ও. হেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন



ও. হেনরী

পরিবর্ধিত, পুনঃসংকলিত, সাম্প্রতিকতম
সংস্করণ থেকে প্রায় দু'শো-তিরিশটি গল্প

দুই খণ্ডে সমাপ্ত ।। প্রকাশ কালানুক্রমে সজ্জিত

অনুবাদ ঃ **রথীন্দ্র সরকার**

ও. হেনরীর উৎকর্ষের মূলে অসহায়-অবহেলিতদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ। অস্তিত্বের চরম গতিহীনতা ও লাঞ্ছনার মধ্যেও তাদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠাময় ভালবাসা, ...যারা নিঃসম্বল, নিরাপত্তার শেষ প্রান্তে যাদের জীবনাতিপাত, তাদের দৈনিক সংগ্রামেই তিনি দেখতে পেতেন সামান্য আনন্দ খুঁজে পাবার তাগিদ, অবশেষে যেন বিপুল জয়লাভের উল্লাস — এরই মধ্যে কখনও-বা প্রলোভন, যা তারা অতিক্রম করে, কখনও-বা ডুবে যায় তার মধ্যেই।*

— ও. হেনরী সম্পর্কে এই মোক্ষম আর অতুলনীয় মন্তব্যটি করেছেন তীক্ষ্ণধী সমালোচক আর্থার কুইন।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রায় জুড়িহীন সৃজনশক্তি ও. হেনরীকে দিয়েছে বিশ্বসেরা কাহিনীকারের স্থান — কেউ বলেন "মপাসাঁ আর চেখভের তিনি সমগোত্রীয়," কারুর মতে, "মার্ক টোয়েইনের পরেই ও. হেনরী।"

ও. হেনরীর অপরূপ কটু-কষায় রসজ্ঞান, উদ্ভাবনী রচনা, লবণাক্ত মাটির ভাষা, রাস্তার জীবনের প্রাণচঞ্চলতা আজও পাঠককে একইভাবে আকৃষ্ট করে রাখে তাঁর একশো

ও. হেনরীর শ্রেষ্ঠগল্প সংকলন

প্রথম খণ্ড

অনুবাদঃ রথীন্দ্র সরকার

সাহিত্যায়ন

১/১ বি. ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

O. Henry Collected Stories

Translated By : Rathindra Sarkar

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুআরি ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ সুজয় ভৌমিক

ফোটোটাইপ সেটিং ঃ কোয়ালিটি প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৩৩৪ ৪৪৯১ / ৫৫১ ৫০৩৩

মুদ্রণ পরিপাট্য ও সহায়তা ঃ অনুপম রায়
প্রচ্ছদ ঃ আশিস সেনগুপ্ত

মুদ্রক ঃ ডায়মণ্ড আর্ট প্রেস
৩৭এ, বেন্টিক স্ট্রীট
কলিকাতা-৬৯

সূচীপত্র

(বাকী অংশ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত)

লেখক পরিচিতি ও ভূমিকা

"লেখার টেবিলে বসে স্রেফ ভেবে-ভেবেই এমন গল্প লেখা যায় না, যাতে 'প্রাণ' থাকে। আপনাকে রাস্তায় বেরুতে হবে, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কথা বলতে হবে মানুষের সঙ্গে, আর প্রকৃত বাস্তব জীবনের গতি ও স্পন্দন বুঝতে হবে নিজের মধ্যে— একজন গল্প লেখকের ওইটাই প্রাণদায়ী শক্তি।"

— ও. হেনরী

১. আজ অবধি ও. হেনরীর কাহিনীগুলো বিশ্বের লক্ষ লক্ষ পাঠককে একটানা বিনোদন ও আনন্দ দিয়ে আসছে। বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা হয়েছে, তার জনপ্রিয় গল্পগুলো নিয়ে মঞ্চ-নাটক, সিনেমা, টেলিভিশন-কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে উত্তর আমেরিকা ছাড়াও ব্যাপকভাবে দক্ষিণ আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায়। ও. হেনরীর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে সমস্ত কাহিনীর মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান : মানবতাবোধ। সহ-মানুষের প্রতি অসীম দরদ, কোমল কৌতুক, অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষটির প্রতি সমবেদনা-এগুলো সবই পাওয়া যাবে ও. হেনরীর রচনায়। একশো বছর আগের লেখার সমকালীনত্ব মিশে গেছে সর্বকালীনতার মধ্যে, আজও তাই নতুনত্ব ঘোচেনি।

২. ও. হেনরীর গোটা জীবনই এক 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা'। এটা বুঝলেই মানুষটাকে আর তাঁর লেখা বেশ কিছুটা বোঝা সম্ভব। বিশদ কল্পনাশক্তিই শুধু নয়, তাঁর গল্পগুলোর শেকড় রয়েছে বাস্তব ঘটনা ও সত্যকার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে। কোথায় না পেয়েছেন তিনি চরিত্র আর পটভূমির সন্ধান? ভদ্র মধ্যবিত্তের 'দক্ষিণ' থেকে শুরু করে টেক্সাসের বুনো 'পশ্চিম', আবার বিপ্লবী ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আধুনিক নিউইয়র্ক নগরী-তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মুখে পড়েছিল মানুষের দোষগুণে ভরা সত্যিকার চরিত্রের অভিব্যক্তি, নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ স্থানীয় বর্ণময় পরিবেশের চিত্রণ-এগুলোই ছিল তাঁর রচনার আসল ভিত।

৩. 'শেষ মোচড়' বা আকস্মিক উপসংহার (যাকে গণ্য করা হয় ও. হেনরী-ট্রেডমার্ক বলে), তার উদ্ভব কিন্তু তাঁর নিজের জীবন থেকেই। অনেকে এটাকে নেহাতই এক 'কৌশল' বলে অভিহিত করলেও ও. হেনরী এ-কৌশলকেই 'নিয়তির গূঢ় শ্লেষ' বলে মনে করতেন, যা কোনো লেখক প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতেও পারেন।

৪. ও. হেনরীর আসল নাম উইলিয়ম সীডনী পোর্টার (তিনি পছন্দ করতেন 'সিডনী' বানানটা)। জন্মেছিলেন উত্তর ক্যারোলাইনা রাজ্যের গ্রীন্স্‌বরোতে-১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬২। তাঁর জন্ম আর বড় হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পুনর্গঠনের' আমলে (১৮৬৫-৭৭ সাল, যখন যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় ফিরে আসার আগে প্রাক্তন

দাক্ষিণী-সংঘ রাজ্যগুলো প্রশাসিত হত ফেডারেল সরকার দ্বারা)। অর্থাৎ তখনো ডামাডোল ও বিশৃঙ্খলা। শিক্ষিতা মায়ের মৃত্যুর পর বাপকে ছেড়ে বাস করতে থাকেন পিসির ঘরে। পিসির যত্নেই প্রথম শিক্ষাদীক্ষা-'গল্প বলা' শেখা, আর কার্টুন স্কেচ আঁকা। ও. হেনরীর নিজের কথায়-'তের থেকে উনিশ বছরের মধ্যে তিনি যত পড়াশোনা করেছিলেন তেমন আর অন্য কোনো সময়ে করেননি।' প্রচুর চিরায়ত সাহিত্যের বই তিনি তখনই পড়ে ফেলেন।

৫. পনের বছর বয়েসে স্কুল ছেড়ে পোর্টার শিক্ষানবীশ হয়ে কাকার ওষুধের দোকানে ঢোকেন-'বিক্রেতার' লাইসেন্সও লাভ করেন। কিন্তু আটক জীবন তাঁর ভাল লাগত না। তবে ওষুধের দোকানে থাকা কালে একটা লাভই তাঁর হল। ওখানে শহুরে সমাজের নানা বিচিত্র লোকের আনাগোনা। গল্পগুজব করার সময় আর গল্প বলার সময় তাদের আচরণভঙ্গি আর মুদ্রাদোষ সবই লক্ষ্য করতেন পোর্টার। কার্টুন এঁকে ফেলতেন সঙ্গে-সঙ্গেই। এইসব বিচিত্র ছবিই পরে রূপ পায় তাঁর 'ও. হেনরী' ছদ্মনামে লেখা গল্পগুলোতে। কাকার ওষুধ-দোকানের চরিত্রগুলো দক্ষিণী পটভূমিতে আবির্ভূত হয় 'ব্ল্যাকজ্যাকে দাঁও কষা', 'সুপুত্রের বাপ' আর 'মর্যাদার রক্ষাকর্তা' গল্পে।

৬. কুড়ি বছর বয়সে পোর্টারের প্রথম ঘরের বাইরে পা রাখা-টেক্সাসে বেড়াতে যাওয়া তাঁর পক্ষে যেন বিদেশ যাত্রা। সেখানে বিস্তর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হল নানা ধরনের পেশায়-কাউবয়, ভেড়া চরানো, ডাক হরকরার কাজ, বাবুর্চি, নকশাবিদ আর আবাদ দপ্তরের কেরানিগিরি। এ ছাড়া শিখলেন মেক্সিকান উপভাষা যা তিনি অনেক গল্পেও ব্যবহার করেছেন। ভ্রমণ-পিপাসু পোর্টার এইসব উপনিবেশ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, প্রথম-বসতিকারীদের বিচিত্র সমাজে মেলামেশা করতেন। বড় কথা হ'ল ভবিষ্যৎ রচনাগুলোর জন্য রসদ সংগ্রহ শুরু হ'ল নতুন করে।

৭. অবশেষে ১৮৮৭ সালে তাঁর স্থায়ী বসবাস হল অস্টিনে, বিয়ে করলেন সেখানে। তাঁদের প্রথম সন্তান জন্মের পরেই মারা যায়, তবে ১৮৮৯ সালে জন্ম হল তাঁর মেয়ে মার্গারেটের। দু'বছর বাদে রাজনৈতিক কারণে পোর্টার চাকরি খোয়ালেন 'জমি-সংক্রান্ত দপ্তর' থেকে। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একটা চাকরি পেয়ে গেলেন 'ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ টেক্সাস'-এ। ওই ব্যাঙ্কে কাজকর্মের যা ছিরিছাঁদ আর দুর্নীতি, তা নিয়ে পরে লিখেছিলেন 'সান রোজারিওর বন্ধুরা' গল্পটি। কিন্তু এই চাকরিই পোর্টারের 'কাল' হল। ১৮৯৪-এ চাকরিকালেই তিনি ছাপাকল সমেত একটি পত্রিকা কিনে ফেলেছিলেন, সে 'বাজে' পত্রিকার আপাদমস্তক সবকিছু নিজেই সম্পাদক, লেখক, প্রকাশক হিসেবে চালু করলেন তাঁর প্রথম

কৌতুকী সাপ্তাহিক 'রোলিং স্টোন'। এই শুরু হ'ল তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজগতে অভিযান।

৮. কিন্তু 'রোলিং স্টোন' চলেছিল এক বছর মাত্র। এ সময়ের কিছু গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। পোর্টার ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে পুরোদমেই নেমে পড়েছিলেন কাজে। কিন্তু ভাগ্যহত ও অনভিজ্ঞ পোর্টার দেনার পাঁকে ডুবে গেলেন। শেষে ছাড়তেই হল প্রেস পরিচালনা।

৯. পোর্টারের বিড়ম্বনার সবে তখন শুরু। ব্যাঙ্কের চাকরির আমলেই তিনি নাকি তহবিল তছরুপ করেছিলেন বলে তাঁর নামে নালিশ উঠল আদালতে। তিনি যথাসাধ্য প্রতিরোধও করলেন সুহৃৎবর্গের সাহায্যে। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের বহু চেষ্টা করেও বদনামটা কিন্তু থেকেই গেল। আদালতের প্রমাণপত্র যথেষ্ট ছিল না। রেহাই পাবার পর প্রস্তাব এসেছিল ওয়াশিংটনের এক কমিক সাপ্তাহিক সম্পাদনার, কিন্তু সে-কাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হল স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির জন্য। পরে অবশ্য একটা পদ লাভ করেছিলেন 'হুস্টন পোস্ট' পত্রিকায়। এক বছর ধরে তাতেই প্রকাশ করতে লাগলেন গল্প, কার্টুন, স্কেচ, কবিতা। সে গল্পগুলোতেই ভবিষ্যৎ 'ও. হেনরীর' নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির স্পষ্ট ছাপ দেখা যেতে থাকে। এই সময়ের বেশ কিছু গল্প বর্তমান সংকলনটিতে সংযোজিত। ...১৮৯৬ সালে আবার সেই ব্যাঙ্ক তছরুপের অভিযোগ নতুন করে এল ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষকদের তরফ থেকে। অস্টিন থেকেই বিচারপ্রার্থী হবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি পালিয়ে গেলেন নিউ অর্লিয়ন্সে, তারপর সেখান থেকে হণ্ডুরাসে। ওদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো 'বন্দী-প্রত্যর্পণ' চুক্তি ছিল না, তাছাড়া স্পেনীয় ভাষাটাও তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন বলে সুবিধা হল।

১০. হণ্ডুরাসে থাকার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তাঁকে গল্পের খোরাক দিয়েছিল যথেষ্ট। হণ্ডুরাসের (ও. হেনরীর ভাষায় আঞ্চুরিয়া) পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পগুলো ১৯০৪ সালে 'রচনাবলী' (রাজারাজড়া ও বাঁধাকপি) আকারে প্রকাশ পায়। আর যাতায়াতের পথে নিউ অর্লিয়ন্স শহর নিশ্চয়ই বিশেষ ছাপ রেখেছিল তাঁর মনে, যার ফল 'মহিলাটির সন্ধান কর!' আর 'শার্লেরয়ে পুণর্জীবন' গল্প দু'টি। বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে অবশ্য 'অন্ধ মানুষের ছুটি' গল্পটি।

১১. আদালতে অভিযুক্ত না হয়ে নির্বাসনেই যতদিন থাকা যায় এই আশায় তিনি স্ত্রী আর মেয়েকে ওখানে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তখন টি. বি. রোগে গুরুতর অসুস্থ, তাই অবশেষে পোর্টার ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েই স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করলেন। স্ত্রী মারা গেলেন

জুলাই ১৮৯৭ সালে, আর পোর্টারের পাঁচ বছরের জেল হল ১৮৯৮ সালের ফেব্রুআরিতে। ওহায়ো রাজ্য জেলের বন্দী হয়ে থাকলেন। মেয়ে মার্গারেটকে দেয়া হয়েছিল স্ত্রীর বাপ-মায়ের হেপাজতে। জীবনের এই করুণ পর্যায়েও তিনি বেচতে পেরেছিলেন প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের গল্প 'লাভা-গিরিখাতে অলৌকিক লীলা'-দেশের এক সংঘবদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছে।

১২. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর অপরাধের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সমাধান কখনোই হয়নি। কাউকে বাঁচাবার জন্য নিজে দোষের ভাগী হয়েছেন, কি ব্যাঙ্কের নির্বিচার বেপরোয়া উল্টোপাল্টা সাক্ষ্যে আসল সত্য চাপা পড়ে গেল তা জানার উপায় থাকেনি-তবে আজ পর্যন্ত তাঁর দোষ বা নির্দোষিতার কোনো মজবুত প্রমাণ মেলেনি, মৃত্যু-পরবর্তী অনুসন্ধানেও। তবে হ্যাঁ, জেল জীবনে তাঁর বিস্তর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রাক্‌জীবনের ওষুধপত্রের জ্ঞান তাঁকে সাহায্যই করেছিল জেলের একঘেয়ে জীবন কাটাতে। সহ-কয়েদীদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে আর তাদের চরিত্র অধ্যয়ন করে তাঁর যথালাভ হয়েছিল গল্পের মাল-মশলা সংগ্রহে। কারা-জীবনেই প্রথম বিকশিত হল তার মূল মানবিক জীবনদর্শন-এইসব হতভাগ্য নিচুতলার মানুষদের অভিব্যক্তি ফোটাতে হবে নিজের রচনায়-তিনি হবেন ওদের মুখপাত্র। চোদ্দটা গল্প জেলে বসে লেখা হয়েছিল বিভিন্ন ছদ্মনামে, ছাপাও জেলের মেয়াদ শেষ হবার আগেই। 'জর্জিয়ার বিধান' আর 'শিসের সুর আর উপহার' এই সময়ের লেখা।

১৩. ১৯০১-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চলে গেলেন পিট্‌সবার্গে, মেয়ের সঙ্গে রইলেন শ্বশুরবাড়িতে। এবার পেলেন একটা চাকরি-'এইন্‌স্লে' ম্যাগাজিনে। ১৯০২ সালে 'অসহ্য' কারখানা-শহর পিট্‌সবার্গ ছেড়ে চলে এলেন নিউইয়র্কে। এতদিনে লেখক হিসেবে সমগ্র দেশে তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছে। নিউইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি থেকেই শুরু হল চরিত্রের ছবি, ঘটনা, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, নানা উপভাষা-সবই এই একটি শহরের মধ্যে। 'এ শহরের প্রত্যেক গৃহেই রয়েছে নাটক, সারা জীবন কাটাতে হয় তো নিউইয়র্কের প্রতিটি রাস্তায় কাটাব', বলতেন ও. হেনরী। ১৯০৩ থেকে ১৯০৭-এই শহরেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল আর ফলবন্ত পর্যায়। দেশের সবচেয়ে বড় পত্রিকা 'নিউইয়র্ক সান্‌ডে ওয়র্ল্ড'-এর সঙ্গে চুক্তি হল এই সময়েই, প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প। অচিরাৎ কর্মজীবনের একেবারে চূড়ান্তে পৌঁছে যান তিনি। ওয়র্ল্ড-এর জন্য ও. হেনরী একশোরও বেশি কাহিনী লিখেছেন, যার অনেকগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার পর্যায়ে : 'The Furnished Room,' 'Gifts of the Magi' আর 'The Unfinished story' সংকলনের ২য় খণ্ডে গল্পগুলি পাবেন।

১৪. প্রাপ্তিযোগটা ভাল হলেও ও. হেনরীর অর্থাভাব চিরন্তন। একদিক থেকে অগ্রিম চাওয়া, অন্যদিকে কোনো-না-কোনো ঋণ পরিশোধ করা-মেয়েকে যে-স্বাচ্ছন্দ্য ও বাৎসল্য আগে দিতে পারেননি তা এবার দু'গুণো দিয়ে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা, তাকে বড় স্কুল-কলেজে পড়ানো, তার ওপর আবার নিজস্ব শৌখিন জীবন, খরচে হাত। এই টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁর সুরাপানের অভ্যাস বেড়েই চলে। যাকে-তাকে অবিবেচকের মতো টাকা ধার দেন, জোচ্চোররা তাঁকে ঠকায়। রাস্তায় বেরুলেই দান-ধ্যান, তার ওপর দামি সুরার আহ্বান।

১৫. লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন না, ওতে ঘন-ঘন ছেদ পড়ে, এর মধ্যে শুরু হয় মদ্যপানজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ। লেখার সংখ্যা ক্রমে বিরলতর হয়ে আসে। সম্পাদকদের ক্রমাগত অভিযোগ, এমনকি শাসানি পর্যন্ত শুনতে হত। এই সময়েই (১৯০৫) 'মান্সিজ' পত্রিকার সঙ্গে একটা নতুন চুক্তি করলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন আবার বেশ নিয়মিতই লিখে চললেন।

১৬. ১৯০৭ সালে ও. হেনরী বিয়ে করলেন উত্তর ক্যারোলাইনার গ্রীনস্‌বরো থেকে তাঁর এক বাল্যসখী সারা কোলম্যানকে। তাঁর এই দ্বিতীয় বিয়ে হল অসফল। ও. হেনরীর অতিরিক্ত মদ্যপান আর ভগ্ন-স্বাস্থ্যই এর অন্যতম কারণ। এক বছরের মধ্যেই তাঁরা পৃথকভাবে বাস করতে লাগলেন। বন্ধু প্রকাশকরা অনেকবার তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন নিউইয়র্কের বাইরে গিয়ে থাকতে, এমনকি তাঁরা তাঁকে লং-আইল্যাণ্ডে একটি বাড়ি দেবারও প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু শহর ছেড়ে নিরিবিলিতে বাস তাঁর ধাতে সয় না, লেখার প্রেরণাই পান না।

১৭. ও. হেনরীর শেষ জীবনে বাসনা হয়েছিল একটি উপন্যাস লেখার, পাছে লোকে তাঁর খ্যাতি ও যোগ্যতাতে আস্থাহীন হয়। 'কোলিয়ার্স' পত্রিকা থেকে আগাম টাকা পেলেও সে-কাজ শুরু করতে পারলেন না। ১৯১০ সালের ১০ই জুন একটানা ছ'মাস অসুস্থ থেকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন।

১৮. ছোট গল্পের রাজা তাঁর পছন্দসই সেই গল্পের চূড়ান্ত 'মোচড়' দিয়ে গেলেন মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও। এমন এক সময়ে তাঁর শেষকৃত্যের আকস্মিক ব্যবস্থা হয়েছিল যখন সেই একই গির্জাতে একটা বিবাহ উদ্‌যাপন হবার কথা। তাই খোলা জানলার বাইরে থেকে যখন বাজনা আর হর্ষধ্বনি ভেসে আসছে তখন ভেতরে তাঁর জন্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দেয়া হল বিয়ের আসর বসতে দিয়ে।

১৯. উপন্যাস লেখার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁর ধারাবাহিক কিছু গল্পে—যা ১৯০৮ সালে The Gentle Grafter নামে প্রকাশিত। ১৪টার মধ্যে ১১টা গল্পই 'জেফ পিটার্স' নামে এক চরিত্রকে নিয়ে (যার অনেক কটিই পরিবেশিত হয়েছে বর্তমান সংকলনে)। 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট'-এ তাঁর একমাত্র প্রকাশিত

গল্প The Ransom of Red Chief যেন এক রত্ন, আর তার পাশাপাশি সেই সর্বপরিচিত অতি জনপ্রিয় কাহিনী Gifts of the Magi যা ছেলেমেয়েদেরও স্কুল-পাঠ্য।

২০. মৃত্যুর পর থেকেই যেন ও. হেনরী জনপ্রিয়তার আরো শীর্ষে আসেন। অসাধারণ সংবেদনশীলতা ছাড়াও সামাজিক জীবনের আরো অনেক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করার মতো। একশো বছর আগের লেখা হলেও কোনো পাঠকই চিনতে ভুলবেন না ঠগ-জোচ্চোর-প্রমোটর-জমি-হাঙ্গর, জমির দলিল জালকারীদের এবং পুরস্কার হিসেবে পাবেন সমাজের এই অহিতকারীদের নাটকীয় শাস্তিবিধান। উদীয়মান শিল্পসৃষ্টির যুগে ইতিহাসের অপ্রধারিত রথচক্রের নিচে যাদের ক্ষয় ও অপচয় তা কিন্তু সে যুগে ও. হেনরীরও দৃষ্টি এড়ায়নি। এগুলোই তাঁর কালোত্তীর্ণতার লক্ষণ।

২১. ১৯২০-১৯৪০ একটানা জনপ্রিয়তার পর বিশ্লেষণমুখী সমালোচকরা কিছু কিছু ত্রুটি আবিষ্কার করেন। তাই এর পর একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ শুরু হয়। কষ্টকল্পিত কৌশল, বা সারগর্ভহীনতার দায় চাপে তাঁর গল্পগুলোর ক্ষেত্রে। কেউ কেউ বলেন জাতিভাষা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেযুগের পক্ষে বোধহয় সেটাই ছিল স্বাভাবিক, আর তাঁর নিজের মতো এগুলো নেহাতই বৈরতাহীন কৌতুকমাত্র, সাদা ইয়াংকি বা নিজের ভাষা নিয়েও তো কম কিছু করেননি। একটা ব্যাপারে কিন্তু সেকেলে বা আধুনিক সমালোচকরা একমত : নারীজাতি সম্পর্কে ও. হেনরীর অগাধ সহৃদয় শ্রদ্ধা, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী। ১৯৬০ সালের পর আবার সমালোচনার মোড় ঘুরে যায়।

২২. এই শেষতম সংকলনটির পেছনে আছে অসংখ্য পাঠকের তাগিদ, মূল রচনা তখনকার পত্র-পত্রিকায় হুবহু যেভাবে ছাপা হয়েছিল তারই জনপ্রিয় সংগ্রহ। সংশোধন ও সংযোজন থেকে উদ্ধার করে এই নব-সংকলন কালানুক্রমে সাজানো, পুরনো পাঠকসমাজ যেভাবে পড়েছিলেন, নিজেদের সংগ্রহে সযত্নে রেখেছিলেন-তেমন মূলরূপেই প্রকাশিত। ও. হেনরীর এমন 'গণতান্ত্রিক' সংকলন আর কখনো হয়নি।

২৩. গল্পগুলোর মধ্যে বিধৃত তাঁর নিজস্ব জীবন-স্থান-কাল-পাত্র ঠিক যেমন বেঁচে থেকে দেখেছিলেন। "মার্ক টোয়েইনের পর এমন খাঁটি আমেরিকান লেখককে 'মার্কিন চেখভ' বা 'ইয়াংকি মপাসাঁ' বললেও অত্যুক্তি হয় না।"
(পল হরোউইটস্)

— অনুবাদক

তিকতোক

অস্টিনে ঝানু ফরাসী গোয়েন্দার আবির্ভাব

ও রাজনৈতিক চক্রান্তে সাফল্য

বিখ্যাত ফরাসী গোয়েন্দা তিক্‌তোক যে গত সপ্তাহে অস্টিনেই ছিলেন তা অনেকেরই অজানা। একটা ছদ্মনাম নিয়ে এ্যভিন্যু হোটেলে কামরা নিয়েছিলেন। ধীর, চাপা হাবভাবের জন্য অচিরেই তাঁকে বেশ আলাদা করে চিনে নেওয়া যাচ্ছিল, একজন গোয়েন্দাকে অবশ্য এভাবে আলাদা চিনে নেবার কথা নয়।

তিনি অস্টিন শহরে কেন এলেন তা কেউ জানে না, তবে দু'একজনের কাছে মুখ খুলে তিনি প্রকৃত তথ্যটা জানিয়েই দিয়েছেন— ফরাসী গভর্নমেন্টের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন।

একটা বিবরণে জানা যায়, ফ্রান্সের রাষ্ট্রসচিব নাকি ফরাসী সাম্রাজ্যের দলিলদস্তাবেজের মধ্যে একটা পুরনো নথি আবিষ্কার করেছেন— সম্রাট শার্লেমেনের সঙ্গে গভর্নর রবার্টসের নাকি চুক্তি হয়েছিল যার ফলে পরিষ্কার শর্ত রয়েছে ক্যাপিটাল (ওয়াশিংটনের) জমির উত্তরের ফটকটা সব সময়ই খোলা রাখতে হবে! তা এসব অবশ্য নেহাতই কপোল কল্পনা।

গত বুধবার বিকেলে এক সুবেশ ভদ্রলোক এসে তিক্‌তোকের হোটেল-কামরার দরজায় করাঘাত করলেন।

গোয়েন্দা দরজা খুললেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনিই মঁসিয়ে তিক্‌তোক মনে হচ্ছে?'

তিক্‌তোক বললেন, 'হোটেলের খাতায় দেখবেন আমার নাম সই করা আছে কিউ. এক্স. জোন্‌স বলে। তার মানে, ভদ্রলোকেরা বুঝবেন, ওই নামেই আমি পরিচিত হতে চাই। আর আপনি যদি নিজেকে ভদ্রলোক বলে উল্লেখ করতে না চান, তাহলে পয়লা জুলাইয়ের পর যে-কোনো দিন আপনাকে যথোচিত খুশি করব, এবং এর মধ্যে আপনার ইচ্ছে হলে স্টিভ ও' কোনেল, জন ম্যাকডোনাল্ড, আর ইগনেশিয়াস্ ডোনেলির সঙ্গে লড়ে দেখাতেও পারি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমারও বিন্দুমাত্র অনিচ্ছে নেই তাতে। সত্যি বলতে, এতেই আমি অভ্যস্ত। আমি হলাম ডেমোক্রাট দলের কার্যকরী কমিটির দু'নম্বর মঞ্চের সভাপতি। আমার এক বন্ধু বিপদে পড়েছেন। আপনার মুখের সঙ্গে চেহারার মিল দেখেই বুঝলাম আপনি তিক্‌তোক ছাড়া আর কেউ নন্।'

'ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক', বললেন ডিটেকটিভ।

ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন, ওঁর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তিক্‌তোক বললেন,

'দেখুন আমি অল্প কথার মানুষ। সম্ভব হলে আপনার বন্ধুকে সাহায্য করব। আমাদের দেশ তো বন্ধু-সুহৃৎদের দেশ। আপনাদের আমরা দিয়েছি লাফায়েতের মতো মানুষ, ফরাসী আলুভাজা। আপনারা আমাদের দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া শ্যাম্পেন, আর—আর ফিরিয়ে নিয়েছেন ওয়ার্ড ম্যাক-এলিস্টারকে। বলুন আপনার কেস্‌টা কী ?

আগন্তুক বললেন, 'খুব সংক্ষেপেই বলব। এই হোটেলের ৭৬ নম্বর কামরায় বাস করছেন পপুলিস্টদলের নামজাদা একজন নির্বাচনী প্রার্থী। উনি একাই আছেন। গত রাত্রে কেউ একজন তাঁর মোজা চুরি করেছে। মোজাগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ওগুলো না ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পার্টি তাঁদের এই ক্ষতির জন্য দায়ী করবে ডেমোক্রাটকেই। অপহরণের ব্যাপারটাকে ওরা বিরাট কিছু বানিয়ে ফেলবে, যদিও আমি নিশ্চিত যে এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চাল ছিল না। মোজাদুটোকে ফিরে পেতেই হবে, স্যর। আপনিই একমাত্র মানুষ যিনি এটা করতে পারেন।'

তিক্‌তোক মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'হোটেলের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেককেই জেরা করবার অবাধ অধিকার পাবো তো ?

'মালিকের সঙ্গে আগেই কথাবার্তা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ, আর প্রতিটি জিনিসই আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকবে।'

তিক্‌তোক নিজের হাতঘড়ি দেখলেন।

'এই কামরাতেই কাল বিকেল ছ'টার সময় আসবেন— হোটেল মালিক, পপুলিস্ট প্রার্থী, আর দু'দল থেকে বাছাই করা কিছু সাক্ষী রাখবেন সঙ্গে। আমি মোজাজোড়া ফিরিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে ফরাসীতে বললেন— ভালো, মঁসিয়। আর জার্মান ভাষায়ও বললেন— সুনিদ্রা দেবেন!

'আ রিভোয়া।'

ডেমোক্রাট দলের কার্যকরী সমিতির দু'নম্বর মঞ্চের সভাপতি বিনয়ে মাথা নত করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

* * *

হোটেলের কামরা পরিচারককে ডেকে পাঠালেন তিক্‌তোক।

'গত রাতে তুমি ছিয়াত্তর নম্বরের কামরায় গিয়েছিলে ?

'হ্যাঁ স্যর।'

'ওখানে কে ছিলেন ?'

'ওই যে বুড়ো গেঁয়ো লোকটা, সাতটা-পঁচিশের গাড়িতে আসে।'

কী চেয়েছিলেন উনি ?'

'বাত্তি নেভাবার ছড়ি।'

'কেন?'

'বাত্তি নিভিয়ে দেবেন বলে।'

'ও ঘরে থাকতে তুমি কোনো জিনিস নিয়েছ?

'না, আমাকে তো বলেননি কিছু নিতে।'

'তোমার নাম?'

'জিম।'

'তুমি যেতে পার।'

অস্টিনের এক অতি সুরম্য ব্যক্তিগত অট্টালিকার বসবার ঘরগুলো আজ আলোয় ঝলমল করছে। সামনে সার বেঁধে একেকটা গাড়ি। ফটক থেকে ভেতরের দরজা অবধি মখমলের কার্পেট পাতা। ওতে আজ হয়তো অতিথিদের কোমল পায়ের ছাপ পড়বে।

আজকের অনুষ্ঠানটার হেতু হল, এই "বেগুনি মুকুটের শহরের" সবচেয়ে সুন্দরী কুঁড়িটিকে সমাজের মধ্যে পরিচিত করে দেওয়া। তাই এই কামরাগুলো ভরে উঠেছে সমাজের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, সৌন্দর্য, যৌবন আর ফ্যাশনে। বলা হয়ে থাকে কান্‌সাস শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একমাত্র অস্টিনের সমাজেই পাওয়া যাবে সবচেয়ে বুদ্ধিরসিক, হাতে গোনা সেরা কুলশীলের রত্নদের।

অন্যত্র যাদের তুলনাই মেলা ভার এমন সব প্রতিভা আর সৌন্দর্যের চক্রকে নিজের চারপাশে আকৃষ্ট করে রাখতে অভ্যস্ত এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী— শ্রীমতী রুটাবাগা সেন্ট-ভিটাস্‌। ওঁর সান্ধ্যবাসরগুলো একেক সময় সত্যিই যেন একটা সালোঁর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অতিথেয়তার এই সম্ভারের সুযোগে শুভলগ্ন সূচনা করে যাকে সমাজের মায়াজালে টেনে আনা হবে সে হল কুমারী সেন্ট-ভিটাস্‌— তন্বী, বাদামি চুল, বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ, মনকাড়া হাসি আর অকপট চালচলনের একটি মেয়ে। সে পরেছে প্রিন্সেস-কাটের চীনা সিল্‌ক, হীরাবসানো গয়না। কাঁধের উঁচু কোণ ঢাকবার জন্য পিঠের পেছনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একজোড়া তোয়ালে। রেশমমোড়া ডবলসোফায় বসে অনায়াস স্বাভাবিকভাবে সে গল্পগাছা করছে হ্যারল্ড সেন্ট্‌-ক্লেয়ারের সঙ্গে। মিনিয়াপোলিস প্যান্ট কোম্পানির দালাল হ্যারল্ড। .....

কাছেই কোথাও ঝোপঝাড়ের আড়ালে ব্যাণ্ড বাজছে। আর কথাবার্তার ফাঁকে-ফাঁকে রান্নাঘর থেকে ভাজা রসুনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

চুনির মতো লাল ঠোঁটগুলো থেকে আনন্দের হাসি; ফর্সা ঘাড় আর আনত মাথার পাশে ঝুঁকে-পড়া সুন্দর মুখগুলো যেন কোমলতর হয়; ভীরু চোখের ভাষায় এমন কত কথা যা মুখে বলতে সাহস হয় না। আর "প্রেমের যৌবনস্বপ্ন"

সঙ্গীতের তালে রেশম বক্ষ-বাস বা মোটা জিনের নিচে হৃৎপিণ্ডগুলোও যেন তাল দিয়ে নাচতে থাকে।

মিস্ সেন্ট-ভিটাস্ এবার হ্যারল্ড সেন্ট্-ক্লেয়ারকে বললে, 'তাহলে আমাদের ভয়কাতুরে বীর! কোথায় কোথায় ঘুরছিলে এত দিন? অন্য কোনো মন্দিরে পুজো দিচ্ছিলে বুঝি? তোমার ক্ষণিকের বন্ধুদের কাছ থেকেও বুঝি পালিয়ে বেড়াও? স্যার বীরপুরুষ, এবার মুখ খুলে নিজের সাফাইটা দাও!

ভারী গানের-গলার মতো ঘন কণ্ঠে জবাব দেয় হ্যারল্ড, 'দূর, ওসব রাখো তো! তুলোবাগিচার বগাগুলোর ধনুকবেঁকা পায়ের মাপে পাতলুন বানাতে গিয়ে বহু সময় নষ্ট করেছি। ওদের পায়ে বড় বড় কুমড়োপানা কড়া, এদিকে চায় ফিটফাট হতে। ধনুক-পায়ের মাপ নিতে চেষ্টা করেছ কখনো? কী নাজেহাল যে হতে হয়! তা ছাড়া ব্যবসাও ভাল যাচ্ছে না, কেউ তিন-ডলারের ওপর দামই দিতে চায় না।'

'এই তো চালাক ছেলে! মুখে মিঠে বুলি, চিরকাল চতুরালি কথা। তা, এখন কী পান করা হচ্ছে?

'ওহ্, বীয়ার।'

'তোমার হাতটা দাও, দু'জনে বসার ঘরে গিয়ে শ্যাম্পেনের কাঁক খুলি। আমিও তো ছাইভস্ম গিলছি।' ...

বাহুতে বাহু জড়িয়ে সুদর্শন জুটিটা সবার নজর কেড়ে হলের ভেতর দিয়ে চলল। ওলিয়েণ্ডার ঝোপের নিচে তখন দাঁড়িয়ে আছে লোনস্টার কসাইখানার উদীয়মান প্রতিভাশালী নৈশ-পাহারাদার লুডেরিক, আর তার সঙ্গে 'কুঁজো-উট' প্রমোদভবনের লাখপতি মালিকের মেয়ে ম্যাবেল গ্রাব।

লুডেরিক বলে, 'বড়ো সুন্দর মেয়েটি।'

ম্যাবেল বলে, 'ইঁদুর।'

এতক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণ নজর রাখলে কেউ দেখতে পেত একটি নিঃসঙ্গ মূর্তিকে। তিনি যেন লোকজন এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কৌশলে জায়গা বদল করে আর পুরোদস্তুর ধীর আত্মস্থ ভাব বজায় রেখে কারুরই দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করছেন না নিজের দিকে।

আজকের সান্ধ্যবাসরে সিংহোপম ব্যক্তি হলেন পিয়ানোবাদক অধ্যাপক শ্রী লুডভিগ ফন বুম। গত হপ্তায় কর্নেল সেন্ট-ভিটাস তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন শহরের এক বীয়ার কক্ষে। অস্টিনের আদবকায়দা অনুযায়ী কর্নেল তাঁকে ঘরে ডেকে আনলেন, আর পরদিনই সমাজে গৃহীত হলেন তিনি। বড়ো সঙ্গীতশিক্ষার অনুশীলন শুরু হল তাঁর হেপাজতে।

অধ্যাপক ফন বুম এখন বীঠোফেনের অপূর্ব সিমফোনিটি বাজাচ্ছেন— "সঙ্গীতহীন

গীত"। সুনিপুণ হাতে অতি জটিল, অতি কষ্টকর অংশোগুলো বাজিয়ে শ্রোতাবর্গকে একেবারে পুরোপুরি রুদ্ধবাক্‌, করে দিলেন— যার মূল্য শিল্পীর কাছে সরব হাততালির চেয়েও বেশি।

অধ্যাপক মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখলেন।

কক্ষ জনশূন্য।

শূন্য শুধু একজন মানুষ বাদে— ফরাসী গোয়েন্দা তিক্‌তোক। তিনি একগাদা দক্ষিণী গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আচমকা হাজির হলেন অধ্যাপকের পাশে।

ঘাবড়ে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক।

তিক্‌তোক বললেন, 'একেবারে চুপ! আওয়াজ করবেন না। এর মধ্যেই অনেক করেছেন।

বাইরের দিকে পদশব্দ শোনা যায়।

তিক্‌তোক বলেন, 'তাড়াতাড়ি করুন। আপনার মোজাগুলো আমায় দিন। নষ্ট করবার সময় নেই এক মুহূর্ত।'

'ভাস্‌ জাগ্‌স্ট্‌ দু?' (কী বলছেন আপনি?)— জার্মান বেরিয়ে আসে অধ্যাপকের।

'ওহো! স্বীকার করছে দোষ! অন্য কোনো মোজায় চলবে না, যে-জোড়া পপুলিস্ট প্রার্থীর কামরা থেকে চুরি করা হয়েছিল সেই জোড়া।'

এদিকে আর-কোনো সঙ্গীত শুনতে না পেয়ে অভ্যাগতেরা ফিরে আসছে।

তিক্‌তোকের কোনো ইতি-উতি নেই। অধ্যাপককে চেপে ধরেন, মেঝের ওপর তাঁকে ফেলে তাঁর জুতো-মোজা খুলে নেন, মোজা হাতে নিয়ে কেটে পড়েন খোলা জানলা দিয়ে একেবারে বাগানে।

এ্যভিন্যু হোটেলে তিক্‌তোকের কামরা।

দরজায় একটা টোকার আওয়াজ শোনা যায়।

তিক্‌তোক দরজা খুলে নিজের ঘড়ির দিকে তাকান। বলেন, 'আ— এই তো ঠিক ছ'টা বাজল। ভেতরে আসুন মশাইরা।'

মশাইরা ভেতরে ঢুকলেন। সাতজন এসেছেন ওঁরা। আমন্ত্রিত যিনি পপুলিস্ট প্রার্থী, কী কারণে তাঁকে ডাকা হয়েছে তা জানেন না। ডেমোক্রাট কার্যকরী সমিতি, মঞ্চ ২-এর সভাপতি। হোটেলের মালিক, আর তিন কি চারজন ডেমোক্রাট আর পপুলিস্ট দলের সদস্য, যতদূর আন্দাজ করা যায়।

পপুলিস্ট প্রার্থীই প্রথম শুরু করেন— 'আমি জানি না কী ছাই ব্যাপারে—'

দৃঢ়কণ্ঠে তিক্‌তোক বলেন, 'ক্ষমা করবেন। যতক্ষণ আমি রিপোর্ট না করছি ততক্ষণ নীরব থেকে আমায় বাধিত করুন। এই মামলায় আমাকেই নিয়োগ করা হয়েছে, আর আমি প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনও করে ফেলেছি। ফ্রান্সের মর্যাদার শপথ

নিয়ে অনুরোধ করছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে আমরা কথাগুলো শুনুন।'

সভাপতি বললেন, 'নিশ্চয়, আমরা খুশি হয়েই শুনব।'

তিক্‌তোক কামরার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বিজলি বাতিটা ওর মাথার ওপরেই সমুজ্জ্বল। ওঁকে দেখলে মনে হয় যেন সতর্কতা, শক্তি, চাতুর্য আর ধূর্ততার প্রতিমূর্তি।

সমবেত ব্যক্তিগণ দেয়ালের পাশ দিয়ে চেয়ার নিয়ে বসেছেন।

তিক্‌তোক শুরু করেন— 'ডাকাতি সম্পর্কে খবরটা পাবার পরই আমি প্রথম জেরা করি কামরা পরিচারককে। সে কিছুই জানত না। পুলিস সদরদপ্তরে যাই। ওঁরাও কিছুই জানেন না। ওঁদের একজনকে নিমন্ত্রণ করি হোটেলের বার-এ। তা তিনি বললেন, দশ নম্বর ওয়ার্ডে একটা বাচ্চা নিগ্রো ছেলে থাকত, সে নাকি ছোটখাটো জিনিস চুরি করে লুকিয়ে রাখত, পরে পুলিস সেগুলো উদ্ধার করবে বলে। কিন্তু একবার কথামতো জায়গায় না থেকে পুলিসের গ্রেপ্তার এড়িয়ে গিয়েছিল— তাই তাকে জেলে পাঠানো হয়।

'আমি তখন ভাবতে শুরু করলাম। মনে মনে বিচার করে দেখলাম। আমার বক্তব্য, কোনো লোকই একজন পপুলিস্ট প্রার্থীর মোজা না ঢেকে-রেখে পকেটে নিয়ে ঘুরবে না। হোটেলের মধ্যে বসে সে মোড়কে পুরবে না। তার একখান কাগজের প্রয়োজন হবে। কোথায় পাবে কাগজ? 'স্টেটস্‌ম্যান' অফিসে নিশ্চয়ই। আমি সেখানে গেলাম। ডেস্কের পেছনে বসেছিল একটি যুবক যার চুল কপালের ওপর অবধি টেনে আঁচড়ানো। আমি জানতাম সে বসে সামাজিক ঘরোয়া কলম লিখছে, যেমন কোনো কুমারীর চটিজুতো, একটুকরো কেক বা হাতপাখা, ককটেলের আধখালি বোতল, গোলাপের তোড়া ইত্যাদি। আর সামনে ডেস্কের ওপর রয়েছে একটা পুলিসের বাঁশি।

'তাকে বললাম, "বলতে পারেন গত তিন মাসের মধ্যে কেউ একখানা কাগজ কিনেছে কিনা এখানে?"

'সে জবাব দিলে, "হ্যাঁ, গত রাতেই একটা বেচেছি।"

"লোকটার বর্ণনা দিতে পারেন?"

"হুবহু। গালে নীল জুলফি, কাঁধের হাড়দুটোর মাঝে আঁচিল, একটু কলিক ব্যথার ছাপ, আর নিশ্বাসের গন্ধে পেশাদারী ট্যাক্স।"

"কোন্ রাস্তায় গেল সে?"

"বাইরের।"

'আমি তখন গেলাম—'

পপুলিস্ট প্রার্থী এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এক মিনিট সবুর। আমি তো বুঝতে পারছি না কেন ছাই—'

তিক্‌তোক বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বললেন, 'আমি আরো একবার অনুরোধ করব আপনি চুপ থাকুন। আমি যখন একটা রিপোর্ট দিচ্ছি তখন মাঝখানে বাধ দিতে পারেন না আপনি।'

তিক্‌তোক ফের বলতে শুরু করেন, 'আমি একটা ভুল গ্রেপ্তার করে ফেললাম। রাস্তায় দু'জন ভদ্রবেশী মানুষের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলাম ওদের একজন বলছে "মোজা কেড়ে নিয়েছি"। আমি তাকে হাতকড়ি পরিয়ে টেনে আনলাম দোকানঘরের আলোর সামনে। তখন তার বন্ধুটি আমায় ব্যাখ্যা করে বোঝালে, আসলে তার সঙ্গী একটু বেশি পান করে জিভ জড়িয়ে কথা বলছিল—ব্যবসার কথাই। বলতে চাইছিল বাজারে স্টক "সোজা ঝেড়ে দিয়েছি"।

'তখন তাকে ছেড়ে দিলাম।... এক ঘণ্টা বাদে একটা বীয়ার সেলুনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তখন দেখি এই অধ্যাপক ফন বুম, টেবিলে বসে বীয়ার খাচ্ছেন। প্যারিসে থাকতেই ওঁকে চিনি। ভাবলাম, "এই আমার বান্দা"। ভাগনারের পরমভক্ত, খালি চীজ, বীয়ার আর ধারকর্জের ওপর বেঁচে রয়েছে—যে-কোনো লোকের মোজাই সে চুরি করতে পারে। কর্নেল সেন্ট-ভিটাসের অনুষ্ঠান অবধি ওর পেছু নিলাম, আর ঠিক যথার্থ সময়টিতে ওকে পাকড়াও করলাম। মোজাদুটো ছিনিয়ে নিলাম ওর পা থেকে। এই দেখুন ওগুলো।'

নাটকীয় ভঙ্গি করে তিক্‌তোক একজোড়া নোংরা মোজা ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওপর। বাহুদুটো ভাঁজ করে পেছনে মাথা ঝুঁকিয়ে রইলেন।

রাগে প্রচণ্ড চিৎকার করে পপুলিস্ট প্রার্থী আবার লাফিয়ে উঠলেন।

'যান্, রিফু করুনগে' ওগুলো! আমি যা বলতে চাই তা আলবৎ বলবই। আমি—'

কামরার আর-দুজন পপুলিস্ট সদস্য তাঁর দিকে শীতল কঠোর চোখে চেয়ে রয়েছেন। প্রার্থীকে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, 'এ গল্পটা কি সত্যি?'

'না, না! মোটেই না!'—ডেমোক্রাট সভাপতির দিকে কাঁপা আঙুল দেখিয়ে জবাব দিলেন উনি, 'ওই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, এই সমস্ত চক্রান্ত ওর মাথা থেকে বেরিয়েছে। একটা নারকীয় অন্যায় রাজনৈতিক কৌশল যাতে আমাদের পার্টির ভোট হারাতে হয়। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে?'—ক্ষিপ্তভাবে গোয়েন্দার দিকে ফিরে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন।

তিক্‌তোক নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—'সমস্ত সংবাদপত্রেই আমার লিখিত প্রতিবেদন চলে গেছে। স্টেট্‌স্‌ম্যান আগামী হপ্তায় বিশেষ কলমে ছাপবে।'

পপুলিস্টরা দরজার দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'সব্বোনাশ হল।' প্রার্থী মহোদয় ওঁদের অনুসরণ করে করুণভাবে জানালেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, বন্ধুগণ, আমার কথাটা শুনুন। শপথ করে বলছি জীবনে কখনো মোজা পায়ে দিইনি। এসব হচ্ছে শয়তানি ভোটযুদ্ধের ভেল্‌কি।'

পপুলিস্টগণ মাথা ঘুরিয়ে নেন। বলেন, 'ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। লোকে কাহিনীটা শুনেছে। আপনার এখনো সময় আছে মানে-মানে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার।'

তিক্‌তোক আর ডেমোক্রাটরা ছাড়া সবাই কামরা ছেড়ে চলে গেছেন।

'এবার সবাই চলুন অর্থ-কমিটির দপ্তরে গিয়ে একটা শ্যামপেনের বোতল খোলা যাক্'— কার্যকরী কমিটির দু'নম্বর মঞ্চের সভাপতি প্রস্তাব দিলেন।

Tictocq. 1894. নিজস্ব পত্রিকা 'রোলিং স্টোন'-এ প্রকাশিত ব্যঙ্গ-কাহিনী

নিয়তির পেছু নিয়ে...

রু-দে-পেশোর রহস্য

প্যারিসে এখন মধ্যরাত।

শাঁজেলিজে আর রুজেনোয়ার অগণন বাতির মালা সীন্ নদীর কালো জলে প্রতিবিম্ব ফেলেছে। নদী বিষণ্নভাবে বয়ে চলেছে প্লাস-ভান্দোম আর নোতাদাম কনভেন্টের কালো পাঁচিল ছুঁয়ে।

বিশাল ফরাসী রাজধানী উচ্চকিত হয়ে জেগে ওঠে। এই হল সময় যখন শুরু হবে অপরাধ, পাপ আর শয়তানির রাজত্ব। শতশত ছ্যাকরা গাড়ি পাগলের মতো রাস্তা দিয়ে ছোটে রঙ্গালয় আর কনসার্ট-হল থেকে সুন্দরী নারীদের তুলে নিতে। রত্নরাজিতে সমুজ্জ্বল ওরা স্বপ্নের মতো সুন্দরী। কাফে তু-লা-তাঁর ছোট ছোট মণিকক্ষের মতো ভোজনাগার ভরে ওঠে হাস্যমুখর রসিকদলে, আর যেন হাওয়ায় ছুটে চলে মিঠে কৌতুক, চটুল ইয়ার্কি আর চাপান-উতোর—চিন্তা আর বাক্যালাপের রত্নখনি যেন এটি।

রাজধানীর পথগুলোতে আবার বিলাস আর দারিদ্র্যের ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান। গৃহহীন ছন্নছাড়া মানুষ এক-পয়সা ভিক্ষে চাইছে একটু শোবার জায়গা ভাড়া করতে, আর সেই ফুটপাতেই সুবাসিত গন্ধ বিলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কোনো অপব্যয়ী লম্পট।

অন্য শহরগুলো যখন নিদ্রামগ্ন, প্যারিস তখন সবে শুরু করে তার উদ্দাম উৎসব।

'রু-দে পেশো' রাস্তার পাশের এক ভূগর্ভকক্ষেই আমাদের গল্পের প্রথম দৃশ্যের সূচনা।

পাইপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কামরাটা, খদ্দেরদের তামাকের গন্ধের নিঃশ্বাসে যেন দম আটকে আসে। একটি মাত্র গ্যাসের বাতির ক্ষীণ আলোয় যে দৃশ্য দেখা যায় তা নিশ্চয় শিল্পী রেমব্রাঁ অথবা মোরল্যাণ্ড বা ক্যাসেল পরমাগ্রহে এঁকে নিতে চাইতেন চিত্রপটে।

যাদের কাছে একটু পয়সা আছে সেই রঙবেরঙী ভিড়ের মধ্যেই একটি পরিচারক 'অ্যাবসিন্থে' বেচে চলেছে—ভাঙা চায়ের কাপে কিপ্‌টের মতো ভাগ করে।

বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কার্নাইনোল কাশু—সাধারণ্যে পরিচিত 'ধূসর নেকড়ে' নামে। প্যারিসের সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তি। উচ্চতায় চারফুট দশ ইঞ্চির একটু বেশি। ওই নামটার মূলে ওর তীক্ষ্ণ হিংস্রদর্শন মুখখানা, আর মুখ ও মাথায় আবৃত একরাশ লম্বা জটপাকানো ধূসর চুল।

ডোরাকাটা জামা গলা অবধি পুরো খোলা, নোংরা চামড়ার পাতলুনের ওপর দিয়ে দু'পাশে ছড়ানো। বেল্‌ট থেকে উঁকি মারে ভয়ংকরদর্শন ছোরার বাঁট। ওই ছোরার এক ঘায়ে সেরা ফরাসী সার্ডিনমাছের বাক্স খুলে ফেলা যায় অনায়াসে।

মদ-পবিবেশক কুতো চেঁচিয়ে ওঠে—'এই যে ধূসর নেকড়ে! আজ ক'টাকে ঘায়েল করলে? হাতে তো রক্তেব দাগ নেই। ধূসর নেকড়ে কি কামড়াতে ভুলে গেল?'

ধূসর নেকড়ে হিসিয়ে ওঠে, 'জর্জের দিব্যি, কেবল ঝঞ্ঝাট! মঁসিয়ে কুতো, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস হল তোমার!... সাঁ-গ্রির দিব্যি! এখন অবধি খাওয়াটুকু জুটল না। লুটের কথা বলছ বটে। প্যারিসে আর থাকা চলবে না! তবে কিছুদিন আগে এক ধনী আমেরিকানের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরেছি।.. হুঁ:, ওই ডেমোক্রাটগুলো। দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছে। আয়কর আর খোলা ব্যবসা চালু করে কোটিপতিদের ধান্দা মাটি ক'রছে।... কারাম্বো! শয়তান হতভাগা!'

'চুপ্‌ চুপ্‌!—হঠাৎ বলে ওঠে শামুনি—'কেউ যেন আসছে!' শামুনি আবর্জনা কুড়িয়েই কুড়ি লাখ ফ্রাঁ জমিয়েছে।

তলাকুঠরির দরজা খুলে যায়। নড়বড়ে সিঁড়ি ধরে গুটিগুটি নেমে আসে একটি লোক। নির্বাক শঙ্কা নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে সমস্ত খদ্দের।

লোকটা বারেব কাছে গিয়ে কাউন্টারের ওপর নিজের কার্ডটা রাখে, এক পাত্র অ্যাবসিন্থে কিনে নেয়। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট আয়না বের করে কাউন্টারের ওপরেই বসায়। একপ্রস্থ নকল দাড়ি আর চুল মাথায় গালে পরে নেয়। তুলির আঁচড় মেরে মুখের ওপর কোঁচকানো ভাঁজগুলো বানাতেই তাকে দেখায় হুবহু একাত্তর বছরের কোনো বুড়োর মতো।

তারপর সে একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে তীক্ষ্ণ বেজির মতো চোখে নজর করতে থাকে সমবেত জনতাকে।

ধূসর নেকড়ে সন্তর্পণে বারের কাছে আসে। আগন্তুকের ছেড়ে-রাখা কার্ডখানা উল্টেপাল্টে দেখে।

সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'সাঁ ব্রিজের দোহাই! ইনি যে গোয়েন্দা তিক্‌তোক!'

দশ মিনিট বাদে একজন সুন্দরী মহিলা ঢুকলো ভূগর্ভের পানকক্ষে।

সযত্ন-লালিতা, অর্থের দ্বারা যতটুকু বিলাসিতা কেনা সম্ভব তাতেই অভ্যস্তা এ মেয়েটি। যৌবনে মুতার্দের সাঁ-সুজান কনভেন্টে সেনাসেবিকা থাকাকালে এই ধূসর নেকড়ের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল—লোকটার অসংখ্য অপরাধের আকর্ষণে, আর এটুকু জানা থাকায় যে ব্যবসার চাপে হঙ্কঘরে জুতোর কাদা ঝাড়া বা নাক ডাকারও সময় লোকটার নেই।

দাঁত কিড়মিড়িয়ে নেকড়ে বললে, 'মারী! তোমায় আসতে হুকুম দিল কে? আমার ভায়ের খাপসুরত ঘোড়া, না তোমার বাপের সুন্দর কুত্তা বাগিয়েছ?'

খুনে, বদমাশ, পকেটমারদের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'না ধূসর নেকড়ে, না!' ওদের কঠিন হৃদয়গুলোও শঙ্কিত নেকড়ের ভয়ানক কথায়— 'হা ঈশ্বর, এতটা নির্দয় তুমি হতে পার না!'

এবার ক্ষেপে মরীয়া হয়েছে নেকড়ে, চক্‌চকে ছোরাটা বের করে চেঁচালে, 'তোরা এবার দ্যাখ্ হারামজাদারা! গোটা দুনিয়ার পুরো হক আছে মোটা ভেড়া কেটে কুটে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার!'

ভয়বিহ্বল ইতর লোকগুলো ত্রাসে কুঁকড়ে যায় যখন দেখে ধূসর নেকড়ে মারিয়ার চুলের মুঠি ধরে তাকে ঠিক উনত্রিশটা টুকরোয় কেটে ফেলল—প্রত্যেকটা টুকরো একই মাপের।

গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সে যখন স্বেদাক্ত হাত নিয়ে মৃতদেহটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তখন সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বুড়ো পাকা দাড়িওয়ালা মানুষটা। এতক্ষণ ধরে দৃশ্যটা দেখে যাচ্ছিল, এবার নকল দাড়ি চুল টেনে খুলে ফেলল—বিখ্যাত ফরাসী গোয়েন্দা তিক্‌তোক দাঁড়িয়ে আছেন ওদের সামনে!

হতভম্ব জড়ভরত হয়ে তলকুঠরির বাসিন্দারা তাকিয়ে থাকে এযুগের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার দিকে, আর তিনি তাঁর পেশাগত নিয়মমাফিক কর্তব্যগুলো করে যান।

প্রথমে তিনি ফিতে দিয়ে মৃতা নারীর দেহ থেকে দেয়ালের একটি বিন্দু অবধি দূরত্ব মেপে দেখেন, তারপর টুকে নেন মদ পরিবেশকের নাম, বছরের নির্দিষ্ট মাসে আজকে তারিখটা। তারপর পকেট থেকে একটা ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র বের করে মেঝের ওপর জমে থাকা একটু খানি রক্ত তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন।

বিড়বিড় করে বলেন, 'হা ঈশ্বর! যা ভয় করেছিলাম তাই—মানুষের রক্ত!'

তারপর তিনি একটা নোটবুকে দ্রুত লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর তদন্তের ফলাফল। তারপর ভূগর্ভকক্ষ ত্যাগ করলেন।

প্যারিস পুলিস-সদরদপ্তরের দিকে দ্রুতপদে রওনা হলেন তিক্‌তোক। কিন্তু পথে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে অধৈর্য ভঙ্গি করে কপালে চপেটাঘাত করলেন। বিড়বিড়িয়ে উঠলেন—'হাজারটা ঝঞ্ঝাট! তখনই আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল ছোরা-হাতে লোকটার নাম।'

* * *

ডাচেস্ ভালেরি দু-বেলেয়ারের প্রাসাদে আজ অভ্যর্থনা উৎসবের সন্ধ্যা।

নিরেট রুপোর ঝাড়বাতিতে বসানো প্যারাফিন মোমের মৃদু আলো কক্ষগুলোকে উদ্ভাসিত করেছে।

আজকের অভ্যাগতরা প্যারিসের সবচেয়ে ধনী আর অভিজাত ব্যক্তি। তিন-চারটে ব্যান্ডের বাজনা বাজছে কয়লার ভাঁড়ারের পেছনের বারান্দায়, তাও আবার সময় পেরিয়ে যাবার পর। রঙচঙে চাপকান আঁটা খানসামারা নীরবে বীয়ার বয়ে আনছে, আর ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতিথিদের বর্জিত আপেলের চোকলা।

ভালেরি হলেন দু-বেলেয়ারদের সপ্তম ডাচেস্। একটা নিরেট সোনার অটোমানে বসে আছেন হাঁসের পালকের গদির ওপর। রাজধানীর সবচেয়ে চতুর সবচেয়ে সাহসী আর সবচেয়ে সুদর্শন রাজসভাসদরা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন।

তেয়াত্তরতম পথের কোণে রাজকীয় প্রাসাদ, সেখানকার রাজকুমার শাঁপ্‌ভিলিয়ে বললে, 'আ মাদাম! মন্টেস্কু যেমন বলেছেন "অল্পখানিকটা থেকেই গড়ে ওঠে সেরা আইসক্রিম ফলার।" যৌবন যেন আপনার উত্তরাধিকারে পাওয়া। আজ রাতে আপনার নিজের সালোঁতে আপনিই সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্তা। আমি যেন নিজের চেতনাকেই বিশ্বাস করতে পারি না যখন মনে পড়ে একত্রিশ বছর আগে আপনি—'

ডাচেস হুকুমের স্বরে বলেন, 'ওঃ রাখো তো ওসব কথা!'

রাজকুমার মাথা অবনত করে একটা রত্নখচিত ছোরা বের করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে ধরে। বলে, 'আপনার অপ্রীতির কারণ হওয়া যে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।' ম্যান্টেলপীসের এক কোণ থেকে সে নিজের ওভারকোট আর টুপিটা তুলে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

অলসভাবে পাখার হাওয়া খেতে খেতে বিবি ফ্রাঁসিলন বলেন, 'দেখলেন তো! এই হল পুরুষদের ব্যবহার। তোষামোদ করুন, আপনার হাতে চুমু খাবে। যে রেশমের দড়িটায় ওরা বাঁধা থাকে বৃথা-অহংকার আর নিজের মতসর্বস্ব হয়ে—তাতে এক মুহূর্ত ঢিলে দিন অমনি হতভাগা মাথায় উঠে বসবে। আমি বলি, শয়তান ওর সঙ্গ নিক।'

কাউন্ট পুম্‌পারনিকেল একটু ঝুঁকে বাঙ্ময় দৃষ্টি মেলে ওঁর কানে-কানে বলেন,

'আহা রাজকুমারী, আপনি আমাদের ওপর একটু বেশি নির্দয় হয়েছেন। বালজাক বলেছেন—'

প্রিন্সেস বললেন, 'বন্ধ করুন! দর্শনের কথা শুনলে আমার মুখ তেতো হয়ে যায়।'

বাহুতে বাহু রেখে ওরা সালোঁ আ-বোরের দিকে এগিয়ে যান। ফলি বের্জেরের তরুণী পিয়ানোবাদক ও নাচিয়ে আর্মাঁদ দ'ফ্লোরি এবার গান গাইতে উঠেছে। গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে সে একখণ্ড লোভনীয় চুয়িং গাম রাখে পিয়ানোর ওপর, আর তাতেই সঙ্গতের প্রথম স্বরধ্বনি সালোঁর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

মেয়েটি গানের জোগাড় করতেই ডাচেস্ দু-বেলেয়ার সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেন অটোমানের হাতল, তীব্র অনুভূতিময় প্রতীক্ষার মুখভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর নিঃশ্বাসই পড়ে না যেন।

তারপর আর্মাঁদ দ'ফ্লোরি যখন প্রথম সুরটা বের করার আগেই টাল খেয়ে ঘুরে বরফের মতো ফ্যাকাশে মুখে মেঝের ওপর পড়ে মরে যায়, তখন ডাচেস্ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস্ ফেলেন।

ডাচেস্ ওকে বিষ দিয়েছিলেন।

অতিথিরা এবার ভিড় করে দাঁড়াল পিয়ানোর পাশে, নিঃশ্বাস রোধ করে দেখেন, আর কেঁপে ওঠেন স্বরলিপির পাতাটায় নজর পড়তে—আর্মাঁদ যে-গানটি প্রায় ধরেই ফেলেছিল তা হল 'সুইট মারী।'

কুড়ি মিনিট পর একটা কালো মাথা-ঢাকা মূর্তিকে দেখা গেল আর্ক-দু-ত্রঁফের থামওয়ালা দেয়ালের এক ফোকর থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে উত্তর দিকে চলে যেতে।

গোয়েন্দা তিক্তোক ছাড়া আর কেউ নন্ তিনি।

মারী কুশো'র হত্যাকারীকে ঘিরে সাক্ষ্যপ্রমাণের জাল বেশ তাড়াতাড়িই গুটিয়ে আনা হচ্ছে।

* * *

নোতাদামের গির্জার চুড়োয় রাত বারোটার ঘণ্টা।

আশপাশের সব নির্দিষ্ট স্থানেই একই সময়ের সংকেত।

গির্জার চুড়ো বাঁধানো-সড়ক থেকে কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে। যে-কোনো সাধারণ পর্যবেক্ষকই চটপট অঙ্কের হিসেব করে অনায়াসেই বুঝে ফেলবে যে এই গির্জা অন্য যে কোনো দশহাজার ফুট উঁচু গির্জা থেকে অন্তত দু'গুণ উঁচু।

চূড়ার একেবারে শীর্ষে একটা ছোট কাঠের মঞ্চ আছে, যেখানে শুধু একজন লোকেরই দাঁড়াবার জায়গা হতে পারে।

প্রতিটি হাওয়ার বেগে দোলায়মান এই বিপজ্জনক মঞ্চে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটি আপাদমস্তক ঢাকা মূর্তি। তার ছদ্মবেশটা কিন্তু পাইকারি মুদির মতো।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ প্রধান ফ্রাঁসোয়া বিয়ঁফালোঁ তখন রু দ-বলোনির একটি চিলেঘরের জানলায় বসে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছিলেন। চুড়োর ওপর একটা নিঃসঙ্গ মূর্তি দূরবীনে ধরা পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন।

নতুন বাঁধানো সেলুলয়েডের দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসিয়ে উঠলেন—'হে ভগবান! উনি তো গোয়েন্দা তিক্তোক দেখছি। জানি না বাবা কোন্ লোকটাকে এখন অনুসরণ করছেন?'

বনবেড়ালের চোখ দিয়ে তিক্তোক তখন মঁমার্ত পাহাড়টা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। হঠাৎ পাশ থেকেই শুনলেন একটা ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ। চোখ ফেরাতেই নজর পড়ল ধূসর নেকড়ের হিংস্র চোখদুটোর ওপর।

কার্নাইনোল কুশো তার গুপ্ত টেলিফোন কোম্পানির আরোহণ ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে এই চুড়োয় উঠেছে।

তিক্তোক বললেন, 'এই যে মঁসিয়, আপনার এই পরিদর্শনের সম্মানের জন্য কার কাছে ঋণী থাকলাম বলুন তো?'

ধূসর নেকড়ে মৃদু উপহাসের হাসি হেসে বললে, 'আপনি বুঝি গোয়েন্দা তিক্তোক?'

'হ্যাঁ আমিই।'

'তাহলে শুনুন, মারী কুশোর হত্যাকারী আমি। মারী ছিল আমার স্ত্রী, নিষ্কর্মা, খালি পেয়াঁজ খেত। কী করারই বা ছিল আমার? তবু তো জীবন আমার কাছে মধুর। আমি গিলোটিনে চড়তে চাই না। শুনলাম আপনি আমার পেছু নিয়েছেন। তদন্ত যে আপনারই হাতে সে কথাটা ঠিক?'

'তা বটে।'

'তাহলে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেলাম।' ধূসর নেকড়ে সাবধানে পায়ে আরোহণ-জুতো গুছিয়ে লাগিয়ে চুড়ো থেকে নেমে যায়।

তিক্তোক নোটবই বের করে তাতে কিছু লেখেন।

বলেন, 'অবশেষে একটা সূত্র খুজে পেলাম।'

* * *

'ধূসর নেকড়ে' নামে একদা পরিচিত কাউন্ট মঁসিয় কার্নাইনোল কুশো ইস্ট ৪৭তম স্ট্রীটে তার প্রাসাদের জাঁকালো উপবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিক্তোকের কাছে স্বীকারোক্তি দেবার তিনদিন পর নেহাতই একটা পরিত্যক্ত পাতলুনের পকেট খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গিয়েছিলেন কুড়ি মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রার ফ্রাঁ।

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়, গোয়েন্দা তিক্‌তোক কামরায় ঢোকেন এক ডজন সেপাই নিয়ে।

ডিটেকটিভ বললেন, 'আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

'কী অভিযোগে?'

'১৭ই আগস্ট তারিখের রাতে মারী কুশোকে খুন করার অপরাধে।'

'আপনার প্রমাণপত্র আছে?'

'আমি আপনাকে খুন করতে দেখেছি, তা ছাড়া নোতাদামের চুড়োয় আপনার নিজের স্বীকারোক্তি।'

কাউন্ট হেসে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেন। বলেন, 'এটা পড়ে দেখুন। মারী কুশো হৃদ্‌রোগে মারা গেছে। তারই প্রমাণ।'

তিক্‌তোক কাগজটার দিকে তাকালেন।

একলক্ষ ফ্রাঁর একখানা চেক।

হাত নেড়ে পুলিশদের চলে যেতে হুকুম দিলেন তিক্‌তোক। বললেন, 'মশাইরা, আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি।'—কিন্তু যেই তিনি ঘর থেকে বেরুতে পা বাড়িয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে কাউন্ট কার্নাইনোল তাঁকে থামালেন।— 'এক সেকেণ্ড, মঁসিয়।'

কাউন্ট কার্নাইনোল তাঁর নিজের মুখের ওপর থেকে নকল দাড়ি খুলে ফেললেন—প্রকাশ হল গোয়েন্দা তিক্‌তোকের উজ্জ্বল চোখ আর সুপরিচিত চেহারাটা।

তারপর এক লাফে সামনে পড়ে তিনি আগন্তুকের হাত থেকে পরচুলা আর ভুরু ছিনিয়ে নিলেন—ধূসর নেকড়ে এখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রাগে দাঁতে দাঁত পিষছে।

মারী কুশোর হত্যাকারীকে আর কখনো আবিষ্কার করা যায়নি।

Tracked to Doom, 1894/5, 'রোলিং স্টোন' পত্রিকা।

প্রেসিডেন্টের ফোটো তোলা

[হয়তো আপনাদের মনে থাকতে পারে মাসখানেক আগে জনসাধারণকে একটা বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ওয়াশিংটন নগরী শস্তায় দু'তরফা ভাড়ায় ঘুরে আসার। টিকিটের দাম আশাতীত কম বলে আমরা অস্টিনের এক জনহিতৈষী নাগরিকের কাছ থেকে কুড়ি ডলার ধার করেছিলাম আমাদের প্রেস আর গরুটা

বন্ধক রেখে। তাছাড়াও আমাদের ভাইয়ের নামে অতিরিক্ত জামিন, মেজর হাচিনসনকে প্রদেয় সামান্য চারহাজার ডলারের হুণ্ডি।

দু'তরফা ভ্রমণের একটা টিকিট কেনা হল, সেই সঙ্গে দু'প্রস্থ ভিয়েনা রুটি আর বেশ বড়সড়ো একখণ্ড চীজ। ওগুলো তুলে দেয়া হল আমাদের প্রতিবেদক সাংবাদিক গোষ্ঠির এক সদস্যের হাতে, তাকে নির্দেশ দেয়া হল ওয়াশিংটনে পৌঁছে প্রেসিডেন্ট ক্লিভ্‌ল্যাণ্ডের সাক্ষাৎকার নিতে, আর সম্ভব হলে কোনো বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করে টেক্সাসের আর সব কাগজের ওপর টেক্কা দিতে।

গতকাল সকালে আমাদের প্রতিবেদক ফিরে এসেছে। ম্যানরের মাটির রাস্তা ধরে হেঁটে, দু'পায়ের তলায় ভাঁজ-করা তুলোর মস্ত ডাঁই বেঁধে। মনে হয় ও ওয়াশিংটনে নিজের টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছিল, পরে রুটি আর চীজ ভাগ করে খেয়েছে কয়েকজন ব্যর্থ মনোরথ চাকুরি-সন্ধানীর সঙ্গে, যারা ওই পথেই ফিরে আসছিল ঘরের দিকে। পেটে বেশ খিদে নিয়ে খাদ্যের আশায় প্রতিবেদক ঘরে ফিরেছে।

একটু বিলম্ব হলেও আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎকারের বিবরণটা এখানে তুলে দিচ্ছি।]

আমি 'রোলিং স্টোন' পত্রিকার প্রধান স্টাফ রিপোর্টার।

মাসখানেক আগে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মশাই আমাদের কামরায় এসেছিলেন। তখন আমরা দুজনে সেখানে বসে বাক্যালাপ করছি। উনি বললেন, 'ও ভালো কথা। একবার ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ডের সাক্ষাৎকারটা নাও তো।'

বললাম, 'বেশ তো, যাব। সামলে-শুমলে থেকো!'

পাঁচ মিনিট বাদে একটা প্রাসাদোপম উপবেশনকক্ষের মতো গাড়িতে চড়ে বসেছি। ইলাস্টিক হাঁসপালকের গদিমোড়া আসন যথেষ্ট ওঠা-নামা করছিল ঠিকই।

ভ্রমণের খুঁটিনাটি নিয়ে সময় নষ্ট করব না। আমাকে অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল নিজের সবরকম সুখসুবিধার ব্যবস্থা করে নেবার। প্রয়োজনে খরচার জন্য সংকোচ করব না। আমার পরিপাক যন্ত্রের সেবার জন্য অঢেল সুব্যবস্থা। আর আমার রুচিসম্মত পানীয় তো ভিয়েনা আর জার্মানি উভয়েই যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় একবারই শুধু গাড়ি আর শার্ট বদল করেছিলাম। একজন অচেনা লোক

একটা দু'ডলার নোট বদল করে নিতে চেয়েছিল, আমি উদ্ধতভাবে 'না' করে দিই।

ওয়াশিংটন অবধি গোটা রাস্তার দৃশ্যই বিচিত্র। জানলা দিয়ে তাকালে এক

অংশে দেখবেন একরকম দৃশ্য, আবার অন্যদিকের জানলায় দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখবেন, দেখে অবাক আর উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন ওই দৃশ্যরই আরো কিছু অংশ!

ট্রেনে বেশ কিছু পালোয়ান পুঙ্গব ছিল। ওদের একজন বায়না ধরলে তার সঙ্গে আমার কব্জির জোর পরীক্ষা করতে হবে। জোর তো আমার ছিলই, তাই সে সফল হল না।

জর্জের ইতিহাস বই পড়েছিলাম, তাই ওয়াশিংটনে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই শহরটাকে চিনে গেছি। এমন তাড়াহুড়ো করে ট্রেন থেকে বেরিয়েছি যে মিঃ পুলম্যানের প্রতিনিধিকে দক্ষিণা দিতেই ভুলে গেলাম।

সোজাই চলে গেলাম 'ক্যাপিটল' (রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ)-এর দিকে।

সামান্য রসিকতার মেজাজে একটা গোলাকার বস্তু বানিয়েছিলাম 'রোলিং স্টোন' বা গড়ানে পাথরের আকারে। জিনিসটা কাঠের, কালচে বং করা একটা ছোটখাটো কামান-গোলার মতো। ওতে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা মোচড়ানো ধুকধুকি জুড়ে দিয়েছিলাম 'শেওলা' বোঝাতে (গড়ানে পাথরে শেওলা ধরে না)। স্থির করেছিলাম নিজের পরিচয় কার্ডের বদলে এটাই ব্যবহার করব। ধারণা ছিল লোকে চট্ করেই দেখে বুঝে যাবে এ আমার সংবাদপত্রের প্রতীকচিহ্ন।

ক্যাপিটলের ব্যবস্থাগুলো আমি ভাল করে অনুধাবন করেছি। তাই সোজাই হেঁটে চলে গেলাম মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডের একান্ত খাস-দপ্তরে।

হল কামরায় একজন ভৃত্যের দেখা পেলাম। হেসে আমার কার্ডটা তুলে দেখালাম তাকে।

দেখে তার মাথার চুল একেবারে খাড়া হয়ে উঠেছে, হরিণের মতো ছুটে গেল দরজার দিকে। নিচু হয়ে লম্বা সিঁড়ির ধাপের ওপর দিয়ে যেন গড়িয়ে চলে গেল আঙিনার মধ্যে।

মনে-মনে ভাবলাম, 'ওহো! উনি বুঝি আমাদেরই একজন দেউলিয়া গ্রাহক।'

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ হল প্রেসিডেন্টের একান্ত-সচিবের সঙ্গে। উনি আমদানি-রফতানি বিষয়ে চিঠি লিখছিলেন, আর সেই ফাঁকে মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডের হাঁস-মারা গাদাবন্দুক সাফ করছিলেন।

আমি তাঁকে আমার পত্রিকার প্রতীকচিহ্নটা দেখাতেই উনি এক লাফে একটা উঁচু জানলার ভেতর দিয়ে টপকে গিয়ে পড়লেন দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ায় ভরা এক হট-হাউসের মধ্যে।

এতে কিছুটা বিস্মিত হলাম আমি।

নিজেকে যাচাই করে দেখি—আমার টুপিটা তো সিধেই বসানো আছে; আমার চেহারার মধ্যেও কোনো আতঙ্ককর কিছু নেই।

প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দপ্তরে ঢুকে গেলাম।

উনি একাই ছিলেন, কথা বলছিলেন টম ওকিলট্রির সঙ্গে। মিঃ ওকিলট্রি

যেই আমার ছোট্ট গোলকটা দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ছুটে গেলেন কামরার বাইরে।

প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ড ধীরে ধীরে চোখ ফেরালেন আমার দিকে। আমার হাতে যা রয়েছে তা উনিও দেখেছেন। ঘস্‌ঘসে গলায় বললেন, 'একটু সবুর করুন। দয়া করে।'

কোটের পকেট খুঁজে উনি বের করলেন একটা কাগজের টুকরো। তাতে রয়েছে কয়েক ছত্র লেখা।

কাগজটা টেবিলে রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এক হাত ওপরে তুলে গম্ভীর স্বরে বললেনঃ

'আমি আমার দেশ, মুক্ত বাণিজ্যের নীতির জন্য—এবং—এবং আরো ওই ধরনেব সবকিছুর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি।'

দেখলাম তিনি একটা সুতো ধরে টানলেন আর অন্য টেবিল থেকে একটা ক্যামেরা কট্ করে উঠল, আমরা যে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওইভাবেই ছবি উঠে গেল।

বললাম, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রাবাসে মরবেন না, একেবারে সিনেটের সভাকক্ষে চলে যান।'

'শান্ত হও খুনি! তোমার বোমাটাকে এবার সাংঘাতিক কাজটা করতে দাও।'

এবার তেজোদ্দীপ্ত হয়ে আমি বলি, 'আমি কোনো বাজে বদমাশ নই। আমি অস্টিন-টেক্সাসের রোলিং স্টোন পত্রিকার প্রতিনিধি—আর আমি যেটা হাতে ধরে আছি সেটার কাজও একই, তবে মনে হচ্ছে কাজটা সফল হল না।'

প্রভূত স্বস্তি নিয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর আসনে গা ঢেলে দিলেন। বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি ডিনামাইট-ওয়ালা। এবার দেখা যাক্,—হ্যাঁ টেক্সাস!... টেক্সাস।' বলতে বলতে তিনি এগিয়ে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট দেওয়াল মানচিত্রটার দিকে। প্রথমে প্রায় ইডাহোর কাছাকাছি একটা জায়গায় আঙুল রাখলেন, তারপর আঁকাবাঁকা সংশয়িত পথে আঙুল নামাতে থাকলেন যতক্ষণ না টেক্সাসে পৌঁছোনো যায়।

'ও হ্যাঁ, এই তো! এত জিনিস মাথার মধ্যে থাকে, যে ভুলেই যাই কোন্‌টা আগে ভাল করে জানা থাকা দরকার।...এবার দেখা যাক, টেক্সাস? ও হ্যাঁ, ওটাই তো সেই রাজ্য যেখানে আইডা ওয়েলস্ আর অনেক নিগ্রো মিলে হগ্ নামের এক সমাজবাদীকে পুড়িয়ে মেরেছিল, একটা শিবির সমাবেশে দাঙ্গা বাধাবার জন্য। তো আপনি এসেছেন সেই টেক্সাস থেকে! ডেভ কালবারসন নামে একজন টেক্সাসবাসীকে আমি চিনি। কেমন আছে ডেভ আর তার পরিবারের লোকরা? ডেভের কি ছেলেপুলে আছে?'

বললাম, 'অস্টিনে তাঁর এক ছেলে আছে, টেক্সাসের রাজধানীর আশেপাশেই কাজ করে।'

'টেক্সাসের প্রেসিডেন্ট এখন কে?'

'আমি ঠিক মনে—'

'ওঃ মাপ করবেন। আবার ভুলে গিয়েছিলাম। টেক্সাস নাকি ফের রিপাবলিক বনে গেছে বলে শুনলাম যেন।'

বললাম, 'এবার মিঃ ক্লিভল্যান্ড, আপনি আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।'

প্রেসিডেন্টের চোখের ওপর কেমন যেন একটা পর্দা নেমে এল, উনি যন্ত্রচালিতের মতো চেয়ারে শক্ত হয়ে বসলেন।

বললেন, 'শুরু করুন।'

'এদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'আমি একথাই বলব যে গুরুতর রাজনৈতিক প্রয়োজনে জরুরি ব্যবস্থামূলক ক্ষিপ্রতার তাগিদ আসে, এবং ভাবাদর্শগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র অবিভাজ্য বা উদ্দেশ্যগতভাবে অপ্রত্যক্ষ হলেও ষড়যন্ত্র এবং অন্তর্ধ্বংসী কলহ দেশপ্রেমের ঐকজাতিবোধকে ছিন্ন করছে, এবং—'

'এক সেকেণ্ড, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' আমি বাধা দিয়ে বলি, 'আপত্তি না থাকলে আপনার এই বাঁধা বুলিগুলো বদল করবেন? প্রতিবেদন-কলমের প্রয়োজন হলে আমি তো এ-সমস্তই "মার্কিন প্রেস সমিতি" থেকে জোগাড় করে নিতে পারতাম। আপনি ফ্লানেলের পোশাক পরেন? আপনার প্রিয় কবি, চাটনি, পাখি, ফুল কী? আর চাকরি চলে গেলে আপনি কী-কাজ করবেন?'

'যুবক', কড়াভাবে মিঃ ক্লিভল্যাণ্ড বললেন, 'আপনি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। আমার প্রাইভেট ব্যাপার পাবলিকের চিন্তার বিষয় নয়।'

আমি তাঁর কাছে মাফ চাইলাম, আর তিনিও মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গেলেন তাঁর খোশমেজাজে। বললেন, 'আপনাদের টেক্সাসবাসীদের একজন মহান প্রতিনিধি সেনেট-সদস্য মিল্‌স্‌। বোধহয় যে দুটো শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা আমি জীবনে শুনেছি তা হল সেনেটের সামনে ওর ভাষণ—লবণের ওপর বিক্রয়কর হটানো আর সোডিয়াম ক্লোরাইডের ওপর তা বাড়ানো নিয়ে।'

বললাম, 'টম ওকিলট্রিও তো আমাদের রাজ্যের—'

'না, না উনি ওখানকার নন্‌। আপনার নিশ্চয় ভুল হয়েছে' জবাব দিলেন মিঃ ক্লিভল্যাণ্ড, 'কারণ উনি তাই বলেন। বাস্তবিক একবার আমাকে টেক্সাসে যেতেই হবে, দেখতে হবে রাজ্যটা। আমি চাই পর্যবেক্ষণ মঞ্চে চড়ে দেখতে, ম্যাপে যেমন দেখায় ও-রাজ্যটা সত্যিই তেমন আকারের কি না।'

বললাম, 'এবার যে আমাকে যেতে হয় মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'টেক্সাসে ফিরে গিয়ে আমাকে চিঠি লিখবেন

কিন্তু। আপনার এই সাক্ষাৎকার আমার বিশেষ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে আপনাদের রাজ্য সম্বন্ধে, যে মনোযোগ আমার দেওয়া খুবই উচিত ছিল তা দিতে পারিনি মনে হয়। যতদূর মনে পড়ে আপনারা বহু ঐতিহাসিক আকর্ষণীয় স্থান পুনরুদ্ধার করেছেন—যেমন আল্মামো, যেখানে ডেভি জোনস্ মারা যান; তারপর গোলিয়াড, যেখানে স্যাম হুস্টন আত্মসমর্পণ করেছিলেন মন্টেজুমার কাছে; অস্টিনের কাছে পাওয়া পাথর-হয়ে-যাওয়া জাহাজের পাইল, পাঁচ সেন্টের তুলো, আর ডালাসে জন্মানো শ্যামদেশীয় ডেমোক্রাট মঞ্চ। আমার যে কত ইচ্ছে করে গ্যালভেস্টনের 'গ্যাল্‌দের' দেখতে, আর ওয়াকোর সমুদ্রতীরে 'ওযাক্' করতে। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুশি। হলঘরে ঢুকে বাঁ দিকে ঘুরবেন, সোজা হেঁটে বেরিয়ে যাবেন।'— সাক্ষাৎকার শেষ হযেছে বোঝাবার জন্য আমি মাথা নোয়াই, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। বাইরে এসে একটুও মুশকিল হয়নি প্রাসাদ ছেড়ে যাবার।

তাড়াতাড়ি ছুটে যাই শহরেব মধ্যে যেখানে বিনে পয়সায় বাড়তি দ্রাক্ষারস পাওয়া যায় এমন জায়গায় একটু খেয়ে নেব বলে।

অস্টিনে ফিরে আসার বর্ণনা আর দিতে চাই না। হোযাইট হাউসেই কোথাও আমার ফেরার টিকিটখানা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর যে পদ্ধতিতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম তাতে আমাব জুতোর আর কিছু আস্ত থাকেনি। চলে আসার সময় ওয়াশিংটনেব সবাইকে ভালোই দেখেছি, সবাই প্রীতি-ভালোবাসা পাঠিয়েছেন আমার মারফত।

A Snapshot at the President, ১৮৯৪, 'রোলিং স্টোন'-এ প্রকাশিত।

আভিজাত্য বনাম জগাখিচুড়ি

রোলিং স্টোন পত্রিকার ঘুঘু রিপোর্টার গত রাতে ওয়াই-এম.সি.এ'র আবাস থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকেই হেঁটে ফিরছিল। পথে বুভুক্ষু চেহারার পাগল-পারা চোখ আর উস্কুখুস্কু চুলওয়ালা এক রোগাটে মানুষ তার সামনে হাজির। দুর্বল, দমে-যাওয়া গলায় রিপোর্টারকে জিজ্ঞেস করলে, 'বলতে পারেন স্যার, এ শহরের কোথায় একটা ওঁচা পরিবার খুঁজে পেতে পারি?'

'ঠিক বুঝলাম না তো কথাটা।'

অচেনা লোকটি বললে, 'মানে, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি'—বলতে-বলতে সে রিপোর্টারের কোটের বোতামে আঙুল পুরে ওর

ক্রিসেনথিমাম ফুলটিরই 'বারো' বাজিয়ে দিলে—'আমি সোপস্টোন জেলার এক জনপ্রতিনিধি। আমি আর আমার পরিবার এখন গৃহহীন, আশ্রয়হীন, আস্তানা-ছাড়া। এক হপ্তার ওপর হল খাবারের স্বাদ পাইনি। পরিবারকে সঙ্গে এনেছিলাম কারণ আমার হজমের গোলমাল, সাথীদের সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরতেও পারিনি। ক'দিন আগে একটা অতিথিশালা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি, হোটেলে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা চমৎকার অভিজাত চেহারার বাড়ি পেলাম যেটা আমার পছন্দসই। ভেতরে গিয়ে বাড়ির মালকিনকে খবর দিলাম। কামরার ভেতর এলেন দারুণ রাজেশ্বরী গোছের টিকালো-নাক এক ভদ্রমহিলা। তাঁর এক হাত পেটে... মানে কোমরের ওপর, অন্য হাতে ধরা লেসের রুমাল। তাঁকে বললাম, আমি আর আমার পরিবার খোরাকি দিয়ে থাকতে চাই। উনি আমাদের নিতে রাজিও হলেন। জিজ্ঞেস করি ওঁর শর্ত কী, বললেন সপ্তাহে তিনশো ডলার।

'পকেটে আমার দুটি ডলারই ছিল, আর তাও ওঁকে দিতে হল সুন্দর চা-পাত্রটার বাবদ—কারণ উনি কথা বলবার সময় টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমি জিনিসটা ভেঙে ফেলি।... বললেন, চমকে গেছেন দেখছি। মনে রাখবেন মশায় আমি জর্জিয়ার গভর্নর রিডলের বিধবা পত্নী; আমার পরিবারের অতি উঁচু সমাজে যোগাযোগ; খোরাকিটা দিচ্ছি নেহাতই অনুগ্রহ হিসেবে; আমার সঙ্গে সামাজিকতার যে সুযোগটা পাচ্ছেন তার মূল্য টাকার চেয়ে অনেক বেশি, আমি—

'যাক্ ওখান থেকে তো বেরিয়ে এলাম, গেলাম আরো অন্য কয়েকটি জায়গায়। পরবর্তী মহিলা, ভার্জিনিয়ার জেনারেল ম্যাহোনের কোনো 'তুতো'-বোন, ঘণ্টায় চার ডলার করে ভাড়া চান পেছনের একখানা কোঠার জন্য—গোলাপী কিছু বাণী লেখা আর বার্নেট পাথরের একটা বিছানা সেখানে। পরের জন হলেন ডেভি ক্রকেটের এক পিসি—দৈনিক আট ডলার করে চান আলামোর নকলে সাজানো একটা কামরার জন্য, সঙ্গে ছাঁটকাট দিয়ে তৈরি প্রাতরাশ আর ডিনারে মহিলার সঙ্গে এক ঘণ্টা করে আলাপাদির সুযোগ। আরেকজন বললেন তিনি তাঁর বাপের দিক থেকে বেনেডিক্ট আর্নল্ডের বংশধর, আর অন্য দিক থেকে ক্যাপ্টেন কিডের।.. দেখতে ক্যাপ্টেন কিডের সঙ্গেই তাঁর মিলটা বেশি।.... উনি দেবেন শুধু একবারের খাওয়া, আর সারাদিন ভগবৎ-নামের অবসর, ওঁর সাহচর্যের মূল্য তাঁর ধারণায় হপ্তায় একশো ডলার।

'এইভাবে পেলাম ন'জন উচ্চতম ন্যায়াধীশের বিধবা, বারোজন প্রয়াত গভর্নর বা সেনাপতির পত্নী, আর বাইশজন নানাবিধ সুখী কর্নেল, অধ্যাপক আর মেজরের পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ—যাঁদের অভিজাত্যের মূল্য মাপা যায় নব্বই থেকে নয়শো ডলার প্রতি হপ্তার হিসেবে। আর ফাউ হিসেবে স্বাদহীন জগাখিচুড়ি আর সঙ্গে একটু শুকনো আপেল। ভালো-ভালো উচ্চবংশের লোকদের আমি সমীহ

করি, তবে আমার পাকস্থলী আকুল হয়ে চায় সংস্কৃতির বদলে একটু মাংস আর সবজি। ঠিক বলিনি কথাটা?'

রিপোর্টার বললে, 'আপনার কথায় বেশ বুঝে গেছি আপনি যা প্রকাশ করতে চান তাই খুলে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ। ব্যাপারটা এই রকম। আমি ধনী নই; আমার আছে শুধু দৈনিক ভাতাটুকু আর সামান্য সুযোগসুবিধা। উচ্চ বংশ আর ছাতা-পড়া পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্যের জন্য দাম দেবার ক্ষমতা আমার নেই। সামান্য মাংস-তরকারী আমাকে রাজমুকুটের চেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয়, শীতে কাতর হলে রাজবর্মে কি আমার ঠাণ্ডা ঘোচে?'

একটু হাসিচাপা হিক্কা তুলে রিপোর্টার বললে, 'ভীষণভাবে বুঝতে পারছি আপনি উচ্চগ্রামে-বাঁধা শহরের কাছে ধাক্কা খেয়েছেন। এখানকার যত প্রথমশ্রেণীর অতিথিগৃহ, বেশির ভাগই চালান পুরনো দক্ষিণী পরিবারের মহিলারা, সারা দেশে তাঁরাই প্রথম।'

জেলা-প্রতিনিধি লবঙ্গ মনে করে একটা কাঠি চিবোতে চিবোতে বললে, 'আমি তো এখন মরীয়া। এখন এমন একটা অতিথিশালা খুঁজছি যার মালিকানা ছিল ঘোড়ার আস্তাবলে কুড়িয়ে-পাওয়া কোনো অনাথা, যার বাপ ছিল পূর্ব অস্টিনের কোনো দাগো-পর্তুগীজ, আর যার ঠাকুর্দাকে মানচিত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি চাই স্রেফ একটা ওঁচা, সাধারণ, নিচু ধরনের, নস্যি-পোঁছা অজ্ঞ গেঁয়ো রঙবেরঙী দল যারা জীবনে কখনো আঙুল ধোয়া জলের-বাটি দেখেনি, শোনেনি ওয়ার্ড ম্যাকএ্যালিস্টারের নাম—কিন্তু সঠিক বাজারদরে যারা গরম-গরম মকাই রুটি আর আইরিশ আলুর দম বানিয়ে দিতে পারে।...আছে এমন জায়গা অস্টিনে?'

ঘুঘু সংবাদ-প্রতিবেদক সদুঃখে মাথা নাড়ে। বলে—'জানি না, তবে আপনাকে একটু বীয়র খাওয়াতে পারি।'

দশ মিনিট বাদে 'ব্লু কুইন' পানশালার কালো শ্লেটে দুটো বাড়তি সংখ্যা যোগ করা হলঃ ১৩।

Aristocracy Vs. Hash, ১৮৯৪-৯৫, রোলিং স্টোন

জেমুয়ার বন্দী

...অতএব রাজা প্রচণ্ড ক্রোধপরবশ হলেন, ভয়ে কেউ তাঁর কাছে যেতেই সাহস পান না। তিনি ঘোষণা করলেন যে, রাজকুমারী ওস্‌লা যেহেতু তাঁর অবাধ্য হয়েছে, তাই একটা বিরাট মল্লযুদ্ধের অনুষ্ঠান হবে, সেই প্রতিযোগিতায় যে রাজপুরুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বীর বলে প্রতিপন্ন করবেন, রাজা তাঁর হাতেই সমর্পণ করবেন রাজকুমারীকে।

তাঁর এই মর্জির কথা জানিয়ে দিতে চারদিকে ঘোষক পাঠালেন রাজা। রাজ্যময় টগ্‌বগে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে ঘুরে ঘোষক বিরাট টিনের ভেঁপু বাজিয়ে জানিয়ে দিলে রাজার বাসনার কথা। গ্রাম্য প্রজারা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বললে—'দ্যাখো ভাইসব, ওই তো সেই টিনের ভেঁপুওয়ালা বাজিকর যার কথা শাস্তরে লিখেছে।'

তারপর যখন সেই দিনটি এল, রাজা তো জাঁকালো উচ্চাসনে বসেছেন হাতে লড়াইয়ের সংকেত জানানো দস্তানাটা নিয়ে, আর তাঁর পাশে বসেছে রাজকন্যা ওস্‌লা; সুন্দরী অথচ দারুণ শুকনো মুখে। শোকমলিন চোখে যেন জল ধরে রাখতে পারছে না। প্রতিযোগিতায় এসেছেন যে বীরপুরুষের দল তাঁরা রাজকন্যার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ। প্রত্যেকেই শপথ নেন জেতার—যাতে ওকে বিঁয়ে করে তিনি রাজার জামাই হয়ে থাকতে পারেন। হঠাৎ রাজকন্যার হৃদয় যেন প্রবলভাবে দুলে উঠল, কারণ সে বীরপুঙ্গবদের মাঝখানে সেই গরিব ছাত্রটিকে আবিষ্কার করেছে! ওর সঙ্গেই তো প্রেমে পড়েছিল সে।

বীরবৃন্দ ঘোড়ায় চেপে সার বেঁধে চলে যায় রাজাসনের সামনে দিয়ে। রাজা সেই গরিব ছাত্রটিকে থামান। তার ঘোড়াটাই সবচেয়ে জীর্ণ, সমবেত যে-কোনো বীরের তুলনায় অতি অখাদ্য তার সাজসজ্জা।

'হে বীরপুরুষ, বলুন তো আপনার ওই অপূর্ব লজ্‌ঝড়ে মরচে-ধরা বর্মটর্মগুলো কী দিয়ে তৈরি?'

ছোকরা বীর বললে, 'হে রাজন্‌, একটা বিরাট লড়াইয়ে নামতে চলেছি আমরা, সেটা বুঝে আমি এগুলোকে ফালতু লোহালক্কড়ই বলব—আপনিও কি তাই বলবেন না?'

রাজা বিস্মিত—'ছোকরার তো বেশ বুদ্ধি!'

এতক্ষণে রাজকুমারী ওস্‌লা ধড়ে একটু প্রাণ পেয়েছে তার প্রেমিককে দেখে। মুখে একখণ্ড আমসী পুরে চোয়াল দিয়ে চাপলো। ফিক করে একটু হাসলোও মুখের ভেতর সাজানো মুক্তোর সারি দাঁত দেখিয়ে। তা লক্ষ্য করে দুশো-সতেরোজন বীর সিধেই রাজার কোষাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে ঘোড়ার দানা-চানা বাবদ হিসেব চুকিয়ে বাড়ি চলে গেল।

রাজকন্যা বললে, 'মুখের ভেতর কিছু চুষতে-চুষতে বিয়ে করা আমার পক্ষে বড়ো মুশকিল।'

কিন্তু দু'জন বীরপুরুষ মাঠে রয়েই গেল শেষ অবধি—তাদের একজন রাজকুমারীর প্রেমিক।

রাজা বললেন, 'তা হোক্, লড়াইয়ের জন্য এরা দুজনই যথেষ্ট। কই হে, বীরপুরুষরা, এই সুন্দরী মহিলাটির হস্ত গ্রহণের জন্য তোমরা লড়বে তো?'

'লড়াই আমরা করবই'—বীর দু'জন বললে।

দু'ঘন্টা ধরে লড়লে ওরা দুটিতে। অবশেষে রাজকন্যার প্রেমিকই জয়লাভ করল, অন্যজনকে সে ধরাশায়ী করেছে। বিজয়ী বীর রাজার সামনে তার ঘোড়ার প্যাঁচালো নাচ দেখালে, জিনের ওপর মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালে।

রাজকুমারী ওস্‌লার গালে তখন লজ্জারুণ আভা; চোখে প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে উত্তেজনার ঝলক। ঠোঁট জোড়া খোলা, সুন্দর চুলে বাঁধন নেই, আসনের হাতল চেপে ধরে দুরুদুরু বক্ষে সামনে ঝুঁকে আছে। মুখে খুশির হাসি ফুটিয়ে, শুনতে চাইছে প্রেমিকের কথাগুলো। রাজা বললেন, 'তুমি তো ভালই লড়েছ, বাহাদুর বীর। এখন যে-কোনো বর তুমি কামনা করবে, শুধু মুখে বলে দাও কী চাও।'

বীর বললে, 'তাহলে আমি যা চাই তা বলি—আমি আপনার রাজ্যে গ্লাইডার কোম্পানির বিখ্যাত বাঁদুরে সাঁড়াশির স্বত্ব কিনেছি। এখন আপনার একটা অধিকার পত্র চাই।'

রাজা বললেন, 'সে তুমি পাবে। কিন্তু বলেই দিচ্ছি আমার রাজ্যে কোনো বাঁদর-টাদর নেই।'

ক্রোধে চিৎকার করে বিজয়ী বীর ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে চড়ে বসল, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গেল ঘোড়া চালিয়ে।

রাজা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ ঝলক দিয়ে উঠল। জাঁকালো উচ্চাসন থেকে পড়ে মরে যাবার আগে শুধু চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—'হে ভগবান! রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেল যে!'

The Prisoner of Zembla, রোলিং স্টোন, ১৮৯৪-৫

একটা আজব কাহিনী

অস্টিনের উত্তর ভাগে একসময় এক পরিবার বাস করত—স্মদারস্ পরিবার। পরিবারে ছিল জন স্মদারস্, তার স্ত্রী, সে নিজে, তাদের ছোট মেয়ে যার পাঁচ বছর বয়েস, আর মেয়েটির মা-বাপ, কুল্লে ছ'জন অর্থাৎ বিশেষ পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত শহরের জনসংখ্যার গুণতিতে—কিন্তু প্রকৃত গণনায় আসলে তারা তিনজন মাত্র।

এক রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মেয়েটির প্রচণ্ড পেটব্যাথা শুরু হল, জন স্মদারস্ তাড়াহুড়ো করে শহরে ছুটল কিছু ওষুধ আনবার জন্য।

সে আর ফিরে আসেনি।

ছোট মেয়েটা এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল এবং যথাসময়ে পূর্ণযৌবনা নারীত্বও পেল।

স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়াতে ওর মা দারুণ শোকার্ত হয়ে পড়েন, তারপর প্রায় তিন মাস কেটে যাবার পর ফের বিয়ে করেন, আর চলে যান সান আন্টোনিওতে।

ছোট মেয়েও যথাসময়ে বিয়ে করল। কয়েকবছর কেটে যাবার পর, তারও হল একটি মেয়ে—তারও বছর পাঁচেক বয়েস হল।

বাপ চলে যাবার সময় যে বাড়িতে ওরা থাকত সে বাড়িতেই এরা বাস করছে। বাপ তো ফিরেই এল না।

আর হবি তো হ', এমন অদ্ভুত যোগাযোগ যে এর ছোট মেয়েটারও ঠিক জন স্মদারসের নিরুদ্দেশ হবার তারিখে আজ রাতেই হল প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা—জন স্মদারস্ বেঁচেবর্তে হাল-হকিকত নিয়ে থাকলে এখন দাদামশায় হত মেয়েটার।

জন স্মিথ (একেই বিয়ে করেছে স্মদারসের মেয়ে) বললেঃ 'দেখি শহরে গিয়ে কিছু ওষুধপত্র কিনে আনি মেয়েটার জন্য।'

তার স্ত্রী আকুল হয়ে বললে, 'না, না, জন! তুমিও হয়তো চিরদিনের মতো বেপাত্তা হয়ে যাবে, ভুলে যাবে ফিরে আসতে।'

তাই জন স্মিথ আর গেল না, ছোট্ট প্যান্সির (প্যান্সির তো ওই নাম) বিছানার পাশে বসে থাকল দু'জন।

খানিকবাদে মনে হল প্যান্সির অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। জন স্মিথ আবার উদ্যোগ করল ওষুধ আনতে শহরে যেতে, কিন্তু তার স্ত্রী কিছুতেই যেতে দেবে না।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একজন ঝুঁকে-পড়া কুঁজো বুড়ো, মাথায় লম্বা সাদা চুল, নিচু হয়ে ঢুকল ঘরে।

প্যান্‌সি বলল, 'আরে এতো দাদামশাই!'—সকলের আগে ও-ই তাকে চিনে নিয়েছে।

বৃদ্ধ পকেট থেকে একটা ওষুধের বোতল বের করে, এক চামচ খাইয়ে দিলে প্যান্‌সিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে ওঠে নাতনি।

জন স্মদারস্‌ বললে, 'একটু... দেরি হয়ে গেল... বাসের জন্য সবুর করছিলাম তো...'

A Strange Story. রোলিং স্টোন, ১৮৯৪-৯৫

বেক্সার পরচা নং ২৬৯২

অস্টিনে বেড়াতে এলে যেমন করে হোক 'সরকারী জমিজমা সংক্রান্ত' দপ্তরটা দেখতে ভুলবেন না।

প্রধান সড়ক ধরে যেতে-যেতে আদালত গৃহের কোণে একটা বাঁক ঘুরলেই চোখের সামনে উঁচু টিলার ওপর দেখবেন মধ্যযুগীয় এক প্রাসাদ।

মনে হবে রাইন নদীর কথা; ড্রাকেনফেলসের দুর্গ প্রাকার: লোরেলাই, অব জার্মানির আঙুর খেতে-ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল। জার্মান তো বটেই—প্রাসাদের প্রতিটি স্থাপত্য আর নকশার কাজে সেই ছাপ।

নকশা করেছিল 'ফাটারলাণ্ডে'রই একজন প্রবীণ বাস্তুকার যার হৃদয়ে সদাই জেগে থাকত স্বদেশভূমির দৃশ্য। তার জন্মস্থানের কাছাকাছি কোনো প্রাসাদের নকশা নাকি হুবহু নকল করেছিল আশ্চর্য নিষ্ঠায়।

প্রাসাদের প্রাচীন সম্ভ্রমজাগানো দেয়ালগুলো অবশ্য বর্তমান শাসনের আমলে নতুন রং লাগিয়ে রুচিহীন করে তোলা হয়েছে। শতসহস্র পায়ের চাপে ক্ষয়ে নিচু-হয়ে যাওয়া মেঝের চুনাপাথরের পাটাগুলো বদলে এখন আধুনিক টালি বসানো। কালজীর্ণ আসবাবপত্রের জায়গায় স্থান পেয়েছে ফিটফাট আড়ম্বরের সাময়িক সজ্জা। অথচ টেক্সাসবাসীরা যে-হাতগুলোকে বরাবরই সম্মান করবে তাদেরই স্পর্শে এককালে পবিত্র হয়েছিল ওইসব আসবাব।

কিন্তু এখনো এই অট্টালিকায় ঢুকলে আপনি গলার স্বর নামিয়ে ফেলবেন। আপনার মনে হবে সময় যেন কত পেছিয়ে গেল, কারণ এখানে যে আবহাওয়া নিঃশ্বাসে গ্রহণ করছেন তা কবরস্থ বহু প্রজন্মের প্রশ্বাসে শীতল।

ভবনটা পাথরের, ওপরে কংক্রিটের আস্তর দেওয়া। অসম্ভব মোটা দেয়াল। গ্রীষ্মে সুশীতল, শীতে কবোষ্ণ। নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন। অন্য সরকারী ভবনগুলো থেকে তফাতে, গম্ভীর ক্ষয়িষ্ণু অতীতের ধ্যানে মগ্ন এক প্রাসাদ।

কুড়ি বছর আগেও এর ছিল আজকের চেহারাই; কুড়ি বছর পরেও যখন উৎকট নতুনত্বটুকু খসে পড়বে তখন এ ফিরে পাবে তার বিমর্ষ অবক্ষয়ের মূর্তি।

অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মানুষরা তো ধারণাই করতে পারবে না এখানে যে কাজকর্ম হত তার বিশালত্ব আর গুরুত্ব, লক্ষ লক্ষ নথিপত্র ও দলিল যা এই দপ্তরের অভিলেখাগারে সঞ্চিত, তার মর্মার্থ।

টেক্সাস রাজ্যের প্রতিটি ফুট জমির স্বত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত মালিকানা-দলিল, অধিকারপত্র, হস্তান্তর আর আইনী দলিলের ফাইলগুলো থাকে এখানেই।

সর্বশক্তিমান ডলারের খাতিরে এই 'জমিজমা সংক্রান্ত দপ্তরের' দলিলদস্তাবেজে যে নোংরা ছাপ পড়ে গেছে তা দিয়ে শত খণ্ড পুস্তক ভরে ফেলা যায়। শয়তানি, দু'মুখো শঠতা, বিরুদ্ধ-মতলব, মিথ্যা সাক্ষ্য, ডাহা মিথ্যে, ঘুষ, বদল করা ও ঘষে তুলে দেয়া, কাগজ বিলকুল গায়েব করা বা নষ্ট করা এবং আরো নানারকম ফন্দি ও চক্রান্তের ইঙ্গিত এইসব দলিলে।

এখানকার কর্মচারীদের কথা অবশ্য বলছি না। কোনো গভর্নমেন্টের কেরানিশ্রেণীর মধ্যেই এঁদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী, কর্মদক্ষ আর যোগ্য মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা বিশেষ শ্রেণী আছে—অথবা ছিল, কারণ তাদের দিনকাল এখন ফুরিয়ে গেছে—যারা ছিল জমির ফাটকাবাজ, সাধারণভাবে যারা জমির 'হাঙর' নামে পরিচিত কতকগুলো নীতিজ্ঞানবর্জিত লোভী। তারা এই দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে রেখে গেছে তাদের সরীসৃপগতির ছাপ,—মালিকানা দলিল নষ্ট করে, স্বত্বাধিকার খারিজ করে, বসতবাটি ধূলিসাৎ বা বিচ্ছিন্ন করে, জাল হস্তান্তর আর মিথ্যা এফিডেভিট করে।

মেঝের ওপর আধুনিক টালিগুলো বসবার আগে, চুনাপাথরের পাটায় গভীর নিচু দাগ পড়েছিল অসংখ্য পায়ের। প্রতিদিন কত উদ্বিগ্ন পদক্ষেপ করিডরে প্রতিধ্বনি তুলত ফাইল-কামরা থেকে পঠনকক্ষে, কমিশনারের একান্ত দপ্তর থেকে দস্তাবেজখানায়, ফের উল্টোপথে ছোটাছুটি করে।

সৎ আর অজ্ঞ কোনো বাসিন্দা হয়তো তার 'ঘর' বলে জানা ছোট্ট-জমির টুকরোটা বাঁচাবার চেষ্টায় কনুইয়ের ধাক্কা মেরে বসল সেই চোখা-নজর 'হাঙর'টিকেই, যে পাশে দাঁড়িয়ে খুঁজছিল ওকেই উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে প্রমাণপত্রগুলো। কমিশনারের ডেস্কের সামনে হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন কর্তাগোছের পশুপালক কোটিপতি তাঁর প্রভাব আর অর্থের ভরসা নিয়ে, আর তাঁর পাশেই প্রথম ডাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সেই লোকটি যার ছোট্ট আলুক্ষেত কোটি-পতিরই [illegible]

পশুচারণভূমির আওতায় সমুদ্রমধ্যে নগণ্য দ্বীপবৎ জেগে আছে, আর উনি এদিকে সেই পুরনো খেলা খেলছেন ওকে 'শুকিয়ে মারার'।

সরীসৃপের চলার গতি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে।

সৎ নিষ্ঠাবান মানুষরা বহু প্রজন্ম ধরে খেটেছেন ওই বিশেষ কটি বছরের জোচ্চুরি আর কলঙ্কের প্যাঁচে বাঁধা লজ্জাজনক জটটা খুলে ফেলতে। ফাইলগুলো খুলে দেখেন কর্মকর্তাদের অসংখ্য মন্তব্য:

'হস্তান্তর সন্দেহজনক—তালা বন্ধ।'

'সুপারিশপত্র জাল—তালা বন্ধ।'

'স্বাক্ষর জাল।'

'স্বত্বাধিকার নাকচ—অন্যত্র নকল স্বত্বাধিকার করা হয়েছে।'

'জরিপের দাগ জাল।'

'সার্টিফিকেট দপ্তর থেকে অপহৃত'—ইত্যাদি আরো অসংখ্য।

দস্তাবেজ কেতাবগুলো ওপরতলার বড়ো কামরায় লম্বা টেবিলের ওপর ছড়ানো। সকলেই এসে অনায়াসে সেগুলো পরীক্ষা করতে পারেন।

ওগুলো খুলুন, দেখবেন অর্ধশতাব্দী ধরে হাতড়ানোর ফলে অসংখ্য আঙুলের কালো তেলচিটে ছাপ। জমির দখলকারীরা দ্রুত হাতে শত সহস্রবার পাতা উল্টেছে। জীর্ণ পাতাগুলোর ওপর পেশার চিহ্ন রেখে গেছে বিচলিত চাষীর ঘামভেজা হাত।

আগ্রহ কেন্দ্রীভূত ফাইলের কক্ষে।

এটা একটা বড়োসড়ো কামরা, আগুনরোধী ভল্টের মতো তৈরি, প্রবেশ করতে হয় একটিমাত্র দরজা দিয়ে।

ওপরে লেখা আছে 'প্রবেশ নিষেধ · কমিশনার অথবা প্রধান করণিকের সইকরা হুকুমপত্র দেখালে তবেই একমাত্র ভারপ্রাপ্ত কেরানিটি মহার্ঘ ফাইল বের করে হাতে দেবেন।

কয়েক বছর আগে ফাইলের তদারকী ব্যাপারে অতিরিক্ত শৈথিল্য দেখানো হত। সমস্ত আগন্তুকই ফাইল নাড়াচাড়া করত স্রেফ নিজের অনুরোধটুকু জানিয়েই, ইচ্ছেমতো ফেরত দিত অথবা আদৌ দিত না। ওইসব দিনেই শয়তানি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ফাইল কক্ষে প্রায় '———' সংখ্যক ফাইল রয়েছে। সবই কাগজের মোড়কে জড়ানো, বিশেষ জমির অংশের জন্য মালিকানা স্বত্বের দলিল থাকে তাতেই।

টেক্সাসের যে-কোনো জরিপ সংক্রান্ত কাগজের জন্য ভারপ্রাপ্ত কেরানিকে জিজ্ঞেস করুন। শুধু জেলা আর পরচা নম্বর হিসেবে সাজানো আছে সব। উনি দরজা থেকে সরে যাবেন, ভেতর থেকে শুনবেন টিনের বাক্স টানার শব্দ, ডালা খুলে গেল, তারপরেই ফাইলটা এসে পড়বে আপনার হাতে।

ওখানেই কোনোদিন গিয়ে 'বেক্সার পরচা নং ২৬৯২'-টা চেয়ে পাঠান। ফাইল

কেরানি আপনার দিকে এক সেকেণ্ড চেয়ে থাকবেন, তারপর বলবেন ছোট্ট করেঃ 'ওটা ফাইলে নেই।'

কুড়ি বছর ধরে সেটা বেপাত্তা।

ওই ফাইলের ইতিহাস আগে কোনোদিনও লেখা হয়নি।

কুড়ি বছর আগে অস্টিনে বাস করত এক ধড়িবাজ জমির দালাল। জমির দখলীস্বত্ব আর প্রাসঙ্গিক বিধিনিয়মগুলো সম্বন্ধে তার অনস্বীকার্য প্রতিভা আর অগাধ জ্ঞান। এই জ্ঞানই সে কাজে লাগিয়েছিল। বেআইনি সুপারিশপত্রের সাহায্যে তৈরি জরিপকাগজ অথবা যা অসম্পূর্ণভাবে তৈরি, অর্থাৎ বিধান না মানার ফলে যেগুলোর কোনো বাস্তব মূল্যই নেই—সেই কাগজপত্র সে খুঁজে বের করত। আরো বহুরকম ত্রুটিবিচ্যুতি তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর নীতিজ্ঞান বর্জিত মগজের কাছে ধরা পড়ত।

'বেক্সার পরচা নং ২৬৯২'-এ উল্লিখিত ফাইলের জমিস্বত্ব দলিলে সে আবিষ্কার করল একটা সাংঘাতিক ত্রুটি। নিজের নামে জরিপের একটা নতুন সার্টিফিকেট করে ঢুকিয়ে দিল ফাইলে।

আইন এখন তারই দিকে।

ন্যায়বিচার, প্রকৃত অধিকার, মানবতা—এসব তার বিরুদ্ধে হলেও।

কারণ মূল জরিপ যে সার্টিফিকেটের জোরে করা হয়েছিল সেই সার্টিফিকেটটারই হদিশ নেই! আইন অনুসারে এখন সেই জমি শূন্য, মালিকানাহীন সাধারণ ভূমি—নির্দিষ্টকরণের জন্য অবারিত।

জমিটা ছিল এক বিধবা ও তার একমাত্র পুত্রসন্তানের খাসদখলে, আর মহিলা ধরেই নিয়েছিল তার স্বত্বাধিকারে কোনো গণ্ডগোল থাকার কথা নয়।

রেল কোম্পানি ওই ভূসম্পত্তির ভেতর দিয়েই জরিপ করে এক নতুন লাইন বের করেছে, ফলে এর মূল্য বেড়ে গেছে দু'গুণ।

আমাদের জমির দালাল শার্প্ কিন্তু বিধবা মহিলার সঙ্গে কোনো ভাবেই যোগাযোগ করেনি যতক্ষণ-না তার নিজের কাগজপত্র জমা হয়ে যায়। সে তাড়া দিয়ে দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে নিজের দাবি পাশ করিয়ে অবশেষে এল স্বত্বাধিকার বিধিবদ্ধ করার বিশেষ কক্ষে।

এবার সে মহিলাকে একটা চিঠি লিখে তাকে শর্ত জানাল— হয় জমিটা আমার কাছ থেকে কিনে নিন, নয়তো পত্রপাঠ জায়গা ছেড়ে চলে যান।

কোনো জবাব পেল না সে।

একদিন অন্য কতকগুলো ফাইল দেখতে দেখতে সে আবিষ্কার করল সেই হারানো মূল সার্টিফিকেটখানা। কেউ—হয়তো দপ্তরেরই কোনো কর্মচারী—দলিলটা পরীক্ষা করার পর নেহাৎই ভুল করে ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল অন্য একটি ফাইলে। আরো আশ্চর্য যে আরেকটা ভ্রান্তির ফলে ফাইলের মলাটের ওপর কাগজটার

কোনো উল্লেখ না থাকায় ওটা কোনো সময় যে ফাইল হয়েছিল তারই হদিশ থাকল না একেবারে।

শার্প তখন মূল ফাইল, যেখানে কাগজটা থাকার কথা, সেটা চেয়ে পাঠাল। খুব তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করল—ওর ভয় হচ্ছে কাগজটা দপ্তরে ফেরত গেছে বলে কোথাও হয়তো কোনো মন্তব্য থাকতে পারে যা সে লক্ষ্য করেনি।

সার্টিফিকেটের পেছনে স্রেফ ফাইল করার তারিখটা লেখা আছে, আইনানুযায়ী প্রধান করণিকের স্বাক্ষর করা।

একবার যদি এই সার্টিফিকেট পরীক্ষক-কেরানির নজরে পড়ে যায়, তা'হলে যে ওর নিজের স্বত্বাধিকারের আবেদন একেবারে ভুয়ো হয়ে যাবে, কানাকড়িও মূল্য থাকবে না সে কাগজটার।

শার্প সতর্ক হয়ে এদিক-ওদিক চায়। একটি যুবক, আঠারো বছর বয়েসের ছোকরাই বলতে হবে, কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কালো চোখের নজরে লক্ষ্য করছিল তাকেই।

শার্প কিছুটা বিব্রত বোধ করে সার্টিফিকেটটা ওটার নিজস্ব মূল ফাইলেই ঢুকিয়ে দেয়। অন্যসব কাগজপত্র গুছিয়ে তুলতে শুরু করে।

ছেলেটি এসে ওর পাশে দাঁড়ায়, ঝুঁকে পড়ে টেবিলটার ওপর।

বলে, 'বেশ মজার দপ্তর, তাই না স্যার। এখানে আগে কখনো আসিনি। ওই যে সব নথিপত্রগুলো, ওগুলো তো জমিজমার ব্যাপারেই, তাই না? মানে ওই দলিল বা স্বত্ব বা ওইরকমই সব?'

শার্প বললে, 'হ্যাঁ ওগুলোর মধ্যেই সমস্ত স্বত্বাধিকারের কাগজ থাকার কথা।'

বেক্সার ২৬৯২ পরচাটা তুলে নিয়ে ছেলেটি বললে, 'যেমন এইখানা ধরুন, কোন জমির স্বত্বাধিকার বোঝাচ্ছে এটা? আহা, এই দেখছি 'বে—' জেলাতে ছ'শো চল্লিশ একর। মূল প্রাপকঃ আবসালোম হ্যারিস। আচ্ছা, আমি তো এসব ব্যাপারে আনাড়ি, বলুন তো একটা ভাল জরিপের কাগজকে বাজে জরিপের কাগজ থেকে আলাদা করে চেনা যায় কী ভাবে? শুনেছি এই দপ্তরে নাকি বিস্তর জাল আর বেআইনি জরিপ বিবরণ আছে। এইখানা বোধ হয় নিখুঁত?'

'না, না। এর মধ্যে সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। এটা বাতিল।'

'ওই যে কাগজটা দেখলাম এই মাত্র ফাইলে রাখলেন, ওটা তা'হলে অন্য জিনিস? জরিপের নোট বা হস্তান্তরের দলিল হয়তো?'

শার্প তাড়াতাড়ি বললে, 'হ্যাঁ, সংশোধন করা জরিপের নোট। মাফ করবেন, আমার একটু তাড়া আছে।'

উজ্জ্বল সতর্ক চোখে ওকে লক্ষ্য করছিল ছেলেটি।

সার্টিফিকেটটাকে তো ফাইলের মধ্যে রেখে দেওয়া চলবে না। কিন্তু এই কৌতূহলী ছেলেটার নজরের সামনে তো ওটা বের করেও নিতে পারছে না।

ফাইল-কক্ষের দিকে পা বাড়ায় সে, হাতে ডজন খানেকেরও বেশি ফাইল নিয়ে। আকস্মিকভাবে হাত থেকে কয়েকটা ফাইল মেঝেয় পড়ে যায়। নিচু হয়ে তুলতে গিয়ে শার্প চট করে 'বেক্সার ২৬৯২' নং ফাইল পরচাখানা কোটের ভেতরের বুক পকেটে পুরে নেয়।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক সাড়ে-চারটার সময়। ফাইল-কেরানি ফাইলগুলো ফেরত নেবার পর ওগুলো পাঁজা করে ফেলে রাখল নিজের কামরায়। তারপর বেরিয়ে এসে দরজায় তালা মেরে দিল। কেরানিরা তখন লম্বা লাইনে সারি বেঁধে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। দপ্তর বন্ধ হবার সময়।

জমি-দপ্তর থেকে ফাইলটা বের করে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না শার্পের।

ছেলেটা হয়তো তাকে দেখেছে পরচার ফাইলটা পকেটে পুরতে। আর এই রকম কাজের জন্য আইনের শাস্তি ভয়ানক কঠোর।

ফাইল-কক্ষ থেকে কিছুটা দূরেই নক্‌শাবিদের সেরেস্তা, এখন একেবারেই খাঁ-খাঁ করছে, জনপ্রাণী নেই সেখানে।

শার্প বাইরের দিকে এগিয়ে-চলা মানুষেব ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর অগোচরেই ঢুকে পড়ল ওই কামরাটায়।

কেরানিরা সার বেঁধে গান গেয়ে, শিস্ দিয়ে হল্লা করতে করতে নেমে আসছে লোহার সিঁড়ি ধরে।

নিচে তাদের প্রস্থান অবধি সবুর করে আছে রাতের চৌকিদার, এখুনি দরজা বন্ধ করে দক্ষিণ আর পুবের বড়ো ফটকগুলোয় আগল দিয়ে দেবে।

তার কর্তব্য হল প্রতিদিন কড়া নজরে দেখা যাতে ছুটির পর দপ্তরভবনে কেউ থেকে না যায়।

শার্প চুপটি করে অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না সব আওয়াজ থেমে যায়। ওর ইচ্ছে সমস্ত কিছু শান্ত হওয়া অবধি এখানেই থাকবে, তারপর ফাইল থেকে সার্টিফিকেটটা সাবিয়ে নিয়ে ফাইলখানা অবহেলায় কোনো নকশাবিদের টেবিলে ফেলে দেবে, যাতে মনে হয় দিনেব কর্মব্যস্ততার মধ্যেই কেউ ওটা ছেড়ে গেছে।

সে এটাও জানে যে সার্টিফিকেটটা হয় ওকে এ-দপ্তর থেকে সরাতে হবে নয়তো নষ্ট করে ফেলতে হবে—না হলে দৈবক্রমে ওটা কোনো কর্মচারীর নজরে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা আসল ফাইলে ফেরত চলে যাবে এবং তার পরেই আবিষ্কার হবে যে পুরনো জরিপ বিবরণীতে তার নিজের স্থান-নিবেশ একেবারেই মূল্যহীন।

পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে সাবধানে এগিয়ে যাবার সময় চৌকিদারের ছোট কালো কুকুরটার উঁচু চিৎকার কানে এল, বোঝা গেল তার পায়ের শব্দ কুকুরটার তীক্ষ্ণ কানে পৌঁছে গেছে।

যত হালকা পায়েই হাঁটুক সে, বিশাল গভীর কক্ষগুলো তাতেই উঁচু প্রতিধ্বনি তোলে। শার্প একটা টেবিলের পাশে বসল ফাইলটা সামনে রেখে।

জীবনে অনেক জালজোচ্চুরি ধূর্ত-চালাকি করলেও সরাসরি অপরাধের কাজ সে এখন অবধি করেনি। যা কিছু করেছে আইন বাঁচিয়ে করেছে। কিন্তু আজ যে কাজটা করতে চলেছে তাতে নিজের সামান্য অবশিষ্ট বিবেকটুকুর সঙ্গেও সমঝোতা চলবে না।

সততা ও অসততার মাঝখানে কোনো পরিষ্কার সীমারেখা নেই। একটার সীমানা আরেকটির বহিঃসীমার সঙ্গে মিলেজুলে থাকে। যে ব্যক্তি এই বিপজ্জনক ভূমিতে পা রাখতে চেষ্ট করে, তার অবস্থান কখনো হয়তো এ-জমিতে, কখনো-বা ও-জমিতে। তাই একমাত্র নির্ঝঞ্ঝাট পথ হল চওড়া সদর রাস্তা ধরে চলা যা সিধে গেছে সুনির্দিষ্ট রেখা কম্পাসের নক্‌শা মেনে।

শার্প হল সমাজের যাকে বলে কেউ-কেটা মানুষ। ব্যবসার ব্যাপারে তার মুখের কথারই অনেক দাম, তার চেক মানেই ধরা যায় পুরো নগদ টাকা, গির্জায় যায় নিয়মিত, ভালো সমাজে যাতায়াত, কারো কাছে কিছু ধারে না।

জমি সংক্রান্ত যে-কোনো বাণিজ্যে তার হাত পড়লে, ধরেই নেওয়া হয় তার সুনিশ্চিত জিত। কিন্তু সেটা তো ওর পেশা।

আর এখন যে কাজটা সে করতে যাচ্ছে তা ওকে চিরদিনেব মতো আসন করে দেবে সেই দলে যারা ভাগ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে শয়তানিকেই—যদি অবশ্য তা কখনো ধরা পড়ে।

তার চেয়েও বড় কথা, এর ফলে কেড়ে নেওয়া হবে এক বিধবা ও তার পুত্রের সম্পত্তি, অচিরেই যার মূল্য হবে অনেক অথচ সে-সম্পত্তি আইনত তাদের না হলেও, ন্যায়বিচারের প্রতিটি দাবি অনুযায়ী নিশ্চয়ই তাদের।

কিন্তু এখন সে এতটা দূর এগিয়েছে যে আর ইতস্তত করা চলে না।

তার নিজের জরিপ-বিবরণ এখন স্বত্বাধিকার কক্ষে, তালিকাভুক্ত হবার অপেক্ষায়। রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বাক্ষরে পাকা হয়ে যাবে তার নিজের দখলীস্বত্ব।

এ সার্টিফিকেটখানা যে নষ্ট করতেই হয়।

একমুহূর্ত সে মাথায় হাত রেখে বসে থাকে। আর ঠিক এই সময় পেছন থেকে একটা আওয়াজ পেয়ে ওর অপরাধী হৃদয় যেন লাফিয়ে ওঠে ভয়ে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার আগেই একখানা হাত এসে পড়ে ওর কাঁধের ওপর। ফাইলখানা কেড়ে নেয় অন্য হাতে।

পাথরের মেঝেতে সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে শার্প—মুখখানা কাগজের মতো সাদা।

একটু আগে ওর সঙ্গে কথা বলেছিল যে ছেলেটি, সে এবার দাঁড়িয়ে ওকে

নির্নিমেষে লক্ষ্য করছে, চোখে বিদ্রূপভরা হাসির ঝলক। শান্তভাবে নিজের কোটের বাঁদিকের ভেতর-পকেটে সে ফাইলটা পুরে নিল। বলল—

'তাহলে, মিস্টার শার্প, নামেও চোখা, স্বভাবেও ধড়িবাজ! মনে হচ্ছে দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে, আপনাকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসতে দেখা অবধি সবুর করে ঠিক কাজই করেছি। এ ব্যাপারে আমার আনন্দটা আপনি নিশ্চয়ই তারিফ করবেন—যখন বলব আমার নামই হ্যারিস। যে জমিটার ওপর আপনি ফাইল দাখিল করেছেন সেটা আমার মায়ের। টেক্সাসে যদি ন্যায়বিচার থাকে তাহলে সেটা ওরই দখলে থাকবে। আমি খুব নিশ্চিত নই, তবে আমার ধারণা এই ফাইলটার মধ্যেই আজ বিকেলে আপনি একটা কাগজ ঢুকিয়েছেন, আর হয়তো এটাও সম্ভব যে আমাদের পক্ষে সে-কাগজটা মূল্যবান। তখন আমার এরকম পরিষ্কার ধারণাও হয়েছিল যে আপনি কাগজটা ফের সরিয়ে ফেলতে চাইছিলেন, কিন্তু তার সুযোগ পাননি। যাই হোক, আমি কাল অবধি এটা আমার কাছে রাখব, আর কমিশনারকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলব।'

মিঃ শার্পের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারুর হয়তো ছিল উন্মাদের রক্ত, তাই সব সতর্কতা, সব উপস্থিতবুদ্ধি, তার মন থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন তার বদলে তাকে গ্রাস করেছে একটা অন্ধ, দুর্বৃত্তসুলভ, কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্রোধ। তার চোখের সাদা ঝিলিকের মধ্যে পলকের জন্য তা ফুটে উঠল।

হাত বাড়িয়ে মোটা ভারী গলায় বললে, 'ও-ফাইল আমাকে দাও হে ছোকরা।'

'আমি অমন বোকা নই মিঃ শার্প। এ ফাইল কাল সকালে কমিশনারের সামনে পেশ করা হবে যাচাই করার জন্য। যদি তিনি বুঝে ফেলেন... বাঁচাও! বাঁচাও!—'

শার্প ওর ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ওকে পেড়ে ফেলল মেঝের ওপর। ছেলেটি সবল আর ক্ষমতাশালী হলেও শার্পের আচম্বিত আক্রমণে বাধা দেবার সুযোগ পায়নি। ও ঠেলেঠুলে নিজের পায়ে খাড়া হল বটে কিন্তু এখন ওর সঙ্গে লড়ছে মানুষ নয়—একটা মূর্তিমান জানোয়ার—আগুনের মতো চোখ আর নিষ্ঠুর-দর্শন দাঁত মেলে। মিঃ শার্প একজন উঁচু স্তরের নামডাকওয়ালা মানুষ, তাকে লড়তে হচ্ছে নিজের মর্যাদার জন্য।...

অচিরেই একটা ভোঁতা শব্দ ওঠে, তারপর আবার, পরে আরো একটা—ছুরির ফলা ঝিকিয়ে ওঠে, প্রথমে সাদা, তারপর লাল—আর এডওয়ার্ড হ্যারিস্ লুটিয়ে পড়ে একট মানুষের আকারে গড়া কুশপুত্তলিকার মতো। তার হাত-পা নেতিয়ে আলুথালু পড়ে রইল সরকারী জমিসংক্রান্ত দপ্তরের পাথর মেঝের ওপর।

বুড়ো চৌকিদারটা তো বদ্ধ কালা, কিছুই শুনতে পায়নি। ছোট কুকুরটা সিঁড়ির নিচে চেঁচাচ্ছিল, তার প্রভু অবশেষে হুকুম করে তাকে নিজের কামরায় ডেকে নিল।

ভাঁজ-করা রক্তাক্ত ছুরিটা হাতে নিয়ে শার্প বেশ ক'মিনিট দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। কান পেতে শুনতে থাকল ছাদের ওপর পায়রাদের বক্ বকম, আর অভ্যর্থনাকক্ষের দরজার মাথায় ঘড়ির জোরালো টিক্ টিক্ শব্দ।

দেয়ালের মানচিত্রটা খরখর করতে তার রক্ত যেন হিম হয়, কতগুলো ছড়ানো কাগজের ওপর দিয়ে ইঁদুর ছুটে যেতে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে শার্পের, জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটতেও সাহস পায় না।

ফাইল-কক্ষ আর নকশা-কক্ষের মাঝখানে একটা দরজা আছে যার ওপাশ থেকে একটা সরু অন্ধকার পেঁচানো সিঁড়িপথ। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে নিচেরতলা থেকে একেবারে বাড়ির মাথার ছাত অবধি।

সেকালে ওই সিঁড়িপথ ব্যবহারই হত না, যেমন এখনও হয় না। অপ্রয়োজনীয়, অসুবিধাজনক এই পথটা নোংরা, রাতে একেবারেই অন্ধকার—যে স্থপতি এই ভবনের নক্শা করেছিল তার এক মহা ভুলের চিহ্ন।

এই সিঁড়িটা ওপরে গিয়ে শেষ হয়েছে ছাদ আর বরগাগুলোর মাঝে তাঁবুর আকারের খোলার নিচে। খোলার জায়গাটা আঁধার, কেউ সেখানে যেতে চায় না, তা ছাড়া অনাবশ্যক বলে কেউ যায়ও না। শার্প এই দরজাটা খুলে পলকের জন্য ওপরদিকে চায়—সরু, ঝুল-জালে ভরা সিঁড়িপথটা।

* * *

সে রাতে পুরো অন্ধকার নেমে এলে, একটি লোক জমি-দপ্তরের নিচের তলার একটা জানলা সাবধানে খুলে ফেলল, দারুণ সতর্কভাবে চারদিক দেখে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। তারপর মিলিয়ে গেল কুয়াশার অন্ধকারে।

* * *

এর ঠিক এক সপ্তাহ বাদে, আবার একদিন বিকেলে শার্প এইভাবেই ছুটি হয়ে যাবার পর কেরানিরা চলে যাওয়া অবধি দেখে দপ্তরের ভেতরেই রয়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রথম আগন্তুকরা এসে দোতলার মেঝের ধুলোয় লক্ষ্য করল একটা চওড়া ঘষা দাগ। আবার ওই একই দাগ দেখা গেল সিঁড়ির নিচে একট জানলার কাছেও।

দেখলে মনে হয় কোনো ভারী, বেশ বড়সড়ো আয়তনের জিনিস, চুনাপাথরের মেঝের ধুলোর ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিঁড়ির ওপর পাওয়া গেল একটা ডায়েরি-বই, মলাটের ভেতরের পাতায় লেখা 'ই. হ্যারিস'। কিন্তু এসব ইঙ্গিত থেকে বিশেষ কিছুই ধারণা করা গেল না।

অনেকদিন ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন, ঘোষণা ইত্যাদি বেরিয়েছিল এডোয়ার্ড হ্যারিস সম্পর্কে অনুসন্ধান করে—সে একটা নির্দিষ্ট তারিখে নাকি বাড়িতে মা'কে রেখে

বেরিয়ে যায়, আর তারপর থেকে তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

কিছুদিন গেলে এসব ঘটনা একেবারেই চাপা পড়ে গেল অন্যসব নতুন আকর্ষণীয় সংবাদের তলায়, জনসাধারণের মনে এসবের কোনো স্মৃতিই রইল না।

* * *

শার্প মারা গেছে দু'বছর আগে, প্রাপ্য সম্মান আর শোক নিয়ে। তার জীবনের শেষ দু'বছর যেন একটা স্থায়ী বিষণ্নতার আবরণে ঘেরা, বন্ধুবান্ধবরাও যার কারণ খুঁজে পায়নি।

জোচ্চুরি ও অপরাধ করে যে ভূসম্পত্তি সে বাগিয়েছিল তা থেকেই মূলত তার আরামবহুল ঐশ্বর্যের শুরু।

ফাইলখানা নিরুদ্দেশ হওয়ার রহস্য হয়তো জমি-দপ্তরে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তবে শার্প তার স্বত্বাধিকার ঠিকই পেয়ে যায়।

* * *

অস্টিন আর আশপাশের এলাকায় একটা কিংবদন্তি খুবই প্রচলিত। শহরের পশ্চিমে, 'শোল'-খালের পাড়ে কোথাও নাকি মাটির নিচে পোঁতা অগাধ মূল্যের গুপ্তধন আছে।

অস্টিনের বাসিন্দা তিন যুবক নাকি সম্প্রতি এমন একটা সূত্র হাতে পেয়েছে যার দ্বারা সেই গুপ্তধনের হদিশ পাওয়া যাবে বলে তাদের ধারণা। বৃহস্পতিবার রাত আঁধার হতেই তারা সেই জায়গায় চলে গেছে। তিন ঘন্টা ধরে সমানে বহু মেহনত করে গাঁইতি আর শাবল চালিয়েছে।

অবশেষে এবার ওদের প্রয়াসের পুরস্কার মিলল—মাটির চারফুট নিচে পাওয়া গেছে একটা বাক্স। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সেটা খুলতে উদ্যত হল।

লণ্ঠনের আলোয় ওদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হল একটা মানুষের কঙ্কালের মাংসহীন হাড়গোড়—ভয়াবহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো জড়ানো আছে পোশাকের আবরণে। ওরা অবিলম্বে ওই জায়গা ছেড়ে যথার্থ কর্তৃপক্ষকে খবর দিল বীভৎস আবিষ্কারের কথাটা জানিয়ে। এবার আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করে কঙ্কালের কোটের বাঁদিকের বুক পটেটে পাওয়া গেল একখানা চ্যাপটা, লম্বাটে, কাগজভরা খাম—ধারালো ছুরির আঘাতে তিন জায়গায় ফালাফালা করে কাটা, আর আগাগোড়া এমন চাপ-ধরা রক্তে চোবানো যে দেখলে যেন চেনাই যায় না বস্তুটিকে।.

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, আর খানিকটা কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করলে খামের ওপরের কতকগুলো অক্ষর কিন্তু পড়া যায়:

"বেক্সা--রচা--নং-২-৯২"

Bexar Scrip No. 2692. রোলিং স্টোন, ১৮৯৪-৫

একটি চান্দ্র উপাখ্যান

অতিপ্রাকৃত ভয়াল এক দৃশ্য। আগ্নেয়শিলা আর পুড়ে-খাক্ হয়ে যাওয়া লাভা প্রবাহের ধূ-ধূ প্রান্তরের ওপরে মাথা জাগিয়ে রয়েছে উঁচু বিস্ময়কর পর্বতের গ্রন্থিময় চুড়োগুলো। ভ্রূকুটিকুটিল মৌচাকপারা গিরিশৃঙ্গের নিচে কাচের মতো নিস্তরঙ্গ কালো জলের গভীর সব হ্রদ। শৃঙ্গগুলো থেকে হামেশাই গভীর শব্দে চলকে পড়ছে ভেঙে-পড়া শিলাখণ্ড। উদ্ভিদ বলতে সেখানে কিছু নেই। তীব্র শৈত্যের রাজত্ব। দিগ্বলয়ের চারদিকেই এবড়ো-খেবড়ো আকারহীন কালো শিলার উপত্যকা। বেগুনি আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে একটা মৃত আগ্নেয়গিরি, রাতের মতোই কালো, বিশ্বের মতো প্রাচীন।

আকাশে অগণন তারার চুমকি, কিন্তু ম্রিয়মাণ ভূতুড়ে আলোর মতো নিষ্প্রভ। কালপুরুষের কোমরবন্ধনীটা ঠিক মাথার ওপর।

লক্ষকোটি মাইল দূরে অস্পষ্ট আল্‌ডেবারান্ নক্ষত্রের জ্যোতি। আর পৃথিবীটাকে নতুন-ওঠা চাঁদের মতো মলিন, রক্তমুখী দেখায়।

মসীকৃষ্ণ সাগরের ওপর ঝুঁকে পড়া অতি উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় পাথর-দিয়ে-তৈরি বসতিস্থলটা। ওটার একমাত্র জানলা থেকে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে এসে পড়েছে বাইরের বিকৃতাকার শিলাগুলোর ওপর। দরজাটা খুলে গেল। দুজন লোক বেরিয়ে এল—পরস্পর মরণপণ লড়াইয়ে মত্ত।

খাড়া গিরিখাতের কিনারায় ওরা কুস্তির প্যাঁচ কষছে, ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ছে, কখনো এ আছে বেশি সুবিধাজনক অবস্থায়, কখনো ও।

দুজনেরই মজবুত শরীর। একজন আরেকজনকে কাবু করতে চেষ্টা করছে, আর ওদের পায়ে ধাক্কা খেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ছে গিরিখাতের ভেতর।

অবশেষে একজন জয়ী হল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেপে ধরে সে নিজের মাথার ওপর উঁচু করে ধরল, তারপর তাকে ছুঁড়ে দিল মহাশূন্যে।

পরাজিত যোদ্ধার দেহ গুলতি-দিয়ে-ছোঁড়া পাথরের মতো শূন্যের ভেতর দিয়ে ছুটে গেল জ্বলজ্বলে পৃথিবীর দিকে।

'এই হপ্তায় এ নিয়ে হল তিনজন,'—চাঁদের মানুষ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল তার ডেরার দিকে—'নিউ ইয়র্কের ওই সাক্ষাৎপ্রার্থীগুলো যে আমায় হয়রান করে দেবে আর কিছুদিন এইভাবে চালালে!'

A Lunar Episode. রোলিং স্টোন, ১৮৯৪-৫

জগতে নতুন কিছুই নেই

সাত পাক সিঁড়ি ঘুরে ওপর উঠলে চিলেঘর। কোনোক্রমে ছেয়ে রাখা ছাদের খোলাগুলোকে বড়ো টানাটানি করছে হাওয়া। ঝড়ের দাপটে বরফের শিলা চূর্ণ হয়ে ঝিরঝির করে তুষারের মতো ঢুকছে ফাঁকফোকর দিয়ে, আর ঝরে পড়ছে বিছানাটার ওপরেই। জীর্ণ বিছানা। ঝড়ের একেকটা দমকায় বাইরের কোনো জানলার পাল্লা ফট্‌ফট করছে, কাতরাচ্ছে। আর দক্ষিণমুখো তুষার-মেঘের ফাঁক দিয়ে জোর করেই একটা ঝল্‌মলে নীল তারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখছে উজ্জ্বল চোখে।

চিলেঘরের ছাদের ফাটল দিয়ে একমাত্র ওই তারাটাই দেখতে পাচ্ছে এ ঘরের ভেতরে কী ব্যাপার চলছে আজ রাতে। শূন্য মেঝের ওপর ভাঙাচোরা আসবাব, মাঝখানে একটা টেবিল, তাতে কাগজ, কালিকলম, আর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি।

টেবিলে কনুই রেখে, কাঠের চেয়ারে বসে আছে যে লোকটা, অন্য হাতটা থুতনির নিচে রেখে, সে কিন্তু টেরই পাচ্ছে না এই তীব্র ঠাণ্ডা। যদিও তার সারা হাত-পা কাঁপছে ঠিকই। উঁচু কপাল থেকে এলোমেলো চুল পেছনদিকে ঠেলা। ওর চোখে এমন এক দ্যুতি যা শুধু ওই তারাই জানে, তাই সে ঝিকমিকি করে পাঠায় ভায়ের অভিনন্দন। প্রতিভা হল স্বর্গের সৃষ্টি, তাই তার আলো আসে তারারশ্মির সমান উঁচু কোনো উৎস থেকেই।

হঠাৎ লোকটা কলম তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করে। কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে, আর তার হাত যেন সবেগে উড়ে চলে। বাতাসের গজরানি, অথবা পাশে ঝরে পড়া মারাত্মক তুষারের কণা, কিছুরই তোয়াক্কা করে না সে। সে শুধু লেখে আর লেখে। ঘড়িতে ঘন্টা বাজে, প্রহর কেটে যায়, আবার ঘন্টা বাজে, তারপর সে কলম ছুঁড়ে দেয়, ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত তোলে বিজয়ের অপরূপ ভঙ্গিতে। চালচলনটা স্বাভাবিকই, কারণ ওই তারাটি ছাড়া দেখার তো কেউ নেই আর। বিড়বিড় করে বলে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি জিতে গেছি। এ বিষয়ে আমিই প্রথম। এ ভাবনা আমার এবং আমারই একমাত্র। চিরকাল বেঁচে থাকবে এ-চিন্তা। সাহিত্যে এর জুড়ি নেই কোথাও। কিন্তু কেন, কেন আমায় এতটা দুস্তর ক্লান্তিকর পথ ধরে আসতে হল এইটুকু পেতে? যা মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে গেলাম অতি অনায়াসে পাখির বুক থেকে পালক খসে পড়ার মতো সহজেই?'

সে আবার চেয়ারে বসে, ফের পড়তে থাকে যা লিখেছে। তারপর সেটা সস্নেহে নামিয়ে রাখে—একটা কথাও পালটায় না, বা ঘষে তুলে দেয় না।

সে জানে জিনিসটা নিখুঁত হয়েছে, নিজেকেও তাই বোঝায়। সত্যিকারের প্রতিভার কাছে তো ছদ্ম বিনয় বলে কিছু নেই।

ওর চোখদুটো কোমল হয়। তাতে আগুনের দীপ্তিটা অন্তর্হিত হয়েছে। এখন শুধু উত্তাপময় আভা, যাতে তারকার সাড়া জাগে না। ওর ঠোঁটের দু'পাশে খেলতে থাকে একটা পাতলা, লেগে-থাকা হাসি, যাতে ফুটে ওঠে আধা আনন্দ, আধা বিদ্রূপ। সে শিল্পী, তাই এ-জ্ঞান তার যথেষ্ট আছে যে সে একটা মৌলিক চিন্তার জন্ম দিয়েছে, আর তাব মূল্যও সে জানে।

সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলে সে দেখে সুখ, প্রেম, আনন্দ। আর সুরা, স্ফটিক, হুল্লোড় আর প্রাণময় সৌন্দর্য—যে বস্তুগুলোকে সে উদগ্রভাবে কামনা করে নেকড়ের ক্ষিদে বুকে নিযে। ওই ক্ষিদেই তো তার ভুখা আত্মার হাঁচড়পাঁচড়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে নিজের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য।

হঠাৎ কানেব মধ্যে জেগে ওঠে বর্তমানের তীক্ষ্ণ চাবুক-শব্দ। ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ে ওর মজ্জা অবধি, ওকে জাগিয়ে তৎপর করে তোলে। উঠে একটা ছেঁড়াখোড়া ওভাবকোট পরে ও দরজা খুলে বেরিয়ে নেমে যায় সাত-প্যাঁচ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে। তারপরেই সোজা ফিরে আসে রুটি আর পনির হাতে নিয়ে, পুরনো খবরের কাগজে জড়ানো। আবার জায়গায় বসে গিলতে শুরু করে খাবারটা, যেন দেবতাদের অমৃতের স্বাদ ওতে। ছাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় সেই তারা, স্বর্গীয় সমবেদনায় পিট্‌পিট্ করে জ্বলে। কারণ লোকটা যে দীর্ঘ ক্লান্তিকর লড়াইটা শেষ পর্যন্ত চালিয়েছে, আব তাই এখন রুটি-পনির খেতে পারছে, কাঁধেপিঠে হিম তুষার ঝরে পড়লেও। বহুবছর পর এই প্রথম ওব চেহারায় ফুটে উঠেছে সাফল্যের চিহ্ন।

* * *

সারাজীবন চেষ্টা করেও অন্যরা যে সাফল্য পায়নি সে তা এক ঘন্টার মধ্যে পেয়ে গেছে। খেতে খেতে লোকটা অলসভাবে তাকায় পুরনো খবরের কাগজটার দিকে, যার মধ্যে তার খাবার জড়ানো ছিল। আকাশ থেকে নক্ষত্র দেখল, হঠাৎ সে বিহ্বল হয়ে দু'হাতে কাগজটা চেপে ধরেছে, জ্বলন্ত চোখে কাগজের কলমগুলো খুঁটিয়ে দেখছে, আর তার পরেই ভগ্ন রুদ্ধ স্বরে একটা শপথ নিয়ে, হুমড়ি খেয়ে ঘুরে পড়ল আবরণশূন্য মেঝের ওপর।

* * *

সকালবেলা তাকে রোজকারের মতো আসতে না দেখে, দুটি লোক গিয়ে চিলেকোঠার দরজা ভেঙে ফেলল। ওখানেই পাওয়া গেছে তাকে।

একজন বললে, 'আত্মহত্যা?'

অন্যজনের বক্তব্য, 'অনাহারে মৃত্যু বলেই তো মনে হয়।'

'তা কেন? এই তো রুটি পনির। যাই হোক, করোনার বুঝবেন। ডেরা তো বেশ চমৎকারই ছিল দেখছি। আরে, দেখ তো এটা কী লিখছিলেন উনি?'

মৃতব্যক্তি যা লিখে গেছে অন্যজন সেটা পড়ে দেখে বললে—'এ যে দেখছি অদ্ভুত রচনা। আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছি না। ওঁর হাতটা দেখ দেখি। ওঃ একেবারে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে রেখেছে একটা পুরনো খবরের কাগজ।'

নিচু হয়ে সে শীতল আঙুলগুলোর ফাঁক থেকে জোর করে টেনে নেয় কাগজটা। কৌতূহলভরে পরীক্ষা করে দেখে। তারপর নিতান্তই ভোঁতাভাবে প্রকৃত সত্যটাতে পৌঁছোয়। বলে, 'বিল, এ যে এক মজার ব্যাপার দেখছি। পুরনো কাগজটাতে একটা রচনা আছে যা প্রায় হুবহু এই ভদ্রলোকের লেখাটিরই মতো!'

Nothing New Under The Sun, রোলিং স্টোন, ১৮৯৫

একটি নতুন জীবাণু

হুস্টনে একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি বিজ্ঞানের পরম ভক্ত। বিজ্ঞানের রহস্য নিয়ে উৎসাহী ছাত্রের মতো তাঁর সাধনা। বাড়িতে একটা ছোট ল্যাবরেটরি তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। সেখানেই তাঁর বেশির ভাগ সময়টা কাটে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আর বিভিন্ন বস্তুর বিশ্লেষণ করে।

ইদানীং তাঁর আকর্ষণের বিষয় হয়েছে নানা জীবাণু তত্ত্ব, তাই পাস্তুর বা কথ্-এর লেখাগুলো পড়ার কাজটায় একটু ঢিলে দিয়েছেন। আর সমানে জোগাড় করে যাচ্ছেন বিবিধ প্রকারের 'ব্যাসিলাই'-সম্পর্কিত তথ্য।

নতুন একটা ৯০০-শক্তির অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিনেছেন। আশা রাখেন অদূর ভবিষ্যতে জীবাণু-জীবন সম্পর্কে নানা মূল্যবান আবিষ্কারের মধ্যে নিজেও একটা বিশেষ স্থান করে নেবেন।

গত মঙ্গলবার রাতে একটা গির্জায় প্রীতিসম্মেলন ও ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী চাইলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে, কিন্তু উনি এ ব্যাপারে রেহাই চাইলেন। বললেন তিনি বরং বাড়িতেই থাকবেন আর শান্তিতে সময় কাটাবেন তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা নিয়ে। অতএব ওঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

প্রাক্তন সরকারী ভূতাত্ত্বিক ডাম্বেলের রিপোর্টটা উনি পড়েছেন, হুস্টনের বিশেষ (উপকারী ?) জল 'বাইউ' সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। তাঁর খুব আগ্রহ নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন ওই ভদ্রলোকের বিবরণ কতটা খাঁটি। তাই, সান্ধ্যভোজন সেরেই তিনি সোজা চলে গেলেন রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে। নালার পাশে বেঞ্চের ওপর বসানো একটা জলভর্তি টিন দেখে তাই তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এলেন নিজের ল্যাবরেটরিতে। দরজায় শেকল তুলে দিয়ে বসে গেলেন কাজে।

খানিক বাদে শুনতে পেলেন তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে বিদায় হল চার্চের সান্ধ্যভোজনে হাজিরা দিতে। মাত্র দু'এক সারি বাড়ি পেরিয়ে গেলেই গির্জাটা। এখন একটু স্বস্তির সঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে পারবেন ভেবে আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন।

প্রায় তিনটি ঘন্টা কাজে মগ্ন রইলেন। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বার বার পরীক্ষা করলেন পাত্রের 'বাইউ' জলের নমুনাগুলো।

* * *

অবশেষে বিজয়ের আনন্দে নিজের হাঁটুর ওপর একটা চাপড় মারলেন হাত দিয়ে।

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ডাম্বেল তো ভুল বলেছেন! তিনি বলছেন এগুলো "কেলাসিত জীবকোষ-সঞ্চিত মল" আর আমি দেখছি তিনি ভুল করেছিলেন। এই জলের বাসিন্দারা হল "বিভাজিত ছত্রাকজাতীয় জীবাণু." কিন্তু এরা "রোজিয়ো পার্সিসিনার" বড় সংস্করণও নয়. এদের "সমদ্বিমপ বিশিষ্ট" কোষও নেই।... তাহলে কি. একটা নতুন জীবাণু আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি? বৈজ্ঞানিক খ্যাতি কি আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল?'

কলমটা তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন তিনি। একটু বাদে তাঁর পরিবারবর্গ ফিরে এল, তাঁর স্ত্রী চলে এলেন ল্যাবরেটরিতে। সাধারণত উনি মানাই করে থাকেন স্ত্রীকে ভেতরে আসতে, কিন্তু আজ এ ঘটনার পর উনি দরজা খুলে দিলেন, দারুণ উৎসাহে ভেতরে ডাকলেন তাকে।

'এলেন, শোনো। তোমরা তো চলে গেলে, আর এই ফাঁকে আমি পেয়ে গিয়েছি খ্যাতি, হয়তো বা বরাতও খুলে গেল। 'বাইউ'-র জলে আমি একটা নতুন জীবাণুর সন্ধান পেয়েছি। বিজ্ঞানে এরকম কিছুর বর্ণনাই নেই। আমি এটার নাম দেব তোমারই নামে, আর চিরকালের জন্য খ্যাত হবে তোমার নাম। অণুবীক্ষণ দিয়ে একটু খালি দেখ শুধু।'

ওঁর স্ত্রী একচোখ বুজে তাকালে চোঙার ভেতরে।

বললে, 'মজার ছোট-ছোট গোল জিনিস, তাই না? ওগুলো শরীরের পক্ষে মারাত্মক নাকি গো?'

'একেবারে মৃত্যু। তোমার পেটের নাড়িতে যদি ওর একটাও ঢোকে, তাহলেই হয়ে গেল তোমার! আজ রাতেই আমি লণ্ডনের ল্যান্সেট পত্রিকা আর নিউইয়র্কের বিজ্ঞান পরিষদকে লিখে জানাচ্ছি। কী নাম দেব ওগুলোর, বল তো এলেন? দাঁড়াও দেখি—এলেনোবিস্, না এলেনাইটিস, না আর কিছু?'

'ওঃ জন, আস্ত হতচ্ছাড়া তুমি!'—টেবিলের ওপর জলের টিন চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠেন গিন্নি—'তুমি আমার কেনা গ্যালভেস্টন গুগলির গামলাটা টেনে এনেছ, আর ওগুলোই আমি চার্চের নৈশভোজের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। জীবাণুই বটে!'

* গুগলি ওদের দেশে সুখাদ্য বলে পরিচিত—অঃ

A New Microbe. হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৫

দৈত্য-নাশী জ্যাক

পোস্ট-এর সম্পাদকীয় কক্ষে সেদিন এসেছিলেন এক মহিলা পুস্তক-বিক্রেতা, বই বেচবেন বলে। তিনি ঢুকলেন প্রধান সম্পাদকের দপ্তরে, আর তাঁর সঙ্গী পাঁচবছর বয়েসের ছোট মেয়েটা রয়ে গেল বাইরের কামরায়। নিশ্চয়ই সহ-সম্পাদকদের উজ্জ্বল মনোরম চেহারাগুলো তাকে আকৃষ্ট করেছিল। একেকবারের অবসরের ফাঁকে তাঁরা বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাফেরা করছিলেন।

কোঁকড়াচুল ঝলমলে চেহারার মেয়েটি বেশ মিশুকে প্রকৃতির। তাই সাহিত্য-সম্পাদককেই সে আক্রমণের বস্তু বলে ধরে নিলে। নিশ্চয়ই তাঁর আভিজাত্যসুলভ হাবভাব আর দস্তানা পরেই অদ্ভুত লেখার অভ্যাসটা দেখে।

কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে, তাঁর দিকে বাদামি চোখ মেলে হুকুমের সুরে দাবি জানাল, 'আমায় এট্টা গপ্পো বলো।'

মিষ্টি হেসে ওর ঝকমকে চুল নেড়ে সাহিত্য-সম্পাদক বললেন, 'গল্প বলতে হবে বাছা? নিশ্চয়ই বলব। তা কিসের গল্প শুনবে?'

'বলো ডৈটোনাছী ড্যাকের গপ্পো।'

'জ্যাক, দৈত্যনাশী? ছোট্ট সোনামণি, প্রাণ খুলে বলব।'

ক্ষুদে মহিলাকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে দিয়ে সাহিত্য-সম্পাদক বলতে শুরু করেন—

'এক সময়ে, এক আদিম অরণ্যের অতি নিকটে একটি জীর্ণ কুটিরে বাস

করত জ্যাক। প্রাকৃতিক বসতির সমস্ত আনন্দ সেখানে কৃষিকাজের কঠোরতর কর্তব্যের সঙ্গে লাভজনকভাবে জড়িত ছিল। জ্যাক, আমার কাহিনীর নায়ক, বাস করত তার বিধবা জননীর সঙ্গে। বিধবার স্বভাবগত কৃপণতা না থাকলেও আর্থিক অসদ্ভাবের ফলে তিনি বাধ্য হতেন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানাবিধ কার্যকলাপ করতে। তিনি একটি অতি গুণশালিনী গৃহপালিত গো-জাতীয় চতুষ্পদের অধিকারিণী। প্রচুর তরল পয়োভাণ্ডার, সুবিনীত শান্তিপ্রিয় প্রকৃতি ও আচারব্যবহারের ভদ্রতা তাকে জ্যাক ও তার মায়ের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। কিন্তু হায়, অবস্থার দুর্বিপাকে শীঘ্রই প্রয়োজন হল চতুষ্পদ বন্ধুটিকে বিদায় করার। জ্যাকের ওপর আরোপিত হল সেই দুঃখজনক কর্তব্য। শোকাহত বক্ষ ও শ্রুতিগোচর রোদনাদির মধ্যে তাঁদের গো-সম্পদটিকে বাজারে নিয়ে যেতে হবে। সংসারের আরো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য তার বিনিময়ের ব্যবস্থা। অতএব জ্যাক—'

ছোট মেয়েটি বললে, 'কই, সে গপ্পোটা কখন বলবে?'

নিজের ডেস্ক ছেড়ে উঠে এসে এবার ক্রীড়া-সম্পাদক বললেন, 'এই যে দেখুন, এমন একটা শিশুকে আপনি আপনার কঠিন ট্র্যাকে বসিয়ে দিয়ে সুফল পাবেন ভেবেছেন? আপনার ধারাবিবরণী সেরা আসনের উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়েটিকে যে মাঠছাড়া করে দিচ্ছেন। তা খেলাটা কী শুনি?'

'তা'লে তুমিই বল আমায় ড্যাক ডৈট্যনাছীর গপ্পোটা',—ছোট মেয়েটি বললে। বোঝাই যায় সে ক্রীড়া-সম্পাদকের খোশমেজাজী হাসি দেখে প্রভাবিত।

হাসিখুশি ভদ্রলোক ওকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে বললেন, 'খুকি, তুমি সে ব্যাপারে বাজি রাখতে পার। আমি সাহিত্যিক রং-ঢং না করে তোমার প্লেটের ওপর সিধে সাজিয়ে দেব ওটা।'

* * *

ক্রীড়া সম্পাদক বললেন, 'এবার বুঝলে, জ্যাক আর তার মার টাকাকড়ি তো কম, তাই বুড়ি টিপে দিলে বুড়ো গাইটার গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যাক কোনো বান্দার কাছে যে খাঁটি জার্সি দুধেল গরুর বদলে ওটাকে নিতে রাজি হবে। তাই একদিন খুব ভোর থাকতেই জ্যাক গাই নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল, নিশান পড়তেই শহরের দিকে তিন পোয়া পথ চলে গেছে সে। এর মধ্যে এক বান্দা এসে হাজির, সে ওকে গাইটার বদলে এক ঝুড়ি কালো শিম দিতে চায়। জ্যাক প্রথমে ওকে বেজার মুখ দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে তাকে ডেকে নিল। অচেনা লোকটাও ভালো জিনিসটা ডাহা শস্তায় বাগিয়ে নিল। জ্যাক ধড়িবাজের পাল্লায় পড়লে রীতিমতো ভ্যাদ্‌ভেদে হয় সন্দেহ নেই। জ্যাক এবার মূল বেস্‌ক্যাম্পে ফিরল। তারপর যখন বড় মুখ করে বুড়িকে তার কাজকর্মের কথা জানাল, বুড়ি ওকে দু'সেকেণ্ডে দড়ির ওপারে পটকে দিল। তাই সে—'

ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই গপ্‌পোটা কখন বলতে শুরু করবে?

'আরে আমায় তাহলে ঘাস খেতে যেতে হয়,' ক্রীড়া-সম্পাদক বললে, 'গল্পটা তো শুরুই করে দিয়েছিলাম জানি। বুঝেছি খুকি, ফাউল হয়ে গেছে।'

এবার রেল-খবর বিভাগের সম্পাদক ভেতরে এসে গ্যাস উনোনের সামনে জামার আস্তিন মেলে দিয়ে বললেন, 'ও বাচ্চা মেয়েটাকে তোমরা কী নিয়ে এত বিরক্ত করছ?'

ক্রীড়া-সম্পাদক বললেন, 'ও দৈত্যনাশী জ্যাকের গল্প শুনতে চায়, কিন্তু আমাদের এত চেষ্টাতেও মোটেই খুশি হচ্ছে বলে মনে হয় না। তুমিও তো ইংরেজিই বল, নাকি শুধু রেলের ভাষা?'

রেল-সম্পাদক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আপনাদের কক্‌পিটের ভাষা ও পতাকা নামিয়ে থামাতে পারবে কিনা সন্দেহ। লাইন খালি করুন, আপনাদের দেখাচ্ছি কী ভাবে শিশুর মনে সাড়া জাগাতে হয়।'

চোখে আশান্বিত দৃষ্টি নিয়ে ছোট বালিকাটি বললে, 'তা'লে তুমি বলবে ওই গপ্‌পোটা?'

রেল-সম্পাদক কাগজের পাঁজার ওপর বসে বললেন, 'ঠিক আছে বলব। আপনারা, বুঝলেন তো, স্টেশন ছেড়ে বেরুবার আগেই অযথা প্রচুর বাষ্প খরচ করে বসেন। একেবারে শুরু থেকেই উত্তেজক অংশটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান।'

* * *

'এবার শোনো তাহলে খুকি'—রেল-সম্পাদক শুরু করলেন, 'হল কী, জ্যাক সকালে ঘুম ভেঙে উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে—একটা শিমের চারা চলবার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক লাইনটা সোজা উঠে চোখের আড়ালে অদৃশ্য। জ্যাক তো কয়লা জল নিয়েই, লাইন পেল কি না-পেল তার জন্য সবুর না করে, সিধে আপের দিকে হুস্ করে উঠে গেল, পথে কোনো স্টেশনে হুইসেলও বাজায়নি। রানের একেবারে শেষ মাথায় উঠে দেখল একটা প্রাসাদ, য়ুনিয়ন ডিপোর মতো বিশাল। তাই সে ব্রেক কষে—'

'তাহলে দৈট্যনাছী জ্যাকের কথাটা বলো এবার?'—মেয়েটা আবার বলে।

এর মধ্যে ওর মা ভেতর দিকে বেরিয়ে আসেন। ছোট মেয়েটা লাফিয়ে নেমে ছুটে যায় তাঁর দিকে। কিছু আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। ওরা যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সম্পাদকরা শুনতে পান মহিলার কথা—'তোমার খুচি লাগবে, মাম্ ঘলে ফিলে তোমায় জ্যাকের সব গপ্‌পো ছোনাবে।'

Jack the Giant Killer, হস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

পাডেরিউস্কির কেশদাম

নিউ হ্যাচিন্সের বৃত্তাকার কক্ষে গতকাল কর্নেল ওয়রবার্টন পোলকের সাক্ষাৎ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল হুস্টন পোস্টের সাংবাদিক।

এদেশে ব্যাপক ভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের একজন হলেন কর্নেল পোলক, আর সম্ভবত জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই একজন যাঁর একালের বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে জানাশোনার পরিধি এত অতি-বিস্তৃত। তিনি রসিক, অসাধারণ তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা, জন্ম-কূটনীতিবিদ্, বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ আর অভিজ্ঞতার মানুষ। কোনো অনুকূল শ্রোতাচক্র পেলে মানুষ ও ঘটনার পরম চিত্তাকর্ষক স্মৃতিকথাগুলো শুনিয়ে যেমন আনন্দ পান তেমন আর কিছুতে নয়। নামজাদা পুরুষ আর মহিলাদের সঙ্গে তাঁর সাহচর্যের স্মরণকাহিনী নিয়ে বেশ কটা বই লিখে ফেলা যায়।

ওয়াশিংটন সিটির এক হোটেলে কর্নেল পোলকের একটা স্থায়ী 'সুইট' রয়েছে কয়েক-কামরার, অবশ্য শুধু অল্প সময়ের জন্য সেখানে এসে থাকেন। গ্রীষ্মকালটা সর্বদাই কাটান ইউরোপে, বিশেষ করে নেপল্স্ আর ফ্লোরেন্সে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই কয়েক হপ্তা বা কয়েক মাসের বেশি থাকেন না।

কর্নেল পোলক এখন চলেছেন দক্ষিণ আমেরিকার পথে। সেখানে তাঁর কিছু মূল্যবান মেহগনি বাগিচা আছে, তারই ব্যাপারে দেখাশোনা করতে।

কর্নেল কোনো রাখ-ঢাক না করে দারুণ আকর্ষণীয়ভাবে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে গল্পগাছা করেন। স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের নানা অপূর্ব কাহিনী শোনান মুগ্ধ মনোযোগী শ্রোতাগোষ্ঠীকে।

লম্বা কালো প্রিন্সিপে চুরুটে টান দিয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের কি বলেছিলাম কয়েক বছর আগে আফ্রিকায় আমার এক অ্যাডভেঞ্চারের কথা? না? তা, দেখছি পাডেরিউস্কি শিগগিরই হুস্টনে আসছেন। সুতরাং গল্পটা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আপনারা সবাই তো নিশ্চয়ই পাডেরিউস্কির আশ্চর্য চুলের কথা শুনেছেন। তবে, খুব কম লোকই জানেন এ চুল তিনি কী করে পেলেন। কেমন করে, শুনুন তাহলে। কয়েক বছর আগে আমরা ক'জন মিলে দল করে আফ্রিকায় গেলাম সিংহ শিকার করতে। ন্যাট গুডউইন, পাডেরিউস্কি, জন সালিভান, জো পুলিট্জার আর আমি। সে ছিল আমাদের কেউ খ্যাতিপ্রতিপত্তি পাওয়ার আগের কথা, তবে আমরা সবাই ছিলাম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আর প্রত্যেকেরই দরকার ছিল একটু বিশ্রাম আর আনন্দ। সেটুকুই উপভোগ করছিলাম সেবার।

'আমরা সবাই বেশ সমমনস্ক ফুর্তিবাজের দল, তাই এই ভ্রমণে বেড়ে মজা চলছিল আমাদের। আফ্রিকার মাটিতে নেমে গাইড ভাড়া করলাম, খাবারদাবার

গোলাগুলির রসদ জোগাড় করে রাখলাম জাম্বেসি অঞ্চলে মাসখানেক ঘোরাঘুরির জন্য।

'সিংহ শিকার করার প্রবল ইচ্ছা আমাদের সকলেরই, তাই ঢুকে পড়লাম বেশ একটা গহন বুনো অনাবিষ্কৃত এলাকায়।

'রাতে ক্যাম্প. আগুন জ্বালিয়ে, গল্প করতে করতে একে অন্যাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে বেজায় আনন্দে কাটছিল, খুবই উপভোগ করছিলাম আমরা।

'আমাদের দলের একমাত্র লোক পাডেরিউস্কিই যা-হোক কিছু টাকাকড়ি করেছে। এই সময়টাতে ওর বাদ্যসংগীত নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেছে দুনিয়ায়। পিয়ানো বাজানোর অনুষ্ঠানগুলো করে বেশ ভাল পয়সা জমিয়ে ফেলেছে।

'একদিন নৈশ আহারের একটু আগে শিবিরের চতুর্দিকে পায়চারি করে বেড়াচ্ছি আমি, গুডউইন, সালিভান আর পাডেরিউস্কি। সারা সকালবেলাটা শিকারের খোঁজে বেরিয়েও তেমন কিছুই জোটেনি। পুলিট্জার এখনো এসে মুখ দেখায়নি। এর মধ্যে গুডউইন আর সালিভান তর্ক জুড়ে দিয়েছে মুষ্টিযুদ্ধের বিশেষ একটা 'আপার কাট' (হীনানের বিখ্যাত কৌশল) সঠিক কীভাবে এড়ানো যায় আর উল্টে মারা যায়, তাই নিয়ে। জানেনই তো, ন্যাট গুডউইন নিজে এক খেলোয়াড় আর পেশাদারের মতোই লড়ে। পাডেরিউস্কি চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ, তবে মিশুকে, আর সবাই তাকে পছন্দও করে। একটা বটগাছের গুঁড়ির ওপর বসে সে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল তার চুম্বক চোখে স্বপ্নের দৃষ্টি নিয়ে। আমি বন্দুকে কার্তুজ ভরছি, কারুর দিকেই তেমন নজর দিই না। হঠাৎ শুনি সালিভান আর গুডউইন চড়া গলায় রীতিমতো রেগেমেগে ঝগড়ায় মেতেছে।

'ন্যাট বলছে, "একজোড়া গ্লাভ্‌স্ থাকত তো প্রমাণ করে দিতাম আমি ঠিক বলেছি।"

'জন বলে, "থাকলেই ভাল হত, এক মিনিটের মধ্যে বুঝে যেতে তুমি নেই।"

'গুডউইন জবাব দেয়, "তুমি তো ঘুষোঘুষির পয়লা নিয়মকানুন যারা জানে তাদের কাছে দু'মিনিটও দাঁড়াতে পারতে না হে।"

'জন দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, "আঃ এই সময় আমাদের কাছে ক'টা দস্তানা থাকত যদি!"

* * *

'যেন কোনো একমুখী চিন্তার বশেই দু'জনে তাকায় পাডেরিউস্কির দিকে।

'সে সব দিনে পাডেরিউস্কির ছিল কুচকুচে কালো চুল, রেড ইণ্ডিয়ানের মতো মসৃণ আর সোজা। মাথার পেছনে ঘন বাবরির মতো তার ঝুল।

'একই সঙ্গে সালিভান আর গুডউইন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। আমি জানি না কে কাজটা করেছিল, তবে একটা ছুরির ঝলক দেখা গেল, আর দু'সেকেণ্ডের মধ্যে পাডেরিউস্কির মাথাটা পরিষ্কার কামানো—এমন সাফ নেড়া করতে শুধু কোমাঞ্চে-ইণ্ডিয়ানরাই পারে!

'ওরা তাঁর কেশপুঞ্জটা দু'টি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। নিজের নিজের অংশ দুটো চামড়ার কার্তুজথলির মধ্যে ঠেসে পুরেছে, আর ফিতেগুলো বেঁধেছে কব্জির ওপর। তারপর দুজনেই উপস্থিত প্রেরণায়-বানানো ঘুষির গ্লাভ্‌স্ পরে পরস্পরের সঙ্গে লড়তে শুরু করল রীতিমতো বাজি-লড়া মল্লভূমির কায়দায়।

'যন্ত্রণা আর হতাশায় এদিকে চেঁচাচ্ছে পাডেরিউস্কি, আর নেড়া মাথার ওপর হাত থাবড়াচ্ছে আতঙ্কে। বলছে, "সর্বস্ব গেল আমার। পেশাদার বাজিয়ের জীবন মাটি হয়ে গেল। এবার কী করব আমি?"

'জন আর ন্যাটকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পাডেরিউস্কির দস্তানার একটা ব্যাক হ্যাণ্ডার ঘুষি খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লাম প্রকাণ্ড এক কাঁটাগাছের ওপর।

* * *

'ঠিক সেই সময় পুলিট্‌জার এল শিবিরে। একটা বড় সিংহের লেজ ধরে টানতে-টানতে। নদীর ধারে বেতবনের ঝোপে এইমাত্র সে ওটাকে গুলি করে মেরেছে।

'চশমার ভেতর দিয়ে দুই মুষ্টিযোদ্ধাকে দেখে জিজ্ঞেস করে—"ভাটস্ ডিস্?" ও দু'জন তখন পাডেরিউস্কির পাশ দিয়ে, ওপর দিয়েই পরস্পরকে ঘুষিয়ে চলেছে। আর সে-বেচারা মাথার চুলগুলো হারিয়ে শোকে আর্তনাদ করছে।

"কেউ পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাইলেও ও চুল বেচতাম না।"—সে গোঙায়।

'পুলিট্‌জার বললে ভাঙা জার্মান-ইংরেজিতে—"ঠিক ঐ রকমই ভাল চুল এক-মাথা পেলে তুমি তার জন্য কী দেবে?"

পাডেরিউস্কির একেবারে পাশ ঘেঁষে দু'জনে কয়েক মিনিট ফিসফিস করে কী বলাবলি করলে। তারপর জো পুলিট্‌জার একটা গজফিতে বের করে পাডেরিউস্কির মাথার মাপ নিলে। তারপর ছুরি বের করে হুবহু সেই মাপের একটা টুকরো কেটে নিলে সিংহের মাথার পেছনদিক থেকে। ফিট্ করে দিল পাডেরিউস্কির মাথায়, ভালো করে চেপে দিয়ে কিছু হাল্কা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল সিংহের কেশরটাতে।

'বললে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু তিনদিনের মধ্যে চামড়াটা শক্ত হয়ে বসে গেল, যন্ত্রণাও চলে গেছে, আর পাডেরিউস্কির মাথায় এখন ঘন, হলদে-বাদামি, ঢেউখেলানো কেশদামের শোভা, যেমনটি কেউ কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখেনি।

'সেদিন সন্ধ্যায় তাঁবুর পেছনে দেখি পাডেরিউস্কি একটা চেক্ দিচ্ছে পুলিট্‌জারকে, আশা করি বলতে হবে না সেটা বেশ মোটা অঙ্কের চেক্ই। ঠিক কতটা তা

বলতে পারব না, তবে আমরা নিউইয়র্কে ফিরে যাবার পরে-পরেই জো 'ওয়র্ল্ড' কাগজটা কিনে নিয়েছিল, এখন তো বহাল তবিয়তেই আছে। ,

'পাডেরিউস্কির ভাগ্য তো এতেই খুলে গেল। ওর এখন যে চুলের মাথা, তাতে ওর কোটিপতি হতে আর দেরি নেই। এখন ওকে ভীষণ ঝুঁকে-ঝুঁকে পিয়ানোর মোটাসুরের চাবিগুলো টিপতে দেখি না বটে, কিন্তু আমার মনে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার অরণ্যে গর্জায়মান কোনো সিংহের কথা। ওরও মনে পড়ে নিশ্চয়।'

* * *

কর্নেল পোলক আবার বলতে থাকেন, 'নাট্যমঞ্চের মানুষগুলোকে আমার ভাল লাগে। ওরাই আসলে পৃথিবীতে সবচাইতে ফুর্তিবাজ সঙ্গী, সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। এমন একটা বছর যায় না যখন আমি সম-মনোভাবের মানুষদের নিয়ে কোনো-না-কোনো দল গড়ে আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়ে না পড়ি। আর আমার দলের মধ্যে দু'তিনজন অভিনেতা থাকবেই। এখন হল কি, দু'এক বছর আগে আমরা কয়েকজন মিলে দল বেঁধে তিনমাসের জন্য দর্শনীয় স্থান দেখতে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। দলেব মধ্যে ছিলেন ডিউল্‌ফ্‌ হপার্‌, ডাঃ পার্কহার্স্ট, বাফেলো বিল, ইউজিন ফিল্‌ড, স্টিভ ব্রোডি, সেনেটর শেরম্যান, জেনারেল কক্‌সি আর বিখ্যাত জাদুকর হারম্যান।

'আমরা হয়েছিলাম যুবরাজ (প্রিন্স অব ওয়েলস্‌)-এব অতিথি, তাঁরই বাষ্পীয় সমুদ্রতরী "অ্যালবিয়ন" ধরে যাত্রা করলাম। আমাদের কেউই আগে অস্ট্রেলিয়া দেখিনি, যুবরাজ চেয়েছিলেন আমাদের সে-দেশটা ঘুরে দেখাতে। যাত্রা তো হল চমৎকার। আমরা সবাই একধরনের মানসিকতার মানুষ, পুরো যাত্রাতেই তাই একটানা খাওয়া দাওয়া আনন্দ করে জাহাজের সময়টা কেটে গেল।

'মেলবোর্নে নামতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভিক্টোরিয়া প্রদেশের গভর্নর আর মাত্র কয়েকজন গণমান্য স্থানীয় ব্যক্তি, কারণ যুবরাজ খবর পাঠিয়েছিলেন খুব কড়া ছদ্ম-পরিচয়ে তিনি ওখানকার পরিদর্শনটি সারতে চান। দু'একদিনের মধ্যে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়করা ছোটখাটো একটা পর্যটনের জন্য আমাদের নিয়ে গেল নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে—দেশটা আমাদের দেখাবেন, ওখানকার বিখ্যাত খনি আর মেষপালন-শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন এই উদ্দেশ্য। ওয়াগ্‌গা-ওয়াগ্‌গা, জাম্বো জংশন, নারাউডেরা পেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেলাম কুডালডুরির কাছে বিশাল পশুচারণ ক্ষেত্রে।

'মেষপালন অঞ্চলের কেন্দ্রে কোবার বলে একটা ছোট শহরে যখন পৌঁছোলাম, কয়েকজন রাজভক্ত ইংরেজ যারা ওখানে বসবাস করে, চিনতে পেরে গেছে

যুবরাজকে। এক ঘন্টার মধ্যে গোটা শহরটা আমাদের পায়ের গোড়ায়, হৈ হল্লা করে "গড সেভ দ্য কুইন" গান গেয়ে আমাদের অনুসরণ করছে।

'যুবরাজ আমায় বললেন "এ বড় বিরক্তিকর হল পোলক। কিন্তু এখন তো আর ঠেকানো যাবে না।'

'গ্রামদেশে ভেড়ার প্রজনন কেন্দ্র দেখতে চলেছে আমাদের দলবল, আর পায়ে হেঁটে অন্তত দুশো নাগরিক আমাদের পেছু নিয়েছে, অবাক বিস্ময় আর গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

'মনে হল এ বছরটা মেষপালকদের পক্ষে বড় দুর্বৎসর গেছে, ভবিষ্যতের কথা ভেবেও ওরা দুশ্চিন্তা আর হতাশা বোধ করছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপুল সংকটটা হল এই: সমস্ত মহাদেশটাতেই ছেয়ে গেছে পালে পালে বংশবৃদ্ধিকারী খরগোশ, তারা ঘাস গুল্মলতা খেয়ে শেষ করছে, বড় বড় এলাকা থেকে একেবারেই সাবাড় করে দিচ্ছে সব রকম ফসলের উৎপাদন। সরকার একটা স্থায়ী ঘোষণা জানিয়ে রেখেছে, এই শশককূল ধ্বংস করতে পারার মতো কোনো পরিকল্পনা পেশ করতে পারলে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের মতো পুরস্কার। কিন্তু এমন কিছুই এপর্যন্ত আবিষ্কার হল না যাতে কোনো কাজ দেয়।

'যে-সব বছরগুলোতে এই খরগোশ অস্বাভাবিকরকম ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে, ভেড়াদের জন্য যথেষ্ট মজুত তৃণক্ষেত্র রাখতে না পেরে মেষপালকদের হয় চূড়ান্ত দুর্ভোগ। আমাদের পরিদর্শনের সময়টাতে খরগোশ গোটা দেশটাকেই প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। খরগোশ যে-সব গাছের উঁচু ডালে উঠতে পারে না, শুধু সেটুকুই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মাত্র ক'টি ভেড়ার দল। কিন্তু বড়-বড় আরো ভেড়ার পালকে তো দেশের অভ্যন্তরে টেনে নিয়ে যেতে হবেই। ভয়ানক বিরক্ত আর মেজাজী হয়ে উঠেছে মানুষজন, এমনকি কারুর কাছে "খরগোশ" নামটি করলেই সে রেগে আগুন হয়ে ওঠে।

'দুপুরের দিকে একটা ছোট গ্রামের প্রান্তে আমরা বসেছি দুপুরের খাবার খেতে। যুবরাজের ভৃত্যরা শিকার-করা প্রাণীর রাঁধা মাংস সাজিয়ে দিয়েছে, নানা সুখাদ্য, ঠাণ্ডা মোরগমাংস।

'যুবরাজ হুকুম দিয়ে প্রচুর সুরা আনিয়েছিলেন, আমরাও মহানন্দে পানভোজন করলাম।

'শতেক গ্রামবাসী আর মেষপালক দল ঘিরে দাঁড়িয়ে আমাদের অবলোকন করল। এক দঙ্গল ক্ষুধার্ত চেহারার অভুক্ত মানুষই তো তারা।

* * *

'এখন, বিখ্যাত ভোজবাজিকর হারম্যানের মতো প্রাণবন্ত, অমায়িক, ভোজনরসিক

মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যে-কোনো উৎসবেরই "জান" হল সে। যুবরাজের সুরা যেই তাকে কিছুটা প্রফুল্ল করতে শুরু করেছে অমনি সে তার ইন্দ্রজালের কৌশল দেখাতে আরম্ভ করল। জিনিসপত্র শূন্যে ছুঁড়ে দিলে তা চোখের সামনে মিলিয়ে যায়, জলের রঙ বদলে যে-কোনো রঙ করতে পারে, টুপির মধ্যেই ডিমের ওম্‌লেট ভেজে ফেলে। শিগগিরই আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল জঙ্গুলে মানুষ, দেশীয় বা ইংরেজ-জাত, দু'রকমই—তাজ্জব হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল।

'এমন মুখব্যাদানকারী মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে দেখে হারম্যানও খুশি। তাই সে উঠে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়াল, যেখান থেকে সবাইকে দেখা যায়। তারপর সে কোটের আস্তিন থেকে, কলার থেকে খরগোশ বের করতে লাগল এক এক করে, আধ ডজন বেরুলো পকেট থেকে। ওগুলোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, তাড়াতাড়ি আরো বড় চক্কর কেটে কেটে এবার বিখ্যাত জাদুকর টেনে বের করতে লাগল আরো খরগোশ, দেশি আদমিদের অবাক চোখের সামনে।

'হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার করে মেষপালকরা মুগুর পাথর যা পায় তুলে নিয়ে, ভোজালি জাতীয় ছোরা বের করে আমাদের দলের ওপর চড়াও হল।

'যুবরাজ আমার বাহু চেপে ধরলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, "পোলক, তুমি পালাও। এই খরগোশের ব্যাপারটা ওদের পাগল করে দিয়েছে। আমরা এখন চম্পট না দিলে আমাদের সবাইকে কেটে ফেলবে।"'

* * *

কর্নেল পোলক বললেন, 'মনে হয় ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে সংকটের মুহূর্ত ছিল। ছুটলাম যত তাড়াতাড়ি পারি। পেছনে ধাওয়া করছে চল্লিশজন দেশি মানুষ, ওদের কেউ কেউ বল্লম ছুঁড়ছে, আমার প্রতিটি লাফের সঙ্গে বুমেরাং ছুঁড়ছে। একটা টিলার ওপর দিয়ে পালাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখি। ঠিক তখুনি আমাদের স্টিভ ব্রোডি মুরামবিজি নদীর ওপর একটা পুল থেকে লাফিয়ে পড়ছে—পুলটা অন্তত দুশো ফুট উঁচুতে। আমাদের দলের সবাই পালিয়েছিল, তারপর দু-দিন ধরে কেতরে কেতরে ফিরে আসে বড় শোচনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সেনেট-সদস্য শেরম্যান জঙ্গলের মধ্যে দু'রাত কাটিয়েছিলেন, সাংঘাতিক তুষারাহত অবস্থায়।

'শুনেছি ডেউল্‌ফ হপার নাকি ঘটনাটার একটা নাটক রূপ দিতে যাচ্ছেন, সামনের মরশুমে। উনি একটা ক্যাঙ্গারুর ভূমিকা নেবেন।

'কক্সি ধরা পড়েছিলেন একটা ছোট সোঁতার ধারে, ওটাতে নামতে চাননি তিনি, আর দেশি বাসিন্দারা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় একজন ইংরেজ জাস্টিস

অব পীসের কাছে, উনি পরদিন তাঁকে ছেড়ে দেন। যুবরাজ সব ব্যাপারটাকে নিয়েছিলেন একটা মজার প্রহসন হিসেবে। সব মিলিয়ে তিনি একজন ভাল মানুষ—এব্যাপারে ভুল বুঝবেন না।'

উঠে দাঁড়িয়ে একটা টেলিগ্রামের প্রাপ্তিস্বীকার করতে গিয়ে গিয়ে বললেন, 'অন্য কোনো সময় আমি আপনাদের একটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শোনাব, রোমের ভূগর্ভ সুড়ঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা। সঙ্গে ছিলেন রাল্ফ ওয়ালডো এমার্সন, বার্নি গিব্স্ আর ইরানের শাহ্।'

কর্নেল পোলক রাতের ট্রেনে সান আন্টোনিও যাচ্ছেন, মেক্সিকো সিটি যাবার পথে।

Paderewsky's Hair, হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

বিঙ্কলের সাংবাদিক বিদ্যালয়

গত মঙ্গলবার বিকেলে মেন স্ট্রিটের কোণায় একটি আলুথালু চেহারা, ছেঁড়াখোড়া পোশাকপরা লোককে দেখা যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে থাকতে। বেশ কিছু লোক যারা ওই পথ ধরেই দ্বিতীয়বার যায় বা ফিরে আসে তারা দেখতে পায় লোকটা ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হয় যেন কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। অবশেষে ফুটপাত ধরে একটি যুবক এল। উদ্ভুটে লোকটা কোনো কথা না বলে সিধেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর চলল ভয়ানক আছড়াপাছড়ি।

যুবক যথাশক্তি নিজেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু পথিকরা দু'জনকে ছাড়াছাড়ি করিয়ে দেবার আগেই সে ভালরকম মার খেয়েছে। অবশ্য কোনো পুলিশের লোককে কাছেপিঠে দেখা যায়নি। তাই ব্যাপারটা যেমন সামান্য গোলমালের মধ্যে শুরু হয়েছিল, তেমনি নিঃশব্দে মিটে গেল। চোখে কালসিটে আর গালে ঘষ্টানি দাগ নিয়ে যুবকটি কেটে পড়ল। আর কদাকার পোশাকের লোকটা মুখে একটা প্রচণ্ড তৃপ্তির ভাব নিয়ে পাশের কোনো গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

একজন সাংবাদিক দেখেছিল ঘটনাটা। লোকটার চেহারার মধ্যে অসাধারণ কিছু লক্ষ্য করে একটু অবাক হয়েছিল সে। ব্যাপারটার মধ্যে অন্যকিছু নিশ্চয়ই আছে যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না আন্দাজ করে সে পেছু নিলে হামলাকারীর।

একেবারে যখন তার পেছনে এসে গেছে, শুনল উদ্ভুটে চেহারার লোকটা নিজের মনেই জোরে জোরে কিছু বলছে। গলার আওয়াজে গভীর এক বিজয়ের আনন্দ: 'এই হল দলের শেষ পাণ্ডা। হাজার হলেও প্রতিশোধ নেবার জোগাড়ে যত আনন্দ, প্রতিশোধ নিয়ে ফেললে আর তত আনন্দ নেই। আমি আমার জীবন থেকে লক্ষ্যটাকেই মুছে দিয়েছি।'

লোকটা নিজের পথেই চলেছে, মোড়গুলোতে এসে সামান্য টালবাহানা করছে যেন শহরটাকে তেমন ভাল চেনে না। একটু বাদে সে কংগ্রেস স্ট্রীটের একটা অখ্যাত পানশালায় ঢুকল।

সাংবাদিকও সেখানে ঢুকে দোকানীর কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে তাতেই চুমুক দিতে লাগল। দেখল উদ্ভুটে পোশাকের লোকটা একটা ছোট টেবিল দখল করে বসেছে। যদিও তার পোশাকের শোচনীয় দুরবস্থা, চুল এলোমেলো, তবু মুখের ভাবে কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধির ছাপ যেটা তার কদর্য পোশাকের সঙ্গে খাপ খায় না।

কৌতূহলের বশে সাংবাদিকও ওই টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিল। পেশাগত কৌশল আব তৎপরতা খাটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই রহস্যময় অচেনা লোকটাকে টেনে নিল কথাবার্তার মধ্যে। আর যেটা ও আগেই ভেবেছিল, লোকটাকে দেখল রীতিমতো শিক্ষিত আর ভদ্র।

মার্জিত ভঙ্গিতে হাতটা নেড়ে ভদ্রলোক বললে, 'আপনি বলছেন আপনি সংবাদপত্রের লোক, তাই একটু ভরসা পাচ্ছি। আপনাকে বলব আমার কাহিনী। একসময় আমিই যে খবরেব কাগজ চালাতাম।'

টেবিলের ওপর হাত চাপড়াতে ওয়েটার এসে দাঁড়াল। জোব্বার ভেতর হাত চালিয়ে সে একটা পাতলা পকেট বই টেনে বের করেছে, টেবিলের ওপর সেখানা ঝাঁকিয়ে বের করল একটা ডলারের নোট। ওয়েটারের হাতে ডলারটা দিয়ে বলল: 'তোমাদের সেরা ওয়াইনের এক বোতল, আর কয়েকটা ভাল চুরুট এনো।'

সাংবাদিকও নিজের বুক-পকেটে দুটো আঙুল রেখে বলল, 'এ হে-হে, আপনাকে দিতে হবে না—এবার আমিই—'

'মোটেই না,'—মর্যাদার সুরে উদ্ভুটে লোকটা বললে, 'অর্ডার তো আমিই দিয়েছি।'

সাংবাদিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। গেলাসগুলো ভর্তি হয়, শেষও হয়; আবার ভর্তি হয়, চুরুট ধরানো হয়, আর সাংবাদিকও অধীর হয়ে অপেক্ষা করে অচেনা আমন্ত্রণকারীর কাহিনীটা শুনবে বলে।

* * *

অদ্ভুত লোকটা বলে, 'আমার নাম বিঙ্ক্‌লে। আমি হলাম "বিঙ্ক্‌লে

ব্যবহারিক-সাংবাদিকতা বিদ্যালয়”-এর প্রতিষ্ঠাতা। যে ডলারটা এইমাত্র খরচ করলাম তা আমার শেষ ডলার এই পৃথিবীতে। আর যে-লোকটিকে শহরের মধ্যে পেটালাম, সে আমার সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রতিবেদক মণ্ডলীর শেষ ব্যক্তি, যাদের সবার সঙ্গে এইরকমই আচবণ করেছি।

'বছরখানেক আগে আমার হাতে পনের হাজার ডলার এসেছিল কোনো ব্যবসাতে নিয়োগ করার মত। আমি হয়তো এ টাকা এমন অনেক কিছুতে নিয়োগ করতে পারতাম যা নিরাপদও হত, ভাল সুদও দিতে পারত, কিন্তু ভাগ্যের দোষে এক মৌলিক চিন্তা মাথায় ঢুকল আরো বেশি উপায় করব ভেবে।

'খবরের কাগজের ব্যবসাটা আমি বুঝতাম, কারণ আগে একটা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় ৮/১০ বছর চাকরি করেছি। তারপরই আমার এক পিসি মরে যাওয়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেলাম ওই পনের হাজার ডলার। লক্ষ্য করেছিলাম দেশে প্রত্যেকটা কাগজের অপিসেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকেরা এসে ভিড় করে, তারা চায় কোনোরকম একটা পদ যাতে সাংবাদিকতা শেখার সুযোগ করে নিতে পারে। ওদের বেশির ভাগই কলেজের গ্র্যাজুয়েট, আর অনেকের কাছেই চাকরি অনুযায়ী মাইনেটা বড় কথা নয় মোটেই। ওদের উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা লাভ করা।

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল—একটা প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র-দপ্তরেই পাওয়া যেতে পারে হাতে কলমে সাংবাদিকতার নৈপুণ্য। আর তা আয়ত্ত করার সুযোগ থাকে এমন পদের জন্য তো ওরা ভাল টাকাই দিতে রাজি হবে। দেশে তো এর মধ্যেই অনেক সাংবাদিকতা বিদ্যালয় চালু হয়েছে আর তারা সাফল্যও পাচ্ছে যথেষ্ট। আমার ধারণা হল, এই ধরনের একটা বিদ্যালয় যদি জীবন্ত উন্নতিশীল কোনো সংবাদপত্র, যার কাটতি আছে, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে তা হবে উদ্ভাবকের পক্ষে একেবারে সোনার খনি। বিদ্যালয়ে তো ওরা শুধু তাত্ত্বিক দিকটাই শেখে, আর আমার বিদ্যালয়ে হাত ধরাধরি করে চলবে তত্ত্ব আর ব্যবহারিক প্রয়োগ, দুটোই।

'দারুণ একটা পরিকল্পনা।

'একটা সংবাদপত্রের খোঁজ পেলাম যা বিক্রির জন্য আছে। দক্ষিণের বড় কোনো শহরে, তার নাম জানাবার প্রয়োজন নেই। কাগজের মালিক রোগে ভুগছেন, দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান। প্রতিষ্ঠানটা ভাল—খরচখরচা বাদ দিয়েও বছরে তিন হাজার ডলার আয়। আমি পেয়ে গেলাম নগদ বারো হাজারে। তিন হাজার ডলার রাখলাম ব্যাঙ্কে। তারপর বসে একটা ছোট্ট ছিমছাম বিজ্ঞাপন লিখলাম ভাবী তরুণ সাংবাদিকদের ধরবার উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞাপনগুলো পাঠালাম উত্তর আর পূর্বাঞ্চলের বড় কয়েকটি কাগজে, সবুর করতে লাগলাম পাঠকদের সাড়া পাবার আশায়।

'আমার কাগজটার খুব নামডাক। সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য কাগজেই একটা জায়গা পাবার কল্পনা লোককে যথার্থ ভাবেই আকর্ষণ করেছিল। বিজ্ঞাপনে বলেছিলাম যেহেতু খুব সীমিত সংখ্যক পদে লোক ভর্তি করা হবে, তাই আবেদনপত্রগুলোকে বিচার করব কে কতটা দর দেবে তারই ভিত্তিতে। প্রত্যেকটা পদ-পিছু যে সর্বোচ্চ দর দেবে চাকরি হবে তারই।

"বললে বিশ্বাস করবেন না কী পরিমাণে জবাব এসেছিল আমার কাছে। এক হপ্তা ধরে সব চিঠি ফাইল করলাম, তারপর তাদের পাঠানো সুপারিশপত্রগুলো দেখলাম, কে কত দিচ্ছে তা তুলনা করলাম—অবশেষে বেছে নিলাম আমার সম্পাদকীয় দল। একটা বিশেষ দিনে তাদের হাজির হতে নির্দেশ দিলাম। সময়মতো এল সবাই, কাজে যাবার জন্য হন্যে হয়ে আছে তারা। আমার সম্পাদকীয় লেখক দিচ্ছে হপ্তায় ৫০ ডলার; শহর সম্পাদক দেবে ৪০ ডলার; তিন রিপোর্টারের কাছ থেকে পাচ্ছি ২৫ ডলার করে; একজন নাট্য সমালোচক দেবে হপ্তায় ২০ ডলার; সাহিত্য সম্পাদক একজন, দেবে ৩৫ ডলার। আর রাতের সম্পাদক ও টেলিগ্রাফ সম্পাদক দু'জনে দেবে ৩০ ডলার করে। তিনজন বিশেষ প্রতিবেদককেও নিলাম আমি, হপ্তায় ১৫ ডলার করে দেবে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে কাজের জন্য। আমি ম্যানেজিং সম্পাদক, সেই হিসেবে কর্মীদের চালনা করব, সমালোচনা করব আর শিক্ষাদান করব।

* * *

'পুরনো দলবলকে ছাঁটাই করে দিলাম। তারপর ঘন্টাখানেকের একটা শিক্ষাক্রম ওদের মাথায় ঢুকিয়ে বের করে দিলাম যার-যার কাজে। বেশির ভাগই তো কলেজের অনার্স গ্র্যাজুয়েট, আর এসেছে ধনী পরিবার থেকে, তাই বিষ্কুলের সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ে ঢোকার অসামান্য সুযোগ পেতে খরচও করার ক্ষমতা রাখে।

'কর্মীরা যখন উৎসুক আর আগ্রহী হয়ে তাদের নানা কর্তব্যকাজে চলে গেল, আমি তৃপ্তির হাসি নিয়ে কাত হয়ে পড়লাম নিজের ঘূর্নি চেয়ারে। এই হল আমার আয়—মাসে ১৪০০ ডলার, যা কর্মীদের বেতন দিতে ব্যয় হচ্ছে না, বরং তাদের কাছ থেকেই আসছে। তাছাড়া কাগজের বার্ষিক তিন হাজার ডলার মুনাফা তো আছেই। আঃ কী চমৎকার ব্যাপারটা বলুন!

'অবশ্য প্রথম-প্রথম আমার কর্মীদের কাজে কিছু স্থূলতা, কিছু আড়ষ্টতা থাকবে তা ধরেই নিয়েছি। তবে এও হিসেব করেছি যে ওদের ভুলভ্রান্তি যদি হয় তা হবে সুচারু রচনার ক্ষেত্রে, অন্য কোনোভাবে নয়। একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে সম্পাদনা কামরাগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াই। সম্পাদকীয়-লেখক ডেস্কে বসে

লিখে চলেছেন, চমৎকার দেখাচ্ছে ওর উঁচু মেধাসম্পন্ন কপাল, আর মোটা-কাপড়ের পোশাক। সাহিত্য-সম্পাদক ভুরু কুঁচকে বিশ্বকোষ ঘাঁটছেন, আর নাট্য সমালোচক তার ডেস্কের ওপর শেকস্‌পীয়রের একখানা ছবি সাঁটছেন। শহরকর্মীর দল খবরাখবর সংগ্রহ করতে বাইরে বেরিয়েছে।

'যারা আমার মতো এমন একটা চমৎকার পরিকল্পনা মাথাতেই আনতে পারেনি তাদের কথা ভেবে দুঃখ হতে থাকে আমার। যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনি নির্বিঘ্নে সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। নিচের তলায় চলে গেলাম। নিজের সাফল্যে দিলদরিয়া হয়ে খুঁজে বের করলাম এক পুরনো ইয়ারকে, তাকে খুলে বললাম আমার আশ্চর্য কৌশলটার কথা। সে তো মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর আমরা দুজন এক সরাইখানায় ঢুকে বোতলের পর বোতল মদ্যপান করলাম এই পরিকল্পনার কৃতিত্বে খুশি হয়ে।

'যখন আপিসে ফিরে এলাম, দেখি সারাদিনের কাজ শেষ করে পুরো কর্মীদল এসে পড়েছে। আসল সত্যটা হল, যা খেয়ে এসেছি তাতেই আমি এমন মাতোয়ারা যে ওদের লেখা কপিগুলো দেখবার সময় কী-পড়ছি, না-পড়ছি, তা খেয়ালই করিনি একদম। তাই আমার 'পণ্ডিত' সহযোগীদের কর্মক্ষমতায় ভ্রান্ত আস্থা রেখে সব রচনাই ঢুকিয়ে দিয়েছি ছাপার ফাইলে, একটু বাদে ফোরম্যান এসে তা নিয়েও গেছে। নৈশ সম্পাদককে তার কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাই। এবার আমার সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখব।

'পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম শহরে। মনে হল যেন সর্বত্র কাগজের ফেরিওয়ালা ছাড়া কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। গোটা শহর ভরে গেছে হকারে, আর লোকে আমার কাগজটাই পড়িমরি করে ওদের চট্‌পটে হাত থেকে কিনে নিচ্ছে। তৃপ্তি আর গর্বে বেশ ফুলেই উঠলাম আমি। দপ্তরের কাছাকাছি এসে দেখি পাঁচজন লোক শট্‌গান হাতে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতের ওপর।

'একজন আমায় দেখতে পেয়েছিল, কোণের মোড়টা ঘুরতেই আমার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল সে। একটা গুলি কানের ওপর দিয়ে ছিটকে গেল, বেশ কটা আমার টুপির মধ্যে। আমি আর কৈফিয়ত চাইবার জন্য সবুর করিনি, কারণ আর চারজনও তখন আমার দিকে তাক করছে বন্দুক। মোড়টা ঘুরেই মাথা বাঁচালাম পেছনের দিকে একটা জঞ্জালভরা উঠোনে ঢুকে।

'কাগজের নামে হাঁক দিয়ে একজন হকার ছুটছিল, শিস্ দিয়ে তাকে ডাকলাম বেড়ার একটা ফাঁকে। কিনলাম একখানা কাগজ। ভেবেছিলাম কাগজে বোধহয় এমন কিছু আছে যা কাউকে চটিয়ে দিয়েছে।

'একটা বড় খালি বাক্সের মধ্যে ঢুকে খুললাম কাগজটা। যতই পড়ছি ততই উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি...বিষয়টা একটু বদলাচ্ছি, মাফ করবেন—' উদ্ভুটে লোকটা

বলেই চলে—'কিন্তু একটু আগেই না আপনি বলছিলেন এই তরল পানীয় সম্পর্কে কিছু? এটা তো শেষ হয়ে গেল দেখছি।'

পোস্টের সাংবাদিক তোত্‌লায়, টালবাহানা করে, তারপর আরেকবার বুকপকেটে হাত দিযে দাঁড়িয়ে পড়ে। দোকানীকে একপাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রায় মিনিট-পনের কথা বলে। ফল হল এই, দোকানী আরেক বোতল ওয়াইন এনে বেশ অভদ্রভাবেই টেবিলের ওপর রাখল বোতল-গেলাসে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে—অশিষ্ট অভব্য মেজাজে।

উদ্ভুটে লোকটা মুচকি হেসে গ্লাস দুটো ভরল। তারপর আবার মুখে গভীর ভ্রূকুটি তুলে সে পুরনো কাহিনীতে ফিরে গেল।

'প্রথমে উল্টে দেখলাম স্থানীয় সংবাদের পাতাটা। প্রথম দফায় যেটি নজরে পড়ল তা এই:

"কর্নেল হেনরী গুইন, পার্কিন্‌স্‌ এস্টেটের পরিচালক, পঁচাত্তর হাজার ডলার মেরেছেন মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের কাছ থেকে। উত্তরাধিকারীরা শীঘ্রই এই অর্থের জন্য মামলা করতে চলেছেন।"

'আমার মনে পড়ল যে-লোকটা আমার ওপর গুলি চালিয়েছিল, সে অনেকটাই কর্নেল গুইনের মতো দেখতে। পরের দফাটি হল এই:

"পৌরসভার এক বিশেষ অল্ডারম্যান, ১২৩৪নং পশ্চিম ৩২তম স্ট্রীটের কাছেই যিনি থাকেন, সম্প্রতি একটি দশহাজার ডলারের বাসগৃহ বানিয়ে নিয়েছেন। পৌর পরিষদে ভোটের দাম বুঝি বেড়েই চলেছে!"

'এই ধরনের প্রায় পনেরটি দফা ছাপা হয়েছে, প্রত্যেকটাই বড় বড় খেসারতের উপযুক্ত লাগসই গুলিগোলা। সামাজিক কলমগুলোর ওপর চোখ বোলালাম, ওতে কিছু নির্দোষ ছোট খাটো ছুঁচোবাজি আছে, যেমন:

"জেনারেল মিসেস ক্রাউডার গতরাতে জনস্টন এ্যাভিন্যুতে বড় ধুমধাম করে বলনাচের পার্টি দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে তিনি বুড়ো ক্রাউডারের পত্নী হিসেবে এত আড়ম্বর দেখাবার আগে কানসাস্‌ সিটির সেই টিকেট-দালালের কাছ থেকে ডিভোর্সটা পেয়েই যাবেন।"

"হেনরী বাউমগার্টেন গত রাতেও আবার তাঁর স্ত্রীকে প্রহার করেছিলেন।"

"গত সন্ধ্যায় ক্লাইনের সঙ্গীত বিপনির ওপরতলায় 'মহিলা অভিনেত্রী সংঘের' বৈঠক হয়। কুমারী স্যাডি ডড্‌সন অত্যধিক উত্তাপে কাতর হয়ে পড়েন, গাড়ি করে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়। উত্তাপ! এই একটা নতুন নাম হয়েছে।'

'এগুলো তো তাও ন্যূনতম আপত্তিকর বিষয়। আর কতগুলো রয়েছে যা পড়তে গিয়ে আমার মাথার চুল ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে ওঠে।

'কলের পুতুলের মতো পাতা উল্টে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় আসি। অন্তত সেটার মধ্যে কোনো গুরুতর গণ্ডগোল থাকার সম্ভাবনা আমি চিন্তাই করিনি। প্রথম নিবন্ধটাতেই পৌর এবং জেলা কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ। তাদের নাম ধরে ধরে। শেষ করা হয়েছে এই বলে যে যদি দশদিনের মধ্যে পত্রিকা তার প্রত্যেকটি অভিযোগ প্রমাণ না করতে পারে তাহলে তারা যে কোনো দাতব্য তহবিলে দশ হাজার ডলার দিতে রাজি।

'আমি তো জঞ্জালের উঠোনটা থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে ওপাশের বেড়ায় লাগানো কাঠের তক্তা ঠেলে ভেঙে দপ্তরের পেছনের সিঁড়ি অবধি চলে এলাম। দেখলাম আমার দুজন রিপোর্টার খিড়কির আঙিনায় পা ছুঁড়ছে আর গালাগাল দিচ্ছে। একজন নরম কয়লাগাদার মধ্যে, অন্যজন রেলিঙের গোঁজে কোটের পেছনটা আটকে ঝুলছে। কেউ তাদের জানলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

'ভগ্নহৃদয়ে আমি ওপরতলার সম্পাদকীয় কামরাগুলোয় চুপিসারে ঢুকি। বেশ ভালরকম গোলমাল চলছে সেখানে। যথাসম্ভব সহজ ভঙ্গিতে ঢুকে চারদিকটা দেখি। এককোণে আমার পঞ্চাশ ডলারের সম্পাদকীয় লেখক হাতে আধখানা চেয়ার তুলে নিজেকে বাঁচাচ্ছে, সাহসের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে পৌর পরিষদের একদল সদস্যকে। ও তিনজনকে কুপোকাত করে, তারপরেও প্রচণ্ড লড়ে যাচ্ছিল। ওদিকে শহর-সম্পাদক মেঝের ওপর পড়ে আছে, তার ওপর বসে আছে চার ব্যক্তি। আর বিশাল চেহারার এক ক্রুদ্ধ জার্মান চেষ্টা করছে একটুকরো গ্যাসের নল দিয়ে খুঁচিয়ে নাট্য সমালোচককে বইয়ের তাক থেকে নামাতে।

'মাসে চোদ্দশো ডলার করে আমার রোজগার দিচ্ছে যে কর্মচারীরা, তাদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার যে কোনো লোককেই হতাশ করে দেবে।

'আমি আমার প্রাইভেট কামরায় ঢুকি, ক্রুদ্ধ জনতা আমাকে সেখানেও অনুসরণ করে। আমি জানতাম ওদের তর্ক করে বোঝানো যাবে না। তাই আমার চেকবইটা বের করে চেষ্টা করি একটা সমঝোতার। যখন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সব টাকাই ফুরিয়ে গেল, আবার আরেকদল নাগরিক চোটপাট করে এসে ঢুকল, হতাশায় একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম।

'বেলা এগারোটার সময় সদলবলে কর্মচারীরা এসে কাজে ইস্তফা দিলে। বারোটার সময়ে পত্রিকার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা আনা হল দু'লক্ষ ডলারের। জানতাম প্রত্যেক নালিশই বিচারক মেনে নেবেন। আমি নিচের তলায় নেমে ন'গেলাস মদ খেয়ে ফিরে এলাম। সিঁড়িতেই দেখা হল সম্পাদকীয় লেখকের সঙ্গে, কোনো কথা না বলে সিধেই তার থুতনির ডগায় মারলাম ঘুষি। তখনো তার হাতে চেয়ারের একখানা পায়া, সেটাই আমার মাথার ওপরে ঘুরিয়ে সে ছুটে পালাল। ভেতরে গিয়ে দেখি নাট্যসমালোচক প্রায় কামাল করে ফেলেছে। সে কলেজ

ছাত্র, তার ওপর নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। পেল্লায় জার্মানটাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে সে এবার শহর-সম্পাদকের ওপর থেকে চারজন নাগরিককে টেনে তুলছে। দুশমনের সঙ্গে ভীষণ লড়ছে তারা। ঠিক সেই সময় খালি পায়ে, শুধু শার্ট আর পাতলুন-পরা সামাজিক-সম্পাদক সবেগে ঢুকল কামরার ভেতর। শুনলাম প্রচণ্ড কিচিরমিচির আর চেঁচামেচি, যেন হাজারটা তোতাপাখি একসঙ্গে কথা বলছে।

* * *

"পালান!" বলে সে চেঁচিয়ে উঠল—"মেয়েছেলেরা আসছে।"

'জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম, দেখি ফুটপাতগুলো ভরে গেছে মহিলায়। আমি পত্রপাঠ খিড়কির জানলার দিকে ছুটলাম, ঝাঁপিয়ে পড়লাম একটা গুদামঘরের মধ্যে। তারপরে আর একবারও থামিনি যতক্ষণ-না শহরের মাইলখানেক দূরে এসে পড়ি। বিঙ্কলের ব্যবহারিক সাংবাদিকতা শেখার বিদ্যালয় এইভাবেই শেষ হল। তারপর থেকে কেবলই বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরছি দেশের মধ্যে।...

'যে লোকটাকে আজ রাস্তায় আক্রমণ করেছিলাম সে হুস্টনের এক বিশেষ-সংবাদদাতা, যাকে আমি চাকরি দিই। লোকটার ওপর আমার এমনিতেই খানিকটা অভক্তি ছিল, পত্রিকায় তার পাঠানো প্রথম চিঠিটার জন্য। আমি তাকে অবাধ অধিকার দিয়েছিলাম যা কিছু তার পছন্দসই তা কাগজে পাঠাবার জন্য। সে টেলিগ্রামে চল্লিশ হাজার শব্দ পাঠিয়েছিল প্রথম দিনেই—ডাকোটায় যখন তিনফুট পুরু বরফ, তখন নাকি আদালতবাড়ির পাশে গাছে বসে গান গেয়েছে কাকাতুয়ার ঝাঁক। আপনার মনে হয় না ভাগ্যটা আমার সত্যিই খারাপ?'

পোস্টের সাংবাদিক বললে, 'দেখুন, সত্যি কথা বলতে, আপনার কাহিনীটা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না।'

উস্কুটে ভদ্রলোক করুণকণ্ঠে তিরস্কার করে জবাব দিলে, 'আমি কি আমার শেষ ডলার নোটটা খরচা করিনি আপনাকে গল্পটা শোনাতে গিয়ে? তার জন্য আপনার কাছে কিছু চেয়েছি আমি?' একটু চিন্তা করে সাংবাদিক বললে, 'হ্যাঁ, তা হয়তো সত্যি, তবু'—

Binkley's Practical School of Journalism, হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

সিমসের শনিবাসরীয় রাত

॥ এক নিরীহ পশুপালকের হস্টন দর্শন ॥

চমৎকার এক শনিবারের বিকেলে হস্টন রেলস্টেশনে নামল এক যুবক—ন'টা দশের 'কেটি' ট্রেন থেকে। বেশ একটু হতভম্ব হয়ে চারদিকটা দেখল। চেহারায় তৃপ্তিকর গ্রাম্য ভাব। অনেকটা আমাদের কৌতুক-অভিনেতাদের চিত্রিত গেঁয়ো যুবক-চরিত্রের মতো। পরনে তার একটা 'প্রিন্স এলবার্ট' ধাঁচের লম্বা কালো কোট—পল্লী-গির্জাগুলোতে রবিবারে যেমন পোশাক দেখা যায়। লম্বাটে পায়ের তুলনায় পাতলুনটা যেন বেশি খাটো। সবুজ ফুটকি দেয়া গাঢ় লাল উড়ুনি অদ্ভুতভাবে গলায় বাঁধা। যুবকের গাল পরিষ্কার কামানো। চোখে যেন অপার বিস্ময়, প্রায় শঙ্কার কাছাকাছি—চারদিকের দৃশ্য দেখে নীল চোখজোড়া একেবারে বিস্ফারিত। যুবকের হাতে একটা সাবেকি ধরনের ঝোলা কার্পেট থলি, কালো কোনো চকচকে অয়েলক্লথে তৈরি।

একটা ট্রামগাড়ির নিশানা দেখে বুঝল সেটা শহরের ভেতরে যাচ্ছে। ধড়মড় করে চড়ে বসল সেট্যাতেই। হাঁটুর ওপর দু'হাতে থলিটা আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে রাখল, যেন গাড়ির অন্য যাত্রীদের ওপর তার বিশ্বাস নেই।

ভীষণ গুম্ আওয়াজ করে, ফুলকি ছড়িয়ে, গাড়ি ফের চলতে শুরু করতেই সে এমন চম্‌কে উঠে আসনের হাতল চেপে ধরল যে কনডাকটর দেখে হাসি চেপে রাখতে পারেনি।

যুবকটির কাছে যখন ভাড়া চাওয়া হল, সে থলিটা খুলে একগাদা মোজা আর রুমাল বের করল, খানিকক্ষণ হাতড়ে টেনে বার করল একটা সেকেলে ধরনের পুঁতিবসানো বটুয়া। তার ভেতর থেকে একটা নিকেল মুদ্রা বের করে কনডাকটরকে দিল।

প্রধান সড়কে আসতেই সে ট্রামগাড়ি থামাতে বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। হেঁটে চলতে থাকে ফুটপাত ধরে। আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে অবাক তারিফের চোখে দেখে গয়নার দোকানের জানলাগুলো। ওর উঁচু বুটের গোড়ালি আর অদ্ভুত ঢঙের হাঁটা পথিকদের বড়োই আমোদ দেয়।

ঠিক তখনই একজন সুবেশ ভদ্রলোক, চমৎকার হাল্কা মেল্টন ওভারকোট পরা, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার সুন্দর সোনার বাঁটওয়ালা মালাক্কা ছড়িটা হঠাৎই ছুঁয়ে গেল অনভিজ্ঞ যুবকের কনুই।

শোভন-পোশাক ভদ্রলোক বললেন, 'হাজার বার মাফ চাইছি আপনার কাছে।'

'না না, ঠিক আছে কর্তা',— যুবক বন্ধুত্বের হাসি দিয়ে বললে, 'আপনি

তো লোকসান কিছু করেননি। টেক্সাসের গো-পালককে ওরকম একটা খেলার জিনিস দেখিয়ে ভড়কানো যায় না। ঠিক আছে, ঠিক আছে'।

সুবেশ লোকটি ওর দিকে মাথা নুইয়ে ধীরে সুস্থে নিজের রাস্তায় হাঁটে। যুবক হোঁচট সামলে সড়কের এক কোণে দাঁড়ায়, তার পর লক্ষ্যহীনভাবে ডান দিকে ঘুরে এগিয়ে যায় আর এক সার বাড়ি ছাড়িয়ে। সেখানে মাথা তুলে দেখে মার্কেট হাউসের স্তম্ভে জ্বলজ্বলে ঘড়িখানা। নিজের বুকপকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড পিরিচের মতো বড় রুপোর ঘড়ি বের করে, একটা চাবি দিয়ে দম দেয় সেটিতে. স্তম্ভের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে কাঁটা ঠিক করে। সে যখন এ কাজে ব্যস্ত তখন একটি সুছাঁদ পোশাক পরা ভদ্রলোক পাশ কাটিয়ে গেল হাতে একখানা সোনা বাঁধানো মলাক্কা ছড়ি নিয়ে। ধীরে ধীরে হেঁটে গেল রাস্তার ছায়াঢাকা অংশটা দিয়ে, তারপর একটু ঘন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াল। মনে হয় যেন কারুর জন্য অপেক্ষা করছে সে।

* * *

প্রায় পনের মিনিট পর যুবকটি কংগ্রেস-স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা টেবিলের কাছে চেয়ার নিয়ে বসেছে, ভয়ে ভয়ে। পাশে আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে সাবধানে রেখেছে ওর কার্পেটের থলিটা। পাঁচ মিনিট বাদে সোনার-বাঁটওয়ালা মালাক্কা ছড়ি হাতে একজন ছিমছাম-পোশাকপরা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল, সিল্কের হ্যাটখানা ঝুলিয়ে রেখে, হাঁপাতে হাঁপাতে বসল ওরই টেবিলের পাশের চেয়ারে। তারপর চোখ তুলে যেন চিনতে পারল যুবকটিকে—ওকেই তো দেখেছিল গয়নার দোকানের জানলায় তাকিয়ে থাকতে। স্মিত হাসি হেসে মন্তব্য করলেঃ

'আরে, আবার যে দেখা হল মশাই। একটা ট্রেন ধরতে গিয়ে কী দৌড়ই না দিয়েছিলাম, দম ফুরোনোর অবস্থা। বুঝলেন মশাই, আমি "দক্ষিণ প্রশান্তসাগর রেলওয়ে কোম্পানি"র বেতনদানকারী কর্মচারী। বেরিয়েছি লাইন ধরে রেল চাকুরেদের মাইনে দিতে। তিন মিনিটের জন্য নিজের ট্রেনটা ফেল্ করলাম। তাছাড়া বড়ো বিচ্ছিরি ব্যাপার হল, সঙ্গে প্রায় দু'হাজার ডলার রয়েছে মশাই। এদিকে হুস্টন আমার একেবারেই অপরিচিত জায়গা।'

যুবক বললে, 'ভগমানের মার কর্নেল। আমারও তো ওই একই ঝামেলা। সবে কানসাস সিটি থেকে ফিরছি। ওখানে একপাল বাছুর বেচেছিলাম, টাকাটা নিয়ে কিছুই করবার অবসর পাইনি। আপনি অবশ্য টাকার অঙ্কে আমার ওপর দিয়ে যান, ন'শো ডলার ছাড়া আর কিছু নেই আমার।'

সুবেশ ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা মোটা নোটের বাণ্ডিল বের করলে,

আঙুলের চেটো দিয়ে একখানা তুললে খাবারের দাম দিতে, বাকিটা সাবধানে ঢুকিয়ে দিলে কোটের ভেতরের পকেটে।

বললে, 'বাস্তবিক একই অবস্থায় পড়েছি দু'জনে। সারারাত এতগুলো টাকা বয়ে বেড়াতে মোটেই ভাল লাগছে না আমার। আচ্ছা ধরুন যদি আমরা একটা পারস্পরিক রক্ষা-জোট করি? এর মধ্যে একটু ঘুরে ফিরে দেখব এ শহরে দেখার মতো কী আছে।'

প্রথমে যুবকটিকে মনে হল যেন এই রকম প্রস্তাবে আচমকা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে, কেমন ঠান্ডা, মুখবোজা। কিন্তু ভদ্রবেশী লোকটার সরল অকৃত্রিম বিনয়ে ক্রমেই যেন সে গলে যেতে লাগল। তারপর যখন ভদ্রলোক দু'জনের খাবারেরই দাম দিতে চাইল, তখন ওর সব সন্দেহ যেন উধাও হয়ে গেল। তখন শুধু যে একান্তে মন খুলল তা নয়, রীতিমতো বাচাল হয়ে উঠল। ভদ্রলোককে জানাল ওর নাম হল সিমন্স, এন্‌সিনাল জেলায় ওর একটা চমৎকার ছোটখাটো পশুপ্রজনন ক্ষেত্র আছে, আর এই ওর প্রথম টেক্সাস ছেড়ে বাইরে বেরুনো। ভদ্রলোক বললে তার নাম ক্ল্যাঙ্গি, বন্ধুরা "ক্যাপ্টেন" বলে ডাকে, বাস করে ডালাস্-এ, সে ওখানে ওয়াই-এম-সি-এর একজন সদস্য। মিঃ সিমন্সকে সে একটা কার্ড দিলে, তাতে ছাপা রয়েছে "ক্যাপ্টেন রিচার্ড স্যাক্সন ক্ল্যাঙ্গি", আর নিচে বড়বড় করে হাতে লেখা— "এম.কে. টি. রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে"।

* * *

নৈশাহার সমাপ্ত করে মিঃ সিমন্স বললে, 'এবার একটা প্রস্তাব, আপনি অচেনা মানুষ, তাই একটু লজ্জা হচ্ছে বলতে। কিন্তু আমার ইচ্ছে এক গ্লাস করে বীয়র খাওয়া যাক। যদি অবশ্য মতলবটা আপনার ভাল না লাগে, তো মাফ করবেন, প্রস্তাবটা দিয়েছি বলে কিছু মন্দ ভাববেন না।'

ক্যাপ্টেন আস্কারা দিয়ে একটু হাসলে, দুষ্ট তামাশার সুরে বললে, 'মনে রাখবেন, আজ রাতে আপনি আমি মিলে কিন্তু নিজেদের ওপর খেয়াল রাখব। আমার কাছে যা তহবিল আছে তার জন্য রেল কোম্পানির কাছে দায়িত্ব আমার, তাছাড়া বীয়র আমি ছুঁই না বলতে গেলে। তবে হ্যাঁ, একগ্লাসে আমার ক্ষতি করবে না মনে হয়।'

মিঃ সিমন্স কার্পেট থলি খুলে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে বের করল পুঁতির বটুয়াখানা। ও থেকে একটা ডাইম বের করে অবিলম্বে সেটা কাজে লাগাতে চাইল। ক্যাপ্টেন ক্ল্যাঙ্গির মনে পড়ল কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন কোথায় যেন একটা নিরিবিলি পানশালা আছে—হ্যাঁ, কোন্ রাস্তায় যেন সেটা?

নানা টালবাহানা খোঁজাখুঁজির পর ওরা একটা জায়গায় এল—স্প্রিং কবজার

দরজা, বাইরে বাতি ঝুলছে। ক্যাপ্টেন ইঙ্গিত দিলে, বোধহয় ভেতরে বীয়র মিলবে। দুজনে ঢুকে দেখে সামনেই জাঁকালো একটা পানশালার বার্, আলো আর আয়নায় ঝলমল, পাঁচ ছ'জন লোক বসে আছে, রুক্ষ, রাতের পেঁচার মতো চেহারা।

মিঃ সিমন্স দু'গ্লাস বীয়র চেয়ে নেয়, তারপর সেটা শেষ হলে কাউন্টারের ওপর তার ডাইমটা রাখে।

বারের দোকানী বলে, 'ভূতে পেয়েছে আপনাকে? দু'টোর দাম দিতে হবে। এখুনি আরো কিছু পয়সা উগরে দিন তো।'

মিঃ সিমন্স বলে, 'দেখুন, সবজায়গায় বীয়র পাঁচসেন্ট করে গেলাস। আমাকে কোনো গেঁয়ো হাঁদা মনে করবেন না।'

ক্যাপ্টেন ক্ল্যাঙ্গি ফিসফিস করে বলে, কোনো ঝামেলা না করে বরং লোকটা যা চাইছে তাই দিয়ে দিতে। বলে, 'মনে হচ্ছে একটা অভদ্র গোছের জায়গা। খেয়াল রাখবেন আমাদের সঙ্গে যখন টাকাকড়ি রয়েছে তখন সাধ করে বিপদ ডাকা ঠিক হবে না। বরং বাড়তি পনের সেন্ট আমাকেই দিতে দিন।'

মিঃ সিমন্স বলে, 'না, আপনি দেবেন কেন? যখন আমি খাওয়াচ্ছি, পুরো বিলটা আমিই দেব।'—কাপেটি থলি হাতড়ে আবার সে তিনটে নিকেল বের করে। ঠিক সেই সময় পাশ থেকে বাজনদারের দল জোর বাজনা বাজিয়ে উঠেছে। মিঃ সিমন্স ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কোথায় বাজনা।

বারওয়ালা ক্যাপ্টেন ক্ল্যাঙ্গির দিকে চোখ টিপে নিচু গলায় বলে:

'জিমি, বুড়ো ছেলে, বেশ জবরদস্ত শিকার ধরেছ?'

ক্যাপ্টেন দোকানীর দিকে বাঁ চোখটা টিপে চাপা গলায় বলে, 'মনে তো হচ্ছে ফায়দা হবে।'

মিঃ সিমন্স বলে ওঠে, 'আচ্ছা, ভেতরে ওদিকে আবার কী?'—আঙুল দেখায় বাজনদারদের দিকে।

দোকানী বলে, 'আরে, দক্ষিণের সেরা উঁচু-কেলাসের বাদা আর নাটকের আমোদ ওখানে। নামকরা শিল্পীদের বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের বাছাই জিনিস। ভেতরে চলে যান্ না, মশাইরা।'

মিঃ সিমন্স বললে, 'ও, নাটকের শো দেখছি! ঢুকে যাব ভেতরে?'

ক্যাপ্টেন ক্ল্যাঙ্গি বলল, 'আমার কিন্তু জায়গাটা ভাল মনে হচ্ছে না। তা যাহোক, গিয়ে দেখাই যাক না, সময়টা কেটে যাবে। এই তো এখন সবে সাড়ে দশটা। খানিকক্ষণ দেখব, তারপর কোনো হোটেলে গিয়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়ব। টিকিটের দামটা আমিই দিই?'

মিঃ সিমন্স বলল, 'ঠিক আছে, বীয়রের দাম তো আমি দিয়েছি।'

বারের লোকটি ছোট হল-দরজার ভেতর দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিল ওদের।

ওখানে গিয়ে আরেক দরজা দিয়ে ওরা ঢুকল। সেখানে যে ভদ্রলোকটি, তার মুখে যেন খই ফুটছে, ওদের বুঝিয়ে দিলে টিকিট কেটে ওপরতলায় গেলে তারা ঢুকতে পাবে। ওরা ওপরে গিয়ে ঢুকল ছোট থিয়েটারের 'ফ্যামিলি' শ্রেণীতে। প্রায় বিশ-তিরিশজন বয়স্ক পুরুষ আর ছোকরা ছড়িয়ে বসেছে আসনগুলোতে, অনুষ্ঠান বেশ এগিয়েই গেছে অনেকটা। মঞ্চে একজন অতি—রংচড়ানো আইরিশম্যান কুড়োল হাতে তাড়া করেছে এক অতিরঞ্জিত নিগ্রোকে, ওদিকে কুঁচি-কাপড় আর নীল আঁটসাট জামা পরা এক ঝি-গোছের যুবতী একটা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তীক্ষ্ণ ভাঙাগলায় কিছু বলছে।

* * *

ক্যাপ্টেন বলছিল, 'এখানে আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, যদি চেনাজানা কেউ নিচের তলায় থাকে। তার চেয়ে চলুন একখানা বক্স আসনে ঢুকি।' একটা ছোট বক্সে ঢুকল ওরা, শস্তা নোংরা লেসপর্দা দিয়ে আড়াল করা, ভেতরে চার-পাঁচটা চেয়ার, আর একটা ছোট টেবিল রয়েছে, তাতে ভিজে গেলাসের গোল-গোল দাগ ভরা।

অনুষ্ঠান দেখে তো মিঃ সিমন্স মহাখুশি। ব্যঙ্গ-অভিনেতার তামাশা দেখে সে হেসেই আকুল। ডি-ভেয়ার ভগ্নীরা যখন তাদের নাচ গান, দ্বৈত অভিনয় দেখাল, সে বক্স থেকে হুমড়ি খেয়ে হাততালি দেয়। ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা, মঞ্চের দিকে প্রায় দেখছেই না, কিন্তু তার মুখে বেশ একটা তুষ্টির ভাব, সেই সঙ্গে শান্ত হাসি। মিঃ সিমন্স এতক্ষণ ধরে দু'হাতে কার্পেট থলিটা আঁকড়েই রেখেছিল। এর মধ্যে পারীর কোকিলকণ্ঠী মাদ্‌মোয়াজেল ফাঁশোর একটা স্থানীয় গান তন্ময় হয়ে শুনছিল সে, হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা হাতের স্পর্শ টের পেল। ঘুরে বসেই যা দৃশ্য দেখল তাতে তার যেন আক্কেল গুড়ুম। সাদা পোশাক, নীল ফিতে পরা দুই উজ্জ্বল সুতনুকা ঢুকেছে বক্সে, কালো শিরতোলা মোজার বেশ খানিকটা অংশ দেখাচ্ছে। আর মিঃ সিমন্স কার্পেট-থলিটা বুকের কাছে চেপে ধরে, কাঁচুমাচু হয়ে চমকে ওঠে ভয়ে।

ওদের একজন বলে, 'লজ্জা পেয়ো না বুড়ো খোকা, বসে একটু বীয়র খাওয়াও দিকি!'

এমন থতমত লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মিঃ সিমন্স যে কী করছে তা বুঝতেই পারে না খানিকক্ষণ। কিন্তু ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি এমন ঠান্ডা মাথায় সহজ ভাবে মহিলাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার মতো গল্পগাছা করতে থাকে যে সে এবারে সাহস ফিরে পায়। তারপরের আধঘন্টা দেখা গেল ছোট টেবিলে চারজন মুখোমুখি বসেছে, আর একজন নিগ্রো ওয়েটার ক্রমাগতই ব্যস্ত রয়েছে বার থেকে বীয়রের বোতল

আনতে আর খালি গ্লাসগুলো ফিরিয়ে নিতে। মিঃ সিমন্স আহ্লাদে একেবারেই আটখানা। মজার মজার গল্প বলতে লাগল র‍্যাঞ্চের জীবন নিয়ে। কানসাস সিটিতে যে তিনদিন কাটিয়ে এসেছে সেখানে কী ফুর্তি করেছিল তা নিয়ে জাঁক করে কতো কিছু শোনাল।

যুবতী মহিলাদের একজন, ভায়োলেট, বলে ওঠে, 'ওঃ, আপনি মশাই বেপরোয়া দুষ্টু লোক। যদি লিলি আর জিম, মানে আপনার বন্ধু, এখানে না থাকত তাহলে আপনাকে যে ভীষণ ভয় করতাম।'

'যান কী বলছেন! আমি সেরকম লোকই নই জানেন? ওহে ওয়েটার, আরো কিছু বীয়র আনো এখানে।'

দলের সবাই বেশ উপভোগই করছিল নিশ্চয়। এর মধ্যে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে ভায়োলেট মিঃ সিমন্সকে ডেকে দেখাতে লাগল মঞ্চের ওপরের মহিলাটিকে, যিনি গান গাইছেন এখন। মিঃ সিমন্স পিঠ ফিরিয়ে রয়েছে, আর সেই ফাঁকে ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি চট্‌পট তার পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে কিছু ঢেলে দিল মিঃ সিমন্সের গ্লাসে। এইমাত্র ওটা ট্রে-তে রাখা হয়েছিল।

লিলি নামের মেয়েটা এবার বলে উঠল, 'এই যে, বন্ধুরা, বীয়র যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' মিঃ সিমন্স আর ভায়োলেট টেবিলের দিকে ফিরেছে, এমন সময় মিঃ সিমন্স আচমকা তার কার্পেটি-থলিতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ল। সে ওটাকে মুহূর্তের জন্য মেঝের ওপরেই রেখেছিল বটে। একেবারে টেবিলের ওপর লম্বমান হয়ে পড়েছে সে, ট্রে-টার কিনারায় হাতের এক ধাক্কা মেরে। ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সিকেও চেয়ারের ওপর প্রায় উলটে ফেলেছিল, তবে এক বিন্দু বীয়রও চলকে পড়েনি।

ভয়ানক লাল হয়ে সে বললে, 'মাফ করবেন, পা-টা আটকে গিয়েছিল আমার। নাচতে গিয়ে আনাড়ি কাউবয়ের মতো। যাক্, পান করুন, সৌভাগ্য কামনায়।'

প্রত্যেকেই বীয়র পান করে, লিলি একটা গানের কলিও ধরে গুন্‌গুন ক'রে। মিনিটখানেকের মধ্যে হঠাৎ ভায়োলেট নিজের চেয়ারে গড়িয়ে পড়ল। একেবারে উলটে পড়ল মেঝেতে—তালগোলপাকানো সাদা মস্‌লিন, সোনালি রংকরা চুল আর কালো মোজা পায়ে নিয়েই।

বড় বিরক্ত হয়েছে যেন ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি। লিলির দিকে একটা ইস্পাত নীল বিজলি-দৃষ্টি হেনে মনে-মনে যা বললে তা অনেকটা 'হতচ্ছাড়ি'-র মতো শুনতে।

মিঃ সিমন্স চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সব্বোনাশ! এ মহিলা যে মূর্ছা গেছেন। একজন ডাক্তার ডাকুন। একটু জল বা কিছু আনুন তাড়াতাড়ি।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে লিলি বলল, 'বলছি অত উতলা হবেন না, একটু ঘুমোলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ভদ্রলোকরা একটু বাইরে যান। আর জি-মিস্টার, যাবার সময় বার রক্ষককে বলবেন স্যামকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে। শুভরাত্রি!'

ক্যাপ্টেন বললে, 'আমাদের এখন যাওয়াই ভাল।'

মিঃ সিমন্স অনেক সমবেদনা উদ্বেগ দেখাবার পর তাকে ধরে ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি নিচে নেমে এল। সেখানে লিলির বার্তাটা পৌঁছে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এল রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

এত বীয়র পানের ফলটা খুব ভালই বুঝতে পারছিল মিঃ সিমন্স। ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর সারা দেহের ভার ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন তাকে আশ্বস্ত করলে—আর খানিক পরেই মহিলা সুস্থ হয়ে উঠবে, সে একটু বেশি বীয়র খেয়ে ফেলেছিল, তাই আচমকা নেশা ধরেছিল এই মাত্র! অবশেষে মিঃ সিমন্সের আগের ফুর্তিবাজ মেজাজটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল সে।

ক্যাপ্টেন বললে, 'এখনো তো সাড়ে-এগারটাই বাজেনি। একবার উঁকি দেবার জন্য একটা জুয়োর ঘরে গেলে কেমন হবে মনে হয় আপনার? খুবই আকর্ষণীয় দেখার-জিনিস তো একটা।'

মিঃ সিমন্স বললে, 'হক কথা বলেছেন। আমার কাছে অবশ্য ওগুলো নতুন কিছু নয়! সান এন্টনেতে দু'বার ঢুকেছি ওদের আড্ডায়। ওই খেলাটা, যাতে ছোট বোর্ডের ওপর ছোট-ছোট বোতাম দিয়ে খেলতে হয়—দেখেছিলাম ওতে একজনকে এক রাতে আঠারো ডলার জিততে।'

'বোধহয় কেনো-খেলার কথা বলছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, তাই—কেনো।'

* * *

এর পর আমাদের দর্শনার্থীরা যে আস্তানাগুলোতে গেল তার অবস্থান আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি না। হুস্টনে জুয়ার আড্ডার অস্তিত্ব এক রকম অজানা, আর এটা একটা সত্য কাহিনী—তাই হুস্টনের মতো সুবিদিত নৈতিক মানের শহরে এধরনের জায়গার সঠিক অবস্থান জানাবার চেষ্টা করলে তা কেউ বিশ্বাসই করবে না। এটাও পরিষ্কার নয় ওরা দু'জন এমন জায়গা খুঁজে পেল কী করে। দুজনেই তো অচেনা এ শহরে। কিন্তু কোনো আকস্মিক ভুলে ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি মিঃ সিমন্সকে নিয়ে ওঠালো উজ্জ্বল-আলোকিত কার্পেট-ঢাকা এক সিঁড়িতে। সিঁড়ি চলে গেছে একটা বড় কোঠাঘরে, সেখানে বেশ কিছু লোকের জটলা। তারা বিভিন্ন খেলাতে ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করছে—যেমনটা সচরাচর সুসজ্জিত দ্যূতক্রীড়ার জায়গায় দেখা যায়।

সিঁড়ির প্রান্তটা শেষ হয়েছে রাস্তা থেকে দূরে কোনো কামরার সামনে। ওরা ঢুকতেই প্রথমে ওদের সামনে পড়ল দু'তিনটে গোল টেবিল্স আর চেয়ার, এখনো কেউ দখল করেনি।

খানিকক্ষণ বড় ঘরটাতেই পায়চারি করে বেড়াল ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি আর মিঃ সিমন্স, চেয়ে দেখল খেলুড়েরা কেমন করে খেলার বিপর্যয় বা সৌভাগ্যে হারছে বা জিতছে। কামরার লোকগুলো মিঃ সিমন্সকে দেখে আর আমোদ চেপে রাখতে পারেনি। তার কার্পেট থলিটাই প্রচুর মজার খোরাক দিচ্ছে। কামরার প্রতিটি লোক যেমন উল্লাস প্রকাশ করছে তেমনি আবার ক্ষুধার্ত লোভী চোখে তাকাচ্ছেও তার দিকে—যেন কোনো বাছাই ভোজ্য বস্তু যার ওপর হামড়ে পড়ে তৃপ্ত হবে তারা।

গোঁপে কলপ-লাগানো একটি মোটা লোক ক্যাপ্টেনকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ভগমান! আমাকেও একটু ভাগ দিতে পার না জিমি?' ক্যাপ্টেন ভ্রূকুটি করে, মোটা লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে যায়। মিঃ সিমন্সের উৎসাহ এদিকে উত্তেজনায় পরিণত। তক্ষুনি বললে, 'দেখুন ক্যাপ্টেন, আপনার কেমন লাগে জানি না, তবে আমার শরীরে খেলাধুলার রক্ত। এদিকে, জুয়ো তো আমি খেলি না, কিন্তু দক্ষিণ-পুব টেক্সাস এলাকায় আমি ভীষণ দাবার ভক্ত। চলুন অন্য কামরাটায় যাই, আপনার সঙ্গে চেকার খেলব, যে হারবে তাকে দুজনের জন্য বীয়র কিনতে হবে।'

ক্যাপ্টেন হেসে তর্জনী তুলে সাবধান করল—'এবার মিঃ সিমন্স, মনে নেই আমাদের পারস্পরিক রক্ষা জোটের কথা? এ জায়গাটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। যাই হোক, আমাদের ওয়াই-এম-সি এ'তে আমি সেরা দাবাড়ুই ছিলাম.....এখন অবশ্য হয়ে যাক্ দু'এক খেপ।'

দু'একটা থেকে শুরু হয়ে অবশ্য আরো ছ' বার খেলা হয়ে গেল। প্রত্যেক দফাতেই ক্যাপ্টেন জিতেছে। খুব বিরক্ত হল মিঃ সিমন্স। দাবাড়ু হিসেবে তার সুখ্যাতি ক্রমে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে দেখে মুখ একেবারে টকটকে লাল।

বললে, 'জাহান্নমে যাক্। সত্তর সেন্ট হেরে বসেছি। আমায় সমান-সমান হবার একটা সুযোগ দিন তো। আমি জিতে এগিয়ে গেলেও আপনাকে সুযোগ দিতাম।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বললে ক্যাপ্টেন, 'কিন্তু দাবা বড় ক্লান্তিকর খেলা। অন্য কোনো খেলায় আপত্তি নেই তো? একপ্রস্থ তাস আনিয়ে নেয়া যাক, কয়েক হাত খেলে দেখি, যতক্ষণে আপনি সমান-সমান হতে পারেন।'

'যা অভিরুচি।'—মিঃ সিমন্সের মাথায় ফিরে এসেছে টুপি, হাল্‌কানীল চোখদুটো পিটপিট করছে, কেমন যেন অস্থির। সবুজ ফুটকি লাল টাই প্রায় কানের কাছে সরে এসেছে। কালো কার্পেট থলিটা কোলের ওপর রেখেছে, ডোরা পাতলুন প্রায় হাঁটু অবধি উঠে গেছে।

ক্যাপ্টেন মনে মনে চাপা গলায় বলে—'আ-হা-হা কী পুণ্যি করেছিলাম যে শুকনো মরুভূমিতে এই অমৃত ঝরে পড়ল আমার ওপর। এমন ভাল জিনিসটা পিছলে আমার হাতেই—ঢেউ না তুলেই এতবড় মাছটা আমার বঁড়শিতে! সত্যি, বিশ্বাস হতে চায় না!'

ক্যাপ্টেন একটা ছোট ঘন্টি বাজাতে ওয়েটার নিয়ে এল একপ্রস্থ তাস।

ক্যাপ্টেন বললে, 'পোকারই খেলা যাক্, কেমন?' মিঃ সিমন্স চেয়ার ছেড়ে উঠল। কড়া গলায় বললে, 'ও তো জুয়োর খেলা। আমি জুয়াড়ি নই।'

'আমিও তা নই, মিঃ সিমন্স',—হঠাৎ মর্যাদার সুরে সামান্য ভুরু কুঁচকে বললে ক্যাপ্টেন, 'আমি যেসব চক্রে ঘুরেছি সেখানে যৎসামান্য বাজি রেখে ভদ্রলোকদের মধ্যে পোকার খেলা পুরোপুরিই চলতে পারে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে—'

'ও, গুলি মারুন। আমি তেমন কিছু বলতে চাইনি। ও খেলা আমি কিছু কিছু খেলেছি র‍্যাঞ্চের ছোকরাদের সঙ্গে, ভুট্টার দানা বাজি রেখে। নিন, তাস বাঁটুন আপনি।'

* * *

'বাজপাখি আর কপোতের' পুরনো গল্পটা এতবার বলা হয়েছে যে বিশদ করে বললে ক্লান্তি এসে যাবে। দশ সেন্ট বাজি থেকে শুরু হয়ে তা উঠল পঞ্চাশ সেন্ট, কি এক ডলার। মিঃ সিমন্সই জিতে যাচ্ছে অবশ্য। থলি থেকে পুঁতির বটুয়াটা বের করে, তার ভেতর থেকে কিছু রুপোর ডলার প্রথমে, তারপর ২৫ ডলারের নোটগুলো বের করল। একবার থলির ভেতব থেকে সুতো-বাঁধা একটা বাণ্ডিলও বের করল, ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ টিপে বলল—'এখানেই আছে সেই নয়শো।'

মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন মোটা বাজি জিতছে। কিন্তু বেশির ভাগ টাকাই যাচ্ছে মিঃ সিমন্সের কাছে। সে উৎফুল্ল কিন্তু সমবেদনাও দেখায়।

ফুর্তিভরা মোটা গলায় বলে, 'আপনার আজ কপাল মন্দ!'— চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যা বীয়র টেনেছে তাতে যথেষ্ট নেশা হয়েছে তার। ক্যাপ্টেনকে বেশ উদ্বিগ্ন আর চিন্তিত দেখায়।

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলে, 'আমার রাহাখরচার টাকাই তো ছিল ওটা, খুইয়েছি। দেখুন সিমন্স, বাজির সীমা তুলে নিন, লোককে একটা সুযোগ তো দিন সমান জায়গায় ওঠার।'

মিঃ সিমন্স বলে, 'তার মানেটা কী? বলছেন যা-খুশি টাকা বাজি রাখতে?'

'হ্যাঁ।'

মিঃ সিমন্স বলে—'যা-আ-ক্ চলে। বোলুন, এ বীয়রটা (হিক্কা) আমায় ক্যামন্ যেন ঘু-গুলিয়ে দিচ্ছে।'

ভীষণ আল্‌গা গোছের খেলছে মিঃ সিমন্স, ভাগ্য তাকে প্রায় পরিত্যাগ করেছে। পুরো টেক্কার ঘরে তার জেতা-টাকার বেশির ভাগটাই গচ্চা গেল। বেশ ক'টা ভাল হাতও মারা গেল। আর ক'টা চালের পর তার রাখা-ঢাকাও চলে গেল। পরের হাতে তার ছোটখাটো পুঁজির সবটুকুই গেছে। আরো বেশি যেন আরক্ত হয়ে উঠেছে মুখখানা, উত্তেজনায় গোল গোল হালকা নীল চোখের দৃষ্টি প্রখর। আবার সে কালো কার্পেট থলিটা খুলল, নিজের পকেট-ছুরিটা বের করে দুটো হাতই ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন শুনল সে ছুরি দিয়ে বাণ্ডিলের সুতো কাটছে। তারপর তার হাত বেরিয়ে এল একগাদা পাঁচ-দশ-কুড়ির নোট আঁকড়ে ধরে। কার্পেট থলিটা কিন্তু তার কোলেই বসানো রয়েছে।

উচ্চকণ্ঠে মিঃ সিমন্স বললে, 'টুক্ বীয়র্-এর হু-কুম দিন তো। বেশ আ-ছেন ক্যাপটেন, খুশ্-ই। যদি চান্... সাররা রাত ধোরে খেলুন না, খেলুন। একটু বেশ্‌শি খেয়েছি, কিন্তু এনসিনাল জেলাব শ্‌শেরা দাবাড়ু আমি। তা-স বাঁটুন।'

* * *

ক্যাপ্টেন রিচার্ড স্যাক্সন ক্ল্যান্সি, এম-কে-এণ্ড-টি রেলকোম্পানির বেতন-বন্টনকারী (?) এবার নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলে। তাব সময় এসে গেছে। অমৃত ধারা এখুনি নামবে। তার নখরের ফাঁকে এর মধ্যেই ছটফট করছে কপোত। এখন মাতলামির একেবারে সঠিক পর্যায়ে তার শিকার—যথোচিত বেপরোয়া, তেমন সতর্ক নজর নেই, কিন্তু তাই বলে খেলায়ও খাম্‌তি নেই।

বেশ সজোরেই একবাব কাশলো ক্যাপ্টেন। অন্য ঘব থেকে দু'একজন লোক ধীরেসুস্থে এসে নিঃশব্দে ওদের খেলা দেখতে লাগল। আবার কাশলো ক্যাপ্টেন। একজন ফ্যাকাশে গোছের যুবক, চোয়াড়ে চেহারা, বিষণ্ণ চোখ নিয়ে মিঃ সিমন্সের চেয়ারের প্রায় পেছনেই ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছে, আনমনা চেয়ে রয়েছে এদিকে। যতবারই তাস বাঁটা হচ্ছে বা তাস টানা হচ্ছে, সে কান চুলকোচ্ছে, নাকে হাত দিচ্ছে, গোঁফ চুলকোচ্ছে অথবা ভেস্ট কোটের বোতাম নাড়ছে আঙুল দিয়ে। ক্যাপ্টেন যে কেন অত তাকাচ্ছে যুবকটির দিকে সেটাই আশ্চর্য, অথচ খেলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

এখনো ক্যাপ্টেনই জিতে যাচ্ছে। মিঃ সিমন্স কোনো দান জিতলেও সেটা বড়সড়ো কিছু নয়।

ক্যাপ্টেন বুঝল এবার তার মোক্ষম চালের সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টিটা বাজাল সে, ওয়েটার এল।

'মাইক, এক প্রস্থ নতুন তাস আনো তো, এগুলো বেশ ক্ষয়ে গেছে।' মিঃ সিমন্স এমন বিভ্রান্ত যে লক্ষ্যই করেনি শহরে অপরিচিত হয়েও ক্যাপ্টেন অন্তরঙ্গের মতো ওয়েটারকে তার আসল নামে ডাকল।

ক্যাপ্টেন তাস বেঁটে দিল এবার। মিঃ সিমন্স্ এলোমেলো আনাড়ির মতো তাস কাটল। মারাত্মক-হাতের তাসটাই বাঁটা হয়েছে, ক্যাপ্টেনের যা অতি প্রিয়। ক্যাপ্টেনের প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে গেছে চার সাহেব, আর ইস্কাপনের সাত। আর ক্যাপ্টেনের নিজের কাছে—চার টেক্কা, আর হরতনের দুরি। ইস্কাপন ও হরতনের বদলে অন্য তাস হলেও চলত। তবে এ দুটো রঙের প্রতি ক্যাপ্টেনের বিশেষ আকর্ষণ।

মিঃ সিমন্স যখন তার তাসের দিকে তাকিয়ে আছে তখন ওর মুখে একটা চাপা আনন্দের আভাস লক্ষ্য করল ক্যাপ্টেন। চট্ করে মিঃ সিমন্স খাড়া হয়ে ওঠে। ক্যাপ্টেন তখন একটা তাস সবে টেনেছে। মিঃ সিমন্সের চেয়ারের পেছনের যুবকটি আগেই সরে গেছে। এখন আব তার কান চুলকোনো বা কোটের বোতাম ছোঁবার প্রয়োজন নেই। ক্যাপ্টেনের মতোই সেও ভাল করে জানে ক্যাপ্টেনের 'মোক্ষম চাল'।

মিঃ সিমন্স হাতের মুঠোয় জোরে আঁকড়ে ধরেছে তার তাস, উৎসাহ আর চেপে রাখতে পারছে না যেন। নতুন তাসটা টেনে ক্যাপ্টেন যেন বাড়াবাড়ি রকমের দুশ্চিন্তা দেখিয়ে সেটা পরীক্ষা করে, তারপর একটা হাঁফ ছাড়ে ইচ্ছে করেই মিঃ সিমন্সকে বুঝতে দিয়ে যে সে ভাল তাসই টেনেছে।

শুরু হল বাজি ধরা। মিঃ সিমন্স টাকা ফেলছে উত্তেজনার ঘোরে, তাড়াতাড়ি। ক্যাপ্টেন প্রতিটি বাজির অঙ্ক দেখে, খুব যেন গভীর চিন্তা-বিবেচনা করে তবে বাজি বাড়াচ্ছে। মিঃ সিমন্স ফুর্তিতে, মাতাল হয়ে, স্থির বিশ্বাসে পাল্টা বাজি রাখছে। টেবিলে যখন দুশো ডলার জমেছে, ক্যাপ্টেনের ভুরু দুটো ঘোঁচ হল, নাকের ফুটো থেকে মুখের কোণা অবধি দুটো অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল— সে বাজি চড়িয়ে দিলে আরো একশো। মিঃ সিমন্স সাবধানে হাতের তাস উপুড় করে রাখল টেবিলে। আবার হাত ঢোকাল কার্পেটের থলিতে। এই বারে সে দুটো ৫০০-ডলার নোট বের করে টেবিলের টাকাগুলোর ওপর চাপিয়ে দিলে।

বললে, 'এ-হাতে আমি এস্পার-কি-উস্পার যদি না করি তাহলে এনসিনাল জেলার ছেলেরা আমায় কাপুরুষ বলে ভাগিয়ে দেবে। ক্যাপ্টেন, আপনি আরো ফাঁপিয়ে তুলুন বাজির রোক।'

পাশে দণ্ডায়মান একজনকে ক্যাপ্টেন ক্ল্যান্সি বললে, 'চার্লিকে এখানে পাঠিয়ে দাও তো!' কলপ-লাগানো গোঁফের সেই মোটা লোকটা এসে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কিছু কথা বলল। তারপর সে বেরিয়ে গিয়ে এক বোঝা সোনার মুদ্রা আর নোট নিয়ে এল। গুনে গুনে এক হাজার ডলার রাখল মিঃ সিমন্সের পাল্টা বাজিতে।

ক্যাপ্টেন বলল, 'আমি ডাক দিচ্ছি।'

সেই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

মিঃ সিমন্স হাল্‌কা পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের তাস টেবিলের ওপর চিত করে ছড়িয়ে দিলে, তারপর ওই বাহু দিয়েই টাকার স্তূপটা টেনে নিলে তার বড়সড়ো কার্পেট থলির মধ্যে।

ছানাবড়া চোখে, একটা জ্বালাভরা শপথ করে ক্যাপ্টেন সেই চারটে সাহেব আর ইস্কাপনের সাতটা খুঁজতে লাগল যা মিঃ সিমন্সকে বেঁটে দিয়েছিল। তার বদলে দেখল একটা হরতনের বিবি থেকে শুরু করে হরতনেরই উঁচু ক্রমের ফ্লাশ।

ক্যাপ্টেন লাফিয়ে পড়বার উপক্রম, আর আশপাশের ফ্যাকাশে চেহারার ভদ্রলোকরা একেকজন বিড়ালের মতো সন্তর্পণে একেক পা এগিয়ে আসছে মিঃ সিমন্সের দিকে। তারপরেই তারা থ'। কার্পেটের থলির মধ্যে টাকাগুলো চলে গেল আর বেরিয়ে এল নীল-নল্‌চেওলা একটা ছ'ঘরা পিস্তল, সেটা মিঃ সিমন্সের হাতে অলক্ষুণেভাবে চকচক করছে এখন। ওরা তাকিয়ে রইল পিস্তলের নলচের দিকে।

মিঃ সিমন্স একবার নিজের পেছনদিকে বিদ্যুৎ দৃষ্টি দিয়ে, পেছু হটে যেতে লাগল দরজা লক্ষ্য করে।

বললে 'ভুল করবেন না আপনারা!'— ঠিক তার অস্ত্রের চক্‌চকে ধাতুর মতোই তার চোখে ফুটে উঠেছে একটা নীল দ্যুতি—'মশাইরা, নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি, নিউ ইয়র্কে গেলেই আমার আস্তানায় আসবেন... ২৫০৮ বাওয়ারি। ডায়মণ্ড জো-কে চাইবেন, তাহলে আমায় দেখতে পাবেন। এখন দু'সপ্তাহের জন্য মেক্সিকো যাচ্ছি, আমার খনি-কারখানাগুলো একটু দেখতে হবে, তারপর যে-কোনোদিন উপস্থিত থাকব আস্তানায়। ২৫০৮নং বাওয়ারি, ওপরতলা, নম্বরটা ভুলবেন না। কোথাও যাবার সময় আমার রাহা-খরচটা তুলেই নিই সাধারণত। শুভ রাত্রি!'

মিঃ সিমন্স চকিতে পিছিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হল।

পাঁচ মিনিট পর ক্যাপ্টেন রিচার্ড স্যাক্সন ক্ল্যান্সি, বেতনবণ্টনকর্তা (?), এম.কে.এণ্ড টি. রেলওয়ে কোম্পানি, এবং ডালাস ওয়াই-এম-সি-এ সদস্য(?), ওরফে 'জিমি' দাঁড়ালেন কোণের দিকে বার-এ, বললেন, 'হুইস্কি দাও, বুড়ো, আর—এবার একটু বড় গ্লাসই দিও, বুঝলে? আমার এখন ওটা দরকার।'

Simmons' Saturday Night হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

সান জ্যাসিন্টোর কিংবদন্তী

।। রণক্ষেত্রের সন্ন্যাসী প্রচীন কাহিনী শোনায় ।।

সান জ্যাসিন্টোর রণক্ষেত্র এক ঐতিহাসিক স্থান। টেক্সাসের অতীত যশগৌরবকে যারা বড় আপন মনে করেন তাঁদের প্রিয় জায়গা হল সান জ্যাসিন্টো। এ জায়গার নামোল্লেখেই যে টেক্সাসবাসী শিউরে না ওঠে সে অতি নচ্ছার জাতের ক্রীতদাস। এখানেই তো জেনারেল স্যাম হুস্টন, আর টেক্সাসের জেলাগুলোর নামধেয় অন্য ভদ্রমহোদয়রা দখল করেছিলেন 'সান্টা আনা'; আর সেখানকার সহজবহনীয় মদ্যভাণ্ডার ও ছোটখাটো হাতিয়ার, যা পাশে ঝোলানো যায়।

ক'দিন আগে 'পোস্টে'র এক রিপোর্টার তাঁর এক বন্ধু "হুডু জেন"-টাগবোটের চালকের সঙ্গে বাইউ নদী ধরে পৌঁছোলেন সেই যুদ্ধ প্রান্তরে। তাঁর মতলব ছিল কোনো জীবিত বুড়ো অধিবাসীর কাছে থেকে কিছু পুরনো কাহিনী আর কিংবদন্তী সংগ্রহ করবেন—ওই স্মরণীয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে ঘটেছে এমন সব ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর গল্পই তো শোনা যায়।

"হুডু জেন" তো রিপোর্টারকে রণক্ষেত্রের পাশেই নামিয়ে দিয়ে গেল। জায়গাটা বাইউরই পাড়ে। রিপোর্টার ঘন গাছ-গাছালির তলা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন নিচু সমতল প্রান্তরে যেখানে নাকি হয়েছিল সেই প্রসিদ্ধ সমর। এল্‌ম্ গাছের একটা ছোট বাদাড়ের তলায় উঁকি দিচ্ছে একটা ছোট কুটির। সেখানে কোনো বৃদ্ধ বাসিন্দার খোঁজ পাবেন ভেবে এগিয়ে গেলেন রিপোর্টার।

কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি, দেখলে বোঝা যায় ৭৫ থেকে ৮০ বছরেব মধ্যে বয়স। লম্বা সাদা চুল, রুপোলি দাড়ি।

বললেন, 'এখানে এসো যুবক। এ জায়গার কিংবদন্তী শুনতে চাও বুঝি? তাহলে আমার হাতের তেলোয় একটা রুপো রাখ, তোমাকে শুনিয়ে দেব সব।'

রিপোর্টার বললেন, 'মাননীয় বাবা, বহু ধন্যবাদ, ঈশ্বরেব দোহাই, যখন আমায় ভালই বাসলেন, দয়া করে আমার কাছে রুপো চাইবেন না। কিন্তু তবু শুনিয়ে দিন আপনার প্রাচীন কিংবদন্তী।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তাহলে বোসো এখানটায়। সান জ্যাসিন্টো রণক্ষেত্রের প্রাচীন কাহিনী শুনিয়ে দিচ্ছি।

'বহু বহু বছর আগে যখন আমার এই পাকা রুপোলি চুলগুলো ছিল কালো, আমার চলাফেরা ছিল তোমার মতোই হালকা আর চটপটে, তেমন এক দিনে আমার মা আমাকে এ-গল্পটা বলেছিল। কত ভাল মনে আছে আমার সে

দিনটা—বিকেলের গোধূলি আলো, গাছের ছায়াগুলো সন্ধ্যে নামার সঙ্গে লম্বা হয়ে পড়ছে। আমার মাথার ওপর হাত রেখে মা বলে চললেন—

* * *

'"খোকা, তোকে আমি সান জাসিন্টোর কিংবদন্তীটা শোনাব। বড় সুন্দর গল্প, আমাকে শুনিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি ছিলেন টেক্সাস রাজ্যের প্রথম স্থায়ী বাসিন্দাদের একজন। আঃ কী মানুষ একটি—ছ'ফুট লম্বা, ওকের ডালের মতো পেশী, আর সিংহের মতো সাহসী। একদিন মনে আছে আমার, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দারুণ একটানা লড়াই করে ঘরে ফিরেছেন। আমাকে যেন মাসি-পিসিদের মতোই আলগোছে হাঁটুতে বসিয়ে আমার বিশাল চেহারার বলিষ্ঠ বাপ বললেন—

'"'শোন্ রে আমার সুয্যিকণা। তোকে আমি সান জাসিন্টোর চমৎকার পুরোনো গল্পটা শোনাই। খুব কম লোকেই এ প্রাচীন কাহিনীটা জানে। শুনলে তোর জ্বলজ্বলে চোখদুটো অবাক হয়ে নাচবে ভুরুর নিচে। আমি শুনেছিলাম আমার খুড়োর কাছ থেকে। খুড়ো বড় অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। যারা তাঁকে জানত, কী ভয়ই না পেত তাঁকে। এক রাতে চাঁদ যখন পশ্চিমে ঢলেছে, বনের মধ্যে বড় পেঁচাগুলো কান্নার সুরে 'হু-হু' করছে, খুড়ো আঙুল তুলে দেখালেন বাইউ'র পাড়ে ওই মস্ত গাছের ঝোপটা, আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস্ করে বললেন: 'ওই গাছগুলো দেখছিস তো খোকা, দেখতে পাচ্ছিস?'

'"'ঘন ঘাসের মধ্যে যে-জায়গাটায় আমরা একা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটা প্রায় অন্ধকার। মাঠের ভেতর দিয়ে হাওয়া ছুটে আসছে আর অদ্ভুত সব আওয়াজ তুলছে।

'"'কোনো নরজীবকে আমি এ-গল্পের একটা কথাও শোনাই নি রে খোকা', বললেন আমার খুড়ো, 'কিন্তু বলতে যে হবেই। শোন্, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার ঠাকুমা আমায় শুনিয়েছিলেন সান জাসিন্টোর কাহিনী। পরদিনই তিনি মরে গেলেন। ঠিক এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে মাঝরাতে শুনিয়েছিলেন গল্পটা। তখন ঝড় উঠেছে, প্রবল হাওয়ার দাপটে আমরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম এই পুরনো ওকগাছটার নিচে। আমার ঠাকুমার চোখদুটো, এমনিতে ঝিমিয়ে-পড়া ক্ষীণজ্যোতি হলেও, তারার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। বয়েস যেন তাঁর পঞ্চাশ বছর কমে গেছে তখন, কাঁপা হাতটা পুরনো যুদ্ধের ময়দানের দিকে তুলে দেখিয়ে বললেন:

'"''"খোকা, অনেক বছর পর এই প্রথম একটা মানুষের জিভ তোকে খুলে বলতে চলেছে সেই গোপন তথ্য, যা এই নীরব মাটি তার চিরন্তন বুকের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। আমি তোকে সান জাসিন্টোর পুরাকাহিনীটা এখন শোনাব

ক যেভাবে আমাকে বলেছিলেন আমার বাবার সৎভাই। চুপচাপ ধরনের খেয়ালি নুষ ছিলেন তিনি, বই পড়তে আর একা পায়চারি করতে ভালবাসতেন। একদিন খি তিনি কাঁদছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে চোখের জল মুছে উনি ধীরকণ্ঠে লেন :

''''''ও, তুই বুঝি, ছোট্কু? আয়, তোকে একটা কথা বলব যা আমি হ বছর হল বুকের মধ্যেই চেপে রেখেছি। এই জায়গাটা সম্পর্কে একটা করুণ আছে, যেটা বলা দরকার। আমার পাশে বোস্, তোকে গল্পটা শোনাই। মি এটা শুনেছিলাম ঠাকুরমা'র দিদির কাছে। সে সব দিনে তিনি ছিলেন ক নামজাদা চরিত্রের মানুষ। কী পরিষ্কার মনে আছে তার কথাগুলো! সুশীলা র মনোরমা মহিলা ছিলেন, তাঁর মধুর বীণাকণ্ঠ যেন আরো হৃদয়গ্রাহী করে লে অদ্ভুত সুন্দর কিংবদন্তী কাহিনীকে।

''''''''কোনো এক সময়," বললেন তিনি, "আমি আমার কাকার সৎবাপের ঙ্গ এই উপত্যকার ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি ই গাছের ঝাড়টার দিকে তাকিয়ে বললেন,

''''''''''সান জাসিন্টোর পুরাকাহিনী কখনো শুনেছ?'

''''''''''নাতো,' বলি আমি।'

''''''''''তোমাকে বলছি, এবার শোনো,' বললেন তিনি, 'অনেক বছর গে আমি যখন বালকমাত্র, আমার বাবা আর আমি বিশ্রাম নেবার জন্য দাঁড়ালাম ই গাছের ছায়ায়। সূর্য সবে ডুবছে। জায়গাটা দেখিয়ে উনি বললেন—

''''''''''''বাছা আমি তো বুড়ো হতে চললাম। তোমাদের সংসারে থাকবও বেশিদিন। এই জায়গাটা সম্বন্ধে একটা পুরনো কাহিনী আছে, মনে হয় টা তোমাকে বলে দেয়াই ভাল। অনেকদিন আগে, তোমার তখন জন্ম হয়নি। মার ঠাকুর্দা একদিন—"'''''''''''

পোস্ট কাগজের রিপোর্টার বলে উঠলেন, 'দেখ হে বুড়ো মুখ্য বাচাল, গল্পটাকে মি টেনে নিয়ে গেছ পন্টিয়াস পাইলেটেরও ছ'শো বছর আগে (খ্রীঃ পূঃ ৬১০)। , পিরামিডের ওপর লেখা শিলালিপির সঙ্গে খবরের কাগজের তফাত বোঝো? মাদের কাগজ খোদাই-ফলক ব্যবহার করে না। তোমার এই তুড়ুকবাজি ংবাদ-বাণিজ্য সংস্থাদের মধ্যে চালালেই পার!'

প্রবীণ সন্ন্যাসী তখন ভ্রূকুটি করে লম্বা কোর্তার তলায় হাত ঢোকাল, আর পোর্টারও ঝাঁ করে লম্বা দিলেন। "হুডু জেন" জাহাজে চড়বার আগে অবশ্য র মর্যাদার ভাবটা ফিরিয়ে এনেছিলেন।

কিন্তু সান জাসিন্টোর যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী তো আছেই এ অঞ্চলে, শুধু সেটা খুঁজে পেলেই হয়!

'The Legend of San Jacinto', হস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

ধাতুর পাতে খোদাই ছবি

হাসপাতালের প্র্যাকটিস ডাক্তার কবেই শেষ করে দিয়েছেন, কিন্তু যখনই সেখানে কোনো বিশেষ আকর্ষণীয় কেস আসে, ওঁর গাড়ির উৎসাহী ঘোড়াগুলোকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে হাসপাতালের ফটকে। এখনো সুদর্শন যুবক তিনি। পেশার জগতে অগ্রগণ্য, প্রচুর আয়। মাত্র ছ'মাস হল বিয়ে করেছেন এক সুন্দরী মেয়েকে, ওঁকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। তাঁর ভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হতেই হয় সবাইকে।

সেদিন যখন বাড়ি ফিরলেন, রাত ন'টাই হবে। আস্তাবলের সহিস ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিল, উনি হালকা পায়ে তরতর করে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলেন। দরজা খুলে যেতেই ডোরিসের বাহু দুটো আলগোছে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরল, তার ভিজে গালে চেপে ধরল ডাক্তারের গালটা।

কাঁপা-কাঁপা অনুযোগের কণ্ঠে ডোরিস বললে 'ও রালফ, এত দেরি করলে তুমি? ঠিক সময়ে তুমি ঘরে না ফিরলে আমি যে কী চিন্তায় পড়ি তা তুমি ভাবেই না। তোমার রাতের খানা গরম করে রেখেছি। তোমার ওই রুগিগুলোর ওপর আমার এমন হিংসে হয়! আমার কাছ থেকে তোমায় এমন করে সরিয়ে রাখে তারা।'

'যা সব দৃশ্য দেখে আসি, তারপর তোমায় এমন তরতাজা মিষ্টি আর স্বাস্থ্যময় দেখে ভালো লাগে'—ওর বালিকাসুলভ মুখের দিকে চেয়ে হাসেন রালফ্—নিজেকে ভালবাসার পাত্র বলে জানেন, তাই একটা উড়ো আত্মবিশ্বাস—'এখন পুষি একটু কফি বানিয়ে দাও, ততক্ষণে ওপরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে আসি।'

খাওয়াদাওয়ার পর লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় আরাম-কেদারায় বসেন। ডোরিসও বসে ওঁর কেদারার হাতলের বিশেষ জায়গাটিতে, উনি চুরুট ধরাবেন বলে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে এগিয়ে দেয়। তাঁকে পেয়ে এখন যেন কত খুশি ডোরিস; প্রত্যেকটা স্পর্শেই আদর, আর ওর প্রত্যেকটা কথার শব্দে সেই টেনে-টেনে আদুরে ভালবাসার সুর যা কোনো নারী শুধু একজন পুরুষের জন্যই ব্যবহার করে—একেক বারে।

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলেন, 'আজ রাতে একজন রুগিকে খোয়ালুম, মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডে মেনিনজাইটিসের কেস্।'

'আমি তোমায় পেয়েও যেন পাই না,' বলে ডোরিস, 'তোমার যত চিন্তা তোমার নিজের ডাক্তারি নিয়ে, ঠিক যখনটা ভাবি তুমি আমার একান্ত আপনার, তখনও।'— দীর্ঘশ্বাস ফেলে— 'হ্যাঁ....ওই তো, যারা ভুগছে তাদের যত্ন করছ, আর আমি চাই তারা সেরে যাক, কিংবা তোমার ওই মস্তিষ্—কী বললে যেন, কী রুগি, তার মতো একেবারে চিরবিশ্রাম নিক।'

ডাক্তার স্ত্রীর হাতে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে চুরুটের ধোঁয়ার মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কেস্‌টাও বেশ অদ্ভুত যেন। সেবেই যেত লোকটা। আমি ওকে সারিয়েও তুলেছিলাম, আর মরল আমারই হাতে, কোনো পূর্ব সংকেত না দিয়েই।..... অকৃতজ্ঞই বলব, না-হলে সুন্দরভাবে চিকিৎসাটা যে করেছিলাম ঠিকই। জাহান্নমে যাক্ সে। আমার ধারণা মরতেই চেয়েছিল লোকটা, কোনো বাজে অর্থহীন রোমান্সের ফলে এমন উদ্বেগ যে জ্বর উঠেছিল মাথায়।'

'রোমান্স'? রালফ্। সবটা বলো আমায়। ভাবো দেখি! হাসপাতালে রোমান্স!'

'আজ সকালে প্রচণ্ড এককেটা খিঁচুনি যন্ত্রণার ফাঁকে-ফাঁকে এক-আধ টুকরো করে ঘটনাটা শোনাচ্ছিল আমায়। পেছনদিকে শরীর চিতিয়ে, মাথা তার গোড়ালি ছোঁয় আর-কি, পাঁজরাগুলো প্রায় ভেঙে যাবার জোগাড়। তবু তার জীবনের খানিকটা কাহিনী শোনাতে পেরেছিল।'

ডাক্তারের স্ত্রী তাঁর কাঁধ আর চেয়ারের মাঝখানে হাত গলিয়ে বলে, 'উঃ কী ভয়ানক!'

ডাক্তার বলতে থাকেন, 'আমি যতটা বুঝে উঠতে পেরেছিলাম, মনে হয় একটি মেয়ে ওকে প্রত্যাখ্যান ক'রে একজন বেশি-পয়সাওয়ালা লোককে বিয়ে করে, আর ওর জীবন থেকে সব আশা আর উৎসাহ নিভে যায়, একেবারে গোল্লায় যায় ও। না, মেয়েটির নাম বলতে ও অস্বীকার করেছে। মেনিনজাইটিস রুগিটির অহংকার ছিল দারুণ। নিজের নামটাও মিথ্যে বলেছিল ফরিশ্‌তার মতো, নার্স্‌কে নিজের ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছিল, আর তার সঙ্গে কথা বলত কোনো রানীর সঙ্গে কথা বলার মতো। মরে যাবাব জন্য তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না, এই আমার বিশ্বাস, কারণ,—কারণ তাকে নিয়ে আমি যা খেটেছি তা প্রায় অসাধ্য সাধনের মতো। যাক্, আজ সকালে তো মারা গেল... একটা ম্যাচ্ জ্বালিয়ে দাও না... ও হ্যাঁ, এই একটা ছোট্ট জিনিস আছে আমার পকেটে, ওর সঙ্গেই কবরে দেবার জন্য বলেছিল। ওর সেই মেয়েটার সঙ্গে এক রাতে নাকি কন্‌সার্টে যাবার জন্য বেরিয়েছিল, বলেছে আমায়, শেষ পর্যন্ত ঠিক করে কন্‌সার্ট শুনতে যাবে না, বরং চাঁদনি রাতে একটু বেড়িয়ে বেড়াবে দুজনে। মেয়েটা ওদের টিকিটটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে, একদিকের অংশটা ওকে দেয়,

বাকিটা রাখে নিজের কাছে। ওর অর্ধেকটা এই ছোট লাল পিস্‌বোর্ডের খন্ড, এতে ছাপা আছে 'প্রবেশ পত্র—'।... দেখো পুষি! পুরনো চেয়ারের হাতলটা বড় পিছলে, ব্যথা পাওনি তো?'

'না রালফ্‌, অত সহজে আমার ব্যথা লাগে না। প্রেম কী বস্তু বলে মনে হয় তোমার, রালফ্‌?'

'প্রেম? ছোট্ট পুষি! প্রেম তো নিঃসন্দেহে এক ধরনের হালকা পাগলামো। মগজের ভারসাম্যের অভাব, যার ফলে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হাম যেমন একটা ব্যারাম, এও তেমনি। কিন্তু এখন অবধি ভাবপ্রবণতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হন না এ ব্যাপারে।'

ছোট লাল টিকিটের আধখানা টুকরো হাতে তুলে সামনে উঁচু করে ধরে ডাক্তারপত্নী।

একটু হেসে বলে, '"প্রবেশ পত্র—" এতক্ষণে বোধহয় লোকটা প্রবেশ পেয়েই গেছে কোথাও, তাই না রালফ্‌?'

'কোথাও',—ডাক্তার নতুন করে চুরুট ধরিয়ে বলেন।

'রালফ্‌ তোমার চুরুট শেষ করে উপরে চলে এস। আমি একটু ক্লান্ত আছি, ওপরেই অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

'ঠিক আছে ছোট্ট পুষি, স্বস্তিতে ঘুমোও।'

উনি চুরুটটা শেষ করলেন, তারপর ধরালেন আরেকটা।

যখন ওপরে গেলেন তখন প্রায় এগারোটা বাজে।

ওঁর স্ত্রীর ঘরের বাতি কম-করে রাখা, পোশাক টোশাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। ডাক্তার যখন ওর পাশে হেঁটে এসে ওর হাতটা তুললেন, একটা ইস্পাতের জিনিস মেঝের ওপর খসে পড়ে ঝন্ করে আওয়াজ তুলল। সাদা মুখখানার মধ্যে একটা গড়িয়ে পড়া লাল ভয়ঙ্কর কিছু দেখে তাঁর রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

বাতির কাছে লাফিয়ে গিয়ে উস্‌কে দিলেন আলো। নিজের ঠোঁট দুটো ফাঁক করে একটা চিৎকার দেবার আগেই মুহূর্তের জন্য রুখে গেলেন। টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা সেই মৃত রুগির আধখানা টিকিটের ওপর নজর গেছে তাঁর। অন্য অর্ধাংশ চমৎকারভাবে জুড়ে রাখা হয়েছে সেটার সঙ্গে, এখন পড়তে পারা যাচ্ছে:

প্রবেশ পত্র	দুজনের জন্য মাত্র

'In Mezzotint, হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

অদ্ভুত ডাক্তারী কেস্

সেদিন বিকেলে, হুস্টন পোস্টের এক রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারই চেনাপরিচিত একজন তরুণ ডাক্তারের। ডাক্তার হুস্টনেরই চিকিৎসক। রিপোর্টার প্রস্তাব করল পাশের এক কাফেতে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা লেমনেড পান করে নেওয়া যাক। ডাক্তার রাজি হতে দুজনে এক নিভৃত কোণে একটা ছোট টেবিল দখল করে বসল, বৈদ্যুতিক পাখার নিচে। ডাক্তারই লেমনেডের দাম মিটিয়ে দিলেন, তারপর রিপোর্টার আলাপের বিষয়টা ঘুরিয়ে আনল ডাক্তারের পেশার প্রসঙ্গে। জিজ্ঞেস করল তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি কোনো অদ্ভুত কেস্ পেয়েছেন কিনা।

ডাক্তার বললেন, 'তা তো পেয়েছি। এমন অনেক কিছু যা আমার পেশাগত শিষ্টাচারে উল্লেখ করা বারণ। আবার আরো কিছু কেস্ আছে যাতে বিশেষ গোপনীয়তার কারণ নেই, তবে এমনিতেই সেগুলো বেশ কৌতূহলজনক। কয়েক হপ্তা আগে এমন একটা কেস্ পেয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল খুবই অস্বাভাবিক। কোনো নাম-ধাম না করে সেটাই আপনাকে শুনিয়ে দিতে পারি বোধ হয়।'

রিপোর্টার বলল, 'বেশ তো, সেটাই বলুন না। আর যতক্ষণ ধরে বলবেন ততক্ষণ আরেক প্রস্থ লেমনেড খাওয়া যাক।'

এ প্রস্তাবে যেন একটু গম্ভীর হলেন তরুণ চিকিৎসক, কিন্তু পকেট হাতড়ে আরেকটা পঁচিশ সেন্ট আঙুলে ঠেকতে, রাজি হয়ে গেলেন।

বলতে শুরু করলেন, 'প্রায় এক হপ্তা আগে আমি আমার দফতরে বসে আছি, একজন রুগি হয়তো আসবে এই আশায়, এমন সময় শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ। মাথা তুলে দেখি একজন সুন্দরী যুবতী কামরায় ঢুকছে। একটা অতি অদ্ভুত চলার ধরন, ওরকম এক মনোহারিণী মহিলার মধ্যে এমনটা তো কখনো দেখিনি। এপাশ থেকে ওপাশ টলে-টলে পড়ছে, একবার একদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে। ওর জন্য যে চেয়ারটা এগিয়ে দিলাম, অত্যন্ত কষ্টকর প্রয়াসে কোনোক্রমে সেটার কাছে পৌঁছুলো। খুবই কমনীয় মুখখানা, কিন্তু তাতে ফুটে উঠেছে করুণ বিষণ্নতা আর দুঃখের আভাস।

'অতি মিষ্টি অথচ কাতর কণ্ঠে সে বলল, "ডাক্তার, আমি আপনাকে আমার এই অবস্থাটা দেখাতে চাই। আর, এ এক অস্বাভাবিক অসুখ তো, তাই আপনাকে একটু কষ্ট করে শুনতে হবে আমার পারিবারিক ইতিহাস—নিঃসন্দেহে আপনার কাছে তা ক্লান্তিকর বক্তৃতা মনে হতে পারে।"

'বললাম, "ম্যাডাম, আমার সময় কেবল আপনারই জন্য। আপনার অসুস্থতার

ওপর আলোকপাত করতে পারে এমন যা-কিছু বলবেন তাতে আমার রোগ-নিরূপণেরই সাহায্য হবে।"

'হেসে আমায় ধন্যবাদ জানালে। সে হাসিতে যেন মুহূর্তের জন্য তার মুখ থেকে বিষাদের রেখাই মুছে গেল।

'বললে, "আমার বাবা ছিলেন পূর্ব-টেক্সাসের এ্যাডাম্‌স্ বংশেরই একজন—এ্যাডাম্‌স্ পরিবারের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন?"

'জবাব দিলাম, "হয়তো শুনেছি, তবে এত পরিবার রয়েছে এ্যাডাম্‌স্ নামের যে—"

"তাতে কিছু যায়-আসে না," হাতটা একটু নেড়ে সে বলেই চলল, "পঞ্চাশ বছর আগে আমার ঠাকুর্দার পরিবার, আর রেডমন্ড নামের আরেক পরিবারের মধ্যে বেধে উঠেছিল তুমুল ঝগড়া— তারাও টেক্সাসের পুরনো বাসিন্দা। রক্তপাত আর বর্বরতার যে ইতিহাস তৈরি হয়েছিল দুপক্ষের মধ্যে, তা নিয়ে বড় বড় বই লেখা যায়। সেই পুরনো কেন্টাকি আর পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আতঙ্ককর লড়াই যেন নতুন করে বাধাল তারা। এ্যাডাম্‌সদের একজন হয়তো বেড়ার আড়াল থেকে কোনো রেডমণ্ডকে পেছনে গুলি করে মারল, যখন সে টেবিলে খেতে বসেছে, কিংবা চার্চে বা অন্য কোথাও গেছে; আবার রেডমণ্ডদের কেউ হয়তো ওইভাবেই কোনো এ্যাডাম্‌সকে খুন করল। দু'বংশের মধ্যে এমন প্রচণ্ড ঘৃণা যে কল্পনাও করা যায় না। এ ওর কুয়োর জলে বিষ মেশাচ্ছে, পরস্পরের গরুঘোড়া মারছে, আর যদি দৈবাৎ কোনো এ্যাডামস্ আর রেডমন্ডের মুখোমুখি দেখা হল, তো একজনই শুধু জায়গা ছেড়ে যাবে শেষ অবধি। সবে কথা বলতে-শিখেছে এমন বাচ্চাকেও তার পরিবার শেখাবে অন্য পরিবারের শিশুকে ঘেন্না করতে, তাই শত্রুতার উত্তরাধিকার নেমে আসে বাপ থেকে ছেলেতে, মা থেকে মেয়েতে। তিরিশ বছর ধরে এই যুদ্ধই চলল দু'পক্ষের মধ্যে, মৃত্যুবর্ষী রাইফেল আর বিভলবারের দাপটে তাদের বংশের লোকজনই গেল কমে, অবশেষে কুড়ি বছর আগে তাদের পরিবার দুটোতে রইল মাত্র একজন করে প্রতিনিধি—লেমুয়েল এ্যাডামস্ আর লুইজা রেডমণ্ড। ওরা দুজনেই যুবক-যুবতী, দেখতেও সুন্দর। প্রথম দেখাতেই ওরা পরিবারের পুরনো রেষারেষি ভুলে গেল, পরস্পরকে ভালবেসে ফেলল। অবিলম্বে বিয়ে করল তারা, এ্যাডামস্-রেডমন্ডদের মহা বিবাদ মিটে গেল চিরতরে। কিন্তু, স্যর, দুঃখের কথা যে এত বছরের একটানা কলহ আর ঘৃণার উত্তরাধিকার বুঝি নিয়তির মতো উল্টে এসে পড়ল একটি নির্দোষ বিড়ম্বিত প্রাণীর ওপর।"

'"ওই বিবাহের সন্তান আমি, অথচ এ্যাডামস্-রেডমণ্ড রক্ত বুঝি কোনোদিনও মিশ খাবে না। একেবারে শিশু বয়েসে আমি ছিলাম অন্য বাচ্চাদেরই মতো,

এমনকি সবাই মনে করত আমি অসাধারণ রকম আকর্ষণীয়।"

'আমিও ফস্ করে বলে ফেললাম, "সেটা তো আমি ভালই দেখতে পাচ্ছি ম্যাডাম।"

'মহিলা এতে সামান্য লাল হয়ে উঠে ফের বলতে লাগল, "যতই বড় হতে লাগলাম, একটা আজব ধরনের বিবাদী আর উল্টোপাল্টা আবেগ মাঝেমাঝে আমায় পেয়ে বসতে লাগল। যা কিছুই ভাবি, বা যা করতে যাই, তারই বিপরীত কিছু এসে যায় আমার মধ্যে। বংশানুক্রমিক বৈরিতারই ফল ওটা। আমার অর্ধেকটা এ্যাডাম্‌স, বাকি অর্ধেক তো রেডমণ্ড। কোনো একটা জিনিসের দিকে যদি তাকাতে চেষ্টা করি, তো আমার আর একটা চোখ তাকিয়ে থাকবে অন্যদিকে। খাবার সময় যদি আলুতে নুন মাখাতে চাই, অন্য হাতটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গিয়ে চিনি ঢেলে দেবে তাতে।

' "কত-শতবার পিয়ানো বাজাতে বসে আমার একটি হাত যখন বীঠোফেনের 'সোনাটা'র চমৎকার সুরটা বাজাতে গেছে, অন্য হাতটাকে আর রুখতে পারিনি, সেটা দুমদাম করে বাজিয়ে চলেছে 'ওভার দ' গার্ডেন ওয়ল' কিংবা 'দ' স্কিডমোর গার্ড্স'। এ্যাডাম্‌স আর রেডমন্ড রক্ত কখনোই মিলেমিশে বইবে না শরীরে। কোনো আইসক্রীমের দোকানে ঢুকে হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভ্যানিলা ক্রীমেরই অর্ডার দিয়ে বসলাম, অথচ তখন আমার প্রাণ হাহাকার করছে লেমনের জন্য। অনেক সময় রাতে শুতে যাবার সময় প্রাণপণ চেষ্টায় জামাকাপড় খুলতে চেষ্টা করছি কিন্তু বিপরীত প্রভাবটা এত বেশি যে শেষ অবধি পরে ফেললাম আমার চমৎকার মিহি জাঁকজমক পোশাকগুলো, আর ওগুলো পরেই জুতো পায়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কখনো এমন ধরনের কেস্ পেয়েছেন কী, ডাক্তার?'

'বলি, "না তো, কখনো দেখিনি। সত্যিই অসাধারণ। উল্টো ঝোঁকগুলো কিছুতেই সংযত করে উঠতে পারেননি বলছেন?"

' "ও হ্যাঁ। অনবরত চেষ্টা আর দিনের পর দিন ব্যায়াম করে এখন এতটা সফল হয়েছি যে শুধু একটা ব্যাপারেই জটিলতা রয়ে গেছে। এই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এরকম প্রভাব থেকে এখন আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার চলার গতিটা এখনো আক্রান্ত। আমার শরীরের নিম্‌-নিম্নাংশটা চলাফেরার মধ্যে একসঙ্গে একতালে মিল রাখতে পারছে না। যদি কোনো বিশেষ দিকে হেঁটে যেতে চাই, একটি... একটি হয়তো আমার ইচ্ছে অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে, কিন্তু অন্যটি যেতে চাইবে একেবারে উল্টো পথে। মনে হয় যেন দুটো পা...পায়ের একটা হল এ্যাডাম্‌স, অন্যটা রেডমণ্ড। হ্যাঁ, একবারই শুধু দুটো সম্পূর্ণ একমতে চলে যখন বাইসিকেলে চড়ি। তখন তো একটা ওপরে উঠলে অন্যটা নেমে যাবেই, ফলে তাদের বিপরীত চাল সত্ত্বেও আমি ঠিকই এগিয়ে যাই। কিন্তু হাঁটতে চেষ্টা করলে আমার হয়

চরম দুর্গতি. ওরা আমার বাধ্য হয়ে থাকে না। আমাকে তো দেখেছিলেন এই ঘরে ঢুকতে। আমার জন্য কিছু করতে পারবেন ডাক্তার?"

'আমি বললাম, "আপনার কেস্‌টা বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত। আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করব। আপনি বরং কাল দশটার সময় আসুন, আমি আপনাকে প্রেস্‌ক্রিপশন দেব।"

'সে চেয়ার থেকে উঠলে, আমি তাকে ধরে-ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম। নিচেই অপেক্ষা করছিল গাড়িটা। আমি জীবনে কখনো এমন হাত-পা ছড়ানো. কুদর্শন, উদ্ভট হাঁটা কারুর দেখিনি।

'সে রাতে অনেকক্ষণ অবধি বসে-বসে ওর অসুখটা নিয়ে চিন্তা করেছি, 'লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া' (দৈহিক চলাফেরার বিকলন) নিয়ে প্রামাণিক কেতাবপত্র ঘাঁটলাম, অথবা পেশীসংক্রান্ত পীড়া ব্যাপারে যা হাতের কাছে পেলাম। মেয়েটির কেস্ সম্পর্কে পুরো কথা বলেছে এমন কিছু পেলাম না। তাই প্রায় মাঝরাতে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পাব এই আশায়। আমার চেনাজানা এক বুড়ো জার্মানের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর সঙ্গে একটু কথা বলব ভেবে ঢুকে পড়লাম তার দোকানে। কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছিলাম সে একজোড়া পোষা হরিণকে দৌড় করায় তার পেছনের খোঁয়াড়ে। ও দুটোর কথা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। বললে, ওরা দুটিতে লড়াই ঝগড়া করত, কিছুতেই একসঙ্গে মিলে মিশে থাকত না বলে দুটিকে আলাদা করে দিয়েছে, আলাদা-আলাদা খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে গেল আমার মাথায়।

'পরদিন সকাল দশটার সময় মহিলা এল আমার দফ্‌তরে। আমি ওর জন্য একটা প্রেস্‌ক্রিপশন তৈরি করেই রেখেছিলাম। ওটা দিলাম, সে পড়ল— মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে, এই বুঝি রেগে গেল মনে হল।

'বললাম, "এটা পরখ করে দেখুন, ম্যাডাম।"

'সে পরীক্ষা করতে রাজি হল—আর তাকে কাল দেখলাম প্রকাশ্য রাস্তায়, শহরের অন্য যে-কোনো মহিলার মতোই অনায়াসে স্বাভাবিক সৌষ্ঠবে হেঁটে যাচ্ছে।'

রিপোর্টার জিজ্ঞেস করে, "আপনার নিদানপত্রটা কী ছিল?"

'স্রেফ একজোড়া "ব্লুমার" (ডিভাইডেড স্কার্ট) পরার জন্য পরামর্শ।'— বললেন তরুণ ডাক্তার, 'বুঝলেন না. দুটি বিরুদ্ধ পক্ষকে আলাদা করে তাদের সমন্বয় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ্যাডাম্‌স আর রেডমণ্ড বিভাগ দুটো আর সংঘর্ষে মাতে না এখন, তাই রোগিণীর নিরাময়ও সম্পূর্ণ। দাঁড়ান দেখি,...' ফের বলতে থাকেন ডাক্তার—'এখন তো প্রায় সাড়ে সাতটা. ওর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে

ঠিক আটটার সময়। আপনাকে চুপি-চুপি বলি তা হলে, ও নিজের পদবি বদল করে আমার পদবি নিতে রাজি—খুব শিগগিরই। আপনাকে যা বললাম তা আবার কারুর কাছে বলতে যাবেন না নিশ্চয়!'

রিপোর্টার বললে, 'তা তো বটেই, বলব না। কিন্তু আরেকটা লেমনেড—'

'না, না, ধন্যবাদ!' তড়বড়িয়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার, 'এবার আমায় যেতে হয়। শুভ সন্ধ্যা, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা করব আপনার সঙ্গে।'

A Strange Case. হস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

ডিয়ারটন ভিলা

।। দক্ষিণের কাহিনী ।।

[দক্ষিণী যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ও আচারব্যবহার নিয়ে এই গল্পটি বোস্টনের এক সংবাদপত্র-ঘোষিত শ্রেষ্ঠ গল্পের পুরস্কার পায়। লিখেছিলেন বোস্টনেরই কোনো যুবতী—শহরের কোনো উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। দক্ষিণে তিনি কোনোদিনই যাননি, কিন্তু যেভাবে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের যথাযথ বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণ করেছেন তাতে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় দেখতে পাওয়া যায় শ্রীমতী হ্যারিয়েট বীচার স্টো, অ্যালবিয়ন টুরগি ইত্যাদি দক্ষিণী জীবনের নামকরা বিবৃতিকারদের রচনার সঙ্গে। যাঁরা দক্ষিণে বসবাস করেন তাঁরা দেখলেই চিনে যাবেন দক্ষিনী টাইপ-চারিত্রের অবিকল চিত্রায়ণ আর দক্ষিণের আবাদমালিকদের জীবনের বাস্তব বর্ণনা।]—লেখক।

* * *

'তুমি তা'হলে যাচ্ছ, পেনিলোপী?'—জিজ্ঞেস করে সাইরাস।

'এ তো আমার কর্তব্য', বলি আমি, 'একটা মহান্ কাজে টেক্সাসে চলেছি, দেখি ওখানকার তমসা কবলিত বাসিন্দাদের মধ্যে কী আলো পৌঁছে দিতে পারি। যে স্কুলটা আমায় দায়িত্ব দিয়েছে তারা মাইনে তো ভালই দেবে। আমিও সুখী হব যদি ও-অঞ্চলের বর্বর মানুষগুলোকে আমাদের সংস্কৃতি ও সুরুচির কিছুটা অন্তত দিতে পারি।'

'তা হলে বিদায়,'—সাইরাস হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে।

ওকে এমন আবেগপরায়ণ হয়ে উঠতে আগে কখনো দেখিনি। এক সেকেণ্ড

ওর হাতটা হাতে রেখেই ট্রেনে উঠে পড়ি, এই ট্রেনই আমাকে আমার নতুন কর্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে।

বিয়ে করব বলে আজ পনের বছর হল সাইরাস্ আর আমি বাগ্‌দত্ত। ও মাসাচুসেট্‌স্ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। আমিও টেক্সাসের এক ছোট শহরে একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়িয়ে মাসে চল্লিশ ডলার পাব, তাই প্রস্তাবটা স্বীকার করে নিয়েছি। সাইরাস্ মাসে কুড়ি ডলার পায় তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে। আমার প্রতীক্ষায় ও পনের বছর কাটিয়েছে, যাতে দুজনে মিলে যথেষ্ট উপায় করলে ও আমায় বিয়ে করতে পারে। টেক্সাসের এই সুযোগটা তাই হাতছাড়া করিনি, ঠিক করেছি মিতব্যয় করে চালাব। আরো পনের বছরে, যদি স্কুলটা অতদিন ধরে রাখতে পারি, তবে আমাদের বিয়ে হবে।

খোরাকি, থাকার খরচা, আমার কিছুই লাগবে না, কারণ ডি'ভিয়াররা দক্ষিণ অঞ্চলে সবচেয়ে প্রাচীন একটা বনেদী বংশ—তাঁরাই আমাকে নিজেদের ভবনে ঠাঁই দিচ্ছেন। ওঁদের পরিবারে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, তাই ওরা যে ছোট স্কুলটিতে পড়ে সেখানে একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

যে স্টেশনে নামলাম তার নাম হুস্টন। দেখলাম সেখানে একদল লোক অপেক্ষা করছে আমাকে ভিয়ারটনে পৌঁছে দেবার জন্য। এখান থেকে ছ'মাইল দূরে একটা ছোট শহর ভিয়ারটন—ওখানেই আমার যাবার কথা।

গাড়ির চালক এক কালো মানুষ, আমার কাছে এগিয়ে এসে সসম্মানে জানতে চাইল আমিই মিস্ কুক কিনা। গাড়িতেই আমার ট্রাঙ্কখানা রাখা হল। একটা পুরনো ঝরঝরে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি, জরাজীর্ণ একজোড়া খচ্চরে টানা। আমি উঠে বসি চালকের পাশে। বলে, ওর নাম পিট।

একটা ছায়াভরা রাস্তা দিয়ে চলবার সময়, পিট হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, এমন ফোঁপাতে লাগল যেন ওর বুক যন্ত্রণায় ভেঙে যাচ্ছে।

বললাম, 'বন্ধু, তোমার কী হয়েছে তা আমাকে বলবে না?'

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে বললে, 'রাস্তার দুইপাশে ঝোলা শেকলের একটা ভাঙা কড়া (লিঙ্ক) নজরে পড়ে গেল, আর মনে পড়ল মাসা লিঙ্কানের (মাস্টার লিঙ্কন) কথা। উনি তো স্বগ্‌গে আছেন, আমাদের গরিব দাসদের জন্য স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।'

বললাম, 'পিট, কেঁদো না। ওপরে ঈশ্বরের ভবনে তোমার দেবতুল্য মুক্তিদাতা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। স্বর্গের দূতদের মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কনই সবচেয়ে উজ্জ্বল গৌরবমুকুটটা পরে গান গাইছেন।'

আমি পিটের কাঁধের ওপর আস্তে করে হাত রাখলাম।

দরিদ্র নরম-প্রাণ কৃতজ্ঞ লোকটার কালো চামড়ার নিচে রয়েছে সাদা তুষারের মতোই পবিত্র একটা হৃদয়। শহীদ লিঙ্কনের কথা স্মরণ করে সে এখনো ফুঁপিয়ে চলেছে। আমি তার মাথাটা টেনে নিলাম নিজের বুকে, সেভাবেই হু-হু করে অবারিত কেঁদে চলল সে, আর আমি নিজেই বাকি রাস্তাটা গাড়ি চালিয়ে এগোলাম ভিয়ারটনের দিকে।

* * *

দক্ষিণী গৃহের জ্বলজ্যান্ত একটি নমুনা হল ভিয়ারটন। আমি আগেই খবর পেয়েছিলাম বিদ্রোহের আমলে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হলেও ডি'ভিয়ার পরিবারটি এখনো অতি ধনী, তাঁরা এখনো প্রকৃত অভিজাত আবাদমালিকের ঠাট বজায় রেখেই বসবাস করেন।

বাড়িটা দোতলা, চতুষ্কোণ, সামনে বড় বড় সাদা থাম। সারা বাড়ি ঘিরেই চওড়া বারান্দা, গা বেয়ে উঠেছে আইভিলতা আর হানিসাক্লের ঘন কুঞ্জ।

আমি 'অ্যাম্বুলেন্স' থেকে নেমেই শুনলাম একদফা বক্‌বকানি, দেখি সামনের দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে একটা মস্ত খচ্চর, পেছনে ঝাঁটা হাতে তাড়া করে আসছেন এক মহিলা। খচ্চরটা বারান্দাতে শুয়ে পড়ল, আর মহিলা এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

মৃদু অস্পষ্ট উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই বুঝি মিস্ কুক?' মাথা নোয়ালাম।

বললেন, 'আমি মিসেস ডি'ভিয়ার। ভেতরে এসো, খেয়াল রাখবে হতভাগা খচ্চরটার দিকে। কিছুতেই বাড়ি থেকে বের করতে পারছি না।'

বসবার ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে চারদিকটা দেখি। কামরাটায় দামি-দামি আসবাব, কিন্তু সর্বত্রই নজরে পড়ে দক্ষিণসুলভ ছন্নছাড়া ফেলা-ছড়া ভাব। এক কোণে একটা ঠেলাগাড়ি, শুকনো চুনসুরকি ভরা, মিস্ত্রিরা বাড়ি তৈরি করার সময় থেকে ওখানেই পড়ে রয়েছে। পিয়ানোর ওপর দু-দুটো মুরগি বসে ঝিমোচ্ছে, একজোড়া পাতলুন ঝুলছে ঝাড়বাতিটার ওপর।

মিসেস ডি'ভিয়ারের মুখখানা আভিজাত্যব্যঞ্জক, পাংশু, গ্রীকসুলভ নাকমুখের খাঁজ। তুষারধবল চুল সযত্নে বেঁধে শোভন অঙ্গুরি করা। তাঁর পরনে কালো সাটিন পোশাক, হাতে গলায় পরেছেন ঝিকমিকে হীরার গয়না। চোখে কালো, সূচি-প্রখর দৃষ্টি, ভুরু দুটো ঘনকালচে। আমি আসনে বসতে উনি একটা কার্ডরাখা রুপোর থালা থেকে লম্বা এক চিলতে ঠাসা-তামাক তুলে মুখে পুরে চিবোন।

হেসে প্রশ্ন করেন—'তোমারও চলে নাকি?'

আমি মাথা নাড়ি।

জবাব দেন, 'না খেলে নিকুচি করেছে।'

ঠিক তখুনি একটা ঘোড়া ছুটে এল বারান্দায়—কিংবা গ্যালারিতে, টেক্সাসে যেমন বলে। কেউ ঘোড়া থেকে নেমে কামরায় এসে ঢুকল।

* * *

অব্রি ডি'ভিয়ারকে প্রথম দর্শন করার ঘটনাটা আমি কখনোই ভুলব না। লম্বায় পুরো সাত ফুট, মুখমণ্ডল নিখুঁত। একেবারে হুবহু আন্দ্রিয়া-দেল-সার্তোর আঁকা যুবক 'সেন্ট জনের' প্রতিমূর্তি। তার চোখ দুটো আয়ত, কালো, দিশাহারা বিষণ্ণতায় ভরা। পাংশু, সম্ভ্রান্ত মুখের আদল আর উঁচু-সমাজের মেজাজ দেখলেই চিনে নেওয়া যায় তার সুদীর্ঘ বনেদী বংশধারার ছাপ।

অত্যাধুনিক কাটের ড্রেস-স্যুট পরনে, কিন্তু দেখলাম তার পায়ে জুতো নেই, আর মুখের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘন-বাদামি তামাকের রসের ধারা।

প্রকাণ্ড একটা মেক্সিকান 'চুড়োটুপি' দিয়েছে মাথায়। কোনো শার্ট পরেনি, কিন্তু চওড়া বুক থেকে পেছনদিকে ঠেলে দেয়া ড্রেস্ স্যুটের নিচে উঁকি দিচ্ছে একটা বিশাল ঝক্‌মকে হীরা—পাতলা গেঞ্জির জালের মধ্যে আটকানো একটা টোন সুতোর টুকরো দিয়ে বাঁধা।

মিসেস্ ডি'ভিয়ার অলস কণ্ঠে বললেন, 'এ আমার ছেলে অব্রে; আর ইনি মিস্ কুক।'

মিঃ ডি'ভিয়াব মুখ থেকে এক দলা তামাক বের করে ছুঁড়ে দিল পিয়ানোর পেছনে।

গভীর উদাত্ত ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠে বলল, 'ধরে নিতে পারি আপনিই সেই মহিলা—আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার যিনি দয়া করে নিতে রাজি হয়েছেন?'

আমি মাথাটা কাত করলাম।

সুন্দবপানা মুখে একটা আঁধার ভ্রূকুটি জাগল—'আপনাদের দেশের লোকদের তো জানি। এখনো তারা কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকার ঐতিহ্য হাতড়ে চলেছে। জেফারসন ডেভিস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে সোজাই তার চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, 'সে তো ছিল বেইমান।'

মিঃ ডি'ভিয়ার খল্‌খল করে হেসে, ঝুঁকে পড়ে পায়ের ডগা থেকে একটা পাইনের চিলতে খুঁটে বের করল। তারপর মায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল বীরোচিত শ্রদ্ধা দেখিয়ে। এ কায়দা আর ভদ্রতা এখনো রয়ে গেছে দক্ষিণের সন্তানদের মধ্যে।

বলল, 'রাতের ভোজনে আমরা কী খাব মা-মণি?'

'যা ছাইভস্ম খুশি খাবি।' বললেন মিসেস ডি'ভিয়ার।

অব্রে ডি'ভিয়ার হাত বাড়িয়ে পিয়ানোর ওপর থেকে একটা ঘুমন্ত মুরগি তুলে নিল। মুরগির গলা মুচড়ে দিয়ে ওটার কাঁপা ছট্‌ফটে দেহটা ছুঁড়ে দিল মিহি 'ব্রাসেল্‌স' গালিচার ওপরে। তারপর লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়াল আমার সামনে, যেন প্রতিশোধকামী দেবতার মতো আকাশের মাথা ছুঁয়ে। একহাত শূন্যে তুলে, অন্য হাতে মৃত্যুযাতনায় ছটফট করতে থাকা মুরগিটার দিকে দেখাল।

বজ্রকণ্ঠে বলল, 'ওই হল দক্ষিণভূমি। গেটিসবার্গের পতনের পর রক্তঝরা মুমূর্ষু দক্ষিণ। আজ রাতে ওটার মরদেহ ভোজন করবেন, যেমন গত তিরিশ বছর ধরে আপনার স্বদেশীয়রা করে আসছে।'

মুরগির মাথাটা সে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলে, ভয়ংকর শপথ তুলে, আর তারপরেই এক হাঁটু মুড়ে বসে তার রাজকীয় মাথাটা নত করলে। বললে, 'ক্ষমা করুন মিস্ কুক। আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি। আজ থেকে ঠিক আটাশ বছর আগে এই দিনে আমার বাবা নিহত হয়েছিলেন ''শিলো''র যুদ্ধে।'

* * *

খাবারের ঘন্টা বেজে উঠতে আমাকে ডাকা হল একটা লম্বা উঁচু কামরায়, কাল্‌চে ওককাঠের দেয়াল, প্যারাফিন বাতির আলোয় আলোকিত।

টেবিলের এক প্রান্তে বসে অব্রে ডি'ভিয়ার রান্না মাংস কেটে ভাগ করছে। কোটখানা খুলে নিয়েছে সে, আঁটসাট গেঞ্জিতে তার বুকের প্রত্যেকটি পেশী প্রকট, রোমের ভ্যাটিকানের ছবি সেই ''মুমূর্ষু মল্লযোদ্ধা''র মতো। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা একেবারে খাঁটি দক্ষিণী। একদিকে রয়েছে বিকশিত দন্ত বড়ো বুনো-পোসাম্ আর মিষ্টি আলু। আর টেবিল জুড়ে ডিশ—তাতে বাঁধাকপি, ভাজা মুরগি, ফ্রুটকেক, খেজুর, গরম বিস্কুট, কালোজাম, ভাজা মাগুরমাছ, মেপলের সরবত, হালুয়া, আইসক্রিম, সসেজ, কলা, মুচমুচে রুটি, আনারস, স্কোয়াশ, বুনো আঙুর আর আপেল-পিঠে।

পিট্, কালো লোকটা, তদারক করছিল আমাদের। একবার মিঃ ডি'ভিয়ারকে ঝোলের বাটি এগিয়ে দিতে গিয়ে সে খানিকটা ঝোল ফেলে দিল টেবিলক্লথের ওপর। বাঘের মতো তীব্র চিৎকার করে অব্রে ডি'ভিয়ার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, পিটের বুকের ওপর মাংস কাটা ছুরিটা ছুঁড়ে দিল। বাঁট অবধি বসে গেছে ছুরিটা। বেচারি কালো মানুষটা পড়ে গেল মেঝেতে। আমি ছুটে গিয়ে তার মাথাটা তুলে ধরলাম।

সে ফিসফিস করে বললে, 'বিদায় মিসিবাবা। দেবদূতদের গান শুনতে পাইছি, দেখতেছি ধন্য কর্তা আব্রাহাম লিঙ্কাম্‌রে—মস্ত সাদা সিঙ্গাসনের কাছ থেইকে

হাসতেছেন আমার দিকে চে'য়ে। বিদায় মিসি, বুড়া পিট্ চললা এবার ঘর।'

আমি উঠে মুখোমুখি হলাম ডি'ভিয়ারের।

'অমানুষ রাক্ষস! তুমি খুন করেছ একে!'—চেঁচিয়ে উঠলাম। সে একটা রুপোর ঘন্টা ছুঁতেই আরেকজন ভৃত্য চলে এল। হুকুম দিল, 'এ লাশটা বাইরে নিয়ে যাও, আর আমার জন্য একটা পরিষ্কার ছুরি নিয়ে এস।...মিস্ কুক, নিজের আসনে বসুন। আপনাদের সমস্ত স্বদেশবাসীর মতো আপনিও দেখছি কালো মাংসের দিকে ঝোঁক দেখাচ্ছেন। মামণি, পোসামের একটা বাছাই টুকরো ওপাশে ঠেলে দেব নাকি?'

* * *

পরদিন আমার সাক্ষাৎ হল ডি'ভিয়ারদের চারটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে। দেখলাম বেশ বুদ্ধিমান ওরা, মনে প্রীতির উদ্রেক করে। দুটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে, বয়েস দশ থেকে ষোলোর মধ্যে। একটা সুন্দর গ্রাম্য রাস্তা ধরে আধমাইলটাক গেলে স্কুলের ছোট বাড়িটা। ঘাস আর ফুলে ছাওয়া। পনেরজন ছাত্রছাত্রী আমার স্কুলে। কেবল দু'টো-একটা ব্যাপার ছাড়া ভিয়ারটনের জীবন হয়তো স্বর্গই হয়ে উঠতে পারত। প্রথম মাসেই জমিয়েছিলাম বিয়াল্লিশ ডলার। মাইনে তো আমার চল্লিশ ডলার, আর দুটো ডলার উপায় করেছিলাম আমার ছাত্রদের কিছু সাময়িক ধার দিয়ে—যার জন্য ওরা আমায় দশ থেকে পঁচিশ সেন্ট অবধি সুদ দেয়।

অব্রে ডি'ভিয়ারের চরিত্রটা বোঝার জন্য আমার ছিল এক কৌতূহলী আকর্ষণ। ওর মতো উন্নত মন আর চমৎকার স্বভাব আগে কারুর দেখিনি, কিন্তু এতকাল যাদের সঙ্গে ও বসবাস করেছে তাদের রীতিনীতি ঐতিহ্যের প্রভাবে ওর সেই স্বাভাবিক সুকুমারবৃত্তির আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট রইল না।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমতো ভাল শিক্ষা পেয়েছিল সে। কৃতী সুবক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী; কিন্তু প্রথম শৈশবকাল থেকেই তাকে আস্কারা দেওয়া হত প্রতিটি আবেগ আর ইচ্ছার জোয়ারে ভেসে যেতে। ওর পুরুষত্বের মধ্যে তাই দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় আত্মসংযমের অভাব।

এক সন্ধ্যায় আমি ডি'ভিয়ার-ভবনের দোতলায় সঙ্গীতঘরে বসে পিয়ানোতে শুবার্টের একটা চমৎকার স্বরলিপি তুলছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল অব্রে ডি'ভিয়ার। ইদানীং কোনো বিশেষ আজব খেয়ালে সে নিজের পোশাক পরিচ্ছদের দিকে বেশি নজর দিয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় একটা শার্ট পরেছে, বুকটা একেবারে খোলা, ভারী কাঁধের কণ্ঠাস্থি প্রকট। একটা কালো মখমলের পাইপ-জ্যাকেট, জরির কাজ করা খেয়ালি নকশা তাতে। দু'হাতে পরেছে সাদা নরম চামড়ার দস্তানা।

আর লক্ষ্য করলাম, যে-পায়ে সে একেবারেই জুতো গলাতে চায় না সে দুটো সম্প্রতি কলের জলে ধুয়েছে। এখন সে রয়েছে তার তিক্ত নাক-সিঁটকোনো মেজাজের সপ্তমে। একরাশ অতি বদখত গালিগালাজ ঝাড়ল গ্র্যান্ট, লিঙ্কন, জর্জ ফ্রান্সিস ট্রেইন এবং ইউনিয়নের অন্য বীরদের উদ্দেশে। মাঝখানের নিচু টেবিলের উপর বসে এক পায়ের ডগা দিয়ে অন্য পায়ের গোড়ালি চুলকোতে শুরু করেছে, জেনে শুনে যে এমন ব্যবহারে আমার সর্বদাই প্রচণ্ড বিরক্তি জাগে।

তবু রেগে উঠব না বলেই ঠিক করেছি। বাজিয়েই চলি এক নাগাড়ে। হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'মাফ করবেন, মিস্ কুক, ওই কোমল স্বরের সপ্তমে টেনে নিতে গিয়ে আপনি ভুল চাবিতে ঘা দিয়ে বসেছেন।'

জবাব দিলাম, 'আমার তা মনে হয় না।'

'আপনি মিথ্যেবাদী!' জবাব দেয় সে, 'যেখানে উঁচু ধ্বনি হবার কথা সেখানে মধ্যস্বরের চাবিতে ঘা দিয়েছেন। আপনার বাজানো উচিত ছিল এইটে—'

কী যেন একটা 'সুশ্' করে হাওয়ায় উড়ে গেল শুনলাম। মাঝখানের টেবিলটায় যেখানে সে বসেছিল, সেখান থেকেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে তামাকের রসের একটা আস্ত দলা—সোজা নির্ঘাৎ লক্ষ্যে—পিয়ানোর মুদারা 'ধা'-এর কালো চাবির ওপর। আমি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কাঁটাটা বিঁধলেও মুখে হাসি রেখেছি।

উপহাসভরে সে বলল, 'আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাদের দক্ষিণী চালচলন আপনার পছন্দ নয়। আমাকে মনে করেন একটা বদমাশ। আপনার ধারণা আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, শিষ্টাচার নেই। আপনার বোস্টনী সংস্কৃতি নিয়ে ভাবেন আমাদের ভদ্রতার মধ্যে 'ভুল সুরেব' খুঁত ধরবেন, আমাদের ব্যবহারে সুরুচি আর সূক্ষ্মতার অভাব খুঁজে বের করবেন। অস্বীকার করবেন না এটা।'

আমি শীতলকণ্ঠে বলি, 'মিঃ ডি'ভিয়ার, আপনার ব্যঙ্গবিদ্রূপে আমার কিছুই যায়-আসে না। আমি এখানে কর্তব্য করতে এসেছি। আপনার নিজের বাড়িতে আপনি যেমন খুশি আচরণ অবাধে করতে পারেন। আপনার পা-টা দয়া করে একটু সরাবেন কি? আমায় যেতে দিন।'

মিঃ ডি'ভিয়ার হঠাৎ টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমায় তার দু'বাহুর মধ্যে ভয়ানকভাবে আঁকড়ে ধরল। ভীষণ বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেনিলোপী, তোমায় আমি ভালবাসি! একটা অপদার্থ ক্ষুদে শুকনো কাঠ, তবু—দুব্‌লাপাতলা ফ্যাকাশে গাল-বসা রসকষহীন হাড়গিলে ইয়াঙ্কি স্কুল মাস্টারনী হলেও সেই প্রথম দিন দেখার মুহূর্ত থেকে তোমায় ভালবেসেছি। আমায় বিয়ে করবে?'

আমি মুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ লড়ি। চিৎকার করে বলি, 'আমায় ছেড়ে দাও। উঃ, সাইরাস্ যদি আজ এখানে থাকত!'

'সাইরাস! কে সাইরাস?'— চেঁচায় ডি'ভিয়ার, 'কোনো সাইরাস্ কখনো পাবে না তোমায়, বলে দিচ্ছি।'

আমাকে সে একহাতে তার মাথার ওপর তুলল, আর সোজা ছুঁড়ে দিল কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে নিচের উঠোনের মধ্যে। তারপর একটা-একটা করে ঘরের আসবাবপত্রগুলো ছুড়তে লাগল আমার ওপর, সবশেষে পিয়ানোখানা। তারপর শুনতে পেলাম সে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে আসছে। মুহূর্তে টের পেলাম ভাঙা আসবাবের ভেতর দিয়ে কোনো তরল পদার্থের ধারা ঝরে পড়ছে। পেট্রোলের উগ্রগন্ধ আমি চিনি। একটা ম্যাচকাঠি ঘষার আওয়াজও যেন শুনলাম। তারপর দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে আগুন; হঠাৎ একটা তীব্র উত্তাপ অনুভব করি, তারপর আর কিছু মনে নেই।

* * *

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, দেখি নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছি, আর মিসেস ডি'ভিয়ার পাশে বসে বাতাস করছেন আমায়। উঠবার চেষ্টা করি, কিন্তু বড় দুর্বল বোধ হয় নিজেকে।

মিসেস্ ডি'ভিয়ার মৃদু কণ্ঠে বলেন, 'তুমি একটু স্থির হয়ে থাক। দু'হপ্তা হল জ্বরে পড়ে আছ। আমার ছেলেটাকে তুমি মাফ করে দিও। তোমাকে ও খুবই ভালবাসে, কিন্তু বড্ড আবেগপ্রবণ তো!'

'কোথায় সে?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'ও গেছে সাইরাস্‌কে আনতে—আসার তো সময়ও হয়ে গেল।'

'ওই ভয়ানক আগুন থেকে কী ভাবে বাঁচলাম আমি?'

'অব্রে তোমায় উদ্ধার করেছিল। ওর আবেগের ঝোঁকটা কেটে যেতেই ছুটে যায় জ্বলন্ত আসবাবগুলো সরাতে, তারপর তোমায় তুলে নিয়ে ফিরে আসে ওপরতলায়।'

কয়েক মিনিট বাদে শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ। চোখ তুলে দেখি অব্রে ডি'ভিয়ার আর সাইরাস পট্‌স্ আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। আমি কেঁদে উঠি 'সাইরাস!' বলে।

সাইরাস বলল, 'কেমন আছে, পেনিলোপী?'

আমি জবাব দেবার আগেই শুনি প্রচণ্ড শয়তানি হল্লাবাজি হচ্ছে বাইরে। সামনের দরজা ভেঙে ডজনখানেক মুখোসধারী লোক ঢুকল কামরায়।

চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনলাম একটা হতচ্ছাড়া ইয়াঙ্কি এসেছে এখানে? পুড়িয়ে মারো তাকে!'

অব্রে ডি'ভিয়ার একটা টেবিলের পায়া ধরে সেটাকে তুলল শূন্যে, তারপর 'পোড়ানি' দলের প্রত্যেকটা লোককে মেরে শেষ করল।

বজ্রকণ্ঠে বলল, 'সাইরাস পট্‌স্, স্কুল দিদিমণিকে চুমো খাও, নয়তো তোমার ঘিলু বের করে দেব, যেমন দিয়েছি ওদের।'

সাইরাস একটা বরফ-ঠাণ্ডা চুমু জুবড়ে দিল মুখে।

এক সপ্তাহ পর সাইরাস আর আমি রওনা হলাম বোস্টনের উদ্দেশে। ওর মাইনে আগেই বেড়েছিল পঁচিশ ডলারে, আর আমি বাঁচিয়েছি দু'শ-দশ ডলার।

ট্রেন পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়েছিল অব্রে ডি'ভিয়ার। বগলের নিচে বয়ে এনেছিল বিস্ফোরক বারুদের একটা পিপে। আমাদের ট্রেন চলতে শুরু করতেই সে ওই পিপেটার ওপর বসল, একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁয়ে দিল ওটাতে।

ওর পায়ের একটা বুড়ো-আঙুল উড়ে এসে পড়েছিল আমাদের গাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে, একেবারে আমারই কোলে।

সাইরাস্ হিংসুটে মনোভাবের লোক নয়। সেই বুড়ো আঙুলটা এখন আমার লেখার টেবিলের ওপর একটা এ্যালকোহলের বোতলের মধ্যে রয়েছে, আমারই কাছে। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। দক্ষিণের দিকে আমি আর কক্ষনো যাচ্ছি না দ্বিতীয়বার।

দক্ষিণদেশী লোকগুলো বড় বেশি আবেগপ্রবণ।

Vereton Villa. হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

মতিচ্ছন্ন মণিকার

টমাস কীলিং-এর নাম আপনি হুস্টন শহরের নামপঞ্জীতে খুঁজে পাবেন না। এতদিনে হয়তো পেতেন, যদি-না মিঃ কীলিং মাসখানেক আগেই ব্যবসার পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও সরে পড়তেন। প্রায় ওইরকম সময়েই উনি হুস্টন শহরে আসেন, আর একটা ছোটখাটো গোয়েন্দা দপ্তর খুলে বসেন এখানে। গোয়েন্দা হিসেবে জনসাধারণের সেবাই তাঁর লক্ষ্য, তবে বেশ নরম-সরম পন্থায়। পিঙ্কারটনদের মতো জাঁদরেল কোনো সংস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি হতে চাননি, এবং একটু কম-সম ঝক্কি নিয়ে কাজ করাই বেশি পছন্দ করেন।

যদি কোনো মালিক তাঁর কেরানিটির চালচলনের ওপর নজর রাখতে চান, অথবা কোনো মহিলা তাঁর ফুর্তিবাজ স্বামীর ওপর—তাহলে সে-কাজ নেবার উপযুক্ত লোক মিঃ কীলিং। চুপচাপ মানুষ, গোয়েন্দাগিরির তাত্ত্বিক দিক নিয়ে পড়াশোনা করেন। গ্যাবোরিয় পড়েছেন. কোনান ডয়েল পড়েছেন, আশা রাখেন একদিন তিনিও তাঁর পেশার কোনো শীর্ষস্থান দখল করবেন। এর আগে পূর্বাঞ্চলের একটা বড় গোয়েন্দা দপ্তরে ছোটখাটো কাজে বহাল ছিলেন। কিন্তু চাকরিতে পদোন্নতি হয় শামুকের গতিতে, তাই ঠিক করলেন পশ্চিমে চলে আসবেন।

এই-এলাকায় এখনো তেমন ভিড় জমেনি এ পেশাতে।

কয়েক বছর ধরে ন'শো ডলার জমিয়েছিলেন মিঃ কীলিং। হুস্টনের এক ব্যবসায়ীর হেপাজতে রাখলেন টাকাটা, উভয়ের চেনাজানা এক বন্ধুর কাছ থেকে তার উদ্দেশে এনেছিলেন পরিচয়-পত্র। কোনো অখ্যাত গলির মধ্যে দোতলার ওপর একটা ছোট দপ্তর-কামরা ভাড়া নিলেন। কীসের ব্যবসা তা লিখে একটা সাইনবোর্ড টাঙালেন। তারপর ডয়েলের শার্লক হোম্‌স কাহিনীগুলোতে মগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কোনো মক্কেলের জন্য।

দপ্তর খোলার তিনদিন বাদে (তিনি একাই সেখানে সর্বেসর্বা) একজন মক্কেল এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

প্রায় চব্বিশ বছর বয়েসের এক যুবতী মহিলা। পাতলা-সাতলা, বেশ দীঘল গড়নের, সুছাঁদ পোশাক। একটা ফিনফিনে ওড়না তাঁর মাথায়। মিঃ কীলিং-এর এগিয়ে-দেওয়া চেয়ারে বসার পর ওড়নাটা তাঁর কালো বোনাটুপির ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন। মহিলার মুখখানা কমনীয়, মার্জিতরুচির, ধূসর চোখজোড়া একটু যেন চঞ্চল, আর সামান্য উৎকণ্ঠিত ভাবভঙ্গি।

* * *

বেশ মিষ্টি অথচ খানিকটা করুণ, গম্ভীর বামাকণ্ঠে উনি বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম এই কারণে যে আপনি এখানে মোটামুটি অজানা-অচেনা মানুষ, তা'ছাড়া আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে নিজের একজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করব এও তো চাই না। আমি আপনাকে নিয়োগ করতে চাই আমার স্বামীর চালচলনের ওপর নজর রাখার জন্য। একথা খুলে বলতে আমার নিজের কাছে অপমানজনকই লাগে, তবে আমার ভয় আমার স্বামীর প্রীতি-অনুরাগ এখন আর আমার প্রতি নয়। আমাদের বিয়ে হবার আগে যে পরিবারের সঙ্গে উনি খোরাকি দিয়ে বাস করতেন তাদেরই কোনো আত্মীয়া যুবতী মেয়ের জন্য পাগল হয়ে ওঠেন। আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ বছর পাঁচেক হল, বেশ সুখেরই সংসার ছিল। কিন্তু এই যুবতীটি সম্প্রতি চলে এসেছে হুস্টনে, আর আমার সন্দেহ করার কারণ রয়েছে আমার স্বামী তার সঙ্গে চলাঢলি করছেন। আমি চাই আপনি তাঁর চালচলনের ওপর যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠ নজর রাখুন আর আমাকে রিপোর্ট করুন। আমি একদিন বাদে একদিন নির্দিষ্ট সময়ে আপনার দপ্তরে নিজে এসে শুনব কতটা কী আবিষ্কার করেছেন। আমার নাম মিসেস্ র—, আর আমার স্বামী একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। ওঁর একটা ছোটখাটো মণিরত্নের দোকান রয়েছে '—'স্ট্রীটে। আমি আপনার কাজের জন্য ভালোই পুরস্কার দেব। এই নিন কুড়ি ডলার আগাম।'

মহিলা নোটখানা দিলেন মিঃ কীলিংএর হাতে, আর উনি সেটা অবহেলাভরে

নিলেন, যেন এটা তাঁর ব্যবসাতে একটা অতি, অতি মামুলি ব্যাপার।

উনি মহিলাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন তাঁর ইচ্ছাই বিশ্বস্তভাবে পালন করবেন তিনি,—প্রথম রিপোর্টটা নেবার জন্য যেন পরের পরদিন বেলা চারটের সময় এসে দেখা করেন আবার।

পরদিন মিঃ কীলিং অভিযান শুরু করার আগে যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিলেন। রত্নকারের দোকানটা খুঁজে পেলেন, ভেতরে ঢুকে গেলেন খোলাখুলিই, তাঁর ঘড়ির 'ক্রিস্টাল' আঁট করে নেবেন বলে। রত্নব্যবসায়ী মিঃ র—এর বয়েস দেখলে পঁয়ত্রিশই মনে হয়, ব্যবহার বিনীত, পরিশ্রমী ধরনধারন। তার দোকানটা ছোট হতে পারে, কিন্তু চমৎকার সব বাছাই জিনিসের সমাবেশ, হীরা, রত্নালঙ্কার, ঘড়ির বড়সড়ো সম্ভার। আরো খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল মিঃ র—এর অভ্যাস আচরণ অতি অনবদ্য, কখনো মদ্যপান করেন না, সর্বদাই মণিকারের আসনে বসে কাজে ব্যস্ত থাকেন।

সেদিন বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে রত্নকারের দোকানের দরজার কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করলেন মিঃ কীলিং। অবশেষে পুরস্কার মিলল যখন ঝক্‌ঝকে পোশাক পরা, কালো চুল আর কালো চোখের এক যুবতীকে দেখলেন দোকানে ঢুকতে। মিঃ কীলিং হেঁটে আরেকটু এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, যাতে ভেতরে কী ঘটছে তা দেখতে পান। যুবতী স্বাভাবিক আস্থা নিয়ে হেঁটে গেল দোকানের পেছন দিকে, কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে মিঃ র—এর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলল। উনি আসন ছেড়ে উঠলেন, দুজনের মধ্যে কয়েক মিনিট ধরে কিছু আলোচনা হল। অবশেষে মণিকার তার হাতে কিছু খুচরো টাকাপয়সা দিলেন, মিঃ কীলিং শুনতে পেলেন ঝিন্‌ঝিন্ শব্দটা। এরপর মহিলা বাইরে বেরিয়ে এল, দ্রুতপদে হেঁটে গেল রাস্তা ধরে।

* * *

নির্ধারিত সময়েই মিঃ কীলিং-এর দপ্তরে এসে গেলেন তাঁর মক্কেল। উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন ওঁর সন্দেহের মতো কোনো কাজকর্ম তিনি লক্ষ্য করেছেন কিনা। গোয়েন্দা যা দেখেছিলেন সবই তাকে বললেন।

যে যুবতীটি দোকানে ঢুকেছিল তার বর্ণনা দিতেই মহিলা বলে উঠলেন—'ওই তো সে! অসভ্য বেপরোয়া চীজ একটা। চার্লস তাহলে ওকে পয়সাকড়ি দিচ্ছে! ঘটনা শেষ পর্যন্ত এতদূর অবধি দাঁড়াল?'

ক্ষোভে চোখের ওপর রুমাল চাপা দেন।

গোয়েন্দা বললেন, 'মিসেস র—, এব্যাপারে আপনার বাসনা কী? কতদূর অবধি আমি তদন্ত চালাতে পারি?'

'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, যা সন্দেহ করেছিলাম তা কতখানি সত্যি। তাছাড়া সাক্ষীও চাই যাতে ডিভোর্সের মামলা আনতে পারি। এখন যেভাবে বেঁচে রয়েছি সেভাবে আর বাঁচতে চাই না।'

এর পর উনি গোয়েন্দার হাতে একখানা দশ-ডলারের নোট তুলে দেন।

পরদিনের পরের দিন আবার মহিলা যখন মিঃ কীলিং-এর দপ্তরে এলেন তাঁর বিবরণ শুনতে, গোয়েন্দা বললেন—

'দেখুন, আজ বিকেলে সামান্য কোনো ছুতো করে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। ওই মহিলাটি ভেতরেই ছিল আগে থেকে, তবে বেশিক্ষণ আর দাঁড়ায়নি। যাবার আগে বলল — চার্লি, আজ রাতে তোমার প্রস্তাবমতো দু'জনে একটু ভালমন্দ কোথাও খেয়ে নেব; তারপর আমরা দোকানেই ফিরে আসব, আর দুজনে একটু গল্প করার ফাঁকে তুমি হীরার ব্রোচ্‌টা বসাবার কাজ শেষ করে ফেলবে। বাইরের লোকের ঝামেলা থাকবে না। ... আজ রাতেই, মিসেস র—, আমার মনে হয় আপনার ভাল সুযোগ—নিজের চোখেই দেখবেন আপনার স্বামী আর তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করেছে যে চীজটি, তাকেও একসঙ্গে মিলতে। দেখে মনের কৌতূহল মেটাবেন, বুঝবেন অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।'

জ্বলন্ত চোখে মহিলা সজোরে বলে উঠলেন, 'হতভাগা! বিকেলে খাবার সময় বলেছিল জরুরি কাজ নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত দোকানেই থাকবে। আর এইভাবে আমাকে এড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে।'

গোয়েন্দা বললেন, 'আমি মতলব দিচ্ছি আপনি দোকানের ভেতরে লুকিয়ে থাকুন, তাতে শুনতে পাবেন ওরা কী বলাবলি করে। পর্যাপ্ত শোনা হলে সাক্ষী ডাকতে পারেন, তাদের সামনেই স্বামীর মুখোমুখি হতে পারবেন।'

'ঠিক কথাই। দোকান যে রাস্তায়, আমার মনে হয় ওই বীটের পাহারাদার পুলিশটি আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনে। অন্ধকারের পর সে ডিউটি করতে দোকানের কাছেপিঠে থাকবে। আপনি তার সঙ্গে দেখা করুন না কেন! সমস্ত ব্যাপারটা তাকে ব্যাখ্যা করে বলুন, আর আমি যথেষ্ট শুনে নেবার পর, সে আর আপনি গিয়ে হাজির হতে পারেন সাক্ষী হিসেবে, তাই না?'

গোয়েন্দা বললেন, 'ঠিক আছে, কথা বলব তার সঙ্গে, তাকে রাজি করাবো আমাদের সাহায্য করতে। আর আপনিও আমার দপ্তরে আসবেন আজ রাতের অন্ধকার নামার একটু আগেই। তাহলে ফাঁদে ফেলতে পারব ওদের।'

* * *

পুলিশের লোকটিকে খুঁজে বের করলেন গোয়েন্দা, অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে বললেন।

শান্তির রক্ষক বলল, 'এ তো অদ্ভুত কথা শুনছি! মিঃ র—কে তো আদৌ

ফুর্তিবাজ লোক বলে জানতাম না। কিন্তু সে যাহোক, কারুর কথাই হলপ করে বলা যায় না। তাহলে তাঁর স্ত্রী আজ রাতে তাঁকে হাতেনাতে ধরতে চান? দাঁড়ান দেখছি, উনি তো চান দোকানের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে আর ওরা যা বলে তা শুনতে! দোকানের পেছনে একটা ছোট খুপরি আছে, সেখানে র— কয়লা আর পুরনো বাক্সটাক্স রাখেন। অবশ্য মাঝখানের দরজাটা তালাবন্ধ থাকে, কিন্তু ওই দরজা দিয়ে তাঁকে ভেতরে ঢোকাতে পারলে তিনি যেমন-তেমন করে লুকিয়ে থাকতে পারেন। আমি এ ব্যাপারে জড়িত থাকা পছন্দ করি না, তবে ভদ্রমহিলার ওপর আমার সহানুভূতি আছে। আমরা যখন ছেলেমানুষ তখন থেকেই তাঁকে চিনি, তাই উনি যা চান তাতে মদত দিতে আমার আপত্তি নেই।'

সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসার মুখে গোয়েন্দার মক্কেল তাড়াহুড়ো করে ঢুকলেন তাঁর দপ্তরে। সাধারণ কালো পোশাক পরনে, একটা কালো গোল টুপি মাথায় দিয়েছেন, মুখখানা ওড়নায় ঢাকা। বললেন, 'চার্লি আমায় দেখলেও এখন চিনতে পারবে না।'

রত্নকারের দোকানের উল্টোদিকের রাস্তায় ধীরে ধীরে হেঁটে যান মিঃ কীলিং আর মহিলাটি। আটটা নাগাদ দোকানে ঢুকল সেই যুবতী যার জন্য নজর রাখছিলেন দু'জনে। একটু বাদেই সে মিঃ র—র সঙ্গে বেরিয়ে এসে তাঁর হাতে হাত রাখল। তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল দুজনে, নৈশাহারের জন্যই, ধরে নেওয়া যায়।

গোয়েন্দা টের পেলেন পাশে মহিলার বাহু কাঁপছে। তিক্তভাবে বলছেন, 'হতভাগাটা ভেবেছে, আমি বাড়িতে বসে নির্বোধের মতো ওর জন্য অপেক্ষা করছি। আর উনি ওই চতুর মতলববাজ ছেনালটার সঙ্গে ফুর্তি লুটতে বেরিয়েছেন! ওঃ পুরুষের শঠতা যে কী জিনিস!' মহিলাকে একটা খোলা হলবাড়ির রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলেন মিঃ কীলিং, দোকানের পেছনের আঙিনায় ঢুকে গেছে পথটা। খিড়কিঘরের বাইরের দরজায় তালা নেই, ওঁরা ভেতরে প্রবেশ করলেন।

মিসেস্ র—বললেন, 'দোকানের ভেতর যেখানে বসে আমার স্বামী কাজ করেন সেই আসনের কাছেই আছে একটা বড় টেবিল। তার ঢাকনাটা মেঝে অবধি ঝোলানো। একবার যদি ওটার তলায় ঢুকতে পারতাম তাহলে ওদের প্রত্যেকটা কথা শুনতে পেতাম।'

মিঃ কীলিং পকেট থেকে এক গোছা নকল চাবি বের করে ক'মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেলেন দরকারের চাবিটা, দরজা খুলে ঢোকা গেল দোকানের ভেতরে। গ্যাসের বাতিটা খুব ঢিমে করে রাখা হয়েছিল।

দোকানের ভেতরে পা ফেলে মহিলা বললেন, 'এ দরজাটা আমি ভেতর থেকে বন্ধ রাখব। আমি চাই আপনি আমার স্বামী আর ওই মেয়েটাকে অনুসরণ করুন। দেখুন ওরা কোথাও খেতে বসেছে কিনা, বসে থাকলে ওরা যখন

ফেরার জোগাড় করবে, আপনি এই পেছনের কামরাটায় অবশ্যই ফিরে আসবেন, আর দরজায় তিনবার টোকা দিয়ে জানাবেন সেটা। ওদের কথাবার্তাগুলো ভালমতো শুনে নিয়েই আমি দরজার আগল খুলব, আর সবাই মিলে অপরাধী দু'জনের মুখোমুখি হব। আমি হয়তো আপনার কাছে রক্ষা চাইব, কারণ জানি না তো ওরা আমার ওপর কিছু করার চেষ্টা করবে কিনা।'

* * *

গোয়েন্দা নিঃশব্দে পথ করে বেরিয়ে মণিকার আর মেয়েটার পেছু নিয়েছেন। খানিক পরেই আবিষ্কার করলেন ওরা একটু দূরের নির্জন কোনো রেস্তোরাঁয় একটা প্রাইভেট কামরায় বসে খাবারের অর্ডার দিয়েছে। যতক্ষণ না ওরা বেরিয়ে আসে ততক্ষণ এদিক-ওদিক করে তারপরেই হন্‌হন করে ফিরে এলেন দোকানে, পেছনের খুপরিটায় ঢুকে দরজার ওপর তিনবার টোকা দিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মণিকারও প্রবেশ করলেন যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে। গোয়েন্দা দরজার একটা ফাটল দিয়ে দেখলেন ঘরের আলো এবার জোরালো হয়েছে। শুনতে পেলেন পুরুষ ও মহিলা অন্তরঙ্গভাবে অনবরতই কথাবার্তা বলে চলেছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে ওদের বক্তব্য বুঝতে পারলেন না। আবার সটকে গেলেন রাস্তায়, বাইরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন মিঃ র—তাঁর কাজের আসনে বসে কাজ করছেন আর কালো-চুল মেয়েটা তাঁর পাশ ঘেঁসে বসে কথা বলে চলেছে।

মিঃ কীলিং ভাবলেন—ওদের বরং একটু সময় দেয়া যাক। রাস্তায় পায়চারি করতে থাকলেন। কোণের দিকে পুলিসের লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল।

গোয়েন্দা তাকে বললেন, 'মিসেস্ র—তো দোকানেই লুকিয়ে আছেন, মতলবমতোই সব কাজ হচ্ছে চমৎকার। আমি এখন একটু আড়ালে থাকছি, ভদ্রমহিলা ফাঁদটা ফেললেই প্রস্তুত হয়ে যাব।'

পুলিসের লোকটি ওঁর সঙ্গে দোকান অবধি হেঁটে গিয়ে উঁকি দেয় জানলার ভেতর। বলে, 'ওরা তো বেশ মানিয়েই নিয়েছে দেখছি। অন্য স্ত্রীলোকটা কোথায় ঢুকল গিয়ে?'

গোয়েন্দা বলেন, 'কেন, ওই তো ভদ্রলোকের পাশেই বসে রয়েছে।'

'আরে, আমি বলছি সেই মেয়েটার কথা যাকে নিয়ে র— খেতে গিয়েছিলেন।'

'আমিও তো তার কথাই বলছি,' বলেন গোয়েন্দা মশাই।

'আপনি বোধহয় গুলিয়ে বসেছেন,' পুলিসের লোক বলে, 'র—এর সঙ্গে ওই মহিলাকে চেনেন আপনি?'

'এই স্ত্রীলোকটার সঙ্গেই তো উনি খানা খেতে বেরিয়েছিলেন।'

'উনি তো র—এর স্ত্রী, পুলিস বললে, 'পনের বছর ধরে ওনাকে চিনি।'

গোয়েন্দার দম আটকে যায়—'তাহলে কে—? হে ভগবান্, তাহ'লে টেবিলের তলায় কে আছে?'

মিঃ কীলিং দোকানের দরজায় লাথি মারতে থাকেন। মিঃ র— এগিয়ে এসে দরজা খোলেন। পুলিসের লোক আর গোয়েন্দা ঢোকেন ভেতরে।

গোয়েন্দা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'শিগগির টেবিলটার নিচে দেখুন।' পুলিসের লোক টেবিলের ঢাকনাটা তুলে একটা কালো পোশাক, কালো ওড়না, আর কালো মেয়েলি পরচুলা টেনে বের করে।

'এই ভদ্রমহিলা কি আপনার স্-স্-স্ত্রী?'—উত্তেজিত মিঃ কীলিং প্রশ্ন করেন কালো-চোখ যুবতী মহিলাকে দেখিয়ে। মহিলা দারুণ অবাক হয়ে ওদের লক্ষ্য করছিলেন।

মণিকার বললেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনারা আমার টেবিলের নিচে কী আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন, বলুন দেখি! দরজাই বা কেন ভেঙে দেবার উপক্রম করেছিলেন?'

পুলিসের লোক এবার পরিস্থিতিটা যাচাই করতে শুরু করেছিল। বললে, 'আপনার শো-কেসগুলো একবার দেখুন তো!'

* * *

হীরার আংটি আর ঘড়ি যেগুলো উধাও হয়েছে তার মূল্য হবে আটশো ডলার। গোয়েন্দা পরের দিন সে বিল মিটিয়ে দিলেন। সে রাতে অনেক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছিল রত্ন ব্যবসায়ীকে। এক ঘন্টা বাদে মিঃ কীলিং তাঁর দপ্তরে বসে ব্যস্ত হয়ে ঘাঁটছিলেন তাঁর অ্যালবামগুলো—যাতে চোরজোচ্চোরদের ফোটো আছে।

অবশেষে পেয়ে গেলেন একখানা। পাতা ওল্টানো বন্ধ রেখে এবার চুল ছিঁড়তে লাগলেন নিজের। একটি কমনীয়-চেহারা মসৃণ কামানো যুবকের ছবির নিচে রয়েছে এই বর্ণনা:

"জেমস্ এইচ্. মিগ্‌ল্‌স, ওরফে স্লিক সাইমন, ওরফে কাঁদুনে বিধবা, ওরফে বাঙ্কো কেট, ওরফে ছিঁচকে জিমি—সাধারণভাবে জুয়াচোর ও সিঁধেল চোর। সাধারণত নারীর ছদ্মবেশে কাজ করে। বাক্‌চাতুর্যে মনোহর, খুবই বিপজ্জনক। কানসাস্ সিটি, অশ্‌কশ্, নিউ অর্লিন্স ও মিলওউকিতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে।"

এই কারণেই মিঃ টমাস্ কীলিং হুস্টনে তাঁর গোয়েন্দা দপ্তর চালাতে পারেননি।

'The Dissipated Jeweler / হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

এক অজানা প্রেমকথা

গিরিখাতের নিচের দিকে বিকেলের প্রথম পাণ্ডুর তারা উঁকি দেয়। অপর দিকে আল্পসের অসীম উচ্চতা—মাথার দিকে বরফ সাদা, আশপাশ ছায়াঘেরা, আর গিরিখাতের গভীর অংশগুলো কালো।

বলিষ্ঠ গড়নের এক যুবক পথ ধরে ওপরে আসছে। পরনে শ্যামময় হরিণ শিকারীর পোশাক। রোদে-হাওয়ায় তামাটে হয়ে গেছে মুখখানা, চোখদুটো সরল স্বচ্ছ, পদক্ষেপ ক্ষিপ্র আর দৃঢ়। একটা বাভেরিয়ান শিকার-গানের টুকরো টুকরো কলি গাইছে, আর হাতে ধরে রেখেছে পাহাড়ের ধার থেকে তোলা এডেল্‌ভাইস ফুলের সাদা একটা গুচ্ছ। হঠাৎ সে থেমে গেল, গানও যেন ভঙ্গ হয়ে ঠোঁট থেকে খসে পড়ল। সুইস্‌ চাষীদের মতো পোশাকে একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে ওরই পথের আড়াআড়ি অন্য একটি পথ ধরে। বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা জলভর্তি ছোট পাথরের কুঁজো। চুলগুলো অতি-হালকা সোনালি, মোটা বেণীটা সরু কোমর বেয়ে অনেকটা নিচে ঝুলছে। নেমে-আসা গোধূলির আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ, আর সামান্য খোলা ঠোঁটের ফাঁকে শুভ্রতম দাঁতের ঈষৎ ঝিলিক।

যেন উভয় তরফ থেকেই কোনো আবেগের বশে থেমে দাঁড়াল শিকারী আর কুমারী, দুজনের চোখজোড়া দুজনের ওপর। তারপর পুরুষটি এগিয়ে গিয়ে তার পালক-তোলা টুপি খুলে মাথা নত করল, জার্মান ভাষায় কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল। কুমারীও জবাব দিলে একটু তোতলামি ভরে, নিচু গলায়।

তারপর গাছের আড়ালে প্রায়-লুকোনো একটা কুটিরের দরজা খুলে গেল, শোনা গেল নানা কণ্ঠের কলরব। একেবারে ডগডগে লাল হয়ে উঠেছে মেয়েটির গাল। সে যাবার জন্য পা বাড়ায়, কিন্তু যেতে যেতে একবার নজর ফিরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে দেখে শিকারীকে। শিকারীও ওর পেছনে এক পা এগোয়, হাতটা বাড়িয়ে দেয় যেন ওকে রুখবার জন্যই। মেয়েটি ওর বুকের কাছ থেকে একগুচ্ছ নীল জেন্‌শিয়ান ফুল ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেয় শিকারীর দিকে। সেটা মাটিতে পড়তেই সে তুলে নেয়, তারপর হাল্‌কা পায়ে ছুটে গিয়ে মেয়েটির হাতে দেয় তার নিজের হাতের এডেলভাইস্‌ ফুলগুলো। মেয়েটিও তা বুকের মধ্যে গুঁজে সেই কলরবমুখর কুটিরের দিকে ছুটে যায় পাহাড়ি পরীর মতো।

শিকারী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পাহাড়ের পথ ধরে চলে আগের চেয়ে মন্থর গতিতে, কিন্তু গানটান আর গায় না। যেতে-যেতে কেবলই ফুলগুলো চেপে ধরে ঠোঁটের ওপর।

* * *

বিবাহ হচ্ছে মহা আড়ম্বরে, এমন জাঁকজমক আগে কেউ দেখেনি। শহরের উচ্চ সমাজ মুখিয়ে আছে কখন নিমন্ত্রণটা পাবে সেই আশায়।

বর হল ভ্যান উইক্লারদের প্রাচীন বনেদি বংশের ছেলে, নিজের যা অংশ তাতেই উঁচু স্তরের সমাজে তার প্রতিপত্তি। পাত্রীর সৌন্দর্য তো নিখুঁত, তার ওপর পাঁচ মিলিয়ন ডলার। বিয়ের ঘটকালি ব্যবস্থাদি করা হয়েছিল ব্যবসায়ীসুলভ কায়দায়। প্রেমের কোনো প্রশ্নই ছিল না। পাত্র বিনয়ী, ভদ্রতাসঙ্গতভাবে মনোযোগী, পাত্রীও উদাসীনভাবে সম্মতি জানিয়েছে। একটা কেতাদুরস্ত গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যাবাসে ওদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভ্যান উইক্লারদের বংশমর্যাদা আর ভ্যান্সদের অর্থ এবার এক হতে চলেছে।

একেবারে মাঝদুপুরে বিয়ে হবে।

পেলহাম ভ্যান উইক্লার তার অন্যতম একটা কক্ষে প্রাচীন টালিবসানো চুল্লিতে আগুনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে—যদিও আবহাওয়া এখন উষ্ণই। একটা লেখার টেবিলের ধারে বসে সে মুঠোভর্তি চতুষ্কোণ-আকারের চিঠিগুলো সেই আগুনে ছুঁড়ছে—ওর মধ্যে কিছু আবার রিবনে বাঁধা। সেগুলো জ্বলে উঠতে সামান্য পরিহাসের হাসি ফুটছে তার মুখে। একেকবার ওগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে কোনো শুকনো ফুল, কিংবা গন্ধমাখা দস্তানা, অথবা ফিতে-খোলা চুলের থোকা।

আগুনের শিখায় শেষ উৎসর্গ নীল জেন্‌শিয়ান ফুলের একটা শুকনো গুচ্ছ, কোনো বইটই কিছুর তলায় চাপা রাখা ছিল।

ভ্যান উইক্লার নিঃশ্বাস ফেলল, হাসিটা মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে। আল্‌প্‌স পাহাড়ের সেই গোধূলির দৃশ্যটা মনে পড়ে ওর। একবার গ্রীষ্মভ্রমণে গিয়ে চার-পাঁচজন সঙ্গীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিল সেখানে, নিশ্চিন্ত আনন্দে, শ্যাময় শিকারীদের আকর্ষণীয় পোশাক পরে। একটি ফুটফুটে চাষী কন্যার ছবি ভেসে উঠল চোখে, মেয়েটার চোখ যেন চুম্বকের জাদু দিয়ে ধরে রেখেছিল ওকে, পাহাড়ি পথ ডিঙিয়ে যাবার সময় এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল ওই জেন্‌শিয়ান ফুলের গুচ্ছটা ওকে দেবার জন্য। ও যদি ভ্যান উইক্লার বংশের একজন না হত, ও নামের প্রতি তার কর্তব্যবোধ থাকত না, আর মেয়েটিকে খুঁজে বের করে তাকেই বিয়ে করত—কারণ সেই গোধূলি সন্ধ্যার মুহূর্তটি থেকে তার মূর্তি কখনোই ওর নয়ন অথবা হৃদয় ছেড়ে যায়নি। কিন্তু সমাজ আর পারিবারিক নামের দাবি আছে ওর ওপরে, আজ দুপুরে তাই বিয়ে করতে হচ্ছে কুমারী ভ্যান্সকে—একজন কোটিপতি লোহার কারখানা-মালিকের মেয়ে।

পেলহাম ভ্যান উইক্লার নীল জেন্‌শিয়ানের গোছাটা ছুঁড়ে দিল আগুনে, তারপর ঘন্টা বাজিয়ে ডাকল খাস-পরিচারককে।

* * *

হল্লাবাজ সখীদের দল আর বাতিকগ্রস্তা আত্মীয়াদের বিরক্তিকর সঙ্গ এড়িয়ে কুমারী অগাস্টা ভ্যান্স্ পালিয়ে এসেছে তার আপন নিভৃত কক্ষে, কয়েক মুহূর্তের শান্তির খোঁজে। পোড়াবার মতো ওর কোনো চিঠিপত্র নেই, কোনো অতীতকে কবরও দেবার নেই তার। ওর মা'র তো আনন্দের শেষ নেই যেন, কারণ পরিবারের কোটি টাকার দৌলতে তাদের স্থান এখন দেমাক-দেদারের মেলায় সামনের সারিতে।

ভর-দুপুরে বিয়ে হচ্ছে পেলহাম ভ্যান উইঙ্কলারের সঙ্গে। হঠাৎ একটা স্বপ্নের মতো সাত-পাঁচ ভাবনায় ডুবে যায় কুমারী ভ্যান্স্। মনে পড়ে একবারের ভ্রমণের কথা। বছর খানেক আগে ইউরোপে সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিল। বিশেষ করে মনে পড়ে একটি সপ্তাহের কথা, সেবার একজন সুইস্ পর্বতারোহীর কুটিরে কাটিয়েছিল আল্পস পাহাড়ের পাদদেশে। গোধূলি সন্ধ্যায় একটা কুঁজো নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছিল ঝরনার জল আনতে। সেদিন ওর বড় শখ হয়েছিল গৃহকর্তার মেয়ে ব্যাবেটের চাষীকন্যার পোশাকটা পরার। ওর হাল্‌কাসোনালি লম্বা চুলের গোছা আর নীল চোখের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল পোশাকটা। ও ফেরার সময় আড়-পথে আসছিল এক শিকারী—আল্পসের শ্যাময় শিকারী, তামাটে, বলিষ্ঠ দীঘল গড়নের, আড়ষ্টতাহীন। ও চোখ তুলে চাইতেই তার চোখে চোখ, সেও তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকেই। ও এগিয়ে যায়, তবু তার চুম্বক দৃষ্টি যেন ওর চোখকে টেনেই রাখে। কুটিরের দরজা খুলে গেছে, ওরা ডাকাডাকি করছে। সে চলতে শুরু করলেও একটা আবেগ ওকে বাধ্য করে বুকের কাছ থেকে এক গুচ্ছ জেন্‌শিয়ান ফুল বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিতে। ফুলগুলো ধরে ফেলে ছেলেটিও লাফিয়ে এসে ওর হাতে দেয় এডেলভাইস্ ফুলের একটা গোছা। সেই সন্ধ্যাটির পর থেকে কোনোদিনও আর সেই শ্যাময় শিকারীর মূর্তি ওকে ছেড়ে যায়নি। নিয়তিই হয়তো তাকে মিলিয়েছিল ওর সঙ্গে, মনে হয়েছিল সে একটি পুরুষের মতো পুরুষ। কিন্তু কুমারী অগাস্টা ভ্যান্স্ এখন পাঁচ মিলিয়ন ডলার পণ রেখে তো আর আল্পস্ পাহাড়ের একটি সাধারণ শিকারীর কথা ভেবে মারাত্মক বোকামি করতে পারে না।

কুমারী ভ্যান্স্ উঠে তার প্রসাধনী পেটিকার ওপর রাখা একটা সোনার লকেট খুলল। ভেতর থেকে একটা ফ্যাকাশে এডেলভাইস্ ফুল বের করে ধীরে ধীরে সেটাকে দু'আঙুলে পিষে গুঁড়ো করে ফেলল। তারপর ঘন্টাটা বাজাল পরিচারিকাকে ডাকতে। তখন বাইরে বিয়ের উপলক্ষে গির্জার ঘন্টাগুলোও বাজতে শুরু করেছে।

An Unknown Romance. *হস্টন পোস্ট*, ১৮৯৬

পাঁইটের বোতল

হুস্টনের এক গণ্যমান্য কর্নেল, চার্চের বিশিষ্ট সদস্যও বটেন—গত রবিবার সকালে সপরিবারে গির্জায় যাবার জন্য বেরুলেন। এটাই তাঁর রীতি। প্রশান্ত বলিষ্ঠ চেহারা, কালো ঝোলা কোট আর হালকা ধূসর ট্রাউজারে বড় চমৎকার কেতাদুরস্ত দেখাচ্ছে। গির্জায় যাবার পথে সদর রাস্তা ধরে চলেছেন এমন সময় কর্নেলের মনে পড়ল একটা দরকারী চিঠি পড়ে আছে তাঁর ডেস্কে। তাই পরিবারকে বললেন দরজার কাছে একটু দাঁড়াতে, এই ফাঁকে অফিসে গিয়ে উনি সেটা নিয়ে আসবেন। ভেতরে ঢুকে চিঠিটাও নিলেন, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন টেবিলের ওপর খাড়া করে রাখা হয়েছে একটা অসভ্য চেহারার হুইস্কির পাঁইট বোতল, এখনো আউন্সখানেক হুইস্কি পড়ে আছে তাতে। কর্নেল হুইস্কি তো ঘেন্না করেনই, কড়া কোনো পানীয়ই স্পর্শ করেন না। বুঝলেন কেউ সেটা জানে বলেই, ডেস্কের কাছে এসে বোতলটা রেখে গেছে তামাশা করে।

বোতলটা কোথায় ফেলা যায় ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন, কিন্তু পেছনের দরজাটা বন্ধ, পাশের গলির দিকে উঁকি-মারা জানলা অনেক চেষ্টাতেও খুলতে পারলেন না। কর্নেলের স্ত্রী এদিকে উনি ফিরতে কেন দেরি করছেন বুঝতে না পেরে দরজা খুলে হট্ করে হাজির হলেন সামনে। উনিও কী করছেন চিন্তা না করেই বোতলটা পুরে ফেললেন প্যান্টের পেছনের পকেটে, লম্বাকোটের ঝুলের তলায়।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আসছ না কেন? চিঠিটা কি পাওনি নাকি?'

ওর সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না কিছু করার। তখনই তিনি বোতলটা বের করতে পারতেন, পরিস্থিতিটাও বোঝাতে পারতেন, কিন্তু সুযোগটা হেলায় হারালেন। পরিবারের সঙ্গে সদর রাস্তা ধরে চলেছেন, আর পকেটের ভেতর পাঁইটের বোতলটা ওঁর কাছে মনে হচ্ছে পিপের মতো বড়। ওঁর ভয় হচ্ছে কেউ হয়তো লক্ষ্য করবে ওঁর কোটের তলাটা কেমন ফুলে উঠেছে, তাই সকলের একটু পেছন-পেছন চলতে লাগলেন। গির্জার আসনসারিতে ঢুকে উনি যখন বসলেন, একটা তীক্ষ্ণ, ভাঙার-মতো আওয়াজ হল। আর জঘন্য হুইস্কির গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল গির্জার সর্বত্র। কর্নেল দেখলেন অনেকেই নাক সিঁটকোচ্ছেন আর সপ্রশ্ন চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। উনি বীটের মতো লাল হয়ে উঠলেন। শুনলেন আসনের পেছন থেকে একটা নারী কণ্ঠ সজোরে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—'বুড়ো কর্নেল জে—দেখছি আবার নেশা করেছেন। উনি নাকি শুনি আজকাল প্রকৃতিস্থ খুব কম সময়ই থাকেন, কেউ আবার বলে প্রায় রোজই বউকে ধরে পেটান।'

কর্নেল চিনতে পারেন কণ্ঠের অধিকারিণীকে—হুস্টনের সবচেয়ে কুখ্যাতা গল্পবাজ মহিলাদের একজন। ঘুরে কটমট করে তাকালেন তার দিকে। সে এবার চাপা গলা একটু চড়িয়েই বললে, 'দেখুন না ওঁকে। সত্যি সত্যি ভয়ানক দেখাচ্ছে কিনা! আর এইভাবে গির্জায় চলে আসা, ছি!'

* * *

কর্নেল টের পান বোতলটা ফেটে গেছে, তাই নড়াচড়া করতে ভয় পান। কিন্তু বোতলের একটা টুকরো বেরিয়ে মেঝের ওপর পড়ল। সাধারণত উনি প্রার্থনার সময় হাঁটু গেড়েই বসেন, কিন্তু কাঠের মতো শক্ত সোজা হয়ে আসনেই বসে রইলেন। ওঁর স্ত্রী ওঁর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করে ফিসফিস করে বললেন:

'জেমস্, বুঝতে পারছ না কী যন্ত্রণা দিচ্ছ আমায়। আজকাল প্রার্থনাও করছ না দেখছি। তখনই জানতাম, তোমায় ইঙ্গারসোলের বক্তৃতা শুনতে দেওয়ার কুফল আন্দাজ করেছিলাম আগেই। তুমি নাস্তিক। আর ওটা কিসের গন্ধ পাচ্ছি? উঃ জেমস্, তুমি মদ খাচ্ছ, তাও আবার রোববারের দিন!'

কর্নেল-পত্নী চোখে রুমাল চাপেন, আর উনি রাগে দাঁত কিড়মিড় করেন। গির্জার উপাসনা শেষ হবার পর, বাড়ি ফিরে ওঁর স্ত্রী পেছনের বারান্দায় বসে ডিনারের জন্য স্ট্রবেরির খোসা ছাড়াতে শুরু করেন। এর ফলে খিড়কির আঙিনায় গিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে বেড়া পার করে দেবার পক্ষে বাধা হল, তেমনই ছিল ওঁর ইচ্ছেটা। ছোট ছেলেদুটোও অনবরত ওঁর পেছু-পেছু ঘুরছে, রবিবারে ওরা যেমনটা করে, তাই বোতলটাকে বিদায় করা ওঁর অসম্ভব মনে হল। ছেলেদের নিয়ে সামনের আঙিনায় বেড়াতে গেলেন। অবশেষে কোনো ছুতো করে দুটিকেই পাঠালেন বাড়ির ভেতরে। তারপর বোতলটা বের করে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তায়। বোতলের ফাটলটা ছিল অল্প, তাই যখন আবর্জনার নরম গাদায় পড়ল, তখনও ভেঙে চুরমার হল না।

কর্নেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু বাচ্চা দুটো ঠিক যখন দৌড়ে ফিরে আসছে, শুনতে পেলেন রাস্তা থেকে কেউ বলছে—'এই যে দেখুন স্যর, রাস্তায় কাচের জিনিস ফেলা আইনসঙ্গত নয়। আপনাকে ফেলতে দেখেছি, তাই বলছি তুলে ফেলুন, এবারের মতো মানে-মানে।'

কর্নেল ফিরে দেখলেন এক হোঁতকা পুলিসম্যান বেড়ার ওপর দিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে সাংঘাতিক বেতলখানা। উনি বোতলটা নিয়ে ফের ঢোকালেন নিজের পকেটে—একটা নিচু অথচ স্পষ্ট কিছু মন্তব্য করে। ওঁর ছেলে দুটো চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল—'ও বাবা, পুলিসের লোকটা তোমায় কী দিল গো? দেখাও, দেখাও!'

ওরা তাঁর কোটের কিনারা ধরে টানে, পকেটগুলো হাতড়ায়, আর কর্নেল পেছিয়ে

যেতে থাকেন বেড়ার দিকে। চিৎকার করে বলেন, 'যা বাড়ির মধ্যে, নয়তো দু'জনকেই ধরে আচ্ছা মতো দেব।'

* * *

কর্নেল বাড়ির ভেতর ঢুকে টুপিটা মাথায় দিলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যদি তাঁকে এক মাইলও হাঁটতে হয় তবু বোতলটাকে বিদায় করেই আসবেন শেষ অবধি।

অবাক হয়ে গিন্নি জিজ্ঞেস করেন, 'যাচ্ছ কোথায়? ডিনার তো প্রায় তৈরি। কোট জামা খুলে একটু শান্ত হয়ে বোসো না জেমস্, যেমন তুমি করে থাক।'

গভীর সন্দেহভরা দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন বলে ওঁর মহা বিরক্তি আসে। রেগে গিয়ে বলেন, 'ডিনার গোল্লায় যাক্। আমার খিদে পেয়েছে—মানে, বলছি অসুখ করেছে; কোনো ডিনার চাই না—শুধু হেঁটে ঘুরে আসব একবার।'

'বাবা, পুলিসের লোকটা কী দিল তোমায়, দেখাও না একবার!' বললে ছোট বাচ্চাদের একজন।

'পুলিসের লোক!' প্রতিধ্বনি কর্নেল পত্নীর মুখে—'ওঃ জেমস্, তুমি শেষে এমন ব্যাভার করবে ভাবতে পারি না! আমি জানি তুমি মদটদ খাওনি, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী বলতো? এসো, ভেতরে, শুয়ে পড়। দেখি তোমার কোটটা খুলে দিচ্ছি।'

কর্নেলের এ্যালবার্ট-কোটটা টেনে খুলতে যান কর্নেল-পত্নী। এটা বরাবরই করেন। কিন্তু ভীষণ রেগে যান কর্নেল, লাফিয়ে সরে যান স্ত্রীর কাছ থেকে।

চিৎকার করেন, 'নারী, তুমি আমায় স্পর্শ কোরো না। আমার মাথা ধরেছে, তাই বাইরে হাঁটতে যাচ্ছি। এ হতচ্ছাড়া জিনিস ফেলে দেবার জন্য যদি উত্তর মেরু অবধি যেতে হয় তবু যাব।'

উনি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর স্ত্রী শুধু মাথা নাড়েন। বলেন, 'বড্ড বেশি কাজের চাপ ওঁর। হয়তো একটু হেঁটে এলে উপকারই হবে।'

পর-পর বেশ কয়েক সারি বাড়ি পেরিয়ে গেলেন কর্নেল, বোতলটার একটা বিহিত করার সুযোগ খুঁজে। রাস্তাগুলোতে বেশ কিছু লোকজন রয়েছে, আর সব সময় মনে হচ্ছে কেউ যেন ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

কর্নেলের দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হল, তাঁরা সকৌতূহলে ওঁর দিকে চেয়ে থাকেন। ওঁর মুখখানা বেশ রক্তরাঙা, মাথার পেছনে টুপি হেলে পড়েছে, চোখে বন্য দীপ্তি। ওদের কেউ কেউ কথা না বলেই পাশ কাটিয়ে গেল, তিক্তভাবে হেসে উঠলেন কর্নেল। তিনি যেন মরীয়া হয়ে উঠেছেন। যখনই কোনো খালি জায়গা দেখতে পান,—সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে সন্ধানী চোখে দেখেন সবদিকে পথ পরিষ্কার

তো, যাতে বোতলটা বের করে ফেলে দিতে পারেন?

লোকে জানলা থেকে ওঁকে লক্ষ্য করতে শুরু করেছে, আর গোটা দু'তিন বাচ্চা ওঁকে অনুসরণও করতে লেগেছে। কর্নেল ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের কড়াগলায় ধমক দিলেন। ওরা জবাব দিলে—'দ্যাখ্ রে বুড়ো মদে চুর হয়ে শোবার জায়গা টুঁড়ছে। তা যাও না শীরিঘরে, সেখানেই ঝিমিয়ে নেশাটা কাটাও মিস্টার।'

* * *

কর্নেল অবশেষে ছেলেগুলোকে এড়িয়েছেন। একটা ফাঁকা চারকোণা জায়গা দেখে তাঁর মনে ভরসা এল—জায়গাটা ঘাসজঙ্গলে ভরা, একেক জায়গায় সেগুলো তাঁর মাথার সামান উঁচু।

এই একটি স্থান যেখানে বোতলটার সদ্‌গতি করতে পারবেন। তাঁরই চার্চের পাদ্রি বাস করেন ওই খালি জমিটার উল্টোদিকে, কিন্তু আগাছা ঘাসগুলো এত উঁচু যে বাড়িখানা একেবারেই দেখা যায় না, পুরো আড়ালে।

অপরাধীর মতো এধার ওধার দেখেন কর্নেল, কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে সোজা ঢুকে পড়েন আগাছার ভেতর দিয়ে যাওয়া একটা পথ ধরে। মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে যেখানে ঘাসগুলো সবচেয়ে উঁচু, তিনি থামেন আর পকেট থেকে বের করেন হুইস্কির বোতলটা। তিনি ওটার দিকে তাকিয়ে একবার গম্ভীরভাবে হেসে সোচ্চারেই বলেন, 'তুই আমাকে যা লঞ্ছনা দিয়েছিস সে এক আমি ছাড়া কেউ জানে না।'

বোতলটা উনি সবে ফেলতে গিয়েছেন এমন সময় শুনলেন একটা আওয়াজ, মাথা তুলে দেখলেন তাঁরই পাদ্রিমশাই রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, আতঙ্কভরা চোখে তাকিয়ে আছেন ওঁর দিকে।

সৎ মানুষটি বললেন, 'প্রিয় কর্নেল জে—, আপনি যারপর-নাই দুঃখ দিলেন আমাকে। আপনি যে মদ্যপান করতেন তা তো কখনো জানতাম না। আমি বাস্তবিকই আপনাকে এই অবস্থায় এখানে দেখে অতীব মর্মাহত।'

কর্নেল এমন খেপে উঠলেন যে তার আর বাঁধন রইল না। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি কী ভাবলেন তাতে আমার বড় বয়েই গেছে! খিটখিটে পেঁচার মতো ঢোঁক-গেলা মাতাল আমি, কে তা জানল তা নিয়ে তোয়াক্কা করি না। আমি তো সবসময়েই মাতাল। গেল দু'হপ্তায় পনের হাজার গ্যালন হুইস্কি খেয়েছি। প্রতি রোববার এই সময়ে আমি অতি বদ লোক। এই যে আরেক বোতল .... কপালের জোরে!'

বলে উনি বোতলটা ছুঁড়ে দিলেন পাদ্রির ওপর, তাঁর কানে লেগে সেটা কুড়ি টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। পাদ্রি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেলেন ফের তাঁর বাড়ির দিকে।

কর্নেল এক গাদা পাথর জড়ো করে লুকিয়ে রইলেন লম্বা ঘাসগুলোর আড়ালে।

র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যতক্ষণ অস্ত্রসম্ভার মজুত থাকবে, ততক্ষণ অবধি লড়ে যাবেন রা শহরের বিরুদ্ধে। তাঁর দুর্ভাগ্যই তাঁকে মরীয়া করে তুলেছে। এক ঘন্টা বাদে নজন ঘোড়াসাওয়ার পুলিস ঢুকল আগাছা জঙ্গলের মধ্যে। কর্নেল আত্মসমর্পণ রলেন। এতক্ষণে তিনি যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়েছেন, এবার সহজেই সবকিছু ব্যাখ্যা করে লতে পারবেন। যেহেতু একজন স্থির মস্তিষ্ক, পুরো প্রকৃতিস্থ নাগরিক হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল, তাই তাঁকে বাড়ি চলে যেতে দেওয়া হল।

কিন্তু আপনারা আর কখনো তাঁকে বোতল কুড়োতে দেখবেন না— তা সে খালিই হোক, কি ভরাই হোক।

The Pint Flask, হৃস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

উনিও ভিড়লেন দলে

প্রলোভনের ছায়া ওদের পথ মাড়াবার আগে কিন্তু সারা হৃস্টন শহরে ওদের মতো সুখী দম্পতি ছিল না কেউ। জর্জ সেন্ট্‌বিব্‌স্ আর তার স্ত্রীর কথা বলছি। প্রলুব্ধক সর্বদা যে কেমন করে পথের ওপর লম্বা ছায়া ফেলে, সেটই অদ্ভুত, তাই না? মনে হবে, যে-প্রলোভনকারী সে তো নিজের কাজটা ঠিক বোঝে, সে আসবে অন্য পথ ধরে, অথবা বেছে নেবে একটা মেঘলা দিন যাতে পথে ছায়া না পড়ে? কিন্তু যাক্ গে, এসব অন্য কথা।

সেন্ট্‌বিব্‌স্‌রা বাস করত চমৎকার সাজানো একটা আরামপ্রদ কুটিরে। মেয়াদী ধারে যা কিছু কেনা সম্ভব সবই ওদের আছে। ওদের দুটি মিষ্টি ছোট মেয়ে— ডলি আর পলি।

জর্জ সেন্ট্‌বিব্‌স্ পছন্দ করত ফ্যাশানদুরস্ত সমাজ, আর তার বউ আচার আচরণে ঘরোয়া। তাই বউ ওকে জোর করেই হৃস্টনে টেনে আনল, যাতে ওর নিজের রুচিমত শখ মেটাবার সুযোগ না থাকে। তবু জর্জ এখনো উৎসব সম্মেলনে বা ওই ধরনের কাজে যায়, আর স্ত্রীকে রেখে যায় ঘরে।

একদিন রাতে উচ্চসমাজের লোকদের একটা উচ্চাঙ্গের জলসা হবার কথা— উদ্যোক্তা বণিক সংঘ, আর 'কনফেডারেট পুনর্মিলনের' আধুনা-জীবিত ব্যক্তিদের কন্যারা।

জর্জ চলে যাবার পর, তার স্ত্রী নিজের ছোট হাত-আয়নাটা দেখে মনে মনে বললে: 'একটি ডলার বাজি রেখে বলতে পারি, ওই বলনাচের আসরে দ্বিতীয় কোনো মহিলাই নেই যে আমি সাজলে গুজলে আমার কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে!'

তখনই একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়।

ঘন্টা বাজিয়ে কাজের-মেয়েকে ডাকল, তাকে বলল এক কাপ গরমাগরম চা দিতে। তারপর একটা মনোহর সান্ধ্য পোশাক পরে, ঝিকে ডলি-পলির দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে বেড়িয়ে গেল। ট্রামগাড়িতে চড়ে চলে গেল বলনাচের উৎসবে।

নাচের আসরে বড়োই আনন্দ উপভোগ করছিল জর্জ। সেরা মানুষেরা সবাই জুটেছে সেখানে. আদিরসাত্মক সঙ্গীতে উজ্জীবিত সবকিছু, প্রেমভরা নয়ন কোমল চোখে আবার তাকায় 'কথা কও' বলে, এই রকমের সব ব্যাপার।

অথিতিদের মধ্যে রয়েছেন ভিকঁত্ কারোলু দ' ভিইয়া, নামজাদা ফরাসী অভিজাত ব্যক্তি। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে প্যারিস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, এখন এ্যালভিনের কাছে একটা বিশাল স্ট্রবেরি আবাদের কাজ দেখছেন।

একটা দরজার পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছিলেন ভাইকাউন্ট, এমন সময় শ্রীমতী সেন্ট্বিব্স্কে দেখলেন ঢুকতে।

মুহূর্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, আর আগামী প্রত্যেকটি নাচের জন্য তার নামের সঙ্গে নিজের নামের জুটি লিখিয়ে রাখলেন। জর্জ মাথা উঁচিয়ে দেখছিল, ওদের দিকে নজর পড়তেই বিস্মিত হয়ে খাবি খাবার অবস্থা— 'জে-রু-জালেম, ও যে মলি!'

ঢোকবার পথে একটা মখমলের পর্দায় হেলান দিয়ে দিয়ে সে ওদের দেখতে লাগল। শ্রীমতী সেন্টবিব্স্ই যেন আজকের সন্ধ্যার মক্ষিরানী। সবাই ভিড় করে তাকেই ঘিরে রয়েছে, ভাইকাউন্ট তো তার ওপর হেলে পড়ে কথা বলছেন অতি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। আব মধ্যে মধ্যে একটা পুরোনো খবরকাগজ দিয়ে ওকে হাওয়া করছেন, সেও উজ্জ্বল হাসি বিলিয়ে দিচ্ছে তাঁকে, দেদীপ্যমান রসিকতা, লঘুশ্লেষ আর তৎপর প্রত্যুত্তর ঝবে পড়ছে তাব ঠোঁট থেকে।

ভাইকাউন্টের আগ্রহী দৃষ্টি তার ওপর, মনে-মনে বললেন, 'ভগবান্! মহিলাটি কে তা কি জানা যাবে না?'

নৈশভোজনের সময় দলের মধ্যমণি যেন মিসেস্ সেন্ট্বিব্স্। টেবিল ঘিরে-বসা অত্যুজ্জ্বল বিদ্বজ্জনের সঙ্গে বিজ্ঞ আলোচনায় মত্ত হয়ে সে শহরের রসিক-পাণ্ডাদেরও পুরো ঘোল খাইয়ে দিল। মফস্বল নির্বাচন-এলাকার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও ওদের দেশি ভাষাতেই তৎপর আলোচনা, এমনকি কোনো ইতস্তত না করে জবাব দিল একটি প্রশ্নেরও। প্রশ্নটি যিনি করেছিলেন তার বোন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন।

জর্জ যেন বিশ্বাসই করতে পারে না এই মোহময়ী দীপ্তিমতী দুনিয়া-জানা মহিলাটি ওরই সেই শান্ত লক্ষ্মী বউ যাকে আজ সন্ধ্যায় সে ঘরে ফেলে এসেছিল।

নাচের আসব ভাঙ্গার পর বাদ্যকররা যখন সরে গেছে, জর্জ গুটি গুটি স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, লজ্জিত আর অনুতপ্ত সে।

বললে 'মলি, আমায় মাফ কর। জাঁকজমকের সমাজে যে তুমি এত সুন্দরী আর আমোদপ্রিয় হতে পার, তা জানতাম না। এর পরের বারে আমাদের লংফেলো সাহিত্য গোষ্ঠীর "মাছ-ভাজা" পার্টিতে তোমায় নিয়ে যাব।'

মিষ্টি হেসে মিসেস্ সেন্ট্‌বিব্‌স্ স্বামীর বাহু চেপে ধরল, 'ঠিক আছে জর্জ, তোমাকে শুধু দেখাতে চেয়েছিলাম এ শহরের সমাজে এমন কেউ আহা-মরি নেই যাকে আকাশ থেকে নামাতে পারি না আমি। একবার দু'হপ্তা গ্যালভেস্টনে কাটিয়েছিলাম,— যেটা ঠিক ধরবার তা অন্য-কারুর মতোই চট্ করে ধরতে পারি।'

বর্তমানে এ শহরে আর কোনো শৌখিন দম্পতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের প্রশংসা আর চাহিদা জর্জ আর তার গুণবতী ভার্যার চেয়ে বেশি।

How She Got in the Swim, হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

উদ্ভট চরিত্র

গত রাত্রে সান জাসিন্টো সেতুর ওপর 'পোস্টে'র এক রিপোর্টার দাঁড়িয়েছিলেন। মে মাসের আধলা-চাঁদ পুবদিকের উঁচু আকাশে ঘোল-থকথকে মেঘের সমুদ্রে সাঁতার কেটে চলেছে। সেতুর নিচে, আধো-অন্ধকারে বাইউ নদীর নিষ্প্রভ আভা, আরো দূরে কাজল আঁধারের মধ্যে মিশে গেছে। মন্থর জল ঠেলে একটা বাষ্পচালিত টানা বোট নিঃশব্দে ভেসে যায়, পেছনে রেখে যায় গলিত রুপোর চুর-চুর ভগ্নরেখা। সেতুর ওপর পায়ে-হাঁটা যাত্রী বড় কম। কয়েকজন বিলম্বিত খাটিয়ে মানুষ পাটাতনের উঁচুনিচু তক্তায় খট্‌মটে আওয়াজ তুলে পা ঘষে ঘষে চলে। রিপোর্টার মাথা থেকে টুপি খুলে বিশাল শহরের ঠাণ্ডা হাওয়াকে একটু সুযোগ দেয় তাঁর কপাল ছুঁয়ে যাবার। একটা কোমল কণ্ঠ, অবশ্য অতিরিক্ত নাটুকে উচ্চারণে ভারাক্রান্ত, ওঁর কনুইয়ের কাছে গুনগুনিয়ে ওঠে। বায়রনের কবিতা থেকে অশুদ্ধ এক উধৃতিঃ

"ও চাঁদ, ও সন্ধ্যানিবিড় নদী,
কী মায়াবী শক্তি ধরিস্ তোরা,
মেয়ের কালো চোখের আলোর মতো
শক্তি থেকে চিরসুন্দর ধারা।"

রিপোর্টার মাথা ফিরিয়ে দেখলেন খাঁটি ভবঘুরের এক জলজ্যান্ত নমুনা। এমন জামাজুতো পরনে যে অবাক হয়ে দেখতে হয়, এমনকি ঘাবড়েও যেতে হয় ত্রাসে। কোটখানা কালো ঝুললম্বা কোটই ছিল, হয়তো ককেয় বছর আগেই

ধুকড়ি হয়ে গেছে। খুশপোশাকি কোনো ডোরাকাটা ব্লেজার ছিল কোটের তলায়, কিন্তু বোতাম আঁটার পক্ষে খুবই আঁটসাঁট। একটা কলারের মতো কিছু অবশ্য উঁকি দিচ্ছে জটিলতার ভেতর থেকে। ট্রাউজারে তালি ও ছেঁড়া, নিচের দিকে বিবর্ণ আর ঘষটানো, ভুতুড়ে অবর্ণনীয় একজোড়া পায়ের সঙ্গে মিলছে। আকারহীন চামড়া আর ধুলোঢাকা জুতো।

লোকটার মুখখানা কিন্তু ফুর্তিবাজ হরিণশিশুর মতো। চোখদুটো উজ্জ্বল, আর অন্তর্ভেদী. দেবং সদৃশ হাসিমাখা মুখে কৃত্রিমতা নেই, সাবানের সঙ্গে সম্পর্কও নেই।

নাকখানা যেন গ্রীক নাসা, নাকের ফুটো পাতলা ও চঞ্চল— হয় জাতিবৈশিষ্ট্য, নয় স্বর। কপাল চওড়া ও মসৃণ। তাকনোর ধরন উন্নত ও গর্বিত, যদিও অনিশ্চিতভাবে কাটা খোঁচা দাড়ি এবং নিম্নাঙ্গের এলোমেলো আবরণ একটা ভয়াবহ চেহারার সৃষ্টি করেছে।

অদ্ভুত লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি জানেন স্যর, আমি কী করি?' রিপোর্টার তার ভুতুড়ে চেহারার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন।

ভবঘুরে বললে, 'আপনার জবাব আমাকে আশ্বস্ত করেছে। আমি নিশ্চিন্ত যে আপনাকে বক্তব্য নিবেদন করে আমি কিছু ভুল করিনি। আপনার মধ্যে একজন ভদ্রব্যক্তির সহজাত সংস্কার কিছু বজায় আছে, যার জন্য আপনি ভাল করে জেনেও বলতে বিরত হয়েছেন যে আমি একটি ভবঘুরে। আমি ভবঘুরের মতো দেখতে. আসলে তো ভবঘুরেই, কিন্তু হেঁজিপেজি নই তা-বলে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রয়েছে। আমি গ্রীক ও ল্যাটিনে সুশিক্ষিত, এমন এক কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছি যার নাম বিশ্ববিদিত। আমি একজন জীবতত্ত্ববিৎ এবং তার চেয়েও বড় কথা আমি এক আশ্চর্য কেতাবের ছাত্র—মানুষ। এই শেষ অর্জিত গুণটিকেই এখন পেশা হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছি। যদি আমার দক্ষতা এখনো ফুরিয়ে না গিয়ে থাকে, আমি আপনাকে অধ্যয়ন করতে পারি।'

রিপোর্টারের দিকে সে তির্যক যাচাইয়ের দৃষ্টিতে তাকাল। রিপোর্টার চুরুট খেতে খেতে তার নিরীক্ষণের সামনে নিজেকে সঁপে দেন।

ভবঘুরে বলে. 'আপনি খবরের কাগজের লোক। এ সিদ্ধান্তে কেমন করে এলাম তা বলছি। আপনাকে দশ মিনিট ধরে লক্ষ্য করছিলাম। আপনি যে অলসভাবে সময় কাটাবার মানুষ নন তা বুঝেছি, কারণ আপনি খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে পুলের ওপর হাঁটছিলেন। আপনি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর নদীর জলের ওপর চাঁদের শোভা দেখতে থাকলেন। ব্যবসায়ী মানুষ হলে তাড়াহুড়ো করে দৌড়াত নৈশাহারের জন্য। যখন চুরুট বের করলেন. তার আগে আপনাকে তিন-চারটে পকেট হাতড়াতে হয়েছিল তারপর একটা পেলেন। সংবাদপত্রের মানুষকে স

দিনের মধ্যে অনেকগুলো চুরুট উপহার নিতে হয়, আর সেগুলো তিনি এ-পকেটে সে-পকেটে ঢুকিয়ে রাখেন। আবার দেখুন, আপনার পকেট থেকে কোনো পেন্সিলও বেরিয়ে থাকে না। কোনো সাংবাদিকেরই তা থাকে না। আমার ধারণাগুলো ঠিক তো?'

রিপোর্টার তীক্ষ্ণভাবে অনুমান করে দেখলেন। বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন; আর কিছুদিন আগে আমাকে একটা সংবাদপত্রের অফিসে ঢুকতে দেখেছেন বলে নিঃসন্দেহে আপনার পর্যবেক্ষণেও সাহায্য হয়েছে।'

ভবঘুরে হাসলে। বললে, 'আপনি ভুল করেছেন। কাল যখন আপনাকে দেখি, আপনি তখন বেরিয়ে আসছেন। আপনার মতো লোক আমি পছন্দ করি। আপনি যেমন নিতে পারেন, তেমনি দিতেও পারেন। আজ হুস্টনে প্রায় তিনমাস হল আছি, আর আপনিই প্রথম মানুষ যাঁর কাছে নিজের কথা বললাম। আপনি আমাকে টাকা দিতে চাননি এতেই আপনার ওপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। আমি ভবঘুরে, কিন্তু কখনো কারুর কাছ থেকে টাকাপয়সা গ্রহণ করি না। কেন তা করব? আপনাদের শহরের সবচেয়ে ধনবান্ ব্যক্তিও আমার তুলনায় অতি দরিদ্র। আপনি হাসছেন দেখছি! দেখুন স্যর, একটু বরদাস্ত করুন আমায়। একেক সময় ক্যাকোএথিস্ লোকাণ্ডি (আবোলতাবোল বকা) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন এমন ভদ্রলোক খুঁজে পাই না যে আমার কথাগুলো শুনবে।'

'পোস্টে'র সাংবাদিক এমন অনেক চতুষ্কোণ খয়ে-যাওয়া মানুষ দেখেছেন, যারা ঠিক প্রত্যাশিত পথেই সর্বদা চলবে এবং কথা বলবে। তাই এই লোকটাকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কথা বলতে শুনে তিনি মজা পেয়ে গেলেন।

ভবঘুরে মাতাল নয়, চেহারা দেখলেও মদ্যপ মনে হয় না। চাঁদের আলোয় তাকে দিব্যি ছিমছাম রুচিবান দেখাচ্ছে; আর তার গলার আওয়াজ— হ্যাঁ কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন আজব। ঘুমের ঘোরে সরাসরি কথা বলে যাচ্ছে এইরকমই মনে হয় শুনলে।

সাংবাদিক সিদ্ধান্ত করে নিলেন লোকটা ছিটগ্রস্ত।

ভবঘুরে আবার বলতে থাকে— 'বলেছিলাম না আমার যথেষ্ট পয়সা-কড়ি? সত্যিই তাই। আমি আপনাকে কিছু দেখাব, কয়েকটা অতি আশ্চর্য জিনিস যার অস্তিত্ব আপনারা ভদ্র, খেটেখাওয়া সুবেশ মানুষরা কল্পনাই করতে পারেন না। এই আংটিটা দেখুন।'

পেটানো তামার একটা অদ্ভুত কাজ করা আংটি, চাঁদের আলোয় যার নকশা বোঝা যায় না, আঙুল থেকে খুলে রিপোর্টারের হাতে দিল।

'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তিনবার ঘষুন আংটিটাকে', বললে ভবঘুরে।

রিপোর্টার তাই করলেন, অবশ্য এমন একটা ভুতুড়ে অনুভূতি নিয়ে যে তাঁর নিজেরই হাসি পেয়ে যায়। ভবঘুরের চোখ ঝিকমিক করে ওঠে, আকাশের দিকে

আঙুল তুলে কিছু দেখায়; যেন আঙুল নেড়ে কোনো অদৃশ্য বস্তুর নড়া-চড়া দেখাচ্ছে।

বলে, 'এ হল আর্তামেলা, আংটির দৈত্য— এই ধরুন।'

শূন্য থেকেই খোঁদল হাতে কিছু যেন কাঁছিয়ে তুলে রিপোর্টারের হাতে দেয়। বলে, 'দেখুন! সোনার মোহর। যত খুশি পরিমাণে ইচ্ছেমতো আনতে পারি, ভিক্ষে করতে যাব কেন?'

খালি হাতটাই একটা ভঙ্গি করে ধরে রিপোর্টারের সামনে, উনিও ভান করে কল্পিত জিনিসগুলো তুলে নেন।

ভবঘুরে এবার টুপি খুলে এলোমেলো চুলে হাওয়া খেলিয়ে নেয়। বলে, 'যদি বলি আমার বয়েস ২৪১ বছর, তা'হলে কী ভাববেন বলুন?'

রিপোর্টার বললেন, 'ও থেকে কয়েক শতক কেটে বাদ দিন, তা'হলে মোটামুটি চলবে।'

ভবঘুরে বললে, 'এই আংটি আমায় দিয়েছিল ভারতের বেনারসের এক বৌদ্ধ লামা, আমেরিকা আবিষ্কার হবার একশো বছর আগে। অফুরন্ত ধনের উৎস এটা, ধন-জীবন-সৌভাগ্য। মানুষ যত রকমের সৌভাগ্য ভোগ করতে পারে তা আমায় এনে দিয়েছে। এমন অতুল সম্পদ হাতে থাকতে, এ দুনিয়ায় কাকে আর ঈর্ষা করব? স্বর্গসুখেই আছি, একমাত্র আদর্শ জীবনই যাপন করি।'

আর-কোনো কথা না বলে নদীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ভবঘুরে। রিপোর্টার চলার উপক্রম করতেই সে যেন ভয়ানক চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখতে থাকে। ওর মুখের ওপর একটা পরিবর্তনের ছাপ। ভুরু ক্রমেই নিচু হচ্ছে, হাবভাবে আতঙ্ক। কাঁপতে কাঁপতে কোটটা আঁট করে টেনে ধরছে।

ঘ্যাস্‌ঘেসে ভারী গলায় বললে, 'কী কথা বলছিলাম যেন? বক্‌বক্ করছিলাম বুঝি? এই যে, মিস্টার, এ বান্দাকে দশ-পয়সা দিতে পারেন না কিছু খাবার জন্য?'

আকস্মিক রূপান্তরটা দেখে অবাক হয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন রিপোর্টার।

ভবঘুরে বিড়বিড় করে কিছু বলে, তারপর কাঁপা হাতে পকেট থেকে কাগজে-মোড়া কিছু বের করে।

মোড়কটা খুলে আঙুলের চিম্‌টি করে কিছু তোলে তা থেকে, মুখের মধ্যে পুরে দেয়।

রিপোর্টারের নাকে আসে আফিমের দলার মাথা-ঘুলানো হাল্‌কা মিষ্টি গন্ধটা।....ভবঘুরের রহস্যের এবার সমাধান হল।

An Odd Character, হস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

নাপিতের কথা

'হুস্টন পোস্টের' সাংবাদিক কাঁচুমাচু ভাব করে চেয়ারে ঢুকে বসলেন। কারণ নাপিত তাঁর দিকে উদ্ধত বিদ্রূপভরা চোখে তাকিয়ে আছে। এমন শয়তান গোছের লোকটা, অথচ ঠাণ্ডামাথা, আত্মস্থ, খদ্দের সাধারণের ওপর তার যার-পর-নাই অবজ্ঞা যেন!

একদিন আগেই সংবাদিকের চুল ক্লিপ্ দিয়ে কদম ছাঁট করা হয়েছিল।

'চুল ছাঁটা হবে?'—জিজ্ঞেস করে নাপিত, গলায় শান্ত অথচ পুরোপুরি মারমুখো সুর।

'না, দাড়ি কামাব,' জবাব দেন সাংবাদিক।

নাপিত ভুরুদুটো উঁচোয়, গভীর তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে তার শিকারটিকে। তাবপর খটাং করে সশব্দে চেয়ারটাকে পেছন দিকে মটকে দেয়, হেলান দেয়ার অবস্থানে।

এবার সে একটা মগ আর বুরুশ তুলে নিয়ে চোখের অন্তহীন অবজ্ঞা বর্ষণ করে সাংবাদিকের ওপর, তারপর মুখ সিঁটকে এগিয়ে যায় ফোয়ারা-কলের দিকে। ওখান থেকে ফিরে একখানা বিশাল কাপড় দিয়ে মোড়ে নিশ্চল বলির প্রাণীটিকে। নির্দয় হাতে তাঁর মুখ জুড়ে ছোপ লাগায় পেল্লায় এক-বুরুশ মিষ্টিমিষ্টি ফেনাওয়ালা সাবানের।

তারপর শুরু করে কথা।

'কখনো ওয়াশিংটন এলাকার সীয়াট্লে গিয়েছেন?'— তার প্রশ্ন।

'বুলুব্-আ-লুব্-বুলুব্'—সাবানের ফেনার বিরুদ্ধে লড়াই করে জবাব দেন সাংবাদিক, তারপর দুর্বলভাবে মাথাটা নাড়েন।

নাপিত বললে, 'আমিও যাইনি। কিন্তু আমার এক ভাই আছে, বিল্, সে ফ্লোরিডার সান্-জন থেকে ন'মাইল দূরে একটা কমলালেবুর বাগিচা চালায়। আপনার ঘাড়ের ওপর ওটা একটা ফাটা চুল, ভুল ভাবে বেড়ে উঠছে। উল্টোপাল্টা দাড়ি কামালে ওই রকম গজায়। অনেক সময় হুইস্কিতেও ওইরকম উল্টো ফল দেয়। বড়ো ভীষণ জিনিস হুইস্কি। আপনি ওটা খান নাকি?'

সাংবাদিকের সারা মুখের মধ্যে শুধু একখানা চোখই সাবানের ফেনা থেকে জেগে আছে। আর ওই অক্ষিদ্বার দিয়েই তিনি চেষ্টা করেন নঙর্থক একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে। কিন্তু নাপিত ওঁর চেয়েও খরগতি, বুরুশের একটা দক্ষ ছোবল দিয়ে ও চোখটাও সাবানে ঢেকে দেয়।

নাপিত বলতেই থাকে—'আমার ভাই বিলের ছিল মদ্যপানের অভ্যাস। হুস্টনের

যে-কোনো লোকের চেয়ে বেশি হুইস্কি খেতে পারত, কিন্তু মাতাল কখনোই হত না। আমার দোকানে ওর একটা চেয়ার ছিল, কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। বিলের স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার। যতটা পারে টেনে যখন পেটে আর জায়গা থাকত না, তখন বন্ধ করত হুইস্কি খাওয়া। একমাত্র ওর চোখ দেখলেই বোঝা যেত সেটা। চোখ কী রকম যেন চক্‌চক্ করত, মাছের মতো, কিন্তু উল্টে যেত না। কোনো একটি দিকে দেখতে হলে বিল নিজের হাতের আঙুলগুলো দিয়ে সেইদিকে একটু ঠেলে দিত চোখের গোলা দুটো। ডাকঘরের গম্বুজে যেমন ছোট গোল-গোল জানলা আছে না, হুবহু ওই রকম দেখাত ওর চোখদুটো। পুরো মদে ঠাসা থাকলে বিলের নিঃশ্বাসের শব্দ রাস্তার ওপার থেকে শোনা যেত। মগজ সাফ থাকলে যেমন ভাল কামাত, তেমনি মাতাল হয়েও লোকের দাড়ি ঠিকই কামাত।— ক্ষুরের খোঁচা লাগল নাকি?'

সাংবাদিক একটা হাত নাড়িয়ে জানাতে চেষ্টা করলেন সে রকম ব্যথা কিছু লাগেনি, কিন্তু ক্ষিপ্রচোখে ইশারাটা দেখলেও, নাপিত চেয়ারের ওপর হাতটাকে চেপে ধরল নিজের শরীরের ওজন দিয়ে।

'লক্ষ্য করেছিলাম,' নাপিত বলতেই থাকে, 'বিল অত মদ খেলে কী হবে, আমি যেখানে একজন খদ্দের পাই, ও পায় সেখানে চারজন। লোকে কখনো হয়তো তিন চারজনই একসঙ্গে দলবেঁধে আসে, বসে থেকে নিজেদের পালার জন্য সবুর করে, বিলের হাত কখন খালি হবে সেই অপেক্ষায়। যখন আমার চেয়ার থাকে শূন্য। কী ব্যাপারটা হচ্ছে তা মাথায় ঢোকে না আমার। বিল তো তার যথাসাধ্য করছেই, এমন ভিড়ে পড়ে যায় যে সময়ই পায় না একটু বেরিয়ে গিয়ে শুঁড়িখানায় ঘুরে আসার। তাই পেছনের কামরায় একটা বড় জগ রেখেছে, কয়েক মিনিট বাদে-বাদেই সেখানে শুট্ করে ঢুকে একটু গলায় ঢেলে আসে।

'একদিন লক্ষ্য করলাম, বিলের চেয়ার থেকে একটি লোক নেমে এল কেমন আজব ভঙ্গি করে, একেবারে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। দু'একদিন বাদে দোকান খদ্দেরে ঠাসা, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি। একেকজন আবার বিকেলের মধ্যে ফিরে এসে তিন-তিনবার আলাদা আলাদা সময়ে দাড়ি কামিয়ে গেল। আরো দু'দিন পর, দোকানে এমনই লোকের ভিড় যে তারা বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, রাস্তায় দু'তিনটে বাড়ির দরজা ছাড়িয়ে যায় সে লাইন। বিল সেদিন ন'ডলার কামিয়েছে। সন্ধ্যায় একজন পুলিসের লোক এল, বিনা লাইসেন্সে শুঁড়িখানা চালাচ্ছি বলে কড়কালো আমাকে। ব্যাপারটা যা বুঝলাম, বিলের নিঃশ্বাসে এমনই হুইস্কি ভরা যে একেকটা লোক কামাবার পর ফুর্তিতে মশগুল বেহেড হয়ে বেরিয়ে যায়, আর ইয়ারবন্ধুদের পাঠিয়ে দেয় এখানে এসে কামিয়ে যাবার জন্য।

তিনশো ডলার দিয়ে তবে রেহাই পেলাম। বিলকেও পত্রপাঠ বিদায় করে দিলাম ফ্লোরিডায়।'

নাপিত তার বিড়ম্বিত আসামীর একদিকের কান ধরে অন্যদিকে সজোরে তাঁর মাথাটা কাত করে দেয়, বলে 'একবার আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল পিনে স্ট্রীটে গিয়ে কোনো মরা লোকের দাড়ি কামিয়ে দেবার জন্য। নাপিতরা এধরনের কাজ তেমন পছন্দ করে না, যদিও একাজের জন্য তারা পাঁচ থেকে দশ ডলার অবধি কামায়। ঠিকানা ছিল ১৯০৮ নং পিনে স্ট্রীট। রাত এগারোটা নাগাদ রওনা হলাম। রাস্তা তো ঠিকমতোই পেয়ে গেলাম, আর কোণ থেকে গুনেগুনে ১৯০৮ নম্বরও পেলাম। এসব কাজের জন্য নিজের কাছে একটা ছোট বাক্সো রাখি, তাতে ক্ষুর, সাবান, মগ। আমি ভেতরে গিয়ে দরজায় ঘা দিলাম। একজন বুড়ো মানুষ দরজা খুলল, তার চোখ পড়েছে আমার নাপিত-বাক্সের ওপর।

'জিজ্ঞেস করলে, "ও, তুমিই এসেছ বুঝি, অ্যাঁ? যাক্, ওপরের তলায় চলে যাও, ডানদিকের সামনের ঘরটাতেই আছেন। ওঁর সঙ্গে কেউ নেই। শহরে তাঁর কোনো বন্ধু বা আত্মীয় নেই। এখানে হপ্তাখানেক হল মাত্র বাস করছেন।"

'"কতক্ষণ হল তিনি—মানে ঘটনা কতক্ষণ আগে—?" প্রশ্ন করি।

'"তা বোধহয় ঘন্টাখানেক হবে।" বললে বুড়ো। আমি খুশিই হলাম, কারণ সদ্যমৃতকে ভালোই কামানো যায়, নয়তো দেরি হলে ঠাণ্ডা কাঠ। আমি কামরায় ঢুকে বাতিটা উস্কে দিই। লোকটাকে বিছানায় শোয়ানো হয়েছে। এখনো খানিকটা গরম রয়েছে, মুখে প্রায় এক-হপ্তার দাড়ি। আমি কাজে লেগে গেলাম। আধঘন্টার মধ্যে চমৎকার পরিষ্কার কামানো হয়ে গেল। আহা, বেঁচে থাকলে তার হৃৎপিণ্ডের উন্নতিই হত এতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম, বুড়োর সঙ্গে দেখা হল।

'"কেমন হল?" বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

'আমি বলি, "ভাল। একেবারে ফিটফাট হয়ে গেছেন। টাকাটা কে দেবে?"

'বুড়ো বললে, "কাল আমায় উনি তিরিশ ডলার দিয়েছিলেন, আলাবামায় তাঁর আত্মীয়দের পাঠাবার জন্য। হয়তো তোমার মজুরিটাও ও থেকেই দিতে হবে।"

'বললাম, "পাঁচ ডলার।"

'বুড়ো আমায় একটা পাঁচ ডলারের নোট দিলে, আমিও খুব খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেলাম।'

এইখানে থেমে নাপিত চেয়ারটা ধরে, টেনে সোজা করে। কাপড়টা গা থেকে তুলে নেয়, আর হাত ঢোকায় সাংবাদিকের মাথার চুলের মধ্যে। প্রায়

ছিঁড়েই নেয় মুঠোখানেক, ধাক্কা মারে, থপথপ করে থাবড়ায় মাথাটা। ভয়ানকভাবে নাড়া দেয় আর উপহাসভরে চাপাগলায় প্রশ্ন করে: 'সুগন্ধ দেব কিছু?'

'পোস্টের' সাংবাদিক বোকার মতো মাথা ঝোঁকান, চোখ বন্ধ করে স্মরণ করতে চেষ্টা করেন ভগবানের নাম।

নাপিত বলে, 'তার-পরদিন, কিছু খবর শুনলাম। মনে হয় ১৯০৮ পিনে স্ট্রীটে একজন বুড়ো ঠিকই মারা গিয়েছিল, আর তার মৃত্যুর খানিক আগে ওটার পরের বাড়িতে বিষ খেয়েছিল আরেকটি লোক। এক বাড়ির বাসিন্দারা ডাক্তার ডেকে পাঠায়, আর অন্য বাড়ির কেউ নাপিত ডাকে। মজার ব্যাপার হল ডাক্তার আর আমি দু'জনেই ভুল করে গলদ জায়গায় ঢুকেছি। উনি মরার বাড়িতে ঢুকে ওদের পারিবারিক ডাক্তারকে দেখেন বিদায় নেবার জন্য তৈরি। উনি আর বৃথা প্রশ্ন করে কালক্ষেপ করতে চাননি, সোজাই নিজের স্টমাক পাম্প্ ফিট করলেন মৃতের শরীরে, আর পাম্প করতে লেগে গেলেন বিষ বের করার জন্য। আর আমি এতক্ষণ সময় ব্যস্ত ছিলাম বিষ-খাওয়া রুগির দাড়ি কামাতে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এ ডাক্তার যখন আগের ডাক্তারটির সব ওষুধ মড়ার পেট থেকে বের করে দিয়েছেন, তখন মৃতদেহ চোখ মেলে তাকাল, বিছানায় উঠে বসে ভাজা মাংস আর আলু খেতে চাইল।

'এতে তো ক্ষেপে আগুন পারিবারিক ডাক্তার, তিনি আর স্টমাক পাম্পওয়ালা ডাক্তার লড়াই শুরু করে দিলেন। লড়তে লড়তে দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে পড়ে ভাঙলেন ওদের টুপি রাখার আল্‌নাখানা।'

সাংবাদিক ভীতু গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আর আপনার সেই বিষ খাওয়া রুগিটা, তার কী হল?'

নাপিত বললে, 'সে? সে তো অবশ্যই মরে গিয়েছিল, তবে মরে ছিল বিউটিফুলেস্ট্ বর-কামানো নিয়ে, অমন সেরা কামানো কারুর হয় না।—বুরুশ!'

ভয়ানক চেহারার এক আফ্রিকান ঝাঁপিয়ে পড়ে সাংবাদিকের ওপর, বেঁড়ে ফুলঝাড়ু দিয়ে পেটায় তাঁকে, পেছন থেকে কোট ধরে নামিয়ে দেয় কাঁধের কাছটা।

ভয়ানক গম্ভীর সুরে নাপিত গরগর করে ওঠে, 'আসবেন কিন্তু আবার।' সাংবাদিক্ ততক্ষণে দরজা অবধি পৌঁছে পগার পার।

The Barber Talks, হস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

নাপিতের দোকানে অ্যাডভেঞ্চার

গতকাল 'পোস্টের' সাংবাদিক যখন দোকানে ঢুকে দেখলেন খদ্দেররা সমস্ত চেয়ার দখল করে বসে আছে, মুহূর্তের জন্য আশায় উৎফুল্ল হলেন এই ভেবে যে এবার পালানো যাবে। কিন্তু নাপিতের চোখ, অন্ধকার ভয়াবহ—ঠিক স্থিরনিবদ্ধ হল তাঁরই ওপর।

একটা বিশ্রীরকম কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে—'এর পর আপনি!' অগত্যা সাংবাদিক দেয়ালে আঁটা একটা শক্ত আসনে ধপ্ করে বসলেন, আশাহীন নৈরাশ্য নিয়ে।

কয়েক মিনিট বাদেই একটা খটমট্ আওয়াজ, দুম্,—চেয়ারের খদ্দের ছিট্‌কে পড়ে দু'পায়ে খাড়া। আফ্রিকানটি একটা বেঁড়ে ফুলঝাড়ু বাগিয়ে ঝাড়পোঁছ করতে যাবার আগেই সে দরজা দিয়ে পালিয়েছে।

সাংবাদিক বাইরের রোদের দিকে একটানা চেয়ে থেকে একটা ছোট চিরকুট তাঁর টাইয়ের সঙ্গে লট্‌কে দিলেন টাইপিনে গুঁজে—ওতে দিয়েছেন নিজের নাম ঠিকানা, যদি সাংঘাতিক কিছু ঘটেই যায়!— তারপর বসে পড়লেন চেয়ারে।

নাপিতের কড়া জেরার মুখে জানালেন যে তিনি চুল ছাঁটাবেন না। প্রত্যুত্তরে পেলেন কঠিন অবিশ্বাস আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি।

চেয়ারটাকে হেলানো অবস্থানে ঠেলে কাত করা হল। সাবানের ফেনা তৈরি। ভয়ানক বুরুশটা যখন এক-এক করে ওঁর শ্রবণ, দৃষ্টি আর ঘ্রাণের সব ইন্দ্রিয়ই রোধ করে দিল, সাংবাদিকের তখন হৃত-বিধ্বস্ত অবস্থা। ঘোর কাটল কানে একটা তীক্ষ্ণ ধাতব অস্ত্রের আওয়াজ যেতে—নাপিত সাবানের ফেনা আঁচড়ে তুলছে আর তা মুছছে সাংবাদিকেরই শার্টের আস্তিনে।

* * *

নাপিত বললে, 'সবাই তো আজকাল সাইকেলে চড়ছে। শিগগিরই আর শৌখিন লোকেরা ওটাকে একচেটে করে রাখতে পারবে না ব্যায়ামের সরঞ্জাম হিসেবে। বুঝলেন না, কারুর বাইসিকেলে চড়ার ইচ্ছে হলে তাতে তো আর বাধা দিতে পারছেন না আপনি। রাস্তা সকলেরই সম্পত্তি। আমি নিজে ও-খেলাটাতে কারুর লোকসান দেখি না, আর দিন দিন শখটা জনপ্রিয়ই হচ্ছে। ক'দিন বাদে এমন চল্ হবে সাইকেল চড়ার, যে কোনো-মহিলাকেও চাকার ওপর দেখলে তা একজন রাস্তা-চলা মহিলার চেয়ে বেশি নজর টানবে না। মহিলাদের পক্ষে ওটা ভাল ব্যায়াম। ওরা ঘোড়ায় চড়লে দেখায় যেন কাপড়-টাঙানো দড়িতে ঝোলানো লড়াকু-বেড়াল-ভরা থলির মতো; তার থেকে তো ভালই এটা।

'কিন্তু নিজেদের পুরুষালি দেখাবার জন্য কত কষ্টই না করে তারা। কেন, চেহারায় আর পোশাকে কর্কশ দেখাবার চেষ্টা না করে মহিলারা খেলাধুলায় নামে না কেন? সেদিন ওদেরই একজন কী কাণ্ড যে করেছিল তা যদি আপনাকে বলি আপনি হয়তো বিশ্বাসই করবেন না।'

এই সময় নাপিত এমন ভয়ংকরভাবে সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল, যে উনি অমানুষিক চেষ্টায় সাবানের ফেনা ঠেলে কেশশিল্পীকে আশ্বস্ত করলেন; যাই সে বলুক তা পূর্ণ বিশ্বাসে মেনে নেবেন।

নাপিত আবার শুরু করে, 'আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ম্যাক্‌কিনি অ্যাভিন্যুর এক বাড়িতে, সঙ্গে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল ক্ষুর আর যাবতীয় কামানোর সরঞ্জাম। গেলাম, বাড়িটাও পেলাম খুঁজে।

'একজন সুদর্শনা মহিলাকে দেখলাম গেটের সামনে আগে-পিছে সাইকেলে চক্কর দিচ্ছেন। তাঁর পরনে খাটো স্কার্ট, পায়ে পট্টি আর গায়ে পুরুষের ধরনে তৈরি মোটা কাপড়ের কোট।

'আমি ভেতরে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম, ওরা ভেতরের একটা ছোট কামরা দেখিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভেতরে এলেন যুবতী মহিলাটি, একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর একজন বুড়ি মহিলা এলেন, যাকে আমি তার মা বলে ধরে নিয়েছি।

'যুবতী মহিলা বললেন, "নিন্, কামিয়ে দিন। দুবার কামাবেন, আর একটু তাড়াতাড়ি করবেন; আমার অন্য কাজে যাবার আছে।"

'অবাক হয়ে আমি প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি! তবে কোনো রকমে গুছিয়ে নিই আমার সরঞ্জাম। এ মহিলাই যে বাড়ির কর্ত্রী সেটা পরিষ্কার। বুড়ি মহিলা আমায় ফিস্ ফিস করে বললেন, তাঁর মেয়ে নারী-মুক্তিতে বিশ্বাসী মহিলাদের মধ্যে এক নেত্রী, দৃঢ় পণ করেছেন গোঁফ গজাবেন, আর সেইভাবে টেক্কা দেবেন তার যুবতী সহকর্মিনীদের ওপর।

'মহিলা এদিকে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন।

'আমি সাবানের ফেনায় বুরুশ চুবিয়ে তাঁর ওপরের ঠোঁট বরাবর হাত চালাই। কাজটা শুরু করতে না-করতেই উনি লাফিয়ে উঠে পড়লেন, তাঁর চোখ জোড়া যেন রাগে জ্বলছে।

'ঝামড়ে উঠলেন, "কী সাহস তোমার, আমায় অপমান!"— মনে হল আমাকে যেন খেয়েই ফেলবেন। বলতে থাকলেন, "বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে, এখখুনি।"

'আমি তো হতভম্ব। ভাবলাম উনি বোধহয় একটু উড়োমেজাজের, তাই নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাই। দরজার কাছে পৌঁছে আমার মনের স্থিরতা খানিকটা ফিরে আসে, তাই বলে উঠি: "মিস! আমি কিন্তু আপনাকে

অসন্তুষ্ট করার মতো কিছুই করিনি, আমি নিশ্চিত। যখনই সুযোগ পাই, আমি ভদ্রলোকের মতোই ব্যবহার করি। আপনাকে অপমানটা করলাম কীভাবে?"

'উনি রাগত কণ্ঠে বললেন, "বিদায় হও তুমি! আমি বেশ ভাল করেই জানি কখন পুরুষরা চুমু খেতে যায় আমায়।"

'আর তাই বেরিয়ে এলাম। এ ব্যাপারটাকে কী মনে করেন আপনি?'—প্রশ্ন করেই নাপিত বুড়ো আঙুলের মাথায় আউন্সখানেক সাবান ঠেলে দিল সাংবাদিকের মুখের ভেতর।

অনেক সাহস সঞ্চয় করে সাংবাদিক বললেন, 'মনে হয় এমন কড়া মাত্রার গল্প সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

কামানো বন্ধ রেখে নাপিত এমন হিংস্র, শীতল কুটিল দৃষ্টিতে তার শিকারের দিকে তাকাল যে তিনি তড়বড় করে বললেন— 'তা' হলেও যেমন আপনি বলেছেন তেমনই ঘটেছিল ব্যাপারটা, সন্দেহ নেই।'

নাপিত বললে, 'ঘটেছিল তো বটেই। বলছি না যে আমার মুখের কথাই আপনাকে মানতে হবে। আমি প্রমাণ দিতে পারি। তাকের ওপর ওই নীল মগটা দেখতে পাচ্ছেন, ডানদিক থেকে তিন নম্বরটা? তো, ওই মগখানাই সেদিন আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবার বোধহয় আপনি বিশ্বাস করবেন!'—

'হ্যাঁ', টাকমাথাদের কথাই যদি বলেন,'—নাপিত বলতেই থাকে, যদিও কেউ টাক মাথা নিয়ে একটি কথাও বলেনি—'মনে পড়ে যায় কেমন করে একটি লোক এই হস্টনেই আমায় রাম-ঠকান ঠকিয়েছিল। জানেন তো দুনিয়ায় এমন ওষুধ নেই যাতে টাক মাথায় চুল গজাতে পারে। নিশ্চিত ফল দেবার নাম করে নানান জিনিসই বিক্রি হয়, কিন্তু চুলের গোড়া যদি একবার মরে যায়, কোনো কিছুই তাকে জিইয়ে তুলতে পারে না। গেল বছর শীতকালে একদিন এক খদ্দের এল আমার দোকানে, দাড়ি কামিয়ে গেল। তাব মাথায় পুরো টাক, চায়ের পেয়ালার মতো চকচকে। দুনিয়ার সমস্ত রকম টনিক লাগালেও ও-টাকে একগাছি চুল গজাবে না। লোকটা আমার অপরিচিত। কিন্তু বলল শহরতলিরই কোথাও বাজারের জন্য সবজিবাগান চালায়। তিন চারবার এখানে এসে কামিয়ে গেল। তারপর একবার আমায় ধরল, একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন যাতে আমার মাথায় ফের চুল গজিয়ে ওঠে।'

এই পর্যন্ত বলে নাপিত পেছনের তাকের দিকে গিয়ে এক প্রস্থ আঠা-মাখা প্লাস্টার পটি নিয়ে আসে। তারপর সাংবাদিকের থুতনিটা একটু কেটে দিয়ে তার ওপর সেই প্লাস্টার সেঁটে দেয়।

আবার বলে নাপিত—'নাপিতের দোকানে কোনো খদ্দের চুলের টনিক চাইলে অবশ্যই তা দেয়া হয়। কোনো মিকশ্চার বানিয়ে দিতে পারেন যা একজন তার

মাথার ওপর দিনের পর দিন ব্যবহার করবে, শেষে দেখবে কোনো ফলই ফলছে না ওতে। এরই মধ্যে সে মাঝেমাঝে দোকানে এসে দাড়ি কামিয়ে যাচ্ছে আগের মতো।

'আমি আমার খদ্দেরকে বোঝালাম একটা টনিক আবিষ্কার করেছি, যা এক নাগাড়ে নিয়মিত ব্যবহার করলে একেবারে মসৃণ মাথাতেও চুল গজিয়ে উঠবে। আমি বসে তাকে একটা ফরমুলা লিখে দিলাম, বললাম জিনিসটা তাকে কোনো ওষুধের দোকান থেকে বানিয়ে নিতে হবে। আর যেন কোনোমতেই খবরটা প্রকাশ না করে দেয়, কারণ আমার ইচ্ছা কিছুদিন বাদে প্রক্রিয়াটা পেটেন্ট করে নেব আর অঢেল পরিমাণে বিক্রি করব। ওষুধের প্রণালীর মধ্যে প্রচুর নির্দোষ জিনিস, অম্লচূর্ণ, বাদাম তেল, সুগন্ধ কেশরাগ, গোলাপ জল, মস্তকি নির্যাস আর নানা উপাদান। যেমন মাথায় এসেছিল তেমন-তেমনই লিখে দিয়েছি চোখ বুজে, আধ ঘন্টা বাদে নিজেই বলতে পারতাম না কী লিখেছি। লোকটা ওটা নিয়ে আমায় এক ডলার দিল ফরমুলার দাম। তারপর চলে গেল কোনো ওষুধের দোকানে জিনিসটা তৈরি করে নেবে বলে।

'সে-হপ্তায় সে দু'বার এল দাড়ি কামাতে। বললে একেবারে নিয়মমতো ওষুধটা ব্যবহার করে যাচ্ছে সে। তারপর আর দু'সপ্তাহ তার আর দেখা নেই। তারপর এক বিকেলে এসে টুপিটা খুলে রাখল। আমি তো প্রায় হতভম্ব, যখন দেখলাম তার মাথায় চমৎকার এক গোছা চুল গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ভারি সুন্দরভাবে গজাচ্ছে, অথচ দু'হপ্তা আগেও ওর মাথা ছিল দরজার হাতলটার মতো তেলতেলে।

'সে বলল আমার টনিকে তার অশেষ উপকার হয়েছে, সে খুব খুশি। হবে নাই-বা কেন। ওর দাড়িটা কামাবার সময় কেবলই মনে করতে চেষ্টা করছি জিনিসগুলো কী ছিল যা ওকে লিখে দিয়েছিলাম ব্যবহার করতে? কিন্তু, না মনে পড়ে পরিমাণ, না স্মরণ হয় অর্ধেক জিনিসেরও নাম। এদিকে বুঝতে পারছি আমি আচমকা অঘটনের মতোই আবিষ্কার করে ফেলেছি একটা টনিক যাতে নতুন চুল গজাবে, আর এও জানি ওই ফরমুলায় কাজ দিলে তার মূল্য যে কোনো লোকের কাছে লক্ষ ডলারের সমান। টাক মাথায় চুল গজানো! যদি তা সত্যি সম্ভব হয়, সে তো যে কোনো সোনার খনিরও বাড়া। মনে-মনে ঠিক করলাম ফরমুলাটা বাগাতে হবে ফের। সে চলে যাবার উপক্রম করতে আমি উদাসীন ভাব করে বললাম:

"ভাল কথা, মিঃ প্লাঙ্কেট, আমি আমার ডায়েরি বইখানা হারিয়ে ফেলেছি, ওতেই লেখা ছিল আমার টনিকের ফরমূলা। আজ সকালে দুটো-একটা বোতল তৈরি করিয়ে নিতে চাই। আপনাকে যেটা দিয়েছিলাম সেটা আপনার কাছে থাকলে তার একটা কপি করে নিতাম—আপনি এখানে থাকতে-থাকতেই।"

'আমাকে বোধ হয় অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, তাই আমার দিকে কয়েক মিনিট চেয়ে থেকে সে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল।

'বললে, "ভগবানের দোহাই, আমার তো বিশ্বাস হয় না আপনি কোথাও ওটার কপি রেখেছেন! আমার ধারণা আপনি বেমক্কাই খাঁটি জিনিসটা বের করে ফেলেছিলেন আর এখন মনে করতে পারছেন না কিছুই। আমায় যত কাঁচা দেখায় তত কাঁচা নই, বুঝলেন? ওই চুল গজানোর ওষুধটার দাম এখন অনেক। ঐশ্বর্য যাকে বলে। মনে করছি আপনার নিদানপত্রটা আমি নিজের কাছেই রাখব, আর কাউকে ধরে জিনিসটা বানিয়ে বাজারে বেচব।"

'সে বাইরে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে পেছনের ঘরে আনলাম, আধঘণ্টা ধরে কথা বললাম তার সঙ্গে।

'শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবসার রফা হল তার সঙ্গে, আড়াইশো ডলার নগদ দিয়ে ফরমুলাটা ফের কিনে নিই। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলি, ওই টাকাটা জমিয়েছিলাম একটা বাড়ি তৈরি করবার আশায়। এবার সে আমার দেওয়া নিদানপত্রটা ফেরত দিলে, আর ওটার ওপর সমস্ত স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে একটা কাগজে সইও করলে। আর ওই ওষুধের গুণে দু'হপ্তার মধ্যে তার চুল গজিয়েছে বলে একটা প্রশংসাপত্রও স্বাক্ষর করে দিতে রাজি হল সে।'

নাপিতকে এবার বিমর্ষ দেখাতে শুরু করেছে। সাংবাদিকের শার্টের কলারের নিচে সে আঙুল ঢোকায়, বোতামের ছেঁদা ধরে টানে আর কলারের বোতামটা সাঁ করে দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তায়, ফুটপাত ধরে একেবারে নালার মধ্যে।

নাপিত বলে, 'পরদিনই লেগে গেলাম কাজে। আমার টনিকের ওপর একটা পেটেন্টের আবেদন করে চিঠি পাঠালাম ওয়াশিংটনে। হুস্টনের একটা বড় ওষুধ ব্যাপারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম আমার হয়ে ওষুধটা বাজারে ছাড়বার জন্য। চোখের সামনে তখন আমার মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন। একখানা ঘর ভাড়া করলাম যেখানে বসে টনিকের রসায়ন জিনিসগুলো মেশানো যায়—কারণ আমি ওষুধ-ব্যাপারী বা অন্য কাউকেই জানতে দিতে চাইনি ওতে কী আছে। তারপর অবশ্য ওরা ওষুধটা বোতলে ভরে লেবেল লাগাবে।

'নাপিতের দোকানের কাজ ছেড়ে আমি পুরোপুরিই লেগে পড়লাম আমার টনিকের কাজে।

'পরের দু'সপ্তাহে অবশ্য মিঃ প্লাঙ্কেট দু'একবার এসেছিল দোকানে। তার চুল এখনো চমৎকার বেড়ে চলেছে। শিগগিরই প্রায় দু'শো ডলারের মাল তৈরি হল বাজারে ছাড়ার জন্য। মিঃ প্লাঙ্কেট শনিবারে আসবে শহরে, তার প্রশংসাপত্রটা আমায় দেবে বিজ্ঞাপনের পুস্তিকা আর প্রচারপত্রে ছাপতে। আমি সেগুলো হাজারে-হাজারে বিলি করে সারা দেশ ভাসিয়ে দেব।

'শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ অপেক্ষা করছি টনিক মেশানোর ঘরটাতে, এমন সময় দরজা খুলে গেল, এল মিঃ প্লাঙ্কেট। ভীষণ উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ সে।

'চেঁচিয়ে উঠল, "দেখুন এদিকে! আপনার ওই জঘন্য জিনিসের ব্যাপারটা কী?"

'টুপিটা মাথা থেকে টেনে সরালো, তার মাথাখানা এখন চীনামাটির ডিমের মতো চক্চকে, কেশশূন্য!

'কর্কশ কণ্ঠে বললে, "সবটাই খসে গেছে! কাল সন্ধ্যে অবধি ঠিকই বেড়ে উঠেছিল, তারপর ঝরে পড়তে শুরু করল, আর আজ সকালে দেখি একগাছিও চুল নেই মাথায়।"

'পরীক্ষা করে দেখি, একখানা চুলের চিহ্নও নেই মাথার কোনোখানে।

'ক্ষিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনার টনিকে মশাই উপকারটা কী হল, যদি একবার চুল গজিয়েও তা পরে খসেই পড়ে?"

আমি বলি, "মিঃ প্লাঙ্কেট, ভগবানের দোহাই, এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না, তা'হলে পথে বসব আমি! এই চুলের টনিকের পেছনে আমার যথাসর্বস্ব ঢেলেছি, যেভাবে হোক এখন টাকাটা উদ্ধার করতে হবে। আপনার চুল তো গজিয়েছিলই, সে প্রশংসাপত্রটা অন্তত দিন, এখন দেখি তৈরি মালের কতটা বেচে দিতে পারি। আপনি তো আড়াইশো ডলার আগেই পেয়ে গেছেন, এবার আমায় নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করুন।"

'কিন্তু সে ভয়ানক খেপে আছে, কর্কশভাবেই নস্যাৎ করে বললে, তাকে প্রতারণা করা হয়েছে, টনিকের ব্যাপারটা জোচ্চুরি বলে ফাঁস করে দেবে, আর এইরকমই কত কিছু। অবশেষে আমি তাকে আরো একশো ডলার দেব বলতে সে রাজি হল প্রশংসাপত্রটা দিতে—ওতে শুধু বলা হবে টনিকটাতে তার চুল গজিয়েছিল, ব্যস্। আবার খসে যাওয়ার বিষয়টা উল্লেখই করা হবে না। যতটা তৈরি করা হয়েছে তা যদি এক ডলার বোতলপ্রতি বেচতে পারি, তাহলে মোটামুটি পুষিয়ে নিতে পারব।

'বেরিয়ে গিয়ে টাকা ধার করে আনলাম, সেও টাকা পেয়ে প্রশংসাপত্রে সই করে বেরিয়ে গেল।'

সাংবাদিক যথাসম্ভব সংযত হয়ে, চটাবার মতো সুরে কথা না বলে সিধে প্রশ্ন করেন—'বেচে দিতে পেরেছিলেন আপনার টনিক?'

উপহাসভরা অবজ্ঞার চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে নাপিত যার-পর-নাই ব্যঙ্গের সুরে বলে:

'হ্যাঁ, তা বেচেছিলাম বৈকি। গোনাগাথা পাঁচ বোতল বেচেছিলাম, আর ক্রেতারা বিশ্বাস ক'রে একমাস ব্যবহারের পর, ফিরে এসে পয়সা ফেরত চাইল। যারা ব্যবহার করেছে তাদের মাথায় নতুন একগাছিও চুল গজায়নি।'

'তা'হলে যে মিঃ প্লাঙ্কেটের মাথায় চুল গজিয়েছিল সেটা বোঝাবেন কী করে?' জিজ্ঞেস করেন সাংবাদিক।

'সেটা বোঝাব কী করে?'—এমন ভয়ানক সুরে পুনরুক্তি করে নাপিত, যে কেঁপে ওঠেন সাংবাদিক—'সেটা বোঝাব কী করে? বলছি আপনাকে কেমন করে সেটা বোঝাব। একদিন চলে গেলাম শহরতলিতে, যেখানে মিঃ প্লাঙ্কেট থাকে। তার খোঁজ নিলাম।

'একজন লোক গেটের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, "কোন্ মিঃ প্লাঙ্কেট, বলুন তো?"

'বলি, "আরে ছাড়ুন দিকি, যে প্লাঙ্কেট এখানে থাকে।"

'লোকটা বলে, "তেনারা দু'জনেই তো চলে গেছেন।"

"দুজনেই মানে? কী বলতে চান?"—বললাম, কিন্তু এবার চিন্তা করে লোকটাকে প্রশ্ন করলাম: "ওই প্লাঙ্কেটরা দেখতে কেমন ছিল বলুন তো?"

"ঠিক এক জোড়া মটরশুঁটির দানা। যমজ, তাই কেউ ওদের চেহারায় বা কথাবার্তায় ফারাক ধরতে পারত না। একমাত্র তফাত ছিল একজনের মাথায় মুরগির ডিমের মতো টাক, অন্যজনের প্রচুর চুল।"

সাংবাদিকের শার্টের বুকে দু'আউন্স সুগন্ধি ঢেলে নাপিত বললে, 'এবার তো বোঝাতে পারলাম কী করে? একেক সময় টাক-মাথা প্লাঙ্কেটটা আসত দোকানে, অন্য সময় আসত চুলওয়ালাটা, আর আমি বুঝতে পারতাম না তফাত।'

নাপিত কাজ শেষ করতেই সাংবাদিক দেখলেন আফ্রিকানটা ঝাড়ু হাতে প্রস্তুত সামনের দরজায়। অতএব পেছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করলেন, একটা ইটের দেয়াল ডিঙিয়ে পাশের গলিতে অদৃশ্য হলেন।

Barber Shop Adventure, হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

লাভা-গিরিখাতে অলৌকিক লীলা

আরিজোনায়, সিস্কিওয়া জেলার শেরিফ মশায়ের ছিল একটা গোপন ব্যাপার। তাঁর সেরা বন্ধুদেরও এ বিষয়ে কখনো কিছুই বলেননি, আবার নিজের মন থেকেও কোনোদিন তাড়াতে পারেননি। বন্দুকের আওয়াজ শুনলে তাঁর বুক প্রচণ্ড দুর-দুর করত, লড়াই বা রক্তপাত দেখলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁর নাড়ির গতি মিনিটে পঁচানব্বই, আর, কারো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা হাতে এলেই তাঁর বুক শুকিয়ে যেত। প্রতিবারই নিজের অদম্য উৎসাহী ঘোড়াটার পিঠে চাপবার সময় একটা স্নায়বিক আতঙ্ক অনুভব করতেন। বিপদের সংকেতের মতো কোনো আচম্বিত শব্দ কানে এলে ভয়ে বিহ্বল হতেন। সবসময়েই উচ্চকিত, স্পর্শকাতর, ভয়কাতুরে ভাব, যার কোনো রকমফের নেই। অথচ তবু "র‍্যাড্" কনরাডকে এ অঞ্চলের সবাই অতি-ঠাণ্ডামাথার অত্যন্ত সাহসী এক শেরিফ বলে জানে। তাঁর এই খ্যাতিটুকু বজায় রেখেছেন নিজের প্রকৃতিগত দুর্বলতার বিরুদ্ধে সমস্ত নৈতিক শক্তি খাটিয়ে প্রতি মুহূর্ত লড়ে যাবার ফলে। বিপদের ভয় তাঁর কাছে খুবই বড় হতে পারে, কিন্তু সে-ভয়কেও ছাপিয়ে ওঠে আর এক ভয়—পাছে তাঁর দুর্বলতার কথা লোকে জেনে ফেলে। দুনিয়ার কাছ থেকে নিজের কাপুরুষতাকে কীভাবে লুকিয়ে রাখবেন সেটাই তাঁর নিজের লক্ষ্য। বুকে শীতল আতঙ্ক পুষলেও বিপদকে বেছে নেন— যেন প্রতিপদে বিপদকে বরণ করে নিতে কতই না আগ্রহ তাঁর।

এক লক্ষ্যে পথ চলেন নীরবে, তাঁর পেশার অন্য বেশির-ভাগ লোকের মতো 'পশ্চিমী সুলভ' উগ্রতা বা ঔদ্ধত্য তাঁর মধ্যে নেই। ক্রমাগত খোঁজেন আসন্ন বিপদ আর ঝুঁকি—নিজেকে অকুতোভয় দেখাবার অস্বাভাবিক প্রয়াসে। "ভয়" কথাটার অর্থ নিয়ে যাদের কোনো ধারণাই নেই, তারাও একেক সময় সরে দাঁড়ায় মানুষটার দুর্দান্ত সাহস দেখে। আর তারিফ করে। দেখলে মনে হয়, সামান্যতম উত্তেজিত না হয়েই উনি গম্ভীর চেহারা করে মারাত্মক আসামীদের পেছু নিচ্ছেন, ঢুকে পড়ছেন তাদের আড্ডায়। ভয়ংকর অসুবিধার মধ্যেও লড়াইয়ে মেতে উঠছেন। এমন নাছোড়বান্দা হয়ে যুদ্ধ করছেন মরীয়া বে-আইনি দস্যুদের সঙ্গে যে আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-দেশান্তরে।

র‍্যাডক্লিফ কনরাড তাঁর গোপন তথ্যটা ভালোই সামলে রেখেছেন। সিস্কিওয়া জেলার কোনো বাসিন্দাই তাঁকে কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়াতে দেখেনি। সরাইখানায়, সৈন্যশিবিরে কেবলই তাঁর অটল সাহস আর বেপরোয়া কাজকর্ম নিয়ে গল্প।

শেরিফের ব্যক্তিগত চেহারা যেমন হয়, তাতে ওঁর সাহায্যই হয়েছে। এমনিতেই বলিষ্ঠ সুষ্ঠু গড়নপেটন, খানদানি ছাঁচের সোনালি-চুল মাথা, আর সুসংযত ইস্পাত-নীল চোখদুটো। মনের ভেতর লড়াই চলছে বলে টানটান উত্তেজনা. তাই ওঁর মধ্যে সদাই ফুটে ওঠে একটা গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাব। ওঁর প্রত্যেকটা কাজের পেছনে তাই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আছে বলে মনে হয়—কোনো আবেগের দাবড়ানি নেই। আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করাটাকেই তো এড়াতে চান তিনি। ওঁর ধারণা একদিন তাঁর নৈতিক সাহস হার মেনে যাবেই, সেদিন বন্ধুদের চোখের সামনে তাঁর কাপুরুষ চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিজের মর্মান্তিক দুর্বলতাকে যেভাবে র‍্যাডক্লিফ কনরাড কশাঘাত করেন, তেমনটা তো সাধু-সন্ন্যাসীরাও করেন না তাঁদের পাপিষ্ঠ শরীরের ওপর। কীভাবে এ ব্যাপারে তাঁর জিত হল, তার সাক্ষী হয়ে থাকবে লাভা-উপত্যকায় তাঁর খ্যাতি, এবং বলা বাহুল্য পুব থেকে পশ্চিমে বিপুল এলাকায় লোকমুখে প্রচারিত কাহিনী।

সেই নিষ্ঠুর দিনটা যখন এল, শেরিফকে দ্বিগুণ শক্তি দিয়ে কশাঘাত হানতে হল নিজের নির্যাতিত আত্মার ওপর। লাভা গিরিখাতের শহরটা তৈরি হয়েছিল একটা সমতলভূমির বিস্তারের ওপর, যেটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। সমতল শুরু হয়েছে একটা পাহাড়ি গিরিখাতের নির্গমন পথে। গিরিখাতের মধ্যে ঘন বনজঙ্গল। শহরের মাইল দুয়েক পেছনদিকে সেটা মিশে গেছে আধ-মাইল গভীর এক ফাটলের মধ্যে, তরোয়ালের কোপে কাটা পাহাড়ের মতো। পাহাড়ের ঢালের দুটো দিকই পুরোপুরি দুর্গম। একমাত্র র‍্যাট্‌ল সাপগুলোই সেখানে পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে বাসা করে থাকে। গিরিখাতের ঠিক কিনারায়, যেখানে ঘন বনের ঢাল আরো খাড়া হতে শুরু করেছে, সেখানে একটা সাদা রঙ-করা কুটির। পোস্টমাস্টার এমেট রীডের ঘর। তিনি আবার লোহালক্কড়, ছুরিকাঁচি, অস্ত্র আর গোলাবারুদেরও নামকরা ব্যবসাদার। এখানে পাহাড়ি সোঁতার ধারে, শেওলা ধরা পাথরগুলোর মাঝে খেলা করে রীডদের ছেলেমেয়েরা—লম্বায় একেকটি নলখাগড়ার সমানই—আর ওদের ওপর মোটামুটি নজর রাখে বাড়ির বড় মেয়েটি। কুড়ি বছরের মেয়ে বোডিসিয়া।

একদিন বিকেলে এই এলাকাতেই এসে হাজির অ্যারিজোনা ড্যান। দেশের সবচেয়ে জঘন্য লোক। বড় বড় প্রমোদভবনগুলোতে শ' শ' ডলারের আয়না, কাচের জিনিসপত্র ভেঙে, বিভিন্ন নাগরিকের দেহে প্রচণ্ড যন্ত্রণাকর নানা মাপের তামার বুলেট ঢুকিয়ে অবশেষে এসেছে এখানে। ড্যান এমন মাতাল হয়ে রয়েছে যে র‍্যাড কনরাড সম্বন্ধে কোনো সত্যিকার ভয় তার মনে দাগই কাটল না। সে শুধু ফিকিরে রইল, যতক্ষণ না অন্ধকারের আড়ালে পালানো যায় ততক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

এ সব ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবার পর জেলার শেরিফ নিজের কর্তব্য বুঝে নিলেন, ড্যানকে ধরবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। তাঁর জায়গায় অন্য কোনো সাহসী ব্যক্তি হলে যথাযথ হিসেব করে দেখত—অ্যারিজোনা ড্যানের মতো একটা পিশাচের প্রাণপাখিটির তুলনায় একজন সৎ নাগরিকের জীবনের মূল্য নিশ্চয় বেশি। তাই 'যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার' তত্ত্বটাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিতে সে পুলিসবাহিনী তলব করত, সংখ্যার নৈতিক শক্তি দিয়েই সে অপরাধীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করত রক্তপাতের ঝুঁকি না নিয়ে। কিন্তু এমন কাজ করার লোকই নন্ ব্র্যাড কনরাড। অন্তরে পোষণ করেন বিপদ এড়াবার ইচ্ছা, আবার সাহসের অভাবের কোনো লক্ষণ তিনি বাইরে প্রকাশ করতেও চান না।

অ্যারিজোনা ড্যান্‌কে যারা গিরিখাতের মধ্যে লুকোতে দেখেছে তাদের প্রশ্ন করেন—'সঙ্গে কী কী হাতিয়ার ছিল ওর?'

পানশালার এক মালিক ফেরারি আসামীর হাতে নাকাল হয়েছিল। সে বললে, 'কিচ্ছুটি নয়। দুটো পিস্তলই সে আমার কাছে রেখে গেছে।'

শেরিফও রিভলবারের কোমরবন্দ্ খুলে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন সামনে, বললেন, 'আমার জন্য জমা রাখ। আমি গিয়ে ড্যানকে ধরে আনছি।'

রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন গিরিখাত লক্ষ্য করে, পায়ে হেঁটে। অবাক প্রশংসার চোখে লোকে তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে। ডাক হরকরা বললে, 'ভয় কাকে বলে তা যেন জানেই না, ওই ব্র্যাড।'

জেলা আপিসের কেরানী বললে, 'জন্ম থেকেই অমনটা। ভয়-ডর ভেতরে নেই, তবু বুকের পাটার জন্য কদর করে কে? ড্যান বন্দুক ছেড়ে গেছে বলে উনিও সঙ্গে বন্দুক নিলেন না। ড্যানের মতো জানোয়ার যেখানে, আমার তো মনে হয় কাজটা একটু বেপরোয়াই হল। ড্যানের ওজন ব্র্যাডের চেয়ে, না-হলেও পঁচিশ পাউণ্ড বেশি তো হবেই!'

গিরিখাতের মধ্যে কিন্তু সবকিছুই স্বাভাবিক। অন্তত বাইরে থেকে দেখলে। ছোট পাহাড়ি নদী খাড়া শিলাস্তূপ থেকে সবেগে নেমে এসে ঘন ছায়ার নিচে পাক খাচ্ছে। হীরার ঝলক ছড়িয়ে দিচ্ছে যেখানে ওর মধ্যে রোদের এলোমেলো কিরণ ঠিকরে পড়ে। পাখিগুলো রেডউড গাছের ডালে সমানেই শিস্ কেটে যায়, যেন অ্যারিজোনা ড্যানের মতো কোনো বেখাপ্পা নারকীয় কীট সেখানে নেই, নিজের নোংরা অস্তিত্ব যেন সে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে না নিচেই কোথাও! রীড পরিবারের বাচ্চাগুলো এখন স্কুলে। সুতরাং কোনো কল্পিত হঠাৎ-আগন্তুক কষ্ট করে এখানে এলে শুধু সেই আওয়াজই শুনতো যা একান্ত আরণ্য, সুষম সুরে-বাঁধা। দৃশ্যচিত্রে সুসমতার সমালোচক কেউ এখানে এলেও খুঁত ধবার মতো কিছুই খুঁজে পেতেন না— যদি না অবশ্য এই সময়ে আঙুরলতার

দোলনায় দোল-খাওয়া কুমারী বোডিসিয়া রীডের অলস বসার ভঙ্গিটা তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বড় বেশি বিসদৃশ মনে হত, বনপরীসুলভ নয় বলে।

কুমারী বোডিসিয়াকে ওর ঘরের লোক আর বন্ধুরা 'ডাইসি' বলে ডাকে। ওটা এসেছে তাদের আদি খামখেয়ালি উচ্চারণ থেকে। শুনতে হয়তো বেসুরো লাগতে পারত, কিন্তু বনের মৃদু সুতানকে যেন ও-নাম আপন জোরেই আরো বাড়িয়ে তোলে। বিশাল আঙুরলতায় আধ-শোওয়া থাকলে ওর সদ্য কলপ দেওয়া সাদা মস্‌লিন যেন খসখস্ করে জড়িয়ে ধরে শরীরটা,—যার মাপ একালের আদর্শ মাপ থেকে এক ইঞ্চিও এদিক-সেদিক নয়। 'লাভা' শহরে ইদানীং যে মহিলা-পত্রিকাগুলো এসেছে তাতে দেখানো সর্বাধুনিক ফ্যাশান অনুযায়ী ওর চক্‌চকে কালো চুলের বিন্যাস। ওর নাক-মুখ পরিষ্কার কাটা, সুছাঁদ গড়নের। গ্রীক ট্র্যাজেডি-দেবী মেল্‌পোমিনের মতো চোখ-জোড়া, আর ওর হৃদয় হল পুরাকালের বৃটিশ রানী বোডিসিয়ার মতো, যার নামে ওর নাম।

কুমারী বোডিসিয়া রীডেরও একটা গোপন তথ্য রয়েছে। মেয়েমানুষ বলেই হয়তো তার প্রাণের বন্ধুরা এর অনেকটাই শুনেও ফেলেছে। কিন্তু যেহেতু গোপন, তাই কেউ কেউ তো রয়েছেই যাদের এসব তথ্য জানানো চলে না। মনুষ্য সমাজের এই অংশটা, বোডিসিয়ার সংজ্ঞায়—"ভদ্রলোকের দল।" আর, ভয়ানক গোপন তথ্যটা হল স্মরণকাল থেকেই কোনো মানুষ বা বস্তু সম্পর্কে তার ভয়ডর বা লজ্জার অনুভূতি কখনোই ছিল না,—না কক্ষনো নয়। ছোট ছোট সহজাত মেয়েলি দুর্বলতা বা আতঙ্ক সে বরাবরই ঘেন্না আর অবজ্ঞা করে, ওগুলো সে বোঝে না বলে চিরদিনই মনে ওগুলো সম্পর্কে প্রতিকূল ভাব। সময়কালে জন্ম হলে, আর সুযোগ পেলে সে একটা-দুটো রাজত্বও উল্টে দিতে পারত, সবলে দখল পারত সমাজের রানীর মুকুটটা, অথবা নিদেনপক্ষে বেলুনে চড়ে আকাশ-অভিযান করতে পারত পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের বিশেষ মহিলা-প্রতিনিধি হয়ে। ওর নির্ভীক তেজস্বিতার সামান্য ধারণা করা যাবে নমুনা দেখলে—সাপ, কুকুর, মাকড়সা, খোশগল্প, বজ্রপাত, বেটাছেলে— এ হল আংশিক তালিকা যেগুলো সম্পর্কে কুমারী রীডের অচঞ্চলতা প্রায় ঔদ্ধত্যের কাছাকাছি। চরাচরের প্রভু যে পুরুষ, তার উপস্থিতিতেও কোনো সবিস্ময় ভয় নেই ওর মনে। সীমান্ত শহরে বাস, নানা আকর্ষণের অধিকারিণী বলে কয়েক বছর আগে থেকেই বিয়ের সম্বন্ধ আসছিল। কিন্তু পাণিপ্রার্থীরা কেউই ওর মনে নিছক বন্ধুত্বের চেয়ে কোমল কোনো অনুভূতি জাগাতে পারেনি। বেশির ভাগকেই ও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একজনকে জানলার বাইরেও ছুঁড়ে দিয়েছিল, আর সবাইকেই জানিয়ে দিয়েছে যে ওকে তারা "অবসাদগ্রস্ত করে"। সত্যি বলতে, ওর মধ্যে কাঁপুনি বা দুর্বলতা জাগাতে পারে, এমন কোনো প্রাণী বা বস্তুই সৃষ্টিতে নেই।

ডাকাতদের অতি অসভ্য মানুষ বলে মনে করে, তাদের দিকে দৃক্‌পাতও করে না ও। সরীসৃপ, কাঁটাতোলা ব্যাঙ, ইঁদুর বা বিষাক্ত গিরগিটিদের কৌতূহলের অনুপযুক্ত নিরীহ কীট বলে জানে, ভয় পাবার কারণই নেই তাদের। আঠারো বছর বয়েস অবধি যে গোপন উচ্চাশা পোষণ করেছিল তা হ'ল ছেলেদের মতো পোশাক পরা, সারা পৃথিবী ঘুরে সাবান, অথবা হীরা অথবা স্ফটিক ভাঙা কল বেচা— কিছু একটা হলেই হল। কুড়ি বছরে পা দিতে এসব চিন্তা খানিকটা দমিয়ে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল কোনো অপেরা দলের প্রধানা-নায়িকা হবে—তাই বেশ ক'মাস ধরে গিরিখাতে রোজই প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কণ্ঠস্বর, যা সুমধুর তানে না-হলেও তীক্ষ্ণতা আর উচ্চগ্রামে অনায়াসেই ছাড়িয়ে গেল লাভা উপত্যকার যে-কোনো কণ্ঠকে। খসখসে সাদা মসলিনের আড়ালে যে দেহটা, সেটা যেন এক উদ্ধত জীবনীশক্তির সঞ্চিত বিদ্যুৎ-আধার, যা সবসময়ই চায় কোনো লক্ষ্যবস্তু, আর তার ওপর নিঃশেষে প্রয়োগ করতে চায় নিজের তেজ।

বাড়ি থেকে প্রায় তিনশো গজ ছাড়িয়ে গিরিখাতের খোঁদলে আঙুরগাছের লতায় দোল খাচ্ছে বোডিসিয়া। দুলতে দুলতে অলসভাবেই সে একবার তাকাল বেশ ঘন একটা ঝোপের দিকে। দেখল একটা চোখ পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখের যে-অংশটা সাধারণত সাদা হয় তার মধ্যে যেন লালটাই বেশি।

ও ঝট্‌ করে সোজা হয়ে বসল দোলনার ওপর। চোখটা যখন ওর কাছে মনে হল বেটাছেলেরই চোখ, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কিছু না-ভেবেই ওর হাতটা চলে এল মাথার পেছনে খোঁপার দিকে। একটু সমান করে ওতে চুলের কাঁটাগুলো ভাল করে বসিয়ে নিল।

বলল, 'ওখান থেকে বেরিয়ে এসো।'

মদ খেয়ে চোখ-ভারী, মুখ লাল অ্যারিজোনা ড্যানের। রিভলবারশূন্য বেলট্‌খানা হেঁচকে তুলে ঝোপের নরম ডালগুলো সরিয়ে বিশাল গতরখানা টেনে তুলল রাস্তায়।

'শ্‌-শ্‌-শ্‌'— ভারী গোব্দামুখে সামান্য হাসির ভাঁজ তুলে, আশ্বস্ত করার সুরে বলল—'তোমায় আমি আঘাত দিতে যাচ্ছি না, মিস্‌'।

'আমাকে আঘাত!'—ব্যঙ্গ কণ্ঠে বললে কুমারী রীড, 'সেটা না করাই ভাল। তুমি কী করছ এখানে?'

'একটু গা ঢাকা দিয়ে আছি, মিস্‌, যতক্ষণ না রাত হয়। বুঝলে তো, এই যাকে বলে একটু মাতামাতি করতে গিয়ে গেলাস-টেলাস কিছু ভেঙেছি। হয়তো কাউকে জখমও করে থাকব। সব হুইস্কির ফল। তুমি একজন সুন্দরী অল্পবয়েসী মহিলা, বেটাছেলের কথায়-দাম দেবে না, তাই একটা ঘোড়াই বাজি রাখছি।'

তারিফ জানাবার এলোমেলো চেষ্টা করে বিশেষ ফল পেল না ড্যান। বোডিসিয়া অনড় উপেক্ষাভরা দৃষ্টিতে কঠোরভাবে চেয়ে রইল তার দিকে।

বোডিসিয়া তার স্বাভাবিক উঁচু কেতার কথাবার্তা বদ্‌লে স্থানীয় লব্‌জেই বলে যাতে তার শ্রোতার উপযুক্ত হয়— 'এখানকার গাড্ডাগর্তের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে চাও না নিশ্চয়? ভড়কি খেয়ে ডুব মারোনি তো?' —শেষ কথাটা বললে অন্তহীন শ্লেষের সঙ্গে।

অ্যারিজোনা ড্যান অস্বস্তিভরে এ-পা থেকে ও-পায়ে ভার বদল করে—'ভয় আমি পাইনি, তবে জালে পড়েছি। সারা শহরের সঙ্গে তো আর লড়তে পারি না।'

'কেউ তোমার পেছু নিয়েছে?'

'এখনো না নিলেও, পরে নেবেই। র‍্যাড কনরাড রয়েছে শহরে, আর—'

অ্যারিজোনা ড্যান শাপান্ত করে, খাড়া নিচু রাস্তাটার দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে—'ওই তো এবার আসছে সে।'

বোডিসিয়া উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝখানের ঝোপগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঁকি দেয় ওপাশে। শেরিফ নিরস্ত্র, গায়ে হালকা গ্রীষ্ম স্যুট, যার ফলে তার বলিষ্ঠ সুকুমার দেহ সুপরিস্ফুট। পথ ধরে হেঁটে আসছেন। কোঁকড়া কটা চুলে মাথা থেকে সূর্যের সোনালি আলো ঠিকরে পড়ছে। বোডিসিয়া তাঁকে দেখল আর প্রেমে পড়ে গেল প্রথম দর্শনেই।

আসামীর সামনে থেকে দশ পা' দূরে এসে তিনি মাথার টুপিটা খুললেন, একটা সিল্‌কের রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন।

নিস্তরঙ্গ কণ্ঠে বললেন, 'ড্যান, তোমাকে আমার চাই।'

অ্যারিজোনা ড্যান বুটের কিনারা থেকে একটা ন'ইঞ্চি লম্বা ছোরা বের করল। মুখে চেরা হাসি, আর ডান হাত ইঙ্গিতবাচক ভঙ্গিতে ওপরে তোলা। বললে, 'এসো না! ধরো আমাকে!'

চক্‌চকে ছোরা হাতে ওই দানব দস্যুটাকে খালি হাতে পাকড়াতে চান শেরিফ? তাকে দেখেই তো ওঁর সেই পুরনো, অনেক-চেনা প্রাণান্তক ভয়— গা-বমি করা, ভীরু শারীরিক আতঙ্ক স্পর্শ করে তাঁকে। বুক-বসে-যাওয়া আতঙ্ক থেকেও যে অসম্ভব অহংকার আর আশ্চর্য নৈতিক শক্তির জোরে তিনি দুঃসাহসী কাজের নমুনা বের করে আনেন সেই ক্ষমতাই তাঁকে আরো এক পা সামনে এগিয়ে দিল। অ্যারিজোনা ড্যান হাসল,—নিচু, আধা-প্রকৃতিস্থ, কিন্তু হাড় হিম-করা হাসি। এমনই মৃদু সে হাসি যে সোঁতার কলগুঞ্জনও শেরিফের কানে ঠেকে ওঁর কাপুরুষতায় ব্যঙ্গ করে কারো খিলখিলে হাসির মতো।

মুহূর্তের জন্য র‍্যাডক্লিফ কনরাডের ভারসাম্য শিথিল হয়েছিল। একটা সর্বগ্রাসী

আতঙ্ক ওঁকে চেপে ধরে যেন। সামনে এগোতে গিয়ে যে পা-টা তুলছিলেন তার ওজন বুঝি একশো মণ। ফাঁকা জমির ওপাশে, ওঁর ডান দিক থেকে একটা গাছের ডালের খস্খস্ শব্দ ওঁর চকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দশ সেকেণ্ডের জন্য দেখতে পেলেন একজোড়া কালো চোখ। সে চোখ বিদ্যুতের মতো হানলো কিছু অদ্ভুত তুরীয় সারসত্তা ওঁর শিরায় উপশিরায়। ওঁর দেহের ভেতর কোথা থেকে যেন একটা গুরুভার ওজন সরে গেল, ওঁর মনে হল সেটা বুঝি ওই পড়ে যাচ্ছে কোনো শব্দহীন গহ্বরে। অ্যারিজোনা ড্যানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মৃদু, ফুর্তিভরা গলায়,—অনেকদিন থেকে যে খেলনাটি পাবার আশা সেটি পেয়ে গেলে শিশু যেমন হাসে।

'আসছো তো?'—বললেন শেরিফ, বর যেমন বধূকে ডাকে তেমনই এক সুরে।

'যদি দু'পাও সামনে এগোও, তোমার হৃৎপিণ্ড টুকরো করে দেব, র‍্যাড কন্‌রাড!— বললে অ্যারিজোনা ড্যান।

ওপরের চাতালে বোডিসিয়া সামান্য খরখরিয়ে উঠলেও, শেরিফ চোখ তুলে দেখলেন না, শুধু হাসলেন আরেকবার। ছোরাটা তরোয়ালের মতো সামনে তাক করে ধরেছে ড্যান, গাঁটের পেছনে বুড়ো আঙুল চেপে। শেরিফ বেড়ালের ভঙ্গিতে ইঞ্চিতিনেক কুঁকড়ে যান। মনে হচ্ছে নিজেকে সামলে নিয়ে দু'পায়ের ওপর সমান ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছেন। অ্যারিজোনা ড্যান ছোরা প্রস্তুত রেখে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। র‍্যাড কনরাড কি এমনই বোকা যে তাকে খালি হাতে আক্রমণ করবেন?

শেরিফ হয়তো আনন্দে চিৎকার করেই উঠতেন। বিজলির ঝলকের মতো বীরত্ব আর দুঃসাহস তাঁকে পেয়ে বসেছে এবার। আর যেন কখনোই ভয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে না তাঁর, এই রকমই ভাবেন। কিছু-একটা প্রবেশ করেছে তাঁর রক্তে যা আগের ঝুটো মানুষটাকে বদলে একজন সত্যিকারের পুরুষ করে দিয়েছে তাঁকে। উনি টের পাচ্ছেন দুটো কালো চোখ ওর ওপর স্থিরনিবদ্ধ, কিন্তু নিজের নজরটা ঠায় ধরে রেখেছেন ড্যানের চোখের দিকে।

এতদিন পর্যন্ত শেরিফের কাণ্ড-কীর্তিগুলোর সঙ্গে আকস্মিক দৈবের যোগাযোগ থাকত, যার ফলে তিনি বিপদ থেকে বেমালুম বেরিয়ে আসতেন। কিন্তু সে যোগাযোগ ছিল অন্ধ, অকল্পনীয় দৈবের— যার জোরে শিশুরা বা মাতালরাও রক্ষা পেয়ে যায় নানাভাবে। এবার তিনি বুঝলেন সতর্কতা কাকে বলে— একই সঙ্গে কর্তব্যের অদম্য প্রেরণা আর সফলকাম সেনাপতির বিবেচনা বুদ্ধি। এর জন্যেই তো সাহসিকতার মূল্য। অলৌকিক লীলার অর্ধেক তো ঘটেই গেছে, এর পর ঘটবে বাকি অর্ধেকটা।

উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ফলেই নিশ্চয় অ্যারিজোনা ড্যানের স্নায়ুগুলো বিপর্যস্ত। না হলে বোডিসিয়ার পায়ে ধাক্কা লেগে একটা ছোট্ট পাথরের টুকরো ওর পাশের রাস্তাটায় গড়িয়ে পড়তে ও চমকে উঠবেই বা কেন, আর দেখবার জন্য আচমকা সেদিকে মাথা ফিরিয়ে সুযোগটাই বা দেবে কেন? কিন্তু তাই করল সে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শেরিফের একখানা হাত চেপে ধরল ওর ছোরা-ধরা হাতের কব্জি, আর অন্য হাতটা পাকড়ে ধরল ওর কোমর। তারপর অ্যারিজোনা ড্যান অবাক হয়ে টের পেল ওর ছোরা-ধরা হাতখানা ধীরে ধীরে মুচড়ে যাচ্ছে ওর সব প্রতিরোধ সত্ত্বেও—মোচড় খাচ্ছে বাইরের দিকে, যতক্ষণ না শিরা আর পেশীগুলো ছিঁড়তে থাকে। শেরিফের হাত যেন ইস্পাতের সাঁড়াশি। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠতে ড্যানের হাত থেকে ছোরা পড়ে যায়। পাথরের ওপর ছোরার টুং আওয়াজটা কানে যেতেই শেরিফ হঠাৎ ওর কব্জিটা ছেড়ে দেন, আর বাঁ-দিকের সামনের বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরেন ড্যানের কণ্ঠদেশ। ওরা এত কাছাকাছি যে ঘুষাঘুষি চলে না, তেমন ঠেলাঠেলি বা পা বদলাবদলিও নেই। শেষ পর্যন্ত যে পক্ষ নড়াতে পারল তারই জিত, দুজন মল্লযোদ্ধা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। অ্যারিজোনা ড্যানের মাথার দিকে ছুটে-আসা একটা পাথরের ছোট চাঁই তাকে কাত করে দিল, শুইয়ে দিল এমন বিশ্রি অসাড় ঢিবির মতো যে হেরে-গেছে বলে চেতনাও রইল না তার। তামার বুলেট উপহার দিয়ে বেড়াত যে লোকটা তার পরাজিত দেহের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে শেরিফ পকেট থেকে দড়ি বের করেন, অপমানজনকভাবে বেঁধে দেন তার হাত পা। তারপর তিনি একলাফে উঠে দাঁড়ান, হলদে কোঁকড়া চুল আর লাল মুখটা ঘুরিয়ে তাকান তাঁর নতুন ব্যক্তিত্বের উৎসের দিকে, সূর্যের দিকে যেমন ফেরে সূর্যমুখী ফুল।

বোডিসিয়া নবযৌবনা চিতাবাঘের মতো ঝোপের ভেতর থেকে সরসর্ করে নেমে আসে।

'আপনি তো পাক্কা বাহাদুর মানুষ!' বললে সে, 'এমন আর কাউকে দেখিনি। নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমি—'

আচমকা থেমে যায় সে। শেরিফ সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই প্রথম গালে একটা আজব উত্তাপ অনুভব করে সে, ভাবে বুঝি জ্বর এসেছে। এই প্রথম আরেকজনের চোখের সামনে ওর নিজের চোখ ধীরে ধীরে নত হল। এই প্রথম ওর জিভে এল জড়তা আর তোতলামি।

শেরিফ বলতে শুরু করেন, 'শিগগিরই অন্ধকার হয়ে যাবে'... ওর কানে তাঁর গলাটা শোনায় যেন পাইন বনের হাওয়ার মতো সুদূর—'আমাকে বরং তোমার সঙ্গে বাড়ি অবধি হেঁটে যেতে দাও। এ লোকটার জন্য একটা ঘোড়া নিয়ে আসব, ততক্ষণে এর সম্বিত ফিরবে। তুমি তো মিস্ রীড, তাই না? তোমার বাবাকে আমি চিনি।'

রেডউডের বনে মৃদুমন্দ সান্ধ্য হাওয়ার শিরশিরানি। একটা হিকোরি গাছের ওপর সড়াক করে উঠে যায় কাঠবেড়ালি। সোঁতার ধারে ছায়ার আঁধার থেকে পেঁচার প্রথম ডাক শোনা যায়। সোঁতার জল থেকে আর বিদ্রূপের কলহাস্য নয়,
বয়ে আসছে গৌরবের গাথা। ওরা দুজন একসঙ্গে পথ ধরে হেঁটে যাবার সময় ব্রিটনদের রানী বোডিসিয়ার সমনাম-ধারিণীর মুখ থেকে একটা আঁতকে-ওঠা চিৎকার জাগে—'কী বিচ্ছিরি টিকটিকি, ও মা!'

শেরিফের সবল বাহু ওকে আশ্রয় দেয়। অলৌকিক লীলা সাঙ্গ হয়েছে। একজনের হৃদয় এখন আরেকজনের হৃদয়ে।

The Miracle of Lava Canyon, হুস্টন পোস্ট, ১৮৯৬

শিসের সুর আর উপহার

ও হেনরী ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প

বন্ধ 'বাক্স'-গাড়ির পেছনের দরজাটা সাবধানে খোলে ডিক—শিসের সুর-বাজিয়ে ডিক। ও খুব সতর্ক, কারণ শহর-অর্ডিনান্সের ৫৭১৬ ধারা অনুযায়ী হুকুম রয়েছে সন্দেহক্রমে যে-কোনো কাউকে গ্রেপ্তারের। হুকুমটা সংবিধান বিরোধী হয়তো। তবে বহুদিন থেকেই এ অর্ডিনান্সের সঙ্গে পরিচয় আছে ওর। তাই গাড়ি থেকে বেরুবার আগে ও পাক্কা সেনাপতির মতো পুরো এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করে নেয়।

শেষবার যখন দেখে গিয়েছিল তার পরে কোনো নতুন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। দক্ষিণের এই বিশাল শহর ভিক্ষাদানে অকৃপণ, দীর্ঘদিন কষ্ট সয়েছে, আর শীতকালে ভবঘুরেদের পক্ষে তো সাক্ষাৎ স্বর্গ। নদীপাড়ের বাঁধ, যেখানে ডিকের মালটানা গাড়িটা দাঁড়িয়ে, সেখানে ছোট-ছোট ডাঁই করে-রাখা পণ্যদ্রব্যের কালো সারি। বস্তা আর পিপের ওপর চাপা পুরনো তেরপলের গা-গুলোনো গন্ধ বাতাসে—ভালোই চেনা গন্ধটা। নৌকো-জাহাজের ফাঁক দিয়ে তেলের গাঁজলা তুলে বয়ে চলেছে মেটে রঙের নদী। ভাটির দিকে অনেকটা দূরে শালমেট, সেখানে ও দেখতে পায় স্রোতের বাঁকটা, বিজলি বাতির সারিতে রেখায়িত। নদীর ওপারে আলজিয়ার্স—লম্বা এবড়োখেবড়ো কালো ছোপের মতো। আরো কালো দেখাচ্ছে উষার ফিকে আকাশের পটে। ভোর সকালেই কোনো জাহাজ ছাড়বে, তাই একটা-দুটো মেহনতী টানা-বোট বুক-কাঁপানো শিটি বাজিয়ে ছুটে

আসছে। ওটাই দিন শুরু হবার সংকেত মনে হয়। ইটালীয় পালখাটানো জাহাজগুলো গুটিগুটি জেটির দিকে এগুচ্ছে প্রত্যূষের শাকশব্জি চিংড়িকাঁকড়ায় বোঝাই হয়ে। একটা অস্পষ্ট গর্জন, যেন মাটি থেকে ওঠার মতো টের পাওয়া যায়, শুনতেও পাওয়া যায় ঠেলাগাড়ির ভারী চাকা আর ট্রামগাড়ি থেকে। আর ফেরি বোট, যেগুলোকে বলে 'মেরীঅ্যান', মন্থরভাবে চলতে শুরু করেছে তাদের সকালের বেগার-খাটা কাজে।

হঠাৎ চট্ করে গাড়ির ভেতর ঢুকে যায় 'শিস্-কাটা' ডিকের লাল মাথাটা। দৃশ্যের মধ্যে এবার যোগ হয়েছে এমন এক মহান্ গর্বোদ্ধত মূর্তির, যার দিকে তাকাতে পারে না সে। এক বিশালবপু অতুলনীয় পুলিসম্যান এক গাদা চালের বস্তা পাকড়াও করে দাঁড়িয়ে আছে ওর গাড়ির কুড়ি গজের মধ্যেই। পৌর আমলা গৌরবের এই নমুনাটি আবার তারিফের দৃষ্টিতে মন দিয়ে দেখছে আলজিয়ার্স-এর আকাশে ঊষা-উদয়ের দৈনন্দিন আশ্চর্য দৃশ্যটা! নিরপেক্ষ মর্যাদার চোখে হাল্কা রঙের খেলা দেখে অবশেষে চওড়া পিঠ ফেরালেন সেদিকে—ভাবখানা যেন সে বুঝে গেছে আইনের প্রয়োগের এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই, সূর্য যদি ওঠে তো উঠুক। তাই সে মুখ ঘোরাল চালের বস্তাগুলোর দিকে, ভেতরের পকেট থেকে একটা চ্যাপটা বোতল বের করে ঠোঁটের ওপর রেখে আকাশটা দেখতে থাকল।

এই অফিসারটির সঙ্গে পেশাদার বাউণ্ডুলে শিস্-কাটা ডিকের আধা-বন্ধুত্বের পরিচয়। দুজনেই সঙ্গীত ভালবাসে। তবু, বর্তমান অবস্থার বিচারে সে পরিচয়টাকে ঝালিয়ে নিতে চাইছে না। একজন পুলিসের সঙ্গে নির্জন রাস্তার মোড়ে দেখা করে তাকে দুটো অপেরার সুর শিস্ বাজিয়ে শোনানো, আর একটা মালগাড়ি থেকে গুঁড়ি মেরে বেরুতে গিয়ে তার হাতে পড়া—এ দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাত আছে। তাই ডিক সবুর করে, নিউ অর্লিন্সের একজন পুলিসম্যানকেও তো একসময় সরতেই হবে, হয়তো প্রকৃতিরই পরিশোধের বিধান এটা। একটু পরেই 'হোঁত্কা সেপাই' সাড়ম্বরে অদৃশ্য হল সারি-বাঁধা গাড়ির ফাঁক দিয়ে।

শিস-কাটা ডিক গাড়ির মধ্যেই অপেক্ষা করল যতক্ষণ থাকা ওর বিবেচনায় সঠিক। তারপর চট্ করে নেমে পড়ল মাটিতে। যতটা সম্ভব রোজকার কাজের ধান্দায়-ফেরা কোনো সৎ মজুরের মতো ভাব করে সে রেললাইনের কাটাকুটি জাল পার হল—উদ্দেশ্য নির্জন জিরো স্ট্রীটটা ধরে লাফায়েত চত্বরের একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চে পৌঁছোনো। ব্যবস্থামতো সেখানে তার আরেকবার মিলবার কথা 'স্লিকে'র সঙ্গে। ও-নামে পরিচিত ওর ইয়ারবন্ধুটি রোমাঞ্চসন্ধানী পথযাত্রী, ওর একদিন আগেই চলে এসেছে একটা গরুভেড়া-বোঝাই গাড়িতে। গাড়ির একটা ভাঙা তক্তা তাকে ভ্রমণের লোভ দেখিয়েছিল।

এখনও রাতের অন্ধকার যায়নি বোঁটকাগন্ধ, বড়বড়, স্যাঁতসেঁতে গুদামঘরগুলো

থেকে। ওরই মধ্যে পথ করে যাবার সময় ওর সেই পুরনো অভ্যাসটা ছাড়তে পারল না শিস্-কাটা ডিক, যে-কারণে ওর এই নাম। চাপা অথচ পরিষ্কার প্রত্যেকটা স্বরক্ষেপ, সুরেলা 'ববোলিঙ্ক' পাখির মতো নির্ভেজাল তরল শিসের শব্দ আছড়ে পড়ে আবছা শীতল ইটের পাহাড়ে—বনের আড়ালে কোনো জলাশয়ের মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটার মতো। একটা গৎ ও অনুসরণ করছিল, কিন্তু তা কুহেলীর মতো মিশে গেল স্বতোৎসারিত অন্য কোনো উদ্ভাবনের ঘূর্ণিস্রোতে। খুঁজলে ওর মধ্যে আপনি পেতেন পাহাড়ি সোঁতার কাঁপুনি, স্থির জলাশয়ে কম্পমান সবুজ নলখাগড়ার খরখরানি, তন্দ্রাতুর পাখিদের শীৎকার।

একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে শিস্-শিল্পী ধাক্কা খেল নীল উর্দি আর পেতল বোতামওয়ালা এক পাহাড়ের সঙ্গে।

পাহাড় শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তা হলে তুমি এর মধ্যেই ফিরে এসেছ! এদিকে বরফ পড়তে তো আরো দু'হপ্তা বাকি। তা ছাড়া শিস্ দেবার কায়দাও ভুলে গেছ। ওই শেষ পদটাতে একটা বেসুরো স্বর বাজিয়েছ।'

একটু গা ঘেঁষার মতলবে ডিক বললে, 'পাহারাদারমশাই জানেন তা'হলে এসব? আপনার তো আবার শেরমান-বাদ্যের নানা টুকিটাকি সুর। পাহারাদার মশাই গানবাজনা জানেন? কানটা খাড়া করুন, আবার ভাল করে শুনুন। এই রকমভাবে বাজিয়েছিলাম আমি— দেখুন!'

ঠোঁটটা সে সবে গোল করেছে, কিন্তু মোটা পুলিসম্যান হাত তুলল।

'থামো!' বললে সে, 'ঠিকভাবে শেখার চেষ্টা কর। আর এও শিখে নাও—গড়িয়ে-বেড়ানো পাথর পয়সা পেলেও শিস্ দিতে পারে না।'

হোঁতকা সেপাইয়ের ভারী গোঁফ গোল চক্কর হল, আর তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর কোমল শব্দ, বাঁশির মতো। ভবঘুরে যে-সুরটি বাজাচ্ছিল তারই কয়েকটা পদ সে ফের বাজিয়ে শোনাল। তার প্রণালীটা নীরস, কিন্তু যথার্থ। আর যে-জায়গাটায় তার আপত্তি ছিল সেটা একটু জোর দিয়েই বাজাল।

'ওই রে-টা হল মধ্যম 'রে', খাদের নয়। ভাল কথা, তোমার কপাল ভাল যে আমার দেখা পেয়েছ। এক ঘণ্টা বাদে, তোমায় হাজতে ঢোকাতে পারি, তখন শিস্ কাটবে জেলের পাখিদের সঙ্গে। হুকুম আছে সূর্য ওঠার পর সব অকম্মাগুলোকে পাকড়াবার।'

'কী হুকুম?—'

'অকম্মাদের ধরার—মানে যাদের প্রকাশ্য রোজগারপত্তর নেই। কয়েদ খেটে দাম দেবে, নয়তো পনেরটা ডলার।'

'এটা কি খাঁটি কথা? নাকি আমায় ধোঁকা দিচ্ছেন?'

'তোমায় যে ইশারা দিলাম তাই তোমার ভাগ্যি হে! আমার ধারণা তুমি বাকি-গুলোর

মতো বাজে নও, আর তাছাড়া 'ডি-ফ্রাইশুৎস্' গানটা তুমি আমার চেয়েও ভাল শিস্ দিয়ে বাজাতে পার। রাস্তার মোড়গুলোতে আর কোনো পুলিসম্যানের খপ্পরে পোড়ো না। কিছুদিন শহরের বাইরে গিয়ে থাকো। বিদায়!'

অতএব বোঝা যাচ্ছে মাতা অর্লিন্স এবার বছর-বছরে আগন্তুক এই বাউণ্ডুলের দলকে নিয়ে হয়রান হয়ে উঠেছেন—ওরা তো এসে তাঁরই সদয় পক্ষপুটে আশ্রয় নিত!

হোঁতকা পুলিস চলে যাবার পর, টালবাহানা করে ডিক মিনিটখানেক দাঁড়ায়। ভাড়া বাকি-রাখা ভাড়াটেকে উঠে যাবার হুকুম দিলে তার যা মনের অবস্থা হয়, তেমনই অনুভূতি ওর। কত ভেবে রেখেছিল বন্ধুর সঙ্গে মেলার পর স্বপ্নের আয়াসে দিনটা কাটাবে; তারপর একদিন জেটি এলাকায় ঘুরে বেড়াবে আর ফলের স্টীমারগুলো থেকে মাল খালাসের সময় ছড়ানো ছিটোনো কলা-নারকোল চিবোবে; আবার একদিন মাগনা-খাবার খাবে ভোজনাগারের কাউন্টারে, সেখানকার দিলদরিয়া মালিকরা এমন ভালো আর দরাজ যে ওকে তাড়াবেই না; তারপর একটা ছোট ফুলের পার্কে শুয়ে তন্দ্রা দেবে, নয়তো জাহাজঘাটারই কোনো ছায়াঢাকা কোণে শুয়ে ঘুম। কিন্তু এবার যে নির্বাসনের কড়া হুকুম, আর ও জানে তা মানতেই হবে। তাই একটা চোখ পিতল-বোতামের দিকে খোলা রেখে ও পশ্চাদপসরণ শুরু করে, কোনো গ্রাম্য আশ্রয়ের দিকে। কয়েকটা দিন গ্রাম দেশে কাটালে বড়ো একটা প্রাণান্তকর কিছু যে হবে, তাও নয়। তুষারপাত হলে একটু ঠাণ্ডা লাগা ছাড়া, তেমন কোনো বিপদের সম্ভাবনা তো ও দেখতে পায় না।

যাই হোক, মন খারাপ নিয়েই ডিক নদীর ভাটির পথে যেতে গিয়ে পুরনো 'ফরাসী' বাজারটার ধার দিয়ে এগোয়। সাবধানতার খাতিরে আবার সেই পুরনো ভূমিকাটা নিয়েছে, যেন কাজের ধান্দায় ফেরা কোনো খাটিয়ে মজুর। বাজারের একজন দোকানদার কিন্তু চিনতে ভুল করেনি, ওকে হাঁক দিয়ে ডাকল ভবঘুরেদের সাধারণ নামটা ধরে—আর 'জ্যাক'ও দাঁড়িয়ে পড়ল অবাক হয়ে। নিজের দক্ষতার সদ্য প্রমাণ পেয়ে নরম হল দোকানী, ওকে দান করল ফুটখানিক লম্বা 'ফ্র্যাঙ্কফুর্টার' সসেজ আর আধপাউণ্ড রুটি। সুতরাং প্রাতরাশের সমস্যাটা মিটে গেল!

তারপর রাস্তাগুলো যখন ভৌগোলিক কারণে নদীপাড় ছেড়ে সরে যাচ্ছে, নির্বাসিত ব্যক্তি উঠল একটা বাঁধের পথে। পথটা বহু-ব্যবহৃত। তাই নিজের মতোই চলল সে বিনা আয়াসে। শহরতলীর চোখগুলো ওকে শীতল সন্দেহের সঙ্গে দেখে। একেকটা লোক যেন শহরের হৃদয়হীন আইনের কড়া প্রতিমূর্তি। জনাকীর্ণ নগরীর নিঃসঙ্গতাটা ও পাচ্ছে না এখানে, ভিড়ের মধ্যে সর্বদাই যে নিরাপত্তা, তা এখানে নেই।

ছ'মাইল পথ যেমন-তেমন হেঁটে ও শালমেট্-এ আসতেই হঠাৎ যেন ওর

সামনে বিভীষিকার মতো দাঁড়ায় বিশাল হতভম্ব-করা কল-কারখানা। একটা নতুন বন্দর গড়া হচ্ছে; তার জন্য জেটি তৈরি হচ্ছে, কম্‌প্রেসগুলো ওপরে উঠছে, আর সাপের মতো চারদিক থেকে ছুটে আসছে শাবল, গাঁইতি, হাতগাড়ি—যেন ওকেই লক্ষ্য করে। একটা হামবড়া ফোরম্যান ওর ওপরে এসে পড়ল। কোনো রংরুট সার্জেন্টের মতোই সে ওর পেশী আর শরীর যাচাই করল। ওর আশপাশে বাদামি মানুষ, কালো মানুষ কাজ করে চলেছে। ভয়েই পালিয়ে গেল ডিক।

দুপুর নাগাদ ডিক পৌঁছেছে আবাদ-বাগিচার অঞ্চলে। চওড়া নদীর কিনারা ঘেঁষে একেকটা প্রকাণ্ড সমতল জমি, বিষণ্ণ আর নিস্তব্ধ। উঁচু হয়ে দেখল সব আখের খেত, এমনই বিস্তৃত যে তাদের দূর প্রান্তগুলো আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে। আখ তোলার মৌসুম এখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফসল কাটার লোকেরা কাজ করছে; ক্যাঁচ্‌কোচ করে মন্থর মাল-বওয়া গাড়িগুলো তাদের পেছু নেয়; নিগ্রো চালকেরা মিহি সুরে মন্ত্র পড়ার মতো খচ্চরগুলোকে আরো জোরে চলতে উৎসাহ দেয়। দূরান্তের নীলে আবছা ঘন-সবুজ ঝোপগুলোই সংকেত দেয় আবাদের বাড়িঘর সব কোন্ দিকে। আখের মিল্'এর উঁচু চিমনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েক মাইল দূর থেকে, সমুদ্রের আলোকস্তম্ভের মতো।

একটা বিশেষ জায়গায় ডিকের নাকে আসে মাছ ভাজার গন্ধ— এতে ওর ভুল হবার কথাই নয়। তিতিরের খোঁজে ধাওয়া-করা পয়েন্টার কুকুরের মতো ও বাঁধের নিচে নেমে পথ করে সিধে এগোয় একজন বুড়ো সহজবিশ্বাসী মাছধরা-জেলের ডেরায়। তাকে গান শুনিয়ে গল্প বলে এমন খুশি করে যে অবশেষে তার খাওয়াটা হয় নৌসেনাপতির মতো। তারপর দুপুরের সবচেয়ে বিশ্রি তিনটে ঘণ্টা ও দার্শনিকের মতো কাটিয়ে দেয় গাছের তলায় নিদ্রা দিয়ে।

ঘুম থেকে উঠে আবার যখন সে 'তীর্থযাত্রা' শুরু করে, ততক্ষণে হাওয়াতে একটা তুষার-শিরশিরে ভাব, সারাদিনের ঝিমুনি-ধরা গরমের পর। শীতার্ত রাতের সম্ভাবনা জানিয়ে এই লক্ষণটা শ্রীযাত্রিকের মগজে প্রবেশ করতেই সে লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটতে থাকে, ভাবে একটা আশ্রয় তো পেতেই হবে। উঁচু-নিচু বাঁধের সঙ্গে তাল-দিয়ে-চলা পথ ধরে, বাঁধেরই গোড়ায় গোড়ায় সে এগোয়, কিন্তু কোথায় তা সে জানে না। গাড়ির চাকার দাগের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ঝোপঝাড়, প্রচুর ঘাস। আর এই জঙ্গলের রাজত্ব থেকে জলাভূমির যত পোকামাকড় ওকে ছেঁকে ধরেছে চড়া সুরে তীক্ষ্ণ ঘিন্‌ঘিনে আওয়াজ তুলে। রাত যত বাড়ে, ঠাণ্ডা হলেও, মশার গুনগুনানি আরো লোভাতুর, অধৈর্য, রুক্ষ গর্জন হয়ে অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে। ডান দিকে আকাশের গায়ে ডিক দেখে একটা সবুজ আলো নড়ছে, আর তার সঙ্গে একটা বড় অগ্রসরমান স্টিমারের মাস্তুল আর ফানেল। সরে আসছে ম্যাজিক-লণ্ঠনের দৃশ্যপটে ছবির মতো। ওর বাঁ দিকে

সেই রহস্যময় জলাভূমি। সেখান থেকে আসছে অদ্ভুত গল্‌গল্‌ আওয়াজ, গলা-চাপা কঁকানি। এই বিষাদের প্রভাবটা কাটাবার জন্য শিস্‌ বাজানো বাউণ্ডুলে একটা মন-তাজা-করা তান ধরল। দেবতা প্যান স্বয়ং যখন বেণুশরে তান তুলতেন তারপর আর সম্ভবত কোনোদিনও এমন অপূর্ব সুর শোনা যায়নি এই নির্জন পাণ্ডববর্জিত এলাকায়।

ওর পেছনে, দূর থেকে একটা চটর চটর শব্দ। শিগগিরই তা ঘোড়ার খুরের দ্রুত ছন্দে রূপ নেয়! রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য শিস্‌-কাটা ডিক পাশের শিশিরভেজা ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে জাঁকালো ক'জোড়া ধূসর ঘোড়া একটা চার-চাকার গাড়ি টেনে এদিকেই আসছে। সাদা গোঁফওলা মোটাসোটা চেহারার একটি লোক সামনের আসনে, তাঁর সমস্ত মনোযাগ হাতের টান-টান লাগামের দিকে। তার পেছনে বসেছেন শান্ত চেহারার মাঝবয়েসী এক মহিলা, সঙ্গে সদ্য উদ্ভিন্নযৌবনা ঝল্‌মলে একটি মেয়ে। চালক-ভদ্রলোকের হাঁটু থেকে কোলের কম্বলটা প্রায় সরে গেছে, আর তাঁর দু'পায়ের ফাঁকে ডিক দেখতে পায় দুটো মোটা ক্যানভাস থলি—ওই থলিগুলো ডিক শহরে ঘুরতে-ঘুরতে আগেও দেখেছে এক্সপ্রেস মালগাড়ি আর ব্যাঙ্কের দরজাগুলোর সামনে, সাবধানে হাত-বদলাবদলি হতে। ঘোড়ার গাড়িটার বাকি ফাঁকা জায়গা নানা আকারের মোড়ক পুলিন্দায় ঠাসা।

পথ-ছেড়ে-দেওয়া বাউণ্ডুলের একেবারে পাশাপাশি গাড়িটা আসতেই, কী এক মজার খামখেয়ালের বশে সেই উদ্ভাসিত-চোখ মেয়েটি ওর দিকে মিষ্টি ঝলমলে হাসি ছড়িয়ে ঝুঁকে পড়লে। তীক্ষ্ণ আবেগের সুরে গলা চড়িয়ে সম্ভাষণ জানালে—'মের-রি ক্রিস্‌-মাস্‌!'

শিস্‌-কাটা ডিকের জীবনে এমন ঘটনা বিশেষ ঘটেনি, তাই সে ভেবে পায় না এর যথার্থ প্রত্যুত্তর কী হতে পারে। চিন্তা করার সময়ও তেমন নেই। তাই যা-হোক কিছু করা যাক ভেবে নিজের পায়ের ধুকড়ি একপাটি জুতো খুলে সেটাই হাত উঁচু করে বাড়িয়ে ধরল, আর ছুটে-চলা গাড়ির পেছন লক্ষ্য করে ক্রমাগত সেটা নেড়ে নেড়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল ভদ্র সুরেই 'এই যে!' 'এই যে!' বলে।

মেয়েটির আকস্মিক নড়াচড়ায় একখানা মোড়কের কাগজ খুলে গিয়েছিল। তা থেকে কিছু একটা, নরম কালো মতো, গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ভবঘুরে সেটা তুলে নিল, দেখল সেটা একটা নতুন কালো মোজা, লম্বা মিহি আর সরু। ওর আঙুলের ফাঁকে মুচমুচ করে উঠল জিনিসটা, তবে একটা মনোরম পেলবতা তাতে।

ডিকের দাগ-ধরা মুখে ফাটল তুলে একটা চওড়া হাসি জাগে। বলে, 'কী

অলপ্পেয়ে ওদের ছোঁড়াছুঁড়িগুলো। এবার কী বুঝবে বল? মের-রি ক্রিস্-মাস! ঠিক কোকিল-ঘড়ির মতো, সেই রকমই তো করল মেয়েটা। ওরা সব বড়লোক তো, সুখে থাকেন, আর ওই বুড়ো লোকটা টাকার থলি সামলে রেখেছেন দু'পায়ের ফাঁকে, যেন ওগুলো মামুলি শুকনো আপেল। বড়দিনের বাজার করতে গিয়েছিলেন আর-কি। আর ওই খুকিটা নতুন কেনা মোজার একটি হারাল। হয়তো ওইটে দিয়েই সান্টা ক্লজকে আটকাত। আহাম্মক সব ছোঁড়াছুঁড়ি! বলে 'মেরি ক্রিস্‌মাস্'—কী বুঝলে! 'এই জ্যাক, কেমন চলেছে', বলার মতোই তো হল!'

শিস্-কাটা ডিক মোজাটা সযত্নে ভাঁজ করে নিজের পকেটে ঢোকায়। প্রায় দু'ঘন্টা পর সে দেখতে পায় লোকালয়ের চিহ্ন। রাস্তায় মোড় নিতেই চোখের সামনে ফুটে উঠল সুবিস্তীর্ণ আবাদের ইটের ঘরবাড়িগুলো। ও অনায়াসেই চিনতে পারল আবাদ-মালিকের নিজস্ব বাসগৃহটা। একটা বিশাল চতুষ্কোণ অট্টালিকা দু'ভাগে ভাগ। অসংখ্য প্রমাণ মাপের সু-আলোকিত জানলা, চওড়া বারান্দা বাড়িটার চারপাশ ঘিরে। একটা মসৃণ লনের ওপর ভবনটা দাঁড়িয়ে, ভেতর থেকে বাড়ির আলো ঠিকরে পড়ছে অনেকটা দূর অবধি বাইরে। চারপাশ ঘিরে বনেদি ফলবাগিচা, হাঁটা পথ আর বেড়ার পাশে পুরনো কেতার ঘন গুল্ম। পেছনে একটু দূরত্বে মজুর মুনিষদের বসতঘর আর মিল্-এর বাড়ি।

এবার রাস্তার দু'পাশেই বেড়ার ঘেরা। শিস্-কাটা ডিক অবিলম্বে বাড়িগুলোর কাছে চলে আসে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর বাতাসটা শোঁকে।

'একেবারে হাতের কাছেই কোথাও যদি খিচুড়ির স্টু রান্না না হতে থাকে তাহলে বলব আমার নাক আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে'— নিজের মনেই বলে সে।

কোনো ইতস্তত না করে সে হাওয়ার গতি বুঝে বেড়ার ওপর চড়ে বসে। দেখে যে-জায়গাটায় এসেছে সেটা একটা অব্যবহৃত জায়গা। পুরনো ইট পাঁজা করে রাখা, আর বাতিল পচ্-ধরা তক্তাকাঠ। একটা কোণার দিকে দেখে আগুনের হালকা আঁচ। একেবারে মরা কয়লার আগুন নয়। মনে হচ্ছে যেন কয়েকটা অস্পষ্ট মানুষের মূর্তিকেও দেখা যায় আগুনের পাশে বসে বা শুয়ে থাকতে। ও আরো কাছে এগিয়ে যায়। আগুনের হাল্‌কা আভা হঠাৎ জোরালো হয়ে উঠতে ও পরিষ্কার দেখতে পায় একটা উস্কুখুস্কু মোটা লোককে— পরনে তার পুরনো বাদামি সোয়েটার আর টুপি।

ডিক নিজের মনে বিড়বিড় করে, 'ও লোকটা তো বোস্টন-হ্যারির পালের গোদা। আমার সেরা সংকেত দিয়ে যাচাই করা যাক।'

নিগ্রোদের মজার গানের একটা-কি-দুটো কলি ও শিস্ দিয়ে বাজিয়েছে। আর

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটাই বদলে গেল। একটা বিশেষ ধরনের সুরে চট্ করে শেষ হল সঙ্গীত। প্রথম শিস্-বাজিয়ে এবার সাহস করে এগিয়ে গেল আগুনের কাছে। মোটা লোকটা চোখ তুলে তাকাল, তারপর হাঁপানির মতো ঘ্যাঁসঘেসে গলা উঁচু করে বলল :

'বন্ধুগণ, আমাদের চক্রে এবার অপ্রত্যাশিত, কিন্তু স্বাগত এক অতিথি যোগ দিলেন, মিঃ শিস্-কাটা ডিক। উনি আমার পুরনো বন্ধু, আমি ওঁর জন্য পুরো জামিন থাকছি। ওয়েটার এক্ষুনি তার খাবার ব্যবস্থা করবে। মিঃ ডিক আমাদের সঙ্গে নৈশাহারে যোগ দেবেন। ওই সময়ে তিনি বর্ণনা করবেন কী অবস্থায় তাঁর শুভ আগমন হল আমাদের মধ্যে।'

শিস্-কাটা ডিক বলল, 'একই ব্যাপার নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে হবে, বোস্টন, কিন্তু তবু আপনাদের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আমার ধারণা আমি যেভাবে এখানে এসে পড়েছি, সেভাবেই আপনারা সবাই প্রায় এসেছেন। আজ সকালে এক সেপাই আমায় ইঙ্গিতটা দিলে। আপনারা বুঝি এই আবাদে কাজ করছেন?'

বোস্টন কঠিন গলায় বললে, 'পুরো পেটপুজো না করে কোনো অতিথিরই উচিত নয় তার আশ্রয়দাতার অপমান করা। এটা ভাল ব্যবসাবুদ্ধি নয়। হুঁ, খেটে খাওয়া!... তা যাক্ আমি আর কিছু বলছি না। আমরা পাঁচজন—কালা পিট্, চোখ-পিটপিটে ব্লিংকি, গোল চশমা আর ইণ্ডিয়ানা টম— নু অর্লিন্সে বসে এই মতলব ঠাউরেছিলেম যে গেঁয়ো মাঠের ভদ্রলোকদের দর্শন করে বেড়াব। কাল সন্ধ্যায় তাই গোধূলির হালকা আমেজ ডেইজি ফুলের ওপর পড়তেই, মানে ওইসব পদ্যের কথা, আমরা বেরিয়ে পড়লাম সড়ক ধরে।... পিট্পিটে, তোমার বাঁ দিক থেকে খালি গুগ্‌লির টিনটা এগিয়ে দাও তো ডানদিকের খালি-পেট ভদ্রলোককে।'

এর পর দশ মিনিট ধরে অভিজ্ঞ পর্যটকের দল তাদের অখণ্ড মনোযোগ নিয়োগ করল নৈশাহারে। একটা পুরনো পাঁচ-গ্যালন কেরোসিন কানেস্তারায় তারা মাংস, পেঁয়াজ দিয়ে আলুর স্টু পাকিয়েছিল। ওটাই তারা ছোট-ছোট টিনের ক্যানে ভাগ করে খেল। পাত্রগুলো তারা ফাঁকা জায়গাটা থেকে তুলে এনেছিল।

বোস্টন হ্যারিকে অনেক দিন আগে থেকেই চেনে ডিক। ভাই-বেরাদারদের মধ্যে তাকে একজন অতি বিচক্ষণ সফলকাম মানুষ বলে জানে। চেহারাটা দেখতে বেশ শাঁসালো, শেয়ার-দালাল অথবা গ্রাম দেশের পোক্ত ব্যবসায়ীর মতো। গোলগাল স্বাস্থ্যবান, লালচে মুখখানা সর্বদা মসৃণভাবে কামানো। পোশাক মজবুত, ফিটফাট, আর সুদর্শন জুতোজোড়ার দিকে নিজের সযত্ন নজরও আছে। গত দশ বছরে সে যতগুলো সফল ঠকবাজির কাজ গুছিয়েছে, তা এক রেকর্ড যেন,— পরিচিত

বন্ধুরা তার ধারেকাছেও আসতে পারেনি। এমন একটি দিনও যায় না যখন সে হাত গুটিয়ে থাকে।

ওর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে গুজব সে প্রচুর টাকা জমিয়েছে। অন্য চারজন গোপন-চালচলন, ধুকড়ি-পোশাক, হল্লাবাজির একেকটা নমুনা; প্রকাশ্যেই 'সন্দেহজনক' ছাপটা বহন করে তারা।

বড় ক্যানেস্তারার তলা অবধি চেটেপুটে সাফ করার পর ওরা একেকটা পাইপ ধরিয়ে বসল আগুনের পাশে। দু'জন লোক বোস্টনকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে কী যেন বলাবলি করল চাপা গলায়। বোস্টন সজোরে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এবার উঁচু গলায় বললে ডিককে:

'শোনো হে বাছা কিছু সিধেসিধি কথা। আমরা পাঁচজন এখানে জাল পেতে বসেছি। তুমি খাঁটি লোক বলে আমি এদের কথা দিয়েছি। তুমি দলে এলে এদের সঙ্গেই থাকবে, তোমারও সমান বখরা, তবে সাহায্য করতে হবে আমাদের। এই আবাদের দুশো মজুর অপেক্ষা করছে আগামী কাল সকালে এ-হপ্তার মাইনে পেয়ে যাবে বলে। কাল তো বড়দিনের উৎসব, তাই ওরা ছুটি চায়। ওদের মালিক বুঝিয়েছে "ভোর পাঁচটা থেকে ন'টা অবধি কাজ কর, তাহলে একটা পুরো ট্রেন বোঝাই চিনি পেয়ে যাবে, আর আমিও তোমাদের প্রত্যেককে দেব সপ্তাহের টাকা নগদে, তা ছাড়া একদিনের অতিরিক্ত ছুটি।" ওরা বলল "মালিকের জয় হোক! মেনে নিচ্ছি সব।" মালিক আজ নু-অর্লিন্সে গেছে ঘোড়া-গাড়ি করে, নিয়ে আসছে কাঁচা ডলার। টাকার অঙ্কটা হবে দু'হাজার চুয়াত্তর ডলার পঞ্চাশ সেন্ট। অঙ্কটা পেয়েছি অতিবাচাল একজন লোকের কাছ থেকে, সে আবার শুনেছিল ওদের হিসাবরক্ষকের কাছে। এই আবাদের কর্তা ভেবেছেন তিনি মুনিষদের দেবেন এ সম্পদ। কিন্তু তিনি ভুল করেছেন, আসলে তিনি টাকাটা আমাদেরই দিচ্ছেন। ও টাকা যাদের হওয়া উচিত, সেই অলস শ্রেণীর হাতেই থাকছে। এখন, আধা খেপ মাল আসবে আমার কাছে, বাকি অর্ধেক তোমরাই ভাগ করে নিতে পার। কেন এই পার্থক্য? আমিই যে আসল মস্তিষ্ক। এ মতলবটা আমার। কেমন করে পেতে চলেছি এবার সেটাই বলি। ও বাড়িতে রাতের খানার সময় কিছু সঙ্গীসাথী থাকবে, কিন্তু রাত ন'টা নাগাদ সবাই চলে যাবে। ওরা তো নেহাৎ ঘন্টাখানেকের জন্য এসেছে। যদি তাড়াতাড়ি বিদায় নাও হয়, তাহলেও নক্শাটা যেভাবেই হোক বজায় রাখব। আমরা চাই পুরো রাতটা, যাতে ডলারগুলো নিয়ে ভালোভাবে সট্‌কাতে পারি। ভারী জিনিস তো। ন'টা নাগাদ কালা-পিট আর চোখ পিটপিটে ব্লিংকি রাস্তা ধরে বাড়ির পেছনে সওয়া মাইলটাক যাবে, আর একটা বড় আখ-খেতে আগুন দেবে। ফসল কাটা মজুররা ওটা এখনো ছোঁয়নি। দু'মিনিটের মধ্যে হু-হু করে জ্বলে উঠবে,

সেরকমই হাওয়া বইছে। বিপদ জানিয়ে ঘণ্টি বাজবে, আর দশ মিনিটের মধ্যে সেখানে প্রত্যেকটা মুনিষ আগুন নেভাতে জুটে যাবে। টাকার থলি বাড়িতে ছেড়ে মেয়েদের একা রেখে ওরা চলে যাবে— তারপর বাকি কাজ আমাদের। আখ পুড়তে দেখেছ কখনো? আরে, কয়েকজন মেয়েমানুষ একসঙ্গে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও আখ ফাটার আওয়াজ ছাপিয়ে তা শোনা যাবে না! পুরোপুরি নিরাপদ ব্যাপারটা। একমাত্র বিপদ, টাকা নিয়ে বেশিদূর পালাবার আগেই কোনো ক্রমে ধরা না পড়ে যাই। এবার তুমি যদি—'

'বোস্টন,' বাধা দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে ডিক, 'আপনারা আমায় খেতে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, তবে এখন আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।'

বোস্টনও দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'কী বলতে চাও?'

'আপনারা এই ব্যাপারটা থেকে আমাকে বাদ দিন। আপনার তো জানা থাকা উচিত। আমি সব জায়গায় পাছা ঘষে বেড়াই, সে কথা নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু এই অন্য জিনিসগুলো আমার আদপেই চলে না। ডাকাতি সিঁধকাটা মোটে ভাল নয়। আমি এবার বিদায় নেব, আর অনেক ধন্যবাদ জানাই—'

বলতে বলতে শিস্-কাটা ডিক কয়েক পা চলেও গেছে। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। বোস্টন একটা খাটো রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছে ওকে তাক্ করে।

বাউণ্ডুলে সর্দার বলল, 'বসে পড়ো তো নিজের জায়গায়। তোমায় চলে যেতে দিয়ে খেলা ভণ্ডুল করে মহা গর্ব হবে কিনা আমার! যতক্ষণ না আমাদের কাজ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তুমি স্রেফ এই ডেরায় বসে থাকবে। ওই ইটের পাঁজর শেষটুকু অবধি তোমার সীমানা। তুমি ওটা ছাড়িয়ে দু'ইঞ্চি গেলেও আমায় গুলি চালাতে হবে। তার চেয়ে এখন বরং চুপচাপ বোসো।'

শিস্-কাটা ডিক বলল, 'আমার কাজের ধারাই এ-রকম। সবকিছু সহজ করে নিই। তুমি ওই বারো-ইঞ্চি রিভলবারের নলটা নিচু করতে পার, যথাস্থানে গুঁজে রাখতে পার। আমি রইলাম, খবরের কাগজের ভাষায়, তোমাদেরই মাঝখানে।'

বোস্টন বন্দুকটা নামিয়ে বললে, 'ঠিক আছে।' ডিক ফিরে এসে কাঠের পাঁজা থেকে এগিয়ে আসা একটা তক্তার ওপর বসতে সে আবার বললে, 'শুধু চলে যাবার ধান্দা কোরো না, ব্যস্। আমি এবারের সুযোগটা কিছুতেই হারাতে চাই না, তার জন্য যদি কোনো পুরনো বন্ধুকেও গুলি করে মারতে হয় তো মারব। বিশেষ করে কাউকে জখম করার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার, তবে এই দু'হাজার ডলার কামাতে পারলে আমারও একটা হিল্লে হয়। আমি রাহাজানি ছেড়ে আমার জানা একটা ছোট শহরে সেলুন খুলে বসব। চারদিক থেকে লাথি খেতে-খেতে জেরবার হয়ে গেছি।'

বোস্টন হ্যারি পকেট থেকে একটা শস্তা রুপোর ঘড়ি বের করে আগুনের

কাছে ধরল। বলল, 'এখন পৌনে ন'টা। পিট আর ব্লিংকি, তোমরা কাজ শুরু কর। বাড়ির পাশের রাস্তা ধরে চলে যাও, আখের খেতে দশ-বারো জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেবে। তারপর ছুটে যাবে বাঁধের রাস্তায়, ওটা ধরেই ফিরে আসবে যাতে পথে কারুর সঙ্গে দেখা না হয়। তোমরা যতক্ষণে ফিরে আসবে এ বাড়ির পুরুষরা সবাই আগুন ঠেকাতে ছুটে যাবে, আর আমরাও বাড়ির ভেতর ঢুকে ডলারগুলো হাতাবো। যার-যার কাছে দেশলাই-বাক্স আছে সব বের করে ফেল!'

দুজন গোমড়ামুখো বাউন্ডুলে দলের সকলের কাছ থেকে দেশলাই বাক্স জড়ো করে নিল। শিস্-কাটা ডিকও ওদের খুশি করবার জন্য চটপট নিজের দেশলাই বের করে দিয়েছে। তারপর অস্পষ্ট তারার আলোয় ওদের দুজন রওনা হল রাস্তার দিকে।

বাকি যে তিনজন বাউণ্ডুলে রয়ে গেল, তাদের মধ্যে গোলচশমা আর ইণ্ডিয়ানা টম একটা যুৎসই কাঠের পাঁজার ওপর অলসভাবে কাত হয়ে শুয়েছে। শিস্-কাটা ডিকের দিকে ওদের দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা সুস্পষ্ট। বোস্টন যখন দেখেশুনে বুঝল গররাজি হলেও নবাগত শান্তিতেই থাকতে চায়, তখন সে নজরদারিতে একটু টিলে দিল। খানিকবাদেই উঠে ডিক পায়চারি শুরু করল এদিক-উদিক—সাবধানে, নির্ধারিত এলাকার মধ্যে।

বোস্টন হ্যারির সামনে একটু থেমে সে প্রশ্ন করলে, 'কী করে তুমি জানলে এই আবাদ-মালিকটা, বাড়ির মধ্যেই টাকাগুলো রেখেছে?'

'তথ্যগুলো সবই আমার গোচরে আনা হয়েছে'—উকিলী ঢঙে, বলে বোস্টন, 'লোকটা নু-অর্লিন্সে ঘোড়ার-গাড়ি চেপে গিয়েছিল, টাকাটা আজই তুলে এনেছে বললাম তো! কেন, তুমি মন বদল করে আসতে চাও নাকি দলে?'

'না-না। জিজ্ঞেস করছিলাম, এই মাত্র। কী ধরনের ঘোড়া ছিল লোকটার গাড়ির সঙ্গে?'

'এক জোড়া ধূসর রঙের ঘুড়ী।'

'চারচাকার ডবল গাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে বাড়ির মেয়েছেলেরাও ছিল?'

'বউ, মেয়ে। বল তো কোন্ খবরের কাগজে খবর দেবার জন্য চেষ্টা করছ তুমি?'

'এই সময় কাটাবার জন্য একটু আলাপ করছি, ব্যাস্। আন্দাজ হচ্ছে আজ সন্ধ্যায় ওই ঘোড়ার গাড়িটাই আমার পাশ কাটিয়ে এসেছিল। এই পর্যন্তই।'

শিস্-কাটা ডিক দু'পকেটে হাত গুঁজে ফের শুরু করে আগুনের ধার দিয়ে

তার গণ্ডিকাটা পায়চারি। পকেটের মধ্যে সেই রাস্তায় কুড়োনো সিল্‌কের মোজাটার অস্তিত্ব টের পায়।

মুখে একটা কাষ্ঠ হাসি টেনে বিড়বিড় করে বলে—'অলপ্পেয়ে ছোঁড়াছুঁড়িগুলো!'

এদিক-ওদিক খানিক হাঁটতেই ওর নজর পড়ল—গাছের ফাঁক দিয়ে সরু স্বাভাবিক গলির ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আবাদ-মালিকের বসতবাড়ি। প্রায় দুশো গজ দূরে। বাড়ির যে-প্রান্তটা ওর সামনে, সেদিকে বড়-বড় আলোকোজ্জ্বল জানালা। তা থেকে হালকা আলোর আভা ঠিকরে পড়ছে চওড়া বারান্দায়, নিচের সবুজ লনের ওপরও খানিকটা।

বোস্টন চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এক্ষুনি কী বললে তুমি?'

'না, তেমন কিছু নয়।'— বলে ডিক। অবহেলাভরে পায়চারি করে, আর কিছু চিন্তা করে জমির ওপর থেকে একখণ্ড পাথর লাথি মেরে সরিয়ে দেয়।

নিজের মনেই ফের বকে ভবঘুরে সুকণ্ঠপাখি—"মের-রি ক্রিস্‌-মাস্‌—" কী সহজেই না বলল কথাটা। মিশুকে... আর ঠাটবাট কত।... কী ভাবছ হে এখন!'

বেলেমীড আবাদবাগিচার ভোজনকক্ষে ডিনার পরিবেশন হল আজ তিন ঘন্টা দেরি করে। খাবার-ঘর ও তার আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র, সবকিছুতেই সেই পুরনো আমলের ছাপ। স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ওগুলো টিকে আছে এতকাল! ধাতব বাসনপত্রে আড়ম্বরের চেয়ে প্রাচীনত্ব ও বৈচিত্র্যই ওগুলোকে বেশি মূল্যবান করে তুলেছে। দেয়ালের ছবিগুলোর কোণায় সব কৌতূহল-জনক নামের স্বাক্ষর। খাবারদাবারের ব্যবস্থা দেখলে ভোজনরসিকদের চোখ চক্‌চক করে ওঠে। পরিবেশনের কাজও চলে দ্রুত, নীরব, দরাজ হাতে। সোনারুপার বাসনের দামই তো একসময়ে ছিল এই খানসামাদের! মনিবের পরিবার আর অভ্যাগতরা সবাই পরস্পরকে যে নামে সম্বোধন করে সেগুলো দু'জাতির ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ নাম। ওদের চালচলন আর বাক্যালাপে অতি কঠোর ধরনের সাবলীলতা— একটা বিশেষ ধরন যাতে আদবকায়দা বজায় রয়েছে এখনও। আবাদমালিক স্বয়ং যেন আনন্দ ও কৌতুকরসের খনি। বেশির ভাগ মজার কথাই তাঁর কাছ থেকে। ওঁর পরিহাস আর ঠাট্টা-তামাশার বন্দুক চলতে থাকলে জোয়ান ছেলেদের সাধ্য কী তার সামনে দাঁড়ায়। এটা ঠিক যে সুশ্রী বান্ধবীদের তারিফ পাবার আশায় ছোকরারাও মাঝে-মাঝে কামান দেগে তাঁকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভালোমতো তাক করে ছুঁড়লেও, বুড়ো কর্তা তা ফিরিয়ে দেন এমন প্রচণ্ড উচ্চহাসির সঙ্গে পাল্টা জবাব দিয়ে যে তারা একেবারে চুপসে যায়। টেবিলের মাথার দিকে বিরাজ করছেন গৃহের কর্ত্রী— প্রশান্ত, সদয় মাতৃমূর্তির মতো,—মাঝে মাঝে শুধু যথার্থ স্থানে সঠিক হাসিটি, উপযুক্ত কথা আর সায়-জানানো কটাক্ষ বিলিয়ে দেন।

পানভোজনের সময় কথাবার্তাগুলো এমন এলোমেলো আর এমন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যে বুঝেই ওঠা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা পরিচিত বিষয়ে এলেন। ভবঘুরেদের জ্বালাতন, যা ইদানীং কয়েক মাইল জুড়ে আবাদগুলোতে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়ো কর্তা এই সুযোগটা নিয়ে বেশ কিছু মিষ্টিঝাল কথা শুনিয়ে দিলেন গিন্নিকে, তিনি নাকি এই নোংরা আপদটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বললেন, 'ওরা তো শীতকাল পড়লেই ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেয়ে ফেলে নদীর আগা মাথা। নিউ অর্লিন্সের ওপর উপচে-পড়া ভিড় করে অবশেষে বাদবাকিগুলো আসে আমাদের এলাকায়। এগুলোই সবচেয়ে ওঁচা। দু'একদিন আগে হয়তো "নব-অর্লিন্স" দেবী আচমকা আবিষ্কার করলেন তিনি আর বাজারঘাট করে বেড়াতে পারছেন না এই বাউণ্ডুলেগুলোর ভিড়ে নিজের পোশাক বাঁচিয়ে, তারা রাস্তায় সার বেঁধে বসে রোদ পোহায়, তাই পুলিসকে হুকুম দিলেন—"সবগুলোকে ধরো!" পুলিসও ডজন দুই গ্রেপ্তার করে, বাকি তিন-চার হাজার ছেয়ে ফেলে নদীর বাঁধগুলোর আগাপাস্তলা। আর আমাদের এই ম্যাডাম'—করুণকণ্ঠে ছুরি দেখালেন গিন্নির দিকে— 'ওনাদের খেতে দেন। ওরা কাজ করবে না, উপরন্তু আমার বাগান-কর্মচারীদের তোয়াক্কা করবে না, আমার কুকুরদের সঙ্গে ভাব জমাবে। আর তুমি, ম্যাডাম, আমার চোখের সামনেই ওদের খেতে দেবে, আমি বাধা দিলে আমাকেই চোখ রাঙাবে। বলো তো দেখি, আজ ক'টা বাউণ্ডুলেকে তুমি ওইভাবে আস্কারা দিয়েছ যাতে তারা ভবিষ্যতে কুঁড়ে আর লুটেরা হয়ে ওঠে?'

একটু চিন্তা করে হেসে ম্যাডাম বললেন, 'ছ'জন বোধ হয়। কিন্তু দু'জন তো কাজ করতে চাইল, সে তো তুমি নিজের কানেই শুনলে!'

আবার কর্তার সেই বেচাল-করা হা-হা হাসি—'হ্যাঁ, তাদের নিজের পেশার কাজ। একজন নকল ফুল তৈরি করে, আরেকজন ফুঁ দিয়ে কাচের জিনিস গড়ে। হ্যাঁ কাজ চায় তারা! অন্য কোনো রকম খাটুনির কাজে হাতই ওঠাবে না যে!'

কোমল-হৃদয়া কর্ত্রী কিন্তু বলতেই থাকেন—'অন্য আরেকজনও তো দেখলে বেশ ভদ্র ভাষায় কথা বলে। ওই জাতের মানুষের পক্ষে সত্যিই অসাধারণ। তার আবার একটা পকেট-ঘড়ি আছে। বোস্টনে থাকত নাকি। আমার বিশ্বাস হয় না ওরা সবাই খারাপ। আমার তো বরাবরই মনে হয়েছে ওদের আসল অভাব বিকাশের। আমি ওদের সব সময়েই ছোট শিশুর মতো দেখি, যাদের ময়লা আর গোঁপদাড়ি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের সীমা আটকে রয়েছে একটি জায়গাতেই। আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় পথে ওইরকমই একজনকে দেখেছিলাম। ভালোমানুষ মুখখানা, তাতে আনাড়িপনার ভাব, কিন্তু শিস্ দিয়ে বাজাচ্ছিল কী জানো? "কাভালেরিয়া"-র অন্তরা থেকে কটা কলি, সুবকার ম্যাস্কাগ্নিকেই যেন প্রাণঢালা আবেগে জীবন্ত করে তুলেছিল।'

গৃহিনীর বাঁ-পাশে বসা উজ্জ্বল-আঁখি তরুণীটি একটু ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় গোপন কিছু বলার মতো বললে:

'কে জানে মা, রাস্তায় পাশ কাটিয়ে চলা সেই ভবঘুরেটাই আমার মোজাখানা পেয়ে গেল কি না! তোমার কি মনে হয় আজ রাতে সে ওটা টাঙিয়ে দেবে উপহারের আশায়? এখন আমি তো মাত্র একখানাই টাঙাতে পারছি। তুমি জানো আমি কেন একগাদা মোজা থাকতেও একজোড়া নতুন মোজা চেয়েছিলাম? বুড়ি জুডি পিসি বলেছে যদি দুটো আনকোরা মোজা টাঙিয়ে রাখ তাহলে সান্টা ক্লজ্ ওর একটার মধ্যে ভাল জিনিসগুলো ভরে দেবেন, আর অন্যটাতে "মঁসিয়ে পাম্বে" ক্রিসমাসের আগের দিনটিতে লোককে যত ভালো বা মন্দ কথা বলেছ তার জন্য দাম শুধে দেবেন। সেই জন্যই তো সকলের সঙ্গে আমি আজ খুব ভাল ব্যবহার করছি। বুঝছো না, মঁসিয়ে পাম্বে হলেন ডাইন্-বাবা, উনি—'

একটা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটতেই বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটির কথা।

ছুট্-তারার লেজের মতো একটা কালো লম্বা কী জিনিস যেন জানলার কাচ ভেঙে ছুটে এসে পড়ল টেবিলের ওপর। তারপরেই কাচের বাসনপত্র চিনেমাটির কিছু-জিনিস খান্‌খান্ করে সেটা অতিথিদের মাথার ফাঁক দিয়ে পড়ল গিয়ে দেয়ালে। সেখানে একটা গভীর গোল গর্ত হয়ে রইল, যা আজও বেলেমীড দর্শন করতে এসে পর্যটকরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর শোনে এই কাহিনীটা যেমন এখানে বলা হচ্ছে।

যাক্, নানান্ সুরে মহিলারা তো চিৎকার করে উঠলেন, আর পুরুষরা উঠে দাঁড়ালেন এমনভাবে যেন এক্ষুনি তাঁরা তরোয়াল উঁচিয়ে ধরবেন, যদি-না অবশ্য ইতিহাসের তথ্য তাতে বাদ সাধত!

প্রথম তৎপর হলেন আবাদের মালিকই। তিনি লাফিয়ে গেলেন প্রবেশকারী ক্ষেপণাস্ত্রটার দিকে, তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করলেন জিনিসটা।

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় খোদা! এ যে হোসিয়ারি মোজার উল্কাপাত! তা'হলে কি শেষে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গেও যোগাযোগ ব্যবস্থা বসে গেল?'

একজন যুবক অতিথি সাহস করে বলেই ফেলল, 'আমি তো বলব... ম্‌ম্... প্রেমের গ্রহ ভিনাস্-এর সঙ্গে— ' আশাভরা নয়নে সে তারিফ খোঁজে সাড়াশব্দহীন যুবতী অতিথি-মহলে।

বেআদব ছুটে আসা বস্তুটাকে এক হাত দূরে মেলে ধরলেন কর্তা—একটা লম্বা, দোলায়মান, কালো হাঁটু-ঢাকা মোজা। ঘোষণা করলেন, 'ভেতরে রসদ আছে।'

বলতে-বলতেই মোজাটাকে উল্টে দিলেন পায়ের ডগা ধরে, আর ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ল একটা গোলমতো পাথর, হলদে একখণ্ড কাগজে মোড়া।

উনি বলে উঠলেন, 'এবার শতাব্দীর প্রথম আন্তঃগ্রহ বার্তাটি পড়ে দেখা যাক্!' ওঁকে ঘিরে যে সঙ্গী সাথীরা ভিড় করেছিল তাদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে চশমাজোড়া ঠিকঠাক নাকে বসিয়ে নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করলেন কাগজটা। যেই দেখা শেষ হল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাসিখুশি গৃহকর্তার রূপটি বদলে গেল। এবার তিনি একজন তৎপর বাস্তব কাজের মানুষ। তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজালেন। নিঃশব্দ-পদে একজন মুলাটো পরিচারক এসে দাঁড়াতেই তাকে বললেন, 'যাও, মিঃ ওয়েসলিকে গিয়ে বল রীভস্, মরিস, আর গোটা দশেক বিশ্বাসী ষণ্ডা মানুষকে নিয়ে এখুনি হলঘরের দরজায় আসতে। ওকে বল লোকগুলো যেন হাতিয়ারবন্দ্ হয়ে আসে, আর সঙ্গে আনে প্রচুর দড়ি, লাঙলের রশা। তাড়াতাড়ি করতে বল ওকে!'

এবার তিনি কাগজটা থেকে জোরে জোরে পড়ে শোনাতে লাগলেন কথাগুলো:

"ঘরের বাবুদের কাছে নিবেদন—

এখানে ৫ জন কট্টর ভবঘুরে রহিয়াছে আমি ছাড়া, পথের কাছে খালি জমিতে যেকেনে পুরাতন ইটের পাজা। উয়ারা আমায় বন্দুক দেখাই আটক করিছে বুঝিলেন, আর আমি এইভাবে খবর পাঠাইতেছি। উয়াদের ২ ছোকরা বাড়ির পিছনের আখের খেতে আগুন লাগাইতে গিছে আর আপনকার লোকেরা যখন তাহা জল দিয়া নিভাইতে যাইবেন তখন পুরা দল বাড়ির ভিতরে টাকা লুট করিতে যাইবে ওই টাকা যাহা আপনারা মজুরী দিবার আশায় রাখিয়াছেন তাই এক্ষণই বেবস্তা করুন এবং ওই বালিকা যে এই মোজা পথে ফেলিয়াছিল তাহাকেও শুভ কড়দিন জানাইবেন যেমন সে আমাকে জানাইয়াছিল। পেথমে রাস্তা হইতে বদমাশ দুটিকে ধরুন তারপর আমাকে বাঁচাইতে মুক্তি দল পাঠান ইতি আঃ বিশ্বাসী

—শিস্-কাটা ডিক্।"

এর পরের আধঘণ্টা বেলেমীডে খানিকটা নিঃশব্দে অথচ দ্রুত কিছু সুকৌশলী অভিযান চলল, যার ফলে অবশেষে ধরা পড়ল পাঁচজন নাজেহাল গোমড়ামুখো বাউণ্ডুলে, বাইরের মহলে তাদের ভাল করে তালাবন্ধ রাখা হল যতক্ষণ-না সকাল হয় আর সাহায্য আসে। এর আরেকটি ফল হল এই যে আগন্তুক যুবকরা তাদের বিশিষ্ট বীরত্বপূর্ণ আচরণের গুণে অভ্যাগতা যুবতী মহিলাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। অন্য বিষয়টি—চেয়ে দেখুন আমাদের বীর নায়ক শিস্-কাটা ডিককে—তিনি বসে রয়েছেন আবাদ মালিকের টেবিলে, ভোজন করছেন এমন খাদ্য যার অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনো হয়নি। তার সেবায় ব্যস্ত প্রশংসামুখর রমণীকুল। তাদের সুগঠন রূপ আর "পীবরতা" দেখে ডিক তার ভরা-মুখ নিয়েও শিস্ কাটা বন্ধ করতে পারেনি। ওকে সাধাসাধি করে তারা বোস্টন হ্যারির

বদমাশ দলের সঙ্গে ওর অ্যাডভেঞ্চারের পুরো কাহিনীটা শোনেন—কেমন চালাকি করে সে চিরকুটটি লিখে তা একটা পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে মোজাটার ডগার দিকে ভরে দিয়েছিল, আর সুযোগ বুঝে ঠিক সময়ে নিঃশব্দে সেটা অদ্ভুত ধূমকেতুর মতো কেন্দ্রাতিগ বেগে ছুঁড়ে দিয়েছিল খাবার-ঘরের আলোকিত বড় জানলাটি লক্ষ্য করে।

আবাদমালিক অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন ভবঘুরেকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না; ওর এমন সৎস্বভাব আর সততা পুরস্কারের যোগ্য। কৃতজ্ঞতার ঋণ হিসেবে তা অবশ্যই পরিশোধ করা হবে। একটা নিঃসন্দেহ আসন্ন ক্ষতি থেকে সে কি ওদের বাঁচায়নি, যেটা হয়তো অতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত? শিস্-কাটা ডিককে তিনি আশ্বাস দিলেন, সে এখন বেলেমীডের মানমর্যাদার ওপর ভরসা রাখতে পারে, তার ক্ষমতার উপযুক্ত একটা পদ তাকে এখুনি খুঁজে দেওয়া হবে। আর এই ইঙ্গিতও দিলেন যে ভবিষ্যতে আবাদের ক্ষমতানুযায়ী যে-কোনো ভাতা বা জিম্মার উঁচু পদ পাওয়ার সম্ভাবনাও তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রশস্ত রাখা হবে।

কিন্তু এখন তো (ওঁরা বললেন) সে নিশ্চয় খুবই ক্লান্ত, এখন যেটা ভাবার কথা তা ওর বিশ্রাম আর ঘুমের ব্যবস্থা। তাই গৃহিণী একজন ভৃত্যের সঙ্গে কথা বললেন, ডিককে নিয়ে যাওয়া হল বাড়ির একপ্রান্তে যেখানে চাকরবাকর বাস করে তারই একটা কামরায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে আনা হল একটা জলভরা স্নানের টব, মেঝের ওপর অয়েল ক্লথ বিছিয়ে সেটা বসানো হল। ভবঘুরেকে এখানেই ছেড়ে দেওয়া হল রাতটির মতো।

মোমবাতির আলোয় সে ঘরটা ভাল করে দেখে। পরিপাটি করে গুটোনো আচ্ছাদনের নিচে বিছানার ফটফটে সাদা বালিশ আর চাদর। মেঝেতে পুরনো হলেও পরিষ্কার একখণ্ড লাল গালিচা পাতা। ঢালু আয়নাওলা একটা প্রসাধন-টেবিল, হাত-মুখ ধোবার চিত্রিত গামলা আর কুঁজো, দু-তিনটে চেয়ারে সামান্য গদিও আছে। একটা খুদে টেবিলে কিছু বইপত্র, কাগজ আর জারের মধ্যে একদিনের পুরনো কিছু গোলাপের গুচ্ছ। র‍্যাকে কিছু তোয়ালে, আর সাদা পিরিচে একটা সাবানও রয়েছে।

শিস-কাটা ডিক মোমবাতিখানা একটা চেয়ারের ওপর রাখে। আর সাবধানে টুপিটা রাখে টেবিলের তলায়। যেটাকে তার কৌতূহলই বলতে পারি তা যখন নিবৃত্ত হল সবকিছু ঠাণ্ডা মাথায় নিরীক্ষণ করার পর তখন সে কোটখানা গা থেকে খুলে, ভাঁজ করে মেঝের ওপর রাখে, দেয়ালের কাছে। অব্যবহৃত স্নানের টবটা থেকে যথাসম্ভব দূরে। কোটটাকেই বালিশ করে নিয়ে সে আরামে লম্বা হয় গালিচাটার ওপর।

ইতিহাস-রচয়িতাদের কাহিনী বেশির ভাগ সময়েই হতাশাব্যঞ্জক হয়। আর সেই ইতিহাসকার যদি হন এমন কারিগর যাঁর নজর ফলাফল আর অনুপাতের দিকে, তাহলে তাঁর ঝোঁক আসে বাস্তব তথ্যের ঘাটতিতে। কারণ তখন যুক্তিসিদ্ধভাবে ফলাফলগুলো খাপ খেয়ে বসে না, আর গভীর উদাসীনতা প্রকট হয় তাঁর শিল্পশৈলীতে। কিন্তু এখানে যে আমরা তথ্যেরই দাস। অতএব স্থান-কাল-পাত্রের 'ঐক্য'—বা যাই সেগুলো হোক না কেন—সব বিসর্জন দিতে হয় অথর্ব উপসংহারের জাঁতাকলে।

শুভ বড়দিনের প্রভাতে যখন জলাভূমির এই অঞ্চলে প্রথম উষার কিরণ ফুটে উঠল, শিস্-কাটা ডিক জেগে উঠে বরাবরের অভ্যাসবশেই হাত বাড়াল তার টুপির দিকে। তারপর মনে পড়ল, গত রাতে তাকে ভাগ্যদেবী নিজের ঘেরাটোপের নিচে আশ্রয় দিয়েছিলেন। জানলার কাছে গিয়ে সে শার্সি তুলে দিল কপালে একটু সকালের তাজা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাবে বলে, আর ওর এখনো-স্বপ্নের মতো লেগে থাকা সৌভাগ্যের স্মৃতিটাকে মগজের মধ্যে ঠিকঠাক বসিয়ে নেবে।

ওখানে যখন দাঁড়িয়ে আছে, কিছু আতঙ্ককর অলক্ষুণে শব্দ যেন ওর শঙ্কিত কানের মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে প্রবেশ করল।

আবাদের মজুরের দল সবাই একসঙ্গে জেগে উঠেছে। তারা তাদের বাকি নির্দিষ্ট কাজটুকু শেষ করতে ব্যগ্র। শ্রম-দানবের দাপাদাপি যেন মেদিনী কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের বেচারি, জীর্ণ, চিরছদ্মবেশী ভাগ্যান্বেষী রাজপুত্র তখন মায়াচ্ছন্ন দৈত্যপুরীর জানলা আঁকড়ে ধরে কাঁপছেন!

এর মধ্যেই মিল্-বাড়ির ভেতর থেকে গড়ানো চিনির পিপেগুলোর বজ্রশব্দ ভেসে আসছে, আর (কারাগারের মতোই) জোর শেকলের ঝন্ঝন—গাড়ির জোয়ালে খচ্চরগুলোকে ঠেলে জোতা হচ্ছে সোৎসাহ গালিগালাজ ঝেড়ে। আবাদের জমি অবধি সরু-গেজের রেলরাস্তা, সেখানে ফোঁসফোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে একটা খুদে দস্যি 'ডামি' ইঞ্জিন—পেছনে এক সারি চ্যাপটা পাটাতন-গাড়ি। আধা অন্ধকারে দেখা যায় একদল মজুর হৈ-হৈ দৌড়ঝাঁপ করে মেহনত করছে, চিনির সাপ্তাহিক ফলন বোঝাই করছে ট্রেনে। এখানেই তো কবিতা, মহাকাব্য—বরং বলব শ্রমের ট্র্যাজেডি। সারা বিশ্বের অভিশাপ কুড়োচ্ছে তার সারবস্তু।

ডিসেম্বরের হাওয়া তুষার-ঝরা, তবু শিস্-কাটা ডিকের কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায় সে, নিচের দিকে চেয়ে দেখে। পনের ফুট নিচে দেয়াল ঘেঁষে, দেখতে পায় ফুলের কেয়ারি। অতএব চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে নরম-মাটির ঠিক ওপরেই রয়েছে সে।

সিঁধেল চোরের মতো সন্তর্পণে জানলার গোবরাটের বাইরে বেরিয়ে নিচে ঝুলে পড়ে দু'হাতে দেহের ভার রেখে, তারপর নিরাপদেই নেমে পড়ে। বাড়ির এদিকটায় তখন জনপ্রাণী নেই মনে হয়। ঝাপটি মেরে ডিক দ্রুত উঠোন ডিঙিয়ে

সট্‌কে যায় নিচু বেড়ার দিকে। ওটার ওপর দিয়ে লাফ মেরে ডিঙিয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপারই হল—সিংহের তাড়া খেয়ে হরিণ যেমন কাঁটাঝোপ ডিঙিয়ে যায় সেই আতঙ্কই তো এখন ওর! তারপর রাস্তার ধারের শিশির ভেজা ঘাসের ভেতর দিয়ে ছোটা, বাঁধের পাশে পিছল ঘেসো দিকটায় হাঁচড়পাচড় করে ওঠা, শেষ অবধি মাথার ওপরের সেই পায়ে-হাঁটা পথ—ব্যস্ সে এখন মুক্ত।

পুবের আকাশে লালিমা, আলোর আভাস। বাতাস তো নিজেই এক ভবঘুরে, তাই সে ভাইয়ের গালে অভিনন্দনের স্পর্শ দেয়। অনেক উঁচুতে ক'টা বুনো হাঁস কলরব করে ওঠে। ওর পথের ওপর দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে গেল একটা খরগোশ, সে তো ডানদিক, বাঁ-দিক যেদিকে ওর মন চায় যেতেই পারে সেদিকে। নদী বয়ে যাচ্ছে পাশে,—নিশ্চয়ই কেউ তার চূড়ান্ত আস্তানাটির হদিশ দিতে পারবে না?

ছোট্ট উস্কোখুস্কো বাদামি বুক-ওয়ালা একটা পাখি কচি ডগউড চারার ওপর বসেছিল। শিশিরের লোভে বোকা পোকার দল গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, তাই শিশিরেরই জয়গান গাইতে সবে সে মিঠে, বুকভরা, সরু শিস্ দিয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে হঠাৎ চুপ করে গেল, একদিকে মাথাটা কাত করে শুনতে লাগল কিছু।

বাঁধের ওপরের পথটা থেকে জেগে উঠেছে আর একটা ফুর্তিভরা, সাড়া-জাগানো, প্রাণভরা চাঞ্চল্যময় শিসের সুর—পিকোলো বাঁশির নিখুঁত সুরের মতো নির্মল তীক্ষ্ণ আর উঁচু। আকাশ ছোঁয়া আওয়াজ কেঁপে-কেঁপে ঢেউ খেলে উঠছে—বুনো পাখিদের গানে যা হয় না; কিন্তু একটা বন্য মুক্ত মাধুর্য আছে এ স্বরে, যা ছোট বাদামি পাখিটাকে কোনো পরিচিত কিছু মনে করিয়ে দেয়, তবে সেটা যে ঠিক কী তা ও বলতে পারে না। এ স্বরের মধ্যে আছে সেই 'বিহগ-আহ্বান' যা সব পাখিরাই জানে। কিন্তু তা এক বিশাল অপচয়, অর্থহীন বাহুল্য, যা শিল্পকলাই জুড়েছে এবং সাজিয়েছেও, আর সেটাই বড় হেঁয়ালি, রীতিমতো বিস্ময়কর। ছোট পাখিটা তাই মাথা কাত করেই বসে থাকে, যতক্ষণ-না দূরে মিলিয়ে যায় সে শব্দ।

ছোট পাখিটা এটা জানত না যে ওই অপূর্ব সুরের যেটুকু অংশ সে বুঝেছিল তা ওই সুরকারকে সেদিন সারা সকালটা না খাইয়ে রেখেছে। কিন্তু সে এটা ভাল করেই জানে যে, যে-অংশটা সে বোঝেনি সেটা তার নিজের কোনো ব্যাপারই নয়, তাই সে ডানার সামান্য স্পন্দন তুলে একটা বাদামি বুলেটের মতো ছোঁ মেরে পড়ল মোটাসোটা একটা পোকার ওপর। সেটা বাঁধের পথে কুঁকড়ে-কুঁকড়ে চলছিল।

Whistling Dick's Christmas Stocking, ম্যাকক্লিওর পত্রিকা, ১৮৯৯

জর্জিয়ার বিধান

যদি সরকারী জমি-সংক্রান্ত দপ্তরটা দর্শন করার সুযোগ পান কখনো, তাহলে নক্শাবিদ্‌দের কামরায় পদার্পণ করে সালাডো জেলার মানচিত্রখানা একবার দেখতে চাইবেন। একজন মন্থরগতি জার্মান ভদ্রলোক—হয়তো-বা বুড়ো কাম্‌ফার নিজেই—ওটা আপনার কাছে নিয়ে আসবেন। জিনিসটা হবে চারফুট চৌকো, পুরু ড্রয়িং-কাপড়ের জন্য বেশ ভারী। অক্ষর আর সংখ্যাগুলো দেখবেন চমৎকার পরিষ্কার আর স্পষ্ট। শিরোনাম হবে সুন্দর দুষ্পাঠ্য জার্মান ভাষায় লিপিবদ্ধ, পুরাতনী টিউটন নক্শায় অলংকৃত। হয়তো বা আদ্যাক্ষরগুলোয় প্রচিন দেবদেবীর মূর্তি, আঙুরলতা ইত্যাদিও থাকবে। আপনাকে জানাতেই হবে এ মানচিত্রটা আপনি দেখতে চাইছেন না; তিনি যেন দয়া করে এটার আগের সংস্করণের সরকারী মানচিত্রটা দেখান। উনি তখন 'আখ্ সো!' (ও তাই!) বলে একটা ম্যাপ নিয়ে আসবেন যেটা এর অর্ধেক সাইজের—পুরনো ফ্যাকাশে, বিবর্ণ এবং ছেঁড়াখোঁড়া।

সতর্কভাবে ম্যাপটার উত্তর-পশ্চিম কোণটার কাছে দেখলেই পেয়ে যাবেন চিকুইটো নদীর ক্ষয়ে-যাওয়া উপকূলরেখা, আর যদি আপনার চোখের নজর ভাল থাকে, তাহলে এই কাহিনীর নীরব সাক্ষীটিকেও খুঁজে বের করতে পারবেন ও থেকে।

* * *

জমি-দপ্তরের কমিশনারটি ছিলেন সাবেক ধরনের। তাঁর পুরনো কেতাকানুন তাঁর নিজের আমলের পক্ষেই অতিরিক্ত লৌকিকতা বলে মনে হত। মিহি কালো পোশাক পরতেন, লম্বা কোটের ঝুলে যেন রোমানযুগের রেশ থেকে গেছে; কলারগুলো 'বিচ্ছিন্ন' নয় (যা আজকালকার দর্জিজগতে চালু); টাই পরতেন সরু, ফালিমাত্র, জুতোর ফিতের মতোই বাঁধা। ধূসর মাথার চুল পেছনদিকে একটু যেন বেশিরকম লম্বা, তবে বেশ ছিমছাম, মসৃণ করে রাখেন। সেকালের কূটনীতিজ্ঞদের মতো পরিষ্কার-কামানো মুখ। বেশির ভাগ লোকই তা কঠোর মুখ বলে মনে করে, কিন্তু এ মুখ থেকে বাহ্যিক সরকারী আবরণটা সরে গেলে তা যে একেবারে অন্য চেহারা নেয় তা কেউ-কেউ দেখেছে। ওঁর এই কোমল নম্র রূপ বিশেষ করে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা যাঁরা ওঁর একমাত্র সন্তানটির শেষ রোগভোগের সময় ওঁর আশেপাশে ছিলেন।

বহুবছর ধরেই কমিশনার ছিলেন বিপত্নীক। দপ্তর সংক্রান্ত কর্তব্যকাজের বাইরে তাঁর জীবন ছোট্ট মেয়ে জর্জিয়াকে ঘিরে এমন উৎসর্গিত যে লোকে সেটাকে হৃদয়স্পর্শী, তারিফের বিষয় বলে মনে করত। তিনি এমনিতে গম্ভীর ধরনের

মানুষ, তার মর্যাদাবোধ প্রায় কঠোরতার শামিল, কিন্তু এসবের ভেতর দিয়েই এসে মেয়েটি তার বাপের বুকে স্থান করে নিয়েছিল, একেবারে তাঁর হৃদয়স্থলে—যার ফলে সে ফিরে পেয়েছিল হারানো মায়ের স্নেহ। বাপে-মেয়েতে গড়ে উঠেছিল এক আশ্চর্য বন্ধুত্ব। ওঁর অনেক কিছুই দেখা যেত মেয়ের মধ্যেও, ওঁরই মতো বয়েসের তুলনায় বেশি গাম্ভীর্য আর চিন্তাশীলতা।

একদিন, জ্বরের উত্তাপে ডগডগে আরক্ত গালে শুয়ে থেকেই, সে হঠাৎ বলে উঠল—'বাবা, আমার বড় ইচ্ছে হয় একদল ছেলেমেয়ের জন্য ভাল কিছু করি, কিছু ভাল কাজ!'

কমিশনার শুধোলেন, 'কী কাজ করতে চাস্ বাছা, ওদের জন্য একটা উৎসব?'

'না না, আমি ওধরনের কিছু বলছি না। আমি বলছি গরিব শিশুদের কথা। যাদের ঘর নেই, কেউ যাদের ভালবাসে না, যত্ন করে না আমার মতো। তা'হলে বলব তোমায় বাপি?'

'কী বলবি রে বাছা?'

'যদি আমি আর সেরে না উঠি, তাহলে ওদের আমি তোমার কাছেই ছেড়ে যাব—তোমায় দিয়ে দেব না, শুধু ধার দেব, কারণ তুমিও তো মরে যাবার পরে আমার আর মার কাছে চলে আসছোই। যদি হাতে সময় পাও, তাহলে ওদের সাহায্য করতে কিছু করবে না তুমি বাবা? যদি আমি তোমার কাছে তা-ই চাই?'

'চুপ চুপ, বাছা আমার, ওসব বলে না।'—ওর ছোট্ট গরম হাতটা নিজের গালের ওপর চেপে ধরে বলেন কমিশনার—'তুমি যে খুব শিগ্‌গির ভালো হয়ে উঠবে। আর তুমি আমি দু'জনে মিলে দেখব ওদের জন্য কী কাজ করা যায়।'

কিন্তু অস্পষ্টভাবে যে-কোনো পরোপকার-পন্থাই তিনি ভেবে থাকুন না কেন, ভবিষ্যতের সে কাজে আর সঙ্গী থাকবে না তাঁর প্রিয়পাত্রী। সে রাতে ছোট পল্‌কা শরীরটা যেন হঠাৎই ক্লান্ত হয়ে হার মেনে গেল, আর লড়তে পারল না মরণের সঙ্গে। জর্জিয়া সবে যখন পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে তার ছোট ভূমিকাটির জন্য মুখ খুলেছিল তখনই বিশাল মঞ্চ থেকে হল তার বিদায়। কিন্তু মঞ্চ পরিচালক তো একজন থাকেনই যিনি এসব বোঝেন। ওর যে পরবর্তী বক্তা তার জন্যই খেই ধরিয়ে দিয়ে গেছে জর্জিয়া।

জর্জিয়াকে কবরে দেবার এক হপ্তা পর কমিশনার আবার হাজির হলেন দপ্তরে। এখন যেন উনি আগের চেয়েও ভদ্র, হয়তো একটু ফ্যাকাশে, একটু বেশি কঠোর। দীর্ঘ দেহ থেকে কালো ফ্রক কোটটা যেন আগের চেয়েও বেশি শিথিল ভাবে ঝুলছে।

ওঁর অনুপস্থিতির চারটে সপ্তাহ—বুকভাঙা চার সপ্তাহের মধ্যে—টেবিলের

ওপর ডাঁই হয়ে জমেছে নানা কাগজপত্র। প্রধান করণিক তাঁর যথাসাধ্য করেছেন, কিন্তু পড়ে রয়েছে আইনের সমস্যাগুলো; পেটেন্ট দান করার ব্যাপারে চুলচেরা বিচারের সিদ্ধান্ত দিতে হবে; বিদ্যালয়ের জমি বন্টন ও লীজ দেবার ব্যাপার; পশুচারণ, চাষবাস, জলাশয় ও দারুবৃক্ষের জমির শ্রেণীভাগ; বসত প্রার্থীদের জন্য নতুন জমির পত্তন, এই সব।

মনের শোক যতটা সম্ভব চেপে রেখে কমিশনার কাজে নেমে পড়েন নীরবে, এক গোঁ ধরে। জোর করে মনোযোগ দেন অফিসের জটিল আর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে। দপ্তরে ফেরার দ্বিতীয় দিনে তিনি কুলি ডেকে তাকে একটা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার দেখালেন, যেটা ওঁর নিজের চেয়ারের পাশেই থাকত। হুকুম দিলেন ওটাকে ছাদের গুদামঘরে তুলে দেবার জন্য। বিকেলের দিকে ওঁর কাছে বেড়াতে এলে জর্জিয়া সবসময় ওই চেয়ারটাতেই বসত।

সময় যতই কেটে যায়, কমিশনার যেন ক্রমে আরো চুপচাপ, নিঃসঙ্গ, আর গম্ভীর হয়ে যেতে থাকেন। একটা নতুন স্তরের মানসিকতা ওর মধ্যে গড়ে ওঠে। কোনো শিশুর উপস্থিতি বরদাস্ত করতে পারেন না। অনেক সময় কাজের বড় হলঘর থেকে কেরানিদেরই কারো কোনো বাচ্চাকাচ্চার আওয়াজ কানে এলে তিনি নিঃশব্দে উঠে তাঁর ছোট কামরার দরজাটা ভেজিয়ে দেন। হাস্যমুখর স্কুলের ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে ফুটপাত ধরে নাচতে নাচতে এলে তিনি ওদের এড়াবার জন্য রাস্তার অন্যপাশে চলে যান, আর তাঁর শক্ত চাপা ঠোঁট একটা সরু রেখায় পরিণত হয়।

ছোট্ট জর্জিয়ার সমাধি-স্তূপের ওপর থেকে শেষ মরা ফুলের পাঁপড়িটা বর্ষার জলে ধুয়ে যাবার পর আজ প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। এই সময়ে এল "হ্যামলিন এ্যাণ্ড আভেরি"—'জমি হাঙর'দের একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তারা দাবিপত্র পেশ করেছে সরকারী দপ্তরে। তাদের হিসেব অনুযায়ী এবছরের সবচেয়ে 'সেরা লাভের' দখলহীন জমিটা তাদেরই হতে পারে।

এটা অবশ্য ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে 'জমি-হাঙর' বলতে যাদের বোঝায় তারা সবাই এ বিশেষণের যোগ্য। ওঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা সৎ ব্যবসায়িক চরিত্রের সুনামসম্পন্ন মানুষ। তাঁদের কেউ কেউ সোজাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পরিষদে গিয়ে জানাতে পারেন—'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এইটা পেতে চাই, ওটা চাই এবং এইভাবে সেটা সম্ভব, ইত্যাদি'। কিন্তু পর-পর তিন বছর অজন্মা আর দস্যু পোকার উৎপাতের পর 'প্রকৃত বসতকারীরা' এই জমি-হাঙরদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে। জমি-হাঙররা জমিসংক্রান্ত দপ্তরগুলোতে হানা দিয়ে বেড়ায়, সেখানেই রাখা আছে সমস্ত জমিজমার রেকর্ড—আর খুঁজে বের করে 'শূন্যস্থানগুলো', অর্থাৎ রাজ্য এলাকার 'অদখলীকৃত' জমিজমাগুলো, সাধারণত

সরকারী মানচিত্রে যেগুলো অদৃশ্য কিন্তু আসলে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে "মাটির ওপর"। আইনের অধিকার-বলে যে-কোনো ব্যক্তির কিছু রাষ্ট্রীয় পরচা থাকলেই সে ওই পরচার জোরে দাবি পেশ করতে পারে যে-কোনো জমির ওপর যা আগে আইন মোতাবেক দখলীকৃত হয়নি। বেশির ভাগ পরচাই এখন জমি-হাঙরদের হাতে। তাই, মাত্র কয়েক শো ডলার খরচ করে তারা হামেশাই পেয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার ডলার মূল্যের জমি। স্বভাবতই 'শূন্যস্থানের' খোঁজ করাটা মহা উৎসাহের ব্যাপার।

কিন্তু প্রায়শই,—বলা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে জমি তারা এইভাবে কব্জা করছে (যদিও তা আইনত 'অদখলীকৃত' ছিল), তবু সে জমিতে তো আসলে বসবাস করত সুখী ও সন্তুষ্ট বসতকারীরাই। তারাই বছরের পর বছর পরিশ্রম করে বানিয়েছিল তাদের ঘর, অথচ এখন তারা আবিষ্কার করছে জমিতে তাদের স্বত্বগুলো নাকি বাজে কাগজ, তারা এখন পাচ্ছে জমিজমা ছাড়বার নোটিশ। এইভাবে এল তিক্ততা,—নিতান্ত অমূলক নয় এই পরিশ্রমী বসতিকারীদের ঘৃণা এই কূটবুদ্ধি ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে। তাদের দয়ামায়া বলতে কিছু নেই, ব্যর্থ পরিশ্রমের ফল এই ঘরবাড়ি থেকে এদের নিঃস্ব অবস্থায় তাড়িয়ে দিচ্ছে ওরা। রাজ্যের এসময়ের ইতিহাস তাই তাদের অসংখ্য বিরোধিতার উদাহরণে ভরা। দানবীয় জটিলতাপূর্ণ ভূমিব্যবস্থার এই পোড়াকপালে শিকারগুলোকে যেখান থেকে উৎখাত করতে হবে, সেই 'অকুস্থলে' কিন্তু মুখে দেখান না জমি-হাঙর মহাশয়, তাঁর দালালদের দিয়েই একাজ করিয়ে থাকেন। প্রত্যেক চাষী কুটিরেই তামা দিয়ে গুলি বানানো হচ্ছে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে; তাঁরই অনেক ভাই-বেরাদার নিজেদের রক্ত ঢেলে জমি উর্বর করেছে। এ সমস্ত দোষের মূল খুঁজতে গেলে অনেকটা পেছনে চলে যেতে হয়।

এ রাজ্য তখন ছিল নবযৌবনা, নবাগতদের আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করত সে। সীমার মধ্যে আগেই যেসব প্রাথমিক উদ্যোগীরা এসে গেছে তাদেরও পুরস্কার দিতে হয়। বছরের পর বছর নতুন জমির পরচা বিলি হত—শীর্ষাধিকার, একযোগে উপহার, প্রাক্তন সেনাদের অনুদান, কনফেডারেট (যারা যুক্তরাষ্ট্র-পূর্ব স্বতন্ত্র এলাকার নাগরিক); এছাড়াও রেলপথ, সেচ প্রতিষ্ঠান, কলোনি ও অজস্র কৃষক চাষীর জমি। অনগৃহীতের কাছে শুধু এইটুকু চাওয়া হত যেন তারা পরচা অনুযায়ী জমিগুলোকে জেলা অথবা এলাকার জরিপকারীদের দিয়ে যথাযথভাবে জরিপ করিয়ে সেগুলো সরকারী নথিভুক্ত করে। এই ভাবে যে জমি দখল করা হত তা অনুগৃহীতের বা তার উত্তরাধিকারীদের চিরকালের সম্পত্তি হয়ে থাকবে।

এখানেই হল ঝামেলার সূত্রপাত। সে আমলে রাজ্যের ভূমি-বিস্তার ছিল প্রকৃতপক্ষেই অফুরন্ত—আর বুড়ো জরিপকর্তারা রাজকীয় ঢঙে, হ্যাঁ পশ্চিমী মার্কিন

কায়দায়, অতি উদারহস্ত উপচে পড়লেও অঢেল পরিমাণেই দিতেন বিলিয়ে। মাপজোকের মালিক ওই ফুর্তিবাজ ভদ্রলোকরা প্রায়ই তেপায়াযন্ত্র আর শেকল, বেমালুম ছেড়ে দিতেন আসল কাজের বেলায়। স্রেফ পনিঘোড়ায় চড়ে তারই একেক পা ফেলার মাপে মোটামুটি একেক 'ভারা' ধরে নিতেন, আর একখানা পকেট কম্পাস দেখে বুঝে নিতেন কোন্ দিকে যাচ্ছেন। তারপর তাঁর পনির খুরের একেকটা 'ঘা' গুনে-গুনে কদমচালে শেষ করতেন তাঁর জরিপ নক্শা, কোণাগুলোতে ঢেঁড়া দিতেন, আর বেশ বহাল-তবিয়তে 'কর্তব্যকাজ সুসম্পন্ন' ভেবে লিখে দিতেন চিহ্ন, সংখ্যা ইত্যাদি মন্তব্য। কখনো-কখনো আবার (জরিপকর্তাকে কে আব দোষ দেবে!) যখন পনি 'নিজের খোশমেজাজে' চরে খেত, উনি হয়তো একটু ওপরে উঠে এগিয়েই গেলেন কয়েক পা, আর এতে লাভ ষোল আনা পরচা মালিকেরই কারণ এব ফলে হয়তো সে আরো হাজার দু'হাজার একর জমি বেশিই পেয়ে গেল তার পবচার দাবির বাইরে, জরিপের হিসেবে। কিন্তু ভেবে দেখুন কত সীমাহীন মাইল রাজ্যকে এইভাবে ছেড়ে দিতে হয়েছিল! অবশ্য কাউকেই কখনো নালিশ কবতে হয়নি পনির বেয়াড়াপনার জন্য। বাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটা পুরনো জরিপেই রয়ে গেছে বাড়তি অতিরিক্ত জমি।

পরের বছরগুলোতে যখন বাজ্যের জনসংখ্যা আরো বেড়ে গেল, জমির মূল্যও চড়তে লাগল, তখন এই দায়সারা কাজের ফলে ঝামেলা হয়ে উঠল ধারণাতীত—অন্তহীন মামলা, মারপেটাই করে জমি দখলের যুগ, আর রক্তপাতও কম নয়। পুরনো জরিপের এই বাড়তি জায়গাগুলো গোগ্রাসে গিলতে এল জমি হাঙররা, আব নতুন পবচার ভিত্তিতে ওগুলোকে অ-দখলীকৃত সাধারণ জমি বলে দাবি পেশ কবতে লাগল। যেখানেই মান্ধাতার আমলের দাগ-নিশানা অস্পষ্ট মনে হয়, কোণগুলো স্পষ্ট চিহ্নিত করা যায় না, সেখানে জমি-দপ্তর আধুনিক চিহ্নকরণকেই বৈধ বলে মেনে নেয়। আর জমির স্বত্বও দিয়ে দেয় চিহ্নকারীকে। এখানেই মাথা চাড়া দেয় চরম দুরবস্থা। সেকালের জরিপ অনুযায়ী পছন্দ-করা জমিগুলো প্রায় পুরোপুরিই ভোগদখল করছিল নিঃসন্দিগ্ধ শান্তিপ্রিয় বসতকারীরা, কিন্তু এখন তাদের জমিস্বত্ব নস্যাৎ হয়ে গেল। তাদের কাছে শর্ত দেওয়া হল—হয় তারা দ্বিগুণ দামে নিজেদের জমিই ফের খরিদ করে নিক্, নয়তো পরিবারপরিজনসহ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে অবিলম্বে জমি 'খালি' করে দিক্। শ'য়ে শ'য়ে জমি-যাচাইকারী গজিয়ে উঠল। একটা কাঁটা কম্পাসের অস্ত্র তাক্ করে, সারা দেশকে কাবু করে, চলল 'শূন্য জমির' তল্লাসী। হাজার-লাখো ডলারের মূল্যবান চমৎকার একবগুলো কেড়ে নেওয়া হল তাদের প্রকৃত ধারক নির্দোষ ক্রেতাদের কাছ থেকে। শুরু হল ভাঙা গাড়িতে চেপে উচ্ছিন্ন বসতিকারীদের বিশাল পথযাত্রা। উদ্দেশ্যহীন চলা, অবিচারকে অভিশাপ, হতভম্ব, গৃহহারা, আশাহীন, লক্ষ্যহীন।

ওদের শিশুরা এক টুকরো রুটির জন্য মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আর কাঁদে।

ঠিক এই অবস্থার পরিণতিক্রমেই 'হ্যামিল্টন ও আভেরি' দাবি পেশ করেছিল এক-মাইল-চওড়া তিন-মাইল-লম্বা একটি ভূখণ্ডের ওপর। তাতে জমি রয়েছে দু'হাজার একর। *চিকুইটো নদীর ধারে এলিয়াস ডেনি'র তিন-লীগ জরিপের বাড়তি* অংশ এটা, মধ্য-পশ্চিমের অন্যতম এক জেলায়। এই দু'হাজার একর-টাক জমি ওদের দাবি অনুযায়ী 'শূন্য' জমি; ওটা নাকি বেঠিক ভাবে ডেনি-জরিপের একটা অংশ বলে দেখানো হয়েছিল। ওদের এই দৃঢ়মতের ভিত্তি, আর জমিটার ওপর দাবির বাস্তব প্রমাণ হল—ডেনি-জরিপের শুরুর কোণটি পরিষ্কারই চিহ্নিত; মাপের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমদিকে ৫,৭৬০ ভারা যাবার পর আসছে চিকুইটো নদীর উল্লেখ; তারপর মাপ চলেছে দক্ষিণ মুখো, নদীর ধারের আঁকাবাঁকা ধরে—আর এই খানেই, চিকুইটো নদী তার নিজের ভূমিতে ওই বিন্দু থেকে আরও পুরো একটি মাইল পশ্চিমদিকে গিয়েছে পথ বা দূরত্বের হিসেবে। মোটের ওপর বলা যায়: সঠিক ডেনি-জরিপের নকশা আর চিকুইটো নদীর মাঝখানে রয়েছে দু'হাজার একর 'শূন্য' জমি।

ভ্যাপসা গরম জুলাইয়ের একটি দিনে কমিশনার এই 'নতুন চিহ্নিত' স্থান সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্রগুলো দেখতে চাইলেন। নথিপত্র এনে তাঁর ডেস্কের ওপর ডাঁই করে রাখা হল—এক ফুট উঁচু, তাতে আছে জরিপের টিপ্পনি নম্বর, নানা বিবৃতি, নক্শার খসড়া, হলফনামা, সংক্রান্ত বিষয়ে ঘুক্ত—মানে সমস্ত ধরনের দলিল যা কূটবুদ্ধি আর অর্থের বলে হ্যামলিন ও আভেরির কল্যাণে জড়ো করা যায়।

ওদের কোম্পানি কমিশনারের ওপর চাপ দিচ্ছে তাদের নির্বাচিত স্থানের স্বার্থে উনি স্বত্বাধিকার বন্টন করুন। ওদের কাছে 'ভেতরের খবর' রয়েছে—একটা নতুন রেলপথ সম্ভবত এই জমির কাছাকাছি কোনো স্থান দিয়ে অতিক্রমণ করবে।

কমিশনার যখন বিপুল সাক্ষ্যপ্রমাণের বোঝার মধ্যে একেবারে ঢুকে পড়েছেন তখন জমি-দপ্তরের বাইরের কামরাগুলো কিন্তু ভীষণ শান্ত। পুরনো প্রাসাদসম বাড়ির ছাদ থেকে শোনা যাচ্ছে কবুতরের বকবকম আর ডানা ঝাপটানো। কেরানিরা সর্বত্রই ঝিমুচ্ছেন, বেতন অর্জনের সামান্য ছলটুকুও দেখাচ্ছেন না। জমাট ফাঁকা, পাথরটৌকো বসানো মেঝে, প্লাস্টার-করা দেয়াল আর লোহার বরগা লাগানো ভেতরের ছাদ থেকে সামান্যতম আওয়াজও দশগুণ গম্ভীর হয়ে ঠিকরে আসে। অনন্ত চুনোপাথরের ধুলো ধরা-ছোঁয়া যায় না, কোথাও থিতু হয়ে বসেও না—আধভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে-ঢোকা সূর্যরশ্মির মধ্যে সে-ধুলো সাদা লম্বা পতাকাফালির মতো দেখায়।

মনে হচ্ছে 'হ্যামলিন ও আভেরি' ব্যাপারটা বেশ ভালই সাজিয়ে এনেছে। ডেনি-জরিপটা করা হয়েছিল অত্যন্ত অগোছালোভাবে—এমনকি সেই অযত্ন অবহেলার আমলের পক্ষেও। একটা সুনির্দিষ্ট সাবেকি স্পেনীয় অনুদানের সঙ্গে মিল রেখেই শুরুর কোণটা ধরা হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বাকি চিহ্নগুলো অত্যন্ত গর্হিতরূপে অস্পষ্ট। জরিপচিহ্নগুলো এমন কোনো বস্তুকেই সাক্ষী রাখেনি যা টিঁকে থাকার মত—না বড় গাছ, না কোনো প্রাকৃতিক বস্তু, এক চিকুইটো নদীটা ছাড়া, আর সেখানেও আবার এক মাইলের ফারাক। সুতরাং পূর্বতন উদাহরণ মেনে দপ্তর যদি পথ ও দূরত্বের হিসেবে বাকিটা পরিপূরণ করেও দেন তাতে তাঁরা অন্যায্য কিছু করবেন না। অবশিষ্ট জমিটাকে শুধু উদ্বৃত্ত নয়, শূন্যও বলে ধরে নিতে পারেন তাঁরা।

প্রকৃত বসতকারী এবার ক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ প্রতিবাদে ঘেরাও করতে লাগল দপ্তর। জমি-হাঙরের দিকে তার ডালকুত্তার নাক আর বাজপাখির নজর, তাদের চেলাচামুণ্ডাদের দেখেছে নিজের জমির সীমানায় ঘোরাঘুরি করতে। খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, লুটেরা তাদের বাস্তুভিটেতে হামলা চালাবে, তাই সে জমিতেই লাঙল ফেলে রেখে এবার ধরেছে কলম।

একটা বিশেষ প্রতিবাদপত্র কমিশনার দু'দুবার পড়লেন। চিঠিটা এক বিধবা মহিলার, স্বয়ং এলিয়াস্ ডেনিরই নাতনি। তিনি জানিয়েছেন কীভাবে তার ঠাকুরদা অনেক বছর আগে জলের দামে বেশির ভাগ জরিপ জমিই বেচে দিয়েছিলেন—যে জমি এখন পরিমাণে ও মূল্যে এক নম্বর জমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওঁর মা'ও একটা অংশ বেচে দেন। তিনিই এই পশ্চিম ভাগের উত্তরাধিকার নিয়ে চিকুইটো নদীর ধার বরাবর বাস করতেন। এরও বেশির ভাগটাই তিনি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন বেঁচে থাকার তাগিদে। এখন তাঁর আছে মাত্র তিনশো একর সম্বল, এখানেই তাঁর ভিটেবাড়ি। মহিলার চিঠির শেষ অংশ বেশ করুণ:

'আমার আটটি ছেলেমেয়ে, সবচেয়ে বড়টির বয়েস পনের। আমি সারা দিন, আর রাতের অর্ধেক অবধি, যতটুকু পারি জমিতে চাষের কাজ করি—ওতেই কাপড় আর বইপত্রের সংস্থান হয়। ছেলেমেয়েরা আমার কাছেই লেখাপড়া শেখে। আমার প্রতিবেশীরা সবাই গরিব, তাদের বড় বড় পরিবার। একবছর দু'বছর অন্তর খরার ফলে অজন্মা হয়, তখন আমাদের খাবার জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ জমিতে দশটি পরিবার আছে, আর এ-জমিই হাঙরেরা কেড়ে নিতে চাইছে, অথচ এরা সবাই স্বত্ব পেয়েছে আমার কাছ থেকে। ওদের শস্তায় বেচে দিয়েছি, পুরো দাম ওরা দিতে পারেনি, তবে কিছু অংশ দিয়েছে। আর ওদের জমি যদি কেড়ে নেয়া হয় তা'হলে আমি যে মারা পড়ব। আমার ঠাকুরদা ছিলেন সৎ মানুষ, এ রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের সৎ

তে শিখিয়েছিলেন, অথচ আমি এখন কেমন করে তাদের ক্ষতিপূরণ দেব যারা আমার জমি কিনেছিল? কমিশনার মহাশয়, আপনি যদি এই জমি-হাঙরগুলিকে আমার শিশুদের মাথার উপরের ছাদ এবং সামান্য যেটুকু নিয়ে তারা বেঁচে আছে তা কেড়ে নিতে দেন, তা'হলে বলব এই রাজ্যকে যারা মহান্ আর এই গভর্নমেন্টকে যারা ন্যায়পরায়ণ বলে, তাদের মুখে মিথ্যে বুলি ছাড়া আর কিছুর ঠাঁই নেই।'

কমিশনার নিঃশ্বাস ফেলে চিঠিটাকে একদিকে সরিয়ে রাখলেন। এরকম আরো অনেক, অনেক চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। কখনোই আঘাত পাননি। কখনো অনুভবও করেননি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই আবেদন জানানো হয়েছিল এইসব চিঠিতে। উনি তো রাজ্যের সেবকমাত্র, আইন তাঁকে মেনে চলতেই হয়। কিন্তু কোনো কারণে তাঁর এই চিন্তা সব সময় দূর করতে পারে না একটা বিশেষ দায়িত্ববোধের অনুভূতি, যা তাঁর মনের ওপর চেপে বসে থাকে। সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে তিনিই তাঁর বিভাগের সর্বপ্রধান, এমনকি গভর্নরও এর আওতার বাইরে নন্। এটা সত্যি যে তিনি মোটামুটি সাধারণ ভূমি-আইনগুলোই অনুসরণ করেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া আছে। আইনের চেয়ে বরং বিধিনির্দেশের পন্থাই তিনি বেশি করে মানেন, অর্থাৎ বিভাগ-গত বিধিবিধান এবং আগের নজিরগুলো। আজকাল রাজ্যের উন্নয়নে যেসব জটিল আর নতুন-নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাতে কমিশনারের বিশেষ নির্দেশের জন্য আবেদন প্রায় করতেই হয় না। এমন-কি আদালতও তা বহাল রাখে যখন দেখা যায় চাক্ষুষভাবে সুবিচারই হয়েছে।

কমিশনার দরজার কাছে এগিয়ে এসে ওপাশের কামরার একজন কেরানিকে বললেন—যেমনভাবে বরাবরই বলেন, যেন কোনো রাজবংশের কুমারকে বলছেন:

'মিঃ ওয়েলডন্, দয়া করে আপনি মিঃ অ্যাশ্‌কে একটু বলে দেবেন আমার অফিসে আসতে? মানে যত তাড়াতাড়ি তাঁর সুবিধে হয়।'

'রাজ্য বিদ্যালয়ভূমির মূল্যনির্ণায়ক' অ্যাশ বড়ো টেবিলটার ওপর তার রিপোর্টগুলো সাজিয়ে রাখছিল, চটপট্ করে চলে এল।

কমিশনার বললেন, 'মিঃ অ্যাশ, আপনি তো গতবার কাজে বেরিয়ে সালাডো জেলায় চিকুইটো নদীর ধার বরাবরই ঘুরে এসেছিলেন, তাই না? এঙ্গিয়াস ডেনির তিন লীগ জরিপের কিছু মনে পড়ে আপনার?'

'হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয় মনে আছে',—জবাব দেয় ভোঁতা হাল্কা মেজাজের জরিপকর্তা, 'এইচ্-ব্লকে যাবার সময় নদীটা পার হলাম উত্তরদিক থেকে। চিকুইটো নদী-বরাবরই তো রাস্তা গিয়েছে, খাত এলাকা ধরে। ডেনি-জরিপের তিন মাইল পড়েছে নদীর সামনাসামনি।'

কমিশনার বলেই চলেন, 'দাবি করা হচ্ছে যে এ জরিপ পুরো এক মাইলের মধ্যেও নদী ছুঁতে পারেনি।'

অ্যাশ ঘাড় কোঁচকায়। জন্ম ও সহজাত বুদ্ধিতে সে একজন 'প্রকৃত বসতকারী', তাই জমি-হাঙরদের স্বাভাবিক দুশমন।

শুকনো গলায় বলে, 'বরাবর নদীর কিনারা অবধি এগিয়ে গেছে বলেই তো ধরা হয়।'

'কিন্তু আমি ঠিক সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাইনি,' বলেন কমিশনার, 'ডেনি-জমিই যদি বলি, তা এই খাত এলাকার গ্রাম-দেশটা ঠিক কেমন বলুন তো?'

প্রকৃত বসতকারীর মেজাজই যেন প্রতিবিম্বিত হয় অ্যাশের মুখমণ্ডলে। সে উৎসাহভরে বলে, 'চমৎকার! একেবারে এঘরের মেঝের মতো সমান, সামান্য একটু ঢেউ সমুদ্রের মতো, আর জমির ফসল যেন দুধের সর। শীতের দিনে গরুভেড়া বাঁচাবার মতো গাড্ডা, যতটুকু না হলেই নয়। ছ'ফুট গভীর কালো দোআঁশ মাটি, তার নিচে কাদা, জল ধরে রাখতে পারে। ডজনখানেক সুন্দর ঘর রয়েছে জমিতে। সঙ্গে হাওয়াকল, বাগান। আন্দাজ করি লোকজন বেশ গরিব, বাজার বন্দর থেকে দূরে তো—কিন্তু স্বচ্ছন্দেই থাকে। আমি জীবনে অত বাচ্চাকাচ্চা দেখিনি।'

'ওরা বুঝি গরু ভেড়া পালে?' শুধোন কমিশনার।

'ও হরি, না! দুপেয়ে বাচ্চার কথা বলছি': হেসে ফেলে জরিপকর্তা, 'দুটি পা, খালি-পা, মাথায় শণের নুড়ি।'

'ছেলেপিলে! হাঃ ছেলেপিলে!' মনে-মনে বলতে থাকেন কমিশনার, যেন একটা নতুন দৃশ্য খুলে যায় ওর সামনে—'ওরা তাহলে ছেলেমেয়ে পয়দা করে!'

'নির্জন গ্রাম এলাকা, কমিশনার সাহেব—ওদের আর কী দোষ দেবেন?'

কমিশনার যেন কোনো নতুন বিস্ময়কর তত্ত্ব থেকে সাবধানে সিদ্ধান্ত টানার মতো ধীরে ধীরে বলেন, 'আমার তো মনে হয় না ওদের সকলের মাথায় শণের মতো কটা চুল। মিঃ অ্যাশ, আমার ধারণা ওদের কারুর কারুর মাথায় বাদামি, এমন-কি কালো চুলও আছে ভাবলে তা অযৌক্তিক হবে না!'

'বাদামি, কালো তো নিশ্চয়,—লালচুলও আছে,' বলে অ্যাশ।

'নিঃসন্দেহে।' বললেন কমিশনার, 'যাক্ আপনি আমায় দয়া করে খবরগুলো দিলেন বলে ধন্যবাদ। আমি আর আপনাকে বেশিক্ষণ আটকাতে চাই না, মিঃ অ্যাশ, আপনারও কাজ আছে।'

এর পর, বিকেলের দিকে এল হ্যামলিন আর আভেরি—দলাসই সুপুরুষ অমায়িক লোক, ইতস্তত পায়চারি করার অভ্যেস। পরনে সাদা মোটা কাপড়ের

পোশাক, পায়ে নিচু-কাট জুতো। সাফল্যের প্রফুল্ল হাওয়া ছড়িয়ে দিল সারা দপ্তরে। কেরানিকুলের মধ্যে পদচারণা করতে গিয়ে তারা সংক্ষিপ্ত ডাক-নাম আর পুরুষ্টু বাদামি চুরুট বিলিয়ে গেল।

এগুলোই হল জমি-হাঙরদের আভিজাত্য। তাদের নজর বড় জিনিসের দিকে। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, সিণ্ডিকেট নেই, রেল কোম্পানি অথবা এ্যাটর্নি-জেনারেল—যা ওদের পক্ষে বাগে আনা অসম্ভব। রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের অন্দরমহলে, বিধানসভার প্রতিটি কমিটি ঘরে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের উপবেশন কক্ষে আর রাষ্ট্রীয় রাজধানীর প্রতি গোপন মন্ত্রণাকক্ষে টের পাওয়া যাবে ওদের এই দুষ্প্রাপ্য মোটা বাদামি চুরুটের ধোঁয়ার বিশেষ ধরনের গন্ধ। সর্বদাই খোশমেজাজে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, মনে হয় যেন অফুরন্ত অবসর তাদের হাতে। লোকে অবাক হয়ে ভাবে কখন ওরা ওদের অতসব দুঃসাহসী কর্মোদ্যোগে মন দেয়? ওগুলোর মধ্যে তাদের তো মগ্ন হয়ে থাকার কথা?

ক্রমে ক্রমে ওরা দু'জন অবহেলায় ঢুকে পড়ল কমিশনারের কক্ষে, অলসভাবে কাত হল বড় চামড়াগদি-আঁটা আরামকেদারায়। টেনে-টেনে নালিশ জানাল আবহাওয়ার ভাবগতি সম্বন্ধে। তারপর হ্যামলিন কমিশনারকে শোনাল একটা চমৎকার কাহিনী যা আজ সকালেই সে সংগ্রহ করেছে স্বয়ং রাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে।

কিন্তু কমিশনার জানেন কেন তারা এখানে এসেছে। ওদের 'চিহ্নিত' দাবি সম্পর্কে আজই একটা নিষ্পত্তি জানাবেন বলে মোটামুটি কথা দিয়েছিলেন।

প্রধান করণিক এখন এক প্রস্থ সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি এনেছেন কমিশনারের 'সই' নেবেন বলে। প্রত্যেকটার ওপর তাঁর আঁকাবাঁকা স্বাক্ষর "হলিস্ সামারফিল্ড, কমিশনার জেনারেল, ভূমি-দপ্তর" অনুধাবন করে প্রধান করণিক নিপুণহস্তে সেগুলো সরিয়ে, ব্লটিং কাগজ চাপালেন। দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, 'দেখছি আপনি সালাডো জেলার সেই চিহ্নিত এলাকা খতিয়ে দেখছেন। কাম্ফার মশাই সালাডোর একটা নতুন ম্যাপ বানাচ্ছেন, আর বোধহয় এই অংশটাই নকশায় তুলছেন এখন।'

কমিশনার বললেন, 'আমি ওটা দেখব।' কয়েক মুহূর্ত বাদে তিনি নিজে উঠে নক্শাবিদের কামরায় গেলেন।

ঢুকেই দেখলেন পাঁচ-ছজন নক্শাকার কাম্ফারের ডেস্ক্ ঘিরে জটলা করছে, খরবরে জার্মান ভাষায় পরস্পরকে কিছু বলছে আর ঝুঁকে পড়ে দেখছে কোনো কিছু। কমিশনারকে দেখেই তারা ছড়িয়ে পড়ে নিজের-নিজের আসনে গেল। কাম্ফার শীর্ণ বেঁটেখাটো জার্মান। মাথায় লম্বা, কোঁকড়া উস্কোখুস্কো চুল, চোখদুটো সদাই জলসিক্ত। বোধ হয় কোনোরকম কৈফিয়ত জানাতে চাইছিলেন তোতলামি করে, কমিশনার ভাবলেন তাঁর ডেস্ক্ ঘিরে সঙ্গীরা ভিড় করেছিল তাই ক্ষমা চাইছেন।

বললেন, 'ওসব' থাক্। আপনি যে ম্যাপটা তৈরি করছেন সেটা দেখতে চাই।'—বুড়ো জার্মানের পাশ কাটিয়ে তিনি বসলেন নকশাবিদের উঁচু টুলটার ওপর। কাম্ফার তখনো কিছু কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ইংরেজিভাষার দফারফা করছেন—

—হের কমিশনার, আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি এ আমার মনগড়া কিছু নয়—এটা ছিলই, নিজে থেকে গড়ে উঠেছে। দেখুন না! জমির মাপ থেকেই নকশা করা। দয়া করে দেখুন মাপে কী বলছে: দক্ষিণে ১০° পশ্চিম থেকে ১০৫০ ভারা; দক্ষিণে ১০° পুবে ৩০০ ভারা; দক্ষিণে ১০০; দক্ষিণে ৯; পশ্চিমে ২০০; দক্ষিণে ৪০° পশ্চিম থেকে ৪০০—এইরকম সব। হের কমিশনার, আমার জীবনে তো কখনো—'

কমিশনার নীরবে একখানা সাদা দস্তানাপরা হাত তুললেন। কাম্ফার হাতের পাইপটা রেখেই প্রস্থান করল।

ডেস্কে কনুই আর দু'গালে দু'হাত রেখে কমিশনার তাকিয়ে থাকেন মানচিত্রটার দিকে—সেটা ওখানেই ছড়িয়ে এঁটে-রাখা। ওর মধ্যেই যেন দেখতে পান ছোট্ট জর্জিয়ার মিষ্টি জীবন্ত ছবিটা আঁকা—তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে, বিষণ্ণ, পেলব আর ছেলেমানুষী ভরা, হুবহু প্রতিচিত্রের মতো রেখায়িত।

পরে যখন এর কারণটা বুঝবার জন্য ওঁর মনটা উদ্‌গ্রীব হল, দেখলেন এটা ওই কাম্ফারেরই ভাষায় 'মনগড়া কিছু নয়'। বুড়ো নক্‌শাবিদ 'এলিয়াসি ডেনি'—জরিপটার নক্‌শা বানচ্ছিলেন, আর জর্জিয়ার মুখের অবিকল অংশটা ফুটে ওঠে নেহাৎই চিকুইটো নদীর আঁকবাঁকগুলোর মধ্যে—যদিও তা খানিকটা আশ্চর্যের। বাস্তবিকপক্ষে, কাম্ফারের ব্লটিং প্যাডের ওপর প্রাথমিক আঁকজোকগুলো করা হয়েছিল, তাই তাতে কষ্ট-করে টানা মাপের অঙ্কের রেখা, আর কাঁটা কম্পাসের অজস্র ছিদ্র। তারপরে কাম্ফার তাঁর হাল্কা পেন্সিলের দাগের ওপর শক্ত মোটা কলমে কালো চিনেকালিতে এঁকেছিলেন চিকুইটো নদীর প্রতিচিত্র। আর তা থেকেই রহস্যজনক ভাবে ফুটে উঠছে শিশুকন্যাটির সুচারু ব্যথিত মুখের আদল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আধ ঘন্টা বসে কমিশনার, সিধে নিচের দিকে তাকিয়ে, কারো সাহস হল না তাঁর কাছে আসার। তারপর তিনি উঠে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। কাজের অফিসে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন যাতে ডেনির ফাইলটা তার ডেস্কে এসে পৌঁছোয়।

হ্যামলিন আর আভেরিকে দেখলেন তখনো আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের যেন কোনো কাজকর্ম নেই। তারা অলসভাবে আলোচনা করছে গ্রীষ্ম মরশুমের অপেরা নিয়ে, সেটাই তাদের অভ্যেস—হয়তো-বা তাদের গর্বও এতে—বিশেষ করে যখন তাদের বিরাট কোনো স্বার্থ বিপদাপন্ন তখন

এমন দুরধিগম্য উদাসীনতা দেখাতেই হয়। আর এবারকার বাজিতে তাদের যে বিপুল জিত হবার কথা, তা আর ক'টি লোকই বা জানে! তারা ভেতরের খবর রাখে, জানতে পেরেছে বছরখানেকের মধ্যে একটা নতুন রেলপথ ঠিক এই চিকুইটো নদীর উপত্যকাকেই দুভাগে ভাগ করবে, আর গোটা পথের আশপাশে সমস্ত জমির মূল্যই আকাশচুম্বী করে দেবে। এমন অবস্থা যদি বজায় থাকে, তাহলে এ জমির ওপর মুনাফা তিরিশ হাজার ডলারের চেয়ে একটি পয়সা কম হলেও তা ওদের প্রত্যাশায় লোকসান ঘটাবে। তাই ওরা হালকা মেজাজে গল্পগাছা করলেও, সবুর করে কমিশনার কখন বিষয়টা উত্থাপন করবেন, ওদের দ্রুত আড়চোখের দৃষ্টিতে তাই ঝিলিক ওঠে। কখন ওরা চিকুইটোর ওই চমৎকার একরগুলোর ওপরে নিজেদের নির্ঝঞ্ঝাট স্বত্বটি পাবে। তাই লোভের সংকেত ওদের চোখে।

একজন কেরানি এল ফাইলটি নিয়ে। কমিশনার আসন গ্রহণ করলেন, লাল কালি দিয়ে কিছু লিখলেন কাগজের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে থাকলেন জানলার বাইরে। একটা উঁচু টিলার ঠিক মাথায় ভূমিদপ্তরের বাড়িটা। ঘন সবুজের মধ্যে ঠাসা অসংখ্য বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হল চোখঝলসানো সাদা পথের কাটাকুটিতে ভরা গোটা তল্লাটের ওপর। দিগন্তের যেখানে তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল সেখানে মোটামুটি বুনো একটা টিলা জেগে রয়েছে, তাতে ধবধবে সাদা কতগুলো বিন্দু। ওইখানেই সমাধিস্থানটা। ওখানে রয়েছে অনেকে, যাদের লোকে ভুলে গেছে, আবার রয়েছে এমনও কেউ-কেউ, যাদের জীবন বৃথা যায়নি। আর, একটি আছে খুব সামান্য জমি দখল করে—তার শিশু-হৃদয়টা ছিল এতই বড় যে স্পন্দনের শেষ মুহূর্তে এসেও কামনা করেছিল অন্যদের মঙ্গল। মনে-মনে ফিসফিসানির সঙ্গে কমিশনারের ঠোঁটদুটো সামান্য নড়ে ওঠে: 'এটাই তো ছিল ওর শেষ ইচ্ছা আর নির্দেশ অথচ এতকাল আমি তা অবহেলা করেছি!'

হ্যামলিন আর আভেরির বড়ো বাদামি চুরুট জোড়ার আগুন নিভে গেছে, কিন্তু এখনো সেগুলো দাঁতে চেপে রেখে অপেক্ষা করছে তারা। কমিশনারের মুখে অন্যমনস্কতার চিহ্ন দেখে তারা অবাক।

অবশেষে তিনি কথা বললেন—আচমকাই, অথচ ধীরে ধীরে।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এক্ষুনি অনুমোদন করেছি 'এলিয়াস ডেনির' জরিপে স্বত্বদান করে। এই দপ্তর এর কোনো অংশের ওপর আপনাদের দাবি আইনসিদ্ধ বলে মনে করবে না।'

তিনি এক মুহূর্ত থামলেন, তারপর সেই প্রিয় প্রাচীন নেতাদের মতো বিতর্কসভার ঢঙে হাত ছড়িয়ে ব্যাখ্যা করলেন বিধিনির্দেশের তাৎপর্য। ফলে শেষ অবধি কোণঠাসা

হল জমি-হাঙররা। দশহাজার গৃহের দরজায় শান্তি ও সংরক্ষণের শিলমোহর বসালেন কমিশনার।

'এর পরেও শুনে রাখুন'—কমিশনারের মুখের ওপর স্নিগ্ধ নির্মল আলোর আভা—'হয়তো আপনাদের জানতে আগ্রহ হবে। এখন থেকে রাজ্যর যেসব মানুষ এক সময় বসতিহীন জঙ্গল ও বর্বরদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে সরকারী অনুদানপত্র পেয়েছিল, তাদের জমির জরিপ এই দপ্তর বিচারবিবেচনা করে দেখবে। এই জরিপগুলো সৎ বিশ্বাসে করা হয়েছিল, সরল বিশ্বাসেই এগুলোতে বসতি হয়েছিল এবং সরল বিশ্বাসেই পুত্র-প্রপৌত্রদের অথবা নিরীহ ক্রেতাদের দান করা হয়েছিল। এ ধরনের জরিপ যদি কোনো বাড়তি অংশে ছাপিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা মানবচক্ষে দৃষ্ট কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে মেনে নেবে, সেই বস্তুতেই সীমানির্ধারণ করবে, এবং তা হবে সিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। আর এই রাজ্যের শিশুরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, জমির দখলস্বত্ব নিয়ে কোনো গুজব তাদের শান্তির ব্যাঘাত করবে না। কারণ—ঈশ্বরের রাজ্যের বিধান এই রকমই।' বলে শেষ করলেন কমিশনার।

এর পরের নীরবতাটুকু ভাঙল একটা হাসির শব্দে—নিচের তলার 'স্বত্ব বণ্টন' কক্ষ থেকে উঠে এসেছে। যে কেরানিটি "ডেনি"-ফাইল নিয়ে নিচে গিয়েছিল সেই ওটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সাথীদের।

উল্লসিত হয়ে বলছে, 'দেখ দেখ, বুড়ো কর্তা নিজের নামটাই ভুলে গেছেন। লিখেছেন 'মূল প্রাপককে দত্ত স্বত্বাধিকার,' আর সই করেছেন 'জর্জিয়া সামারফিল্ড, কমিশনার' বলে।

হ্যামলিন-আভেরির দুর্ভেদ্য মগজে সামান্য ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে কমিশনারের বক্তব্য। তারা মুচকি হাসে, ভদ্রভাবে উঠে দাঁড়ায়, বেস্‌বল টিমের কথা বলে, আর যেন অনুভূতি দিয়েই বিচার করে—আজ পুব দিক থেকে বেশ একটু হাওয়া উঠেছে মনে হয়। আরেকবার মোটা বাদামি চুরুট জ্বালিয়ে তারা বিনয়সহকারে প্রস্থান করে।

কিন্তু বধ্য শিকারের উদ্দেশে তারা আর-একটা ব্যাঘ্র-ঝম্পও দিয়েছিল এর পরে। তবে খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুসারে আদালতগুলো "তাদের ঠাণ্ডি রোস্ট" করে দেয় (তরল-বায়ুর কারিকুরি বিচার করলে অতীব বাহাদুরির কাজ), আর বহাল রাখে কমিশনারের বিধানই।

আর এই বিধানই পরে হয়ে দাঁড়ায় নজির বা পূর্ব সিদ্ধান্ত; প্রকৃত-বসত-কারীরা ওটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে, ছেলেপিলেদের ওটা থেকে বানান শেখায়। রাতে সকলেরই সুনিদ্রা হয়—পাইনবন থেকে তেজপাতা-ঝাড় অবধি, বেঁটে ওকের ঝোপ থেকে উত্তরের বড় বাদামি নদী পর্যন্ত।

কিন্তু আমি তো মনে করি, মানে আমি নিশ্চিত যে কমিশনার অন্যরকম কিছু ভাবেননি—তা সে কামফারই কোনো নিয়তির কোপনস্বভাব বৃদ্ধ অনুঘটক কিনা, অথবা চিকুইটো নদীর আঁকাবাঁকা পাড় দৈবক্রমেই সেই মিষ্টি স্মরণীয় মুখের আদল গড়ে তুলল কিনা—কিন্তু এর মাধ্যমে সত্যিই 'একদল ছেলেমেয়ের জন্য কিছু ভাল কাজ' তো হয়েছিল, আর এই সুফলটিকেই বলা উচিত 'জর্জিয়ার বিধান।'

Georgia's Ruling, 'আউটলুক', জুন ১৯০০

প্রস্তাবনা

ছুতোর মিস্ত্রি রচিত

আঞ্চুরিয়াতে গেলে সেখানকার লোকের মুখে শুনতে পাবেন কেমন করে তাদের উবে-যাওয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস নিজের হাতেই খুন হলেন উপকূল-বন্দর কোরালিওতে। এও শুনবেন যে আসন্ন বিপ্লবের হুজ্জত এড়াবার জন্যই তিনি পালিয়ে গিয়ে পৌঁচেছিলেন সেখানে, আর সরকারী তহবিলের একলক্ষ ডলার, যা তিনি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রজাতন্ত্রের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর মার্কিনী চামড়ার ব্যাগে বহন করছিলেন, তা আর পরে কোনোদিনও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘটনাটা যে কত 'সত্যি' তা বোঝাতে ওখানকার কোনো ছোকরা আপনাকে তাঁর কবরটাও দেখিয়ে দেবে। শহরের শেষ প্রান্তে একটা ম্যান্‌গ্রোভ (সুন্দরিগাছ)-জলার ওপর ছোট একটা সেতুর কাছে। কবরের মাথার-দিকে সাদামাটা একটা কাঠের তক্তা। কেউ গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে এই অক্ষরগুলো লিখে রেখেছিল শিরচিহ্নে:

র‍্যামন এঞ্জেল ডি লাস ক্রুজেস্‌
ঈ মিরাফ্লোরেস
প্রেসিডেন্টে ডি লা রেপুব্‌লিকা
ডি আঞ্চুরিয়া।
॥ঈশ্বরই তাঁর বিচারক হোন্‌॥

আবেগপরায়ণ এই মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্যই এই—কবর হয়ে যাবার পর আর তারা মানুষটির খোঁজ খবর নেয় না—'ঈশ্বরই তাঁর বিচারক হবেন!' এমনকি সেই না-পাওয়া একলক্ষ ডলারেও। লোভ তাদের ছিল খুবই, কিন্তু তাদের

হৈ-হল্লা-চিৎকার আর এর চেয়ে বেশি এগোয়নি, এখানেই ইতি।

আগন্তুক বা অতিথি কাউকে পেলে কোরালিওর লোকেরা শোনাবে তাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিয়োগান্তক কাহিনী—কেমন করে তিনি দেশ থেকে পালাতে চেষ্টা করলেন সরকারী তহবিল, আর সেই সঙ্গে যুবতী মার্কিন অপেরা-গায়িকা ডোনা ইসাবেল গিল্‌বার্টকে নিয়ে। আর এও শোনাবে কী করে কোরালিওতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের হাতে প্রায় ধরা পড়তে গিয়ে তিনি বরং নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে বসলেন তবু তহবিল ছাড়লেন না, পরিণতিক্রমে সিনোরিটা গিল্‌বার্টকেও নয়। কোরালিওবাসীরা আরো বলবে, এমন এক নামজাদা প্রণয়ীর অপমৃত্যু আর একই সঙ্গে লক্ষ ডলারের লোকসান ডোনা ইসাবেলের রোমাঞ্চকর ভাগ্যতরুর ছাল-বাকল খসিয়ে দিল, তাই সে এই স্রোতহীন উপকূলে নোঙর ফেলেই বসে রইল একটা উত্তাল জোয়ারের অপেক্ষায়।

কোরালিও'র ওরা বলে, ডোনা বেশ চটপটই পেয়ে গেল সেই শাঁসালো জোয়ারটি—শহরের মার্কিন বাসিন্দা ফ্র্যাঙ্ক গুডউইনের মূর্তিতে। ফ্র্যাঙ্ক এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের কারবারে টাকা ঢেলে ধনী হয়েছে—সে কদলীর 'কিং', রবারের 'প্রিন্স', সার্সাপারিলা-নীল-মেহগনির 'ব্যারন'। আপনারা শুনবেন—সিনরিটা গিলবার্ট সেনর গুডউইনকে প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর একমাস পরেই বিয়ে করলেন, অর্থাৎ ঠিক যে-মুহূর্তে তার ভাগ্যের স্মিতহাস্য ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তখনই সে লক্ষ্মীশ্রীর কাছ থেকে বাগিয়ে নিল তার হারিয়ে-যাওয়া পুরস্কারের চেয়েও মোটা এক উপঢৌকন।

আমেরিকান ডন ফ্র্যাঙ্ক গুডউইন এবং তার স্ত্রী সম্পর্কে এদেশীয়দের ভাল ছাড়া মন্দ বলার কিছু নেই। ডন ফ্র্যাঙ্ক তাদের মধ্যে বহু বছর ধরে বাস করেছে, তাদের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করে নিয়েছে। এখানকার 'ঠাণ্ডা-মাথা' সমুদ্রতীর যতটুকু সামাজিক জীবনের সুযোগ দেয়, তার মধ্যে অনায়াসেই তার স্ত্রী হল মক্ষীরানী। জেলার গভর্নরের পত্নী স্বয়ং—যিনি নাকি মন্টিলিয়ন-ঈ-ডোলোরেসা-ডি-লস্-স্যান্টোস-মেণ্ডেজের গর্বিত ক্যাস্টিলীয় পরিবারের লোক—তিনিও সিনোরা গুডউইনের খাবার টেবিলে আংটিপরা জলপাইরঙা আঙুল দিয়ে ন্যাপকিন খুলে বসতে মর্যাদাই বোধ করেন। যদি (আপনাদের উত্তরদেশী গোঁড়ামি-বশে) কখনো মিসেস্ গুডউইনের প্রাণোচ্ছল অতীতের কথা উল্লেখ করে বসেন—যেমন হাল্‌কা অপেরার যুগে তার স্পর্ধিত উল্লাসের জোয়ার বুঝি প্রবীণ প্রেসিডেন্টের মন কেড়ে নিয়েছিল, অথবা রাষ্ট্রনেতাটির পতন ও বেআইনি কাজকর্মে বুঝি তারও ভূমিকা ছিল—তাহলে একমাত্র জবাব পাবেন তাদের লাটিন কায়দায় ঘাড় কোঁচকানো, অথবা সরাসরি প্রতিবাদে। কোরালিওতে সিনোরা গুডউইন সম্পর্কে যেটুকু বদ্ধ ধারণা ছিল তা অতীতে যেমনই হোক্, আজ বোধ হয় তারই সপক্ষে।

মনে হবে কাহিনীটা হয়তো শুরু হওয়ার বদলে শেষই হয়ে গেল। হয়তো বিয়োগান্ত নাটকের শেষ, আর একটি রোমান্সের চূড়ান্ত পর্যায়, পাঠকের আগ্রহের সমগ্র আঙিনা পেরিয়ে এসেছে; কিন্তু আরো কৌতূহলী পাঠকের কাছে সামান্য কিছু শেখার ব্যাপার হবে যদি ঘনসংবদ্ধ সূত্রগুলোকে অনুসবণ করা যায়—এগুলো অবস্থাক্রমেব সুকৌশলী মাকড়সা-জালেব আড়ালেই লুকোনো।

প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসেব নাম-লেখা শিবোফলকটা প্রত্যহই সাবান-ছোবড়া আর বালি দিয়ে ঝাড়পোঁছ করা হয। একজন বুড়ো দোআঁশলা ইণ্ডিয়ান (আমেরিকান) নিষ্ঠার সঙ্গে কবরটা দেখাশোনা করে, অলস শ্লথ-ভালুকের মতো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। ভোজালি-দা দিয়ে আগাছা আর ক্রমাগত গজিয়ে-চলা ঘাস কেটে সাফ করে, আঙুলের শক্ত নখেব চিমটি দিয়ে পিঁপড়ে, কাঁকড়াবিছে আব গুবরে পোকা তুলে ফেলে, আর প্লাজাব ফোয়াবা থেকে জল এনে সেচে দেয কবরের ঘাসে। কোথাও এমন যত্নে সাজিয়েগুছিয়ে রাখা হয না কোনো কবব।

অন্তর্মগ্ন সূত্রগুলো ধরে এগোলেই একমাত্র পবিষ্কার হবে কেন এই বুড়ো ইণ্ডিয়ান গালভেজ-কে গোপনে অর্থ দেয়া হয প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসের কবরটা সবুজ রাখাব জন্য—আব সে-অর্থ দেয় এমন একজন যে জীবনে, বা মরণকালেও, হতভাগ্য রাষ্ট্রনেতাকে চোখে দেখেনি। আব কেনই বা একজন নিয়মিত অভ্যাসে গোধূলি-আলোয় হেঁটে যায়, দূর থেকে সকরুণ সবিনয নেত্রে তাকিয়ে দেখে ওই মর্যাদাহীন মাটির ঢিবিটা।

কিন্তু কোরালিওতে না হলেও অন্য জায়গায় শুনতে পাবেন ইসাবেল গিলবার্টের উদ্দাম জীবনযাত্রার কথা। নিউ অর্লিয়ন্স শুধু তাকে জন্মই দেয়নি, দিয়েছে তার ফরাসী-স্পেনীয় সংকর (ক্রিওল) প্রকৃতি—তাব জীবনকে এমন অশান্ত উষ্ণতায় রঞ্জিত কবেছে এই প্রকৃতিই। শিক্ষা-দীক্ষা তার সামান্যই, কিন্তু যেন সহজাত ভাবেই এসেছে মানুষ ও তাদের চালচলন সম্পর্ক জ্ঞান। সাধারণ স্ত্রীলোকদের নাগালের অনেক বাইরে তার বেপরোয়া দুঃসাহস, বিপদের একেবারে শেষ ধাপ অবধি অভিযান চালিয়ে যাবার ঝোঁক, সেই সঙ্গে আবার জীবনের আনন্দ উপভোগের আকুতি। যে-কোন বাধাবন্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই ছিল তার মনোবৃত্তি; স্বর্গ থেকে পতনের পর ঈভেরই মতো, তবে জীবনেব তিক্ততাটুকু বোধ করার আগে। জীবনকে সে বুকের মধ্যে গোলাপের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। শত-শত পুরুষ যারা ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ত, তাদের মধ্যে শুধু একজনই ছিল ভাগ্যবান্—ওর সব কল্পনাকে মুগ্ধ-মগ্ন করে রাখবার মতো। আঞ্চুরিয়ার দেদীপ্যমান অথচ অস্থির শাসক মিরাফ্লোরেসের হাতেই সে সঁপে দিয়েছিল নিজের অটল হৃদয়ের চাবি। তাই যদি হয়, তা'হলে কেমন করে (কোরালিওবাসীদের যা বক্তব্য) তাকে আমরা ফ্র্যাঙ্ক গুডউইনের কান্তা হিসাবে দেখি—সুখ স্বপ্নবিভোর এক নিষ্কর্মার মন্থর জীবনে?

অন্তর্মগ্ন সূত্রগুলো অনেক, অনেকদূর অবধি ছড়িয়ে আছে,— সাগরের ওপারে অবধি। সেগুলোকে অনুসরণ করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে কেন কলাম্বিয়া গোয়েন্দা সংস্থার "বাঁটুল" ও'ডে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়েছিল। আর, খানিকটা হাল্কা অবসর বিনোদনের জন্য, ক্রান্তীয় এলাকার তারামণ্ডলীর নিচে বিদূষক দেবতার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কর্তব্যও করা হবে, আমোদ-প্রমোদও হবে—কারণ সেখানেই বিয়োগান্ত নাটকের দেবী একসময় কঠোর রূপ নিয়ে পদক্ষেপ করতেন। এখন কাজ হবে ওই দেদার জঙ্গল আর কুটিল ভঙ্গিল পাহাড় থেকে হাসির প্রতিধ্বনি তোলা—ওখানেই আগে আর্তনাদ উঠত জলদস্যু কবলিত আক্রান্তের। এখন আমাদের কাজ বর্শা আর খঞ্জর সরিয়ে রেখে তরল পরিহাস আর প্রফুল্ল রসিকতা দিয়ে আক্রমণ; রোমান্সের জং-ধরা কৌটো থেকে অন্তত একটি বেঁচে-থাকা খিলখিলে হাসি টেনে বের করা—ওই বাঁকা উপকূলরেখা যেখানে উদ্গত হাসি-আঁকা ঠোঁটের মতো, ওখানেই লেবুগাছের ছায়ায় বসে এসব তো আনন্দেরই কাজ হবে।

কারণ, 'স্পেনীয় সমুদ্রের কাহিনী' এখনো অনেক আছে। ঝড়-বিক্ষুব্ধ ক্যারিবিয়ান বিধৌত মহাদেশের ওই অংশটা সমুদ্রের মধ্যে টেনে এনেছে দুর্ভেদ্য গ্রীষ্ম-অরণ্যের সীমানা, শিয়রে ঝুঁকে-পড়া কর্ডিলেরা পর্বতমালা, এরই মধ্যে এখনো রহস্য আর রোমান্সের বেষ্টনী। অতীত দিনে জলদস্যু আর বিপ্লবীরা এর পাহাড়ে-পাহাড়ে জাগাত প্রতিধ্বনি। কণ্ডোর-শকুনি যেখানে অনন্ত পাক খেয়ে উড়ত, সেই সবুজ ঝোপগুলোর নিচে তাদের খাদ্য বিছিয়ে দিত জলদস্যুরাই, তাদের গাদাবন্দুক আর তলোয়ারের সাহায্যে। সমুদ্র অভিযাত্রীরা, বিরুদ্ধ জাতির সেপাইরা, আর আচম্বিতে উত্থিত বিদ্রোহী দল বার-বার কেড়ে নিয়েছে, হাত-বদল করেছে এই ৩০০ মাইল দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিযান-জর্জর উপকূলভাগ—অথচ শত-শত বর্ষ ধরেও এই ভূখণ্ড জানেনি কে তার প্রকৃত মালিক। পিৎসারো, বালবোয়া, স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক আর বলিভার তাদের যথাসাধ্য করেছিলেন একে খৃষ্টানজগতের অন্তর্ভুক্ত করতে। স্যর জন মর্গান, লাফীৎ এবং অন্যাসব নামকরা অত্যাচারীরা নরকের দিব্যি করে গুলি-গোলাবর্ষণে চূর্ণ করতে চেয়েছিল এই উপকূলভূমি।

সেই খেলা এখনো চলেছে। হামলাবাজদের কামান হয়তো স্তব্ধ; কিন্তু টিনপ্লেটে চিত্র-তোলা, ফোটো-বড় করার দল, কোডাক ক্যামেরা হাতে ট্যুরিস্ট আর ভদ্র জালিয়াত বাহিনীর গোয়েন্দারা জায়গাটা খুঁজে বের করেছে, আর তাদের কাজও চালিয়ে যাচ্ছে। জার্মানি, ফ্রান্স আর সিসিলির ক্ষুদে ফেরিওয়ালারা এখন দোকানে বসে এখানকার খুচরো পয়সা থলিতে পোরে। শাসকদের প্রতীক্ষা-কামরায় ভিড় জমায় ভদ্র অ্যাডভেঞ্চার-সন্ধানীরা, তারা রেলপথ ও সুযোগ সুবিধার নানা প্রস্তাব দেয়। ক্ষুদে প্রহসন-চরিত্রের জাতগুলো প্রশাসন ও ষড়যন্ত্রের খেলা খেলে, যত দিন-না হঠাৎ কোনো এক বিশাল নিঃশব্দ রণতরী ধীরে এসে দাঁড়ায় সমুদ্রতীরের

অদূরে, আর হুঁশিয়ারি দেয় 'খেলনা-পাতি ভাঙা' বন্ধ করতে। আর এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসে ছোটখাট রোমাঞ্চ সন্ধানীও—শূন্য পকেট ভরতে। একেকজন দিলদরিয়া ব্যস্তমগজ আধুনিক রূপকথার রাজপুত্র; তাদের সঙ্গে থাকে একেকটা অ্যালার্মঘড়ি—ভাবপ্রবণ কোনো চুম্বনে জেগে ওঠার চেয়ে তা দিয়ে বরং শতাব্দীর ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন ক্রান্তিমণ্ডলকে জাগিয়ে তোলাই চলে। সাধারণত মাথায় সে চুড়ো-পল্লব লাগায়, অতিসজ্জিত তালগাছের সঙ্গে সগর্বে টেক্কা দিতে। ট্র্যাজেডির দেবীকে সেই তো ঠেলে দিয়েছে মঞ্চের কোণায়, আর কমেডিকে নাচতে টেনে এনেছে দক্ষিণ গোলার্ধের তারামণ্ডলীর পাদপ্রদীপের সামনে।

তাই ছোট কাহিনীটার মধ্যেই রয়েছে অনেক কিছু বলার কথা। হয়তো সিন্ধুঘোটকের বাছবিচারহীন কানের পক্ষেই সহজগ্রাহ্য এ কাহিনী—কারণ এতে সত্যিই আছে জুতো থেকে জাহাজ, লাক্ষা থেকে কপি-তালশাঁস। আর রাজার বদলে রাষ্ট্রপতি।

এরই সঙ্গে যোগ করুন একটু ভালবাসা আর পাল্টা ষড়যন্ত্র। আর রহস্যজালের সর্বত্র ছড়িয়ে দিন ক্রান্তীয় মুদ্রার অনুসরণ-সূত্র—সে ডলারও ভাগ্যসন্ধানীর হাতের উষ্ণতায় এ-মুলুকের সূর্যতাপের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হবে না। তা ছাড়া আসল কথা, প্রকৃত জীবন তো মনে হয় এখানেই—এত কথা এত বক্তব্য যা এমনকি সবচেয়ে বাক্যবাগীশ সিন্ধুঘোটককেও হয়রান করে দেবে।

[পরের চারটি কাহিনীর প্রস্তাবনা]

The Proem. এইন্সলি. ১৯০১

"শেষ রাতের শেয়াল"

প্রথম কাহিনী

ভর-দুপুরের গরমে কোরালিও অর্ধশয়ান, যেন সুরক্ষিত হারেমে গড়িয়ে নিচ্ছেন অলস কোনো সুন্দরী। পল্লিসজ্জিত উপকূলের একফালি জায়গায় সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে শহরটা। পান্নার সারির মধ্যে একটি ছোট মুক্তো বসানো যেন। ঠিক পেছনেই মাথার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে বুঝি কর্ডিলেরার সমুদ্রমুখী শৈলমালা। সামনে সমুদ্রের বিস্তার, সহাস্য বদন কারারক্ষীর মতো,—কিন্তু ভ্রূকুটিময় পাহাড়ের চেয়েও সে বেশি কড়া, উৎকোচ-অসাধ্য। মসৃণ সাগরবেলায় ঢেউগুলো সাঁই সাঁই শ্বাস ফেলে যায়, কমলালেবু আর 'সেইবা গাছে' তোতাপাখি চেঁচায়। তালগাছের

পাতাগুলো বোকার মতো হাত নাড়ে, যেন নায়িকা মঞ্চে অবতীর্ণ হবার মুহূর্তে কোনো আনাড়ি সখীদলের অঙ্গভঙ্গি।

হঠাৎই শহরটা যেন উত্তেজনায় ভরে গেল। ঘাস-গজানো রাস্তায় একটি দেশী ছোকরা ছুটছে আর চিৎকার করছে—"সেনর গুডউইনের জন্য খবর। তাঁর নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

কথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কোরালিওতে কারো নামে কোনো টেলিগ্রাম কদাচিৎ আসে। ডজনখানেক উপর-পড়া গলা এবার সশব্দে তুলে নিয়েছে সিনর গুডউইনের উদ্দেশে আওয়াজটা। সৈকতের সমান্তরাল প্রধান সড়কটা ভরে উঠল লোকজনে, তারা কাগজটা প্রাপকের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে উন্মুখ। রাস্তার কোণে-কোণে জটলা পাকিয়েছে নানা বর্ণের স্ত্রীলোক, অতি হাল্‌কা জলপাই-রং থেকে ঘন বাদামি পর্যন্ত। কাতরকণ্ঠে রোল তুলেছে: "উন্ টেলিগ্রামা পোর্ সেনিওর গুডউইন!"

ফৌজী কমাণ্ডাণ্ট, ডন সিনর এল্ করোনেল এনকার্নাসিয়ন রিওস্ 'অন্তর্দল-এর' অনুগত। সন্দেহ করেন গুডউইন 'বহির্দল-এর' ভক্ত। হিসিয়ে উঠলেন 'আঃহা!' বলে। তাঁর গোপন ডাইরি-বইতে লিখলেন, 'অভিযোগের মতো ঘটনা যে আজকের গুরুত্বপূর্ণ দিনে সেনর গুডউইন একটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন।'

হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে একটি লোক তার ছোট কাঠের-বাড়ির দরজায় পা রেখে তাকায় বাইরের দিকে। দরজার ওপর সাইনবোর্ডে লেখা "কিওঘ ও ক্ল্যান্সি"—দেখলেই মনে হয় এ গরম-দেশের মাটিতে ওটা কোনো স্বদেশী নাম নয়। দরজার সামনের লোকটাই বিলি কিওঘ—প্রথম জীবনে ভাগ্য ও উন্নতির সন্ধানী, পরবর্তী কালে স্পেনীয় সমুদ্রের বোম্বেটে। সে আমলে টিনপ্লেট খোদাই আর ফোটো-তোলাকেই অস্ত্র করে কিওঘ আর ক্ল্যান্সি অসহায় সমুদ্রতীরে হামলা চালিয়েছিল। দোকানের বাইরে দুটো বড়ো ফ্রেমে সাজানো আছে ওদের শিল্পকৌশলের নমুনাগুলো।

রাস্তায় অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আর আওয়াজে সচকিত হয় কিওঘের মজাদার খোলামেলা মুখখানা, সে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কোলাহলের মানেটা যখন তার কাছে পরিষ্কার হল তখন সে ঠোঁটের পাশে হাতের তেলো রেখে চেঁচিয়ে উঠল—"এই ফ্র্যাঙ্ক!" বলে। এমন জোরালো সে কণ্ঠস্বর যে তাতে এদেশীদের দুর্বল চিৎকার একেবারে ডুবে গিয়ে ক্ষান্ত হল।

পঞ্চাশ গজ দূরে, রাস্তার সমুদ্রমুখো দিকটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের বাসাবাড়ি। ডাক শুনে গুডউইন টুপ্ করে বেরিয়ে এল ওবাড়ির দরজা থেকে। কনসালদপ্তরের পেছনদিকের বারান্দায়-কনসাল উইলার্ড গেডি'র সঙ্গে বসে ধূমপান করছিল সে। ওটাকেই কোরালিওর সবচাইতে সুশীতল জায়গা বলে মনে করা হয়।

কিওঘ উচ্চকণ্ঠে বললে, 'তাড়াতাড়ি কর! তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, তাই নিয়ে শহরে দাঙ্গা হাঙ্গামা। এ সব ব্যাপারে তোমাকে একটু সাবধান থাকতে হয় যে বাছা। এভাবে পাবলিকের মতিগতি নিয়ে হেলাফেলা করা চলে না। হয়তো একদিন একটা গোলাপি চিঠি পেয়ে যাবে ভায়োলেটের গন্ধ মাখা; আর গোটা দেশটাই তখন বিপ্লবে মেতে উঠবে।'

গুডউইন রাস্তা ধরে হেঁটে গেল বার্তাবাহক ছেলেটির কাছে। গো-নয়নী মহিলারা লাজুক মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, ওর বিশেষ আদলটা তাদের আকর্ষণ করে। সোনালিচুল, দীঘল চেহারা, তরতাজা সাদা লিনেনের জামা, সেই সঙ্গে হরিণ চামড়ার 'জাপাটো'। ওর ব্যবহারটা সুবিনয়ী, তাতে একধরনের সদয় উগ্রতা আছে যা আবার করুণাদৃষ্টিতে স্নিগ্ধ। যখন টেলিগ্রামটা নেওয়া হল, বখশিশ দিয়ে বিদায় করা হল বাহকটিকেও, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জনতা ফিরে গেল সেই ছায়ার সান্নিধ্যে যেখান থেকে কৌতূহলের বশে তারা বেরিয়ে এসেছিল। মেয়েরা ফিরে গেল কমলালেবু গাছের নিচে তাদের মাটির উনোনে রুটি সেঁকতে, অথবা অনন্ত বসে-বসে লম্বা সোজা চুলে চিরুনি আঁচড়াতে। পুরুষরা রইল সিগারেট টানা আর 'ক্যান্টিনায়' বসে গল্পগাছা করতে।

কিওঘের দোরগোড়ায় বসে টেলিগ্রামটা পড়ল গুডউইন। ওটা এসেছে বব এঙ্গলহার্টের কাছ থেকে। সে একজন আমেরিকান, আরো আশি মাইল ভেতর দিকে আঞ্চুরিয়ার রাজধানী সান মাতিওতে বসবাস করে। এঙ্গলহার্ট সোনার খনির মালিক, উৎসাহী বিপ্লবপন্থী, মোটের ওপর "ভালো লোক"। ও যে কত বুদ্ধি আর উদ্ভাবনাশক্তি ধরে তার প্রমাণ এই টেলিগ্রামটাই। ওর দরকারি একটা কাজ ছিল কোরালিওতে ওর বন্ধুকে একটা গোপনীয় বার্তা পাঠানো; তা সেটা স্প্যানিশেও লেখা চলবে না, ইংরেজিতেও নয়, কারণ আঞ্চুরিয়াতে রাজনৈতিক-গোয়েন্দার চোখ অতি তৎপর। অন্তর্দল আর বহির্দল, দু'পক্ষই হামেশা সতর্ক। কিন্তু এঙ্গলহার্ট কূটনীতি-বিশারদ। একটাই সংকেত লিপি আছে দুনিয়াতে, যার ওপর নির্ভয়ে ভরসা করতে পারে সে—'ইতর বুলি'র মোক্ষম সংকেত অতএব এই হল সেই বার্তা যা 'অর্থবহ নয়' বলে কৌতূহলী কর্মচারীদের আঙুল গলে বেরিয়ে এসেছে, আর পড়েছে গুডউইনেরই চোখে:

"গোদা খরগোশের শুঁড়িপথ ধরে কাল বড় কলমের ডগা কেটে পড়েছে—কৌটোর বিলকুল রেস্তগি আর তার 'আহা-মরি' মস্লিন-পুঁটলিটা সঙ্গে নিয়ে। ভাঁড়ারে ছয়-অঙ্ক খামতি। আমাদের লোক সব দুরস্ত, তবে আমাদের চাই নগদি। তুমি কব্জা কর। আসলি মরদ আর শুখা মাল দরিয়ার পথে। কী করতে হবে তুমি জান।

—বব।"

চমকপ্রদ হলেও এই দীর্ঘ বার্তায় কোনো রহস্য নেই গুডউইনের কাছে। ফাটকাবাজ আমেরিকান যারা আঞ্চুরিয়ায় অভিযান করেছে তাদের মুষ্টিমেয় অগ্রণী-রক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ব্যক্তি গুডউইন। পূর্বানুমান আর সঠিক সিদ্ধান্তের কায়দাকানুন আয়ত্ত না করে তো সে এই শীর্ষস্থানে পৌঁছোয়নি? রাজনৈতিক চক্রান্ত তার দৈনন্দিন ব্যবসারই অঙ্গ। ধুরন্ধর মতলববাজদের কিছুটা প্রভাবিত করার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার ছিলই, আর ক্ষুদে কর্মচারীদের ভক্তিশ্রদ্ধা কেনার মতো যথেষ্ট অর্থও তার আছে। একটা বিপ্লবী দল তো হামেশাই থাকে, তাদের সঙ্গেই সে সর্বদা হাত মেলায়। কারণ নতুন প্রশাসন এলে তাদের অনুগামীরাই মেহনতের পুরস্কারটি নেবে। এখন একটা উদারনীতিক পার্টি আছে যারা প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসকে সরিয়ে দিতে চায়। চাকা যদি ঠিকমতো ঘোরে, তাহলে দেশের অভ্যন্তরে ৩০ হাজার মান্‌জানা সেরা কফির বাগান গুডউইনের মালিকানায় আসার কথা। প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক জীবনে কিছু ঘটনা ঘটেছে যা গুডউইনের মনে গূঢ় সন্দেহ জাগায়—গভর্নমেন্টের পতন প্রায় আসন্ন, তবে তা বিপ্লব নয়, অন্য কোনো কারণের ফলে। আর এই সময় এঙ্গলহার্টের তারবার্তা ওর নিজের জ্ঞানের সঙ্গে পুরো সঙ্গতি রেখেছে দেখা যাচ্ছে।

আঞ্চুরিয়ার ভাষাবিদ্‌রা বৃথাই চেষ্টা করেছিল তাদের স্পেনীয় আর প্রাথমিক ইংরেজির জ্ঞান দিয়ে তারবার্তার পাঠোদ্ধার করতে, তাদের কাছে ওটা দুর্বোধ্যই রয়ে গেল। এদিকে গুডউইনের বোধশক্তির কাছে তা এক উত্তেজনাকর খবরের খোরাক। বুঝিয়ে দিচ্ছে যে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছেন অর্থকোষের যথাসম্বল নিয়ে। তাছাড়া এও জানাচ্ছে পলায়নের সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন সেই অপেরা গায়িকা, মন-মজানো 'প্রণয়ী-সন্ধানী' ইসাবেল গিল্‌বার্টকে। তার অভিনেতৃদলকেই তো গত এক মাস ধরে সান মাতিওতে প্রেসিডেন্ট এমন আদর আপ্যায়ন করছিলেন যার খানিকটা পেলেও কৃতার্থ হতেন অন্য রাজকীয় অতিথিরা। "গোদা খরগোশের শুঁড়িপথ" বলতে বোধহয় বোঝানো হয়েছে কোরালিও থেকে রাজধানী অবধি রসদবাহী খচ্চরের চলার রাস্তাটাকেই। "ভাঁড়ারে ছয়-অঙ্কের খামতি" পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে জাতীয় কোষাগারের কী করুণ অবস্থা! এটাও বেশ সত্যি কথা যে 'ভেতর-মুখো' দলটি—যাদের এখনকার পথ প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে—"নগদি" (টাকাকড়ি) তো চাইবেই। বাস্তবিকই নতুন গভর্নমেন্টের অবস্থা হবে ঘোরালো, যদি-না তারা নিজের শপথ রক্ষা করে, আর লুটের মাল না রাখে বিজয়ীদের চিত্তবিনোদনের জন্য। সুতরাং এখন একান্তই দরকার "আস্‌লি মরদকে কব্‌জা করা", এবং টাকাকড়ি আর গভর্নমেন্ট পুনর্দখল করা।

গুডউইন বার্তাটি তুলে দেয় কিওঘের হাতে। বলে. 'পড়ে দেখ বিলি। বব এঙ্গলহার্টের কাছ থেকে এসেছে। সংকেতগুলো ধরতে পার?'

দরজার অন্যদিকে বসে কিওঘ খুব যত্ন করে পড়ল টেলিগ্রাম।

অবশেষে বলল, 'এ তো সংকেতের কথা নয়, এ যে, যাকে ওরা বলে সাহিত্য! একটা ঢঙের ভাষা যা লোকের মুখে ঢোকানো হয়েছে। অথচ তারা কোনোকালে কল্পনাশীল লেখকদের চেনেই না। পত্রপত্রিকাগুলো এগুলো আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আমি আগে জানতাম না যে প্রেসিডেন্ট নরভিন গ্রীনও তাঁর অনুমোদনের মোহর বসিয়েছেন। এখন আর এটা সাহিত্য নয়, দেশের ভাষাই। অভিধানগুলো চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা স্থানীয় বাচনের বেশি এগুতে পারেনি। তবে এটা নিশ্চয় যে একবার যখন পশ্চিমী ইউনিয়ন অনুমোদন করেছে তখন এক জাতের লোক গজিয়ে উঠবেই যারা এ-ভাষায় কথা বলে।'

'ওঃ তুমি বড্ড বেশি ভাষাতত্ত্বের দিকে ছুটছ বিলি,' বলল গুডউইন, 'তুমি কি এটার মানে বুঝতে পেরেছ?'

'নিশ্চয়', জবাব দেয় ভাগ্যলক্ষ্মীর দার্শনিক, 'যে মানুষকে জানতেই হবে তার কাছে সব ভাষাই সহজ। একবার যখন বন্দুকের নল বাগিয়ে উচ্চমানের চীনাভাষায় আমাদের হুকুম করা হয়েছিল সরে যেতে, তখন এমনকি আমিও বুঝতে ভুল করিনি। এই যে ছোট সাহিত্যিক রচনাটি আমার হাতে, এর মানে হল "শেষ রাতের শেয়ালের" খেলা। কখনো ছেলে বয়েসে এ খেলা খেলেছ ফ্রাঙ্ক?'

গুডউইন হাসতে-হাসতে বলে, 'বোধহয় খেলেছি। হাত-ধরাধরি করে চারদিক ঘিরে দাঁড়াবে, আর—'

'মোটেই না', বাধা দেয় কিওঘ, 'একটা মজার শিকারের খেলা তুমি গুলিয়ে ফেলেছ "গোলাপঝাড়-ঘিরে-দাঁড়াও" খেলার সঙ্গে। "ভোরের শেয়ালের" মেজাজ হল হাত-ধরাধরির একেবারে উল্টো। কেমন করে খেলতে হয় বলছি। খেলায় এই প্রেসিডেন্ট লোকটা আর তার সাথী সান মাতিওতে দাঁড়িয়ে রয়েছে—দৌড় দেবার জন্য তৈরি, আর চেঁচাতে শুরু করল "শেষরাতের শেয়াল" বলে। এদিকে তুমি আর অমি এইখানে, আমরা বললাম "হাঁসা আর হাঁসী!" ওরা বললে: "লণ্ডন শহরে যেতে আর কত মাইল?" আমরা বললাম, 'পা যদি লম্বা হয় তো মাত্র কয়েক মাইল। ক'জন বেরিয়ে আসছো?' ওরা বললে, "এতোজন যে তোমরা ধরতে পারবে না!" এই বারে শুরু হবে খেলা।'

'মতলবটা বুঝতে পেরেছি', বলল গুডউইন, 'মানে হল হাঁসা আর হাঁসীকে আমাদের আঙুলের ফাঁক গলে যেতে দেয়া চলবে না, বিলি। ওদের পালকের যে অনেক দাম। আমাদের লোকজন তৈরি আছে, হুট্ বললেই সরকারী জুতোয় পা ঢোকাবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু রাজকোষ খালি থাকলে আমরা ক্ষমতায় থাকব ততক্ষণই যতক্ষণ এক আনাড়ি বিদেশী পোষ-না-মানা ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পারে। উপকূলের প্রত্যেকটি চরণেই আমাদের শেয়াল সেজে বাধা দিতে হবে যাতে তারা দেশ থেকে বেরিয়ে না যায়।'

কিওঘ বললে, 'রসদ-বওয়া খচ্চরের চালে সান মাতিও থেকে এখান অবধি পাঁচ দিনের রাস্তা। আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে দূরের ঘাঁটিগুলোকে সাজানোর। সাগরতীরে মাত্র তিনটে জায়গাই আছে যেখান থেকে ওর সমুদ্রে যাত্রা করার আশা করতে পারে—এখান থেকে, বা সলিটাস্ কিংবা আলাজান থেকে। মাত্র এই তিনটে জায়গাতেই আমাদের পাহারা বসাতে হবে। দাবা খেলার মতোই সোজা ব্যাপার—শেয়াল খেলবে আর কিস্তি মাত করবে তিনটি চালে। ওহো! হাঁসী হাঁসা, হাঁসী, কোন্ দিকে তোরা যাবি? "সাহিত্যিক" তারবার্তার আশীর্বাদে এই অন্ধকার পিতৃভূমির রাজকোষ রক্ষা করা হবে সৎ রাজনৈতিক দলের জন্য যারা এ সরকারকে উৎখাত করতে চাইছে।'

পরিস্থিতির নক্শা-চিত্রটা ঠিকই এঁকেছে কিওঘ। রাজধানী থেকে আসার পথটা ভ্রমণের পক্ষে সব সময়েই ক্লান্তিকর। লক্কড়-ঝক্কড় যাত্রা—বরফঠাণ্ডা, আবার গরম। ভিজে আর শুকনো। আতঙ্ককর পর্বতে উঠে গেছে সেই শুঁড়িপথ,—হাঁস্ফাঁস পাহাড়চুড়োর কপালে জড়ানো-পচা-ফিতের মতো প্যাঁচ খেয়ে, আবার ঝাঁপ খেয়েছে হিহি-কাঁপানো বরফগলা সোঁতার ভেতর, আর সাপের মতোই মোচড় খেতে-খেতে গেছে ভয়ানক পোকামাকড়-জানোয়ারের আড্ডা সূর্যহীন জঙ্গলগুলোর ভেতর দিয়ে। পাহাড়ের পাদদেশে নেমে পথ মুড়েছে একটা ত্রিশূলের মাথায়, তার মধ্যের কাঁটাটা আলাজানে গিয়ে শেষ; অন্যটা ভাগ হয়ে কোরালিওর দিকে; তৃতীয়টা ফুঁড়ে বেরিয়েছে সলিটাস্-মুখো। পাহাড়ের পাদদেশ আর সমুদ্রের মাঝখানে পাঁচ মাইল চওড়া পলিমাটির সৈকত। এইখানে হল ক্রান্তীয় এলাকার সবচেয়ে উড়নচণ্ড, বাড়াবাড়ি রকমের ফুলের উৎপাদন। জঙ্গল থেকে এখানে-ওখানে জমি বের করে তাতে কলা আখ আর কমলালেবুর ঝাড় লাগানো হয়েছে। বাকিটা বুনো গাছপালার রংদার সমারোহ, —বানর, টেপির, জাগুয়ার, কুমির আর বিশালকায় সরীসৃপ বা কীটপতঙ্গ। যেখানে কোনো রাস্তা বানানো হয়নি সেখানে একটা বড় সাপের পক্ষে চলা খুব মুশকিল আঙুর আর লতাপাতার জটের ভেতর দিয়ে। বিশ্বাসঘাতক সুঁদ্রির জলাগুলোর ওপর দিয়ে ডানাশূন্য কোনো প্রাণীই নিরাপদে পার হতে পারে না। অতএব সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে হলে পলাতকদের একমাত্র উপরে বর্ণিত একটা পথই ধরতে হবে, তাতেই যেটুকু আশা।

গুডউইন উপদেশ দিলে, 'ব্যাপারটা যেন চাপা থাকে, বিলি। আমরা ভেতর-দলের কাউকে জানতে দিতে চাই না যে প্রেসিডেন্ট পালিয়ে যাচ্ছেন। আমার ধারণা ববের খবরটা এখন পর্যন্ত রাজধানীতে গুজব ছাড়া কিছু নয়। তা না-হলে সে বার্তাটাকে গোপনীয় চেহারা দেবার চেষ্টা করত না; তাছাড়া প্রত্যেকেই খবরটা শুনতে পেত। আমি এখন যাচ্ছি ডক্টর জাভালার সঙ্গে দেখা করতে, একটা লোককেও খচ্চরের রাস্তা ধরে পাঠাতে হবে টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবার জন্য।'

গুডউইন উঠে দাঁড়াতেই কিওঘ ওর টুপিটা দরজার পাশে ঘাসের ওপর ছুড়ে দিল। তারপর একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

গুডউইন থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ঝামেলা হল, বিলি? এই প্রথম তোমায় আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলাম।'

কিওঘ বললে, 'এইটেই শেষ—এই দুঃখের হাওয়াটার সঙ্গেই আমি একটা প্রশংসনীয়, কিন্তু বিরক্তিকর সততার জীবনে সঁপে দিচ্ছি নিজেকে। টিনপ্লেট-খোদাই কী আর এমন জিনিস বল, হংস-হংসীদের মহান ফুর্তিবাজ শ্রেণীর সুযোগ সুবিধার কাছে? এ নয় যে আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই, ফ্রাঙ্ক—আর যে ভাণ্ডারটি তাঁর আছে সেটা আমার হাত লাগাবার পক্ষে অতিরিক্ত বড়—কিন্তু কোনোভাবে যেন বোধকরি আমার বিবেক আমার খোঁচা দিচ্ছে, কারণ নেশার মতো একটা জাতির শুধু ছবিই তুলে গেছি, ওদের সঙ্গে নিয়ে সরে পড়িনি। ফ্র্যাঙ্ক, তুমি কখনো ওই "মস্লিনের পুঁটলি"টাকে দেখেছ যাকে "হিজ্ এক্সিলেন্সি" বগলদাবা করে নিয়ে গেছেন?'

'ইসাবেল্ল গিলবার্ট?' হেসে বললে গুডউইন, 'না, কখনো দেখিনি। তবে যা শুনেছি তাব সম্পর্কে, আমার ধারণা নিজের কোলে ঝোল টানার জন্য সে কোনো-কিছু করতেই পেছ-পা নয়। বিলি, তুমি যেন আবার রোমান্টিক হয়ে উঠো না। একেক সময় আমার ভয় হয় তোমার বংশধারার মধ্যে আইরিশ রক্ত আছে।'

'আমিও তাকে দেখিনি', বলে চলে কিওঘ, 'তবে লোকে বলে পুরাণ ভাস্কর্য আর উপন্যাসের সমস্ত নায়িকাকে সে বিবর্ণ ম্লান করে দিয়েছে। সে নাকি একবার কোনো পুরুষের দিকে তাকালে, বেচারা বাঁদর হয়ে গাছে উঠে তাকে নারকোল পেড়ে দেয়। একবার ওই প্রেসিডেন্ট লোকটার কথা ভাবো,—ঈশ্বর জানেন কত লাখ ডলার এক হাতে নিয়ে, অন্য হাতে এই মস্লিন কুহকিনীটাকে ধরে, পাহাড় থেকে নেমে আসছেন গাইয়ে-পাখি আর ফুলের রাজ্য দিয়ে, একটা দরদী খচ্চরে চেপে! আর বিলি কিওঘ এখানে, কারণ সে ধর্মপথে চলে, সৎভাবে বেঁচে থাকতে তাকে মানুষ-বাঁদরগুলোর ব্যঙ্গ চেহারা টিনের ওপর ছেপে ফায়দাহীন জোচ্চুরি চালাতে হয়, সেই তার ভাগ্য! প্রকৃতির এ এক অবিচার।'

গুডউইন বলে, 'মেজাজ খারাপ কোর না। তুমি খাপসুরত গরিব শেয়াল, হাঁসটাকে হিংসে কেন? হয়তো তুমি আর তোমার টিনচিত্রগুলোই মজিয়ে দেবে কুহকিনী গিলবার্টের মন—যখন আমরা তার রাজকীয় সঙ্গীটির ট্যাঁক খসাব।'

কিওঘ যেন চিন্তা করে বলে, 'সে হয়তো আরো মন্দ কিছু করতে পারত, কিন্তু করবে না। টিনচিত্রের গ্যালারি নয়, সে দেবতাদের গ্যালারিতেই সাজিয়ে রাখার যোগ্য। ভয়ানক কূটচক্রী মহিলা, আর প্রেসিডেন্টেরও কপাল খুলে গেছে।

কিন্তু এবার যে শুনতে পাচ্ছি পেছনের কামরায় ক্ল্যান্সি গজ্‌গজ্ করছে সব কাজ তাকেই করতে হচ্ছে বলে।'—বলেই কিওঘ সাঁৎ করে "গ্যালারির" পেছনে চলে গেল আপন মনের খুশিতে শিস্ দিতে-দিতে।—তাতে প্রমাণ হল পলায়মান প্রেসিডেন্টের সন্দেহজনক 'সৌভাগ্য' নিয়ে তার দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা নেহাতই ঝুট্‌মুট।

প্রধান সড়ক থেকে ঘুরে গুডউইন একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল—দুটি পথ ঠিক সমকোণে কাটাকুটি করেছে।

এই পাশের-গলিগুলো সাধারণত ঘন আর প্রচুর ঘাসে ভরা, পুলিসের ভোজালি দিয়ে খাটো করে কেটে রাখা, যাতে চলার সুবিধে হয়। রোদপোড়া ইটের দরিদ্র একঘেয়ে বাড়িগুলোর বনেদ ঘেঁষেই গেছে একেকটা পাথরের পার্শ্বপথ—বড় জোর দেয়ালের মতোই চওড়া। এই রাস্তাগুলো গ্রামের বাইরে গিয়ে কোথায় যে মিলেছে তার ঠিক নেই। আর এখানেই ক্যারিবীয় এবং দরিদ্রতর দেশী লোকের তালপাত্তা-ছাওয়া কুটিরগুলো। সেই সঙ্গে জ্যামেইকা আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ থেকে আসা নিগ্রোদেরও জীর্ণ কেবিন। কয়েকটি কাঠামো আছে পাশের একতলা লাল টালির ছাদগুলোর ওপর মাথা জাগিয়ে—ওগুলো 'কালাবোজার' ঘণ্টা-ঘর, এস্ট্রাঞ্জেরো হোটেল, ভিসুভিয়াস ফ্রুট কোম্পানির প্রতিনিধির বাড়ি, বার্নার্ড ব্র্যানিগানের দোকান-ও-বাড়ি, একটা ধসে যাওয়া গির্জাঘর, যেখানে কলাম্বাস একবার পা রেখেছিলেন। আর সবচেয়ে সুন্দর হল মোরেনা প্রাসাদ—আঙ্কুরিয়ার প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মকালীন আবাস। সৈকতভূমি ধরে প্রধান রাজপথটা— কোরালিও'র ব্রডওয়ে—সেখানেই বড়-বড় দোকান, সরকারী মদের ভাঁটিখানা আর ডাকঘর। কুয়ার্টেল, রাম্-পানশালা আর বাজার।

চলতে চলতে বার্নার্ড ব্র্যানিগানের দোকানবাড়ির পাশে আসে গুডউইন। ওটা আধুনিক কাঠের বাড়ি, দোতলা উঁচু। নিচের তলায় ব্র্যানিগানের দোকানটা, আর ওপর তলায় ওদের আবাসঘর। একটা চওড়া বারান্দাঘর বাড়িটাকে ঘিরে, বাইরের দেয়াল থেকে আধাআধি উঁচুতে। লম্বাঝুল সাদা ঘাগরা পরা একটি সুন্দরী উদ্ভাসিতা যুবতী রেলিঙের ওপর থেকে ঝুঁকে, গুডউইনের দিকে তাকিয়ে হাসে। উঁচু বংশের আন্দালুসিয় মহিলাদের চেয়ে সে বেশি শ্যামাভ নয়। ক্রান্তীয় জ্যোৎস্নার মতোই ঝলমলে, উজ্জ্বল।

গুডউইন মাথার টুপি খুলে তার সদা-উপস্থিত হাসিটা দিয়ে বলে, 'শুভ সন্ধ্যা, মিস্ পলা'। স্ত্রীলোক বা পুরুষ যাকেই সে সম্বোধন করুক, ব্যবহারে কোনো উনিশ-বিশ নেই। বিশালদেহ আমেরিকানটির অভিবাদন নিতে কোরালিও'র সবাই ভালবাসে।

'কোনো খবর আছে নাকি, মিঃ গুডউইন? 'না' বলবেন না কিন্তু। বেশ গরম পড়েছে না? আমার তো প্রায় পুড়ে যাবার অবস্থা!'

'না। বলার মতো খবর তো নেই—' চোখে দুষ্টুমির হাসি গুডউইনের 'শুধু বুড়ো গেডি কনসাল দিনকার-দিন তিরিক্ষি মেজাজের হয়ে যাচ্ছেন। যদি ওঁর মনকে চাঙা করার মতো কিছু এর মধ্যে না ঘটে, তাহলে ওঁর খিড়কির বারান্দায় বসে ধূমপান করা আমায় ছাড়াতে হবে—আর ওরকম ঠাণ্ডা জায়গাও আর কোথাও পাওয়া যাবে না।'

পলা ব্র্যানিগান আবেগের কণ্ঠে বলে, 'না না, গোমড়ামুখো উনি নন্। তবে যখন—'

কিন্তু ও হঠাৎ মুখ বন্ধ করে, রাঙা মুখ করে পেছনে সরে যায়। কারণ ওর মা হলেন স্পেনীয় সংকর মহিলা, স্পেনের রক্ত পলার মধ্যেও কিছুটা ব্রীড়ার ভাব এনে দিয়েছে—ওর স্পষ্ট প্রকট প্রকৃতির অন্য দিকটায় সেটা অলঙ্কারস্বরূপ।

Fox-in-the-Morning. এইন্‌স্‌লি, ১৯০১

স্মিথ

দ্বিতীয় কাহিনী

প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস আর তাঁর সঙ্গিনীর পালাবার পথ রুখতে সব রকম সতর্কতা নিয়েছে গুডউইন এবং উৎসাহী দেশভক্ত জাভালা,—তাদের দূরদৃষ্টিতে যতটা ফন্দি আঁটা সম্ভব। সমুদ্রের পাড় ধরে সলিটাস আর আলাজান অবধি বিশ্বস্ত বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছে ওদের পলায়ন সম্পর্কে স্থানীয় নেতাদের সাবধান করতে। আর নির্দেশ দিয়েছে উপকূল বরাবর টহলদারি করার; ও-অঞ্চলে তাঁদের আত্মপ্রকাশ করতে দেখলেই যে-কোনো ঝুঁকি নিয়ে গ্রেপ্তার করতে হবে তাঁদের। এ কাজ হয়ে যাবার পর বাকি রইল শুধু কোরালিওর আশপাশের এলাকা পুরো নজরে রেখে ওৎ পেতে শিকারের অপেক্ষায় থাকা। জাল বেশ ভালই বিছানো হয়েছে। রাস্তা এত কম, জাহাজে ওঠার সুযোগ এত সীমাবদ্ধ, তা ছাড়া দুটো-তিনটে সম্ভাব্য নিষ্ক্রমণ-পথে এত ভাল পাহারার ব্যবস্থা যে এই ফাঁদের ভেতর দিয়েও যদি দেশের এতখানি মর্যাদা, রোমান্স ও আনুষঙ্গিক সবকিছু গলে বেরিয়ে যায়, তা হবে বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার। নিঃসন্দেহেই প্রেসিডেন্ট যথাসম্ভব গোপনে চলাফেরা করবেন, আর সমুদ্রতীরের কোনো নিঃসঙ্গ জায়গা থেকেই নৌকো বা জাহাজে উঠতে চেষ্টা করবেন।

এঙ্গলহার্টের টেলিগ্রাম পাবার পর চতুর্থদিনে নিউ অর্লিয়ন্স ফল-ব্যবসায়ীদের চার্টার করা একটা নরওয়েজীয়ান জাহাজ "কার্লসেফিন" তিনবার কর্কশ সাইরেন বাজিয়ে এসে নোঙর করল কোরালিওর অদূরেই। এখানকার ভিসুভিয়স্ ফ্রুট কোম্পানি কিন্তু কার্লসেফিন জাহাজের লাইনে ব্যবসা করে না। ও জাহাজটা অ-পেশাদারি গোছের, একটা ছোটখাটো কোম্পানির ফুটফরমাশ খাটে, যারা ভিসুভিয়সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাজারের অবস্থার ওপর কার্লসেফিনের চলাফেরা নির্ভর করে। কখনো-কখনো সে নিয়মিত ফল পরিবহনের কাজে একনাগাড়ে স্পেনীয় সমুদ্র আর নিউ অর্লিয়ন্সের মধ্যে চলাচল করে; তারপরেই হয়তো এলোমেলো যাত্রা করে মোবাইল অথবা চার্লস্টনের দিকে, এমনকি সুদূর উত্তরেও যায় নিউ ইয়র্ক অবধি—মানে দরকারমতো ফল-সরবরাহের বণ্টন-কাজে।

স্টীমার দেখতে-আসা অভ্যস্ত অলস জনতার মধ্যে গুডউইনও পায়চারি করে সমুদ্রসৈকতে। এখন তো যে-কোনো মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস তাঁর শপথবদ্ধ রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছোতে পারেন, তাই হুকুম দেয়া হয়েছে শৈথিল্যহীন কড়া নজর রাখতে। উপকূলে যত জাহাজ এসে লাগবে, প্রত্যেকটাকেই সন্দেহ করা যেতে পারে পলাতকদের সম্ভাব্য পলায়নের উপায় হিসেবে। আর নজর রাখা হয়েছে কোরালিও বন্দর থেকে সমুদ্রগামী ছোট ডিঙি বা নৌকোর ওপরেও। গুডউইন আর জাভালা সর্বত্রই ঘোরে, তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নয়, তারা লক্ষ্য রাখে পলায়নের ছিদ্রপথের দিকে।

শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা জাঁক দেখিয়ে ভিড় করে উঠল তাদের বজরায়। দাঁড় বেয়ে চলল কার্লসেফিনের দিকে। স্টীমার থেকে একটি বোট তাদের তত্ত্বাবধায়ককে কাগজপত্র সহ নামিয়ে দিয়েছে পাড়ে, আর পরীক্ষক-ডাক্তারকে সবুজ ছাতা, রুগির থার্মোমিটার সমেত নিয়ে গেছে জাহাজে। এর পরে এক দল ক্যারিবীয় পাড়ের ওপর জমা-করা হাজার-হাজার ছড়া কলা বোঝাই করতে থাকে হাল্কা ডিঙিতে, দাঁড় চালিয়ে নিয়ে যায় স্টীমারের দিকে। কার্লসেফিনে কোনো যাত্রী-তালিকা নেই, তাই অবিলম্বে কর্তাদের তদারকি শেষ হল। জাহাজের তত্ত্বাবধায়ক ঘোষণা করলেন জাহাজ কাল ভোর অবধি নোঙর-করাই থাকবে, ফল বোঝাই করা হবে রাতে। বললেন, কার্লসেফিন এখন এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে,—সেখানকার বন্দরেই তাদের কমলালেবু-নারকোলের শেষ বোঝা খালাস করা হয়েছিল। দু'তিনটে মালটানা সুলুপ-ডিঙি লাগানো হয়েছে এখানকার কাজে সাহায্যের জন্য, কারণ ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে উদগ্রীব। মার্কিন রাষ্ট্রে ফলপাকড়ের বিশেষ অভাব, তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান তিনি।

বিকেল চারটে নাগাদ আরেকখানা সমুদ্রের 'দানব', এ অঞ্চলের দরিয়ায় বেশ অচেনা, ভেসে উঠল সকলের নজরে। সামনে নিয়তির দূতের মতো এগিয়ে

আসছে ইয়ট্ "ইডালিয়া"—হাল্কা হলদে রং-করা, ইস্পাতের খোদাইয়ের মতো ছিমছাম একটি সুশোভন বাষ্পচালিত প্রমোদতরী। সুন্দর ইয়টটা ডাঙার অদূরেই ওঠা-নামা করছে, হাঁস যেমন পিপেবন্দী বৃষ্টিজলে হাল্কাভাবে নাচে। উর্দিপরা এক নাবিক একটা দ্রুতগামী বোট চালিয়ে ডাঙায় এল, আর একজন গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ লাফিয়ে পড়ল বালির ওপর।

মনে হল নবাগত ব্যক্তি অপছন্দের চোখেই তাকাল স্থানীয় আঙ্কুরিয়দের রংবেরঙী ভিড়ের দিকে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল গুডউইনের দিকে, সেই তো উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নজরে-পড়ার মতো ইঙ্গ-স্যাক্সন রূপধারী! গুডউইনও সবিনয়ে সম্ভাষণ জানাল।

কথায় কথায় জানা গেল নবাগত লোকটির নাম স্মিথ, আর সে একটা ইয়টে চড়ে এসেছে। বড্ড সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়, সত্যিই; কারণ "ইয়ট্টা" তো চোখেই দেখা যাচ্ছে, আর খুলে না বললে শুধু "স্মিথ" থেকেও বেশি কিছু আন্দাজ করা যায় না। তবু গুডউইনের চোখ, যা অনেক কিছুই দেখেছে, তাতে ধরা পড়ে একটা অসামঞ্জস্য—স্মিথ আর তার জলযানটার মধ্যে। ছোট গোলমাথা-ওয়ালা লোক বটে স্মিথ, চোখজোড়া ট্যারা আর নিষ্প্রাণ, পানশালার মদ্যমিশ্রকের মতো গোঁফ। আর ডাঙায় নামবার আগে যদি না সে পোশাক বদ্‌লে থাকে তাহলে তার সত্যিকারের জলযানের ডেক্‌কে অপমান করতেই বুঝি পায়ে দিয়েছে এক জোড়া মুক্তা-ধূসর ডার্বিজুতো। পরনে হাইল্যাণ্ডার শাল আর প্রমোদশালার গলাবন্ধ। যারা প্রমোদ-তরণীর মালিক তারা সাধারণত এর চেয়ে ভালভাবে জাহাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।

স্মিথকে দেখায় তো ব্যবসাদারের মতো, তবে সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু সে জাহির করছে না। চারদিকের দৃশ্যের তারিফ করে—ভূগোল বইয়ের ছবির সঙ্গে দৃশ্যগুলো নাকি যথাযথ মিল বজায় রেখেছে। তারপর খোঁজখবর করে মার্কিন কনসালের। কমলালেবুগাছের আড়ালে ছোট কনসুলেট দপ্তরটা, 'তারা-আর ডোরা' পতাকা ঝুলছে ছাদ থেকে। গুডউইন সেদিকে আঙুল দেখাল।

বলল, 'কনসাল মিঃ গেডি নিশ্চয় বাড়িতে আছেন। সমুদ্রে সাঁতার দিতে গিয়ে ক'দিন আগে প্রায় ডুবে মরার অবস্থা হয়েছিল তাঁর। ডাক্তার তাঁকে কিছুদিন বাড়ির মধ্যে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন।'

বালির ভেতর দিয়ে খপ্‌খপ্ করে এগিয়ে গেল স্মিথ—তার বিচিত্র সাজগোজ ভয়ানক বেখাপ্পা দেখাচ্ছে ক্রান্তিমণ্ডলের মসৃণ নীল আর সবুজের পটভূমিতে।

গেডি তাঁর হ্যামক-ঝোলায় গা এলিয়ে শুয়েছিলেন, মুখটা একটু ফ্যাকাশে, ভঙ্গিটা অবসাদের। সে রাতে যখন 'ভাল্‌হাল্লা' জাহাজের বোট তাঁকে এনেছিল ডাঙায়, সমুদ্রে ভিজে মর-মর অবস্থায়, তখন ডাঃ গ্রেগ আর অন্য বন্ধুরা তাঁর

নিভু-নিভু প্রাণপ্রদীপটা বাঁচিয়ে রাখতে ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করলেন। একটা নিষ্ফল বার্তা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে যায় বোতলটা, যে সমস্যাটা তা জাগিয়ে তুলেছিল তার সমাধান নেহাতই একটা যোগের অঙ্ক— 'এক' আর 'একে' দুই হয় পাটিগণিতের নিয়মে, আর 'এক'ই থাকে রোমান্সের নিয়মে।

একটা মজার সাবেকী তত্ত্ব আছে—মানুষের নাকি দুটো আত্মা। একটা প্রান্তিক, যা সাধারণভাবে কাজে ব্যস্ত। আর একটা কেন্দ্রিক, যা বিশেষ-বিশেষ সময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে,—তবে তা কর্মোদ্যোগ ও প্রাণশক্তির তাগিদেই। প্রথমটির বশবর্তী হয়ে মানুষ দাড়ি কামাবে, ভোট দেবে, কর দেবে, পরিবারকে টাকা দেবে, চাঁদা দেবে, সাধারণ নিয়মের উপযুক্ত হয়ে চলবে। কিন্তু হঠাৎ কেন্দ্রিক আত্মাটিকে আধিপত্য করতে দিন,তখন মানুষ এক পলকের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াবে তার আনন্দের সাথীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড উষ্মা নিয়ে; সে হয়তো আপনি খেয়াল করার আগেই তার রাজনীতি পরিবর্তন করে বসবে; তার প্রিয়তম বন্ধুকেও মারাত্মক অপমান করবে—হয়তো তাকে মুহূর্তের মধ্যে আশ্রমে বা নৃত্যশালায় পাঠিয়ে দেবে; সে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়েও যেতে পারে, ফাঁসি লাগিয়ে মরতেও পারে। কিংবা হয়তো সে একটা গান বা কবিতা লিখবে, অযাচিতভাবেই স্ত্রীকে চুমু খেয়ে বসবে অথবা তার টাকাকড়ি সব দান করবে কোনো জীবাণু-অনুসন্ধানের গবেষণায়। তারপর আবার ফিরে আসবে প্রান্তিক আত্মা; আমরা আবার ফিরে পাব আমাদের নিরাপদ, স্থিরমস্তিষ্ক নাগরিকটিকে। এ হল আসলে 'নিয়ম'-এর বিরুদ্ধে 'অহং'-এর বিদ্রোহ; এর ক্রিয়াফল হল পরমাণুগুলোকে একটা জোর ঝাঁকুনি দেয়া যাতে তারা নিজেদের উপযুক্ত স্থানে ফের থিতু হয়ে বসে।

গেডির আন্তরিক বিক্ষোভটা ছিল নরম ধরনের—ভাসমান বোতলের মতো একটা নিকৃষ্ট বস্তুকে ধাওয়া করে গ্রীষ্ম সমুদ্রে সাঁতরে যাবার চেয়ে বেশি নয়। আর এখন, তিনি যা-ছিলেন তাই। ওঁর টেবিলে রয়েছে ডাকে যাবার জন্য তৈরি একখানা চিঠি, সরকারের উদ্দেশে। কনসালের পদ থেকে অব্যাহতি চান। তাঁর জায়গায় আর কাউকে নিয়োগ করলেই পদত্যাগ কার্যকরী হবে। কারণ বানার্ড ব্র্যানিগান কোনো কাজই আধ-খেঁচড়াভাবে করেন না, সঙ্গে সঙ্গেই গেডিকে অংশীদার করে নেবেন তার অত্যন্ত লাভজনক বিবিধ কর্মোদ্যোগে। আর পলাও আনন্দে মগ্ন হয়ে আছে ব্র্যানিগান-বাড়ির ওপরতলাটা নতুন আসবাবপত্রে সাজাবার পরিকল্পনায়।

নজরে-পড়ার মতো চেহারার আগন্তুকটিকে দরজার কাছে দেখেই 'হ্যামক' ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কনসাল।

দর্শনার্থী মস্ত হাতখানা শূন্যে দুলিয়ে বললে, 'আপনি বসেই থাকুন, ওল্ড ম্যান। আমার নাম স্মিথ, একটা ইয়টে চেপে এসেছি। আপনিই তো কনসাল,

তাই না? সমুদ্রপাড় থেকে একজন মস্ত চেহারার ঠাণ্ডা মাথা লোক আমায় এ বাড়িটা দেখিয়ে দিল। ভাবলাম আমাদের দেশের পতাকাকে একটু সেলাম জানিয়ে যাই।'

গেডি বললেন, 'বসুন। প্রথম নজরে আসার পর থেকেই আপনার প্রমোদতরীটার তারিফ করছিলাম। বেশ বেগে চলার মতোই দেখতে। কত টন ওজনের মাল বয়?'

'বলছেন আমায়! কীসে ওটার ওজন হয় তাই জানি না! তবে চমৎকার চালে জল কাটিয়ে চলে। "র‍্যাম্‌ব্লার" নাম ওটার—ওর আগে কোনো জাহাজ চলতেই পারে না। ওর সঙ্গে এই আমার প্রথম যাত্রা। এদিকের উপকূল ধরে একটু বুড়ি ছুঁয়ে যাচ্ছি—যেসব দেশ থেকে রবার, লাল লঙ্কা আর বিপ্লব আসে তাদের সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নেব এই ইচ্ছে। এসব জায়গায় এমন দৃশ্য ভাবতেই পারিনি! এত গাছপালা বুঝি সেন্ট্রাল পার্কেও নেই। আমি নিউ ইয়র্কের লোক। এখানে নাকি বানর, নারকোল আর তোতাপাখির ছড়াছড়ি—সেটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, আমাদের সবই আছে। আমাদের গাছপালা আর জীবজন্তু যে সেন্ট্রাল পার্কের ওপরেও টেক্কা দেয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

স্মিথ সানন্দেই স্বীকার করে, 'হয়তো দেয়। আমি তো এখন অবধি সেটা দেখিনি। কিন্তু জানোয়ার আর গাছগাছালির ব্যাপারে আপনারা আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন তা আন্দাজ করি। আপনাদের এদিকে পর্যটনের ব্যাপার বেশি নেই, তাই না?'

কনসাল প্রশ্ন করেন, 'পর্যটন? আপনি হয়তো স্টীমারের যাত্রীদের কথা বোঝাচ্ছেন। না: খুব কম লোকই কোরালিওতে নামে। মাঝে-মধ্যে কোনো বিনিয়োগকারী। ভ্রমণকারী বা দর্শনেচ্ছু যাত্রীরা উপকূল ধরে আরো আগে চলে যায় কোনো বড় শহরে, যেখানে পোতাশ্রয় আছে।'

স্মিথ বলে, 'বাইরে একটা জাহাজ দেখলাম, কলা বোঝাই করা হচ্ছে। ওতে কোনো যাত্রী আসেনি?'

কনসাল বললেন, 'ওটা হল কার্লসেফিন। ভবঘুরে ফলবাহী জাহাজ। বোধ হয় শেষ খেপটাতে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল। না, ওতে কোনো যাত্রী আসেনি। ওদের ডিঙিটাকে দেখলাম ডাঙায় আসতে, ওতেও কেউ ছিল না। কোনো স্টীমার ভিড়লে তা দেখাই এখানকার একমাত্র উত্তেজনার বিষয়; আর যদি কোনো যাত্রী আসে তাহলে তো গোটা শহরই ভেঙে পড়বে তাকে দেখতে। কিছুদিন যদি কোরালিওতে থাকেন মিঃ স্মিথ, আমি খুশি হয়ে আপনাকে কিছু লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। চারজন কি পাঁচজন আমেরিকান আছে যাদের মিললে ভাল লাগত, তা'ছাড়া কিছু এদেশী মানী ব্যক্তি।'

ইয়ট্-মালিক বললে, 'ধন্যবাদ, তবে আপনাকে মিছে কষ্ট দিতে চাই না। যাদের কথা বললেন তাদের সঙ্গে দেখা করলে ভালই হত, কিন্তু এখানে খুব একটা ঘুরবার মতো সময় আমার নেই। সমুদ্রতীরের ওই ঠাণ্ডামাথা ভদ্রলোক একজন ডাক্তারের কথা বলল; বলতে পারেন কোথায় তাঁর দেখা পাব? র‍্যাম্বলার তো ব্রডওয়ের হোটেলের মতো শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারে না, তাই মাঝে মধ্যে আমার মতো লোকের একটু সমুদ্রপীড়া হয়েই থাকে। ভেবেছিলাম ডাক্তারকে বলে কিছু চিনির গুলি-টুলি নিয়ে নেব, যদি কখনো দরকার পড়ে।'

কনসাল বললেন, 'ডাক্তারকে তাঁর হোটেলেই পেয়ে যাবেন। দরজা থেকে দেখতে পাবেন—ওই দোতলা ব্যালকনিওয়ালা বাড়িটা যেখানে কমলালেবু গাছগুলো রয়েছে।'

বিষণ্ন চেহারার হোটেল 'ডি-লস্-এস্ট্রাঞ্জেরোস'—আগন্তুক বা বন্ধু, সকলেরই চরম উপেক্ষিত। 'পবিত্র সমাধি' নামক রাস্তার ঠিক কোণেই তার অবস্থান। একপাশে জটলা করে আছে কমলালেবুর ঝোপঝাড়, নিচু পাথরের দেয়াল ঘেরা—যার ওপর দিয়ে দীর্ঘকায় কোনো ব্যক্তি অনায়াসেই ডিঙিয়ে যেতে পারে। প্লাস্টার-লেপা রোদপোড়া ইটের বাড়ি, নোনা হাওয়া আর রোদে একশো-রকম রঙ ধরেছে তাতে। ওপরের ব্যালকনিতে একটা বড় দরজা, আর দুটো জানলা, তাতে কাঁচের বদলে চওড়া খড়খড়ি।

নিচের তলাটা দুটো দরজা মারফত যোগ রেখেছে পাশের সরু পাথরবসানো গলিটার সঙ্গে। একতলাতেই মালিক মাদামা তিমোতিয়া অর্টিজের পানশালা—'পুলপেরিয়া'। ব্র্যাণ্ডি, আনিসাড়া, স্কচ্ আর কম-দামি ওয়াইনের বোতলগুলোয় পুরু ধুলো, শুধু কয়েকটাতে কালেভদ্রে আসা খদ্দেরের এলোমেলো আঙুলের ছাপ। উপরতলায় চার-পাঁচটা অতিথি কামরা, আসল কাজে খুব কমই ব্যবহার হয়। কখনো ফল-চাষীরা ঘোড়ায় চড়ে আসে দালালের সঙ্গে পরামর্শ করতে, গুমোট ওপরতলার ঘরে বিষণ্ন রাত কাটিয়ে যায়; কখনো হেঁজিপেজি কোনো সরকারী কর্মচারী মাদামা'র সমাধি-সুলভ আতিথ্যে জাঁক দেখাতেও ভুলে যায়। কিন্তু মাদামা ঠায় বারের পেছনে বসে থাকেন, ভাগ্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে চান না। কেউ হোটেলে মাংস, পানীয় বা শয়নকক্ষ চাইলে তাকে শুধু এখানে আসতে হবে। পরিবেশনও হবে। এটাই ভাল। তারা যদি না আসে তো নাই এল। সেটাও ভাল।

অ-সাধারণ ইয়ট্-মালিক যখন 'পবিত্র সমাধি সড়ক' থেকে বিপজ্জনক পাশ-গলিটা ধরে এগুলো, তখন ধসে-পড়া হোটেলের দরজায় বসে আছেন এর একমাত্র স্থায়ী অতিথি, সমুদ্রের হাওয়া উপভোগ করছেন।

প্রাণী-সঙ্গরোধের চিকিৎসক ডাঃ গ্রেগের বয়েস পঞ্চাশ কি ষাট, লালচে মুখ

আর টোপেকা থেকে টেরা-ডেলা-ফিউগো অবধি এত লম্বা দাড়ি কারো নেই। দক্ষিণী একটি বন্দর-শহরের স্বাস্থ্য বোর্ড থেকে নিয়োগপত্র পেয়ে তাঁর এই চিকিৎসক পদ। সমস্ত দক্ষিণী বন্দরের যা প্রাচীন দুশমন—পীত জ্বর, তারই আতঙ্ক থেকে এই ব্যবস্থা। ডাঃ গ্রেগের কাজ হল কোরালিও থেকে যাত্রা করা প্রতিটি জাহাজের নাবিক ও যাত্রীকে পরীক্ষা করা রোগের প্রাথমিক লক্ষণের খোঁজে। কাজ তো যৎসামান্যই, আর কোরালিওর বাসিন্দা হিসেবে মাইনেটাও যথেষ্ট। প্রচুর অবসর সময়, ভাল ডাক্তার হিসেবে উপরি রোজগার উপকূলভাগের বাসিন্দাদের মধ্যে বড়সড় বেসরকারী প্র্যাকটিস্। স্পেনীয় ভাষার দশটি শব্দও জানেন না, তাতে অবশ্য কোনো বাধা হয় না, নাড়ি পরীক্ষা করতে বা ফীস্‌টা তুলে নেবার জন্য কাউকে ভাষাবিদ্ হবার প্রয়োজন নেই। এই বর্ণনার সঙ্গে আরেকটু যোগ করুন: ডাক্তারের একটা লম্বা কাহিনী বলার আছে মাথার খুলি ছিদ্র করার অপারেশন নিয়ে, যেটা কোনো শ্রোতাই তাকে শেষ অবধি কখনো বলতে দেয়নি; আর তিনি ব্র্যাণ্ডিকে একটা সেরা রোগ নিবারক বলে বিশ্বাস করেন। এ হলেই ডাঃ গ্রেগের বিশেষ আকর্ষণের তালিকা সমাপ্ত হবে।

পাশের গলিটার দিকে ডাক্তার তাঁর চেয়ার টেনে এনেছেন। গায়ে কোট নেই, দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি ধূমপান করছেন আর দড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। হাল্‌কা নীল চোখ দুটো বিস্মিত হয়ে উঠল যখন তিনি স্মিথকে দেখলেন তার অসাধারণ রামধনু পোশাকে।

স্মিথ তার টাই-পিনের কুকুর-মাথাটায় হাত বুলিয়ে বললে, 'আপনিই তো ডাঃ গ্রেগ—তাই না? কন্‌স্টেবল, আই মীন কনসাল বলছিলেন আপনি এই সরাইখানাতেই আস্তানা করেছেন। আমার নাম স্মিথ, ইয়টে চেপে এসেছি। একটু চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছি, বাঁদর আর আনারস গাছ দেখতে। ভেতরে আসুন ডক্, একটু পান করা যাক। কাফেটা তো দেখছি পিট্‌পিট করছে, তবে আন্দাজ করি কিছু ভিজে মাল খাওয়াতে পারবে।'

ডাঃ গ্রেগ চট করে উঠে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে বসছি, স্যার, একটু ব্র্যাণ্ডির স্বাদ নেব। আমি দেখেছি সামান্য ব্র্যাণ্ডি রোগ নিবারক হিসেবে এই জলবায়ুতে প্রায় প্রয়োজনীয় পর্যায়েই পড়ে।'

ওরা ঘুরে 'পুলপেরিয়াতে' ঢুকতে যাবে, এমন সময় এদেশী একটি লোক, খালি পায়ে নিঃশব্দে উঠে এসে ডাক্তারকে স্পেনীয় ভাষায় কিছু বলল। লোকটা হলদেটে-বাদামি। অতি পাকা লেবুর মতো। একটা সুতির শার্ট পরেছে, আর চামড়ার বেল্‌ট্-বাঁধা রুক্ষ লিনেনের পাতলুন। লোকটার মুখ যেন কোনো চট্‌পটে সাবধানী জন্তুর মতো, তবে খুব বেশি বুদ্ধি ধরে বলে মনে হয় না। উত্তেজনাভরে এমন গুরুতর ভাব নিয়ে বক্‌বক্ করছে যে দুঃখ হয় তার কথাগুলো মাঠে মারা গেল।

ডাঃ গ্রেগ তার নাড়ি ধরলেন। শুধোলেন—'ব্যারাম?'

'আমার মুজে অসুখ হয়ে কাসাতে পড়ে আছে'—লোকটা তার জানা একমাত্র ভাষায় খবরটা দিতে চেষ্টা করে (তার স্ত্রী তালপাতার কুটিরে অসুস্থ)।

ট্রাউজারের পকেট থেকে সাদা চূর্ণ-ভরা একমুঠো ক্যাপসুল বের করলেন ডাক্তার। গুনেগুনে দশটা তুলে দিলেন দেশী লোকটার হাতে। তারপর গম্ভীরভাবে তর্জনীটা তুলে বললেন—'প্রথমে একটা, দু'ঘন্টা অন্তর'—বলে আবার দুটো আঙুল দেখালেন লোকটার নাকের সামনে সজোরে নাচিয়ে। এবার তিনি ঘড়ি বের করে ডায়ালের ওপর দুবার আঙুল ঘোরালেন। আবার লোকটার নাকের দিকে এগোল দুটো আঙুল—'দুই-দুই-দু'ঘন্টা' আবার বললেন ডাক্তার।

লোকটা করুণভাবে বললে 'সি, সিনিওর!'

নিজের পকেট থেকে একটা শস্তা রূপোর ঘড়ি বের করে সে ডাক্তারের হাতে রাখলে। প্রাণপণে চেষ্টা করে তার বিরল ইংরেজিতে বললে— 'মি ব্রিং, কাল অন্য ওয়াচিটা আনব।'

'ভীষণ অজ্ঞ এখানকার মানুষগুলো', বললেন ডাক্তার, ঘড়িটা নিজের পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে—'মনে হয় আমার ওষুধের ইশারাগুলো ও ডাক্তারের ফি বলে ভুল করেছে। যাক্ গে, সেও ঠিক আছে। এমনিতেই ও আমার কাছে ধারে। অন্য ঘড়িটা ও আনবে সে-সম্ভাবনা কম। কখনো নির্ভর করতে পারবেন না ওদের কোনো কথার ওপর। এবার সেই ড্রিঙ্কটা চলবে? কেমন করে কোরালিওতে আসা হল মিঃ স্মিথ? কার্লসেফিন ছাড়া আর কোনো জাহাজ ক'দিনের মধ্যে এসেছে বলে তো জানি না।'

দু'জনে জনশূন্য 'বারে' হেলান দিয়ে বসলেন। ডাক্তারের অর্ডারের অপেক্ষা না করেই মাদামা একটা বোতল সামনে রাখলেন, ওতে কোনো ধুলোর চিহ্ন নেই।

দু'বার পান করার পর স্মিথ বললে: 'আপনি বলছেন কার্লসেফিনে কোনো যাত্রী ছিল না, ডক্? আপনি একেবারে নিশ্চিত সে ব্যাপারে? আমি তো যেন সাগরধারে কারো মুখে শুনলাম দু'একজন লোক জাহাজে আছে?'

'তারা ভুল করেছে স্যর। আমি নিজে জাহাজে গিয়ে প্রত্যেকের ডাক্তারী পরীক্ষা করেছি, যা করা হয়ে থাকে। কলার বস্তা বোঝাই হয়ে গেলেই কার্লসেফিন বিদায় নেবে, কাল ভোর সকাল অবধি সেটা হবে। আজ বিকেলে তারা সবকিছু তৈরি রাখছে। না স্যর, ওদের কোনো যাত্রী তালিকা ছিল না। এই 'থ্রি-স্টারটা' আপনার পছন্দ হল? একমাস আগে একটা ফরাসী স্কুনার দু'ডিঙি বোঝাই এ জিনিস নামিয়ে গিয়েছিল। কাস্টম্স্ শুল্কের একটি পয়সাও যদি মহামান্য আঙ্কুরিয়া-রিপাব্লিককে পৌঁছে থাকে তার জন্য বাজি রইল আমার টুপিখানা। আরেক প্রস্থ যদি না খেতে চান, তবে বাইরে চলুন ঠাণ্ডা ছায়ায় গিয়ে বসি খানিকক্ষণ।

বাইরের পৃথিবী থেকে আসা কারুর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ তো আমাদের মতো নির্বাসিতদের খুব কমই আসে।'

নব-পরিচিতের জন্য আরেকখানা চেয়ার টেনে বাইরে আনলেন ডাক্তার। দু'জনেই বসলেন।

'আপনি তো দুনিয়াঘোরা মানুষ', বললেন ডাঃ গ্রেগ—'ভ্রমণ আর অভিজ্ঞতার মানুষ। নীতিজ্ঞানের ব্যাপারে, আর নিঃসন্দেহে সমবিচার, দক্ষতা, পেশাদারী সততা সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্ত মূল্যবানই হবে। আপনি ডাক্তারীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় একটি ঘটনার বিবরণ শুনলে আমি খুশি হব।

'বছর নয়েক আগে আমি যখন নিজের শহরে চিকিৎসার পেশায় ব্যস্ত, আমার ডাক পড়ল মস্তিষ্কের ওপর আঘাতের একটি কেস্ দেখতে। আমার নির্ণয় ছিল কোনো হাড়ের টুকরো মস্তিষ্কের ওপর চাপ দিচ্ছে, তাই শল্য শাস্ত্রে যাকে তুরপুন-চিকিৎসা বলে সেই অপারেশনটি করতে হবে। যাই হোক, রুগি যখন একজন ধনমর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোক তখন আরেকজনকে ডাকলাম পরামর্শের জন্য—ডাক্তার....'

স্মিথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, একটা কোমল হাত ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে রাখে ডাক্তারের জামার আস্তিনে। গম্ভীরভাবেই বলে, 'ডক, দেখুন, গল্পটা আমি শুনতে চাই, কারণ আমার আগ্রহ জেগেছে, তাই বাকিটুকু শোনার সুযোগ ছাড়ব না। শুরুটুকু শুনেই বুঝেছি মজার গল্প হবে, বার্নি-ও' ফ্লিন সংঘের আগামী সভায় ওটা তাদের শোনাবই, যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে। কিন্তু তার আগে আমাকে যে দু'একটা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে ডক। যদি ঠিক সময়ে ব্যবস্থাগুলো করে আসতে পারি তবে সোজা এসে আপনার কাহিনী শুনব, শয্যা নেবার আগে—ঠিক আছে তো ডক?'

ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আগে কাজগুলো সেরে ফিরে আসুন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। বুঝলেন, পরামর্শদাতা ডাক্তারদের একজন খুবই নামকরা, বললেন ওটা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য হয়েছে; আরেকজন বললেন 'ফোঁড়া', কিন্তু আমি—'

'এখন বলবেন না ডক। গল্পটা শুরুতেই নষ্ট করে দেবেন না। আমি ফিরে আসা অবধি সবুর করুন। শুরু থেকে শেষ অবধি শুনতে চাই। ঠিক আছে?'

পাহাড়গুলো তাদের বৃষস্কন্ধ জাগিয়ে তুলেছে সূর্যদেবের গৃহমুখী অশ্বের পদশব্দ শুনতে। সাগর-লগ্ন হ্রদগুলোতে দিবাবসান হল। আঁধার ঘনালো কলাবনের ছায়ায়, সুঁদরির জলাভূমিতে—সেখানে নৈশভ্রমণের জন্য তৈরি হয়ে বড়-বড় নীল কাঁকড়ার দল হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে শুরু করেছে। অবশেষে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়াগুলোতেও

নিভে গেল দিবালোক। তারপর, দেয়ালি পোকার ক্ষণকালের ওড়ার মতো ক্ষণিকের গোধূলিও এসেই আবার চলে গেল। একসারি তালগাছের মাথার ওপর থেকে উঁকি দিচ্ছে দক্ষিণ-তারামণ্ডলীর একেবারে ওপরের নক্ষত্রটি। জোনাকির দল মশাল জ্বালিয়ে নিশানা দিচ্ছে রাত্রির কোমল পদক্ষেপের।

অদূরে নোঙর-বাঁধা কার্লসেফিন দোল খাচ্ছে। আর তার আলোগুলোর প্রতিবিম্ব যেন ঝিকমিকে বর্শাফলকের মতো অন্তহীন গভীরতায় জলের ভেতর টুঁ দিচ্ছে। ক্যারিবীযরা ব্যস্ত বড়-বড় হাল্কা ডিঙিতে চাপিয়ে পাড় থেকে ফলের বস্তা এনে জাহাজে বোঝাই করতে। বালি-পাড়ে একটা নারকোল গাছে হেলান দিয়ে, চারদিকে অজস্র চুরুটের গোড়া ছড়িয়ে বসে স্মিথ অপেক্ষা করছে। স্টিমারের দিক থেকে একবারটিও তীক্ষ্ণ নজর শিথিল করেনি।

বেখাপ্পা ইয়ট্-মালিকটি তার মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছে নিরীহ ফল-জাহাজটার ওপব। দু'দুবার তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, জাহাজে চেপে কোবালিওতে কোনো যাত্রী আসেনি। তবু সে নাছোড়বান্দা, ভবঘুরে কোনো অলস ব্যক্তির মধ্যে যা দেখা যায় না। নিজেব চোখে দেখবে বলেই সে পণ করেছে। রঙচঙে কোনো গিরগিটির মতোই বিস্ময়করভাবে নারকোল গাছের নিচে গুঁড়ি মেবে আছে, আর ও-জাতেবই পুঁতিব মতো চুলবুলে চোখে গোয়েন্দাগিরি জারি রেখেছে কার্লসেফিনের ওপর।

ওদিকে সাদা বালির ওপব ইয়টেবই একটা সাদা বোট ভেড়ানো আছে, পাহারা দিচ্ছে সাদা উর্দিপরা একজন নাবিক। ডাঙা ছেড়ে অল্প দূরে একটা পানশালা "কাফে গ্রাণ্ডে", সেখানে তিনজন নাবিক ছড়ি ঘোরাচ্ছে কোরালিওর একমাত্র বিলিয়ার্ড টেবিলটাকে ঘিরে। বোটটা যেন কারো হুকুমমাফিক অপেক্ষা করছে যে-কোনো মুহূর্তে ব্যবহারেব জন্য প্রস্তুত হয়ে। গোটা আবহাওয়াতে কোনো প্রত্যাশার ইঙ্গিত, কোনো কিছু ঘটবে বলে অপেক্ষা, কোরালিওর মাটিতে ব্যাপারটাই কেমন যেন বিসদৃশ।

উজ্জ্বল শিখাধাবী দ্রুত-অপসারী কোনো পাখিব মতোই স্মিথ এই তালগাছঘেরা উপকূলে নেমে আসে, শুধু একটি মুহূর্ত পাখা মেলে নিঃশব্দ ডানায় ভর করে অদৃশ্য হয। যখন ভোর হল, তখন স্মিথ নেই, অপেক্ষমান বোটও নেই, সমুদ্রে কোনো ইয়ট্ই নেই। এখানে স্মিথ তার আগমনের কোনো ইঙ্গিত রেখে যায়নি, সে রাত্রে কোরালিওর সৈকতে কোন্ রহস্যের সে পেছু নিয়েছিল তা কোনো পদচিহ্নের সূত্রেই ধবা যায়নি। সে এসেছিল; শহুরে রাস্তা আর কাফে'র অদ্ভুত ভাষায় কথা বলেছিল। তারপর নারকোল গাছের নিচে বসেও অদৃশ্য হল! পরদিন সকালে, স্মিথ-বিহনে কোরালিও তার ভাজা-কলার ফলার খেয়ে বলল—'চিত্রিবিচিত্রি জামাপরা লোকটা নিজে থেকেই হাওয়া হয়ে গেছে।' দিবানিদ্রার পর সে-ঘটনার স্মৃতিও আর রইল না, হাই তুলেই হয়ে গেল ইতিহাস।

অতএব, আপাতত স্মিথকে নাটকের মঞ্চ-দৃশ্যের পেছনেই থাকতে হচ্ছে। সে আর কোরালিওতে আসছে না, ডাঃ গ্রেগের কাছেও নয়। উনি তো বৃথাই বসে থাকেন, তাঁর পেল্লায় দাড়ি নাড়েন, আর অপেক্ষা করেন কখন ফাঁকিবাজ শ্রোতাদের তুরপুন-চিকিৎসা এবং পেশাদাবী ঈর্ষার কাহিনী শুনিয়ে দিগ্গজ করে তুলবেন।

কিন্তু চক্চকে এই আলগা পৃষ্ঠাগুলোব ভাঁজে শুভসূচনা করে আবার স্মিথ ডানা ঝাপ্টাবে। যথাসময়ে সে এসে আমাদের বলবেই কেন সে-বাতে ও নারকোলগাছ তলায় এত উদ্বেগমাখা চুরুটের গোড়া ছড়িয়ে রেখেছিল। এটা তাকে করতেই হবে, কাবণ ভোরেব আগেই সে যখন তার প্রমোদতবী 'ব্যাম্বলারে' চেপে চম্পট দিল, তখন সে পেয়ে গিয়েছিল একটা ধাঁধার উত্তর—সে ধাঁধা এতই বিরাট আব উদ্ভট যে তা প্রমাণ করতেও সাহস পাবে না আঞ্চুরিয়াব বেশির ভাগ মানুষ।

Smith. এইন্সলি. ১৯০১

ধরা-পড়া

তৃতীয় কাহিনী

পলায়মান প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরিস আর তাঁব সঙ্গিনীকে সমুদ্র-উপকূলেই আটকে ফেলার পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। ডঃ জাভালা স্বয়ং গিয়েছে আলাজান বন্দবে, সেখানে প্রহরী ঘাঁটি বসাতে। কোরালিওতে কড়া নজর রাখার জন্য উদারনৈতিক দেশভক্ত ভারাস্-এর ওপর সম্পূর্ণ ভবসা রাখা যায়। গুডউইন নিজে তুলে নিয়েছে কোরালিওর আশপাশের এলাকার দায়িত্ব।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতা হাতে নিতে চায় তাদের কয়েকজন নির্ভরযোগ্য সদস্য ছাড়া বন্দর শহরগুলোতে আর কারুর কাছেই ফাঁস করা হয়নি প্রেসিডেন্টের পলায়নের খবর। জাভালার এক গুপ্তচরকে দিয়ে পাহাড়ের সুদূর শুঁড়িপথ অবধি টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা হয়েছে, যেটা সান মাতিও থেকে উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সে-তার মেরামত হওয়ার আর রাজধানী থেকে কোনো বার্তা আসার অনেক আগেই পলাতকরা উপকূলে পৌঁছে যাবে—সটকে পড়া বা ধরা পড়ার প্রশ্নের সমাধানও তখনই হয়ে যাবে।

কোরালিও থেকে উভয় দিকে একেক মাইল তটরেখা ধরে মাঝে-মাঝে সশস্ত্র প্রহরী রেখেছে গুডউইন। তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে। জলের ধারে ভাগ্যক্রমে কোনো নৌকো বা সুলুপ-ডিঙি পেয়ে গেলে তারই সাহায্যে মিরাফ্লোরেস জাহাজে ওঠার চেষ্টা করতে পারেন—তাতে বাধা দিতে হবে প্রহরীদের। জনা বারো টহলদার সন্দেহের উদ্রেক না করে কোরালিওর রাস্তায় হেঁটে বেড়াবে, কোনো কাজ-পালানো কর্মচারীকে সেখানে ঘুরতে দেখলেই তাকে আটকাবে।

গুডউইন সুনিশ্চিত যে সবরকম সাবধানতাই নেওয়া হয়েছে, কিছুই উপেক্ষা করা হয়নি। ওই সব বড়-বড় নামওয়ালা রাস্তা, যেগুলো আসলে সরু, ঘাসে-ঢাকা গলিমাত্র, সেখান দিয়েই ও ঘুরে বেড়ায়। বব এঙ্গলহার্ট যে সতর্ক প্রহরার দায়িত্ব তাকে দিয়েছে তাতে ওর নিজের সহায়তাই অনেকখানি।

শহরে নিত্যকারের নৈশ আমোদের উষ্ণ হাওয়া জেগেছে এখন। সাদা পোশাক আর ফলাও গলাবন্ধ-পরা কিছু অলস চালিয়াত, বাঁশের কঞ্চিবেত দুলিয়ে ঢুকে পড়ছে ঘেসো গলিঘুঁজির মধ্যে—তাদের পেয়ারের সেনোরিটাদের বাড়ির উদ্দেশে। যারা সঙ্গীতকলার সেবা করে তারা টেনে-টেনে অবিশ্রাম কনসার্টিনায় তান ধরেছে, অথবা ঘুমপাড়ানি গীটার বাজাচ্ছে দরজা-জানলার চৌকাঠে বসে। ছাউনি থেকে মাঝেমধ্যে একেকজন সৈনিক বেরিয়ে আসে—তাদের মাথায় ফড়ফড়ে খড়ের-টুপি, পরনে জুতো বা কোট নেই। তাড়াহুড়ো করে একহাতে বর্শার মতো লম্বা বন্দুক সামলায়। গাছপালার প্রত্যেকটি অন্ধকার কোণ থেকে বিশাল গেছো ব্যাঙ উচ্চস্বরে বিরক্তিকর ডাক ডেকে চলে। আরো দূরে যেখানে গলিপথগুলো জঙ্গলের ধারে হারিয়ে গেছে, সেখানে লুটেরা বেবুনের খক্‌খকে ডাক আর কালো জলের মোহানায় কুমিরদের কাসি ছিন্নভিন্ন করে দেয় অরণ্যের ব্যর্থ নীরবতা।

রাত দশটা নাগাদ সব পথ পরিত্যক্ত। যেমন-তেমন একেকটা কোণে যে মরা-হলদে তেলের বাতিগুলো জ্বলছিল তাও আবার কোনো পয়সা-বাঁচানো কর্মচারী নিভিয়ে দিয়ে গেছে। হুমড়ি-খেয়ে-পড়া পাহাড় আর এগিয়ে-আসা সমুদ্রের মাঝখানে কোরালিও শান্ত, ঘুমন্ত; চুরি-করা শিশুর মতো তার অপহারকদেরই বাহুর আশ্রয়ে। ওই ক্রান্তিবৃত্তের আঁধারের মধ্যেই কোথাও হয়তো পলিময় নিম্নভূমির বিস্তারের মাঝে পথ করেই মহা দুঃসাহসী আর তাঁর সাথী এগিয়ে যাচ্ছেন উপকূলের প্রান্তে। 'শেষরাতের শেয়াল' খেলাটা বুঝি খুব তাড়াতাড়িই সাঙ্গ হয়ে যাবে।

সুচিন্তিত পদক্ষেপেই গুডউইন লম্বা, নিচু সেনা ব্যারাকের পাশ দিয়ে চলে। আঙুরিয়া সেনাবাহিনীর কোরালিও-শাখার সেপাইরা ওখানে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, খালিপায়ের ডগা শূন্যে উঁচিয়ে। আইন ছিল রাত ন'টার পর ওই 'সামরিক কেল্লার' খাসদপ্তরের কাছাকাছিও কোনো নাগরিকের আগমন নিষিদ্ধ। কিন্তু গুডউইন তো বরাবরই ছোটখাটো নিষেধবিধি ভুলে যায়।

'কিয়েন ভিভে ?'— খিঁচিয়ে উঠল শান্ত্রী, লম্বা গাদাবন্দুকটা সামলাতে-সামলাতে।

'আমেরিকানো',—মাথা না ফিরিয়ে গরগর করে জবাব দিল গুডউইন। না থেমে সে হেঁটেই চলে গেল।

ডান দিকে মোড় নেয় ও, তারপর বাঁদিকের পথটা ধরে যেটা শেষ অবধি 'প্লাজা নাসিওনালে' পৌঁচেছে। 'পবিত্র-সমাধি পথ'টা যেখানে আড়াআড়ি কেটেছে, একখানা চুরুটের গোড়া ছুঁড়লেই যার নাগাল পাওয়া যায়, সেখানে ও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল!

দেখল একটা লম্বা গোছের মানুষের আদল, কালো পোশাকে। মস্ত একটা চামড়ার ভ্যালিস্-ব্যাগ হাতে। তাড়াহুড়ো করে আড়াআড়ি সৈকতগামী রাস্তাটা ধরে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার নজর করতেই গুডউইন সচকিত হল— পুরুষটির পেছনদিকে, তার কনুই ঘেঁষে একজন মহিলা, মনে হচ্ছে যেন সঙ্গীকে এগুবার জন্য ঠেলছে। এমনকি সাহায্যও করছে যাতে চটপট অথচ নিঃশব্দে এগুনো যায়; ওরা দুজন যে কোরালিওবাসী নয়, তা বোঝাই যায়।

গুডউইন চলার গতি বাড়িয়ে ওদের অনুসরণ করে, কিন্তু টিকটিকিদের প্রিয় কায়দাকৌশল নিয়ে নয়। গোয়েন্দাদের সহজাত-অনুভূতি ওর মতো উদারবক্ষ আমেরিকানের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ও আঙ্কুরিয়ার মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। যদি কিছু রাজনৈতিক কারণ না থাকত তাহলে এখানে এবং এখুনি সে টাকাটা দাবি করত। ওর দলের পরিকল্পনা: বে-হাতে পড়া তহবিল সুরক্ষিত করা, দেশের কোষাগারে তা পুনরুদ্ধার করে রাখা, আর বিনা রক্তপাতে বা প্রতিরোধে নিজেদের ক্ষমতায় আসীন বলে ঘোষণা করা।

ওরা উভয়ে হোটেল এস্ট্রানজেরোর দরজা গোড়ায় থেমেছে। পুরুষটি এমন অধৈর্য হয়ে দরজায় করাঘাত করছে যে বোঝা যায় খোলার অপেক্ষায় অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সে অভ্যস্ত নয়। মাদামা সাড়া দিতে বেশ বিলম্ব করলেন, অবশেষে তাঁর হাতের আলোটা দেখা গেল, দরজাও খুলল আর অতিথিদের ভেতরে ঢোকানো হল।

নিঝুম রাস্তায় আরেকটা চুরুট ধরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গুডউইন। দু'মিনিটের মধ্যে হোটেলের ওপর তলায় খড়খড়িগুলোর ফাঁকে একটু টিমে আলো দেখা যেতে থাকে। গুডউইন মনে-মনে ভাবে, 'ওরা কামরা ভাড়া নিয়েছে, তার মানে জাহাজে পালানোর ব্যবস্থাটা এখনো পাকাপাকি করতে দেরি আছে।'

সেই মুহূর্তে সেখানে এসে হাজির হল একটি লোক, এস্টেবান ডেলগাডো। সে নাপিত, চালু গভর্নমেন্টের দুশমন, যে-কোনো ধরনের অচলাবস্থার বিরুদ্ধে সানন্দে ষড়যন্ত্র করে। নাপিতটি হল কোরালিওর সবচেয়ে দুর্গত প্রাণী, রাত এগারোটা অবধিও একেক সময় ঘরের বাইরে থাকে। সে স্বেচ্ছাসেবী, উদারনৈতিক

দলের। গুডউইনকে এমন অন্তঃসারহীন বাড়াবাড়ি দেখিয়ে সম্ভাষণ জানাল যেন দু'জন এক গেলাসের ইয়ার। তবে তার কিছু জরুরি জিনিসও ছিল জানাবার।

চক্রান্তকারীদের সুরেই সোচ্চারে বললে এস্টেবান, 'ডন ফ্র্যাঙ্ক, কী ভেবেছেন আপনি! আজ রাত্রে আমি—যাকে আপনারা গালপাট্টা বলেন—স্বয়ং প্রেসিডেন্টের, আরে এই দেশেরই, তাই কামিয়ে দিয়েছি। ভাবুন তো! উনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এক বুড়ির ভাঙা ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন—খুউব ছোট্টো ঘর, অন্ধকার জায়গায়। এ রামোঃ! সেনর প্রেসিডেন্ট নিজে ওই রকম গোপনে, অচেনা অজানা জায়গায় লুকিয়ে'? মনে হয় কেউ জেনে ফেলে তা চাননি। কিন্তু গেল যা! মুখ দেখব না অথচ কামাতে হবে, তাও কি হয়? এই সোনার টাকাটা দিয়েছেন আমায়, বলেছেন সবকিছু চেপে যেতে। আমার ধারণা, ডন ফ্র্যাঙ্ক, এ হল মেঘ না চাইতেই জল!'

'প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসকে আগে কখনো দেখেছিলে?' জিজ্ঞেস করে গুডউইন।

'একবারই শুধু'—জবাব দেয় এস্টেবান, 'লম্বা মানুষ। গালপাট্টা ছিল, খুব কালো আর ঘন।'

'তুমি যখন দাড়ি কামালে, ওখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল?'

'একজন বুড়ি ইণ্ডিয়ান, সিনর, ওই বাড়িরই। আর একজন সিনরিটা—এমন সোন্দর এক লেডী, আহা!'

'ঠিক আছে এস্টেবান, অত্যন্ত ভাগ্যের কথা যে তুমি যথাসময়ে ক্ষৌরকর্মের তথ্যটা নিয়ে এলে। নতুন প্রশাসন নিশ্চয়ই তোমাকে এর জন্য স্মরণ করবে।'

তারপর গুডউইন তাকে দু'চার কথায় জাতির চূড়ান্ত সংকটের কথা বুঝিয়ে বললে। তাঁকে নির্দেশ দিলে বাইরে অপেক্ষা করতে, আর হোটেলের রাস্তামুখো দুটো দিকের ওপর নজর রাখতে। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ কোনো দরজা বা জানলা দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরুবার চেষ্টা করছে কিনা। যে-দরজাটি দিয়ে অতিথিরা ঢুকেছে, গুডউইন নিজে সেই দরজার সামনে গেল, তারপর সেটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মাদাম তখন ওপরতলার আগন্তুকদের আরামের ব্যবস্থা করে নিচের তলায় নেমে এসেছেন। ওঁর মোমবাতিদানটা বারের ওপর। বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়েছে, তাই সান্ত্বনা হিসেবে দু'চামচ রাম খেয়ে নিতে যাচ্ছিলেন। তিন নম্বর সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ভেতরে ঢুকতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন না, ভয়ও পেলেন না।

'আঃহা! সেনর গুডউইন যে! গরিবের ঘরে পায়ের ধুলো দিতে তেমন তো তাঁর আসা হয় না।'

গুডউইন তার মার্কামারা হাসি দিয়ে বললে, 'এবার আরো ঘন-ঘন আসতে হবে দেখছি। শুনলাম আপনার 'কনিয়্যাক' নাকি বেল্জিজ্ থেকে রিও অবধি

সবচেয়ে সেরা। বোতল বের করুন মাদামা, দু'জনেই পাত্রে ঢেলে পরখ করি।'

সগর্বে মাদামা বললেন, 'আমার "আগুয়ার্দিয়েন্তে" একেবারে খাসা জিনিস। কলাঝোপের নিচের অন্ধকারে সুন্দর-সুন্দর বোতলের মধ্যে গজায়। হ্যাঁ সিনর। শুধু মাঝরাতেই ওগুলো তুলতে পারে খালাসিরা আর ভোর হবার আগে পৌঁছে দেয় আপনার খিড়কির দরজায়। ভাল "আগুয়ার্দিয়েন্তে" বড় মেহনতের ফল, সেনর গুডউইন।'

কোরালিওতে চোরা-চালান যতটা বাণিজ্যের অঙ্গ, ততটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় নয়। এ নিয়ে ধূর্তভাবে কথা বললেও গর্বের ব্যাপার আছে, বিশেষ করে কাজটা ভালভাবে হয়ে গেলে।

গুডউইন কাউন্টারের ওপর একটা রুপোর ডলার রেখে বললে, 'আপনার আস্তানায় আজ রাতে অতিথি আছেন দেখছি।'

'কেন নয়?'—খুচরো গুনতে গুনতে মাদামা বললেন—'দুটো... আর ছোটটি আসবে শেষ হবার পর। একজন সেনর, খুব বুড়ো নন, আর একজন সিন্নরিটা, যথেষ্ট সুন্দরী। নিজের নিজের কামরায় চলে গেছেন, খেতেও চাননি, পান করতেও নয়। দুটো কামরা ৯ নম্বর আর ১০ নম্বর।'

গুডউইন বলল, 'ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে আমি প্রত্যাশা করছিলাম, খুব জরুরি লেনদেনের ব্যাপার আছে যেটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে। তাঁদের সঙ্গে আমায় দেখা করতে দেবেন?'

মাদামা শান্তভাবে বললেন, 'কেন নয়? সেনর গুডউইন তো ওপরে গিয়েই বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সেটাই ভাল। কামরা নম্বর ৯ আর কামরা নম্বর ১০।'

'গুডউইন কোটের পকেটের মধ্যে তার আমেরিকান রিভলবারটা আলগা করে নিয়ে উঁচু অন্ধকার সিঁড়িপথ ধরে উঠে গেল।

ওপরের হলরাস্তায় ঝোলানো নারঙ্গী বাতির আলোয় তার সুবিধা হল দরজার ওপর রঙচঙে নম্বরগুলো চিনে নিতে। ৯-নম্বরের দরজার হাতল ঘুরিয়ে সে ভেতরে ঢুকল, তারপর পেছন থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

অতি দীনভাবে সাজানো ঘরের টেবিলের ধারে যে বসে আছে সে যদি ইসাবেল গিলবার্ট হয়, তাহলে বলতে হবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো তার সত্যিকারের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এক হাতের ওপর মাথা এলিয়ে রেখেছে, দেহের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটে উঠছে অসীম অবসাদের চিহ্ন। আর মুখের মধ্যে যেন গভীর বিভ্রান্তির ছাপ। ধূসর-তারার চোখ দুটির গড়ন এমনই যে মনে হবে সারা দুনিয়ার সেরা হৃদয়-রানীদেরই অক্ষিবলয়। গাঢ় আয়ত পল্লবের আড়ালে যাব-পর-নাই নির্মল আর উজ্জ্বল সাদার বেষ্টনী, নিচে তুষার রেখার

আভাস। এ চোখ তেজ ও আভিজাত্যের, আর যদি আপনি ধারণা করতে পারেন—তাতে অতি উদার স্বার্থপরতাও আছে। আমেরিকানটি যখন বিস্মিত মুখে কৌতূহলের অভিব্যক্তি নিয়ে ঢুকল, সে চোখ তুলে চেয়েছে কিন্তু আতঙ্কের ভাব দেখায়নি।

গুডউইন টুপি খুলে বসল টেবিলের এক কোণে—তার স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস ভঙ্গিতে। দু'আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত চুরুট। ও নিশ্চিত যে বেশি ভূমিকা করলে মিস গিলবার্টের ওপর তা নেহাতই অপচয় হবে, তাই সে এই পরিচিত পদ্ধতিটাই গ্রহণ করে। ওর ইতিহাস তার জানা, এও জানে কতটুকু রীতিনীতির স্থান এর মধ্যে।

বললে, 'শুভসন্ধ্যা। এবার ম্যাডাম, কাজের কথাতেই সরাসরি আসা যাক। লক্ষ্য করবেন আমি কারুর নাম উল্লেখ করছি না, কিন্তু আমি জানি পাশের কামরায় কে রয়েছেন, আর ওই চামড়ার ভ্যালিসে তিনি কী বস্তু বহন করছেন। এই নির্দিষ্ট বিষয়টিই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আমি এসেছি আত্মসমর্পণের শর্তগুলো জানিয়ে দিতে।'

মহিলা নড়লও না, জবাবও দিল না, কিন্তু স্থিরনেত্রে তাকিয়ে রইল গুডউইনের হাতের চুরুটের দিকে।

চিন্তিত চোখে নিজের স্বল্প-দোলায়মান পায়ের ছিমছাম বুটের দিকে চেয়ে শর্ত-দাতা ফের বললে, 'আমি জনগণের প্রায় বেশির ভাগ মানুষের সপক্ষেই বলছি, আমরা ওই অপহৃত তহবিল ফেরত চাই যা প্রকৃতপক্ষে তাদেরই। আমাদের শর্ত এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। একেবারেই সহজ। ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে আমি কথা দিতে পারি যে এ শর্ত মেনে নিলে আমাদের তরফ থেকে সব বাধা তুলে নেব। টাকা ফেরত দিন, তারপর আপনাকে আর আপনার সঙ্গীকে যেখানে খুশি চলে যেতে অনুমতি দেওয়া হবে। সত্যি বলতে, নিজেদের পছন্দমতো যে-কোনো বিদেশগামী জাহাজে আপনাদের যাত্রার ব্যবস্থা করতেও আমরা সাহায্য করব। এবার আমি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে আরেকটু জুড়ে দিই: ১০ নম্বর ঘরের ভদ্রলোককে তাঁর নারীসৌন্দর্য সম্পর্কে রুচির জন্য অভিনন্দন।'

চুরুটটা মুখে ফিরিয়ে নিতে-নিতে গুডউইন ওকে লক্ষ্য করে। দেখে মহিলার দু'চোখ হিমশীতল। রীতিমত মনোযোগ দিয়ে চুরুটটাকে অনুসরণ করে স্থির নিবিষ্ট হল। এটা স্পষ্ট যে গুডউইনের কোনো কথাই সে শোনেনি। গুডউইন সেটা বুঝে জানলা দিয়ে চুরুটটা ছুঁড়ে দিল। তারপর একটা কৌতুকের হাসি হেসে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল।

'এ বরং ভাল,' বললে মহিলা, 'আপনার কথা শোনা এবার আমার পক্ষে সম্ভব হবে। আদবকায়দার দু'নম্বর পাঠ হিসেবে, আপনি এখন বলতে পারেন কার দ্বারা আমি অপমানিত হচ্ছি।'

টেবিলের ওপর একখানা হাত রেখে গুডউইন বললে, 'আমি দুঃখিত যে আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত, তাই শিষ্টাচার শিক্ষায় বেশি কালক্ষেপ করতে পারছি না। এবার শুনুন, আপনার সুবুদ্ধির কাছে আবেদন করছি। একাধিক দৃষ্টান্তেই আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কিসে আপনার সুবিধা সে-ব্যাপারে আপনার টনটনে জ্ঞান আছে। এই একটা সুযোগ যেখানে নিজের অনস্বীকার্য বুদ্ধি খাটাতে পারেন। কোনো রহস্য নেই এতে। আমি ফ্র্যাঙ্ক গুডউইন, টাকাটা উদ্ধার করতে এসেছি। একটা ঝুঁকি নিয়ে এই কামরায় ঢুকলাম। অন্য কামরাটায় ঢুকলে এতক্ষণে ওটা আমার হাতে এসে যেত। বুঝিয়ে বলতে হবে কথাটা? ১০ নম্বর ঘরের ভদ্রলোক একটা বিরাট ন্যস্ত-বিশ্বাস নিয়ে প্রতারণা করেছেন। প্রজাদের বড় অঙ্কের তহবিল আত্মসাৎ করেছেন। আর আমিই তাদের সে-ক্ষতি রোধ করব। ওই ভদ্রলোক কে তা আমি বলছি না, তবে যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হই আর উনি যদি প্রজাতন্ত্রের কোনো বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হন, তাহলে আমার কর্তব্য হবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা। এ বাড়ি প্রহরী ঘেরা। আমি আপনাকে সহজ শর্ত দিচ্ছি। পাশের ঘরের ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করার কোনো জরুরি প্রয়োজন নেই। টাকাভর্তি ভ্যালিস্‌টা এনে দিন আপনি, আমরাও ব্যাপারটা শেষ হল বলে ধরে নেব।'

ভদ্রমহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠল, একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবল।

তারপরেই প্রশ্ন করল, 'আপনি কি এখানে থাকেন, মিঃ গুডউইন?'

'হ্যাঁ।'

'এভাবে নাক গলাবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?'

'আমি প্রজাতন্ত্রের একটি যন্ত্র। ১০ নম্বরের ভদ্রলোকের চালচলনের বিষয়ে আমায় তারবার্তায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

'আপনাকে আমি দু'তিনটে প্রশ্ন করতে পারি? মনে হয় ভীরুতা দেখানোর চেয়ে সৎসাহস দেখাবার ঝোঁকই আপনার বেশি। কেমন শহর এই কোরালিও—এটাই তো বুঝি এর নাম?'

'কদলী' শহর বলে ওবা। খড়ের কুড়েঘর, পোড়া ইটের বাড়ি, খান পাঁচ-ছয় দোতলা বাড়ি। থাকবার মতো জায়গা কম, মানুষ দোআঁশলা স্পেনীয় আর ইণ্ডিয়ান, ক্যারিবীয় আর নিগ্রো। পায়ে চলার রাস্তা তথৈবচ, আমোদপ্রমোদ নেই। অ-নৈতিক বলতে গেলে। এটা অবশ্য যেমন-তেমন একটা নক্‌শা দিলাম।'

'এখানে লোকের বসবাস করার মতো উৎসাহজনক কিছু আছে— মানে সামাজিক বা ব্যবসাপত্রের দিক থেকে?'

চওড়া হাসি হেসে গুডউইন বলে, 'তা আছে বৈকি। কোনো সান্ধ্য চায়ের আসর নেই, বাজানোর অর্গান নেই, নানা পণ্যের বিপণি নেই—আবার অপরাধীকে স্বদেশে ফেরত দেবার চুক্তিও নেই।'

'ও বলেছিল',—খানিকটা আপন-মনেই একটু কপাল কুঁচকে বলে ভদ্রমহিলা. 'সুন্দর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহর আছে এ-উপকূলে। মনোরম সামাজিক রীতি—বিশেষ করে সংস্কৃতিবান আবাসীদের নাকি একটা আমরিকান কলোনিও আছে।'

একটু অবাক চোখেই ওর দিকে তাকিয়ে থেকে গুডউইন বলল, 'আমেরিকান কলোনি তো একটা আছে। তাদের কেউ কেউ মোটের ওপর ভাল। কেউ আবার মার্কিন আদালতের সাজা ফাঁকি দিয়ে এসেছে। আমার মনে পড়ে দু'জন নির্বাসিত ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টকে, সন্দেহভাজন একজন ফৌজী তবিলদার, একজোড়া খুনি—আবার একজন বিধবা, আর্সেনিকের বিষ দিয়েছিল বলে মামলাতে সন্দেহ করা হয়। কলোনির তালিকা আমাকে দিয়েই শেষ, তবে এখন অবধি কোনো বিশেষ অপরাধের খ্যাতি আমার জোটেনি।'

শুকনো গলায় ভদ্রমহিলা বললে, 'আশা ছাড়বেন না। আজ রাতে আপনার কাজকর্মে এমন কিছু দেখিনি যা ভবিষ্যতে আপনাকে আড়ালে লুকিয়ে থাকার সুযোগ দেবে। কিছু একটা ভুল হয়েছে, জানি না ঠিক কোনখানে। কিন্তু ওঁকে আজ রাতে আপনি বিরক্ত করতে পারবেন না। ভ্রমণের ক্লান্তি ওঁকে এমন অবসন্ন করেছে যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, হয়তো বাইরের পোশাক পরেই। চুরি-করা টাকার কথা বলছেন আপনি! বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। কিছু ভুল কোথাও হয়েছে। আমি প্রমাণ করে দেখাব। যেমন আছেন এখানেই থাকুন। যে-ভ্যালিসটার ওপর আপনার এত লোভ, সেটা আমি নিয়ে আসছি, আপনাকে দেখিয়ে দেব।'

দু'কামরার মাঝখানে যোগাযোগের দরজাটার দিকে এগিয়ে গিয়েও ভদ্রমহিলা থমকে দাঁড়াল, কাত হয়ে ঘুরে প্রথমে গুডউইনের দিকে একটা গম্ভীর সন্ধানী দৃষ্টিনিক্ষেপ করল, তারপর সে দৃষ্টি একটা হেঁয়ালির হাসিতে শেষ হল। বলল, 'আমার ঘরে জোর করে ঢুকলেন, গুণ্ডার মতো আচরণের পরেই আবার জঘন্য অভিযোগ। কিন্তু তবু—' একটু ইতস্তত করে যেন ভাবল এর পরে কী বলতে যাচ্ছে— 'তবু, একটা ধাঁধার মতো ব্যাপার, আমি নিশ্চিত যে কোথাও একটা ভুলভ্রান্তি ঘটেছে।'

দরজার দিকে সে এক পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু গুডউইন তাকে থামাল তার বাহুর ওপর আলতো স্পর্শ করে। আমি আগেই বলেছি, রাস্তায় চলতে মেয়েরা গুডউইনের দিকে ফিরে চাইত। ও হল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাইকিংদের ধরনের মানুষ—বিশাল, রূপবান, সেই সঙ্গে সদয় নির্মমতার ভাবও রয়েছে। মহিলাটি শ্যামাঙ্গী ও গর্বিতা, মেজাজের তালে কখনো উজ্জ্বল কখনো ম্লান। জানি না ইভ ফর্সা কি কালো ছিলেন, তবে অমন একজন নারী উদ্যানে দাঁড়ালে, জানি

আপেলটা খাওয়াই হয়ে যেত। এ নারীও গুডউইনের নিয়তি হতে চলেছে, অথচ্ সে তা জানে না। কিন্তু ভাগ্যের প্রথম যাতনা সে নিশ্চয়ই টের পেয়েছে, কারণ ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বুঝল ওর নামে পাওয়া আগের বিবরণ এখন তার গলায় তেতোই ঠেকছে যেন।

উষ্মার সঙ্গে সে বললে, 'যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে সে আপনার। আমি তো ও লোকটাকে দোষ দেব না, যে নিজের দেশকে হারিয়েছে, সম্মান হারিয়েছে আর এখন হারাতে চলেছে অপহৃত ধনের সামান্য সান্ত্বনাটাকেও। আমি দোষ দেব আপনাকে, কারণ ঈশ্বরের কৃপায় দেখতেই পাচ্ছি কেমন করে তাঁকে এ-অবস্থায় টেনে আনা হয়েছে। আমি লোকটাকে বুঝতে পারি, করুণাও করি। ঠিক আপনার মতো নারীরাই এই হৃতগৌরব উপকূল দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে হতভাগা দেশ-খেদানো নির্বাসিতদের, যাতে তারা ভুলে যায় অর্পিত আস্থা, আর টেনে নিয়ে যায়—'

ক্লান্ত ভঙ্গি করে মহিলা তাকে বাধা দিলে।

হিম কণ্ঠে বললে, 'আপনার অপমানের তালিকা আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই। আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না, আর আপনিও কোন্ উন্মাদ ভুল করছেন তা জানি না। তবে একজন ভদ্র ব্যক্তির পোর্টম্যান্টো তল্লাশি করিয়ে আমি যদি আপনার কাছ থেকে রেহাই পাই, তাহলে আর দেরি করা নয়।'

দ্রুত নিঃশব্দে সে অন্য কামরাটায় ঢুকল, আর ফিরে এল ভারী চামড়ার ভ্যালিসটা নিয়ে। আমেরিকানের হাতে সেটা তুলে দিল অসীম বিদ্রূপের মেজাজে।

গুডউইন চট্ করে ভ্যালিসটা টেবিলের ওপর রাখে, ফিতেগুলো খুলতে শুরু করে। মুখের ওপর যার পর-নাই অবজ্ঞা আর ক্লান্তির ছাপ নিয়ে ভদ্রমহিলা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভ্যালিসটা পাশের দিকে জবরদস্ত ভাঁজ খুলে হাঁ হয়ে গেছে। গুডউইন দু'একটা জামাকাপড় বের করে ভেতরের পুরো জিনিস মেলে ধরল—তাড়াবন্দী একের পর এক প্যাকেট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক আর সরকারী কোষের উঁচু অঙ্কের নোট। বাঁধা কাগজের পটিতে বড় সংখ্যা লেখা দেখে বোঝা যায় যোগফল প্রায় একলাখের কাছাকাছি।

গুডউইন মহিলার দিকে চট্ করে আড়চোখে তাকাল, আর সবিস্ময়ে দেখল সে সত্যিসত্যিই একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে এতে কোনো ভুল নেই। আর এতে নিজের আনন্দের রোমাঞ্চে নিজেই অবাক হয় গুডউইন। মহিলার চোখ বিস্ফারিত, দম নিতে পারছে না, টেবিলের ওপর শরীরের ভার ছেড়ে দিয়েছে। গুডউইন অনুমান করে মহিলার সঙ্গীটি যে সরকারী তহবিল লুট করেছিল সে-ব্যাপারে মহিলা নিতান্তই অজ্ঞ। কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, এই ভবঘুরে বিবেকবর্জিতা

গায়িকাকে রিপোর্টে যত নোংরা করে দেখিয়েছে তত মলিন সে নয় ভেবে ও কেন উল্লসিত হবে?

পাশের ঘরে একটা আওয়াজ হতে দুজনেই চমকে ওঠে। দরজাটা খুলে যায়, আর একজন দীর্ঘকায়, বয়স্ক, ঘোর বর্ণের মানুষ, সদ্য দাড়ি-কামানো, ছুটে আসেন এ-ঘরের মধ্যে।

প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসের সমস্ত ছবিতেই তাঁকে দেখা যায় প্রচুর ঘন কালো দাড়ি আর সযত্ন লালিত গালপাট্টার মালিক হিসেবে, কিন্তু নাপিত এস্টেবানের কাহিনী গুডউইনকে আগে থেকেই প্রস্তুত রেখেছিল এই পরিবর্তনটার বিষয়ে। ভদ্রলোক অন্ধকার ঘর থেকে প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়লেন এ ঘরে, বাতির আলোয় ঘুমে-ভারী চোখ পিট্‌পিট করছে। চোস্ত ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার হচ্ছে এসব?'—আমেরিকানটির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচলিত দৃষ্টি—'ডাকাতি নাকি'?

'অনেকটা সেইরকমই,' জবাব দিল গুডউইন, 'তবে আমার ধারণা ঠিক সময়েই এসেছি তা ঠেকাতে। যারা এই টাকার প্রকৃত মালিক আমি তাদের প্রতিনিধি, তাদেরই ফেরত দিয়ে দেব বলে এসেছি।' হালকা লিনেন-কোটের পকেটে হাত গুঁজল সে।

অন্য ব্যক্তির হাতও চট্ করে নিজের পেছন দিকে গেছে।

'বের করবেন না!' তীক্ষ্ণস্বরে গুডউইন বললে, 'আমার পকেটের ভেতর থেকেই আপনাকে তাক্ করে রেখেছি।'

ভদ্রমহিলা সামনে এগিয়ে গিয়ে দোনামনো সঙ্গীটির কাঁধে হাত রাখল। টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, 'সত্যি কথা বল আমায়—যা নিখাদ সত্যি। ও টাকা কার?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস টেনে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন মহিলার কপালে। তারপর হেঁটে চলে গেলেন পাশের কামরায়। দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর উদ্দেশ্যটা আগেই বুঝতে পেরেছিল গুডউইন। লাফিয়ে পড়ল দরজার দিকে, কিন্তু দরজার হাতল ছোঁবার আগেই একটা পিস্তলের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল, তারপরেই কোনো ভারী বস্তুর পতন। কেউ তাকে ঠেলে দিয়ে জোর করে ঢুকল ভূপাতিত লোকটির কামরায়।

গুডউইনের মনে হল যেন দয়িত-নায়ক ও ধন হারাবার চেয়েও বড় কোনো নিঃসঙ্গতাবোধ জেগেছিল কুহকিনীর হৃদয়ে, তাই সেই মুহূর্তে মেয়েটির বুক ফেটে বেরুল এক অন্য আর্তনাদ 'ও মা, মাগো!' বলে। —এই কান্না নিয়ে সে ওই রক্তাক্ত মর্যাদাহীন কামরা থেকেই ফিরে তাকিয়েছে সর্ব-ক্ষমাময়ী, শান্তিময়ী, পার্থিব সান্ত্বনাদাত্রীর দিকে।

কিন্তু বাইরে তখন বিপদের সংকেত। গুলির শব্দ শুনে এস্টেবান নিজেই চেঁচিয়ে উঠেছিল; তা ছাড়া বন্দুকের আওয়াজ অর্ধেক শহর জাগিয়ে তুলেছে। রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে পায়ের শব্দ, নিথর বাতাসে কর্তাদের হুকুম-হাকাম। গুডউইনের একটা কর্তব্য আছে করার। ঘটনাক্রমে সে তার অবলম্বিত দেশের রাজকোষের জিম্মাদার। ভ্যালিসের মধ্যে তাড়াতাড়ি টাকাগুলো ঢুকিয়ে সে থলির মুখ বন্ধ করল, তারপর জানলা দিয়ে বাইরে অনেকটা ঝুঁকে থলিটা ফেলে দিল নিচের ছোট বেড়া-দেওয়া ঘন কমলালেবু গাছের ঝোপে।

এ বিয়োগান্তক পলায়নের শেষাবধি কী ঘটেছিল তা আপনাকে শুনিয়ে দেবে কোরালিওবাসীরা, আগন্তুককে যেমন বলে ওরা আনন্দ পায়। তারা আপনাকে বলবে কেমন করে আইনের ধ্বজাধারীরা ছুটে চলে এসেছিল বিপদসংকেতের সঙ্গে সঙ্গে—লাল চটি-পায়ে, প্রধান খানসামার মতো জ্যাকেটপরা 'কমান্ডান্টে' সাহেব কোমরে তরোয়াল বেঁধে এলেন, সেপাইরা এল চিরন্তন বন্দুক নিয়ে, পেছনে ওদের চেয়েও বেশিসংখ্যায় অফিসাররা সোনালি ফিতে আর তকমা আঁটতে-আঁটতে। আর ছিল খালি-পা পুলিসের লোক (গোটা দঙ্গলের মধ্যে তারাই একমাত্র যোগ্য), নানা বর্ণ ও চরিত্রের বিচিত্র নাগরিকরা।

ওরা বলে, মৃত ব্যক্তির মুখের চেহারা গুলির ফলে করুণভাবে বিকৃত হয়েছিল, তবে তাঁকে পতিত প্রেসিডেন্ট বলে সনাক্ত করেছিল গুডউইন এবং নাপিত এস্টেবান, উভয়েই। পরদিন সকালে মেরামত-করা টেলিগ্রাফ-তার মারফত বার্তা আসতে থাকে, আর রাজধানী থেকে পলায়নের কাহিনীটা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়। রাজধানী সান মাতিওতে সরকারের দণ্ড দখল করেছিল বিপ্লবী দল, কোনো বিবোধিতা হয়নি। আর জনগণের তো অস্থির মতিগতি। হতভাগ্য মিরাফ্লোরেসের সপক্ষে কোনো সমর্থন অচিরেই ঘুচিয়ে দিয়েছে তারা।

ওরা আপনাকে শোনাবে কেমন করে নতুন গভর্নমেন্ট আঞ্চুরিয়ার বাড়তি মূলধন-ভরা সেই চামড়ার ভ্যালিসটা শহর ছেঁকে, রাস্তা খুঁড়ে, তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। প্রেসিডেন্ট যে ওটা সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছিলেন সে তো জানা কথাই। তবু সবই বৃথা হল। কোবালিওতে সিনর গুডউইন স্বয়ং সন্ধানী দল নিয়ে বেরিয়েছিল, মেয়েদের চুল আঁচড়াবার মতোই আঁতিপাতি শহরটায় চিরুনি-তল্লাসী চালিয়েছিল, কিন্তু তবু টাকাগুলো উদ্ধার করা গেল না।

অতএব তারা মৃত ব্যক্তিকে কোনো সম্মান না জানিয়ে কবরস্থ করল শহরের পেছন সীমায় সুঁদরি জঙ্গলের জলার ওপর ছোট সেতুটার কাছে। আর 'বাস্তব' বোঝাবার জন্য একটি ছোকরা আপনাকে কবরটাও দেখিয়ে দেবে। লোকে বলে, যে-বুড়িটার ঘরে নাপিত রাষ্ট্রপতির দাড়ি কামিয়েছিল সেই বুড়িই কাঠের তক্তাটা বসায় তার কবরের মাথায়, আর গরম লোহা-পোড়া দিয়ে অক্ষরগুলো লেখে।

আপনারা এও শুনবেন যে সিনর গুডউইন শক্তির স্তম্ভের মতো পরবর্তী দুঃখজনক দিনগুলোতে ডোনা ইসাবেলকে রক্ষা করেছিল, আর মহিলার অতীত সম্পর্কে যেটুকু ইতস্তত ভাব তার ছিল (যদি তা থেকেই থাকে), তাও ধুয়ে মুছে যায়। মহিলারও দুঃসাহসিক খেয়ালীপনা আর ছিল না (যদি তা আগে থেকেও থাকে)। তাই তারা পরস্পরকে বিয়ে করে সুখীও হল।

শহরের কাছে একটা ছোট টিলার গোড়ায় আমেরিকানটি একটি বাড়ি তৈরি করে। দেশি নানা কাঠ, যা রপ্তানি করলে বিরাট মুনাফা হত, আর ইট, তালকাঠ, কাঁচ, বাঁশ, রোদপোড়া ইট—সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কাঠামো। পরিবেশ যেন প্রাকৃতিক স্বর্গের: আর সেই রকমই ভেতরটাও। তারিফ করার ভঙ্গিতে হাত উঁচিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এর অন্দরমহলের কথা বলে। মেঝেগুলো নাকি আয়নার মতো ঝকঝকে পালিশ-করা, রেশম সুতো হাতে বুনে তৈরি ইণ্ডিয়ান গালচে। বড় বড় অলঙ্করণ আর ছবি, বাদ্যযন্ত্র আর কাগজমোড়া দেয়াল—'নিজেই আন্দাজ করুন!' সোৎসাহে বলে তারা।

কোরালিওর ওরা কিন্তু বলতে পারবে না (পরে আপনি জানবেন) কী ঘটেছিল সেই টাকার যা ফ্রাঙ্ক গুডউইন কমলালেবুর ঝোপে ফেলে দেয়। তবে—সে কাহিনী আসছে পরে, কারণ তালগাছগুলো হাওয়াতে হাতছানি দিচ্ছে, আমাদের এখন ডাকছে খেলা আর আনন্দের উৎসবে।

Caught, এইন্সলি, ১৯০১

দুজনের ফেরার ডাক

চতুর্থ কাহিনী

এই জোড়াতালির কমেডি-নাটকের যবনিকাপতনের আগে তিনটে কর্তব্য বাকি রইল। দুটোর জন্য কথা দেওয়াই আছে, তৃতীয়টাও অবশ্যপালনীয়ই বলতে হয়।

এই ভ্রান্তি-মণ্ডলীয় প্রমোদনাট্যের নির্ঘণ্টে বলা হয়েছিল কলাম্বিয়া গোয়েন্দা-সংস্থার 'বাঁটুল' ও'ডে কেন তার চাকরিটা খুইয়েছিল তা যথাসময়ে জানানো হবে। আর স্মিথও আবার ফিরে এসে বলবে আঞ্চুরিয়ার সৈকতভূমিতে সে কোন্ রহস্যের সূত্র পেয়েছিল যার জন্য তাকে নিঃসঙ্গ রাতে অতন্দ্র নজর রাখতে গিয়ে নারকোল গাছের নিচে অতগুলো চুরুটের ধ্বংসাবশেষ ফেলে রাখতে হয়। এসবের কথা

তো দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একটা বড় জিনিস যে হাসিল করা বাকি—যেসব ঐতিহাসিক তথ্য (সত্যভাবেই পরিবেশিত) অনুযায়ী একটা আপাত অন্যায় ঘটেছে তা পরিষ্কার করে দেওয়া'। এবার একটা কণ্ঠস্বরই বলবে এই তিনটের কথা।

নিউ ইয়র্ক শহরে, 'নর্থ রিভার'-এর এক জেটিতে ঘেরা-দড়ির ওপর বসেছিল দুটি লোক। ঘাটে কলা আর কমলালেবুর বোঝা খালাস করছিল ক্রান্তি-অঞ্চল থেকে আসা একটি স্টিমার। অতিপাকা কাঁদি থেকে মাঝে মধ্যে এক-আধটা কলা খসে পড়লে ওদের একজন তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ফলটা নিয়ে ফিরবে, তারপর সঙ্গীর সাথে ভাগ করে খাবে।

দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা যেন দুর্গতির চরমে। রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া তার পোশাকের যতটা ক্ষতি করতে পারে, করেছে। চেহারার মধ্যেও পরিষ্কার দেখা যায় মদ্যপানের ধ্বংসলীলা। কিন্তু তবু তার লালচে খাড়া নাকের ওপর চাট করে বসানো একজোড়া নিখুঁত ঝকঝকে সোনার ফ্রেমের চশমা।

অন্য লোকটা অবশ্য অযোগ্যদেব অধঃপতনের সিঁড়ি বেয়ে অতটা নিচে নামেনি। তার পৌরুষের ফুল থেকে বীজ ঝরে গেছে সত্যি, তবে সে বীজে হয়তো আর কোনো মাটিতেই অঙ্কুর গজাবে না। তবে তার চলার রাস্তায় এখনো কিছু আড়াআড়ি মোড় আছে যা দিয়ে চললে সে উপযুক্ততার পথটা আবার ফিরেও পেতে পারে, বেমক্কা কিছু ঘটার স্বপ্ন জাগিয়ে না তুলে। এ লোকটা বেঁটে আর গাঁটাগোট্টা। ট্যারচা মরা চোখ, আর মদ্যমিশ্রকের মতো গোঁফ জোড়া। এ-চোখ আর গোঁফ আমরা চিনি: আমরা জানি প্রমোদতরণী, জাঁকাল পোশাক, রহস্যময় অভিযান আর জাদুর মতো উপে-যাওয়া সেই স্মিথ আবার এসেছে, তবে তার আগের অবস্থাব জৌলুস খসে গেছে।

তিন নম্বর কলাটা খেতে গিয়ে নাকে-চশমা লোকটা শিউরে উঠে থু-থু করে ফেলে দিল।

অভিজাত ধরনের বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "ছ্যাঃ এ আবার ফল! যে দেশে এগুলো ফলে সেখানে দুটো বছর ছিলাম আমি। সে স্বাদ তো মুখে লেগে থাকে লোকের। কমলালেবুটা তেমন খারাপ নয়। দেখতো আর-দুটো জোগাড় করতে পার কিনা, ও'ডে, এর পরে যখন ভাঙা কোনো ঝুড়ি আসবে!"

রোদের উসুমে আর বসালো ফলে পেট ভরতে অন্য লোকটা এবার একটু বাচাল হয়েছে। বললে, "বাঁদরগুলোর সঙ্গে কাটিয়েছিলে ওদেশে? আমি নিজেও একবার গিয়েছিলাম ওখানে—কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। সেই যখন কলাম্বিয়া গোয়েন্দা দপ্তরে কাজ করতাম, তখন, ওই বাঁদর মানুষগুলো আমার হায়া বের করে দিয়েছিল। ওরা না হলে আমার সেই চাকরি আজও বজায় থাকত। তোমাকে বলছি সে'সব কথা।

"একদিন আমাদের চীফ দপ্তরে চিঠি দিলেন—ও'ডেকে এক্ষুনি এখানে পাঠিয়ে দাও, বড় রকমের কাজ আছে। সেসময় সংস্থার জটিল কাজে এই বান্দার ডাক পড়ত—সব সময় ভারী-ভারী কাজ। যেখান থেকে চীফের চিঠি এসেছিল তার ঠিকানা হল ওয়াল স্ট্রীট এলাকায়।

"যখন সেখানে পৌঁছোই, দেখি তিনি প্রাইভেট দপ্তরে, রীতিমতো উশ্‌খুশে দেখতে সব ডিরেকটররা তাঁর ঘরে। ব্যাপারটা ওঁরাই জানালেন। রিপাবলিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কেটে পড়েছেন নগদ একলাখ ডলার নিয়ে। ডিরেকটররা তাঁকে এখুনি ফেরত চান, তার চেয়েও বেশি করে চাই ওঁদের টাকাটা। ওঁরা বললেন ওটা ওঁদের প্রয়োজন। ওঁরা বুড়োর গতিবিধির সূত্র পেয়ে গেছেন একটা বিশেষ বন্দর অবধি—সেখান থেকে উনি একটা ভবঘুরে দক্ষিণ আমেরিকাগামী ফলপাকড়ের স্টীমার ধরেছেন সেদিন সকালেই, আর সঙ্গে গেছে তাঁর কন্যা আর একটি বড় চামড়ার থলে—পরিবার বলতে ওরাই নাকি তাঁর যথাসর্বস্ব।

"একজন ডিরেকটর তাঁর নিজের স্টীম-ইয়টে কয়লার স্টীম করে যাত্রার জন্য তৈরি রেখেছেন। সেটাই তুলে দিলেন আমার হাতে, আর যেমন খুশি চালাবার অধিকার। চার ঘন্টার মধ্যে ইয়টে চড়লাম, আর তাড়া করলাম ফলের জাহাজটার পেছনে। আমি পরিষ্কারই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম কোথায় বুড়ো ওয়ারফিলড্ যাবেন—ওটাই তাঁর নাম: জে. চার্চিল ওয়ারফিলড্। সে সময়ে প্রায় প্রত্যেকটা বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে আমাদের চুক্তি ছিল—এক বেলজিয়াম আর ওই কলা-রিপাবলিক আঞ্চুরিয়া ছাড়া। নিউইয়র্কে বুড়ো ওয়ারফিল্ডের কোনো ফোটোও পাওয়া যায়নি।—সেখানেই ছিল তাঁর চালাকি—কিন্তু আমার কাছে ছিল তার চেহারার বর্ণনা। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গের মহিলাকে তো যে-কোনো জায়গাতেই নির্ঘাত চিনে ফেলা যাবে। সে ছিল সমাজের উঁচু মহলের লোক—রবিবাসরীয় কাগজে যাদের ছবি বেরোয় সে ধাঁচের নয়—সত্যিকারের জাত যারা ক্রিসেন্থিমাম ফুলের প্রদর্শনী উদ্বোধন করে, জাহাজের নামকরণ করে।

"সে যা হোক্ সার, রাস্তায় একেবারে পাত্তাই পেলাম না ফলের জাহাজটার। সমুদ্র তো বড় জায়গা, বোধহয় আলাদা-আলাদা পথে চলছিলাম। কিন্তু ফলের জাহাজের লক্ষ্যস্থল ছিল আঞ্চুরিয়া, সেইদিকেই চলতে থাকলাম আমরাও।

"একদিন বিকেল চারটে নাগাদ গিয়ে পড়লাম বাঁদর সমুদ্রকূলে। ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা লজ্‌ঝরে স্টিমার, বড় বড় বজরায় করে বাঁদররা তাতে কলা বোঝাই করছে। বুড়োটা হয়তো এ জাহাজটাই ধরেছিল। আবার নাও হতে পারে তা। ডাঙায় উঠলাম চারদিকটা খতিয়ে দেখতে। জায়গার দৃশ্য তো মনোরম। নিউ ইয়র্কের নাট্যমঞ্চেও এমন সুন্দর দৃশ্য দেখিনি। সমুদ্রের তীরে একজন আমেরিকানের সঙ্গে দেখা। ঠাণ্ডা মেজাজের লম্বাচওড়া মানুষ, বাঁদরগুলোর সঙ্গে

দাঁড়িয়ে আছে। সে আমায় কনসালের দপ্তরটা দেখিয়ে দিল। কনসাল বেশ চমৎকার ছোকরা। সে বলল ফলের জাহাজটা হল "কার্লসেফিন", সাধারণত নিউ অর্লিয়ন্সে দৌড়োয়, তবে শেষ খেপে মাল পৌঁছে দিয়েছে নিউ ইয়র্কে। তখন আমি নিশ্চিত হলাম আমার আসামীরা ওই জাহাজেই, যদিও প্রত্যেকেই বলেছিল কোনো যাত্রীই নামেনি জাহাজ থেকে। অন্ধকার হবার আগে তারা নামবে বলে আমিও মনে করিনি, কারণ তারা আমার ইয়ট্‌টাকে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখে হয়তো সাহস পায়নি নামতে। তাই আমাব কাজ হবে সবুর করা, ওরা ডাঙায় এলে তবেই পাকড়াও করা। 'আসামী-ফেরত চুক্তির' কাগজপত্র না থাকলে তো তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না, তবে আমার কৌশল হবে নগদ টাকাটা ছিনিয়ে নেওয়া। সাধারণত ওসব লোক অবসন্ন, বিরক্ত বা বদমেজাজি হয়ে থাকলে তখনই যদি ওদের ওপর হামলা চালান তাহলে ধরা দেবে ওরা।

"সন্ধ্যা ঘনালে তটের ওপর একটা নারকোল গাছের নিচে খানিকক্ষণ বসি, তারপর একটু টহল দিয়ে সন্ধান চালাই শহরটায়। ও বাবা, এ তো সিংহের খাঁচা! কেউ যদি নিউ ইয়র্কেই সৎ ভদ্র হয়ে থাকতে পারে তো তাই করাই ভাল, এই বাঁদব শহরে হাজার টাকা খরচ করার চেয়ে।

"নিচু ছোট মাটির দেয়ালের ঘর; রাস্তায় হাঁটু সমান ঘাস; মহিলাবা নিচু-গলা ছোট-হাতা জামা পরে ঘুরছে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে; গেছো ব্যাংগুলো ভাঙা গাড়িব মতো তারস্বরে কাতরাচ্ছে; বড়-বড় পাহাড় থেকে খিড়কি উঠোনে নুড়ি-পাথরের ঢল; আবার সমুদ্র চেটে সাফ করে সামনের রংপালিশ—না সার, তার চেয়ে ভগবানের দেশে মাগ্না টিফিন খেয়ে থাকা বরং ভাল।

"সমুদ্রের বালিপাড় ধরেই চলে গেছে বড় সড়কটা, আমি তাই ধরে হেঁটে যাই। একটা গলি গোছের জায়গায় ঢুকি, সেখানে বাড়িগুলো বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি। দেখতে চাইছিলাম বাঁদবগুলো যখন নারকোল গাছে চড়ে না, তখন কী করে সময় কাটায়। একেবারে পয়লা ঝুপড়িটাতে উঁকি মারতেই দেখি আমার আসামীরা সেখানে। আমি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই ফাঁকেই নিশ্চয় ডাঙায় এসেছে। গোটা পঞ্চাশেক বছরের একটি লোক, কামানো মুখ, মোটা ভুরু, কালো মোটাকাপড়ের পোশাকে তাকে এমন দেখাচ্ছিল যেন এখুনি বলে উঠবেন: 'সাণ্ডে স্কুলের বাছারা কেউ এর জবাব দিতে পারবে?' হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন একটা গ্রিপ্‌ব্যাগ যার ওজন এক-ডজন সোনার বাঁটের মতো। আর একটি ফুটফুটে মেয়ে যেন টস্‌টসে পীচফল, ফিফ্‌থ এ্যাভিন্যুর পোশাকে—বসে আছে একটা কাঠের চেয়ারে। ওদের ঘরের আলোটা কেবল পেরেকে ঝোলানো একটা লণ্ঠনবাতি থেকে। আমি গিয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ালাম, ওরাও চাইল আমার দিকে। বললাম:

'মিঃ ওয়ারফিল্ড, আপনি আমার বন্দী। আশা করি এই মহিলার খাতিরে, সব ব্যাপারটা সুবুদ্ধির সঙ্গে নেবেন। আপনি জানেন কেন আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

"বুড়ো বললেন, 'কে তুমি?'

"বললাম, 'আমি ও'ডে, কলাম্বিয়া গোয়েন্দা সংস্থার। এবার স্যার আপনাকে একটা সদুপদেশ দিতে চাই। আপনি ফিরে চলুন, মরদের মতো প্রাপ্য সাজা নিন। চুরির মাল ওদের ফিরিয়ে দিন, হয়তো তারা আপনাকে অল্পের ওপরেই ছেড়ে দেবে। সহজভাবে চলুন, আমি আপনার হয়ে দুটো কথাও ওদের বলতে পারব। আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি সিদ্ধান্ত নিতে।'—বলে নিজের ঘড়ি বের করে সবুর করতে থাকি।

"এবার সেই যুবতী মহিলা ফোঁড়ন কাটলেন। একেবারে খাঁটি উচ্চমার্গের পথিক, সে তার পোশাকের ফিটিং আর স্টাইলেই বোঝা যায়, ফিফ্‌থ অ্যাভিন্যু যেন তারই জন্য খোলা।

"বললে, 'ভেতরে আসুন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ও-পোশাকে আর সারা ফ্ল্যাটে অশান্তি ডাকবেন না। এবার বলুন, কী চান আপনি।'

"বললাম, 'তিন মিনিট কেটে গেল। আরো দু'মিনিট কেটে যাক, তারপর বলব।...'

"আপনি যে রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট, তা তো স্বীকার করছেন?'

"তাতো বটেই', বললেন ভদ্রলোক।

"আমি বললাম, 'বেশ, তাহলে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা অতি সরল। নিউ ইয়র্কে ফেরত চাওয়া হচ্ছে রিপাবলিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রেসিডেন্ট জে. চার্চিল ওয়ারফিল্ডকে। ... তা ছাড়া উক্ত কোম্পানির তহবিল যা এখন ওই গ্রিপ্‌ব্যাগটায় আছে—উক্ত জে. চার্চিল ওয়ারফিল্ডের হেপাজতে—সেটাও।'

"যেন কোনো কিছু চিন্তা করেই মহিলা বললে, 'ওহ্‌-হো-হো! নিউ ইয়র্কে নিয়ে যেতে চান আমাদের?'

"হ্যাঁ, মিঃ ওয়ারফিল্ডকে। আপনার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ নেই মিস্। অবশ্য আপনি আপনার বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে চাইলে আপত্তি করা হবে না।'

"হঠাৎই মেয়েটি একটি ছোট্ট চিৎকার করে বুড়োর কাঁধ জড়িয়ে ধরল। গানের খাদের সুরের মতো বলল, 'ও বাবা, বাবা, এ কি সত্যি হতে পারে? যে টাকা তোমার নয় তাই তুমি নিয়েছ? কথা বল বাবা!'—গলার মধ্যে যে কাঁপুনির সুর তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

"মেয়েটি তাঁকে চেপে ধরতে প্রথমে বুড়োটাকে বেশ ঘাবড়ে-যাওয়া মনে হচ্ছিল। সে কিন্তু ফিসফিস করে বুড়োর কানে কিছু বলেই চলেছে আর তাঁর

পিঠ চাপড়াচ্ছে যতক্ষণ না উনি স্থির হয়ে দাঁড়ান। এদিকে সে ঘেমেও উঠেছে খানিকটা।

"মেয়েটি তাঁকে একটি দিকে টেনে নিয়ে দু'জনা মিনিটখানেক কিছু বলাবলি করল, তারপর উনি সোনার পাঁশনে নাকে এঁটে এগিয়ে এসে আমার হাতে ব্যাগখানা দিলেন।

"একটু যেন ভাঙা উচ্চারণে বললেন, 'মিঃ ডিটেকটিফ আমি স্থির করলাম আপনার সঙ্গে ফিরব। আমার বেশ বোঝা হয়ে গেছে এই বেয়াড়া নিঃসঙ্গ উপকূলে বেঁচে থাকা মানে মরণেরও অধম। আমি ফিরে গিয়ে নিজেকে সঁপে দেব রেপুবলিক কোম্পানির দয়ার ওপর। আপনি জাহাশ্ এনেছেন?'

"জাহাশ্ মানে?"

"জাহাজ' মেয়েটি মাঝে পড়ে বললে, 'মশ্করা রাখুন, বাবা জার্মান বংশের লোক, ভাল ইংরেজি বলতে পারেন না। আপনি এসেছেন কী ভাবে?'

"মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মুখে রুমাল ঢেকে কেবলই মাঝে মাঝে বলছে, ও বাবা, বাবা! আমার দিকে এগিয়ে এসে তার লিলিফুল-সাদা হাতখানা রাখল আমার জামার ওপর যেটা তার প্রথমে ভীষণ অপছন্দ হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, 'একটা ব্যক্তিগত ইয়টে চেপে এসেছি।

"মিঃ ও'ডে, ওঃ, আমাদের এক্ষুনি এই জঘন্য দেশ থেকে নিয়ে চলুন! পারবেন না! নেবেন তো'! বলুন নেবেন আমাদের!'

"বললাম, 'চেষ্টা করব।'———অথচ মনে-মনে জানি আমি মরিয়া হয়ে চাইছি আবার মন বদল করার আগেই যে-করে হোক ওদের নোনা সমুদ্দুরে নিয়ে তুলবই।

"কিন্তু একটা বিষয়ে ওরা দুজন জেদ করে বসেছে, কিছুতেই শহরের ভেতর দিয়ে জাহাজঘাটে যাবে না। বলছে লোক-জানাজানিতে ওদের ভীষণ আতঙ্ক। এখন তো ওরা ফিরে যাচ্ছেই। তাই এখনো ব্যাপারটা সংবাদপত্রের নাগালে যাবে না বলেই আশা রাখে। শপথ করে বলল, কেউ ঘুণাক্ষরে জানবে না এমন ভাবে তাদের ইয়টে পৌঁছে না দিলে তারা নড়বেই না। তাই ওদের খুশি রাখতে রাজি হলাম।

"যে খালাসিরা দাঁড় বেয়ে আমায় পাড়ে এনেছিল তারা সাগরের কাছেই একটা মদের দোকানে তখন বিলিয়ার্ড খেলছে আর হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই প্রস্তাব দিলাম, বোটটাকে ওদের দিয়ে পাড় ঘেঁষে আরো আধমাইলটাক সরিয়ে আনব, আমরাও চলে যাব সেখানে। এখন ওদের খবরটা দিই কী করে সেটাই প্রশ্ন, কারণ বন্দীর হাতে তো ব্যাগটা ছেড়ে যেতে পারি না, সঙ্গেও নিতে পারি না—কারণ বাঁদরগুলো অন্যায় কীসের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেবে তা তো জানি না।

"যুবতী মহিলা বলল, 'এদেশী বুড়ি স্ত্রীলোকটাই তো ওদের কাছে চিরকুট পৌঁছে দিতে পারে।' আমি বসে চিঠি লিখলাম, বুড়িকে সিধে বুঝিয়ে দিলাম কী করতে হবে, সে বেবুনের মতো দাঁত বের করে কেবলই মাথা নাড়তে লাগল।

"তখন মিঃ ওয়ারফিল্ড বিদেশী ভাষায় একগাদা কী সব বললেন তাকে, সে শুধু মাথা নাড়ে আর 'সী, সেনর' বলে— পঞ্চাশ বারই হবে—তারপর চিঠি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

"মিস্ ওয়ারফিল্ড আমার দিকে চেয়ে হাসে—'বুড়ি অগাস্টা শুধু জার্মানই বোঝে। আমরা ওর বাড়িতে এসে জানতে চাইছিলাম থাকার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে, তা ও পেড়াপিড়ি করতে লাগল কফি খাওয়ার জন্য। বলে, সান ডমিঙ্গোয় কোন্ জার্মান পরিবারে নাকি বড় হয়েছিল।'

"বললাম, 'তা খুবই সম্ভব, তবে আমি কিন্তু জার্মান কথা বুঝিই না। 'সী সিনর'টা তো আমি ফরাসীই ভেবেছিলাম!'

"যাক্ আমরা তিনজন তো শহরের কিনারা এড়িয়ে ঘাপ্‌টি মেরে চললাম যাতে কেউ দেখতে না পায়। আঙুরলতায় জড়িয়ে, ফার্ন আর কলা ঝোপে ঢুকে, এদেশের 'সিনারির' মধ্যে অনেক নাস্তানাবুদ হলাম। বাঁদর গাঁওগুলো সেন্টাল পার্কের মতোই বুনো। পাক্কা আধমাইল ছুটে তবে বেরিয়ে এলাম সাগরতটে। একটা বাদামি ছোকরা নারকোল গাছের নিচে শুয়ে ঘুম দিচ্ছিল, পাশে দশফুট লম্বা গাদা বন্দুক। মিঃ ওয়ারফিল্ড বন্দুকটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন সমুদ্রে, বললেন, 'এই ভাবে পাহারা দেয় এরা! তাই পাকা ফলের মতো বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রও পেকে ওঠে।' নড়নচড়নহীন ঘুমন্ত লোকটার দিকে আঙুল দেখান, 'এই ভাবেই তো বিশ্বাসের মান রাখে, বাছারা।'

"দেখলাম আমাদের বোট আসছে। আমি একটা ম্যাচকাঠি দিয়ে খবরের কাগজ জ্বালিয়ে ওদের ইঙ্গিত দিলাম কোথায় আমরা আছি। তিরিশ মিনিটের মধ্যে ইয়টে উঠে পড়লাম সবাই।

"প্রথম কাজই হল মিঃ ওয়ারফিল্ড, তাঁর মেয়ে আর আমি ব্যাগখানা নিয়ে ঢুকলাম মালিকের কেবিনে। ওটা খুলে একটা তালিকা করলাম সবকিছুর। ভেতরে ছিল এক লক্ষ পাঁচ হাজার ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী নোট, তাছাড়া প্রচুর হীরার গয়নাপত্র আর দুশো হাভানা চুরুট। বুড়োকে আমি সিগারগুলো দিয়ে দিলাম আর সেই সঙ্গে পুরো জিনিসের রসিদ, কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে। তারপর সবকিছু তালাবন্ধ করে রাখলাম আমার নিজের কামরায়।

"সেবারকার মতো আনন্দ আমি আর কোনো ভ্রমণযাত্রায় পাইনি। খোলা সমুদ্রে এসে যুবতী মহিলাটির যেন ফুর্তি আর ধরে না। প্রথম নৈশাহারে বসেই

যখন স্টুয়ার্ড তাকে শ্যাম্পেন ঢেলে দিল— ডিরেক্টরের ইয়টটা তো ছিল পুরোদস্তুর ভাসমান 'ওয়লডর্ফ-অ্যাস্টেরিয়া হোটেল'—সে আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'আরে মিস্টার মক্ষী সেপাই, ঝামেলা ডেকে লাভ কী? তার চেয়ে এখন আশা করা যাক যে-মুরগিটা আপনার কবর খুঁড়ছে তাকে খাবার জন্যই বেঁচে থাকুন আপনি!' জাহাজে একটা পিয়ানো ছিল। সেখানে বসেই গাইল এমন খাসা গান যা বার বার শুনতে আপনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করবেন। ন'খানা অপেরাগান তার একেবারে কণ্ঠস্থ। সত্যিকারের খানদানি, উঁচু জাতের। 'আরও যাহারা উপস্থিত' তাদের দলে সে নেই, বিশেষ উল্লেখ্যের তালিকাতেই সে থাকবে।

"পথ চলতে চলতে বুড়ো ভদ্রলোকও অদ্ভুতভাবে চাঙা হয়ে উঠেছেন। চুরুট এগিয়ে দিয়ে একবার ধোঁয়ার আড়াল থেকে বললেন, 'মিঃ ও'ডে, আমার যেন কেন মনে হচ্ছে রেপুবলিক কোম্পানি তেমন ঝামেলা করবে না আমার সঙ্গে। টাকার ওই গ্রিপভ্যালিস্টা ভাল করে নজরে রাখবেন মিঃ ও'ডে, যখন আসব তখন তো যাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।'

"নিউ ইয়র্কে নেমেই ফোন করলাম চীফকে, যাতে তিনি এসে আমাদের ডিরেক্টরের দপ্তরে মেলেন। একটা গাড়িতে চেপে আমরা পৌঁছে গেলাম সেখানে। আমি বয়ে নিয়ে গেলাম গ্রিপব্যাগ। আমরা ভেতরে ঢুকেছি, আমি খুশি হই দেখে যে চীফ সেই পুরনো টাকার পোকাগুলোকেই একজায়গায় এনেছেন যাদের গোলাপি গাল, দুধসাদা জামা, আমাদের সদলবলে প্রবেশ দেখতে এসেছে তারা। আমি গ্রিপব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখি। বলি, 'এই হল সেই টাকা।'

"আর তোমার বন্দী?'—শুধোন চীফ।

"মিঃ ওয়ারফিল্ডকে দেখিয়ে দিই, আর উনিও এগিয়ে এসে বলেন—'একটা কথা বলার মর্যাদা দেবেন, স্যার, কিছু ব্যাখ্যা করার আছে।'

"উনি আর চীফ আরেকটা কামরায় ঢোকেন, সেখানে দশ মিনিট কাটান, তারপর যখন তারা বেরিয়ে আসেন চীফের মুখখানা যেন একটন কয়লা!

"আমাকে বলেন—এই ভ্যালিস্টা কি এই ভদ্রলোকের জিম্মাতেই ছিল যখন তাঁকে প্রথম দেখলে?'

"আমি বললাম—'হ্যাঁ ওঁর কাছেই ছিল।'

"চীফ গ্রিপটা তুলে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে তুলে দিলেন বন্দীর হাতে, আর ডিরেক্টরদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের কেউ এই ভদ্রমহোদয়কে চিনতে পারেন?'

"ওরা সবাই গোলাপি মুখগুলো নাড়ল।

"তিনি বলেই চললেন, 'এবার আমায় সসম্মানে হাজির করতে দিন—সেনর মিরাফ্লোরেস, আঙ্কুরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে। সেনর বদান্যতা দেখিয়ে সম্মত

হয়েছেন এই মারাত্মক ভুলটাকে অগ্রাহ্য করতে, তবে এই শর্তে আমাদের মুচলেকা দিতে হবে যে কোনোরকম বিরক্তিকর প্রকাশ্য মন্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁকে আমরা সুরক্ষা দেব। ওঁর দিক থেকে এটা একটা বড় রকমের ছাড় যে একটা অপমান উনি উপেক্ষা করছেন যার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারতেন। আমার ধারণা এব্যাপারে আমরা তাঁকে গোপনীয়তা রক্ষার সকৃতজ্ঞ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

'ওরা সবাই মাথা নত করে 'গোলাপি' সমর্থন জানাল তাঁকে।

"চীফ আমাকে বললেন, 'ও'ডে, বাবা, প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরিতে তুমি একেবারে অচল। যুদ্ধের সময় যখন কোনো সরকারকে অপহরণ করা নিয়ম-সম্মত, তখন তোমার অসীম মূল্য হতে পারত। এগারোটার সময় আমার দপ্তরে এসো।'

"জানতাম এর মানে কী।

"বললাম, 'তাহলে উনিই ওই বাঁদরগুলোর প্রেসিডেন্ট, তা তিনি আগে সে কথা বললেন না কেন?'

'একটা বড় ধাক্কা খেয়ে যেতে না তুমি?'"

Two Recalls, এইন্‌স্‌লি, ১৯০১

ব্ল্যাকজ্যাকে দাঁও কষা

গোরি-কোলট্রেনদের ঝগড়ার অদ্ভুত পরিণতি

ইয়াঙ্কি গোরির উকিল-দপ্তরে সবচেয়ে দুর্নামের বস্তু গোরি স্বয়ং,—তাঁর পুরনো মচমচে আরামকেদারায় গা এলিয়ে পড়ে আছেন। লাল ইটের তৈরি পুঁইয়ে ধরা ছোট দপ্তরটা বাইরের রাস্তার বরাবর—বেথেল শহরের যেটা প্রধান সড়ক।

বেথেলের অবস্থান 'ব্লু রিজ' পাহাড়ের পাদদেশে। মাথার দিকের পাহাড়গুলো আকাশ অবধি স্তূপাকার। শহরের অনেক নিচে ঘোলা ক্যাটাওবা নদী নির্জন খাত বয়ে হলদে ঝিলিক দিয়ে চলেছে।

জুন মাসের দুপুরটা গুমোটের চূড়ান্ত। উষ্ণ ছায়ার মধ্যে ঝিমোয় শহর। কিন্তু ব্যবসা বন্ধ নেই। এমনই নিস্তব্ধ যে গোরি চেয়ারে হেলান দিয়ে পরিষ্কার শুনতে পান জুরিদের বড় কক্ষে টাকা ফেলার শব্দ—সেখানে "আদালতের বাবুরা" পোকার খেলছেন। অফিসের পেছনের খোলা দরজা থেকে একটা খয়ে যাওয়া পথ,

ঘুরে-ঘুরে গেছে আদালতবাড়ির ঘেসো আঙিনার ভেতর দিয়ে। ওই পথে হেঁটে-হেঁটেই গোরির সর্বস্ব যা ছিল সব গেছে—প্রথমে ক'হাজার ডলারের একটা উত্তরাধিকার, তারপর পুরনো পৈতৃক বাড়িটা, তারপর অবশেষে তাঁর আত্ম-সম্মান ও মনুষ্যত্ব যেটুকু বা ছিল তাও। 'বাবুদের দঙ্গল' একেবারে খেদিয়ে দিল তাঁকে। বিধ্বস্ত জুয়াড়ি মদ্যপ আর পরজীবী হয়ে দাঁড়ালেন; তারপর এদিনও দেখতে হল যখন তাঁর যথাসর্বস্ব খসিয়ে নিয়ে ভদ্রলোকরা তাঁকে খেলার আসরে একটা আসন পর্যন্ত দেয়নি। ওঁর কথার তখন আর দাম নেই। দৈনিক তাসের খেলায় সেভাবেই ব্যবস্থা হল যাতে তাঁকে শুধু নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় রাখা যায়। শেরিফ, জেলা করণিক, এক খেলোয়াড় ডেপুটি, একজন ফুর্তিবাজ এ্যাটর্নি, আর-"উপত্যকা থেকে"-আসা একটি ফ্যাকাশে-মুখ লোক টেবিল ঘিরে বসল, আর এইভাবেই নীরবে জানিয়ে দেয়া হল: 'লোমচাঁছা ভেড়া যেন এবার গিয়ে আরো লোম গজিয়ে আসে'।

সমাজচ্যুতিতে অতিষ্ঠ হয়ে একটু বাদেই গোরি ফিরে চললেন নিজের দপ্তরে—অপয়া পথটা টলতে-টলতে পেরুলেন আপনমনে বিড়বিড় করতে-করতে। টেবিলের তলা থেকে একটা গলা-সরু বোতল বের করে এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। আর, এক ধরনের ভাবপ্রবণ বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন গ্রীষ্মের ধোঁয়াশায় ডুবে-থাকা পাহাড়গুলোর দিকে। ব্ল্যাকজ্যাকের গা ঘেঁষে আরেকটু দূরে যে সাদা চিল্‌তেটা দেখতে পান সেটা হল লরেল,—ওই গ্রামেরই কাছাকাছি তিনি জন্মেছিলেন, বড়ও হয়েছিলেন। গোরি আর কোলট্রেনদের পারিবারিক কলহের জন্মস্থানও ওখানে। গোরি বংশের আর কোনো সরাসরি উত্তরাধিকারী এখন বেঁচে নেই—একমাত্র এই পালক-ছাড়ানো, ঝলসানো, হতভাগ্য পাখিটি ছাড়া। কোলট্রেনদের তরফেও একজন মাত্র পুরুষ প্রতিপালক জীবিত—কর্নেল এ্যাবনের কোল্‌ট্রেন, মানমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ, রাজ্য আইনসভার সদস্য, গোরির বাপের সমসাময়িক। কলহটা এ অঞ্চলের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য; ঘৃণা, অন্যায় আর হত্যার রক্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে ইতিহাসে।

কিন্তু ইয়ান্সি গোরি ঝগড়াঝাঁটির কথা ভাবছিলেন না। ওঁর বিভ্রান্ত মস্তিষ্ক ব্যর্থভাবে লড়ছে নিজের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদন আর প্রিয় বদভ্যাসগুলোর সমস্যা নিয়ে। সম্প্রতি পরিবারের পুরনো বন্ধুরা দেখছিলেন যাতে তিনি অন্তত কোথাও খাওয়াদাওয়াটা আর একটা শোবার জায়গা পান, তবে হুইস্কি তাঁরা কিনে দেবেন না মোটেই, অথচ হুইস্কি তাঁকে খেতেই হবে। ওঁর আইনের ব্যবসা তো গোল্লায় গেছে; দু'বছরে কোনো মামলাই হাতে পাননি তিনি। খালি ধার করেছেন আর মাতলামি করেছেন; আর মনে হয়, এর চেয়েও অধঃপতন যদি তাঁর না হয় সে নিতান্তই সুযোগের অভাবে। মনে-মনে ভাবছেন—আর একটা মওকা, শুধু

একটা বাজি যদি ধরতে পারেন খেলায়, তাহলে জিতে যাবেন। কিন্তু আর যে কিছু নেই তাঁর বেচার, বিশ্বাসের ওপর ধার পাবার সম্ভাবনাও একেবারেই নিঃশেষ।

এত দুঃখের মধ্যেও তাঁর হাসি পায় সেই লোকটার কথা ভেবে, যাকে ছ'মাস আগে তিনি বংশের পুরনো বসতবাড়িটা বেচে দিয়েছিলেন। পাহাড়ের কোন্ অজ 'পেছন-তল্লাট' থেকে দুটো অদ্ভুত প্রাণীর উদয় হয়েছিল,—একটি লোক, পাইক গার্ভে নামে, আর তার স্ত্রী। 'পেছন-তল্লাট' বলতে পাহাড়ের দিকে হাত নেড়ে দেখানো—পাহাড়ি অভিযাত্রীরা ওতে বোঝে একেবারে দূরতম প্রচ্ছন্ন জায়গাগুলো যেখানে অজানা গভীরতার গিরিসংকট, ফেরারীদের আস্তানা, নেকড়ের গুহা, আর ভালুকের 'গোঁসাঘর'-গুলো। ব্ল্যাকজ্যাক পাহাড়ের ওই উঁচু কাঁধের ওপর, আস্তানাগুলোর একেবারে বন্য অংশে এই আজব দম্পতিটি কুড়ি বছর ধরে বাস করছে। ওদের কুকুরও নেই, বাচ্চাকাচ্চাও নেই যে পাহাড়ের ওই ভারী নৈঃশব্দের মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য আনবে। বসত এলাকায় পাইক গার্ভেকে কেউ চেনেই না বলতে গেলে। তবে যাদের সঙ্গে তার খানিকটা পরিচয় হয়েছে তারা বলে, "বাতিকগ্রস্ত খ্যাপা"। কাঠবেরালি শিকার ছাড়া কোনো পেশাই তার কাছে পেশা নয়। তবে একেক সময় চিত্তবিনোদনের জন্য মদ চোলাইও করে। একবার 'রাজস্ব'বিভাগের লোকরা তাকে ডেরা থেকে টেনে বের করেছিল, সেও নিঃশব্দে মরীয়া টেরিয়ার কুকুরের মতো লড়েছে কিন্তু রাজ্য জেলে দু'বছর কাটাতে হল তাকে। ছাড়া পেয়ে আবার সে ক্ষিপ্র ভামের মতো নিজের গর্তে এসে মাথা তুলল।

প্রতীক্ষমান বহু ভক্তকে উপেক্ষা করে একদিন ভাগ্যদেবী হুট্ করে নেমে এলেন ব্ল্যাকজ্যাকের বুনো খানাখন্দে,—পাইক আর তার অনুগতা সহকর্মিণীর ওপর প্রসন্ন হাসি বিলোতে।

একদিন চশমা-আঁটা, নিকারবোকার পরা, একেবারেই বেয়াড়া দেখতে একদল ধাতু-সন্ধানী এসে হামলা করল গার্ভের কুটিরের কাছে। পাইক ওদের 'রাজস্বের লোক' মনে করে হুক্ থেকে নামিয়ে নিল কাঠবেরালি-মারা বন্দুক, দূর থেকে একটা গুলি ছুঁড়ল ওদের লক্ষ্য করে। কপাল ভাল তাক ফস্কে গিয়েছিল, তাই সৌভাগ্যের অজানিত নিরীহ দালালরা কাছে এগিয়ে আসে, তারা যে আইন বা ন্যায়ের রক্ষক নয় সেটাও পরিষ্কার হয়। পরে তারা গার্ভেকে দিতে চাইল তৈরি, সবুজ কড়কড়ে নোটে এক বিশাল টাকার অঙ্ক,—বদলে চাইল ওর তিরিশ একর সাফ-সুতরো জমিটা কিনতে। এরকম উন্মাদ প্রস্তাবের অজুহাত হিসেবে কিছু উদ্ভট এলোমেলো যুক্তিও দেখাল,—ওই জমির নিচে নাকি অভ্রের খনি আছে।

গার্ভেদের হাতে যখন অতগুলো ডলার এল, যা ওরা ভাল করে গুনতে হিমসিম খায়, তখন ব্ল্যাকজ্যাকের জীবন ক্রমেই বেশি করে অসম্পূর্ণ মনে হতে

লাগল তাদের। পাইক বলতে শুরু করল নতুন জুতো, ঘরের কোণে তামাকরাখা বাক্স, আর রাইফেলের নতুন লকের কথা। পাহাড়ের পাশে একটা বিশেষ জায়গায় মার্টেলাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখাল কেমন করে সেখানে একটা ছোট কামান বসানো যায়—টাকার ভাবনা কী যখন এত টাকা আছে। ওখানে কামানটা বসালে ওদের কুটির পর্যন্ত গোটা রাস্তাটা নজরে রেখে রক্ষা করা সম্ভব। তাতে চিরকালের মতো 'রাজস্ব'-ওয়ালা আর উটকো আগন্তুকগুলো বিভ্রান্ত হয়ে থাকবে।

কিন্তু ঈভকে বাদ দিয়েই হিসেবে করেছে আদম। এসব জিনিস গার্ভের কাছে অর্থের বাস্তব প্রয়োগ, কিন্তু তার খুপরি কুটিরে ঘুমোচ্ছে এক উচ্চাভিলাষ যা তার ছিঁচকে অভাব-অভিযোগের অনেক উঁচু দিয়ে চলে। শ্রীমতী গার্ভের বুকের মধ্যে এখনো বেঁচে আছে একটি নারী-অন্তর যা কুড়ি বছরের ব্ল্যাকজ্যাকের জীবনও একেবারে ঘুচিয়ে দিতে পারেনি। এত বছর ধরে সে শুধু কানে শুনেছে দুপুরবেলায় স্কেলিবার্ক গাছের ছাল খসার শব্দ, আর রাতে পাহাড়ের মধ্যে নেকড়েদের গান—এতেই তার অভিমান অহংকার উধাও হয়ে গেছে। মোটা আর বিষণ্ণ হয়েছে সে, ফ্যাকাশে আর বোকা-বোকা। কিন্তু সঙ্গতি যখন এলই, সে এবার টের পায় নতুন করে জ্বলে-ওঠা আকাঙ্ক্ষা—নারীত্বের বাড়তি পাওনাগুলো পেতে হবে যে—যেমন চায়ের টেবিলে বসা, অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা। সামান্য আড়ম্বর আর সজ্জা দিয়ে জীবনের কদাকার সত্যের ওপর চুনকাম করতে হবে। তাই সে শীতলভাবে বাতিল করে দিল পাইকের দুর্গ তৈরি করার প্রস্তাব, ঘোষণা করল ওরা বরং বাইরের দুনিয়ার মধ্যে নেমে আসবে, সমাজে চক্কর কাটবে।

আর শেষ পর্যন্ত সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, কাজটাও করা হল। মিসেস্ গার্ভের বড়সড়ো কোনো উপত্যকা-শহরে থাকার ঝোঁক, আর পাইকের আদিম নির্জনতার জন্য আকুতির শেষ নিষ্পত্তি হল 'লরেল' গ্রামটি বেছে নেওয়া। মার্টেলার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মানিয়ে লরেল নিবেদন করল হাল্‌কা সামাজিক চিত্তবিক্ষেপের প্রথম বাধো-বাধো পরিক্রমা। আর পাইকেরও নেহাৎ অপছন্দ হল না, কারণ পাহাড়গুলো একেবারে কাছে; ফ্যাশনদুরস্ত সমাজে থেকে একান্ত যুক্তিযুক্ত বুঝলে সে হঠাৎই আশ্রয় নিতে পারে পাহাড়ে।

ইয়াঙ্কি গোরির যখন প্রবল বাসনা নিজের সম্পত্তির বিনিময়ে কিছু নগদ টাকা কামানো, ঠিক সেই সময়েই গার্ভেরাও নেমে এসেছিল লরেল গ্রামে। তারা অপব্যয়ীর কাঁপা হাতে নগদ চার হাজার ডলার গুঁজে দিয়ে কিনে নিল বুড়ো গোরির বাস্তুভিটে। অতএব ঘটনাটা যা ঘটল—ঝগড়ার শেষে যে-ইয়ারদের তিনি গিলিয়েছিলেন তাদেরই ঘৃণার পাত্র হয়ে বংশের শেষ নিন্দিত গোরিটি যখন তাঁর কলঙ্কিত দপ্তরে লম্বমান, সে সময়ে তাঁর বাপ-পিতামোর বসত-ঘরে বাস করছে কটি অজানা অচেনা মানুষ।

তপ্ত খটখটে রাস্তা ধরে একটা ধুলোর মেঘ ধীরে-ধীরে গড়িয়ে আসছিল, মাঝখানে সচল কোনো বস্তু। সামান্য হাওয়াতে ধুলো-মেঘটা একপাশে একটু সরে যেতে দেখা গেল একটা নতুন ঝক্‌ঝকে রং করা ঘোড়ার গাড়ি। একটা অলস ধূসর ঘোড়া গাড়িটাকে টানছে। গোরির দপ্তরের কাছাকাছি আসতে গাড়িটা রাস্তার মাঝখান ছেড়ে সোজাই দাঁড়াল নর্দামার কিনারায়, গোরির দরজার মুখোমুখি।

সামনের আসনে কালো মোটা সুতির পোশাকপরা রোগাটে লম্বা চেহারার একটি লোক। আড়ষ্ট হাতদুটো হলদে চামড়ার দস্তানায় পোরা। পেছনের আসনে বসে একজন মহিলা, জুনের খর উত্তাপকেও যেন জয় করেছে। মোটা শরীরে একটা ত্বক্‌লগ্ন সিল্কের পোশাক, যাকে বর্ণনা করা হয় 'রূপান্তরী' বলে—রং বদলের জাঁকালো মিশ্রণ। অতি-সজ্জিত একটা পাখা নাড়তে-নাড়তে সোজা বসে সামনে চেয়ে রয়েছে পাথরের মতো স্থির চোখ মেলে। মার্টেলা গার্ভের হৃদয় নতুন জীবনের আনন্দে যতই বিভোল হোক, ব্ল্যাকজ্যাক তার বহিরবয়বের সর্বনাশ করে দিয়েছিল। অন্তঃসারহীন শূন্যতা দিয়ে বুঝি খোদাই করেছিল তার মূর্তি; দুরারোহ পাহাড়চূড়ার অচলতা দিয়ে, আর নির্বাক অন্তঃরাজ্যের গাম্ভীর্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল তাকে। আশপাশে যাই ঘটুক না কেন, সে সর্বদাই যেন শুনতে পায় পাহাড়ের ধারে স্কেলিবার্কগুলোর পাতা আর বাকল ঝরা। কেবলই শুনতে পায় নিস্তব্ধতম রাতের মধ্যেও ব্ল্যাকজ্যাকের ভয়াবহ নীরবতা আওয়াজ করে চলেছে।

প্রথমে গোরি এই সজ্জিত গাড়িঘোড়ার আগমন তাঁরই দরজার কাছে—দেখে সামান্যই উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন শীর্ণচেহারার চালক নিজের চাবুকটায় লাগাম জড়িয়ে বেয়াড়া ভঙ্গিতে নেমে এল, আর ঢুকল এই দপ্তরেই, উনি টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালেন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। পাইক গার্ভেকে চিনতে পেরেছেন এবার—আনকোরা বদলে-যাওয়া, হালে সুসভ্য হয়েছে।

গোরির এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসল পাহাড়বাসী। যারা গার্ভের মনের প্রকৃতিস্থতা নিয়ে সন্দেহ করে তারা কিন্তু বক্তব্যের কড়া সমর্থন পাবে লোকটার মুখমণ্ডলে। মুখখানা একটু বেশি লম্বা, রং বিবর্ণ জাফরানি, আর পাথরের মূর্তির মতো অনড়। গোল-গোল পলকহীন চোখ হাল্‌কা নীল, সে চোখে পাতা নেই বলে ভয়ঙ্কর মুখে যোগ হয়েছে কেমনতরো একটা স্বাতন্ত্র্য। তার আগমনের কারণ না বুঝতে পেরে গোরি হতভম্ব হন।

জিজ্ঞেস করেন, 'লরেলের সব কিছু ঠিক আছে তো, মিঃ গার্ভে?'

'সবকিছু ঠিক আছে স্যার, মিসিস গার্ভে আর আমি জমিজমা নিয়ে মহা খুশি। আপনার সাবেক বাড়ি মিসিস গার্ভের পছন্দ, আশপাশের সবই। সমাজও তাই, উনি যা চান, সবই পেয়ে যাচ্ছেন। রজার্সরা, হ্যাপগুডরা, প্র্যাট, ট্রয় সবাই মিসিস গার্ভেকে দেখে গেছেন, উনিও বেশির ভাগ বাড়িতেই নেমন্তন্ন

খেয়েছেন। সেরা আদমিরা তাঁকে ভালো ভালো কাজে ডেকেছেন। মিঃ গোরি, আমি কিন্তু বলতে পারি না এসব আমার মনের মতো কিনা—আমার হল ওই যে ওখানে—' গার্ভের বিশাল হলদে দস্তানা-পরা হাতটা পাহাড়ের দিকে দেখায়—'ওইখানে হল আমার আসল জায়গা, বুনো মৌমাছি আর ভালুকদের মাঝে। কিন্তু আমি সে কথা বলতে আসিনি, মিঃ গোরি। আপনার এমন একটা জিনিস আছে যা আমি আর মিসিস গার্ভে কিনতে চাই।'

'কিনবেন!' প্রতিধ্বনি তোলেন গোরি, 'আমার কাছ থেকে?' কর্কশ সুরে হাসেন, 'আমার মনে হয় আপনারা ভুল করেছেন। আমি আপনাকে—আপনার নিজের কথাতেই 'আগাপাস্তালা' বেচে দিয়েছি, এখন তো কুটোটাও বেচবার নেই।'

'আপনার সেটা আছে, আর আমরা তা কিনতে চাই। মিসিস্ গার্ভে বললেন—এই ট্যাকা নিয়ে যাও, আর জিনিসটা নেয্য দামে কিনে ফেল।'

গোরি মাথা নাড়েন। 'ভাঁড়ারে কিছুই নেই', বলেন তিনি। পাহাড়বাসী লক্ষ্যে স্থির। সে বলেই চলে, 'আমরা অনেক অনেকটা উঠেছি। ইঁদুরের মতো ভিকিরি ছিলাম, এখন রোজই মানুষ ডেকে ঘরে খাওয়াতে পারি। মিসিস্ তো বলেন আমরা এখন সেরা সমাজে পরিচয় পাচ্ছি। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের চাই, যা আমাদের নেই। মিসিস্ বলেন বিক্রির তালিকার মধ্যে ওটা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু থাকেনি। তিনি বলছেন, এই নাও ট্যাকা, নেয্য দামে কিনে নাও জিনিসটা।'

গোরির বিধ্বস্ত স্নায়ু অধীর হয়ে ওঠে। বলেন, 'বলেই ফেলুন না কী?'

গার্ভে তার চওড়া কানাওয়ালা টুপিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেয়। সামনে ঝুঁকে নিষ্পলক চোখজোড়া গোরির চোখে রেখে ধীরে পরিষ্কার উচ্চারণে বলে—'একটা পুরনো ঝগড়া আছে বটে আপনাদের আর কোলট্রেনদের মধ্যে।'

গোরি একটা অলক্ষুণে ভ্রূকুটি করেন। পাহাড়ের আদবকেতায় কোনো কলহপর ব্যক্তির সামনে তার কলহের কথা উচ্চারণ করাও ভয়ানক দোষের। তা এই "পেছন-তল্লাটের" লোকটি যেমন জানে, উকিলও তেমনি জানেন।

লোকটা বলতে থাকে, 'অপরাধ নেবেন না, নিছক ব্যবসার কথাই বলছি। মিসিস্ গার্ভে কলহ-বিবাদ নিয়ে অনেক কিছু জেনেছেন। পাহাড়ের বেশির ভাগ উঁচুমানের লোকদেরই ওটা আছে। সেট্লরা আর গোফোর্থরা, র‍্যাঙ্কিনরা আর বয়েডরা, সাইলার বংশ আর গ্যালোয়ে বংশ ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন কুড়ি থেকে একশো বছর ধরে। আপনাদের বিবাদ বছর কুড়ি পুরনো। শেষ লোকটা নিপাত হল যখন আপনাদের কাকা জজ পেইস্লে গোরি—কোর্ট স্থগিত রেখে বেঞ্চ থেকেই লেন কোলট্রেনকে গুলি করে মারলেন। মিসিস গার্ভে আর আমি এসেছি গরিব সাদা ওঁচাদের বংশ থেকে। আমাদের সঙ্গে তো ঝগড়া বাধাবার কেউ

ছিল না, গেছো ব্যাঙের পরিবারের সঙ্গে কীসের ঝগড়া! মিসিস্ বলেন উঁচু মানের লোকরাই সর্বত্র ঝগড়া পোষেন। আমাদের তো উঁচু মান নেই, কিন্তু যতটা পারি পয়সা খর্চা করে এর মধ্যে ঢুকছি। মিসিস্ বললেন, তাহলে ট্যাকাটা নিয়ে যাও মিঃ গোরির ঝগড়া-বিবাদ নেয্য দামে কিনে ফ্যালো।'

কাঠবেরালি-শিকারী ঘরের আধাআধি লম্বা করে দিল পা। পকেট থেকে এক বাণ্ডিল নোট বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর।

'ওর মধ্যে দুইশো ডলার আছে, মিঃ গোরি। যে ঝগড়াটা আপনারা চালিয়ে যেতে দিচ্ছেন তার জন্য নেয্য দাম। আপনার দিকে এখন তো রয়েছেন শুধু আপুনি। আর আপনাকে মারলে সেটা আবার মারা হল! আপুনার ঝগড়া আমি হাতে নিচ্ছি, এতে আমি আর মিসিস গার্ভে উঁচু মানের সারিতে উঠব। এই নিন ট্যাকা।'

টেবিলের ওপর ধীরে ধীরে দলা-পাকানো নোটগুলোর পাক খুলে যাচ্ছে, ভাঁজ শিথিল হতে মোচড় দিয়ে লাফিয়ে উঠছে যেন। গার্ভের শেষ কথাগুলোর পর, নীরবতার ভেতর দিয়েই পরিষ্কার শোনা যায় আদালত বাড়ি থেকে পোকার খেলার 'চিপ্' ছোঁড়ার শব্দ। গোরি টের পান শেরিফ এইমাত্র একটা মোটা দান জিতেছেন, তাই ওঁর চাপা গলার বিজয়ধ্বনি আঙিনার ভেতর দিয়ে ভেসে এল কড়া গরম হাওয়ায়। গোরির কপালে ঘামের ফোঁটা দাঁড়িয়ে গেছে। নিচু হয়ে টেবিলের তলা থেকে বেতে-মোড়া বোতলটা তুলে নিলেন, একটা পাত্রে তা থেকে ঢাললেন কিছুটা।

'একটু চলবে মিঃ গার্ভে? অবশ্য আপনি তামাশাই করছিলেন—কী নিয়ে যেন! বেশ একটা নতুন ব্যবসার বাজার খুলে যেতে পারে, তাই না? সেরা জাতের বিবাদ—আড়াইশো থেকে তিনশো, বিবাদ, একটু চোট্ খেয়ে থাকলে—দু'শো। তাই তো বললেন, মিঃ গার্ভে?'

গোরি আত্মসচেতনভাবে হাসলেন।

তাঁর দেওয়া পাত্রটা হাতে নিলে পাগড়বাসী, চেয়ে-থাকা চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে হুইস্কিটা গলায় ঢাললে। ঈর্ষাতুর বিস্ময়ের চোখে উকিল তার কৃতিত্বের তারিফ করেন। নিজের পাত্রটা ভরে নিয়ে তিনি মাতালের মতো ঢোঁকে ঢোঁকে গেলেন, আর শিউরে ওঠেন গন্ধে আর স্বাদে।

গার্ভে ফের বলল, 'দুই শো, ওই রইল ট্যাকা।'

একটা আচম্বিত আবেগ জেগে উঠল গোরির মাথায়। তিনি টেবিলের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করলেন। নোটগুলোর একটা পিছলে পড়ে ওঁর হাত স্পর্শ করেছে। যেন কিছু কামড়েছে এইভাবে কুঁচকে গেলেন তিনি। চেঁচিয়ে উঠলেন —'আপনি কি সত্যি সত্যিই আমার কাছে এরকম একটা হাস্যকর, অপমানজনক, গর্দভের মতো প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন?'

'এ তো পুরোপুরি নেয্য।' বলল কাঠবেরালি শিকারী। তারপর যেন টাকাটা ফিরিয়ে নেবার জন্যই হাতটা বাড়াল। আর তখনই গোরি বুঝলেন তাঁর নিজের ক্রোধাবেগটা কোনো অহংকার বা আপত্তি থেকে নয়, আসলে তা নিজের ওপর রাগ থেকেই, কারণ উনি জানেন, যে-প্রলোভন আসছে তাতে তিনি আরো বেশি তলিয়ে যাবেন নিচে। মুহূর্তের মধ্যে একজন অপমানিত ভদ্রলোক থেকে ভোল পালটে তিনি হয়ে গেলেন নিজের সেরা মালটির তারিফে উদগ্রীব দর-কষা দোকানী।

লাল মুখ করে, জড়িয়ে-যাওয়া জিভে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করবেন না গার্ভে, আপনার প-প-প্রস্তাব আমি মেনে নিচ্ছি, যদিও দুশো বড় শস্তা হল। একটা ব্যা-ব্যা-ব্যবসা তখনই যথার্থ যখন কে-ক্রেতা আর বে-বিক্রেতা দুজনেই স্-সন্তুষ্ট। তাহলে কি এটা গ্-গুছিয়েগাছিয়ে লিখে দেব, মিঃ গার্ভে?'

গার্ভে উঠে তার মোটা পোশাক ঝাড়ল। 'মিসিস গার্ভে বড় খুশি হবেন। আপুনি হাওয়া হয়ে যান এবার, থাকুক শুধু কোলট্রেন আর গার্ভে। মিঃ গোরি, আপুনি তো উকিল, শুধু একটু কাগজে লিখে দেওয়া, যাতে দেখানো যায় আমরা কেনাবেচা করেছি।'

গোরি তৎক্ষণাৎ একটা কাগজ আর কলম তুলে নিলেন। ওঁর ঘর্মাক্ত হাতে টাকাটা আঁকড়ানো। বাকি সবকিছুই হঠাৎ যেন হাল্কা আর মামুলি মনে হয়।

'বিক্রি কবালা তো বটেই! "অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, এবং চিরকাল তাহা ..... ও ভোগ করিবার অনুমতি—" না, গার্ভে, 'রক্ষা' কথাটা আমাদের বাদ দিতে হবে' বলে উচ্চকণ্ঠে হাসলেন গোবির, 'এ স্বত্ব রক্ষা নিজেকেই করতে হবে আপনার।'

উকিলের দেওয়া সেই অদ্ভুত দলিলটাই হাতে তুলে নিল পাহাড়বাসী, অনেক মেহনত করে ভাঁজ করল, তারপর সাবধানে রাখল নিজের পকেটে।

গোরি জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন 'এখানটাতে আসুন।'— আঙুল তুলে দেখালেন, 'আপনার সদ্য কেনা শত্রুটিকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই সে, রাস্তার ওধার দিয়ে যাচ্ছে।'

জানলা দিয়ে উকিলের দেখানো দিকটা দেখতে গিয়ে লম্বা দেহের কাঠামোটা ভাঁজ করতে হল গার্ভেকে। ঋজু হৃষ্টপুষ্ট দেহের ভদ্রলোক কর্নেল এ্যাবনের কোল্ট্রেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, দক্ষিণী আইনজ্ঞদের মতো অপরিহার্য লম্বা ডবল-বোতাম ফ্রককোট পরনে আর মাথায় সাবেকী উঁচু সিল্কের টুপি—হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তার অপর দিকের ফুটপাত ধরে। গার্ভে যখন তাকিয়ে আছে, গোরি ওর মুখখানা চেয়ে দ্যাখেন। হল্দে নেকড়ে বলে যদি কিছু থাকে তো এই হল তার জুড়িদার। সচল মানুষটাকে অমানুষিক চোখের দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করার সময় তার লম্বা পিঙ্গল শ্ব-দন্ত বেরিয়ে পড়েছে।

'ওই বুঝি সে? আরে ও লোকটাই তো আমায় একবার জেলখানায় পাঠিয়েছিল!'

গোরি উদাসীনভাবে বললেন, 'এক সময় জেলা এ্যাটর্নি ছিল। হ্যাঁ একটা কথা, ও কিন্তু পয়লা শ্রেণীর লক্ষ্যভেদী।'

'আমি একশো গজ দূর থেকেও কাঠবেরালির চোখ ভেদ করতে পারি', বললে গার্ভে, 'তাহলে উনিই হলেন কোলট্রেন! আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও এ যে ভাল কেনা-বেচা হল। আমি এ ঝগড়ার দায়িত্ব নেব। মিঃ গোরি, আপনি যদ্দূর করেছিলেন তার চেয়ে ভাল ভাবে নেব!'

ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু একটু সবুর করল ফাঁপরে-পড়া ভাব করে।

'আজ আরো কিছু বাকি আছে নাকি?'—জিভ-জড়ানো ব্যঙ্গের সুরে গোরি প্রশ্ন করলেন, 'কোনো পারিবারিক ঐতিহ্য, কি পূর্বপুরুষের ভূতপ্রেত, কিম্বা কুলুঙ্গিতে কঙ্কাল? একেবারে শস্তার শস্তায় ছেড়ে দেব।'

অটল কাঠবেরাল-শিকারী জবাব দিল, 'আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা মিসিস্ গার্ভে ভেবেছিলেন। এটা ঠিক আমার লাইনে অবিশ্যি নয়, তবে উনি বিশেষ করে চেয়েছিলেন আমি জিগ্যেস করি—আর যদি আপুনি রাজি থাকেন তো 'দাম দিয়ে দেব', বললেন উনি. 'নেয্য দাম'। মিঃ গোরি, আপনি তো জানেন আপনার পুরনো জায়গায়, সিডার গাছের তলায়, একটা কবর দেবার জমি আছে। ওখানেই তো রয়েছে আপুনার আপুন জন যাঁরা কোলট্রেনদের হাতে মরেছে। স্তম্ভে তাদের নাম লেখা আছে। মিসিস্ গার্ভে বলেন, উঁচু মানের নির্ঘাত নমুনাই হল পারিবারিক কবরস্থান। উনি বলেন যদি আমরা বিবাদটা পেয়ে যাই, তাহলে সঙ্গে অন্য কিছুও পাওয়া উচিত। স্তম্ভগুলোর ওপর নাম আছে 'গোরি'দের, কিন্তু সেগুলো আমাদের নামে বদল করা যাবে যদি—'

'যান! যান!—মুখ বেগুনে করে চেঁচান গোরি। পাহাড়বাসীর দিকে দুটো হাতই বাড়িয়ে দেন, আঙুলগুলো কুঁকড়ে, আর কাঁপতে-কাঁপতে—'যান! পিশাচ কোথাকার! একজন চি-চিনাম্যানও তার পূর্বপুরুষদের স-সমাধি বাঁচায়—বিদায় হোন্।'

কাঠবেরাল-শিকারী ঝুঁকে পড়ে দরজা দিয়ে ছুটে যায় তার ঘোড়ার গাড়িতে। সে যখন চাকা বেয়ে উঠছে, গোরি অস্থির তৎপরতার সঙ্গে তুলে নিচ্ছিলেন তার হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে-যাওয়া টাকাগুলো। গাড়ি যখন ধীরে ধীরে উল্টোদিকে মুড়ে গেল, ভেড়া তখন নতুন-গজানো লোমের জামা পরে ছুটছে অভদ্র গতিতে, আঙিনা-পথ ধরে আদালত বাড়ির দিকে।

ভোর তিনটে নাগাদ ওরা ওঁকে ফিরিয়ে আনল নিজের দপ্তরে— সর্বস্ব খসানো, অচৈতন্য। শেরিফ, খেলোয়াড় ডেপুটি, জেলা করণিক, আর ফুর্তিবাজ অ্যাটর্নি

তাকে বয়ে এনেছেন, আর সেই ফ্যাকাশে-মুখ 'উপত্যকা'র লোকটা ছিল ওঁদের সঙ্গী।

'টেবিলের ওপরেই রাখো হে', ওঁদের একজন বললেন, আর সবাই ওঁকে নামিয়ে দিলেন ওঁর বেকার বইপত্র আর কাগজ ছড়ানো টেবিলটার ওপর।

শেরিফ কী ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'মদে চুর হয়ে ইয়াঙ্গ একজোড়া 'দুরি'কেই মস্ত তাস মনে করে।'

ফুর্তিবাজ অ্যাটর্নি বলেন, 'বড্ড বাড়াবাড়ি। এত মদ খেয়ে কারুর পোকার খেলা উচিতই নয়। জানি না আজ কত বাজি ধরেছিল।'

'দুশোর কাছাকাছি। শুধু ভেবে অবাক হচ্ছি টাকাটা পেল কোথায়। এক মাসের ওপর তো কানাকড়িও ছিল না ওর।'

'হয়তো কোনো মক্কেল পাকড়েছিল। চল হে, ভোরের আলোর আগেই ঘরে ফিরে যাই। একবার জেগে উঠলে ঠিক হয়ে যাবে, শুধু মাথার খুলিতে একটু মৌচাকের ভোঁ ভোঁ।'

উষার আলোর মধ্যে গোটা দলটাই কেটে পড়ে। এর পরে যে চোখ মেলে চায় হতভাগ্য গোরির দিকে, সে দিনের সূর্য। পর্দাহীন জানলার ভেতর দিয়ে উঁকি দেয় সে, প্রথমে নিদ্রিতকে হাল্কা সোনার বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটু পরেই তাঁর বিচিত্র রাঙা শরীরের ওপর ঢেলে দেয় সন্ধানী শুভ্র গ্রীষ্মতাপ। গোরি অর্ধসচেতন হয়ে নড়েচড়ে ওঠেন টেবিলের লণ্ডভণ্ড স্তূপের মধ্যেই, মুখ ফেরান জানলার দিকে। ওঁর নড়াতে একটা ভারী আইনের কেতাব বিচ্যুত হয়ে মেঝের ওপর সশব্দে পড়ে। চোখ খুলে উনি দেখেন একজন কালো ফ্রককোট পরা মানুষ ওঁর ওপর ঝুঁকে আছে। আরো একটু ওপরে চোখ তুলতে আবিষ্কার করেন একটা বহুব্যবহৃত সিল্কের টুপি, আর তার ঠিক নিচেই কর্নেল এ্যাবনের কোলট্রেনের শান্ত সদয় মুখশ্রী।

ফলাফল সম্পর্কে একটু দ্বিধান্বিত কর্নেল, সবুর করছিলেন অন্য ব্যক্তি চিনতে পারার কোনো ইঙ্গিত দেন কিনা বুঝতে। কুড়ি বছরের মধ্যে এই দুই পরিবারের কোনো পুরুষ শান্তিতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়নি। দর্শনপ্রার্থীর দিকে ঝাপসা দৃষ্টি জোর করে ফেরাতে গিয়ে গোরির চোখের পাতাদুটো কুঁচকে ওঠে। তারপর তিনি প্রশান্তভাবে ঈষৎ হাসেন।

শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'স্টেলা আর লুসিকেও নিয়ে এসেছ নাকি খেলতে?'

'তুমি আমায় চিনতে পার, ইয়াঙ্কি?'—কোলট্রেন শুধোন।

'নিশ্চয় চিনি— তুমি আমায় একটা চাবুক দিয়েছিলে, ডগায় হুইসেল-বাঁশি লাগানো।'

তা তো তিনি দিয়েছিলেন—চব্বিশ বছর আগে! তখন ইয়াঙ্কির বয়েস ছয়, আর ইয়াঙ্কির বাপ ছিলেন তাঁর সেরা বন্ধু।

গোরির চোখ কামরার চতুর্দিকে কিছু খোঁজে। কর্নেল বুঝতে পারেন। বলেন, 'চুপ করে শুয়ে থাক, এনে দিচ্ছি।' আঙিনায় একটা জলের কল আছে। গোরি চোখ বুজে গভীর আনন্দে শোনেন কলের হাতলের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ, আর উথলে ওঠা জলের কল্‌কলানি। কোলট্রেন একটা কুঁজোতে ঠাণ্ডা জল এনেছেন। তুলে ধরলেন তাঁকে জলটা খাওয়াবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে গোরি উঠে বসেন.— চূড়ান্ত একাকী মানুষটি. এদিকে ওঁব হলদে গ্রীষ্ম স্যুটখানা নোংরা. কোঁচকানো; মূল্যহীন মাথাটা অস্থির, উস্কোখুস্কো। চেষ্টা করলেন কর্নেলের দিকে এক হাত নেড়ে স্বাগত জানাতে।

'আমায় ক্ষ-ক্ষমা কোরো সবকিছুর জন্য—করবে তো? কাল রাতে বোধহয় বেশি রকম হুইস্কি খেয়ে ফেলেছিলাম, তারপর টেবিলেই শুয়ে পড়েছি।'—একটা ধাঁধায় পড়া ভ্রূকুটিতে কুচঁকে গেল কপাল।

কোলট্রেন নরম সুরে শুধোলেন, 'ছোকরা ইয়ারদের সঙ্গে বুঝি একটু বেবিয়ে পড়েছিলে?'

'না, না, কোথাও যাইনি। গত দু'মাস ধরে পকেটে একটা ডলারও নেই খরচ করার মতো। ওই যেমন হয় আর কি. অফিসে-রাখা বোতলটা থেকে ঘন-ঘন খেয়েছি বোধহয়।'

কর্নেল কোলট্রেন তাঁর কাঁধে হাত ছোঁয়ালেন।

'একটু আগে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে, স্টেলা আর লুসিকে খেলতে সঙ্গে এনেছি কিনা। তোমার ঘুমটা তখনো ভাল করে কাটেনি. নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলে তুমি আবার নিজের ছেলেবেলায় ফিরে গেছ। এখন তো পুরোই সজাগ, এবার আমার কথা মন দিয়ে শোনো। স্টেলা আর লুসির কাছ থেকেই তো এসেছি তাদেব পুরনো খেলার সাথীর কাছে, মানে আমার পুরনো বন্ধুর ছেলের কাছে। ওরা জানে আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি, তাই আগের দিনগুলোতে যেমন তৈরি হয়ে থাকত, দেখবে তেমনই বসে আছে তোমায় অভ্যর্থনা করতে। আমি চাই তুমি আমার ঘরে চলে এস, আর যত দিন-না সুস্থ হয়ে ওঠো আমাদের কাছেই থাক—যতদিন তোমাব মন চায়। সংসারে তোমার বেহাল অবস্থা, প্রলোভনে ডুবে গেছ, সে-সব আমরা শুনেছি। তাই আমরা যুক্তি করেছিলাম, আবার আগের মতো তুমি আমাদের কাছেই আসবে, যেমন খুশি খেলবে। আসবে তো তুমি, খোকা? আমাদের পুরনো পরিবারিক ঝামেলা ভুলে গিয়ে আমাব সঙ্গে আসবে?'

'ঝামেলা!'—গোরি চোখ বড় করে বলেন, 'আমি তো অন্তত কোনো ঝামেলার কথা শুনিনি তোমার-আমার মধ্যে! আমরা সেরা বন্ধুই তো ছিলাম বরাবর। কিন্তু কর্নেল, ঈশ্বরের দোহাই, আমার এই অবস্থায় কেমন করে তোমার ওখানে

বল তো! একটা মাতাল হতভাগা, একটা অধঃপাতে-যাওয়া হতচ্ছাড়া উড়নচণ্ডে, জুয়াড়ি—'

টেবিল থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন নিজের আরামকেদারার ওপর, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মরাকান্না। অনুশোচনা আর লজ্জার খাঁটি চোখের জলও অবশ্য তার মধ্যে মেশানো। কোলট্রেন এদিকে এক নাগাড়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন—এককালে গোবি কত ভালবাসতেন পাহাড় জীবনের ছোটখাটো আনন্দগুলো, তা ছাড়া আমন্ত্রণটা যে খাঁটি তাতে তো ওর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

শেষমেষ গোবিকে কাত করলেন একটা কথা বলে—ওঁর সাহায্যের ওপরেই ভরসা করে আছেন তিনি; পাহাড়ের একটা উঁচু কিনারা থেকে বিপুল পরিমাণে কেটে-রাখা গাছের গুঁড়ি পরিবহণ করে নিয়ে যেতে হবে নদীস্রোতের মধ্যে, তার কলকৌশল তো একমাত্র গোবিই করতে পারেন। উনি জানতেন গোবি একবার এই কাজে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কায়দা আবিষ্কার করেছিলেন— গড়িয়ে মাল নামাবার জন্য পর-পর হড়কানো তক্তার ব্যবস্থা। আর এই নিয়ে গোবির বিলক্ষণ গর্বও ছিল। মুহূর্তের মধ্যে বেচারী ভদ্রলোক আনন্দে বিহ্বল হলেন কারুর কাজে লাগতে পারছেন বলে, তখনই টেবিলের ওপর কাগজ পেতে এঁকে ফেললেন দ্রুত অথচ কাঁপা হাতে কিছু রেখচিত্র; যা করতে পারেন ও করতে যাচ্ছেন, তার নক্‌শা।

ভুষিমালের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল ভদ্রলোকের, তাঁর উড়নচণ্ড হৃদয় আবার ফিরে যেতে চাইছিল পাহাড়ের দিকে কিন্তু মন তবুও অদ্ভুতরকম খোঁড়া। ওঁর আগের চিন্তা আর স্মৃতিগুলো এক এক করে ফিরে আসে মস্তিষ্কে—ঝোড়ো সমুদ্রের ওপর দিয়ে বার্তা-বাহক কপোতের মতো। কিন্তু ওঁর এই সামান্য উন্নতি দেখেই সন্তুষ্ট হন কোলট্রেন।

সেদিন বিকেলে বেথেলের ইহজন্মে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়! কোলট্রেনদের একজন আর গোবি বংশের একজন একসঙ্গে বন্ধুভাবে শহরের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। ধুলোভরা রাস্তা আর হাঁ-করে চেয়ে থাকা শহরবাসীদের ছাড়িয়ে তাঁরা পাশাপাশি নেমে গেলেন সোঁতার পল্লব দিকে, তারপর উঠলেন পাহাড়ের দিকের রাস্তায়। উড়নচণ্ড মানুষ এবার নিজেকে ধুয়ে পুঁছে চুল আঁচড়ে আগের চেয়ে ভদ্রস্থ হয়েছেন, কিন্তু ঘোড়ার জিনে বসে একটু কেমন অস্থির—মনে হয় কোনো বির্বাক্তকর সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। কোলট্রেন ওঁকে নিজের মেজাজের ওপরেই ছেড়ে দিলেন, তাঁর ভরসা ওঁর মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে পরিবর্তিত পরিবেশের প্রভাব।

একবার গোবি কেমন যেন মূর্ছাহতই হয়ে গিয়েছিলেন, প্রায় দেহশক্তি লোপের

মতো। ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার ধারে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। কর্নেল ওঁর এরকম অবস্থা হতে পারে তা আগেই অনুমান করে ভ্রমণের জন্য একটা ছোট হুইস্কি-বোতল সঙ্গে আনেন, কিন্তু গোরিকে তা দিতে চাইলে তিনি ভয়ানকভাবে আপত্তি জানালেন, বললেন কখনো ওটা স্পর্শও করবেন না। ক্রমে ক্রমে সামলে উঠে মাইল-দু'মাইল পথ বেশ নীরবেই চললেন। তারপর হঠাৎ ঘোড়াটা রুখে বললেন—'গত রাতে পোকার খেলতে গিয়ে দুশো ডলার খুইয়েছিলাম। কথাটা হচ্ছে টাকা আমি পেলাম কোথায়?'

'ইয়াঙ্কি, সহজভাবে নাও ব্যাপারটা। পাহাড়ের হাওয়া এখুনি সব পরিষ্কার করে দেবে। প্রথমেই আমরা মাছ ধরতে যাব পিনাক্‌ল্ ঝরনায়। কোলাব্যাঙের মতো ট্রাউটমাছ লাফায় সেখানে। আমরা স্টেলা আর লুসিকেও নিয়ে যাব, সবাই মিলে ঈগ্‌ল রকে পিকনিক করব। তুমি হিকোরি কাঠে জ্বালানো হ্যাম-স্যাণ্ডুইচের স্বাদ ভোলোনি তো? মাছধরার পর খিদে-পেটে কেমন লাগে?'

বোঝাই যায় কর্নেল তাঁর খোয়ানো সম্পদের কথা বিশ্বাস করেননি; তাই গোরি আবার ডুবে যান নিজের চিন্তার নীরবতায়।

বেথেল থেকে লরেলের দূরত্ব বারো মাইল, তার মধ্যে দশ মাইল তাঁরা পেরিয়ে আসেন বিকেল নাগাদ। লরেল থেকে আধমাইল এপাশে গোরিদের পুরনো ভিটেবাড়ি। গ্রাম ছাড়িয়ে আর একমাইল কি দু'মাইল গেলেই কোলট্রেনদের বসতবাড়ি। রাস্তা এখানে বড্ড খাড়াই, পরিশ্রমসাধ্য, কিন্তু তা উশুল করে নেবারও অঢেল আয়োজন। তির্যক অরণ্যবীথি পাতা পাখি আর ফুলে উপচে পড়ছে। হাওয়াতে যা টনিক, তা ওষুধ-রসায়নের শাস্ত্রকেও 'ফেল' পড়িয়ে দেবে। বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গাগুলো শেওলাছায়ায় অন্ধকার, আবার কখনো ফার্ন আর লরেল ঝোপের আড়াল থেকে লাজুক সোঁতার উঁকিঝুকিতে ঝল্‌মলে। সামনের পাতাঝাড়ের ফ্রেম থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ওরা দেখতে পান দূরের উপত্যকার অপূর্ব রূপরেখা—যেন শুভ্র কুয়াশায় লীন হয়ে গেছে।

কোলট্রেন দেখে খুশি হন যে তাঁর সঙ্গী পাহাড় বনের মুগ্ধ আবেশের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন শুধু 'পেন্টার্স ক্লিফ' পাহাড়টার পাদদেশ ঘুরে যেতে পারলেই হয়; তারপর 'এলডার ব্রাঞ্চ' নদীটা পেরিয়ে পরের পাহাড়টায় ওঠা; গোরিকে সেখানে তাঁর বিলিয়ে-দেওয়া পৈতৃক বাড়িটার মুখোমুখি হতে হবে। এ সবই তাঁর একান্ত পরিচিতি পথের নিশানা—প্রতিটি শিলা, প্রতিটা গাছ, রাস্তার প্রতিটি ফুট। বনটাকে ভুলে গেলেও, তা ওঁকে চঞ্চল করে তোলে—"ঘর, আমার সুখের ঘর"-এর সঙ্গীতের মতোই।

পাহাড়টা ঘুরে ওঁরা নেমে যান 'এলডার ব্রাঞ্চে'। একটু জিরোন ঘোড়া দুটোকে জল খেতে দিয়ে—বেগবতী নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করুক তারা। ডানদিকে একটা

লোহার বেড়া কোণাকুণি বেরিয়ে এসেছে, তারপর নদী আর রাস্তা ঘেঁষেই বরাবর গেছে। গোরির ভিটের পুরনো আপেল বাগান সেই বেড়ার ঘেরার মধ্যে; বাড়িটা এখনো উঁচু পাহাড়ের কিনারা থেকে আড়ালে। বেড়ার ভেতরে আর ধার ঘেঁষে পোক্‌বেরী, এল্ডার, সাসাফ্রা, আর সুমাক গাছগুলো ঘন আর উঁচু হয়ে উঠেছে। গাছের ডালে একটা খচমচ আওয়াজ শুনে গোরি আর কোলট্রেন দুজনেই চোখ তুলে তাকান। দেখেন বেড়ার ওপর থেকে একটা লম্বা মুখ, হলদে, নেকড়ে-সুলভ, চেয়ে আছে তাঁদেরই দিকে ফ্যাকাশে নিষ্পলক চোখে। মাথাটা চট্‌ করে অদৃশ্য হয়। ঝোপগুলো ভীষণভাবে দুলে ওঠে আর একটি বেয়াড়া ধরনের মূর্তি আঁকাবাঁকা পথে ছুটে যায় আপেলবাগানের ভেতর দিয়ে বাড়িমুখো।

কোলট্রেন বললেন, 'ওই হল গার্ভে যাকে তুমি জায়গাটা বেচে দিলে। লোকটা যে রীতিমতো উন্মাদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একবার ওকে আমি পাগলা গারদে পাঠিয়েছিলাম, বেশ ক'বছর আগে। লোকটা তো আসলে দায়িত্বজ্ঞানহীন, সেটা জানা সত্ত্বেও। কী ব্যাপার হল তোমার, ইয়াঙ্কি?'

গোরি কপাল মুছছিলেন, মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটু হাসার চেষ্টা করলেন—'কেন, আমাকেও কি আজব ধরনের দেখাচ্ছে? আরো কিছু জিনিস মনে পড়ছে আমার। মগজ থেকে খানিকটা মদের নেশা তো উপে গেছে। এখন মনে পড়ল ওই দুশো ডলার আমি কোথায় পেয়েছিলাম।'

'ওসব আর ভেবো না,' খুশি গলায় বললেন কোলট্রেন, 'পরে দু'জনে বসে সব হিসেবকেতাব করা যাবে।'

নদীর মোড়টা থেকে আবার ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন দুজনে। পাহাড়ের গোড়া অবধি পৌঁছুতে হঠাৎ আবার ঘোড়া কখলেন গোরি। জিজ্ঞেস করলেন:

'কর্নেল, তুমি কি কখনো ধারণা করেছিলে আমার বড় বেশি দেমাক বলে? মানে এই ঠাট-বাঁটের ব্যাপারে একটু বোকা গোছের অহঙ্কার?'

কর্নেলের চোখ যেন ইচ্ছে করেই ফিরে তাকাতে চাইছিল না নোংরা ধ্যাদ্‌ধেড়ে হলদে স্যুট আর রংজ্বলা চওড়া টুপিটার দিকে।

একটু ধাঁধায় পড়ে জবাব দিলেন, অবশ্য ওঁর মন রাখার চেষ্টায়—'আমার তো মনে হয়..... আমার শুধু মনে পড়ছে কুড়ি বছরের জোয়ান ফুল বাবুটিকে, আঁটসাট কোটপরা, চক্‌চকে চুল, ব্লু রিজের সবচেয়ে লাফানে জিনসাজ-আঁটা ঘোড়া যেন—'

উদ্‌গ্রীব হয়ে গোরি বলেন, 'ঠিক বলেছ। ওটা এখনো রয়েছে আমার মধ্যে, যদিও বাইরে দেখাই না। আরে, আমি হলাম হাবাতে টার্কি মোরগের মতো চালবাজ। একটা ছোট ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাইব—আমার দুর্বলতায় তোমার সামান্য আস্কারা!'

'বলেই ফেল না ইয়াঙ্কি। যদি চাও তোমায় আমরা 'লরেলের ডিউক' আর 'ব্লুরিজের ব্যারন' করে দেব, তুমি স্টেলার ময়ূর-পুচ্ছ থেকে একটা পাখনা নিয়ে তোমার টুপিতেও বসাতে পার।'

'না না, আমি সত্যি বলছি! ক'মিনিট বাদেই পাহাড়ের ওপর আমার সেই বাড়ির সামনে দিয়ে যাব, যেখানে আমার জন্ম, আর সেখানে আমার পরিবার প্রায় একশো বছর বাস করেছিল। সেখানে বাস করছে এখন অচেনা মানুষ। আর আমার দিকে চেয়ে দেখ! ওদের দেখাতে চলেছি আমার ছন্নছাড়া, নিঃসম্বল চেহারা, নাচ্চর ভিখিরির মতো! কর্নেল কোলট্রেন, বড় লজ্জা হচ্ছে আমার। তোমার কোট আর টুপিখানা বরং পরতে দাও না আমায়, এই যতক্ষণ না ওদের চোখের আড়াল হই! জানি তুমি ভাবছ এটা মূর্খের জাঁক, কিন্তু আমি চাইছি পুরনো বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু পরিপাটি সাজপোশাকে থাকতে।'

সহযাত্রীর শান্ত চেহারা আর সংযত ব্যবহারের সঙ্গে এই অদ্ভুত অনুরোধের তুলনা করে মনে-মনে কোলট্রেন ভাবেন—'এবার আবার কী করতে চায় ও?' কিন্তু এর মধ্যেই শশব্যস্তে সম্মতি জানিয়ে তিনি কোটের বোতাম খুলতে লেগেছেন, যেন এই খেয়ালটাকে কোনোমতেই উদ্ভট মনে করা যাবে না!

কোট আর টুপিটায় গোরিকে ভালই মানিয়ে গেছে। চোখে বেশ তুষ্ট গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে গোরি বোতাম আঁটলেন। উনি আর কোলট্রেন প্রায় একই মাপের—লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট ঋজু। ওঁদের মধ্যে বয়েসের ফারাক পঁচিশ বছরের হলেও দেখতে দুজনকে দেখায় ভাইয়ের মতো। গোরিকে বয়েসের তুলনায় একটু ভারিক্কি দেখায়, মুখখানা মাংসল, রেখায়িত। কর্নেলের মসৃণ তাজা গাত্রবর্ণ, মিতাচারী জীবন কাটালে যেমন হয়। উনি গোরির বিশ্রি পুরনো হলদে কোট আর রংজ্বলা টুপিটা পরে নিলেন।

লাগাম তুলে নিয়ে গোরি বললেন, 'এবার আমি ঠিক আছি। আমি চাই তুমি আমার দশফুট পেছন-পেছন এস, কর্নেল, যাতে ওরা আমাকে বেশ ভাল করে দেখতে পায়। ওরা বুঝে যাবে আমি এখনো কিছু হেঁজিপেজি নই—কোনো ব্যাপারেই। অন্তত আরেকবার আমার শোভন চেহারাটা দেখাতে পারব ওদের। চল আমরা এগোই।'

গোরি পাহাড়ে উঠতে লাগলেন সতর্ক দুল্‌কি চালে। কর্নেল চললেন ওঁর অনুরোধ মেনে পেছন-পেছন।

জিনের ওপর সোজা হয়ে বসেছেন গোরি। মাথা খাড়া কিন্তু চোখজোড়া ডানদিকে ফেরানো। পুরনো ভিটের হাতার মধ্যে আনাচ কানাচ, ঝোপঝাড়, বেড়া তন্নতন্ন করে দেখে যাচ্ছেন। একবার বিড়বিড় করে মনে মনে বললেন—'উন্মাদ মূর্খটা কি সত্যি চেষ্টা করবে, নাকি আমিই আধা স্বপ্নের ঘোরে আছি?'

একেবারে ছোট পরিবারিক কবর-জমিটার উল্টো দিকে এসে তবেই তিনি লক্ষ্য করলেন যেটা খুঁজছিলেন—এক কোণে একটা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরিয়ে এল ঘন সিডারের জঙ্গল থেকে। এমন ধীরে বাঁপাশে গড়িয়ে পড়লেন গোরি যে কোলট্রেন তবু একটু সময় পেয়েছিলেন নিজের ঘোড়াটাকে ওঁর পাশে নিয়ে আসতে। একটি বাহু দিয়ে চেপে ধরলেন গোরিকে।

কাঠবেরাল-শিকারী যে নিজের লক্ষ্যভেদের তারিফ করেছিল সেটা নেহাৎ জাঁকের কথা নয়। ঠিক যেখানে সে চেয়েছিল সেখানেই বুলেটটা ছুঁড়েছে, আর গোরিও প্রত্যাশাই করেছিলেন ওটা কর্নেল অ্যাবনের কোলট্রেনের কালো ফ্রককোটের বুক ভেদ করে আসবে।

কোলট্রেনের ওপর একেবারে ঢলে পড়েছেন গোরি, কিন্তু মাটিতে পড়ে যাননি। ঘোড়া দুটো পাশাপাশি এসেছে, কর্নেলের বাহুও তাঁকে সোজা ধরে রেখেছে। লরেলের ছোট সাদা বাড়িগুলো আধ মাইল দূরে, গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়। গোরি একটা হাত বাড়িয়ে খুঁজতে খুঁজতে কোলট্রেনের লাগাম ধরা হাতের আঙুল স্পর্শ করেন। বলেন, 'সত্যিকারের বন্ধু।'—ব্যাস্, ওইটুকুই।

সব দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়—এইভাবে ইয়ান্সি গোরি তাঁর সাবেক ভিটের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় নিজের সাধ্যমতো সেবা ঠাটটুকুই বজায় রেখেছিলেন।

A Blackjack Bargainer. এইন্সলি, ১৯০১. সিডনী পোর্টার নামে.

বালজারের বন্ধু

বুড়ো বাল্জার যেবার 'স্যাল্ভেশন' ফৌজে যোগ দিল, শহরের বিশেষ কোনো সমাজের কাছে তা এক ভারি মজার তামাশা মনে হল—এমন মজা আগে কেউ দেখেনি। শহরের এক অদ্ভুত 'চরিত্র' বাল্জার,—কোনো কাজে এলেম নেই, ছিটগ্রস্ত বুড়ো, সমাজের বাঁধাধরা রীতিনীতির স্বভাব-শত্রু। একটা ছোট সোঁতার ধারে থাকে, যা শহরটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। নিজেরই কায়দাকৌশলে গড়া এক আজব কুঁড়েঘর—টুকরোটাকরা কাঠ, খড়খড়ির মতো সাজানো তক্তা দিয়ে দেয়াল, টিনের পাত, চট আর করগেট টিন দিয়ে তৈরি, সেখানে তার বাস।

অতি দুরন্ত ছেলের দলও সম্মানজনক দূরত্ব রেখে বালজারের কুটির ঘুরে-ঘুরে দেখে। আগন্তুক তার অসহ্য; মারমুখো রুক্ষ অতিথিবিমুখতা দেখিয়ে কৌতূহলীদের

তাড়ায়। এর পালটাও তাই খবর রটে যায়—ওর মগজের স্থিরতা নেই, একটা ডাইন গোছের লোক. আর কঞ্জুষি করে কুঁড়েঘরের মধ্যে অথবা কাছাকাছি মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছে বিস্তর সোনাদানা। বুড়ো এটা-সেটা ফালতু কাজ করে, যেমন বাগানের আগাছা সাফ করা, চুনকাম করা, এ ছাড়া সে জোগাড় করে বেড়ায় পুরনো হাড়গোড়, অলিগলি আস্তিনা থেকে বর্জিত লোহালক্কড়ের টুকরো, বোতল ইত্যাদি।

এক বর্ষার রাতে 'স্যালভেশন আর্মি' (খৃষ্টীয় মুক্তিসেনা সেবাদল) তাদের হলঘরে বিরল সংখ্যক শ্রোতা নিয়ে সভা করছিল, এমন সময় বাল্‌জার এসে হাজির, ফৌজে যোগ দেবার অনুমতি চাইল সে। ঘাঁটির অধিকর্তা সার্জেন্টটি বুড়োকে স্বাগত জানালেন—শান্তিপূর্ণ যোদ্ধাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে নিঃসঙ্কোচ আনন্দ সহকারে।

বাল্‌জারকে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়োগ করা হল ড্রাম-বাদকের পদে। এতে সে খুবই খুশি, তবে খুশিটা প্রকাশ করে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে। সার্জেন্ট হয়তো আন্তরিকভাবেই নিজের সাফল্যে বিশ্বাস রেখে ধারণা করে নিয়েছেন—নতুন রংরুটটিকে এইভাবে সামনের সারিতে সাজিয়ে রাখলে সে সাথক লড়াইয়ের মন্দ নমুনা হবে না, বিশেষ করে যখন সে নরক-জ্বালায় পোড়া অঙ্গার না হলেও অন্তত একটি অর্ধদগ্ধ রসশূন্য কাঠ তো বটেই।

অতএব, প্রতি রাতে যখন ফৌজ তাদের কোয়ার্টার ছেড়ে রাস্তার কোণায় মার্চ করে আসে মুক্ত হাওয়ায় গান-প্রার্থনাদি করতে, বালজারও পেতলের ড্রাম নিয়ে সার্জেন্ট আর কর্পোরালের পেছনে হোঁচট খেতে-খেতে আসে। ওঁরা দুজন একসঙ্গে তাঁদের কর্নেটে "ধীরে ধীরে মিঠে" আর "শুধু এক বর্মধারী" গানের সুর বাজান। ও শহরে অবশ্য এত জোরে কেউ কোনোদিন ড্রাম পেটায়নি আগে। বাল্‌জার কর্নেটের সঙ্গে নিজের বাজনাটার যাহোক কোনো রকমে তাল রাখে, তবে ওর পা দুটো সারাক্ষণই বেতালায় চলে। ও সামনে-পেছনে ঝোঁকে, টলে আর দুপাশে দুলতে থাকে ঠিক ভালুকের মতো।

এটা ঠিক, তাকে মোটেই নয়নাভিরাম দেখায় না। একটা কুঁজো জবুথবু বুড়ো, যার মুখখানা একদিকে ট্যারা, শুকনো খেজুরের মতো কোঁচকানো। ফৌজি দলের রংরুট হিসেবে তার লাল জামাটা ঢলঢলে, ওটা ছিল অধুনা-মৃত এক জাঁদরেল চেহারার কর্পোরালের বাইরের খোলস। এখন সে পোশাক বাল্‌জারের গায়ে ঝুলছে একশো ভাঁজ হয়ে। ওর পুরনো বাদামি টুপিটা সব সময় একখানা চোখের ওপর টানা। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে ওর টলমল করে চলা—একটা বড় বাঁদরের রূপ দিয়েছে ওকে। যেন বাঁদরটাকে আটক করে রাস্তার নাচ গান শেখানো হয়েছে, এখনো ততটা রপ্ত হয়নি শিক্ষা।

বুদ্ধিহীন ছেলেছোকরা আর অপরিণত বুড়োগুলো সেবা-ফৌজের পথসভার সময় বাল্জারকে অনবরত বিরক্ত করে। ওর নব দীক্ষার বাচনিক সাক্ষ্য প্রমাণ দাবি করে তারা, ড্রাম বাজানোর কায়দা কসরত নিয়ে সমালোচনাও করে। কিন্তু বুড়ো তাদের ঠাট্টাইয়ার্কির তোয়াক্কা করে না। একমাত্র আসা যাওয়ার সময়টিতে খরখরে গলায় নিজের সাথীদের সম্ভাষণ জানানো ছাড়া সে কদাচিৎ কারুর সঙ্গে কথা বলে।

অনেক রকম আজব চরিত্র দেখেছেন সার্জেন্ট, জানেন কীভাবে তাদের বুঝতে হয়। কিছুকাল নতুন সদস্যকে তার মর্জিমতো শান্তিতে ছেড়ে দেন। প্রতি সন্ধ্যায় বাল্জার হলঘরে হাজির থাকে, দলের সঙ্গে মার্চ করে যায় রাস্তায়, ফিরে আসে আবার। তারপর ড্রামটাকে রেখে এক কোণে, সেটার নিজের জায়গায়। একেবারে পেছনের বেঞ্চে বসে থাকে যতক্ষণ সভা শেষ না হয়।

কিন্তু এক রাতে সার্জেন্ট, বুড়োর পেছু-পেছু রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'সাথীভাই, তোমার সব ঠিক মতো হচ্ছে তো?'

বাল্জার বলল, 'এখনো নয়, সার্জেন্ট, শুধু চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনি বাইরে আসাতে খুশি হলাম। একটা কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল—আপনি বিশ্বাস করেন একটি লোক যদি দেরি করে, মানে শেষ আশ্রয় হিসেবে, ঈশ্বরের কাছে আসে, তিনি তাকে গ্রহণ করবেন? ধরুন, যে-লোক সব কিছু হারিয়েছে—বাড়িঘর, সম্পত্তি, বন্ধুবান্ধব, স্বাস্থ্য? ততদিন ধরে অপেক্ষা করে তাঁর কাছে আসাটা কি ইতরের কাজ হবে না?'

'ঈশ্বরের নাম ধন্য!—না, না! "যারা ভাবাক্রান্ত তারা আমার কাছে এস" তাই তো বলেন তিনি। যত দরিদ্র হবে, যত দুর্গত হবে, যত হতভাগ্য হবে, ততই মহৎ হবে ঈশ্বরের ভালবাসা আর ক্ষমা।'

বাল্জার বলল, 'হ্যাঁ, আমি তো গরিবই। ভয়ানক গরিব আর ছন্নছাড়া। জানেন সার্জেন্ট, কখন আমার মাথা সবচেয়ে খুলে যায়? যখন ড্রামটা বাজাই। অন্য সময় মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে থাকে। ড্রামই কেমন যেন আমার মগজটাকে ঠাণ্ডা করে, শান্ত রাখে মনে হয়। এই একটা জিনিসই চেষ্টা করছি শিখতে, কিন্তু এখনো রপ্ত হল না।'

'তুমি কি ঈশ্বরকে প্রার্থনায় ডাকো, সাথীভাই?'—শুধোলেন সার্জেন্ট।

'না ডাকি না। ডেকে কী হবে? আমি জানি গলদটা আসলে কোথায়। কোথায় না বলা হয়েছে—মানুষের উচিত নিজের পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের ত্যাগ করে ঈশ্বরের সেবা করা?'

'যদি তারা পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়ায় তবেই, নচেৎ নয়।'

বুড়ো বলতেই থাকল,—'আমার কোনো পরিবার-পরিজন নেই, বন্ধুও

নেই—একজন ছাড়া। আর ওই বন্ধুই আমায় সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে।'

'তাহলে নিজেকে মুক্ত কর!'—সার্জেন্ট বলে ওঠেন, 'তোমার আর তোমার মুক্তির পথে যে প্রতিবন্ধক সে তো কোনো বন্ধু নয়, দুশমনই।'

সোচ্চারে জবাব দেয় বাল্‌জার—'না, দুশমন নয়। এমন সেরা বন্ধু হয় না।'

'কিন্তু তুমি যে বলছ সে তোমায় সর্বনাশের রাস্তায় পাঠিয়েছে?'

শুকনো জিভে খল্‌খলিয়ে উঠল বুড়ো—'হ্যাঁ, আর ধুকড়ি পরিয়েছে, এঁটোকাঁটা খাইয়েছে, একটা জোড়াতালি কুকুরের ঘরে শুতে জায়গা দিয়েছে। কিন্তু তবু, অত ভাল বন্ধু কোনো দিনও পাইনি। আপনি বুঝবেন না সার্জেন্ট। সব বন্ধু আপনার হারিয়ে যাক্ সেরা বন্ধুটি ছাড়া, তখন দেখবেন কেমন করে ওই শেষ বন্ধুটিরই হাত ধরে থাকতে হয়।'

'আপনি কি মদ খান, সাথীভাই?'—সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করেন।

বাল্‌জার জবাব দেয়, 'কুড়ি বছরে একটি ফোঁটাও খাইনি।' সার্জেন্ট ধাঁধায় পড়ে যান। কোনোমতে শুধু এইটুকুই বলতে পারেন—'যদি এই বন্ধু তোমার আর তোমার আত্মার শান্তির মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে ত্যাগ কর।'

'এখন—আর তা পারি না আমি',—খিট্‌খিটে নাকীকান্নায় বুড়ো বলে, 'তবে আমায় ড্রাম বাজানোটা চালিয়ে যেতে দিন, সার্জেন্ট, হয়তো একদিন তাকে ছাড়ব। চেষ্টা তো করছিই। মাঝে মাঝে এমন কাছে এসে যাই কাজটা সেরে ফেলার, যে ড্রামে আর ডজনখানেক চাপড় লাগালেই বুঝি ফয়সালা হয়ে যায়। একেবারে জায়গামতো ঘা কষাতে গিয়েও হাল ছেড়ে দিতে হয়। আপনি আমায় আরো একটু সময় দিতে পারবেন না সার্জেন্ট?'

'ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন, সাথীভাই—যা তোমার চাই, পিটিয়ে যাও যতক্ষণ না মোক্ষম সুরে ঘা পড়ে।'

পরে বাল্‌জারকে ডেকে সার্জেন্ট প্রায়ই বলতেন, 'সময় যে হল সাথীভাই! তোমার ওই বন্ধুটাকে মেরে তাড়াতে পারলে?' বুড়োর জবাবটা কিন্তু কোনো সময়েই মন-মতো হয় না।

একদিন রাতে রাস্তার মোড়ে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন সার্জেন্ট, যেন এক বিশেষ সংগ্রামরত সাথীকে তার শত্রুর কাছে থেকে সরিয়ে আনা হয়—ওই শত্রু তাকে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে কুপথে নিয়ে যাচ্ছে। বাল্‌জার চোখের সামনেই হঠাৎ রীতিমতো আতঙ্কিত হল। তৎক্ষণাৎ ড্রামটা তার পাশের স্বেচ্ছাসেবকের হাতে তুলে দিয়ে, তাড়াতাড়ি পা হেঁচড়ে চলে গেল রাস্তা ধরে। পরের রাতে সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল, কিন্তু তার অদ্ভুত আচরণের কোনো জবাবদিহি করল না।

সার্জেন্ট অবাক হয়ে ভাবেন এসবের মানে কী! সুযোগ করে বুড়োকে আরো

খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবেন, তার আত্মা যে-শান্তির জন্য আকুল, সে-শান্তি কিসের প্রভাবে এমন ব্যাহত হচ্ছে'? কিন্তু বাল্‌জার প্রশ্নটা সতর্কভাবে এড়িয়ে যায়, বিশেষ কোনো কিছুর উল্লেখ করে না।

বলে, 'দেখুন এটা আমার নিজের লড়াই। নিজেকেই ভেবে বের করতে হবে আমায়। অন্যরা কেউ বুঝবে না।'

দক্ষিণ অঞ্চলে ১৮৯৬ সালের শীতকালটা ছিল বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। প্রায় নজিরহীন শৈত্য, যেসব জায়গায় আগে বরফ পড়ে সাদাই হত না সেখানে কয়েক ইঞ্চি গভীর তুষার। গরিবদের মধ্যেই কষ্টটা হল বেশি, কারণ তারা এমন কঠোর ঋতু প্রত্যাশাই করেনি। 'স্যালভেশনের' ছোট দলটা যতটা-না তাদের সেবার ক্ষমতা, তার চেয়ে বেশি দুর্গতির সম্মুখীন হল।

ওদের শহরটা সেবাধর্মে তৎপর আর অকৃপণ হলেও, সংগঠন বলে কিছু বুঝত না। স্বাস্থ্যকর উৎপাদনশীল জলবায়ুতে কিছুর অভাব ঘটলেও তা ঘটত কদাচিৎ এখানে-সেখানে, আর বেশির ভাগ সময় সে অভাব বদান্য প্রতিবেশীদের কৃপায় নিঃশব্দে মিটে যেত। কিন্তু হঠাৎ কোনো প্রাকৃতিক বিপদপাত—ঝড়, দাবানল বা বন্যা হলে অব্যবস্থার ফলে পেটে টান-পড়া দুর্ভাগাদের কাছে সাহায্য পৌঁছোত দেরি করে: তা ছাড়া দানধ্যানের প্রয়োজন কমই দেখা দিত বলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়নি। এ-সব সময়ে 'মুক্তি সেবাদল' বড় কাজের পরিচয় দিত। তাদের সেপাইরা অলিতে-গলিতে গিয়ে বাঁচাত সেইসব মানুষদের যারা চরম অভাবে অনভ্যস্ত, কখনো ভিক্ষা করতে শেখেনি।

তিন হপ্তা ধরে কড়া বরফ জমার পর নরম তুষার পড়ল একফুট পুরু সমতলে। আগে থাকতে যারা জোগাড় রাখেনি, তাদের কপালে জুটল অনাহার আর শীতের প্রকোপ। সেবা ফৌজের আস্তানায় একটু খাদ্য আর উত্তাপের আকর্ষণে জুটল শতাধিক নারী শিশু আর বৃদ্ধ। প্রতিদিনই নীল উর্দিপরা সেপাইরা শহরের দোকান আর দপ্তরগুলোয় ঢোকে, খুচরো টাকা-পয়সা-আধলা জোগাড় করে অনাহারীদের জন্য খাবার কেনে। স্যালভেশনওয়ালারা খাদ্য ও বস্ত্রের প্যাকেট নিয়ে ব্যক্তিগত বাড়িগুলোর ভেতর যাওয়া-আসা করে। এদিকে দিনের পর দিন তাপমানের পারাও নেমে যেতে থাকে—দশ থেকে কুড়িতে।

হায় কপাল, বরাবরের বল্লির পাঁঠা ব্যবসা বাণিজ্যও ঢিমে হয়ে এল। এখন অতি অনিচ্ছার সঙ্গে আনি-দুয়ানি-পয়সা বেরোয় দেরাজ থেকে, খোলার সময় টুং টাং আওয়াজও হয় না। তবু ফৌজের বড় হলঘরটার চুল্লিতে গনগনে আগুন রাখতেই হয়, পেছনদিকের লম্বা টেবিলে সর্বদাই পাওয়া যাবে আর কিছু না হলেও কফি, রুটি, আর পনির। বীরের মতো লড়ে চলেছেন সার্জেন্ট আর তাঁর দল। শেষ কালে হাতের টাকা গেল ফুরিয়ে, দৈনিক চাঁদার পরিমাণ নামমাত্র, ফৌজের পোষ্যদের প্রয়োজনের পক্ষে মোটে পর্যাপ্ত নয়।

এদিকে 'ক্রিসমাস্' পরব হাতের কাছে। হলঘরেই আছে পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ে, বাইরে আরো বেশি। ফৌজ যেটুকু কিনে রেখেছে তার বেশি আনন্দও নেই এবারের মৌসুমে। তা হলেও, এই ক্ষুদে পেনশনভোগীরা কেউ এখন অবধি প্রয়োজনীয় আরাম থেকে বঞ্চিত হয়নি, তারা এর মধ্যেই কলরব শুরু করেছে ক্রিস্‌মাসের গাছ নিয়ে—বছরের গম্ভীর একঘেয়েমির মধ্যে ওটাই তো উজ্জ্বল কিছু স্বপ্ন আনে! সেবাফৌজ যখন প্রথম আসে, তারপর থেকে কোনো বছরেই তারা বাচ্চাদের জন্য একটা গাছ জোগাড় করতে বা উপহার দিতে ব্যর্থ হয়নি।

সার্জেন্ট বড় মুশকিলে পড়েছেন। উনি জানেন ওঁর একটি ঘোষণা: "গাছ হবে না"— পাতলা সুতির পোশাক আর ধুকড়ি জ্যাকেটের নিচে ধুক্‌ধুক্ করা বুকগুলোকে ভেঙে দেবে, যতটা এই ঝড়ের দাপট আর আধা-উপোসও ভাঙতে পারেনি। অথচ দৈনন্দিন প্রয়োজনের খাদ্য আর ইন্ধন জোগাবার পয়সাতেও তাদের ঘাটতি যে!

২০শে ডিসেম্বরের রাতে সার্জেন্ট স্থির করলেন ঘোষণা করে দেবেন যে এবার ক্রিস্‌মাসের গাছ হচ্ছে না। বাচ্চাগুলোর বেড়ে-চলা প্রত্যাশাকে আর বেশি উঁচুতে উঠতে দেওয়া হয়তো অন্যায় হবে।

আজ সন্ধ্যাটা আরো যেন ঠাণ্ডা, আরেকটা ভারী পশলার তুষারপাতে গভীর বরফ আরো গভীরই হল। হিংস্র তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তুরে হাওয়া ঝেঁটিয়ে আনছে সে বরফ। রাত নেমে আসতে সার্জেন্ট ভিজে বুট আর লাল মুখ নিয়ে হলঘরে ঢুকলেন, জরাজীর্ণ ওভারকোটখানা খুলে রাখলেন। একটু বাদেই বাকি বিশ্বাসী সেবকরা দল বেঁধে ঢুকল—ভারী শাল মুড়ি দিয়ে মহিলারা, পুরুষরা সশব্দে সিঁড়ির ওপর বরফমাখা পা ঠুকে। ঠাণ্ডা মাংস, রুবরুটি, রুটি আর কফি দিয়ে সামান্য নৈশাহার সেরে সবাই যোগ দিল সংক্ষিপ্ত গান-প্রার্থনার সভায়, যা ওদের রোজকার অভ্যাস।

পেছন দিকে একেবারে ছায়ার মধ্যে বসে আছে বাল্‌জার। আজ ক'হপ্তা হল ওর চিন্তার সঙ্গী—বড় পেতল-ড্রামের গুরুগম্ভীর নাদ থেকে ও বঞ্চিত। একটা ছায়াচ্ছন্ন হতভম্ব ভাব ওর কোঁচকানো মুখে। ফৌজ এখন নিয়মিত প্রার্থনা আর কুচকাওয়াজ নিয়েই ব্যস্ত। নিস্তব্ধ ড্রাম, নিশান আর কর্নেটগুলো সিঁড়িরাস্তার ওপর একটা ছোট কামরায় মজুত করে রাখা হয়েছে।

রোজই রাতে বাল্‌জার হলঘরে আসে, অন্যদের সঙ্গে নৈশাহার করে। এরকম আবহাওয়ায় বুড়ো মানুষটা যেসব কাজ সচরাচর করে তেমন কাজ পাচ্ছে না, তাই ওকে বলা হয়েছে অন্য হতভাগ্যদের কপালে যা জুটছে তাই যেন ভাগাভাগি করে নেয়। সব সময় একটু আগেভাগেই সে চলে যায়। তাই সবার ধারণা সে তার জোড়াতালি কুটিরেই রাত কাটায়। বাইরে থেকে দেখতে যেমনই হোক

তার কুঁড়েঘরের কাঠামোটা কিন্তু বৃষ্টিবাদল বরফ ঝড় ভালই ঠেকোয়। ইদানিং সার্জেন্ট বুড়োকে দেবার মতো সময়ই করে উঠতে পারছেন না।

সন্ধ্যে সাতটার সময় সার্জেন্ট উঠে টেবিলে একটা কয়লার টুকরো ঠুকে আওয়াজ করলেন। কামরার সবাই শান্ত হলে তিনি বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক সিধে রাখাঢাকাহীন বক্তৃতাগুলোর চেয়ে বেশ আলাদা যেন আজকের বাধোবাধো কথাগুলোর ধরন। বাচ্চারা ছন্নছাড়া, জটপাকানো বৃত্তের মতো ঘিরে ধরেছে তাদের বন্ধুকে, সজাগ নয়নে। এদের মধ্যে অনেকেই আগে দেখেছে কেমন করে সেই উজ্জ্বল রাতে বারোটার-ঘণ্টা বাজতেই তাঁর তাজা রাঙা মুখখানা বেরিয়ে আসত একটা জাঁকালো দাড়ি গোঁপওয়ালা 'সান্টা ক্লসের' মুখোশ থেকে। তাই তারা জানে এবার তিনি 'ক্রিস্‌মাস গাছের' কথা বলতে যাচ্ছেন।

ওরা পায়ের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে শোনে, একটা আশাভরা উদগ্রীব বিস্ময় ওদের উদ্দীপ্ত মুখে। সার্জেন্ট তা দেখেছেন, ভুরু কুচঁকে সজোরে ঢোকও গিলেছেন। কথা বলতে বলতেই তিনি প্রতিটি অপেক্ষমান ছোট বুকে বিঁধিয়ে দিলেন হতাশার হুল, দেখলেন ওদের চোখ থেকে আলোর ধীর অন্তর্ধান।

কোনো গাছ এবার হবে না। ত্যাগ ওদের কাছে নতুন জিনিস নয়; এর মধ্যেই জন্মেছে ওরা। তবু খুব ছোট ক'জন আছে যারা আশা ছাড়ে না কোনোমতেই—তারা সশব্দে ফোঁপাতে লাগল, আর ম্লানমুখী দুর্গত মায়েরা চাইল তাদের থামাতে, সান্ত্বনা দিতে। এক ধরনের স্বরহীন বিষাদের কান্না ছড়িয়ে গেল ওদের মধ্যে, যেটা কোনো প্রতিবাদ নয়; বরং বলা যায় ছেলেবেলার আনন্দের স্বাদ যা ওরা কখনো জানেনি, তাই পেল না বলে একটা শোকের আভাস। সার্জেন্ট বসে পড়ে খবরের কাগজের সাদা কিনারাগুলোয় পেন্সিলের টুকরো দিয়ে নিরানন্দে আঁকিবুকি কাটতে থাকলেন।

বাল্জার উঠে স্খলিত পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যায় কাউকে কিছু না বলে, নিজের অভ্যাসমতো। শোনা গেল সিঁড়িপথের ছোট কামরাটায় সে কিছু ঘুটঘাট করছে। তারপরেই হঠাৎ এক বজ্রনির্ঘোষ যেন গোটা বাড়িটাকেই কাঁপিয়ে দিল, গুরুগুরু আওয়াজে ভরে দিল চারদিক। সার্জেন্ট চমকে উঠলেন, তারপর হো-হো করে হাসতে লাগলেন যেন তাঁর স্নায়ুর পক্ষে আনন্দদায়ক কোনো বিনোদন।

বললেন, 'আরে এ যে সাথী বাল্জার, ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবনা-চিন্তা করছেন!'

উত্তুরে হাওয়া জানলাগুলো খট্‌খটায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে আর্তনাদ তোলে। সার্জেন্ট আরো কয়লা ঢাললেন চুল্লিতে। হাড় কাঁপানো হাওয়াটা ইঙ্গিত দিচ্ছে, আগামী দিন বা হপ্তাগুলোয় হয়তো আরো কঠিন সময় আসছে। ছেলেমেয়েগুলো ধীরে ধীরে ভুলছে তাদের করুণ স্বপ্ন—ওই স্বপ্ন থেকেই কোনো উজ্জ্বল দিনের

ছলনাময় আশা ওদের প্রলোভন দেখিয়েছিল। মহিলারা রাতের জন্য ব্যবস্থা করছে; হলঘরের আড়ের দিকে লম্বা পর্দা টেনে নিজেদের আর বাচ্চাদের জন্য আলাদা শোবার জায়গা করে নিচ্ছে পুরুষদের থেকে।

আটটা নাগাদ সার্জেন্ট দেখলেন সব ঠিকঠাক আছে। গলায় উলের মাফলার জড়িয়ে ঘরে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় সিঁড়িপথের ওপর শোনা গেল পায়ের শব্দ। দরজা খুলে যেতেই ভেতরে এল বাল্‌জার। সান্টা ক্লসের মতো তুষারে ঢাকা, ওই রকমই লাল মুখ, তবে আর সব দিক থেকে ফুর্তিবাজ 'ক্রিস্‌মাস্‌'-সাধুর সঙ্গে তার অমিলটাই বেশি।

বুড়ো হলের ভেতর দিয়ে খড়বড় করে এল যেখানে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন, একটা ভিজে মাটি-মাখা থলি বের করল কোটের ভেতর থেকে। টেবিলের ওপর সেটা রেখে সার্জেন্টের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এবার খুলুন ওটা।'

খোশমেজাজি ফৌজী অধিকর্তা আস্কারার হাসি দিয়ে ওর হুকুম মানলেন। থলিটার তলার দিক খিমচে ধরে উল্টে দিলেন সবটাই। তারপর তাঁর হাসি বদলে গেল সবিস্ময় মুখ ব্যাদানে; দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলেন টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়া সোনা আর রুপোর মুদ্রা-স্তূপটার দিকে।

বাল্‌জার বলল, 'গুনে দেখুন।'

মুদ্রার ঝঙ্কার আর তার উৎস নিয়ে বিস্ময়ের চমক হলঘরে একটা গভীর নিস্তব্ধতার সৃষ্টি করেছিল। কিছুক্ষণ অবধি বাতাসের কান্না আর মুদ্রার ঝিনিক্-ঝিনিক্ শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না—সার্জেন্ট ধীরে ওগুলোকে আলাদা ছোট-ছোট পাল্লা করে সাজাচ্ছিলেন।

'ছয় শো',—বললেন সার্জেন্ট, একটু থেমে গলা সাফ করে ফের বললেন, 'ছয়শো তেইশ ডলার পঁচাশি সেন্ট!'

'আশি। পাঁচ সেন্ট ভুল হয়েছে।' বলল বাল্‌জার, 'আমি শেষ অবধি চিন্তাভাবনা করেছি সার্জেন্ট, তারপর পরিত্যাগ করলাম সেই বন্ধুকে যার কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওই তো সে—ডলার আর সেন্ট। ছোকরাগুলো যখন আমায় কঞ্জুষ বুড়ো বলত, ঠিকই বলত। নিন্ তুলে, সার্জেন্ট, যাদের ওটার দরকার আছে তাদের জন্যই সেরা উপায়ে খরচা করুন, আর কচি বাচ্চাদের জন্য একটা গাছের কথা ভুলবেন না কিন্তু, আর—'

সার্জেন্ট চেঁচিয়ে উঠলেন—'ধন্য পরমেশ্বর।'

'আর একটা নতুন পেতলের ড্রাম', কথাটা শেষ করে বাল্‌জার।

এবার সার্জেন্ট দিলেন আরেকটা বক্তৃতা।

Bulger's Friend. দি হুইংস্ কম্প্যানিয়ন, ১৯০১

শ্রেষ্ঠ পতাকা

প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মন্ত্রীসভার একটা ঘরোয়া বৈঠকের সঙ্গে এক ডজন পোয়া-বোতল শ্যাম্পেন—এই নিয়ে হল নৌবহরের উদ্বোধন, আর ফেলিপে ক্যারেরার অ্যাডমিরাল পদে অভিষেক। সুরা পাঠিয়েছিল নিউ অর্লিয়ন্সের 'মোগল কদলী কোম্পানি'—সৌহার্দ্যের সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে—তা ছাড়া ওই কোম্পানি আর প্রজাতন্ত্রের মধ্যে নিষ্পন্ন কিছু লেনদেনের নিদর্শন হিসেবেও।

নিয়োগ ব্যাপারে শ্যাম্পেনের পরেই দু'নম্বর কৃতিত্ব ডন সাবাস প্লাসিদোর, তিনি সবে নতুন যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

সভা হয়েছিল অতীব ক্লান্তিকর; কাজের কথা, সুরা সবই অস্বাভাবিক রকম নির্জলা। ডন সাবাসের কাজটার পেছনে ছিল হঠাৎ তামাশা গোছের একটা প্রেরণা, মজাদার কৌতুকের হাওয়া দিয়ে গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারকে একটু সুস্বাদু করা।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এসেছিল একটা বুলেটিন, ওরিলা-ডেল মারের দপ্তর থেকে—তাতে রিপোর্ট করা হয়েছে: বন্দর-শহর সোলিটাস্-এর শুল্ক-অফিসাররা 'এস্ট্রেলা দে'নশ্' নামে একটা সুলুপ-জাহাজ পাকড়াও করে, সেই সঙ্গে আটক করে তাব মালপত্র—জামাকাপড়, পেটেন্ট ওষুধ, দানা-চিনি আর 'তিন-তারা' ব্র্যাণ্ডি। তা ছাড়া, ছ'খানা মার্টিনি রাইফেল আর দশ হাজার হাভানা চুরুট। চোরাচালানে ব্যাপৃত সুলুপ-জাহাজ আর মাল এখন আইন অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি।

শুল্ক বিভাগের কালেক্টর তাঁব বিবৃতি দিতে গিয়ে প্রথাসম্মত নিয়মের বাইরে গিয়ে এ প্রস্তাবও দিয়েছেন যে বাজেয়াপ্ত-করা জাহাজটাকে সরকারের ব্যবহারে আনা হোক। গত দশ বছরে বিভাগের এই প্রথম দখল করা সম্পদ। প্রায়ই দেখা যায়, সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজন হয় উপকূল ধরে পর-পর একেকটি স্থানে যাবার, অথচ চলাচলের সুযোগ প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তা ছাড়া, চোরাচালানের ক্ষতিকর কাজকর্মে বাধা দিতে জাহাজটা উপকূল-রক্ষীর ভূমিকা নিতে পারে। কালেক্টর সাহস করে একজনের নামও করেছেন যার ওপর নিশ্চিন্তে জাহাজটার ভার দেওয়া যেতে পারে—ফেলিপে ক্যারেরা— একজন যুবক যার প্রচণ্ড জ্ঞানগম্যি না থাকলেও (সেটা বুঝে নিন) সে দেশভক্ত, সমগ্র উপকূলভাগের শ্রেষ্ঠ নাবিক।

ঠিক এই ইঙ্গিতটা নিয়েই যুদ্ধমন্ত্রী তার ক্ষুদ্র রসিকতাটুকু পেশ করলেন, আর তা ব্যবস্থাপক সভার ক্লান্তি ঘুচিয়ে সবাইকে চাঙা করে তুলল।

এই ক্ষুদে উপকূলঘেঁষা 'কদলী'-প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে একটা বিস্মৃত অধ্যায় রয়েছে নৌবহর রাখার বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করে। চঞ্চলমতি কূটনীতিকদের শিরায়

তখন সকৌতুকে বুদ্‌বুদ তুলেছে শ্যাম্পেন। একটা দুর্দান্ত দলিল তৈরি করা হল বর্ণাঢ্য শিলমোহরের খোলস আর পতপতে ফিতের বাহার দিয়ে; তাতে রাষ্ট্রনেতাদের অলঙ্কৃত পেঁচানো দস্তখতগুলো : এল-সেনিওর-ডন-ফেলিপে-ক্যারেরার ওপর অর্পিত হল প্রজাতন্ত্রের নৌবহর ও নৌবাহিনীর 'অ্যাডমিরাল' উপাধি। এই ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে, ডজন খানেক অতি-নির্জলার দাপটে, দেশ উন্নীত হল নৌশক্তিমান রাষ্ট্রের পর্যায়ে, আর ফেলিপে ক্যারেরা হলেন একুশ-তোপের হকদার—যখনই কোনো বন্দরে প্রবেশ করবেন এই অভিবাদন তাঁর প্রাপ্য হবে। জন্মগত দুর্ভাগ্য নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করার বিশিষ্ট গুণটি দক্ষিণের এই জাতিগুলোর নেই। এই ত্রুটির ফলে তারা কাউকে বিকৃতাঙ্গ, দুর্বল-মস্তিষ্ক বা পাগল দেখলে হেসে গড়িয়ে পড়ে না। ফেলিপে ক্যারেরা তো শুধু বুদ্ধিহীন। তাই সোলিটাসের লোকরা তাকে ডাকে 'বেচারি খ্যাপা' বলে. ঈশ্বর নাকি তার অর্ধাংশটুকু পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে। আর বাকি অর্ধাংশ রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। বিষণ্ণ গম্ভীর যুবক, ভ্রূকুটি করে তাকায় আর কথা বলে খুবই কম। ফেলিপে কিন্তু 'ভেতরমুখো' খ্যাপা। সাধারণত ডাঙায় নামলে সব প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না। মনে হয় সে জানে ডাঙায় সে বিশ্রিরকম নাচার, সেখানে কত কিছু জানা-বোঝার প্রয়োজন, অথচ জলে কটা নাবিক আছে যাদের ভগবান পুরোপুরি সাবধানে তৈরি করেছেন? কিন্তু তারা পালতোলা নৌকো কায়দা করতে ওস্তাদ। ওদের মধ্যে যারা সেরা তাদের চেয়েও খরগতিতে সে সুলুপ চালিয়ে ঝড়ের মুখোমুখি হতে পারে। ওর নিজের কোনো নৌকো নেই, কিন্তু কাজ করে সমুদ্রপাড়-আঁচড়ানো স্কুনার আর সুলুপের খালাসিদের সঙ্গে। যেখানে কোনো পোতাশ্রয় নেই সেখানে স্টিমারের সঙ্গে কেনাবেচা করে, ফলপাকড়ের পসরা পৌঁছে দেয়। নাবিক হিসেবে তার সর্বজনবিদিত সাহস আর দক্ষতার জোরে, এবং তার মানসিক অসম্পূর্ণতায় করুণা বোধ করেই কালেক্টর তাকে মনোনীত করেছিলেন অধিকৃত সুলুপ জাহাজটার যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে।

সেনর প্লাসিদোর ছোট্ট তামাশাটার পরিণতি যখন চমৎকার এক কমিশনের রূপ নিয়ে এসে পৌঁছোল, কালেক্টর তো প্রথম বিস্মিত হলেন, পরে হাসলেন। ফেলিপেকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে দিলেন দলিলটা, আর গভর্নমেন্ট যে উচ্চ সম্মান তাকে দিচ্ছে সেটাও সযত্নে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। বিনা বাক্যব্যয়ে নতুন সৃষ্ট 'অ্যাডমিরাল' তার দলিল নিয়ে প্রস্থান করল।

পরদিন সকালে সে আবার এল কালেকটরের কাছে। পল্লীর রাস্তার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করার সময় 'বেচারি ছেলেটা' বলে অনেক দরদভরা উচ্চ সম্ভাষণই শোনা গেল, কিন্তু একবারও কেউ জোরে হাসেনি, মুচকি হাসিও নয়।

কোথা থেকে খুঁজে পেতে একটা সামরিক উর্দি-জাতীয় শোচনীয় কিছু বানিয়ে

নিয়েছে ফেলিপে। লাল পাতলুন, জীর্ণ নীল কোট হলদে সুতোয় ছুঁচ-কাজ করা, আর বেলিজ শহরে একজন ইংরেজ সৈনিকের ছেড়ে-যাওয়া একটা পুরনো কপাল ঢাকা টুপি। টুপিতে গুঁজে নিয়েছে কাকাতুয়া-লেজের ঝলমলে পালক। ওর কোমরে বাঁধা সাবেক কালের জাহাজী খঞ্জরটা দিয়েছে নাপিত পেদ্রো লাফীৎ। পেদ্রো সগর্বে ঘোষণা করে ওটা তার পূর্বপুরুষ বিখ্যাত জলদস্যু লাফীতের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

অ্যাডমিরালের পায়ে-পায়ে ঘোরে তার নতুন নিযুক্ত নাবিকরা—তিনজন দেঁতো-হাসি, চক্‌চকে কালো ক্যারিবীয়। কোমর অবধি খোলা গা; খালি পায়ের দাপানিতে রাস্তা থেকে ধুলোর ঝড় ওঠে।

যথাযোগ্য সম্ভ্রম সহকারে কালেক্টরের কাছে নিজের জাহাজ চেয়ে নেয় ফেলিপে। এবার তার জন্য প্রতীক্ষা করছে নতুন সম্মান। কালেক্টরের স্ত্রী রোগাপাতলা ছোটখাটো ফ্যাকাশে চেহারার মানুষ। সারাদিন 'হ্যামকে' শুয়ে নভেল পড়েন; একদিন একটা পুরনো কেতাবে পেয়ে গিয়েছিলেন কোনো পতাকার ছবি—সেটাই নাকি এই প্রজাতন্ত্রের নৌ-পতাকা। হয়তো-বা জাতির প্রতিষ্ঠাতারা ওইরকমই পতাকার নক্‌শা তৈরি করেছিলেন, তবে কোনোকালে নৌবহর সৃষ্টি হয়নি বলে তা স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা নিজের তামাটে হাতে ওই নিশানের নমুনায় একটা পতাকা বানিয়েছেন—নীল-সাদা জমিতে লাল ক্রসচিহ্ন। রোমান্সের ছড়াছড়ি নভেলগুলো থেকেই একটু ভাবগ্রহণ করে ফেলিপের হাতে পতাকা তুলে দিলেন এই বাণী দিয়ে: 'সাহসী নাবিক! এই পতাকাই তোমার স্বদেশ। জীবন দিয়ে একে রক্ষা করবে। ঈশ্বরের পথে চল!'

নৌবাহিনীর সমস্যা এল এর পরবর্তী মাসটিতে। হুকুম ছাড়া কী করবে তা জানতে না পেরে ধাঁধায় পড়ে গেল স্বয়ং অ্যাডমিরাল। কিন্তু কোনো অর্ডারই এল না ওপর থেকে। কোনো মাইনে-পত্রও এল না। স্লুপ-জাহাজে নতুন রং করা হয়েছে, নতুন নামকরণ হয়েছে "এল্‌ নাসিওনাল", এখন তা নোঙরে বাঁধা, অলসভাবে দুলছে। ফেলিপের সামান্য টাকার ভাঁড়ার যখন শেষ, সে গেল কালেক্টরের কাছে, টাকাকড়ির প্রশ্ন তুলল।

হাত দুটো শূন্যে তুলে কালেক্টর চেঁচালেন, 'মাইনে! "কো" মাইনে! সাত মাস ধরে নিজেই একটা "সেন্টাভো" পাইনি। বলছ একজন অ্যাডমিরালের মাইনের কথা? কত হবে জানো? তিন হাজার পেসোর কম হবে ভেবেছ? ভগবান! শিগগিরই এদেশে একটা বিপ্লব হবে দেখো। পেসো, পেসো করে ওরা চেঁচায় বটে, সেটা সুলক্ষণ, কিন্তু একটা পেসোও তো দেয় না।'

গম্ভীর মুখে প্রায় একটা তৃপ্তির ভাব নিয়েই ফেলিপে চলে আসে। বিপ্লব হলে তার মানে লড়াই, তখন গভর্নমেন্টের কাজের ডাক আসবে ওর কাছে।

এভাবে বিনা কাজে অ্যাডমিরাল হয়ে থাকা অপমানজনক, এদিকে অনাহারী নাবিকরা একটু কলা রুটি কিনে খাবার জন্য সামান্য সিকি ভিক্ষে চাইছে।

সরলমনা ক্যারিবীয়রা অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, ও ফিরে আসতেই তারা লাফিয়ে উঠে স্যালুট করল ওরই শেখানো কায়দায়।

অ্যাডমিরাল বললে, 'এস ছোকরারা! গভর্নমেন্ট গরিব। এখন তাদের হাতে টাকাপয়সা নেই। বাঁচার জন্য আমাদের যতটুকু দরকার নিজেরা উপার্জন করব। শিগগিরই'—ভারী চোখদুটো ওর ঝিলিক দিয়ে ওঠে প্রায়—'আমাদের সাহায্য ওরা খুশি হয়েই চাইবে।'

এরপর থেকে "এল্ নাসিওনাল" অন্য জাহাজ-নৌকোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যে-সব ফলবাহী স্টিমার সমুদ্রপাড়ের এক মাইলের মধ্যে ভিড়তে পারে না সোলিটাসে কোনো জেটি না থাকার ফলে, তাদের কাছে কলা আর কমলালেবুর রসদ পৌঁছে দেয়। বাস্তবিকই, যে কোনো দেশের বাজেটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য একটা নৌবহরের এমন স্বাবলম্বী হবার প্রয়াস!

সোলিটাসে একটা ছোট টেলিগ্রাফ দপ্তর রয়েছে যেখান থেকে ছোট তারের লাইন বড় পাহাড়গুলোকে ডিঙিয়ে পৌঁছে গেছে রাজধানীতে। যখন জাহাজে মাল পরিবহন করে অন্তত নিজের নাবিকদের খাদ্য আর হপ্তা দুয়েক বেতনের মতো যথেষ্ট রোজগার হয়, ফেলিপে তখন ছেঁকে ধরে এই তার-দপ্তরটা। দেউলে কোনো কমিক অপেরার দল ম্যানেজারের ঘাঁটি ঘেরাও করলে যেমন দেখায়, অনেকটা তেমনই। মেঝের ওপর একটা পছন্দমতো কোণে ফেলিপে শুয়ে পড়ে থাকে দ্রুত ক্ষয়ে-যাওয়া উর্দি পরে, লাল দু'পায়ের ফাঁকে তার বেটপ খঞ্জরটা পাকড়ে রেখে। এইভাবেই সে সবুর করে থাকে দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা—তার গভর্নমেন্টের অতি বিলম্বিত হুকুমের জন্য। রোজই সে গম্ভীর প্রত্যাশার কণ্ঠে কোনো বার্তা আছে কিনা জানতে চাইবে। অপারেটরও খুঁজে দেখবার ভান করবে আর জবাব দেবে: 'সেনিওর এল্ আল্মিরান্দে, এখনো তো কিছু আসেনি দেখছি। আবহাওয়া সুবিধের নয়!'

জবাব পেয়ে অ্যাডমিরাল, ফের সশব্দে বসে পড়বে নিজের কোণটিতে, টেবিলের ওপরের ক্ষুদ্র যন্ত্রটা থেকে বিরল কিট্ কিট্ আওয়াজ শোনার অপেক্ষায়। বাইরে তখন লেবুগাছের ছায়ায় বসে নাবিকরা আখ চিবোচ্ছে কিংবা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে—এত সামান্য সেবাতে যদি একটা দেশ খুশি থাকে তাহলে তারাও খুশি।

গ্রীষ্ম-শুরুর একটি দিনে হঠাৎই কালেক্টরের ভবিষ্যৎবাণীর সেই বিপ্লব প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। বহুদিন ধরেই ধূমায়িত হচ্ছিল সে আগুন। বিদ্রোহীদের শীর্ষস্থানে দেখা দিলেন ডন সাবাস প্লাসিদো—কেন্দ্রীয় আমেরিকান প্রজাতন্ত্রগুলোর অতিভাষী

মুখপাত্র, জ্ঞানী বলে পরিচিত। তিনি একাধারে ভ্রমণকারী, সৈনিক, কবি, বিজ্ঞানী, বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা, আবার চারুকলা-রসিক পণ্ডিতও—বিস্ময়কর হেঁয়ালি হল তিনি তাঁর জন্মভূমির দূরপ্রান্তীয় তুচ্ছ জীবনেই তৃপ্ত থাকতে পেরেছেন।

তাঁকে ভাল করেই চেনেন এমন এক বন্ধু বলেন, 'রাজনীতির চক্রান্তে তিনি যে মাথা গলান সেটা প্লাসিদোর একটা বাতিক। এ আর অন্য কিছু নয়, তার কাছে অনেকটা সঙ্গীতের কোনো নতুন "লয়" খুঁজে পাবার মত, কিংবা হাওয়ায় কোনো নতুন জীবাণু; নতুন সুঘ্রাণ, বা ছন্দ বা বিস্ফোরক। বিপ্লব পিষে ও সব উন্মাদনা বের করে দেবে, তারও হপ্তাখানেক বাদে সব ভুলে যাবে। তখন নিজের দু-মাস্তুল জাহাজে চড়ে বিশ্বের সাগর সাঁতরাবে, আর তার পৃথিবীবিখ্যাত সংগ্রহে যোগ হবে আরো কিছু—হা ভগবান! সবকিছু আছে তাতে—ডাকটিকিট থেকে শুরু করে বাষ্প জাহাজের কল অবধি।'

এদিকে, নিছক পল্লবগ্রাহী রসিক হলেও, সৌন্দর্যপ্রিয় প্লাসিদো কিন্তু বেশ শোরগোল তুলেছেন মনে হয়। জনতার প্রিয় ব্যক্তিরা প্রায় একযোগে মাথা তুলেছে তাঁকে উগ্রমেজাজী প্রেসিডেন্ট প্রাদোসের পদে বসাবার জন্য। রাজধানীতে জোর লড়াই, সেখানে (গৃহীত ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে) সৈন্যবাহিনী একজোট হয়েছে নব-বাঞ্ছিতের সপক্ষে। বেশির ভাগ উপকূল-শহরেও রীতিমতো দাঙ্গাবাজি এখন। জনশ্রুতি, বিপ্লবে সাহায্য করছে এক শক্তিশালী মার্কিনী সংস্থা—'মোগল কদলী কোম্পানি।' ওদের দু'টো স্টীমার "ট্রাভেলার" আর "সালভাডর"-কে নাকি দেখা গেছে সমুদ্রতীর ধরে-ধরে একেকটা স্থানে বিদ্রোহী সেনাদলকে নামিয়ে দিতে।

যুদ্ধের প্রথম ইঙ্গিত পেতেই নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল সোজা জাহাজ নিয়ে চলে গেল বেলিজ, সেখানে তাড়াতাড়িতে যোগাড়-করা কিছু রসদ বিক্রি করে কার্তুজ কিনে ফেলল তার পাঁচখানা মার্টিনি রাইফেলের জন্য। 'এল নাসিওনালের' অস্ত্র বলতে ওই গুলোই। তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের ঘাঁটিতে, দেশের ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে। সোলিটাসে এখন অবধি সত্যিকারের কোনো বিদ্রোহ ঘটেনি। সামরিক শাসন বহাল আছে, বিক্ষোভের মুখ বুজে রাখা হয়েছে। একটা খবর পাওয়া গেল। বিদ্রোহীরা নাকি সর্বত্রই পরাজয়ের মুখোমুখি। রাজধানীতে প্রেসিডেন্টের রক্ষীরা জিতে গেছে, আর গুজব, বিদ্রোহের নেতাদের বাধ্য করা হয়েছে পলায়ন করতে, সবেগে পেছু-তাড়া করা হচ্ছে তাদের।

সোলিটাসের ছোট টেলিগ্রাফ-দপ্তরে এখন হরদমই কর্মচারী আর সরকার-ভক্ত নাগরিকদের ভিড়, রাজধানীর কেন্দ্র থেকে তারা খবরের জন্য প্রতীক্ষা করে। একদিন সকালে টেলিগ্রাফের চাবি কিট্‌কিট্ করতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গেই অপারেটর চেঁচিয়ে ওঠে—'এল্ আলমিরাল্তের জন্য টেলিগ্রাম। ডন সেনিওর ফেলিপে ক্যারেরা।'

হুড়োহুড়ির শব্দ; তরোয়ালের টিন-খাপে জোর ঝনৎকার, অ্যাডমিরাল তার সদাপ্রতীক্ষার জায়গা থেকে চট্‌ করে লাফ দিয়ে কামরার এধারে চলে এল খবরটা নিতে।

তার হাতে বার্তা দেওয়া হল। ধীরে ধীরে বানান করে পড়ে সে বুঝল এটা তার প্রথম সরকারী হুকুম—এই ভাবে বলছে:

"এক্ষুনি জাহাজ নিয়ে রওনা হয়ে যান রিও রুইজ নদীর মোহানায়; মাংস ও খাদ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে যান আলফোরানের ব্যারাকগুলোতে। মার্টিনেজ, জেনারেল।"

দেশের এই প্রথম আহ্বানে গৌরব তেমন নেই সত্যি কথা, তবে ডাক তো এসেছে শেষ অবধি। অ্যাডমিরালের বুকে আনন্দ উদ্বেল হয়ে ওঠে। খঞ্জরখানা সে বেলটের আরেকটা ফুটোয় সরিয়ে দেয়, ঝিমোনো সেপাই-খালাসিদের ঠেলে তোলে। সোয়া ঘণ্টার মধ্যেই 'এল্ নাসিওনাল' কড়া সমুদ্র-বায়ুর ধাক্কায় তীরবেগে ছুটে চলে উপকূল ধরে।

রিও রুইজ্ ছোট্ট নদী। সোলিটাস্ থেকে দশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পড়েছে। উপকূলের ওই অংশটা বুনো, জনপ্রাণীহীন। কর্ডিলেরার গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বেগে ধেয়ে আসছে নদীটা, ঠাণ্ডা আর ফেনিল। তারপর অবশেষে ঢলে পড়ছে চওড়া, মন্দগতি হয়ে পলিমাটির জলাভূমি দিয়ে সমুদ্রে।

'এল নাসিওনাল' দু'ঘণ্টায় নদীর মোহানায় প্রবেশ করল। নদীপাড়ে প্রকাণ্ড গাছগুলো ভিড় জমিয়ে বিন্যস্ত। ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রচুর আগাছা, একেবারে ডাঙা ছেয়ে পিঙ্গল জলে ডুব দিয়েছে। সুলুপটা নিঃশব্দে সেখানে প্রবেশ করে, সামনা হয় আরো গভীর নিস্তব্ধতার। উজ্জ্বল সবুজ, গেরুয়া, আর ফুলের লালিমায়, ছায়াঘেরা নদীমুখ থেকে কোনো ধ্বনি বা চঞ্চলতা জাগে না, শুধু সাগরগামী জলের আওয়াজ ছাড়া—যখন তা জাহাজের গলুইয়ে ঘা খেয়ে কুণ্ডলি পাকায়। এই খাঁ-খাঁ নির্জনতায় কোথা থেকে পাওয়া যাবে গরুমোষের মাংস বা খাবারদাবার?

তবু নোঙর ফেলাই সাব্যস্ত করল অ্যাডমিরাল। শেকলের ঝনঝন আওয়াজে অচিরাৎ সারা বনে যেন জোর প্রতিধ্বনি জেগে উঠল। রিও রুইজের নদীমুখটা সবে তখন ভোর-ঘুম দিচ্ছিল—কাকাতুয়া বেবুনরা কিচমিচ করে উঠল গাছে; জানোয়ার জীবনের ঘুমভাঙার ইঙ্গিত ফর্‌ফর্‌, হিস্‌হিস্‌, গুমগুম আওয়াজে; একটা চমকে-ওঠা টেপির লতাপাতা ঠেলে রাস্তা খুঁজতে এক ঝলক গাঢ় নীল চামড়া মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েছিল।

হুকুম অনুযায়ী 'নৌবহর' ছোট নদীটার মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে। নাবিকরা হাঙর-ডানার স্যুপ, কলা, কাঁকড়া-ঝোল আর টক ক্লারেট মদ দিয়ে খানা পরিবেশন করে। অ্যাডমিরাল একটা তিন-ফুটের দূরবীন দিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরের অভেদ্য গাছগাছালি নিরীক্ষণ করে।

সূর্য প্রায় ডোবে. এমন সময় ওদের বাঁদিকের জঙ্গল থেকে এল 'হ্যাল্লো-ও-ও' ডাক দিয়ে একটা গুর্‌গুরে আওয়াজ। ওরাও জবাব দিল, আর তিনজন লোক, খচ্চরের পিঠে বসা, হুড়মুড় করে বনবাদাড় ভেঙে এসে দাঁড়াল নদীপাড়ের গজ-বারোর মধ্যে। ওখানেই বাহন থেকে নামল; একজন বেল্ট খুলে তার তরোয়ালের খাপ দিয়ে এমন প্রচণ্ড মার কষাল একেকটা খচ্চরের পিঠে যে তারা পেছনের পা ছুঁড়ে পাগলের মতো ছুট লাগাল ফের বনের ভেতরে।

ওই অদ্ভুত-চেহারা মানুষগুলোরই মাংস আর খাদ্যরসদ আনার কথা। ওদের একজন অত্যন্ত চট্‌পটে লোক, দেখার মতো দশাসই চেহারা। নিখাদ স্পেনীয় ছাঁচের, কোঁকড়া কালো চুল, ছাই রঙের ছিটেফোঁটায় নীল ঝক্‌ঝকে চোখ, আর ঘুঘু ষড়যন্ত্রীর চালচলন। অন্য দুজন ছোটখাটো বাদামি-বদন মানুষ, পরনে সাদা ফৌজী উর্দি, উঁচু ঘোড়সওয়ারি বুট, আর তরোয়াল। প্রত্যেকেরই পোশাক ভিজে, কাদা-ছেটা, বন বাদাড়ে ছেঁড়া। কোনো বিশেষ অবস্থার চাপে পড়েই নিশ্চয় ওদের হন্তদন্ত ডবল-মার্চে ছুটতে হয়েছে জলা, কাদা আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

হোঁতকা লোকটা ডাকল, 'এই যে, সেনিওর আলমিরানতে! আমাদের এদিকে আপনার বোট পাঠিয়ে দিন।'

'ডোরি' নামানো হল, একজন ক্যারিবীয়নকে সঙ্গে নিয়ে ফেলিপে দাঁড় বেয়ে চলল বাঁ দিকের পাড়ে।

জলের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল হোঁতকা লোকটা, জটপাকানো আঙুর-লতাপাতাগুলোর মধ্যে কোমরতক ডুবিয়ে। নৌকোর মাথায় কাগতাড়ুয়া মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে লোকটার ভাবচঞ্চল মুখে খুশির উৎসাহ চকচক করে ওঠে। মাসের পর মাস বেতনহীন তারিফহীন চাকরি অ্যাডমিরালের সব চাকচিক্য খুইয়ে দিয়েছে। ওর লাল পাতলুন তালি-মারা ছোঁড়াখোড়া। কোর্তা থেকে বেশির ভাগ চকচকে বোতাম আর হলদে বুনটটা উধাও। টুপির কানাত ছেঁড়া, খোলা চোখের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অ্যাডমিরালের পায়েও জুতো নেই।

'প্রিয় অ্যাডমিরাল,' চেচাঁল বিশালবপু লোকটা, যেন চোঙার ভেতর দিয়ে গাঁক্-গাঁক্ করে গলা, 'আপনার করচুম্বন করি। আমি জানতাম আপনার আনুগত্যের ওপর আমরা ভরসা করতে পারি। আপনি তো আমাদের বার্তাটা পেয়েছিলেন—জেনারেল মার্টিনেজের পাঠানো? আর একটু এগিয়ে আসুন বোট নিয়ে, প্রিয় অ্যাডমিরাল, এই হতচ্ছাড়া সরসরে লতাগুলোর মধ্যে অতি মুশকিলে দাঁড়িয়ে আছি—নিরাপত্তার অভাব।'

অবিচল মুখে তাকে লক্ষ্য করে ফেলিপে।

হুবহু বার্তার বয়ান শোনায়—'আলফোরানের ব্যারাকের জন্য মাংস আর রসদ।'

'কসাই বেচারাদের দোষ নেই, 'আলমিরান্তে মিও,' মাংসের জোগাড় হয়নি

আপনাদের জন্য। কিন্তু গরুমোষ বাঁচাবার পক্ষে ঠিক সময়টিতেই এসে পড়েছেন আপনারা। আমাদের এক্ষুনি জাহাজে তুলে নিন, সেনিওর। ওস্তাদরা, তোমরা আগে যাও! আমার জন্য ফিরে আসবেন। বোটটা বড্ড ছোট।'

ডোরি দু'জন কর্মচারীকে সুলুপে পৌঁছে দেয়, ফিরে আসে হোঁতকা লোকটির জন্য।

জাহাজে উঠেই সে চেঁচায়, 'অ্যাডমিরাল মশাই, জাহাজে মোটা খাবার বলে কিছু আছে, আর, হয়তো কিছু কফি? আপনি মাংস আর রসদের কথা বলছিলেন! ঈশ্বরের দিব্যি—আর একটু দেরি হলে হয়তো ওই খচ্চরদেরই একটাকে মেরে খেতাম। আরে, কর্নেল রাফাইল, তুমিই তো আদর করে ওদের তরোয়ালের খাপের সেলাম জানিয়ে বিদায় করলে! এখন যে খাবার চাই। তারপর পাল তুলে যাওয়া যাবে আলফোরানের ব্যাঙ্ককে, কী বলেন?'

ক্যারিবীয়রা খাবার তৈরি করে, সানন্দ খিদে নিয়ে তার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে এল্ নাসিওনালের তিন 'যাত্রী'। সূর্যাস্তের মুখোমুখি, হাওয়াটা নিয়মমাফিক ঘুরে যায়, পাহাড় থেকে এবার বয়ে আসে, ঠাণ্ডা, একটানা। সঙ্গে আনে বদ্ধ লেগুনের, আর নিচু জায়গায় জটলা করা আমের জঙ্গল-জলার স্বাদ। সুলুপ-জাহাজের প্রধান পাল খাটানো হল, ফোলানোও হল, আর ঠিক সেই সময় ওরা শুনতে পেল বনের গভীর ঝোপঝাড় থেকে চেঁচামেচি আর ক্রমবর্ধমান হাঁকাহাঁকির আওয়াজ।

হোঁতকা লোকটা হেসে বললে, 'কসাইগুলো, প্রিয় অ্যাডমিরাল! মাংস কাটার পক্ষে বড় দেরি করে ফেলেছে।'

নিজের নাবিকদের আদেশ দেওয়া ছাড়া অ্যাডমিরাল অন্য কোনো কথাই বলছে না। চুড়োর পালখানা আর তেকোণা পাশের পাল ছড়ানো হয়েছে, সুলুপও মোহনার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল সরসর করে। খোলা ডেকের ওপর যতটা আরাম করা যায় সেভাবেই বিশাল লোকটা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা হাত-পা মেলে রয়েছে। সম্ভবত ওদের মনে ভারী হয়ে বসেছিল এই সংকটময় উপকূল থেকে উদ্ধার পাওয়ার চিন্তা, আর এখন ঝামেলা অনেকটা কমে যাওয়ায় ওদের চিন্তা হল আরো রেহাই পাবার জন্য কী করা যেতে পারে তা ভেবে দেখা। কিন্তু যখন দেখল সুলুপটা মোড় নিয়ে পাড় ধরে উত্তরেই ফিরে যাচ্ছে তখন তারা অ্যাডমিরালের নেওয়া যাত্রাপথে সন্তুষ্টই হল।

গা এলিয়ে বসেছে হোঁত্কা লোকটা। চন্মনে নীল চোখ দুটো দিয়ে নৌ-অধ্যক্ষের চালচলন যাচাই করে দেখছে। এই গম্ভীর অদ্ভুত লোকটা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়বার চেষ্টা করে সে—দুর্ভেদ্য অবিচল মুখখানা তাকে ধাঁধায় ফেলে। সে নিজে পলাতক, তার অস্তিত্ব আর গতিবিধির সন্ধান চলছে। পরাজয় আর ব্যর্থতার হুল-ফোটানো জ্বালা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে,—এ অবস্থায় তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যই

হল নিজের মনোযোগ সঙ্গে সঙ্গেই একটা নতুন বিষয়ের অনুধাবনে নিয়োগ করা। এই যে শেষ মরীয়া পাগলাটে ফন্দিটা সে মাথায় আনল আর সমস্ত ঝুঁকি নিল তারই ওপরে, সেও তার স্বভাবসিদ্ধ ঢঙেই—একটা বেচারী 'খ্যাপা,' উদ্ভুটে উর্দি আর তামাশার উপাধি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাকে ওই বার্তা তো পাঠিয়েছিল সে-ই। কিন্তু এ জিনিস তার সাঙ্গপাঙ্গদের মাথাতেই আসেনি; পালানো মনে হয়েছে অবিশ্বাস্য। আর এখন, যেটাকে ওরা পাগলামো আর বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল সেই মতলবসিদ্ধিতে সে খুশি।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত গোধূলি, মনে হল যেন ত্বরিতেই মিশে গেল চাঁদনি রাতের মুক্তা-আলোর শোভায়। এবার ফুটে উঠল সোলিটাসের বাতিগুলো, ওদের ডানদিকের আঁধার-হয়ে আসা তীরভূমির রেখায় ছড়ানো। জাহাজের হালের কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডমিরাল, ক্যারিবরা কালো চিতার মতো পাল ধরে আছে, আর কর্তার ছোট-ছোট হুকুম তামিল করছে নিঃশব্দে লাফঝাঁপ দিয়ে। তিনজন যাত্রী একাগ্রে লক্ষ্য করছে তাদের সম্মুখের সাগর। তারপর একসময় যখন একটা স্টীমারের অবয়ব ওদের চোখে পড়ল শহর থেকে একমাইল দূরে নোঙর করা, আলোগুলো জলের গভীর অবধি ছড়িয়ে,—তখন তিনজনই সহসা এক-মাথা হয়ে কোনো শশব্যস্ত আলোচনায় মত্ত হল। সুলুপ তখন সবেগে এগোচ্ছে, যেন স্টীমার আর উপকূলের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা ভেদ করে যাবে।

হোঁতকা লোকটা হঠাৎ দলের সঙ্গীদের ছেড়ে এগিয়ে এল কাণ্ডারী 'কাগতাড়ুয়ার' দিকে। বলল, 'প্রিয় অ্যাডমিরাল, গভর্নমেন্ট অত্যন্ত গুরুতর অবহেলা দেখিয়েছে। সে-অবহেলা যে সমানে চলতে পেরেছে তার কারণ আপনার পরম বিশ্বস্ত সেবা সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা, যার জন্য আজ সমস্ত লজ্জা অনুভব করছি আমি নিজে। ক্ষমার অযোগ্য একটা ভুল করা হয়েছে। আপনার জন্য একটি জাহাজ, একজোড়া উর্দি আর আপনার আনুগত্যের উপযুক্ত একদল নাবিক আপনাকে দেয়া হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে একটা দরকারি কর্তব্যকাজ অপেক্ষা করছে, অ্যাডমিরাল সাহেব! এই যে স্টীমারটা দাঁড়িয়ে আছে 'সালভাডর'—ওতেই উঠতে চাই আমি আর আমার বন্ধুরা, গভর্নমেন্টের কাজেই আমাদের পাঠানো হচ্ছে। আপনি দয়া করে সেইভাবেই পথনির্দেশ করুন।'

কোনো জবাব না দিয়ে অ্যাডমিরাল একটা তীক্ষ্ণ হুকুম দিল, হাল সোজা ঘুরিয়ে দিল বন্দর লক্ষ্য করে। 'এল নাসিওনাল' একটু কাত হয়ে সিধে তীরের মতো তাক করে ছুটল ডাঙার দিকে। বেশ একটু অশান্ত ভাব করে হোঁতকা লোকটা বললে, 'দয়া করে অন্তত এটুকু আমায় বুঝতে দিন যে আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন।'—হতে পারে ও-বান্দার যেমন বুদ্ধির অভাব, তেমনি হয়তো অনুভূতিশক্তিরও অভাব।

অ্যাডমিরাল একটা খরখরে কর্কশ হাসি উগরে দিয়ে অবশেষে কথা বলল।

'ওরা তোমাদের দেয়ালের সামনে মুখ করিয়ে দাঁড় করাবে, তারপর গুলি করে মারবে। ওভাবেই ওরা বেইমানদের মারে। যখন আমার বোটে উঠেছিলে তখনই চিনেছিলাম তোমাকে। একটা কেতাবে তোমার ছবি দেখেছি। তুমি সাবাস প্লাসিদো, তোমার নিজের দেশের বেইমান শত্তুর। দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। ওইভাবেই তুমি মরতে যাচ্ছ। আমি অ্যাডমিরাল, আমিই তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে।'

ডন সাবাস হাসির ঝঙ্কার তুলে, একটু কাত হয়ে ঘুরে হাতের ইশারা করল সঙ্গী পলাতকদের দিকে—'সাগরেদরা, তোমাদের তো বলেছিলাম সেই পানোৎসবের ইতিহাস যখন সেই 'আ-মরি' হাস্যকর "কার্যভার অর্পণের" দলিলটা আমরা বের করি? সত্যি বলতে, আমাদের সেই তামাশাই এখন আমাদের দুশমন হল। এখন দেখ সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানব! আমাদেরই হাতে গড়া!'

ডন সাবাস পাড়ের দিকে এক লহমা তাকায়। সোলিটাসের আলোগুলো ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। সে দেখতে পায় সৈকতটা, বোডেগা নাসিওনালের গুদামবাড়ি, সৈনিকদের আস্তানা লম্বা নিচু শিবিরটা, আর তারও পেছনে জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল একটানা উঁচু পোড়া-ইটের দেয়াল। সে আগেও দেখেছিল ওই দেয়ালের সামনে মুখ করে বন্দীদের দাঁড়াতে, গুলি খেয়ে মরতে।

আবার সে হাল ধরে-দাঁড়ানো অতি-জমকালো সাজা মূর্তিটাকে উদ্দেশ করে বলে, 'এটা সত্যি কথা যে আমি দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি। কিন্তু ভাল করে শুনে রাখুন সেজন্য আমার বড় বয়েই গেছে! সারা দুনিয়ার রাজসভা আর শিবির সাবাস প্লাসিদোর জন্য উন্মুক্ত। হা! আমার মতো লোকের কাছে এ উইয়ের-ঢিবি প্রজাতন্ত্র, শুয়ারের মাথা দেশের মূল্য কী? আমি সব দেশের নাগরিক। রোমা, লঁদ্রে, ভিয়েনা, নুয়েভো ইয়র্ক, মাদ্রিদ, সব শহরেই শুনবেন "স্বাগত ডন সাবাস, আসুন, আসুন!" এবার আসুন। জলদি—খোকা বেবুন, অ্যাডমিরাল যাই বলুন নিজেকে—জাহাজটা ঘোরান! 'সালভাডরে' তুলে দিন আমাদের, আর এই রইল আপনার মাইনে—"এস্টাডোস ইউনিডসের" (যুক্তরাষ্ট্রের) টাকায় পাঁচশো পেসো—আপনার মিথ্যুক গভর্নমেন্ট কুড়ি বছরেও যা দেবে না।'

একটা মোটাসোটা থলি নাবিকের হাতে ঠেলে দেয় ডন সাবাস। অ্যাডমিরাল তার কথা বা ভঙ্গি কোনোদিকেই মন দেয় না। হালের সামনে আঁটসাট দাঁড়িয়ে, সুলুপটাকে সিধে নিয়ে চলেছে তীর-মুখী পথে। কোনো আন্তরিক অহঙ্কার তার ভোঁতা মুখটার ওপর প্রায় বুদ্ধির আলো ছড়িয়ে দিয়েছে, এতেই জাগছে তার আনন্দ, এই বুদ্ধিই মুখর হল আবার এক কাকাতুয়া-কলকণ্ঠে।

বলল, 'ওইজন্যাই তো ওরা এটা করে, যাতে তোমরা বন্দুকটা না দেখতে পাও। ওরা গুলি চালায়-বুম্, আর তোমরা মুখ থুবড়ে পড়। হ্যাঁ ওইজন্যাই মুখগুলো থাকে দেয়ালের দিকে ফেরানো।'

আচম্‌কা অ্যাডমিরাল একটা হুকুম দেয় নাবিকদের। নমনীয় নীরব ক্যারিবরা ধরে-থাকা পালগুলো জড়িয়ে ফেলে, তারপর পাটাতনের ফোকর-পথ দিয়ে নেমে যায় সুলুপের খোলের মধ্যে। শেষ লোকটা অবধি নিচে চলে যেতে, ডন সাবাস একটা বড় বাদামি গুলবাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে ফোকরের মুখের ঢাকনাটা বন্ধ করে দেয়, তারপর দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

'দয়া করে কোনো রাইফেল্স নয়, প্রিয় অ্যাডমিরাল। এক সময়ে আমার একটা খেয়াল চেপেছিল, ক্যারিবদেব 'ভাষার' একটা অভিধান লিখব। তাই আপনার আদেশটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। হয়তো এখন আপনি—'

মাঝখানেই কথা বন্ধ করে সে, কারণ শুনতে পায় টিনের ভেতর থেকে ইস্পাত পেরিয়ে আসার তীক্ষ্ণ "হিশ্" শব্দটা। অ্যাডমিরাল তার খঞ্জর বের করেছে, আর ছুটে আসছে তারই দিকে। অস্ত্রের ধারালো দিকটা নেমে এল, কিন্তু একটা বিস্ময়কর সতর্কতার পরিচয় দিয়ে হোঁতকা লোকটা কাটিয়ে এসেছে ক্ষিপ্র অস্ত্রের আঘাত। শুধু কাঁধ ছড়ে গেছে। লাফ দিয়ে উঠেই সে নিজের পিস্তল বের করল, আর পরের মুহূর্তে অ্যাডমিরালকে গুলি করে নিচে ফেলে দিল। ডন সাবাস তার ওপর একবার ঝুঁকে পড়ে ফের উঠে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে ক'টা কথা বলে শুধু—'ওঁর শেষ যাত্রা। সেনিওরগণ, নৌবহর খতম করা হল!'

কর্নেল রাফাইল ছুটল হালের দিকে; অন্য অফিসারটা চট্‌পট প্রধান মাস্তুলের পাল খুলতে লাগল। পাল বাঁধা কাঠের দণ্ড ঘুরে গেল আরেকদিকে। একটা সাবলীল বাঁক নিয়ে 'এল নাসিওনাল' পরিশ্রম করে এগোতে লাগল 'সালভাড়রের' দিকে।

কর্নেল রাফাইল চেঁচাল, 'সেনিওর, ওই পতাকাটা নামিয়ে ফেলুন। আমাদের স্টীমারের বন্ধুরা অবাক হয়ে ভাববে আমরা এ-পতাকার নিচে সুলুপ চালাচ্ছি কেন!'

'ঠিক বলেছ', বলল ডন সাবাস। মাস্তুলের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে পতাকাটা নামিয়ে আনল একেবারে যেখানে শুয়ে আছে পতাকার অনুগত সমর্থকটি। এইভাবে শেষ হল যুদ্ধমন্ত্রীর সামান্য ভোজনান্তিক বসিকতাটুকু; যে-হাতে তার সৃষ্টি সে-হাতেই সমাপ্তি।

হঠাৎ ডন সাবাস আনন্দে বিকট চিৎকার করে ওঠে। ঢালু ডেক বেয়ে নেমে আসে কর্নেল রাফাইলের পাশে। অবলুপ্ত নৌবহরের পতাকাটা তার বাহুর ওপর আড়াআড়ি রেখে বয়ে এনেছে।

'দেখ, দেখ! সেনিওর। আঃ ভগবান্! এর মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি অস্ট্রিয়ার সেই মোটা ভালুকটার চিৎকার—"দু হাস্ট মাইন হের্জ্ গেব্রোখেন! (আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছ তুমি)" আমার বন্ধু ভিয়েনার সেই হের গ্রুনিৎসের কথা তো বলেছি তোমাদের। সেই লোক একটা অর্কিড ফুলের খোঁজে সিলোন গিয়েছে, একখানা টুপির জন্য প্যাটাগোনিয়া, এক জোড়া চটির জন্য বেনারস, একটা বল্লমের ডগার জন্য মোজাম্বিক—সব তার বিখ্যাত দুষ্প্রাপ্য-সংগ্রহে নতুন কিছু যোগ করতে। এও তুমি জান রাফাইল দোস্ত, যে আমি একজন দুর্লভ বস্তুর সংগ্রাহক। পৃথিবীর যাবতীয় নৌবহরের যুদ্ধ-পতাকা নিয়ে আমার যা সংগ্রহ, তা গত বছর অবধি বিশ্বের সম্পূর্ণতম বিদ্যমান সংগ্রহ বলে জানা ছিল। তারপর হের গ্রুনিৎস যোগাড় করলেন দুটো—ওহো! অতিবিরল নমুনা। একটা এক বার্বারি (উত্তর আফ্রিকা) রাজ্যের, দু'নম্বরটা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কোনো ম্যাকারুরু জাতির। ওগুলো আমার নেই, তবে যোগাড় করা যায়। কিন্তু এই যে পতাকাখানা, সেনিওর—জানো এটা কী? ঈশ্বরের নামে বল, জানো তুমি? নীল আর সাদা জমির ওপর এই লাল ক্রসটা দেখছ! আগে কখনো দেখনি তো? নিশ্চয়ই না.....! এ হল তোমার দেশের নৌবাহিনীর পতাকা। mire! আর এই যে পচা গামলাটার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এ হল তার নৌবহর—আর ওই যে মরা কাকাতুয়া ওখানে পড়ে আছে সে ছিল এর কমান্ডার—ওই খণ্ডরের ঘা আর একটিমাত্র পিস্তল গুলি, এই হল সমুদ্দুরের নৌযুদ্ধ। সবই বোকা-তামাশার চূড়ান্ত, তবে হ্যাঁ, খাঁটি সত্য ঘটনা। এই পতাকার মতো পতাকা আগে কোনোদিন কোথাও হয়নি, আর হবেও না কখনো। না, এটা হল সারা দুনিয়ার মধ্যে অদ্বিতীয়। হ্যাঁ। একজন পতাকা-সংগ্রাহকের কাছে এর মূল্য কী তা বোঝো? "করোনেল মিও", তুমি জান এই পতাকার জন্য কত শত সোনার ক্রাউন দিতে পারেন হের গ্রুনিৎস? দশ হাজার হয়তো-বা! বলছি, একশো হাজারেও এ জিনিস কেনা যাবে না। চমৎকার পতাকা! একমাত্র পতাকা! এ যে স্বর্গে জন্মানো ছোট্ট শয়তান পতাকা! এই যে! সাগরের ওপার থেকে খুঁতখুতে বুড়ো, শুনছ? সবুর কর, ডন সাবাস্ আবার ক্যোনিগিন স্ট্রীটে আসছে। সে তোমায় শুধু এক আঙুলে এটার ভাঁজ ছুঁতে দেবে, হাঁটু গেড়ে বসে, ব্যস—ও হে চশমাআঁটা বুড়ো, সারা দুনিয়াতো তন্নতন্ন খোঁজো!—'

সব ভুলে যাওয়া হয়েছে—ব্যর্থ বিপ্লব, বিপদ, লোকসান, পরাজয়ের গ্লানি। সংগ্রাহক-সুলভ সীমাহীন স্বতন্ত্র আবেগে পুরোপুরি মত্ত হয়ে সে ছোট ডেক্‌টার এদিক-ওদিক পা দাপিয়ে বেড়ায়, এক হাতে বুকের কাছে চেপে ধরে থাকে অতুলনীয় পতাকাটা। পুবের দিকে বিজয়গর্বে আঙুলের তুড়ি মেরে দেখায়।

তার এই পরম ধনের গুণগান করে ভেঁপু বাজায় যেন, বুড়ো গ্রুনিংসকে যে শোনাতেই হবে।

'সালভাডর' জাহাজে ওরা অপেক্ষা করছিল ওদের স্বাগত জানাতে। সুলুপটা স্টীমারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল—প্রায় নিচের ডেকের সমান করে পাশের দিক কাটা, যাতে ফলপাকড়ের বোঝা তোলা যায়। 'সালভাডর'-এর খালাসিরা ওটাকে ধরে ওখানেই বেঁধে রাখল।

স্টীমারের ধার থেকে ঝুঁকে পড়ল কাপ্তেন ম্যাকলিয়ড। 'এই যে সেনিওর, খেল তো খতম শুনলাম!'

'খেল খতম ?'—মুহূর্তেক হতভম্বভাবে তাকাল ডন সাবাস— 'ওই বিপ্লব—আঃ, ওই ব্যাপার ?' একবার কাঁধ ঝাড়া দিয়ে সে ব্যাপারটাই নস্যাৎ করে দিল।

কাপ্তেন শুনল পলায়ন, আর বন্দী-করা নাবিকদের বিবরণ, বললে, 'ক্যারিব' ? ওদের দিয়ে কোনো ক্ষতি হবার নেই।'—সাঁৎ করে নেমে এল সুলুপের মধ্যে, ফোকরদরজার পাল্লাটা লাথি মেরে আলগা করে দিল। কালো মানুষগুলো টলতে টলতে ওপরে উঠে এল, ঘামছে, তবু দাঁত বের করে হাসছে।

কাপ্তেন তার নিজস্ব ভাষায় বললে, 'ওহে! কালো ছোঁড়ারা! তোমরা সবে ক্যাচি বোট, ফিরে যাও নিজেদের জায়গায়, কুইক্‌।' ওরা দেখল কাপ্তেন ওদের দিকে, তারপর সুলুপজাহাজ আর সোলিটাসের দিকে এক এক করে আঙুল দেখাল। 'ইয়াস্‌ ইয়াস্‌!' চেঁচিয়ে উঠল তারা আরো চওড়া হাসি আর অজস্রবার মাথা নোয়ানোর সঙ্গে।

চারজন—ডন সাবাস, দু'জন অফিসার আর কাপ্তেন—এবার সুলুপ ছেড়ে স্টীমারে উঠতে যাচ্ছে। ডন সাবাস একটু পেছনে পড়ে গিয়ে মৃত অ্যাডমিরালের নিশ্চল দেহটার দিকে তাকায়। নগণ্য সাজসজ্জায় সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

ডন সাবাস নরম গলায় বললে, 'বেচারী-খ্যাপা'।

সে একজন দীপ্তিমান বিশ্বনাগরিক, উচ্চমর্যাদার পদ সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত; কিন্তু তাহলেও সে তো এই জাত, এই রক্ত আর এই মানুষগুলোর সংস্কার নিয়েই জন্মেছিল। সোলিটাসের সামান্য জেন্টুরা যা বলত, ডন সাবাসও বলল সেই কথাটাই। একটুও না হেসে, তাকিয়ে থেকে বলল: 'বেচারী খ্যাপা মানুষটা।'

নিচু হয়ে অ্যাডমিরালের শিথিল কাঁধদুটো উঁচু করে ধরল, অমূল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী পতাকাটা টেনে দিল কাঁধের তলায় আর বুকের ওপরে, তারপর নিজের কোটের কলার থেকে "অর্ডার অব সান কার্লোস্‌"-এর হীরক তারকাটা খুলে আটকে দিল সেই বুকের ওপর।

অন্যদের পেছু নিয়ে সে উঠে এল, ওদের সঙ্গেই দাঁড়াল 'সালভাডর'-এর ডেকে। নাবিকরা যারা 'এল নাসিওনাল'কে ধরে রেখেছিল, তারা ধাক্কা মেরে

ও়াকে এগিয়ে দিল। বক্‌বক-করা ক্যারিবরা টেনে নিল দড়িদড়া, সুলুপ চলল সাগর তটের দিকে; আর হের গ্রুনিৎসের নৌ-পতাকার সংগ্রহ এখনো সারা বিশ্বের সবসেরা হয়েই থাকল।

The Flag Paramount. এইন্‌স্‌লি, ১৯০২ (পরে অলিভিয়ের হেনরি ছদ্মনামে)

দিবাস্বপ্ন ও বোতল-বার্তা

কনসাল তাঁর বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে গড়িমসি করে কাজ সারছেন। অত হাজার কাঁদি কলা; অত হাজার কমলালেবু আর নারকোল; অত শত আউন্স স্বর্ণরেণু, পাউণ্ডকে-পাউণ্ড রবার, কফি, নীল, আর সার্সাপারিলা—সত্যি বলতে রপ্তানি আর আমদানি বেড়েছে কুড়ি শতাংশ, আগের বছরের চেয়েও বেশি।

কনসালের দেহে তৃপ্তির রোমাঞ্চ জাগে খানিকটা। হয়তো রাষ্ট্র বিভাগ ওঁর রিপোর্টের ভূমিকা পড়েই ... এবারে উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসেন। বাকি আর-সবার মতোই বদখত হয়ে যাচ্ছেন তিনি। এক মুহূর্তে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে টাগালন দ্বীপটা একটা অতি নগণ্য প্রজাতন্ত্রের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশ, পাণ্ডববর্জিত কোনো সাগরের নিরালা গলির মধ্যে তন্দ্রামগ্ন। মনে পড়ল সংক্রামক-রোধের ডাক্তারটির কথা। তিনি লণ্ডনের "ল্যানসেট" পত্রিকার গ্রাহক, আশায় থাকেন কবে তাতে তাঁর পীত-জ্বরের জীবাণু সংক্রান্ত বিবরণটা পুনরায় ছাপা হবে। সে বিবরণ তিনি টাগালন থেকে পাঠিয়েছিলেন নিউ অর্লিয়ন্সের স্বাস্থ্য পরিষদে। কনসাল জানেন, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে পঞ্চাশজনের একজনও টাগালনের নাম শোনেনি। উনি এও জানেন যে অন্তত দু'জন ব্যক্তিকে তাঁর এই রিপোর্টটা পড়তেই হবে— রাষ্ট্রবিভাগের কোনো ওঁচা কেরানি, আর সরকারী ছাপাখানার কম্পোজিটর। সম্ভবত মুদ্রক ভদ্রলোকই দেখবেন টাগালনে বাণিজ্যবৃদ্ধির খবরটা, হয়তো বলবেনও তাঁর চেনাজানা কাউকে।

ভূমিকাতে তিনি সবে লিখছেন—"সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয় আমাদের বৃহৎ রপ্তানিকারীদের আলস্য, তারা নির্বিবাদে ছেড়ে দিচ্ছে ফরাসী আর জার্মান ব্যবসাদারদের, আর ওরাই প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করছে বাণিজ্য স্বার্থ, এই সম্পদশালী উৎপাদনশীল—" এমন সময় তাঁর কানে এল একটা স্টীমারের ভেঁপুর ভাঙা-কর্কশ আওয়াজ।

উইলার্ড গেডি কলম ছেড়ে পানামা টুপি আর ছাতাটা তুলে নিলেন। কনসাল-দপ্তর

থেকে পা চালিয়ে বাইরে এসে একটা ছায়াচ্ছন্ন অথচ ঘুর-পথ ধরে চলে এলেন সমুদ্রসৈকতে। জাহাজটা তো সেই "ভালহাল্লা"—নিয়মিত ফলসংগ্রহের পথে যাতায়াত করে, অথচ তাকেই দেখতে টাগালনের অর্ধেক অধিবাসী জড়ো হয়েছে সমুদ্রতীরে, তাদের স্বভাবসিদ্ধ কেতায়। দ্বীপে কোনো পোতাশ্রয় নেই; "ভালহাল্লা"র মাপের জাহাজগুলো সব সমুদ্রপাড় থেকে একমাইল দূরে নোঙর করে।

অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে কনসাল ঠিক গুনে-গুনে এমন মাপে পা ফেলে আসেন যে পৌঁছোবার আগেই শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা দাঁড় বেয়ে নৌকো নিয়ে তাদের কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছে, তাদের সঙ্গে জাহাজের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী—ডাঙায় এসে নৌকো সবে পাথরের ওপর ঘষা খেয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলেজের বেস্‌বল টিমে গেডি ছিলেন ফার্স্টবেস্‌ খেলোয়াড় হিসেবে রত্ন। উনি এবার ছাতাটা বন্ধ করে ওটার মাথা গুঁজে দিলেন বালিতে। তারপর দু'হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে রইলেন সামনে। কর্মচারী লোকটিও বলছোঁড়ার অঙ্গভঙ্গি নকল করে, যথাশক্তি প্রয়োগ করে দড়ি-বাঁধা কাগজের ভারী পুলিন্দাটা ছুঁড়ে দিল তাঁর দিকে। স্টীমার হামেশাই কনসালের জন্য এরকম পুলিন্দা আনে। গেডি লাফিয়ে উঠলেন উঁচুতে, পুলিন্দাটা ধরলেন সশব্দ 'টপাক্‌' করে। সৈকতের আড্ডাবাজেরা হেসে তুমুল আনন্দে হাততালি দিল। প্রতি সপ্তাহে ওরা প্রত্যাশা করে এই ভাবেই কাগজের বাণ্ডিলটা ছোঁড়া হবে আর ধরা হবে। হতাশও হয় না কোনোবারই। কোনো রকমের নতুন কেরামতি টাগালনে পৌঁছোয়নি।

গেডি ছাতা তুলে নিয়ে আবার অলস গতিতে ফিরে চললেন কনসাল বাড়ির দিকে। দু'কামরার কাঠের বাড়ি। পুরোটা ঘিরে দেশীয়দের তৈরি বাঁশ আর নিপা-তালকাঠের ঘেরা বারান্দা। খানিকটা জীর্ণ এক ফালি 'তারা-আর-ডোরা' ঝুলছে দরজার ওপরের ডাণ্ডা থেকে, একটা কামরায় সরকারী বিভাগ। এক সেট সোজা-পিঠ বেতের চেয়ার, একটা বাঁশের 'কাউচ্‌', আর রাষ্ট্রের কাগজপত্র-ছড়ানো সমতল ডেস্‌ক্‌ দিয়ে ছিমছাম সাজানো। দেয়ালে প্রথম প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান প্রেসিডেন্টের ছবি। অন্য কামরাটা গেডির ব্যক্তিগত বসবাসের জন্য।

সৈকত থেকে যখন তিনি ফিরলেন তখন এগারটা বাজে, অতএব প্রাতরাশের সময়। ওঁর জন্য রান্নাবান্না করে যে কারিব মেয়েটি, চাঙ্কা, তখন সবে বারান্দার দিকের একটা ছায়া জায়গায় ছোট টেবিলে পরিবেশন করতে শুরু করেছে। খানা বলতে হাঙর-ডানার স্যুপ, মেঠো কাঁকড়ার স্টু, রুটিফল, ঝল্‌সানো ইগুয়ানার টুকরো, সদ্য-কাটা আনারস, ক্লারেট আর কফি।

কনসাল আসনে বসে বিলাসের আলস্যে তাঁর খবরকাগজের বাণ্ডিলখানা খুললেন। এখন দু'দিন টাগালনে বসেই উনি বাইরের জগতের খবরাখবর পড়বেন, ঠিক যেমন আমরা পৃথিবীর মানুষরা মঙ্গলগ্রহে কী ঘটছে না-ঘটছে তার বর্ণনা করে

অ-যথার্থ বিজ্ঞানের খেয়ালী-অবদানগুলো পাঠ করি। ওঁর যখন পড়া শেষ হবে, তখন কাগজগুলো দ্বীপের গোটা-ছয় ইংরেজি-ভাষী পরিবারের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবে।

যে-কাগজটা ওঁর হাতে প্রথম এল, সেটা ভাগ্যক্রমে ছাপা বস্তুর মোটাসোটা চটখানা, যা মাটিতে পেতে রবিবারের দিন নাকি ঘুমোয় কতগুলো বিশেষ নিউইয়র্ক-পত্রিকার পাঠকবৃন্দ। ওটা খুলে কনসাল বিছিয়ে দিলেন টেবিলে আর চেয়ারের পেছনে। তারপর ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করলেন, মাঝে মধ্যে পাতা উলটে, আর অলসভাবে সূচীপত্রগুলো দেখে। হঠাৎই একটা ছবিতে পরিচিত কিছু দেখে চমকিত হলেন— আধপাতা জুড়ে বিশ্রি ছাপা একটা জাহাজের ফোটো। নিস্তেজ উৎসাহে আরেকটু ঝুঁকলেন কাছ থেকে নিরীক্ষণ করতে। দেখতে হচ্ছে নিচের আধ কলমগুলো জুড়ে ছাপা পেচাঁনো বড় অক্ষরের হেডলাইনও।

না, ভুল তিনি করেননি। ছবিটা হল ৮০০ টন বাষ্পীয় প্রমোদতরী "আইডালিয়া"-র ফোটোচিত্র। ইয়টটির মালিক সজ্জনদের রাজকুমার, মুদ্রা-বাজারের মিডাস (যা ছোঁন তাই সোনা হয়) আর সমাজের পরমোৎকর্ষ— জে. ওয়ার্ড টোলিভার।

ধীরে কালো কফিতে চুমুক দিতে-দিতে গেডি ছবির তলার লাইনগুলো পড়তে থাকেন। মিঃ টোলিভারের স্থাবর সম্পত্তি আর বণ্ড ইত্যাদির তালিকার পরেই প্রমোদতরীর সাজসজ্জা নিয়ে একটা বর্ণনা, আর তারপর খবরের আসল দানাটি, যা 'একটা সর্ষের দানার চেয়ে বড়' নয়! পরের দিন মিঃ টোলিভার ছ'সপ্তাহের ভ্রমণে বেরুচ্ছেন—সঙ্গে নিমন্ত্রিত অতিথিরা। যাবেন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ধরে, বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে। অতিথিদের মধ্যে থাকছেন নরফোকের মিসেস্ কাম্বারল্যাণ্ড পেইন ও মিস্ আইডা পেইন।

লেখক তার নিজের গোষ্ঠিসুলভ বোকা ধারণা নিয়ে গড়ে তুলেছে তার পাঠকদের মুখরোচক একটা রোমান্স গল্প। মিস্ পেইন আর মিঃ টোলিভারের নাম এক বন্ধনীতে যুগলবন্দী করেছে, আর শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানটি বাদে সব মন্ত্রই পড়ে ফেলেছে! লুকোচুরি খেলে কটাক্ষ করেছে— 'শোনা যায়', 'ছোট পাখির কথায়', 'শ্রীমতী জনশ্রুতি' আর 'কেউ এতে আশ্চর্য হবেন না' ইত্যাদির সূত্র ছেড়ে। শেষে অভিনন্দন।

গেডি প্রাতরাশ সেরে কাগজগুলো নিয়ে গেলেন পশ্চিমের বারান্দার দিকে, সেখানে তাঁর প্রিয় 'স্টীমার-কেদারায়' বসলেন পা-দুটো বাঁশের রেলিঙের ওপর তুলে দিয়ে, একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে। যা পড়লেন তাতে একটুও বিচলিত হননি বুঝে তৃপ্তিই উপভোগ করছেন। হ্যাঁ, তাহলে জয় করেছেন নিজের ব্যথা। আইডাকে তিনি কখনো ভুলতে পারেন না। কিন্তু তার

কথা ভাবলে এখন আর মনে কষ্ট হয় না। ওদের সেই ঝগড়াটা যখন হয়েছিল, তিনি হঠাৎ আবেগবশে বেছে নিয়েছিলেন এবং পেয়েও গিয়েছিলেন দূর বিদেশে কনসালগিরির কাজ; মনে একমাত্র বাসনা ছিল ওর পৃথিবী, ওর অস্তিত্ব থেকে নিজেকে ছিন্ন করে ওর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। প্রথম কাজটাতে তো তিনি পুরোপুরি সফল হলেন। আঠারো মাস উনি টাগালনের কনসাল হয়ে রয়েছেন, দু'জনের মধ্যে আর একটি কথাও চালাচালি হয়নি। স্বল্প সংখ্যক বন্ধু যাদের তিনি এখনো চিঠি লেখেন— অতি কালেভদ্রে, তাদের কাছেই সংক্ষেপে ওর কথা একেকবার শুনতে পান। ও যে এখনো বিয়ে করেনি সেই সামান্য তৃপ্তির শিহরণ তিনি চেপে রাখতে পারেন না! না, টোলিভারকে নয়, আর-কাউকেও সে বিয়ে করেনি। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে টোলিভার এখনো হাল ছাড়েনি।

যাক্, এখন এতে ওঁর কী এল-গেল? উনি জলপদ্মের স্বপ্নমধু খেয়েছেন। এই চিরস্থায়ী গোধূলির দেশে তিনি তৃপ্ত ও সুখী। বরং বিরক্তিকর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় স্টেট্‌স্-এর সেই উন্মুখ জীবনের পুরনো দিনগুলো। আশা করেন আইডাও ওঁর মতোই সুখী হবে। সেই সুদূর আভালোনের মতোই স্বাস্থ্যকর এখানকার আবহাওয়া। বন্ধনহীন, কাব্যময় স্বপ্ন-দিনে ঘেরা; এই কল্পনাবিলাসী অলস মানুষগুলোর মাঝে জীবন, সঙ্গীত ফুল আর লঘু হাসিতে ভরা; তার ওপর গা-ঘেঁষে ওই পাহাড় আর সমুদ্র, শুভ্র ক্রান্তীয় রাতগুলোতে ফুটে ওঠা প্রেম, জাদু আর সৌন্দর্যের নানা বিচিত্র রূপ—এ সব নিয়েই তিনি যার-পর-নাই পরিতৃপ্ত। তা ছাড়া, পলাও তো রয়েছে, পলা ও'ব্রানিগান।

গেডি বিয়ে করতে চান পলাকে—অবশ্য সে যদি রাজি থাকে। কিন্তু উনি পলার অনুভূতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত। তবু কেন যেন নিজের প্রস্তাব দান মুলতুবিই রেখে যাচ্ছেন। অনেকবারই প্রায় আসন্ন হয়েছিল ব্যাপারটা। কিন্তু রহস্যময় কিছু যেন তাঁকে রুখে দিয়েছে। হয়তো নেহাৎই এক অবচেতন ধারণা যে সে-কাজ করলে পুরনো পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর শেষ বাঁধনটিও ছিন্ন হয়ে যাবে।

জীবনে পলার সঙ্গ পেলে খুবই সুখী হতে পারবেন তিনি। ওর সঙ্গে দ্বীপের আর কোনো মেয়ের তুলনাই হয় না। পলা দু'বছর স্টেট্‌সের স্কুলে কাটিয়েছে; ও যখন খেয়াল রাখে, তখন ওর সঙ্গে নরফোক ম্যানহাটানের মেয়েদের কোনো তফাত কেউ ধরতেই পারে না। কিন্তু স্বদেশের ঘরেই ওকে চমৎকার মানায়। বিশেষ করে মাঝে-মাঝে যখন স্থানীয় পোশাক পরে, খোলা কাঁধ আর ঢলঢলে আস্তিনের।

বার্নার্ড ও'ব্রানিগান টাগালনের সেরা ব্যবসায়ী। সচ্ছল বললে খুব কমই বলা হয়। থাকেন দোতলা বাড়িতে, ঘরে 'আমদানি-করা' আসবাব পত্র, প্রতিটি চিলতেই নিউ অর্লিয়ন্সের। পলার মা উচ্চ ক্যাস্টিলিয়ান (স্পেনীয়) বংশের স্থানীয় মহিলা,

তবে জলপাইরঙের গালের মধ্যে বাদামির ছোঁয়াও দেখা যায়। আইরিশ আর স্পেনীয়র মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—সচরাচর হয়—এক বিরল সৌন্দর্য আর প্রাণবন্ত প্রজন্মের। খুবই চমৎকার মানুষ ওরা। আর বাড়ির ওপরতলাটাও প্রস্তুত রয়েছে গেডি আর পলার সেবার জন্য—মানে যখনই উনি কথা পাড়ার জন্য মনস্থির করবেন।

দু'ঘন্টার মধ্যেই কনসাল কাগজ পড়ে-পড়ে ক্লান্ত হলেন। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সংবাদপত্র। হেলান দিয়ে শুয়েই দেখতে লাগলেন এক সত্যিকারের স্বর্গোদ্যান। ওঁর ওপর রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একঝাড় কলাগাছ, তাদের চওড়া পাতার ঢাল তুলে। কনসাল-বাড়ি থেকে সমুদ্র অবধি ক্রমান্বয়ে ঢালু জমিটা ভরে আছে সদ্য-ফোটা ফুলে ঢাকা বাতাবি লেবু আর কমলালেবুর ঘন সবুজ পাতায়। খাঁজ-কাটা একটা লেগুন হ্রদ স্থলভাগে ঢুকে পড়েছে কালো স্ফটিকের মতো, ওপরে পাংশু 'সেইবা' গাছগুলো যেন মেঘচুম্বী। সৈকতে দোলায়মান নারিকেল-তাল পাতা সবুজের শোভা তুলে ধরেছে প্রায়-শান্ত সাগরের স্লেট-কালো পটে। বেড়াগাছের লালচে সবুজের ফাঁকে উজ্জ্বল লাল আর গেরুয়া গেডির চোখ এড়ায় না, গন্ধও পান ফল-ফুলের, 'কালাবাশ' গাছের নিচে চাক্কার মাটির উনোন থেকে ধোঁয়ার গন্ধ, শুনতে পান কুটিরগুলোতে এদেশী মেয়েদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাসি, রবিন• পাখির গান, আর নোনা স্বাদ পান হাল্‌কা হাওয়ায়। সমুদ্রপাড় ধরে ক্ষীণ ফেনিল ঢেউয়ের ক্রমহ্রাসমান ধ্বনি। তারপরে ধীরে-ধীরেই নজরে পড়ে একটা সাদা বিন্দু অস্পষ্ট অবয়বের মতো বড় হয়ে, জোর করে ঢুকছে সমুদ্রের নিকষ কালো দৃশ্যপটে।

অলস আগ্রহ নিয়েই তিনি অস্পষ্ট বস্তুটাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন—যতক্ষণ-না সেটা হয়ে দাঁড়াল "আইডালিয়া"। পুরো বেগে বাষ্প উদ্‌গীরণ করে আসছে তটরেখা ধরেই। যে অবস্থায় বসে আছেন সেভাবেই তিনি তাকিয়ে থাকলেন সুন্দর সাদা ইয়টটার দিকে। তরী সবেগে আরো কাছাকাছি এসে গেল, এবার টাগালনের ছোট গ্রামটার মুখোমুখি। তারপর সিধে হয়ে বসে গেডি দেখলেন, "আইডালিয়া" এক নাগাড়ে পাশ কাটিয়ে সোজাই চলে যাচ্ছে। মাত্র এক মাইল দূরত্ব তাকে ডাঙা থেকে পৃথক করে রেখেছে। তরীর পালিশ করা পেতলকাজগুলো আর ডেকের চাঁদোয়ার ডোরা মাঝে মাঝেই ঝলকে উঠল ওঁর চোখের সামনে—ব্যস্ এইটুকুই, এর বেশি নয়। পর্দায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সরে-যাওয়া ছবির মতো "আইডালিয়া" পার হয়ে গেল কনসালের ক্ষুদ্র জগতের আলোর বৃত্ত—একেবারে চলেই গেল। সমুদ্রের কিনারায় রেখে-যাওয়া ওইটুকু ভাসমান ধোঁয়ার মেঘ চিহ্ন ছাড়া, তাকে মনে হতে পারত একটা অবাস্তব বস্তু— কনসালের অলস মস্তিষ্কের অসার কল্পনা।

গেডি নিজের দপ্তরে ফিরে আসেন। বসে তাঁর রিপোর্টটা নিয়ে কালক্ষেপ করেন। খবরের কাগজের বিবরণটা পড়ে তিনি যদি বিচলিত না হয়ে থাকেন, তাহলে "আইডালিয়া"র এই নীরব প্রস্থানও তাঁকে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। পরিস্থিতির মধ্যে এমন একটা নির্ঝঞ্ঝাট শান্তি এনে দিয়েছে যার ফলে সমস্ত অনিশ্চয়তাই কেটে গেল। উনি জানেন মানুষ অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতেই কিছু আশা করে। এখন, দু'হাজার মাইল দূর থেকে এসেও সে যখন কোনো ইঙ্গিত না দিয়েই চলে গেল, ওঁর অবচেতন মনেরও কোনো তাগিদ নেই অতীতকে দীর্ঘদিন আঁকড়ে রাখার।

দিবাহারের পর, সূর্য যখন নিচে নেমে যাচ্ছে, গেডি হেঁটে গেলেন নারকোল গাছের নিচের ওই বালুসৈকতটুকুর দিকে। বাতাস স্থলমুখী, সমুদ্রে ছোট ছোট তরঙ্গের বিস্তার।

একটা মাঝারি গোছের ঢেউ মৃদু 'সুশ্' করে ছড়িয়ে পড়ল বালুতটে। সঙ্গে বয়ে এনেছিল গোল মতো চকচকে কিছু জিনিস, যা ঢেউ সরে যাবার সঙ্গেই গড়িয়ে ফিরে গেল আবার। পরের ঢেউটা আবার সেটাকে এনে তুলল সৈকতে। এবার গেডি সেটা তুলে নিলেন। পরিষ্কার কাঁচের লম্বা-গলা একটা মদের বোতল। কাঁক্টা খুব জোরে চেপে বসানো, বোতলের প্রায় মুখোমুখি। বোতলের পেছনটা গাঢ় লাল শিলমোহরের গালা দিয়ে বন্ধ। মনে হয় বোতলটার মধ্যে একটা কাগজের ফালি রয়েছে, ভেতরে ঢোকাবার সময় হাতের রগড়ানিতে কিছুটা গোল পাকিয়ে গিয়েছিল। শিলমোহরটার ওপর একটা নামাঙ্কিত আংটির ছাপ যেটা গেডি ভাল করেই চেনেন। এ আঙ্টি আইডা পেইন সব সময় পরত অন্যসব রত্ন পাথর ছেড়ে। পরিচিত আদ্যাক্ষর দুটো "আই. পি." দেখামাত্র একটা অদ্ভুত অস্বস্তির অনুভূতি হল গেডির। সে যে-জাহাজে চড়েছে তা চাক্ষুষ দেখতে পাওয়ার চেয়েও যেন এই স্মারক ওঁর কাছে অনেক বেশি ব্যক্তিগত, অনেক ঘনিষ্ঠ। বোতলটা নিয়ে উনি ঘরে ফিরলেন, ওটাকে ডেস্কের ওপর রাখলেন।

টুপি আর কোট ছুঁড়ে ফেলে একটা বাতি জ্বালালেন, কারণ সংক্ষিপ্ত গোধূলিকালে এর মধ্যেই আঁধার ঘনিয়ে আসছে। পরীক্ষা করতে বসলেন সমুদ্র থেকে উদ্ধার-করা সামগ্রী।

আলোর কাছে বোতলটা ধরে সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝলেন ওর ভেতরে একটা ডবল ভাঁজের চিঠির কাগজ আছে, ঘন হাতের লেখায় ঠাসা। তাছাড়া ওটার রং ও আকার আইডারই সর্বদা-ব্যবহারের কাগজের মতো, মনে হয় যতদূর ওঁর বিশ্বাস, হাতের লেখাটাও তারই। বোতলের অমসৃণ কাঁচে বিকৃত দেখাবার ফলে লেখার একটি বর্ণও তিনি পড়তে পারেন না; কিন্তু কয়েকটা বিশেষ বড়-হাতের অক্ষর ভালো করে দেখে নিশ্চিত হলেন লেখাগুলো আইডারই।

একটা মৃদু কৌতুকের হাসি গেডির চোখে—যখন উনি বোতলটা নামিয়ে রেখে, ডেস্‌কের ওপর পাশাপাশি তিনখানা চুরুট সাজালেন। বারান্দার ধার থেকে স্টীমার-চেয়ারখানা টেনে এনে আরাম করে গা ছেড়ে দিলেন তাতে। ওই তিনটে চুরুট খেতে-খেতে তিনি সমস্যাটার বিচার করবেন।

কারণ এটা তো 'সমস্যারই' মতো কিছু। বোতলটা ওঁর বোধহয় না পেলেই ভাল হত, কিন্তু বোতলটা জলজ্যান্ত বর্তমান। কেন ওটা সমুদ্র থেকে ডাঙায় ভেসে আসবে, যেমন হাজারো ঝামেলার জিনিস ভেসে আসে, ওঁরই শান্তি ভঙ্গ করতে?

এই স্বপ্নময় দেশে, যেখানে 'সময়' মনে হয় অফুরন্ত, উনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা ব্যয় করতে।

বোতলের কাহিনী নিয়ে অনেক আবোলতাবোল গবেষণা আছে, তারই এক-একটা পরখ করতে থাকেন আর বাতিল করতে থাকেন একে-একে। ধ্বংস অথবা পঙ্গু হবার মতো বিপদেই সাধারণত জাহাজ থেকে এমন জিনিস বাইরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তো তিন ঘন্টা আগেও "আইডালিয়া"-কে দেখলেন নির্বিঘ্নে দ্রুত প্রস্থান করতে। শোনা যায়, সমুদ্রযাত্রিনী মেয়েরা এই রকম বোতলবন্ধ বার্তা পাঠায় নিরীহ ধরনের সামান্য তামাশা করার তাগিদে। কিন্তু এ জিনিস করা আইডার চরিত্রবিরুদ্ধ। ধরা যাক, নাবিকরা বিদ্রোহ করে নিচের তলার যাত্রীদের বন্দী করেছে, আর ওই বার্তা উদ্ধার-ভিক্ষা করেই পাঠানো? কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাপার যদি ধরেও নেয়া যায়, উত্তেজিত বন্দীরা কি কষ্ট করে পাতার পর পাতা চিঠি লিখবে উদ্ধারের জন্য সাবধানে যুক্তি বিস্তার করে?

অতএব, 'পরিহার পদ্ধতি' গ্রহণ করে উনি অচিরেই ব্যাপারটা থেকে অযৌক্তিক তত্ত্বগুলো বাদ দিলেন, আর শেষ পর্যন্ত—যদিও ওঁর পছন্দসই নয়—একটাই মোটামুটি পাকা যুক্তি পেলেন: বোতলের বার্তাটা ওঁরই উদ্দেশে! আইডা জানে তিনি এখানে আছেন; ইয়টটা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওটা ভাসানো হয়েছে; বাতাসও বইছিল ডাঙা লক্ষ্য করেই। এই অর্ধ-সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেই গেডির কপালে একটা ভাঁজ পড়ল, ঠোঁটের দু'পাশে জমল একটা কঠিন জেদী ভাব। উনি দেখতে থাকলেন বিশালাকৃতি জোনাকি পোকাগুলোকে—ওরা সরু, ঘাসে ঢাকা গলিগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

এটা যদি ওঁর কাছে আইডার বার্তাই হয়, তাহলে তা নতুন করে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব ছাড়া আর কী হতে পারে? আর তা যদি হয়, তাহলে সে ডাক মারফত চিঠি দেবার নিরাপদ ব্যবস্থা ছেড়ে এমন একটা অনিশ্চিত ছেলেমানুষি পদ্ধতি নেবে কেন? খালি বোতলে চিঠি, সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম! বাঃ। ব্যাপারটার মধ্যে হাল্‌কা চটুলতার গন্ধ আছে ঠিকই, সত্যিসত্যি বিতৃষ্ণাজনক না হলেও।

বোতল-প্রাপ্তিটা ওঁর মনে কিছু প্রাথমিক আবেগ পুনর্জীবিত করলেও এই চিন্তাটাই এখন ওঁর অহঙ্কারকে জাগিয়ে তোলে, ডুবিয়ে দেয় সে আবেগ।

গেডি কোট টুপি পরে বাইরে বেরিয়ে যান। একটা পথ ধরেন যেটা তাঁকে একটা ছোট পার্ক-চত্বরের কাছে নিয়ে আসে। সেখানে ব্যাণ্ডের বাজনা চলছে, লোকে ভাবনাহীন আমোদে ঘোরাফেরা করছে। ক'জন লাজুক সিনোরিটা তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যায়, তাদের চকচকে কালো চুলের বেনীতে জোনাকিগুলো আটক পড়ে, ওঁর দিকে তারা কালো-কালো মন-মাতানো চোখে তাকায়। যুঁই আর কমলাফুলের সুগন্ধে বাতাসে যেন ঘুমের আমেজ।

কনসাল পা রাখলেন বার্নার্ড ও'ব্রানিগানের বাড়িতে। পলা বারান্দায় একটা 'হ্যামকে' বসে দুলছিল। এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল যেন পাখির বাসা থেকে বেরিয়ে এল পাখি। গেডির গলার আওয়াজেই তার গাল লাল হয়ে উঠেছিল।

ওর বেশভূষা দেখে মোহিত হলেন কনসাল। ফোলা মস্‌লিনের পোশাক, সাদা ফ্লানেলের ছোট জ্যাকেট—সবই ছিমছাম, কেতামাফিক তৈরি করা। উনি একটু পায়চারি করতে চাইলে, দুজনে একসঙ্গে হেঁটে চললেন পাহাড়ি রাস্তায়, পুরনো 'ইণ্ডিয়ান' কুয়োটার কাছে। কিনারায় বসলেন ওরা, মুখ খুললেন গেডি। যদিও নিশ্চিতই জানতেন পলা ওঁকে কখনো 'না' বলবে না, তবু ওর আত্মসমর্পণের পূর্ণতায় আনন্দে শিউরে উঠলেন গেডি। এই একটি হৃদয় যা প্রেম আর অটলতার জন্যাই সৃজিত। কোনো খেয়ালখুশি অথবা প্রশ্ন অথবা রীতিনীতির খুঁত ধরা আদর্শ এখানে নেই। সে-রাতে গেডি পলাদের গেটে দাঁড়িয়ে ওকে চুমু দিলেন, তারপর ফিরে চললেন নিজের বাড়ির দিকে। এত খুশি তিনি জীবনে কখনো হননি। "এই নিরালা স্বপ্নমধুর দেশেই চিরদিন থাকব মাটিতে গা ঢেলে"—নানা নাবিকের এই স্বপ্নই ওঁর কাছে মনে হল সবচাইতে ভাল, সবচেয়ে সহজ। ওঁর ভবিষ্যৎ হবে আদর্শ ভবিষ্যৎ। একটা স্বর্গ তিনি পেয়েছেন যেখানে খল সর্প নেই। ওঁর ঈভ বাস্তবিকই ওঁর অঙ্গ, ছলনাহীনা—তাই ভোলাতেও পারে বেশি। সেদিনটা খুবই সুখের হবে যেদিন সমুদ্রের ওপারের সঙ্গে শেষ ফিন্‌ফিনে সূত্রটাও তিনি ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। এখানেই উইলার্ড গেডির ভবিষ্যৎ, এখানেই হবে ওঁর ঘর। সেই সিদ্ধান্তটিই নিয়েছেন আজ রাতে, তাই তাঁর অন্তর প্রশান্ত, নিশ্চিত তৃপ্তিতে ভরা।

সেই অতি চমৎকার, অতি করুণ প্রেমের গান "লা গোলুড্রিনা" শিসের সুরে ভাঁজতে ভাঁজতে গেডি নিজের বাড়িতে ঢুকলেন। বইয়ের শেল্‌ফ থেকে তাঁর পোষা বাঁদরটা লাফ দিয়ে পড়ল দরজার সামনে, ওঁর দিকে তাকিয়ে চঞ্চলভাবে কিচ্‌মিচ করে উঠল। কনসাল ডেস্‌কের দিকে ঘুরলেন বাঁদরটার জন্য কিছু জমিয়ে-রাখা বাদাম এনে দিতে। আধো-অন্ধকারে হাত বাড়াতে হাতটা ঠেকল সেই বোতলের

গায়ে। ওটা যে ওখানে আছে, তা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। গেডি, হয় চমকে উঠলেন নয়তো ফের মনে পড়ে যাওয়ায় মৃদুভাবে কিছু গালাগালই করে উঠলেন।

বাতিটা জ্বালিয়ে বাঁদরকে খেতে দিলেন, তারপর বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে হেঁটে চললেন পথ ধরে সমুদ্রের পাড়ে।

আকাশে চাঁদ, সমুদ্রকে দেখাচ্ছে অতি মনোরম। হাওয়াটা পাল্টে গেছে, যেমন রোজ সন্ধ্যায় হয়, এখন একটানা বইছে সাগর মুখো।

জলের কিনারায় পা ফেলে নেমে গেডি বোতলটা ছুঁড়ে দিলেন, সমুদ্রের অনেকটা দূর অবধি। পলকের জন্য সেটা অদৃশ্য হল, তারপর আবার ছিটকে উঠল জলের দ্বিগুণ ওপরে। গেডি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন। চাঁদের আলো এমন প্রখর যে উনি পরিষ্কার দেখতে পান বোতলটা ঢেউয়ের তালে তালে ওঠা-নামা করছে। ক্রমে সেটা পাড় থেকে দূরে সরে যায়, ঝকমক করে পাল্টি খেতে-খেতে সমুদ্রের পথে। অচিরেই তা হয়ে ওঠে একটা কালো বিন্দু মাত্র, সহজে ঠাহর করা যায় না অনিয়মিত ওঠা-নামায়, তারপর অবশেষে সমুদ্রের রহস্যের মধ্যেই গ্রাস হয়ে যায় ওটাবও রহস্য। গেডি বালুতটে দাঁড়িয়ে চুরুট টানেন আর তাকিয়ে থাকেন জলের দিকে।

ডাঙার কাছেই একটা কুঁড়েঘরে থাকে বুড়ো সাইমন আর্লি, দো-আঁশলা মাছধরা জেলে। "পাজারো" সুলুপটার মালিক সে। পাজারো এখন হাওয়ামুখো ছোট খাড়িটার মধ্যে নোঙর-করা।

প্রথম তন্দ্রার মুখেই সে জেগে উঠল একজনের ডাক শুনে। চপ্পলে পা গলিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। দেখল 'ভালহাল্লা' জাহাজ থেকে এইমাত্র একটা বোট এসে উঠল ডাঙায়। আবার ওর নাম ধরে কেউ ডাকতেই সে বোটটার কাছে চলে আসে। 'ভালহাল্লা'র থার্ড মেট, সাইমনের পরিচিত—সে আছে ওখানে, আর ফলের জাহাজটা থেকে আরো তিনজন খালাসি।

মেট বলল, 'সাইমন, ওপরে গিয়ে ডাক্তার প্যারিশ্‌কে খবর দাও, হোটেলেই আছেন। নয়তো মিঃ ওয়েলেসলি বা যাকেই তুমি কনসাল গেডির বন্ধু বলে জান, বল এক্ষুনি এখানে চলে আসতে।'

ঘুম জড়ানো গলায় সাইমন বলল, 'হা ভগবান্। মিঃ গেডির কিছু হয়ে গেল নাকি?'

বোটের দিকে আঙুল দেখিয়ে মেট বলল, 'ওই তেরপলটার নিচে রয়েছেন, জলে আধ-ডোবা হয়ে মরে যাচ্ছিলেন আরেকটু হলে। 'ভালহাল্লা' থেকে দেখতে পেয়েছিলাম ডাঙার মাইলখানেক দূরে, পাগলের মতো সাঁতার কাটছিল একটা বোতলের পেছনে। জলে ভাসছিল সেটা, বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডিঙি নামিয়ে

আমরা ছুটলাম তাঁর দিকে। হাত দিয়ে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন বোতলটা তারপর দম রাখতে পারেননি, জলের নিচে তলিয়ে গেলেন। ঠিক সময়েই টেনে তুলে বাঁচাতে পেরেছি, হয়তো, তবে ডাক্তারই ঠিকমতো বলতে পারবেন।'

চোখ কচলাতে কচলাতে বুড়ো বললে—এখনো ভাল করে ঘুম ভাঙেনি তার—'একটা বোতল! তা বোতলটা কোথায়?'

সমুদ্রের দিকে বুড়ো-আঙুল নাচিয়ে মেট বলল, 'ওই দিকেই কোথাও ভেসে যাচ্ছে। যাও যাও, সাইমন, জলদি!'

The Lotus and the Bottle, স্মার্ট সেট, ১৯০২

কালো ঈগলের অন্তর্ধান

কোনো একটি বছরে বেশ ক'মাস ধরে এক ভয়াবহ ডাকাত বড় উপদ্রব করেছিল টেক্সাসের সীমানায়— রিও গ্রাণ্ডি নদীর ধার বরাবর। এই কুখ্যাত লুটেরা বিশেষ কতকগুলো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত গুণে তার নাম জুটে যায়— "কালো ঈগল, সীমানার আতঙ্ক।" তার এবং তার অনুচরদের কীর্তিকলাপ নিয়ে অনেক ভয়ংকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। হঠাৎ সামান্য একটি মিনিটের মধ্যেই সেই কালো ঈগল সম্পূর্ণ উপে গেল পৃথিবী থেকে। তারপর আর কখনো শোনা যায়নি তার কথা। এমনকি তার নিজের সাঙ্গপাঙ্গরাও কখনো আন্দাজ করে কূল পায়নি তার অদৃশ্য হবার রহস্যের। সীমানার র‍্যাঞ্চ (পশুপালন খামার) বা জনবসতিগুলোতে এখনও ভয়, আবার সে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসবে আর লুটপাট করবে। না, আর সে কখনোই আসবে না। কালো ঈগলের সেই নিয়তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেই এ কাহিনীর অবতারণা।

এ গল্পের প্রস্তাবনা সেন্ট লুইসের এক সুরা-পরিবেশকের বুটের ডগা থেকে। তার খুঁটিয়ে-দেখা নজর পড়ল গিয়ে 'চিকেন রাগ্‌লস্'-এর বপুটির ওপর, লোভীর মতো মাগ্‌না 'নাস্তা' ঠুকরে চলেছে লোকটা। 'চিকেন' এক ভবঘুরে। মোরগের ঠোঁটের মতো লম্বা নাক, হাঁসমুরগির মাংসের ওপর প্রচণ্ড লোভ, আর নি-খরচায় তা খাবার অভ্যাস—তাই সঙ্গী ভবঘুরেদেরই দেওয়া ওই নামটি—'চিকেন'।

ডাক্তারেরা বলেন আহারের সময় তরল বস্তু খাওয়া নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে মন্দ অভ্যাস। কিন্তু পানশালার স্বাস্থ্য বিধান উল্টো পথে চলে। চিকেন তার খাবারের সঙ্গে মদ কেনার প্রয়োজন বোধ করেনি। দোকানদার কাউন্টার ঘুরে

এসে অবিবেচক খাইয়ের কানটি ধরলে লেবু-চেপা চিমটে দিয়ে। দরজা অবধি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে এক লাথি মেরে বের করে দিলে রাস্তায়।

এইবারেই চিকেনের মন সচকিত হল আগামী শীতের ইঙ্গিত টের পেয়ে। রাত বেশ ঠাণ্ডা; নির্মম উজ্জ্বলতায় তারাগুলো জ্বলছে; লোকজন ত্রস্তব্যস্ত হয়ে রাস্তায় ছুটছে দুটো আত্মসর্বস্ব ঘেঁষাঘেষি লাইন ধরে। পুরুষেরা ওভারকোট চাপিয়েছে — চিকেন কড়াক্রান্তির হিসেবেই জানে ওই সব বোতাম আঁটা ভেতরের-পকেট থেকে একটা খুচরো পয়সা বার করাও এখন কঠিন হবে। তা'হলে এবার সত্যিই সময় হল ওর বৎসরান্তিক দক্ষিণমুখো যাত্রার।

পাঁচ-ছ' বছর বয়েসের একটি ছোট ছেলে লুব্ধ চোখে উঁকি দিচ্ছিল চকোলেট-বিস্কুটের দোকানের জানলায়। একটা ছোট হাতে ধরে আছে দু'আউন্সের খালি শিশি, অন্য হাতের শক্ত মুঠোয় চ্যাপটা গোলমতো কিছু, চক্‌চকে, কিনারায় খাঁজকাটা। চিকেনের কেরামতি আর সাহস বুঝেই যেন হাজির হয়েছে ওর কাজের উপযুক্ত একটা সুযোগ। দৃশ্যটাই হুবহু সেইরকম। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে যখন চিকেন নিশ্চিত হল কোনো পুলিসের লোক কাছেপিঠে ঘুরছে না, তখন ফাঁদে ফেলার মতলবে ও শিকারকে আলাপের মধ্যে টেনে নিল। ছেলেটিকে বাড়ি থেকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল অচেনা লোকের সদিচ্ছার কথাবার্তা যেন খুব সন্দেহের চোখে দেখে, তাই সে গা করল না ওর আগ বাড়িয়ে আলাপের চেষ্টায়।

এবার চিকেন বুঝল ওকে একটা আপ্রাণ মরীয়া রকমের ঝাঁপ দিতে হবে ভাগ্যের খেলায়, ভাগ্য জয় করতে হলে অনেক সময় এমনই করতে হয়। মূলধন ওর পাঁচটি সেন্ট, এরই ঝুঁকি নিয়ে তাকে ওই বালকটার পুষ্ট হাতের মুঠোয় যা লুকোনো আছে তা জিতে নিতে হবে। এ বড় ভয়ানক লটারি, চিকেন তা জানে। কিন্তু কাজটা হাসিল করতে হবে কৌশলে, কারণ জোর জবরদস্তি শিশুদের লুট করায় তার পুরোদস্তুর ভীতি। একবার একটা পার্কে ও খিদের জ্বালায় হামড়ে পড়েছিল বেবি-গাড়িতে বসা একটি বাচ্চার দুধের বোতলের ওপর। আক্রান্ত শিশুও সঙ্গে সঙ্গে এমন গগনবিদারী চিৎকার জুড়ে দেয় যে লোকজন এসে পড়ে, আর চিকেনের হয় তিরিশ দিনের শ্রীঘর বাস। সে বলে, সে-সময় থেকেই নাকি সে "বাচ্চাদের সমঝে চলে।"

ছেলেটা কী মেঠাই ভালবাসে এই নিয়ে কায়দা করে প্রশ্ন শুরু করে সে ধীরে ধীরে যা জানতে চায় সব তথ্যই বের করে ফেলল। ওর মা বলেছেন ওষুধের দোকানে গিয়ে বলবে দু'সেন্টের ব্যথার-ওষুধ শিশিতে ভরে দিতে; আর শক্ত করে ডলারটা হাতে ধরে রাখবে; রাস্তায় যেন কারো সঙ্গে কথা বলতে দাঁড়িয়ে না পড়ে। আর যেন ওষুধের দোকানীকে বলে খুচরো পয়সা কাগজে

জড়িয়ে ওর প্যান্টের পকেটে পুরে দিতে। সত্যিই ওর প্যান্টে পকেট আছে-দু'দুটো! আর সে সবচেয়ে ভালবাসে ক্রীমভরা চকোলেট।

চিকেন দোকানে ঢুকে একটা টেপা-মেশিনের চাবি ঘোরায়। সবগুলো কোঠাতেই নিজের পুরো পুঁজি ঢেলে দেয়, স্রেফ পবে একটা বড়রকম দাঁও মারার ঝুঁকি নিয়ে।

ছোট ছেলেটাকে মিষ্টিগুলো দিয়ে দেয়, আর দেখে খুশি হয় যে এবার সে ওর বিশ্বাস জাগাতে পেরেছে। এর পর অভিযানের নেতৃত্ব হাতে নেওয়া সহজ হয়ে গেল; 'পুঁজির' হাত ধরেই তাকে নিয়ে গেল ওর চেনাজানা পাড়ারই একটা ভালো ওষুধের দোকানে। সেখানে গুরুজনের মতো ভাবগতি করে চিকেন ডলারটা এগিয়ে দিয়ে ওষুধ চাইল। ছেলেটা এদিকে জিনিস কেনাব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে মনের আনন্দে চকোলেট চিবুচ্ছে। তারপর সফলকাম 'বিনিয়োগকারী" নিজের পকেট চুঁড়ে একটা ওভারকোটের পুরনো বোতাম পেয়ে সেটাকেই সাবধানে কাগজে জড়িয়ে 'খুচরো পয়সার মতো' ঢুকিয়ে দিল সরলবিশ্বাসী ছেলেটার পকেটে। এবার কিশোরের মুখখানা বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তার পিঠে আদর করে একটা চাপড় মেরে চিকেন বাজার থেকে বেরুল। তাব লাভ হয়েছে 'পুঁজির' ওপর ১৭০০ শতাংশ!

দু'ঘন্টা বাদে, বেলের ইয়ার্ড থেকে একটা মাল ইঞ্জিন বেরিয়ে আসে—কয়েকটা খালি গাড়ি নিয়ে টেক্সাসেব দিকে চলেছে। একটা গরুভেড়ার কামবায় ঢুকে চিকেন নিশ্চিন্ত আবামে শুয়ে পড়ে খড়ের গাদার মধ্যে অর্ধেক ডুবে। ওর পাশে রয়েছে অতি নিকৃষ্ট জাতের হুইস্কির পোয়া-বোতল, কাগজের ব্যাগে রুটি আর পনির। মিঃ রাগল্‌স্‌ তাঁর 'প্রাইভেট কামরার' গাড়িতে এবার চললেন দক্ষিণে, শীতকালটা কাটাতে।

একসপ্তাহ ধরে টিকিয়ে টিকিয়ে গাড়ি চলল দক্ষিণমুখো, কখনো লাইন বদল করে, কখনো আটকে থেকে, রেলের মালগাড়ির কায়দায় হাতবদল হয়ে। কিন্তু চিকেন লেগেই থাকে গাড়ির সঙ্গে, শুধু দরকার মতো এককে সময়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণাব ব্যবস্থা করে। ও জানে গাড়িটা সোজা চলেছে গরু-ভেড়ার দেশে, আর সান এ্যান্টনিও হল ওর লক্ষ্যস্থল। সেখানকার জল-হাওয়া বড় স্বাস্থ্যকর আর মৃদু। মানুষজনও নানা প্রশ্রয় দিতে উৎসুক, কষ্টসহিষ্ণু। সেখানকার মদের দোকানীরা ওকে লাথি মারবে না। যদি অনেকক্ষণ সময় নিয়েও খায়, বা একই জায়গায় বার-বার খেতে আসে, তবু তারা মুখস্থ পড়ার মতো গাল দেবে, কিন্তু রেগে গরম হবে না। ওরা ইনিয়ে-বিনিয়ে গালাগাল দেয়, তবু কদাচিৎ তাদের পুরো কথার 'অভিধান' শেষ করে (যার থই নেই), তাই আগে অনেক সময় গালমন্দের নিষেধের মধ্যে বসেও চিকেন পেট পুরে খাওয়া শেষ

করেছে। ওখানে সর্বদাই প্রায়-বসন্তের ঋতু, রাতে পার্ক চত্বরগুলো আরামপ্রদ, গানে ফুর্তিতে ভরা। কালেভদ্রে যৎসামান্য শীতের হঠাৎ-কামড় ছাড়া, ঘরের বাইরেই আরামে শুযে কাটানো যায়, মানে কোনো কারণে ভেতরে আতিথেয়তার অভাব দেখা গেলে।

ট্রেক্সারকানায় এসে ওর গাড়িটা ঠেলে দেওয়া হল আই-জি এন-এর লাইনে। তবু সেটা দক্ষিণমুখেই চলে, যতক্ষণ-না অস্টিনের কলোরেডো পুলটা গুঁড়ি মেরে পার হয়ে অবশেষে লাইন বদল করে সোজা তীরের মতো ছোটে সান এ্যান্টনিওর দিকে।

মালগাড়ি যখন শহরে এসে থামে, চিকেন তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন আবার ছুটল লারেডোর দিকে, ওটাই এ লাইনেব শেষ। লাইন ধরে-ধরে একেকটা বিন্দুতে খালি গরু-ভেড়ার গাড়িগুলো ছেড়ে যাওয়া হয়, সে-সব জায়গায় পরে র‍্যাঞ্চমালিকবা তাদের মাল বোঝাই করবে।

চিকেন যখন জেগে উঠল, ওর গাড়িটা স্থির। তক্তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ঝলমলে চাঁদনি রাত। হাঁচড়ে পাঁচড়ে বেরিয়ে এসে দ্যাখে আরো তিনটে গাড়ির সঙ্গে ওর গাড়িটাও একটা বুনো নির্জন জায়গায় ছোট পাশ-লাইনে ছেড়ে যাওয়া হয়েছে। রেলপথ বিস্তৃত প্রেইরিব অস্পষ্ট সমুদ্রেব মাঝখানে। তারই মধ্যে চিকেনের অবস্থা ববিনসন ক্রুসোব মতো—বেকার রেলকামরা নিয়ে একেবাবে অসহায় অবস্থায় যেন চতুর্দিকে স্থল ঘেরা নৌকোর মধ্যে!

লাইনের পাশে একটা সাদা থাম। কাছে গিয়ে চিকেন ওপরের অক্ষরগুলো পড়ল—এস. এ. ৯০। লারেডো প্রায় অতটাই দক্ষিণে। যে কোনো শহর থেকেই সে একশো মাইলটাক দূরে। চারদিক্কের রহস্য ঘেরা সমুদ্রে বুনো কয়োট্গুলো চিৎকার করছে। বড় একা মনে হয় চিকেনেব। বোস্টনে থেকেছে লেখাপড়া না-শিখে, শিকাগোয় বুকে সাহসের অভাব নিয়ে, ফিলাডেলফিয়ায় শোবার জায়গা ছিল না, নিউ ইয়র্কে জানাশোনা কাউকে পায়নি, আর পিট্স্বার্গে মদ্য-বিরহিত—কিন্তু এখানকার মতো এত নিঃসঙ্গ তার কোথাও বোধ হয়নি।

গভীর নৈঃশব্দ্যেব মধ্যে হঠাৎ সে শুনতে পেল একটা ঘোড়ার ফোঁস ফোঁস শব্দ। পুবদিকে লাইনের ধার থেকেই আওয়াজটা এল। চিকেন ভয়ে-ভয়ে সেদিকটা খুঁজে দেখতে যায়। পা উঁচুতে তুলে হাঁটছে কোঁকড়ানো মেস্কিট ঘাসের আস্তরণের ওপর দিয়ে। ওর ভয়, এই আঘাটা জঙ্গলে যা কিছু হোক থাকতে পারে—সাপ, ইঁদুর, ডাকাত, কেন্নো, মরীচিকা, কাউবয়, টারানটুলা মাকড়সা, কী নয়? গল্প কাগজে ওদের কথা পড়েছে। একটা কাঁটাওয়ালা নাসপাতির ঝোপ অদ্ভুত গোল মাথা জাগিয়ে রয়েছে ভয়ংকরভাবে, ও সেটা এড়িয়ে ঘুরে যেতেই শিউরে উঠল আতঙ্কে—একটা ঘোড়া ফোঁস্ করে এক সাংঘাতিক লাফ দিয়েছে নিজেই

ঘাবড়ে গিয়ে, ছিটকে গেছে পঞ্চাশ গজ দূরে, তারপর আবার ঘাস খেতে শুরু করেছে আগের মতো। কিন্তু মরুভূমিতে ওই একটা জীব যাকে চিকেন ভয় পায় না। ও বড় হয়েছে একটা খামারে, ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, ওদের আদবকেতা বোঝে, আর ঘোড়ায় চড়তেও পারে।

ধীরে ধীরে নরম কথা বলে এগোতে-এগোতে ও জানোয়ারটার পেছু নেয়। ঘোড়াটা প্রথমবারে ভড়কে গেলেও এখন বেশ শান্ত হয়েছে মনে হয়। কুড়ি ফুট লম্বা দড়ির ফাঁসও ওর গলায় পরাতে পেরেছে চিকেন, সেটা ঘাসের মধ্যে টানতে টানতে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই দড়িটাকে প্যাঁচ দিয়ে সে মেক্সিকানদের 'বোরসাল' কায়দায় একটা সুকৌশলী নাক-বল্‌গা করে ফেলল। পরের সেকেণ্ডেই সে ঘোড়ার পিঠে; চমৎকার একেক লাফে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়াটাকে ইচ্ছেমতো চলার সুযোগ দিয়েছে সে। মনে মনে বলে, 'কোথাও তো আমাকে নিয়ে যাবেই!'

চাঁদ-ফুটফুটে প্রেইরি প্রান্তর ধরে অবাধে চলা হয়তো আনন্দের ব্যাপার হতে পারত, এমনকি খাটুনি-বিমুখ চিকেনের কাছেও, কিন্তু এখন তার সে মেজাজই নেই। তার মাথায় যন্ত্রণা, পেটে বেড়ে-চলা খিদে—সেই "কোথাও" যে এই ভাগ্যমন্ত ঘোড়া তাকে নিয়ে যাবে সেও তো বোধহয় কুটিল ঘটনাচক্রে ভরা।

এবার সে নজর করল ঘোড়া একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই চলেছে। যেখানে প্রান্তর মসৃণ সেখানে তার গতি সিধে তীরের মতো—পুবদিকে। টিলা বা গর্ত বা কাঁটাঝোপের ক্লেশসাধ্য বাধা থাকলে তা ঘুরে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে তার নির্ভুল সহজাত বুদ্ধির ছককাটা রাস্তায়। অবশেষে ক্রমান্বয়ে-উঁচু একটা জায়গায় এসে হঠাৎ তার চলার গতি 'আরামের হাঁটা' হয়ে দাঁড়ায়। এক ঢিলেই নাগাল পাওয়া যায় এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কোমা গাছের ঝাড়, আর তার নিচেই একটা 'জাকাল'—মেক্সিকোবাসীরা যেমন বানায়—সোজা বাঁশের তৈরি এক-কামরার ঘর, কাদা লেপা, আর 'টিউল'-শনের খড় বা ঘাস দিয়ে ছাদ। অভিজ্ঞ চোখ থাকলে কেউ বুঝত এটা কোনো ছোট ভেড়ার র‍্যাঞ্চের সদর আস্তানা। চাঁদের আলোয় কাছের খোঁয়াড়ের ভেতরে দেখা যায় ভেড়াদের খুরের চাপে রেণু হয়ে যাওয়া সমতল মসৃণ জমি। সর্বত্রই আগোছাল ভাবে ছড়ানো আস্তানার জিনিসপত্র—দড়ি, লাগাম, জিন, ভেড়ার ছাল, উলের বস্তা, খাবারের গামলা আর ক্যাম্পের হাবিজাবি জিনিস। দরজার কাছে দু'ঘোড়া-টানা গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পানীয় জলের পিপে। গাড়ির জোয়ালে গাদা-করা এলোমেলো সাজসরঞ্জাম শিশিরে ভিজছে।

সড়াৎ করে মাটিতে নেমে চিকেন ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল। বার-বার হ্যালো হ্যালো ডেকেও ঘর থেকে কারো সাড়া পেল না, নিঃশব্দ। দরজা হাট খোলা, সাবধানে ঢুকল ভেতরে। যেটুকু আলো তাতেই পরিষ্কার

দেখল ঘরের মধ্যে কেউ নেই। একটা ম্যাচকাঠি ঠুকে টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা জ্বালিয়ে নিল। কামরাটা কোনো অবিবাহিত র‍্যাঞ্চ রক্ষকের, যে জীবনের সামান্য প্রয়োজনটুকুতেই সন্তুষ্ট। চিকেন বুদ্ধি করে হাতড়ে বেড়াল যতক্ষণ-না তার মনের মতো জিনিসটা পায় (ওর তো আশা করতেই সাহস হয়নি)—একটা ছোট বাদামি জগ যার মধ্যে এখনো পোয়াটাক বস্তু রয়েছে!

আধঘণ্টা বাদে চিকেন অস্থির পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে—এবার তার চেহারা একেবারে মারমুখো শিকারী মোরগের মতো। নিজের ধোকড়া জামাকাপড়ের বদলে অনুপস্থিত র‍্যাঞ্চরক্ষকের ধরাচুড়ো পরে নিয়েছে। মোটা বাদামি ডাকিং পোশাক, স্পেনীয় ধরনের শয়তানি বোলেরো জ্যাকেট, বেশ চালিয়াত গোছের। পায়ে বুট, স্পার লাগানো। লম্বা পদক্ষেপে বোঁ-বোঁ করে ঘোরে। কোমর ঘিরে বগলস্-আঁটা বেলটে কার্তুজ ভরা, দু'পাশের খাপে একটা করে ছ'ঘরার বড় রিভলবার।

চারদিক ঘুরঘুর করে দুটো কম্বল পেল, একটা জিনসাজ আর বল্গা চাপাল ঘোড়াটার পিঠে। আবার ঘোড়ায় চড়ে সে তারস্বরে বেসুরো গান গাইতে গাইতে সবেগে ছুটতে লাগল।

* * *

ফ্রিও নদীর পাড়ে একটা নির্জন জায়গায় ক্যাম্প করে বসেছিল বাড কিং-এর দলবল—বেপরোয়া দুর্বৃত্ত, ফেরারী, আর গরুঘোড়া চোর ওদের সবাই। রিও গ্রাণ্ডি এলাকায় ওদের লুটপাটের কাজ যতটা না দুঃসাহসিক, তার চেয়ে বিজ্ঞাপন পেয়েছে বেশি ব্যাপক আকারে। আর ক্যাপ্টেন কিনির রেঞ্জার-দলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওদের ওপর নজর রাখতে। তার ফলে বাড কিং-ও অভিজ্ঞ সেনাপতির মতো, নিজের দলবলের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আইনের ধ্বজাধারীদের সুযোগ দেয়নি কোনো টাটকা অপরাধের সূত্র অনুসরণ করতে। আপাতত আত্মগোপন করেছে ফ্রিও উপত্যকার কাঁটাবনের জঙ্গলে।

চালটা বুদ্ধিমানের মতো হলেও, বাডের বিখ্যাত বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে অসঙ্গতি না থাকলেও, দলের সভ্যদের মধ্যে এই নিয়ে জেগেছে বিক্ষোভ। সত্যি বলতে, এই ভাবে অগৌরব নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার সময় বাড কিং-এর নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে, যেন জঙ্গলের 'বন্ধ দরজার' আড়ালে অনুচরদের মধ্যে তর্ক বাধে। এর আগে কখনো বাড কিং-এর দক্ষতা বা কুশলতা সমালোচনার মুখে পড়েনি; কিন্তু এবার তার গৌরব ম্লান হতে শুরু করেছে (গৌরবের নিয়তিই তাই) আরেকটি নতুন তারকার উত্থানে। দলের ভাবনা-অনুভূতি ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে একটি মতে—একমাত্র কালো ঈগলই পারে তাদের চালাতে—আরো চাকচিক্য, আরো লাভ আর নামডাকের দিকে।

কালো ঈগল—যার আরেক উপনাম "সীমানার আতঙ্ক"—আজ তিনমাস হল দলের সভ্য হয়েছে।

একরাতে যখন ওরা শিবির করে বসেছিল সান মিগুয়েল জলাশয়ের ধারে, ওদের মধ্যে সোজাই ছুটে এল একজন ঘোড়াসওয়ার, একাকী। খাঁটি জাতের টগবগে ঘোড়ায় চেপে। অস্বাভাবিক বিধ্বংসী চেহারার এই আগন্তুক। খোঁচা খোঁচা নীলচে-কালো গালপাট্টার ভেতর দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে শিকারী পাখির বাঁকা ঠোঁটের মতো নাকটা। চোখদুটো কোটরে বসা, হিংস্র। কী তার নেই? 'স্পার' নাল, গোল ঘেরাটুপি, উঁচু বুট, রিভলবার-সাজ। প্রচুর মদ্যপান করেছে, ভয়ডর বলে কিছু নেই। রিও ব্রাভো-বিধৌত দেশের খুব অল্প লোকই সাহস পাবে এভাবে একলা বাড কিং-এর আস্তানায় হামলা করতে। কিন্তু এই শিকারী পাখিটি নির্ভয়ে ছোঁ মেরেছে ওদের ওপর, চাইছে খাবার।

প্রেইরি প্রান্তরের আতিথেয়তা সর্বজনস্বীকৃত। আপনার দুশমনও যদি আপনার সামনে দিয়ে যায়, তাকে গুলি করে মারার আগে আপনি তাকে খেতে দেবেন। তার ওপর আপনার তামার বুলেট উজাড় করার আগে আপনার খাবার ভাঁড়ার উজাড় করে দেবেন তার সামনে। অতএব নিজের উদ্দেশ্য কিছু ব্যক্ত না করেই আগন্তুক ভূরিভোজনে বসল।

লোকটা বাচাল পাখি, দারুণ আশ্চর্য সব জাঁকালো অভিযানের গল্প তার ভাণ্ডারে। এমন ভাষায় কথা বলে যা একেক সময় দুর্বোধ্য, কিন্তু রংচঙের অভাব আদৌ নেই তাতে। বাড কিং-এর অনুচরদের কাছে সে এক নব আশ্চর্য, কারণ তারা কদাচিৎ নতুন ধরনের কাউকে পায়। আহ্লাদে তারা মুগ্ধ হয় তার সদম্ভ বাহাদুরিতে, তার ভাষার অদ্ভুত চটকে; জীবন, পৃথিবী, দূর দেশ সম্পর্কে তার পরিচয় যেন হেলাফেলার ব্যাপার, নিজের ভাবনাচিন্তা বোঝাতে সে অসংযত ধরনের খোলামেলা।

অতিথির চোখে এই ফেরারী লুটেরার দল এক দঙ্গল গেঁয়ো ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়। ওদের সে পেটপুজোর জন্য "ফাঁদে ফেলছে"—ঠিক যেমন ভাবে সে কোনো খামারবাড়ির পেছনের দরজায় বসে গল্প শোনাত কিছু খানা বাগাবার মতলবে। আর এদের আসল পরিচয় সম্পর্কে ওর এই অজ্ঞতার একটা কারণও আছে—দক্ষিণ-পশ্চিমের এই "বদলোকগুলো" কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। এই ডাকাতদের অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেত শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের একটা ছোট দল বলে, যারা চড়ুইভাতি বা পেকান ধরার জন্য জুটেছে। ব্যবহারে ভদ্র, ঝুঁকে ঝুঁকে চলে, নরম গলায় কথা বলে, সাদাসিধে পোশাক; ওদের একজনকে দেখলেও আন্দাজ হয় না যে ওদের নামে ভয়ানক সব নালিশ থাকতে পারে।

আস্তানায় দু'দিন ধরে চাকচিক্যময় অতিথিটিকে আপ্যায়ন করা হল। তারপর সবাই একমত হয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানাল দলের একজন সদস্য হবার জন্য।

সে রাজি হয়ে নিজের নাম তালিকায় দিতে চাইল জাঁদরেল এক নাম: "ক্যাপ্টেন মন্ট্রেসর"। এ নাম সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করল দল। তার বদলে তার অসামান্য তৃপ্তিহীন জঠরাগ্নির তারিফ করে ওর নাম দিলে "পিগি"। এইভাবে ওকগাছে ছাওয়া টেক্সাসের সীমান্তে তৈরি হল একটি দেখবার মতো বাঘা ডাকাত দল, যার তুলনা হয় না।

পরের তিন মাস বাড কিং গতানুগতিকভাবেই কাজ চালিয়ে গেল। আইন রক্ষকদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে, সঙ্গত লাভেই খুশি থেকে। বেশ কয়েকটা বড় ঘোড়ার দলকে ওরা রেঞ্জ (এলাকা) থেকে ভাগিয়ে এনেছিল, বেশ কিছু সংখ্যায় ভাল-জাতের গরুও। সেগুলো তারা নিরাপদে রিও গ্রাণ্ডি পার করে বেশ লাভ রেখেই বেচে দিল। ওদের দল প্রায়ই ঢুকত ছোট-ছোট গ্রাম আর মেক্সিকান-বসতির মধ্যে, ওখানকার বাসিন্দাদের ভয় দেখিয়ে লুট করত নিজেদের প্রয়োজনের গুলিবারুদ রসদ। রক্তপাতহীন এই হামলাগুলোর সময়েই পিগির ভয়ংকর চেহারা আর বুক-কাঁপানো কণ্ঠস্বর যা খ্যাতি ওর ছড়িয়ে দিল, তা ব্যাপকতা আর গৌরবের দিক থেকে অন্য সব মেনি-মুখো নরম-গলা ডাকাতদের সারাজীবনের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

মেক্সিকানরা নামকরণে দড়ো, প্রথমেই তারা ওর নাম দিল 'কালো ঈগল', ওই নামের জুজু দেখিয়ে বাচ্চাদের শাসন করত—সে নাকি এক ভয়ানক ডাকাত যে লম্বা ঠোঁটে ছোট শিশুদের তুলে নিয়ে পালায়। এর পর নামটা বাড়ানো হল—"কালো ঈগল, সীমান্তের আতঙ্ক'। অতিরঞ্জিত সংবাদপত্র-বিবরণ আর পশু-খামারের কানাঘুষো গল্পে সেটা হয়ে দাঁড়াল নজর-কাড়া নাম।

নিউসেস্ থেকে রিও গ্রাণ্ডি—দেশ এলাকাটা বুনো হলেও উর্বর, গরু ভেড়া পালনের খামার সেখানে খুব চলে। অঞ্চলটা অবাধ মুক্ত, জনবসতি কম, আইন বলতে নামমাত্র, দস্যুরা প্রায় বাধাই পায় না কোথাও, আর তারই মধ্যে চালিয়াত, উদ্ভুটে-রংদার 'পিগি' এনে ফেলল অনাবশ্যক ঢাক-পেটানো। তখন এই বুনো এলাকাগুলোর দিকে ছুটল ম্যাক্‌কিনির রেঞ্জার ফৌজ। বাড কিং বুঝল, হয় এর মানে হবে আচম্বিত ভীষণ লড়াই, নতুবা নিতে হবে সাময়িক গা-ঢাকার অবসর। ঝুঁকি নেওয়া অপ্রয়োজনীয় বুঝে, সে দলবল নিয়ে সরে পড়ল ফ্রিও নদীর পাড়ে একটা প্রায়-দুর্গম জায়গায়। সেখানেই, আগে যেমন বলেছি, শুরু হল দলের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ এবং বাড কিং-এর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক বিচারের কথা উঠছে তা আসলে আগে থাকতেই ভেবে-রাখা যাতে কালো ঈগলকে নেতার আসনে বসানো যায়। বাড কিং কিন্তু অনুচরদের মনের কথা সম্বন্ধে সজাগ, তাই সে তার অন্তরঙ্গ সাগরেদ ক্যাকটাস্ টেলরকে এক কোণে ডেকে নেয় আলোচনা করতে।

বাড বলে, 'ছোকরারা যদি আমায় নিয়ে খুশি না হয়, তো আমি সরে যেতে রাজি। আমি যেভাবে চালাতে চাই তা ওরা মানতে চাইছে না। বিশেষ করে স্যাম কিনির ফৌজ এ-লাইনে এলে আমি যখন জঙ্গলে ঢোকার মতলবটা নিলাম। আমি ওদের গুলি খাওয়া বা সরকারী ঘানি টানা থেকে বাঁচাচ্ছি আর ওরা মাথা তুলে বলছে আমি কোনো কাজের নই।'

ক্যাকটাস ব্যাখ্যা করে, 'না, অতটা হয়তো নয়, তবে এরা বড় মজে গেছে পিগিকে নিয়ে। এরা চায় ওই দাড়ি আর ওই নাক নিয়ে.সে দলের আগে-আগে হাওয়া কেটে চলুক।'

একটু চিন্তা করে বাড সোজাই জানায়, 'পিগির মধ্যে কোথায় যেন কী খামতি আছে। ঠিক পা মিলিয়ে চলার মতো গুণ তো এখন অব্দি দেখলাম না ওর। হয়তো খুব বোলচাল মারতে পারে ঠিকই, রাস্তা তৈরি করে দিলে ঘোড়া চালিয়েও ছোটে। তবে এখনো ধোঁয়া খেয়ে পোক্ত হয়নি সে। তুমি তো দেখেছ ক্যাকটাস্, যখন থেকে সে এসেছে, কখনো কাজিয়া হয়নি আমাদের মধ্যে। গোবেচারা বাচ্চাদের ভয় দেখাবার পক্ষে পিগি ঠিক আছে, রাস্তার মোড়ের দোকান ভেঙে চুরমারও করতে পারে। আমার তো মনে হয় সে টিনে পোরা গুগ্‌লির সেরা লুটেরা, এত ভাল পনিরখোরও কাউকে দেখিনি—তবে লড়াইয়ের খিদেটা তার কতখানি? আমি কিছু নাগরিককে জানি যাদের মনে হবে হাঙ্গামের জন্য তড়পাচ্ছে, অথচ পয়লা তামার গুলির ডোজ্‌টা পেটে পড়লেই পোড়া অম্বলের রুগি!'

ক্যাকটাস্ বলে, 'কোথায় কোন্ কোন্ কাগের বাসায় ছিল বলে তো অনেক বোলচাল শোনায়। হলপ করেই বলে হাতি দেখেছে, পেঁচার ডাক শুনেছে।'

অবিকল গরুচোরদের ভাষায় অবিশ্বাস জানিয়ে বাড জবাব দেয়, 'জানি আমি, তবে বড্ড বেশি "ড্যাং ড্যাং কয়"।'

এ আলোচনা চলছিল এক রাতে, আস্তানায় যখন দলের অন্য সদস্যারা—আটজন তারা—আগুনের ধারে শুয়ে বসে একটু-একটু করে খাবার চাখছে। বাড আর ক্যাকটাস্ আলাপ বন্ধ করেই শুনতে পেল পিগির গম্ভীর কণ্ঠ। বরাবরের মতো অন্যাদের বক্তৃতা শোনাচ্ছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজের প্রচণ্ড খিদেটা প্রশমন করছে, যদিও পুরোপুরি মেটাচ্ছে না।

সে বলছিল, 'হাজার মাইল চক্কোর দিয়ে খুদে লালগরু আর ঘোড়াগুলোকে তাড়া করে কী ফায়দা? কিস্যুই তো নেই ওর মধ্যে। এই ঝড়জঙ্গলের ভেতর ঘোড়া দাবড়ে শুধুই তেষ্টা, যা গোটা ভাঁটিখানাও মেটাতে পারে না, আর খানা ফস্‌কানো। বলো কিনা! আমি যদি এই দঙ্গলের বুড়ো আঙুল হতাম তাহলে জানো কী করতাম? আমি ট্রেন আটকে ডাকাতি করতাম। এক্সপ্রেস গাড়ি উড়িয়ে দিয়ে নগদ ডলার কামাতাম, যেখানে তোমরা স্রেফ হাওয়া খাচ্ছ। তোমরা আমায়

ক্লান্ত ক... দিলে। এই গরুচুরির মতো শস্তা খেলা আমার প্রাণে দাগা দেয়।'

কিছু পরে একটা প্রতিনিধিদল হাজির বাডের সামনে। ওরা এক পায়ে খাড়া, মেস্কিট ঘাসের ডগা চিবোয় আর ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে, কারণ বাডের মনে আঘাত দিতে ওদের খুবই বাধে। বাড আগেই বুঝেছিল ওরা কী চায়, আর তাই ওদের পক্ষে সহজই করে দিল ব্যাপারটা। ওরা চাইছিল আরো বড় ঝুঁকি এবং আরো বেশি লাভ।

পিগির ট্রেন আটকে লুট করার প্রস্তাবটা ওদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে, প্ররোচকের সাহস আর রোখের ওপর ওদের সপ্রশংস শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। ওরা এমন সরল, ছলনাহীন আর বাঁধাধরা নিয়মের জঙ্গুলে-ডাকু যে আগে কখনো ভাবেইনি তাদের গরুভেড়া চুরির নিত্যকর্মপদ্ধতির বাইরেও কিছু করার থাকতে পারে। নেহাৎ কোনো পরিচিত লোক সাহস করে ওদের বাধা দিলে তবেই ওরা গুলি ছুঁড়ত, বাস্ ওইটুকুই।

বাড খোলাখুলি 'নিরপেক্ষ' নীতি নিয়ে দলের মধ্যে অধস্তন পদে থাকতে রাজি, যতদিন-না কালো ঈগলকে নেতা হিসেবে পরখ করা হয়।

অনেক শলাপরামর্শ, টাইমটেবিল ঘাঁটাঘাঁটি, দেশের উচ্চাবচ ভূগোল নিয়ে আলোচনার পর, স্থির করা হল ওদের নতুন উদ্যোগের স্থান ও সময়। সে সময়ে মেক্সিকোতে চলছিল পশুখাদ্যের দুর্ভিক্ষ। আর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো-কোনো অঞ্চলে গরুভেড়ার অনটন; তাই দু'দেশের মধ্যে চলছিল জোর বাণিজ্য। দুই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগের রেলপথ ধরে তাই প্রচুর টাকাকড়ির লেনদেন। শেষ অবধি সবাই একমত হল পরিকল্পিত ডাকাতির সেরা সম্ভাব্য জায়গা হবে এস্পিনাতে—লারেডোর প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে আই. জি. এন্ রেলপথের একটা ছোট স্টেশন এস্পিনা। ট্রেন সেখানে এক মিনিট থামে; আশপাশের এলাকা বুনো জঙ্গল, বসতিহীন; স্টেশন বলতে শুধু একখানা বাড়ি, যেখানে রেলের এজেন্ট বাস করে।

কালো ঈগলের দল বেরিয়ে পড়ে, রাত করে ঘোড়া হাঁকায়। এস্পিনার কাছে এসে ওরা কয়েকমাইল দূরের বনভূমিতে ঘোড়াগুলোকে জিরোতে দেয় সারাদিনের মতো।

রাত সাড়ে দশটায় এস্পিনাতে ট্রেন থামার কথা। ট্রেন লুট করে তারা অনায়াসেই লুটের টাকা নিয়ে মেক্সিকো সীমানার ওপারে উঠতে পারে পরদিন ভোরে, দিবালোকে।

কালো ঈগলের ওপর একটু সুবিচার করতেই হয়— যে সম্মানের দায়িত্ব তার ওপর দেয়া হয়েছে তা থেকে সংকুচিত হবার কোনো লক্ষণই সে প্রকাশ করেনি।

নিজের লোকজনকে ভেবেচিন্তে যথাযোগ্য জায়গায় বসিয়েছে, যার যার কর্তব্য

সাবধানে বুঝিয়ে দিয়েছে। লাইনের দু'পাশে দলের চারজন করে বেঁটে-ওকগাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। 'কান-কোঁচকানো' রজার্স পিস্তল দেখিয়ে আটকাবে স্টেশনের এজেন্টকে। ব্রঙ্কো চার্লি ঘোড়াগুলোর সঙ্গেই থাকবে তাদের প্রস্তুত রেখে। যেখানটায় ওদের হিসেবমতো দাঁড়ানো-ট্রেনের ইঞ্জিনটা থাকার কথা, বাড কিং সেখানে একপাশে ঘাপটি মেরে থাকবে, আর অন্যদিকে থাকবে কালো ঈগল স্বয়ং। দুজন ঝাঁপিয়ে পড়বে ইঞ্জিনচালক আর ফায়ারম্যানের ওপর, তাদের টেনে নামাবে নিচে, নিয়ে যাবে পেছনের দিকে। তারপর এক্সপ্রেস বগিটা লুট করে তারা ভেগে পড়বে। কালো ঈগল যতক্ষণ-না রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে আওয়াজ দেবে ততক্ষণ কেউ নড়বে না। একেবারে নিখুঁত ছক।

ট্রেনের সময় হবার দশ মিনিট আগে প্রত্যেকটি লোক তাদের নিজের-নিজের জায়গায়, ঘন ওকবনের আড়ালে ভালভাবে লুকিয়ে পড়েছে। ওক গাছগুলো প্রায় লাইনের ধার অবধি। রাতের অন্ধকার ক্রমে নেমে আসছে, উপসাগরের ভেসে আসা মেঘ থেকে সামান্য ঝরঝরে বৃষ্টিও ঝরছে। লাইন থেকে পাঁচগজ দূরে একটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে কালো ঈগল। ওর কোমরের বেল্টের পেছনে দু'দুটো ছ'ঘরা রিভলবার। মাঝেমাঝেই পকেট থেকে একটা বড় কালো বোতল বের করে ঠোঁটের ওপর ধরছে।

লাইন ধরে দূরে একটা তারার আবির্ভাব। শিগগিরই সেটা অগ্রসরমান ট্রেনের হেডলাইট হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমবর্ধমান গর্জনের সঙ্গে এগিয়ে আসছে; ওৎ পেতে বসে-থাকা দুর্বৃত্তদের ওপর এমন আলো আর তীব্র চিৎকার বর্ষণ করে ইঞ্জিনটা হামড়ে আসে যেন কোনো প্রতিশোধকামী দানব আসছে তাদের বিচারের হাতে তুলে দিতে। মাটির ওপর একেবারে চেপ্টে থাকে কালো ঈগল। এদিকে ইঞ্জিনটা ওদের হিসেবমতো ওর আর বাড কিং-এর লুকোনোর জায়গার মাঝখানে না থেমে আরো চল্লিশ গজ এগিয়ে গিয়ে থামে।

দস্যু নেতা উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের আশপাশ থেকে উঁকি দেয়। ওর অনুচররা চুপচাপ শুয়ে আছে রিভলবারের সংকেতের অপেক্ষায়। কালো ঈগলের ঠিক উল্টো মুখেই একটা জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ট্রেনটা ঠিক নিয়মমাফিক যাত্রীবাহী গাড়ি নয়, মিশ্রিত গাড়ি। ওর সামনেই একটা বক্স কামরা, স্বল্প যাত্রীর জন্য। কোনো কারণে দরজাটা সামান্য খোলা। কালো ঈগল ওটার সামনে গিয়ে ঠেলে দরজাটা আরো খুলে দিল। একটা গন্ধ এল— ভ্যাপসা, ছাতাধরা, পরিচিত গন্ধ, বাসি, মাদকতাময়, প্রিয় ঘ্রাণ যা ওর মনে পুরনো দিনগুলোর আর ভ্রমণের সুখ-স্মৃতি সজোরে নাড়া দিয়ে জাগায়। কালো ঈগল এমন ভাবে মাতাল-করা গন্ধটা শোঁকে যেন নানা দেশ ঘুরে ফিরে এসে কেউ তার ছেলেবেলার কুটিরঘরে লতিয়ে-ওঠা গোলাপের গন্ধ শুঁকছে। দেশের টানে ওর মন কাঁদে। ও ভেতরে

হাত বাড়ায়। মেঝের ওপর এক্সেলসিয়র। শুকনো, স্প্রিংয়ের মতো, নরম, লোভনীয় গালিচা। বাইরের ঝিরঝিরে বর্ষণ এখন হাড়কাঁপানো বৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনের ঘন্টা বাজল। দস্যু সর্দার রিভলবার সমেতই বেল্‌ট্‌ খুলে ছুঁড়ে দিল বাইরে, মাটির ওপর। স্পারদুটোও সঙ্গে সঙ্গে পেছু নিল ওটার আর তার চওড়া গোল সোম্‌ব্রেরো টুপি। কালো ঈগলের পালক খসছে। সশব্দ ঠেলা দিয়ে ট্রেন ছাড়ে। প্রাক্তন 'সীমান্তের আতঙ্ক' বক্স-গাড়িটার ভেতর কোনো রকমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। 'এক্সেলসিয়রের' ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রাখে কালো বোতলটা। চোখদুটো বোজা, আর ভয়ানক মুখখানায় একটা নির্বোধ সুখের হাসি। 'চিকেন রাগ্‌ল্‌স্‌' শুরু করেছে তার ফিরতি যাত্রা।

এস্‌পিনা থেকে ট্রেনটা নির্বিবাদেই বেরিয়ে গেল আর নিশ্চলভাবে ওৎ পেতেই বসে রইল মরীয়া ডাকাতের দঙ্গল—আক্রমণের সংকেতের অপেক্ষায়। ট্রেনের গতি যত বাড়ে, দু'পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে সরে যায় বেঁটে ওকের কালো জঙ্গল, আর এক্সপ্রেসের কর্ণধার কর্মচারী নিজের পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে জানলার ভেতর থেকে বাইরে তাকান, বেশ একটু দরদের সঙ্গেই মন্তব্য করেন: 'গাড়ি রুখে ডাকাতি করার পক্ষে কী চমৎকার জায়গা এটা!'

The Passing of Black Eagle, এইন্‌স্‌লি'জ, ১৯০২

সান রোজারিওর বন্ধুরা

পশ্চিমগামী ট্রেন যথারীতি সকাল ৮ : ২০ তে পৌঁছল সান রোজারিও। বগলের নিচে একটা মোটা কালোচামড়ার ব্যাগ নিয়ে ট্রেন থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক, তাড়াতাড়ি শহরের প্রধান সড়ক ধরে হেঁটে চললেন। ট্রেন থেকে আরো অনেকেই নেমেছে সান রোজারিওতে, কিন্তু তারা হয় গদাইলস্করি চালে রেলের ভোজনাগারে কিংবা 'সিলভার ডলার' রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে, নয়তো স্টেশনের কাছে-পিঠেই অলস বেকারদের দলে যোগ দিয়েছে।

ব্যাগওয়ালা ভদ্রলোকের চালচলনে কোনো ইতস্তত ভাব নেই। বেঁটেখাটো চেহারা, কিন্তু শক্তসমর্থ; মাথায় খুব হাল্‌কা রঙের ছোট করে ছাঁটা চুল, মসৃণ মুখখানায় দৃঢ়তার প্রকাশ, হামলামুখো সোনার ফ্রেমে নাক-চশমা আঁটা। একেলে পূর্বাঞ্চলীয় কায়দার ছিমছাম পোশাক। হাবভাবে একটা শান্ত অথচ সচেতন আত্মশক্তির ইঙ্গিত, তা সত্যিকারের কর্তৃত্বব্যঞ্জকও হতে পারে।

রাস্তার তিনটে চত্বর পেরিয়ে তিনি শহরের বাণিজ্য এলাকার কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন। এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রধান সড়কটাকে আড়াআড়ি কেটেছে, সান রোজারিও-শহরের বাণিজ্য ও জীবিকার কেন্দ্রবিন্দু এখানেই। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে পোস্টাপিস। আরেকদিকে রুবেন্সকির পোশাকের দোকান। আর দুটো বিপ্রতীপ কোণ দখল করে আছে শহরের দুটি ব্যাঙ্ক—'ফার্স্ট ন্যাশনাল' আর 'স্টকমেন'স্ ন্যাশনাল'। আগন্তুক ঢুকে পড়লেন সান রোজারিওর ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মধ্যে। যতক্ষণ-না ক্যাশিয়ারের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন এর মধ্যে একবারও কিন্তু তাঁর দ্রুত চলার গতি শ্লথ হয়নি। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম শুরু হবে ন'টার সময়। কর্মচারীরা এর মধ্যেই উপস্থিত হয়ে যার যার বিভাগ প্রস্তুত রাখছে সারাদিনের কাজের জন্য। ক্যাশিয়ার ডাকের চিঠিপত্র পরীক্ষা করতে-করতেই নজর করলেন আগন্তুক তাঁর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে।

'ব্যাঙ্ক তো ন'টার আগে খোলে না',—সংক্ষেপে কাটা-কথায় বললেন তিনি, কিন্তু কোনো ভাবের প্রকাশ নেই—সান রোজারিও যেদিন থেকে 'শহুরে' ব্যাঙ্ক-নির্ঘণ্ট মেনে চলছে, তারপর থেকে কত 'ভোরের পাখিকে' এই কথাই শুনিয়ে আসছেন তিনি।

'সেটা আমি ভাল করেই জানি,'—ঠাণ্ডা খিটখিটে গলায় জবাব আগন্তুকের—'আপনি দয়া করে আমার কার্ডটা দেখবেন কি?

ক্যাশিয়ার ছোট, চতুষ্কোণ, নিদাগ কার্ডটি টেনে নিলেন তাঁর খাঁচার বেড়ার পেছনে, পড়লেন :

জে. পি. সি. নেট্‌লউইক
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক পরীক্ষক।

'ওঃ—ইয়ে—আপনি ঘুরে ভেতরে আসবেন মিঃ—ইয়ে নেট্‌ল্‌উইক। আপনার প্রথম পরিদর্শন—বুঝতে পারিনি তো কী উদ্দেশ্যে! আসুন, দয়া করে পুরোটা ঘুরে আসুন ভেতরে।'

ব্যাঙ্কের পরীক্ষক চট্ করে চলে এলেন ব্যাঙ্কের অলঙ্ঘ্য এক্তিয়ারের মধ্যে, সেখানে তাঁকে প্রত্যেকটি কর্মচারীর সঙ্গে ভারিক্কি চঙে পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্যাশিয়ার মিঃ এডলিঙ্গার। মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক এডলিঙ্গার ভেবেচিন্তে বলেন, সিদ্ধান্ত নেন, নিয়মনিষ্ঠ। বললেন, 'আমি তো প্রত্যাশা করছিলাম স্যাম টার্নারকেই, শিগগিরই তাঁর আরেক রাউন্ড দেবার কথা। চার বছর হল স্যামই আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। আমার মনে হয় আপনি আমাদের সবকিছু ঠিকঠাকই পাবেন, অবশ্য ব্যবসার কঠিন অবস্থা বিবেচনা করলে। খুব বেশি টাকা হাতে না থাকলেও ঝড় সামলাবার ক্ষমতা আছে স্যর, ঝড় সামলাতে পারব।'

পরীক্ষক যেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল, বাহ্যিক আচরণ সর্বস্ব। বললেন, 'নিয়ন্ত্রক-অধ্যক্ষের হুকুমে মিঃ টার্নার ও আমাকে এলাকা বদলাবদলি করতে হয়েছে। উনি দক্ষিণ-ইলিনয় আর ইণ্ডিয়ানাতে আমার পুরনো এলাকার ভার নিয়েছেন। আমি প্রথমে ক্যাশ পরীক্ষা করব, প্লীজ্।'

পেরি ডরসি, খাজাঞ্চি, এর মধ্যেই ক্যাশ গুছিয়ে রাখছিলেন কাউন্টারে—পরীক্ষকের তদারকের জন্য। উনি জানেন কড়াক্রান্তি অবধি হিসেব ঠিক আছে, তাঁর ভয় পাবার কিছু নেই, তবু তিনি একটু উদ্বিগ্ন আর বিচলিত ভাব দেখান। ব্যাঙ্কের আর সবারও একই অবস্থা। লোকটার মধ্যে যেন এমন কিছু আছে যা বরফশীতল এবং ক্ষিপ্র, এমন নৈর্ব্যক্তিক আর আপসহীন যে তাঁর নিছক উপস্থিতিটাই যেন অভিযোগের আঙুল নির্দেশ করে। দেখলে মনে হয় এ মানুষ কখনো ভুল করবে না, ভুল মেনেও নেবে না।

মিঃ নেট্লউইক প্রথমেই হাত দিলেন টাকা-পয়সায়। দ্রুত কারেন্সি-নোটগুলো প্যাকেট ধরে-ধরে গুণে ফেললেন প্রায় ভোজবাজির কায়দায়, তারপর স্পঞ্জের কাপটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে একেকটা নোট যাচাই করে গুনলেন আবার। তাঁর সরু সাদা আঙুলগুলো যেন কোনো ওস্তাদ বাজিয়ের মতো পিয়ানোর চাবির ওপর নাচছিল। ঝনাৎ করে কাউন্টারের ওপর সোনার মুদ্রাগুলো জমা করলেন, ওঁর পল্কা আঙুলের ডগা থেকে মার্বেলের পাটার ওপর মুদ্রাগুলো যেন ঝিনিক ঝিনিক করে গান গেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি আধুলি আর সিকি নিয়ে পড়লেন তখন সারা জায়গা জুড়ে কেবলই খুচরো পয়সা। শেষ 'নিকেল' আর 'ডাইমটা' অবধি গুনলেন। তারপর নিক্তি আনিয়ে সিন্দুকের প্রত্যেকটি রুপোর থলি ওজন করলেন। নগদ টাকার হিসেবখাতা নিয়ে মিঃ ডোরসিকে প্রশ্ন করেন খুঁটিয়ে—বিশেষ চেক, দাবির স্লিপ ইত্যাদি যা আগের দিনের কাজের জের হিসেবে টানা। ওঁর বিনয়ের মধ্যে কোনো খুঁত নেই, তবু শীতল ভাবভঙ্গিতে এমন রহস্যময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে যা টেলার-মশাইয়ের গণ্ডদেশ একেবারে গোলাপি করে দেয়, জিভে তোতলামি আনে।

এই নতুন আমদানি পরীক্ষকটি যেন স্যাম টার্নারের চেয়ে কত আলাদা! স্যামের পদ্ধতি ছিল হৈ-হল্লা করে ব্যাঙ্কে ঢোকা, চুরুট বিলানো আর রাউণ্ড দেবার কালে যা—যা মজার গল্প শুনেছেন তা বলা। ডোরসিকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সম্ভাষণ জানাতেন—'হেল্লো পেরী! দেখছি এখনো তুমি টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়োনি, অ্যাঁ?' টার্নারের ক্যাশ গোনার কায়দাও ছিল অন্যরকম। কেমন এক মন্থর ক্লান্ত ঢঙে নোটের বাণ্ডিল হাতড়াতেন, তারপর সিন্দুকের কাছে গিয়ে কয়েকটা রুপোর থলির ওপর লাথি মারতেন, ব্যস্ ওই পর্যন্তই। আধুলি সিকি ডাইম? ওসব স্যাম টার্নারের জন্য নয়। ওগুলো সামনে রাখলে বলতেন, 'ও

মুরগির খাদ্য আমার নয়, আমি তো কৃষি বিভাগের লোক নই।' তবে হ্যাঁ. টার্নার টেক্সাসের মানুষ, ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের পুরনো দোস্ত. আর ডোরসিকেও জানেন তাঁর ছেলেবেলা থেকেই।

পরীক্ষক যখন ক্যাশ গুনছেন, তখন ফার্স্ট ন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট তার বুড়ো খোঁয়াটে-বাদামি ঘোড়া আর বগিগাড়ি নিয়ে দাঁড়ালেন দরজার পাশে। মেজর টমাস বি. কিংস্‌ম্যান, সকলের কাছে "মেজর টম" নামেই পরিচিত, ঢুকলেন ভেতরে। পরীক্ষককে টাকাকড়ি নিয়ে ব্যস্ত দেখে উনি তাঁর "টাট্টুঘোড়ার খোঁয়াড়ে" ঢুকলেন—উনিই নামটা দিয়েছেন। ভেতরে তাঁর আলাদা ডেস্ক। চিঠিপত্র দেখতে শুরু করলেন।

একটু আগেই একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যা পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ নজরও এড়িয়ে গেছে। উনি যখন ক্যাশ কাউন্টারে কাজ শুরু করেন, মিঃ এডলিঙ্গার একবার বিশেষ ইঙ্গিত করে ছোকরা ব্যাঙ্ক-পিওন রয় উইলসনের দিকে চোখ টেপেন, আব সামান্য মাথা নেড়ে সামনের দরজাটা দেখান। রয ঠিক বুঝেছিল, সে টুপি তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে পিওন বইখানা বগলদাবা করে বেরিয়ে গেল। একবার বাইরে এসেই সে সোজা ছুটল "স্টকমেন'স্ ন্যাশনালের" দিকে। ও ব্যাঙ্কটাও খোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এখন অবধি কোনো গ্রাহক-খদ্দের সেখানে আসেনি।

দীর্ঘদিনের পরিচয় আব ছোকরা বয়েসের অন্তরঙ্গতা নিয়ে বয় চেঁচিয়ে ওঠে—'এই যে স্যাঙাৎরা! এবার একটু নড়াচড়া করবে তো। আমাদের ফার্স্টে একজন নয়া ব্যাঙ্ক পরীক্ষক এসেছে, বড্ড নট্‌খট্ করে। পেরীর সঙ্গে বসে নিকেল গুনছে, গোটা দপ্তরটাকেই একেবারে ভড়কে দিয়েছে। মিঃ এডলিঙ্গার আমায় ইশারা দিলেন তোমাদের ব্যাপারটা জানাতে।'

স্টকমেন'স্ ন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ বাক্‌লে—বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি, রবিবারের ছুটির পোশাক পরা চাষীর মতো পোশাক—পেছনের প্রাইভেট দপ্তর থেকে শুনতে পান রয়ের গলা, তাকে ভেতরে ডাকেন।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেন, 'মেজর কিংম্যান কি এর মধ্যেই ব্যাঙ্কে এসে গেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তো দেখলাম তাঁকে গাড়ি চালিয়ে আসতে।'

'তাঁকে একটা চিঠি দেব, তুমি নিয়ে যাবে। ফেরামাত্রই তাঁর নিজের হাতে দিও কিন্তু।'

মিঃ বাক্‌লে বসে লিখতে শুরু করেন।

বয় ফিরে এসে চিঠিসমেত খামটা তুলে দেয় মেজর কিংম্যানেব হাতে। মেজর ওটা পড়ে, ভাঁজ করে ঢুকিয়ে নেন নিজেব ভেতর-কোটের পকেটে। কয়েক

মুহূর্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন। তারপর উঠে এগিয়ে যান ভল্টের মধ্যে। পেছনে সোনালি অক্ষর ছাপা একটা মোটা সাবেকি আমলের চামড়ার কেস্ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ওতে লেখাঃ "বাটা দেওয়া বিলসমূহ"।

ওতে রয়েছে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য জামানত সহ হুণ্ডিগুলো। মেজর স্বভাবসিদ্ধ হেলাফেলায় ওগুলো নিজের ডেস্কের ওপর নামিয়ে রেখে বাছাই করতে লাগলেন।

ততক্ষণে নেট্‌লউইক ক্যাশ গোনা শেষ করেছেন। এবার যে কাগজটায় উনি হিসেবের অঙ্কগুলো লিখেছেন তার ওপর পেন্সিল চালাতে লাগলেন ভাড়ুই পাখির গতিতে। তিনি তাঁর কালো ব্যাগটা খুললেন, ওটাও বলতে গেলে এক ধরনের গোপন স্মারক খাতা। তাতে চট্‌পট কিছু অংকের সংখ্যা লিখলেন, তারপর বোঁ করে ঘুরে ডোর্‌সির দিকে তাকালেন, তাঁর চশমার ঝলকানি থমকে দিয়েছে ডোর্‌সিকে। ওঁর দৃষ্টিটা যেন বলছে: 'আপনি এবারের মতো বেঁচে গেলেন, কিন্তু— ....'

পরীক্ষক ক্যাট্‌ক্যাট করে বললেন, 'ক্যাশ সবই ঠিক আছে।' ঝট্ করে চলে গেলেন 'স্বতন্ত্র' হিসাবরক্ষকের কাছে—কয়েকমিনিট ধরে ফর্‌ফর্ লেজারের পাতা ওলটানো, হিসাব নিকাশের পাতাগুলো আকাশে ওড়ানো।

হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'আপনার পাসবইয়ের হিসেব-নিকেশ কতদিন বাদে-বাঁদে করা হয়?'

'ইয়ে ... মাসে একবার ...' তোতলান হিসাবরক্ষক, ভাবেন ওঁর এবার কত বছরের জেল হবে কে জানে!

'ঠিক আছে সব,' বলেই পরীক্ষক ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'সাধারণ' হিসাবরক্ষকের ওপর। তাঁর কাছে বিদেশী ব্যাঙ্কের লেনদেন, হিসেব মেলানোর বিবরণগুলো প্রস্তুতই রয়েছে। ওসবের মধ্যেও কোনো গণ্ডগোল নেই। এরপর জমা নেবার স্বীকারপত্রগুলোর কাটা অংশ। ফরর-ফরর্ ফ্যাস্-চেক্! সব ঠিক। ওভারড্রাফটের তালিকা দেখান দয়া করে। ধন্যবাদ। হুম্-ম্। এর পর ব্যাঙ্কের সই না করা বিলগুলো। ঠিক আছে।

তারপর এল ক্যাশিয়ারের পালা। জেরার তোপের মুখে নির্ঝঞ্ঝাট মিঃ এডলিঙ্গার নাক মোছেন, উদ্বেগের সঙ্গে চশমা সাফ করেন—প্রশ্ন, বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ, একক মুনাফা, ব্যাঙ্কের স্থাবর সম্পত্তি, স্টকশেয়ারের মালিকানা ইত্যাদি নিয়ে।

হঠাৎ নেট্‌লউইক খেয়াল করলেন তাঁর কনুইয়ের পাশে এক বিশালবপু ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর চেয়েও একমাথা উঁচু। বছর ষাটেক বয়েস, রুক্ষ হলেও স্বাস্থ্যবান, উস্কুখুস্কু ধূসর দাড়ি, মাথায় এক রাশ আধপাকা চুল, এক জোড়া অন্তর্ভেদী নীল চোখ নিষ্পলকে সোজাই তাকিয়ে রয়েছে পরীক্ষকের প্রখর চশমার দিকে।

ক্যাশিয়ার বললেন, 'ইনি—ইয়ে— আমাদের প্রেসিডেন্ট মেজর কিংম্যান—আর ইনি মিঃ নেট্‌লউইক।'

দুই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের মানুষ পরস্পরের করমর্দন করেন। একজন সরল রেখা, বাঁধাধরা নিয়ম আর বাহ্য-আচরণের দুনিয়ার সন্তান। আরেকজন অপেক্ষাকৃত মুক্ত, প্রসারিত, প্রকৃতির কাছাকাছি। টম কিংম্যান কোনো ছকে-বাঁধা মানুষ নন। এক সময় উনি ছিলেন ঘোড়ার চালক, কাউবয়, রেঞ্জার, সেপাই, শেরিফ, ধাতুসন্ধানী এবং খামারমালিক। এখন, যখন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হলেন, তারপরেও তাঁর প্রেইরি এলাকার জিন-তাঁবু-পথ-হেঁচড়ানো পুরনো দোস্তরা তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেল না। টেক্সাসের গরুভেড়ার যখন আকাশচুম্বী মূল্য, তাঁর ভাগ্য খুলে গেল, গড়ে তুললেন সান রোজারিওর ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। হৃদয়ের উদারতা এবং মাঝেমধ্যে পুরনো বন্ধুদের খাতিরে বিবেচনাহীন বদান্যতা সত্ত্বেও কিন্তু ব্যাঙ্ক বেড়েই চলে, কারণ মেজর কিংম্যান যেমন গরুভেড়া চেনেন তেমনি মানুষও ভাল করেই চেনেন। গত কয়েক বছরে গরুভেড়ার ব্যবসা হয়তো গোল্লায় গেছে, কিন্তু মেজরের ব্যাঙ্ক এমন একটা ব্যাঙ্ক যার বলতে গেলে তেমন লোকসানই হয়নি।

পরীক্ষক ভদ্রলোক চট্ করে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দ্যাখেন—'এবার তা'হলে শেষ ব্যাপারটায় আসি—'ধার-দেনা'। যদি আপত্তি না থাকে এখনই শুরু করি?'

প্রায় 'রেকর্ড ভাঙার' গতিতেই তিনি ফার্স্ট ন্যাশনাল শেষ করেছেন— তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে, যেমন সব ব্যাপারেই করেন। ব্যাঙ্কের পরিচালন-ব্যবস্থা খুবই মসৃণ এবং পরিষ্কার, তার ফলে তারই কাজের সুবিধা হয়েছে। এ-শহরে আব মাত্র একটি ব্যাঙ্ক। পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক পিছু পঁচিশ ডলার পান সরকার থেকে। বাকি যা দেনা আর বাটার কাজ, তা আধ ঘন্টাতেই কাবার হয়ে যাওয়া উচিত। তা যদি হয়, তাহলে অন্য ব্যাঙ্কের কাজটা এর পরেই ধরতে পারেন, আর ১১: ৪৫-এর ট্রেনটাও পাকড়াতে পারেন। ওঁর কাজের এলাকার দিকে ওইটাই আজকের একমাত্র গাড়ি তো! না হলে তাঁকে আবার আজ রাতটা আর রবিবারটাও কাটাতে হয় এই আকর্ষণহীন পশ্চিমী শহরে। আর সেই জন্যই মিঃ নেট্‌লউইক এমন তাড়াহুড়ো করছেন।

'আমার সঙ্গে আসুন, স্যার,'—মেজর কিংম্যান বললেন। ওঁর গলার আওয়াজ গাঢ়—দক্ষিণী অলস-টান আর পশ্চিমের ছান্দস খোনা সুরের মেশামিশি —'আমরা দু'জনে মিলেই দেখব ওটা। আমি যতটা জানি, ব্যাঙ্কের আর কেউ অত ভাল করে জানে না ওসব নথিপত্র। কতগুলো আছে সিধে পায়ে দাঁড়াতে পারে না, আর কতগুলো পথে-পথে-ঘোরা, পিঠে তেমন মার্কামারা ছাপ নেই, তবে

চক্করে বেরুলেই সবাই মোটের ওপর ঠিকঠাক মিটিয়ে দেয় প্রাপ্য'।

দু'জনে প্রেসিডেন্টের ডেস্কে বসলেন। প্রথমে, পরীক্ষক বিদ্যুৎগতিতে হুণ্ডিগুলো দেখলেন, ওগুলোর মোটফল মেলালেন। দেখলেন দৈনিক জমাখরচের খাতার সঙ্গে মিলেই যাচ্ছে দেনার অঙ্ক। এর পর, তিনি ধরলেন বড় ধার-দেনা, খুঁটিয়ে জেনে নিলেন খাতকদের অবস্থা আর জামানতের শর্ত। নতুন পরীক্ষকের মনটা যেন ডালকুত্তার মতো সূত্র ধরে এগোয়, কখনো সোজা পথে, কখনো বাঁক নিয়ে, কখনো এখানে-ওখানে আকস্মিকভাবে ছুটে গিয়ে। অবশেষে তিনি কয়েকটা বাদে বাকি সব কাগজ ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ওই ক'টা তিনি সুন্দর করে সাজালেন সামনে, তারপর শুরু করলেন একটা শুকনো, আনুষ্ঠানিক, ছোট বক্তৃতা।

'আমি দেখলাম, স্যর, আপনার ব্যাঙ্কের অবস্থা খুবই ভাল,—বিশেষ করে আপনাদের স্টেটে ফসলের ঘাটতি আর পশুপালনের উৎসাহের অভাবটা বিবেচনা করলে। কেরানি কর্মচারীদের কাজ পাকা, সময়ানুবর্তী। আপনাদের 'অতীতের প্রাপ্য' হিসেবেও টাকার অঙ্ক পরিমিত, খুব কমই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আমি সুপারিশ করব বড় ধারদেনাগুলো কমিয়ে ফেলুন, সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্য আবার চাঙা না হওয়া পর্যন্ত শুধু ষাট দিন কি নব্বই দিনের মেয়াদে ঋণ দিন। এবার, আরো একটা জিনিস আছে যেটা করে ফেললে আমার এ ব্যাঙ্কের কাজ শেষ হয়। এখানে ছ'টা হুণ্ডি আছে যার পরিমাণ একুনে ৪০,০০০ ডলার। এগুলো জামানতবদ্ধ, বিভিন্ন স্টক, বন্ড, শেয়ার ইত্যাদি মিলিয়ে যার আপাত মূল্য হবে ৭০,০০০ ডলার। হ্যাণ্ডনোটে সংলগ্ন থাকার কথা সেই জামানতগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ধারণা আপনি সেগুলো হয় সিন্দুকে, নয় ভল্‌টে রেখেছেন। আপনি অনুমতি দিলে ওগুলো পরীক্ষা করি।'

মেজর টমের হাল্‌কা-নীল চোখের অটল দৃষ্টি পরীক্ষকের দিকে।

নিচু অথচ স্থির কণ্ঠে বললেন, 'না স্যর। ও জামানতের কাগজগুলো সিন্দুকেও নেই, ভল্‌টেও নেই। আমিই নিয়েছি ওগুলো। ওগুলো হাজির নেই বলে আপনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করতে পারেন।'

সামান্য রোমাঞ্চ অনুভব করলেন নেট্‌লউইক। উনি এটা প্রত্যাশা করেননি। শিকার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখনই একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে এল ওঁর।

বললেন, 'অ্যাঁ!'—এক মুহূর্ত থেমে আবার: 'আরো নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করবেন ব্যাপারটা?'

মেজর পুনরাবৃত্তি করলেন, 'জামানতের কাগজগুলো আমিই নিয়েছি। আমার নিজের ব্যবহারের জন্য নয়, কিন্তু এক পুরনো বন্ধুকে ঝামেলা থেকে বাঁচাতে। আপনি ভেতরে আসুন স্যর, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব।'

পেছনদিকে ব্যাঙ্কের প্রাইভেট দপ্তর, সেখানে পরীক্ষককে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করেন মেজর। ভেতরে একটা ডেস্ক্, একটা টেবিল, আর চামড়া-মোড়া আধডজন চেয়ার। দেয়ালে একটা টেক্সান বলদের মাথা সাজানো, শিংজোড়া তার ডগা থেকে ছ'ফুট। উল্টোদিকের দেয়ালে ঝুলছে মেজরের সাবেকী ঘোড়সওয়ারী বাঁকা কিরিচ যা উনি শিলো আর ফোর্ট-পিলোতে ব্যবহার করতেন।

নেট্‌লউইককে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মেজর নিজে বসেন জানলার কাছে। সেখান থেকে উনি পোস্টাফিসটা, আর স্টকমেন'স্ ন্যাশনালের কারুকাজ-করা চুনোপাথরের প্রবেশমুখটা দেখতে পান। উনি তক্ষুনি মুখ খোলেননি, আর নেট্‌লউইকের মনে হল— শীতল বরফ এখনই ভাঙবে যখন সরকারী সাবধানবাণীর শব্দগুলো একই তাপমানে তার ওপর হামড়ে পড়বে।

তিনি শুরু করলেন, 'আপনার বিবৃতি যখন সংশোধন করতে অপারগ হলেন, তার মানে কী দাঁড়ায় তা আপনার অজানা নয়— অত্যন্ত গুরুতর একটা বিষয়। আপনি এ-ও জানেন কর্তব্য আমাকে কী করতে বাধ্য করবে। আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কমিশনারের সামনে গিয়ে জানাতে—'

অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে মেজর টম বললেন, 'জানি, আমি জানি। আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না, জাতীয় ব্যাঙ্কিং আইন আর সংশোধিত বিধানগুলো না জেনেই আমি একটা ব্যাঙ্ক চালাচ্ছি। আপনি আপনার কর্তব্য করুন, কোনো অনুগ্রহ চাইছি না আপনার কাছে। কিন্তু আমি আমার বন্ধুর কথা বলছিলাম। বব্ সম্পর্কে আমি যা বলছিলাম আপনি তা শুনুন এই আমি চাই।'

নেট্‌লউইক নিজের চেয়ারে গুছিয়ে বসলেন। আজ আর সান রোজারিও ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে না তাঁর। কারেন্সি নিয়ন্ত্রককে টেলিগ্রাফ করতেই হবে; যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনারের সামনে শপথ নিয়ে তাঁকে একটা ওয়ারেন্ট বের করতে হবে মেজর কিংম্যানকে গ্রেপ্তার করার জন্য; হয়তো তাঁর ওপর হুকুম হবে জামানতের কাগজপত্র খোয়া গেছে বলে ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেবার। এটাই তো প্রথম অপরাধ নয় যা পরীক্ষক উদ্ঘাটন করেছেন। তদন্ত করতে গিয়ে দু'একবার এমন ভয়ানক মানবীয় আবেগের উত্থান আগেও ঘটিয়েছেন যার ফলে তাঁর সরকারী প্রশান্তির মধ্যে ছোটখাট তরঙ্গও জেগেছে। ব্যাঙ্কের লোককে তিনি মেয়েমানুষের মতো হাঁটু গেড়ে বসে কেঁদে আবেদন জানাতে দেখেছেন—একটি ঘণ্টা সময় দিন—সামান্য ভুলটা অগ্রাহ্য করুন। একজন ক্যাশিয়ার তো ওঁর চোখের সামনেই ডেস্কে বসে গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করল। কিন্তু এই কঠোর বুড়ো পশ্চিমবাসীটির মতো মর্যাদা আর ঠাণ্ডা মেজাজ দেখিয়ে কেউ ব্যাপারটা গ্রহণ করেনি। নেট্‌লউইক ভাবলেন বুড়ো যদি কিছু বলতেই চায় তা অন্তত এই কারণেই সেটা শোনা যাক। চেয়ারের হাতলে কনুই, আর ডান হাতের আঙুলের ওপর তাঁর চৌকো থুতনিটা রেখে

ব্যাঙ্ক পরীক্ষক সবুর করতে লাগলেন—সান রোজারিওর ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের স্বীকারোক্তি শুনতে।

কিছুটা শিক্ষা দেবার ঢঙে মেজর টম বলতে আরম্ভ করেছেন, 'কোনো মানুষ যখন আপনার চল্লিশ বছরের পুরনো বন্ধু হয়—জল আগুন মাটি সাইক্লোনের ভেতর দিয়ে পরীক্ষিত—তখন তাকে একটু মদত দেবার ক্ষমতা থাকলে মদত দিতে ইচ্ছাই করে।'

(পরীক্ষক-মশাই ভাবেন: হ্যাঁ তার জন্য সত্তর হাজার ডলারও তছরুপ করা যেতে পারে।)

'আমরা দুজন একসঙ্গেই কাউবয় ছিলাম—বব আর আমি', ধীর কণ্ঠে বলে চলেন মেজর, ইচ্ছে করে, অনেক ভেবেচিন্তে, যেন বর্তমানের সংকট নিয়ে নয়, বরং অতীত নিয়েই তাঁর সব ভাবনা—'আমরা দু'জনে মিলেই গোটা আরিজোনা নিউ মেক্সিকো, আর কিছুটা কালিফোর্নিয়াতেও সোনা আর রুপোর সন্ধান চালাই। 'একষট্টি সালের যুদ্ধে দুজনেই ছিলাম, তবে আলাদা-আলাদা কমাণ্ডে। পাশাপাশি থেকে ইণ্ডিয়ান আর ঘোড়াচোরদের সঙ্গে লড়েছি, আরিজোনার পাহাড়ে একটা কেবিনের মধ্যে হপ্তার পর হপ্তা উপোস করেছি বরফের কুড়ি ফুট নিচে ডুবে। আমরা একসঙ্গে গরুর পাল দাবড়েছি এমন প্রচণ্ড হাওয়ার ভেতর যে আকাশের বাজও আমাদের আঘাত করতে পারেনি। ... যাক, বব আর আমি এই সব বিপদ-আপদের মধ্যে কাটিয়েছি প্রথম যেবার আমাদের দেখা হয় তার পর থেকেই,—সেটা, পুরনো "নোঙর-বার" পশুখামারের "চিহ্ন দেওয়ার" শিবিরে।

'আর সেই সময়টাতেই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম—একবার নয় একাধিকবার, যে মুশকিলে পড়লে আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করা কত প্রয়োজন। সে সব দিনে একজন তার বন্ধুর সঙ্গে লেগে থাকবে এটা ধরেই নেওয়া হত, তার জন্য সে কোনো কৃতিত্বের দাবি করত না। হয়তো বা পরদিনই তাকে আপনার প্রয়োজন হবে পেছনের আঙিনায়, তার সাহায্য নিতে হবে এ্যাপাচে দস্যুদলকে তাড়াতে, কিংবা আপনার পায়ে র‍্যাট্‌লসাপ-কামড়ানো জায়গার ওপর বাঁধন আঁটতে আর ঘোড়ায় চেপে হুইস্কি আনতে। তাই, মোটের ওপর তা ছিল দেয়া-নেয়ার ব্যাপার—যদি সঙ্গীর মুখোমুখি দাঁড়াতে না পার, তবে পরে নিজেই লজ্জায় পড়বে যখন তাকে প্রয়োজন হবে। কিন্তু বব ছিল এমন একটা লোক যে এর চেয়েও বেশি যেতে প্রস্তুত, তার খেলার কোনো সীমা নেই।

'কুড়ি বছর আগে আমি ছিলাম জেলার শেরিফ, ববকে আমার প্রধান ডেপুটি করে নিলাম। সেবার গরুভেড়ার ব্যবসা তেজি হবার আগেই আমরা দুজন নিজেদের খুঁটি পাকা করে নিয়েছি। আমি শেরিফ এবং কালেক্টর—তখনকার দিনে আমার পক্ষে মস্ত ব্যাপার। আমি বিয়ে করেছিলাম, আমার তখন দুটো বাচ্চা— চার

বছরের ছেলে, ছ'বছর বয়েসের মেয়ে। আদালত বাড়ির পাশেই একটা চমৎকার বাড়িতে থাকি, জেলা থেকেই দিয়েছে, ভাড়া দিতে হয় না, কিছু পয়সাও জমিয়ে ফেলেছি। দপ্তরের কাজ বেশির ভাগ ববই করে। আমরা দুজনেই কঠিন কালের মধ্যে প্রচুর বিপদ আপদের ভেতর দিয়ে কাটিয়েছি। তাই বলছি, রাতগুলোতে বড় ভাল লাগত জানলার ওপর বর্ষা আর বৃষ্টি-বরফ আছড়ে পড়ার শব্দ, মনে হত এই তো এখন আরামে নিরাপদে বাস করছি, জানি ভোর হলেই উঠে পড়ব, দাড়ি কামাব, আর লোকে ডাকবে আমাদের 'মিস্টার' বলে। তা ছাড়া আমার গিন্নিটির মতো গিন্নি আর ছেলেপুলে সারা তল্লাটে নেই। আমি পুরনো দোস্তের সঙ্গে মিলে উপভোগ করি উন্নতির প্রথম ফসল, সাদা ভদ্র পোশাক। মনে হয় সুখীই ছিলাম, সত্যিই বড় সুখে ছিলাম সে সময়টা।'

মেজর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এমনিই একবার জানলার বাইরে তাকান। ব্যাঙ্ক পরীক্ষক চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসেন, এবার অন্য হাতটার ওপর থুতনি রেখে।

মেজর বলে চলেন, 'একবার শীতকালে, জেলার ট্যাক্সের টাকা এমন বিপুল পরিমাণে হুড়হুড় করে আসতে থাকে যে এক হপ্তা ধরে সময়ই পাচ্ছিলাম না সেগুলো ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবার। সোজা চেকগুলো ঢুকিয়ে রাখলাম চুরুটের বাক্সে, আর টাকাগুলো একটা থলিতে। শেরিফ দপ্তরেরই বড় সিন্দুকটায় তালাবন্ধ করে রাখলাম সব।

'বড় অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছিল সে হপ্তায়, তাই খানিকটা অসুস্থও হয়ে পড়লাম। স্নায়ু বেচাল, রাতের ঘুমেও যেন বিশ্রাম জোটে না। ডাক্তারদের কী যেন এক বৈজ্ঞানিক নাম আছে এ ব্যারামের। ওষুধপত্র খেতে থাকলাম। তাই বিশ্রামের সঙ্গে, মনে টাকার চিন্তা নিয়ে বিছানায় যাই রাতে। খুব যে একটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল তা নয়, কারণ সিন্দুকটা মজবুত, তা ছাড়া, বব্ আর আমি ছাড়া কেউ সিন্দুকের তালা-নম্বর জানে না।

'শুক্রবার রাতে থলির মধ্যে নগদ ছিল ৬,৫০০ ডলার। শনিবার সকালে যথারীতি দপ্তরে গেলাম। সিন্দুক তালাবন্ধ, বব ডেস্কে বসে লেখালিখি করছে। আমি সিন্দুকটা খুলেই দেখি টাকা উধাও। ববকে ডাকি, আদালতবাড়ির সবাইকে ডেকে তুলে জানিয়ে দিই ডাকাতির ব্যাপারটা। আমার কাছে কেমন যেন লাগল, বব বেশ শান্তভাবে নিচ্ছে সবকিছু—বিশেষ করে যখন দায়িত্বটা আমাদের দু'জনের ঘাড়েই!

'দুটো দিন চলে গেল, কোনো সূত্রই পেলাম না আমরা। নিশ্চয়ই সিঁধেল চোরের কাজ নয়, কারণ সঠিক পদ্ধতিতেই নম্বর সাজিয়ে সিন্দুক খোলা হয়েছে। লোকে নিশ্চয়ই বলাবলি করছে, তাই একদিন বিকেলে এসে হাজির এ্যালিস্, আমার স্ত্রী, সঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে। এ্যালিস্ জলভরা চোখে পা দাপিয়ে চেঁচাতে

লাগল—'মিথ্যুক হতভাগারা,—টম্, টম!' ওকে বেহুঁশ অবস্থায় ধরে ফেলি আমি, একটু একটু করে ওর জ্ঞান ফেরাই। ও মাথা গুঁজে হু-হু করে কাঁদতে থাকে। টম কিংম্যানের পদবী ও মর্যাদা পাবার পর ওর এই প্রথম কান্না। আর ছেলেমেয়ে দুটো—জ্যাক আর জিল্লা, ওরা তো সব সময় ববের ওপর বাঘের বাচ্চার মতো চড়ে বসত যখনই ওদের আদালতবাড়িতে আসার সুযোগ হত, কিন্তু তারাও তখন ভয়-পাওয়া তিতিরের মতো একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, জীবনের আঁধার ছায়ার মধ্যে এই তাদের প্রথম পদক্ষেপ। বব ডেস্কে বসে কাজ করছিল, ও শুধু উঠে দাঁড়াল, একটি কথাও না বলে বাইরে বেরিয়ে গেল। আদালতে তখন জুরীদের সেশন চলছে, পরদিন সকালেই বব ওঁদের সামনে গিয়ে স্বীকার করল যে ও-ই টাকাটা চুরি করেছে। বলল সে নাকি পোকার খেলায় বাজি হেরেছিল। পনের মিনিটের মধ্যে একটা মুচলেকা পেয়ে তাঁরা আমার কাছে পরোয়ানা পাঠালেন—গ্রেপ্তার করতে হবে এমন এক মানুষকে যার সঙ্গে আমার অত বছরের ওঠ-বস, হাজারটা ভাইয়ের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ।

'গ্রেপ্তার তো করলাম, ববিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "ওই আমার বাড়ি আর এই দপ্তর, সামনে মেইন নদী, পার হলেই ক্যালিফোর্নিয়ার পথ, সেখানে ফ্লোরিডা—এইটুকুই তোমার এলাকা, যতদিন না আদালত বসে। তুমি আমার হেপাজতে, দায়িত্ব আমার কাঁধে। যখনই চাওয়া হবে, তুমি এখানে হাজির থাকবে।"

'একটু অবহেলা ভরেই যেন ও বলল, "ধন্যবাদ টম। আমি খানিকটা আশাই করছিলাম তুমি আমাকে হাজতে পুরবে না। আদালত বসবে সামনের সোমবার, তাই তোমার আপত্তি না থাকলে এ ক'দিন আমি দপ্তরের কাছেই ঘোরাফেরা করব একটু। একটা অনুগ্রহ শুধু চাইব, যদি সেটা বাড়াবাড়ি না হয়। মাঝেমধ্যে তুমি তোমার বাচ্চাদের যদি আঙিনায় এসে হৈচৈ করতে দাও, তো খুব খুশি হব।"

'বললাম, "কেন নয়? ওরা যেমন আসতে পারে, তুমিও আসতে পার। আমার বাড়িতেও এস, আগে যেমন আসতে।" বুঝলেন তো, মিঃ নেট্‌লউইক, একজন চোরকে আপনি বন্ধু বানাতে পারেন না, কিন্তু একজন বন্ধুকেও তো চোর বানাতে পারেন না, একই সঙ্গে?'

পরীক্ষকের কাছে এর কোনো জবাব নেই। ঠিক সেই সময়টাতে শোনা গেল একটা রেলইঞ্জিনের স্টেশনে ঢোকার তীক্ষ্ণ বাঁশি। ওটা দক্ষিণ দিক থেকে সান রোজারিও আসতে সরু-গেজের ছোট লাইনের ট্রেন। মেজর মুহূর্তেক কান খাড়া করে শুনলেন, নিজের ঘড়িটাও দেখলেন। 'সরু-গেজ'তো ঠিক টাইমেই এসেছে—দশটা পঁয়ত্রিশ। মেজর আবার বলতে থাকলেন: 'অতএব বব্ দপ্তরের আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে, কাগজ পড়ে, চুরুট খায়। ওর জায়গায় আমি

এক নতুন ডেপুটি নিয়েছি। কিছু পরে ঘটনাটার প্রথম উত্তেজনা কেটে গেল।

'একদিন আমরা যখন দপ্তরে একা, বব্ এল আমার আসনের কাছে। ওকে যেন কেমন গম্ভীর আর কাল্‌চে দেখায়—ঠিক এরকম চেহারাই ওর দেখতাম যখন সারা রাত ধরে ও ইণ্ডিয়ানদের নজরে রাখত, কিংবা ঘোড়ার দল দাবড়াত।

'ও বললে, "টম, এইভাবে থাকা লাল-চামড়াদের তাড়াবার চেয়েও কঠিন হচ্ছে। জল থেকে চল্লিশ মাইল দূরে লাভা মরুভূমিতে শুয়ে থাকাও এর চেয়ে সহজ, তবু শেষ পর্যন্ত আমি লেগে থাকবই। তুমি তো জান এই আমার চিরকালের কায়দা। তবে তুমি যদি সামান্য ইশারাটাও দাও, যদি শুধু বল, 'বব, আমি বুঝেছি,' তাতেই আমার অর্ধেক মুশকিল কমে যায়।"

'আমি তো অবাক। বলি, "তুমি কী বলতে চাইছ বব, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই তুমি জান, তোমার জন্য দুনিয়ায় হেন কাজ নেই যা আমি করতে পারি না। কিন্তু এ যে কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না।"

"ঠিক আছে, টম,"—ব্যস্ এইটুকুই সে বলল, তারপর ফিরে গেল তার খবরের কাগজে, জ্বালিয়ে নিল আরেকখানা চুরুট।

'কোর্ট বসার আগের রাতে বুঝে গেলাম সে কী বলতে চাইছিল। সে-রাতে আমার সেই পুরনো, মাথা ঝিম্‌ঝিম-করা স্নায়বিক অনুভূতি আবার ফিরে এল। মাঝরাত নাগাদ ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন জাগলাম, দেখি আদালতবাড়ির একটা বারান্দায় অসম্পূর্ণ পোশাকে দাঁড়িয়ে আছি। বব আমার একটা বাহু ধরে রয়েছে, আরেকটা হাত ধরেছেন আমাদের পারিবারিক ডাক্তার, আর এ্যালিস্ আমায় ঝাঁকুনি দিতে-দিতে কেঁদে ফেলার উপক্রম। আমার অজান্তেই সে ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছিল। উনি এসে দেখলেন আমি বিছানায় নেই, উধাও। তখন শুরু করলেন আমার সন্ধান।

'ডাক্তার বললেন, "ঘুমের ঘোরে হাঁটা"।

'সবাই ফিরে গেলাম বাড়িতে। ডাক্তার আমাদের শোনালেন ওই রকম অবস্থায় লোকে কী অদ্ভুত সব কাণ্ড করে তাই নিয়ে কিছু অসাধারণ কাহিনী। একবার বাইরে ঘুরে এসে রীতিমত ঠাণ্ডা বোধ করছিলাম; আমার স্ত্রী তখন কামরার বাইরে থাকায়, নিজেই একটা পুরনো আলমারির দরজা খুলে টেনে বের করলাম একটা বড়সড় লেপ। ওটা যে ওখানে থাকে তা আমি দেখেছি। লেপটার সঙ্গে বাইরে গড়িয়ে পড়ল টাকার সেই থলি, যেটা চুরি করার দায়ে ববের বিচার হতে চলেছে—হয়তো শাস্তিও—আজই সকাল বেলায়!

'আমি চিৎকার করে উঠলাম, "এটা আবার কোন্ ভোজবাজিতে এখানে এসে ঢুকল?"—সবাই নিশ্চয় দেখেছিল কী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ববও মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেছে।

'মুখে আগের যুগের সেই একই ভাব। বললে, "হতভাগা ঝিমুনো বুড়ো!

আমি তোমায় ওটা রাখতে দেখেছি। ভাল করে লক্ষ্য করেছি সিন্দুক খুলতে আর ওটা বের করে নিতে, তারপর তোমার পেছু নিয়েছি। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি তুমি ওটা আলমারির মধ্যে লুকোচ্ছ।"

"তা'হলে তুইও গোমুখ্যু, কান-ভোঁতা, ভেড়া-মাথা কয়োট্ একটা। কেন বলেছিলি ওটা চুরি করেছিস?"

'বব সাদাসিধে উত্তর দেয়— "কারণ আমি বুঝতে পারিনি তুমি আসলে ঘুমোচ্ছিলে।"

'আমি ওকে কামরার দরজার দিকে তাকাতে দেখি—এ্যালিস্ আর জ্যাক-জিল্লা সেখানে—আর তখনই বুঝতে পারি ববের দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন মানুষের বন্ধু হবার মানেটা কী।'

মেজর থামলেন, আবার তাকালেন জানলার বাইরের দিকে। দেখলেন স্টকমেন'স্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মধ্যে কেউ একজন এগিয়ে এসে পুরো চ্যাপটা-কাঁচ বসানো বড় সামনের জানলাটার ওপর একটা হলদে শেড টেনে দিল। যদিও অবশ্য সূর্য এখন যেখানে তাতে রোদের তাপ ঠেকোবার জন্য অতটা আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছিল না।

নেট্লউইক চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন। তিনি ধৈর্য ধরেই মেজরের কাহিনীটা শুনেছেন, তবে তেমন আগ্রহের সঙ্গে নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওটা তাঁর অবান্তরই মনে হয়েছে, আর ফলাফলের ওপরও নিশ্চয় ওটার কোনো প্রভাব পড়বে না। ভাবলেন, পশ্চিমী এই মানুষগুলোর ধ্যানধারণায় ভাববিলাসের বাহুল্য। ওরা ঠিক ব্যবসায়ী মনোভাবের নয়। বন্ধুবান্ধবদের খপ্পর থেকে ওদের বাঁচানোর প্রয়োজন আছে। মনে তো হচ্ছে মেজর গল্পটা শেষ করেছেন, আর যা বলেছেন তার মোট বক্তব্য দাঁড়ায় শূন্য।

পরীক্ষক বললেন, 'জিজ্ঞেস করতে পারি আপনার আরো কিছু বলার আছে কী, যার সঙ্গে এই উধাও জামানত-কাগজগুলোর সরাসরি সম্পর্ক?'

'উধাও জামানত কাগজ, স্যার!' মেজর হঠাৎ ঘুরে বসলেন চেয়ারে, তাঁর নীল চোখজোড়া ঝল্কে ওঠে পরীক্ষকের ওপর—'আপনি কী বলতে চান, স্যার?'

কোটের পকেট থেকে রবার-ব্যাণ্ডে-বাঁধা এক গোছা ভাঁজ-করা কাগজ টেনে বের করেন তিনি, নেটলউইকের হাতে সেগুলো গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

'ও জামানতগুলো ওর ভেতরেই পাবেন স্যার, প্রত্যেকটি স্টক, বণ্ড আর শেয়ারের কাগজ। আপনি যখন ক্যাশ গুনছিলেন, আমি তখন নথি থেকে ওগুলোই বের করছিলাম। নিজেই পরীক্ষা করে সব মিলিয়ে দেখুন।'

মেজর ওঁর আগে-আগে ভেতরের দপ্তরে ঢুকলেন ফের। পরীক্ষক ওঁর পেছু-পেছু—হতভম্ব, ধাঁধায় পড়া, বিছুটির জ্বালা নিয়ে অথৈ জলে। বুঝতে পারছেন

তিনি একটা কিছুর শিকার হয়েছিলেন যা ঠিক ধোঁকাবাজি নয়, তবে তাঁর অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে এক ক্রীড়নকের মতো, যাকে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, অথচ খেলার কিছুই ধারণা করতে পারেননি। হয়তো তাঁর বিভাগগত পদমর্যাদা নিয়েও অসম্মানজনক ভেলকি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেসব তো প্রমাণ করতে পারবেন না। ব্যাপারটা নিয়ে সরকারী রিপোর্ট দিলে তা হবে হাস্যকর। আর তাছাড়া কোনো কারণে তাঁর মনে হয়, আগে যেটুকু বুঝেছিলেন তার চেয়ে আর বেশি-কিছু কোনো দিনই জানতে পারবেন না।

নিরাবেগ কলের পুতুলের মতো নেট্‌লউইক জামানতগুলো পরীক্ষা করেন, নথির সঙ্গে মিলিয়ে সব ঠিকই আছে দেখতে পান, তার পর তাঁর কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ান।

মেজর কিংম্যানের দিকে ক্রুদ্ধ চশমার ঝলক দিয়ে প্রতিবাদের স্বরে বললেন, 'আমি এটা বলবই যে আপনার বিবৃতিগুলো—আপনার ওই বিপথে-চালানো বিবৃতি যা ব্যাখ্যা করার কোনো গরজই আপনি দেখাননি—ওগুলো কোনো কাজের কথা বলে মনে হয় না—না ব্যবসার, না তামাশার। এধরনের উদ্দেশ্য বা কাজের কোনো মানেই বুঝলাম না।'

মেজর টম্ তাঁর দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে আছেন, খানিকটা সদয়ও। বললেন, 'সন্, এদিককার ওক-বনে, প্রেইরিতে, ক্যানিয়নের ওপারে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা আপনি বুঝবেন না। তবে, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই একটা বাচাল বুড়োর গদ্যময় গল্প এত মন দিয়ে শুনেছেন! আমরা টেক্সাসের বুড়োরা, আমাদের অ্যাডভেঞ্চার, আমাদের পুরনো সাথীদের কথা বলতে ভালবাসি; আর বাড়ির লোকজন তো যখনই আমাদের মুখে শোনে "এক যে ছিল"—সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালায়। তাই কোনো বাইরের আগন্তুক একবার বাড়ির গণ্ডি ডিঙোলে তাকে আমরা গল্প না শুনিয়ে ছাড়ি না।'

মেজর হাসলেন, কিন্তু পরীক্ষক-মশাই শীতলভাবে শুধু মাথা নোয়ালেন আর ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সবাই দেখল উনি রাস্তা ধরে কোণাকুণি সিধে চলে যাচ্ছেন, তারপর ঢুকছেন স্টকমেন'স ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে।

মেজর টম এবার নিজের ডেস্কে বসেন, কোটের ভেতরের পকেট থেকে বের করেন রয়ের দেওয়া সেই চিঠিটা। একবার ওটা পড়েছিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে; আর এখন চোখের তারায় যেন ঝিকিমিকি নিয়ে পড়লেন আরেকবার। যে কথাগুলো পড়লেন তা এই:

"প্রিয় টম, শুনলাম আঙ্কল্ স্যামের একটি গ্রে-হাউণ্ড তোমাদের খুঁটিয়ে দেখছেন, তার মানে দু'ঘণ্টার মধ্যে হয়তো তাকে এখানেও দেখা যাবে। এখন, আমি চাই তুমি আমার জন্য কিছু কর। আমাদের ব্যাঙ্কে মাত্র ২২০০ ডলার

আছে, আর আইনমাফিক আমাদের কাছে অন্তত ২০,০০০ ডলার মজুত থাকার কথা। কাল একেবারে বিকেলের দিকে রস ও ফিশারকে ১৮,০০০ ডলার দিয়েছিলাম ওই গিবসন আবাদের গরুগুলো কিনে নেবার জন্য। এ লেনদেনে ওরা তিরিশ দিনের মধ্যেই ৪০,০০০ ডলার কামাচ্ছে, কিন্তু তাতে আমাদের নগদ মজুতে তো আর ব্যাঙ্ক পরীক্ষকের মন ভরবে না। এখন এই ধারের হুণ্ডিও তাঁকে দেখাতে পারি না, কারণ এগুলো স্রেফ হাতে লেখা কাগজ, যার সঙ্গে নাগালের মধ্যে কোনো জামানতপত্র নেই। কিন্তু তুমি তো ভাল করেই জান পিঙ্কু রস আর জিম ফিশার ঈশ্বরের সৃষ্ট সাদা জাতের মধ্যে দুটি সেরা মানুষ, তারা সবসময় খাঁটি কাজটিই করে। জিম ফিশারকে তোমার মনে আছে— সেই এল-পাসোতে যে তাসের জুয়াড়িটাকে গুলি করে মেরেছিল? স্যাম ব্র্যাড্‌শ'র ব্যাঙ্কে 'তার' করে ২০,০০০ ডলার চেয়ে পাঠিয়েছি, সেটা এসে পৌঁছোবে সরু গেজের লাইনে, দশটা-পঁয়ত্রিশে। কোনো ব্যাঙ্ক পরীক্ষককে ভেতরে ঢুকিয়ে ২,২০০ ডলার গুণতে দিয়ে তো আবার দরজা বন্ধ রাখা যায় না। টম, তুমি ওই পরীক্ষকটিকে ধরে রাখ। আটকে রাখ। যদি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেও হয় তবু তাই কর, ওঁর মাথার ওপর বসে থাক। 'সরু গেজ' স্টেশনে ঢোকার পর নজর রেখো আমাদের সামনের জানলার ওপর, একবার ভেতরে ক্যাশ এসে গেলেই আমরা সংকেত দেব জানলার শেডটা নামিয়ে দিয়ে। তার আগে কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দিও না। তোমার ওপর ভরসা করে রইলাম, টম।—

তোমার পুরনো দোস্ত

বব বাকলে,

প্রেসিঃ স্টকমেন'স্ ন্যাশনাল"

মেজর চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন। আর সেই সঙ্গে সামান্য তৃপ্তির হাসি ফোটে তাঁর মুখে।

খুশি গলায় গরগর্ করে ওঠেন—'হতচ্ছাড়া বুড়ো, বেপরোয়া গরুচোর! এই হিসেব মিটে গেল আমার সঙ্গে, কুড়ি বছর আগে শেরিফের দপ্তরে আমার সঙ্গে যা করেছিলে তারই খানিকটা।'

Friends in San Rosario. এইন্‌স্‌লিজ, ১৯০২ (অলিভিয়ার হেনরী ছদ্মনামে)

পুতুলনাচের রঙ্গ

চব্বিশ নম্বর সড়ক, আর অন্য একটা অস্বাভাবিক অন্ধকার আড়াআড়ি গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিসম্যান—কাছেই সড়কটাকে ডিঙিয়ে গেছে উঁচু রেলের রাস্তা। সময় তখন রাত দু'টো; দৃশ্যের আভাস—একটানা ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে বর্ষণ, ভোর না-হওয়া অবধি অবাঞ্ছিত অন্ধকার।

লম্বা-ওভারকোট পরা, মাথার টুপি সামনে নিচু করে, একটি লোক হাল্‌কা অথচ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল অন্ধকার গলিটা থেকে। হাতে কিছু-একটা জিনিস বয়ে আনছে। পুলিস তাকে ভদ্রভাবেই কিছু জিজ্ঞেস করে, তবে সচেতন কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িত আত্মস্থ ভঙ্গিতে। এ রকম বেয়াড়া একটা সময়, গলিটার দুর্নাম, পথচারীর তাড়াহুড়ো, আর সঙ্গের বোঝাটা—অনায়াসেই এগুলো মিলে সেই 'সন্দেহজনক পরিস্থিতি'র সৃষ্টি করে, যার জন্য অফিসারের তরফ থেকে 'আলোকপাতের' দাবি উঠতেই পারে।

'সন্দেহজনক' ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, টুপিটা পেছনে ঠেলে দেয়। বিজলি বাতির টিপটিপে আলোয় দেখা যায় একটি আবেগশূন্য মসৃণ মুখ, একটু বেশিরকম লম্বা নাক, আর স্থির কালো চোখের চাউনি। দস্তানাপরা হাতটা ওভারকোটের পাশ-পকেটে ঢুকিয়ে একখানা কার্ড বের করে সে পুলিসম্যানের হাতে দেয়। অস্পষ্ট আলোর সামনে কার্ডটা উঁচু করে ধরে অফিসার পড়ে নামটা: 'চার্লস স্পেন্সার জেমস্, এম.ডি.'। ঠিকানার রাস্তা ও নম্বর এমন একটি শাঁসালো মান্যগণ্য পল্লীর যে কৌতূহলও নিজে থেকেই দমিয়ে ফেলতে হয়। ডাক্তারের হাতের বস্তুটার দিকে পুলিসম্যান চোখ নামিয়ে তাকায়—চমৎকার কালো চামড়ার ওষুধের ব্যাগ, ছোট রুপোর তকমা আঁটা—ওতেই কার্ডের যথোচিত 'গ্যারান্টি' মিলে যাচ্ছে।

বপু-ভারাক্রান্ত বিনয়ের ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়ায় অফিসার: 'ঠিক আছে ডাক্তারসাহেব। খুব সাবধান থাকার হুকুম আছে, অনেক সিঁধকাটা রাহাজানির কেস্ চলছে তো আজকাল! বাইরে বেরুবার পক্ষে রাতগুলো ভাল নয়। ঠাণ্ডা অতটা না হলেও—স্যাঁতসেঁতে।'

ভদ্রতাসূচক মাথা হেলানো আর অফিসারের আবহাওয়ার ধারণায় দু'এক কথায় সায় দিয়ে ডাঃ জেম্‌স শুরু করলেন আগের মতোই দ্রুত পথ চলা। সে-রাতে রাস্তায় তিনবার টহলদার সেপাই তাঁর পেশাদার কার্ড দেখে মেনে নিয়েছে, আর চমৎকার ডাক্তারি ব্যাগটা দেখে বুঝে নিয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও উদ্দেশ্যের সততা। পরের দিন যদি এদের একজনও সেই কার্ড যাচিয়ে দেখার প্রয়োজন বুঝত,

তাহলে পেত নির্ঘাত প্রমাণ—সুন্দর দরজা-ফলকে ডাক্তারের নাম, তার স্ত্রীর সুবেশ উপস্থিতি নিজের চমৎকার সাজানো দপ্তরে (অবশ্য ডা. জেম্‌স দেরি করে ঘুম থেকে জাগলেও, আজ উঠেছেন একটু আগেই)। তা ছাড়া অবশ্য রয়েছে তাঁর সৎ নাগরিকত্ব, পরিবারের প্রতি আনুরক্তি সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য, তা ছাড়া দু'বছর ধরে তাদের মধ্যে বসবাস-কালে আপন পেশায় সাফল্য।

তাই, শান্তির এই উৎসাহী রক্ষাকর্তাদের একজনও যদি ওই নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক ডাক্তারি-ব্যাগটার ভেতর উঁকি দিতে পারত, তাহলে বোধ হয় খুব অবাকই হয়ে যেত। ওটা খুললে প্রথমেই যে-বস্তুটা চোখে পড়ত তা সর্বাধুনিক কালের আবিষ্কৃত চমৎকার এক-প্রস্থ যন্ত্রপাতি, যা 'বক্স ম্যান্‌রা' ব্যবহার করে। (কৌশলী সিন্দুক-ভাঙা সিঁধেলরা এখন নিজেদের 'বক্স ম্যান' নাম দিয়েছে।) যন্ত্রগুলো বিশেষভাবে নক্‌শা করে তৈরি—ছোট অথচ শক্তিশালী 'জিমি', মানে অদ্ভুতভাবে তৈরি-করা চাবি, সেরা পান-দেওয়া নীলচে তুরপুন, আর ছেঁদা করার কল। এরা অনায়াসে শীতল ইস্পাতের মধ্যেও পথ করে নিতে পারে, ইঁদুর যেমন অক্লেশে পনির কেটে খায়। এমন সব ক্ল্যাম্‌প, যেগুলো সিন্দুকের পালিশ করা দরজার ওপর ছিনে-জোঁকের মতো আট্‌কে বসে, আর দাঁতের ডাক্তার যেমন দাঁত তোলেন ওইভাবেই উপড়ে ফেলে গোটা নম্বর-সাজানো তালার 'নব্‌'। ডাক্তারি ব্যাগের একেবারে ভেতরের দিকে একটা ছোট থলির মধ্যে আছে চার-আউন্স নাইট্রোগ্লিসারিনের শিশি, এখন যার অর্ধেকটা খালি। যন্ত্রপাতিগুলোর তলায় রয়েছে দলা-পাকানো কতগুলো ব্যাঙ্কনোট, আর ক'মুঠো স্বর্ণমুদ্রা—টাকা'র পরিমাণ সব মিলিয়ে আটশো-তিরিশ ডলার।

অত্যন্ত সীমিত এক বন্ধু-চক্রের কাছে ডাক্তার জেম্‌স্‌ 'বাবু গ্রীক' নামে পরিচিত। এই রহস্যময় উপাধিটার অর্ধেক হল তাঁর শান্ত ভদ্রলোক-সুলভ আচরণের খাতিরে, আর বাকি অর্ধাংশের মানে, ভাই-বেরাদারদের অপভাষায়—নেতা, নক্‌শাকার, এমন-কেউ যে তার ক্ষমতা, আর ঠিকানা ও পেশার মর্যাদার দৌলতে যোগাড় করতে পারে খবরাখবর—ওদের সমস্ত ছক আর দুঃসাহসিক অভিযানগুলো এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতেই নেওয়া হয়ে থাকে।

এই বাছাই-করা চক্রের অন্য সদস্য স্কিট্‌সি মর্গান আর গাম্‌ ডেকার হল ওস্তাদ 'বক্স ম্যান', আর লিওপোল্ড প্রেৎস্‌ফেল্ডার,— শহরের এক রত্নব্যবসায়ী,— অন্য তিনজন কর্মীর সংগ্রহ-করা হীরা জহরত বা গহনাপত্র নিজের হেপাজতে রেখে তত্ত্বাবধান করে। এরা সবাই সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ— মৌনী হিমালয়ের মতো বাচাল, আর ধ্রুবতারার মতোই চপল!

সে-রাতের কাজটা 'কোম্পানির' হিসেবে তেমন জুৎসই হয়নি, এতে ওদের কষ্টের খানিকটা মাত্র উশুল হয়েছে বলা যায়। শনিবারের রাতে অত্যন্ত ধনী

পুরনো আমলের এক পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এঁদো দপ্তরে, তাদের মান্ধাতার আমলের দো-ঘরা পাশ-বল্টু-সিন্দুক থেকে শেষমেষ বেরুল মাত্র আড়াই হাজার ডলার। কিন্তু ওইটুকুই সব, যা পেয়েছে তাই সমান ভাগ করে নিল তিনজনের মধ্যে—ওইখানে দাঁড়িয়েই, তাদের নিয়মমতো। ওরা আশা করেছিল দশ-বারো হাজার। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মালিকদের একজন একটু বেশিরকম সেকেলে-পন্থী, অন্ধকার হতেই একটা শার্টের বাক্সের মধ্যে হাতের কাছে পাওয়া তহবিলের মোটা অংশই গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার জেমস চব্বিশ নম্বর সড়ক ধরে চলেছেন—রাস্তা আপাতদৃষ্টিতে একেবারে জনবর্জিত। এমন-কি থিয়েটার রঙ্গমঞ্চের লোক যারা এ অঞ্চলে বসবাস করে, তারাও অনেকক্ষণ আগে বিছানায় ঢুকে পড়েছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির জল জড়ো হয়েছিল রাস্তায়; পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে তারই জমা জলে বিজলি বাতির আলো ঠিকরে অসংখ্য তরল চুম্‌কি জাগে। খিট্‌খিটে বাতাস যেন ধারাসিক্ত কাঁপুনির মধ্যে খক্‌খক্ করে কাসে বাড়িগুলোর ফাঁকে, ফুসফুসের প্রদাহজ্বরের মতো।

ডাক্তারের পা যখন অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় ভদ্রস্থ একটা উঁচু ইটের বাড়ির কোণে এসে স্বস্তি পায়, তখনই ও বাড়ির সামনের দরজা হট্ করে খুলে গেল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে এক নিগ্রো রমণী খট্‌খট করে সিঁড়ি ধরে নেমে এল ফুটপাতে। অনেকগুলো কথা হড়বড় করে বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে, কথাগুলো ওর নিজেকে লক্ষ্য করে নয়—যেমনটা ওর জাতির দস্তুর। যখন একা থাকে অথবা অশুভের আশঙ্কা করে তখনই এটা করে ওরা। দেখলে মনে হয় সে দক্ষিণাঞ্চলের পুরনো ভৃত্যদেরই একজন—বাক্‌পটু, অন্তরঙ্গ, প্রভুভক্ত, অদম্য; চেহারাতেও তার প্রকাশ—স্থূল, পরিচ্ছন্ন, এপ্রন-পরা, মাথায় রুমাল-বাঁধা।

এই আকস্মিক প্রেতমূর্তি নিস্তব্ধ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নিচে দাঁড়াতেই উল্টোদিক থেকে এলেন ডাক্তার। মেয়েটার মগজ এবার সমস্ত শক্তি বদল করল—শব্দ থেকে দৃষ্টিতে। চিৎকার থামিয়ে ডেলা চোখ দুটো নিবদ্ধ করল ডাক্তারের হাত-ব্যাগে।

দৃষ্টির সঙ্গে এল ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা: 'লড্-কে ধন্যবাদ! আপুনি কি ডাক্তার সা'?

ডা. জেম্‌স একটু চুপ থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি একজন চিকিৎসক।'

'তাইলে ঈশ্বরের দোহাই আসুন, মিস্টার চ্যাণ্ডলারকে একটু দেখুন সা'। ফিট হয়েছে, না কিছু একটা হয়েছেন। পড়ে আছেন য্যানো মড়াটির মতন। মিজ্ এমি আমায় পাঠাচ্ছিলেন ডাক্তার ডাকতে। আপুনি যদি এসে না পড়তেন তাইলে লড্ জানেন কোথায় বুড়ি সিণ্ডি একজনকে খুঁজে পেত। যদি বুড়ি-মা এসবের একশো-ভাগের দশভাগও জানতেন, তাইলে কুরুক্ষেত্র হত সা' — পিস্তল ছোঁড়া, জমিতে মাপ করে দাঁড়িয়ে ডুয়েল। আর বেচারি মিস্ এমি—'

'পথ দেখাও,'—সিঁড়ির ওপর পা রেখে ডাক্তার জেম্‌স বললেন, 'যদি ডাক্তার হিসেবেই চাও। শ্রোতা হিসেবে আমি সময় দিতে পারছি না।'

নিগ্রো পরিচারিকা ওঁর আগে-আগে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পুরু কার্পেট পাতা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে থাকে। দু'বার তারা স্বল্প আলোকিত হল-দরজা পেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়টাতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে পথপ্রদর্শিকা একটা হলের ভেতরে ঢুকল, একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেটা খুলে ধরল।

'আমি ডাক্তার এনিছি, মিজ্ এমি!'

ডাক্তার জেম্‌স কামরায় ঢুকে একজন যুবতী মহিলার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নোয়ালেন। মহিলা একটা শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

একটা চেয়ারের ওপর ওষুধের ব্যাগটা রেখে ডাক্তার তাঁর ওভারকোট খুললেন। ব্যাগ আর চেয়ারের পিঠের ওপর ওটাকে ফেলে বেশ সপ্রতিভভাবেই এগিয়ে গেলেন বিছানার ধারে। বিছানায় একটা লোক শুয়ে আছে, বোধহয় যে ভাবে পড়েছিল সেভাবেই হাত-পা ছড়িয়ে। হালফ্যাশানের দামি পোশাক পরনে, শুধু জুতো জোড়া খোলা। এমন শিথিলভাবে শুয়ে আছে যেন মড়া।

ডাঃ জেম্‌সের দেহ থেকে এমন এক শান্ত শক্তি আর চাপা ক্ষমতার জ্যোতি ফুটে বেরোয় যা তার দুর্বল নিঃসঙ্গ মক্কেলদের কাছে 'মরুভূমিতে অমৃতধারা' সদৃশ। বিশেষ করে মহিলারা তো সব সময়ই আকৃষ্টা হয় তার রোগীকক্ষে আচরণের মধ্যে কিছু একটা বিশিষ্ট গুণে; কেতাদুরস্ত চিকিৎসকের প্রশ্রয়পূর্ণ কোমলতায় নয়, বরং বলা যায় আচরণের স্থৈর্য ও নিশ্চয়তাবোধে, নিয়তিকে জয় করার, সশ্রদ্ধ ভাবে মেনে নেবার ক্ষমতায়, আর সুরক্ষা ও গভীর নিষ্ঠায়। ওর অচঞ্চল উজ্জ্বল বাদামি চোখে একটা অন্তঃসন্ধানী চুম্বকশক্তি আছে। মসৃণ মুখের অনুভূতিশূন্য, প্রায় পুরোহিতসুলভ, প্রশান্তির মধ্যে একটা ছদ্ম কর্তৃত্বভাব, যার ফলে গোপন আস্থার রক্ষক বা সান্ত্বনাদাতার ভূমিকা তার পক্ষে বেমানান হয় না—অন্তত বাহ্যিক ভাবে। এমনকি মহিলারা কখনো কখনো তার প্রথম পেশাদারি ভিজিটের সময়ই বলে ফেলেন সিঁধেল চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের হীরাগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখেন।

বহু অভিজ্ঞতার সহজ অভ্যাসে ডা. জেমসের চোখ একবার দেখেই বুঝে যায় এ ঘরের সাজানো আসবাবের শৃঙ্খলা ও উৎকর্ষ। সাজসরঞ্জাম মূল্যবান, ঐশ্বর্যের পরিচয়। একই চাউনিতে মহিলার চেহারাও যাচাই করা হয়েছে। ছোটখাটো মানুষ, কুড়িও পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। মুখে হয়তো একটা হাসিখুশি সুশ্রীতার ছাপ ছিল, এখন তা ঢাকা পড়ে গেছে—হঠাৎ শোকের প্রাবল্যে ততটা নয় যতটা স্থায়ী কোনো বিষণ্ন বেদনায়। কপালে, একটা ভুরুর ওপরে আঘাতের কালশিটে দাগ, যেটা চিকিৎসকের চোখে গত ছ'ঘন্টার মধ্যেই ঘটেছে।

ডা. জেম্‌সের হাত লোকটার কবজির দিকে এগোয়। তাঁর প্রায়-সবাক চোখ মহিলার দিকে প্রশ্নদৃষ্টিতে তাকায়।

ভারাক্রান্ত দক্ষিণী কণ্ঠ আর অস্পষ্ট উচ্চারণে জবাব দেয় মহিলা—'আমি মিসেস্ চ্যাণ্ডলার। আপনি আসার মিনিট দশেক আগে আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃদ্‌রোগের আক্রমণ তাঁর আগেও হয়েছে—দুয়েকবার তো গুরুতর রকমের।'—স্বামীর পোশাকপরা অবস্থা আর এত-বেশি রাতেরও একটা ব্যাখ্যা দিতে হয় তাকে—'আজ অনেক রাত অবধি বাইরে ছিলেন—বোধহয় কোনো—রাত্রি ভোজের ব্যাপারে।'

ডা. জেম্‌স এবার মনোযোগ দিলেন রুগির দিকে। তাঁর "পেশা"-দুটোর যেটাতেই তিনি ব্যস্ত থাকুন, তাঁর অভ্যাস সমগ্র আগ্রহ দিয়ে 'কেস্' অথবা 'কাজ'টার মর্যাদা দেওয়া।

চিকিৎসক রুগির বাইরের-পোশাক খুলে ফেললেন, তারপর একটা পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে শার্টের সামনেটা কলার থেকে কোমর অবধি চিরে দিলেন। সব বাধা সরিয়ে দেবার পর রুগির হৃৎপিণ্ডের ওপর কান রেখে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে নিচুগলায় বললেন, 'মিট্রাল রিসারজিটেশান?' কথার শেষ দিকটা অনিশ্চিতির দ্যোতক। আবার বেশ খানিকক্ষণ কান রেখে শুনলেন, এবার বললেন, 'মিট্রাল ইনসাফিশ্যেন্সি।'— কণ্ঠস্বরে নিশ্চিত নিরূপণের জোর।

সাধারণত যে আশ্বাসের সুরে তিনি উদ্বেগের প্রশমন করেন সেভাবেই শুরু করলেন— 'ম্যাডাম, একটা সম্ভাবনা রয়েছে—' আস্তে মাথা ঘুরিয়ে মহিলার দিকে তাকাতে গিয়েই দেখলেন সে পড়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশে আর জ্ঞানশূন্য হয়ে—নিগ্রো বুড়ির বাহুর মধ্যে।

'আহা! বেচারী! বাছা আমার, সিণ্ডি মাসির নিজের মেয়েটাকে মেরে ফেলল? লর্ড্ নিজের কোপে ধ্বংস করুন যে ওকে কেড়ে নিচ্ছে, স্বগ্‌গের দূতের বুক ভেঙে দিচ্ছে। যেটুকুন রয়েছে—'

'ওর পা উঁচু করে ধর।'—নুয়ে পড়া দেহটাকে সামলাতে সাহায্য করেন ডাক্তার, 'ওর কামরা কোনটা? এখুনি ওকে বিছানায় শোয়াতে হবে।'

'এই যে ভেতরে সা' '—দরজার দিকে রুমালবাঁধা মাথাটা ঝোঁকায় সিণ্ডি, 'ওই হল মিজ্ এমির কামরা।'

ওরা তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। বিছানায় শুইয়ে দেয়। মেয়েটির নাড়ি ক্ষীণ, তবে নিয়মিত। মূর্ছা কেটে গেছে, চেতনা ফেরেনি—সোজাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

চিকিৎসক বললেন, 'একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, ঘুমই এ অবস্থায় ভাল ওষুধ। যখন জেগে উঠবে একটু গরমজল-চিনি মিশিয়ে ব্রাণ্ডি দিও—সঙ্গে ডিম, যদি খেতে পারে। কপালের ওই চোট্‌টা কীভাবে লেগেছিল?'

'একটু গুঁতো খেয়ে গিছিল সা'। বেচারি পড়ে গিয়ে—না, সা'— বুড়ির জাতিগত পরিবর্তনশীলতা হঠাৎই টেনে আনে প্রচণ্ড রাগ—'ওই শয়তানটার খাতিরে বুড়ি সিণ্ডি মিথ্যে বলতে যাবে না। ওই তো করেছে সা'। ভগমান ওর হাতটা শুকিয়ে কাঠ করুন— এই যা! সিণ্ডি যে মিষ্টি বেচারিকে কথা দিয়েছিল কাউকে বলবে না। মিজ এমি গুঁতো খেয়েছিল সা', মাথায়।'

ডা. জেম্‌স একটা স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে চমৎকার জ্বলন্ত বাতিটার শিখা কমিয়ে দিলেন। হুকুম দিলেন, 'তোমার গিন্নিমার সঙ্গে এখানেই থাক। আর চুপ করে থাকবে যাতে উনি ঘুমোন। জেগে উঠলে ব্র্যাণ্ডি চিনি দিও। আরো যদি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেখ, তবে আমায় খবর দিও। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এখানে আছে।'

'এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার সব এখানে তো রয়েছে,' বলতে শুরু করে নিগ্রোরমণী, কিন্তু ডাক্তার তাকে চুপ করিয়ে দেন—কদাচিৎ ব্যবহৃত এক ধরনের বাধ্য-করা কেন্দ্রীভূত গলার স্বরে, যা প্রয়োগ করে অনেক সময় আগে হিস্টিরিয়াও শান্ত করেছেন। অন্য কামরায় ফিরে যান, আলগোছে পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে। বিছানার মানুষটা নড়েনি, কিন্তু তার চোখ খোলা। মনে হয় ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে চাইছে। ডা. জেম্‌স শুনবার জন্য মাথা নোয়ালেন। ফিসফিস করে ঠোঁটদুটো বলছে—'টাকা! টাকাটা!'

ডাক্তার নিচু অথচ পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন করলেন—'আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন?'

মাথাটা সামান্য নড়ল।

'আমি একজন ডাক্তার, আপনার স্ত্রী ডেকেছেন। শুনলাম, আপনার নাম চ্যাণ্ডলার। আপনি বেশ অসুস্থ। আপনি উত্তেজিত হবেন না, নিজেকে হয়রানও করবেন না।'

রুগির চোখ দুটো যেন তাঁকে ইশারা করে ডাকল। ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে শুনলেন সেই একই অস্পষ্ট কথা।

'টাকাটা—কুড়ি হাজার ডলার।'

'কোথায় সে টাকা?—ব্যাঙ্কে?'

চোখে না-বোধক সংকেত। ফিস্‌ফিসানি যেন আরো অস্পষ্ট হয়— 'ওকে বলবেন—কুড়ি হাজার ডলার—তারই টাকা—' ঘরের এপাশ-ওপাশে ঘোরে চোখদুটো।

'আপনি কি এই টাকা কোথাও রেখেছেন?—ডাক্তারের কণ্ঠস্বর ডাকিনী-কণ্ঠের

মতো লোকটার ক্ষীয়মান মগজ থেকে গুপ্ততথ্যটা জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে, 'এই কামরার মধ্যেই আছে কি?'

ওঁর মনে হল আবছা চোখের পিটপিটানিতে একটা সায় দেবার চিহ্ন। ওঁর আঙুলের নিচে নাড়ির গতি রেশম সুতোর মতো সূক্ষ্ম আর স্তিমিত।

ডা. জেম্‌সের হৃদয় ও মস্তিষ্কে তখন তাঁর অন্য পেশাটার সহজ প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যেমন সব ব্যাপারেই করেন, চট্‌পট স্থির করে ফেললেন এ টাকার হদিশ খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে একটি মানুষের জীবন, হিসেব করে, নিশ্চিত ভাবেই শেষ করা যেতে পারে।

পকেট থেকে ফাঁকা প্রেসক্রিপশন পত্রের একটা ছোট প্যাড বের করে তাতে লিখলেন একটা ফরমূলা, সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র হিসেবে যা যন্ত্রণাভোগী রোগীর পক্ষে খুবই উপযুক্ত। ভেতরের কামরার দরজার কাছে গিয়ে বুড়ি ঝিকে ডাকলেন। তাকে প্রেস্‌ক্রিপশনটা দিয়ে বললেন কোনো ওষুধের দোকান থেকে এখুনি ওষুধটা নিয়ে আসতে।

নিজের মনে বিড়বিড় করতে-করতে সে যখন বেরিয়ে যায়, ডাক্তার পা ফেলে আসেন মহিলার বিছানার পাশে। সে এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে; নাড়ি এখন কিছুটা জোরালো; কপালটা ঠাণ্ডাই, শুধু ক্ষতস্থানটা একটু বড় হয়েছে আর তাতে কিছু জল জমেছে। ব্যাঘাত না ঘটলে আরো কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতে পারে। দরজার গায়েই চাবিটা আছে, আগের কামরায় ফেরবার সময় তালা মেরে দিলেন।

গ্লাসের মধ্যে এক ফোঁটা হাল্‌কা হলদে, পুরু তরল পদার্থ ঢাললেন। রুপোর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের কেস্‌টা বের করে ছুঁচখানা যথাস্থানে প্যাঁচ দিয়ে বসালেন। সিরিঞ্জের মাপ-করা কাঁচের নলে সাবধানে জলের মাত্রা স্থির করে, গ্লাসের সেই হলদে ফোঁটা মিশিয়ে দিলেন প্রায় আধগ্লাস জলে।

সে-রাতে দু'ঘণ্টা আগে ডা. জেম্‌স ওই সিরিঞ্জ দিয়েই নিছক অমিশ্রিত তরল পদার্থটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন একটা সিন্দুকের তালার গায়ে তুরপুন-করা ছিদ্রে। ভোঁতা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কলকব্জা, যা সিন্দুকের হুড়কোগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখন উনি চাইছেন সেই একই পদ্ধতিতে একটি মানুষের প্রাথমিক শরীরযন্ত্রগুলো বিগড়ে দিতে—হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করতে। প্রতিটি ধাক্কা হবে পরে যে-টাকা আসবে তার খাতিরেই।

একই পদ্ধতি, তবে অন্য চেহারায়। যেখানে আগের রূপ ছিল দানবীয়, আদিম স্থূল সক্রিয় শক্তি, এবার ভদ্রবেশী, তবে আগের মতোই মৃত্যুবর্ষী, হাতে শুধু কোমল মখমলের দস্তানা। কারণ এখন চিকিৎসক সাবধানে গ্লাসের যে তরল পদার্থটি সিরিঞ্জে পুরে নিয়েছেন তা হল 'গ্লোনোইন' দ্রাবক, চিকিৎসা

বিজ্ঞানে জানা সবচাইতে শক্তিশালী উত্তেজক—হৃৎপিণ্ডের পক্ষে। দু'আউন্সে সিন্দুকের নিরেট লোহার পাল্লা ভেদ করেছিল, আর এখন তার সামান্যতম পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ প্রয়োগ করে তিনি মানবজীবনের জটিল যন্ত্র স্তব্ধ করতে চলেছেন।

কিন্তু এক্ষুনি নয়। সেভাবে ভাবা হয়নি কাজটা। প্রথমে জীবনীশক্তি দ্রুত বাড়িয়ে দিতে হবে; জোরালো উদ্দীপনা জাগাতে হবে প্রতিটি ইন্দ্রিয় আর দেহযন্ত্রে। মারাত্মক উত্তেজনায় সাহসের সঙ্গে সাড়া দেবে হৃৎপিণ্ড; শিরার সমস্ত রক্ত তাড়াতাড়ি ফিরতে থাকবে তার উৎসস্থলে।

কিন্তু, ডা. জেম্‌স ভাল করেই জানেন, এই ধরনের হৃদ্‌রোগে অতিউত্তেজনা মানেই মৃত্যু—রাইফেলের গুলিতে মরার মতোই নিশ্চিত। সিঁধেল চোরের 'তেলের' শক্তি দূষিত-রক্ত জমা ধমনীতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে সে-ধমনী বাড়তি রক্তের জোয়ারে একেবারে বুজে যাবে, দেখতে-দেখতে হবে 'চলাচল নিষেধ'—জীবনের উৎসধাবা হবে রুদ্ধ।

অচেতন চ্যাণ্ডলারের বুক সামনে মেলে ধরলেন ডাক্তার। ধীরে দক্ষ হাতে তিনি চামড়ার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন সিরিঞ্জের ভেতরের বস্তু— হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরের পেশীগুলোর মধ্যে। দুটো পেশাতেই তিনি নিখুঁত সিদ্ধহস্ত। সাবধানে ছুঁচ শুকিয়ে ওটার মধ্যে আবার পুরে দিলেন সূক্ষ্ম একটি তার, ব্যবহার না করলে যেভাবে রাখতে হয়।

তিন মিনিটের মধ্যে চোখ খুলল চ্যাণ্ডলার, কথা বলল অস্পষ্ট অথচ শ্রুতিযোগ্য স্বরে। জানতে চাইল কে তাকে দেখছে। ডা. জেম্‌স আবার নিজের উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিলেন।

'আমার স্ত্রী কোথায়?' জিজ্ঞেস করে রুগি।

'তিনি ঘুমোচ্ছেন—অবসন্ন আর উদ্বিগ্ন হয়ে। আমি তাঁকে জাগাতে চাই না, যদি না—'

'নাঃ—না...দরকার নেই।' চ্যাণ্ডলার কথা বলে শব্দের মধ্যে ফাঁক দিয়ে দিয়ে, যেন কোনো দৈত্য খুব তাড়াহুড়ো করে ঠেলে বের করে দিচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত প্রশ্বাস—'সে হয়তো...আসবে না। আমার জন্য ওকে জাগাতে চেয়েছিলেন ....ধন্যবাদ।'

ডাক্তার জেম্‌স একটা চেয়ার টেনে নেন বিছানার পাশে। বাক্যালাপের অপচয় ঘটানো চলবে না এখন।

'কয়েক মিনিট আগে—' তিনি বলতে শুরু করেন তাঁর অন্য পেশার গম্ভীর অকপট সুরে — 'আপনি আমাকে কিছু বলতে চাইছিলেন, কোনো টাকার কথা। আমি আপনার গোপন কথা শুনতে চাই না, তবে আমার কর্তব্য আপনাকে জানানো যে উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা আপনার নিরাময়ের পক্ষে ক্ষতিকর। যদি এ

বিষয়ে আপনার কিছু বলার থাকে—নিজের মন হাল্কা করতে, কুড়ি হাজার ডলার, তাই তো বোধ হয় বলেছিলেন—তা হলে বরং বলেই ফেলুন এই বেলা।'

চ্যাণ্ডলার মাথা ঘোরাতে পারে না, শুধু বক্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকায়।

'বলেছিলাম কী... কোথায় এই.... টাকা আছে?'

'না।' জবাব দেন চিকিৎসক, 'শুধু আপনার খুব অস্পষ্ট কথা থেকে অনুমান করেছিলাম, ও টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা বোধ করছেন। যদি এই ঘরেই থেকে থাকে—'

ডা. জেম্‌স চুপ করেন। উনি কি রোগীর ব্যঙ্গাত্মক হাবভাবে কোনো বোধশক্তির ঝলক দেখতে পেলেন? কোনো সন্দেহের ইশারা? উনি কি একটু বেশি ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন? বেশি বলে ফেলেছেন? চ্যাণ্ডলারের পরের কথাগুলো অবশ্য ওঁকে আশ্বস্ত করে।

সে দম নিতে-নিতে বলে, 'কোথায়...থাকতে পারে...ওখানে—ওই সিন্দুকটা ছাড়া?'

চোখ দিয়ে দেখায় কামরার এক কোণের দিকে, সেখানে ডাক্তার এই প্রথম লক্ষ্য করেন একটা ছোট লোহার সিন্দুক। জানলার লম্বা পর্দার নিচে আধ-ঢাকা।

উঠে দাঁড়িয়ে অসুস্থ লোকটার কব্জি ধরেন। প্রচণ্ড ধক্‌ধক্ করে নাড়ি চলছে, মাঝে-মাঝে অলক্ষুণে বিরাম।

ডাক্তার জেম্‌স বললেন, 'হাতটা তুলুন।'

'আপনি তো জানেন... আমি নড়তে পারি না... ডাক্তার।'

চিকিৎসক তাড়াতাড়ি হলঘরের দরজার দিকে গেলেন, দরজাটা খুলে একটু কান পেতে শুনলেন। সব নিস্তব্ধ। আর ঘোরাঘুরি না করে সিন্দুকটার কাছে গিয়ে সেটা পরীক্ষা করলেন। সাবেক আমলের সরল নক্‌শার সিন্দুক। চোর চাকরবাকরের হাত থেকে একটু নিরাপত্তা দিলেও সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। ওঁর দক্ষতার কাছে নেহাতই খেলনা, যেন খড় আর পিস্‌বোর্ডের তৈরি। টাকাটা তাঁর হাতেই এসে গেছে বলা যায়। ক্ল্যাম্‌প্ দিয়ে নব্‌টা টেনে বের করে, হুড়কো নামিয়ে দু'মিনিটেই ডালা খুলতে পারেন। হয়তো অন্য কোনো উপায়ে এক-মিনিটেই পারেন।

মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে তিনি কান রাখলেন সাজানো নম্বরের প্লেটের ওপর আর ধীরে ধীরে নব্ ঘোরাতে থাকলেন। যা আন্দাজ করেছিলেন, শুধু 'একটা নম্বরের' ভিত্তিতে তালাটা বন্ধ করা। সঠিক ঘাটে ক্লিক্ করে আওয়াজের মৃদু ইশারাটা তীক্ষ্ণ কান পেতে শুনলেন, সেই সূত্র বুঝেই ঘোরালেন হাতল। এবার ডালাটা টেনে পুরোই খুলে ফেললেন।

সিন্দুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা!—খালি লোহার তাকে একটুকরো কাগজও পড়ে নেই।

ডা. জেম্‌স উঠে দাঁড়ান। ফের হেঁটে যান বিছানার কাছে। মুমূর্ষু মানুষটার কপালে মোটা একবিন্দু ঘাম, কিন্তু তার ঠোঁট আর চোখদুটোতে একটা উপহাসের করাল হাসি।

যাতনাভরা গলায় সে বলে, 'এমনটি আর.... আগে কখনো দেখিনি। ডাক্তারী আর... সিঁধ কাটার যুগল বন্ধন!... তা ডাক্তার.... নম্বর মিলিয়ে তালা খুলে ... কিছু পেলেন?'

এই পরিস্থিতির বাইরে, এমন কঠিন পরীক্ষার সামনে তাঁর মহত্ত্বের যাচাই হয়নি কোনোদিনও। নিজেরই বলির পশুর শয়তানি তামাশার ফাঁদে পড়ে তাঁর অবস্থা হয়েছে হাস্যকর এবং বিপজ্জনক, দুই-ই। তবু তিনি নিজের মর্যাদা আর উপস্থিত বুদ্ধি, দুটোই রক্ষা করেন। ঘড়ি বের করে দেখেন, সবুর করে থাকেন লোকটার মরা অবধি।

'আপনি বোধ হয়.... একটু বেশি... উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন.... টাকার ব্যাপারটায়। কিন্তু প্রিয় ডাক্তার... আপনার হাত থেকে... ওটার বিপদ তো কখনোই ছিল না। নিরাপদেই আছে।... একেবারে নিরাপদ।... সবই তো আছে.... রেসের দালালদের হাতে। কুড়ি হাজার —এমির টাকা! আমি বাজি রেখেছিলাম ঘোড়দৌড়ে। ...হারালাম শেষ—কপর্দকটাও। আমি বড় বাজে ছেলে ছিলাম, সিঁধেল ... মাপ করবেন, ডাক্তার .... কিন্তু খাঁটি সৎ খেলোয়াড়। কখনো বোধ হয়... আপনার মতো ..... এমন আঠারো ক্যারেটের শয়তানের সঙ্গে... দেখা হয়নি আমার, ডাক্তার—থুড়ি, সিঁধেলচোর ... এতদিনের মধ্যে! আপনার নীতিজ্ঞানে.... আপনাদের দলের সিঁধ-কাটাদের ... বাধা আছে কি .... শিকারকে, থুড়ি রুগিকে—এক গ্লাস জল খেতে দিতে?'

ডা. জেম্‌স ওর জন্য জল এনে দেন। গিলতেই পারছে না। শক্তিশালী ড্রাগের প্রতিক্রিয়া নিযমিত, ক্রমবর্ধমান তরঙ্গের মতো আসছে। কিন্তু তার মরণোন্মুখ কল্পনা বোধহয় আরেকবার কর্কশ বিদ্রূপ হানতে চায়।

'জুয়াড়ি... মাতাল... অপব্যয়ী... সবই তো ছিলাম, কিন্তু—ডাক্তার সিঁধেল!

ডাক্তার শুধু গরজ করে একটাই জবাব দেন অন্যজনের তিক্ত উপহাসের। চ্যাণ্ডলারের দ্রুত ঘনায়মান দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একটু ঝুঁকে, আঙুল দেখান ঘুমন্ত মহিলার দরজার দিকে। এমন কঠোর আর অর্থপূর্ণ সে-ভঙ্গি যে দেখবার জন্য শায়িত লোকটা অল্প মাথা তোলে তার বাকি জোরটুকু দিয়ে। কিছুই দেখতে পায় না সে; কিন্তু ডাক্তারের শীতল কথাগুলো তার কানে যায়—এই তার শোনা শেষ শব্দ: 'আমি এখনো অবধি কোনো নারীকে আঘাত করিনি।'

এইসব লোকের নীতিজ্ঞান যাচাই করে কোনো লাভ নেই। এমন কোনো নিয়ম-সূত্র নেই যা দিয়ে ওদের গণ্ডির মধ্যে ঢুকে হিসেবনিকেশ করা চলে। ওরা হল এমন জাতের জীব যাদের সম্পর্কে শুধু 'ও একাজ করবে' বা 'ওকাজ করবে' এইটুকুই বলা যেতে পারে। আমরা শুধু জানি ওদের অস্তিত্ব আছে; ওদের দেখতেও পাই, আর পরস্পরকে বলতে পারি ওদের নিছক কীর্তির কথা—যেমন বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পুতুল খেলার রঙ্গ দ্যাখে এবং বলে।

কিন্তু অহমিকার একটা মজার অনুশীলন হবে যদি এ দুজনাকে যাচাই করি—একজন খুনে ডাকাত, শিকারকে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যজন নিকৃষ্টতর অপরাধী, যদিও আইনভঙ্গকারী হিসেবে ততটা নয়। সে ঘৃণিত, মিথ্যাবাদী, নিজের স্ত্রীর ঘরেই; তাকে সে যন্ত্রণা দিয়েছে, ধ্বংস করেছে, আঘাত দিয়েছে। একজন বাঘ, অন্যজন নেকড়ে-কুত্তা। যাচাই করতে হয় ওদের একজনের নোংরামিতে অপরজনের বমি উঠে আসা! প্রত্যেকেই তার স্বীকৃত অপরাধের গ্লানির মধ্যে নিজের-নিজের নিষ্কলঙ্ক পতাকা তুলে ধরছে—মর্যাদার না হলেও, আচরণের।

ডাক্তার জেম্‌সের ওই একটি জবাব নিশ্চয়ই অন্যজনের লজ্জা ও মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত জায়গাটিতে আঘাত করেছিল, কারণ ওইটাই হল 'ছবির শেষ টান'। চ্যাণ্ডলারের মুখে ছড়িয়ে পড়ল গাঢ় রক্তিমাভা—কলঙ্কজনক মৃত্যু আভাস; শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ, তারপর একটি অস্পষ্ট কম্পনে তার মৃত্যু।

চ্যাণ্ডলারের শেষ নিশ্বাসের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এল নিগ্রো পরিচারিকা, ওষুধটা সঙ্গে নিয়ে। বন্ধ চোখের পাতার ওপর মৃদু চাপ দিয়ে ডাক্তার জানালেন শেষ হয়ে গেছে। শোক নয়, তবে মৃত্যুর বংশানুক্রমিক সান্নিধ্য বুড়িকে একটা বিরস, কান্না ওপচানো ফোঁপানির দিকে ঠেলে দেয়, আর সেই সঙ্গে শুরু হয় তার চিরাচরিত হাহুতাশ ও ভগবানের কাছে নালিশ।

'এবার তাহলে! এখন লর্ডের হাতেই সব। অপরাধীর বিচারক তিনিই, যারা দুর্দশায়, তাদেরও বাঁচান তিনি। উনিই আমাদের পালন করবেন এখন। সিণ্ডি তার শেষ কোয়ার্টারটা দিয়ে এই ওষুধের শিশি আনল। কিন্তু কোনো কাজেই লাগল না।'

ডাক্তার জেম্‌স জিজ্ঞেস করেন, 'তার মানে তা'হলে মিসেস চ্যাণ্ডলারের কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই?

'টাকাকড়ি সা'? আপুনি জানেন কেন মিজ্‌ এমি পড়ে গেলেন, আর অত দুব্বল? অনাহার সা'। এবাড়িতে তিন দিন ধরে শুকনো গুঁড়ো রুটি ছাড়া খাবার কিচ্ছু নেই। ওই দেবদূত আঙুলের আংটিগুলো বেচেন আর মাসের পর মাস সবুর করেন। এই সুন্দর বাড়ি সা', লাল কিয়াপেটি, চকচকে আলমারি সবই তো ভাড়া করা। আর ওই লোকটা ভাড়া নিয়ে বিচ্ছিরি কথা বলে। ওই

শয়তান—ক্ষমা করুন লর্ড, মরল আপনার হাতে সেটাই বিচার—সব কিছু নিয়ে সরে পড়েছিল।'

চিকিৎসকের নীরবতা ওকে আরো বলার প্রেরণা দেয়। সিণ্ডির বিশৃঙ্খল একক-উক্তি থেকে যে ইতিহাস তিনি উদ্ধার করলেন তা সেই পুরনো কথা—ভুল ধারণা, একগুঁয়েমি, বিপর্যয়, নিষ্ঠুরতা আর দম্ভ। সিণ্ডির বকবকানির অস্পষ্ট দৃশ্যপট থেকে বেরিয়ে আসে ছোট্ট পরিষ্কার সব ছবি—সুদূর দক্ষিণে একটা আদর্শ গৃহ; বিবাহের পরে-পরেই আপসোস; অসুখী একটি ঋতু অন্যায় আর গালিগালাজে ভরা, আর ইদানিং উত্তরাধিকার সূত্রে টাকা পেয়ে মুক্তির সম্ভাবনা; সে টাকা কেড়ে নিয়ে অপব্যয় করে নেকড়ে-কুত্তা, দু'মাস নিরুদ্দেশ থেকে; তারপর একদিন কেলেঙ্কারি মাতলামির মধ্যে তার পুনরাগমন। আবছা-মোছা-বিকৃত কাহিনীর মধ্যে শুধু ছত্রে-ছত্রে ফুটে ওঠে একটাই অনুগ্র অথচ দৃশ্যমান শ্বেতশুভ্র রেখা — বুড়ি নিগ্রো পরিচারিকার সরল, সব-সওয়া, অনবদ্য ভালবাসা; শেষ অবধি সব কিছুর ভেতর দিয়ে অবিচলভাবে মনিবানীর সঙ্গে লেগে থাকা।

অবশেষে সে যখন থামল, চিকিৎসক মুখ খুলে প্রশ্ন করলেন ঘরে হুইস্কি বা ওইজাতীয় কোনো পানীয় আছে কিনা। বুড়ি জানাল, আছে আধ বোতল ব্রাণ্ডি, পাশের আলমারিতে ছেড়ে গেছে নেকড়ে-কুত্তা।

ডা. জেম্‌স বললেন, 'বানাও তো একটা পানীয় যেমন তোমায় বলেছিলাম। মনিবানীকে জাগাও; তাকে ওটা খেয়ে নিতে বল। আর তাকে বল যা-যা ঘটেছে।'

প্রায় দশ মিনিট বাদে বুড়ি সিণ্ডির বাহুতে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস্ চ্যাণ্ডলার। মনে হল ঘুমিয়ে আর উত্তেজক পানীয়টা খেয়ে সে যেন একটু বল পেয়েছে শরীরে। একটা চাদর দিয়ে ডা. জেম্‌স ঢেকে দিয়েছিলেন বিছানার ওপরের দেহটা।

মহিলা একবার শুধু অর্ধ-ভীতভাবে শোকার্ত চোখ সেদিকে ফেরাল। আশ্রয়দাত্রীকে আরো নিবিড় করে চেপে ধরল সে। ওর চোখদুটো এখন শুকনো, জ্বলজ্বলে। শোকদুঃখ তাকে নিয়ে যতটা করবার তা করেছে, এখন অশ্রুজলের উৎসও শুকিয়ে গেছে, অনুভূতিই হয়ে গেছে অসাড়।

ডা. জেম্‌স টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওভারকোট চড়ানো হয়ে গেছে, হাতে টুপি আর ডাক্তারি ব্যাগ। শান্ত আবেগশূন্য মুখভাব—অভিজ্ঞতাই তাঁকে মানবিক দুঃখকষ্টের চিত্রে অভ্যস্ত করেছে। একমাত্র মৃদু-উদ্দীপ্ত বাদামি চোখ দুটোতেই সতর্ক পেশাদারি সহানুভূতির প্রকাশ।

সংক্ষিপ্ত নরম গলায় বললেন এখন এত রাত হয়ে গেছে, সাহায্য পাওয়া নিঃসন্দেহে মুশকিল হবে। তাই উনি নিজেই উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় শেষকৃত্যের জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

'আরেকটা কথা, শেষ করার আগে বলে যাই,'—ডাক্তার আঙুল দেখালেন সিন্দুকটার দিকে, এখনো ডালা খোলাই আছে—'আপনার স্বামী মিঃ চ্যাণ্ডলার শেষ দিকে বুঝতে পারছিলেন আর বাঁচবেন না; আমাকে সিন্দুকটা খুলতে বললেন, গোপন নম্বরটাও দিলেন যা সাজিয়ে ওটার তালা খোলে। যদি আপনার কখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, মনে রাখবেন নম্বরটা হল একচল্লিশ। বেশ কয়েকবার ডান দিকে ঘোরাবেন, তারপর বাঁদিকে একচল্লিশের ওপর থামবেন। তিনি কিছুতেই চাইছিলেন না আপনাকে আমি জাগাই, যদিও জানতেন তাঁর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে।

'সিন্দুকটার মধ্যে উনি কিছু টাকা রেখেছিলেন, তেমন বেশি নয়—তবে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আপনার পক্ষে যথেষ্ট। ইচ্ছাটা ছিল আপনি দেশের পুরনো বাড়িতে ফিরে যাবেন, আর ভবিষ্যতে যখন সময় সব কিছু সহজ করে তুলবে তখন আপনার বিরুদ্ধে তাঁর শত পাপ ক্ষমা করে দেবেন।'

টেবিলের দিকে আঙুল দেখালেন, সেখানে ব্যাঙ্কনোটগুলো গুছিয়ে সাজানো, ওপরের দু'টি থাকে সোনার মুদ্রা।

'টাকাটা ওখানেই—যেমন তিনি বলেছেন—আটশো তিরিশ ডলার। আমি আমার কার্ড রেখে যাচ্ছি, যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয় আমাকে।'

তাহলে—শেষ সময়ে সে ভেবেছিল ওর কথা—করুণাপরবশ হয়েই! কিন্তু এত দেরিতে! তা'হলেও এই মিথ্যাই জাগিয়ে তুলতে পারল মমতার শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু যা বিহনে ওর মনে হয়েছিল সবই ছাই হয়ে ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। 'রব্! রব্!' বলে কেঁদে উঠল সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে তার একনিষ্ঠ পরিচারিকার সদা-আশ্রয় বুকে সব দুঃখ ঢেলে দিল অব্যাহত কান্নায়। ভাবতেও ভাল লাগে—আগামী বছরগুলোতে একজন হত্যাকারীর মিথ্যাই ছোট তারার মতো প্রেমের সমাধির ওপর জ্বলজ্বল করে সান্ত্বনা দিচ্ছে তাকে, আর অর্জন করছে ক্ষমা,—যা ভিক্ষা করা হোক বা না হোক, এমনিতেই ভাল।

কালো বুকখানার ওপর শিশুর মতো মুখ গুঁজে তার কলস্বরে আবোলতাবোল সান্ত্বনার কথা শুনে নিশ্চুপ, শান্ত হয় সে, তারপর অবশেষে মাথা তোলে—কিন্তু ডাক্তার যে চলে গেছেন!

The Marionettes, ব্ল্যাক ক্যাট, ১৯০২

দূত-বার্তা

পার্কে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের পক্ষে কিন্তু এটা মৌসুমও নয়, সঠিক প্রহরও নয়; তাই ওই যুবতী মহিলা, যে পার্কের হাঁটাপথের ধারে বেঞ্চটায় বসে আছে, ধরে নেওয়া যায় সে নেহাৎ মুহূর্তের আবেগের বশেই খানিকক্ষণ জিরিয়ে আগামী বসন্তের পূর্বস্বাদটুকু উপভোগ করে নিচ্ছে।

সে বসেই রয়েছে—চিন্তামগ্ন, নিশ্চল। ওর যে চেহারায় একধরনের বিষণ্ণভাব ছুঁয়ে আছে তা নিশ্চয়ই একেবারে হালের সৃষ্টি, কারণ এতে ওর গালের কমনীয় তারুণ্যময় অবয়বরেখার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, ওর ঠোঁটের বঙ্কিম অথচ দৃঢ় রেখাও শিথিল হয়নি।

ওই পথ ধরেই পার্কের মধ্যে আসছিল একটি দীর্ঘকায় যুবক— লম্বা পা ফেলে, ওরই আসনের কাছাকাছি। তার পেছনে-পেছনে একটি বাচ্চা ছেলে—একটা সুটকেস্ বয়ে আনছে। যুবতী মহিলাকে দেখতে পাওয়া মাত্র যুবকের মুখখানা লাল হয়ে উঠল, তারপরেই আবার আগের মতো ফ্যাকাশে। এগিয়ে আসতে-আসতে সে যুবতীর মুখখানা লক্ষ্য করতে লাগল, তার নিজের মুখেও মিশ্রিত আশা আর উদ্বেগের চিহ্ন। মেয়েটির কয়েক গজের মধ্যেই সে এসে গেছে, অথচ মেয়েটি যে তার উপস্থিতি বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন তেমন কোনো ইঙ্গিতই সে পেল না।

প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যুবকটি হঠাৎ থামল, একটা বেঞ্চের একপাশ দখল করে বসল। বাচ্চা ছেলেটা সুটকেস নামিয়ে রেখে ওর দিকে চেয়ে রইল বিস্মিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। যুবক রুমাল বের করে কপাল মোছে। সুন্দর রুমাল, চমৎকার কপাল, যুবকও দেখতে সুদর্শন। ছেলেটাকে সে বলে:

'ওই বেঞ্চিতে বসা মহিলাকে আমার কতগুলো কথা তোমায় জানাতে হবে। ওকে বলবে আমি এখন স্টেশনে চলেছি, সানফ্রান্সিস্কো রওনা হব। সেখানে গিয়ে আলাস্কার মূজ-হরিণ শিকারের দলে যোগ দেব। একথা ওকে বলবে, যেহেতু ও হুকুম দিয়েছে আমি যেন ওর সঙ্গে কথা না বলি, ওকে চিঠিপত্রও না লিখি, তাই এই উপায় বেছে নিয়েছি ওর ন্যায়বোধের কাছে শেষ আবেদন জানাতে। যা ঘটে গেছে তারই খাতিরে। ওকে বলবে, এমন ব্যবহারের পাত্র যে নয়, তাকে কোনো কারণ না-দেখিয়ে, কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া—এ তো ওর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলেই আমার বিশ্বাস। ওকে বলবে, আমি তাই কিছুটা পরিমাণে ওর নিষেধ লঙ্ঘন করেছি, আমার আশা এখনো সে ন্যায়বিচারের দিকে ঝুঁকতে পারে। যাও, ওকে গিয়ে বল এই কথা।'

যুবক বালকটির হাতে একটা আধ-ডলারের মুদ্রা গুঁজে দেয়। সে এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকায়—নোংরা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল বিচক্ষণ চোখদুটো। তারপর ছুট দেয় সবেগে। বেঞ্চের মহিলার কাছে একটু খট্‌কার ভাব নিয়ে আসে, তবে সপ্রতিভ। মাথার পেছনে ঠেলে-বসানো পুরনো বাইসাইক্‌ল্‌-টুপির কিনারায় আঙুল ছোঁয়। মহিলা শীতল দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে, সংকোচ বা আস্কারা কিছুই নেই তাতে। ছেলেটি বলে, 'দিদি, অন্য বেঞ্চের ওই ভদ্রলোক আমায় বললেন আপনাকে নাচা-গানা দেখাতে। আপনি যদি লোকটাকে না চেনেন, আর উনি যদি ফক্কুড়ি করার চেষ্টা করেন, তো আমায় বলুন, তিন মিনিটের মধ্যে পুলিস ডেকে আনছি। আর যদি আপনাদের জানাশোনা থাকে, উনি সিধে মানুষ হন, তাহলে খেলা দেখিয়ে আপনাকে ওর একরাশ গরম কথা শুনিয়ে দি?'

যুবতীর মধ্যে খানিকটা আগ্রহ প্রকাশ পায়।

'নাচ গান!'—ইচ্ছে করেই মিঠে-গলায় যেন কথাটার ওপর একটা পাতলা আবরণ রাখে, ঢাকা দিতে চায় স্পর্শাতীত কোনো শ্লেষ,—'আন্দাজ করি এটা যাত্রাগানের কোনো নতুন কল্পনা! আমি ... অবশ্য যিনি তোমায় পাঠিয়েছেন তাঁকে জানতাম, তাই পুলিস ডাকার বোধ হয় কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার নাচ-গান শোনাও, তবে বেশি জোরে গাইবে না। মুক্তাঙ্গন যাত্রাগানের পক্ষে একটু বেশি আগেভাগে হচ্ছে, অযথা লোকের নজর টানা হবে।'

পুরো শরীরটাই ঝাঁকিয়ে ছোকরা বললে, 'ও-ও! আপনি তাহলে বুঝেছেন আমি কী বলছি। শুধু পাক খাওয়া নয়, বেশ হাওয়া! উনি বললেন ওঁর জামা-পাজামা ওই সুটকেসে, এখুনি পাড়ি দেবেন 'ফ্রিস্কো। তারপর ক্লনডাইকে যাবেন তুষার-পাখি শিকারে। বলেছেন, আপনি তাঁকে বারণ করে দিয়েছেন গোলাপি চিঠি পাঠাতে, বাগানের গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করতে। আর তাই তিনি এই উপায়টি নিয়েছেন আপনাকে জানাতে। বলছেন, ওঁকে নাকি আপনি মাঠ থেকে খেদিয়ে দিয়েছেন খেলো হয়ে গেছেন বলে, কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না আপনার সিদ্ধান্তে ঘা দিতে। বলছেন, ওকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন, অথচ বললেনও না, কেন।'

মহিলার চোখে সামান্য উচ্চকিত আগ্রহ কিন্তু কমেনি। হয়তো এটার কারণ, তুষার পাখি-শিকারীর মৌলিক চিন্তা অথবা ঔদ্ধত্য— গতানুগতিক চিঠিপত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে ওর সাফ-সাফ হুকুম এই ভাবে লঙ্ঘন করা! ছন্নছাড়া পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা সান্ত্বনাহীন একটা মূর্তির দিকে স্থির চোখে চেয়ে থেকে সে 'বার্তাপ্রেরক যন্ত্রে' কথা বললে:

'ভদ্রলোককে বল, তার কাছে আমার আদর্শের বর্ণনা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। তিনি জানেন সেগুলো কী ছিল এবং এখনো আছে। এক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা'হল, সবচাইতে ওপরে পুরো আনুগত্য আর সত্যতার স্থান। তাকে বল, আমি

আমার নিজের হৃদয় যতটা সম্ভব অনুধাবন করেছি, এর দুর্বলতা যেমন জানি, তেমন জানি এর চাহিদাগুলোও। তাই তার কৈফিয়ত শুনতে চাইনি—সেগুলো যাই হোক্ না কেন। আমি তাকে লোকের কথা শুনে, অথবা সন্দেহজনক সাক্ষ্যের ওপর দোষারোপ করিনি—তাই কোনো নালিশও জানাইনি। কিন্তু যা তিনি ভাল করেই জানেন তাই শুনবার জন্য যখন পেড়াপিড়ি করছেন, তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিও।...

'তাকে বোলো যে সেদিন সন্ধ্যায় আমি পেছনের দরজা দিয়ে কাঁচের হট্-হাউসে ঢুকেছিলাম আমার মা'র জন্য একটা গোলাপফুল তুলে আনতে। বোলো যে তাকে আর মিস্ অ্যাশবার্টনকে গোলাপি করবী-গাছটার নিচে দেখেছি। দৃশ্যপটটা চমৎকার, তবে ভঙ্গি আর অঙ্গসংস্থান একটু যেন বেশি সোচ্চার—এমন প্রকাশ্য যে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমি হট্-হাউস ছেড়ে তো এলামই, সেই সঙ্গে ছেড়ে এলাম গোলাপফুল আর আমার আদর্শও। তুমি তোমার অধিকারী মশায়কে এ গানগুলো শুনিয়ে দিও।'

'একটা কথা তো বুঝতে পারলাম না দিদি, অঙ্গ...অঙ্গসং—আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?'

'অঙ্গসংস্থান—বলতে পার দেহের ঘনিষ্ঠতা ... কিংবা যদি বল আদর্শ অবস্থান রক্ষার পক্ষে একটু বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা।'

সঙ্গে সঙ্গে বালকের পায়ের নিচে পাথরের নুড়ি পাক খেয়ে গেল। অন্য বেঞ্চিটার সামনে পৌঁছে গেছে সে। যুবকের চোখ যেন গিলে খাবার মতো জেরা করে ওকে। ছেলেটির চোখ এদিকে তর্জমাকারীর নৈর্ব্যক্তিক উৎসাহে জ্বলছে।

'দিদি বললেন তিনি ভাল করেই জানেন, কোনো বান্দা ভূতের গল্প শুনিয়ে ভাব করতে এলে মেয়েগুলো হাতের পাঁচ, তাই উনি কোনো কাঁদুনে গল্প শুনতে রাজি নন। বললেন আপনাকে হাতে নাতে ধরেছেন, হট্হাউসে একঝাড় ''ক্যালিকো'' বুকে ধরে আছেন আপনি। উনি ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন কিছু ফুল তুলতে, আর আপনি তখন অন্য মেয়েটাকে চেপে ধরে বসেছিলেন। উনি বলছেন দেখতে মন্দ দেখাচ্ছিল না—ঠিক আছে সই-সই,—তবে ওঁর গা বমি করছিল। বললেন আপনি বরং নিজের পথ দেখুন, কেটে পড়ুন ট্রেন ধরতে।'

যুবক একটা মৃদু শিস্ ছাড়ে, হঠাৎ কোনো চিন্তায় চোখ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। চট্ করে কোটের ভেতরের-পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো চিঠি বের করে। তার মধ্যে একটা চিঠি বেছে নিয়ে ছেলেটির হাতে দেয়, আর ভেস্ট্পকেট থেকে বের করে দেয় একখানা রুপোর ডলার।

বলে, 'ভদ্রমহিলাকে চিঠিটা দাও, আর তাকে বল পড়ে দেখতে। বল যে এটা পড়লেই সবকিছু বুঝতে পারবেন। বলবে যে, উনি তাঁর আদর্শের ধারণার

সঙ্গে একটু যদি বিশ্বাস মেলাতে পারতেন তাহলেই অনেক হৃদয়যাতনা এড়ানো যেত। বোলো, যে-আনুগত্যের এত মূল্য তার কাছে, তা কখনোই বিচলিত হয়নি। বলবে আমি তার জবাবের প্রতীক্ষায় রয়েছি।'

দূত এবার দাঁড়াল মহিলার সামনে।

'ভদ্রলোক বলছেন বিনা কারণে তাঁর ঘাড়ের ওপর দোষের বোঝা চাপানো হয়েছে। বললেন উনি তো কোনো বাজে লোক নন; দিদি আপনি চিঠিটা পড়ুন, বাজি রাখতে পারি উনি সাচ্চা খেলুড়ে, সত্যি।'

মহিলা একটু সন্দেহ নিয়ে চিঠির ভাঁজ খুলল। তারপর পড়ল:

'প্রিয় ডা. আর্নল্ড: গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার মেয়ে তার পুরনো হার্টের ব্যামোর শিকার হয়ে পড়ে হট্‌হাউসের মধ্যে, মিসেস্ ওয়াল্‌ড্রনের অভ্যর্থনার সময়ে। আপনি তাকে যে-রকম সহৃদয় ও সময়োচিত সাহায্য করেছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনি যদি কাছাকাছি থেকে তাকে পতন থেকে না বাঁচাতেন আর যথার্থ পরিচর্যা না করতেন তাহলে ওকে আমরা হয়তো হারাতাম। আমি খুশি হব যদি একবার দর্শন দিয়ে ওর চিকিৎসাব ভার হাতে নেন।

আপনার কৃতজ্ঞ

রবার্ট অ্যাশবার্টন।'

যুবতী মহিলা চিঠি ফের ভাঁজ করে ছেলেটির হাতে দেয়। দূত বলে, 'ভদ্রলোক যে একটা জবাব চান, কী বলব তাঁকে?' মহিলার চোখদুটো হঠাৎ একটা ঝলক্ দেয় ছেলেটার দিকে—উজ্জ্বল, সস্মিত, কান্নায় ভেজা। সুখের কাঁপা গলায় একটা হাসি তুলে বলে, 'অন্য বেঞ্চের লোকটাকে বল তার প্রিয় বান্ধবী তাকে চায়।'

His Courier. স্মার্ট সেট, ১৯০২

খামার মালিক শ্রীমতী বো-পিপ্

নরম-চামড়ার কালো দস্তানাজোড়া জানলার ধারিতে বসা গম্ভীর পার্শী বেড়ালটার ওপর ছুঁড়ে দিল অক্টেভিয়া, সাবধানেই। খুশি গলায় বলে উঠল—'এলেন-পিসি, আমি এখন ভিখিরি।'

'তুই এমন বাড়াবাড়ি করে কথা বলিস, অক্টেভিয়া বাছা,'— খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে নরম গলায় বললেন এলেন-পিসি—'একটু বনবন্ খাবার

শখ হয়েছে বলে খুচরো পয়সার দরকার থাকলে ওই লেখার-টেবিলের দেরাজে আমার পার্স্টা আছে, ওতেই পাবি।'

অক্টেভিয়া বোপ্রি মাথার টুপি খুলে, পিসির চেয়ারের কাছে পা-রাখার টুলে বসে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের হাঁটুজোড়া। একেলে শোকের পোশাক পরা ওর পাতলাসাতলা নমনীয় দেহ অনায়াসেই এই কষ্টসাধ্য আসনে কমনীয়ভাবে খাপ খেয়ে যায়। উজ্জ্বল তারুণ্যমাখা মুখখানা, আর সেইসঙ্গে একজোড়া দীপ্তিময় জীবন-অনুরক্ত চোখ, চেষ্টা করছে গুরুগম্ভীর হতে—এই সময়ে প্রয়োজন তো সেটারই।

'বলো না ভাল-পিসি, এটা বন্‌বনের সময়? এখন তো মুখের ওপর হাঁ করে-থাকা শোচনীয় কুদৃশ্য দারিদ্র্য। এখন রেডিমেড পোশাক, গাড়ির তেলের গন্ধমাখা দস্তানা আর হয়তো মাঝরাতের ডিনারগুলো গল্পের সেই ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো দরজাগোড়ায় সবুর করে থাকবে। এই তো ঘুরে এলাম আমার উকিলের কাছে থেকে... "প্লীজ্ মাডাম, কিছুই তো দেখছি না আমার কাছে"... অনেকটা "ফুল নেবেন দিদি? বোতামের ফুল চাই মশাই? পেন্সিল, স্যর, তিনটে পাঁচ সেন্টে, গরিব বিধবাকে সাহায্য করুন।".. ভাল ভাবে নকল করেছি না পিসি? নাকি আমাব আবৃত্তির পাঠ একেবারে বৃথাই গেছে রুটি-জোগাড়ের গুণ অর্জন করতে?'

মেঝের ওপর কাগজটা ছেড়ে দিয়ে এলেন-পিসি বলেন, 'বাছা' একটু গম্ভীর হ'। যা বলতে চাইছিস অনেক আগেই বলতে পারতিস। কর্নেল বোপ্রির সম্পত্তি—'

'কর্নেল বোপ্রির সম্পত্তি,'—বাগড়া দেয় অক্টেভিয়া, যথাযোগ্য নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলোর ওপর জোর দিয়ে—'স্প্যানিশ প্রাসাদের ছাঁদে—স্থাপত্য। কর্নেল বোপ্রির আয়ের উৎস—হাওয়া। কর্নেল বোপ্রির মজুত শেয়ার—জল। কর্ণেল বোপ্রির আয় —খতম। যা জানালাম এর মধ্যে আইনের কচকচিগুলো নেই যেগুলো আমি এক ঘন্টা ধরে শুনেছি! তবে হ্যাঁ, তরজমা করলে এই মানেই দাঁড়ায়।'

'অক্টেভিয়া!'—এবার এলেন-পিসি চাক্ষুষভাবেই আতঙ্কিত—'আমি তো এ বিশ্বাসই করতে পারছি না। লক্ষপতি বলেই তো ধারণা হয়েছিল—ডি'পেস্টাররা তো নিজেরাই ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।'

অক্টেভিয়া একবার তরঙ্গিত হাসি দিয়েই, যথাযথ ভাবে গম্ভীর হল।

'কথায় বলে, "মৃতের সম্বন্ধে কিছুই বোলো না,"—পিসি, এমনকি বাকিটুকুও নয় ("সদগুণ ছাড়া")। হাজার হলেও তিনি ছিলেন সোনার ইট! আমি আমার দিক থেকে যথাসাধ্য মূল্য দিয়েছি—এই তো আমায় দেখছ, দেখছ না?—একের পর এক,—চোখ, আঙুল, পায়ের ডগা, যৌবন, কুলীন পরিবার, সমাজে প্রশ্নাতীত

প্রতিষ্ঠা—যা যা চুক্তির চাহিদা, কোনো উদ্বৃট মজুত শেয়ার নেই এখানে।'—মেঝে থেকে খবরের কাগজটা তুলে নেয় অক্টেভিয়া— 'কিন্তু আমি আর্তনাদ করে নালিশ জানাচ্ছি না, যেমন কেউ খেলায় হেরে গিয়ে ভাগ্যকে গালাগাল দেয়।' শান্তভাবে কাগজের পাতা ওলটায় আর বলে চলে, 'স্টকের বাজার—কোনো কাজ নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান—অনেক হয়েছে। এই হল আমার পৃষ্ঠা: কর্মখালি। ভ্যান ড্রেসারদের অবশ্য কিছুর চাহিদা নেই। গৃহপরিচারিকা, রাঁধুনি, ক্যানভাসার, স্টেনোগ্রাফার—'

সামান্য কাঁপা গলায় এলেন-পিসি বলেন, 'বাছা, ওভাবে কথা বলিস্‌নি। তোর অশেষ দুর্ভাগ্যের অবস্থা হলেও আমার তো তিন হাজার—'

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ছিমছাম ছোটখাটো বুড়ির নরম গালে একটা সজোর চুমু বসিয়ে দেয় অক্টেভিয়া।

'আমার মিষ্টি পিসিমা, তোমার ওই তিন হাজারই তো লেগে যাবে উইলোগাছের পাতা থেকে বাড়িটা বাঁচাতে, আর পার্শী বেড়ালকে খাঁটি দুধ-সর খাওয়াতে। আমি জানি তুমি আমায় এখানে রাখতে চাইবে—কিন্তু আমার ইচ্ছে, বরং অভিশপ্ত স্বর্গদূতের মতো সমুদ্রের তলায় গুঁতো খাব তবু পরীর মতো ফটকের আড়ালে লুকিয়ে গান শুনব না। নিজের বাঁচার জন্য নিজেই উপার্জন করব। এ ছাড়া করারও কিছু নেই। আমি তো.... ওঃ হো হো! ভুলেই গিয়েছিলাম—একটা জিনিস ধ্বংস থেকে বেঁচে গেছে। ওটা হল একটা জানোয়ারের খোঁয়াড়—না, না, একটা র‍্যাঞ্চ—কোথায় যেন.... হ্যাঁ টেক্সাসে: মিঃ ব্যানিস্টার বলেছেন ওটা একটা সত্যিকারের সম্পত্তি। নিরঙ্কুশ ঝামেলাহীন বলে আমায় একটা জিনিস অন্তত দেখাতে পেরে কী খুশি যে হয়েছিলেন তিনি। ওই বাক্সে কাগজগুলোর মধ্যেই ওটার একটা বর্ণনা আছে, তাঁর দপ্তর থেকে জোর করে গছিয়ে দিয়েছিলেন আমার হাতে।'

অক্টেভিয়া ওর বাজার-থলিটা টেনে নেয়, ভেতর থেকে একখানা লম্বা লেপাফা বের করে টাইপ-করা দলিলে ঠাসা।

এলেন-পিসি নিশ্বাস ফেলেন—'টেক্সাসের খামার! শুনলে তো মনে হয় সম্পত্তিতে পাওনার চেয়ে দেনাই বেশি। ওসব জায়গাতেই তো রাজ্যের বিছে, কেন্নো, কাউবয় আর ফ্যানড্যাঙ্গো।'

ভীষণ বেগুনে রঙে টাইপ-করা একটা কাগজ থেকে অক্টেভিয়া পড়ে শোনায়—"র‍্যাঞ্চো ডি লাস্ সমব্রাস্: সান আন্টোনিও থেকে একশো-দশ মাইল দক্ষিণ-পুবে, আর তার সবচেয়ে কাছের আই.জি.এন রেলস্টেশন 'নোপাল' থেকে আটত্রিশ মাইল দূরে। র‍্যাঞ্চটা ৭৬৮০ একর কূপসেচিত জমির ওপর, রাজ্য স্বত্বে পেটেন্টপ্রাপ্ত, বাইশটি অংশে অর্থাৎ ১৪০৮০ একর কিছুটা বার্ষিক চালু-লীজের

ভিত্তিতে, কিছুটা রাজ্যের কুড়ি বছর-মেয়াদী আইনে খরিদ করা। বিভিন্ন ধরনের আট হাজার মেরিনো ভেড়া, প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাড়ি ও আনুষঙ্গিক র‍্যাঞ্চের জিনিসপাতি। র‍্যাঞ্চবাড়ি ইটের তৈরি, ছ'টি সাজানো আরামদায়ক কামরা আবহাওয়ার উপযুক্ত। সমস্ত এলাকাটিই শক্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

"বর্তমান র‍্যাঞ্চ ম্যানেজারকে সুদক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মনে হয়। দ্রুতহারে ব্যবসার মুনাফা বাড়াচ্ছেন, যা আগে অন্য লোকের তদারকে অবহেলা ও অনাচারের শিকার হয়েছিল।

"এই সম্পত্তি কর্নেল বোপ্রি একটি পশ্চিমী সেচন-সিণ্ডিকেটের সঙ্গে লেনদেনের মারফত অর্জন করেছিলেন, এর স্বত্ব নিখুঁতই মনে হয়। সতর্ক পরিচালনা আর জমির মূল্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে, এ-সম্পত্তি মালিকের পক্ষে অনায়াসে যথেষ্ট লাভের ভিত্তি হতে পারে।"

অক্টেভিয়ার পড়া শেষ হলে এলেন-পিসি একটা নাক-সিঁটকানো ধরনের আওয়াজ করলেন—যতটা অবশ্য তাঁর বংশমর্যাদায় মঞ্জুর করে।

শহুরে আপসহীন অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'ও জ্ঞাপন-পত্রে তো বিছের কথা নেই, ইণ্ডিয়ানদের কথাও নেই। তুমিও তো কোনোকালে ভেড়ার মাংস পছন্দ করতে না, অক্টেভিয়া। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী উপকার পেতে যাচ্ছ ওই—মরুভূমিতে।'

কিন্তু অক্টেভিয়া এখন স্বপ্নাচ্ছন্ন। ওর চোখ দুটো দৃষ্টিকেন্দ্র ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে যেন কিছুর সন্ধান করছে, তদ্‌গতচিত্তে। ঠোঁট দুটো ফাঁক, মুখে অভিযাত্রীর প্রজ্বলিত উন্মাদনার দীপ্তি, অ্যাডভেঞ্চার-সন্ধানীর অস্থির উৎসাহ। হঠাৎ উল্লাসে চেপে ধরল নিজের দু'হাত।

'পিসি, সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি ওই র‍্যাঞ্চে। ভেড়ার মাংস খেতে শিখব, এমনকি বিছে-কেন্নোদেরও ভাল গুণগুলো মেনে নেব, অবশ্য সম্মানজনক দূরত্ব রেখে। ঠিক আমি যেমনটি চাই। এ-আমার পুরনো জীবন যখন খতম হতে চলেছে তখন একটা নতুন জীবনের আগমন। অবাধ মুক্তি, পিসি, গণ্ডিতে আটক-পড়া নয়। মাইলের পর মাইল প্রেইরির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার কথা ভাবো, ভাবো হাওয়া কেমন তোমার চুলের গোড়া ধরে টানছে, মাটির কাছে এসে গেছ আর নতুন করে শিখছ নাম-না-জানা ঘাস আর ছোট বুনো ফুলের গল্পগুলো! যাকে বলে দীপ্ত মহিমা! আমি কি ওয়াটো-টুপি পরা মেষপালিকা হব, হাতের বাঁকা ছড়ি দিয়ে বদ নেকড়ের কবল থেকে ভেড়ার বাচ্চাদের বাঁচাতে? নাকি মার্কামারা পশ্চিমী র‍্যাঞ্চ-দুহিতা হব ছাঁটা-চুলওয়ালা, রবিবাসরীয় কাগজের ছবিগুলোর মতো? মনে হয় পরেরটাই ভাল। আর, যেসব বুনো-জানোয়ার মারব, তাদের সঙ্গে আমার ছবি উঠবে,

একাই মেরেছি জিনের মাথা থেকে ঝুঁকে, এই বর্ণনা দিয়ে। ওরা শিরোনামা দেবে: 'ধনীর দুলালী মেষপালিকা!' বলে, পুরনো ভ্যান-ড্রেসার বাড়ির ফটো ছাপবে, কোন্ চার্চে আমাদের বিয়ে হয়েছিল তাও ছাপবে। আমার ফোটো তো পাবে না, তাই শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নেবে। আমি রোমশ বুনো হব, নিজের 'উল' নিজেই বানিয়ে নেব।'

এলেন-পিসির প্রতিবাদের ভাষাগুলো প্রকাশের পথ পাচ্ছিল না, এখন তা একটি শব্দেই বেরিয়ে এল—'অক্টেভিয়া!'

'একটি কথা বলবে না পিসি,-আমি চললাম। রাতে আকাশটাকে দেখব তোমার বড় মাখন-ডিশের ঢাকনার মতো, পৃথিবীটাকে খাপে-খাপে ঢেকে বসেছে, আবার দোস্তি করব তারাগুলোর সঙ্গে, যাদের সাথে কচি বাচ্চা-বয়েস থেকে আর গল্পই করা হয়নি। আমি যেতে চাই। সব কিছুতেই অবসাদ এসে গেছে। আমার অর্থ নেই বলে আমি খুশি। ওই র‍্যাঞ্চটার খাতিরেই কর্নেল বোপ্রির কল্যাণ কামনা করতে পারি, সব ঝুটো-ফানুসের জন্য তাকে মাফ করতে পারি। সেখানে জীবন যদি কর্কশ আর নিঃসঙ্গ হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী! আমার....আমার যোগ্য শাস্তিই হবে—ওই ঘৃণিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তো হৃদয়ের দুয়ার বন্ধ রেখেছিলাম। আমি— না না, আমি চলে যেতেই চাই, আর ভুলতে চাই...ভুলতে!'

হঠাৎ অক্টেভিয়া হাঁটু মুড়ে বসে ওর রাঙা মুখখানা রাখল পিসিমার কোলে। কাঁপতে কাঁপতে আকুল হয়ে ফোঁপাতে লাগল।

এলেন-পিসি ওর ওপর ঝুঁকে প... তামাটে-বাদামি চুলগুলো সমান করে দিতে লাগলেন।

ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি জানতাম না রে, ও-কথা জানতাম না।... সে কে ছিল রে বাছা?'

মিসেস্ অক্টেভিয়া বোপ্রি (কুমারী-নাম ভ্যান ড্রেসার) যখন ট্রেন থেকে নোপাল স্টেশনে নামল, মুহূর্তের জন্য ওর আচরণ থেকে সেই সহজ নিশ্চিত ভাব যেন উধাও হল, ওর চলাফেরায় সর্বদাই যা দেখা যেত। শহরটা সবে গড়ে উঠেছে, তাই মনে হয় তাড়াহুড়ো করে ছাল-তোলা কাঠ আর আলগা-ঝোলানো ক্যামবিস দিয়ে সাজানো। স্টেশনের আশপাশে যে ধরনের লোকজনের জমায়েত, বিরক্তিকরভাবে প্রকট না হলেও কিছু নাগরিক পরিষ্কারই রূঢ় বিপদাশঙ্কায় অভ্যস্ত এবং তার জন্য প্রস্তুত।

অক্টেভিয়া ডাকঘরের বিপরীতে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে; চেষ্টা করছে সহজাত অনুমানের

জোরে সদম্ভে-হাঁটা অথবা পেছিয়ে-পড়া আগন্তুকদের সারির মধ্যে র‍্যাঞ্চো ডি লাস্-সম্ব্রাসের ম্যানেজারকে খুঁজে বের করতে। ওর সঙ্গে দেখা করতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন মিঃ ব্যানিস্টার। গম্ভীর দীর্ঘদেহী বয়স্ক লোকটি, নীল ফ্লানেল শার্ট আর সাদা টাই-পরা. মনে হল উনিই তিনি। কিন্তু না, উনি তো পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন. ওর স্থির নজর থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিয়ে—ওটাই দক্ষিণী রেওয়াজ। ওকে এভাবে অপেক্ষা করানো হচ্ছে বলে. অধৈর্য হয়ে ভাবল, ম্যানেজারের তো তাকে চিনতে মুশকিল হবার কথা নয়। অতি আধুনিক ছাইরঙা ভ্রমণ-পোশাক পরা যুবতী মহিলা নোপালে প্রচুর আছে নাকি!

তাই, ম্যানেজার গোছের চেহারার সম্ভাব্য সব লোককেই খতিয়ে দেখতে-দেখতে অক্টেভিয়া হঠাৎ চমকে উঠল— শ্বাস রোধ করে অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করল: টেডি ওয়েস্ট্লেক! প্ল্যাটফর্ম ধরে ট্রেনের দিকে ছুটে যাচ্ছে—চিভিয়ট উলের পোশাক, বুট আর চামড়া-ফিতে-ঘেরা টুপি-পরা ও কি টেডি ওয়েস্টলেক, নাকি তার রোদপোড়া বাদামি প্রেত? থিয়োডোর ওয়েস্ট্লেক, জুনিয়র. ছিল শৌখিন পোলো চ্যাম্পিয়ন (প্রায়), সবজান্তা প্রজাপতি, মাটির বোঝা বইত; অথচ যে-টেডিকে ও জানত,—একবছর আগে যাকে শেষ দেখেছিল, তার তুলনায় এ যেন আরো চওড়াবুক, আরো সচেতন, আরো দৃঢ়মনা কোনো টেডি।

প্রায একই সময় সে'ও দেখতে পেয়েছে অক্টেভিয়াকে। দিক বদল করে ওর দিকে এগিয়ে এল তার পুরনো সিধেসিধি ঢঙে। এবার একেবারে কাছে থেকে তার অদ্ভুত পরিবর্তনের মাত্রা দেখে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল অক্টেভিয়া; তরতাজা বাদামি-লাল চামড়ার রঙে যেন আরো প্রকট দেখাচ্ছে তার সোনালি গোঁফ আর ইস্পাত-ধূসর চোখদুটো। যেন আরো কত বড় হয়ে গেছে, কোনোভাবে বেশ দূরে সরে গেছে মনে হয়। কিন্তু যখন কথা বলল, তখন আবার সেই পুরনো বালকসুলভ টেডিই যেন ফিরে এসেছে! ওরা তো ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরের বন্ধু।

'আরে, 'টেভ যে!'—ধাঁধায় পড়া ভাবটাকে কিছুতেই সংহত করতে পারছিল না টেডি—'কেমন করে....কী....কখন...কোথায়?'

'ট্রেনে—প্রয়োজনের তাগিদে; দশ মিনিট আগে, বাড়িতেই ছিলাম। তোমার রং যে চটে গেছে টেডি। সেটা কেমন করে .. কী... কখন .... কোথায়?'

টেডি বলল, 'আমি তো এদিকেই কাজ করি।'—আড়চোখে স্টেশনের চারদিক দেখে—যেন কর্তব্যের সঙ্গে ভদ্রতাকে চেষ্টা করে জুড়তে হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করে, 'ট্রেনে কোনো বুড়িকে লক্ষ্য করেছিলে? ধূসর কোঁকড়া চুল, সঙ্গে পুড্‌ল্ কুকুর, বোঁচকা নিয়ে ডবল সীট দখল করে ছিলেন আর কন্ডাকটরের সঙ্গে ঝগড়া করছিলেন—দেখেছ?'

কিছু চিন্তা করে অক্টেভিয়া জবাব দেয়, 'মনে তো পড়ে না। কিন্তু তুমিও কোনোক্রমে একজন বিশাল চেহারার পাকা গোঁফওলা, নীল শার্ট পরা লোককে দেখনি? যার সঙ্গে ছ'ঘরা পিস্তল, চুলের ওপর লেগে রয়েছে মেরিনো ভেড়ার লোম, দেখেছ?'

'অনেক দেখেছি,'—চাপে পড়ে টেডির মানসিক দুর্যোগের লক্ষণ— 'তুমি কি এমন কোনো লোককে সত্যিই চেন?'

'না। বর্ণনাটা মন-গড়া। তুমি যে বুড়ি ভদ্রমহিলার বর্ণনা দিলে তার পেছনে কি ব্যক্তিগত স্বার্থ?'

'জীবনে তাকে দেখিনি। একেবারে কল্পনায় আঁকা ছবি। আমি যেখানে রুটি-রুজি কামাই সেই ছোট সম্পত্তির তিনিই মালিকানী—র‍্যাঞ্চো ডি-লাস্ সম্ব্রাস্। তাঁরই উকিলের পরামর্শে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি গাড়ি নিয়ে।'

ডাকঘরের দেয়ালে হেলান দেয় অক্টেভিয়া। এও কি সম্ভব? ও কি সত্যিই জানে না?

দুর্বলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—'ওই র‍্যাঞ্চের তুমিই কি ম্যানেজার?'

গর্বিত জবাব টেডির—'আমিই তো।'

ক্ষীণ স্বরে অক্টেভিয়া বলে, 'আমি মিসেস বোপ্রি, কিন্তু আমার চুল কোনোদিনই কোঁকড়া হবে না, আর কণ্ডাকটারের সঙ্গে অভদ্রতাও করিনি।'

মুহূর্তের জন্য সেই অদ্ভুত বয়স্ক ভাবটা এসে টেডিকে যেন ওর কাছ থেকে কয়েক শো মাইল দূরে ঠেলে দিল।

অপ্রতিভ ভাবে বলল, 'আশা করি আমাকে ক্ষমা করবে। এই ওক-বনে আছি আজ এক বছর হল, বুঝেছ। কিছুই জানতে পারিনি। তোমার গালটা এগিয়ে দাও প্লিজ, আমি গাড়ির মধ্যে তোমার বোঁচকাগুলো তুলে দিচ্ছি। জোসে ওটা নিয়ে পেছন-পেছন আসবে। আমরা বাক্‌বোর্ডে চড়ে আগে-আগে চলে যাব।'

একটা হাল্‌কা বাক্‌বোর্ড গাড়িতে টেডির পাশে চড়ে বসল অক্টেভিয়া, সামনে একজোড়া ছটফটে, মাখন-রং, স্পেনীয় পনি-ঘোড়া। বর্তমানের উল্লাস-মুহূর্তে সব দুশ্চিন্তা বরবাদ করে দেয় ও। ছোট শহরটা ছেড়ে সবেগে বেরিয়ে এসে ওরা দক্ষিণমুখো সমতল রাস্তা ধরে। একটু বাদে রাস্তাও ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায়, ওরা এবার চলতে থাকে যতদূর চোখ-যায় কোঁকড়া মেস্কিট ঘাসের আস্তরণ-ঢাকা পৃথিবীটাকে দলতে-দলতে। চাকায় আওয়াজ ওঠে না। অবিশ্রাম কদম চালে সামনে ছুটে চলে অক্লান্ত পনি দুটো। হাজার-হাজার একর জুড়ে নীল হলদে বুনো ফুলের গন্ধে সুরভিত কবোষ্ণ বাতাস ওদের কানে সোঁ সোঁ আওয়াজ তোলে সোল্লাসে। এ যেন বায়বীয় তুরীয়ানন্দ গতি, একটা চিরস্থায়িত্বের রোমাঞ্চ-অনুভূতি

জাগিয়ে তোলে মনে। অক্টেভিয়া বসে আছে চুপচাপ, একটা আদিম সংবেদনশীল অনুভূতিতে মশগুল। টেডি যেন কোনো অন্তরঙ্গ সমস্যার সঙ্গে লড়াইয়ে রত।

মেহনতের শেষে অবশেষে জানাল, 'আমি তোমাকে "মাদামা" বলে ডাকব। মেক্সিকানরা তোমাকে ও-নামেই ডাকবে—র‍্যাঞ্চের বেশিরভাগ মানুষই মেক্সিকান, বুঝলে! ওটাই আমার মনে হয় সঙ্গত।'

'বেশ তো মিঃ ওয়েস্টলেক',—কাটছাঁট সুরেই বললে অক্টেভিয়া।

এবার একটু যেন আতঙ্কের ভাব করে বললে টেডি, 'কিন্তু....ওটা যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, তাই না?'

'তোমাদের ওই জানোয়ারমার্কা-ভব্যতা দিয়ে আমায় বিব্রত কোরো না তো! আমি সবে বাঁচতে শুরু করেছি—কোনো কৃত্রিম কিছু আমায় মনে করিয়ে দিও না। আঃ, এই হাওয়াটাকে যদি বোতলে ভরা যেত! এই একটা জিনিসের জন্যই তো এখানে আসা সার্থক। ওই দ্যাখো! একটা হরিণ ছুটে যাচ্ছে!'

'ধেড়ে খরগোশ,'—মাথা না ফিরিয়েই জবাব দিল টেডি।

অক্টেভিয়া উৎসুক শিশুর মতো চোখ আর গোলাপি গাল নিয়ে কাঁপা গলায় প্রস্তাব করে, 'আমি কি একটু চালাতে পারি... মানে পারতাম হয়তো?'

'একটা শর্তে। আমি একটু চুরুট টানতে পারি?....মানে হয়তো টানা চলবে?'

'ও, যখন খুশি!'— অক্টেভিয়া মহা আনন্দে ঘোড়ার লাগাম ধরে— 'কেমন করে জানব কোন্ দিকে চালাতে হবে?'

'দক্ষিণ-পূর্ব থেকে আরেকটু কোণের দিকে মুখ করে গাড়ি রাখবে, ব্যস্ সব চালু। ওই কালো দাগটা দেখতে পাচ্ছ, উপসাগর-মেঘের একেবারে নিচে মাটির কিনারায়? ওটা হল এক ঝাড় ওক গাছ, আর ওটাই চিহ্ন। একপাশে ওটা, আর বাঁদিকের ওই টিলাটার মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে চালিয়ে যাও। টেক্সাসের প্রেইরিতে গাড়ি চালাবার সমস্ত নিয়ম আমি তোমায় বলে-বলে যাব; তুমি শুধু ঘোড়াদের পায়ের নিচে লাগাম ছেড়ো না, আর মাঝে মাঝেই ওদের গালাগাল ঝেড়ো।'

'গালাগাল ছাড়তে আমার বড় মজা, টেড। আঃ, লোকে যে কেন ইয়ট্ কেনে, প্রাসাদগাড়িতে বেড়ায়, যখন একটা বাক্‌বোর্ড, একজোড়া টাট্টু আর এরকম বসন্তের সকাল সব কামনাই মেটাতে পারে?'

টেডি বৃথাই একটার পর একটা ম্যাচকাঠি ঠুকছিল তক্তার গায়ে; প্রতিবাদ করে বললে, 'দেখ, তোমায় বলছি এই হাওয়ার দূত দুটোকে টাট্টু বলবে না,— ভোর থেকে আঁধার অবধি এরা একশো মাইল ছুটতে পারে।' অবশেষে একটা ম্যাচ কাঠি জ্বালিয়ে দু'হাতের ফোকর থেকে চুরুটটা ধরাতে পেরেছে সে।

'ফাঁকা জায়গা!'—গভীর আবেগে বলে অক্টেভিয়া, 'ওতেই তো এমন ফল

ফলে। এখন আমি জানি কী চেয়েছি আমি—বাগিচা, অবাধ পান্না, ফাঁকা জায়গা!'

অনুভূতিহীনভাবে টেডি বলে, 'ধূমপানের মুক্ত স্থান, আমি এই বারান্দায় বসে ধূমপান করতে। হাওয়ার জোরেই ধোঁয়া ভেতরে ঢোকে আর বের হয়—পরিশ্রমের লাঘব।'

পুরনো দিনের মিতালির মধ্যে ওরা এমন স্বাভাবিকভাবে ডুবে যায় যে নিঃশব্দ ধাপে-ধাপে তারা অবহিত হতে থাকে নতুন সম্পর্কের আজব চেহারায়।

টেডি অবাক হয়ে বলে, 'মাদামা, বন্ধুবান্ধব দলবল ছেড়ে এখানে চলে আসার ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকল কেমন করে? নিউইয়র্ক না গিয়ে ভেড়ার চরাণিক্ষেত্রে খুটখটিয়ে চলে আসা কি উঁচু শ্রেণীর মধ্যে এখন নতুন কোনো খুশখেয়াল?'

অক্টেভিয়া মিষ্টি গলায় বলে, 'আমি যে কপর্দকশূন্য হয়ে গেছি টেডি!'—ওর মনোযোগ এখন একটা স্পেনীয় 'কাঁচ' গাছ, আর একটা ওক গাছের ফাঁক দিয়ে নিরাপদে কাটিয়ে যাওয়ার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। —'এই বাগানটা ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই নেই আমার—এমনকি যাবার মতো অন্য কোনো বাড়িও নেই।'

উদ্বেগ আর অবিশ্বাস নিয়ে টেডি বলে, 'আরে কী বলছ! তেমন কিছু নিশ্চয়ই নয়?'

অক্টেভিয়া একটু লজ্জিত অস্পষ্ট উচ্চারণে বলে, 'তিন মাস আগে আমার স্বামী যখন মারা গেলেন, ভাবলাম পার্থিব সম্পদের কিছুটা তো আমার থাকলই। তাঁর উকিল ষাট মিনিটের এক সচিত্র বক্তৃতা দিয়ে সে তত্ত্ব একেবারেই উড়িয়ে দিলেন। তাই ভেড়ার মাঠকেই ধরলাম শেষ আশ্রয় হিসেবে। তুমিও কি মানহাটানের চটকদার যুবকদের কাউকে জানো যে শৌখিন খুশখেয়ালের তাগিদে পোলো খেলা আর ক্লাব-জানলা ছেড়ে ভেড়ার খামারের ম্যানেজার হয়েছে?'

'আমার ক্ষেত্রে এটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়', সঙ্গে সঙ্গেই টেডি সাড়া দিল, 'আমাকে কাজকর্ম করতেই হত। নিউ ইয়র্কে বসে আমার খোরাক জুটত না, তাই কিছুদিন বুড়ো স্যাণ্ডফোর্ডের সঙ্গে খাতির জমালাম। সে সিণ্ডিকেটের একজন, যারা কর্নেল বোপ্রি কিনে নেবার আগে এই র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল, একটা পদও এখানে ছিল শূন্য। আমাকে তো প্রথমেই ম্যানেজার করেনি। পনিতে ঘুরতাম আর ব্যবসাটা খুঁটিয়ে বুঝে নিতাম, যতদিন না সব ব্যাপারগুলো মাথায় ঢোকে। দেখলাম কোথায় লোকসান হচ্ছে, কী করলে তার প্রতিকার হয়। এর পর স্ট্যানফোর্ড আমায় সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। আমি মাসে একশো ডলার পাই, আর সেটা খেটেই উপার্জন করি।'

অক্টেভিয়া মুচকি হাসে, 'বেচারা টেডি!'

'বলার দরকার ছিল না। আমি একাজ পছন্দই করি। মাইনের অর্ধেকটা বাঁচাই, আর খরচার ব্যাপারে কড়া। এর কাছে পোলো কিছুই নয়।'

'ওখানে কি আরেকজনের রুটি-চা-জ্যাম মিলবে, যে সভ্যতা থেকে নির্বাসিত ?'

ম্যানেজার বলে, 'গত বছরের ব্যবসার দেনাটা সবে মিটে গেল বসন্ত মরশুমের উল-ছাঁটাই করে। এতদিন পর্যন্ত অপচয় আর অমনোযোগই ছিল এখানকার রেওয়াজ। সামনের শরৎকালে যে পশম উঠবে তাতে সব খরচ-খরচার পরও কিছুটা লাভ থাকবে। সামনের বছরে আসবে "জ্যাম"।'

বিকেল চারটে নাগাদ যখন পনি দুটো একটা নরমসরম আগাছা-ঢাকা টিলাকে চক্কর মেরে মাখনরঙা জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের মতো ছোঁ মেরে নেমে এল 'ডি-লাস সমব্রাস' র‍্যাঞ্চের মধ্যে, অক্টেভিয়া যেন অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। চমৎকার তরতাজা ওকগাছের মহিমময় কুঞ্জ সেখানে কৃতজ্ঞ শীতল ছায়ার আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে—যার থেকে এই র‍্যাঞ্চের নাম 'ডি-লাস সমব্রাস'—মানে 'ছায়া-ঘেরা'। গাছের তলা দিয়ে নিচু লম্বা একসার লাল ইটের একতলা বাড়ি। বাড়ির ছ'টা কামরা দু'দিকে ভাগ করে ঠিক মাঝখানে বরাবর একটা চওড়া খিলান-ঢাকা গলিপথ, দু'পাশে সুন্দর ফুল-ফোটা ক্যাকটাস আর ঝোলানো লাল মাটির টব। একটা নিচু আর সরু 'গ্যালারি'-বারান্দা বাড়ির চারদিকটা ঘিরে। লতানে আঙুর গাছ উঠেছে সেখানে। আর বাড়ির গায়েই জমির খানিকটা জায়গা নিয়ে ঘাস আর গুল্মের চাষ।

পেছন দিকে একটা লম্বা সরু জলাশয় রোদে ঝিকমিক করছে। একটু দূরেই মেক্সিকান মুনিষদের চালাঘরগুলো, খোঁয়াড়, পশমঘর আর উল-ছাঁটাইয়ের ঘেরা-বেড়া। ডানদিকে নিচু পাহাড়, দূরে ওকের কালো-কালো ছোপ ছড়িয়ে আছে সেখানে। আর বাঁদিকে নিঃসীম সবুজ প্রেইরির তৃণভূমি নীল আকাশের গায়ে মিশেছে।

অক্টেভিয়া রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বলে, 'এই তো ঘর, টেডি, এই হল আসল ভিটে!'

'ভেড়ার খামার বাড়ি হিসেবে মন্দ নয়', স্বীকার করে টেডি, (ওর এই জাঁক ক্ষমা করা যায়!)—'সময় অসময়ে এই নিয়েই নাড়া-চাড়া করি।'

একটি মেক্সিকান ছোকরা ঝপ্ করে বেরিয়ে এল ঘাসের আড়াল থেকে, মাখন-রঙা পনিদুটোকে সামলে ধরল। মালিকানী ও ম্যানেজার ঢুকল বাড়ির ভেতরে।

শান্তশিষ্ট ছিমছাম একটি বয়স্কা মহিলা গ্যালারিতে ওদের সঙ্গে মিলবার জন্য বেরিয়ে আসে। টেডি বলে, 'এই হল মিসেস্ ম্যাকিনটায়ার, —মিসেস্ ম্যাক্,—ইনি এখানকার কর্ত্রী। এত দূর গাড়ি চালিয়ে এসে নিশ্চয়ই উনি বেকনের বড় টুকরো আর শিমের ডিশ চাইবেন।'

গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস্ ম্যাকিনটায়ার জলাশয় আর ওকগাছগুলোর মতোই এ-জায়গার অপরিহার্য অঙ্গ—সে একটু নরম রাগের সঙ্গেই র‍্যাঞ্চের খাদ্য সরবরাহের অপবাদটা গ্রহণ করেছে, প্রায় জবাব দিতেই যাচ্ছিল এমন সময় অক্টেভিয়া বলে উঠল—

'ওঃ, মিসেস্ ম্যাকিনটায়ার, টেডির হয়ে আর মাফ চাইতে হবে না। হ্যাঁ, আমি ওকে টেডি বলেই ডাকি। যাদের ও গম্ভীর ভাব দেখিয়ে ঠকাতে পারেনি, তারা সবাই ডাকে। বহু যুগ আগে, বুঝলে, আমরা একসঙ্গে মিলে কাগজের পুতুল বানাতাম, খড়ের পুতুল নিয়ে খেলতাম। ও যা বলে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'না', বলল টেডি, 'ও যা বলে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, আবার তেমনি, ও-ও সে-কাজ দ্বিতীয়বার করে না।'

আনত চোখের পাতার তলা থেকে অক্টেভিয়া ওর সেই অলক্ষ্য আড়-নয়নের দৃষ্টিটা হানল তার দিকে—টেডি এ চাউনিটার বর্ণনা দিত 'উত্তল প্রহার' বলে (ঘুঁষির আপার-কাট্)। কিন্তু টেডির অকপট, রোদ-জলে তামাটে মুখখানায় এমন কিছু ছিল না যা থেকে সন্দেহ জাগে সে কটাক্ষ করে কিছুর উল্লেখ করছে—সে রকম কিছুই না। অক্টেভিয়া ভাবে, নিঃসন্দেহেই সে ভুলে গেছে।

অক্টেভিয়াকে তার কামরা দেখাতে নিয়ে গিয়ে মিসেস্ ম্যাকিনটায়ার বললে, 'মিঃ ওয়েস্টলেক তামাশা করতে ভালবাসেন, কিন্তু.. এখানকার লোকজন তো বেশ মন দিয়েই শোনে যখন উনি আন্তরিকভাবে কিছু বলেন। উনি না থাকলে এ জায়গাটার যে কী হাল হত!'

র‍্যাঞ্চের কর্ত্রী দখল করবেন বলে বাড়ির পুবদিকে দু'খানা কামরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে ঢুকতেই কামরাগুলোর ফাঁকা প্রায়-আসবাবহীন চেহারা ওর মনে সামান্য আতঙ্ক জাগায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল হয় এখানকার জল-হাওয়া তো প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয়—তাই মানিয়ে চলার সুপরিকল্পিত চেষ্টা দেখে অবশেষে তারিফই করে। বড় জানলাগুলো থেকে এর মধ্যেই কাচের শার্সি সরানো হয়ে গেছে, চওড়া খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বয়ে আসছে উপসাগরীয় বাতাস, সাদা পর্দাগুলোকে দুলিয়ে। খালি মেঝেতে প্রচুর সুতির কার্পেট পাতা, চেয়ারগুলো স্বাগতোন্মুখ, গভীর, স্বপ্নমাখা উইলো কাঠে তৈরি। দেয়ালে হালকা ঝলমলে জলপাইরঙ কাগজমোড়া। ওর বসার ঘরের পুরো একদিকটা বইয়ে ঠাসা—মসৃণ, বিনা-রঙকরা পাইনকাঠের শেলফে। ও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেল সেদিকে; খুব বাছাই-করা বইয়ের লাইব্রেরি বটে। উপন্যাস, ভ্রমণের বইগুলোর নাম চট করে দেখে নিল, এখনো যেন মুদ্রণের আর্দ্রতা থেকে পোক্ত হয়ে ওঠেনি।

তক্ষুণি মনে পড়ল ও তো রয়েছে মাটন, বিছে আর অভাবের মরুদেশে,—এখানে এমন বিলাসিতা কি বেখাপ্পা নয়? স্বতঃলব্ধ মেয়েলি সন্দেহে ও একের-পর এক বইয়ের প্রথম পাতাগুলো খোলে। প্রত্যেকটাতে সাবলীল অক্ষরে লেখা আছে থিওডোর ওয়েস্টলেক, জুনিয়রের নাম।

লম্বা সফরে অবসন্ন অক্টেভিয়া সে-রাতে একটু আগেই শুতে যায়। ঠাণ্ডা

সাদা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম হয় আরামে কিন্তু ঘুম অনেকক্ষণ ধরে যেন ঠাট-ঠমক দেখায় ওকে। এমন সব ক্ষীণ আওয়াজ পায় যার অভিনবত্ব ওর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখে,—কয়োটগুলোর খেঁকানি, বাতাসের অন্তহীন মৃদু ঐকতান, দূরে জলাশয়ের ধারে ব্যাঙের ডাক, মেক্সিকান বস্তিতে কোনো কনসার্টিনার শোকসংগীত। ওর হৃদয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী অনুভূতি জাগে—কৃতজ্ঞতা আর অবাধ্যতা, শান্তি আর চাঞ্চল্য, নিঃসঙ্গতা আর সযত্ন দেখাশোনার ধারণা, সুখ অথচ একটা পুরনো নাছোড়বান্দা ব্যথা। অবশেষে, অন্য মেয়েরা যা করে থাকে, ও-ও তাই করে—অসময়ের কান্নার শুভদায়ী স্রোতে খুঁজে পায় স্বস্তি, আর গভীর ঘুমের আগে, হার মেনে ওর নিজের কাছে বিড়বিড় করে বলা শেষ কথাগুলোই সান্ত্বনা দেয়—"ও সবই ভুলে গেছে।"

ডি লাস্ সমব্রাসের ম্যানেজার কিছু আনাড়ি-পণ্ডিত নয়। 'জোর করে খাটাবার' মানুষ। সাধারণত ভোরের মুখেই ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে, বাড়ির বাদবাকি সবাই উঠে পড়ার আগে, ভেড়ার পাল আর ছাউনি চক্কর দিয়ে আসে। আসলে সেটা প্রধান তদারককারীর কাজ,—সে একজন হোমরা চোমরা চেহারার বুড়ো মেক্সিকান, রাজার মতো চালচলন। কিন্তু টেডির নিজের চোখের নজরের ওপরেই বেশি ভরসা মনে হয়। কর্মব্যস্ত মরশুমগুলো ছাড়া অন্য সময়ে সে প্রায় নিয়মিতই আটটার প্রাতরাশে র‍্যাঞ্চে ফিরে আসে, অক্টেভিয়ার আর মিসেস্ ম্যাকিনটায়ারের সঙ্গে মধ্যের হলকামরায় একটা ছোট টেবিল ঘিরে বসে। সঙ্গে নিয়ে আসে প্রেইরির স্বাস্থ্য ও স্বাদগন্ধে ভরা ফুর্তির হাওয়া আর উদ্দীপনা।

অক্টেভিয়া আসার কয়েক দিন পরে সে ওকে দিয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ার স্কার্ট বের করিয়ে নিল, ওক-চারা ঝোপের ভেতর দিয়ে চলার উপযুক্ত করে সেটাকে কাটছাঁট করে খাটোও করতে হল।

মনে একটু আশঙ্কা নিয়ে ও পোশাকটা পরল, সেই সঙ্গে তারই নির্দেশমতো একজোড়া চামড়ার পা-ঢাকা লেগিং। একটা নাচিয়ে-পনির পিঠে চড়ে টেডির সঙ্গে চলল সম্পত্তি পরিদর্শনে। ওকে সে সবকিছুই দেখাল—ভেড়ীর পাল, মাটনের উপযুক্ত ভেড়া, চবানির বাচ্চা ভেড়া, ডোবানোর চৌবাচ্চা, পশম কাটার খোঁয়াড়, ঘেঁট ঘেরা মাঠে কুৎসিত মেরিনো ভেড়া, গ্রীষ্মের জলসংকট ঠেকাতে তৈরি জলের ট্যাঙ্কগুলো।—সব কিছুতেই পরিচয় পাওয়া যায় টেডির পরিচালনার মধ্যে একটা কিশোরসুলভ উৎসাহ, যা কখনোই স্তিমিত হয় না।

কিন্তু যাকে ও অত ভাল করে জানত, সে-টেডি গেল কোথায়? তার এ-তরফটা তো সেইরকমই আছে, আর এ-তরফটাই অক্টেভিয়ার পছন্দ; কিন্তু এখন তো তার মাত্র-এইটুকুই দেখতে পাচ্ছে ও। কোথায় তার সেই ভাবপ্রবণতা—সেই পুরনো বিচিত্র মেজাজে উন্মাদ প্রেমাভিনয়, কল্পনাবিলাসী অসার-আদর্শের

অনুগত-প্রেম, বুক-ভাঙা বিষাদ, কখনো অযৌক্তিক প্রীতি, কখনো উদ্ধত মর্যাদাবোধ? তার প্রকৃতিটা ছিল সংবেদনশীল, মেজাজটা প্রায় শিল্পীর মেজাজ। অক্টেভিয়া জানত ফ্যাশন, খুশখেয়াল আর খেলার অনুরাগী হলেও সে কিছু সূক্ষ্মতর রুচিরও অনুশীলন করত। কিছু লেখালিখি করেছে, রং তুলি নিয়ে কষ্টিনষ্টি করেছে, শিল্পকলার কোনো-কোনো বিভাগে অধ্যয়নও করেছে। একসময়ে টেডির উচ্চাশা আর চিন্তার রাজ্যে অক্টেভিয়ার ছিল অবাধ প্রবেশ। আর এখন—সিদ্ধান্তটা ও না টেনে পারে না— টেডি ওর দিকে সমস্ত বেড়াই তুলেছে নিজেকে ঘিরে, শুধু একটা দিক ছাড়া—সেদিকে দেখা যায় ডি লাস্-সমব্রাস ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে, ফুর্তিবাজ দোস্ত, যে সব ভুলে গিয়েছে, সব ক্ষমা করেছে। বেশ একটু বিচিত্র ভাবেই ওর মনে আসে মিঃ ব্যানিস্টারের কথাগুলো: "সমস্ত এলাকাটাই শক্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।"

অক্টেভিয়া মনে মনে বলে, 'টেডিও বোধহয় বেড়া দিয়ে ঘেরা।'

নিজেকে ঘিরে টেডির দুর্গ তৈরির কারণটা অনুধাবন করতে বেশি কষ্ট হয় না ওর। হ্যামারস্মিথ'দের বল-নাচের আসরে ব্যাপারটার সূত্রপাত। ঘটেছিল ঠিক সেই সময় যখন ও সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে কর্নেল বোপ্রি আর তাঁর লক্ষ-ডলারই সে গ্রহণ করবে,—অবশ্য ওর সৌন্দর্য আর সমাজের অন্তরঙ্গ চক্রে প্রবেশের মূল্য হিসেবে সেটার কতটুকুই বা দাম! টেডি তার সমগ্র আবেগ আর উদ্দীপনা দেখিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতে ও সোজাই তার চোখের দিকে তাকায়, আর শীতল চূড়ান্ত কণ্ঠে বলে, 'এ ধরনের বোকা বাজে কথা আর কখনো যেন তোমার মুখ থেকে শুনতে না হয়।' টেডি বলে, 'ভাল কথা, আর কখনো শুনবে না'।—ঠোঁটের দুপাশে তখন তার অন্য এক ধরনের অভিব্যক্তি। আর এখন টেডি শক্ত কাঁটাতারের জালের আড়ালে।

এই প্রথম ঘোড়ায় চড়ে পরিদর্শনের সময়ই টেডির হঠাৎ প্রেরণা জাগল 'হাঁস-মায়ের' গল্পের নায়িকার নামটি নিয়ে: বো-পিপ। আর সঙ্গে সঙ্গে অক্টেভিয়ার নামকরণ করে ফেলল সে। দু'জনের নামেও খানিকটা মিল আর কাজও অনেকটা একই, তাই মতলবটা তার ভালই লেগে যায়, অনবরত ব্যবহার করেও ইাঁফিয়ে ওঠে না। ব্যাঙ্কের মেক্সিকান মুনিষরাও নামটা মেনে নেয়, শুধু তাই নয়, শেষ অক্ষরের সঙ্গে জুড়ে দেয় আরেকটু লেজ, ওদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য, গম্ভীরভাবে ওর উল্লেখ করে 'লা মাদামা বো-পিপি' বলে। ক্রমেই সেটা ছড়িয়ে পড়ে, আর 'র‍্যাঞ্চো সমব্রাসের' নাম হয়ে দাঁড়ায় 'মাদাম বো-পিপের র‍্যাঞ্চ।'

এর পর এল মে থেকে সেপ্টেম্বরের দীর্ঘ গরম কাল। এখন র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম কম। অক্টেভিয়ার দিনগুলো কাটে পদ্মমধুপায়ীর স্বপ্নের মতো। বইপত্র, হ্যামক, কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে চিঠিপত্র লেখা, পুরনো রঙের বাক্স আর ইজেলে

নতুন করে আসক্তি—এই নিয়ে কেটে যায় দিবাভাগের ভ্যাপসাগরম সময়টা। সন্ধ্যাটাই নিশ্চিত উপভোগের। বিশেষ করে ভাল লাগে টেডির সঙ্গে পরমানন্দে ঘোড়ায় চড়া। হাওয়া ঝেঁটানো দূরান্ত পথে চাঁদের আলো, তারই মধ্যে খবরদারি করে চক্কর-খাওয়া রাত্রি-বাজ, আর চমকে ওঠে পেঁচা। অনেক সময় মেক্সিকানরা তাদের ঝোপড়ি থেকে আসে গীটার নিয়ে, হৃদয়নিংড়োনো অতি অদ্ভুত সব গান গায়। গ্যালারির ফুরফুরে হাওয়ায় বসে লম্বা-লম্বা মজার গল্প-গাছা, আর টেডি-মিসেস ম্যাকের মধ্যে অনন্ত ঝগড়া চলে। যেটাতে মিসেস্ ম্যাকের ঘাটতি, হালকা তামাশা, সেটা সে পুষিয়ে নেয় তার স্বচ্ছ বিচক্ষণতার প্রাচুর্য দিয়ে।

রাতগুলো আসে একটার পর এক, আর সার বেঁধে চলে যায় হপ্তা মাস ধরে— কী নরম, ঘুম-ঘুম, গন্ধস্নিগ্ধ সব রাত, যতই কাঁটাতার থাক্ সে-বেড়া ডিঙিয়ে স্টেফান চলে যেত ক্লো'র কাছে, কিউপিড নিজে বেরুতেন শিকারে, ল্যাসো হাতে, এই প্রেমভরা প্রান্তরে—অথচ টেডি তার প্রাচীর উঁচু করেই রেখেছে।

জুলাইয়ের এক রাতে মাদাম বো-পিপ্ আর তার ম্যানেজার বসে রয়েছে পুব দিকের গ্যালারিতে। পূর্বাভাস-স্নানের আদ্যশ্রাদ্ধ করে আগামী শরৎকালের পশম-ছেদনে চব্বিশ সেন্ট হিসেবে দাম পাওয়ার সম্ভাবনা বুঝিয়ে অবশেষে টেড ক্ষান্তি দিল—ডুবে গেল হাভানা চুরুটের অনুভূতিনাশী ধোঁয়ার মধ্যে। মেয়েমানুষের মতো অযোগ্য বিচারকই একমাত্র লক্ষ্য করতে ভুলে যাবে—যা অনেক আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল—টেডির মাইনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশই তো উড়ে যায় ওই আমদানি-করা রাজসিক নেশার ধোঁয়ায়!

অক্টেভিয়া হঠাৎ বেশ তীক্ষ্ণস্বরেই বলল, 'টেডি, তুমি এখানে একটা সামান্য র‍্যাঞ্চে কাজ করে কত টাকা উপার্জন কর?'

আত্মপ্রসাদের সুরে টেডি বলল, 'একশো প্রতিমাসে, সেই সঙ্গে অন্য সুবিধা'।

'আমার খুবই ইচ্ছা তোমাকে বরখাস্ত করি।'

দাঁত বের করে হাসল টেডি, 'সেটি পারবে না।'

'কেন পারব না?'—তর্কের গরমে মুখর হল অক্টেভিয়া।

'চুক্তি রয়েছে যে। সমস্ত রকম চালু মেয়াদের চুক্তি মেনে বিক্রির শর্ত। আমার চুক্তি ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটা অবধি। সে তারিখে মাঝরাতে উঠে তুমি আমায় 'ছুটি' করতে পার। তার আগে যদি চেষ্টা কর, তাহলে আমার ক্ষমতা থাকবে মামলা রুজু করার।'

মামলাবাজির সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে এই রকম ভাব দেখায় অক্টেভিয়া।

টেডি খুশি গলায় বলে, 'কিন্তু এমনিতেই আমি ইস্তফা দেবার কথা ভাবছি।'

অক্টেভিয়ার দোলনা-চেয়ার দুলুনি থামায়। এদেশে নানারকম বিছে আছে নির্ঘাত; আর ইণ্ডিয়ান; তা ছাড়া বিশাল নিঃসঙ্গ জনশূন্য ফাঁকা পতিত জমি; সবই

শক্ত কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে। কিন্তু ভ্যান ড্রেসার বংশের যেমন গর্ব আছে, তেমনি আছে ভ্যান ড্রেসার হৃদয়ও। ওকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে, টেডি সব ভুলে গেছে, কি ভোলেনি।

আবার চমৎকারভাবে সবিনয় আগ্রহ দেখিয়ে ও বল্লে, 'তা বেশ, টেডি। এখানে তো বড় একা লাগে; তোমারও ইচ্ছে পুরনো জীবনে ফিরে যাওয়া—পোলো, গলদা চিংড়ি, থিয়েটার, বল-নাচ।'

'কোনোদিনও বল-নাচ নিয়ে অত মাথা ঘামাইনি'—সৎ ভাব দেখিয়ে টেডি বলে।

'তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ টেডি। তোমার স্মরণশক্তি কমে যাচ্ছে। কোনো নাচে তুমি গরহাজির ছিলে এমন কথা কেউ বলবে না—যদি না অবশ্য একই রাতে তোমার অন্য কোনো নাচে যাবার থাকত। আর খুব বিশ্রী রুচির পরিচয় দিতে তুমি একই পার্টনারের সঙ্গে দশবার করে নেচে। দাঁড়াও মনে করি, কী যেন ওই ফর্ব্‌স্‌ পরিবারের মেয়েটার নাম—দেয়াল-সাঁটা চোখ যার—ম্যাবেল, তাই না?'

'না, এ্যাডেল। ম্যাবেল তো সেই শুকনো কনুইওলা মেয়েটা। এ্যাডেলের চোখে কোনো দেয়াল নয়, ছিল দিল। আমরা দু'জনে সনেটের কথা বলতাম, কবি ভার্লেইনের কথা। ঠিক ওই সময়টাতে আমি পাইরিয়ান ঝরনা থেকে একটা সেচের পাইপলাইন টানার চেষ্টা করছিলাম—'

অক্টেভিয়া হাল না ছেড়ে বলে, 'তুমি ওর সঙ্গে নাচের আঙিনায় ছিলে, হ্যামারস্মিথদের ওখানে—পাঁচ পাঁচবার।'

শূন্য নয়নে প্রশ্ন করে টেডি, 'হ্যামারস্মিথদের কী?'

'নাচ—বলনাচ,'—তীব্রকণ্ঠে বলে অক্টেভিয়া, 'কী নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা?'

একটু চিন্তা করে টেডি বলে, 'চোখ বোধহয়, আর কনুই।'

ডেক-চেয়ারে ক্যানভাসে টেডের আরাম করে হেলান-দেওয়া মাথাটা থেকে এক মুঠো রোদপোড়া সোনালি চুল উপড়ে নেবার অদম্য ইচ্ছাটা কোনো রকমে চাপা দিয়েছিল অক্টেভিয়া। এবার ওর মিষ্টি সামাজিক কচ্‌কচালির সুরে বললে, 'হ্যামারস্মিথদের ছিল বড় বেশি টাকার দাপট। খনি থেকে, তাই না? কত টনে কত আয়। ও বাড়িতে এক গ্লাস সিধে জল পাবার উপায় ছিল না। নাচগুলোতে আয়োজন হত বড় বাড়াবাড়ি রকম।'

'তা হত,' বললে টেডি।

'কী ভিড় হত সেখানে'—অক্টেভিয়া সচেতন যে সে জীবনের প্রথম নাচের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো বালিকার মতো অনর্গল বকে চলেছে, তবু থামল না—'ব্যালকনিগুলোও নিচের ঘরের মতোই গরম। আমি তো—সে নাচে একটা

জিনিস খুইয়েই বসলাম।'—শেষ কথাগুলো হিসেব করে বলা, যাতে মাইলকে মাইল তার থেকে কাঁটাগুলো সরানো যায়।

'আমিও তো তাই,'—নিচু গলায় স্বীকার করল টেডি।

শত্রুকে নিজের পরিখার দিকে এগোতে দেখে পেছিয়ে যায় অক্টেভিয়া—'একজোড়া দস্তানা।'

কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করে টেডি তার বন্দুক রোখে—'আমি খোয়ালাম জাত। সন্ধ্যার অর্ধেক সময় হ্যামারস্মিথদের একজন খনি কর্মীর সঙ্গে ওঠ-বস করলাম। লোকটা পকেটে হাত গুঁজে কথা বলে, কেউকেটার মতো,— বিভাজন সরঞ্জাম, প্রবাহ চালনা, জলস্তর, স্লুইস্ বাক্স (জলকপাট) নিয়ে।'

'এক জোড়া মুক্তো-ধূসর দস্তানা'— আক্ষেপের নিঃশ্বাস ফেলে অক্টেভিয়া।

টেডি তারিফের সুরে বলতেই থাকে,—'ম্যাক্আর্ডল্ লোকটা কিন্তু তুখোড়। সুখশান্তি, পদোন্নতি ঘোষণা করে; পাহাড় দলে আলুর দলার মতো; হাওয়াতেই টানেল তৈরি করে। একটা বাজে কথা বলেনি সারা জীবনে। মাদামা! লীজ-নবীকরণের আবেদনপত্রে এখনো সই করোনি? একত্রিশ তারিখের মধ্যে কিন্তু জমি-দপ্তরে ফাইল করতে হবে।'

টেডি অলসভাবে মাথা ফেরায়। অক্টেভিয়ার চেয়ার শূন্য।

একটা শতপদী কীট, ঠ্যালা-বিছের মতো, নিয়তি চিহ্নিত পথ ধরেই বোধহয় পরিস্থিতিটা বুঝে নিচ্ছিল। সেদিন বেশ সকাল-সকাল অক্টেভিয়া আর মিসেস ম্যাকিনটায়ার পশ্চিম বারান্দার হানিসক্ল্ লতাগুলো কাটছাঁট করছিল। টেডি উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে সূর্যোদয়ের আগেই, খবর এসেছিল একদল ভেড়ী নাকি রাতের ঝড়বৃষ্টির সময় বিশ্রামের জায়গা ছেড়ে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

নিয়তি-তাড়িত বিছেটা বারান্দার মেঝেতে প্রথম দেখা দেয়, তারপর দুটি স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ চিৎকার তাকে পথ দেখায়, সে হলদে পাগুলোর ওপর ভর করে ছুটে যায় একেবারে পশ্চিমের কামরাটিতে—দরজা খোলা পেয়ে। ওটা টেডির কামরা। বেশ লম্বা দেখে ঘরোয়া বাসন কোসন বেছে নিয়ে সশস্ত্র অক্টেভিয়া আর মিসেস্ ম্যাকিনটায়ার ওটার পেছন-পেছন গেল—স্কার্ট খিমচে ধরে, আক্রমণকারী দলের বক্ষণভাগ দখলের লড়াই করতে-করতে।

একবার কামরার ভেতরে ঢুকতে পেয়ে বিছেটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার ভবিষ্যৎ হন্তারক'রা তখন শিকারকে তন্নতন্ন করে সতর্ক নজরে খুঁজতে লেগেছে।

অক্টেভিয়া এই বিপজ্জনক আর নিবিষ্ট হয়ে-থাকার মতো অভিযানেও কিন্তু সচেতন,—টেডির একান্ত ব্যক্তিগত ঘরে এসে পড়ে একটা সভয় কৌতূহল জাগে। ও-ঘরে একা বসে, ও টেডির সেই চিন্তাগুলোর সঙ্গে নীরবে যোগাযোগ করতে

চায়, যা সে কারুর সঙ্গে এখন আর ভাগাভাগি করবে না; সেখানে যে-স্বপ্ন টেডি দেখে তার মানে বোঝার জন্য কাউকে আর ডাকে না।

একজন সরল সৈনিকের কামরা এটা। এক কোণে রয়েছে একটা চওড়া, ক্যানভাসের খাট, অন্য কোণে একটা ছোট বইয়ের তাক, আরেক কোণে উইনচেস্টার রাইফেল আর শট্‌গানের একটা ভাবিক্কি স্ট্যাণ্ড। একদিক দখল করে আছে একটা মস্ত টেবিল, চিঠিপত্র, কাগজ, দলিল ছড়ানো, ওপরে বসানো একটা কাগজরাখা খোপ-দেরাজ।

এমন ফাঁকা ঘরেও লুকোবার কৌশল জানে বিছেটা! বইয়ের তাকের পেছনে ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁতোয় মিসেস্ ম্যাক। অক্টেভিয়া এগোয় টেডির খাটের দিকে। ম্যানেজার তাড়াতাড়িতে ঠিক যেভাবে রেখে গেছে কামরাটা সেভাবেই আছে। মেক্সিকান পরিচারিকা এখনো মনোযোগ দেয়নি এখানে। একটা বড় বালিশ, মাঝখানে এখনো তার মাথার ছাপ। ও ভাবল বিচ্ছিরি প্রাণীটা হয়তো খাট বেয়েই উঠে থাকবে, আর এখন লুকিয়ে আছে টেডিকে কামড়াবার জন্য। বিছেগুলো তাই ম্যানেজারদের পক্ষে নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ।

ও সাবধানে বালিশটা উল্টে দেয়। তারপর একটা লম্বা সরু কালো জিনিস সেখানে পড়ে থাকতে দেখে প্রায় ঠোঁট খুলেছিল আরো লোকজন ডাকার জন্য সংকেত দিতে। কিন্তু যথাসময়ে সেটা চাপা দিয়ে ও একখানা দস্তানা তুলে ধরল, একটা মুক্তো-ধূসর দস্তানা। চ্যাপটা হয়ে আছে। কল্পনা করা যায়, যে-লোকটা হ্যামারস্মিথদের বলনাচের কথা ভুলে গেছে, তারই বালিশের তলায়, রাতের-পর-রাত বহু বহুমাস ধরে চাপা পড়ে থেকে ওটার এই অবস্থা। টেডি নিশ্চয় আজ সকালে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে যে, এইবার অন্তত, ভুলে গিয়েছিল ওটাকে সরিয়ে দিবাভাগের আশ্রয়স্থলে রাখতে। ভয়ানক চালাক আর ধূর্ত ম্যানেজাররাও তা'হলে একেক সময় ধরা পড়ে যান!

ধূসর দস্তানাটা ওর পাতলা মর্নিং-গাউনের বুকের ভেতরে চালান করে দেয় অক্টেভিয়া। এটা তো ওরই। যে-সব পুরুষ নিজেদের শক্ত কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে রাখে, আর হ্যামারস্মিথ-নাচের বদলে মনে রাখে শুধু স্লুইস্-বাক্স নিয়ে খনিবিশারদদের বক্তৃতা, তাদের কাছে তো এসব জিনিস থাকতেই দেয়া চলে না।

যাই হোক্ না কেন, এই প্রেইরির দেশ এক স্বর্গ। ঠিক যে-সময় তুমি ভেবে নিয়েছিলে এই বুঝি সব হারালাম, তখনই কেমন তা ফুটে উঠল গোলাপের মতো! কেমন চমৎকার এই সকালের হাওয়া, জানালা দিয়ে আসছে, তাজা মিষ্টি, হলদে রাটামা ফুলের গন্ধ সুরভিত! কেউ কি এক মিনিটও দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বল সুদূর দৃষ্টি মেলে স্বপ্ন দেখবে না, যে ভুলগুলোও শোধরানো যায়?

মিসেস ম্যাকিনটায়ার কেন এমন অদ্ভুত বেয়াড়াভাবে ঝাঁটা দিয়ে এখানে-ওখানে খোঁচাচ্ছে?

মেঝের ওপর পা দাপিয়ে মিসেস্ ম্যাক বললে, 'এবার পেয়েছি, এখানে আছে।'

মিষ্টি নরম অনাগ্রহের সুরে অক্টেভিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিছু হারিয়েছিলে নাকি?'

'বাঃ!' মিসেস ম্যাক হিংস্রকণ্ঠে বলে, 'ছোট শয়তানটা! আপনি! আপনি কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

দুজনে মিলে বিছেটাকে মারলেন। এইভাবে প্রাণীটা পেল হ্যামারস্মিথ-নাচে হারানো বস্তুর উদ্ধারে তার মধ্যস্থতার জন্য পুরস্কার!

মনে হয় যথাসময়ে টেডিরও মনে পড়েছিল দস্তানাটার কথা, তাই সূর্যাস্তের পর বাড়িতে ফিরেই গোপনে অথচ তন্নতন্ন করে খুঁজল ওটা। একেবারে সন্ধ্যের সময় যখন পুব বারান্দায় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তখন সেখানেই আবিষ্কার করল সে দস্তানা। যে হাত সে চিরকালের মতো হারিয়েছে বলে তার ধারণা, সেই হাতেই এখন জিনিসটা। তাই বাধ্য হয়ে কতগুলো কথার আবোলতাবোল পুনরাবৃত্তি করতে হল, যা তাকে না করতেই হুকুম করা হয়েছিল। টেডির বেড়া এবার ধসে পড়েছে।

এবারে আর কোনো 'উচ্চাশা' পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, আর প্রেম নিবেদনটাও হল এমন স্বাভাবিক আর সফল, যা এক উৎসাহী মেষপালক আর কোনো ব্রীড়াময়ী মেষপালিকার মধ্যেই হতে পারে।

প্রেইরির প্রান্তর এবার ফুলের বাগান হয়ে দাঁড়ায়। ছায়ানিবিড় র‍্যাঞ্চো সমব্রাস্ হয় আলোর র‍্যাঞ্চ।

ক'দিন পর অক্টেভিয়া একটা চিঠি পেল মিঃ ব্যানিস্টারের কাছ থেকে। ওরই একটা চিঠির উত্তরে ব্যবসার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল অক্টেভিয়া। চিঠিটার অংশবিশেষ এই রকম:

"ভেড়ার র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে আপনার উল্লিখিত বিষয়গুলোর জবাবদিহি করতে বিপন্নবোধ করছি। আপনি সেখানে বসবাস করতে চলে যাবার ঠিক দু'মাস পর আবিষ্কার করলাম যে কর্নেল বোপ্রির মালিকানা-স্বত্ব একেবারে ভুয়ো। একটি দলিল হাতে এল যাতে দেখা যাচ্ছে তিনি মৃত্যুর আগে সম্পত্তিটা বেচে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা আপনার ম্যানেজার মিঃ ওয়েস্টলেককে জানানো হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তিটা পুনঃক্রয় করে নেন। এ আমার কল্পনাশক্তির একেবারে বাইরে কেমন করে আপনি এ তথ্য সম্পর্কে অনবগত রইলেন। আমি অনুরোধ করছি আপনি এখনই ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করুন, উনি অন্তত আমার বিবৃতি সত্য বলে সমর্থন করবেন।"

অক্টেভিয়া টেডিকে খুঁজে বের করে, ওর চোখে এখন সভ্রাইয়ের উত্তেজনা। আগের মতোই জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এই র‍্যাঞ্চে কিসের তাগিদে কাজ কর?'

'এক শো—' আবার বলতে গিয়েছিল টেডি, কিন্তু ওর চোখ দেখেই বুঝল ও জেনে গেছে। মিঃ ব্যানিস্টারের চিঠিটা ওর হাতে রয়েছে। টেডি বোঝে খেলা এবার সাঙ্গ।

দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা-পড়া স্কুল বালকের মতো টেডি বলে, 'এটা আমার র‍্যাঞ্চ। কিন্তু তুমি যথেষ্ট সময় দিলেও সে যদি মালিকের ব্যবসা আয়ত্ত না করতে পারে তা'হলে সে তো অতি বাজে ম্যানেজার।'

'তুমি এখানে কাজ করছিলে কেন?'—অক্টেভিয়া তবু লেগে থাকে, তাকে যেমন করে হোক জানতে হবে টেডির হেঁয়ালির চাবিকাঠিটা কী?

টেডি এবার শান্ত অকপটতা নিয়ে বলে, 'সত্যি বলতে' টেভ, সেটা মাইনের জন্য নয়। ওতে বড়জোর আমার চুরুট আর রোদে-পোড়ার মলম হত। আমার ডাক্তার আমায় দক্ষিণে পাঠিয়েছিলেন। অতিরিক্ত ব্যায়াম, পোলো আর জিমনাস্টিক্স্-এর চাপ আমার ডানদিকের ফুসফুসটা খারাপ করে ফেলেছিল। আমার দরকার ছিল হাওয়া বদলানো, ওজোন, বিশ্রাম, আর ওই জাতীয় ব্যাপার।'

মুহূর্তের মতো অক্টেভিয়া তার আক্রান্ত দেহযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ অঞ্চলে লগ্ন হয়। মিঃ ব্যানিস্টারের চিঠি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে।

'এখন তো .... এখন নিশ্চয় ভাল আছে বুকটা; টেডি?'

'মেস্কিট ঘাসের চাপড়ার মতো চাঙা। একটা ব্যাপারে তোমাকে ঠকিয়েছিলাম। যখনই জানলাম তোমার কোনো স্বত্ব নেই, আমি পঞ্চাশ হাজার দিয়ে তোমার র‍্যাঞ্চটা কিনে ফেললাম। প্রায় অতটাই পরিমাণ আয় আমার জমে গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, যে-সময়টা আমি এখানে ভেড়া চরাচ্ছি, তাই ব্যাপারটা দাঁড়াল কোনো শস্তা হরেক মালের দোকানে এক পেনি দিয়ে দাঁও মেরে কোনো জিনিস তুলে নেবার মতো। এখন আবার আরেকটা বাড়তি ছোট আয়, উপার্জন না করেই, গড়ে উঠছে সেখানে। 'টেভ, আমি ভাবছিলাম বিয়ের পর একটা ইয়ট্-ভ্রমণের কথা, মাস্তুলে সাদা রিবন বাঁধা থাকবে, ভূমধ্যসাগরের ভেতর দিয়ে যাব—একেবারে সেই হেব্রাইডিস্ দ্বীপগুলোর মধ্যে, তারপর নরওয়ে ঘুরে জুইডার-জী অবধি'।

মৃদুকণ্ঠে অক্টেভিয়া বলে, 'আর আমি ভাবছিলাম আমার ম্যানেজারের সঙ্গে একটা বিয়ের ঘোড়দৌড়, ভেড়ার পালের মধ্যে, তারপর ফিরে মিসেস্ ম্যাকিনটায়ারের সঙ্গে বিয়ের ভোজ—গ্যালারিতে। হয়তো টেবিলের লাল জারটার ওপর একটা কমলালেবু-ফুলের ডাল জড়ানো থাকবে।'

টেডি হেসে উঠে সুর করে গাইতে থাকে

"ছোট্ট বো-পিপ, ছোট্ট বো-পিপ, হারিয়েছে ভেড়া,

জানে না সে কোথায় গেলে, পাবে তাদের সাড়া।
থাক্ না ওরা একা, ঘরে তো ফিরবেই,
আর—'

অক্টেভিয়া তার মাথাটা টেনে নামায়, আর কানে-কানে বলে—।

—কিন্তু সে আরেক গল্প, যা ওরা পরে রচনা করেছে।

'Madame Bo-Peep, of the Ranches' শর্ট সেট, ১৯০২

গোধূলির জাদু

আন্তর্জাতিক নদীসেতুর মার্কিন তরফে, চারজন সশস্ত্র রক্ষী (রেঞ্জার) ছোট একটা রোদপোড়া-ইটের ঘরে বসে গরমে সেদ্ধ হচ্ছিল। মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবেই গোয়েন্দা-নজর রাখছিল মেক্সিকোর তরফ থেকে আসা মন্থর যাত্রী-সারির ওপর।

আগের দিন সন্ধ্যায় একটা কাণ্ড ঘটেছে। 'টপ-নচ্' পানশালার মালিক বাড ডসন সবিক্রমে তার দোকান থেকে কোনো এক লিয়ান্দ্রো গার্সিয়াকে বের করে দেয়, শেষোক্ত ব্যক্তি 'টপ্-নচ'-এর আদব কায়দা লঙ্ঘন করেছিল বলে। গার্সিয়াও জানিয়ে দেয়— চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছে সে, এর মধ্যেই ফিরে এসে ব্যক্তিগত 'খুশ' মেটাতে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে।

মেক্সিকান গার্সিয়ার ভয়ানক মুখ-বড়াই, তা'হলেও সে নির্ভেজাল সাহসী—আর এ দুটোর কোনো একটা গুণে নদীর দু'পারের লোকই তাকে ইজ্জত করে। সে, আর তার একই রকম দুঃসাহসী সাঙ্গপাঙ্গ, মাঝেমধ্যে শহরগুলোর একঘেয়ে অবরুদ্ধ জীবন চাঙ্গা করে তোলে—এ তাদের এক নেশার মতো, সময় কাটানোর খেলা।

গার্সিয়ার চিহ্নিত 'হিসেব-নিকেশের' দিনটা আরো একটু বেশি গুরুত্ব পেল আমেরিকান তরফে তখন একটা 'পশুপালক সম্মেলন' থাকার ফলে, সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই, পুরনো আবাসনকারীদের বনভোজন, বারবিকু্য উৎসব। এমন সব ভদ্র সামাজিক বিনোদন চলার সময়ে শান্তির সন্ধি আহ্বান করাই বুদ্ধির কাজ; আর প্রতিশোধকামী লোকটা যে নিজের কথা রাখে সেটাও জানেন স্থানীয় রেঞ্জার-দলের ক্যাপ্টেন ম্যাকনাল্টি। তিনি তাঁর সহকারী আর তিনজন সেপাইকে ডিউটিতে বসালেন সেতুর একটা মাথায়। ওদের নির্দেশ দেওয়া হল গার্সিয়ার আক্রমণ রুখতে হবে, তা সে একাই আসুক, কি দলবল নিয়ে।

ওই ভ্যাপসা বিকেলটাতে লোকজনের যাতায়াত কম, আর রেঞ্জাররাও তাদের সুবিধাজনক অথচ ঘিঞ্জি ঘাঁটিটার মধ্যে বসে কেবলই মৃদু গালাগাল ঝাড়ছে আর কপাল মুছছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একজন যাত্রীও সেতু পার হয়নি—একজন কালো জোব্বাপরা বাদামি শালমুড়ি-দেওয়া বুড়ি ছাড়া। হ্যালানি কাপড়ের ছোট-ছোট পুঁটলি ফেরি করবে বলে একটা গাধার পিঠে চাপিয়ে তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে গেল। তারপর রাস্তার দিক থেকে গুলির আওয়াজ, নিথর হাওয়ায় স্পষ্ট শোনা যায় ফট্‌ফট্‌ করে।

চারজন রেঞ্জারই তাদের অলস গড়ানো ভঙ্গি থেকে হঠাৎ সজাগ সজীব হয়ে ওঠে, কিন্তু খাড়া হয়ে দাঁড়ায় একজনই। চতুর্থ জনের দিকে বাকি তিনজন কেমন যেন নিরাশ মিনতির চোখে তাকায়। সে চট্‌পট উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে বেড় দিয়ে কার্তুজ-বেল্টটার বকলেশ আঁটছে। বাকি তিন জন জানে যে লেফটেনান্ট বব বাক্‌লে এখন দলপতি, ও থাকতে ওদের কেউই অনুমতি পেতে পারে না কোনো কলহের তদন্তে যেতে, যখন সে নিজেই চলেছে।

চওড়া-বুক, তৎপর লেফটেনান্ট, মসৃণ, হলদে-বাদামি বিষণ্ণ মুখে কোনো ভাব-পরিবর্তন না দেখিয়ে, বেল্টের বকলেশের ভেতর ফিতে ঢোকাল, খাপের মধ্যে ছ'ঘরা পিস্তল গুঁজল—বিবিরা যেমন প্রসাধনের শেষ ছোঁয়া লাগান, তেমনি,—তারপর উইনচেস্টার রাইফেলটা তুলে নিয়ে ছুটল দরজার দিকে। সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সাথীদের সতর্ক করল সেতুটার ওপর নজর রাখার জন্য, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উত্তপ্ত প্রধান সড়কে।

তিনজন আবার ডুবে গেল অলস কর্মহীনতা, আর সবিলাপ আলাপে। ব্রঙ্কো লেদাস গজগজ করে, 'বিপদকে শাদি করে নিয়েছে এমন অনেক বান্দার কথা শুনেছি, তবে বব বাক্‌লে যদি ভবলে-বিয়ে না করে থাকে তো আমি হারামীর বাচ্চা।'

নিউসেস্‌ কিড গোঁজ দেয়, 'ববের আসল গণ্ডগোলটা হল ও সত্যিকারের ট্রেনিং পায়নি। কী করে ভয় পেতে হয় তা ও শেখেনি। এখন, একটা ঝামেলার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ভয় তাকে পেতেই হবে, নয়তো হাঁ করে চেয়ে থাকতে হবে বাঁচলো-যারা তাদের তালিকায় নিজের নাম দেখতে!'

তিন নম্বর রেঞ্জার একজন বিপথচালিত পূবদেশী, বিদ্যা-ভারাক্রান্ত। সে মন্তব্য করে, 'বাক্‌লে এমন গুরুগম্ভীরভাবে লড়ে যে আমার সন্দেহ হয় সেটা খাঁটি লড়াই কি-না। আমি তার ধরন-ধারণ অতটা বুঝি না, তবে মনে হয় যেন অঙ্ক-বই পড়ে লড়ছে—টাইবল্টের মতো।'

ব্রঙ্কো বলে, 'আমি তো বাবা অঙ্ক-কষা আর লড়াই করার শয়তানি কায়দাকানুন বুঝি না।'

ছোট নিউসেস ফোঁড়ন কাটে—'ট্রিগার-নো-মেট্রি নাকি?'

'ওটা তো বেশ বলেছ ভায়া, ভাবতেই পারিনি তোমার মুখ থেকে'— পুবদেশী তারিফ করে মাথা ঝোঁকায়, 'অন্য অর্থটা হল, চারদিকে নিজের ওজন না দেখিয়ে বাক্‌লে কক্ষনো লড়তে যায় না। সামান্য সুযোগটা নিতেও কেন যেন ভয় পায়। আরে বাবা, যখন ঘোড়া-চোর আর তারের বেড়া-কাটাদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিস তখন ওটা কি গোঁয়ার্তুমি নয়? যে-কোনো রাতেই তো তারা সুযোগ পেলে পথের মধ্যে আটকে তোকে পেছন থেকে গুলি করে মারতে পারে। বাক্‌লে যেন বালিব বস্তা। একেক দিন এক নাগাড়ে পুল ধরে বসে থাকবে—হোরেশিয়াসের মতো।'

কিড টেনে-টেনে বলে, 'আমি জানি ওটা, বইয়ে পড়েছি পুলের দঙ্গলটার কথা। আমি কিন্তু অন্য লোকটার বুদ্ধিই মানি—কী যেন নাম,—যে লড়াই করে দলবল নিয়ে কেটে পড়ল আরেকদিন এসে লড়বে বলে।'

ব্রঙ্কো মোটের ওপর সিদ্ধান্ত টানে—'যা হোক, রিও ব্রাভোর পাড়ে ববের মতো এমন লড়াকু আর দেখিনি—নদী আরো গরম হলে ফুটতে থাকবে যে, প্রেসিডেন্ট সাহেব!' বলতে বলতেই ব্রঙ্কো ওর চারপাউণ্ড স্টেট্‌সন টুপি দিয়ে একটা কাঁকড়া বিছেকে চেপে মারল। তারপর তিনজন নজরদার সেপাই চুপ করে রইল সান্ত্বনাহীন নীরবতার মধ্যে।

ওরা যে বব বাক্‌লে সম্পর্কে ওইভাবে বলে, তাতে বোঝা যায় কী চমৎকার ভাবে সে নিজের গোপন কথাটা চাপা দিয়ে রেখেছে। অথচ এই লোকগুলো দু'বছর ধরে ওর পাশের সাথী, অসংখ্য সীমান্ত হানা আর বিপদে-আপদে, কিন্তু জানে না যে গোটা রিও-ব্রাভো এলাকায় ওর মতো ডাহা ভীতু আর দুটি নেই! ওর মধ্যে চূড়ান্ত সাহস ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে বলে ওর বন্ধু বা শত্রুরা কখনো বিশ্বাসই করবে না। আসলে সেটা নিছক শারীরিক কাপুরুষতা। একমাত্র নিদারুণ, অসীম ইচ্ছাশক্তির বলেই সে নিজের ভীরু দেহটাকে দিয়ে চরম দুঃসাহসিক কাজগুলো করায়। সাধুরা যেমন চাবুক কষে পাপের বাধা দূর করে, সেভাবেই বাক্‌লে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনের মতো আপাত দুঃসাহস দেখিয়ে নিজেকে ঠেলে দেয় সব রকম বিপদের মধ্যে—ওর আশা এইভাবেই একদিন ঘৃণ্য পীড়াটা থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে পারবে। কিন্তু পরপর নানা পরীক্ষাতেও স্বস্তি আর পায় না, তাই রেঞ্জার হিসেবে তার মুখখানা যেখানে স্বভাবত উজ্জ্বল আর হাসিখুশি থাকার কথা, সেখানে তা সর্বদা অন্ধকার বিষাদের মুখোশ পরে থাকে। তাই যখন গোটা সীমান্ত অঞ্চল ওর কীর্তি নিয়ে মুখর, ওর ক্ষমতার কথা ছাপা কাগজে বেরোয়, ব্রাভোর উপত্যকায় শিবির-আগুনের ধারে মুখে-মুখে ছড়ায়, তখনো ওর অন্তর ভেতরে-ভেতরে কাতর। একমাত্র ওই জানে ওর লজ্জাকর

ব্যাধির অভ্রান্ত লক্ষণগুলো — বুকের মধ্যে ভয়ানক মোচড়ানি, শুকনো জিভ, শিরদাঁড়ার শিথিলভাব, টান-টান স্নায়ুর যন্ত্রণা।

ওরই ফৌজদলের এক সামান্য বালক ঘোড়ার জিনের ওপর হেলায় পা ঘুরিয়ে বসে লড়াইয়ে ছুটে যেতে অভ্যস্ত—তার ঠোঁটে সিগারেট ঝোলে, ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার নানা নতুন চালাকির বচনও ঝাড়ে। ওরকম বেপরোয়া ধরন-ধারন আয়ত্ত করতে ও নিজের এক-বছরের বেতনও দিয়ে দিতে রাজি। একবার চালবাজ ছোকরাটা ওকে বলেছিল, 'বাক্, তুমি লড়তে যাও, যেন শবযাত্রায় যাচ্ছ তা হয়তো নয় তবু সেটাই মনে হয়।'—শেষ কথাটা সৌজন্য করে চায়ের কাপ নেড়ে বলে।

বাক্‌লের বিবেক নিউ-ইংল্যাণ্ডের শৃঙ্খলা আর পশ্চিমী কাটছাঁটে গড়া। সে যত বেশি সম্ভব ঝামেলার মধ্যেই নিজের বিদ্রোহী শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়; আর তারই ফলে আজকের ভ্যাপসা বিকেলটাতে সে নিজের অবাধ্য হাত-পাগুলোকে ঠেলে দিতে চেয়েছে ওই হঠাৎ বিপদসংকেতের তদন্ত করতে—রাজ্যের শান্তি আর মর্যাদাকে সচকিত করেছে ওই গুলির শব্দ।

রাস্তার দুটো চত্বর ছাড়িয়ে 'টপ-নচ্' সেলুনের অবস্থান। সম্প্রতি কিছু লণ্ডভণ্ড হয়েছে, তারই চিহ্ন দেখতে পায় বাক্‌লে। সামনের দরজাটার কাছে ভিড় করেছে একদল কৌতূহলী দর্শক, তাদের জুতোর গোড়ালির তলায় গুঁড়ো হচ্ছে একটা জানলার টানা-কাঁচের টুকরো। ভেতরে ঢুকে বাক্‌লে পেল বাড ডসনকে,—নিজের কাঁধের জখমটার দিকে বিলকুলই খেয়াল নেই তার, কেবল আবেগভরে কাঁদছে 'ওই হতচ্ছাড়া সঙের দলের ভাঁড়টা' গুলি ছুঁড়ল, অথচ কেন সে তাকে নিপাত করতে পারেনি,—এখন তাকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে—এই দুঃখেই। রেঞ্জার ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আবেদনের ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল, যেন 'নিজের চোখেই তো দেখলেন' কী মহামারী কাণ্ডটা সে করেছে!

'বুঝলেন বাক্, প্রথম ধাক্কাতেই আমি তাকে সাবাড় করতে পারতাম, শুধু এক মিনিট যদি ভেবে দেখতাম। সঙের দলের লোক, মুখোশধারী মেয়েছেলে সেজে সে এখানে ঢুকল, তারপরেই নিজ মূর্তি! আমি বন্দুকের জন্য হাতই বাড়াইনি, ভেবেছিলাম নিশ্চয় চিহুয়াহুয়া বেটি কিংবা মিসেস্ এ্যাটওয়াটার, বা বড়জোর মেফিল্ডের কোনো মেয়ে বন্দুক-ছোঁড়া বিদ্যা দেখাচ্ছে, উচিত কিনা সে প্রশ্ন আলাদা। একবারও ওই হতচ্ছাড়া গার্সিয়ার কথা ভাবিনি যতক্ষণ না—'

'গার্সিয়া!' খেঁকিয়ে ওঠে বাক্‌লে— 'সে এখানে এল কী করে?'

বাড়ের পান-পরিবেশক রেঞ্জারের বাহু ধরে তাকে পাশের দরজায় নিয়ে যায়। সেখানে নর্দমার ধারে ঘাস চিবোচ্ছে একটা ধীরস্থির ধূসর গাধা, পিঠের ওপর এক বোঝা জ্বালানি কাঠ বাঁধা। মাটির ওপর পড়ে আছে একটা কালো শাল, আর বড়সড়ো বাদামি পোশাক।

বাড তখন জায়গায় ওষুধ লাগাতে এখনো রাজি নয়, উঁচু গলায় বললে, 'ওই সব পোশাকে সেজে এসেছিল, ভেবেছিলাম কোনো মেয়েছেলে, কিন্তু একবার চেঁচিয়ে উঠে আমায় তখন করতেই বুঝে গেলাম।'

মদ্য-পরিবেশক বললে, 'এই পাশের গলিটা ধরে বেরিয়ে গেছে। একাই রয়েছে, রাত অবধি লুকিয়ে থাকবে নিশ্চয়, যতক্ষণ-না তার দলবল এসে পড়ে। স্টেশনের নিচের ওই মেক্সিকান এলাকাতেই পাবেন তাকে। সেখানে তার এক মেয়ে বন্ধু থাকে—পাপ্পা সেলস্।'

'অস্ত্র-শস্ত্র কী ছিল সঙ্গে?'

'হাতলে-মুক্তো-বসানো দুটো ছ'ঘরা পিস্তল, আর একটা ছোরা।'

বেঞ্চার তার উইনচেস্টারখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এটা তোমার জিম্মায় রইল বিলি, পরে নেব এসে।'—উদ্ভট হয়তো, তবে এটাই বব বাক্লের দস্তুর। অন্য কোনো লোক—এর চেয়ে সাহসী হলেও—হয়তো সঙ্গে একটা ফৌজী বাহিনী নিত। কিন্তু বাক্লের নিয়ম হল সবরকম প্রাথমিক সুবিধাগুলো বর্জন করা।

মেক্সিকানটা যে পথ দিয়ে গেছে সে-রাস্তা জনশূন্য, একেক করে সব বাড়ির দরজা বন্ধ। কিন্তু এবার লোকে বেরুতে শুরু করেছে তাদের লুকোবার জায়গা থেকে, যেন কিছু ঘটছে বলে জানেই না তারা এমন ভাব। অনেক নাগরিক যারা বেঞ্চারকে চেনে, চট্ করে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গার্সিয়ার পলায়ন-পথটা।

বাক্লে ঘোড়া ঘুরিয়ে সে-পথ ধরতেই আবার তার গলার কাছে সেই দম-আটকানো অনুভূতিটা টের পেতে শুরু করে, টুপির কিনারায় কপালের ঠাণ্ডা ঘাম। আর সেই পুরনো লজ্জাকর আতঙ্ক; ওর হৃৎপিণ্ড যেন ডুবে যাচ্ছে, ডুবছে নিজের বুকের মধ্যেই।

'মেক্সিকান সেন্ট্রাল' থেকে সকালের ট্রেনটা সেদিন তিন ঘণ্টা দেরি করে এসেছে—তাই নদীর অপর তীরে আই. জি. এন.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি যথাসময়ে। যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এই দু'রাজ্যের খিচুড়ি চালিয়াত ছোট্ট শহরটাতেই বিনোদন খোঁজে, কারণ কাল সকালের আগে আর অন্য কোনো ট্রেন আসছে না তাদের উদ্ধার করতে। তারা ক্ষুব্ধ এ-কারণেও যে দু'দিন বাদে সান আন্টনেতে শুরু হতে যাচ্ছে বিরাট মেলা আর রেস্খেলা। চিন্তা করে দেখুন, সে আমলে সান আন্টনেই ছিল ভাগ্যচক্রের কেন্দ্র, আর চক্রের দাঁড়গুলোর নাম: গরুভেড়া, উল, তাসের জুয়া, ঘোড়দৌড় আর ওজোন-হাওয়া। সে সব দিনে ভদ্রলোকরা তাসের বাজি ধরতেন টাকার থোকের উচ্চতা ধরে—যতক্ষণ মাধ্যাকর্ষণের টান তাকে টিকিয়ে রাখে। মানে সেখানেও যেত শস্য-রোপক আর

শস্যছেদকের দল—কেউ ডলার ছড়াত, কেউ মুঠোভর তুলে নিত। বিশেষ করে লোক-বিনোদনের পরিবেশকরাই ছুটে যেত সান আন্টনেতে। এর মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে বিশ্বের দুটো শ্রেষ্ঠ প্রমোদ-প্রদর্শনী, আর রাস্তায় আছে কয়েক ডজন ছোট খেল্-তামাশার দল।

পোড়া-ইটের হতশ্রী ছোট স্টেশনটার কাছে, পাশের রেল লাইনে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রাইভেট বগি, সেদিন সকালে মেক্সিকোর ট্রেন ওটাকে ছেড়ে গেছে ওখানে। এখন বেকার সময়-নির্ঘন্টের দৌলতে তাকে নোংরা পরিবেশের মধ্যে হীনভাবে সবুর করতে হচ্ছে পরের দিনের নিয়মিত ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

গাড়িটা এক সময়ে ছিল সাধারণ কোচ, কিন্তু এক সময় যারা এতে বসত আর কন্ডাকটরকে দেখলে কাঠ হয়ে যেত, তারা আর চিনতেই পারবে না এর ভোল পাল্টাবার পর। রং, সোনালি গিল্টি, কিছু ঘরোয়া ছোঁয়া ইত্যাদি দেখলে 'জনসাধারণের ব্যবহারার্থ' বলে কোনো খট্‌কাই আসবে না কারুর। ফট্‌ফটে সাদা লেস্‌লাগানো পর্দা, বুদ্ধি করে জানলায় ঝোলানো। সামনের দিক থেকে জোর হাওয়ায় দুলছে মেক্সিকোর পতাকা। পেছন দিকে ডোরা আর তারকা লাঞ্ছিত নিশান, আর কর্মব্যস্ত চুল্লির নল,—শেষোক্তটি বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছে রান্নার সুবন্দোবস্ত ছাড়াও গোপনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয়। গাড়ির জমকালো দুটি পাশ দেখতে গিয়ে নজরদারের চোখ রীতিমতো আগ্রহী হয়ে উঠবে গোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে সোনালি আর নীল অক্ষরে একটি নাম দেখে—একটিই নাম, উদ্ধত রাজকীয় অথবা প্রতিভাব দাপটে। এখানে যেন নামটা দু'গুনো স্পর্ধিত: "আলতারিতা—সপকুলের রানী।" মহিলার এই গাড়িখানা মেক্সিকোর প্রধান শহরগুলোতে বিজয় অভিযান শেষ করে এবার চলেছে সান আন্টনের দিকে। সেখানে আগাম বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, মহিলা প্রদর্শন করবেন "মারাত্মক ও বিষাক্ত সাপের ওপর তার আশ্চর্য প্রভাব ও নির্ভয় শাসন! সহস্র কম্পিত বাক্‌রুদ্ধ দর্শক ত্রাসগ্রস্ত হবে যখন অতি অনায়াসে তিনি হিসহিসে কুণ্ডলিত সাপগুলোকে নিয়ে খেলবেন।"

একশো লোক ছায়ার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে বলে আশপাশের জায়গাটা একটু জনবিরল। শহরের এই এলাকা একটা এবড়ো খেবড়ো কিনারার মতো; এখানকার বাসিন্দা পাঁচ জাতের উচ্ছিষ্ট ফেনা; এখানকার স্থাপত্য হল তাঁবু, চালাঘর আর রোদপোড়া ইটের ঘর। এখানকার বিনোদন: কলের বাজনা, আর হঠাৎ আগন্তুকের অভিজ্ঞতায় নানা লৌকিকতাবর্জিত অবদান। এই বেয়াড়া কিনারাটা পার হলেই পুরনো শহরের হনুদেশে একটা ঘন জঙ্গল ছোট নিম্নভূমি জুড়ে। তার ভেতর দিয়ে চিকচিক করে একটা ক্ষীণ সোঁতা বয়ে যাচ্ছে, আর পড়ছে গিয়ে রিও

ব্রাভো ডেল নর্ট নদীর বিশাল গিরিখাতে তার খাড়া কর্কশ গা বেয়ে।

এই জঘন্য জায়গাটিতেই সর্পকূলের রানীর অক্ষম শকট বাহনটি কয়েক ঘন্টার জন্য আটক হয়ে থাকার শাস্তিভোগ করছে।

গাড়ির সামনের দরজাটা খোলা। সম্মুখ ভাগে পর্দা দিয়ে একটা ছোট বসার ঘর করা হয়েছে। তারিফ আর স্তাবকতা নিয়ে কাগজের রিপোর্টাররা সেখানে বসতে অভ্যস্ত, আর সেনোরিটা আলভারিতার বাক্-সঙ্গীতসুধা তারা রূপান্তরিত করে আরো অলঙ্কৃত কাগুজে ভাষায়। এক দেয়ালে ঝুলছে আব্রাহাম লিঙ্কনের ছবি; আরেকটা ছবি অন্য জায়গায়—পাথরের সিঁড়িতে বসা একদল স্কুলের মেয়ে; তৃতীয় ছবিটা টক্‌টকে লাল ফ্রেম, ইস্টার-লিলিফুলের। পায়ের তলায় ছিমছাম কার্পেট। একটা নড়বড়ে স্ট্যাণ্ডে রাখা আছে ঠাণ্ডা ঘাম-ঝরা কুঁজো আর গ্লাস। উইলোকাঠের দুলুনি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে আলভারিতা।

হয়তো আপনার মনে হবে স্পেনীয়, কিংবা আন্দালুসীয়, অথবা আরো ভাল করে দেখলে—বাস্ক্। সেই একধরনের মিশ্রণ, আগুন আর আঁধার মিশিয়ে হীরার মতো। চুলগুলো, মাঝরাতে দেখলে বেগুনে-আঙুরের ছায়া। চোখ দীঘল, কাল্‌চে; নিরুদ্বেগ সিধে দৃষ্টির জন্য খানিকটা অস্বস্তিকর। মুখমণ্ডলে গর্বিত বেপরোয়াভাব, একটা মিষ্টি ঔদ্ধত্যের স্পর্শ যেন প্রাণবন্ত করে তুলেছে মুখখানাকে। কিন্তু তার মোহিনীমায়া চট্‌ করে বুঝতে হলে তাকাতে হবে কোণের দিকে রাখা হ্যাণ্ডবিলের গাদাগুলোর দিকে—সবুজ, হলুদ, সাদা। ওগুলোর ওপর দেখতে পাবেন সিনোরিটার যেমন-তেমন করে ছাপা ছবি—তার পেশাদারি পোশাক আর ভঙ্গিমায়। কালো লেস্ আর হলদে ফিতের সাজে মুখখানা দুর্নিবারভাবে আপনার দিকে ফেরানো; দুটি নগ্ন বাহুতে পেঁচিয়ে আছে একটা নীল সাপ, কোমরে দু'পাক আর গলায় এক পাক দিয়ে। ভয়ঙ্কর মাথাটা ওর মাথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। উনি হলেন 'কুকু'—এগারো ফুট লম্বা এশিয়া-বংশী অজগর সাপ।

ভেতরের ভাগ-করা পর্দাটা এক হাতে সরিয়ে এপাশে উঁকি দিল এক মধ্যবয়েসী পাংশুমুখ মহিলা, হাতে একখানা ছুরি আর অর্ধেক খোসা—ছাড়ানো আলু। বলল:

'আলভিরি, খুব ব্যস্ত আছ কি?'

'আমি দেশের খবর পড়ছি, মা। জানো কী হয়েছে! ওই ঝোপড়া মাথা, ফ্যাকাশে মাটিল্‌ডা প্রাইস্, গ্যালিপোলিসের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর ভোট পেয়েছে 'নিউজ' কাগজে।'

'শুঃ! তুমি যদি দেশে থাকতে তা'হলে আর তাকে পেতে হত না ভোট। আলভিরি, ঈশ্বর জানেন আমার কত আশা শীত পড়ার আগেই দেশে ফিরে যাবার। আমরা ইতর 'ডেগো' সেজে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াচ্ছি সাপের খেলা দেখিয়ে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি সেটা বলতে আসিনি। সবচেয়ে বড়

সাপটা যে আবার ভেগে গেছে! সারা গাড়ি খুঁজে দেখলাম, পাচ্ছি না কোথাও। নিশ্চয় এক ঘন্টা হল বেরিয়ে গেছে। মেঝে ধরে কিছু একটা খড়খড় করে যাবার শব্দ শুনেছিলাম মনে আছে, কিন্তু আমি ভাবলাম তুমিই হয়তো।"

'ওঃ! বুড়ো বদমাশটাকেই গাল দিতে হয়!'—কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সচীৎকারে বললে রানী—'এই নিয়ে তিনবার ছাড়া পেয়ে গেল। জর্জ তো কক্ষনো ভাল করে বাক্সের ঢাকনাটা আটকাবে না! আমার বিশ্বাস কুকুটাকে সে ভয় পায়। এবার আমাকেই যেতে হবে খুঁজতে।'

'একটু তাড়াতাড়ি কর বরং। কেউ হয়তো ঘা মেরে বসবে।'

ব্যঙ্গহাসিতে চিকমিক করে উঠল রানীর দাঁত—'কোনো বিপদ নেই। কুকুকে বাইরে দেখলেই লোকজন সিধে সট্‌কে পড়বে, স্নায়ুর দাওয়াই কিনবে। এখান থেকে নদীর পথে একটা সোঁতা আছে। একটু বহতা জল পাবার জন্য বুড়ো বেচারা যে-কোনো সময় খোলস পালটাতেও রাজি। আমার ধারণা ওখানেই তাকে পেয়ে যাব ঠিক।'

কয়েক মিনিট বাদে আলভারিতা সামনের প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল, সন্ধানের জন্য তৈরি হয়ে। ওর চমৎকার কালো ঘাগরাটা আধুনিকতম ফ্যাশনের ঘোষণা জানাচ্ছে। রোদের মরুরাজ্যে ওর নিদাগ জামার কোমরটা যেন চোখকে আনন্দ দেয়, যেন ঠাণ্ডা আর তাজা একটা উৎফুল্ল মরূদ্যান। ওর কোঁকড়ানো গোছাভরা চুলের ওপর একটা পুরুষালি খড়ের টুপি। উদ্ধত গোলাকৃতি প্রশান্ত চিবুকের নিচে ছেলেদের উঁচু শক্ত কলার, তাতে একটা রঙ্গিলা চওড়া পুরুষসুলভ টাই বাঁধা। অবশ্য একটা ছাতাও নিয়েছে সে, সাদা সিল্কের,—কিনারায় লেস্, হল্‌দেটে বলেই খাঁটি।

আমি ওর পোশাকের জন্য গ্যালিপলিসের তারিফ করব, কিন্তু ওর চোখদুটো নিশ্চয়ই স্পেনের শহর সেভিল বা ভাল্লাদলিদ্-এর কাছে ঋণী। ওগুলোর কৃষ্ণ গভীরতা অঙ্গীকার জানায় কাঠের করতাল, ব্যালকনি, মান্টিলা ওড়না, প্রণয়ীর নৈশসঙ্গীত, অতর্কিত আক্রমণ, স্বগৃহ-নিষ্কৃতি—এই সমস্ত কিছুরই।

রানীমাতা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'একলা যেতে তোমার ভয় করবে না, আলভিরি? কত সব বাজে লোক ঘুর-ঘুর করছে। হয়তো সঙ্গে—'

'এ পর্যন্ত তো কিছুই দেখিনি, মা, যাতে আমি ভয় পাই। বিশেষ করে মানুষকে। পুরুষকে তো নয়ই। তুমি ছটফট কোর না। ভেগে যাওয়া পাজিটাকে খুঁজে পেলেই খুটখুট করে ফিরে আসব।'

লাইনের কাছে খোলা জমিতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। আলভারিতার চোখ অবিলম্বেই আবিষ্কার করল পলাতক পাইথনের কাটা কাটা চলার দাগ। স্টেশন-জমির ওপর দিয়ে দাগটা চলে গেছে একটা খুদে গলির মধ্যে—ছোট

সোঁতাটার দিকে, ও যেমন আগেই বলেছিল। কাছেপিঠে নিশ্চুপ, উত্তেজনা শূন্য ভাব দেখে আশা জাগে, বাসিন্দারা হয়তো টেরই পায়নি অতো দুর্দান্ত এক অতিথি তাদের সড়ক পার হয়ে গেছে। গরমে তারা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসে তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ কিংবা কোনো নিগৃহীত বাদ্যযন্ত্র থেকে করুণ আর্তনাদ। ছায়ার মধ্যে কয়েকটা মেক্সিকান শিশু জ্যান্ত হয়ে-ওঠা অনড় মাটির পুতুলের মতো; আলভারিতা এদিক থেকে ওদিক যাবার সময় খেলা ছেড়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে হতভম্ব, নির্বাক। এখানে ওখানে মেয়েরা উঁকি দেয় দরজা থেকে, আর বোবার মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখে সাদা সিল্কের ছাতার দিকে।

আরো একশো গজ, তারপর শহরের সীমা শেষ, শুরু হয় ছড়ানো ওক চারার জঙ্গল, তারও পরে একটা বিশালাকার ওকের ঝাড়—চমৎকার গিরিখাতের ওপর ঝুঁকে পড়া। এরই ভেতর দিয়ে একটা ছোট ঝলমলে সোঁতা এঁকেবেঁকে গেছে। পার্কের মতোই ছিমছাম খানিকটা, একটা যেন শহুরে গ্রাম্যতা যার প্রমাণ মিলছে বনভোজনকারীদের বাতিল কাগজ আর মোচড়ানো খাবারের টিন দেখে। এই সোঁতাটা, এবং আরো নিচের দিকে সোঁতার ছদ্ম-আরণ্যক বনভূমি আর নতস্থানগুলোতে অবিচলিত চিত্তে ঘোরাঘুরি করে দীপ্তিময়ী আলভারিতা। বেহুমান সরীসৃপটার ভ্রমণ পথের চিহ্ন ও একজায়গায় পেয়ে গেল—ছড়ানো মিহি বালুর ওপর। টাটকা জলের ধারা তাকে প্ররোচনা দিতে বাধ্য; বেশি দূর যেতেই পারে না সে।

সে যে হাতের কাছেই আছে সে-বিষয়ে ও এত নিশ্চিত যে ভাবল এখানেই একটু জিরিয়ে নেবে একটা বিশাল লতার বাঁকে। লতাটা একটা দানবাকৃতি এল্‌ম্‌গাছ থেকে পাকিয়ে নেমে এসেছে। ওটার কাছে পৌঁছোবার জন্য পথ ছেড়ে কিছুটা দূরে একটা খাড়া এবড়ো-খেবড়ো ঢাল ধরে ওপরে উঠল। ওকে ঘিরে ওকের চারা যেমন ঘন তেমনি উঁচু। দেরিতে-ফুল-ফোটা একটা বাটামা গাছ তার হলদে পাঁপড়ি থেকে মিষ্টি নাছোড়বান্দা সুবাস ঢালছে। খাতের নিচের দিকে ঝিরঝিরিয়ে বইছে মাতাল হাওয়া, ভিজে খসে-পড়া পাতার স্বাদে তা বিষণ্ণ।

আলভারিতা টুপি খোলে, চুলের ভারাক্রান্ত গোছ আলগা ক'রে এবার ধীরে ধীরে দুটো লম্বা কাল্‌চে বেণী পাকাতে শুরু করে।

পাঁচ ফুট দূরে, চিরসবুজ গুল্মের একটা মোটা ঝাড়ের অস্পষ্ট অন্ধকারে, হীরার মতো জ্বলজ্বলে দুটো ছোট চোখ একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। দেহ পাকিয়ে শুয়ে আছে কুকু, বিশাল পাইথন;— কঠিন আঁশের মুখ, বিভক্ত ঠোঁট, আর এগারোফুট দীর্ঘ বিচিত্র বহুবর্ণ উজ্জ্বল চামড়ার অসামান্য কুকু। মনিবানীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে পাইথনটা, কিন্তু উপস্থিতির সামান্য পরিচয়ও দিচ্ছে না আওয়াজ বা নড়াচড়া করে। হয়তো জাঁকালো পলাতকটি আগেই টের পেয়েছে

সে ধরা পড়বে, তবু গাছপাতার আড়ালে শুয়ে কল্পনা করছে পলায়নের আনন্দটা কত দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। ওই গরম ধুলোভরা গাড়ির পর, এইভাবে শুয়ে থাকা যে কত মজার! নাকে আসে বয়ে-যাওয়া জলস্রোতের গন্ধ, শরীরে মাটি আর পাথরের মনোরম আঘাত অনুভব করা! শিগ্‌গির, খুব শিগ্‌গিরই রানী তাকে পেয়ে যাবে, আর সেও রানীর স্পর্ধিত হাতের মধ্যে কেঁচোর মতো অক্ষম হয়ে ফিরে যাবে সেই সরু ঘরটার অন্ধকার সিন্দুকে—সরু ঘর যেটা চাকার ওপর চলে।

হঠাৎ নিচে থেকে পাথরের নুড়ির ওপর পায়ের চাপের একটা শব্দ শুনতে পায় আলভারিতা। মাথা ঘুরিয়েই সে দেখতে পায় বড়সড়ো চেহারার এক কালো মেক্সিকানকে। বেপরোয়া শয়তানের মতো ভাবভঙ্গি, অলক্ষুণে নির্বোধ চোখে নির্নিমেষ লক্ষ্য করছে ওকে।

আলভারিতার ঠোঁটের মধ্যে পাঁচটা চুলের-কাঁটা গোঁজা, তারই ফাঁক দিয়ে যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল ও,—'কী চাই তোমার?' চুলের বিনুনি ওর সমানে চলছে, পরিষ্কার বিদ্রূপ ওর চোখে। মেক্সিকানটা ওর দিকে তাকিয়েই থাকে, অসমান সাদা দাঁত বের করে হাসে।

'আমি তোমায় দুঃখু দেব না, সেনোরিটা'—বললে লোকটা।

'সে তোমার দেবার সাধ্যই বা কী!' জবাব দিলে রানী, একটা সদ্য শেষ করা মোটা বেণী পেছনে ঠেলে দিয়ে—'কিন্তু তোমার সরে পড়াই বরং ভাল হত, তাই না?'

'দুঃখু দেব না— না, না। তবে বোধহয় একটা 'বেসো'—একটা ছোট্ট চুমো যাকে বল—নিতে পারতে?'

লোকটা আবার মুচকি হেসে, ঢালু জায়গাটা বেয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে। আলভারিতা চট্‌ করে নিচু হয়ে নারকোল-সাইজের একখানা পাথর হাতে তুলে নিল।

তর্কাতীত হুকুমের কণ্ঠে বললে, 'কেটে পড়, জলদি, কালো ভালুক!'

মেক্সিকানের কালো চামড়ায় অপমানের জ্বালা ধরে।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে আগুন ছোঁড়ে, 'আরে! স্পেনের বিবি। আমি নিগ্‌-রো নই! শয়তান টুনি-মাছ, এর জন্য তোকে মূল্য দিতে হবে!'

এবার সে দ্রুত দু'ধাপ ওপরে উঠে আসে, কিন্তু পাথরটাও তো দুর্বল হাতে ছোঁড়া হয়নি—সেটা সোজা গিয়ে লাগল তার বুকে। টলতে-টলতে পেছিয়ে নেমে যায় লোকটা এক পাশে ঘুরে, আর তখনই অন্য একটা দৃশ্য দেখে তার মাথা থেকে মেয়েটির চিন্তা বিলকুল উপে যায়। আলভারিতা চোখ ঘুরিয়ে দেখতে যায় কী-এমন জিনিসটা যা লোকটার সব আগ্রহ ভেস্তে দিল। কুড়ি গজ দূরে,

পথ ধরে আসছে একটি ভদ্রলোক, লালচে-বাদামি কোঁকড়া চুল, রোদপোড়া মসৃণ-কামানো মুখখানা একটু বিষণ্ন। মেক্সিকানটার কোমরে আঁটা একটা পিস্তল-বেল্‌ট, যার দুটো খাপ শূন্য। তার ছ'ঘরা পিস্তল দুটো সে ছেড়ে এসেছে—সম্ভবত সুন্দরী পাঞ্চার খোলাঘরে। আরো বেশি সুন্দরী আলভারিতাকে এপথে আসতে দেখে ওর পেছু নিতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিল পিস্তলের কথা। স্বভাববশেই হাত-দুটো তার খাপের দিকে ছোটে, কিন্তু অস্ত্র উধাও দেখে এবার সে হাল-ছেড়ে-দেবার সবাক ল্যাটিন ভঙ্গিতে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দেয় আর দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মতো। ওর অবস্থা দেখে আগন্তুক তার দুটো রিভলবারসমেত নিজের বেল্‌টটা খুলে ছুঁড়ে দেয় মাটিতে, আর এগুতেই থাকে ওর দিকে।

চোখে ঝিলিক্ তুলে আলভারিতা চাপা গলায় বলে, 'চমৎকার!'

সাহস সম্পর্কে বব বাক্‌লের এক উদ্ভট সংস্কার, ওর ভাবপ্রবণ বিবেক সেটাকেই নিজের ভীরু স্নায়ুর ওপর চাপায়। তারই বশে ও বন্দুক-টন্দুক ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এল দুশমনের কাছে। এদিকে সেই হীন ভয়ের পুরনো অবধারিত বমি ভাবটা তার দেহ যেন ঘুলিয়ে দিচ্ছে। রুদ্ধ নাসাপথের ফাঁক দিয়ে তার নিশ্বাস সাঁইসাঁই আওয়াজ তুলছে। পা-দুটো যেন ভারী তামার থাম। ধুলোর মতো শুকনো জিভ। ওর রক্ত-জমা হৃৎপিণ্ড দুরদুর করে পাঁজরায় আঘাত করে। গরম জুনমাসের দিন হয়ে দাঁড়ায় ভ্যাপ্‌সা নভেম্বর। কিন্তু তবু সে এগোয়, একটা বাধ্যতামূলক অহঙ্কারের তাড়নায়—সে অহঙ্কার প্রাণপণে যুঝছে ওর কাপুরুষ দেহের বিরুদ্ধে।

দু'টো লোকের মধ্যে দূরত্ব ধীরে ধীরে কমে এল। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে মেক্সিকানটি, সবুর করছে। যখন মোটে পাঁচটি গজের পার্থক্য ওদের মধ্যে, ওপর থেকে হঠাৎ এক রাশ আলগা পাথরের নুড়ি খরবর করে ঝরে পড়ল রেঞ্জারের পায়ের কাছে। সহজাত সতর্কতাবশে সে ওপরের দিকে মুখ তুলে চাইল। একজোড়া কালোচোখ, দীপ্ত অথচ নরম, আগুনের মতো তবু স্নিগ্ধ, ওর চোখের সঙ্গে মিলল এবং নিবিষ্ট হয়েই রইল। রিও ব্রাভো অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াতুর আর সবচেয়ে দুঃসাহসী হৃদয় একটা নীরব দুর্জ্ঞেয় বার্তা বিনিময় করেছে। আলভারিতা এখনো বৃক্ষলতার ভেতরেই বসে, বুক-সমান উঁচু ওক চারার ওপর দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে সামনে। ওর এক হাত বুকের ওপর। একটা কালো মোটা চুলের বেণী কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক, আর মুখখানা বোধহয় বিস্ময়েই দীপ্ত—অগাধ ও বিপুল বিস্ময়। বাক্‌লের চোখের ওপর ওর চোখদুটো নিবদ্ধ। জাদু যে কীসের সূক্ষ্ম মাধ্যমে ঘটে গেল তা যেন কেউ প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে না যান। বিজলির ঝলকে যেমন দুটি বিপরীত মেঘের মধ্যে সমভার বণ্টিত হয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, সেই রকম ওই চোখের চাউনিতেই

মানুষটি পেয়ে গেল পৌরুষের পরিপূরক, আর মেয়েটি মেনে নিল তার ক্ষতিপূরণে আরো ঐশ্বর্য—নারীর মাধুর্য।

মেক্সিকানটি হঠাৎ যেন সচকিত হল। তার উদাসীন প্রতীক্ষার ভঙ্গিতে বদল ঘটিয়ে চট্ করে নিজের বুটের গোড়া থেকে টেনে বের করল একটা লম্বা ছোরা। বাক্‌লে নিজের টুপিখানা এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে একবার হো-হো করে হেসে উঠল—যেন ফুর্তিবাজ কোনো স্কুল-ছাত্রের খেলা হচ্ছে। তারপর খালি-হাতেই একটা ক্ষিপ্র লম্ফ দিল, আর গার্সিয়াও বিন্দুমাত্র ত্রুটি না দেখিয়ে তার মোকাবিলা করল।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি লড়াইটা শেষ হল যে রেঞ্জারের তুঙ্গে-ওঠা যুদ্ধের খোশমেজাজটাই যেন খানিকটা ম্লান হয়ে গেল। গতানুগতিক ধারায় নিচের দিকে আঘাত না হেনে, মেক্সিকানটা তার ছোরা সামনে রেখে সোজাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাক্‌লেও অনিশ্চিত বিপজ্জনক সুযোগটাই নিল, চেপে ধরল তার কব্‌জি, পুরোপুরি দৃঢ় মুষ্টিতে। তারপর সে ঝাড়ল তার খাঁটি স্যাক্সন কায়দায় এক-ঘায়ে বেহুঁশ করা ঘুষি—মুষ্টিহীন ল্যাটিন জাতের পক্ষে যা সর্বদাই করুণ মর্মান্তিক। গার্সিয়া অচেতন হয়ে পড়ে গেল, মাথাটা এক ঝাড় কাঁটা গাছের নিচে রেখে। রেঞ্জার আবার চোখ তুলে চাইল সর্পকুলের রানীর দিকে।

আলভারিতা হাঁচড়েপাঁচড়ে পথে নেমে আসে।

রেঞ্জার বলল—'ঠিক এই সময়টাতেই এদিকে এসে পড়েছিলাম, তাই রক্ষা। আমি বড় খুশি।'

আলভারিতা কলধ্বনি করে—'এমন....এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল লোকটা।'

গুল্ম ঘাসের নিচে পাইথনটার দীর্ঘ মৃদু হিসহিস শব্দ ওরা শুনতে পায়নি। জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত প্রাণী তো, তাই নিঃসন্দেহেই অপমানের আপসোস জানাচ্ছে—এত কাল এই কম্পমানা লাজ-রাঙা মনিবানীর কাছে গোলামি করতে হল, অথচ সে ভেবেছিল উনি কত শক্তিমতী, ক্ষমতাময়ী আর ভয়ংকরী।

আস্তে, ধীরে, ওরা চলতে শুরু করে। রেঞ্জার তার হাতিয়ারের কোমরবন্দটা তুলে নেয়। একটা চমৎকার ভীরু ভঙ্গি করে মেয়েটি তার প্রকাণ্ড পঁয়তাল্লিশ বোরের পিস্তল দুটোয় একটু আঙুল লাগিয়ে দেখতে চায়, আর 'ওঃ' 'আঃ' করে বিস্ময়ে জানায় সদ্যোজাত, কমনীয় লজ্জায়।

গিরিখাতের এলাকায় আঁধার নেমে আসছে। জমির কিনারায় যেখানে নদীর পাড় সহসা নেমে গেছে, সেখানে ওরা দেখতে পায় বাইরের পৃথিবী এখনো অস্তগামী সূর্যের গোধূলি আভায় আপ্লুত।

একটা চীৎকার—একটা কানফাটানো ভয়ের আর্তস্বর আলভারিতার কণ্ঠে। পেছন দিকে কুঁকড়ে সরে যায়, আর বাক্‌লের সদাপ্রস্তুত আগলে-রাখা হাতখানা ওকে

আশ্রয় দেয়। কী এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক যা 'চিরদিন পরোয়াহীন' রানীর রাজত্বের অবসানের মুখে এসে দাঁড়াল?

পথের এপাশ থেকে ওপাশে গুটিশুটি চলেছে একটা শুঁয়োপোকা—কুৎসিত, রোঁ-ওয়ালা একটা দু'ইঞ্চি-লম্বা শুঁয়োপোকা! সত্যি কুকু, এবার তুমি প্রতিশোধ নিলে বটে। এইভাবেই সিংহাসন ত্যাগ করলেন সর্পকূলের রানী—"রানী দীর্ঘজীবী হোন্'।

An Afternoon Miracle. এভ্‌রিবডি'স, ১৯০২

মফস্বলবাসীর সংগ্রাম

আজও শহরের ছন্নছাড়া উপান্তে একটা বিশেষ রাস্তার সামনে ট্রাম গাড়ি থামাতে ব'লে লরেন্স হলকোম্ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বছর চল্লিশ বয়েসের সুপুরুষ হলকোম্ একজন উঠ্‌তি ব্যবসায়ী, সমাজে তার উচ্চ প্রতিষ্ঠা, মেলামেশা। আরো পাঁচ মাইল এগিয়ে গেলে—রাস্তার ওই একই গাড়ির লাইনে ওর নিজের আরামদায়ক শহরতলির বাড়ি। আজকাল অবশ্য প্রায়ই ও এ-রাস্তার মুখে নেমে পড়ছে।

একজন নিয়মিত যাত্রীর দিকে চোখ টিপে, কনডাকটর মাথা কাত করে হলকোমের প্রস্থানপথের দিকে ইশারা করে মন্তব্য করে, 'ব্যাপারটা বেশ নিয়মিতই ঘটছে আজকাল।'

হলকোম্ সাবধানে পা ফেলে পাশের একটা এবড়োখেবড়ো উৎরাই গলি ধরে। উশকুখুশকু চ্যাংড়া ছেলের ভিড় সেখানে, পরিত্যক্ত টিনের টুকিটাকি জিনিস বাধার সৃষ্টি করে। একটা ছোট কুটির-বাড়ির সামনে দাঁড়াল সে। এক টুকরো পাথুরে আঙিনা ঘিরে বেড়া, চারদিকে কয়েকটা বেঁটেখাটো গাছ ছায়া দেয়। মধ্যবয়েসী এক মোটাসোটা মহিলা দরজার এক পাশে বড় গামলার মধ্যে কাপড় কাচাকাচি করছিলেন। তিনি ঘুরে তাকালেন। চিনতে পেরে একটা মোটা হাসিও দিলেন।

'শুভ সন্ধ্যা, মিঃ হলকোম্, আবার এলেন বুঝি? কেটিকে ভেতরেই পাবেন স্যর।'

'ওকে আমার হয়ে বলেছিলেন তো আপনি?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল হলকোম্, 'আপনার কথামতো আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিলেন তো, যাতে ওর সম্মতিটা পাই?'

'নিশ্চয়, সে চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু স্যর, জানেন তো মেয়েরা চিরকাল মেয়েই রয়ে যাবে। যত বেশি ওদের সাদাসাদি করবেন ততোই [illegible] গুঁয়ে হয়

উঠবে। যদি কারুর সাধ্যি থাকে তো সে আপনারই নিজের আরজিতে। আমার আশা আপনিই পারবেন, কারণ আমি ওকে বলিছি স্যর, আপনার চেয়ে ভাল প্রস্তাব ও আর কক্ষনো পাবে না কারুর থেকে। মেয়ে তো বড় ভালই, আর রান্নাঘর থেকে বসার ঘর সব জায়গাতেই ওর হাতটা ছিমছাম, কোনো কালেই কোনো দোষ নেই, শুধু হয়তো একটু বেশিরকম নাচগান, কুঁচি পোশাক আর চুলের ফিতে ভালবাসে, তা ওর বয়েসে সেটা তো স্বাভাবিক—সুন্দর দেখাতে ওসব চাই, আমি ওর মা হয়েই একথা বলি। মিঃ হলকোম্, আপনি আবার কেটির সঙ্গে কথা বলুন না! হয়তো এবার আপনার ভাগ্য খুলবে, যদি-না অবিশ্যি এই বুনো ড্যানি কন্‌লানটা আবার ওকে ভুজুং ভাজুং বুঝিয়ে থাকে আপনার খেলাপে।'

সামান্য ফ্যাকাশে হয়ে হলকোম্ পাশ ফেরে, ওর ঠোঁটজোড়া মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে চেপে বসে।

'এই কন্‌লান লোকটার কথা আগে শুনেছি। কেন সে এর মধ্যে বাগড়া দেয়? কেন সে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়? কেটি আর ওর মধ্যে কিছু আছে নাকি? কেটি ওকেই কথা দেয়নি তো?'

রেলের ইঞ্জিনের মতো ফোঁস্ করে নিশ্বাস ছাড়েন মিসেস্ ফ্লিন। তক্তার ওপর ভিজে কাপড়ের একটা বাড়ি পড়তেই ভিজে একাকার হলকোম্ ছ'ফুট দূরে ছিটকে যায়।

'কোন্ মেয়াটির মনে কী আছে তা আমাকে জিজ্ঞেসাও করবেন না, আমাকেও কিছু মিছে কথা বলতে হবে না। মিঃ হলকোম্, আপনি নিজে যা জানেন তার চেয়ে বেশি ওর নিজের মা'ও বলতে পারবে না।'

কুটিরের ভেতরে ঢোকে হলকোম্। কেটি ফ্লিন জামার আস্তিন গুটিয়ে ফুরফুরে মসলিনের একটা পোশাক ইস্তিরি করছিল। হলকোমের নিজস্ব চক্র থেকে নেমে এই নিম্নতর কক্ষের তারকার কাছে আসা নিয়ে যত সমালোচনা, সব ভুলে যেতে হয় এই মেয়েটিকে একবার চোখে দেখলে। সব সমস্যা মিটিয়ে দেবার আর প্রত্যয় জাগাবার মতো ওর এই রূপ। কালচে আইরিশ চোখ, ঘন কালো চক্‌চকে চুলের মস্ত বেণী, রাঙা ঠোঁট যা কখনো টোল খেয়ে কখনো বঙ্কিম হয়ে মালিকের মনের প্রতিটি মেজাজ বোঝায়, সুঠাম ও লাবণ্যময় দেহশ্রী, যা দেখলেই মনে হয় অপর্যাপ্ত জীবন আর কর্মচাঞ্চল্যে ভরা—এমন কেটি ফ্লিনের সঙ্গ যে সবাই চায়, লড়াই করেই পাবার মতো সে।

ও ইস্তিরি করার সময় ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় হলকোম্, ওর সুগোল হাতের মসৃণ ত্বকের নিচে দোলায়মান পেশীর সাবলীল খেলা লক্ষ্য করে।

একটা মিনতিমাখা কোমলতা দিয়ে, কণ্ঠস্বরে কোনো বিশেষ উদ্বেগ চেপে

রেখে সে বলে—'কেটি, আমি আমার জবাবটা পেতে এসেছি। যা নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি, সে-সব আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি জান তোমাকে পাবার জন্য আমি কত অধীর। তুমি আমার অবস্থা. আমার প্রতিষ্ঠা জান, আর এও জান সব রকম সুখ, প্রত্যেকটা অধিকার যা তুমি চাইবে তাই পাবে। কেটি, বল 'হ্যাঁ', তাহলে আজ আমি এই শহরের সবচেয়ে ভাগ্যবান্ মানুষ হব।'

ঠুং করে একটা ধাতব আওয়াজ তুলে কেট্ ইস্তিরিটা নামিয়ে রাখল। কনুইদুটো রাখল কাঠের তক্তার ওপর। ওর বড় বড় নীল-কালো চোখ, আইরিশ ধরনে, কৌতুকের দীপ্তি থেকে চিন্তিত বিষণ্ণতায় ডুবে গেল।

'ও মিঃ হলকোম্, জানি না আমি কী বলব। আমি জানি আপনি আমার ওপর সহৃদয়, আমার আশার অতিরিক্ত কোনো সুগৃহই আমাকে দেবেন।। আমি তো "হ্যাঁ" বলতেই চাই—বাস্তবিকই "হ্যাঁ" হয়তো বলতামও। আমি আপনাকে তা বলব বলেই স্থির করেছিলাম, কিন্তু ওই ড্যানি যে —এমন আপত্তি করছে।'

আবার ড্যানি! হলকোম্ অধৈর্যভাবে ভুরু কুঁচকে ঘরের এপাশ-ওপাশ পাইচারি করে।

'এই কন্‌লোন লোকটা কে, কেটি?' জিজ্ঞেস করে সে, 'যতবারই তোমার সম্মতি প্রায় পেতে চলি, ততবারই এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। সে কি গায়ের জোরের সুবাদেই এ বাড়িতে তোমায় চিরকাল টিকিয়ে রাখতে চায়? তুমি তার কথা শোনো কেন?'

ছোট্ট, আদরে-বিগড়ে-যাওয়া শিশুর মতো গলায় কেটি বলে, 'ও যে আমাকে চায়।'

কর্তৃত্বের সুরে হলকোম্ বলে, 'আমিও তো তোমাকে চাই! এই প্ররোচনার জিভওয়ালা আশ্চর্য মিঃ কন্‌লানকে যদি দেখতে পেতাম, তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে তার সঙ্গেই তর্ক করতাম।'

একটু যেন দুষ্টুমি করেই কেটি বলল, 'ও এ-শহরের চ্যাম্পিয়ন লড়াকু, দু'মন ওজনের বিভাগে।'

'ও, তাই বুঝি! দেখ, ওতে আমি ঘাবড়াই না কেটি। সত্যি বলতে, আমি খুব নিশ্চিত না হলেও ক'টা রাউণ্ড তো লড়তে পারবই তার সঙ্গে, তুমি পুরস্কার হিসেবে থাকলে; অবশ্য মুষ্টিযুদ্ধের ব্যাপারে খানিকটা মরচে ধরে গেছে আমার।'

'হুশ্! ওই তো আসছে সে', চেঁচিয়ে ওঠে কেটি, চোখদুটো যেন ওর শঙ্কিত, গোল-গোল।

দরজার বাইরের দিকে তাকাল হলকোম্, দেখল একটি যুবক গেট থেকে ভেতরে আসছে। বেশ গদাইলস্করি চালে হাঁটছে। মুখখানা মসৃণ কিন্তু নিষ্ঠুর,

তবে খারাপ নয়। এক চোখ ঢেকে একটা টুপি টেনে দিয়েছে। বাড়ির ভেতরে এসে কামরাটার দরজার সামনে দাঁড়াল। ওই কামরাতেই রয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কলহের বিষয়টি।

'আবার আমার ছুঁড়িটার পেছনে লেগেছ, অ্যাঁ?'—খস্‌খসে অলক্ষুণে গলায় সে গজ্‌গজ্ করে— 'এ আমি পছন্দ করি না, বুঝেছ? সে কথা ওকেও বলেছি, তোমাকেও বলছি। ও এখানেই থাকবে। শুধু দশ সেন্ট বাজির ওপরেই তোমার বদনা ফাটিয়ে দেব, বুঝতে পেরেছ?'

'ব্যক্তি-বিষয়ক তর্ক' পরিহার করার চেষ্টায় হলকোম্ বলতে শুরু করে, 'দেখুন মিঃ কন্‌লান, যুক্তির কথা শুনুন। কেটিকে নিজের পছন্দের ওপর ছেড়ে দেওয়াই তো ন্যায়সঙ্গত। ও যা চায় তা করতে না দেওয়াটা কি উপযুক্ত কাজ? আপনি যদি বাধাদান না করতেন তো কবেই আমি ওকে পেয়ে যেতাম।'

মিঃ কন্‌লান এতে ভোলবার নয়, শর্তের মাত্রা নামিয়ে বলে, 'পাঁচ সেন্ট বাজি ধরলেই তোমার বদনা উড়িয়ে দেব।'

হলকোমের চোখে একটা মরীয়া সংকল্পের ঝিলিক জাগে। ও এখন একটাই পথ দেখতে পায় নিজের রাস্তা থেকে বাধা সরানোর।

মৃদু আর দৃঢ়স্বরে বলে, 'আমি শুনেছি আপনি একজন লড়াকু। আপনার মন বোধহয় সব প্রশ্নের সমাধান খোঁজে শারীরিক সংঘর্ষের মধ্যে। এখন কন্‌লান, আমি কোনো মারামারির লোক নই, তবে তিন মিনিটের মধ্যে আপনার সঙ্গে একটা এস্‌পার উস্‌পার লড়াই করতে রাজি, দেখতে চাই কে মেয়েটাকে পায়। যদি আমি জিতি, সে আমার সঙ্গে যাবে। আপনি জিতলে নিজের মরজিতে যা করবার করবেন, আমি আর ওকে বিব্রত করব না। আপনি রাজি?'

ড্যানি কন্‌লানের কঠিন নীল চোখে একটা আকস্মিক তারিফের দৃষ্টি। রূঢ় সারল্যের সঙ্গেই মেনে নিল, 'তুমি সাচ্চা লোক আছ। আমি ভাবতে পারিনি তুমি এই রকম—তুমি ঠিক লোক। মোক্ষম ন্যায্য প্রস্তাব দিয়েছ, আমি তোমার সঙ্গে একমত। শর্ত মাফিক যা ফলাফল হবে মেনে নেব। এবার এস, তোমাকে দেখাই কোথায় লড়াই হবে। তুমি সাচ্চা লোক।'

কেটি বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ড্যানি তাকে চুপ করিয়ে দেয়। হলকোম্‌কে সে নিয়ে যায় টিলার নিচে একটা গভীর খাতে, দৃষ্টির আড়ালে। গোধূলির ফাঁকেই সবে রাতের আঁধার নেমে আসছে। ওরা ওদের কোট আর টুপি এক পাশে রাখে। লরেন্স হলকোমের নিয়মে-বাঁধা অস্তিত্বের মধ্যে এ এক পরিস্থিতি বটে। সে ভূসম্পত্তি ও বণ্ডের দালাল, প্রশ্নাতীত আচরণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যবসায়ী! আর একটা পেশাদার মস্তানের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে নোংরা বস্তিতে, একজন আইরিশ ধোপানীর মেয়ের জন্য!

লড়াইটা হল সংক্ষিপ্ত। যদি বেশিক্ষণ ধরে চলত, তা'হলে হলকোম্‌ই হারত,

কারণ দীর্ঘ অনভ্যাসের দরুন ওর বুকের দম আর প্রণালীজ্ঞান, দুটোরই অবনতি ঘটেছে। তাই শুরু থেকেই ও চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর্যায়টাকে টেনে এনেছিল। বলা কঠিন কীসের জোরে ও এক একদা-দু'মনী চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে লড়াই করে জিতল। ওর অনুকূলে একটা কারণ ছিল, সম্প্রতিকালে ফুর্তি-মাতলামোর ফলে মিঃ কন্‌লানের স্নায়ু ও বিচারবুদ্ধি বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েই ছিল। অন্য কারণটা বোধ হয়, জয়লাভের উদগ্র কোনো প্রেরণায় চরম শক্তিপ্রয়োগের উত্তেজনা—এ প্রেরণা যেন গ্ল্যাডিয়েটরের সহজাত বুদ্ধির চেয়েও প্রখর, বীরদের নানা মহান আদর্শের চেয়েও গভীর, নিছক প্রেমের সঞ্জীবনী প্রভাবের চেয়েও বেশি গুরুত্বের। তিন নম্বর, দৈব আনুষঙ্গিক কারণটা অবশ্য নিঃসন্দেহে দু'মনী চ্যাম্পিয়নের উদ্গত চিবুকের ওপর আচম্বিত ঘুষিখানা। এরই ফলে যোদ্ধাটি খালের ময়লা কাদায় পড়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি, আর হলকোম্ এদিকে ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ধীরে সুস্থে সময় গুনেছে দশ অবধি।

ড্যানি অবশেষে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, সত্যিকারের খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখায় সে।

বললে, 'তুমি খাঁটি লোক। তবে যদি রাউণ্ডের হিসেবে আমরা লড়তাম, তাহলে ফলটা দাঁড়াত অন্য রকম। মেয়েটা তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছ? আমি বাবা সিধে বিচারের লোক।'

ওরা ওপরে উঠে কটেজ-বাড়িতে আসে।

হলকোম্ বলল, 'নিষ্পত্তি হয়ে গেল। মিঃ কন্‌লান নিজের আপত্তি তুলে নিচ্ছেন।'

ড্যানি বললে, 'সিধে সমাধান হয়ে গেল। উনি সাচ্চা মানুষ।'

হলকোমের থুতনিতে শুধু একটু আঁচড় আর সামান্য লাল দাগ—ড্যানির বাঁহাতের একটা জোরালো চামড়া-ঘেঁষা 'আপারকাট' থেকে। ড্যানি তার নিজের শাস্তির চিহ্নও রেখেছে। একটা চোখ প্রায় বোজা; ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে।

কেটি সত্যিকারের নারী। এরা কখনো সঙ্গেসঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ বিজয়ীর মাথায় মুকুট চাপিয়ে তাদেব অনুগ্রহ দেখায় না। প্রথমে দেখাতে হবে সহানুভূতি। বিজয়ীকে নিজের পালার জন্য সবুর করতে হবে। পুরস্কার তার আসবেও। কেটি ছুটে যায় বিজিত চ্যাম্পিয়নের কাছে, তাকে সান্ত্বনা দেয়, জখমগুলো তদারক করে। হলকোম্ দাঁড়িয়ে থাকে, প্রশান্ত, হাস্যমুখ,—কোনো ঈর্ষা নেই তার।

মাথা সোজা রেখে দীপ্ত চোখে কেটিকে বলে, 'আগামী কাল।'

'তুমি চাইলে আগামী কালই!' জবাব দেয় কেটি।

পরিত্যক্ত টিনকৌটোগুলোর ভেতর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে-ফেলে এবড়ো-খেবড়ো

পাহাড়ি চড়াই পথে ওপরে ওঠে হলকোম্। বিজলিবাতি সমুজ্জ্বল যাত্রী ভিড়ে-ঠাসা ওর গাড়িটাও এসে পড়ল। পেছনের দিকের পাদানিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রইল সে। পাশেই দেখল ওর বন্ধু আর প্রতিবেশি ওয়েদারলি-কে, সেও শহরতলিতে একটা বাড়ি বানিয়েছে ওর বাড়ি থেকে কয়েকটা চত্বর ছাড়িয়ে।

গাড়ির আওয়াজের ওপর গলা তুলে ওয়েদারলি চেঁচাল, 'এই যে, হলকোম্! এখানে কোনো জমি-টমির খোঁজ করছিলে নাকি? মিসেস্ হলকোম্, বাচ্চা-কাচ্চারা সব কেমন আছে?'

'খুব ভাল', চিৎকার করে জবাব দিলে হলকোম্, 'অন্তত সকালে কাজে যাবার সময় তেমনই তো দেখেছি। তা তোমার পরিবারের সবাই ভাল?'

'এই, আছে একরকম। মফঃস্বলে যা সব ঝামেলা আর কি! কাজের লোকরা অতদূরে যেতে চায় না, দোকানদাররা মফস্বলে মাল ডেলিভারি দিতে আপত্তি করে, গাড়ির ব্রেকডাউন, এই সব। তা তুমি এত খুশি কেন? আজ একটা দাঁও মেরেছ বুঝি?'

হলকোমের মুখে পরম আনন্দের আভাস। এক হাতে থুতনির ছোট আঁচড়টায় আঙুল বোলাচ্ছিল। মাথাটা ঝোঁকাল ওয়েদারলির কানের দিকে।

'আরে বব্, তোমার মনে আছে সেই আইরিশ মেয়েটাকে, কেটি ফ্লিন? স্প্যাফোর্ডদের বাড়িতে তো অনেক দিন ছিল?'

'তার কথা তো শুনেছি,' বললে ওয়েদারলি, 'ওদের ওখানে যতদিন ছিল, একদিনও নাকি কামাই দেয়নি। ওসব আষাঢ়ে গল্প আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না।'

'ওটাই কিন্তু ঘটনা। বুঝলে, আজ তাকে বান্নার কাজে বহাল করলাম। কালই যাবে আমাদের বাড়িতে।'

'বেড়ে ভাগ্য হে তোমার—মোলো যা!'— চেঁচায় ওয়েদারলি, গলার স্বর আর হৃদয়ে তার ঈর্ষা, 'আরে, আমাদের চেয়েও চার ব্লক দূরে তো তুমি থাকো হে! তবে!'

The Struggle of the Outliers, 'এভরিবডিস্', ১৯০২

পেশাদারি গোপনীয়তা

অবকাশ ভোগী শ্রেণীর চিকিৎসক ডাঃ স্যাটারফিল্ড প্রিন্স তাঁর পকেটঘড়ি দেখলেন। বারোটা বাজতে পাঁচ। বারোটা বাজতেই শেষ হবে সকালের রুগি-দেখার পর্যায়—ওঁর সাজানো দপ্তরে তাদের বসবার সময়টা বাঁধা। ডাক্তারের যুবতী সহকারিণী ঠিক এই সময়টাতে প্রতীক্ষা-কক্ষ থেকে নিয়ে এল ওঁর ধনী ফ্যাশনদার পৃষ্ঠপোষক মহলের শেষ দর্শনার্থীটিকে।

ঘড়িটা হাতে ধরেই ডাঃ প্রিন্স ঘুরে দেখলেন। ওঁর আচরণে বিনয়, কিন্তু বোঝা যায় সাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত আর দ্রুত হবে বলেই তাঁর প্রত্যাশা। শেষ চিকিৎসাপ্রার্থী হলেন একজন মাঝবয়েসী মহিলা। দামি পোশাক, শান্ত সৌজন্যময় মুখমণ্ডল। কথা বলবার সময় মহিলার কণ্ঠস্বরে বেরিয়ে আসে দক্ষিণী উচ্চারণে টেনে-টেনে গানের মতো অস্পষ্ট সুর। উনি ধীরেসুস্থে ব্যাখ্যা করে বলেন আসলে উনি ডাঃ প্রিন্সের সাহায্য চান ওঁর মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে। সে এক অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাধিতে ভুগছে। ব্যারামটার পুরোপুরি লক্ষণগুলো তিনি (মেয়েলি ধরনেই) বোঝাতে চান, স্থির নিশ্চিতির সঙ্গে ব্যাধির মূল কারণ আর প্রকৃতি সম্বন্ধে ডাক্তারকে অবহিত করেন।

যে লক্ষণগুলোর কথা মহিলা—অর্থাৎ মিসেস্ গ্যালওয়ে র‍্যাঙ্কিন, বললেন তা এমন অদ্ভুত আর সৃষ্টিছাড়া যে ধারণা করতেই আশ্চর্য লাগে, এমন-কি বড়লোকি ব্যারামগুলোর উদ্ভট খামখেয়ালিতে অভ্যস্ত ডাঃ প্রিন্সও নিঃসন্দেহে হতভম্ব হলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে মিসেস্ র‍্যাঙ্কিনের মূল বিবরণটা এই:

উনি, মানে মিসেস র‍্যাঙ্কিন, কেন্টাকি প্রদেশের এক পুরনো পরিবারের লোক—যাঁদের পদবি বীল্। বীল্‌দের সঙ্গে আরেকটা ঐতিহাসিক বংশ র‍্যাঙ্কিনদের আজন্ম লড়াই। ও-রাজ্যের ইতিহাসে প্রায় এক শতাব্দী ধরে হিংস্রতম রক্তক্ষয়ী বিবাদ চলেছিল দুই পরিবারের মধ্যে। পর পর প্রত্যেকটা প্রজন্মই 'ঘৃণা আর যুদ্ধ' দুটোই জীইয়ে রেখেছিল পরস্পরের মধ্যে। এক সময় বলা হত, প্রকৃতি তাদের প্রবণতা ভালমতোই বুঝে নিয়েছিল বলে বীল্ আর র‍্যাঙ্কিনদের পৃথিবীতে পাঠাত কুকুর আর বেড়ালের মতো পরস্পরবিরোধী করে। তাই, চার প্রজন্ম ধরে একটানা লড়াইয়ের ফলে পাহাড়গুলোতে সার-বাঁধা বিন্দুর মতো জমে যায় দুই পরিবারের সমাধিস্তম্ভ। অবশেষে বিবাদের সব ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে লড়াইও শেষ হল, কারণ তখন দু'বংশের সরাসরি উত্তরাধিকারী রয়ে গেছে মাত্র দু'জন—একজন বীল্‌দের, আরেকজন র‍্যাঙ্কিনদের গোষ্ঠীর। উনিশ বছর বয়েসের এভালিনা বীল্, আর পঁচিশ বছর বয়েসী গ্যালওয়ে র‍্যাঙ্কিন। লড়াইয়ের শেষ

ডাঃ প্রিন্স তাঁর স্বভাব-গাম্ভীর্য আর পেশাগত মনোযোগ দিয়ে সমস্ত বিবৃতি শুনলেন, আর কথা দিলেন পরদিন সকাল দশটায় রোগীকে দেখতে যাবেন।

যথানির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ছোট বৈদ্যুতিক গাড়ি ঘুরে দাঁড়াল কেতাদুরস্ত মোটরগাড়ি আর দু'চাকার হ্যানসামগুলোর লাইনে—ওরাই মার্কিন দেশের মহার্ঘ আবাসগৃহগুলোর সামনে বাঁধানো-সড়কের ধার দিয়ে প্রতীক্ষা করে।

মিস্ আনাবেল র‍্যাঙ্কিন যখন ওদের সেরা-পছন্দ স্যুইটের উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করল, ডাঃ প্রিন্স তাঁর ঝক্‌ঝকে সাফ নাকচশমার ভেতর দিয়ে ওকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করলেন একটু। যুবতী মহিলার মুখে ও দেহে পূর্ণ স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য, পুরোদস্তর সৌন্দর্যের অবয়বরেখা তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু যখন তাকে হাঁটতে দেখলেন, তারিফের জায়গায় এল সমবেদনা। সামান্য দৌড়ে ভেতরে ঢুকেছে সে, একটু টাল খেয়ে আবার অসহায়ভাবে পা তুলে নিয়েছে টেরচা কোণে কাত হয়ে, আবার এগিয়েছে, ধাপে-ধাপে পা ফেলে পেছনদিকে গেছে। তারপর সামলে নিয়ে কৌশলে একপেশে ভঙ্গিতে ছুটে এসেছে একটা কাউচের কাছে। সেখানে বসে এবার সে জিরোয়—সুন্দরপানা মুখে গম্ভীর বিষণ্নতার ভাব নিয়ে।

ডাঃ প্রিন্স এবার তাঁর প্রশ্নমালা শুরু করলেন স্নিগ্ধ, আশ্বাসদায়ক, ভদ্র আচরণ দেখিয়ে—ওঁর এই আদবকায়দাই আকর্ষণ করে নানা পৃষ্ঠপোষককে, যাঁরা এসবের যথেষ্ট মর্যাদা দেন। মিস আনাবেল জবাব দেয় অকপটে, বয়েসের তুলনায় বেশ বুদ্ধির সঙ্গেই। মিসেস্ র‍্যাঙ্কিনের 'দ্বন্দ্ব' বিষয়ক তত্ত্ব নিয়েও সরাসরি আলোচনা হল। কন্যাটিও এ-ব্যাপারেই বিশ্বাস করে।

একটু বাদেই চিকিৎসক বিদায় নিলেন, বলে গেলেন আবার আসবেন এবং চিকিৎসা শুরু করবেন। তারপর উনি এ্যাভিন্যু ধরে ভোঁ করে চলে গেলেন, একটা পিচঢালা পাশের গলির চারটি দরজা পেরিয়ে এলেন ডাঃ গ্রাম্বল্টন মায়ার্সের দপ্তরে। ডাঃ মায়ার্স অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চলৎশক্তি বিকলন ও স্নায়বিক পীড়ার ব্যাপারে একজন মস্ত বিশেষজ্ঞ। দু'জন সেরা চিকিৎসক একটা প্রাইভেট কাম্‌রায় একান্তে বসলেন। জাঁদরেল ডাক্তার মায়ার্স টেনে বের করলেন শেরির বোতল আর এক বাক্স হাভানা চুরুট। পরামর্শ যখন শেষ হল দু'জনেই মাথা নাড়লেন।

মোটের ওপর সিদ্ধান্ত টানলেন মায়ার্স—'আসল কথাটা হল আমরা এর কোনো বিষয়েই কিছু জানি না। আমি বরং বলব, এখন লক্ষণ বুঝে চিকিৎসা চালিয়ে যান, যতক্ষণ না কিছু একটা নিজেই বেরিয়ে আসে; কিন্তু রোগলক্ষণও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

ডাঃ প্রিন্স চুরুটের ছাই ঝেড়ে তীর্যকভাবে ইঙ্গিত দিলেন, 'সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের লক্ষণের ওপরই রোগনির্ণয় হোক?'

কোনো ধরাছোঁয়ায় না গিয়ে বিশেষজ্ঞ বললেন, 'বড় কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু কেস্‌টা।'

ডাঃ প্রিন্স ঠিক চলে যাবার মুখেই মায়ার্স ফের বলে উঠলেন—'আমি বলি প্রিন্স... এই ... অনেক সময়, জানেন তো, যে-সব ছেলেপিলেরা ঝগড়া মারামারি করে তাদের আলাদা কামরায় বাখা হয়। এখন.... আপনার আপসোস হয় না ভেতর-পাজামার ফ্যাশনটা উঠে গিয়ে ক্ষতিই হয়েছে? একটু ভাগ করে—'

'কিন্তু ব্লুমার তো আজকাল নেই,' হাসলেন ডাঃ প্রিন্স, 'হাল ফ্যাশনটাও তো বজায় রাখতে হবে আমাদের!'

ডাঃ প্রিন্স সারারাত এ-যুগেব মার্কামারা বিজলি-বাতি জ্বালিয়ে তাঁর কেস্‌টা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর জ্ঞানাঞ্জনেও কাজ হয় না দেখে বাধ্য হয়ে র‍্যাঙ্কিনদের সামনে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দেন যা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় ভরা (রুগিদের কাছে এসব তিনি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যান সচরাচর) —অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তিনি সুবিধাজনক কৌশলের দিকে ঝুঁকছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একধাপ নিচে নেমে হিপ্নোটিজ্‌ম্‌ (সম্মোহন) দ্বারা চিকিৎসার প্রস্তাব করলেন।

আরেকটু চাপে পড়ে সেটা নির্দেশ হিসেবেই দিলেন এবং একদিন সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রোফেসর আদামিকে। পেশাদাব গোষ্ঠীব মধ্যে একমাত্র তাকেই পেয়েছেন যে সবচেয়ে খ্যাতিমান অথচ নিজেকে বিজ্ঞাপনে জাহিব করে না।

মিস্ আনাবেল নরমসবম বিষণ্ন মেয়ে, সহজেই প্রোফেসরেব প্রভাবের শিকার হল—নাকি বলব, 'চিকিৎসা-পাত্রী'। কী ধরনের ব্যারামের মোকাবিলা তাকে করতে হবে সে সম্বন্ধে ডাঃ প্রিন্স তাকে আগেই বুঝিয়ে শুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাই মানসিক দাওয়াইয়ের কারবারী গোড়াতেই অগ্রসর হল 'সাজেস্‌চন' (ধারণা-সঞ্চার, তার পেশাদাব ভাষায়) দিতে, আক্রান্ত অচেতন যুবতী মহিলার মনে এই সুদৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করতে, যে তার পীড়া অমূলক, আর তার চলৎশক্তির কোনো ক্ষতিই হয়নি।

সম্মোহনের ঘোর কেটে যাবার পর মিস্ র‍্যাঙ্কিন উঠে বসল, প্রথমে একটু হতভম্ব ভাব, তাবপর উঠে দাঁড়াল, তারপর কামরার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গেল—যেন দেবী ডায়ানার মতো সৌষ্ঠব, নিশ্চিতি আর স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। মিস আনাবেলের করুণ মুখ এখন আশা আর আনন্দে উদ্ভাসিত। মিসেস্ র‍্যাঙ্কিনের দক্ষিণী প্রবণতা, তাই খুশি হয়ে একটু কাঁদলেন সূক্ষ্ম লেসের রুমালে মুখ ঢেকে। মিস্ আনাবেল দৃঢ় নির্ভুল পায়ে হেঁটেই বেড়াচ্ছে, তা করতে দেহযন্ত্রের ওপর যে পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তা ওব আয়ত্তে। ডাঃ প্রিন্স মৃদুস্বরে প্রোফেসর আদামিকে অভিনন্দন জানান, তারপর এগিয়ে এসে চালিয়াতির ভঙ্গিতে নাক-চশমাটা মুছতে থাকেন হাসিমুখে। নিজের উচ্চ অবস্থানের দৌলতে সম্মোহককে একেবারে

পেছনে ঠেলে দেন। সে বেচারা আপাতত পশ্চাৎপটেই সন্তুষ্ট থেকে মনে-মনে হিসেব করে নিজের কাজের জন্য সাহস করে কত বড় 'বিল' সে শোভনতা বুঝে পেশ করবে, যখন আবার সামনে এসে দাঁড়াবে।

পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে দু'জন পেশাদার ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। চিকিৎসার সাফল্যে তারা খানিকটা উল্লসিত—একজনের পক্ষে সেটা গবেষণামূলক পরীক্ষা, অন্যজনের কাছে প্রদর্শনী মাত্র।

ওঁদের পেছন থেকে দরজা বন্ধ হতে, মিস্ আনাবেল তার স্বভাবত গম্ভীর বিষণ্ণ মেজাজে খানিকটা প্রসন্নতা ফিরে পেয়ে, বসল পিয়ানোর সামনে, আর সঙ্গে সঙ্গেই বাজাতে শুরু করে দিল চাঞ্চল্যময় 'মার্চের' সঙ্গীত। ওদিকে বাইরে, দু'জন ব্যক্তি লিফ্‌টের দিকে এগোতে গিয়েই শুনতে পেলেন মেয়েটির মুখ থেকে একটা আতঙ্কের আর্তনাদ, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ছুটে ফিরে এলেন। ওঁরা দেখলেন সে পিয়ানোর টুলে বসে আছে, একটা হাত এখনো পিয়ানোর চাবি টিপে চলেছে। অন্য হাতটা পেছনদিকে পুরোপুরি শক্ত করে বাড়ানো, আঙুলগুলো সজোরে কুঁকড়ে একটা গোলাপি চমৎকার ছোট মুঠো পাকানো। ওর মা ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছেন, তিনিও আতঙ্ক ও বিস্ময়ে যোগ দিয়েছেন। মিস্ র‍্যাঙ্কিন এবার টুল থেকে ওঠে। এখন শান্ত, তবু আগের মতোই হতাশ আর বিষণ্ণ।

নালিশের সুরে ও বললে, 'জানি না কী করে এটা হল। আমি বাজাতে শুরু করেছি, আর এ হাতটা সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ছিটকে গেল। অন্য হাতটা পিয়ানোর ওপর থাকলেও এটা যেন কিছুতেই পিয়ানোর কাছে থাকবে না।'

কামরার মধ্যে ছিল একটা পিং-পং টেবিল।

প্রফেসর আদামি একটা পথের হদিশ পাবার মতো সহর্ষে বলে উঠল, 'এক হাত খেলা হয়ে যাক্, মিস র‍্যাঙ্কিন?'

ওরা দুজন খেলল। অবাধ্য হাতটায় র‍্যাকেট ধরে মিস্ আনাবেল চমৎকার কায়দায় খেলেছে। ওটার ওপর তার দখল পুরোদস্তুর। প্রোফেসর র‍্যাকেট নামিয়ে রাখলেন।

বললেন, 'আরে! আমার কোটটার একটা বোতাম খুলে যাচ্ছে যে! দুর্গত আইবুড়োর এই দুর্ভাগ্য! মিস্ র‍্যাঙ্কিন, এক্ষুনি একটা ছুঁচ-সুতো দিতে পারবেন?'

একটু অবাক হলেও হেসে সায় দিয়ে, আনাবেল জিনিসগুলো এনে দিল পাশের ঘর থেকে।

'এবার ছুঁচে একটা সুতো পরিয়ে দেবেন দয়া করে?' বললে প্রোঃ আদামি।

কালো সিল্‌ক্ সুতোর দু'ফুট কামড়ে কেটে নেয় আনাবেল। যখন সে ছুঁচে সুতো পরাতে আসে তখনই প্রকাশ হয় গোপন তথ্যটা। সুতো নিয়ে যে-হাতটা এগিয়ে আসে ছুঁচ-হাতে-ধরা অন্য হাতটার কাছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভয়ানকভাবে

ছিটকে যায় অন্যদিকে। ডাঃ প্রিন্সই প্রথম বেদনাদায়ক আবিষ্কারটা ভাষায় প্রকাশ করলেন।

সুরেলা সান্ত্বনা-কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয় মিস্ ও মিসেস্ র‍্যাঙ্কিন, আমরা শুধু আংশিকভাবে সফলতা পেয়েছি। মিস র‍্যাঙ্কিন, ব্যাধিটা আপনার ... ইয়ে ছেড়ে—মানে এখন ব্যাধিটা ঢুকেছে আপনার বাহুদুটোর মধ্যে।'

নিশ্বাস ফেলল আনাবেল। 'আমার কপাল। তাহলে আমার একটা বীল্-হাত, আর একটা র‍্যাঙ্কিন-হাত? যা হোক, একবারে একটা হাতও ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে। আগে যেমন লোকের নজরে পড়ত এখন ততটা পড়বে না। উঃ কী বিরক্তিকর ওইসব লড়াই-ঝগড়াগুলো ছিল, সত্যি! আমার তো মনে হয় এসবের বিরুদ্ধে আইন করা উচিত।'

ডাঃ প্রিন্স প্রশ্নসূচক চোখে প্রোঃ আদামির দিকে তাকান। সে-ভদ্রলোক মাথা নাড়ল। বলল, 'আরেকদিন হবে। আমি অন্তত দু-তিনদিনের ফাঁক না দিয়ে কোনো নতুন শারীরিক অবস্থা পাকা করতে চাই না।'

অতএব, তিনদিন বাদে তাঁরা ফিরলেন, প্রোফেসরও মিস্ র‍্যাঙ্কিনকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণের বশবর্তী করল। বাহ্যত এবারেও পুরো সাফল্যই পাওয়া গেছে। মোহাবস্থা থেকে ও শান্তভাবেই জেগে উঠল, পূর্ণ পেশী-ক্ষমতা নিয়ে। নিশ্চিত ছন্দোবদ্ধ পায়ে মেঝের ওপর হাঁটল। কয়েকটা কঠিন স্বরলিপি বাজাল পিয়ানোতে, হাত, বাহুর সুষ্ঠু সঙ্গতিপূর্ণ সাবলীলতায় নড়াচড়া করল। মনে হল মিস্ র‍্যাঙ্কিন অবশেষে নিখুঁত সুশৃঙ্খল দৈহিক সত্তা তো ফিরে পেয়েছেই, একটা অতি সুবিনীত মানসিক সত্তাও পেয়েছে।

এক সপ্তাহ পরে ডাঃ প্রিন্সের দপ্তরে হাল্কা পায়ে প্রবেশ করল একটি যুবক, অকৃপণভাবে ঝক্‌মকে। উচ্চ সমাজের সব ছাপই তার ওপর মোটা দাগে আঁকা।

সে ব্যাখ্যা করে পরিচয় দিল—'আমি অ্যাশবার্টন, বুঝলেন, টি. রিপ্‌লি অ্যাশবার্টন। মিস্ র‍্যাঙ্কিনের বাগ্‌দত্ত। শুনেছি আপনি ওর চলাফেরায় অসুবিধের জন্য কিছু ট্রেনিং দিচ্ছেন—অতটা বলতে চাইনি, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে, বুঝলেন। ঘোড়া, আস্তাবল নিয়ে ঘোরাঘুরি তো! তা, ডাঃ প্রিন্স, আপনার কাছেই জানতে চাই। মানে খোলাখুলিভাবে, বুঝলেন। মিস্ র‍্যাঙ্কিনের জন্য আমি পাগল। শীতের আগেই বিয়েটা হবে আমাদের। আপনি আমাকে ওদের পরিবারেরই একজন মনে করতে পারেন, বুঝলেন। ওঁরা বলেছেন, আপনি আর—ইয়ে—মিডিয়াম লোকটি মিলে কী যেন চিকিৎসা করেছেন। ওতেই কিন্তু ও চমৎকার সেরে গেছে, সন্দেহ নেই। এখন তো সে অবাধেই হাঁটে, নিজেই সামনের—মানে আপনি জানেন, তার সেই পুরনো ঝামেলাগুলো কেটে গেছে। কিন্তু এবার অন্য একটা জিনিস

শুরু করে দিয়েছে যা বেশ চিন্তার ব্যাপার; সেই কারণেই আমি এসেছি, বুঝতে পারলেন না?'

'এমন কিছু তো আমায় জানানো হয়নি মিস্ র‍্যাঙ্কিনের অসুখটা আবার চাগিয়ে উঠেছে বলে!'—বললেন ডাঃ প্রিন্স।

রিপ্‌লি অ্যাশবার্টন একটা রুপোর সিগ্রেট-কেস্ বের করে। কী করবে তা বিনীতভাবে চিন্তা করে। ডাক্তারের তরফ থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলে ফের সেটা পকেটে ঢোকায়।

'না, চাগিয়ে ওঠার ব্যাপার নয়', চিন্তা করে বলে সে, 'অন্য কিছু ব্যাপার। হয়তো আমিই একমাত্র লোক যে জানতে পারে। আলোচনা করতে লজ্জা হয়—প্রেমের দেবতার গোপন কথা ফাঁস করা, বুঝলেন তো—একটা ইতর কাজ... কিন্তু ধরুন যদি ঘটনার প্রয়োজনে এর ন্যায্যতা থাকে।'

ডাঃ প্রিন্স বিচার করার সুরে বলেন, 'আপনি যদি কোনো তথ্য পেয়ে থাকেন, অথবা কিছু লক্ষ্য করে থাকেন যার সাহায্যে মিস্ র‍্যাঙ্কিনের এ অবস্থায় উপকার হতে পারে, তা হলে সেটা ওঁর খাতিরেই আপনার জানানো কর্তব্য। আপনাকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না যে এধরনের উদ্ঘাটনকে গোপন হিসেবেই রাখা হয়, পেশাদারি মর্যাদার ভিত্তিতে।'

'আমার বিশ্বাস আমি আগেই বলেছি',—অ্যাশবার্টনের আঙুল এখনো নিশপিশ করে সিগ্রেট-কেসের পকেটের মধ্যে—'মিস্ র‍্যাঙ্কিন আর আমি বরাবরই পরস্পরের অনুরাগী। কেন্টাকি পাহাড় থেকে এসে থাকলেও সে ফুর্তিবাজ চটকদার মেয়ে। ইদানীং কেমন যেন অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করছে। এক মিনিট হয়তো ভীষণ আদর দেখাচ্ছে, আবার পরের মিনিটেই আমাকে পুরো অচেনা মানুষের মতো দূর-ছাই করছে। কাল রাতে হোটেলে গেলাম, সে আমার সঙ্গে কামরার দরজাতেই মিলল। কেউ কাছেপিঠে ছিল না। আমায় একটা ভীষণ সুন্দর চুমো—ইয়ে—জানেন তো আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। তারপরেই সে ঝেড়ে গালাগাল দিলে, আমার মুখের ওপর একটা ভীষণ জোর চড় কষিয়ে দিলে। বললে, 'তোমার চেহারা দেখতে ইচ্ছে করে না। কী সাহসে তুমি এমন বাড়াবাড়ি কর।'

মিঃ অ্যাশবার্টন পকেট থেকে একটা লেপাফা বের করল, তার ভেতর থেকে একটা সুন্দর লালচে রঙের চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে বলল—'আপনি এই চিঠিটা পড়ে দেখতে পারেন। বলতে পারি না এটা কোনো ডাক্তারী কেস্ কিনা, কিন্তু বুঝতে পারছেন আমি ভীষণ রকম অদ্ভুত বোধ করছি।'

ডাঃ প্রিন্স চিঠির লাইনগুলো পড়লেন:

"প্রিয়তম রিপ্‌লি,

নিশ্চয় করে আজ সন্ধ্যায় এসো— আমার মিষ্টি সোনা। আমায় কোথাও

আজ বেড়াতে নিয়ে চল। মাম্মির মাথা ধরেছে, বলছেন আমরা দুজনে কিছুক্ষণ বাইরে থাকলে উনি রেহাই পেয়ে খুশিই হবেন। ওই জল পদ্মগুলো পাঠিয়েছিলে বলে কী আনন্দ যে হল—ঠিক যে জিনিসটা চেয়েছিলাম পুব-জানলাটার জন্য। আমার আদরের রিপ্‌লি—তুমি যে কত ভাল আর কত ভাবো—তুমি আমার সব ভালবাসার একমাত্র যোগ্য ধন। ইতি

তোমার নিজস্ব

আনাবেল

"পুনশ্চ: পরে ভেবে দেখেছি—আজ সন্ধ্যায় তোমার না আসাই ভাল, কারণ আমি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকব। হয়তো তুমি কখনো ভেবেই দেখনি তোমার ধারণা অনুযায়ী যে-দেদার মজা তোমার সমাজ অন্যদের বিলোয়, সে-সম্পর্কে দ্বিমতও থাকতে পারে। অন্য কোনো গুণ না থাকলে শুধু পোশাক আশাক আর ক্লাবঘর আর ঘোড়দৌড়ে কখনো সত্যিকার মানুষ হওয়া যায় না।

গভীর সম্মান সহকারে,

আনাবেল র‍্যাঙ্কিন।"

সান্ত্বনার চুষিকাঠিগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে গোমড়ামুখে বসে রয়েছে অ্যাশবার্টন, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানা চিন্তা।

ডাঃ প্রিন্স বলে উঠলেন 'আ হাঃ!' তবে বিস্ময়োক্তিটা নিজেকেই উদ্দেশ করে—'এ যে দেখছি হাত থেকে এখন হৃদয়ে!' তিনি লক্ষ্য করেছেন— রহস্যময় বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্বটা এবার বাস্তবে পীড়িতা কুমারীটির কোমল হৃদ্‌যন্ত্রে আশ্রয় নিয়েছে।

'মাপ করবেন, কী বললেন যেন? কবিতার মতো শোনাল।'

ঝকঝকে যুবককে বিদায় দেয়া হল, কথা রইল ডাঃ প্রিন্স মিস্ র‍্যাঙ্কিনকে পেশাদারি 'কলে' দেখতে যাবেন। অবিলম্বে করলেনও তাই, প্রোফেসর আদামি সহযোগে। তার আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়েছিলেন—বীল্‌-র‍্যাঙ্কিনদের এই বিরক্তিকর ঐতিহ্য কেন অদ্ভুত একটা রাস্তা নিল? এবারে যেহেতু বিশৃঙ্খলার স্থানটা এমন যে বুদ্ধি খাটিয়ে রোগীর মোকাবিলা করতে হবে, তাই যুবতী মহিলাকে প্রোফেসরের কলাকৌশলে রাজি করাবার আগে কিছুটা কূটনীতির আশ্রয় নিতে হল। তবে সে ক্রমে ক্রমে মেনেও নিয়েছে আর স্বাভাবিকভাবেই মোহ-ঘুম থেকে জেগে উঠেছে কোনোরকম অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

যথেষ্ট আগ্রহ আর কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে ডাঃ প্রিন্স ক'টা দিন অপেক্ষা করলেন মিঃ অ্যাশবার্টনের রিপোর্টের জন্য, কারণ, আর কেউ না-হোক তার ওপরেই

তো নির্ভর করতে হবে কোনো উন্নতি হল কিনা লক্ষ্য রাখতে। একদিন সকালে সোল্লাসে প্রবেশ করল সেই যুবক।

খুশি গলায় বলল, 'সবই ঠিক আছে, বুঝলেন। মিস্ র‍্যাঙ্কিন আবার ঠিক আগের মানুষটি। চিনির মতো মিষ্টি, সমস্ত অশান্তি উধাও। কোনো কড়া কথা বা চাউনি নেই। আমি তার আগের পোষাপাখিই রয়ে গেছি। কীভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছে সেকথা বললে ও বিশ্বাসই করে না। বলে, আমি সব বানিয়ে বলছি। কিন্তু এখন সব ঠিকঠাক—যেন রবারের টায়ারের ওপর চলছে সবকিছু। আমি ভীষণ বাধিত রইলাম আপনার, আর সেই বুড়ো— ইয়ে-মিডিয়ামের কাছে। আর এখন ডাঃ প্রিন্স, একথা বলবই যে মিস র‍্যাঙ্কিনের আশ্চর্য রকম উন্নতি হয়েছে—সব দিক থেকে। আগে ও ছিল কঠিন ধরনের, মানে বুঝলেন না—নাক উঁচু, বই-ঘেঁষা, আর নানা জিনিস নিয়ে চিন্তার অভ্যেস। এখন সেসব সেরে গেছে—এখন তোড়ার সেরা ফুলটি—ফুর্তিবাজ, চালিয়াত, তরতাজা! ওঃ, যখন মিসেস্ রিপ্‌লি হবে, লোকে ভিড় করে তার পায়ের ধুলো নেবে। এবার তাই বলছি, ডাক্তার আপনি এবং সেই-ইয়ে-মিডিয়াম ভদ্রলোকটি আজ রাতে এসে মিসেস্, মিস্ র‍্যাঙ্কিন আর আমার সঙ্গে নৈশভোজ করুন। যদি আসেন তো খুশি হয়ে দেখাবো মিস্ র‍্যাঙ্কিনের কী উন্নতিই না হয়েছে।'

ডাঃ প্রিন্স আর প্রোফেসর আদামি অবশ্যই মিঃ অ্যাশবার্টনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁরা হোটেলে র‍্যাঙ্কিনদের কামরাগুলোতে মিলিত হলেন। সেখান থেকে তাঁরা যাবেন অ্যাশবার্টনের অনুগৃহীত রেস্তোরাঁয়।

মিস র‍্যাঙ্কিন যখন সাবলীল ভঙ্গিমায় কামরার ভেতর এল, মুগ্ধ আর বিস্মিত পেশাদার ভদ্রলোকদের অন্তরে যেন অনুভূতির সংঘর্ষ। যুবতী উদ্ভাসিত, মোহময়ী, প্রায় উদ্বেল হবার মতো প্রাণবন্ত। ওর প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি কথার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছেন ওর মা, আর অ্যাশবার্টন। হাল্‌কা নীল পোশাকে অতি শোভনীয় ওর রূপ।

একেবারে ভরপূর প্রাণে ও হঠাৎ বলে বসল, 'ওঃ বিচ্ছিরি। এ পোশাক আমার ভাল লাগছে না মোটেই। আপনারা সবাই সবুর করুন'—হুকুম করল পোশাকের পেছনভাগটা মনোহর ভঙ্গিতে একদিকে টেনে নিয়ে—'আমি বদল-করে আসছি।' আধঘন্টা বাদে সে ফিরে এল একটা কালো লেসের চোখধাঁধানো মনোরম পোশাক পরে।

একটা মন-মাতানো হাসি দিয়ে সে ঘোষণা করল—'আমি আপনার সঙ্গেই নিচে হেঁটে যাব, প্রেফেসর আদামি।' সিঁড়ি ধরে অর্ধেকটা নেমে হঠাৎ সে প্রোফেসরের সঙ্গ ছেড়ে, যোগ দিল ডাঃ প্রিন্সের সঙ্গে। বললে, 'আপনি সত্যিই আমার এত উপকার করলেন। ওই জঘন্য কলহ-বিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে

কী স্বস্তিই না পেয়েছি। হা ভগবান! রিপলি, ওই মিষ্টিগুলোর কথা ভুলে গেছ? উঃ কী বাজে এই কালো পোশাক! পরাই উচিত হয়নি আমার, শোকযাত্রার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তখন ওই লিল্যাক ফুলগুলোর গন্ধ পাচ্ছিলেন না? কেন্টাকি পাহাড়ের কথা মনে পড়ে যায়। ফিরে যেতে পারলে কী মজা যে হত।'

ডাঃ প্রিন্স সাগ্রহে তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে কি নিউ ইয়র্ক ভাল লাগে না আপনার?'

ওর গলার স্বরে চমকে উঠে ভরা চোখে তাকাল সে।

'নিশ্চয় ভাল লাগে। নিউ ইয়র্ক আমায় মুগ্ধ করে,' ওর কণ্ঠস্বরে সততা,—'আরে—থিয়েটার, নাচ, আর এখানে আমার রোজকার গাড়িতে ঘোরা—এসব না হলে তো আমি বাঁচতামই না।'—কাঁধের পেছনে মাথা ঘুরিয়ে ডাকলে—'ও রিপ্‌লি, আমি যে বুলডগের বাচ্চা চেয়েছিলাম, ওটা কিন্তু এনো না; আমি মন বদলেছি। আমি চাই পমেরানিয়ান—হ্যাঁ এবার কিন্তু ভুলো না।'

ওরা বাঁধানো রাস্তায় এসে নামে।

মিস্ র‍্যাঙ্কিন চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওঃ, ঘোড়ার গাড়ি? না, ঘোড়ার গাড়ি চাই না আমি। মোটরগাড়ি চাই। এটাকে ফেরত পাঠাও।'

অ্যাশবার্টন খুশি গলাতেই বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘোড়ার গাড়ির কথাই বলেছ।'

হুকুম মেনে ঘোড়ার গাড়ি বিদায় হল, ওর জায়গায় এল একটা ছাদ-খোলা মোটর গাড়ি।

মিস্ র‍্যাঙ্কিন মিষ্টি করে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বদগন্ধ-ওয়ালা গুমোট জিনিস! আমরা হেঁটেই যাব। রিপ্‌লি, তুমি আর ডাঃ প্রিন্স মা'কে একটু দেখবে। আসুন, প্রোফেসর আদামি।'—মোহিনী সুন্দরীকে আস্কারা দিয়ে ওর বলির-প্রাণীরা অবশ্য মেনে নেন ব্যবস্থাটা।

মিসেস র‍্যাঙ্কিন সুখাবিষ্ট কণ্ঠে ডাঃ প্রিন্সকে বলেন, 'আদরের বাছাটি আমার! কেমন ভরপুর হয়ে উঠেছে মনে প্রাণে! আগের সেই অবস্থা থেকে কত যে উন্নতি হয়েছে ওর!'

'প্রচুর উন্নতি,'—অ্যাশবার্টন সগর্বে হাঁদার মতো বলে, 'রীতিমতো মহানগরীর চালচলন আয়ত্ত করে ফেলেছে। সুরুচি-মার্জিত চালিয়াত বললে বোঝানো যাবে না ওকে। মন-মরা সেই 'চিন্তা' ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। আপ-টু-ডেট একেবারে! আরে, মন তো ও দু'মিনিটে একবার করে বদল করে। এই হল যাকে বলে আনাবেল।'

খানিক পরে ওরা সবাই সেই চটকদার রেস্তোরাঁয় বসতে, ডাঃ প্রিন্সের মনোযোগ

আর কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হল মিস্ র‍্যাঙ্কিনের আচরণের ওপর। বেশ একটা মানানসই আর আকর্ষণীয় কৌতুকভাব ওর মধ্যে। একটা আদুরে বাচ্চার কাছ থেকে যেমন আশা করা যায় তেমনি ওর চলন-বলন, ওর অস্থির খেয়ালীপনায় আস্কারা দিয়ে যাচ্ছেন নতমুখ আত্মীয়রা। খাবারের তালিকা থেকে একটার পর একটা জিনিসের অর্ডার করে যাচ্ছে, আবার সামনে এনে হাজির করলে বাতিলও করে দিচ্ছে প্রায় প্রত্যেকটা পদ। ওয়েটাররা ছুটে যাচ্ছে, ফিরে আসছে, ধাক্কাধাক্কি খাচ্ছে, মিষ্টি কথায় বোঝাচ্ছে, মাপ চাইছে আর নাচছে ওর হুকুমের তালে। ওর কথাগুলো চট্‌পটে, সতেজ, তৃপ্তিকর অসঙ্গতিতে ভরা, প্রচুর উল্টোপাল্টা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, হাস্যকর অমিল, সামঞ্জস্যহীন। মোটের ওপর বেশ অল্প ক'টি দিনের মধ্যে সে রপ্ত করে নিয়েছে সমস্ত রকম অবান্তর যুক্তিহীন গ্যাঁজলা যা চটকদার জীবনের কিছু নির্দিষ্ট চক্রের মধ্যে চালু। অ্যাশবার্টন তার বাগ্‌দত্তার মধ্যে নতুন এক মোহিনীমায়ার সন্ধান পেয়ে অন্ধ-অনুরাগ আর নিষ্ফল আনন্দের তারিফ জানায়—সে এই জাদুমায়াকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনে নিয়েছে তার আপন দঙ্গলের 'আইনগ্রাহ্য মুদ্রা' বলে।

পরে, পার্টি যখন ভেঙে গেল, ডাঃ প্রিন্স আর প্রোঃ আদামি এক কোণে ক'সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়ালেন, এখান থেকেই ওরা আলাদা পথ ধরবেন।

প্রোফেসর সুখাদ্য ও পানীয়ের সদ্ব্যবহার করে প্রসন্ন কোমল, বলল 'যাক, এবার আমাদের মহিলাকে মনে হল অনেক ভাগ্যবতী। ওঁর দেহ থেকে অসুখটা পুরোপুরি নির্মূল হয়েছে। হ্যাঁ স্যর, যথাসময়ে আমাদের গবেষণাকেন্দ্র সকলেরই স্বীকৃতি পাবে।'

সম্মোহক-প্রোফেসরের সুশোভন সুন্দর চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখেন ডাঃ প্রিন্স। ভদ্রলোক যে ওঁর নিজস্ব রোগ-নির্ণয়টা আন্দাজ করতে পেরেছে তেমন কোনো আভাসই পেলেন না তার মুখভাবে।

জবাবে তিনি শুধু বললেন, 'তা যা বলেছেন। মহিলার বন্ধুদের যতটা বিচারবুদ্ধির দৌড়, তাতে তো সে সেরেই উঠেছে বলে মনে হয়।'

পরে একটু সময় করতে পেরেই ডাঃ প্রিন্স ফের চড়াও হলেন বিশেষজ্ঞ-প্রবর গ্রাম্বলটন মায়ার্সের নিভৃত আস্তানায়। দু'জনে মিলে নিকোটিন-বিষের আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন।

তারপর যখন দরজা খুলল, আর ডাঃ প্রিন্স ধোঁয়ার সঙ্গেই নিষ্ক্রান্ত হতে যাচ্ছেন, সেই মুহূর্তে বিজ্ঞ পণ্ডিত মায়ার্স বললেন, 'হ্যাঁ, মনে হয় ঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন আপনি। যতক্ষণ অবধি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কেউই আসল সত্যটা নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ না করছেন, আর বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টই থাকছেন, আমার তো মনে হয় না কোনো প্রয়োজন আছে তাঁদের জানাবার। লড়াইটা,

মানে "ফিউডিটিস্ বীলোরুম্-এট্ -র‍্যাঙ্কিনোরুম্"— কেমন হল ল্যাটিনটা ডাক্তার? সেটা এখন সব ছেড়ে মিস্ র‍্যাঙ্কিনের মস্তিষ্কে ঢুকে পড়েছে, এই যা!'

A Professional Secret. টাউন টপিক্স, ১৯০২

শার্লেরয়ে পুনর্জীবন

গ্রাঁদেমঁ চার্লস একজন ছোটখাটো 'ক্রিওল' ভদ্রলোক, চৌত্রিশ বছর বয়েস, মাথার চাঁদিতে টাকের আভাস, চালচলন যেন রাজকুমারের মতো। দিনের বেলায় সে এক তুলোর দালালের দপ্তরে কেরানি—নিউ অর্লিয়ন্সের নদীপাড় ঘেঁষে ওই স্যাঁতসেতে দুর্গন্ধ পিচ্ছিল ইটের পাঁজাগুলোর একটাতে। রাতে, আদি ফরাসী পাড়ার তিন-তলা-উঁচু শয়ন আস্তানায় সে কিন্তু আবার সেই শার্ল্ পরিবারের শেষ পুরুষ-বংশধর। এই অভিজাত পরিবারটির এক সময় দাপট ছিল ফ্রান্সে, পরে লুইসিয়ানার পুরনো উজ্জ্বল দিনগুলোতে তারা নম্র ও হাস্যমুখেই তলোয়ারের খোঁচা মেরে ঢুকে পড়ে সেখানে। বিগত কয়েক বছরে চার্লস্‌রা যদিও শান্তশিষ্ট রিপাবলিকান বনে যায়, তবু মিসিসিপির ধার দিয়ে ওদের আবাদী জীবনের আয়াস আর আড়ম্বর বড় একটা কম রাজকীয় ছিল না। হয়তো 'মার্কুইস্'ও ছিল আমাদের গ্রাঁদেমঁ। 'মার্কুইস-দ্য-ব্রাসে' উপাধিটা তো এখনো ওদের পরিবারে আছে। তবে হ্যাঁ, পঁচাত্তর ডলার মাস-মাইনের মার্কুইস! সত্যিই তাই, তবে এর চেয়ে কম রোজগারেও এমনটা তো ঘটে দেখি।

গ্রাঁদেমঁ তার বেতন থেকে ছ'শো ডলার বাঁচিয়েছে। আপনি হয়তো বলবেন, একটা লোকের বিয়ে করার পক্ষে এ-টাকা তো যথেষ্ট। তাই, এ-বিষয়ে দুটি বছর চুপচাপ থাকার পর সে অবশেষে ওই ভীষণ ঝুঁকির প্রশ্নটা আবার তুলল কুমারী এ্যাডেল ফোকিয়েরের কাছে—ঘোড়ায় চড়ে ওর বাপের আবাদ মীড-ডি'অরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে। গত দশ বছর ধরে যে জবাব মেয়েটির কাছে পেয়েছে একারও সেই একই কথা: "আগে আমার ভাইকে খুঁজে বার করুন, মঁসিয়ে চার্ল্স।"

এবার সে ওর সামনে দাঁড়িয়েই রইল, হয়তো এমন অযৌক্তিক একটা অনিশ্চিত ঘটনার ওপর শর্তবদ্ধ হয়ে ওর এত দীর্ঘদিনের ভালবাসা হতোদ্যম, নিরাশ হয়েছে, তাই সোজা ভাষায় জবাব চায় এ্যাডেল তাকে ভালবাসে কি বাসে না?

ধূসর চোখ মেলে এ্যাডেল ওর দিকে চায়, সে চোখে কোনো গোপনতা ধরা পড়ে না। একটু নরম সুরেই সে জবাব দেয়:

'গ্রাঁদেমঁ, আমি যা চেয়েছি তা যদি না করতে পার, তো ও-প্রশ্নটা করার অধিকারও তোমার নেই। হয় আমাদের কাছে ভিক্টরকে ফিরিয়ে আনো, নয়তো সে যে মরেছে তার প্রমাণ দেখাও।'

যদিও পাঁচ-পাঁচবার সে এইভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তবু কোনো কারণে ফিরে যাবার সময় এবার তার হৃদয় অতটা ভারাক্রান্ত হল না। ও তো অস্বীকার করেনি যে তাকে ভালবাসে? কত অগভীর জলেও বাসনার তরী তো ভাসমান থাকতেই পাবে! নাকি আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ইঙ্গিত করব—চৌত্রিশে পা দিলে এমনিতেই জীবনের জোয়ার শান্ত হয়ে আসে: চব্বিশে যেমন-তেমন একটি প্রেরণার দিকেই মনপ্রাণ নিবদ্ধ না থেকে নজর যায় বহুবিধ প্রেরণার প্রতি?

ভিক্টর ফোকিয়েরকে আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগের সেই দিনগুলোতে, ওর নিরুদ্দেশ হবার সময়, 'চার্লস' নামেই ছিল টাকার গন্ধ, আর হারানো ছেলেটিকে খুঁজে বের করার জন্য গ্রাঁদেমঁ খোলামকুচির মতোই ডলার খরচ করেছিল। তবু সাফল্যের আশা ছিল খুব কম, কারণ একমাত্র মিসিসিপির মারাত্মক খেয়ালি মর্জিতেই তার তৈলাক্ত জলাজঙ্গল থেকে উঠে আসতে পারে কোনো হতভাগ্য শিকার।

অন্তত হাজার বার গ্রাঁদেমঁ মনে-মনে খতিয়ে দেখেছে ভিক্টরের উধাও হবার দৃশ্যটা। আর যতবারই এ্যাডেল তার বিয়ের প্রস্তাবের পাল্টা একগুঁয়ে দুঃখজনক শর্তগুলো দিয়েছে, ততবারই তার মস্তিষ্কে যেন আরো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে সেইসব ছবি।

ছেলেটা ছিল পরিবারটির চোখের মণি: বেপরোয়া, দুর্জয় সাহসী আর আকর্ষণীয়। ওর অবিজ্ঞ মনের কল্পনাকে দখল করেছিল আবাদ বাগিচারই একটি মেয়ে—একজন তদারককারীর কন্যা। ব্যাপার যতদূর গড়িয়েছিল, অবৈধ গুপ্ত প্রণয়টা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞই ছিল ভিক্টরের পরিবার। ছেলেটির মতিগতির ফলে ওদের নির্ঘাতই ক্লেশ হতে চলেছে বুঝে গ্রাঁদেমঁ ওদের বাঁচাতে চাইল ব্যাপারটাতে সক্রিয় বাধা দিয়ে। টাকার অসীম ক্ষমতাই পথটা সরল করে দিল। সূর্যাস্ত থেকে ভোর হবার মধ্যেই এক ফাঁকে তদারককারী আর তার মেয়ে ঘর ছেড়ে কোনো অনির্দিষ্ট এলাকায় প্রস্থান করল। গ্রাঁদেমঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল এই এক কোপেই ছেলেটির বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরে আসবে। সে ঘোড়ায় চেপে মীড-ডি'অরে গেল তার সঙ্গে কথা বলতে। বাড়ি, আঙিনা ছাড়িয়ে পায়চারি করতে করতে ওরা রাস্তা পার হয়ে গেল। বাঁধের ওপর ওঠে চওড়া পথ ধরে কথা বলতে-বলতেই এগোলো। মাথার ওপর তখন ঝড়-বিজলির মেঘ, আসন্ন হলেও বৃষ্টি তখনো শুরু হয়নি।

ওর গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে গ্রাঁদেমঁর নাক গলানোর খবরটা পাবামাত্র ভিক্টর প্রচণ্ড আকস্মিক ক্রোধে তাকে আক্রমণ করে বসল। গ্রাঁদেমঁ হাল্কাপলকা লোক হলেও তার পেশীগুলো যেন লোহার। এলোপাথাড়ি ঘুষির বর্ষণের মধ্যেও সে তার কবজি চেপে ধরে, ছোকরাটিকে পেছন দিকে হেলিয়ে তাকে বাঁধের রাস্তার ওপর শুইয়ে ফেলে। একটু বাদে, আবেগের প্রচণ্ডতা একটু কমে গেলে তাকে উঠতে দেয় সে। এখন যদিও শান্ত, একটু আগে যে ছিল বদমেজাজের সামান্য ফুৎকার, সেই ভিক্টর এখন বারুদের স্তূপ। সে হাত বাড়িয়ে মীড ডি'অরে নিজের বাড়িটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলল—'তুমি আর ওরা মিলে আমার সুখশান্তি নষ্ট করার ফন্দি এঁটেছ। তোমরা কেউ আর আমার মুখ দেখবে না।'

ঘুরেই সে সবেগে ছুটল বাঁধের পথ ধরে, আঁধারে অদৃশ্য হল। গ্রাঁদেমঁও যতটা পারে ওকে অনুসরণ করে, চিৎকার করে ডাকে, কিন্তু বৃথা। এক ঘন্টারও বেশি সময় নিয়ে ওর খোঁজ করে বেড়ায়। বাঁধের কিনারা থেকে নেমে ঘন নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢোকে, একেবারে নদীর পাড় অবধি উইলো গাছের গোড়া ধরে এগোয়, ভিক্টরের নাম ধরে ডাকে। কোনো জবাবই পেল না সে, শুধু একবার যেন মনে হয়েছিল পাশ-কেটে যাওয়া ঘোলা জল থেকে একটা গল্‌গলে আর্তনাদ কানে আসছে। তারপর আকাশ ভেঙে ঝড় নামল, ভিজে কাপড়ে হতাশমনে সে ওদের বাড়িতে ফিরে এল।

ওখানে সে ছেলেটার উধাও হবার একটা পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাই দিল,—ওর ধারণায় পর্যাপ্ত। হাতাহাতির ব্যাপারটা সে চেপে গেল, কারণ ওর আশা রাগ ঠাণ্ডা হলেই ভিক্টর ঠিক ফিরে আসবে। পরে যখন ছেলেটার শাসানিটাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল, তার মুখ আর দেখাই গেল না, তখন ওর পক্ষে মুশকিল হল সেই রাতের ঘটনার ব্যাখ্যাটা বদল করা। তাই ছেলেটার অদৃশ্য হওয়া, আর যেভাবে তা ঘটল, তার প্রকৃত কারণ নিয়ে একটা রহস্য যেন থেকেই গেল।

ওই রাতেই গ্রাঁদেমঁ লক্ষ্য করেছিল—যখনই এ্যাডেল ওর দিকে তাকাচ্ছে, তখনই একটা নতুন, বিশেষ অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে তার চোখে। এতগুলো বছর পরেও সে-অভিব্যক্তি যেন একই রকম রয়ে গেছে। ও সেটা ধরতে পারে না, কারণ সেটার পেছনে রয়েছে কোনো ভাবনা যা এ্যাডেল কোনো ক্রমেই প্রকাশ করবে না।

কিন্তু সে যদি জানত একটা কথা—ওই অপয়া রাতটিতে এ্যাডেলও ওদের পেছু নিয়ে গেট অবধি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সবুর করছিল তার ভাই আর প্রেমিকের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়, আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল ওরা এমন দুর্যোগের সময়টা বেছে নিয়ে কেন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার একটা জায়গায় গেল আলোচনা করতে—আর যদি একথা জানত যে একটা আচম্বিত বিজলির ঝলকানিতে এ্যাডেলের চোখের

সামনে প্রকাশিত হয়েছিল সংক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র লড়াইয়ের দৃশ্যটা, যখন ভিক্টরকে নিজের হাতের চাপে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সে,— তাহলে হয়তো সে ব্যাখ্যা করে সবই বোঝাতে পারত, আর এ্যাডেলও—

আমি জানি না এ্যাডেল তাহলে কী করত। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার—ওর ভাইয়ের উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা ছাড়াও অন্য কিছু এসে গোঁজ দিয়েছে গ্রাঁদেমঁর বিবাহ-প্রস্তাব আর এ্যাডেলের 'হ্যাঁ' বলার মধ্যে। দশটা বছর পেরিয়ে গেছে, তবু এক লহমার বিজলিচমকের মধ্যে সে যা দেখেছিল তা যেন একটা অনপনেয় ছবি হয়ে রয়েছে। এ্যাডেল ওর ভাইকে ভালবাসত, কিন্তু ও কি শুধু সেই রহস্যটার সমাধানের জন্যই প্রতিরোধ করে যাচ্ছে, নাকি "প্রকৃত সত্যটার" জন্য? মেয়েরা এ জিনিসের মর্যাদা দেয় বলে জানি, এমন-কি একটা নিছক নিগূঢ় নীতি হিসেবেই মানে। বলা হয়ে থাকে, কিছু নারী তাদের প্রেমের ব্যাপারে বরং জীবনকেই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেছে তবু মিথ্যাকে মেনে নেয়নি। আমি সেটা জানি না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি, গ্রাঁদেমঁ যদি ওর পায়ের ওপর কেঁদে পড়ে বলত যে তার হাতই ভিকটরকে সেই সন্ধান-অসাধ্য নদীর তলায় পুঁতে দিয়েছে, আর একটা মিথ্যা দিয়ে সে তার ভালবাসাকে দীর্ঘদিন কলঙ্কিত করতে চায় না, আমি ভেবে অবাক হই... কী যে সে করত তা ভেবেই পাই না!

কিন্তু সরলপ্রাণ খুদে ভদ্রলোক গ্রাঁদেমঁ চার্লস, কখনো আন্দাজই করতে পারেনি এ্যাডেলের চোখের ওই চাউনিটার অর্থ। সৌজন্য জানাতে গিয়ে এই শেষ নিষ্ফল প্রতিদানটা পেয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে ফিরল,—বরাবরের মতোই প্রেম ও মর্যাদায় ধনী, প্রত্যাশার দিক থেকে দরিদ্র হয়ে।

এ হল সেপ্টেম্বরের ঘটনা। প্রথম শীতের মাসটাতেই গ্রাঁদেমঁর মাথায় এল 'পুনর্জীবনের' কল্পনাটা। এ্যাডেল যখন ওর হচ্ছেই না কখনো, আর ওকে বাদ দিয়ে ধন নিরর্থক আবর্জনা, তখন কী প্রয়োজন ধীরে ধীরে জমিয়ে তোলা সঞ্চয়ে আরো নতুন ডলার যোগ করার? ও-সঞ্চয় আদৌ ও রাখবেই বা কেন?

রয়াল স্ট্রীটের কাফেগুলোতে ছোট পালিশকরা টেবিলে বসে ক্লারেটের বোতলের ওপর সে শ'য়ে শ'য়ে সিগারেট ধ্বংস করে, আর সেই সঙ্গে পরিকল্পনাও করে। ক্রমে-ক্রমে নিশ্ছিদ্র হল মতলবটা। নিঃসন্দেহে এতে ওর সর্বস্বই খরচ হয়ে যাবে, কিন্তু—'এ খেলায় সব মোমবাতি ফৌত'— কয়েক ঘণ্টার জন্য তো সে আবার এক শার্লেরয়ের চার্লস বনে যাবে। আবার সেই উনিশে জানুয়ারি। চার্লস বংশের সৌভাগ্যের সবচেয়ে তাৎপর্যময় দিনটি মহাআড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে। ওইদিনই ফরাসী রাজা নিজের টেবিলের পাশে প্রথম বসিয়েছিলেন একজন 'শার্ল'কে, ওই তারিখেই 'মার্কুইস দ্য-ব্রাসে' আরমান্দ চার্লস্‌ জ্বলন্ত উল্কার মতো নেমেছিলেন

নিউ অর্লিন্সের মাটিতে; ওই তারিখেই হয়েছিল তার মায়ের বিবাহ; গ্রাঁদেমঁও জন্মেছিল ওই দিনটিতে। পরিবার ভাগ হয়ে যাওয়া অবধি গ্রাঁদেমঁর মনে পড়ে, বাৎসরিক উৎসবগুলো ছিল পানভোজন, আতিথেয়তা আর সগর্ব স্মরণেরই সমার্থ নাম।

'শার্লেরয়' হল পুরনো পারিবারিক আবাদ-বাগিচা,—নদী ধরে আরো কুড়ি মাইল উজিয়ে। বহু বছর আগে ভূসম্পত্তিটা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল তার অতিখরচে মালিকদের দেনা শোধ করতে। আবার একবার হাত বদল হয়েছিল, এখন সেখানে মামলা মোকদ্দমার ছাতা ছেঁতলা বাসা বেঁধেছে। আদালতে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠেছিল, সেখানেই রয়ে গেছে তা। আর শার্লেরয়ের বসতবাড়িটা—যদি পাউডারচর্চিত-লেস্‌পরা ভুতুড়ে চার্লস্‌দের এর প্রতিধ্বনিহীন কামরাগুলোয় হানা দেবার কাহিনীগুলো সত্যি না হয়—তাহলে বসতিশূন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মামলার ফয়সালা অবধি বাড়ির চাবিগুলো ধরে রেখেছেন সলিসিটর, তাঁকে বিচারালয়েই পেয়ে গেল গ্রাঁদেমঁ। উনি যে পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু সেটা প্রমাণিত। গ্রাঁদেমঁ তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল, মাত্র দু-তিনদিনের জন্য বাড়িটা ভাড়া নিতে চায় সে। তার ইচ্ছা পুরনো-বাড়িতে নতুন বন্ধুদের ডিনারে আপ্যায়ন করা।

সলিসিটর বললেন, 'নিন না একহপ্তার জন্য—যদি চান মাসখানেকের জন্যও নিতে পারেন, তবে ভাড়ার কথা বলবেন না আমায়।'—একটা নিশ্বাস ফেলে শেষ কথা বললেন—'উঃ, ও বাড়িতে কত ডিনার যে খেয়েছি, ভাই!'

এর পর ক্যানাল, শার্ত্র্, সেন্টচার্লস, আর রয়্যাল স্ট্রীটের পুরনো বড় ব্যবসাদার, যারা আসবাবপত্র চিনেমাটির জিনিস রুপোর বাসনপত্র আর ঘরদোর সাজানোর জিনিস বেচেন, তাদের কাছে হানা দিতে লাগল একটি নম্র যুবক। মাথার চাঁদিতে তার ছোট্ট টাক, শোভনীয় আচরণ, খাঁটি সমজদারের চোখ। বুঝিয়ে বলল সে কী চায়—একটা ডাইনিং রুম, হলঘর, অভ্যর্থনাকক্ষ ও পোশাককক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ সুরুচিপূর্ণ সাজসজ্জা ভাড়া করা। জিনিসগুলো প্যাক করে জাহাজে পাঠাতে হবে শার্লেরয় জেটিতে। ফেরত পাঠানো হবে তিন-চারদিন পরে। যা কিছু লোকসান হবে বা হারিয়ে যাবে তার জন্য তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

পুরনো ব্যবসায়ীদের অনেকেরই মুখ-চেনা গ্রাঁদেমঁ, তাছাড়া সেকালের চার্লসদের কাছাকাছি মানুষই তো সে! ওদের কেউ-কেউ আবার ক্রিওল গোষ্ঠীর, তাই তাঁরা সহানুভূতিতে রোমাঞ্চিত হল এই অধুনা-দরিদ্র কেরানিটির বিচারবুদ্ধিহীন আড়ম্বরের পরিকল্পনা দেখে— লোকটা অন্তত ক্ষণেকের জন্য নিজের পুঁজি জ্বালিয়ে দিয়ে অতীত গৌরবের আতসবাজি দেখাতে চায়।

ওঁরা তাকে বলেন, 'নিয়ে নিন্ আপনার যা খুশি। সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন শুধু, দেখবেন যাতে লোকসানের বিলটা কম হয়। ধার নেবার জন্য খুব কিছু চড়া দর দিতে হবে না।'

এরপর মদের দোকানীদের কাছে। এখানেই একটা বেদনাময় সিংহভাগ কেটে দিতে হয় ছ'শো ডলার থেকে। সেই মহার্ঘ সুরাগুলো থেকে আগের দিনের মতো আবার পছন্দ করা— এতে এক অপূর্ব আনন্দ জাগে গ্রাঁদেমঁর মনে। শ্যাম্পেনের পিপেগুলো তাকে ডাকিনী পরীদের মতো লোভ দেখালেও, তাকে বাধ্য হয়ে এড়িয়ে যেতে হয়। ছ'শো ডলার হাতে নিয়ে ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ফরাসীপুতুলের সামনে এক-পেনি-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর মতোই। তবে ও রুচিসম্মত ভাবে বিচার করেই অন্য পানীয়গুলো বেছে নেয়— শাব্লি, মোজেল, ক্রেতো দ'র্ হখ্হাইমার, আর সঠিক বয়ঃক্রম ও কৌলিন্যের পোর্ট মদ্য।

ভোজনের বিষয়টা নিয়ে অনেক মাথা ঘামানোর পর হঠাৎ ওর মনে পড়ল আঁদ্রের কথা— আঁদ্রে ওদের পুরনো বাবুর্চি—গোটা মিসিসিপি উপত্যকায় অত বড় ফরাসী-ক্রিওল রান্না-বিশারদ আর হয় না। হয়তো এখনো আবাদের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে। সলিসিটর তাকে বলেছেন, জায়গাটায় এখনো চাষ আবাদ হচ্ছে—, দুই মামলাকারীর মধ্যে এক আপসচুক্তির ভিত্তিতে।

এটা ভাবার পর, রবিবারেই গ্রাঁদেমঁ ঘোড়ায় চেপে পৌঁছে গেল শার্লেরয়ে। দুটো লম্বা 'এল্' অক্ষরের মতো বিরাট চতুষ্কোণ বাড়িটা দেখায় শূন্য, দরজা-জানালা বন্ধ থাকার ফলে জীবনহীন।

উঠোনের গুল্ম-উদ্যানটা এবড়োখেবড়ো ছন্নছাড়া। বাগানের ঝরাপাতা ভেতরের হাঁটাপথ আর বারান্দাগুলো ছেয়ে ফেলেছে। বাড়ির পাশের গলিটা ঘুরে গ্রাঁদেমঁ ঘোড়া চালিয়ে সোজাই চলে এল মুনিষ মজুরদের ঝুপড়িতে। মজুররা তখন সার বেঁধে গির্জা থেকে ফিরছে, চিন্তাভাবনা নেই, সুখী, ঝলমলে হলদে লাল আর নীল জামা পরা।

হ্যাঁ, আঁদ্রে এখনো এখানেই রয়েছে। মাথার গুঁড়ো চুল একটু যা পেকেছে, মুখটা আগের মতোই চওড়া, যেন এখুনি হেসে উঠবে। গ্রাঁদেমঁ ওকে নিজের মতলবের কথা বলে, আর বুড়ো বাবুর্চি গর্বে আর আনন্দে আটখানা হয়ে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গ্রাঁদেমঁ বুঝল সেদিন ডিনারটার পরিবেশন ঘোষণা হবার আগে অন্তত আর চিন্তার কারণ নেই, তাই আঁদ্রের হাতে বেশ দরাজ একটা টাকার অঙ্ক তুলে দেয়—দস্তুরমতো ভোজের জন্য ঢালাও খরচার অধিকার।

কালোদের মধ্যে কিছু সাবেকি গৃহভৃত্যও ছিল। পুরনো বাজার সরকার আবসালোম এবং আরো আধ ডজন যুবক যারা আগে রান্নাঘর, ভাঁড়ার বা বাড়ির অন্য সব কাজে খাটিয়ে-ছোকরা ছিল, সবাই দল বেঁধে এসেছে 'মুশি গ্রাদে'-কে

দেখতে। আবসালোম কথা দিল এদের ভেতর থেকে বাছাই করে একদল সহকারী নেবে যারা ডিনার পরিবেশনে ভালই কাজ করবে।

বিশ্বস্তদের মধ্যে বেশ উদার ভাবেই উপঢৌকন বিলিয়ে গ্রাঁদেমঁ হৃষ্টচিত্তে শহরে ফিরে এল। অন্য খুঁটিনাটিও কত কিছু ভাবার আছে, ব্যবস্থা করার আছে। তবে শেষ অবধি পরিকল্পনাটা পুরোই দাঁড়িয়ে গেল, এখন শুধু বাকি অতিথিদের আমন্ত্রণ-লিপি পাঠানো।

নদীর ধার বরাবর প্রায় কুড়ি মাইল জুড়ে আধ-ডজন পরিবার বাস করত যাদের রাজসিক অতিথেয়তা চার্লসদেরই সমকালীন। পুরনো রাজতন্ত্রের তারা সবচেয়ে মানী ও সম্ভ্রান্ত বংশ। তাদের ছোট চক্রটা যেন উজ্জ্বল রত্ন, ঘনিষ্ঠ প্রীতিমণ্ডিত তাদের সামাজিক সম্পর্ক, তাদের ঘরে সাদর দুর্লভ অভ্যর্থনা, যোগ্যতা বুঝে উদার দানশীলতা। গ্রাঁদেমঁ ভাবল, ওই বন্ধুরা আরেকবার ফের আসুক (আর বোধহয় কখনো হবে না!), বসুক শার্লেরয়ে উনিশে জানুয়ারিতে, ও-গৃহের বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান করতে।

গ্রাঁদেমঁ তার আমন্ত্রণ লিপিগুলো খোদাই অক্ষরে ছাপিয়েছে। দামি হলেও সুন্দর। একটা ব্যাপারে হয়তো সুরুচি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত; কিন্তু ক্রিওল ভদ্রলোক তার অপসৃয়মান ঔজ্জ্বল্যের টুপিতে একটাই পালক সাজিয়ে রাখতে চান। 'পুনর্জীবনের' ওই একটি দিনে অন্তত কি তাঁকে "শার্লেরয়ের গ্রাঁদেমঁ-দু-পুই-শার্লে" হতে দেওয়া যায় না? জানুয়ারির গোড়ার দিকেই সে আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে শুরু করল যাতে অতিথিরা যথাসময়েই বিজ্ঞাপিত হন।

উনিশ তারিখ সকাল আটটায়, ভাঁটির স্টীমবোট 'রিভার বেল্" সাবধানে এগিয়ে এল শার্লেরয়ের বহুদিন অব্যবহৃত জেটির দিকে। পুল নামানো হল, একদল আবাদের মানুষ সার বেঁধে ভেড়ানোর জায়গায় দাঁড়িয়েছে; তারা ডাঙার ওপর তুলে আনছে নানা অদ্ভুত ধরনের মাল। বড়-বড় আকারহীন বাণ্ডিল, বস্তা আর প্যাকেট, কাপড়ে মোড়া, দড়ি দিয়ে বাঁধা; পামগাছ, চিরসবুজ চারা, গ্রীষ্মমণ্ডলের ফুল টবে অথবা গামলায়; টেবিল, আয়না, চেয়ার, কৌচ, কার্পেট আর ছবি—সবই সাবধানে, চলাফেরার আঘাত বাঁচিয়ে বাঁধা অথবা মোড়ক করা।

গ্রাঁদেমঁও ওদের মধ্যে আছে, সবার চেয়ে ব্যস্ত সে। কিছু বিশাল ঝুড়ি যাদের গায়ে স্পষ্ট ছাপা সাবধানবাণী 'দেখে-শুনে নাড়াচাড়া করার',—সে ওগুলোর ওপর বিশেষ নজর রাখছে। কারণ ওগুলোর মধ্যে আছে ভঙ্গুর চিনেমাটি আর কাচের বাসনপত্র। ওর একটা পড়ে গেলে যা ক্ষতি হবে তা ওর সারা বছরের সঞ্চয়েও শোধ করা যাবে না।

শেষ মালটা অবধি নেমে গেলে, 'রিভার বেল্' আবার পেছিয়ে নদী পথ ধরে চলে গেল। সমস্ত জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছুতে এক ঘন্টাও লাগেনি। তারপর

আসে আবসালোমের তদারকি, আসবাবপত্র বাসনকোসন যথাস্থানে সাজিয়ে বসানো। সাহায্যের হাতও রয়েছে প্রচুর, কারণ সেদিনটা শার্লেরয়ে চিরকালই ছুটির দিন। নিগ্রোরা তাদের পুরনো ঐতিহ্য ভুলে যেতে দেয়নি। তাদের বস্তির প্রায় সমস্ত বাসিন্দাই এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে। প্রায় এক কুড়ি বাচ্চাকাচ্চা লেগে গেছে উঠোন ঝাড়ু দিয়ে পাতা সরাতে। পেছনের বড়ো রসুইখানায় আঁদ্রে মাতব্বরি করছে তার পুরনো আড়ম্বর নিয়ে—একাধিক ছোট-বাবুর্চি আর বাসন-মাজার লোকদের ওপর। জানলাগুলো পুরো খোলা, মেঘের মতো পাক খেয়ে ধুলো উড়ছে, হাঁকডাক পায়ের দাপাদাপিতে গোটা বাড়ি গমগম্ করছে। রাজকুমার ফিরে এসেছেন আবার, দীর্ঘদিনের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে শার্লেরয়।

সে রাতে পূর্ণিমার চাঁদ যখন নদীর ওপাশ থেকে উঠে বাঁধের ওপর থেকে উঁকি দিল, এমন এক দৃশ্য সে দেখল যা বহুযুগ ধরে তার কক্ষপথে দেখা যায় নি। বাগিচা বাড়ির প্রত্যেকটা জানলা থেকে নরম লোভনীয় দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। চল্লিশখানা কামরার মধ্যে মাত্র চারটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছিল। বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষ, ডাইনিং হল, দুটো ছোট কামরা প্রত্যাশিত অতিথিদের সুযোগ-সুবিধার জন্য। কিন্তু জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা হয়েছে প্রত্যেকটি ঘরের জানলাতেই।

ভোজন কক্ষটা হয়েছে একেবারে সেরা কাজের পরাকাষ্ঠা। পঁচিশখানা আবরণে সাজানো দীর্ঘ টেবিল, শীতের নিসর্গদৃশ্যের মতো ঝকমক করে সাদা কাপড়, চিনেমাটি আর স্ফটিকের তুহিন চমকে। এ-কক্ষের শুচিশুভ্র সৌন্দর্যে আর বেশি অলঙ্করণের প্রয়োজন ছিল না। মোমবাতির আলোর প্রতিবিম্বে পালিশ-করা মেঝে যেন চুনির রক্তাভা ধারণ করেছে। দেয়ালে দামি ওক-কাঠের প্যানেল প্রায় ছাদের আধাআধি। আর তারই ওপর দেয়ালের ধার বরাবর কয়েকটা ফুল-ফলের জল-রঙ্ স্কেচ যেন একটা স্বস্তিকর হাল্কা আমেজ এনেছে।

অভ্যর্থনা কক্ষ আড়ম্বরহীন, তবু মার্জিত রুচিতে সাজানো। দেখলে আন্দাজ করা যায় না যে আগামীকাল সকালেই কামরাগুলো খালি হয়ে যাবে, ছেড়ে যাওয়া হবে ধুলো আর মাকড়সাদের হাতে। প্রবেশ কক্ষ চমৎকার ভাবে পামগাছ, ফার্ন আর বিশাল ঝাড়বাতির আলো দিয়ে সাজানো।

সাতটার সময় গ্রাঁদেমঁ সান্ধ্যপোশাকে, নিদাগ শুভ্র লিনেনের শার্টে মুক্তামালা সাজিয়ে—যেটা ওদের পরিবারিক শখ—কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এল। আমন্ত্রণপত্রে আটটার সময় নৈশাহার পর্ব শুরু বলে জানানো হয়েছিল। বারান্দায় একটা আরামকেদারা টেনে নিয়ে সে বসল, ধূমপানের সঙ্গে আধা-স্বপ্নের মেজাজ নিয়ে।

ঘণ্টাখানেক হল চাঁদ উঠেছে। ফটক ছেড়ে পঞ্চাশ গজ ভেতরে মনোরম বাগিচার

ছায়ায় দাঁড়িয়ে বাড়িটা। সামনে বড় সড়ক, তারও পরে ঘাসে-ছাওয়া বাঁধের পথ, আর ওপাশে অতৃপ্ত নদী। বাঁধের একেবারে চূড়া ছাড়িয়ে দূর থেকে গুঁড়ি মেরে আসছে একটা ছোট লাল আলো, পেছনে সবুজ আলোটাও জেগে উঠছে তালে-তালে। তারপর চলমান স্টীমারগুলো সিটি দেয়, আর তার ভগ্ন আওয়াজে চমকে ওঠে বিষণ্ণ নিম্নভূমির তন্দ্রাতুর নীরবতা। নৈঃশব্দ্য আবার ফিরে আসে, শুধু রাতের ক্ষীণ কণ্ঠগুলো ছাড়া—পেঁচার আবৃত্তিপাঠ, ঝিঁঝি পোকার কাটাকাটা সুর, ব্যাঙের সমবেত সঙ্গীত। বস্তির কাচ্চাবাচ্চা আর ভবঘুরেদের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, এবার দিনের জগাখিচুড়ি হৈ-হল্লা পর্যবসিত হয় সুশৃঙ্খল বুঝমান নীরবতায়। ছ'জন কালো পরিচারক সাদা জ্যাকেট পরে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে টেবিলের পাশে ঘোরাঘুরি করছে আর ঠিকঠাক করার ভাণ করছে যেখানে সবই চূড়ান্ত নিপুণতায় সাজানো। কালো চক্‌চকে পাম্প্‌শু-পরা আবসালোম এমন সব জায়গায় ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে যেখানে আলোটা পড়বে ওরই জাঁকালো চেহারায়। আর গ্রাঁদেমঁ চেয়ারে বসে সবুর করছে তার অতিথিদের জন্য।

সে বোধহয় কোনো স্বপ্নের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল—বড় বাড়াবাড়ি রকমের স্বপ্ন—যেন সে শার্লেরয়ের প্রভু আর এ্যাডেল্ তার স্ত্রী। সে এবার চলে আসছে ওর কাছে; ও শুনতে পাচ্ছে তার পায়ের শব্দ; যেন ও তার হাতের ছোঁয়া টের পাচ্ছে কাঁধের ওপর—

'মাপ করবেন, মুশি গ্রাঁদে'—আবসালোমের হাত স্পর্শ করছে তাকে, আবসালোমেরই গলার স্বরটা কালোদের দেশী ভাষায়—'কিন্তু আটটা তো বেজে গেল।'

আটটা বাজে! গ্রাঁদেমঁ লাফিয়ে উঠে পড়ে। চাঁদের আলোয় সে দেখতে পায় ফটকের বাইরে ঘোড়া-বাঁধার খাম্বাগুলো। অনেক আগেই তো অতিথিদের ঘোড়া সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সব যে ফাঁকা।

আঁদ্রের রান্নাঘর থেকে একটা সুর করে রাগেব গর্জন, প্রকাশ্য অপমানে যথার্থভাবে ক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত প্রতিভার কণ্ঠ ভেসে আসে, ছন্দোময় প্রতিবাদে ভরে তোলে গোটা বাড়িটা। অমন সুন্দর ভোজটা, অমন রত্নের মতো একটা ডিনার, অপূর্ব মহিমান্বিত একটা খানাপিনার আয়োজন! কিন্তু আরো একটা মুহূর্ত তো সবুর করতেই হবে, তার আগে বস্তির কালো শুয়োরগুলোর হাজার চেঁচানিও এখানে হাত বাড়াতে পারবে না!

গ্রাঁদেমঁ শান্তভাবে বলে, 'ওরা একটু দেরি করে ফেলেছে, কিন্তু আসবে শিগ্‌গিরই। আঁদ্রেকে বল ডিনারটাকে ঠেকিয়ে রাখতে। আর জিজ্ঞেস কর তো, কোনোক্রমে চরানি মাঠ থেকে কোনো ষাঁড় বাড়ির ভেতর গর্জন করে ঢুকে পড়েছে কিনা।'

ও আবার নিজের সিগারেট নিয়ে বসে পড়ল। যদিও সে বলল কথাটা,

তবে নিজেরই আদৌ বিশ্বাস নেই আজ রাতে শার্লেরয়ে লোকজনের সমাগম হবে কি না। ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম একজন চার্লসের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য হল। কিন্তু গ্রাঁদেমঁ তার সুবিনয় আর মর্যাদার ব্যাপারে এতই সরল, আর বোধ হয় নিজের নামের গৌরব নিয়ে এমন তার অটল আত্মবিশ্বাস, যে আজকের শূন্য ভোজনকক্ষের আসল সম্ভাব্য কারণটাই সে বুঝে উঠতে পারেনি।

শার্লেরয় যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে রাস্তায় রোজই চলাচল করে আবাদের মানুষজন, আর সেই আবাদেই পাঠানো হয়েছে নিমন্ত্রণপত্রগুলো। নিঃসন্দেহে মান্ধাতার বাড়িটার হঠাৎ পুনর্যৌবন লাভের আগের দিনটাতেও তো তারা ওপথে গাড়ি চালিয়ে গেছে, দেখেছে ওটার দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত হতশ্রী চেহারার নমুনা। তারা শার্লেরয়ের মৃতদেহ দেখে গেল আর পরদিনই পেল চার্লস গ্রাঁদেমঁর আমন্ত্রণ লিপি! তাই একটা কুরুচিকর ধাপ্পাবাজি বা ধাঁধা বা যাই ব্যাপারটার মানে হোক না, তাতে হতভম্ব হলেও তারা এর সমাধান খুঁজতে ওই পরিত্যক্ত বাড়িটা দেখতে যাওয়ার মতো আহাম্মুকি তো করতে পারে না।

চাঁদ এখন বাগিচার মাথায় উঠেছে। আঙিনায় ঘন ছায়া, শুধু মোমবাতির হালকা আলো-গলে-পড়া উদ্ভাসিত জায়গাগুলো ছাড়া। নদীর দিক থেকে একটা শিরশিরে হাওয়ায় গভীর রাত নাগাদ তুষারপাতের ইশারা। সিঁড়ির এক পাশের ঘাসে গ্রাঁদেমঁর পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলোর ফুটকিচিহ্ন। তুলো-দালালের কেরানি এখন চতুর্দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছড়িয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। সামান্য পুঁজির এমন নিষ্ফল অপব্যয়ে তার সামান্য দুশ্চিন্তাও আছে বলে আমার সন্দেহ। হয়তো-বা কয়েকটা পুনরুদ্ধার করা প্রহর এইভাবে শার্লেরয়ে বসে থাকলেই তার যথেষ্ট লোকসান-পূরণ। স্মৃতির নানা কল্পনাময় পথে আসা-যাওয়া করে তার অলস মন। বাইবেলের একটা লাইন মনের মধ্যে জেগে উঠতে সে নিজের মনে হাসে—'কোনো দরিদ্র ব্যক্তি একটা ভোজের ব্যবস্থা করল...'

আবসালোমের গলার খাঁকারি পেছন থেকে, তলবের ইঙ্গিত। গ্রাঁদেমঁ নড়েচড়ে ওঠে। এবার সে ঘুমোয়নি—কেবলই তন্দ্রা।

'ন'টা বাজল মুশি গ্রাঁদ।' উপযুক্ত ভৃত্যের ভাঁজহীন কণ্ঠ, যখন কিছু জানায় তাতে নিজস্ব মতের চিহ্নও থাকে না।

গ্রাঁদেমঁ উঠে দাঁড়ায়। চার্লসরা তাঁদের আমলে সবাই পরীক্ষিত ব্যক্তি, তাঁরা বুক ফুলিয়ে হার মানতেন।

শান্তস্বরে বলে, 'ডিনার পরিবেশন কর।' আবসালোম হুকুম মানতে গেলে সে ওকে আটকায়, কারণ ফটকে কে যেন শেকলের আওয়াজ করল, তারপর ভেতরের পথ ধরে বাড়ির দিকে আসতে থাকে সেটা। কী যেন একটা পা হেঁচড়ে আসতে-আসতে নিজের মনে বিড়বিড় করে বকছে। সিঁড়ির ধাপের কাছে

এগিয়ে এসে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলে উঠল, ঘুরে-বেড়ানো ভিখারির চিরপরিচিত ঘ্যানঘ্যানানির সুরে।

'দয়াময় স্যার, একটা দরিদ্র অনাহারী মানুষ, কপাল খোয়ানো— সামান্য কিছু খেতে দেবেন? আর, একটা চালাঘরে একটু ঘুমোবার জায়গা? কারণ'—কথাটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই শেষ হয়ে গেল—'এখন তো আমি ঘুমোতে পারি। রাতে কোনো পাহাড়ের মাথা-ঘোরানো নাচ নেই; তামার কেতলিগুলো মেজে ঝকঝকে সাফ করা হয়েছে। পায়ে আমার লোহার বেড়ি এখনো বাঁধা, একটা শেকলের টুকরোও রয়েছে, যদি ইচ্ছে করেন আমায় শেকল বেঁধে রাখতে পারেন।'

একটা পা জীবটা সিঁড়ির ওপর চাপাল, ঝুলে পড়া ধুকড়ি পোশাক টেনে উঁচু করল। বিকৃত জুতোটায় একশো মাইলের ধুলোর পরত কাদা হয়ে জমে আছে, ওরই ওপরে ওরা দেখল শেকল আর বেড়িটা। ভবঘুরের পোশাক রোদ বৃষ্টিতে খয়ে শতছিন্ন সাদা-কালো নেকড়া হয়ে গেছে। উস্কোখুস্কো বাদামি চুল আর দাড়ি, চাপ বেঁধে মাথা আর মুখ ঢেকেছে, ওর ভেতর থেকে চোখদুটো চেয়ে থাকে বিহ্বলভাবে। গ্রাঁদেমঁ লক্ষ্য করল ওর এক হাতে একটা সাদা চৌকো কার্ড।

জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী?'

'রাস্তার ধারে এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম স্যার,' ভবঘুরে গ্রাঁদেমঁর হাতে কার্ডটা দিয়ে বলল, 'একটু খেতে চাই স্যার। সামান্য ভাজা ভুট্টা, একটা ডিম আর এক মুঠো শিম। ছাগলের মাংস আমি খেতে পারি না। ছাগলের গলা কাটতে গেলে বাচ্চাদের মতো চেঁচায়।'

গ্রাঁদেমঁ কার্ডটা উঁচু করে ধরল। ওরই নিজের ডিনারের নিমন্ত্রণলিপি। নিশ্চয়ই কেউ গাড়িতে যাবার সময় শার্লেরয়ের বাসিন্দাহীন বাড়িটা দেখে কিছু ধারণা করে ফেলে দিয়েছিল।

নিজের মনেই বললে সামান্য হেসে—'পথ থেকে, ঘর থেকে, সবাইকে ডাকো'। তারপর ঘুরে আবসালোমকে বলল—'লুইস্‌কে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো।'

সাদা কোট-পরা লুইস্ তৎক্ষণাৎ চলে আসে, এক সময় তো ওরই ব্যক্তিগত ভৃত্য ছিল সে।

গ্রাঁদেমঁ বলে, 'এই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খেতে বসবেন। এঁকে স্নান করিয়ে পোশাক পরিয়ে আন। কুড়ি মিনিটের মধ্যে এঁকে তৈরি করে দেবে, আর ডিনারও পরিবেশন করবে।'

অশোভন চেহারার অতিথির দিকে লুইস্ এগিয়ে আসে নম্রভাবে, শার্লেরয়ের দর্শনপ্রার্থীর যেটুকু প্রাপ্য, তারপর তাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যায় অন্দরমহলে।

কুড়ি মিনিট বাদে যথাসময়ে ডিনারের ঘোষণা জানায় আবসালোম। আর পরের মুহূর্তেই ভোজনকক্ষে আনা হয় অতিথিকে। গ্রাঁদের্ম সেখানে টেবিলের শিরোভাগে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। লুইসের যত্নে আগন্তুকের চেহারা বদলে ভদ্রস্থ প্রাণীর মতো হয়েছে। পরিষ্কার জামা, আর শহর থেকে কোনো পরিচারকের জন্য আসা পুরনো সান্ধ্য স্যুট পরে তার বহিরাবয়ব যেন জাদুমন্ত্রের মায়ায় একেবারে খুলে গেছে। এলোমেলো মাথার চুল কিছুটা নরম হয়েছে চিরুনি আর ব্রাশের দাপটে। শিল্পকলা বা সঙ্গীতের চালবাজ যারা অদ্ভুত চেহারার ভড়ং দেখান, এখন তাকে অনায়াসে তাদেরই কেউ বলে চালানো যায়। 'আরব্য-রজনী'-সুলভ এত বড় পবিবর্তনের ফলে যে আনাড়িপনা বা ফাঁপরে-পড়া ভাব তার মধ্যে আশা করা গিয়েছিল, তার কিছুই দেখা গেল না লোকটার চেহারায় বা হাবভাবে, সোজাই টেবিলের দিকে এগিয়ে এল সে। যেন এ-রকম আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত এমন ভাব করেই আবসালোমের নির্দেশে গ্রাঁদের্মর ডানদিকে বসতে রাজি হল।

গ্রাঁদের্ম বলল, 'একজন অতিথির সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করতে হচ্ছে বলে আপসোস হয়। আমার নিজের নাম চার্ল্স।'

পথিক বলল, 'পাহাড়ে আমাকে সবাই গ্রিঙ্গো (আমেরিকান) বলে ডাকে। রাস্তাগুলোতে আমায ডাকে 'জ্যাক' বলে।'

'পরের নামটাই আমার পছন্দ। দু'জনে এক পাত্র ওয়াইন হয়ে যাক, মিঃ জ্যাক।'

অতিরিক্ত সংখ্যায় পরিচারক. পদের পর পদ খানা পরিবেশন করে তারা। আঁদ্রের অপূর্ব রান্নার গুণে আর নিজের পছন্দ-করা পানীয়গুলোর উৎকর্ষের ফলে উৎসাহিত গ্রাঁদের্ম, আদর্শ গৃহকর্তা হয়ে দাঁড়ায়—কথার ফুলঝুরি, যেমন রসিকতাময় তেমনি অমায়িক। অতিথি বাক্যালাপে কেমন যেন খামখেয়ালি। তার মনে এক্কেবার একটানা স্মৃতিভ্রংশতা, আবার তারপরেই অনেকটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। সাম্প্রতিক জ্বরের চক্চকে লক্ষণাভাস দু'চোখে। দীর্ঘদিন ভোগার ফলেই বোধ হয় রোগা আর দুর্বল লোকটা, আনমনা। রোদ-বাতাসে টান চামড়ার ভেতর দিয়েও ফুটে বের হচ্ছে ম্লান বিবর্ণতা।

গ্রাঁদের্মকে বলল, 'চার্লস'—ওভাবেই নামটাকে বুঝে নিয়েছিল সে—'আপনি কখনো পাহাড়ের নাচ দেখেননি, তাই না?'

গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় গ্রাঁদের্ম, 'না, মিঃ জ্যাক, ও দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু এটুকু আপনাকে বলছি, ওটা যে একটা আশ্চর্য দৃশ্য হবে তা আমি বুঝি। উঁচু পাহাড়গুলো বরফের টুপি মাথায় নিয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচে, বুঝলেন—'

'আগে যে আপনাকে কেতলি মাজতে হবে'.—উত্তেজিত মিঃ জ্যাক ঝুঁকে পড়ে বলে, 'সকালে শিমগুলো রাঁধতে হবে তো. .তারপর কম্বলের ওপর শুয়ে

থাকবেন চুপটি করে। তখন ওরা বেরিয়ে এসে আপনাকে দেখিয়ে নাচবে। আপনারও ইচ্ছে করবে গিয়ে ওদের সঙ্গে নাচেন, কিন্তু রোজ রাতে ওই কুঁড়ে-বাড়ির খুঁটিতে তো আপনি শেকল দিয়ে বাঁধা। আপনি বিশ্বাস করেন পাহাড়গুলো নাচে, তাই না চার্লি?'

গ্রাঁদেমঁ হেসে বলে, 'পথিকদের গল্প, আমি কখনো এতে প্রতিবাদ করি না।'

খুব জোরে হেসে ওঠে মিঃ জ্যাক। তারপর গলার স্বর নামিয়ে চুপিচুপি ফিস্‌ফিসিয়ে বলে—'যদি বিশ্বাস করে থাকেন তা'হলে আপনি বোকা। ওরা তো সত্যি সত্যি নাচে না। আপনার মাথার ভেতর জ্বরের কাজ ওটা, হাড়ভাঙা খাটুনি আর খারাপ জলের ফলে। হপ্তার পর হপ্তা অসুখে পড়ে রইলেন, কিন্তু ওষুধ নেই। রোজ সন্ধ্যায় জ্বর আসে, তখন আপনার গায়ে দু'নো শক্তি। একরাতে কোম্পানিয়া 'মেস্‌কাল' খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকল। তারা বস্তা-বস্তা রুপোর ডলার বয়ে এনেছে ঘোড়া চালিয়ে, তাই উৎসব মদ খেয়ে। রাতে আপনি শেকলটাকে ঘষে দু'ভাগ করে পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে। মাইলের পর মাইল হাঁটলেন—কত শো মাইল! আস্তে আস্তে পাহাড়গুলো সব মিলিয়ে গেছে, আপনি এসে পড়েছেন প্রেইরির মাঠে। ওরা কিন্তু রাতে নাচে না, ওদের দয়ামায়া আছে, আপনি ঘুমোতে পারেন। তারপর আপনি এলেন নদীর পাড়ে, নদী আপনাকে কত কী বলে! পাড় ধরে চলে যান, চলে যান, কিন্তু যা আপনি চান তা যেন খুঁজেই পাচ্ছেন না।'

মিঃ জ্যাক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে; তার চোখ ধীরে বুজে যায়। খাদ্য আর পানীয় তাকে পরিপূর্ণ করে গভীর শান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। মুখে যন্ত্রণার টান-টান ভাবটা এবার মসৃণ। প্রাচুর্যের অবসাদ তাকে আচ্ছন্ন করেছে। বিজড়িত কণ্ঠেই ফের বলে—'এটা যে অভদ্রতা, তা তো জানি... টেবিলে বসে.. ঘুমিয়ে পড়া। কিন্তু কী চমৎকার ডিনার যে হল... গ্রাঁদে... বুড়ো মানুষ।'

গ্রাঁদে!— ও-নামের মালিক চমকে উঠল, নামিয়ে রাখল নিজের গেলাস। এই হতভাগা ছেঁড়া-নেকড়াপরা লোকটা, যাকে ও গল্পের খলিফার মতো পাশে বসিয়ে খাওয়াল, কেমন করে জানল ওর নাম?

একবারেই নয়, কিন্তু ধীরে-ধীরে, ওর সন্দেহটা—উদ্দাম অযৌক্তিক হলেও—মগজের মধ্যে দ্রুত সেঁধিয়ে গেল। ঘড়িটা বের করল এমন কাঁপা হাতে যে ওর অসুবিধাই হচ্ছিল। ঘড়ির পেছনের ঢাকনাটা খুলল। ওতে একটি ছবি রয়েছে, ঢাকনার ভেতর দিকে সাঁটা একটা ফোটোগ্রাফ।

উঠে দাঁড়িয়ে গ্রাঁদেমঁ মিঃ জ্যাকের কাঁধ ধরে ঝাঁকায়। ক্লান্ত অতিথি চোখ মেলে চায়। গ্রাঁদেমঁ ঘড়িটা তুলে ধরে।

'দেখুন তো এটা মিঃ জ্যাক। আপনি কি কখনো—'

'আমার বোন এ্যাডেল যে!'

সমস্ত কামরাটা উঁচু আকস্মিক আওয়াজে কেঁপে উঠল, ভবঘুরের কণ্ঠস্বরে: পা বাড়িয়ে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু গ্রাঁদেমঁর বাহু তাকে জড়িয়ে ধরেছে। গ্রাঁদেমঁ তাকে ডাকছে—'ভিক্টর! ভিক্টর ফোকিয়ের। ধন্য, ধন্যবাদ... হে ঈশ্বর!'

সে রাতে সেই হতভাগ্য এমনই অবসন্ন, ঘুমে কাতর, যে আর কথাই হল না কিছু। বেশ ক'দিন পর যখন তার রক্তশিরার মধ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলের বিকারজ্বর স্তিমিত হয়ে গেল, তার ছন্নছাড়া কথাগুলোর টুকরো জোড়া দিয়ে অবশেষে পুরো ধারাবাহিক কাহিনীটা জানা গেল। অভিমানভরে লড়াই, পালিয়ে সমুদ্র আর সাগরতীরে প্রচণ্ড খাটুনি ও চরম দুর্দশা, দক্ষিণের দ্বীপগুলোতে জোয়ারভাঁটা ভাগ্যের খেলা, আর তার সর্বশেষ বিপদ মেক্সিকোর সোনোরা পাহাড়ে বন্দী থেকে একদল ডাকাতের আড্ডায় গোলামি খাটা। আর সেই বিকার জ্বর তাকে ওখানেই ধরেছিল, তারপর পালিয়ে বিকারের ঘোরে ও খালি এদিক-ওদিক ঘুরেছে, হয়তো বা অদ্ভুত কোনো সহজাত সংস্কারবলেই ফিরে আসে সেই নদীর পাড়ে সেখানে তার জন্ম। আর জানা গেল, ওর রক্তে সেই গর্বিত একবগ্‌গা ভাবের কথা যা ওকে এত বছর মূক করে রেখেছিল, আর নিজের অজান্তেই একজনের মর্যাদাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছিল, মিলতে দেয়নি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কে। আপনি হয়তো বলবেন, 'প্রেম যে কী জিনিস'! আমি সেটা মেনে নিলে আমার সঙ্গেই সুর মিলিয়ে ফের বলবেন, 'অহঙ্কার যে কী জিনিস!'

অভ্যর্থনা কক্ষের একটা কৌচে শুয়ে আছে ভিক্টর। ওর ভারী চোখে উদীয়মান উষার উপলব্ধি; স্নিগ্ধ চেহারায় প্রশান্তি। আবসালোম শার্লেরয়ের ক্ষণস্থায়ী প্রভুর জন্য একটা বিশ্রামের জায়গা প্রস্তুত করছিল—প্রভু তো আবার তুলোর দালালের কেরানিই হতে যাচ্ছেন আগামী কাল, কিন্তু তা ছাড়াও—

অতিথির কৌচের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রাঁদেমঁ বলছিল, 'কাল! কাল তো আমি তোমাকে ওর কাছেই নিয়ে যাচ্ছি।' এ যেন স্বর্গ থেকে ঘুরে এসে এলিজার সারথির উদ্দীপ্ত মুখে স্বর্গ যাত্রার বর্ণনা!

The Renaissance at Charleroi, মে, ১৯০২

"ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার"

টেক্সাসে আপনি সোজা পথে হাজার মাইল চলে যেতে পারেন। যদি আপনার পথ হয় বাঁকা, তা'হলে দূরত্ব আর আপনার ভ্রমণের গতি দুটোই হয়তো বহুগুণে বেড়ে যাবে। সেখানে মেঘের দল অতি শান্তভাবে পাড়ি দেয় আকাশে, হাওয়ার প্রতিকূলে। গুঁতোলেও না-চলার ইচ্ছা প্রবোধহীন কান্না ঝরায়—সে সুর তার উত্তরের প্রতিবেশী ভাইটির একেবারে উল্টো। একবার খরা হয়ে গেলে তারপরেই আবার তুমুল বর্ষা, আর কী আশ্চর্য!—পাথুরে তৃণহীন মাটি থেকে এক রাতের মধ্যেই ফুটে বেরিয়ে আসে লিলিফুলের ঝাঁক, আজব রকমের ঝলমলে! টম গ্রীন জেলাটা এক সময় ছিল সরকারী মাপের মানদণ্ড। এখন ভুলেও গেছি কতগুলো নিউ-জার্সি আর রোড-আইল্যাণ্ড রাজ্য এর ওক বনের মধ্যেই ঠাসবন্দী হয়ে হারিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আইনের কুড়োল এসে টম গ্রীনকে কেটে ছেঁটে এমন কতকগুলো টুকরো জেলা বানাল যার একেকটা ইউরোপীয় রাজ্যগুলোর চেয়ে বড় নয়। আইনসভার অধিবেশন হয় অস্টিনে—রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রের কাছে; আর রিও-গ্রাণ্ডে এলাকার প্রতিনিধি যখন তালপাতার হাতপাখা আর ধুলোঝাড়ার লিনেন নিয়ে তৈরি হচ্ছেন রাজধানীতে যাবেন বলে, ততক্ষণে ক্ষুদে রাজ্যের আইনজ্ঞ তাঁর বোতাম আঁটা ওভারকোটের ওপর মাফলার জড়িয়ে, চক্চকে বুটজুতো থেকে বরফ ঝেড়ে তৈরি—ওই একই পথে যাত্রী। এ সবই বলছি শুধু এইটুকু ইঙ্গিত দিতে যে দক্ষিণ-পশ্চিমের এই বিশাল প্রাক্তন-প্রজাতন্ত্রটি রাষ্ট্রপতাকার একটি জাঁদরেল তারকা, বলছি একটা অনুসিদ্ধান্তের জন্য তৈরি থাকতে যে সেখানে এমন-এমন কাণ্ড ঘটে যা নক্শামাফিক কাটা নয়, মাপ আর সীমানার বেড় দিয়ে বাঁধাও নয়।

টেক্সাস রাজ্যের বীমা-পরিসংখ্যান-ও-ইতিহাস দপ্তরের কমিশনার গুরুত্বের দিক থেকে খুব বড় কিছু ছিলেন না, আবার একেবারে হেলাফেলাও ছিলেন না। ক্রিয়াপদে অতীতকালটা ব্যবহার করলাম, কারণ এখন উনি শুধুমাত্র বীমার কমিশনার। সরকারী নথিপত্রে পরিসংখ্যান আর ইতিহাস এখন নামবাচক বিশেষ্য পদ নয়।

১৮৮- সালে গভর্নর এই বিভাগের প্রধান পদাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন লূক কুনরড স্ট্যাণ্ডিফারকে। স্ট্যাণ্ডিফারের বয়েস তখন পঞ্চান্ন, হাড়ে-হাড়ে টেক্সান। স্ট্যাণ্ডিফারের বাপ ছিলেন এ রাজ্যের আদি প্রবর্তক আবাসনকারীদের মধ্যে একজন। স্ট্যাণ্ডিফার নিজেও কমনওয়েলথের সেবা করেছিলেন মার্কিনী-ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা, সেপাই, রেঞ্জার আর আইনসভা সদস্য হিসেবে। খুব একটা বিদ্যাবুদ্ধির দাবি করতেন না, তবে অভিজ্ঞতার উৎস থেকে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

অন্য ক্ষেত্রগুলোতে তেমন পর্যাপ্ত না হলেও, টেক্সাস কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' প্রজাতন্ত্র হিসেবে সম্মানের তালিকায় অনেক উঁচু স্থানে। কারণ প্রজাতন্ত্র বা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য উভয় রূপেই সে তার সন্তানদের মাথার ওপর কালবিলম্ব না করে ঢেলে দিয়েছে সত্যকার পুরস্কার আর মর্যাদার আশীর্বাদ—তারাই তো চাষবাসহীন বুনো জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছিল এ রাজ্যটাকে।

সেইভাবে এবং সেই কারণেই, এজরা স্ট্যাণ্ডিফারের ছেলে লূক কুনরড স্ট্যাণ্ডিফার—প্রাক্তন রেঞ্জার, খাঁটি গণতন্ত্রী আর রাজনৈতিক ভূগোলের মানচিত্রে প্রায় প্রতিনিধিত্বহীন একটা অংশের ভাগ্যবান বাসিন্দা—পেয়ে গেলেন কমিশনারের পদটা।

যে পদে তিনি নিযুক্ত হতে যাচ্ছেন তার প্রকৃতি কী হবে, ও-কাজে তাঁর যোগ্যতা আছে কিনা, এসব সন্দেহ মনে নিয়েও তিনি সম্মানটা গ্রহণ করলেন। মেনে নিলেন এবং 'তার' করে সেটা জানিয়েও দিলেন। ক্ষুদে একটা মফস্বল শহরে তিনি জরিপ ও মানচিত্র আঁকার একটা দপ্তর রেখেছিলেন (ঘুমন্ত নিষ্ফল দপ্তরটা অবশ্য তাঁর নিজের দেখভাল বিশেষ করেনি), সেই শহর থেকেই তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। যাবার আগে "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" ঢুঁড়ে দেখলেন— 'বীমা' 'পরিসংখ্যান' 'ইতিহাস' ইত্যাদি শব্দগুলোর নিচে কী তথ্য, সরকারী কোন্ কর্তব্যের হদিশ দেওয়া হয়েছে ওই জবরদস্ত ভল্যুমগুলোতে।

কয়েক সপ্তাহ অধিষ্ঠান করেই নতুন কমিশনারের ভয়ডর কমে গেল বিশাল, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরটা সম্বন্ধে, তাঁকেই তো এবার চালাতে হবে সে দপ্তর। যতই এর কাজেকর্মের সঙ্গে পরিচয় বাড়তে থাকল ততই ফিরে আসতে লাগল তাঁর অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের ধারা। ওঁর দপ্তরে একজন বুড়ো চশমাপরা কেরানি রয়েছেন—একেবারে চৌকস উৎসর্গিত প্রাণ, অভিজ্ঞ যন্ত্র বিশেষ—ওপরওলাদের অদলবদল ঘটলেও তাঁর আসনটি যথাস্থানেই পাকা। বুড়ো কাউফমান ধীরে ধীরে তাঁর নতুন চীফকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন তাঁর বিভাগের ব্যাপারস্যাপার (বাইরে থেকে অবশ্য সেটা নজরে পড়ল না)। একটি খাঁজও বেচাল না করে চালু রাখলেন দপ্তরের চাকা।

বাস্তবিকপক্ষে, 'বীমা-পরিসংখ্যান- ইতিহাস' বিভাগটাকে এ-রাজ্যের বোঝা বিশেষ-কিছুই বইতে হয় না। এর প্রধান কাজ হল রাজ্যে যে সব বিদেশী বীমা কোম্পানি ব্যবসা করেছে তা নিয়ন্ত্রণ করা, আর সে-ব্যাপারে আইনের খুঁটিনাটি আছে পথ দেখাতে। পরিসংখ্যান? সে তো স্রেফ জেলা অফিসারদের চিঠি লেখা, অন্য লোকদের রিপোর্টের ওপর কাঁচি চালানো, আর প্রতি বছরে নিজস্ব একটা বিবরণ তৈরি করা—ভুট্টার ফলন, তুলোর ফলন, পেকান বাদাম, শুয়োর, সাদা-কালো অধিবাসীদের সংখ্যা, আর 'বুশেল,' 'একর', 'বর্গমাইল' ইত্যাদি শিরোনামে বড়-বড় অঙ্কের কলম বসানো—ব্যস্ হয়ে গেল। ইতিহাস?

সে শুধু একতরফা পাওয়ার ব্যাপার। ও বিষয়ে উৎসাহী বুড়ি মহিলারা একটু-আধটু বিরক্ত করেন তাঁদের 'ঐতিহাসিক পরিষদ'গুলোর লম্বা কার্যবিবরণী পাঠিয়ে। বছরে প্রায় বিশ-ত্রিশজন আপনাকে লিখে জানাবেন যে তাঁরা স্যাম হুস্টনের পকেট-ছুরি, বা সান্টা আনা'র হুইস্কি বোতল, অথবা ডেভি ক্রকেটের রাইফেল খুঁজে পেয়েছেন—সবই রীতিমতো খাঁটি বলে চিহ্নিত—আর তাই দাবি জানাবেন ওগুলো সরকার থেকে কিনে নেবার জন্য আইন জারি করা হোক্। 'ইতিহাস' শাখার বেশির ভাগ গবেষণা পত্রই বাতিল কাগজের খোপে ঢুকে যায়।

রোদ-চনচনে আগস্টের এক বিকেলে কমিশনার তাঁর দপ্তরের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন, সবুজ বিলিয়ার্ড-কাপড়ে ঢাকা সরকারী লম্বা টেবিলটার ওপর পা তুলে দিয়ে। কমিশনার চুরুট টানছেন আর স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে আছেন জানলার ফ্রেমে ধরা বাইরের কম্পিত নিসর্গদৃশ্যের দিকে, সামনে বৃক্ষহীন শাসনসৌধের চত্বর। হয়তো ভাবছিলেন তাঁর রুক্ষ আর উদ্দাম অতীত জীবনের কথা, সেই সব শ্বাসরোধী অ্যাডভেঞ্চার আর দৌড়ঝাঁপের পুরনো দিনগুলো, সেইসব সাথীর কথা যারা আজ অন্য পথের পথিক কিংবা হয়তো পথই ছেড়ে দিয়েছে। সভ্যতা আর শান্তি যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে! আর হয়তো কিছুটা আত্মসন্তুষ্টভাবেই, এই সৌধের গম্বুজের নিচে নিরাপদ আরামপ্রদ ঘাঁটিটার কথা ভাবছেন, যা সরকার তাঁকে দিয়েছে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে।

তাঁর ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম শ্লথ। বীমার ব্যাপারটা সহজ। পরিসংখ্যানের চাহিদা নেই। ইতিহাস মৃত। সুদক্ষ নিরলস কেরানি, বুড়ো কাউফমান, আজ বিরল ঘটনার মতো আধাদিনের ছুটি চেয়ে নিয়েছেন—অস্বাভাবিক শখটা হয়েছিল সফলভাবে কনেক্টিকাটের এক বীমা কোম্পানির লেজ মোড়ানোর আনন্দে। তারা এমন এক জাঁদরেল রাজ্যের আইন ভেঙে ব্যবসা করতে চেষ্টা করে!

দপ্তর একেবারে নিস্তব্ধ। অন্য বিভাগগুলোর নানা চাপা আওয়াজ খোলা দরজা দিয়ে গলে আসে—পাশের কোষাধ্যক্ষের অফিস থেকে একটা ভোঁতা ঝন্‌ঝন্ শব্দ, ভল্টের মেঝেতে কোনো কেরানি বোধহয় এক থলি রৌপ্যমুদ্রা ছুঁড়ে দিল—একটা বিলম্বিত টাইপমেশিনের ছাড়া-ছাড়া অস্পষ্ট খট্‌খটানি—রাজ্য-ভূতাত্ত্বিকের এলাকা থেকে একটা ভোঁতা ধপ্‌ধপ, যেন কোনো কাঠঠোকরা উড়ে এসে ঢুকেছে বিশাল বাড়ির ঠাণ্ডায় তার শিকার ধরার জন্য কোথাও ফুটো করতে—আর তার পরেই হলঘর ধরে বহুব্যবহৃত জুতোর হাল্‌কা চলার শব্দ, সামান্য খস্‌খসানি, আওয়াজটা এসে থেমে যায় দরজাটার কাছে, যেদিকে কমিশনারের অলস পৃষ্ঠদেশ ঘোরানো। এর পরে পরেই, কমিশনারের কিছুটা তন্দ্রাতুর বোধশক্তির পক্ষে দুর্বোধ্য একটা নরম কণ্ঠে কিছু কথার আওয়াজ, তবে তাতে হতভম্ব, দ্বিধার আভাস।

কণ্ঠস্বরটা কোনো নারীর। কমিশনারও সেই বীর জাতের পুরুষ যাঁরা ঘাগরার লুণ্ঠিত প্রান্ত দেখলেই 'সালাম' জানান, কাপড়ের গুণাগুণ বিচার করেন না।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন পাংশুমুখী মহিলা, তার অসংখ্য অসুখী বোনদেরই একজন হবে। পুরো কালো পোশাক পরা—সুখ-বঞ্চিত দারিদ্র্যের চিরকালীন শোক-বাস। মুখের অবয়বে কুড়ির আভাস থাকলেও রেখায় আঁকা চল্লিশ। হয়তো-বা মাঝখানের কুড়ি বছর হু-হু করে কেটে গেছে বারোমাসেই। ওর দেহ ঘিরে এখনও প্রতিবাদী যৌবনের ক্ষুব্ধ অপ্রশমিত একটা আভা—অনাকাঙ্ক্ষিত হীনতার বালপ্রৌঢ় ঘোমটা থেকে ম্লানভাবে উঁকি দিচ্ছে।

চেয়ারটাকে মহা শব্দ করে একপাশে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন কমিশনার—'মাপ করবেন মাডাম।'

'আপনিই কি গভর্নর স্যর?'—বিষাদের প্রতিমার প্রশ্ন।

অভিবাদনের ঘটা দেখাবার পর, ডবল ব্রেস্ট ফ্রক-কোটের বুকে হাত রেখে দ্বিধান্বিত হল কমিশনার। অবশেষে সত্যেরই জয় হয়। 'আজ্ঞে না মাডাম, আমি গভর্নর নই। আমি বীমা-পরিসংখ্যান ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত কমিশনার। আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি মা'ম্? একটা চেয়ারে বসবেন না, মা'ম্?'

এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় এলায়িত হল মহিলা, বোধহয় নিছক দৈহিক কারণেই। ভদ্রসমাজের পরিত্যাজ্য শেষ চিহ্ন একটা শস্তা হাত-পাখা নেড়ে একটু হাওয়া খেল। তার পোশাকে-আশাকে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ। সে চেয়ে দেখল লোকটার দিকে, যিনি গভর্নর নন্,—আর দেখল সহৃদয় সারল্য, একটা কর্কশ ভূষণহীন ভদ্রতাবোধ। চল্লিশ বছরের গৃহবহির্ভূত জীবনে কঠিন পোড়-খাওয়া দেহ থেকেই আসে এধরনের ভদ্র আচরণ। মহিলা এও দেখল যে তাঁর চোখদুটো নির্মল, সবল, আর নীল। ঐরকমই তো ছিল চোখ-দুটো যখন তা দিগন্ত টুঁড়ে বেড়াত কিওয়া আর সিউ'দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। এমনই বদ্ধচোয়াল দৃঢ়-ওষ্ঠ ছিল সেদিনও, যখন তিনি স্বয়ং বুড়ো সিংহ স্যাম হুস্টনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন—সে ছিল রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা দাবির যুগ। এখন অবশ্য পোশাকে-আচরণে লূক কুনরড স্ট্যাণ্ডিফার বীমা-পরিসংখ্যান-ইতিহাসের মূল্যবান কলা-বিজ্ঞানকে যথাযথ মর্যাদা দেবার চেষ্টা করছেন। দেশ-গাঁয়ের ঢিলেঢালা পোশাক ত্যাগ করেছেন। এখন চওড়া-কানাত কালো নরম টুপি আর লম্বা-ঝুলের ফ্রক-কোটে দিব্যি মানিয়ে গেছেন সরকারী কর্তাব্যক্তিদের পরিবারে।

'আপনি কি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন, মা'ম?'— সশ্রদ্ধ বাধ্যতার সুরটা কমিশনার সর্বদাই ব্যবহার করেন মহিলাদের উদ্দেশে।

দ্বিধাগ্রস্তা মহিলা বলে, 'সে ঠিক জানি না। হয়তো সেই রকমই।' হঠাৎই সে এবার অন্য ব্যক্তির সমবেদনা-ভরা দৃষ্টিতে আকৃষ্টা হয়ে, তার প্রয়োজনের পুরো কাহিনীটাই বলে ফেলল উজাড় করে।

এ কাহিনী এমনই সাধারণ, যে লোকে এসব কথার একঘেয়েমিটাই দেখে, করুণা বোধ করে না। অসুখী বিবাহিত জীবনের সেই পুরনো গল্প—একজন পাশবিক, বিবেকশূন্য স্বামী, ডাকাত, খরচে, নৈতিক কাপুরুষ, নিম্নতম অস্তিত্বের উপায়টুকু করতেও যে অপারগ এমনই এক জুলুমবাজ স্বামী তার এই হাল করেছে। হ্যাঁ, এমনই নীচতার দিকে নেমে এসেছিল যে ওকে আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। আগের দিনই ব্যাপারটা ঘটে—ওর কপালের একদিকে এখনো দাগ রয়েছে—মহিলা 'হিজ-হাইনেস্'কে চটিয়ে দিয়েছিল বাঁচার মতো সামান্য ক'টি টাকা চেয়ে। কিন্তু তবু, মহিলাদের যা হয়, অত্যাচারী স্বামীর সপক্ষে কিছু যুক্তি সে দেখাবেই—'মদ-টদ খেত তো; প্রকৃতিস্থ থাকলে কক্ষনো এমন দুর্ব্যবহার করত না।'

পাংশুমুখী মহিলা যেন দুঃখের সাক্ষাৎ সহোদরা। করুণ কণ্ঠে বলল 'আমি ভেবেছিলাম সরকার থেকে হয়তো আমায় কিছু সাহায্য দিতে রাজি হতে পারে। শুনেছি পুরনো আবাসনকারীদের পরিবারের জন্য এমন ব্যবস্থা আগে করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। লোকের কথাতে জেনেছি, যে-সব লোক দেশের জন্য মেক্সিকোর বিরুদ্ধে লড়েছিল, দেশ গড়ে তুলেছিল, ইণ্ডিয়ানদের তাড়াতে সাহায্য করেছিল তাদের রাজ্য থেকে জমিদান করা হত। আমার বাবা তো এসমস্ত কিছুই করেছিলেন, তবে কখনো কিছু পাননি। তিনি অবশ্য নিতেনও না। ভেবেছিলাম এব্যাপারে বুঝি গভর্নরের সঙ্গেই দেখা করতে হয়, আর সেই কারণেই এসেছিলাম। বাবার যদি এরকম কোনো অধিকার প্রাপ্য থাকত, তাহলে তা হয়তো আমাকেও দিতে পারেন এঁরা।'

স্ট্যাণ্ডিফার বললেন, 'সেটা হয়তো সম্ভব, মা'ম্, এরকমটা তো হতেই পারত। কিন্তু বেশির ভাগ প্রবীণ যোদ্ধা বা আবাসনকারী যে অনেক আগেই নিজেদের জমির স্বত্ব পেয়ে জমি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তবু আমরা জমিসংক্রান্ত দপ্তরে ওটা খোঁজ করেই নিশ্চিত হতে পারি। এখন আপনার বাবার নাম—'

'অ্যামোস্ কলভিন, স্যর।'

'হা ভগবান্!'— উত্তেজনাভরে উঠে দাঁড়িয়েই আঁটসাট কোটের বোতাম খুলে ফেলেন স্ট্যাণ্ডিফার, 'তুমি অ্যামোস কলভিনের মেয়ে? আরে, মা'ম্, আমি আর কলভিন যে দুটো ঘোড়াচোরের চেয়েও ঘনিষ্ঠ ছিলাম, দশ বছরেরও বেশি। সারা টেক্সাসে ঘুরে আমরা কিওয়াদের সঙ্গে লড়েছি, গরুঘোড়া তাড়িয়েছি, পাশাপাশি রেঞ্জার রক্ষীর কাজ করেছি। হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে, তোমাকে আগে একবার আমি দেখেছি। তুমি তখন একেবারে বাচ্চা, সাতের মতো বয়েস, একটা হলদে পনিতে চড়ে ওপরে-নিচে দৌড়োচ্ছিলে। অ্যামোস্ আর আমি সেবার মেক্সিকান পশু-চোরদের তাড়া করছিলাম কার্নেস আর বী'র ভেতর দিয়ে, আমরা তোমাদের

বাড়িতে থেমে যা-হোক-কিছু খেয়ে নিলাম। কী আশ্চর্য কাণ্ড! তুমি অ্যামোস্ কলভিনের ছোট মেয়ে! কখনো বাবার মুখে শুনেছিলে লূক স্ট্যাণ্ডিফারের নাম?—হয়তো কথায়-কথায়, যেন আমার সঙ্গে দু'একবার তার দেখা হয়েছে বলে?'

মহিলার ফ্যাকাশে মুখে একটা ছোট হাল্কা হাসি খেলে গেল।

বলল, 'অন্য কোনো কথা তো তার মুখে শুনেছি বলে মনেই পড়ে না। রোজই একটা করে গল্প তাকে বলতে হত তিনি আর আপনি কী কাণ্ড করতেন সেসব নিয়ে। একেবারে শেষ যে-সব কথা শুনেছি তার মুখে, সেই ইণ্ডিয়ানরা যেবার তাকে জখম করে ফেলে রেখেছিল আর আপনি ঘাসেব ভেতর গুঁড়ি মেরে তার কাছে একটা জলের ক্যান নিয়ে গিয়েছিলেন, যখন—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—তবে—ও তো কিছুই নয়',— স্ট্যাণ্ডিফার তোতলাতে থাকেন আর কোটের বোতাম আঁটেন ফের— 'এখন বল মা'ম, কোন্ সে হতভাগা —মাপ কর মা'ম্—কে সেই ভদ্রলোক যাকে তুমি বিয়ে করেছ?'

'বেন্টন শার্প।'

কমিশনার আবার ধপ্ করে বসে পড়লেন চেয়ারে, সঙ্গে একটু কঁকানি। এই ম্লানমুখ ছোট্ট ভদ্রমহিলাটি, জীর্ণ কালো গাউন পরা, তাঁর সবচেয়ে পুরনো বন্ধুর মেয়ে হল বেন্টন শার্পের স্ত্রী! বেন্টন শার্প রাজ্যের এ অঞ্চলে সবচেয়ে "জঘন্য"

মানুষ বলে পরিচিত। লোকটা আগে ছিল ঘোড়াচোর, ফেরারি আসামী, বেপরোয়া দুর্বৃত্ত, এখন সে একজন জুয়াড়ি, প্রতাপ-জাহির করা মস্তান। তার কর্মক্ষেত্র প্রধানত বড় সীমান্ত-শহরগুলোতে। পুরনো নজির আর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ক্ষিপ্রতার ওপর ভরসা করেই নিজের কর্তাত্তি বজায় রাখে। খুব কম লোকই বেন্টন শার্পের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ঝুঁকি নিতে সাহস পায়। এমন-কি আইনের রক্ষকরা অবধি খুশি হয় তাকে নিজের শর্তে শান্তি বজায় রাখতে দিয়ে। শার্প, সদাপ্রস্তুত অমোঘ লক্ষ্যের বন্দুকবাজ। এমন ভাগ্যবান যে দেহে আঁচড়টিও না লাগিয়ে ঝকঝকে নতুন-সিকির মতো সর্বদা বেরিয়ে আসে। স্ট্যাণ্ডিফার ভেবে অবাক হলেন কেমন করে এই লুটেরা ঈগলটার সঙ্গে অ্যামোস্ কলভিনের ছোট্ট কপোতটির মিলন হল। সে বিষয়ে বিস্ময়ও প্রকাশ করলেন।

শ্রীমতী শার্প দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বুঝলেম, মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার, আমরা ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, তা ছাড়া ইচ্ছে করলেই উনি ভীষণ মিষ্টি আর দরদী হতে পারেন। আমরা বাস করতাম ছোট্ট শহর গোলিয়াডে। বেন্টন ওই রাস্তাতেই একবার আসছিলেন, ওখানে কিছুকাল থাকলেন উনি। মনে হয় তখন আমি এখনকার তুলনায় অনেকটা ভালোই ছিলাম

দেখতে। আমাদের বিয়ে হয়ে যাবার পর পুরো এক বছর উনি আমার সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার করেছেন। আমার অনুকূলে নিজের জীবন বীমাও করেছিলেন পাঁচ হাজার ডলারের। কিন্তু গত ছ'মাস ধরে,. এক খুন করা ছাড়া সব রকম দুর্ব্যবহারই করেছেন আমার সঙ্গে। একেকবার ভাবি সেটা করলেও তো ভালই হত। কিছুকাল ওঁর টাকা পয়সায় টান পড়ল, আর আমাকেই নির্লজ্জের মতো গালাগাল করতে লাগলেন তাঁর খরচা করার মতো কিছুই আমার নেই বলে। এই সময় বাবা মারা গেলেন, আর আমার জন্য রেখে গেলেন তাঁর গোলিয়াডের ছোট বাড়িটা। আমার স্বামী আমায় বাড়িটা বিক্রি করতে বাধ্য করলেন, আর আমাকে ছুঁড়ে দিলেন বাইরের রাস্তায়। আমি কোনোরকমে বেঁচে আছি মাত্র, কারণ খাটা-খাটুনির মতো শক্ত শরীর আমার নয়। এই সেদিন শুনলাম উনি সান আন্টোনিওতে টাকা কামাচ্ছেন, তাই চলে গেলাম সেখানে। খুঁজেও বের করলাম তাঁকে, একটু সাহায্য ভিক্ষা করলাম তাঁর কাছে।'—কপালের কালচে আঘাত চিহ্নটায় আঙুল ছুঁয়ে বলল, 'এইটা পুরস্কার দিলেন আমায়। তাই অস্টিনে চলে এলাম গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে। একবার বাবার মুখে শুনেছিলাম সরকার থেকে নাকি কিছু জমি আর পেনশন আসছিল তাঁর নামে, কিন্তু উনি কখনোই ওসব চাননি।'

লূক স্ট্যাণ্ডিফার উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিলেন। সুসজ্জিত আসবাবপত্র-ওয়ালা প্রশস্ত দপ্তরটার মধ্যে একবার বহুল চোখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

ধীরে ধীরে বললেন, 'গভর্নমেন্টের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করতে চেষ্টা করলে লম্বা সূত্র ধরে এগোতে হয়। লাল ফিতে আছে। উকিল, নিয়মকানুন, প্রমাণ, আদালত সবাই সবুর করিয়ে রাখবে। আমি খুব নিশ্চিত নই।'—কমিশনারের কপালে গভীর চিন্তার ভ্রূকুটি—'এই যে ডিপার্টমেন্ট, যার আমি কর্তা, এর কোনো এক্তিয়ার এতে আছে কি নেই? এ শুধু বীমা, পরিসংখ্যান, ইতিহাস, মা'ম্, শুনলে তো মনে হয় না কেসটার ওপর এর কোনো আওতা থাকতে পারে। তবে সময় সময় ঘোড়ার জিনের কম্বলও বিছিয়ে শোয়া যায়। মাম্, তুমি তোমার আসনে কয়েক মিনিট বসো, আমি একটু পাশের কামরায় গিয়ে দেখি কী করা যেতে পারে।'

রাজ্য কোষাধ্যক্ষ তাঁর বিপুল জটিল রেলিংগুলোর পেছনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সারা দিনের মতো কাজ শেষ। কেরানিরা ডেস্কে গড়াচ্ছেন, সবুর করছেন ছুটির ঘন্টার জন্য। কমিশনার ভেতরে ঢুকে জানলায় ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

কোষাধ্যক্ষ চটপটে ছোটখাটো বুড়ো মানুষ, ধবধবে পাকা গোঁফ-দাড়ি, স্ট্যাণ্ডিফারকে দেখে যুবকের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে এলেন তাঁকে অভিবাদন জানাতে। দু'জনেই পরস্পরের পুরনো বন্ধু।

'আঙ্কল্ ফ্র্যাংক!'— প্রতিটি টেক্সাসবাসী যে-নামে ঐতিহাসিক কোষাধ্যক্ষকে সম্বোধন করে, সেই অন্তরঙ্গ নামটাই ব্যবহার করেন কমিশনার, 'আপনার হাতে এখন কত টাকা আছে?'

শেষ পাই পয়সাটি অবধি কতো টাকা হাতে আছে জানালেন কোষাধ্যক্ষ—তা প্রায় দশ লাখ ডলারের মতো।

কমিশনার মৃদু শিস্ কাটলেন, আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখদুটো।

'আঙ্কল ফ্র্যাংক, আপনি হয়তো অ্যামোস্ কলভিনকে চিনতেন, কিংবা তাঁর নাম শুনেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ বললেন, 'চিনতাম তো বিলক্ষণ, ভাল লোক, প্রকৃত নাগরিক। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পয়লা বাসিন্দাদের একজন।'

স্ট্যাণ্ডিফার বললেন, 'তাঁর মেয়ে আমার অফিসে বসে আছেন। কপর্দকশূন্য। ওর বিয়ে হয়েছিল বেন্টন শার্পের সঙ্গে—একটা নেকড়ে, খুনী। অভাবের চরমে ঠেলে দিয়েছে মেয়েটাকে, ওর বুক ভেঙে দিয়েছে। ওর বাপ একসময় এ রাজ্যটাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, এখন রাজ্যের কর্তব্য তাঁর সন্তানটিকে সাহায্য করা। হাজার দুয়েক ডলার পেলেই সে তার বাড়ি ফের কিনে নিতে পারে, শান্তিতে জীবনও কাটাতে পারে। টেক্সাস রাজ্য নিশ্চয়ই এটা দিতে অস্বীকার করবে না! আঙ্কল ফ্র্যাংক, টাকাটা আমায় দিন, আমি সরাসরিই ওর হাতে তুলে দিই—দপ্তরের নথিপত্র পরে ঠিক করে নিলেও চলবে।'

একটু যেন হতভম্ব দেখাচ্ছে কোষাধ্যক্ষকে।

বললেন, 'কেমন করে স্ট্যাণ্ডিফার! আপনি তো জানেন আমি সরকারী কোষ থেকে অধ্যক্ষের হুকুমনামা না পেলে একটি পয়সাও বের করে দিতে পারি না। কোনো ভাউচার না দেখিয়ে এক ডলারও খরচ করতে পারি না আমি।'

কমিশনার সামান্য অধৈর্যভাব প্রকাশ করেন। বলেন, 'ভাউচার আমি দেব আপনাকে। আমায় এ চাকরিটা ওরা দিলেন কোন্ কারণে? আমি কি একমুঠো মেস্কিট-ঘাসের গিঁট বাঁধতে রয়েছি? আমার দপ্তর কি এ ব্যাপারে একটুও দাঁড়াতে পারে না? আদায় করুন বীমা এবং আর-দুটো আনুষঙ্গিকের কাছে। পরিসংখ্যানই তো দেখাচ্ছে অ্যামোস্ কলভিন যখন এসেছিলেন তখন এ রাজ্য ছিল মেক্সিকান, র‍্যাট্‌ল সাপ আর কোমাঞ্চে-ইণ্ডিয়ানদের কবজায়, দিনরাত তাঁরা লড়েছিলেন এদেশকে সাদাদের হাতে আনতে। পরিসংখ্যান কি দেখায় না, এমন একটা শয়তান কলভিনের মেয়ের সর্বনাশ করেছে, যে আপনার আমার, বুড়ো টেক্সানদের রক্তে গড়া সবকিছু টেনে ভেঙে নামাতে চায়? ইতিহাস কি বলে না, এই একমাত্র তারকা-রাজ্য যা কখনোই সেই সব মানুষের অত্যাচারিত পীড়িত সন্তানদের জন্য অনুদান মঞ্জুর করতে ভোলেনি যার ফলে এ রাজ্য ইউনিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গরাজ্য? যদি পরিসংখ্যান

আর ইতিহাস দিয়েও কলভিনের কন্যার দাবি প্রমাণ না করা যায়, তাহলে আগামী বিধানসভায় প্রস্তাব করব আমার বিভাগটি তুলে দেবার জন্য। আসুন আঙ্কল ফ্র্যাংক, এবার ওকে টাকাটা দিন। আপনি বললে আমিই সরকারী কাগজে সই করে দেব; আর তার পরেও যদি গভর্নর বা অধ্যক্ষ বা দরোয়ান বা আর-কেউ লম্ফঝম্প করেন, ঈশ্বরের দিব্যি ব্যাপারটা আমি জনসাধারণের চোখের সামনে আনব, দেখব তারা আমার কাজ সমর্থন করে কিনা।'

কোষাধ্যক্ষকে দেখায় সহানুভূতিশীল, কিন্তু হতচকিত। কমিশনারের কণ্ঠ আরো উচ্চগ্রামে ওঠে যখন কথাগুলো শেষ করেন এই বলে যে, অনুভূতির দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও রাজ্যের ছোট বড় বিভাগের কর্তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে কটাক্ষ করতেই হয়। কেরানিরা সবাই শুনতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তাঁকে নরম করার সুরে কোষাধ্যক্ষ বললেন, 'শুনুন, স্ট্যাণ্ডিফার। আপনি জানেন এ ব্যাপারে আমি সাহায্যই করতে চাই, কিন্তু একটু থেমে চিন্তা করুন ভাই। আইনসভা অনুমোদন করলে তবেই রাজকোষের প্রতিটি সেন্ট খরচ করা যায়, টাকা তোলা যায় একমাত্র অধ্যক্ষের চেকের বলে। এর একটি সেন্ট ব্যবহার করারও ক্ষমতা আমার নেই। আপনিও তা পারেন না। আপনার বিভাগটা তো খরচা করার বিভাগ নয়—এমনকি প্রশাসনিক বিভাগও নয়— পুরোদস্তুর কেরানি কাজের বিভাগ। ভদ্রমহিলার একটিই উপায় আছে অনুদান পাবার, তা হল আইনসভাতে আবেদন জানানো, আর—'

'চুলোয় যাক আইনসভা,'— বলে ঘুরে দাঁড়ালেন স্ট্যাণ্ডিফার।

কোষাধ্যক্ষ তাঁকে পেছন থেকে ডাকেন—'আমি খুশি হব, স্ট্যাণ্ডিফার, কলভিনের মেয়ের আশু খরচখরচার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একশো ডলার দিতে পারলে,'—পকেটবুকের দিকে হাত বাড়ান তিনি।

'ও ছেড়ে দিন, আঙ্কল ফ্র্যাংক,'—এবার একটু নরম গলায় বলেন কমিশনার—'ওটার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন অবধি সে ওরকম কিছু চায়নি। তাছাড়া, ওর কেস্‌টা আমারই হাতে। এবার দেখতে পাচ্ছি কি এক ওঁচা খেলো ডিপার্টমেনেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। মনে হয় কোনো পঞ্জিকা বা হোটেল রেজিস্টারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ! কিন্তু যতক্ষণ আমি এ বিভাগ চালাচ্ছি, ততক্ষণ নিজেদের এক্তিয়ার টেনে বাড়াতে না পারলেও সম্ভব হলে কোনো অ্যামোস্‌ কলভিনের মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে যাব না। আপনি নজর রাখতে পারেন বীমা-পরিসংখ্যান-ইতিহাস দপ্তরের ওপর।'

কমিশনার নিজের অফিসে ফিরে এলেন। তাঁকে চিন্তিত দেখায়। ডেস্কের ওপর কালিদানের ঢাকনাটা বার-বার খোলেন, বন্ধ করেন। তারপর অতিরিক্ত এবং অনাবশ্যক মনোযোগ দিয়ে কথা বলেন।

'তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চেয়ে নিচ্ছ না কেন?'—আচম্‌কা প্রশ্ন করলেন।

'এর খরচা দেবার টাকা আমার নেই', জবাব দিল মহিলা।

কমিশনার নিয়মমাফিক কণ্ঠে জানালেন, 'ঠিক এক্ষুনি, আমার বিভাগের ক্ষমতা যথেষ্ট সংকুচিত মনে হয়। পরিসংখ্যান বোধহয় ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত টাকা তুলেছে, আর ইতিহাসের দু'বেলার আহারও জোটে না। তুমি কিন্তু ঠিক জায়গাতেই এসেছ মা'ম। ডিপার্টমেন্ট তোমার একটা হিল্লে করবেই। তোমার স্বামী কোথায় আছে বললে মা'ম?'

'কাল তো সান আন্টোনিওতেই ছিলেন। আজকাল সেখানেই বসবাস করছেন।'

হঠাৎ কমিশনার তাঁর সরকারী ভঙ্গিটা ত্যাগ করলেন। পাংশু মেয়েটির ছোট হাত নিজের হাতে নিয়ে, সেই পুরনো ঢঙে বলে উঠলেন, যেমনটা ব্যবহার করতেন শত্রুকে তাড়া করতে গিয়ে বা ছাউনির আগুনেব পাশে বসে: 'তোমার নাম তো আমাণ্ডা, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। তোমার বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি তো। আচ্ছা আমাণ্ডা, এই হল তোমার বাবার সেরা বন্ধু, রাজ্য সরকারের একটা বড় দপ্তরের কর্তা, যে ঝামেলা থেকে তোমায় উদ্ধার করতে সাহায্য করবে। আব আমিই সেই জঙ্গল-দাবড়ানো গরু-খেদানো লোক যাকে তোমার বাবা বার-বার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমাণ্ডা, তোমার কাছে অন্তত আগামী দু-তিনটে দিন চালাবার মতো পয়সাকড়ি আছে তো?'

মিসেস্ শার্পের রক্তহীন মুখ একটুও লাল হল না।

'যথেষ্ট আছে স্যর—কয়েক দিনের মতো আছে।'

'ঠিক আছে তা' হলে, মাম্। এখন ফিরে যাও যেখানে তুমি উঠেছ, আবার এই অফিসেই ফিরে এস কাল-বাদ পরশু, বিকেল চারটের সময়। খুব সম্ভব ওই সময়ে তোমাকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিতে পারব।'— কমিশনার একটু যেন দ্বিধায় পড়েছেন। খানিকটা থতমত করে বললেন, 'তুমি বলেছিলে তোমার স্বামী জীবন বীমা করেছে ৫০০০ ডলারের। জানো ওর কিস্তি প্রিমিয়ামগুলো সময়মতো জমা দিয়েছে কি দেয়নি?'

'পাঁচ মাস আগে তো গোটা বছরের প্রিমিয়াম আগাম দিয়ে দিলেন,'—মিসেস্ শার্প বলল, 'পলিসি আর রশিদগুলো আমার ট্রাঙ্কেই রয়েছে।'

'ওঃ তাহলে তো ঠিক আছে। এসব-জাতীয় জিনিসের দিকে একটু নজর রাখতেই হয়। কোনো দিন হয়তো কাজে লেগে যাবে।'

মিসেস শার্প বিদায় নেয়। একটু বাদেই লূক স্ট্যাণ্ডিফারও চলে যান তাঁর ছোট হোটেলটিতে, যেখানে তিনি উঠেছেন। দৈনিক পত্রিকা থেকে রেলের টাইম

টেবিলটা দেখেন। আধঘন্টা বাদে তিনি কোট আর ভেতরের ভেস্ট্‌কোট খুলে একটা বিশেষ কায়দায় তৈরি পিস্তলের খাপ কাঁধের ওপর দিয়ে বেঁধে নেন স্ট্র্যাপে, জিনিসটা থাকে তাঁর বাঁ বগল ঘেঁষে। খাপটার মধ্যে গুঁজে রাখেন একটা ·৪৪ বোরের খাটো-নল্‌চে রিভলবার। আবার পোশাকগুলো পরে তিনি হেঁটে চলে যান স্টেশনের দিকে। সান আন্টোনিও যাবার পাঁচটা-কুড়ির বৈকালিক ট্রেনটা ধরেন।

পরদিন সকালে সান আন্টোনিওর 'এক্সপ্রেস' কাগজে বেরুল এই লোমহর্ষক ঘটনার খবর :

যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি বেন্টন শার্প

দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত গোল্ড-ফ্রন্ট রেস্তোরাঁয় গুলির আঘাতে নিহত—নামী মস্তানের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট রাজ্য পদাধিকারীর সফল আত্মপক্ষ সমর্থন—ক্ষিপ্র বন্দুকচালনার অদ্ভুত প্রদর্শন।।

গত রাত্রিতে প্রায় এগারোটা নাগাদ অন্য দুই সঙ্গীসহ বেন্টন শার্প গোল্ড-ফ্রন্ট রেস্তোরায় প্রবেশ করে এবং একটি টেবিল নিয়ে বসে। শার্প মদ্যপান করছিল এবং সুরার প্রভাবে বরাবরের মতোই চিৎকার হৈ-হল্লা শুরু করে দেয়। ওরা সেখানে পাঁচ মিনিট বসে থাকার পর একজন দীর্ঘদেহী, সুবেশ, বয়স্ক ব্যক্তি রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই মাননীয় লূক স্ট্যাণ্ডিফারকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি সদ্যনিযুক্ত বীমা-পরিসংখ্যান-ইতিহাস বিভাগের সদ্যনিযুক্ত কমিশনার।

শার্প যে প্রান্তটিতে বসেছিল, সেদিকেই গিয়ে মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার পরবর্তী টেবিলে একটি আসন নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেয়ালের পাশের একটি হুকে নিজের টুপি রাখতে গেলে তার হাত থেকে টুপিটা শার্পের মাথার ওপর পড়ে যায়। অত্যন্ত কুৎসিত মেজাজ নিয়ে শার্প ফিরে তাকায়, আর বেধড়ক গালমন্দ করতে থাকে। আকস্মিক ঘটনাটার জন্য শান্তভাবেই মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার ক্ষমা চান, কিন্তু শার্প সমানেই গালিগালাজ চালিয়ে যায়। মিঃ স্ট্যাণ্ডিফারকে দেখা যায় দুর্বৃত্তটার খুব কাছে এসে নিচু গলায় কিছু বলতে, কিন্তু অন্য কেউ তাঁর একটি কথাও শুনতে পায়নি। শার্প রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। এর মধ্যে মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার কয়েক গজ দূরে সরে গেছেন, এবং তার ঢিলে ঝুল-কোটের বুকে দু'বাহু ভাঁজ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

যে প্রচণ্ড মারাত্মক ক্ষিপ্রতা শার্পকে এত ভয়ংকর করে তুলেছে, তারই আবেগে সে তৎক্ষণাৎ হাত বাড়ায় তার পেছন-পকেটে সদা বহন-করা পিস্তলের দিকে। এই ভঙ্গিটা এর আগেও অন্তত এক ডজন লোকের মৃত্যু ডেকে এনেছে তার হাতে। গতিটা ক্ষিপ্র ছিল নিশ্চয়ই, তবে দর্শকরাও জোর দিয়েই বলছেন যে

এ-গতির মোকাবিলায় এক অপূর্ব বিদ্যুৎ-চকিত বন্দুক-আকর্ষণের মহড়া দেখা গেল যা এ-অঞ্চলে কেউ আগে দেখেনি। শার্পের পিস্তল যখন ওপরে উঠছে—প্রকৃতপক্ষে একাজ এত দ্রুত যেন চোখকেও ফাঁকি দেয়—একটা চক্‌চকে ·৪৪ যেন ভোজবাজির মতো এসে গেল মিঃ স্ট্যাগুফারের ডান হাতে. উনিও বাহুতে কোনো নজরে পড়ার-মতো চাঞ্চল্য না দেখিয়েই সোজা বেন্টন শার্পের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গুলি চালিয়ে দিলেন। মনে হয় নতুন কমিশনারটি সাবেক-আমলের ইণ্ডিয়ান ডাকাতদের তাড়ানো একজন লড়াকু এবং দীর্ঘদিনের প্রাক্তন রেঞ্জার। আর তাই বোধ হয় ·৪৪ রিভলবার ব্যবহারে তিনি এমন দক্ষ।

আজ একটা আবশ্যিক ও আনুষ্ঠানিক শুনানি ছাড়া বিশেষ কোনো অসুবিধার মধ্যে মিঃ স্ট্যাগুফারকে পড়তে হবে বলে মনে হয় না, কারণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত সমস্ত সাক্ষীই একযোগে ঘোষণা করেছেন যে কাজটা হয়েছিল নিতান্তই আত্মরক্ষার তাগিদে।

যখন ধার্য সময় অনুসারে মিসেস্ শার্প কমিশনারের দপ্তরে হাজির হল, দেখল ভদ্রলোক শান্তভাবে বসে একটা সোনালী-পিঙ্গল আপেল চিবুচ্ছেন। কোনো অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে তিনি ওকে সম্ভাষণ জানালেন, আজকের আলোচনার বিষয়ের মধ্যেও সরাসরিই চলে এলেন।

যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে বললেন, 'কাজটা আমায় করতেই হত মা'ম্, নয়তো আমিই মরতাম।' বুড়ো কেরানির দিকে ফিরে বললেন, 'মিঃ কাউফমান, সিকিউরিটি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের নথিপত্রগুলো একটু দেখুন তো! দেখুন সব ঠিক আছে কিনা।'

'ও আর দেখার দরকার নেই,' গজগজ করলে বুড়ো, ওর মাথার মধ্যেই সবকিছু রয়েছে, 'সব ঠিকঠাক। সমস্ত ক্ষতিপূরণ দশদিনের মধ্যে মিটিয়ে দেয় ওরা।'

একটু পরেই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় মিসেস শার্প। পলিসির টাকাটা যতক্ষণ না পাওয়া যায় শহরেই থাকার ব্যবস্থা করেছে সে। কমিশনার তাকে আটকালেন না। ও একজন মেয়েমানুষ, এখন ওকে কী বলতে হয় তা উনি ঠিক জানেনই না। একটু বিশ্রাম আর অবসর পেলে ওর নিজের প্রয়োজন বুঝে নেবে।

কিন্তু যখন সে চলে যাবার জোগাড় করছে, লূক স্ট্যাগুফার একটা সরকারী টিপ্পনি না ছেড়ে আর পারলেন না।

'মা'ম্, বীমা-পরিসংখ্যান-ইতিহাস ডিপার্টমেন্ট তোমার ব্যাপারটা নিয়ে যতদূর করবার তা করেছে। সরকারী ফাইলে বাঁধা থাকলে এ কেস্ আওতাভুক্ত করাই কঠিন হত। পরিসংখ্যান ব্যর্থ হয়েছে, ইতিহাসের টিপ্ ব্যর্থ হয়েছে. তবে এটুকু

বোধহয় বলতে পারি বীমার ব্যাপারে আমরা বেশ পোক্ত হয়েই বেরুতে পেরেছি।'

A Departmental Case. এইন্‌স্‌লি'জ, ১৯০২ ('অলিভিয়ের হেনরী' ছদ্মনামে)

কুলমর্যাদার রক্ষাকর্তা

ওয়েমাউথ ব্যাঙ্কের কোনো হেঁজিপেজি কাজের লোক ছিল না বুশরড খুড়ো। ষাটটি বছর কাটিয়েছে বুশরড খুড়ো—ষাটটি বছর ওয়েমাউথ-বাড়ির বিশ্বস্ত সেবায়, অস্থাবর সম্পত্তি, পরিচারক ও বন্ধু হিসেবে। ব্যাঙ্ক আসবাবের মেহগনির রঙ বুশরড খুড়োর, বাইরে থেকে কৃষ্ণাঙ্গ হলেও ব্যাঙ্কের লেজারের কালি-দাগহীন পৃষ্ঠাগুলোর মতোই সাদা তার অন্তঃকরণ। তুলনাটা বুশরড খুড়োর পক্ষে বড়ই আনন্দদায়ক হতে পারত, কারণ ওর চোখে সারা ধরিত্রীর মধ্যে একমাত্র সৃষ্টি যা ধর্তব্যের যোগ্য তা ওই ব্যাঙ্কটা। ওখানে সে পিওন থেকে শুরু করে ভারপ্রাপ্ত-জেনারেল, সবই।

ছায়াঘেরা তন্দ্রামগ্ন শহর ওয়েমাউথ্‌স্‌ভিল একটা দক্ষিণী উপত্যকার কিনারা ধরে নিচু তবাই পাহাড়ের মধ্যে। তিনটে ব্যাঙ্ক আছে সেখানে। দুটো তো একেবারে রদ্দি, কু-পরিচালিত সংস্থা। তাদের গৌরব দান করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠাবান 'ওয়েমাউথ' তো সেখানে নেই। ব্যাঙ্ক বলতে তিন নম্বরটা—যার পরিচালনায় রয়েছেন ওয়েমাউথরা—আর আছে বুশরড খুড়ো। শহরে আসতে যখন এল্ডার ক্রীক পার হবেন, আপনার ডান দিকে প্রথমেই চোখে পড়বে ওয়েমাউথদের লাল ইটের সাদা থামওয়ালা সাবেকি মহলাবাড়িটা। সেখানে বাস করেন মিঃ রবার্ট ওয়েমাউথ (ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট), তাঁর বিধবা মেয়ে মিসেস্‌ ভেসী—সবাই 'মিস্‌ লেটি' বলে ডাকে—আর তার দুই সন্তান, ন্যান্‌ আর গাই। ওইখানেই আঙিনার একটা কটেজঘরে থাকে বুশরড খুড়ো আর মালিণ্ডি খুড়ি, তার স্ত্রী। মিঃ উইলিয়ম ওয়েমাউথ (ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার) প্রধান এ্যাভিন্যুর একটা আধুনিক চমৎকার বাড়িতে বাস করেন।

মিঃ রবার্ট বিশালকায় বলিষ্ঠ মানুষ, বাষট্টি বছর বয়েস, পুষ্ট মসৃণ মুখ, লম্বা লোহা-ধূসর চুল আর উজ্জ্বল নীল চোখ। উগ্রমেজাজ হলেও সহৃদয় ও বদান্য। যুবকসুলভ মুখের হাসিটা; জোরালো, কঠিন কণ্ঠস্বরে যা বলতে চান তা কিন্তু সব সময় বোঝাতে চান না। মিঃ উইলিয়ম তুলনায় অনেকটা নরমসরম, আচরণে যথার্থ, ব্যবসা নিয়েই মগ্ন। ওয়েমাউথরাই গড়ে তুলেছে

ওয়েমাউথস্‌ভিল পরিবার, আর তাঁদের সম্মানও দেয়া হয় বংশগত অধিকারের মতো।

বুশরড খুড়ো ব্যাঙ্কের আস্থাভাজন পিওন, বার্তাবাহক, পোষ্যভৃত্য এবং অভিভাবক। মিঃ রবার্ট আর মিঃ উইলিয়মের মতো সে-ও তোশাখানার একটা চাবি বহন করে। অনেক সময় ওদের ভলটের দরজায় দশ পনের, কি কুড়ি হাজার ডলারের রুপোর মুদ্রাও থলিভর্তি জমা পড়ে। বুশরড খুড়োর হাতে ওগুলো নিরাপদ। সে কায়মনোবাক্যে একজন ওয়েমাউথ—হৃদয়ে, সততায় ও সগর্ব আচরণে।

তবে ইদানিং কিছু দিন বুশরড খুড়ো খুব একটা শান্তিতে নেই। কারণটা হলেন তার 'মার্স' রবার্ট। বছর খানেক তিনি বড় বেশি মদ্যপান করছেন বলে সবাই জানে। তাই বলে তিনি মাতাল হয়ে যাবার মতো মদ খান না—সেটা বুঝবেন—তবে অভ্যাসটা এখন ওঁকে বেশ পেয়ে বসেছে, আর সবাই সেটা লক্ষ্যও করতে শুরু করেছে। দিনের মধ্যে ছ'বার তিনি ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরুবেন, পায়ে-পায়ে হেঁটে ঢুকবেন 'মার্চেন্ট-প্লান্টারদের হোটেলে' এক ঢোঁক খেতে। মিঃ রবার্টের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি আর ব্যবসায়িক ক্ষমতা কিছুটা যেন ক্ষুণ্ণও হয়েছে। মিঃ উইলিয়ম, ওয়েমাউথ হলেও ওঁর মতো অভিজ্ঞ নন, চেষ্টা করছেন অবধারিত উপচে-পড়া জোয়ারকে বাঁধ দিয়ে রুখতে, কিন্তু একেবারেই ব্যর্থকাম তিনি। ওয়েমাউথ-ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ছয় অঙ্ক থেকে পাঁচ অঙ্কে নেমে এসেছে। 'আংশিক-প্রাপ্য' কাগজের পরিমাণ বেড়েই চলেছে অবিবেচনা-প্রসূত ঋণ দেবার জন্য। মদ্যপান পরিমিত করার বিষয়ে মিঃ রবার্টকে উপদেশ দিতে কেউই চান না। ওঁর বন্ধুদের অনেকেই বলেন, বছর দুয়েক আগে ওঁর পত্নী বিয়োগের ফলেই ব্যাপারটা ঘটেছে। অন্যরা ইতস্তত করেন মিঃ রবার্টের উগ্র মেজাজের জন্য। এই ধরনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো তাঁকে ভয়ানক কুপিত করবেই, বলা বাহুল্য। মিস্ লেটি ও বাচ্চারা পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে এ-নিয়ে দুঃখ পায়। বুশরডও বেশ চিন্তিত হয়, কিন্তু সে যে-ধরনের লোক তাতে তিরস্কার করার সাহস তার হবে না, যদিও সে আর মার্স্ রবার্ট একসঙ্গে প্রায় সাথী হিসেবেই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের সুরাসক্তির ফলে যা ঘটছিল তার চেয়েও জোরদার একটা আঘাত আসছিল বুশরড খুড়োকে লক্ষ্য করেই।

মিঃ রবার্টের প্রচণ্ড শখ ছিল মাছ ধরার, সচরাচর মৌসুম আর ব্যবসার ফাঁকে সুযোগ পেলেই শখটা মেটাতেন। এর মধ্যে একদিন প্রচুর 'ব্যাস্' আর 'পার্চ' মাছ পড়েছে বলে খবর আসতে, তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন দু-তিনদিনের জন্য হ্রদের ঝিলগুলোর দিকে বেড়িয়ে আসবেন। বললেন তিনি তাঁর বন্ধু বিচারপতি আর্চিনার্ডের সঙ্গে রিডি লেকে যাচ্ছেন।

এদিকে, বুশরড খুড়ো হল "ভগবানের পুত্রকন্যা" সংঘের কোষাধ্যক্ষ। সমস্ত

সংঘই বিনা দ্বিধায় তাকে কোষাধ্যক্ষ বানায়। কালোদের চক্রগুলোতে তিনি "উত্তমতম" স্থানে। ওরা তাকে জানে ওয়েমাউথ ব্যাঙ্কের মিঃ বুশরড ওয়েমাউথ হিসেবে।

মিঃ রবার্ট যেদিন মাছ-ধরা অভিযানে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করলেন সে রাতেই বুড়ো লোকটা ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বারোটার সময়। বলল তাকে এক্ষুনি ব্যাঙ্কে যেতে হচ্ছে—"পুত্রকন্যা" সংঘের পাশবই-খানা আনতে হবে, সেটা ভুলে ব্যাঙ্কেই ফেলে এসেছে। হিসেবরক্ষক সেদিন ওরই জন্য জমা-খরচ নিষ্পত্তি করে বইখানার ভেতরে বাতিল চেকগুলো রেখে দু-দুটো ইলাস্টিক ব্যাণ্ড দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। অন্য পাশবইগুলোতে অবশ্য একটাই ব্যাণ্ড জড়িয়ে রাখেন।

মালিণ্ডি খুড়ি অত রাতে বেরুবার কথা শুনে আপত্তি জানাল, বোকামির কাজ, কোনো মানেই হয় না বলে। কিন্তু বুশরড খুড়োকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করা কারো সাধ্যের বাইরে।

বললে—'সিস্টার আডালিন হস্‌কিন্সকে বলে রেখেছিলাম কাল সকালে এখানে এসে বইটা নিতে। ব্যবস্থাপক বোর্ডের সভায় ওটা নিয়ে যেতে হবে। আর সে যখন আসবে বইটা থাকার কথা এখানেই।'

অতএব বুশরড খুড়ো তার পুরনো স্যুট পরে, হাতে মোটা হিকোরি-ডালের লাঠি নিয়ে, ওয়েমাউথ্‌স্‌ভিলের প্রায় জনবিরল রাস্তা ধরে ধরে এগিয়ে যায়। ব্যাঙ্কের পাশ-দরজার তালা খুলে সে ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢোকে। পেয়ে যায় পাশবইটি ঠিক যেখানটাতে রেখেছিল সেখানেই অর্থাৎ পেছনের ব্যক্তিগত সলাপরামর্শের কামরাটিতে। ও সবসময় নিজের কোট ঝুলিয়ে রাখে সেখানেই। চারদিকটা একবার এমনিই চোখ বুলিয়ে দেখল, সবই ঠিকঠাক আছে যেমন ও রেখে গিয়েছিল। আবার বাড়ির দিকে ফিরবে বলে তৈরি হয়েছে, এমন সময় ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়াল—সামনের দরজায় হঠাৎ একটা চাবির শব্দ। কেউ যেন চট্‌ করে ভেতরে ঢুকল, আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, তারপর লোহার রেলিঙের দরজা দিয়ে হিসাবকক্ষে প্রবেশ করল।

ব্যাঙ্কের ওই অংশটার সঙ্গে পেছনের কামরার যোগাযোগ একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে, সেখানে এখন গাঢ় অন্ধকার।

হিকোরি লাঠিটা শক্ত করে ধরে বুশরড খুড়ো নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে প্যাসেজটা ধরে এগুলো, তারপর সে ওয়েমাউথ ব্যাঙ্কের অলঙ্ঘনীয় এক্তিয়ারের মধ্যে দেখতে পেল নিশাচর অনধিকার প্রবেশকারীকে। একটা ক্ষীণ গ্যাসের বাতি জ্বলছে সেখানে, কিন্তু তবু তার অস্পষ্ট আলোয় সে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল—শিকার সন্ধানী স্বয়ং ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট।

বিস্মিত, ভীত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় কালো বুড়ো-মানুষটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে

অন্ধকার হলঘরের গলিটার মধ্যে; আর অপেক্ষা করে এর পরে কী ঘটে তাই দেখতে।

ঠিক ওর উল্টো দিকেই বড় লোহার দরজাওয়ালা ভল্টটা। ওরই মধ্যে আছে সিন্দুক, তাতে রয়েছে মূল্যবান কাগজপত্র, সোনা আর ব্যাঙ্কের কারেন্সি-নোট। ভল্টের মেঝের ওপর বোধহয় আঠারো হাজার রুপোর ডলার মুদ্রা আছে।

প্রেসিডেন্ট নিজের পকেট থেকে তাঁর চাবি বের করেন, ভল্টটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন—পেছনে দরজাটা প্রায় বন্ধ রেখে। বুশরড খুড়ো সরু ফাঁকটার ভেতর উঁকি মেরে দেখল, একটা মোমবাতির দপ্‌দপে আলো। এক দু'মিনিট বাদেই—যেটা নজরদারের মনে হয়েছিল এক ঘন্টা—মিঃ রবার্ট বেরিয়ে এলেন একটা বড়সড়ো হাতব্যাগ সঙ্গে নিয়ে। উনি সেটা সাবধানে অথচ দ্রুত ভঙ্গিতে বহন করছেন, যেন কেউ দেখে ফেলবে এই রকম একটা ভয়। এক হাতেই তিনি ভল্টের দরজা বন্ধ করলেন ও তালা মেরে দিলেন।

বুড়োর কোঁকড়া চুলের নিচে তখন একটা অনিচ্ছুক ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছে; বুশরড খুড়ো সবুর করে আর লক্ষ্য করে যায়। লুকোনো ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে সে।

একটা ডেস্কের ওপর নিঃশব্দে ব্যাগটা রাখলেন মিঃ রবার্ট। গলা আর কান ঢেকে কোটের কলার তুলে দিলেন। যেন ভ্রমণের জন্য তৈরি হয়েই একটা মোটাসুতোর ধূসর স্যুট পরেছেন। জ্বলন্ত গ্যাস বাতির ওপর থেকে অফিসের বড় ঘড়িটার দিকে ভুরু কুঁচকে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, তারপর চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন ব্যাঙ্কের চারদিকটা, একটানা স্নেহের দৃষ্টিতে—বুশরড অন্তত ভেবেছিল তাই, বিদায়ের আগে কেউ যখন প্রিয় পরিচিত দৃশ্যগুলোকে শেষ বারের মতো দেখে নেয়। এবার উনি ব্যাগটা তুলে নিলেন আবার; তারপর যে-পথে ব্যাঙ্কে এসেছিলেন সেই পথেই দ্রুত নিঃশব্দ পদে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় পেছন থেকে সামনের দরজার তালাটা বন্ধ করে দিলেন।

এক মিনিট বা তারও বেশি সময় বুশরড খুড়ো পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়। নিশাচর ওই সিন্দুক-ভল্টের লুটেরা যদি ওই মানুষটা না হয়ে পৃথিবীর আর-কেউ হত, তাহলে বুড়ো এক্ষুনি ছুটে গিয়ে আঘাত হানতো ওয়েমাউথদের সম্পত্তি বাঁচাতে। কিন্তু এখন যে নজরদারের হৃদয় একটা বেদনাময় ভয়ে মুচড়ে উঠেছে—নিছক ডাকাতির চেয়েও ভয়ানক আতঙ্কে। একটা অভিযোগের দুঃসহ শঙ্কা, যার নিশানা ওয়েমাউথদের নাম ও মর্যাদা ধুলোয় মিটিয়ে দেবার দিকে। মার্স্ রবার্ট শেষে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করলেন! এ-ছাড়া অন্য আর কী মানে হতে পারে এর? রাতের এই প্রহর, চুপিসারে ভল্টে প্রবেশ করা, থলিটা ভরা অবস্থায় নিঃশব্দে ও তৎপরতার সঙ্গে বাইরে আনা, হানাদারের কর্কশ পোশাক,

অধীরভাবে ঘড়ি দেখা, আর নীরবে বিদায় নেয়া—এসবের আর কী মানে থাকতে পারে?

তারপরেই আবার বুশরড খুড়োর চিন্তার মধ্যে আলোড়ন তোলে আগের কতকগুলো ঘটনার স্মৃতি যা এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়—মিঃ রবার্টের ক্রমে-বেড়ে-চলা মদ্যপান, ফলে রাজকীয় প্রাণচাঞ্চল্যের গুণে নানা ধরনের মেজাজ আর কঠোর মানসিকতা; ব্যাঙ্কে যে-সব অসতর্ক কথাবার্তা শুনে বুশরড বুঝেছে ব্যবসার ঘাটতি আর ধার আদায়ের সংকটের কথা। মিঃ রবার্ট ওয়েমাউথ যে পলাতক হতে যাচ্ছেন তা ছাড়া আর কী বোঝায় এসবে? ব্যাঙ্কের বাকি তহবিলটা উঠিয়ে নিয়ে পালাতে চলেছেন, আর কলঙ্কের বোঝা বইতে রেখে যাচ্ছেন মিঃ উইলিয়ম, মিস্ লেটি, ছোট্ট ন্যান আর গাই, আর বুশরড খুড়োকে?

ওই এক মিনিটের মধ্যে বুশরড খুড়ো সমস্ত ব্যাপারটা যাচাই করে নিয়েছে। তারপর সে সচকিত হয়ে উঠল ত্বরিত সিদ্ধান্ত ও কাজে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত পাশ-দরজাটার দিকে ছুটে চলল সজোর আর্তস্বর তুলে—'লড! হা ঈশ্বর! এতগুলো বছরের এমন বড় কাজ, ভালো কাজের পর এই ফল হল? ওয়েমাউথ বংশই যদি ডাকাত আর চোর হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যে পিথিমির বুকে কলঙ্কের ছায়া নেমে আসবে! এবার বুশরড খুড়োর সময় হয়েছে কারুর মুরগির ঘর সাফ করে আসল চেহারাটা দেখিয়ে দেওয়া। ও লড! এমন কাজ তুমি করতে পার না মার্স রবার্ট! আর মিস্ লেটি, বাচ্চাগুলোর কত গর্ব; সারাক্ষণ তো 'ওয়েমাউথ, ওয়েমাউথ' করে। যদি পারি তো আমিই তোমায় রুখব। আন্দাজ করি, তোমার সঙ্গে চালাকি করতে গেলে তুমি মিঃ নিগারের মাথাই গুলি করে উড়িয়ে দেবে, তবু আমি তোমাকে যদি পারি তো রুখব।'

রাতের জন্য চলতে মুশকিল হলেও তার হিকোরি লাঠিটার সাহায্য নিয়ে বুশরড খুড়ো তাড়াহুড়ো করে রাস্তা ধরে ছোটে রেল-স্টেশনের দিকে—ওয়েমাউথ্‌স্‌ভিলকে স্পর্শ করে দুটো রেল-লাইন মিশেছে সেখানে। যেমন প্রত্যাশা করেছিল, ভয়ও করেছিল সেটাই, দেখল মিঃ রবার্ট ওখানে বিল্ডিংটার ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রেন আসার অপেক্ষায়। হাতব্যাগখানা তাঁর হাতেই ধরা।

ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের কুড়ি গজ কাছে আসতে বুশরড যখন দেখল উনি স্টেশনের দেয়ালের ধারে বিশাল একটা ধূসর প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে, তখন একটা অস্থির উত্তেজনা তাকে যেন গ্রাস করে। যে কাজটা করতে এসেছে তার ধৃষ্টতা আর হঠকারিতা এবার যেন পুরো উপলব্ধি করে সে। ও যদি এক্ষুনি ফিরে সুনিশ্চিত ওয়েমাউথ-ক্রোধের আওতা থেকে পালাতে পারত তা হলে বরং সুখীই হত।

কিন্তু আবার সে কল্পনার চোখে দেখতে পায় মিস্ লেটির ফ্যাকাশে তিরস্কারপূর্ণ মুখখানা, ন্যান আর গাইয়ের ভেঙে-পড়া চেহারা—যদি সে কর্তব্যকাজে ব্যর্থ হয়, যদি ওরা তার দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করতে শুরু করে!

এই ভাবনাতেই চাঙা হয়ে সে এবার সিধে সরলরেখায় এগিয়ে যায়; গলাটা পরিষ্কার করে নেয় আর লাঠি ঠুকে আওয়াজ করে, যাতে তাকে দূর থেকেই চেনা যায়। এই ভাবে হয়তো সে মিঃ রবার্টের মতো হঠাৎ-রাগী মানুষকে আচমকা চমকে দেবার সম্ভাব্য বিপদটা এড়াতে পারে। এ ব্যাপারে সে সফলই হয়েছে। ধূসর প্রেতের স্পষ্ট জোরালো কণ্ঠস্বর—'ও কে, বুশরড নাকি?'

'হ্যাঁ সা', মার্স্ রবার্ট।'

'তুমি এত রাতে কী করতে বেরিয়েছ?'

জীবনে এই প্রথম মার্স রবার্টকে একটা মিছে কথা বলল বুশরড। ও চাপা রাখতে পারে না, তাই একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে ওকে। সরাসরি আক্রমণের মতো স্নায়ুর জোর ওর নেই।

'আমি গিয়েছিলাম সা' বুড়ি মারিয়া প্যাটার্সন মাসিকে দেখতে। রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন, মালিশ্তির এক বোতল ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। হ্যাঁ সা'।'

'হুম্! তুমি বরং বাড়ি চলে যাও রাতের হাওয়া না খেয়ে। বাতাসটা জোলো। কাল আর বাতের ব্যথায় তোমায় খুঁজে পেতে হবে না। কী মনে হয় বুশরড, আজকের দিনটা পরিষ্কার থাকবে?'

'আমার তো মনে হয় থাকবে সা'। কাল সন্ধ্যায় সূর্যি ছিল লাল।'

ছায়ার মধ্যে মিঃ রবার্ট একটা চুরুট ধরান। ধোঁয়াটাকে মনে হয় তাঁরই ধূসর প্রেতচ্ছায়া, ক্রমে বড় হয়ে রাতের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনো কারণে বুশরড খুড়ো জোর করে অনিচ্ছুক জিভটাকে ভয়াবহ বিষয়টার মধ্যে আনতেই পারছে না। বেয়াড়াভাবে উশখুশ করে সে নুড়িপাথরগুলোর ওপর দাঁড়িয়েই রইল আর অসহায়ের মতো হাতড়াতে থাকল লাঠিটা। কিন্তু তখনই দূর থেকে—তিন মাইল দূরের 'জিমটাউন' রেল-সুইচে, আগুয়ান ট্রেনের ক্ষীণ বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল সে। ওই ট্রেনের সওয়ারী হয়েই বুঝি ওয়েমাউথ নামটা মিলিয়ে যাবে অসম্মান ও লজ্জার রাজ্যে। সব ভয় তার চলে গেল। টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে ও মুখোমুখি হল ওর প্রভুগোষ্ঠীর প্রধানের—মহান, রাজকীয়, সহৃদয়, উচ্চমনা, ভয়ংকর ওয়েমাউথের সামনে, এখুনি যে বিশ্রি ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে তারই কিনারা-প্রান্তে এসে ও মুখের ওপর কথাগুলো শুনিয়ে দিল।

অনুভূতির গাঢ়তায় ওর কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি—'মার্স রবার্ট, আপনার মনে আছে সেদিনটা, ওক্-লনে সবাই মিলে গিয়েছিলাম ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা লড়তে?

সেদিন সা' আপনি জিতেছিলেন, আর মিস্ লুসিকে মুকুট পরিয়ে রানী বানিয়েছিলেন।'

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে মিঃ রবার্ট বললেন, 'টুর্নামেন্ট? হ্যাঁ ভালই মনে আছে—কিন্তু মাঝরাতে এসে টুর্নামেন্টের কথা বলার কোনো মানে হয়? যাও, বাড়ি যাও বুশরড। আমার ধারণা তোমায় নিশিতে পেয়েছে।'

কর্ণপাত না করে বুড়ো বলেই চলল, 'মিস লুসি আপনার কাঁধে তরোয়াল ছুঁইয়ে বললেন, "সা'রবার্ট তোমাকে আমি নাইট্ বানিয়ে নিচ্ছি—উঠে দাঁড়াও অন্তরে পবিত্র ও নির্ভয় হয়ে, নিষ্কলঙ্ক হয়ে।" এ কথাই তো মিস্ লুসি বলেছিলেন। সে অনেকদিন আগের কথা, কিন্তু আমি বা আপনি কেউই তা ভুলতে পারি না। তারপর আরও একটি সময়ের কথা আমরা ভুলতে পারি না—যখন মিস্ লুসি তাঁর শেষ শয্যায়। উনি বুশরড খুড়োকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, "বুশরড খুড়ো, আমি যখন মরব, আমি চাই তুমি মিঃ রবার্টের ভালভাবে দেখাশোনার ভার নাও।"...মিস লুসি যা বললেন, "মনে হয় উনি আর কারুর চেয়ে তোমার কথাই বেশি শোনেন। উনি একেক সময় ভয়ানক বদমেজাজি হয়ে পড়েন, হয়তো তুমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলে তোমাকেও গালাগাল করেন, কিন্তু তাঁর একজনকে দরকার যে তাঁকে বোঝে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারে। উনি একেক সময় ছোট বাচ্চার মতো,"—করুণ পাতলা মুখে চোখ জ্বলজ্বল করে মিস্ লুসি বললেন—"কিন্তু তিনি যে চিরকাল আমারই নাইট-নায়ক"—ঠিক এ কথাগুলোই বললেন, "আমার নাইট, পবিত্র, নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক।"

মিঃ রবার্টের যা বরাবরের অভ্যেস, কৃত্রিম রাগ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করেন হৃদয়ের নরম-হয়ে-আসার ঝোঁকটাকে।

'তুমি বুড়ো—বড্ড বাচাল!' চুরুট ধোঁয়ার পাকানো মেঘের ভেতর থেকে গরগর করেন, 'আমার বিশ্বাস তুমি পাগল। বুশরড, তখনই বলেছি তুমি বাড়ি চলে যাও। মিস লুসি ওইসব কথা বলেছিলেন বুঝি? তা, কুলমর্যাদা আমরা খুব একটা নিষ্কলঙ্ক রাখিনি। দু'বছর আগে, তাই না বুশরড—গত হপ্তায় পড়েছিল তারিখটা—মারা গিয়েছিলেন উনি? দূর দূর! তুমি কি সারা রাতই ওখানে দাঁড়িয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করবে কফি-রঙের রাজহাঁসের মতো?'

আবার ট্রেনের হুইসেল—এবার একমাইল দূরে জলের ট্যাঙ্কের কাছে।

ব্যাঙ্ক-মালিকের হাতের ব্যাগটার ওপর নিজের হাত রেখে বুশরড খুড়ো বলল, 'মার্স রবার্ট, ঈশ্বরের দোহাই এটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। আমি জানি এর ভেতরে কী আছে। আমি জানি ব্যাঙ্কের কোথা থেকে এটা নিয়েছেন। এটা আপনি সঙ্গে বইবেন না। এই থলিতে রয়েছে মিস্ লুসি আর তাঁর সন্তানের সন্তানদের সমূহ সর্বনাশ। ওয়েমাউথদের নাম আলবৎ ঘুচিয়ে দেবে, ও নামের লোকদের মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে লজ্জায় আর যন্ত্রণায়। মার্স রবার্ট যদি চান্ছে করন

এই বুড়ো নিগারকে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু এ থলি নিয়ে চলে যাবেন না। যদি স্বপ্নের নদী পার হবার সৌভাগ্য হয় কখনো, তাহলে ওপারে মিস লুসি আমায় জিগেস করবেন, বুশরড খুড়ো, মিঃ রবার্টের ভাল খেয়াল খবর করোনি কেন? তখন কী জবাব দেব আমি?'

মিঃ রবার্ট ওয়েমাউথ ছুঁড়ে ফেললেন চুরুটটা, একটা হাত ঝেড়ে নিলেন সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে যা বরাবরই রাগে ফেটে পড়ার আগে প্রকাশ করেন। প্রত্যাশিত ঝড়ের সামনে বুশরড খুড়ো মাথা নিচু করে, কিন্তু ভয়ে কুঁকড়োয় না। যদি ওয়েমাউথ বাড়িরই পতন হয়, তো তার সঙ্গে ওরও পতন হবে। ব্যাঙ্কার যখন কথা বললেন তখন অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করল বুশরড খুড়ো। ঝড় এখনো রয়েছে, তবে তা গ্রীষ্ম পবনের নম্রতায় চাপা পড়েছে।

এক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিকের চেয়ে নরম গলাতেই বলেন মিঃ রবার্ট, 'বুশরড, সব সীমা ডিঙিয়ে গেছ তুমি। তোমার সঙ্গে নরম ব্যবহার করা হয় বলে তুমি তার সুযোগ নিয়ে নাক গলাচ্ছ ক্ষমার অযোগ্যভাবে। তা হলে তুমি জানো এই থলিতে কী আছে! তোমার দীর্ঘ দিনের বিশ্বস্ত কাজই একটা ওজর হল, কিন্তু যাক্—বাড়ি যাও বুশরড—আর একটি কথাও বলবে না!'

কিন্তু বুশরড এবার আরো কঠিন হাতে চেপে ধরে ব্যাগটা। ট্রেনের হেডলাইটের আলো এবার স্টেশনের ছায়াগুলোকে ফিকে করে দিচ্ছে। গর্জন যত বাড়ছে, লোকজন লাইনের ধারে নড়ে-চড়ে উঠছে।

'মার্স রবার্ট, এই ব্যাগটা আমায় দিন। এভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার আছে সা'। আপনার দাসত্ব করেছি, ছেলেবেলা থেকে আপনাকে মানুষ করেছি। যুদ্ধের ভেতর কাটিয়েছি আপনার বডি-গার্ড হয়ে, যতদিন-না ইয়াংকিগুলোকে তাড়িয়ে তাদের উত্তরে পাঠানো হয়। আপনার বিয়েতে ছিলাম, আবার আপনার মিস্ লেটি জন্মাবার সময়ও বেশি দূরে ছিলাম না। আর মিস্ লেটির খোকাখুকিরা আজও বুশরড খুড়োকেই খোঁজে রোজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর। বরাবরই আমি ওয়েমাউথ, শুধু রঙ আর অধিকার ছাড়া সব কিছুতেই। আমরা দু'জনে বুড়ো হয়েছি মার্স, মিস্ লুসির সঙ্গে দেখা হবার আমাদের আর বেশি দেরি তো নেই, তাঁকে আমাদের কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হবে। বুড়ো নিগার আর কত কী বলবে, যেটুকু সে এই পুষে-রাখা পরিবারের জন্য করতে পেরেছে সেটুকু ছাড়া। কিন্তু ওয়েমাউথদের তো বলতেই হবে তারা পবিত্র, নির্ভীকভাবে, কোনো অখ্যাতি ছাড়াই বেঁচেছে। মার্স রবার্ট, থলিটা আমায় দিন—ওটা আমি নেবই। ওটা আমি ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, আর ভল্টে তালা আটকে রাখব। আমি মিস্ লুসির হুকুম পালন করতে যাচ্ছি—এটা ছেড়ে দিন, মার্স্ রবার্ট।'

ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক লোক গাড়ির পাশে সিঁড়ি লাগাচ্ছে। দু'তিন জন যাত্রী ঘুমচোখে নেমে এল গাড়ি থেকে তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নুড়িপাথরের ওপর নেমে দাঁড়াল কন্‌ডাকটর, লণ্ঠন দুলিয়ে অদৃশ্য কাউকে দেখে বলে উঠল, 'এই যে, ফ্র্যাঙ্ক!' ঘন্টা ঠনঠন্ করে, ব্রেকগুলো হিসিয়ে ওঠে, কনডাকটর টেনে-টেনে বলে, 'সবাই উঠে পড়ুন!'

মিঃ রবার্ট থলির ওপর থেকে মুঠো আলগা করে দিলেন। বুশরড খুড়ো দু'হাতে সেটা বুকের কাছে চেপে ধরল, প্রেমিক যে-ভাবে তার প্রথম প্রিয়পাত্রীকে আলিঙ্গন করে।

পকেটের ভেতর নিজের হাতদুটো গুঁজে মিঃ রবার্ট বললেন, 'ওটা তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও বুশরড। আর ব্যাপারটাও বেমালুম চেপে যাও—তবে শুনে রাখো! অনেক কথাই তুমি আমায় শুনিয়েছ। আমি এই ট্রেনটা ধরছি। মিঃ উইলিয়মকে বোলো আমি শনিবার ফিরে আসব। শুভ রাত্রি!'

চলন্ত ট্রেনের পা-দানিতে উঠলেন ব্যাঙ্কার। অদৃশ্য হলেন কামরার ভেতরে। বুশরড খুড়ো মূল্যবান থলিটা বুকে চেপে ধরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। ওর চোখ তখন বুজে আছে, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে ওপরের প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়ে—অবশেষে ওয়েমাউথদের মর্যাদা রক্ষা পেল! ও জানে মিঃ রবার্ট তাঁর কথামতো যথাসময়ে ফিরবেন। ওয়েমাউথরা কখনো মিথ্যে বলে না। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আর বলাও চলবে না যে তাঁরা ব্যাঙ্কের টাকা তছরুপ করেছিলেন।

অতএব, ওয়েমাউথ-গচ্ছিত তহবিলের পুনরায় তদারকী করতে সজাগ হয়ে ওঠে বুড়ো মানুষটা, উদ্ধার-করা থলিটা নিয়ে ফিরে চলে ব্যাঙ্কের দিকে।

ওয়েমাউথ্‌সভিল থেকে তিন ঘন্টার পথ এসে ধূসর ভোরে মিঃ রবার্ট নামলেন একটা নির্জন গ্রাম্য স্টেশনে। প্ল্যাটফরমে প্রতীক্ষারত একটা মানুষের মূর্তি দেখতে পেলেন আবছা-মতো। পাশে একটা স্প্রিং-ওয়াগন, দলবল আর ড্রাইভারের আদল। ওয়াগনের পেছন থেকে বেরিয়ে আছে আধ-ডজন লম্বা বাঁশের কঞ্চির মাছ-ধরা ছিপ।

জজ আর্চিনার্ড বললেন, 'তুমি এসে পড়েছ বব?' মিঃ রবার্টের তিনি পুরনো বন্ধু ও স্কুলের সাথী।—'মাছ ধরার পক্ষে আজ জবরদস্ত দিনটা। তুমি তো যেন বলেছিলে—সে কী, সঙ্গে আনোনি রসদটা?'

ওয়েমাউথ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট টুপি খুলে কাঁচা পাকা চুলগুলো এলোমেলো করলেন।

'হয়েছে কী বেন্, আসল কথা একটি উৎকট উপর-পড়া বুড়ো নিগার রয়েছে বাড়িতে, পরিবারেরই লোক, সে সব বন্দোবস্ত ঘুলিয়ে দিয়েছে। স্টেশনে চলে এসেছিল, গোটা মামলা নাকচ করে দিল। সে অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই করেছে—ইয়ে,

আমার মনে হয় ও-ই ঠিক। সে কোনোভাবে টের পেয়ে গিয়েছিল সঙ্গে আমার কী আছে—যদিও ব্যাঙ্কের ভল্টেই লুকিয়ে রেখেছিলাম, আর মাঝরাতে বেরও করে নিয়েছিলাম। মনে হয় ও লক্ষ্য করেছিল, ভদ্রব্যক্তি হিসেবে আমার পক্ষে ওগুলো করা একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে, তাই ওৎ পেতে বসেছিল দুটো কাজের কথা শোনাবার জন্য।'

'মদ্যপান ছেড়েই দেব আমি,' শেষে বললেন মিঃ রবার্ট, 'আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে কোনো মানুষই একসঙ্গে ওটাও চালাবে আর যা সে হতে চায় তাও হবে—মানে, "পবিত্র, নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক"—তা হয় না। কথাটা ওইভাবেই উদ্ধৃত করেছিল বুড়ো বুশরড।'

ওঁরা যখন ওয়াগনে উঠছেন তখন বিচারক মহাশয় একটু চিন্তা করেই বললেন, 'তা, আমাকে এটা মানতেই হবে যে বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করলে বুড়ো নিগ্রোর যুক্তি উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'তবু', সামান্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঃ রবার্ট বললেন, 'ওই ব্যাগটাতে একেবারে সেরা জাতের পুরনো সিল্ক-ভেলভেট বুরবঁ দু'কোয়ার্ট তো ছিলই যাতে আপনার ঠোঁট ভিজিয়ে নিতে পারতেন!'

The Guardian of the Scutcheon. ব্র্যাণ্ডার, ১৯০২ (অলিভিয়ের হেনরী ছদ্মনামে)

বৃত্ত ঘুরে আসা

'শার্টটা ঠিকঠাক পেলে তো স্যাম?'—ওকগাছের নিচে চেয়ার থেকেই প্রশ্ন করল মিসেস্ ওয়েবার। একটা মোটা পেপারব্যাক উপন্যাস সঙ্গী করে সেখানে আরামে বসেছে সে।

স্যাম জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, একেবারে চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে, মার্থি',—ওর গলার সুরে সন্দেহজনক খুশির আভাস—'প্রথমে তো রেগে পা ছুঁড়তে গিয়েছিলাম এটার বোতাম উড়ে গেছে দেখে, কিন্তু যখন আবিষ্কার করলাম বোতামের ঘরই সব ছিঁড়ে গেছে, তখন আর বোতাম হারিয়ে গেছে বলে নালিশই থাকল না।'

তাচ্ছিল্যভরে ওর স্ত্রী বললে, 'ও ঠিক আছে, তোমার নেকটাইটা পরো—তাতেই সব জুড়ে থাকবে।'

দেশের এক নির্জনতম এলাকায় স্যাম ওয়েবারের ভেড়ার খামার—নিউসেস্ থেকে ফ্রিও'র মাঝামাঝি। খামার-বাড়িটা, দু'কামরার বাক্স ধাঁচের, উঁচু ওক-বনের

মাঝখানে ধীরে মাথা-উঁচু-করা একটা ঢালু টিলার ওপর। সামনে খানিকটা খোলা আঙিনা, সেখানে ভেড়ার খোঁয়াড়, লোম ছাড়াবার জায়গা, উল ঘর। মাত্র কয়েক ফুট পেছন থেকেই শুরু হয়েছে কাঁটা গাছের জঙ্গল।

স্যাম ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল চ্যাপম্যান খামারে, কিছু ভাল জাতের মেরিনো ভেড়া কেনবার জন্য একটু দেখেশুনে নেবার ইচ্ছা। অবশেষে ঘোড়ায় ওঠার জন্য তৈরি হয়ে বেরুল। এটা খানিকটা দরকারী বাণিজ্যিক যাত্রা, তার ওপর চ্যাপম্যান খামারটা জনসংখ্যা ও আয়তনে প্রায় একটা ছোট শহরের মতো, তাই স্যাম সেইরকমের 'সাজগোজ' করাই সাব্যস্ত করেছিল। তার ফল হল এই যে একজন সুপুরুষ সুদৃশ্য সীমান্তবাসী থেকে নিজেকে বানিয়ে ফেলল এমন কিছু যাকে দেখতে মোটেই নয়নসুখকর নয়। পেশীবহুল মেহগনি-রং গলাটার ওপর বিশ্রিভাবে চেপে বসে আছে আঁটসাট শাদা কলার, বোতামশূন্য ভেস্টের নিচে চাপা পড়েছে শক্ত ঢেউ তোলা বোতামহারা শার্ট। ওর সিধে খেলোয়াড় সুলভ দেহের চমৎকার রেখাগুলোকে বেশ ভালভাবেই ঢেকে দিয়েছে "রেডিমেড স্যুট" খানা। বৈঁচি-বাদামী মুখখানা নিথর হয়ে আছে রাজবন্দী-যোগ্য বিষণ্ণ মর্যাদায়। তিনবছরের ছেলে র‍্যাণ্ডির মাথায় একটা আল্‌তো চাপড় মেরে সে ছুটল যেখানে ওর প্রিয় জিন-ঘোড়া 'মেক্সিকো' দাঁড়িয়ে আছে।

মার্থি অলসভাবে চেয়ার দুলিয়ে বইয়ের ভেতর পড়াব-জায়গাটায় আঙুল রাখে, তারপর মাথা ঘুরিয়ে স্যামকে দেখে একটা দুষ্টুমির হাসি হাসে—"সাজতে" গিয়ে এ কী অদ্ভুত চেহারা করেছে নিজের!

টেনে-টেনে মার্থা বলে, 'হ্যাঁ, একথা আমায় বলতেই হবে স্যাম, তোমায় দেখাচ্ছে ঠিক ওই সচিত্র কাগজে ছাপা আনাড়ি গেঁয়োগুলোর মতো, টেক্সাস রাজ্যের মুক্ত স্বাধীন মেষপালকের মতো নয়।'

স্যাম বেয়াড়াভঙ্গিতে জিনের ওপর চড়ে বসে।

'ওটা বলতে তো তোমারই লজ্জা হওয়া উচিত',—গরম হয়ে জবাব দেয় স্যাম, 'ঘরের মানুষের জামাকাপড়গুলোর যত্ন না করে সব সময় বসে ওই ছাইভস্ম হলদে-মলাট নভিলগুলো পড়ছ।'

চেয়ারের হাতলে একটু ধাক্কা মেরে মিসেস্ ওয়েবার বললে, 'ওঃ, মুখ বোজো তো। বেরিয়ে পড়। সব সময় আমার পড়া নিয়ে খোঁটা দিচ্ছ। আমি অনেক কাজই করি ; ইচ্ছে হলে বইও পড়ব। এখানে তো জঙ্গলে পড়ে আছি পোকামাকড়ের মতো। কিছু দেখতেও পাই না, শুনতেও পাই না, তা ছাড়া অন্য আমোদ-মজাই বা কী পেতে পারি? তোমার কথা শুনতেও চাই না—কেবল নালিশ, আর নালিশ, দিনের পর দিন। আঃ তুমি যাও স্যাম, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

স্যাম হাঁটু দিয়ে পনিটাকে ঠেলে, তারপর নেমে পড়ে গাড়ির রাস্তায়, ওটাই ওর র‍্যাঞ্চের সঙ্গে সদর সরকারী রাস্তার যোগসাধন করেছে। এখন সকাল আটটা, এর মধ্যেই বেশ গরম হতে শুরু করেছে। তিন ঘন্টা আগে রওনা হওয়া উচিত ছিল ওর। চ্যাপম্যান-র‍্যাঞ্চটা মাত্র আঠারো মাইল দূরে, কিন্তু সে দূরত্বের মাত্র তিনটি মাইল পাকা রাস্তা। একবার সে ঘোড়ায় চেপে ওখানে গিয়েছিল, সেই হাফ-মুন কউবয়দের একজনের সঙ্গে, মনের মধ্যে পরিষ্কারই গাঁথা আছে রাস্তাঘাটের নক্শা।

পুরনো সরকারী পথ ছেড়ে স্যাম এবার নামল মেস্কিট ঘাসের শুঁড়ি পথে, তারপর মাঠ ধরে ছুটল— কুইন্টানিলার উপত্যকা। হাস্যোজ্জ্বল উপত্যকার সরু এলাকা, সবুজের ঘন গালিচায় যেন কোঁকড়া মেস্কিট ঘাসের ঠাস-বুনোনি। মেস্কিকো দীর্ঘ সহজ পদক্ষেপে এ ক'টা মাইল বেশ তাড়াতাড়িই চলে এল। এরপর আবার 'বুনো-হাঁস' কূপে এসে স্যামকে বাঁধা ধরা পথ ছাড়তে হবে। ডানদিকে ঘুরে একটা ছোট টিলা অবধি চলে আসে—নুড়ি-আবৃত, তার ওপর শুধু গজিয়েছে নাছোড়বান্দা কাঁটাওয়ালা নাসপাতি আর ওকের চারা। চূড়োয় উঠে ও একবার থামে শেষবারের মতো পুরো নিসর্গদৃশ্যটা দেখে নিতে, কারণ এর পর থেকে ওকে এঁকেবেঁকে চলতে হবে ওক-বনের, নাসপাতি আর মেস্কিটের আগাছা আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। বেশির ভাগ জায়গাতে যে-কোনো দিকে ওর দৃষ্টি কুড়ি গজের বেশি যাবে কিনা সন্দেহ, রাস্তা বেছে নিতে হবে প্রেইরিবাসীদের সহজাত বুদ্ধিতে—শুধু সুদূরবর্তী কোন টিলা আচম্কা নজরে পড়লে, কিংবা গাছপালার বিশেষ আকৃতি, অথবা সূর্যের অবস্থান দেখে।

ঢালু পাহাড় বেয়ে নিচে নেবে স্যাম ঢুকে পড়ল নাসপাতির বিশাল বনে,— যেটা কুইন্টানিলা আর পিয়েদ্রার মাঝখানে।

দু'ঘন্টার মধ্যেই ও বুঝে গেল যে ও পথ হারিয়েছে। তারপরেই এল মনের অবধারিত বিশৃঙ্খলা, কোথাও একটা পৌঁছোবার জন্য তাড়াহুড়ো। মেস্কিকো তবু অবস্থাটা ফেরাতে উৎসুকক, সে তৎপরতার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে এগোয় জঙ্গলের কুটিল গোলকধাঁধা দিয়ে। সেই মুহূর্তে ঘোড়া বুঝে গেছে ব্যাপারটা, সে জানে পথ সম্বন্ধে তার মনিবের নিশ্চয়তাবোধ আর কাজ করছে না! কোনো টিলাও এখন নেই যার ওপর উঠে ওরা সমতল দেশের দৃশ্য দেখতে পারে। কয়েকটার কাছে এসেছিল বটে তবে জঙ্গল সেখানে এমন ঘন আর গভীর যে তার ভেতরে একটা খরগোশও ঢুকতে পারে না। ফ্রিও নিম্নভূমির বিশাল নির্জন জঙ্গলে এখন ওরা।

এক-দিন বা এক-রাত হারিয়ে গেলেও কোনো গো-পালক বা মেষ-পালকের কাছে তা কিছুই নয়। এ ব্যাপারটা হামেশাই ঘটে। নেহাতই এক বেলা কি দু-বেলার আহার ফস্কে যাবে, আর মেস্কিট ঘাসের নরম গদিতে জিন-কম্বল

বিছিয়ে ঘুমটি হবে তোফা। কিন্তু স্যামের ব্যাপারটা আলাদা। রাতে সে কখোনো র‍্যাঞ্চ ছেড়ে দূরে কোথাও থাকেনি। গ্রামদেশে মার্থির বড় ভয়—মেক্সিকানদের ভয়, সাপ, চিতাবাঘ, এমনকি ভেড়াতেও ভয়। তাই কখনো সে ওকে একলা ফেলে বেরোয়নি।

বিকেল তখন নিশ্চয় প্রায় চারটে হয়ে গেছে যখন স্যামের বিবেক জাগ্রত হল। অবসন্ন ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছে ও—উত্তাপ বা ক্লান্তি থেকে ততটা নয় যতটা উদ্বেগ থেকে। এতক্ষণ অবধি ও সেই পথটাই খুঁজে পাবে বলে আশা করছিল যেটা ফ্রিও-র চৌরাস্তা আর চ্যাপম্যান র‍্যাঞ্চের দিকে গিয়েছে। কোনো অস্পষ্ট নিশানায় এসে, নির্ঘাত সেটা পার হয়ে সে বেশি আগে চলে গিয়েছে। তা যদি খামার, কি শিবির, কি কোনো একটা জায়গা পেয়ে যেত যেখানে তাজা ঘোড়া পাওয়া যায়, জেনে নেওয়া যায় পথের হদিশ, তাহলে সারা রাত লেগে গেলেও ঘোড়া চালিয়ে সে ফিরে যাবেই মার্থি আর নিজের ছেলের কাছে।

অতএব, যেমন ইঙ্গিত করেছি,—স্যামের এখন প্রচণ্ড আপসোস। বউকে যে কড়া কথাগুলো শুনিয়েছিল এখন তা যেন গলার মধ্যে একটা বড় কাঁটার মতো আটকে আছে। এমনিতেই মার্থির পক্ষে ওই পাণ্ডব বর্জিত দেশে বাস করা একটা বোঝা স্বরূপ, যদি স্বামীর গালাগালের জুলুম সইতে নাও হত তবুও। নিজেকে ভয়ানক তিরস্কার করে, আকস্মিক লজ্জা যেন গ্রীষ্মের গরমকেও ছাপিয়ে ওঠে—ভেবে যে কতবার সে বউকে মন্দ কথা শুনিয়েছে, বকাঝকা করেছে তার উপন্যাস পড়ার ঝোঁক দেখে।

'ওই একটাই আনন্দ তো বেচারী মেয়েটোর আছে!' —ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে গলা উঁচিয়ে কাঁদে স্যাম, আর অনভ্যস্ত আওয়াজটা শুনে ভড়কে ওঠে মেক্সিকো,—'আমার মতো মোটা-মাথা একটা নেকড়ের সঙ্গে বাস করা! ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারতে হয় হতভাগা জানোয়ারকে!—তারপর রান্না, ঝাড়পোঁছ করে সেই ভেড়ার মাংস আর শিম গেলা—আর আমি কিনা ওকে গাল দিই একটা ক্ষুদে কেতাবের মধ্যে শান্তি খুঁজেছে বলে!'

ডগটাউনে প্রথম দেখা হবার সময় মার্থি কেমন ছিল সে-কথা মনে পড়ে ওর। স্মার্ট, প্রিয়দর্শনা, ছিমছাম। তারপর কড়া রোদের তাপে ওর গালদুটো গোলাপি থেকে বাদামি হয়ে গেল, ওক-অরণ্যের নীরবতা ওর সব উঁচু আশা-আকাঙ্খা স্তিমিত করে দিল।

স্যাম বিড়বিড় করে বলে, 'আবার যদি ক্ষুদে মেয়েটাকে একটা কড়া কথাও বলেছি, কিংবা যে ভালবাসা-স্নেহ আমার দেবার কথা তা দিতে না পারি তাহলে বুনোবেড়াল আমায় টুকরো-টুকরো করে খাক্।'

ও জানে এবার কী করতে হবে। ওর সান আন্টেনিওর সওদাগর 'গর্সিয়া-এণ্ড-জোন্‌স', যাদের সঙ্গে ওর উল বেচা আর রসদ কেনার সম্পর্ক,

তাদের ও চিঠি লিখে বড় এক বাক্স নভেল আর অন্য পড়ার বই আনিয়ে নেবে মার্থির জন্য। এবার সবই অন্য রকম হবে। একটা ছোট্ট পিয়ানো র‍্যাঞ্চ-বাড়ির কামরায় রাখলে কেমন হয় যাতে ওর পরিবারকে ঘরের বাইরে না যেতে হয়?

মার্থি আর র‍্যাণ্ডিকে একা রাত কাটাতে হবে এ-চিন্তা কিন্তু ওর আত্ম-ধিক্কারকে প্রশমন করার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কল্পনা করেনি ও। যত খুনসুটিই ওদের হোক, রাত হলে মার্থি গ্রামদেশের সব ভয় তুচ্ছ ক'রে স্যামের সবল বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে স্বস্তি আর ভরসার শান্তিময় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে অভ্যস্ত। আর ওর ভয়গুলোও কি নেহাতই কাল্পনিক? স্যামের মনে আসে ঘুর-ঘুর করা ডাকাত মেক্সিকানদের কথা, তারপর কুগারের চুপিচুপি হানা র‍্যাঞ্চগুলোর ওপর, র‍্যাট্‌ল সাপ, কেন্নো, বিছে, আরো ডজনখানেক সম্ভাব্য বিপদের কথা। মার্থি তো ভয়ে পাগল হয়ে যাবে। আর র‍্যাণ্ডি 'ড্যাডির' ফেরার জন্য কাঁদাকাটি করবে।

এখনো যেন শেষ হতে চায় না পালা করে কাঁটাগাছ, ক্যাক্‌টাস্ আর মেস্কিটের বিস্তার। খাড়ার পর খাড়া, ঢালের পর ঢাল্—সব যেন একই ধাঁচের—ক্রমাগত পুনরাবৃত্তির ফলে সবই যেন চেনা, অথচ তবু নতুন আর অচেনা। একবার যদি অন্তত কোথাও গিয়ে 'পৌঁছুতে' পারত।

সরল রেখা হল শিল্প। প্রকৃতি চলে বৃত্তপথে। একজন সরল সিধে মানুষ যে কোনো কূটনীতিকের তুলনায় বেশি শিল্পসৃষ্ট। মানুষ তুষার রাজ্যে হারিয়ে গেছে হুবহু একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরে. যতক্ষণ না সে অবসন্ন হবে বসে পড়েছে—এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে তার পায়ের চিহ্ন থেকে। দর্শন এবং অন্যান্য মানসিক চিন্তার পথিকরাও প্রায়ই ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসেন তাঁদের আরম্ভ বিন্দুতেই।

স্যাম ওযেবার যখন অনুতাপ ও সদিচ্ছার চরম পর্যায়ে. মেক্সিকো তখন কিন্তু গভীর নিশ্বাস ফেলে নিজের নিয়মিত দুলকি চাল ছেড়ে ধীর আপখুশি ভাবে হাঁটতে শুরু করেছে। ওরা এবার একটা সহজ উৎরাই বেয়ে নামছে—জায়গাটা দশ-বারো ফুট উঁচু কাঁটাঝোপে ঢাকা।

স্যাম গজ্‌গজ করে, 'মেক্স. এ তোমার কী হচ্ছে, এ তো চলবে না! আমি জানি তুমি পুরো ক্লান্ত, কিন্তু আমাদের যে চলতেই হবে। ওঃ লর্ডি, সারা দুনিয়ায় কোথাও কি একটা দ্বিতীয় বাড়ি নেই?' —পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা সজোর লাথি কষায় ঘোড়ার গায়ে।

মেক্সিকো আপত্তি জানিয়ে ঘোঁৎ করে ওঠে. যেন বলতে চায়—ওটার কি প্রয়োজন ছিল যখন এত কাছে এসেই গেছি'?—গতিটাকে একটু বাড়িয়ে অলস কদমে চলে। একটা ঘন কালো বিরাট ওক-বন চক্কর দিয়ে, একজায়গায় এসে ও থেমে পড়ে। স্যাম লাগামের বাঁধন ছেড়ে বসে, তাকিয়ে থাকে নিজের বাড়িরই পেছন দরজার দিকে—দশগজ দূরেও হবে না সেটা!

মার্থি শান্ত আরামে দোলনা চেয়ারে বসে আছে. দরজার সামনে বাড়ির ছায়ায়,

পা-দুটো আরামে ছড়িয়ে দিয়েছে সিঁড়ির ওপর। এক জোড়া ঘোড়সওয়ারী রেকাব নিয়ে মাটিতে খেলছিল র‍্যাণ্ডি। একবার সে মুখ তুলে বাপের দিকে তাকাল, তারপর আবার রেকাবে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে এক কলি গান গেয়ে চলল। মার্থি চেয়ারের পেছনে অলসভাবে মাথা ঘুরিয়ে আবেগশূন্য দৃষ্টিতে দেখল ওদের এসে পৌঁছানো। কোলের ওপর একটা বই রেখেছে ভেতরের পাতায় আঙুল রেখে।

স্যাম অদ্ভুত রকম একটা গা ঝাড়া দিল, যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো, তারপর নামল ঘোড়া থেকে। শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল একটু। বললে, 'তুমি যে দেখছি সেই বসেই আছো, আর ওই ছাইভস্ম হলদে-মলাট নাভিলগুলো পড়েই চলেছ!'

স্যাম বৃত্তের চারদিকে ঘুরে অবশেষে নিজের কাছেই ফিরে এসেছে।

Round the Circle. এভারিবডিস, ১৯০২ (সিডনী পোর্টার নামে)

ক্যাক্টাস্

'সময়' ব্যাপারটা পুরোপুরিই আপেক্ষিক, সময় সম্পর্কে সেটাই লক্ষ্যণীয় বিষয়। অনেকেই এব্যাপারে একমত যে ডুবন্ত মানুষের মগজে নাকি রাজ্যের যত স্মৃতি ভিড় করে আসে ডোবার সময়: আর এটাও কোনো অবিশ্বাসের কথা নয় যে, কেউ তার দস্তানা খুলে ফেলবার মুহূর্তটাতেই স্মরণ করতে পারে তার গোটা প্রেমপর্বের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

নিজের ব্যাচিলর-কামরার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে সেইটেই করছিল ট্রিস্‌ডেল। টেবিলের ওপর রাখা আছে লাল মাটির পাত্রে একটা অনন্য-দর্শনীয় সবুজ গাছ। গাছটা হল এক জাতের ক্যাক্টাস্, লম্বা আঁকড়া-ওয়ালা পাতায় সজ্জিত—সামান্যতম বাতাসেও অনবরত দোলে অদ্ভুতরকম হাতছানি দিয়ে ডাকার ভঙ্গিতে।

বধূর ভ্রাতা—ট্রিস্‌ডেলের বন্ধু—একটা সাইডবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে গজগজ করছিল, তাকে একা মদ্যপান করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে। দু'জন পুরুষই সান্ধ্যপোশাক পরা। তাঁদের কোটের ওপর সাদা প্রতীকচিহ্ন তারার মতো জ্বলজ্বল করছে কামরার অন্ধকারে।

ধীরে ধীরে দস্তানার বোতাম খুলতে গিয়েই ট্রিস্‌ডেলের মনের মধ্যে খেলে গেল ভীতি-উৎপাদক পশ্চাৎপটের একটা দ্রুত ছবি—গত কয়েকটি ঘন্টার। মনে

হচ্ছিল ওর নাকে এখনো লেগে রয়েছে চার্চের চতুর্দিকে ছড়ানো ফুলের সুবাসিত স্তূপ থেকে আসা গন্ধ, কানে এখনো বাজছে সহস্র ভদ্রকণ্ঠের নিচু-পর্দার গুঞ্জন, কোঁচানো পোশাকের খস্‌খসানি আর নাছোড়বান্দা কণ্ঠে পাদ্রির টেনে-টেনে বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি—বধূকে একজনের সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে বেঁধে দেবার মন্ত্রে।

ঠিক এই শেষ নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিবিন্দুটা থেকেই সে চেষ্টা করছে কোনো সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে (এটা তার মানসিক অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে)—কেন, এবং কেমন করে সে ওকে হারাল? আপস-সম্ভাবনাহীন এই ঘটনায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ সে বুঝতে পারল সে নিজেই এমন-কিছুর মুখোমুখি, যার সম্মুখীন সে আগে কোনদিন হয়নি—সেটা ওর নিজের অন্তর্নিহিত, অপ্রশমিত, ধরাচূড়াহীন সত্তা। ভণিতা ও অহংকারের সমস্ত ছদ্ম-আবরণ যা ও এতকাল ধারণ করেছে, এখন দেখছে সে সবই মূর্খতার ছেঁড়া পোশাকে পরিণত। ও শিহরিত হয় এই ভেবে যে খানিক আগে অন্যদের চোখেও নিশ্চয় ওর দীন আত্মার পোশাক ধরা পড়ে গেছে করুণ আর জীর্ণ বলে। বৃথা গর্ব, অহংকার! ওর বর্মের এগুলোই ছিল জোর। অথচ মেয়েটি এসব থেকে কত না মুক্ত ছিল বরাবরই! কিন্তু কেন—

মেয়েটি যখন গির্জার মঞ্চপথে ধীর পদক্ষেপে বেদির দিকে এগোচ্ছিল, তখন সে নিজে বোধ করছিল একধরনের অশোভন চাপা রাগের উল্লাস—সেটাই তো খাড়া রেখেছিল তাকে। সে নিজেকে বুঝিয়েছে,—মেয়েটির মুখের এই পাংশুতা আসলে অন্য মানুষের জন্য, যার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চলেছে তার জন্য নয়। কিন্তু সেই অসহায় সান্ত্বনাটুকুও তারপর যে কেড়ে নেওয়া হল তার কাছ থেকে! কারণ, যখন দেখল মেয়েটির চকিত নির্মল চাউনি উঁচু হয়ে চেয়েছে তার করকমলধারী সেই লোকটির দিকেই, তখনই সে বুঝল সে এবার বিস্মৃত। এক সময় ওই একই চোখ উঁচু করে মেয়েটি তাকিয়েছিল তার দিকেও, সে তার মানেও বুঝে নিয়েছিল। বাস্তবিকই তার আত্মগর্ব এবার গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ল; শেষ স্তম্ভটাও অন্তর্হিত। এভাবে কেন শেষ হল সব কিছু? কোন ঝগরাই তো হয়নি তাদের মধ্যে, কিছুই নয়—

এই নিয়ে হাজার বার সে গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো মনের মধ্যে নতুন করে সাজায়—জোয়ারের হঠাৎ পরিবর্তনটা তো এরই মধ্যে এসে গেল!

মেয়েটি বরাবরই তাকে একটা উচ্চাসনে রাখতে চাইত, সেও রাজসিক গৌরবে ওর এই স্তুতিটুকু গ্রহণ করত। অতি সুরভিত ধূপ জ্বালিয়ে রাখত তার সামনে; কত বিনম্র (নিজেই বলত সে), কেমন শিশুসুলভ পুজোর মন্ত্রো, আর কত একনিষ্ঠ (এক সময় সে এ ব্যাপারে হলপ করতেও পারত)। তার ওপর যত উচ্চ-গুণ, পরমোৎকর্ষতা, আর প্রতিভার প্রশস্তি প্রায় অলৌকিক সংখ্যায় বর্ষণ

করত তার ওপর, যে সে নৈবদ্য তাকে গ্রহণ করতেই হল—শুষ্ক মরু যেমন বৃষ্টি পান করে; অথচ বৃষ্টি সেই মরু থেকে জোড় করেও কোনো ফুল বা ফলের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারে না।...

ট্রিস্‌ডেল যখন গম্ভীর মুখে তার শেষ দস্তানাটার কিনারা ধরে টানে, তখনই ওর মনে বিশদ রূপে ফিরে আসে সেই চূড়ান্ত ঘটনাটা—তার বুদ্ধিহীন আত্মসর্বস্বতার সেই নমুনা, যা বিলম্বে পরিতাপ এনেছে।

দৃশ্যটা সেই রাতের, যেদিন সে ওকে আহ্বান জানাল নিজের উচ্চ অবস্থানে এসে তার বিশালত্বে অংশ গ্রহণ করতে। সে রাতে ওর সে সন্দেহাতীত সৌন্দর্যের স্মৃতি ওকে ব্যথিত করে বলে ও সেসব আর ভাবতেই চায় না এখন—সেই অবিন্যস্ত চুলের ঢেউ, চেহারায় আর কথায় কমনীয়তা আর কুমারীত্বের লাবণ্য। কিন্তু ওগুলোই ছিল যথেষ্ট, ওগুলোই কথা জোগালো তার মুখে। ওদের আলাপের এক ফাঁকে মেয়েটি বলে : 'আর দেখুন না, ক্যাপ্টেন ক্যারাথার্স বলেন আপনি নাকি স্পেনীয় ভাষা বলেন স্পেনের লোকের মতোই। এ গুণটি কেন চেপে রাখলেন আমার কাছে? এমন কিছু কি আছে যা আপনি জানেন না?'

এখন হয়েছে কী, ক্যারাথার্স একটা গাধা। সন্দেহ নেই ট্রিস্‌ডেল একটা অপরাধ করেছে (মাঝে মাঝে এ ধরনের ব্যাপার করে সে) : অভিধানের পেছনে পাওয়া কিছু জগাখিচুড়ি পুরনো স্পেনীয় প্রবাদবাক্য উদ্ধৃত করে ক্লাবের মধ্যে সেগুলো যেমন-তেমন ঝেড়েছিল। ক্যারাথার্স তার অসংযমী স্তাবক; যথার্থ লোক যে এই সন্দেহজনক বিদ্যার জাহির অনেক গুণে বাড়িয়েই থাকতে পারে।

কিন্তু হায়! এমনই মিষ্টি আর মন-মজানো মেয়েটির ভক্তি, যে কোনো অস্বীকৃতি না জানিয়ে সে বেমালুম চেপে গেল নিজের নামে অমন একটা বাজে কথা। বিনা প্রতিবাদেই নিজের মাথায় ঝুটো একটা মুকুট চড়াতে দিল—স্পেনীয় পাণ্ডিত্যের। মুকুট তো তার দিগ্বিজয়ী মাথার শোভা বাড়িয়েছে ঠিকই, তবে তার নরম কারুকার্যের মধ্যে সে টের পায়নি সেই কাঁটা, যা ওকে পরে ভালমোই বিঁধবে।

কী খুশি, কেমন লাজুক মেয়েটি, যেন কেঁপে উঠেছিল! ট্রিস্‌ডেল যখন নিজের প্রভুত্ব ওর পায়ের কাছে সঁপে দেয় তখন ও যেন ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছটফট করছিল। ট্রিস্‌ডেল হলপ করে বলতে পারত (এখনো তা বোধহয় পারে) যে মেয়েটিব চোখে ছিল অবিসম্বাদিত সম্মতির প্রকাশ, তবে ব্রীড়াময়ীর মতোই কোনো সিধে জবাব সে দেয়নি। বলেছিল, 'আমার জবাব তোমায় কাল জানাব'; আর সে,—প্রশয়দাতা কৃতনিশ্চয় বিজয়ীর মতোই—হেসে সম্মতি জানাল বিলম্বটুকুর জন্য।

সেই জবাব জানবার জন্য ও পরদিন নিজের ঘরে অধীর হয়ে অপেক্ষা করল। দুপুর বেলায় মেয়েটির খিদমতগার দরজার কাছে এসে রেখে গেল লালমাটির টবে বসানো অদ্ভুত ক্যাক্টাস্‌টা। কোন চিঠি নেই, কোনো বার্তাও নেই, শুধু

চারাগাছটির গায়ে একটা ফিতে বাঁধা, তাতে কোনো অরুচির বিদেশী অথবা খটোমটো উদ্ভিদবিদ্যার নাম। ট্রিস্‌ডেল রাত অবধি প্রতীক্ষা করে, কিন্তু মেয়েটির জবাব আর আসে না। মহা অহংকার আর আহত অভিমানের বশে সে আর খোঁজ করেনি মেয়েটিরও। দুটি সন্ধ্যা বাদে ওদের এক ডিনারে দেখা হল। ওদের পারস্পরিক সম্ভাষণ হল কেতামাফিক, কিন্তু মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়েছিল নিঃশ্বাস রুখে, অবাক ও উৎসুক চোখে। ট্রিস্‌ডেল সৌজন্যময় হলেও গোঁ-ধরা, মেয়েটির কাছ থেকে একটা কৈফিয়ত প্রত্যাশা করছে। স্বাভাবিক মেয়েলি ক্ষিপ্রতায় ওর ব্যবহার থেকেই খেই ধরে নিয়েছে মেয়েটি, ডুবে গেছে বরফের শীতলতা ও কঠিনতার মধ্যে। এই ভাবে, এবং এর পর আরো ব্যবধান বাড়তে, ওরা দু'জনেই সরে গেল পরস্পর থেকে দূরে। ওর দোষটা ছিল কোথায়? কার ওপর দোষারোপ করতে হয়? এখন নতিস্বীকার করে ট্রিস্‌ডেল তার উত্তর খুঁজছে নিজের আত্মভিমানের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। যদি—

ওর চিন্তার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটালো কামরার মধ্যেই প্রশ্নের সুরে অন্য একটি কণ্ঠ, যেন ওকে সজাগ করে তুলল তা :

'এই যে, ট্রিস্‌ডেল, তোমার ব্যাপারটা কী বলতো? তোমাকে দেখাচ্ছে যেন অসুখী, যেন তুমি নিজেই বিয়েটা করেছ; বিয়ের ব্যাপারে নেহাতই যোগসাজশ করে দিয়েছ, সেটাই সব নয়? আমার দিকে চেয়ে দ্যাখ, আমিও তো আরেকজন আনুষঙ্গিক, দু'হাজার মাইল একটা আদা-আরশোলার গন্ধওয়ালা কদলী-জাহাজে চেপে এসেছি দক্ষিণ-আমেমরিকা থেকে—চোখ বুজে বলির উৎসবে সায় দেব বলে—তবু দয়া করে দ্যাখ, আমার ঘাড়ের ওপর কোনো অপরাধবোধের বোঝা তো নেই। আমার একমাত্র ছোট বোন ছিল ও-ই, তাও বিদেয় হল। এবার এসো ভাই! কিছু পান করে নিজের বিবেক হাল্কা কর।'

'আমি এক্ষুনি কিছু খাব না, ধন্যবাদ,' বললে ট্রিস্‌ডেল।

অন্যজন এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ফের বললে, 'তোমার ব্র্যাণ্ডিটা অতি জঘন্য। একবার গিয়ে আমাদের পুন্টা রেডণ্ডা দেখে এস, বুড়ো গার্সিয়া যে জিনিসগুলো লুকিয়ে-ছাপিয়ে আমদানি করে তার খানিকটা নিজেই চেখে দেখো। গোটা ভ্রমণের খরচ উশুল হয়ে যাবে।... আরে! এ যে দেখছি আরেক পুরনো পরিচিত! এটাকে কোথা থেকে খুঁজে পেলে হে ট্রিস্‌ডেল?'

'একটা উপহার,' বললে ট্রিস্‌ডেল, 'একজন বন্ধুর কাছ থেকে। চেনো এই জাতটাকে?

'ভালোই চিনি। গ্রীষ্মাঞ্চলের জিনিস। পুন্টাতে তো রোজ শ'য়ে শ'য়ে দেখতে পাই। এই তো নামটা, বাঁধা ফিতেটার ওপর লেখা। স্পেনীয় ভাষা কিছু জানা আছে ট্রিস্‌ডেল?'

মুখে একটা বিকৃত হাসি টেনে ট্রিস্‌ডেল বললে, 'না ভাই। এটা কি স্প্যানিশ?'

'হ্যাঁ! দেশীয় লোকরা কল্পনা করে এর পাতাগুলো যেন হাত বাড়িয়ে কাউকে ডাকছে। ওরা তো তাই নাম দিয়েছে "ভেন্তোমার্মে", তর্জমা করলে যার মানে—"এসো, আমায় ধরো।"

The Cactus, এভারিবডি'স, ১৯০২ (সিডনী পোর্টার নামে)

হাত আর হৃদয়

ডেনভার স্টেশনে বেশ একদল যাত্রী ভিড় করেছে বি. এণ্ড এম. এক্সপ্রেসের কামরায়। একটা কামরায় বসে ছিল ভারি সুন্দরী এক যুবতী মহিলা, রুচিসম্পন্ন পোশাকে, আর তাকে ঘিরে অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর যোগ্য সব রকম আয়েস ও আরামের সুব্যবস্থা। নবাগতদের মধ্যে দু'জন যুবক—একজন লক্ষণীয় সুপুরুষ, সপ্রতিভ, চেহারা আর আচরণে অকপট। দ্বিতীয়জন উস্কোখুস্কো গোমড়াধরনের মানুষ, ভারী গড়ন, যেমন-তেমন পোশাক। দু'জন একসঙ্গে এক হাতকড়িতে বাঁধা।

কামরার ভেতরের গলি দিয়ে আসবার সময় একটাই আসন ওরা খালি পেল, সেটা আকর্ষণীয়া যুবতীর সামনেই ফেরানো। জোড়-বাঁধা দুই যুবক সেখানেই বসল। যুবতী মহিলার তরফ থেকে একটা ক্ষিপ্র, আগ্রহহীন সুদূর দৃষ্টি ওদের ওপর নজর বুলোয়; তারপরেই মুখখানা চমৎকার হাসিতে উদ্ভাসিত করে, সুগোল গণ্ডে হালকা গোলাপি আভা তুলে মেয়েটি একটা ছোট ধূসর দস্তানাপরা হাত বাড়িয়ে দেয়। যখন মহিলা কথা বলে তখন তার ভরা, মিষ্টি, সপ্রতিভ কণ্ঠেই প্রকাশ পায়—কণ্ঠের অধিকারিণী কথা-বলতে ও কথা-শুনতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত।

'দেখুন মিঃ ইস্টন, আমাকে দিয়েই যদি প্রথম কথা বলাতে চান, তাহলে তো আমায় মুখ খুলতেই হয়। পশ্চিম এলাকায় কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনতেই চান না বুঝি?'

কনিষ্ঠতর যুবকটি ওর গলার আওয়াজে যেন আচমকা জেগে ওঠে, সামান্য বিব্রতভাব এলেও চেষ্টা করে সেটা তৎক্ষণাৎ কাটিয়ে উঠতে। তারপর নিজের বাঁ হাত দিয়ে ধরে মহিলার আঙুলগুলো।

'এ দেখছি মিস্ ফেয়ারচাইল্ড।' একটু হেসে বলে সে, 'আমার অন্য হাতটাকে কিন্তু মাফ করতে হবে; ঠিক এই মুহূর্তে ওটা অন্যভাবে নিযুক্ত।'

ডান হাতটা এবার সামান্য উঁচু করে। চক্চকে "কঙ্কনে" তার কব্জিটা বাঁধা পাশের সঙ্গীর বাঁ-কব্জির সঙ্গে। মেয়েটির চোখের খুশি ভাবটা ধীরে বদলে যায়

হতভম্ব আতঙ্কে। গাল থেকে মুছে যায় আভা। একটা অস্পষ্ট শিথিল মর্মপীড়ায় হাঁ হয়ে যায় তার ঠোঁট দুটো। ইস্টন যেন মজা পেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্য লোকটিই আগে মুখ খুলল। গোমড়ামুখো লোকটা এতক্ষণ তীক্ষ্ণ শেয়ানা চোখের চাপা নজরে লক্ষ্য করছিল মেয়েটির চেহারা।

'মিস্, কথা বলছি বলে আমায় মাফ করবেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আপনি এই মার্শালের সঙ্গে আগেই পরিচিত। যদি আমার হয়ে এঁকে একটু বলেন, তাহলে খোঁয়াড়ে ঢোকার সময় ইনি হয়তো সে-কথা রাখবেন, তার ফলে আমার পক্ষেও একটু হয়তো সুরাহা হবে সেখানে। ইনি আমাকে লিভেনওয়ার্থ জেলে নিয়ে যাচ্ছেন। টাকা জাল করার অপরাধে সাত বছর।'

'ওহ!— বলল মেয়েটি, সেই সঙ্গে গভীর দীর্ঘশ্বাস, গালের রঙও যেন ফিরে এল, 'তাহলে এই বুঝি আপনি করছেন এখানে? একজন মার্শাল!'

ইস্টন শান্তকণ্ঠে বলল, 'দেখুন প্রিয় মিস্ ফেয়ারচাইল্ড, কিছু তো আমায় করতেই হত। টাকা থাকলেই টাকার ডানা গজায়, আর জানেনই তো আমাদের ওয়াশিংটনের সমাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে টাকার কত-না দরকার! পশ্চিমের দিকে পেয়ে গেলাম একটা সুযোগ, আর... তা, মার্শালগিরিটা অবশ্য রাষ্ট্রদূতের পদের মতো অতো উঁচু পদ নয়, তা'হলেও—'

উষ্ণ স্বরে মেয়েটি বলে, 'রাষ্ট্রদূত তো আর আসেন না দেখা করতে। তাঁর আসার প্রয়োজন আদৌ ছিলই না। আপনার তা জানা থাকা উচিত। যাহোক, তাহলে আপনি এখন সেই সাহসী পশ্চিমী বীরনায়কদের একজন, যখন-তখন ঘোড়া দাবড়ে, বন্দুক চালিয়ে, সমস্তরকম বিপদের মধ্যে ছুটে যান। হ্যাঁ, ওয়াশিংটনের জীবন থেকে তা আলাদা। পুরনো দলবল আর আপনাকে পায় না বলে আক্ষেপ তাদের।'

মেয়েটির স্বপ্নমাখা চোখ এবার একটু বড় হয়ে ফিরে তাকায় চক্চকে হাতকড়িটার দিকে, সেদিকেই চেয়ে থাকে।

অন্য লোকটা বলে ওঠে, 'এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না মিস্। সব মার্শালই তাঁদের আসামীদের নিজের সঙ্গে হাতকড়িতে বেঁধে রাখেন, যাতে তারা পালিয়ে না যায়। মিঃ ইস্টন নিজের কাজটি ঠিকই বোঝেন।'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, 'আবার আপনাকে শিগ্গিরই ওয়াশিংটনে দেখতে পাব তো?

'খুব শিগ্গির নয় বোধ হয়।' ইস্টন বললে, 'ভয় হয়, আমার প্রজাপতি জীবনের দিন এবার শেষ হয়ে গেল।'

মেয়েটি অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বললে, 'পশ্চিম আমার খুব ভাল লাগে।' মৃদু-মৃদু জ্বলছে ওর চোখ। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবার

কথা বলে সরল খাঁটি সুরে, সৌজন্য বা বাক্‌নৈপুণ্যের জেল্লা নেই তাতে।— 'মা আর আমি এবার গ্রীষ্ম কাটালাম ডেনভারে। মা হপ্তাখানেক আগে ঘরে ফিরে গেলেন কারণ বাবা ছিলেন সামান্য অসুস্থ। আমি পশ্চিমেই থাকতে পারতাম, খুশি মনে। আমার ধারণা এখানকার হাওয়া আমার পক্ষে বেশ ভাল। টাকাই তো সব নয়। কিন্তু লোকে সবসময় ভুল বোঝে আর বোকাই থেকে যায়—'

গোমড়ামুখো লোকটা এবার গজ্‌গজ করে উঠল— 'দেখুন মিঃ মার্শাল, ব্যাপারটা কিন্তু ন্যায়সঙ্গত নয়। আমার একটু পান করা দরকার, সারাদ্দিন একবারও ধোঁয়া ফুঁকতে পারিনি। এর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই তো কথা বললেন আপনারা! এবার আমায় একটু ধূমপায়ীদের কামরায় নিয়ে চলুন না? যাবেন তো? একটু পাইপ টানব বলে হন্যে হয়ে উঠেছি।'

"বাঁধা" যাত্রী দু'জন উঠে দাঁড়ায়, ইস্টনের মুখে এখনো সেই মৃদু হাসিটা লেগে রয়েছে।

হালকা গলায় বললে, 'কেউ তামাক খাবার আবেদন জানালে আমি তাকে মানা করতে পারি না। ভাগ্যহীনদের ওটাই তো এক বন্ধু। চলি, মিস্ ফেয়ারচাইল্ড। কর্তব্যের ডাক, বুঝলেন তো',— বিদায়ের ইঙ্গিত করে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

কেতাদুরস্ত ভদ্রতায় নিজের পোশক ঠিক করে মেয়েটি বললে, 'পূবে তো আপনি আর যাচ্ছেনই না,— আপসোস। তবে লিভেনওয়ার্থে নামতে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?'

হ্যাঁ। লিভেনওয়ার্থে তো যেতে হবেই আমায়।'

আসনের ফাঁকের গলি দিয়ে দু'জন মানুষই ধূমপায়ী-কক্ষে ঢুকে গেল।

কাছেরই আসনে বসে দু'জন যাত্রী ওদের প্রায় সব কথাবার্তা শুনেছিল। ওদের একজন বলল, 'মার্শালকে তো বেশ ভাল মানুষই মনে হচ্ছে। পশ্চিমের এদিকে কিছু লোক আছে যারা খাঁটি লোক।'

অন্যজন বললে, 'এরকম একটা পদের পক্ষে বেশ অল্পই বয়েস বলতে হবে, তাই না?'

প্রথম বক্তা অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল, 'অল্প বয়েস? কেন— ওহো হো! আপনি লক্ষ্য করেননি বুঝি; কখনো কোনো অফিসারকে দেখেছেন তাঁর "ডান" হাতের হাতকড়ায় বন্দীতে বাঁধতে?'

Hearts and Hands. এভারিবডিস্, ১৯০২ (সিডনী পোর্টার নামে)

সুযোগের ছায়ামাত্র

করুণ কণ্ঠে আবার বললেন মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং— 'সত্যি সত্যি একটা চুন-সুরকির গামলা কাঁধে!'

সহানুভূতিতে ভুরু-দুটোকে ধনুকের মতো উঁচোন মিসেস্ বেলামী বেল্‌মোর। এইভাবে উনি সান্ত্বনা আর বেশ খানিকটা আপাত বিস্ময়, একসঙ্গেই প্রকাশ করেন।

আবার আগের কথায় ফিরে এলেন মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং, 'ভেবে দেখুন তো, সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন উনি এখানেই এই ফ্ল্যাটের মধ্যে— যা হল গিয়ে আমাদের সেরা অতিথি-আবাস— একটা ভূত দেখেছেন, কাঁধে চুনসুরকির গামলা.... আলখাল্লাপরা এক বুড়ো মানুষের ভূত, মুখে পাইপ ঝুলিয়ে গামলা বইছে! এত বাজে উদ্ভট না, যে বোঝা যায় পেছনে হিংসুটে মতলব রয়েছে! এমন কোনো কিন্‌সলভিং জন্মেও ছিলেন না যিনি চুনসুরকির গামলা বইতে পারেন। সকলেই জানে মিঃ কিন্‌সলভিংয়ের বাবা বড়-বড় বাড়ি তৈরির ঠিকদারি করে পয়সা জমিয়েছিলেন, কিন্তু কক্ষনো একদিনের তরেও নিজেরে হাতে কাজ করেননি। এ বাড়িটা বানিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিজের নক্‌শায়— কিন্তু গামলা! উঃ, কেন উনি এমন নিষ্ঠুর হিংসেভাব দেখাচ্ছেন?'

'সত্যিই বড় বিচ্ছিরি ব্যাপারটা', বিড়বিড় করে বলেন মিসেস্ বেল্‌মোর; লিল্যাক আর সেকেলে সোনালি রং-করা মস্ত কামরাটার চারদিকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চেয়ে তারিফ করেন,— 'আর বলছেন এই ঘরেই দেখেছিলেন ভূতটা! না না, আমি ভূত-টুতের ভয় করি না। আমার দিক থেকে সে-ভয় আপনি করবেন না। আমি খুশি হয়েছি যে আমায় এ ঘরটাতে থাকতে দিচ্ছেন। পারিবারিক ভূত তো আমার কাছে বিলক্ষণ কৌতূহলের ব্যাপার বলে মনে হয়! কিন্তু সত্যি বলতে, গল্পটা কেমন যেন খাপছাড়া; মিসেস্ ফিশার-সুইম্প্‌কিনসের কাছে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করেছিলাম। জোগাড়েরা কড়ায় চাপিয়ে ইটই তো বয় তাই না? কেন একটি ভূত খামোখা ইট বয়ে আনতে যাবে মার্বেল পাথরে তৈরি ভিলার মধ্যে? আমি খুব দুঃখিত, তবে এটাই ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে মিসেস্ ফিশার-সুইম্প্‌কিনসের ওপর বয়েসের প্রভাবটা পড়তে শুরু করেছে।'

মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং আবার বলেন, 'এ বাড়িটা বানানো হয়েছিল পুরনো একটা বাড়ির জমির ওপর, যেটা ওদের পরিবার ব্যবহার করতেন বিপ্লবের আমলে। সে বাড়িতে একটা ভূত থাকলে তা বরং বিচিত্র কিছু হত না। তা ছাড়া তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন কিন্‌সল্‌ভিং, যিনি জেনারেল গ্রীণের ফৌজে লড়াইও করেছিলেন যদিও আমরা কখনো এর প্রমাণে কোনো কাগজপত্র খুঁজে বের করতে পারিনি। তা পারিবারিক ভূত যদি থাকতোই সেটা উনি না হয়ে একটা ইট মিস্তিরির হতে

যাবে কেন?

'একজন বিপ্লবী পূর্বপুরুষের ভূত, সেটা তো মন্দ ভাবা হয়নি', মিসেস্ বেল্‌মোর সায় দিলেন, 'কিন্তু জানেন তো ভূতরা কেমন খামখেয়ালি আর অবুঝ হতে পারে। হয়তো-বা প্রেমের মতোই "তাদের জন্ম চোখের নজরে"। যারা ভূত দেখে তাদের একটা সুবিধা হল যে তাদের গল্প কখনো মিথ্যে প্রমাণ করা যায় না। চোখে হিংসের নজর থাকলে একটি বিপ্লবীর কাঁধের ব্যাগকেও অনায়াসে ইটের কড়া বলে চালানো যায়। মিসেস কিন্‌সল্‌ভিং, ডিয়ার, এসব নিয়ে আপনি আর ভাববেন না। আমি নিশ্চিন্ত ওটা একটা ব্যাগই ছিল।'

মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং প্রবোধ মানতে চান না, কান্নাভরা গলায় বলেন, 'কিন্তু উনি তো সব্বাইকে বলেছেন! একটু বিশদ করেই বলেছেন। সেই পাইপটার কথাও। তা ছাড়া আলখাল্লাটা থেকে বেরুবেন কী করে?

'ওর মধ্যে ঢুকবই না!'— সুন্দর করে একটা হাই চেপে বললেন মিসেস্ বেল্‌মোর, 'বড় কড়া আর কোঁচকানো।.... এই যে, ফেলিস্ নাকি? আমার স্নানের জলটা, প্লীজ তৈরি রাখো।..... আপনারা কি "ক্লিফটপে" সাতটার সময় ডিনার করেন, মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং? ধন্যবাদ যে দয়া করে ডিনারের আগে ছুটে এসেছেন একটু গল্প করতে! একজন অতিথির সঙ্গে এই রকমের আন্তরিকতার ছোট-ছোট ছোঁয়া আমার বড় ভাল লাগে। বেড়াতে এসে এটা পেলে যেন নিজের ঘরের স্বাদ পাই। মাফ করবেন ভাই, এবার আমায় সাজগোজ করতে হয়। বড্ড কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছি তো, সব সময় শেষ মুহূর্তের জন্য ঠেলে রাখি এসব।'

সামাজিক 'পাই-পিঠে' থেকে কিন্‌সল্‌ভিংরা সবচেয়ে বড় যে 'কিস্‌মিস্'টি তুলে নিয়েছিলেন সেটাই শ্রীমতি ফিশার-সুইম্প্‌কিনস্। বহুদিন পর্যন্ত গোটা পাই-পিঠেটাই ছিল নাগালের বাইরে, সবচেয়ে উঁচু তাকটাতে। কিন্তু টাকার থলি আর লেগে-থাকার জোরেই অবশেষে ওটা নিচে নেমে আসে। শ্রীমতি ফ্রিশার-সুইম্প্‌কিনস্ ছিলেন ফ্যাশনদুরন্ত সমাজের প্রদর্শন-বাহিনীর প্রতিফলন যন্ত্র, যার সূর্যালোক-সংকেত তাঁর বুদ্ধি ও কাজের প্রতিভাকে পৌঁছে দিত সৈন্যসারির শেষ অবধি, আর প্রচার করত 'উঁকি-ঝুঁকির' খেলায় যা-কিছু তাঁর সর্বাধুনিক ও দুঃসাহসিক আবিষ্কার। কিছুদিন আগে অবধি তাঁর খ্যাতি আর নেতৃত্বই ছিল যথেষ্ট ভরসাস্থল, ফলে কোনো ওঁচা কৌশলের সাহায্য নিতে হত না— যেমন পল্লীনৃত্যের আসরে খাতির পাবার জন্য জ্যান্ত ব্যাঙ ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এখন তার সিংহাসন শক্ত রাখার জন্য দরকার হচ্ছে এসব জিনিসের। তা ছাড়া মধ্য-বয়েসটাও এসে গেছে বেখাপ্পাভাবে তাঁর উদ্ভট-নৃত্যে অধিষ্ঠান করতে। উত্তেজনা-ছড়ানো পত্র-পত্রিকাগুলো তাঁর নির্দিষ্ট স্থান পুরো পৃষ্ঠা থেকে কমিয়ে দু'কলম করে দিয়েছে। তাঁর রসবুদ্ধিতে গজিয়েছে কাঁটা, তাঁর আচরণ হয়েছে আগের তুলনায় কর্কশ আর বিবেচনাহীন, যেন তিনি একটা রাজকীয় প্রয়োজনীয়তা বুঝছেন নিম্নতর আমাত্যদের বাঁধাধরা

রীতিপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করে নিজের একতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার।

কিন্‌সল্‌ভিংদের করায়ত্ত কিছুটা ক্ষমতার চাপে নতি স্বীকার করে শেষ অবধি উনি রাজি হয়েছিলেন একটি সান্ধ্যা-ও-রাতে নিজে উপস্থিত থেকে ওদের গৃহকে মর্যাদা দিতে। সেই গৃহকর্ত্রীর ওপর শোধটা তুললেন এবার— সুগম্ভীর চাপা উল্লাস আর সবিদ্রূপ রসিকতায় তাঁর কাহিনী শোনালেন চুনসুরকির কড়া-বাহী এক প্রেতের। সেই মহিলা তো এদিকে সমাজের লোভনীয় অন্দরে এতটা প্রবেশ করতে পেরে আনন্দে বিভোর, এরই মধ্যে এই ফলাফলটা তাঁর মাথায় হানল হতাশার বজ্রাঘাত। প্রত্যেকেই হয় সহানুভূতি দেখায়, নয়তো হাসে। আর এই দু'রকম ভাব প্রকাশের কোনটাকেই বেছে নেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু পরে মিসেস কিন্‌সল্‌ভিংয়ের আশা-আকাঙ্খা চাঙ্গা হয়ে উঠল দ্বিতীয় ও বৃহত্তর একটি পুরস্কার হাতে পেয়ে।

মিসেস্ বেলামী বেল্‌মোর 'ক্লিফ টপে' বেড়াতে আসার নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছেন, আর এখানে থাকবেন তিন দিন। মিসেস্ বেল্‌মোর আধুনিক যুগের তরুণতর মহিলা নেত্রী, যাঁর সৌন্দর্য, কুলমর্যাদা আর ধনগৌরব তাঁকে পবিত্রতম প্রকোষ্ঠের অন্যতম সেরা আসনটি দিয়েছে। তাই তাঁকে বদান্যই বলতে হবে যে মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিংয়ের চরম আকাঙ্খার সম্মানটি তাঁকে দিয়েছেন ; সেই সঙ্গে ভেবেছেন, এতে টেরেন্সও কতো খুশি হবে— হয়তো এবার তাকে ঠিকমতো বুঝে ওঠাও সম্ভব হবে।

টেরেন্স মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিংয়ের ছেলে, উনত্রিশ বছর বয়েস, যথেষ্ট সুপুরুষই, তা ছাড়া দু'তিনটে আকর্ষণীয় আর রহস্যময় বৈশিষ্ট আছে তার। এক নম্বর তো সে মায়ের দারুণ ভক্ত। সেটা কোন লক্ষ্য করার বিষয় নয়। অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল, সে কথা বলে এত কম যে একেকসময় বিরক্তি জন্মায়, আর মনে হয় সে হয় অতিরিক্ত লাজুক, নয়তো অতি গভীর জলের মাছ। টেরেন্সের বিষয়ে মিসেস্ বেল্‌মোরের আগ্রহের কারণ, তিনি বুঝে উঠতে পারেন না এর কোন্‌টা ঠিক। ওকে একটু বেশি সময় নিয়ে যাচাই করতে চেয়েছিলেন তিনি, যদি-না অবশ্য ভুলেই গিয়ে থাকেন ব্যাপারটা। যদি সে শুধুই লাজুক হয়, তাহলে ওকে ছেড়ে দেবেন, কারণ লাজুকতার ব্যাপারে হাঁফিয়ে উঠতে হয়। আর যদি সে গভীর ধরনের ছেলে হয় তা'হলেও পরিত্যাজ্য, কারণ গভীরতা বড় বিপজ্জনক।

তাঁর আতিথ্যগ্রহণের তৃতীয় দিন বিকেলে টেরেন্স খুঁজে বের করল মিসেস্ বেল্‌মোরকে, দেখল তিনি এক কোণে বসে সত্যিসত্যিই পরিবারের অ্যালবাম-ছবিগুলো দেখছেন।

ও বলল, 'আপনি বড় ভাল কাজ করেছেন এখানে এসে, আমাদের সম্মান বাঁচিয়েছেন। আপনি বোধহয় শুনেছেন মিসেস্ ফিশার-সুইম্প্‌কিন্‌স চলে যাবার আগে আমাদের জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। পুরো পাটাতন খসিয়ে দিয়েছিলেন

একটা চুনসুরকির গামলা দিয়ে। আমার মা তো দুঃখেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আপনি যখন এখানে রয়েছেন মিসেস্ বেল্‌মোর, আমাদের জন্য একটা ভূত দেখতে পারেন না? একটা বেশ ফুলবাবু জাঁকালো ভূত, মাথায় থাকবে শিরোভূষণ, বগলের নিচে চেক-বই?'

মিসেস্ বেল্‌মোর বললেন, 'টেরেন্স, ও বুড়ি মহিলা পাজি বলেই এসব গল্পকথা শুনিয়েছিলেন। হয়তো তোমারা তাঁকে একটু বেশি খাইয়েছিলে। তোমর মা নিশ্চয় এসব তেমন গুরুতর কিছু বলে মনে করেন না, করেন কি?'

'তা মনে হয় করেন', জবাব দিল টেরেন্স, 'দেখলে মনে হবে গামলার একেকটা ইট তারই মাথায় পড়েছে। মা বড় ভাল মানুষ, তাকে এমন দুশ্চিন্তার মধ্যে দেখতে চাই না। বরং আশা করা যাক ভূতটা জোগাড়ে-কুলিদের ইউনিয়নের লোক, এর পরে ধর্মঘট করতে যাবে। যদি না করে তা'হলে কিন্তু পরিবারের মাথায় বাজ পড়বে।'

মিসেস্ বেলমোর চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার শোবার জায়গা ওই ভূত-কামরাতেই। তবে কামরাটা এত চমৎকার যে আমি ওটা বদলাতে চাই না, ভয় পেলেও নয়, ভয় পেলামই-বা কোথায়? একজন মনপসন্দ অভিজাত প্রেতের পাল্‌টা গল্প তো আমার দ্বারা শোনানো চলবে না, তাই না? আনন্দের সঙ্গেই সেটা করতে পারতাম, তবে আমার মনে হয় সেটা অন্য কাহিনীটার এমন সুস্পষ্ট একটা উল্টো দাওয়াই হবে, যা কোন কাজেই আসবে না।'

খরখরে বাদামি চুলের মধ্যে চিন্তিতভাবে দুটো আঙুল চালিয়ে টেরেন্স বললে, 'তা সত্যি, ওতে কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, ওই একই ভূত আবার দেখলে কেমন হয়— শুধু আলখাল্লাটি ছাড়া, আর তার কড়ার মধ্যে সোনার ইট থাকলে? তাতে ভূতটাকে নিচু-মানের খাটিয়ে থেকে অর্থবানের স্তরে ওঠানো যাবে। ও দ্বারা কি যথেষ্ট ভদ্রস্থ করা যাবে না ব্যাপারটা'?

'আচ্ছা, তোমাদের একজন পূর্বপুরুষ তো ছিলেন যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তাই না? তোমর মা সেই রকমই কিছু বলছিলেন যেন।'

'তা তো হতেই পারে; একজন বুড়ো ছিলেন 'র‍্যাগল্যান'-জামা আর গল্‌ফ্ ট্রাউজার-পরা। একজন ইউরোপিয়ানের বদলে অন্য ইউরোপিয়ান— আমার নিজেরই পছন্দ নয়। তবে মার আবার মনে ধরেছে জাঁকজমক, বংশমর্যাদা, আতশবাজি, এই সব। আর আমি চাই তাকে খুশি রাখতে।'

শরীরের এক পাশে সিল্‌কের পোশাক টেনে নিয়ে মিসেস্ বেল্‌মোর বললেন, 'তুমি ভাল ছেলে টেরেন্স, মাকে অখুশি দেখতে চাও না। এখানে আমার পাশে বোসো, এসো দু'জনে মিলে অ্যালবামটা দেখি, ঠিক যেমন কুড়ি বছর আগে লোকে করত। এবার আমায় এঁদের প্রত্যেকের কথা বল। এই যে, লম্বা, সৌম্য-দর্শন ভদ্রলোকটি দিগন্তে হেলান দিয়ে এক বাহু কোরিন্থীয় স্তম্ভের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে

আছেন, ইনি কে?'

ঘাড়টা বকের মতো উঁচিয়ে টেরেন্স শুধোয়, 'ধ্যাবড়া পা-ওয়ালা ওই বুড়ো লোকটা? উনি হলেন ঠাকুর্দার কাকা ও'ব্র্যানিগান। ওঁর আবার বাগানবাড়ির তলায় মদের ভাঁড়ার ছিল।'

'আমি তোমায় বসতে বলেছি টেরেন্স। তুমি যদি আমায় খুশি করতে না-চাও বা মানতে না-চাও, তাহলে কাল সকালেই জানিয়ে দেব একটা ভূত দেখেছি যার পরনে এপ্রন, আর সে বীয়ারের ডবল-গেলাস বইছে।... হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। তোমার বয়েসে এত লজ্জা টেরেন্স— সেটা স্বীকার করতেই তো তোমার শরম হওয়া উচিত।'

* * *

আতিথ্যের শেষ সকালটিতে প্রাতরাশের সময় মিসেস্ বেল্‌মোর উপস্থিত প্রত্যেকটি লোককে চমকে দিলেন ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন এই স্বপ্ন ঘোষণা করে যে তিনি ভূতটিকে স্বচক্ষে দেখেছেন।

'তার পরনে কি এ...এক...একটা?' মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কথাটাই শেষ করতে পারলেন না।

'না, না—সে রকম ব্যাপারই নয়।'

এবার টেবিলের অন্য অভ্যাগতদের তরফ থেকে যুগপৎ প্রশ্ন উঠতে থাকে—'আপনি ভয় পাননি?' 'কী করল ভূতটা?' 'দেখতে কেমন সেটা?' 'কেমন পোশাক পরেছিল?' 'কিছু বলেছিল কি?' 'আপনি চেচিঁয়ে ওঠেননি?'

'যদিও আমার সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে, তবু সব প্রশ্নের জবাব আমি একসঙ্গে দেবার চেষ্টা করব।'— বীরত্বের ভঙ্গিতে বললেন মিসেস বেল্‌মোর, 'কোনো আওয়াজ, কি কারো হাতের ছোঁয়া, ঠিক বুঝিনি, তবে কিছু একটা আমায় জাগিয়ে দিয়েছিল— দেখলাম প্রেতমূর্তিটা, সামনেই দাঁড়িয়ে। আমি রাতে কখনো বাতি জ্বালাই না, তাই কামরাটা ছিল বেশ অন্ধকার, কিন্তু তবু তাকে আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম। না, স্বপ্ন দেখছিলাম না। একটা বেশ লম্বা মানুষ, মাথা থেকে পা অবধি আগাগোড়া সাদা কুয়াশার মতো। পুরনো উপনিবেশ যুগের সমস্ত পোশাকই পরনে—পাউডার-চর্চিত চুল, লম্বা ঝুলের কোট, লেসের আস্তিন আর একখানা তরোয়াল। অন্ধকারে ধরা-ছোঁয়ার মতো দেখায় না, তবে জ্বলজ্বল করছে, আর নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। হ্যাঁ, প্রথমে আমি একটু ভয় পেয়ে পেয়েছিলাম বটে—অথবা বলা যায় চমকে উঠেছিলাম। জীবনে এই প্রথম আমার ভূত দেখা। না, আমি কোনো কথা বলিনি। চিৎকারও করিনি। কনুইয়ে ভর করে একটু উঠেছি, দেখলাম সেটা নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে, তারপর দরজার কাছে পৌঁছে মিলিয়ে গেল শূন্যে।'

মিসেস্ কিন্‌সল্‌ভিং তো এবার সপ্তম স্বর্গে! তিনি সগর্ব কম্পিত স্বস্তির কণ্ঠে

বললেন, 'বর্ণনাটা তো হুবহু মিলে যাচ্ছে, জেনারেল গ্রীণের ফৌজে আমাদের একজন পূর্বপুরুষ ক্যাপ্টেন কিন্‌সলভিংয়ের সঙ্গে। আমার সত্যি মনে হয় মিসেস্ বেল্‌মোর, আমাদের প্রেত-আত্মীয়ের তরফ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই—আপনার ঘুমের মধ্যে হয়তো তিনি ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকবেন!'

টেরেন্স ওর মায়ের দিকে তৃপ্ত অভিনন্দনের হাসি পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে মিসেস্ কিন্‌সলভিং তাঁর প্রাপ্যটুকু পেয়েছেন, ওঁকে সুখী দেখে এবার তারও আনন্দ।

মিসেস্ বেল্‌মোর এবার প্রাতরাশটা উপভোগ করেছেন, বললেন 'আমি যে খুব বিচলিত হইনি তা স্বীকার করতে হয়তো আমার দ্বিধাই হওয়া উচিত ছিল। প্রথামাফিক আমার তো চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যাবারই কথা, আর আপনারাও বিচিত্র পোশাকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিতেন। কিন্তু প্রথম ভয়টা কেটে যাবার পর আমি কিছুতেই নিজেকে আতঙ্কের স্তরে টেনে আনতে পারিনি। ভূত নীরবে আর শান্তিতেই মঞ্চ থেকে প্রস্থান করল তার ছোটখাট ভূমিকা শেষ করে, আর আমিও আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।'

যাঁরা বসে শুনছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই মিসেস্ বেল্‌মোরের গল্পটা একটা সাজানো ব্যাপার বলে বিনীতভাবে মেনে নিলেন—মিসেস্ ফিশার-সুইম্পকিন্‌সের দেখা নির্দয় ছায়ামূর্তির জবাবে ওটা বদান্যতা দেখিয়ে আমদানি করা হয়েছে। কিন্তু উপস্থিত দু-একজন লক্ষ্য করলেন, তাঁর বিবরণের মধ্যে যেন তাঁর নিজের ধারণারই কিছু অকৃত্রিম ছাপ রয়ে গেছে। প্রত্যেকটা শব্দেই যেন সত্যতা আর সরলতার ইঙ্গিত। প্রেতের নামেই যাদের অভক্তি, তাদেরও কেউ যদি খুব ভাল করে লক্ষ্য করত—তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হত যে উনি অন্তত অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশদ একটা স্বপ্ন দেখেছেন, যেন অদ্ভুত আগন্তুকের উপস্থিতি ব্যক্তিগতভাবেই অনুভব করেছেন বাস্তবে।

একটু বাদেই মিসেস্ বেল্‌মোরের পরিচারকা মালপত্র বাঁধাবাঁধি শুরু করল। দু'ঘন্টার মধ্যে গাড়ি এসে যাবে, তাঁদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। পুব দিকের বারান্দায় পায়চারি করছিল টেরেন্স। মিসেস্ বেল্‌মোর তার কাছে এগিয়ে এলেন চোখে একটা গোপনীয় আস্থার দ্যুতি নিয়ে।

বললেন, 'অন্যদের তো সব কথাটা বলা যায় না, কিন্তু তোমাকে বলব আমি। একদিক থেকে কিন্তু তোমাকেই দায়ী করতে হয়। আন্দাজ করতে পার ভূতটা গত রাতে কী ভাবে আমার ঘুম ভাঙাল?

একটু ভেবে নিয়ে টেরেন্স বলল, 'শেকলের আওয়াজ, কিংবা গুঙিয়ে উঠে? ও দুটোই তো সাধারণত করে থাকে।'

হঠাৎ যেন অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই ফের বললেন মিসেস্ বেল্‌মোর, 'আমি তোমার অশান্ত পূর্বপুরুষ ক্যাপ্টেন কিন্‌সলভিঙের কোনো আত্মীয়ার মতো দেখতে—এরকম

কোন ধারণা তোমার আছে কি?'

একেবারেই ধাঁধায় পড়ে এবার টেরেন্স বলে, 'তা তো মনে হয় না.... তাঁদের কেউ যে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি।'

'তাহলে কেন',— যুবকের চোখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন মিসেস্ বেল্‌মোর—'কেন ভূতটা আমার চুমু খেতে যাবে? সত্যিই ওটা আমায় চুমু খেয়েছে তা তো জানি।'

'সে কী!' বিস্মিত হয়ে চোখ বড় করে টেরেন্স, 'আপনি সত্যি বলছেন, মিসেস্ বেল্‌মোর! সে কি বাস্তবিকই আপনাকে চুমু দিয়েছিল?'

'আমি বলেছি "ওটা"— ওকে সংশোধন করলেন মিসেস্ বেলমোর, 'অ-ব্যক্তি-বাচক সর্বনামটা আশা করি সঠিক ব্যবহার করেছি।'

কিন্তু আমিই দায়ী সে-কথা বললেন কেন?'

'কারণ প্রেতের একমাত্র জীবিত পুরুষ-আত্মীয় তো তুমি।'

'ও তাই! বুঝেছি : "তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্ম অবধি—"। কিন্তু পরিহাস ছেড়েই বলছি, সে কি... ওটা কি? কেমন করে জানলেন আপনি?

'জানলাম ' কেমন করে লোকে জানে? আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, আর ওটাই তো আমায় জাগিয়ে তুলল, আমি প্রায় পুরো নিশ্চিত।'

'প্রায় পুরো!'

'তা ছাড়া কি, আমি জেগে উঠলাম, যেই —ওঃহো! কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ না তুমি? যখন কোন-কিছু হঠাৎ তোমার ঘুম ভাঙায়, তখন তুমি নিশ্চিত হতে পার না তুমি স্বপ্ন দেখলে , না...., অথচ তুমি জানতে পেরেছ— আঃহা! টেরেন্স, আমায় কি সবচেয়ে মৌলিক অনুভূতিগুলোও চুলচেরা করে বোঝাতে হবে— যাতে তোমার অতিরিক্ত বাস্তবজ্ঞানের শখ মেটে?'

বিনীতভাবে টেরেন্স বলে, 'কিন্তু চুমো-খাওয়া ভূতের ব্যাপারটা, বুঝলেন তো.... একেবারে প্রাথমিক শিক্ষাটা পেতে চাই। আমি কখনো ভূতকে চুমু খাইনি। সেটা কি....সেটা কি—?'

ইচ্ছাকৃত জোর দিয়ে অথচ সামান্য হাসিমুখে মিসেস বেল্‌মোর বললেন, 'তুমি যখন শিখতেই চাইছ, অনুভূতিটা হল ঠিক বাস্তব আর ভৌতিকের মেশামিশি।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে টেরেন্স বলে, 'অবশ্য এটা একটা স্বপ্ন অথবা কোনো ধরনের বিভ্রমই ছিল। আজকালকার দিনে কেউ প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে না। আপনি যদি সহৃদয়তা থেকেই এ-গল্প বলে থাকেন, মিসেস বেল্‌মোর, আমারও কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই আপনাকে জানাবার মতো। এতে আমার মা দারুণ খুশি হয়েছেন। ওই বিপ্লবী পূর্বপুরুষের ভাবনাটা কিন্তু বেড়ে হয়েছিল!'

মিসেস বেলমোর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, হাল ছেড়ে দেবার সুরে বলেন, 'ভূত-দ্রষ্টাদের ভাগ্যে যা থাকে আমারও তাই ঘটল। একটা প্রেতের সঙ্গে আমার এমন একট

দুলর্ভ মোলাকাতের দায় আরোপ হল কিনা চিংড়ির মালাই কিম্বা নির্জলা মিথ্যের ওপর! যাক্, এ সর্বনাশের মধ্যে একটা স্মৃতি অন্তত আমার বেঁচে রইল—অদৃশ্য জগৎ থেকে একটি চুমু। তুমি জানো টেরেন্স, ক্যাপ্টেন কিন্‌সল্‌ভিং একজন মহা সাহসী মানুষ ছিলেন কিনা?'

টেরেন্স চিন্তা করে বলে, 'আমার ধারণা তিনি মার খেয়েছিলেন ইয়র্কটাউনের যুদ্ধে। প্রথম যুদ্ধের পরই নাকি নিজের কোম্পানি সমেত কেটে পড়েন।'

অন্যমনস্ক মিসেস বেল্‌মোর বলেন, 'আমিও ভেবেছিলাম তিনি ভীতু মানুষই হবেন। এও হতে পারে তাঁর আরো কোনো—'

'আরো কোন যুদ্ধ?' —বোকার মতো প্রশ্ন করে টেরেন্স।

'সে ছাড়া আর কী বলতে পারি? এবার আমাকে যেতে হয়, তৈরি হয়ে নিই। ঘন্টাখানেকের মধ্যে গাড়িও এসে যাবে। কিল্লটপে খুবই আনন্দ পেলাম। এমন সুন্দর সকালটা, তাই না টেরেন্স?'

স্টেশনে যাবার পথে মিসেস্ বেল্‌মোর তাঁর ব্যাগ থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করেন। একটা ছোট্ট অদ্ভুত হাসির সঙ্গে তাকিয়ে থাকেন সেটার দিকে। তারপর উনি সেটাকে অনেকগুলো শক্ত গিঁটে বাঁধেন। একটা সুবিধাজনক মুহূর্তে খাড়া পাহাড়ি খাতের ধার দিয়ে চলবার সময় ছুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে।

টেরেন্স তার ঘরে বসে খাস-বান্দা ব্রুক্‌স্‌কে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল—'এগুলো নিয়ে একটা পার্সেল বানাও তো! তারপর এই কার্ডের ঠিকানায় ডাক মারফত পাঠিয়ে দাও সেটা।'

কার্ডটা হল নিউ ইয়র্কের এক ভাড়ার পোশক-ব্যাপারীর। জিনিসগুলো ১৭৭৬ সালের কোনো ভদ্রলোকের পোশাক-আশাক—সাদা সার্টিন, রুপোর বগলেশ, সাদা সিল্ক-মোজা আর সাদা নরম চামড়ার জুতো। বাকি সজ্জাটুকু একটা পাউডার চর্চিত পরচুলো আর তরোয়াল।

একটু উদ্বিগ্নভাবে টেরেন্স বলে, 'এদিক ঁউদিক নজর রেখো তো ব্রুকস্, কোথাও একটা সিল্কের রুমাল পাও কিনা, কোণায় আমার নামের আদ্যক্ষর লেখা। আমিই নিশ্চয় কোথাও ফেলেছি।'

এরও একমাস পর, মিসেস্ বেল্‌মোর আর কেতাদুরস্ত সমাজের অন্য দু'একজন মিলে নামের তালিকা বানাচ্ছিলেন—ক্যাট্‌স্কিলের ভেতর দিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরুবেন ওঁরা। মিসেস বেল্‌মোর চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য একবার চোখ বুলোচ্ছিলেন তালিকার ওপর। টেরেন্স কিন্‌সল্‌ভিংয়ের নামটা সেখানে আছে। মিসেস্ বেল্‌মোর হালকা করে তার নামের ওপর বাতিলের দাগ কেটে দিলেন পেন্সিল দিয়ে।

বিড়বিড় করে মিষ্টি সুরে ব্যাখ্যা জানালেন, 'বড় বেশি লাজুক!'

A Ghost of A Chance. স্মার্টসেট, ১৯০৩

চিত্রকলা ও বুনো ঘোড়া

নির্জন জংলা মরু প্রান্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক চিত্রশিল্পী। প্রতিভার অভিষেকই একমাত্র গণতান্ত্রিক অভিষেক—প্রতিভাই লনি ব্রিস্কোর কপালে চড়িয়ে দিয়েছিল ওক-পাতার পল্লব-মকুট। কাউবয় হোক, কি পল্লবগ্রাহী সম্রাট হোক, দুজনেরই নখাগ্র থেকে শিল্পকলার স্বর্গীয় প্রকাশ ঘটে পক্ষপাতহীনভাবে; আর সেই শিল্পকলাই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিল সান সাবার বালক-শিল্পীটিকে। ফলস্বরূপ, 'ক্যাপিটল' (রাজ্যের প্রধান পরিষদ ভবন)-এর উপশালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনার গিল্টি-ফ্রেমে বাঁধানো একটা ৭' × ১২' ফুট মালিন্যলিপ্ত ক্যানভাস।

তখন আইনসভার বৈঠক চলছিল; বিশাল পশ্চিমী রাজ্যের রাজধানী শহরে কর্মব্যস্ততা আর উপার্জনের রমরমা,—জ্ঞানবৃদ্ধ বিধায়করা এক জায়গায় হলে যা হয়। ক্রীড়াপ্রিয় আইন-রচয়িতাদের অনায়াসলব্ধ ডলারগুলো কব্জা করছিল খোরাকি হোটেলগুলো। পশ্চিমের বৃহত্তম রাজ্য, আকারে ও সঙ্গতিতে যা সাম্রাজ্য-সমান, এতদিনে জেগে উঠেছে, অস্বীকার করতে চাইছে বর্বরতা-আইন ভাঙা-রক্তপাতের সাবেক বদনামগুলো। এখন তার সীমার মধ্যে শৃঙ্খলা। জান মাল সেখানে ততটাই নিরাপদ, স্যর, যতটা জীর্ণ পূর্বাঞ্চলের কলুষিত শহরগুলোর মধ্যে যে-কোনো জায়গায় আশা করা যায়। কৃত্রিম লড়াই, ধর্মকর্ম, বনভোজন আর 'হেবিয়াস্ কর্পাসের' ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। সাজার ভয় না করেই কোনো আনাড়ি পশ্চিমী গরম গরম বক্তৃতা উগরে দিতে অথবা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার নতুন তত্ত্ব জাহির করতে পারে। চারুকলা ও বিজ্ঞান এখন পোষণ আর অর্থ-বরাদ্দ পাচ্ছে। আর তাই বোধ হয় এই বিশাল রাজ্যের আইনসভার পক্ষে লনি ব্রিস্কোর অমর চিত্রকর্ম কেনার বরাদ্দটা শোভনীয়ই হয়েছিল।

চারুকলার বিকাশে সান সাবা অঞ্চলটার কোনো কালেই কোন অবদান নেই। তার সন্তানেরা বরাবরই তুখোড় ফৌজী-বাহাদুরিতে, ফাঁস-দড়ি ছোঁড়ার কায়দায়, ৪৫—বোর পিস্তলের নিপুণ ব্যবহারে; অসীম সাহসে 'এক-তাস'টানা আর শহরগুলোর অযথা নিদ্রা-ভাঙানোর নৈশ উত্তেজনা, এতদিন পর্যন্ত এই ছিল দস্তুর। তবে সৌন্দর্যতত্ত্বের দুর্গ হিসেবে তার কোন খ্যাতিই নেই। লনি ব্রিস্কোর তুলি এসে সে অপবাদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। এখানকার এই চুনোপাথরের শিলাগুলোর মধ্যে, রসালো ক্যাক্টাস আর ঊষর উপত্যকার খরা-শুকনো ঘাসের মধ্যেই জন্ম হল বালক-চিত্রশিল্পীর। সৃষ্টির চাতুরিময় আত্মা নিশ্চয় তাকে প্রেরণা দিয়েছিল কিছু প্রকাশের প্রয়াসে, তারপর উৎফুল্ল হয়ে স্বয়ং বসে গিয়েছিল উপত্যকার খরোত্তপ্ত বালির ওপরেই, লক্ষ্য করে গিয়েছিল নিজের দুষ্টুমির ফল। কারণ লনির ছবি,

শিল্পকলার বস্তু হিসেবে দেখলে এমন কিছু, যা সমালোচকদের বুক থেকে সব একঘেয়ে দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে।

ছবিটাকে বিপুল বিস্তারের দিক থেকে প্রায় 'প্যানোরামা' বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওতে এঁকে দেখানো হয়েছে একটা আদর্শ পশ্চিমী দৃশ্য। সমস্ত আকর্ষণ চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে একটা কেন্দ্রীয় জন্তুর রূপে—একটা জীবন্ত আকারের বন্যচোখ উদ্দাম আগুয়ান ঘোড়া দল ভেঙে পাগলের মতো ছুটে আসছে, আর কাউবয়-বাহিত ঘনবদ্ধ দলটা পড়ে গেছে ছবির ডানদিকের পশ্চাৎপটে। নিসর্গদৃশ্যে রয়েছে উপযোগী, বিশ্বস্তরূপে চিত্রিত অন্য বস্তুগুলো—যথানুপাতে ছড়ানো আছে ওক-বন, মেস্কিট ঘাস আর নাসপাতি গাছ। একটা স্পেনীয় খঞ্জরগাছ জলের-বালতির মতো মস্ত মোমসদৃশ ফুলের স্তবক নিয়ে ছবির পুষ্পল সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দিয়েছে। দূরান্তদৃশ্য হল উঁচুনিচু প্রেইরিভূমির,—সেটা এখানে-ওখানে কেটে গেছে এ-অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় স্রোতস্বতীর অংশদৃশ্য দিয়ে, গাঢ় সবুজ ওক আর এল্‌ম্ গাছ তার ধারে-ধারে। ছবির পুরোভাগে কাঁটা-নাসপাতির হাল্কা-সবুজ আগাছার তলায় গোল পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা জাঁকাল চিত্রবিচিত্র র‍্যাটল সাপ। চিত্রপটের তিনভাগের একভাগই গাঢ় নীল আর ধবধবে সাদা—একেবারে প্রতীকী 'পশ্চিমী' আকাশ, বৃষ্টিহীন, পালকের মতো উড়ন্ত মেঘ।

বিধায়ক-প্রতিনিধিদের কক্ষের দরজার কাছে প্রশস্ত হলঘরের পথে দুটো প্লাস্টার-করা স্তম্ভ—তাদেরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছবিটি। নাগরিক আর আইনরচয়িতারা কখনো একজোড়া, কখনো দল বেঁধে, কখনো বা ভিড় করে সেখানে যান ছবিটিকে চেয়ে দেখতে। ওদের অনেকেই, হয়তো বেশির ভাগই, এক সময় প্রেইরির জীবন যাপন করেছেন, সহজেই পরিচিত দৃশ্যটাকে স্মরণ করতে পারেন। বুড়ো পশুখামার-মালিকরা স্মৃতিমগ্ন হয়ে অকপট আনন্দে দাঁড়িয়ে গল্প করেন পুরনো সাথীদের সঙ্গে, ওঁদের মনে সেই সব দিনের শিবির আর পথানুসরণের কথা নতুন করে ফিরে আসে। শিল্প-সমালোচক খুব কমই আছেন শহরে, তাই বর্ণ, পরিপ্রেক্ষিত, অনুভূতি নিয়ে ওসব পণ্ডিতী কথা শোনা যায় না যা এখানে—যা পূর্বাঞ্চলের ওঁরা 'লাগাম আর যষ্টি' হিসেবে প্রয়োগ করতে ভালবাসেন শিল্পীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। বেশির ভাগই মেনে নেন এটাকে মহৎ চিত্র বলে; গিল্টি করা ফ্রেমের তারিফ জানান—এত বড় ফ্রেম তো তাঁরা আগে চোখেই দেখেননি।

ছবিটির উদ্যোক্তা ও প্রধান সমর্থক হলেন সেনেট-সদস্য কিনি। তিনি হরদমই এগিয়ে এসে ঘোষণা করছেন বুনোঘোড়া-দাবড়ানো গলায়: এই বিরাট রাজ্যের নামে, স্যর, একটা চির কলঙ্ক থেকে যাবে, যদি তা যথাযোগ্য ভাবে এক প্রতিভাকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করে—এ সেই প্রতিভা যা অবিনশ্বর চিত্রপটে এমন উজ্জ্বলভাবে ধরে রেখেছে একটা আদর্শ দৃশ্য—আমাদের রাজ্যের সম্পদ ও সাফল্যের,

ভূমি আর ইয়ো—পশুসম্পদের একটা প্রতীক—দৃশ্য।

সেনেটর কিনি বাড়েনে এ১০ একটা [illegible] [illegible] যা একেবারেই পশ্চাৎপদ [illegible] [illegible] এলাকার থেকেও [illegible] [illegible] পরে; কিন্তু প্রকৃত শিল্পপ্রেমের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে পড়েন না। আর সেনেটর মুলেনস্, [illegible] সান এলাকার প্রতিনিধিত্ব করলেও বড় একটা আশাবাদী নন্ যে রাজ্য তাঁর নির্বাচনী এলাকা থেকে কোনো ছবি কিনবে। তাঁকে বোঝানো হয়েছে সান সারা অঞ্চল নাকি সমস্বরে তারিফ করছে তাদের এক বাসিন্দার আঁকা মহৎ চিত্র—শিল্পটার। ঘোড়ার পিঠে চেপে শত—শত রসগ্রাহী বহু মাইল ছুটে এসেছিল রাজধানীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার আগে ছবিটাকে একবার দেখতে। সেনেটর মুলেনস্ পুনরায় নির্বাচিত হতে চাইছেন, তাই সান সারার ভোটের গুরুত্ব তিনি বোঝেন। এও জানেন সেনেটর কিনি আইনসভার একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি, তার সাহায্যে ব্যাপারটাকে [illegible] [illegible] [illegible]। এদিকে, সেনেটর কিনির হাতে আছে একটা সেচব্যবস্থার প্রস্তাব, যেটা তিনি বিল হিসেবে পাশ করাতে চান নিজের এলাকার কল্যাণে। তিনি জানেন সেনেটর মুলেনস্ তাকে এ ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য ও সহায়তা দিতে পারেন, কারণ সান সারা এর মধ্যেই এ ধরনের আইনি—ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে। দু'জনের মাথা চমৎকার খাপ খেয়ে যাওয়ায়, রাজ্য রাজধানীতে 'আর্ট' নিয়ে আকস্মিক উৎসাহ স্বাভাবিকভাবেই ওদের আর তেমন অবাক করছে না। লনি ব্রিস্কোর মতো খুব কম শিল্পীই বিশ্বের সামনে তাদের প্রথম ছবি এর চেয়ে সুখকর আনুকূল্যের মধ্যে উদ্ঘাটন করতে পেরেছে।

সেনেটর কিনি আর মুলেনস্ এম্পায়ার হোটেলের কাফেতে দীর্ঘক্ষণ সুরাপানের পরই সেচব্যবস্থা আর চিত্রকলার বিষয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছলেন।

কিনি বললেন, 'হুঁম, ঠিক জানি না। আমি তো আর্ট—সমালোচক নই, তবে আমার মনে হয় এতে কোন কাজ হবে না। আমার চোখে তো এটা একটা বাজে ধরনের পটের ছবি। আমি আপনার এলাকার শিল্প প্রতিভার কোন নিন্দা করতে চাই না, সেনেটর, কিন্তু আমি নিজে হলেও ওটার জন্য ছ'অঙ্কের টাকা দিতে পারতাম না—ফ্রেমটা বাদ দিলে। দাগমেস্থা বরাব-টুকরোর বাবদ ছশো—একাশি ডলার খরচার সামান্য বিল দেখে যাঁরা আর্তনাদ করেন সেই আইনসভার গলা দিয়ে ওরকম জিনিস ঢোকাবেন কী করে? স্রেফ সময়ের অপচয় হবে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, মুলেনস্, কিন্তু আমরা চেষ্টা করলেও ওরা আমাদের উপহাস করেই সেনেট কক্ষ থেকে বার করে দেবে।'

সেনেটর মুলেনস্ লম্বা তর্জনী দিয়ে কিনির গ্লাসে টোকা মেরে সুচিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আপনি আসল বক্তব্যটা ধরতে পারেননি। ছবিটা যে কী বোঝাতে চায় সে সম্পর্কে আমারই সন্দেহ আছে,—ষাঁড়ের লড়াই, না জাপানী রূপকগল্প, কিন্তু আমি এবারের আইনসভা বৈঠকেই ওটা কিনে নেবার জন্য বরাদ্দ করাতে

চাই। অবশ্য ছবির বিষয়বস্তুটা হয়তো রাজ্যের ঐতিহাসিক নির্দেশের লাইনে হলেই ঠিক হত, কিন্তু ছবির রঙ ঘষে তুলে বদল করার পক্ষে বড় দেরি হয়ে গেছে। রাজ্যের টাকাটা জলে যাবে না, আর ছবিটাও একটা অকেজো মালের ঘরে সরিয়ে রাখলে কারুর বিবক্তি ঘটাবে না। এবার আসল যে বিষয়টার ওপর কাজ করতে হবে তা বলছি, আর্টের ব্যাপার যেখানে খুশি যাক্!— যে ছোকরা ছবিটা এঁকেছে সে হল লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতি।'

কী বললেন, ফের বলুন তো!— ঘাড় ঝুঁকিয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন কিনি—'সেকালের সেই আসল লুসিয়েন ব্রিস্কো?'

'হ্যাঁ, তাঁরই নাতি। বুঝলেন তো, "আলো দিয়ে গেল যারা"। সেই মানুষ যিনি জংলা–মরুভূমি থেকে গড়ে তোলেন এই রাজ্য। যে মানুষ ইণ্ডিয়ানদের যথাস্থানে বসালেন। যে মানুষ ঘোড়া–চোরদের উচ্ছেদ করলেন। যিনি মুকুট অবধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাজ্যের প্রিয় সন্তান। এবার বুঝলেন তো আসল কথাটা?'

'গুটিয়ে ফেলুন ছবিটা,' বললেন কিনি, 'ধরে নিন ওটা বিক্রিই হয়ে গেছে। আর্ট নিয়ে অতো প্রেম–পিরিত না দেখিয়ে সে–কথাটা আগে বলেননি কেন? লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতির আঁকা ছবি যদি এ–রাজ্যকে দিয়ে কেনাতে না পারি, তাহলে সেদিনই আমি সেনেটের পদে ইস্তফা দিয়ে গ্রামে চলে যাব জরিপদারের শেকল–টানা সহকারী হয়ে। 'কানা' স্মদার্সের মেয়ের জন্য একটা বাড়ি কিনতে বিশেষ খরচ বরাদ্দ করা হয়েছিল সে খবর আপনি রাখেন? আরে, সেই প্রস্তাবই হুট্ করে পাশ হয়ে গেল, অথচ ব্রিস্কো যতো ইণ্ডিয়ানকে টিট্ করেছিলেন তার অর্ধেকও করেনি বুড়ো 'কানা'। আপনি আর চিত্রশিল্পী মিলে কতটা আন্দাজ স্থির করেছেন ওটার দাম হাঁকতে?'

মুলেনস্ বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম হয়তো পাঁচশো—'

'পাঁচশো!'— কিনি বাগড়া দেন, গ্লাসে টোকা দিয়ে ওয়েটারকে খুঁজতে—তাঁর একটা পেন্সিল চাই। 'কী বলছেন! লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতির উপহার একটা খুরের–ওপর–খাড়া লাল ঘোড়ার বাবদ মাত্র পাঁচশো ডলার! আপনার স্বরাজ্য–গর্ব কোথায় গেল মশাই? ওটা হওয়া উচিত দু'হাজার, দু'হাজারই হবে। আপনি বিলটা পেশ করবেন, আর আমি দাঁড়াব সিনেটের সভাতলে, বুড়ো লুসিয়েন যতো ইণ্ডিয়ানকে সাবাড় করেছিলেন প্রত্যেকের মাথার চামড়া তুলে ধরব। তা ছাড়া, দাঁড়ান—আর কিছু বোকামি আর অভিযানের কাজও তিনি করেছিলেন, তাই না? ও হ্যাঁ, যে–সব প্রাপ্য ভাতা ও পুরস্কারে তাঁর পুরো হক ছিল তা সবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অগ্রণীর অধিকার, প্রবীণ যোদ্ধার অনুদান সার্টিফিকেট নিতে অস্বীকার করেছিলেন। গভর্নরও হতে পারতেন, কিন্তু হননি। অবসর ভাতাও চাননি। এবার রাজ্য একটা সুযোগ পেয়েছে প্রতিদান দেবার। ছবিটা তো রাজ্যকে নিতে হবেই, তা ছাড়া একটা শাস্তিও আমাদের প্রাপ্য ব্রিস্কোর পরিবারকে এত কাল প্রতীক্ষায় রেখেছি

বলে। মাসের মাঝামাঝি আমরা বিষয়টি তুলব, করদাতা বিলের ফয়সালা হবার পর। এবার মাঝামাঝি আমরা বিষয়টি তুলব, করদাতা বিলের ফয়সালা হবার পর। এবার মুলেনস্, আপনি যত তাড়াতাড়ি পাবেন, ওই সেচ খালগুলোর জন্য খরচের হিসেব আর প্রতি–একরে বাড়তি ফলনের পরিসংখ্যান আমাকে পাঠিয়ে দিন। আমার বিলটা যখন আসবে তখন আপনার সাহায্য চাইব। মনে হয় এবারের অধিবেশনটায় আপনি–আমি ভালভাবেই রফা করে চলতে পারব, হয়তো পরের অধিবেশনগুলোতেও, তাই না সেনেটর ?'

এইভাবেই সান সাবার বালক চিত্রশিল্পীর ওপর বর্ষিত হয়েছিল সৌভাগ্যের স্মিতহাস্য। সৃষ্টির উৎপত্তি–উৎসেই নিয়তি তার অনুপরমাণুগুলো লুসিয়েন ব্রিস্‌কোর পৌত্র হিসেবে সাজিয়ে দিয়ে নিজের কর্তব্য করেছে।

আদি ব্রিস্‌কো ছিলেন অগ্রণীর ভূমিকায়, তা সে ভূমির দখলদারিতেই হোক, কি একটি মহৎ সবল হৃদয়ের প্রেরণায় কিছু কাজকর্মের মধ্যেই হোক। তিনি ছিলেন প্রথম আবাসনকারী, প্রকৃতির নিদারুণ বন্যশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম লড়াকুদের একজন, আদিম এবং আনাড়ি রাজনীতির মানুষ। তাঁর নাম ও স্মৃতিকে একইভাবে শ্রদ্ধা করা হত, যেমন সমতালিকাভুক্ত অন্য যে–কোন বিখ্যাত নামকে—হুস্টন, বুন, ক্রকেট, ক্লার্ক বা গ্রীন। সিদেসাধা জীবন যাপন করতেন, স্বাধীনভাবে, কোনো উচ্চাশায় বিড়ম্বিত না হয়ে—আর মারাও যান সেই ভাবেই। সেনেটর কিনির চেয়ে কম বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনায়াসে বলে দিতে পারতেন যে তাঁর গোটা রাজ্য ছুটে এসে সম্মান ও স্বীকৃতি জানাবে লুসিয়েনের নাতিকে, ওক–বনের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে এত দিন দেরি হলেও।

আর সেই সুবাদেই, প্রতিনিধি–কক্ষের দরজার পাশে বিশাল ছবিটার সামনে বেশ কিছুদিন ধরে মাঝেমাঝেই আবির্ভাব ঘটেছে সেনেটর কিনির উৎফুল্ল সবল দেহের, শোনা যাচ্ছে তাঁর তূর্যকণ্ঠে লুসিয়েন ব্রিস্‌কোর অতীত কার্যকলাপের আবৃত্তি, সেই প্রসঙ্গে তাঁর নাতির চিত্রকর্মের কথা। সেনেটর মুলেনসের তৎপরতা দৃশ্যে ও শব্দে খানিকটা সংযত হলেও মোটামোটি এই রকম পথেই চলেছে।

তারপর যখন সিনেট–কক্ষে চিত্র অধিগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপনের দিনটি কাছিয়ে এল, সান সাবা অঞ্চল থেকে লনি ব্রিস্‌কো আর তার ভক্ত কাউবয়দের দল ছুটে এল পোষা বুনো–ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে। তারা আসছে শিল্পের মূল্যকে মর্যাদা দিতে আর বন্ধুত্বের খাতিরে, কারণ লনি তো তাদেরই একজন.—রেকাব আর চামড়ার চ্যাপারেজো পাতলুন পরা সেনাপতি, দড়ির ফাঁস ছোঁড়ায় আর ·৪৫ পিস্তলে যেমন দড়ো, তেমনি কুশলী তুলি আর রঙ–দানি নিয়ে

মার্চ মাসের এক বিকেলে দলবল সরবে ঢুকে পড়েছে শহরের মধ্যে। কাউবয়রা যথাযথভাবে তাদের মুক্ত এলাকার ধরাচূড়োগুলো মানিয়ে বদলে নিয়েছে শহরের উপযুক্ত কেতামাফিক। চ্যাপারেজো সরিয়ে, দেহ থেকে তাদের ছ'ঘরা পিস্তল আর

বোলট্ খুলে ঢুকিয়ে রেখেছে জিনসাজের মধ্যে। ওদের মধ্যে ঘোড়া দাবড়ে আসছে লনি—তেইশ বছরের যুবক, গম্ভীর বাদামি মুখ, ছলাকলাহীন, ধনুক-পা, স্বল্পভাষী—বসে আছে মিসিসিপি-পশ্চিমের সবচেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে-পনি 'হট্ টামালিস্'-এর পিঠে। সেনেটর মুলেন্স্ তাকে পরিস্থিতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে আগেই জানিয়ে রেখেছেন, এমন-কি রাজ্য কত দাম দিতে পারে তারও আন্দাজ দিয়েছেন—ক্ষমতাবান্ কিনির ওপর তাঁর এতই ভরসা। লনির মনে হয়েছে খ্যাতি ও সৌভাগ্য এবার তো তার হাতেই এসে গেল। নিশ্চয়ই বেঁটেখাটো বাদামি অশ্বদেবতার বুকে জ্বলে উঠেছে স্বর্গাগ্নির ফুল্‌কি, কারণ সে এখন দু'হাজার ডলার গুণতে শুরু করেছে নিজের প্রতিভার ভবিষ্যৎ বিকাশের উপায় হিসেবেই। একদিন হয়তো সে একটা ছবি আঁকবে যা হবে এর চেয়েও বড়—ধরুন গিয়ে ১২' × ২০' ফুট— দৃশ্যের বিশালতা, পরিবেশের মেজাজ, আর কর্মচাঞ্চল্য, সবই থাকবে তাতে।

বিল পেশ করার নির্দিষ্ট দিনটি আসতে এখনো তিনদিন দেরি। অশ্বদেবতার দলবল এর মধ্যে দারুণ পরিশ্রম করছে। কোট খুলে, ভরপুর উৎসাহে, নানা অদ্ভুত অভিব্যক্তিতে উত্তেজিত হয়ে তারা ছবিটার সামনে পায়চারি করছে অক্লান্তভাবে। আনাড়ির মতো বিচার করে নয়, তারা ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছে যে ছবির প্রকৃতিনিষ্ঠ অঙ্কন নিয়ে তাদের মন্তব্যগুলো বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন বলেই গৃহীত হবে। সোচ্চার কণ্ঠে তারা শিল্পীর দক্ষতার প্রশংসা করছে—যাতে কাছে-পিঠে শোনার-মতো কোন কান থাকলে এ-সব মন্তব্য তাঁর পক্ষে লাভজনকই হয়। দলের নেতা লেম্ পেরির নতুন কোনো শব্দ চয়নের উদ্ভাবন ক্ষমতা নেই, তাই তার সম্বল বাঁধাধরা গৎগুলো।

দারুচিনির ডালের মতো বাদামি হাতখানা ছবির মর্মস্থলের দিকে নেড়ে দেখায়—'ওই আড়াই-বছরের ঘোড়াটার দিকে তাকান। ওটা যদি জ্যান্ত জানোয়ার না হয় তো আমার চামড়া খুলে নিন্। আমি তো ওটার আওয়াজ পাচ্ছি 'খটাখট্ খটাখট্'—দল ছেড়ে পালাচ্ছে, ভাবখানা যেন ভড়কে গেছে। বড় পাজি ঘোড়া ওটা। ওর চোখটা দেখুন না কেমন 'এই-রকম' পাকাচ্ছে, আর লেজ ঘোরাচ্ছে। একেবারে জ্যান্ত আর সত্যি যেমন দেখি। ও চায় একটা ঘুড়ী পনি এসে ওকে ধরুক আর হটিয়ে দিক দলের ভেতরে। আমার চামড়া খুলে নিন! ওই দোলানো লেজখানাই দেখুন একবার। অন্য কোনোভাবে কোন ঘোড়াকে লেজ দোলাতে দেখিনি কখনো, হলপ করতে পারি!'

ঘোড়ার চমৎকারিত্ব স্বীকার করেও জাড শেল্‌বি অটল হয়ে লেগে রইল নিসর্গ দৃশ্যের অকপট প্রশংসায়, মতলবটা যাতে গোটা ছবিটাই পায় পুরোপুরি তারিফ।

বললে, 'এলাকার ওই জায়গাটা হুবহু মরা-ঘোড়া খাদের মরু-ফাঁদের মতো। সেই ঘাস, সেই জমির ঢাল, সেই পুরনো হুইপারহুইল-খাড়ি লুকোচুরি খেলছে

ঘোটা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে। বাঁ দিকে ওই শকনগুলো চক্কোর কাটছে স্যাম কিলড্রেকের সাবেক ঘোড়াটার ওপর—যেটা গরমের দিনে অতিরিক্ত জল খেয়ে মরে গেল। ওই এলাম গাছের গুঁড়িগুলোর জন্য ঘোড়াটাকে দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা, কিন্তু সে ওখানে আছে। কেউ যদি মরা-ঘোড়ার খাদটা খুঁজতে বেরিয়ে থাকে আর এই ছবিটার সামনে এসে পড়ে, তাহলে নির্ঘাৎ সে ঘোড়া থেকে নেমে শিবির গড়ার জায়গা খুঁজবে এর মধ্যে।'

শুঁটকো বজার্স, তামাশায় সিদ্ধহস্ত, সে মাথা থেকে বের করেছে একটা ছোট নাটক, যা লোককে মুগ্ধ করবেই। ছবিটার খুব কাছাকাছি ঘেঁষে সে সুযোগ পেলেই আচমকা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠবে 'হি—হি—হি!' বলে। লাফিয়ে সরে আসবে জুতোর গোড়ালিতে জোর আওয়াজ তুলে, আর পাক খাবে পাথর-বসানো মেঝেতে।

'ওঃ বাবা ক্রিস্টোফার!'—ওর বুলিটা হবে এই: 'ওই র‍্যাট্লকে ভেবেছিলাম সত্যিকারের সাপ! টের না পেলে কেটে দিত বুঝি! মনে হল যেন ওটাকে ঝুম্‌ঝুমিয়ে আওয়াজ করতে শুনলুম। দেখুন না নাসপাতি ঝোপের নিচে হতভাগা শয়তান প্রাণীটা কেমন দিব্যি শুয়ে আছে। আর একটু হলেই কেউ সাপে কাটা পড়ত গো!'

একদিকে তো লনির বিশ্বস্ত সাঙ্গপাঙ্গদের এই সব কৌশল, সেই সঙ্গে উদাত্তকণ্ঠে ছবিটার নানা গুণ নিয়ে কিনির অবিরত কীর্তন, তার ওপর আদি আবাসিক ব্রিস্‌কোর ধন্বন্তরী মর্যাদা যেন ছবিটার ওপর দামি পালিশ বুলিয়ে দিয়েছে—এবার মনে হয় যেন সান সাবা অঞ্চল তার সুবিদিত ঘোড়া ধরা প্রতিযোগিতা আর বিপজ্জনক বন্যাবোধের কৃতিত্বের ওপরেও যোগ করে নেবে আর্ট-কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি। এইভাবে বোধহয় ছবিটার অনুকূলে এক হাওয়া জেগেছে,—শিল্পীর তুলির জোরে ততটা না হলেও নানা আড়ম্বরের জোরে,—কিন্তু এর ফলেই লোকের দৃষ্টি এখন প্রশংসায় উজ্জ্বল। ব্রিস্‌কো নামটির মধ্যেই এমন এক জাদু যার কাছে ছবির প্রয়োগরীতির খুঁত আর রঙের স্থূলতা চাপা পড়ে যায়। ইণ্ডিয়ান-বিনাশক নেকড়ে-ধ্বংসী বুড়ো হয়তো তাঁর সুখের লীলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কঠোর-হাসি হাসতেন যদি তিনি জানতেন যে তাঁর কলাপ্রেমী আত্মা দুই প্রজন্মের অনুপ্রেরণাহীন অস্তিত্বের পরও আর্টের একজন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এমন উচ্চাসন পাচ্ছে।

তারপর অবশেষে এল সেই দিনটি—ছবিটাকে কেনার অভিপ্রায়ে দু'হাজার ডলার বরাদ্দের অনুমতি চেয়ে সেনেটর মুলেন্‌সের প্রস্তাব হয়তো আজ পাশ হয়ে যাবে। লনি আর সান সাবার নন্দীভৃঙ্গীরা আগেই সেনেটের গ্যালারি আসনগুলো দখল করে বসে আছে। সামনের সারির চেয়ারে বসে পরিষদকক্ষের মহিমা দেখে তারা একটু দমে গেছে; উদ্দাম-কেশ, সঙ্কুচিত। কেবলই উশখুশ করছে।

প্রস্তাব পেশ হল, দ্বিতীয়বার পাঠের জন্য গেল। এবার সেনেটর মুলেন্‌স বিলের সপক্ষে বললেন শুকনো গলায়, একঘেয়ে সুরে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর

উঠলেন সেনেটর কিনি. আকাশ যেন সগর্জনে ঘোষণার জন্য প্রস্তুত। সে—আমলে বাগ্মিতা ছিল এক জীবন্ত বিষয়; পৃথিবী তখনো জ্যামিতি আর গুণের নামতা দিয়ে মাপতে শেখেনি তার সমস্যাগুলোকে। যুগ ছিল বাক্‌পটুতা, হাতনাড়ার ভঙ্গি, সম্বোধনের অলঙ্কারের যুগ—বক্তৃতার উপসংহার হত হৃদয়স্পর্শী।

বললেন সিনেট—সদস্য। সান সাবার দল শ্বাসরুদ্ধ, বসে আছে গ্যালারিতে, উশকোখুশকো চুল চোখের ওপর ঝোলে, ষোলো—আউন্স টুপি এক হাঁটু থেকে অন্য হাঁটুতে চড়ে অস্থির ভাবে। নিচে, নামজাদা সেনেটররা, হয় প্রশ্নাতীত কূটনীতিজ্ঞের আত্মস্থতায় গা এলিয়ে দিয়েছেন ডেস্‌কের ওপর. নয়তো প্রথম অধিবেশন হিসেবে সঠিক ধরনধারণ রক্ষা করছেন।

সেনেটর কিনি আধঘন্টা ধরে বললেন। ইতিহাসই তাঁর বিষয়বস্তু—যে ইতিহাসে রয়েছে দেশাত্মবোধ ও ভাবালুতার প্রসাদগুণ। মাঝেমধ্যে শুধু কথাপ্রসঙ্গে বাইরে—রাখা ছবিটার কথা বললেন—ওটার গুণাগুণের কথা বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নেই—সেনেটররা তো স্বচক্ষেই দেখেছেন ওটা। ও ছবির চিত্রী হলেন লুসিয়েন ব্রিস্‌কোর নাতি। এবার এল চাঞ্চল্যকর রঙে রাঙানো ব্রিস্‌কোর জীবনের কথাচিত্রগুলো। তাঁর রুক্ষ বিপজ্জনক দুঃসাহসের জীবন, সমবায়—রাজ্য গড়ে তুলতে তাঁর সহজমনের দেশপ্রেম, পুরস্কার ও প্রশংসার প্রতি চরম অভক্তি, চূড়ান্ত ও বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেবায় তাঁর বিপুল অবদানের কথা। বাগ্মিতার বিষয়—বস্তু লুসিয়েন ব্রিস্‌কো; আঁকা ছবিটা রইল পশ্চাৎভূমিতে—ওটা শুধু একটি মাধ্যমের ভূমিকায়, যার সাহায্যে সৌভাগ্যক্রমে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে একটা সুযোগ। এরই মারফত রাজ্য তার প্রিয় সন্তানের উত্তরপুরুষকে একটা বিলম্বিত পরিশোধমূল্য দিতে পারছে। বক্তব্যের মর্মার্থ যে ভালভাবেই গৃহীত হয়েছে তার পরিচয় মিলল সেনেটরদের তরফ থেকে মুহুর্মুহু উৎসাহিত হর্ষধ্বনিতে।

কোনো বিরোধী ভোট বিনাই প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল। আগামী কাল সেনেট হাউসের অধিবেশনে গৃহীত হবে বিল। নির্বিঘ্নে ওই দরবারে অনায়াস—চালিত হবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্ল্যাণ্ডফোর্ড, গ্রেসন, প্লামার—সবাই খাঁটি পরিশ্রমী, বাক্‌পটু; অগ্রণী ব্রিস্‌কোর কীর্তিকলাপ—সংক্রান্ত নানা স্মারকপত্র এখন তাঁদের হাতে। তাঁরা চূড়ান্ত চালনাশক্তি প্রয়োগ করতে রাজি। সান সাবার দলবল আর তাদের 'আশ্রয়পুষ্ট' শিল্পী হুড়মুড় করে আনাড়ির মতো সিঁড়ি ধরে নেমে ছুটল ক্যাপিটল (বিধানসৌধের) অঙ্গনের দিকে। তারপর তারা এক জায়গায় ঘনসংবদ্ধ হয়ে বিরাট এক বিজয়ের সিংহনাদ তুলল। কিন্তু ওদের একজন—'হাঁটু মট্‌কানো' সামার্স—একটা চিন্তিত মন্তব্য করে যেন অন্য সুর গাইল। বলল, 'ছবিটা একটা কঠিন কাজ করেছে ঠিকই। লনের বকনা—বাছুরটা ওরা কিনতেই যাচ্ছে বুঝতে পারছি। ওসব 'পার্লামেন্ট' ব্যাপার আমি ততটা বুঝি না, তবে ধারণা করি ইশারাগুলো মিলে ওইরকমই কিছু দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু লনি, মনে হয় ওদের যুক্তিগুলো ততটা ছবির

জন্য নয় যতটা তোমার ঠাকুরদার জন্য। খোকা, বুঝে নিলেই বোধহয় ঠিক হয় যে ব্রিস্কো ছাপটা তোমার ওপর আছে বলেই আসলে তোমার খুশির কারণ।'

মন্তব্যটা লনির মনে দাগ কাটে—ঠিক এই রকমই একটা অপছন্দকর অস্পষ্ট সন্দেহ ওর নিজের মনেও। এমনিতেই স্বল্পভাষী, মুখ আরো বেশি বুজে যায়। মাটি থেকে ঘাস তুলে নিয়ে বিষণ্নমনে সেটা চিবোয়। সেনেটরের বক্তৃতায় ছবি হিসেবে ছবিটার কোনো উপস্থিতিই ছিল না, যেটা অপমানজনক। চিত্রকরকে নিছক নাতি হিসেবেই দেখানো হল। কোন কোন দিক থেকে সেটা প্রীতিজনক হলেও আর্টকে তা ছোট করেছে, চিঁড়েচ্যাপ্টা করেছে। বালক শিল্পী এবার ভাবতে শুরু করল।

ক্যাপিটলের কাছেই লনির থাকবার হোটেল। প্রায় বেলা একটায়, দুপুরের খাওয়ার সময় বরাদ্দ—বিলটা পাশ হল সিনেটে। হোটেলের কর্মচারী লনিকে বলল নিউ ইয়র্ক থেকে একজন বিখ্যাত শিল্পী সেদিনই এসেছেন শহরে, এ-শহরে আছেন। তিনি নাকি পশ্চিমদিকে নিউ মেক্সিকোয় যাচ্ছেন, জুনিস্ এলাকার পুরোনো দেয়ালগুলোর ওপর সূর্যালোকের কী প্রভাব পড়ে তা অনুশীলন করবেন। আধুনিক—পাথর আলো প্রতিবিম্বিত করে, ওই সব পুরনো ইমারতি বস্তু আলোকে শোষণ করে নেয়। শিল্পী এই বাস্তবতাটুকু ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন তাঁর একটা নির্মীয়মান ছবিতে, আর তার জন্য ছুটে যাচ্ছেন তিন হাজার মাইল দূরে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর লনি এই শিল্পীকে খুঁজে বের করে, তাঁকে নিজের সব কথা বলে। ভদ্রলোক কেমন অসুস্থ মানুষ, বেঁচে রয়েছেন শুধু প্রতিভা আর জীবন সম্পর্কে উদাসীনভাব জোরে। লনির সঙ্গে উনি ক্যাপিটলে গেলেন, দাঁড়িয়ে রইলেন ছবিটার সামনে। শিল্পী দাড়ি ধরে টানছেন, অখুশিই দেখায় তাঁকে।

লনি বলল, 'আপনার মতামতটা জানতে চাই, যেমন মাথায় আসে বলে যান, দ্বিধা না করে।'

সেভাবেই তো বলতে হবে। ডিনারের আগে তিন-তিনটে আলাদা ওষুধ খেয়েছি—টেবিল-চামচ ধরে ধরে। মুখে এখনো তার স্বাদ। আমি সত্যি কথা বলতেই শিখেছি। তুমি জানতে চাও এটা ছবি হয়েছে, নাকি হয়নি?

'ঠিক কথা,' বললে লনি, 'এটা পশম, না তুলো? আমি কি আরো কিছু আঁকব, না এসব ছেড়ে দেদার ঘোড়া দাবড়াব?'

শিল্পী বললেন, 'খাবার সময় কানাঘুষো শুনলুম, এই ছবিটার জন্য রাজ্য নাকি তোমার দু'হাজার ডলার দিতে যাচ্ছে।'

'সিনেটে তো পাশ হয়েছে, কাল পুরো অধিবেশনে তোলা হবে প্রস্তাব।'

পাংশু ভদ্রলোক বললেন, 'এটা সৌভাগ্যের কথা। তোমার কি খরগোশের পা?'

'না, তবে মনে হয় আমার ঠাকুরদা তো ছিলেন, তিনি রঙের নক্শার মধ্যে

অনেকখানি মিলেমিশে গেছেন। ও ছবিটা বানাতে আমার এক বছর লেগেছিল। একেবারেই বিচ্ছিরি, না কি তা নয়? কেউ কেউ এখন বলছেন ঘোড়ার লেজটা নাকি খুব খারাপ আঁকা হয়নি। বলছেন বেশ মাপসই হয়েছে। আপনি বলুন।'

লনির শক্ত টানটান্ শরীর আর বাদামি চামড়ার দিকে তাকালেন শিল্পী। একটা সাময়িক বিরক্তি তাঁকে যেন খুঁচিয়ে তুলল।

খিট্‌খিটে গলায় বললেন, 'শিল্পের খাতিরে বলছি, বাছা, ছবি-টবির পেছনে আর পয়সা খরচ কোর না। এট কোন ছবি হয়নি আদৌ। এটা একটা বন্দুক। যদি চাও তো রাজ্যের সামনে উঁচিয়ে ধর, তোমার দু'হাঁক্কার বাগিয়ে নাও, তবে আর কখনো কোনো ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িও না। ওই টাকায় চালিয়ে যাও—ও দিয়ে দুশো পনি কিনে ফেল, শুনেছি ওগুলো ওইরকমই শস্তা—আর ওগুলোকে হাঁকাও, তাড়াও, ছোটো! বুক ভরে বাতাস নাও, খাও, ঘুমোও, সুখী হও। ছবি আর কক্ষনো নয়। তোমাকে তো স্বাস্থ্যবানই দেখায়—ওটাই প্রতিভা। ওটারই চর্চা কর।'—নিজের ঘড়িব দিকে তাকান শিল্পী—'তিনটে বাজতে কুড়ি। তিনটের সময় চরটে ক্যাপসুল, একটা ট্যাবলেট। ব্যস্ এই সবই তো জানতে চেয়েছিলে, তাই না?'

তিনটের সময় কাউবয়রা এল লনির কাছে, সঙ্গে জিন বেঁধে এনেছে 'হট টামালিস্'কে। ঐতিহ্য তো রক্ষা করতে হবেই। সিনেটে বিলটা পাশ হয়ে গেলেই তা নিয়ে উৎসব করতে গোটা দল পাগলের মতো ঘোড়া ছোটাবে শহরের ভেতর দিয়ে, প্রবল হৈ-হট্টগোল আর উত্তেজনার মধ্যে। মদ্যপানও চলবে, শহরতলিতে বন্দুক ছোঁড়া, সবিক্রমে সান সাবা অঞ্চলের গৌরব ঘোষণা করতে হবে। দূরবর্তী সেলুনগুলোতে এর মধ্যেই পালিত হয়েছে ওদের কর্মসূচীর কিছু অংশ।

উৎসাহ আর বুদ্ধিতে টগবগিয়ে-ওঠা ছোট্ট প্রাণী হট টামালিসের পিঠে চড়ে বসল লনি। ওর পিঠের পাঁজরায় আবার লনির ধনুক-পায়ের চাপ অনুভব করে খুশি হয়ে উঠেছে সে। লনি যে ওর বন্ধু, বন্ধুর জন্য ও সবকিছু করতে পারে।

হট টামালিস্‌কে হাঁটু দিয়ে ঠেলে কদমচালে ছোটায় লনি, হাঁক দেয়—'এসো স্যাঙাৎরা!' হুপ্ করে উৎসাহিত দলবল ওর পেছন-পেছন ধুলো উড়িয়ে ছোটে। লনি তার ঘোড়সওয়ার সাথীদের সিধে নিয়ে চলে ক্যাপিটলের দিকে। বন্য চিৎকার করে দলবল তাকে সমর্থন জানায় ঘোড়া নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ার মতলবটা বুঝতে পেরে। সান সাবার জয় হোক!

চারটে চওড়া-চওড়া চুনোপাথরের সিঁড়ি বেয়ে খট্‌খট্ করে উঠে পড়েছে কাউবয়দের আধা-বুনো ঘোড়াগুলো। খুরের আওয়াজ তুলে তার প্রতিধ্বনিত হলঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যারা পায়ে হেঁটে চলছিল তারা ভয়ে এদিক ওদিক ছিটকে যায়। সকলের পুরোভাগে লনি, হট টামালিস্‌কে ঠেলে সোজা নিয়ে গেল বিশাল ছবিটার

সামনে। সেই সময়টিতে দোতলার জানলাগুলো থেকে নেমে আসা একটা হাল্কা আলো যেন মস্ত চিত্রপটটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। হলঘরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার পটভূমির সামনে রীতিমতো আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছবিটা। আঁকার ত্রুটিগুলো সত্ত্বেও মনে হবে যেন সত্যি সত্যিই একটা নিসর্গদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছেন আপনি। হয়তো-বা ঘাসের ওপর দিয়ে পা-ছুঁড়ে-আসা জীবন্ত ঘোড়াটার অতি বাস্তব মূর্তির সামনে আপনি সভয়ে এক পা হটেও যেতে পারেন। হয়তো হট টামালিসের কাছেও সেরকমই মনে হয়েছিল। দৃশ্যটা তো তারই নিজস্ব পরম্পরার, হয়তো সে তার চালকের হুকুম মেনে চলে, এই মাত্র। কান খাড়া হয়ে ওঠে, ও ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। লনি তখন জিন থেকে সামনের দিকে ঝুঁকেছে কনুইদুটো দুপাশে পাখির ডানার মতো উঁচু করে। এইভাবেই কাউবয়রা তাদের বাহনকে ইশারা দেয় পুরো বেগে সামনে ধেয়ে যাবার। হট টামালিস্‌ও কি কল্পনা করছিল সে একটা লাল লম্ফমান ঘোড়াকে দেখতে পাচ্ছে, যাকে এক্ষুনি মুখোমুখি রুখে ফিরিয়ে দিতে হবে তার দলের মধ্যে? একটা তীব্র আওয়াজ হল খুরের দাপাদাপির, তারপর ইস্পাতের মতো পাঁজরা আর হাঁটুর পেশী কুঁচকে সামনে ছুটে যাওয়া, লাগামের ঝাঁকুনির তালে লাফিয়ে ওঠা। জিনের ওপর লনি ঝুঁকে বসে আছে ছবির ওপরের ফ্রেমটা থেকে মাথা বাঁচাতে, আর হট টামালিস্‌ তাকে নিয়ে বিশাল ক্যানভাসটা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল কামানের গোলার মতো—একটা প্রকাণ্ড হাঁ করে দেওয়া গর্তের চারদিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকল ক্যানভাসের মোটা কাপড়ের টুকরোগুলো।

তাড়াতাড়ি লনি তার পনিটাকে টেনে রুখে, ঘুরে এল থামের পাশ থেকে। দর্শকরা হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছে, উত্তেজনার মধ্যে তাদের মুখে আর কথা সরছে না। পরিষদ ভবনের সশস্ত্র সার্জেন্টরক্ষী বেরিয়ে এল, ভুরু কুঁচকে দেখল, প্রথমে মুখটা অনিষ্ট-ইঙ্গিতে গম্ভীর করে পরে দাঁত বের করে হাসল। বহু প্রতিনিধি ভিড় করে এসেছেন হট্টগোলটা দেখতে। লনির কাউবয় সাথীরা ওর উন্মাদ কাজকর্ম দেখে নিঃশব্দ আতঙ্কে অভিভূত।

যাঁরা একেবারে প্রথম বেরিয়ে এসেছিল তাঁদের সেনেটর কিম্‌। তিনি কিছু বলবার আগেই লনি ছট্‌ফটে হট টামালিসের পিঠের ওপর ঝুঁকে চাবুকের গোড়াটা তাঁর দিকে দেখিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে:

'আজ একটা খাসা বক্তিমেই দিয়েছিলেন আপনি মিস্টার, তবে ওই বরাদ্দের ব্যাপারটা না ওঠালেই পারতেন। আমি রাজ্যের কাছে কোনো কিছুই চাইনি। আমি ভেবেছিলাম তাদের কাছে একটা ছবি বেচব, কিন্তু এটা সেটা নয়। ঠাকুরদা ব্রিস্‌কোকে নিয়ে তো আপনি অনেক কিছুই বললেন, আমি তাঁর নাতি হিসেবে তাতে এক রকম গর্ববোধও করেছি। কিন্তু এখন অবধি ব্রিস্‌কোরা রাজ্যের কাছ থেকে কোনো উপহার নিতে যাচ্ছে না। যদি কেউ চায় তো ফ্রেমখানা নিতে পারে, যার খুশি। এবার চলো হে ভাই সব!'

হল ছেড়ে সান সাবার প্রতিনিধিরা তীরবেগে ছুটে গেল সিঁড়ি ডিঙিয়ে, ধুলোভরা সড়ক ধরে।

সান সাবা এলাকায় পৌঁছোবার আধা পথ তখনো বাকি, ওরা তাই রাতে শিবির করে রইল। শোবার সময় লনি চুপিচুপি শিবির-আগুন থেকে দূরে অন্ধকারে খুঁজে বার করল হট টামালিস্‌কে; গোঁজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে শান্তভাবে ঘাস চিবুচ্ছে। লনি ওর গলার কাছে ঝুঁকে বসে রইল, একটা দীর্ঘ বেদনাতুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে চিরকালের মতো উপে গেল ওর শিল্পের উচ্চাশা। কিন্তু ওইভাবে সব ত্যাগ করতে গিয়েও একটা-দুটো শব্দ নিঃশ্বাসের সঙ্গেই বেরিয়ে এল :

'একমাত্র তুইই দেখেছিলি টামালিস্‌ ওটার মধ্যে কিছু ছিল। সত্যিই ওটা ঘোড়ার মতো দেখতে ছিল কিনা বল্‌, বুড়ো খোকা ?'

Art and the Bronco এইন্‌স্‌লি, ১৯০৩ (অলিভিয়ের হেনরী ছদ্মনামে)

সলিটোর ধন্বন্তরী

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাস যদি কিছু জানা থাকে আপনার, তা'হলে নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন (আঠারোশো) নব্বই দশকের একটা ঘটনা। শুধু এক-মিনিট আর কয়েকটা মাত্র সেকেণ্ডের জন্য একটা আন্তর্জাতিক সীমা-নদীর অপর পারে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল এক চ্যাম্পিয়ন যোদ্ধা, আর এক "হবু—চ্যাম্পিয়ন"। অমন ক্ষিপ্র ও হ্রস্ব লড়াইয়ে সত্যিকারের ক্রীড়া-মনোভাব প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ। কাগজের সংবাদদাতারা তো যা পারে তাই লিখল, কিন্তু কোনো নিয়ম রক্ষার ধার না ধেরে খেলাটা হল করুণরকম বায়বীয়, যেন ধোঁয়ার মতো মিটে গেল। চ্যাম্পিয়ন শুধু প্রতিপক্ষকে মেরে শুইয়ে দিল, তার দিকে পেছন ফিরিয়ে বলে উঠল, 'ওকে তো বিলকুল ঘায়েল করেছি', আর জাহাজের মাস্তুলের মতো নিজের হাতটা বাড়িয়ে ধরল যাতে ওরা তার দস্তানা খুলে নেয়।

ফল কথা দাঁড়াল এই : সেই লড়াইয়ের পরদিন সকালে গোটা ট্রেন-বোঝাই, রঙচঙে বাহারি জামা আর গলাবন্ধ পরা নিরতিশয় তিতিবিরক্ত ভদ্রলোকেরা, সান আন্টোনিওতেই নেমে পড়লেন তাঁদের পুলম্যান গাড়ি থেকে। অংশত সেই কারণেই "ক্রিকেট"-ম্যা'গায়ারও পড়েছে এক বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে— তাকে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে বসতে হয়েছে স্টেশনের প্লাটফরমে, সেই সঙ্গে তাকে যেন ছিঁড়ে ফেলছে প্রচণ্ড দম আটকানো ফাঁপা কাসির দমক, যা সান আন্টেনিওবাসীদের কানে যথেষ্ট পরিচিত। ভোরের অনিশ্চিত আলোয় ঠিক সেই সময়েই ও-পথ

ধরে যাচ্ছিল কার্টিস্ রেইডলার। সে নিউসেস্ জেলার পশুখামার মালিক— তাঁর দেহের উচ্চতা আশা করি ছ'ফুট দু'ইঞ্চির নিচে কোনো কালেই হবে না।

খামার মালিকে এত সকালে বেরিয়েছে তার র‍্যাঞ্চ স্টেশনে যাবার দক্ষিণমুখো গাড়ি ধরতে। ক্রীড়া প্রেমিকের এই দুর্দশা দেখে সে ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল, ও-অঞ্চলের স্বভাবগত ঢঙে দরদভরা টানা উচ্চারণে বললে 'খুব বুঝি কষ্ট হচ্ছে, বাড ?'

"ক্রিকেট"-ম্যা'গায়ার নিজেও প্রাক্তন ফেদার-ওয়েট প্রাইজ-লড়াকু, প্রতিযোগিতার দালাল, ঘোড়ার জকি, সবরকম খেলাতেই দড়ো— সে ঝগরাটে ভঙ্গিতে চোখ উঁচিয়ে তাকাল, 'বাড' বলে কী ইঙ্গিত করছে লোকটা ?

খেঁকিয়ে উঠল, 'যাও হে, টেলিগেরাপের খাম্বা! তোমায় তো ডাকা হয়নি ঘন্টা বাজিয়ে।'

আবার একটা কাসির দমক যেন মুচড়ে দেয় তাকে, সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়ানো একটা মালের ট্রাকে দুর্বলভাবে মাথা হেলায় সে। রেইডলার ধৈর্য ধরে সবুর করে, চারদিক চেয়ে দ্যাখে— প্ল্যাটফরমে ভিড় জমিয়ে আছে সাদা টুপি, খাটো ওভারকোট, আর মোটা-মোটা চুরুট। অন্যজন আরেকটু সামলে উঠতেই সে প্রশ্ন করে, 'তুমি তো উত্তরেরই লোক, তাই না বাড ? লড়াই দেখতে এদিকে এসেছিল বুঝি ?'

'লড়াই ?' খ্যাঁক করে ওঠে ম্যা'গায়ার, 'কোণঠাসা পুষির লড়াই। স্রেফ চামড়ার তলায় ঢুকিয়ে একটা ইনজেক্শান। এক পিচকারিতে ডোপের নেশা, আর সে ঘুমিয়ে পড়ল, ব্যাস্। বলছ এটা লড়াই হয়েছে ?'— আবার কেসে, ঝাঁকুনি দিয়ে বকবক্ ক'রে বলেই চলল, পশুপালককে লক্ষ্য করে ততটা নয় যতটা নিজের কষ্টে সোয়াস্তি পেতে, 'আর মোক্ষম নিশ্চিত বলে কিছু রইল না আমার কাছে। তবু রাস্ সেজ্ নিজেই ছোঁ মেরে নিত ওটা। কর্কের ওই ছোকরা যে তিন রাউণ্ডের বেশি টিঁকত না তাতে আমি পাঁচে-এক নিশ্চিত জেনে ওতেই সব বাজিটা ধরি। আমার শেষ সেন্টটা অবধি ঢেলেছি, আর জিমি ডেলানির সারা-রাত খোলা কাফেটাতে তখুনি বসে টাকার গন্ধ পাচ্ছি! ওটা তো আমার কেনার কথা ছিল— ৩৭ নম্বর রাস্তার কাফে। আর তারপর ?— বলো হে টেলিগেরাপ খাম্বা, কোন্ আকাট তার পুরো পুঁজি ওই একটা ফক্কিকারির পেছনে ঢালবে!'

বিশালকায় খামার মালিক বললে, তুমি হক কথাই বলেছ। বিশেষ করে যখন হেরে গেছ। বাছা, এবার ওঠ তো, একটা হোটেলে ঘরে যাও। ভয়ানক বিশ্রি কাসি হয়েছে তোমার। অনেকদিন ধরে চলছে নাকি ?'

এবার একটু স্পষ্ট স্বরেই বলল ম্যা'গায়ার, 'ফুসফুস্। ধরে গেছে রোগ। ডাক্তার বলছে আর চারটা মাস হয়তো সময় করে আসতে পারব— যদি পা সোজা রাখতে পারি, বড় জোর ছ'মাস। চেয়েছিলাম এক জায়গায় থিতু হয়ে বসতে

আর নিজের খিদমত করতে। সেই জন্যই বোধহয় ওই পাঁচে-একের ওপর ফাটকা খেলেছি। এক হাজার খাঁটি ডলার বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। জিতলে ডেলামির কাফেটা কিনে নিতাম। কে ভেবেছিল ঘায়েল লোকটা প্রথম রাউণ্ডেই ঘুমিয়ে পড়বে—বল ? 'এ বড় কঠিন বাজি', মন্তব্য করে রেইডলার চোখ নিচু করে ট্রাকের গায়ে জড়োসড়ো ম্যা'গায়ারের ছোটখাটো দেহটার দিকে তাকায়—'কিন্তু তুমি একটা হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করো গে'। সেখানে মেন্‌জার আছে, দেখবার রাখাল আছে আর—'

'আর ফিফ্‌থ এ্যাভ'নু আছে, ওয়ালডর্ফ এ্যাস্টোরিয়া আছে'— ভেংচে ওঠে ম্যা'গায়ার— 'বললাম না ফতুর হয়ে গেছি ? একেবারে সত্যিসত্যি পথে বসেছি। আমার হাতে এখন একটা দশ-পয়সা। হয়তো ইউরোপে বেড়াতে পারলে, নয়তো নিজের প্রমোদতরীতে ঘুরলে চাঙা হয়ে উঠতাম.... এই পয়েপার!'

পেপার-ওয়ালা ছোকরার দিকে তার দশ-পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে একটা 'একপ্রেস্' কাগজ নিয়ে সে ট্রাকের গায়ে ফের পিঠ ঠেকা দিয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গেই মগ্ন হয়ে যায় কাগজে বিশদভাবে বর্ণিত তার 'ওয়াটার্লু'-পরাজয়ের কাহিনীতে।

কার্টিস রেইডলার একটা প্রকাণ্ড সোনার ঘড়ি বের করে দেখে ; হাত রাখে ম্যা'গায়ারের কাঁধে।

'চলে এস বাড, আমাদের হাতে আর মাত্র তিনি মিনিট—ট্রেন এসে যাবে।'

ব্যঙ্গ যেন ম্যা'গায়ারের শিরায়-উপশিরায়।

'তুমি আমায় নগদ কামাতে দেখলে কোথায়, তাস টানতেই বা দেখলে কোথায় !—একমিনিট আগেই তো বললাম না আমি সর্বস্বান্ত ? বন্ধু, তুমি কেটে পড় হে জলদি।'

'তুমি আমার সঙ্গে র‍্যাঞ্চে যাচ্ছ! বললে খামার মালিক— 'আর সেখানেই থাকছ যদ্দিন না ভাল হয়ে ওঠ। ছ'মাসে আমি তোমায় নতুন চিজ বানিয়ে ছাড়ব।' —এক হাতে সে ম্যা'গায়ারকে টেনে তুলল, তারপর ট্রেনের দিকে তাকে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে চলল।

দুর্বলভাবে পালাবার চেষ্টা করে ম্যা'গায়ার বললে, 'আর পয়সার কী হবে ?'

'পয়সা আবার কীসের জন্য ?' —ধাঁধায় পড়ে রেইডলার শুধোয়। বুঝতে না পেরে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা শুধু সমান্তরালে আনা খাঁজকাটা চাকার জোড়টি স্পর্শ করেছে যথার্থ কোণে কিন্তু ঘুরছে আলাদা-আলাদা কক্ষে।

দক্ষিণগামী ট্রেনের যাত্রীরা ওদের দেখেছে একসঙ্গে বসতে, অবাক হয়ে গেছে দুটো মেরুর এমন 'মেল' দেখে। ম্যা'গায়ার পাঁচফুট-এক, মুখখানা, হয় ইয়োকহামার, নয়তো ডাবলিনের। চক্‌চকে কুৎকুতে চোখ দুটো, চোয়াল আর গালের হাড় উঁচু—ক্ষতচিহ্নময়, কঠিন, কাটা সেলাইয়ের দাগ, যেন ভেঙেও গুড়িয়ে যায়নি ;

রুক্ষ আর ভিমরুলের মতো বণংদেহি এ মূর্তি নতুন নয়, অচেনাও নয়। রেইডলার হল অন্য মাটির মানুষ। ছ'ফুট-দু'ইঞ্চি লম্বা মাইলকে-মাইল চওড়া, স্বচ্ছ একটা সোঁতার চেয়ে বেশি গভীর নয়—ওর মধ্যে যেন মিশ খেয়েছে পশ্চিম আর দক্ষিণ। ওর জাতের মানুষের হুবহু ছবিটা খুব কমই পাওয়া যায়। কারণ টেক্সাসে স্থায়ী চিত্রশালা খুবই অপরিসর, আর ফোটোগ্রাফের সাবি সেদেশে একেবারে অজানা। মোটের ওপর, রেইডলারের ধবনের মানুষদের একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিরূপ পাওয়া যেতে পারে প্রাচীর চিত্রে— এমন কিছু যা উচ্চল সরল, স্নিগ্ধ আর ফ্রেম-বর্জিত।

ইন্টারন্যাশনাল রেলপথে ওরা দক্ষিণ দিকে চলেছে। ঠাসবন্দী কামরাগুলো কদাচিৎ একেকবার দূরে-দূরে ঘন-সবুজ ছোট বনস্থালী পেরিয়ে যায় তারপর গিয়ে পড়ে সরাসরি সবুজরঞ্জিত প্রেইরি তৃণভূমির মধ্যে। এই হল র‍্যাঞ্চের দেশ, গাভীকূলের রাজাদের রাজত্ব।

ম্যা'গায়ার তার আসনের কোণে একেবারে চুপসে বসে আছে, খামারমালিকের কথাবার্তাগুলো কটু সন্দেহের সঙ্গে গ্রহণ করছে। এই হোঁৎকা পাগলাটে বুড়োটা ওকে যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, মতলবটা কী লোকটার? পরোপকার জাতীয় কোনো ব্যাপার ম্যা'গায়ারের আন্দাজের মধ্যেই পড়ে না। বন্দী কল্পনা করে— 'এতো চাষ আবাদ করে না; জোচ্চুরির ব্যবসাও করে না নিশ্চয়। লোকটার কাজের ধারা কোন্ দিকে? তুমি জাল ফেল হে "ক্রিকেট", দেখ ক'টা তাস টানে। মোটমাট ব্যাপারটা তোমার মোটেই পছন্দ নয়। একটা নিকেলের পয়সা সম্বল, জোরকদমে বেড়ে চলা ক্ষয়রোগ, অতএব মাথা গুঁজেই থাকো। মাথা গুঁজে থাকো, আর দেখ লোকটার আসল খেলা কী।'

সান আন্টোনিও থেকে একশো মাইল দূরে, রিঙ্কনে, ট্রেন থেকে নেমে ওরা একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি ধরে। রেইডলারের জন্যই অপেক্ষা করছিল গাড়িটা। ওতে চড়ে ওরা ত্রিশ মাইল রাস্তা পাড়ি দেয়— স্টেশন থেকে ওদের লক্ষ্যস্থল অবধি। আর কিছু না হোক্ এই যাত্রাটুকুর ফলেই ঝগবাটে ম্যা'গায়ারের মুক্তির চেতনাবুদ্ধি জাগ্রত হওয়া উচিত ছিল। উল্লাসদায়ক তৃণভূমির ওপর দিয়ে যেন নরম মখমলের চাকায় উড়ে এসেছে ওরা। চটপটে ক্লান্তিহীন দুলকিচালে ছুটেছে দুই স্পেনীয় পনিঘোড়া, একেকবার তাদের গতি সতেজ হয়েছে বন্য, দুর্বার কদম চালে। হওয়াটা যখন ওরা বুক ভরে নেয়, তখন তাতে দ্রাক্ষারস আর স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের সুবাস, আর তার সঙ্গে প্রেইরি ফুলের হালকা আমেজ। রাস্তা কখন শেষ হয়ে গেল, ঘোড়া-গাড়ি তখন ঘাসের সীমা চৌহদ্দি-ছাড়া ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতার দিয়ে চলেছে রেইডলারের অভ্যস্ত হাতের চালনায়। তার কাছে দূরের যে কোনো তরুগুচ্ছই একেকটা নিশানাচিহ্ন, নিচু পাহাড়গুলোর প্রতিটি ভাঁজই পথ ও দূরত্বের জ্ঞাপক। কিন্তু ম্যা'গায়ার তার শিরদাঁড়ায় ভর করে কাত হয়ে আছে, মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই ওর চোখে পড়ে না, পশুপালক যা বোঝায়

সবই বেজার অবিশ্বাসের সঙ্গে শুনে যায়। ওর ভাবনার মূল কথা হল, 'লোকটার ইচ্ছেটা কী? কোন্ সোনার ইটটা বিক্রি করার তালে রয়েছে হোঁৎকা বুড়ো?' অপার দিগন্ত আর চতুর্মাত্রিক সীমা ঘেরা এই বিশাল প্রান্তরকে সে মাপজোক করেছে শুধু তার শহুরে হাঁটা-রাস্তাগুলোর মানদণ্ডে।

এক হপ্তা আগে প্রেইরির মাঠে ঘুরতে-ঘুরতে রেইডলার একটা অসুস্থ দুর্বল বাছুরকে দেখেছিল পরিত্যক্ত, চিৎকার করছে। ঘোড়া থেকে না নেমেই সে হাত বাড়িয়ে হতভাগ্য বাছুরটাকে তুলে নিল জিনের সামনে, র‍্যাঞ্চে ফিরে ওটাকে নামিয়ে দিল মুনিষদের হাতে, শুশ্রূষা করবে ওরাই। এসব তো ম্যা'গায়ারের পক্ষে জানাই অসম্ভব। পশুপালকের চোখে তার আর বাছুরের ব্যাপারটা যে একই রকম আগ্রহজনক এবং তার সাহায্যের তাগিদ জাগায়, সেটা কল্পনাও করতে পারে না ম্যা'গায়ার। একটি জীব অসুস্থ আর অসহায়, আর তাব আছে সাহায্য দেবার ক্ষমতা—শুধমু এইটুকুই প্রাথমিক স্বীকার্যই পশুপালকের তৎপরতার পক্ষে যথেষ্ট। এইগুলোই তার যুক্তিধারার মূলে, তার রীতিধর্মের প্রধান বিষয়। ম্যা'গায়ার হল সাত নম্বর পুঙ্গ যাকে একইভাবে সান আন্টোনিও থেকে তুলে এনেছে রেইডলার। সান আন্টোনিওর ঘিঞ্জি গলিতে এখনো কিছু 'ওজোন' টিকে রয়েছে এই আশায় নাকি হাজার-হাজার মানুষ আসে সেখানে। সলিটো র‍্যাঞ্চে তাদের পাঁচজন ছিল অতিথি হয়ে, তারপর তারা হয় পুরো সেরে গিয়ে, নয় আরো সুস্থ হয়ে, ফিরে যেতে পেরেছে, কান্নাভেজা কৃতজ্ঞতায় উজাড় করে গেছে তাদের ভাষার অভিধান। একজন এসেছিল বড় দেরি করে, তা সেও খুব আরামের মধ্যেই শেষ অবধি আশ্রয় নেয় বাগানের র‍্যাটামা গাছটার তলায়।

আর সেই কারণেই র‍্যাঞ্চের বাসিন্দারা একটুও বিস্মিত হল না যখন ঘোড়ার গাড়িটা ঘুরে দরজার দিকে ফিরতেই রেইডলার ছেঁড়া কাপড়ের বস্তার মতো তার দুর্বল 'আশ্রিতটিকে' নামিয়ে দিল বারান্দার ওপর।

ম্যা'গায়ার চোখ মেলে যা-সব দেখে তা তার কাছে অচেনা অদ্ভুত মনে হয়। এ অঞ্চলে ওই র‍্যাঞ্চ বাড়িটাই সবচেয়ে দ্যাখনসই। একশো মাইল দূর থেকে গাড়িতে করে ইট বয়ে এনে তৈরি করা হয়েছিল বাড়িটা। চারটে কামরা পুরোপুরি ঘিরে কাদামাটির মেঝেওয়ালা বারান্দা। ঘোড়া, কুকুর, জিনসাজ, গাড়ি, বন্দুক আর কাউবয়দের সাজসরঞ্জাম বিচিত্রভাবে সবদিকে সাজানো, দেখে বিধ্বস্ত ক্রীড়ামোদীর শহুরে-চোখ পীড়িত হয়।

রেইডলার ফুর্তিভরা গলায় বললে, 'ব্যাস্ এই তো এসে গেছি নিজের ঘরে।'

'হ্যাঁ, যা বাড়ির ছিড়ি দেখছি', সঙ্গে সঙ্গে বলে ম্যা'গায়ার, আর কাসির দমকে বারান্দায় গড়িয়ে পড়ে।

পশুপালক নরম সুরে বললে, 'তোমাকে একটু আরামে রাখার চেষ্টাই করব আমরা, বাড়ি। ভেতরটা অতো সুন্দর নয় ঠিকই, তবে আসলে তো বাইরে থাকলেই

তোমার উপকার হবে বেশি। এইটে হবে তোমার কামরা। তুমি চাইলেই আমাদের যা কিছু আছে সব পেয়ে যাবে।'

পুবদিকের কামরাটায় সে ম্যা'গায়ারকে নিয়ে গেল। মেঝেটা ফাঁকা, আর পরিচ্ছন্ন। খোলা জানালা দিয়ে-আসা উপসাগরীয় হাওয়ায় সাদা পর্দাগুলো দুলছে। একটা বড় দোলন-চেয়ার, দুটো সোজা চেয়ার, সংবাদপত্র পাইপ তামাক রেকাব কার্তুজ ছড়ানো একটা লম্বা টেবিল ঘরের ঠিক মাঝখানে। সুন্দর ফ্রেম-বাঁধানো কিছু হরিণের মাথা আর একটা বিশাল কালো মোষের মাথা দেয়াল থেকে ঝুঁকে রয়েছে। এক কোণে একটি চওড়া শীতল খাট। নিউসেস্ জেলার লোকেরা এই অতিথি-কক্ষটাকে রাজপুত্রের যোগ্য বলে মনে করে। ম্যা'গায়ারের শূল-দৃষ্টি পড়ে যেন সেদিকে। পকেট থেকে তার নিকেল মুদ্রাটা বের করে ছাদের দিকে ছোঁড়ে।

'ভেবেছিলে টাকার কথাটা আমি মিথ্যে করে বলেছি, তাই না? বেশ তো, আমায় তন্নতন্ন তালাস করেই দেখ, যদি চাও। এইটা হল আমার তেজুরির শেষ কপর্দক। কে দেবে টাকাটা?'

পশুপালকের স্বচ্ছধূসর চোখদুটো স্থিরনেত্রে উশকোখুশকো ভুরুর তলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে অথিতির ক্ষুদে, নীল চোখজোড়ার দিকে। একটু পরে সে সহজ অথচ ভদ্র কণ্ঠে বলে, 'বাছা, আমি বাধিত থাকব যদি ফের কখনো টাকার কথা উল্লেখ না কর। একবার বলেছ তাই বহুত। যে-সব লোককে আমার র‍্যাঞ্চে ডেকে আনি তাদের কখনো কিছু দিতে হয় না, তারাও খুব কালেভদ্রে কিছু দিতে চায়। আধ ঘন্টার মধ্যেই 'সাপার' তৈরি থাকবে। কুঁজোতে জল রইল, আরো ঠাণ্ডা খেতে চাইলে ওই বারান্দায় লাল ঝোলানো ক্যামে আছে।'

এদিক ওদিক চেয়ে ম্যা'গায়ার জিজ্ঞেস করে, 'ঘন্টাটা কোথায়?'

'ঘন্টা কীসের জন্য?'

'কিছু আনাবার জন্য ঘন্টা বাজাতে হয়। সেরকম তো কিছু.... দেখছি না এখানে।' ----হঠাৎ যেন একটু দুর্বল রাগ দেখিয়ে বলে, 'আমি তো তোমায় কখনো বলিনি আমাকে এখানে নিয়ে আসতে। একটা সেন্টও ধারি না তোমার কাছে। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে বলেই, নয়তো আমি তোমায় কোনো দুঃখের কাহিনী শোনাতে যাইনি। এই তো রয়েছি কোনো 'বেলবয়' বা মদের ভাঁড়ার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমি অসুস্থ। তাড়াহুড়ো করতে পারি না... এ হেহে! আমি যে এসব একেবারেই চাই না!' ---ম্যা'গায়ার খাটের ওপর পড়ে কাঁপে আর ফোঁপাতে থাকে।

রেইড্লার দরজার কাছে গিয়ে কাউকে ডাকে। একজন মেক্সিকান যুবক, বছর কুড়ি বয়েস, পাতলাসাতলা উজ্জ্বলবর্ণ, তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। রেইড্লার তার সঙ্গে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে :

'ইলারিও, আমার মনে পড়ছে, সান কার্লোস্ এলাকায় রোডিয়া ঝরনার কাছে

তোমায় কথা দিয়েছিলাম বেয়ারার কাজ দেব বলে।'

'হ্যাঁ সিনর, এই রকমই সদিচ্ছা জানিয়েছিলেন।'

'শোনো। এই "সেনোরিটো" হলেন আমার বন্ধু। ইনি খুবই অসুস্থ। এঁর পাশে-পাশে থাকবে। সব সময় দেখবে তিনি কী চান। খুব ধৈর্য রেখে এঁর যত্ন করতে হবে কিন্তু। আর তারপর ইনি যখন ভাল হয়ে উঠবেন, কিংবা... যখন সেরে উঠবেন, তখন বেয়ারার বদলে তোমায় আমি র‍্যাঞ্চো ডিলাস্ পিয়েড্রাসের গৃহরক্ষক করে দেব, সেটা ভাল হবে না?'

হ্যাঁ সিনর, আপনার অশেষ দয়া।' ঈলারিও কৃতজ্ঞতায় হাঁটু গেড়ে বসতে চায়, কিন্তু পশুপালক সদয়ভাবে তাকে একটা লাথি মেরে গজগজ করে ওঠে— 'তোমার ওসব যাত্রা-মার্কা ঢং ছাড়ো তো এখন।'

দশ মিনিট বাদে ম্যা'গায়ারের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ঈলারিও, রেইডলারের সামনে দাঁড়াল। জানাল, 'ছোট সিনর তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছেন,' (রেইডলার ওর ভনিতা এবার মাফ করে) 'আর চাইছেন কিছু গুঁড়ো বরফ, গরম জলে স্নান, একটা জিনের বোতল, আর চান জানলা বন্ধ রাখতে, মদে ভেজা পাউঁরুটি, একখানা নিউইয়র্ক হেরাল্ড, সিগারেট, আর চান একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে।'

এইভাবে সলিটো র‍্যাঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হল সন্ত্রাসের রাজত্ব। কয়েক হপ্তা ধরে কাউবয়দের সামনে জাঁক করে বড়-বড় কথা, সদম্ভ চাল দেখাল ম্যা'গায়ার—ওরা খবর পেয়ে কয়েক মাইল দূর-দূর থেকে এসেছিল রেইডলারের সাম্প্রতিকতম আমদানি এই লোকটিকে দেখতে। তাদের কাছে যে যেন নতুন এক অভিজ্ঞতা। মুষ্টিযুদ্ধের সব জটিল আঁতঘাত, শিক্ষা আর আত্মরক্ষার সব রকম কসরত ওদের সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে। পেশাদার খেলায় চামচাদের অশোভন জীবনের পুরোটাই সে ওদের মনশ্চক্ষে তুলে ধরেছে। ওর অশ্লীল ভাষায় খই-ফোটানো দেখে একটানা মজা আর বিস্ময় বোধ করেছে তারা। স্তম্ভিত হয়ে গেছে ওর হাবভাব, অদ্ভুত ঠাটঠমক, মুখের আর রীতিনীতির বিশুদ্ধ নোংরামি দেখে। এক নতুন জগৎ থেকে আসা কোনো প্রাণী যেন সে।

আশ্চর্যের কথা, এই নতুন জগৎ যেখানে ও ঢুকেছে, তার কোনো অস্তিত্বই নেই ওর কাছে। ও হল ইট-কাঠ-পাথরের পুরোদস্তুর আত্মসর্বস্ব মানুষ। ওর ধারণা কিছু কালের জন্য ও খোলা আঙিনায় বেরিয়ে এসেছে, এবং এখানে একমাত্র যারা আছে তারা ওর স্মৃতিচারণের শ্রোতা। এককেটি প্রেইরি দিনমানের সীমাহীন স্বাধীনতা, অথবা তারকাখচিত প্রেইরিরাত্রির নিবিড়-হয়ে-আসা নৈঃশব্দ্য তার মনে কোনো সাড়া জাগায় না। ঊষাকালের সমস্ত বর্ণ মিলেও তাকে খেলার গোলাপি পত্রিকা থেকে সরিয়ে নিতে পারে না। ওর জীবনে একটাই উদ্দেশ্য: 'কোনো কিছু না দিয়ে, কিছু আদায় কর': "সাইত্রিশ নম্বর রাস্তাই" হল ওর লক্ষ্য।

এখানে আসার দু'মাস পরে সে নালিশ শুরু করল, সে আগের চেয়েও খারাপ

বোধ করছে। তখনই সে হয়ে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চের বিভীষিকা, রাতের দানব, সিন্দবাদের নাছোড়বান্দা বুড়ো। নিজেকে কামরার মধ্যে আটকে রাখত লুকোনো কালসাপের মতো, নয়তো বাজে বক্‌বকে অস্থির মানুষের মতো—অনবরত ঘ্যান্‌ঘ্যান, নালিশ, গালাগাল আর অভিযোগ করত। তার নালিশের মোদ্দা কথা, তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নরকে ঢোকানো হয়েছে; অবহেলা আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সে মরতে বসেছে। অসুখ বেড়ে যাচ্ছে বলে তার ভয়ানক অনুযোগ সত্ত্বেও অন্যদের চোখে কিন্তু তাকে একই রকম দেখায়। কিস্‌মিসের মতো চোখ দুটো আগের মতোই উজ্জ্বল, শয়তানিভরা; গলার স্বর সেইরকমই রুক্ষ; ভাবলেশহীন মুখের চামড়া ঢাকের চামড়ার মতো টানটান, খোয়াবার মতো মাংসই তাতে ছিল না। প্রতি বিকেলে ওর উঁচু গালের হাড়ে লাল আভা ইঙ্গিত দেয় থার্মোমিটারে দেখলে হয়তো কোনো লক্ষণ ধরা পড়ত, দেহে আঙুলের টোকা দিয়ে হয়তো পরিষ্কারই বোঝা যেত ম্যা'গায়ার শুধু একটি ফুসফুসেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে; কিন্তু তার চেহারা রয়ে গেছে আগের মতোই।

ঈলারিও একটানা দেখাশোনা করে চলেছে ওকে—গৃহরক্ষক হবার প্রত্যাশিত পুরস্কারটিই নিশ্চয় তাকে চাঙা রেখেছে, কারণ ম্যা'গায়ার তাকে এক তিক্ত অস্তিত্বের শেকলে বেঁধে রেখেছিল। মানুষের একমাত্র জীবন সম্ভাবনা যে বাতাস, তাকেই সে হুকুম করে বন্ধ জানলা আর টানা পর্দার ওপাশে রুদ্ধ করে রেখেছে। কামরাটা সর্বদাই সিগারেটের ধোঁয়ায় নীল আর দূষিত। যে কেউ ঘরে ঢুকুক তাকে বসতে হবে দম আটকে গেলেও; আর শুনতে হবে বেঁটে ভূতটার নিজের কলঙ্কময় জীবন নিয়ে অনন্ত হামবড়াইয়ের কথা।

সবচেয়ে উদ্ভুটে ব্যাপার হল ম্যা'গায়ার আর তার হিতকারীর মধ্যে এখনকার সম্পর্কটা। একটা খুঁতখুতে বিগড়ে-যাওয়া শিশু যেমন তার প্রশ্রয়দাতা বাপ-মায়ের সঙ্গে করে, পশুপালকের প্রতি তেমনি ধরনের আচরণ এই পঙ্গু মানুষটার। রেইড্‌লার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে কোথাও গেলে, ম্যা'গায়ারকে পেয়ে বসে মুখ-বোজা গোঁসা, যা অন্যের অমঙ্গলজনক। যখন সে ফিরে আসে প্রথমেই একপাল্লা ভয়ানক হুলফোটানো গালাগাল জুটবে তার কপালে। আশ্রিতের প্রতি রেইড্‌লারের আচরণও বেশ দুর্বোধ্য। পশুপালক যেন সত্যিসত্যিই ম্যা'গায়ারের বেধড়ক গালাগালের উপযুক্ত চরিত্রটির ভূমিকা নেয়, আর সে-রকম অনুভবও করে—চরিত্রটি হল খেয়ালি পরপীড়ক আর দোষী অত্যাচারীর। লোকটার বর্তমান হালের জন্য যেন নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়; সব সময় সেই তিরস্কারগুলো একটা প্রশান্ত, ধৈর্যময়, এমন-কি অনুশোচনাপূর্ণ করুণার সঙ্গে মেনে নেয়—এ করুণার কখনো কিন্তু অদলবদল হয় না।

একদিন রেইড্‌লার তাকে বলল, 'বাছা, খোলা হাওয়া একটু বেশি করে নাও। ইচ্ছে করলে গাড়িটা আর একজন কোচোয়ান রোজই সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পার।

এক-কি-দু'হপ্তা গরুর খোঁয়াড়গুলোই ঘুরে দেখ। খুব আরামে বসিয়ে দেব। মাটি, আর তার পরেই হাওয়া—এগুলোই তো তোমাকে সারিয়ে তুলবে। ফিলাডেলফির একটা লোককে জানি, তোমার চেয়েও অসুস্থ সে, গুয়াদালুপেতে হারিয়ে গেল, দু'হপ্তা ধরে ভেড়ার খামারগুলোতে খালি-ঘাসের ওপর শুয়ে কাটিয়েছিল। বুঝলে স্যার, ওতেই সে সুস্থ হতে শুরু করল, সত্যিই তাই হল। একেবারে মাটির কাছাকাছি—সেখানেই তো বাতাসের ওষুধটা থাকে। এখন একটু ঘোড়ার পিঠে চলতে শুরু কর। একটা শান্ত নরম পনি আছে—'

'তোমার কী ক্ষতিটা করেছি আমি?' চেঁচিয়ে উঠল ম্যা'গায়ার, 'তোমাকে কখনো ঠকিয়েছি? তোমাকে কি বলেছিলাম আমায় এখানে আনতে? তোমার ইচ্ছে হলে আমাকে খামারে ঘোরাতে পার, কিংবা আমার পেটে একটা ছোরা ঢুকিয়েও সব ঝামেলা মেটাতে পার। ঘোড়ায় চড়া, হুঁঃ। বলে পা'ই তুলতে পারি না! একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও পাশ থেকে ঘুষি মারলে সরে যেতে পারি না। তোমার হতভাগা র‍্যাঞ্চ তো আমার এই উপকার করেছে। খাওয়ার কিছু নেই, দেখার কিছু নেই, কথা বলারও কেউ নেই, শুধু ওই আনাড়িগুলো ছাড়া, —ঘুষিমারা বস্তা থেকে চিংড়ি-কারির তফাত যারা বোঝে না।'

'এটা একটা শুনশান জায়গা, সে তো নিশ্চয়,' —রেইড্‌লার লজ্জিতভাবে ক্ষমা চায়। 'আমাদের আছে যথেষ্ট, তবে একটু সাদামাটা। যা তুমি চাইবে, ছোকরারা ঘোড়ায় চেপে ছুটে গিয়ে তাই এনে দেবে।'

'সার্কেল-বার' গোষ্ঠীর কাউবয় চ্যাড মার্চিসনই প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল যে ম্যা'গায়ারের অসুস্থতা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। চ্যাড তার জন্য তিরিশ মাইল দূর থেকে ঘোড়ার জিনে বেঁধে এক ঝুড়ি আঙুর এনেছিল। ধোঁয়ায় ঢাকা কামরাটার মধ্যে খানিকক্ষণ থেকেই সে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের সন্দেহের কথাটা রেইডলারকে চুপিচুপি বলল নিতান্ত স্থূলভাবেই।

'ওর হাতখানা তো দেখলাম হীরার চেয়েও শক্ত। "শোর-প্লেক্সাস্" ঘুষি বলে কী যেন একটা বোঝাতে চেষ্টা করল আমাকে, দু'দুবার খচ্চরের লাথি খাবার মতো অবস্থা হল আমার। না, না, কার্ট, লোকটা তোমার সামনে ঘাপটি মারার ভান করে আছে। ও যদি অসুস্থ হয় তো আমিও অসুস্থ। বলতে আমার খারাপ লাগছে, কবুতরটা তোমায় খাটাচ্ছে চৌহদ্দি আর আশ্রয় পেতে।'

পশুপালকের ছলাকলাহীন মন চ্যাডের দৃষ্টিভঙ্গি মনে নিতে অস্বীকার করে। পরে যখন সে নিজেই করতে যায়, তখনও কিন্তু তার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো সন্দেহের স্থান থাকে না।

একদিন দুপুর নাগাদ দুটি লোক গাড়ি চালিয়ে এল র‍্যাঞ্চের মধ্যে, গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াদুটো বাঁধল, সোজা চলে এল ডিমারে—ওদেশের রীতিই হল অবারিত ঢালাও আতিথ্য ওদের একজন হলেন সান আন্টেনিওর নামজাদা ডাক্তার, যাঁকে

চড়া ফীস্ দিয়ে ডেকে এনেছিলেন একজন ধনী খামারমালিক।

ভদ্রলোক একটা আকস্মিক গুলিতে আহত হয়ে শয্যাশায়ী হন। এখন ডাক্তারকে লোক সঙ্গে দিয়ে স্টেশনে পাঠানো হচ্ছে শহরে ফিরে যাবার ট্রেন ধরিয়ে দিতে। খাওয়াদাওয়ার পর রেইডলার তাঁকে এক পাশে ডেকে নিয়ে একটা কুড়ি-ডলারের নোট গুঁজে দিল তাঁর হাতে, বলল:

'ডক্, পাশের কামরাটায় একজন ছোকরা মানুষ আছে, আমার আন্দাজ তার বিশ্রি ক্ষয়রোগ ধরেছে। আমার ইচ্ছে আপনি তাকে একটু দেখুন। শুধু এইটুকু বলুন তার অবস্থা কতটা খারাপ, আর আমি তার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।'

'আমি যে ডিনারটা এইমাত্র খেলাম তার দাম কত পড়ত মিঃ রেইডলার?' —চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে স্পষ্ট কথা বললেন ডাক্তার। রেইডলার টাকাটা নিজের পকেটেই ফেরত পাঠাল। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যা'গায়ারের কামরায় ঢুকেছেন, আর পশুপালক বারান্দার ওপর পাঁজা করে রাখা জিনসাজগুলোর ওপর বসে অপেক্ষা করছে। ডাক্তারের রায় অনুকূল না হলে সে নিজেকে দোষ দেবার জন্য তৈরি।

দশ মিনিটের মধ্যে চটপট্ বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'আপনার লোক তো নতুন ডলারের মতো তাজা। ওর ফুসফুস আমার চেয়েও ভাল। শ্বাসপ্রশ্বাস, শরীরের তাপ, নাড়ির গতি স্বাভাবিক। বুকের ছাতি পাঁচ ইঞ্চি বেশি ফোলাতে পাবে। কোনো জায়গায় দুর্বলতার চিহ্ন নেই। অবশ্য জীবাণুটা পরীক্ষা করতে পারিনি, তবে সেটা নেই। এ নির্ণয়ের ব্যাপারে আমার নামও করতে পারেন। এমনকি সিগারেট আর জঘন্য বদ্ধ ঘরও ওর ক্ষতি করেনি। কাসে, তাই না? বেশ তো তাকে বলে দিন ওটার প্রয়োজন নেই। আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা কিছু করতে পারি কি না। তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব ওকে খাম্বার গর্ত খুঁড়তে দিন, বা মেক্সিকোর ঘোড়া বশ করতে দিন। ওই যে আমার লোক তৈরি, এবার চলি। শুভদিন স্যার।' —এক দমক ফুরফুরে তাজা হাওয়ার মতো বেড়িয়ে গেলেন ডাক্তার।

রেইড্লার হাত বাড়িয়ে বেড়িলের ওধার থেকে একটা মেস্কিট ঝাড়ের পাতা তুলে নিল, চিন্তামগ্নভাবে সেটাই চিবুতে লাগল।

গরুর গায়ে ছাপ দেবার মরশুম এসে পড়েছে। ওদের মিস্তিরিদের সর্দার রস্ হার্জিস্ এল পরদিন সকালে। পঁচিশ জন লোককে সে র‍্যাঞ্চে লাগিয়েছে, তারা সান কার্লোস্ এলাকার কাজ আগে শুরু করবে বলে প্রস্তুত। ছ'টা নাগাদ ঘোড়ায় জিন সাজানো, খাবারের গাড়ি তৈরি করে যখন তারা ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছে, তখন রেইড্লার তাদের হুকুম দিল একটু সবুর করতে। লাগাম-জিন সাজানো একটা বাড়তি পনিকে টেনে নিয়ে আনছে এক ছোকরা—গেটের সামনে। রেইডলার ম্যা'গায়ারের কামরার দিকে হেঁটে গেল, খুলে দিল দরজাটা। ম্যা'গায়ার এখনো

পোশাক পরেনি, বিছানায় শুয়ে ধূমপান করছে।

'উঠে পড়ো', বলল পশুপালক, বিউগ্‌লের মতো পরিষ্কার ধাতব কণ্ঠে। ম্যা'গায়ার একটু হতভম্ব হয়ে বলে 'সে কী কথা!'

'উঠে পোশাক পরে নাও। আমি বরং র‍্যাটেলসাপ সইতে পারি, কিন্তু মিথ্যুককে ঘেন্না করি। আবার বলতে হবে নাকি তোমায়?' —ম্যা'গায়ারের ঘাড় চেপে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল মেঝের ওপর।

আর্তনাদ করে ওঠে ম্যা'গায়ার, 'দোস্ত তুমি কি পাগল হলে? দেখতে পাচ্ছ না— আমি অসুস্থ? গুঁতোগুঁতি করতে গেলে যে পটল তুলব। তোমার আমি কী ক্ষতিটা করেছি?' —আবার শুরু করে তার পুরনো কান্না— 'আমি কক্ষনো বলিনি আমায়—'

'প্যান্ট জামা পরে নাও!' এবার একটু চড়া গলায় বলে রেইডলার।

শপথ তুলে, হুমড়ি খেয়ে, কাঁপতে কাঁপতে, নিজের অবাক চকচকে চোখ জোড়া পশুপালকের তেড়ে-ওঠা চেহারার ওপর রেখে, ম্যা'গায়ার কোনোরকমে তার জামাজুতো দেহে চড়াল। তারপর রেইডলার তার কলার চেপে ঠেলে নিয়ে গেল বাইরের উঠোনে, গেটের কাছে বাঁধা পনিটার কাছে। কাউবয়রা জিনের ওপর কাত হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল দৃশ্যটা।

রস্ হার্জিস্‌কে বলল রেইডলার, 'এই লোকটাকে নিয়ে যাও তো, কাজে লাগিয়ে দাও একটা। কড়া খাটুনি খাটাবে, ভাল ঘুমোতে দেবে, আর পেট ঠেসে খাওয়াবে। তোমরা তো ভাই জানো এর জন্য আমি যতটা পেরেছি করেছি, একে আদরযত্নে রেখেছি। কাল সান আন্টোনিওর সেরা ডাক্তার এসে একে পরীক্ষা করলেন, বললেন, এর ষাঁড়ের মতো ফুসফুস, ঘোড়ার মতো স্বাস্থ্য। একে নিয়ে কী করতে হবে তা নিশ্চয় জানো রস্।'

রস্ হার্জিস্ গম্ভীরভাবে একটু হাসল।

রেইডলারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত ভাব মুখে এনে ম্যা'গায়ার বলল, 'অ! বদ্যিটা তাহলে বলেছে আমি ঠিক আছি? আর বুঝি বলেছে আমি ধোঁকা দিচ্ছি? তুমিই ওকে আমার পেছনে লাগিয়েছিলে। ভেবেছিলে আমি ব্যারামী নই। তুমি বলেছ আমি মিথ্যুক। দেখ দোস্ত, আমি জানি আমি কড়া কথা বলি, কিন্তু বেশির ভাগটাই মন্দ ভেবে বলি না। তোমার যদি ধারণা থাকে—অ! যাক গে— আমি ব্যারামী নই, বদ্যি বলেছে। ঠিক আছে দোস্ত, তোমার হয়ে কাজেই যাব এবার। সেখানেই বুঝি তুমি সিধে চালে খেল।'

পাখির মতোই অনায়াসে সে জিনে চড়ে বসল। সামনে থেকে চাবুক তুলে নিয়ে ওটা দিয়ে গুঁতো দিল পনিটাকে। হথর্নের ঘোড়দৌড় একবার যে 'ক্রিকেট' এক গলা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'গুড বয়' ঘোড়াটাকে, —'দশের এক' বাজিতে— সেই 'ক্রিকেট' আবার রেখেছে ঘোড়ার রেকাবে তার পা। ম্যা'গায়ার তার ঘোড়াসওয়ার

দলকে নিয়ে ছুটল সান কার্লোসে। পেছনে ওর ঠেঙানো ধুলোর মধ্যে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে আসতে কাউবয়রা মহা উৎসাহ জানিয়ে চেঁচাচ্ছে।

কিন্তু মাইলখানেক যাবার আগেই ও দলের পেছনে পড়ে গেল। ঘোড়ার খোঁয়ারগুলোর নিচে, উঁচু ওক বনের অংশটাতে আসতে ও হয়ে দাঁড়াল শেষ সওয়ার। একটা ঝাড়ের পেছনে এসে ও লাগাম টেনে ধরল, মুখে গুঁজল তার রুমাল। রুমালটা সরিয়ে দেখল ওটা ভিজে গেছে উজ্জ্বল, ধমনীর রক্তে, সাবধানে ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা কাঁটা-নাসপাতির ঝাড়ের মধ্যে। তারপর চাবুক দিয়ে ফের খোঁচা মেরে রুদ্ধ গলায় বললে, 'চল্ চল্'। বিস্মিতি পনিঘোড়াটা। আবার সে কদমচালে ছুটল দলের পেছনে।

সে-রাতে ওদের আলাবামার পুরনো বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেয়েছিল রেইডলার। ওর পরিবারে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে; সম্পত্তি জমি ভাগাভাগি হবে, ওকে তাই যেতে লিখেছে সেখানে। ও যখন দু'ঘোড়ার গাড়িটায় উঠল তখনও সন্ধ্যে হয়নি, প্রেইরির মাঠ সাঁতরে সে স্টেশনে চলে গেল।

...দুমাস পর এই প্রথম দেশের বাড়ি হয়ে ফিরল সে। র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে দেখল এক ঈলারিও ছাড়া প্রায় খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি, ওর অনুপস্থিতিতে ঈলারিওই একরকম পরিচারক হিসেবে কাজ করছে। ও যখন বাইরে ছিল, অল্পবয়সী ছেলেটা একটু একটু করে কাজকর্ম বুঝে নিয়েছে। খবর পেল ছাপ-মারা শিবিরের কাজ নাকি এখনো চলছে। বেশ বড় রকমের কয়েকটা ঝড়ে গরুর পাল ছন্নছাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই ছাপ মারার কাজ হয়েছে খুব ঢিমে তালে। দলটা এখন রয়েছে কুড়ি মাইল দূরে গুয়াদালুপের উপত্যকা এলাকায়।

হঠাৎ মনে পড়তেই রেইডলার বলে উঠল, 'ভাল কথা, ওদের সঙ্গে যে লোকটাকে পাঠিয়েছিলাম—ম্যা'গায়ার—সে কি এখনো কাজ করছে?'

ঈলারিও বললে, 'সে তো জানি না। শিবির থেকে লোক র‍্যাঞ্চে আসে খু-উ-ব কম। বাচ্চা বাছুরগুলোকে নিয়ে ওদের কত্তো কাজ। ওরা বলে না। ও হ্যাঁ, মনে হয় ম্যা'গায়ার লোকটা, সে তো অনেক দিন আগে মরে গেছে।'

'মরে গেছে! বলছ কি তুমি?'

কাঁধটা কুঁচকে ঈলারিও বলল, 'ম্যা'গায়ার, খুব ব্যারামী ছিল যে! আমার মনে হয় সে বেঁচে নেই, দু'মাস আগে সেই যে চলে গিয়েছিল—!'

'দুশ! তোমাকেও ধাপ্পা দিয়েছিল বড় কথা বলে? ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, সে মেস্কিটের গাঁটের মত পোক্ত।'

ঈলারিও হেসে বলল, 'ওই ডাক্তার, আপনাকে সেই রকম বলেছিল? তিনি ম্যা'গায়ারকে দেখলেন কোথায়? দেখেননি তো!'

'সব খুলে বলতো!' হুকুম দেয় রেইডলার, 'কী আজে বাজে বলতে চাইছ?'

শান্তভাবেই বলে চলে ছেলেটি, 'ম্যাগায়ার তো বাইরে গিয়েছিল জল খেতে,

যখন ডাক্তার কামরায় ঢুকলেন,' —বুকের ওপর হাত রেখে দেখায় ছেলেটা— 'আমি তো জানি না কিসের জন্য। উনি কান পাতলেন এখানে, আর এখানে, আর এখানে, আর শুনতে চাইলেন—কী তা তো জানি না। একটা কাঁচের কাঠি আমার মুখে পুরে দিলেন। আমার হাতটা এই এখানে ধরে থাকলেন। তারপর আমায় চাপা গলায় গুনতে বললেন—এই রকম কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশবার কে জানে।' —দু'হাত ত্রস্ত ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে শেষ করল ইলারিও 'কী জন্য ডাক্তারটি এই মন্তর পড়া'র মতো ভাঁড়ামি করলেন?'

সঙ্গেসঙ্গেই জিজ্ঞেস করল রেইড্লার, 'কোন্ কোন্ ঘোড়া জেগে আছে বল!'

'পাইসানো ঘাস খাচ্ছে, সিনর, ছোট খোঁয়াড়টার পেছনে।'

'ওটার খাবার বেঁধে দাও। শিগগির।'

সামান্য ক'মিনিটের মধ্যে খামারমালিক ঘোড়ায় চেপে বিদায় হল। পাইসানো তীরবেগে ছোটে লম্বা পা ফেলে, যেন গিলে ফেলে মাইলের পর মাইল রাস্তা। সওয়া দু'ঘন্টার মধ্যে রেইড্লার একটা মসৃণ টিলার ওপর থেকে দেখে ছাপমারার শিবিরটা, গুয়াদালুপের একটা জলাশয়ের ধারে। যে খবরটাকে ও ভয় করে সেটা এখন আশুপ্রত্যাশিত, ভেবে কাতর হয়ে পড়ে সে। ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সে নামল। পাইসানোর লাগাম ছেড়ে দিল। ওর মনটা এখন এত নরম হয়ে পড়েছে যে এই মুহূর্তে ম্যা'গায়ারের খুনের অপরাধও স্বীকার করে নিতে পারত। শিবিরেব মধ্যে একটা লোক রয়েছে রাঁধুনি. সে সবে মাংসের কাবাব সাজাতে লেগেছে, টিনের কাপ বসাচ্ছে রাত্রিভোজনের জন্য। রেইড্লার তাকে কোনো সিধে প্রশ্ন করতে চায় না মনের একমাত্র বিষয়টা নিয়ে।

কোনো রকমে জিজ্ঞেস করে, 'শিবিরের সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো. পিট? পিটও একটা মাঝামাঝি জবাব দেয়, 'এই আছে একরকম। দু'বার খাবার দেওয়া। ঝড়ে গরুগুলো ইতি-উতি ছড়িয়ে পড়ে। চল্লিশ মাইল অবধি ঝোপঝাড় ঢুঁড়তে হয়েছিল। একটা নতুন কফির কেতলি আমার চাই। আর কী মশারে বাবা! আগে এতটা দেখিনি।'

'ছেলেরা— সব ভাল আছে?'

পিট কখনো আশাবাদী নয়। তা ছাড়া ছাপ-মারা কাউবয়দের স্বাস্থ্য নিয়ে পুছতাছ শুধু বাড়াবাড়িই নয়, প্রায় মেয়েলি ধরনের নরম। কর্তাব্যক্তিরা কখনো এসব প্রশ্ন করবেন, আশা করা যায় না।

'যারা টিকে আছে তারা তো খাবারের ডাক পেলে ছুটে আসতে দেরি করে না।' —রাঁধুনি শুধু এইটুকুই বলে।

খস্‌খসে গলায় রেইড্লার পুনরুক্তি করে— 'যারা টিকে আছে? যন্ত্রচালিতের মতোই সে মাথা ঘুরিয়ে ম্যা'গায়ারের কবরটা খোঁজে। ওর মনের মধ্যে একটা ছবি আছে চ্যাপটা পাথরের, যা সে আলাবামার গির্জা-প্রাঙ্গনে দেখে এসেছিল।

কিন্তু তারপরেই বুঝল ব্যাপারটা মুর্খের মতো হল। অবশ্যই তারা ওর কবর কাঁটা-নাসপাতির ঝাড় দিয়ে ছেয়ে দিতে পারে, যাতে কয়োট্ নেকড়ে না আসে।

পিট বলে, 'বটেই তো, যারা এখনো আছে। গরুর শিবির প্রতি দু'মাসেই বদলাতে হয়। কেউ কেউ চলে গেছে।'

রেইডলার নিজের স্নায়ু শক্ত রাখে।

'ওই যে... ওই লোকটা ...যাকে আমি পাঠিয়েছিলাম—ম্যা'গায়ার..... সে কি—'

'বলছি,' বাগড়া দেয় পিট, দু'হাতে দুপ্রস্থ ভুট্টার রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে— 'নোংরা লজ্জার ব্যাপার হয়েছিল সেটা, ওইভাবে বেচারা অসুস্থ ছোকরাটাকে গরুর শিবিরে পাঠানো? যে ডাক্তার এটুকু বুঝতে পারে না তার রুগি কবরের দিকে পা বাড়িয়েছে তার তো ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। সেও হয়তো বুকের পাটা দেখিয়েছে—তবে বেইমানদের মধ্যে কলঙ্ক এটা। বলছি শুনুন কী করেছিল সে। শিবিরের পয়লা রাতে ছোকরারা তাকে চামড়ার ব্রিচেস্ পরা শেখাতে গেল। রস্ হার্জিস তার চামড়ার চোস্ত চাপারেজো ঘুরিয়ে ঘা কষাল তাকে—আর জানেন বেচারা কী করল? উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট কবুতরটা পিটিয়ে দিল রসকে। রস হার্জিস্‌কে ধরে মারল! বেশ উত্তমমধ্যম দিল তাকে। যথেষ্ট মার, আগাপাস্তালা শক্ত হাতে। রস খালি উঠে দাঁড়ায় আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে একেকটা নতুন জায়গায়।

'তারপর ওই ম্যা'গায়ার ওইখানে বেরিয়ে গিয়ে ঘাসের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকে, আর রক্ত উগরোতে থাকে। যাকে ওরা "হেম-রিজ" বলে। ঘড়ি ধরে আঠারো ঘণ্টা একভাবে পড়ে রইল সেখানে, তবু কেউ এক ইঞ্চি সরাতে পারল না ওকে। ওর চারদিকের ঘাস লাল হয়ে গেল। শেষ কালে রস্ হার্জিস্‌ই কাজে লেগে পড়ল— তাকে যে পেটাতে পারে রস্ তার কদর করে। গ্রীনল্যাণ্ড থেকে পোলাণ্ড চীনি সব বদ্যিদের শ্রাদ্ধ করল সে; তারপর সে গ্রীন ব্রাঞ্চের জনসন মিলে ম্যা'গায়ারকে একটা তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল, দুজন দুজনকে বোঝাল, আর তাকে কাঁচা মাংসের কোপ্তা সুপ আর হুইস্কি খাওয়াল।

'কিন্তু ও-বান্দার বোধহয় ভাল হয়ে ওঠার ইচ্ছাই ছিল না, কারণ ওরা পরে গিয়ে তার তাবুর মধ্যে খুঁজে পায় না তাকে, দেখে ঘাসের মধ্যে ঘাড় গুঁজে রয়েছে, আর ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছে। সে বলে, "যাও, যাও আমায় যেতে দাও, মরতে দাও যেভাবে আমার খুশি। বলেছে আমি নাকি জোচ্চোর মিথ্যেবাদী," —বলে ম্যা'গায়ার, আমি নাকি ব্যারামের ভান করছি। আমায় একা ছেড়ে দাও তোমরা।'

'দুটি হপ্তা,' বলে চলল রাঁধুনি, 'এদিকউদিক শুয়ে কাটাল, কেউ কিছু দেখে না কিছু না, এর মধ্যে—'

হঠাৎ যেন বাজ পড়ার আওয়াজ আকাশে, এক কুড়ি ঘোড়সওয়ার কদমচালে

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে শিবিরের হাতার মধ্যে।

পিট পড়ি-মরি করে সবদিকে ছুটতে থাকে আর চেঁচায় 'র‍্যাটেল সাপের ঝাড় এসে গেছেন এবার! ওদের আসা মানে তিন মিনিটের মধ্যে খাবার তৈরি না থাকলে আমার ফাঁসি।'

কিন্তু রেইডলারের নজর পড়ল শুধু একটি জিনিস। একটি বেঁটেখাটো, বাদামি-মুখ দেঁতো-হাসি ছোকরা একেবারে আগুনের আলোর সামনেই লাফিয়ে নামল ঘোড়ার জিন থেকে। ম্যা'গায়ার তো এ'রকম ছিল না, তবু—

পরের মুহূর্তেই পশুপালক তার হাত আর ঘাড় দু'হাতে চেপে ধরেছে।

'বাছা, বাছা. কেমন চলছে?' —এটুকুর বেশি আর মুখ থেকে বের হয় না রেইড্লারের।

ম্যা'গায়ার তার হাতের আঙুলগুলো যেন ইস্পাতের মুঠিতে চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে, তুমিই না বলেছিলে—মাটির কাছাকাছি? সেখানেই তো পেয়ে গেলাম স্বাস্থ্য আর শক্তি। সম্বিত এল, বুঝলাম কী শস্তার খেলা এতদিন দেখিয়ে চলেছি। বুড়ো দাদু, আমায় লাথি মেরে বের করে দিয়েছিলে বলে ধন্যবাদ। আর—বল! আসল তামাশা তো ওই বদ্যিটারই, তাই না? জানলা দিয়ে দেখি সে ওই দাগো ছোকরার পেটের নাড়ি টেপাটেপি করছে!'

পশুপালক ফুঁশে ওঠে—হতভাগা! আগে কেন মুখ খুলে বলোনি যে ডাক্তার তোমায় একেবারেই দেখেনি?'

ম্যা'গায়ার তার আগের সেই বদমেজাজ দেখিয়ে বলে, 'আঃ—যাও! কেউ আমায় ধোঁকা দিতে পারেনি। তুমিও তো জিজ্ঞেস করোনি একবার? নিজের গল্পই বানিয়ে চলেছিলে, আর আমায় ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিলে। আমিও আর ঝামেলা বানিয়ে বাড়াইনি। আর বুঝলে দোস্ত, এই গরু দাবড়ানোতেই আমার চোখ খুলে গেল। জীবনে যত খেল তামাশার পেছনে ঘুরেছি, এ নির্মল খেলার কোনো তুলনা দেখিনি। আমায় থাকতে দেবে তো বুড়ো দাদু, দেবে না?'

বেইড্লার প্রশ্নের চোখে তাকায় বস্ হার্জিসের দিকে।

বস্ হার্জিস নরম সুরে মন্তব্য জানায়, 'এ হতচ্ছাড়া বেঁটে-ষাঁড় মাথা গুঁতিয়ে ঢুকবেই,—তাছাড়া যে-কোনো গরুর শিবিরে এমন জবরদস্ত মারকুটে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।'

Hygeia at the Solito. এভ্‌রিবডি'স্, ১৯০৩

গ্রামাফোন ও ঘুষ

"ব্লুমফিল্ড-ক্যাটার" ম্যানুঃ কোম্পানির ইঞ্জিন-ঘরে উঁকি মেরে খুঁজলাম যাকে, সে হল ইঞ্জিনীয়র কিরস্কি। এই আধটা ঘন্টা অবসর, যখন সে স্টীম বন্ধ করে ধুয়ে মুছে পরিস্কাব হয়—ওই সময়টুকুর জন্যই আমি ব্যাকুল। কারণ কিরস্কি বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ—কাহিনীগুলো শুরু করে পেছন থেকে বাইরের দিকে, বলা-কথাগুলো আর বক্তব্য অপনা থেকেই যথাসম্ভব খাপ খেয়ে যায়।

দেখলাম কিরস্কি পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করছে, ঝুলকালি মাখা মুখ, নীল আংরাখা পরা।

বললাম, 'বিকেল তো আজ পরিষ্কার, তবে আরো ঠাণ্ডা পড়বে মনে হয়।'

স্বমর্যাদায় শুরু করে দেয় কিরস্কি—'তোমাকে কখনো বলেছি কি, যেবার একটা গ্রামাফোন নিয়ে আমি আর হেনরি-হর্সকলার দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলাম?' —গল্প শোনাব কৌশল খাটাতে গিয়ে লজ্জা পেলাম আমিই, ওর পায়ের ঠেলায় এগিয়ে-দেওয়া কাঠের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লাম।

'হেনরি ছিল তে-আঁশলা, চেরোকি ফুটবলদলের তেসরা ব্যাক: পূব অঞ্চলে তার ফুটবলের বুলিগুলো শেখা, আর পশ্চিমে শেখা নিষিদ্ধ হুইস্কি, তবে তোমার আমার মতোই ভদ্রমানুষ। চলাফেরায় সহজ, চটপটে, প্রায় প্রায় ছ'ফুট লম্বা, একরকম রবার-টায়ারের মতোই চালচলন। হ্যাঁ, পাঁচফুট-পাঁচের বেঁটে লোক, কিম্বা, পাঁচফুট সাতের। অথচ তোমরা তাকে বলতে পার একজন মাঝামাঝি লম্বা, গড়পরতায় খাটো লোক। হেনরি কলেজ ছেড়েছিল একবার, আর মাস্কোজি-জেল থেকে তিনবার—একবার রাজ্যের এলাকায় হুইস্কি আমদানি করতে গিয়ে, দু'বার তা বেচতে গিয়ে। হেনরি হর্সকলার কোনদিন সামনে শিখণ্ডী রেখে কোনো চুরুটের দোকানের মদত নেয়নি। ও-জাতের (রেড) ইণ্ডিয়ান ছিলই না সে।

'হেনরিতে-আমাতে দেখা টেক্সারকানায়, সেখানেই বসে আমরা এই গ্রামাফোনের পরিকল্পনাটা করি। ওর কাছে ছিল ৩৬০ ডলার, সরকার রক্ষিত জমির বাঁটোয়ারা থেকে পাওয়া। আমি পালিয়ে এসেছিলাম লিট্‌ল-রক থেকে, ওখানকার রাস্তায়, এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে। একটি লোক বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে শস্তায় সোনার ঘড়ি বিলিয়ে দিচ্ছে, প্যাঁচ-দেয়া কেস্, ডগায় বোঁটা ঘুরিয়ে দমের চাবি, দামি এল্‌গিন-ঘড়ির চাল, অতীব মনোহর। কাউন্টার থেকে কিনলে এর দাম কুড়ি ডলার। তিন ডলারে যাচ্ছে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভিড়। লোকটা কোথা থেকে সুবিধাজনক থলিভর্তি মান এনেছে, আর বিক্রি করছে থালাভর্তি গরম বিস্কুটের মতো। ঘড়ির পেছনের প্যাঁচ খোলা দুষ্কর, কিন্তু লোকে কেসের গায়ে কান রেখে শুনছে, চমৎকার মিঠে টিক্-টিক্ শব্দ। এগুলোর মধ্যে তিনটি শুধু খাঁটি টিক্-টিক্

ঘড়ি; বাকিগুলো শুধু চিড়িক্ মারা। অ্যাঁ ? কেন, ওগুলো তো সব খালি কেস; ভেতরে পোরা ওই যে কালো শিং-তোলা সব পোকা, যেগুলো বিজলি বাতির চারপাশে ঘোরে? ও পোকাগুলো সামনে সুন্দর ভাবে লাথি মেরে চলে মিনিটের পর মিনিট, সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড। তা যাহোক, লোকটা, যার কথা বলছি, —২৮৮ ডলার কামিয়ে সরে পড়ল, কারণ সে জানত আবার যখন লিট্‌লরকে ঘরিতে দম দেবার পালা আসবে তখন একজন পতঙ্গ বিজ্ঞানীকে ডাকতে হবে, আর সে তো পতঙ্গবিজ্ঞানী নয়!

'তাই, যা বলছিলাম, হেনরির ছিল ৩৬০ ডলার, আর আমার ২৮৮। দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রামাফোন নিয়ে যাবার মতলবটা হেনরিরই; তবে আমি ব্যাপারটাকে নিলাম মুক্ত মনে, যে কোনো ধরনের কলকব্‌জাই আমার ভাল লাগত।

'হেনরি তার কলেজে শেখা বুলিগুলো দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করে—"ল্যাটিন জাতের লোকগুলো গ্রামাফোনের শিকার হবার জন্য যেন বিশেষভাবেই মুখিয়ে আছে। ওদের সেই শিল্পীর মেজাজটা রয়েছে তো। ওরা গানবাজনা, রঙ্ আর আমোদের জন্য আঁকুপাকু করে। তাঁবুতে হাত-অর্গান বাজিয়ে আর চারপেয়ে মুরগির জন্য ওরা গলার রত্ন খুলে দেবে, ওদিকে হয়তো ঘরে অনটন অনশন তিন মাস ধরে।"

'আমি বলি, "তাহলে আমরা ল্যাটিনদের জন্য টিনে-ভরা সঙ্গীত রপ্তানি করতে পারি, যদিও মিঃ জুলিয়াস সীজার বলেছেন—"

'বিদ্যা জাহির করা আমি একেবারে অপচ্ছন্দ করি, তবু নেহাৎ একটা ইণ্ডিয়ানের কাছে বাক্যবিন্যাসে হেরে যাব তাও চাই না—ও জাতের লোকের কাছে আমরা তো কোনো ধারই ধারি না, শুধু এক দেশটি ছাড়া, যেখানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

'টেক্সারকানায় আমরা একটা চমৎকার গ্রামাফোন কিনলাম একেবারে বাজারের সেরা জিনিস—আর আধ ট্রাঙ্ক বোঝাই রেকর্ড। বাঁধাছাদা করে টি-এণ্ড-পির গাড়িতে চেপে চললাম নিউ অর্লিন্স। গুড় আর ভোটাধিকার বঞ্চিত নিগ্রো গানের ওই বিখ্যাত ঘাঁটি থেকে ধরলাম দক্ষিণ আমেরিকা যাবার স্টীমার।

'সলিটাসে নামলাম, তীর ধরে এখান থেকে চল্লিশ মাইল আরো ভেতরে। দেখতে বেশ তৃপ্তিকরই জায়গাটা। বাড়িগুলো পরিচ্ছন্ন, সাদা; প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে যেভাবে খাপ খেয়ে গেছে যে মনে হবে সবুজ লেটুস্‌শাকের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সেদ্ধ ডিম। বাইরের দিকে মাথা-তোলা বাড়ির মতো উঁচু একেকটা টিলা, সব বেশ চুপচাপ রয়েছে, যেন পা টিপে-টিপে ওখানে এসে তারা লক্ষ্য করেছে শহরটাকে। সমুদ্রও ডাঙায় আছড়ে পড়ছে 'শ্-শ্-শ্' বলে টিপ্‌পুনি কেটে। মাঝে-মধ্যেই একেকটা ঝুনো নারকোল বোঁটাশুদ্ধ খসে পড়ে বালিতে। এইসব দেখে বেড়ানোই কাজ। হ্যাঁ, বলব শহরটা বড় শান্তশিষ্ট ধরনেরই। অর্থাৎ আন্দাজ

করি, দেবদূতের ভেঁপুবাজি যখন শেষ হবে, মোটরগাড়ি চলতে শুরু করবে ফিলাডেলফিয়াকে পেছনে ফেলে, আর্কানসাসের পাইনগুলিকে আরো পেছনে ফেলে, তখন হয়তো শহর সলিটাস ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করবে- কারা যেন কিছু বলছিল?

'ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে ডাঙার দিকে চললেন. তাঁর ইচ্ছে তিনিই আমাদের হয়ে "সৌজন্য দেখানোর" কাজটা পরিচালনা করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের সঙ্গে হেনরি আর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কনসাল কটা-সাদা চেহারার লোক আর তার মাথার ওপরের সাইনবোর্ডটা অনুসারে "বাণিজ্য ও লাইসেন্স-প্রার্থী" বিভাগের কর্তা।

'ক্যাপ্টেন বললেন, "আজ থেকে ঠিক এক হপ্তা বাদে ফিরে আসছি জাহাজে"।

'আমরা বললাম, "ততদিনে আমরা বহু টাকা করে ফেলব আমাদের কলের সুন্দরীকে ভেতরের শহরগুলো ঘুরিয়ে—"

'ক্যাপ্টেন বললেন, "সে তোমরা পারবে না। তোমরাই মন্ত্রমুগ্ধ হবে। দর্শকদের কোনো ভদ্রলোক দয়া করে মঞ্চে উঠে যদি একবার এদেশের আসন চেহারা দেখেন তাহলে তাঁর ধারণা হবে তিনি পরম উপাদেয় সর পনিদের মধ্যে পতিত একটি মক্ষিকামাত্র। তারপর সমুদ্রের হাঁটু-ডোবা পাড়ে দাঁড়িয়ে তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর তোমাদের ওই কল যা এতকালেব সম্মানিত সঙ্গীত-কলা থেকে কোপ্তা-কাবাব বের করছে তা বাজাতে শুরু করবে—ও আমার দেশের মাটি।'

'হেনরি তার পকেট থেকে কুড়ি ডলারের নোট বের করে। "বাণিজ্য প্রার্থী" দপ্তর থেকে পায় একখানা কাগজ—লাল শিলমোহর, বাঁধা গতের নির্দেশ আর ফেরত দেবার খুচরো নেই জানিয়ে।

'এর পর আমরা কনসালকে পেট ঠেসে লাল মদ খাওয়ালাম, এবার বাজিয়ে দেখতে হয় আমাদের ভাগ্যটা: রোগা, অল্পবয়েসী গোছের মানুষ, আমার তবু ধারণা পঞ্চাশ হয়ে গেছে; মেজাজ ফরাসী-আইরিশ ধরনের, কোনো সান্ত্বনার অভাবে হাঁসফাস করছেন। হ্যাঁ, একটা নিঃশেষিত ধরনের লোক যার পেটে মদ পড়ে থাকে বদ্ধ জলার মতো, তাই ঝোঁকটা মোটা হওয়া আর দুঃখ পাওয়ার দিকে। হ্যাঁ, মনে হয় উনি ঠিক ডাচদের মতো, ভীষণ বিষণ্ন আর ব্যবহারে অমায়িক।

'বলতে লাগলেন, "ফেনোগ্রাফ নামের এই আশ্চর্য আবিষ্কারটা এখন অবধি এ মহাদেশের উপকূলে হানা দেয়নি। এখানকার বাসিন্দারা কখনো শোনেনি ওটা। শুনলেও কখনো বিশ্বাস করতে পারবে না বোধ হয়। প্রকৃতির সরল-হৃদয় সন্তান এরা, প্রগতির নামে একটা সামান্য টিন-খোলা যন্ত্রের উপহারও গ্রহণ করতে ওদের জোর করা যায়নি। হয়তো আধুনিক নাচের বাজনা ওদের উসকে দেবে খুনখারাবি বিদ্রোহে। তবে তোমরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পার। অবশ্য তোমরা

যখন বাজাচ্ছ তখনও হয়তো আম-জনতা জেগেই উঠবে না—সেই সম্ভাবনাটাই তোমাদের প্রবল। দু'ভাবে হতে পারে" —বললেন কনসাল—"দুভাবে তারা নিতে পারে। ওরা হয়তো মনোযোগ দিয়ে শুনতে-শুনতে বুঁদ হয়ে যেতে পারে, আটলান্টার কোনো কর্নেলের মতো 'জর্জিয়ার পথে চলেছি আমরা' শুনতে, নতুবা মাথা গরম করে কুড়োলে দিয়ে তোমাদের কল্লের আদা শ্রাদ্ধ করবে, আর তোমাদের পুরবে গারদে। দ্বিতীয় অবস্থাটা ঘটলে অবশ্য," বলেন কনসাল, "আমি আমার কর্তব্য করব রাষ্ট্র-বিভাগে তার পাঠিয়ে। আর তোমাদের গুলি খাবার অবস্থা হলে আমি তোমাদের 'তারা-ও-ডোরা' খচিত ঝাণ্ডা দিয়ে ঘিরে রাখব; আর ওদের ভয় দেখাব— দুনিয়ার বৃহত্তম সোন-রপ্তানি আর সঞ্চিত অর্থের দেশ কঠিন প্রতিশোধ নিতে পারে। এখন তো দেখছ এ-পতাকাটা বুলেটের ছেঁদায় ভরা,' বললেন কনসাল, 'এইভাবেই হয়েছিল। দু'দুবার। আমি আমার গভর্নমেন্টকে তার পাঠিয়ে বলেছিলাম দুটো গানবোট পাঠাতে, মার্কিন নাগরিকদের রক্ষার জন্য। তা, প্রথমবারে তো রাষ্ট্রবিভাগ আমায় এক জোড়া গামবুট পাঠালে। অন্য একবার, পীজ্ (মটরদানা) নামে লোকের এখানে ফাঁসি হতে যাচ্ছিল। ওরা প্রাণদণ্ড মুকুবের আবেদনটা পাঠিয়ে বসল কৃষি সচিবের কাছে। এবার 'বার'-এর সেনরটিকে একটু বিরক্ত করা যাক পরের খেপ লাল ওয়াইনের জন্য।"

'এইভাবে সলিটাসের কনসাল স্বগতোক্তি করে চললেন আমার আর হেনরির কাছে।'

'যাক, তা সত্ত্বেও সেদিন আমরা একটা কামড়া ভাড়া নিলাম কালে-ডি-লস্ এঞ্জেলিসে। প্রধান সড়ক যেটা সমুদ্রের ধার দিয়ে গিয়েছে, আমাদের বাক্সপত্র সেখানেই রাখলাম। মোটামুটি ভাল আকারের অন্ধকার আর তরতাজা কামরা, তবে একটু ছোট। নানান রাস্তার ওপর বিচিত্র ঘর আর বাছা-বাছা গাছের মধ্যে জায়গাটা। শহরের চাষী মানুষরা পাশেষর গলিরাস্তায় ইতস্তত চলাফেরা করে। যেন অপেরার সমবেত সঙ্গীত এখানে, একটু বাদেই মঞ্চে প্রবেশ করবে রাজকীয় আমাত্য।

'পরদিন আমরা মেশিনটার ধুলো ঝেড়ে তৈরি হচ্ছি কারবার শুরু করার জন্য। এমন সময় চমৎকার চেহারার এক বিরাটবপু সাদা-পোশক-পরা সাদা মানুষ দরজার সামনে দাঁড়ালেন, উঁকি দিলেন ভেতরে। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে তিনি ভিতরে ঢুকে আমাদের বেশ খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলেন। একটা লম্বা চুরুট দাঁতে কাটছেন, ভুরুদুটো কুঁচকে কিছু ভাবছেন, একটি মেয়ে যেমন পার্টিতে যাবার আগে কী পোশাক করবে তা নিয়ে ভাবে।

'অবশেষে আমায় প্রশ্ন করলেন— "নিউ ইয়র্ক?"

"মূলত, এবং মাঝেমধ্যেই," বলি আমি, "কেন, গা থেকে এখনো গন্ধ যায়নি বুঝি?"

"সোজা অনুমান," বল্লেন তিনি, "ওটা জানতে হয়। ভেস্ট কোটের ফিটিংটা

দেখ। অন্য কোনো জায়গায় এত ভাল হয় না। হ্যাঁ, কোট হতে পারে, কিন্তু ভেস্ট্ নয়।"

'সাদা মানুষ তাকালেন হেনরি হর্স্‌কলারের দিকে, একটু ইতস্তত করছেন।

'হেনরি বললে, "ইনজান্! নিরীহ ইনজান।"

'উনি জানালেন নিজের নাম—"মেলিঞ্জার, হোমার পি. মেলিঞ্জার। বন্ধুরা, তোমাদের মাল বাজেয়াপ্ত হল। তোমরা বনের মধ্যে কচি শিশুর মতো, অভিভাবক নেই, দায়িত্ব নেবার কেউ নেই। আমার কর্তব্য তোমাদের চালু করে দেয়া। খুঁটি সরিয়ে দিয়ে তোমাদের ঠিকঠাক ভাসিয়ে দেব এই গরম দেশের ঘোলা পানি ছেড়ে পরিষ্কার জলে। তোমাদের নামকরণ হবে, আমার সঙ্গে চলে এস। তোমাদের গলুইয়ের মাথায় একটা ওয়াইনের বোতল ভাঙব, হয়েলের নিয়মমাফিক।"

'যাক, দু'দিন ধরে তো চলল হোমার মেলিঞ্জারের সম্মান বিতরণ। লোকটার সত্যিই প্রতিপত্তি আছে আঙ্কুরিয়াতে। প্রায় সর্বেসর্বা, সর্বঘটে আছেন—রাজ-আমত্য বলতে তিনিই। আমি আর হেনরি যদি বনের মধ্যে হারানো শিশু হই, তাহলে উনি মগডালের রবিন-পাখিটি। উনি, আমি আর হেনরি—তিনজনে হাত ধরাধরি করে চারদিকে দেখিয়ে বেড়ালাম আমাদের গ্রামাফোন, মদ্যপান আর নানা মোচ্ছব করলাম। যেখানেই খোলা দরজা পাই, ঢুকে পড়ি ভেতরে, আর মেশিনটা চালাই। মেলিঞ্জার লোকজনকে ডেকে বলেন কলাসঙ্গীতের কলটা আর তাঁর দুই আজন্ম বন্ধু—আমেরিকানো সেনরদের—স্বচক্ষে দেখতে। শ্রদ্ধায় উদ্বেল হয়ে যাত্রার কোরাস্-দল আমাদের পেছন-পেছন সব বাড়ির দরজায় দরজায় যায়। প্রত্যেক ধরনের সুরের পরিবেশনে আলাদা-আলাদা ধরনের মদ পাওয়া যাচ্ছে। সুরাপানের ব্যাপারে এদেশীয়দের এক মনোরম রীতি, যার স্বাদ লেগে থাকে স্মৃতির কোঠায়। ওরা নারকেল-ডাবের এক মাথা কেটে ভেতরে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ফরাসী ব্রাণ্ডি আর অন্য প্রয়োজনীয় মশলাদি। ওগুলো তো খেতামই, আরো অনেক কিছু।

'আমার আর হেনরির টাকা অচল। সবকিছুই হোমার মেলিঞ্জারের ভরসায়। ভদ্রলোক জামার অন্ধিসন্ধি থেকে বের করতে পারেন নোটের তাড়া, জাদুকর হারমানও যেখান থেকে আস্ত ওমলেট বানাতে পারেন না। উনি ইচ্ছে করলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, তারপরেও যা বাঁচত তা দিয়ে নিজের দেশে অ-শ্বেতকায় ভোট কিনতে পারতেন। হেনরি আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম লোকটার উৎকোচের উৎসযা কোথায়? এক সন্ধ্যায় উনি নিজেই আমাদের বললেন।

'বললেন, "দেখ খোকারা, তোমাদের আমি ধাপ্পা দিয়েছি। রঙচঙে প্রজাপতি নই আমি, বরং বলতে পার এদেশের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। দশ বছর আগে এখানকার ডাঙায় নেমেছিলাম, দু'বছর আগে একেবারে চূড়ান্ত জায়গায়। হ্যাঁ ভাই, একবার চক্কর শেষ করেই এই পাঁচমিশেলি-পিঠের মতো লোকায়

দেশের বিষয় যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি বলে আমার ধারণা। তোমাদের কাছে গোপনে এসব বলতে পারি কারণ তোমরা আমার স্বদেশবাসী এবং অতিথি, যদিও তোমরা আমার গৃহীত দেশের ওপর হামলার অপরাধ করেছ তোমাদের ওই জঘন্য কলটা এনে, যাতে সঙ্গীতের নামে বিকট আওয়াজই শোনান হয়।

"আমার পদ হল এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের একান্ত-সচিবের পদ, আমার কর্তব্য এ-রাজ্যকে চালানো। বিজ্ঞাপনের শিরোনামায় আমাকে পাবে না, কিন্তু আমি রন্ধনের আসল মশলা। আইনসভায় কোনো প্রস্তাব উঠবে না, কোনো সরকারী অনুমোদনই হবে না, কোন আমদানি শুল্কই বসবে না—একমাত্র যতক্ষণ-না মেলিঞ্জার সাহেব সেটা রেঁধে, মশলা দিয়ে, পরখ করে দেখছেন। সামনের দপ্তরে আমি রাষ্ট্রপতির কলমদানি, দর্শনপ্রার্থী কূটনীতিকদের ডিনামাইট তল্লাশি করি। পেছনের কামরায় সরকারের নীতি নির্দেশ করি। দড়ির টান যে কোথা দিয়ে টের পাই তা তোমরা আন্দাজও করতে পারবে না। পৃথিবীতে এটাই এধরনের একমাত্র উৎকোচ। তোমাদের আরেকটু বুঝিয়ে বলি। মনে আছে তো সেই পুরনো 'নীতিকথা' বইয়ের মাথায় লেখা হত—"সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা"? ওইটেই। এ প্রজাতন্ত্রে আমিই একমাত্র সততাপরায়ণ মানুষ। সরকার সেটা জানে; প্রজারা জানে; ঘুষ-দাতারা জানে; বিদেশী বিনিয়োগকারীও জানে। আমি বাধ্য করি গভর্নমেন্টের বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে। একজন লোককে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে চাকরি তার হবেই। বাইরের পুঁজি যদি কোনো বিশেষ সুবিধা কিনে থাকে, তাহলে তারা মাল পাবেই। আমি এখানে ন্যায়সংগত আদান প্রদানের একচেটে ব্যবস্থা কায়েম রেখেছি। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কোনো কর্নেল যদি তার লণ্ঠনবাতির ইশারা দেখাতে চান এই চিহ্নিত এলাকায়, তাহলে তিনি দু'মিনিটেই পেয়ে যাবেন আমার ঠিকানা। এর মধ্যে বড় পয়সার খেলা কিছু নেই, কিন্তু একেবারে নিশ্চিত ব্যবস্থা, লোককে রাতের সুনিদ্রা দেয়।"

'এইভাবে একান্ত গোপনে হোমার মেলিঞ্জার আমার আর হেনরির সামনে বক্তৃতাটা দিলেন। তারপর একটা মন্তব্য করে নিজেকে সম্পূর্ণই মেলে ধরলেন:

"শোনো ভাইরা, আজ সন্ধ্যায় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে একটা সম্মেলন-উৎসব করছি, তোমাদেরও সাহায্য চাই। তোমরা গান-বাজনার ভূট্টাছাড়ানো কলটা এনো, বাইরে থেকে দেখাবে যেন ব্যাপারটা একটা অনুষ্ঠান গোছের কিছু। আসলে হাতে দরকারী কাজকর্ম আছে, কিন্তু সেটা যেন বাইরে দেখানো না হয়। আমি এসব তোমাদেরই বলতে পারি; বছরের পর বছর যন্ত্রণা সয়েছি কারুর কাছে জাঁক করতে পারিনি, গরম মেজাজ দেখাতে পারিনি বলে। মাঝে মাঝে দেশের জন্য কাতর হয়ে পড়ি, মনে হয় দপ্তরের এসব হাবিজাবির বদলে যদি এক ঘন্টার জন্যও নিউ ইয়র্কের তেত্রিশ নম্বর রাস্তার কোথাও একটু মাছের ডিমের স্যাণ্ডুইচ আর সাদা মদ পেতাম! কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম ট্রামগুলো চলে

যাচ্ছে, বুড়ো জিউসেপের ফলের দোকান থেকে বাদাম-মাখন সেঁকবার গন্ধ—"

"হ্যাঁ," বললাম আমি "চৌত্রিশ নম্বর রাস্তার কোণায় বিলি রেনফ্রোর কাফেতে তো সেরা মাছের ডিম—"

'মেলিঞ্জার বাগড়া দেন, "খোদা কসম্, তুমি যদি আগে বলতে বিলি রেনফ্রোকে চেনো, তাহলে কতো হাজার উপায়ে খুশি করতাম তোমাদের! নিউইয়র্কে বিলিই তো ছিল আমার ইয়ার দোস্ত। ওই একটা লোক যে কখনো ট্যারা কিছু বোঝে না। এখানে আমি সততা দেখিয়ে ঘুষ ধরি, আর সে ওতে নিজের লোকসান করে। দূর দূর। একেক সময় এদেশে মনের ধিক্কার এসে যায়। সব কিছুতে পচ ধরে গেছে। সরকারী কর্তা থেকে শুরু করে কফি-মজুর, সবাই মতলব আঁটছে এ-ওকে নিচে পেড়ে ফেলতে, বন্ধুদেরও চামড়া খুলে নিতে। যদি কোনো খচ্চরগাড়ির চালক কোনো সরকারী আমলাকে দেখে মাথার টুপি নামাল, তো এ-লোকটা মনে করবে সে দারুণ জনপ্রিয় নেতা, তারপর সে উঠে-পড়ে লাগবে একটা বিদ্রোহ বাধিয়ে শাসনযন্ত্রকে উল্টে দিতে। একান্ত-সচিব হিসেবে আমার একটা ছোট খাটো বেগারের কাজই হল এই সব বিদ্রোহের গন্ধ খুঁজে বের করা, মাথা তোলবার আগেই মাথা ভেঙে দেয়া, সরকারী সম্পত্তি থেকে রঙ আঁচড়ে তুলে ফেলা। এই ছাতা-পড়া উপকূল শহরটাতে তো এই কারণেই এসেছি। এ জেলার গভর্নর আর তার দলবল ষড়যন্ত্র করছে মাথা তুলতে। আমার কাছে ওদের প্রত্যেকটা লোকের নাম আছে, আর তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আজ রাতে গ্রামাফোন শুনতে, এইচ. পি. এম.-এর সৌজন্যে। এই হল সবগুলোকে দল বেঁধে ধরার সেরা উপায়, কর্মসূচীতে আর যা-যা আছে সবই তাদের কপালে জুটবে।"

'আমরা তিনজন "পবিত্র সাধু" কাফের ক্যান্টিনে বসে আছি। মেলিঞ্জার পাত্রে মদ ঢালছেন, আমার মনে হল যেন তাঁকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'খিটখিটে সুরে বললেন, "বড় ধূর্ত ওদের দলটা। ওদের পুঁজি জোগাচ্ছে একটা বিদেশী রবার শিল্পগোষ্ঠী, কণ্ঠা অবধি ওদের ঘুষে ঠাসা। আমার তো এই কমিক যাত্রা দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গেল। আমি চাই আবার নিউইয়র্কের ইস্ট নদীর গন্ধ পেতে, আবার ঢিলে প্যান্ট পরতে। একেক সময় ইচ্ছে হয় চাকরি ছেড়ে দি', কিন্তু আমি এমনই গাধা যে এর জন্য আবার গর্বও বোধ করি। ওরা সব বলে, "ওই দ্যাখ্ মেলিঞ্জারকে। ঈশ্বর দিবি! লক্ষ ডলার দিয়েও ওর নাগাল পাওয়া যায় না।" কোনদিন হয়তো আমার কীর্তির নথিটা নিয়ে ফিরে যাব আর দেখাব বিলি রেনফ্রোকে, এই আমার আশা; এই বিশ্বাসই আমার আঙুল শক্ত করে তোলে যখন দেখি মোটা মাল বাগাতে পারি একটা চোখ টিপলেই—তবু ছেড়ে দি' ঘুষের সুযোগ। সত্যি বলছি, আমাকে বোকা বানাবার মুরোদ ওদের নেই। ওরাও তা জানে। আমি সৎ পথে যা পাই তাই আমার উপার্জন আর

খরচ। একদিন বেশ কিছু জমিয়ে ফিরে যাব, বিলির সঙ্গে বসে মাছের ডিম খাব। আজ রাতে তোমাদের নমুনা দেখাব কীভাবে একদল ভ্রষ্টাচারীর সাজা দিই। আজ ওদের একান্ত-সচিব মেলিঙ্গার বললে কী বোঝায়, হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেব।"

'মেলিঙ্গারকে অস্থির দেখায়. বোতলের গলায় ঠুকে ওঁর গেলাস ভেঙে যায়।

'মনে মনে বলি, "সাদা মানুষ, যদি ভুল না বুঝে থাকি, একটা ভাল টোপ ফেলা হয়েছে কোথাও, যেটা তোমার আড়চোখের কোণে ধরা পড়ে গেছে।"

'সে-রাতে, ব্যবস্থামতো আমি আর হেনরি একটা নোংরা গলির রোদ-পাকা ইটের বাড়িতে নিয়ে যাই গ্রামাফোনটা। হাঁটু অবধি ঘাস সেখানে। লম্বা একটা কামরা, ধোঁয়া-ওঠা তেলের বাতিতে আলোকিত। প্রচুর চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে পেছনের প্রান্তে। আমরা টেবিলের ওপর গ্রামাফোনটা রাখি। মেলিঙ্গার সেখানে আছেন, এদিক ওদিক পায়চারি করছেন মনের ছটফটানিতে। কখনো চুরুটের গোড়া চিবুচ্ছেন. থু করে ফেলছেন. আবার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে কাটছেন।

'ক্রমে ক্রমে অভ্যাগতেরা আসতে লাগল সঙ্গীত শুনতে—জোড়ায় জোড়ায়, তিন তিন. ইস্কাপনের তেতাসে। তাদের বর্ণও বিচিত্র, তিনদিনের পোড়া পাইপের রঙ থেকে ঝকঝকে পেটেন্ট চামড়ার পালিশ। মোমের মতো বিনয়ে বিগলিত; গদগদ চিত্তে সেনর মেলিঙ্গারকে শুভসন্ধ্যা জানায়। আমি ওদের স্পেনীয় কথা ঠিকই বুঝেছিলাম—একটা মেক্সিকান রুপোর খনিতে দু'বছর পাম্প ইঞ্জিন চালিয়েছি তো. তাই চট করে ধরে ফেলি—তবে হ্যাঁ, সেটা জাহির করি না।

'হয়তো জনা-পঞ্চাশেক লোক এসেছিল। সবাই বসেছে, এমন সময় প্রবেশ করল রাজা মৌমাছি—জেলার গভর্নর। মেলিঙ্গার তাকে দরজার কাছে আপ্যায়ন করে. নিয়ে এলেন মঞ্চস্থলে। ল্যাটিন মানুষকে দেখেই বুঝে গেলাম মেলিঙ্গার. একান্ত-সচিব. তাঁর পুরো তুরুপের তাস খেলেছেন এবার। লোকটা মোটাসোটা, বিপুলাকার, রাবারের ওভার-শ্যু'র মতো রঙ, আর চোখজোড়া যেন হেড-খানসামার চোখের মতো।

'মেলিঙ্গার চোস্ত খাস-স্পেনীয় বাক্যবিন্যাসে ব্যাখ্যা করলেন—যে তাঁর হৃদয় আনন্দে উপচে পড়ছে আজ তাঁর মান্যগণ্য বন্ধুদের সামনে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটিকে উপস্থিত করতে পেরে—এ যুগের এক পরমাশ্চর্য! হেনরি ধরতাই বুঝে চালিয়ে দিল একটা চমৎকার পেতল-ঝঙ্কারের রেকর্ড, শুরু হল অনুষ্ঠান। গভর্নর লোকটার কিছু ইংরেজিজ্ঞান বোধহয় ছিল, বাজনার দম ফুরোতেই সে বলল: "ভারি সুন্দর। গের্-র্-রে-সিয়াস, আমেরিকান জেন্টলীমেন এমন এস্প্লেনডিড মুজিক বাজিয়ে শোনালেন।"

'টেবিলটা ছিল লম্বা. আর আমি ও হেনরি বসেছি দেয়ালের পাশ ঘেঁষে। গভর্নর বসেছে উল্টো প্রান্তে। হোমাব মেলিঙ্গার দাঁড়িয়ে ছিলেন টেবিলের এক

পাশে। আমি চিন্তিত হচ্ছিলাম মেলিঞ্জার কেমন করে এই দলটাকে সামলাবেন। এদেশের আপন প্রতিভাই সে পথ সুগম করে দিল হঠাৎ।

'বিদ্রোহ আর চক্রান্তের উপযুক্ত লোক ওই গভর্নরটি। ও হল এমন ঘুঘু যে তৈরিই থাকে, আর নিজের সময় নেয়। হ্যাঁ, সবাই ওর দিকে মনোযোগ দিয়েছে, ওর কাছাকাছি আসতে চাইছে। টেবিলের ওপর হাত রেখে ঝুঁকে সচিব মশাইদের দিকে মুখ বাড়িয়ে গভর্নর জিজ্ঞেস করল তার দেশীয় বুলিতে: "আমেরিকান সেনর-দু'জন কি স্পেনীয় ভাষা বোঝেন?'

'মেলিঞ্জার বললেন, "না, ওঁরা বোঝেন না।"

'কালবিলম্ব না করে ল্যাটিন লোকটা বলল, "তাহলে শুনুন, গানবাজনা তো খুব সুন্দরই, তবে ওটা প্রয়োজনের জিনিস নয়। আসুন বরং ব্যবসার কথা বলি। আমরা যে কেন এখানে এসেছি সে আমি ভালই জানি, কারণ আমি আমার সহযাত্রীদের ওপর নজর রাখি। আসলে গতকাল হয়তো কানাঘুষায় শুনেছেন, সেনর মেলিঞ্জার, আমাদের প্রস্তাবগুলোর কথা। আজ রাতে প্রকাশ্যেই বলব। আমরা জানি আপনি রাষ্ট্রপতির নেকনজরে আছেন, আপনার প্রতিপত্তির কথাও জানি। এ গভর্নমেন্টের বদল হবে। আপনার কর্মসেবার মূল্য আমরা বুঝি। আপনার বন্ধুত্ব ও সাহায্যের কদর আমরা এতটাই করি যে—" মেলিঞ্জার হাত তুলেছিলেন কিন্তু গভর্নর লোকটা তাঁর মুখ বন্ধ করে দিল—"আমি যতক্ষণ-না শেষ করছি, আপনি মুখ খুলবেন না।"

'গভর্নর লোকটা এবার পকেট থেকে কাগজে-জড়ানো একটা প্যাকেট বের করে, মেলিঞ্জারের হাতের পাশে টেবিলের ওপর রাখে। আবার বলে:

"ওর মধ্যে আপনার দেশের টাকায় এক শো হাজার ডলার পাবেন। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবেন না, কিন্তু আমাদের কাছে আপনার মূল্য অতটাই। রাজধানীতে ফিরে যান আর আমাদের নির্দেশগুলো পালন করুন। এখনই ওই টাকা নিন। আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি। ওর সঙ্গে একটা কাগজ পাবেন, তাতে বিশদভাবে দেয়া হয়েছে আমাদের প্রত্যাশিত কাজের ফিরিস্তি যা আপনি আমাদের জন্য করবেন। অস্বীকার করার মতো দুর্বুদ্ধি যেন আপনার না হয়।"

'গভর্নর থামল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেলিঞ্জারের দিকে, তার চোখে নানা অভিব্যক্তি আর পর্যবেক্ষণ। আমি মেলিঞ্জারের দিকে তাকাই, আর খুশি হই বিলি রেনফ্রো এই সময়টাতে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না বলে। ওঁর কপালে ঘাম ফুটছে, নির্বাক্ দাঁড়িয়ে আছেন, আর আঙুলের ডগা দিয়ে টোকা মারছেন প্যাকেটটাতে। ওঁর অসাধুতার জন্য মুখিয়ে আছে কলোরেডোর মাতুরো দুর্বৃত্তদল। ওঁকে শুধু ওঁর রাজনীতিটা বদলাতে হবে, আর কোটের ভেতরের পকেটে পুরতে হবে ছ'অঙ্কের মাল।

'হেনরি আমার কানে ফিসফিস করে জানতে চায় কর্মসূচীতে এই থেমে থাকার মানেটা কী হচ্ছে। আমি ফিসফিসিয়ে জবাব দিই: "এইচ. পি. ঘুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, 'সংসদ-সদস্য' মাপের ঘুষ, চতুর লোকগুলো ওঁকে খেলাচ্ছে।" দেখলাম মেলিঞ্জারের হাতটা প্যাকেটের দিকে এগোচ্ছে। ফের চাপা গলায় বললাম, "উনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন।" হেনরি বললে, "ওঁকে মনে করিয়ে দিই নিউইয়র্কের চৌত্রিশ-নম্বর রাস্তার বাদাম-রোস্টের কথা!"

'হেনরি নিচু হয়ে ঝুড়ির ভেতর থেকে একটা রেকর্ড বের করে ঠেলে দিল গ্রামাফোনে, চালিয়ে দিল মেশিন। একটা একক কর্ণেটের সুর, পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর, সুরটার নাম "আমার মিঠে দেশের ঘর।" কামরার পঞ্চাশ জন লোকের একজনও নড়ল না সঙ্গীত বাজার সময়; গভর্নরও নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে মেলিঞ্জারের দিকে। দেখলাম মেলিঞ্জারের মাথা একটু-একটু করে খাড়া হচ্ছে, প্যাকেটের কাছ থেকে সরে আসছে হাত। শেষ ধ্বনিটুকু বাজার আগে অবধি একটি লোকও নড়েনি। আর তারপরেই হোমার মেলিঞ্জার টাকার বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে সোজা ছুঁড়ে দিলেন গভর্নরের মুখের-ওপর।

'একান্ত-সচিব মেলিঞ্জার বললেন, "এই আমার জবাব। আর সকালে পাবে আরেকটা জবাব। তোমাদের প্রত্যেকটা লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে আমার কাছে। ভদ্রমহোদয়গণ, অনুষ্ঠান শেষ হল।"

'গভর্নর ফোঁরন কাটল, "আরেকটা অঙ্ক বাকি আছে। আমার বিশ্বাস আপনি একজন ভৃত্য মাত্র. রাষ্ট্রপতির নিয়োগ-করা কর্মচারী, যার কাজ চিঠির নকল করা আর দরজায় টোকার শব্দ হলে জবাব দেয়া। সেনরগণ, আমি এখানে গভর্নর, মহান্ উদ্দেশ্যের নামে আপনাদের আহ্বান করছি এই ব্যক্তিটিকে পাকড়াও করতে।"

'চক্রান্তকারীদেব ওই পাঁচমিশেলি দল তাদের চেয়ারগুলো পেছনে ঠেলে সবলে এগিয়ে আসে। আমি বুঝতে পারছিলাম কোথায় মেলিঞ্জার ভুলটা করেছে—মঞ্চে বাজনার আসর করে দুশমনদের দল পাকাবার সুবিধা করে দিয়েছে একদিকে। আমার মনে হয় আরেকটা ভুলও সে করেছিল, তবে সেটাকে অবহেলা করা যায়—অসাধুতা সম্পর্কে মেলিঞ্জারের ধারণা আর আমার ধারণায় তফাত আছে, অবশ্য যার যার দৃষ্টিভঙ্গি আর হিসেব মতো।

'কামরাটায় শুধু একটা জানলা আর একটাই দরজা—দুটোই সামনের দিকে। এদিকে জনা-পঞ্চাশ ল্যাটিন বাসিন্দা দল বেঁধে আসছে মেলিঞ্জারের আইন রোধ করতে। বলতে পার আমরা তিনজনই আছি, কারণ আমি আর হেনরি একসঙ্গেই ঘোষণা করেছি—নিউইয়র্ক শহর আর চেরোকি জাত দুর্বলতার শক্তির পক্ষে সহানুভূতিশীল।

'আর ঠিক এই সময় হেনরি হর্স্‌কলার উঠল বিশৃঙ্খলার ফয়সালা করতে।সে

মাথা গলিয়ে দেখাল তার প্রশংসনীয় শিক্ষার উচ্চমান—আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর স্বজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা মিললে যেমন হয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার দু'পাশের চুল দু'হাতে বেশ পাট করে নিল—ছোট মেয়েদের যেমন খেলবার সময় করতে দেখ।

'হেনরি বললে, "এবার এসো তো আমার পেছনে, তোমরা দু'জনেই।"

'আমি জিজ্ঞেস করি, "কী করতে যাচ্ছ তুমি?"

'হেনরি তার ফুটবলের লব্‌জে বলল, "এবার আমি সেন্টার দিয়ে টুঁ মারছি। ও'দের কারুর মধ্যে ট্যাক্‌ল করার ক্ষমতা নেই। একেবারে আমার পেছনে ঘেঁষে থাকবে আর ছুটবে সামনে।"

'শিক্ষিত লাল মানুষটা এবার তার মুখ দিয়ে এমন ধরনের বিচিত্র আওয়াজ করে উঠল যে থম্‌কে গেল ল্যাটিন দঙ্গল, ভাবতে আর ইতস্তত করতে লাগল তারা। হেনরির অদ্ভুত আহ্বানটা বোধহয় চেরোকি কলেজের চিৎকার আর কার্লাইল যুদ্ধনাদের মাঝামাঝি কিছু। খয়েরি রঙের 'চকোলেট' দলের দিকে সে নিগ্রো বালকের ফিঙে ছোঁড়ার মতো ছুটেছে। ওর ডান হাতের কনুই গভর্নরকে ফেলে দিল ময়দানের সীমায়, গোটা ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এমন একটা গলি বানিয়ে ফেলল, যে একজন মহিলাও বোধ হয় তার মাঝখান দিয়ে কিছুতে ধাক্কা না মেরে একটা সিঁড়ি-মই টেনে নিয়ে যেতে পারত! ওকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার আর মেলিঞ্জারের কিছু করার নেই।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলাম ওই রাস্তা থেকে, পৌঁছোলাম মিলিটারির সদর ছাউনিতে। সেখানে মেলিঞ্জারের নিজস্ব বন্দোবস্ত।

'পরদিন মেলিঞ্জার আমাকে আর হেনরিকে ডেকে নিলেন একদিকে। দশ-ডলার কুড়ি-ডলারের সব নোট বের করছেন। বললেন, "ওই ফোনোগ্রাফটা কিনতে চাই। শেষ সুরটুকু আমার বড় ভাল লেগেছিল। এবার তোমরা ভাল ছেলের মতো ঘরে ফিরে যাও, কারণ যতক্ষণ-না ওদের ওপর ইস্‌ক্রুপ আঁটতে পারছি তোমাদের ওরা জ্বালাতন করবে। বিলি রেনফ্রোর সঙ্গে আবার যদি দেখা হয় তাকে বলবে আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে আসছি—যখনই কিছু মোটা পয়সা পাব, সৎ ভাবে।"

'আমি বলি, "মেশিনটার যা মূল্য তার চেয়ে এ তো অনেক বেশি টাকা।"

'বললেন, "এ হল সরকারের খরচার টাকা, আর সরকার এ সুর-মাড়াই কলটা শস্তাতেই পাচ্ছে।"

হেনরি আর আমি সেটা বুঝলাম, কিন্তু হোমার পি. মেলিঞ্জারকে কখনোই জানতে দিইনি যে আমরা দেখেছি উৎকোচ হারাবার কত কাছাকাছি অবস্থা হয়েছিল তাঁর!

'স্টীমার ফিরে আসার দিন অবধি চুপচাপ মাথা গুঁজে রইলাম আমরা। সমুদ্রের

তটে ক্যাপ্টেনের বোটটা দেখে আমি আর হেনরি নিচে নেমে জলের কিনারায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন আমাদের দেখে একগাল হেসে বললেন, "বলেছিলাম না তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে? হামবুর্গার-কোণ্ডার মেশিনটা কোথায় গেল?"

বললাম, "ওটা পেছনে রয়ে গেছে 'আমার মিঠে দেশের ঘর' বাজাতে।"

'ক্যাপ্টেন আবার বললেন, "বলেছিলাম তো সেটাও। এবার বোটে উঠে পড়।"

'আর এই ভাবেই আমি আর হেনরি হর্স্‌কেলার দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি ল্যাটিন দেশে হাজির করেছিলাম গ্রামাফোন যন্ত্র।'

The Phnograph and the Graft. ম্যাকক্লিওর, ১৯০৩

নারীটির সন্ধান করো

'পিকায়ুনের' রিপোর্টার রবিন্স, আর 'লাবাইয়ে' সংবাদপত্রের দুমার, পরস্পরের সৎ বন্ধু—বহু বছরের উত্থান-পতনের মধ্যে তা প্রমাণিত। দুমারের সাবেকি ফরাসী কাগজটা প্রায় একশো বছর ধরে নানা হৈ-চৈ করেছে। দুমেইন স্ট্রীটে যেখানে ওরা বরাবর আড্ডা দেয়—মাদাম তিবো'র ছোট্ট ক্রিওল-অধ্যুষিত কাফে—সেখানেই বসেছে দু'জন। যদি জায়গাটা জানা থাকে আপনার, তা'হলে সেটাকে স্মরণ করেই রোমাঞ্চ অনুভব করবেন। একেবারে ছোট আর অন্ধকার, ছ'খানা ছোট পালিশ-করা টেবিল। ওখানে বসে আপনি নিউ অর্লিয়েন্সের সেরা কফি খেতে পারবেন, আর আবসিন্থে-মেশানো পানীয় যা পাবেন তা 'সাজেরাকের' সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়ের বরাবর। স্থূলবপু মাদাম তিবো প্রশ্রয়দাত্রী, ডেস্কে বসে আধিপত্য দেখান আর খদ্দেরের টাকা বুঝে নেন। মাদামের দুই ভাইজি নিকোলেৎ আর মেমে—তারা মনোহর বুক-ঢাকা এপ্রন পরে ঈপ্সিত পানীয়গুলি পরিবেশন করে।

খাঁটি ক্রিওলী কায়দায় দুমার আবসিন্থের পাত্রে চুমুক দেয়, চোখ আধবোজা ক'রে, এক রাশ সিগারেট-ধোঁয়ার মাঝখানে। রবিন্স চোখ বুলোচ্ছিল আজ সকালের 'পিক্' ম্যাগাজিনে। তরুণ রিপোর্টাররা যা করে— খুঁটিয়ে ভুল বের করবার চেষ্টা করছে কাগজের মুদ্রণ-বিন্যাসে, তার সহযোগীরা সম্পাদকের কলম থেকে কতটা রেহাই পেয়েছে, এই সব। বিজ্ঞাপন-কলমের এই অংশটা হঠাৎ ওর নজর টানে, উচ্চকিত আগ্রহে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ও বন্ধুকে জোরে-জোরে পড়ে শোনায়:

"প্রকাশ্য নিলাম—আজ বৈকালে 'লিট্‌ল সিস্টারস অব্ সামারিয়ার' সমুদয় সাধারণ সম্পত্তি, বনোমি স্ট্রীটের সিস্টার-সংঘের গৃহেই সর্বোচ্চ দর-দাতার নিকট

বিক্রয় করা হইবে। এই বিক্রয়ে বিনা-ব্যতিক্রমে বাড়ি, জমি, গৃহ এবং উপাসনাকক্ষের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।"

নোটিশটা পড়ে দুই বন্ধুর মনেই জেগে উঠল প্রায় দু'বছর আগেকার স্মৃতি—ওদের সাংবাদিক পেশার জীবনে এক সময় যা ঘটেছিল সেই অধ্যায়টি মনে করে ওরা আলোচনায় বসে। ঘটনাগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবে, আবার পুরনো তত্ত্বগুলো খতিয়ে দেখে, সময়ের প্রভাবে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকেই আলোচনার মোড় ঘোরে।

কাফেতে আর কোন খদ্দের নেই। মাদাদের তীক্ষ্ণ কান শুনতে পেয়েছে ওদের আলোচনার ধারা। তিনি উঠে এলেন ওদের টেবিলে। কারণ এসব ঘটনাচক্র চালু হবার মূলে তো ওঁর সেই হারানো টাকাটাই ছিল, তাই নয় কি? ওঁর সেই উধাও হয়ে-যাওয়া কুড়ি হাজার ডলার?

ওরা তিনজন আবার দীর্ঘ দিনের পরিত্যক্ত রহস্য নিয়ে বসে, পুরনো কাসুন্দি নতুন করে ঘাঁটে। লিট্‌ল সিস্টার্স অব্ সামারিয়ার এই বাড়িটির উপাসনাকক্ষে দাঁড়িয়েই তো রবিন্স আর দুমার দেখেছিল কুমারী মেরীর সোনার গড়া মূর্তিটা? ওদের সেই কৌতূহলী আর নিষ্ফল সংবাদ-সন্ধানের অভিযান কালে?

মাদাম মোদ্দা কথাটা জানালেন, 'শোনো ভায়েরা, এই হল ব্যাপার। ওই মসিয়ে মোর‍্যাঁ, ভারি বজ্জাত লোক। সবাই নিশ্চয় করে বলবে আমি যে-টাকাগুলো ওঁর হাতে গচ্ছিত রেখেছিলাম তা উনি মেরে দিয়েছেন। হ্যাঁ। টাকাটা তো তাঁকে কোনো-না-কোনো ভাবে খরচ করতেই হত।' —দুমারের দিকে একটা চওড়া দরাজ হাসি দিলেন মাদাম, 'আমি তোমায় বুঝেছিলাম, মসিয়ে দুমার, সেই দিনগুলোতে তুমি যখন আমায় বলতে মসিয়ে মোর‍্যাঁ সম্পর্কে যা-কিছু জানি সব জানাবার জন্য। ও হ্যাঁ! আমি জানি বেশির ভাগ সময় যখন এইসব জাতের মানুষরা টাকা খোয়ায়, তোমরা বল: 'মেয়েমানুষটাকে খুঁজে বের কর'—কোনো মেয়েছেলে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। না, মসিয়ে মোর‍্যাঁর বেলায় কিন্তু তা নয়। না ভাই। মরার আগে পর্যন্ত উনি সাধুই থেকে গেলেন। মসিয়ে দুমার, তোমরা বরং ওই কুমারী মেরীর মূর্তির মধ্যে খুঁজে দেখ, টাকাটা পাও কিনা। কোনো একজন মহিলাকে খুঁজে বের করতে হলে কচি সিস্টারদের দেওয়া মসিয়ে মোর‍্যাঁর ওই উপহার-মূর্তির মধ্যেই তাকে পাবে।'

মাদাম তিবোর শেষ কথাগুলোয় রবিন্স একটু চমকে ওঠে, আর তীক্ষ্ণ আড়চোখে তাকায় দুমারের দিকে। ক্রিওল তখনো অনড় বলে সিগারেটের পাকানো ধোঁয়া দেখছে আধঘুম চোখে।

তখন সকাল ন'টা, আর ক'মিনিট বাদে দু'জন বন্ধু আলাদা হয়ে নিজের-নিজের রাস্তায় চলে যায় প্রাত্যহিক কাজে। এবার তা'হলে বলা যাক্ মাদাম তিবোর উপে-যাওয়া হাজার হাজার ডলারের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটা।

* * *

নিউঅর্লিয়ন্সের বাসিন্দাদের অতি সহজেই মনে পড়ে যাবে সে-শহরে মিঃ গ্যাসপার মোর্‍্যাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর কথা। মিঃ মোর্‍্যাঁ ছিলেন পুরনো ফরাসী এলাকার কলাকুশলীর স্বর্ণকার ও জহুরি। অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। প্রাচীনতম ফরাসী পরিবারের মানুষ, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসে বেশ কিছু দখল ছিল। ব্রহ্মচারী মানুষ, প্রায় পঞ্চাশ বয়েস তখন। রয়াল স্ট্রীটের পুরনো আবাসগৃহগুলোর একটাতে বাস করতেন নির্ঝঞ্ঝাট আরামে। একদিন সকালে তাঁকে তাঁর ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল অজ্ঞাত কারণে মৃত অবস্থায়।

তাঁর সমস্ত বিষয়-আশয় যখন পরীক্ষা করা হল দেখা গেল তিনি বাস্তবেই অসচ্ছল; তাঁর মালপত্রের সঞ্চয় আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনো রকমে ধারদস্তরগুলো মেটাতে পারে, এইমাত্র—তবে কোনো অভিযোগেব দায় থেকে বাঁচাতে পারার মতো যথেষ্ট। এর পরেই এল একটা উদ্‌ঘাটন: ওঁর কাছে নাকি কুড়ি হাজাব ডলার গচ্ছিত রেখেছিলেন মোর্‍্যাঁ পরিবারের একজন প্রাক্তন উচ্চবর্গীয় পরিচারিকা, কোনো এক মাদাম তিবো। মাদাম সে অর্থ পেয়েছিলেন ফ্রান্সের আত্মীয়দের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে।

বন্ধুদের আর আইনের কর্তাদের শত অনুসন্ধানেও কিন্তু সে-অর্থের হাল-হদিশ পাওয়া গেল না। বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে, কোনো সূত্রই কোথাও রাখেনি! মারা যাবার কয়েক সপ্তাহ আগে মিঃ মোর্‍্যাঁ যে ব্যাঙ্কে-টাকাটা রেখেছিলেন সেখান থেকে পুরো অঙ্কটাই তুলে নেন সোনার মুদ্রায়। মাদাম তিবোকে বলেছিলেন উনি নাকি সে-টাকার নিরাপদ কোনো বিনিয়োগের সুযোগ দেখছেন। অতএব, মিঃ মোর্‍্যাঁর স্মৃতি, মনে হল, অবধারিতভাবেই কালিমালিপ্ত হতে চলেছে অসততার দায়ে। আর এদিকে মাদামের অবস্থা সান্ত্বনার অতীত।

আর ঠিক এমনই সময় রবিন্স আর দুমার্‌ তাদের নিজ নিজ কাগজের প্রতিনিধি হিসেবে শুরু করল তাদের নাছোড়বান্দা ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, যে পদ্ধতি পরবর্তীকালে পত্রিকাজগৎ গ্রহণ করেছে তাদের গৌরব বাড়াতে, আর পাঠকবর্গের কৌতূহল মেটাতে।

দুমার বললে, 'নারীটির সন্ধান করো।'

রবিন্স একমত—'হ্যাঁ, ওটাই তো প্রবেশপত্র! সমস্ত পথ গিয়ে মেলে চিরন্তনী নারীতে। আমরা আবিষ্কার করব তাকে।'

মিঃ মোর্‍্যাঁর আবাসবাড়ির সমস্ত কর্মচারী, বেল-বয় মালিক অবধি সকলেরই ঘটনা অবগতি জ্ঞান শেষ অবধি তলিয়ে দেখে ওরা। মৃদু অথচ অনমনীয়ভাবে ওরা মৃতের পরিবারপরিজনকে—এমননি দূর-সম্পর্কের তুতো-ভাইবোন অবধি—জেরা করল। কৌশলে প্রয়াত স্বর্ণকারের কর্মচারীদের বাজিয়ে দেখল, তাঁর আচার-অভ্যাসের তথ্য জানতে খদ্দেরদের বাড়ি অবধি ধাওয়া করল। কল্পিত

নিঃসম্বল ব্যক্তিটি এতকাল ধরে যে বাঁধাধরা একঘেয়ে রাস্তায় চলতেন তার প্রতিটি পদ ওরা ব্লডহাউণ্ড কুকুরের মতো শুঁকে শুঁকে দেখল, যতটা সম্ভব।

ওদের সব পরিশ্রমের পরও মিঃ মোর্ঁয়া অকলঙ্কস্পর্শিত হয়েই দাঁড়িয়ে থাকলেন। সমান্যতম দুর্বল স্থানটুকুও খুঁজে পাওয়া গেল না যেটাকে অপরাধমূলক ঝোঁকের লক্ষণ বলা চলে, সচ্চরিত্রতা থেকে সামানাতম পদস্খলনও নয়, নারী সম্পর্কে পক্ষপাতের কোনো ইঙ্গিতই নয়। ওঁর ঘাটতির দিকে এসব কিছুই নেই। ওঁর জীবন মঠবাসী সন্ন্যাসীর মতোই শৃঙ্খলাবদ্ধ কঠোর, যার আচার-আচরণ সরল, উন্মুক্ত। যারা ওঁকে দেখেছে বা জেনেছে সকলেরই রায় হল উনি বদান্য, দিলদরিয়া, শোভনতার আদর্শ।

রবিন্স তার শূন্য নোটবুকটা নেড়ে চেড়ে বলে—'এবাব তাহলে কী?'

'নারীটির সন্ধান করো,' একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বলে দুমার, "লেডি বেলেয়ার্স"—চেষ্টা করে দেখ।

এই "লেডি"টি হল মরশুমের ঘোড়দৌড়ে একটা জনপ্রিয় ঘোড়া। ঘোড়া বলতে ঘুড়ি, তাই চলাফেরায় একটু এলোমেলো; শহরে বেশ ক'জন মোটা লোকসান করেছেন ওটার প্রতি অহেতুম বিশ্বাস রেখে। রিপোর্টার দু'জন খোঁজখবর করতে যায়।

মিঃ মোর্ঁয়া? নিশ্চয়ই নয়। ঘোড়দৌড়ের দর্শক হিসেবেও কখনো আসেননি। ও ধরনের মানুষই ছিলেন না। ওরা যে জিজ্ঞেস করছে তাতেই তারা তাজ্জব!

রবিন্স প্রস্তাব দেয়—'তাহলে হাল ছেড়ে দিই? ধাঁধা বিভাগের ওরা বরং এসে চেষ্টা করুক?'

গুনগুন করে দুমার বলে, 'নারীটির সন্ধান করো।' হাত বাড়ায় ম্যাচ্‌বাক্সের দিকে—'ওই লিট্‌ল সিস্টারস্ না কী বলে, ওখানে চেষ্টা করো।'

তদন্তকালে প্রকাশ পেল, মিঃ মোর্ঁয়া এই পরোপকারব্রতী সংঘটিকে বিশেষ পক্ষপাত দেখাতেন। এর রক্ষণাবেক্ষনের জন্য উদারহস্তে অনুদান দিতেন, আর এর উপাসনাকক্ষটিকে তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনার প্রিয় স্থান করে নিয়েছিলেন। বলা হয় তিনি নাকি প্রতিদিনই সেখানে যেতেন, বেদীমূলে তাঁর ভক্তি উৎসর্গ করতে। বাস্তবপক্ষে, জীবনের শেষ ভাগে তাঁর সমস্ত ধ্যানজ্ঞানই যেন সংহত হয়েছিল ধর্মীয় বিষয়ের ওপর, ফলে হয়তো ক্ষতি হচ্ছিল তাঁর বৈষয়িক ব্যাপারে।

ওখানেই গেল রবিন্স আর দুমার। বনোম স্ট্রীটের দিকে ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে আছে শূন্যা পাথরের দেয়াল, তারই সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হল তাদের। একটি বুড়ি উপসনালয়ের মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছিল। সে ওদের জানাল, সংঘের প্রধানা সিস্টার ফেলিসিটে এখন নিভৃত কুঠরিতে বেদির সামনে প্রার্থনায় বসেছেন। একটু বাদেই উনি বেড়িয়ে আসবেন। কুঠুরির সামনে ভারী, কালো পর্দা ঝুলছে। ওরা সবুর করতে লাগল।

অবিলম্বে নড়ে উঠল পর্দা, বাইরে বেরিয়ে এলেন সিস্টার ফেলিসিটে। সাদাসিধে চেহারার দীর্ঘাঙ্গী, বিষণ্ণ, কৃশকায় মানুষ, পরেছেন কালো গাউন আর সিস্টার গোষ্ঠীর কঠোব মাথা-ঢাকা আবরণ।

ববিন্স মার্জিত-কেতার স্পর্শবর্জিত হলেও প্রতিবেদক হিসেবে মোটাদাগের আগু-বাড়ানো লোক। কথা বলতে শুরু করে ও-ই।

ওরা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। মহিলা নিঃসন্দেহেই মোর্‍্যাঁর বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। ওই ভদ্রব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সুবিচারের তাগিদেই প্রয়োজন হারানো অর্থের রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান করার। এটা জানা আছে যে তিনি প্রায়ই এই উপাসনালয়ে আসতেন। এখন মিঃ মোর্‍্যাঁর অভ্যাস, রুচি, তাঁর বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো তথ্য পেলে তা মূল্যবান হবে, তাঁর প্রতি মরণোত্তর সুবিচার সম্ভব হবে।

সিস্টার ফেলিসিটে শুনলেন। যতটুকু তিনি জানতেন তা আগ্রহ সহকারেই বলা হবে। কিন্তু সে তো বড়ো সামান্য। সংঘের এক সৎ বন্ধু ছিলেন মঁসিয়ে মোর্‍্যাঁ, একেক সময় একশো ডলারও চাঁদা দিয়েছেন। সিস্টার-সংঘ স্বাধীন সংস্থা, পরহিতকারী কাজ চালাবার জন্য পুরোপুরিই নির্ভর করে ব্যক্তিগত অনুদানের ওপর। মিঃ মোর্‍্যাঁ উপাসনালয়কে রূপোর মোমদানি, বেদির ঢাকনা উপহার দিয়েছিলেন। রোজই সেখানে উপাসনা করতে আসতেন, একেক সময় ঘন্টাভর বসতেন। পবিত্রতায় দীক্ষিত ভক্ত ক্যাথলিক ছিলেন তিনি। হ্যাঁ, আর নিভৃত কুঠরিতে কুমারী মেরীর একটা মূর্তি আছে, যেটা তিনি নিজেই গড়েছিলেন, ছাঁচ তুলেছিলেন, সংঘকে উপহার দিয়েছিলেন। আহা, এমন এক দেবতুল্য মানুষের উপর সন্দেহ করা যে কত্ত নিষ্ঠুর কাজ!

ববিন্সও এই দোষারোপে গভীরভাবে পীড়িত। কিন্তু যতক্ষণ না মাদাম তিবোর অর্থ নিয়ে মিঃ মোর্‍্যাঁ কী করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে, অপযশের জিভ ততক্ষণ স্তব্ধ হবে না বলেই ওর ভয়। একেক সময়—প্রকৃতপক্ষে প্রায়শই—এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে জড়িয়ে থাকে—ইয়ে...যেমন চলিত কথায়...কোনো মহিলা। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে, এখন যদি....হয়তো—

সিস্টার ফেলিসিটের বড়-বড় চোখদুটো গম্ভীরভাবে যাচাই করে ওকে।

ধীরে ধীরে বলেন, 'একজন নারী তো ছিলেনই, যার সামনে উনি মাথা নোয়াতেন—যাকে নিজের হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন।

রবিন্স উল্লসিতভাবে তার পেন্সিল খোঁজে।

হঠাৎ আবেগঘন কণ্ঠে সিস্টার ফেলিসিটে বলেন, 'দেখুন সেই মহিলাকে!' তিনি দীর্ঘায়িত বাহু দিয়ে সরিয়ে ধরলেন কুঠুরির পর্দা। ভেতরে একটি পূতপবিত্র স্থল, রঙিন কাচের শার্সি দিয়ে আলো এসে মৃদু বর্ণশোভিত। শূন্য দেয়ালের গায়ে গভীর কুলুঙ্গির ভেতর দাঁড়িয়ে আছে এক কুমারী মেরী মূর্তি, খাঁটি সোনার রঙ।

দুমার একজন নিয়মপন্থী ক্যাথলিক, ঘটনার নাটকীয়তা তাকে মুগ্ধ করেছে। মুহূর্তের জন্য পাথরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে সে বুকে ক্রুসচিহ্ন আঁকে। কিছুটা লজ্জিত রবিন্স, বিড়বিড় করে অস্পষ্ট ক্ষমা চেয়ে, আনাড়ির মতো পেছু হটে আসে। সিস্টার ফেলিসিটে পর্দা টেনে দেন। রিপোর্টাররা বিদায় নেয়।

বনোমি স্ট্রীটের সরু ফুটপাতে উঠে রবিন্স ফিরে তাকাল দুমারের দিকে। অশোভন ব্যাঙ্গের সুরে বলল—'এবার তা'হলে, নারীটির অনুসন্ধান?'

'আবসিল্থে', —জবাব দিল দুমার।

হারানো টাকার ইতিহাসটা আংশিকভাবে বলার পর এবার হয়তো কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে—মাদাম তিবোর কথায় হঠাৎ কোন্ ধারণাটা গজিয়ে উঠেছিল রবিন্সের মস্তিষ্কে।

এটা অনুমান করলে কি আষাঢ়ে কল্পনা হবে যে ধর্মবিষয়ে গোঁড়া ভক্তটি তাঁর সম্পত্তি উজার করে দিয়েছিলেন (কিংবা বলা যায় মাদাম তিবোর সম্পদ)—তাঁর উগ্র অপচয়ী ভক্তির এক বস্তুগত প্রতীক মূর্তির মধ্যে? পূজার নামে এর চেয়েও অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে। এটা কি সম্ভব নয় যে ওই হাজার-হাজার স্বর্ণমুদ্রা গালিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ঝক্‌কমে মূর্তিটা? স্বর্ণকার খাঁটি মূল্যবান ধাতু দিয়ে গড়েছিলেন ওটা, ওইখানে বসিয়েছিলেন, হয়তো কোনো বিশৃঙ্খল মস্তিকের প্রেরণায় যে ওটা দেবতাদের খুশি করে তাঁর নিজের স্বার্থপর গৌরব বাড়িয়ে দেবে—এ কি হতে পারে না?

সেদিন বিকেলে তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট থাকতে রবিন্স 'লিট্‌ল সিস্টারস অব সামারিয়া'র উপাসনালয়ের দরজা দিয়ে ঢুকল। অল্প আলোর মধ্যে দেখল প্রায় একশো মানুষ ভিড় জমিয়েছে নিলামের বিক্রি দেখতে। ওদের বেশির ভাগই বিভিন্ন ধর্মীয়া গোষ্ঠীর, পুরোহিত বা গির্জানুগামীদের সদস্য। এসেছে উপাসনালয়ের জিনিসপত্র কিনতে, পাছে ওগুলো অপবিত্র ব্যক্তিদের হাতে পড়ে। অন্যরা সব ব্যবসায়ী আর দালাল—তারা এসেছে গোটা সম্পত্তির দরদস্তুর করতে। একজন ভক্ত-চেহারার 'ভ্রাতা' রাজি হয়েছেন নিলামের হাতুড়ি তুলতে—নিলামের দপ্তরে যেন সেরা বাক্যবিন্যাস আর আচার মর্যাদার বৈপরীত্য!

ছোটখাটো কিছু জিনিস বিক্রি হয়ে গেল, তারপর দু'জন সহকর্মী টেনে আনল কুমারী মেরীর মূর্তিটা।

রবিন্স ডাক শুরু করল দশ ডলার থেকে। পুরুতের পোশাক পরা মোটাসোটা একটি লোক দর চড়ালেন পনের অবধি। ভিনের অন্য প্রান্ত থেকে একটি লোক হাঁকলে—কুড়ি। এবার তিনজনই পরপর পাঁচ পাঁচ করে দর তুলে যায়, শেষে দাম ঠেকল পঞ্চাশে। মোটা লোকটা হাল ছেড়ে দিল এবার। রবিন্স এক ঝটকায় তুলে দেবে বলে, হাঁকল—একশো।

অন্য গলাটায় শোনা গেল—'দেড়শো।'

সাহস করে রবিন্স বলল, 'দু'শো!'

ওর প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আড়াইশো।'

বিজলির চমকের মতো এক লহমা দ্বিধা করে রিপোর্টার, হিসেবে কষে অফিসের সাথীদের কাছ থেকে কতটা ধার করতে পারবে, আর আগামী মাসের মাইনে থেকে কতটা কেটে নেবেন ম্যানেজার।

সে প্রস্তাব করল, 'তিনশো।'

ওর চেয়েও জোর গলায় অন্যজন হাঁকল, 'তিনশো পঞ্চাশ'—আওয়াজ শুনেই রবিন্স ভিড় ঠেলে ছুটলো সেদিকে, স্বরের মালিক দুমারকে ধরল ভীষণভাবে কলার চেপে।

রবিন্স ওর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কাফের গাধা কোথাকার! একজোট হয়ে যা!'

শান্তভাবে দুমার বলে, 'রাজি! তল্লাশি পরোয়ানা জারি করলেও তিনশো পঞ্চাশ ডলার জোটাতে পারতাম না। তবে অর্ধেকটা দিতে পারি। তুমি কেন আমার সঙ্গে ডাকাডাকিতে পাল্লা দিলে?'

'ভেবেছিলাম এই ভিড়ের আমিই বুঝি একমাত্র নির্বোধ, ব্যাখ্যা করে রবিন্স।

আর কেউ দর তুলল না, মূর্তি বাঁধা রইল শেষ দরের ওপরেই। দুমার রয়ে গেল পুরস্কারের সঙ্গে, আর রবিন্স ছুটল দুজনেরই মহাজন কর্জা-দাতাদের কাছে কিছু নিংড়ে আনতে। শিগগিরই টাকা নিয়ে ফিরে এল সে, তারপর দুই "মাস্কেটিয়ার" তাদের দামি প্যাকেটটাকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে এল দুমারের আস্তানায়। কাছেই, পুরনো শার্ট্র্ স্ট্রীটে। একটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে গেল ওপরতলায়। রাখল টেবিলের ওপর। ওটার ওজন হবে একশো পাউণ্ড; আউন্সের হিসেবে দেখলে—ওদের হিসেবমতো যদি দুঃসাহসিক অনুমানটাই সত্যি হয়— তাহলে ওটার এখনকার মূল্য দাঁড়াচ্ছে কুড়ি হাজার স্বর্ণ ডলার।

রবিন্স মূর্তির আবরণটা খুলে ওর পকেট-ছুরি বের করল।

দুমার বিড়বিড় করে বলে আর কাঁপে—'পবিত্র! পবিত্র! এ যে খৃষ্টের মাতা। কী করবে এখন?'

'চোপরও জুডাস্!' রবিন্স শীতল কণ্ঠে বলে, 'তোমার আর উদ্ধার প্রাপ্তির সুযোগ নেই, দেরি করে ফেলেছ।'

শক্তহাতে মূর্তির কাঁধের ওপর থেকে একটা চিলতে খুঁচিয়ে তোলে। কাটা জায়গায় দেখা যায় একটা ম্যাড়মেড়ে ধূসর ধাতু, ওপরে সোনার জলের পাতলা আস্তর।

'তামা!' —জানিয়ে রবিন্স ছুরিটা ফেলে দেয় মেঝেতে—'গিল্টি করা!' দুমার এবার সব সংকোচ ভুলে দিব্যি গালে, 'জাহান্নমে যাক্! একটু মদ গিলতেই হচ্ছে আমাকে।'

দু'জনে একসঙ্গে বিষণ্ণ মনে হেঁটে চলে মাদাম তিবোব কাফের দিকে—দু'চত্বর পেরুলেই কাফেটা।

মনে হচ্ছিল মাদামের মন আজ যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওঁর হয়ে এই দুটি যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা নতুন করে স্মরণ করে।

ওদের বাঁধাধরা আসনে বসতে যাবার আগেই বাধা দিলেন তিনি—'ওই টেবিলে তোমরা বোসো না। এই কথা, ভাইরা। কিন্তু না, তোমরা এই কামরাটাতে এসো, আমাদের সেই "তিন ভাল বন্ধুর" মতো। হ্যাঁ আমি নিজের হাতে তোমাদের জন্য চমৎকার করে একটা "আনিসেৎ", একটা "কাফে রয়্যাল" পরিবেশন করব। আঃ, আমি আমার বন্ধুদের খাতির কবতে চাই যে। হ্যাঁ, দয়া করে এই পথে এস।'

মাদাম ওদের পেছনের ছোট ঘরটাতে নিয়ে গেলেন, মাঝেমধ্যে সেখানে উনি তাঁর বাছা বাছা খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানান। ওদের বসতে দিলেন দুটো আরামকেদারায়, ভেতরের আঙিনার দিকে উন্মুক্ত বড় একটা জানলার পাশে, ওদের মাঝখানে বসালেন একটা নিচু টেবিল। আতিথেয়তা সহকারে চনমন করে সাজাতে লাগলেন প্রতিশ্রুতির ভোজ্যবস্তু।

এই পবিত্র প্রকোষ্ঠে প্রথম প্রবেশ করে সম্মানিত হল কোনো সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। অস্পষ্ট গোধূলির আলোর মধ্যে কামরাটা, তারই মাঝে পালিশকরা দামি কাঠ আর বার্নিশ-করা কাচ ও ধাতুর ঝিক্‌মিক চমক। যেটা ক্রিওলদের বড় পছন্দের জিনিস।

ছোট আঙিনা থেকে একটা একরত্তি ফোয়ারা ইঙ্গিতাত্মক শব্দে জলের ছিটে পাঠাচ্ছে ভেতরে, আর তার সঙ্গে জানলার ধারেব কলাগাছটা পাতা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে তাল দিচ্ছে।

রবিন্স স্বভাবগতভাবেই অনুসন্ধানী। সে কৌতূহলী নজর হানলো কামরার চারদিকে। কোনো জবরজঙ্গী আফ্রিকী পূর্বপুরুষ থেকে মাদাম পেয়েছেন সাজসজ্জার মধ্যে স্থূলতা দেখাবার ঝোঁক।

শস্তা ছাপাছবি দিয়ে দেয়ালগুলো সাজানো—প্রকৃতির মানহানিকর উগ্র অলঙ্করণ, যা 'বুর্জোয়া' রুচির কাছে আবেদনশীল—জন্মদিনের কার্ড, চটকদার খবর-কাগজের ক্রোড়পত্র, আর আর্ট-বিজ্ঞাপনের নমুনা যা দৃষ্টিস্নায়ুকে জোর করে বশ মানাবার জন্য পরিকল্পিত। তবে এসব সরাসরি প্রদর্শনের মধ্যেও একটা দুর্বোধ্য কিছুর জোড়াতালি রবিন্সকে ধন্দের মধ্যে ফেলে! উঠে এক-পা কাছে এগিয়ে যায় জিনিসটাকে আরো ঘনিষ্ঠ নজরে দেখতে ও বুঝতে। তারপর সে দেয়ালের গায়ে দুর্বলভাবে গা এলিয়ে, সোচ্চারে ডাকে—

'মাদাম তিবো! ওঃ মাদাম! কবে থেকে—বলুন কবে থেকে আপনি দেয়ালে কাগজ সাঁটছেন, মানে কাগজ হিসেবে সাঁটছেন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ-হাজার ডলারের

৪% স্বর্ণ বণ্ডগুলো? বলুন—এটা কি গ্রিমের রূপকথা, নাকি একজন চোখের ডাক্তারকে ডাকব?'

এর কথায় এগিয়ে এলেন মাদাম তিবো, আর দুমার।

মাদাম ফুর্তিভরা গলায় বললেন, 'কী কী বলছ তুমি? কী বলছ মসিয়ে রবিন? ভালো নয়? আঃ ওই ছোট ছোট সুন্দর কাগজগুলো! একবার ভেবেছিলাম ওগুলোকেই বুঝি তোমারা ক্যাল্-ইণ্ডার বল, নিচে থাকে ছোট্ট করে তারিখ মাস। কিন্তু না। দেয়ালটার ওই জায়গাগুলো ফেটে গিয়েছিল তো মসিয়ে রবিন, আর আমি ফাঁক বোজাবার জন্য ওই খুদে কাগজের টুকরোগুলো বসিয়ে দিয়েছি। আমি ভাবলাম রংটা ভাবি চমৎকার মানিয়ে যাচ্ছে ওয়াল্‌পেপিয়েরের সঙ্গে। ও, কোথায় পেলাম ওগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ ভালই মনে পড়ছে। একদিন মসিয় মোর‍্যাঁ এলেন আমার বাড়িতে—সে হল যখন তিনি 'মরবেন' তার মাসখানেক আগে—আরে ওই সময়ই তিনি ওই টাকাগুলো নতুন জায়গায় লাগাবার কথা দিয়েছিলেন। মসিয় মোর‍্যাঁ তো ওই ছোট ছোট কাগজের টুকরো ছেড়ে গেলেন, টেবিলে, আর টাকা সম্পর্কে অঢেল কথা বললেন যার একবর্ণও আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু, সে টাকা তো আর দেখলামও না চোখে। বড় দুষ্টু মানুষ মসিয় মোর‍্যাঁ। ও কাগজগুলোকে কী বলতে তুমি, মসিয়ে রবিন, বলো?'

রবিন্স ব্যাখ্যা করে বোঝাল।

চারটে বণ্ডের কিনারা দিয়ে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই হল কুড়ি হাজার ডলার, কুপনসমেত। আপনি বরং একজন অভিজ্ঞ লোককে ডাকুন এগুলো ছাড়িয়ে তুলে আপনাকে দেবার জন্য। মিঃ মোর‍্যাঁ ঠিক কথাই বলেছিলেন। আমি এবার চুল ছাঁটতে যাচ্ছি।

দুমারের বাহু ধরে সে টেনে নিয়ে গেল বাইরের কামরায়। মাদাম তখন চেঁচিয়ে ডাকছেন নিকোলেৎ আর মেমে-কে যাতে ওরা দেখে যায় মসিয়ে মোর‍্যাঁ কীভাবে তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন—অমন মানুষ আর হয় না, গৌরবময় সাধু।

রবিন্স বলল, 'মাপ করো, আমি একটা বয়স্কাউট সম্মেলনে যাচ্ছি। তিনদিন "পিক্" পত্রিকাকে আমার মূল্যবান সেবা ছাড়াই চালিয়ে নিতে হবে। আমি তোমায় পরামর্শ দেব আমার সঙ্গে আসতে। এখন, ওই সবুজ পানীয় যেটা তুমি খাও, কোনো কাজের জিনিস নয়। ওতে চিন্তাভাবনা উস্কে দেয়। আমরা যা করতে চাই তা হল স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া। আমি তোমাকে এই বিষয়ে একমাত্র "লেডির" সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব যে প্রত্যাশিত ফল দেবে বলে গ্যারান্টি দেয়া যায়। তার নাম হল "বিল অব কেন্টাকি", বার-বছর-বয়েসের বুর্বঁ (হুইস্কি)। কোয়ার্ট মাপের বোতলে। কেমন লাগল আইডিয়াটা?'

দুমার বললে, 'রাজি! নারীটির সন্ধান করো!'

Cherchez La Femme. এইন্‌স্লিজ, ১৯০৩

লবঙ্গের পাতা ও তালগাছ

একদিন নর্থ র‍্যাম্পার্ট স্ট্রীটের ওপর দেখা হয়ে গেল ক্ল্যান্সির সঙ্গে—অনেক মাস পরে দেখা। আইরিশ সূত্রের আমেরিকান ক্ল্যান্সি, রুচির দিক থেকে বিশ্বনাগরিক অনেক রকম কারবারেই হাত পাকিয়েছে সে, কিন্তু কোনোটাই তাকে বেশিদিন টেনে রাখতে পারেনি। ওর শিরায় শিরায় চির পথযাত্রীর রক্ত।

দিলখোলা সম্ভাষণ তার, তবে ওর চোখের মধ্যে কিছু একটা যেন দেখতে পেলাম যেটা উদ্‌ঘাটিত হওয়া দরকার। একেক সময় ক্ল্যান্সি যখন একেক খেপ বিদেশভ্রমণ সেরে ফিরে আসে চটকশূন্য বিশিষ্ট সমাজের মধ্যে, তখন তাকে পেড়াপেড়ি করে হয়তো বাঙ্‌ময় কোনো কাহিনী শোনা যেতে পারে। এখন আমার যেন মনে হল ওর মধ্যে স্বেচ্ছা-ভাষণের কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। তাই তাড়াতাড়ি ওকে টেনে নিয়ে গেলাম কাছাকাছি একটা ছোট কাফেতে। সেখানে মাথার ওপর বিজলি-পাখা ঘুরছে নিউ অর্লিয়ন্সের গ্রীষ্মের ভ্যাপসা গরম খানিকটা লাঘব করে।

ক্ল্যান্সি যখন বললে, 'আজকের এই আবহাওয়া একেবারে ক্রান্তিমণ্ডলের কাছাকাছি'—ভাবলাম সে বুঝি ঋতুর কথাই বলছে। কিন্তু পরে বুঝলাম এটা তার কাহিনীর সঙ্গেই বেশি সম্পর্কিত। আমি সায় দিয়ে মাথা ঝোঁকালাম।

ক্ল্যান্সি বলে চলে, 'নাবিক-ডাকাতির পক্ষে সেরা মৌসুম। গত দু'মাস ধরে এই তো করছিলাম—পরপীড়ক শাসকের হাত থেকে একটা বিদেশী জাতকে বাঁচাতে লড়াই। বড় কঠিন কাজ। পিঠে বেদনা ধরিয়ে দেয়, হাত কড়া পড়ে যায়।'

বললাম, 'তা'হলে তুমি সত্যিসত্যিই একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হয়েছ বল? আশা করি উপার্জনও কিছু করেছ। তা, কোন্ দেশটাকে মদত দিচ্ছিলে তুমি?'

'কামচাট্‌কা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ক্ল্যান্সি, ভাবলাম আনতাবড়ি প্রশ্ন।

মনে খট্‌কা নিয়ে জবাব দিলাম, 'কেন, সাইবেরিয়ার কাছে। বোধহয় উত্তর মেরু এলাকায়।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ক্ল্যান্সি বলল, 'তাই ভেবেছিলাম ওটা তো ঠাণ্ডা দেশ। তা'হলে গুয়াটেমালাই হবে—গরম দেশ—যেখানে নাবিক-ডাকাতি-সৈনিকগিরি করেছি। ও দেশটা মানচিত্রে দেখতে পাবে। যে অঞ্চলটাকে ক্রান্তি-এলাকা বলে সেখানেই দেশটা। বিধাতার দূরদৃষ্টি-বলে ওটা সমুদ্রের উপকূলের ওপর, যাতে ভূগোলের লোকরা শহরগুলোর নাম টেনে-টেনে সমুদ্রের জল অবধি নিয়ে যেতে পারে। ওগুলো ছোট হরফে একেক ইঞ্চি লম্বা, স্পেনের ভাষায় গড়া। হ্যাঁ, ওই দেশটার ওপরই জাহাজ নিয়ে হামলা করেছিলাম একা হাতে, আর একটা প্রজাপীড়ক সরকারের হাত থেকে দেশটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম এক-নলা গাঁইতি দিয়ে, তাও আবার গুলি-শূন্য। তুমি অবশ্য বুঝবে না। এ বিবৃতিটাকে খোলসা

করতে হবে যথাযোগ্য ত্রুটি স্বীকার করে।'

'পয়লা জুনের কাছাকাছি কোনো সকাল বোধহয় সেটা। আমি জেটির কাছে দাঁড়িয়ে নদীর জাহাজগুলো দেখছিলাম। আমার ঠিক বিপরীত দিকে একটা ক্ষুদে স্টীমার, মনে হল যাত্রা শুরু করার জন্য তৈরি। ফানেল থেকে ধোঁ বেরুচ্ছে, জাহাজঘাটায় পালা করে-রাখা একগাদা পেটি জাহাজে তুলছে একদল কুলি। বাক্সগুলো চতুষ্কোণ, চওড়ায় উচ্চতায় দু'ফুট, লম্বায় চারফুট করে। মনে হল বেশ ভারীও।

'আমি আনমনা এগিয়ে গেলাম বাক্সগুলোর কাছে। দেখলাম একটা বাক্স নাড়াচাড়া করার সময় খুলে গেছে। নেহাৎ কৌতূহল ভরেই আলগা ডালাটা তুলে ভেতরটা দেখি। বাক্সটা উইনচেস্টার রাইফেল দিয়ে ঠেসে ভর্তি। মনে মনে বলি, "ও এই তাহলে! কেউ নিরপেক্ষতা-আইনকে কলা দেখাচ্ছে। যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে কেউ সাহায্য করছে কাউকে। কে জানে কোথায় যাচ্ছে এসব মাল!"

'কারুব গলা খাঁকারির শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে দেখি। সাদা পোশাক পরা বাদামি-মুখ এক বেঁটেখাটো গোলগাল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দুরন্ত চেহারার ছোট্ট মানুষ। হাতে চার ক্যারেট হীরের আংটি, চোখের মধ্যে নানা প্রশ্ন এবং সম্ভ্রমও। আমি ধরে নিলাম সে কোনো বিদেশীই হবে—হয় রাশিয়া থেকে, নয়তো জাপান বা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জগুলো থেকে।

'গোলগাল লোকটা যেন গোপনীয় কিছু চাপা দিতে চায় এইভাবে বললে—"হিশ্! সেনর কি দয়া করে তার আবিষ্কারের ব্যাপারটা মানে-মানে চেপে রাখবেন যাতে জাহাজের লোকেরা জানতে না পারে? সেনর ভদ্রলোক, আচমকা ব্যাপারটা ঘটে গেছে বলে তা প্রকাশ করে দেবেন না।'

'আমি ধরে নিই লোকটা এক জাতের ফরাসী, যাদের প্রকৃতিই বাধ্য করেছে বিনয়ী হতে আর আজব ভাষা গ্রহণ করতে। তাই বললাম, "মনসিয়ার, আমার অতি-ব্যাকুল আশ্বাস গ্রহণ করুন—জেমস্ ক্ল্যান্সির কাছে আপনার তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ-ছাড়া একটু আগে বাড়িয়ে আমি মন্তব্য করব—'ভীভ্ লা লিবার্টি,' বেঁচে থাক্ মুক্তি বহাল-তবিয়তে! যখনই শুনবেন কোনো ক্ল্যান্সি বংশের কেউ বর্তমান গভর্নমেন্টের উৎখাতে বাধা দিচ্ছে, আপনি ফেরত ডাকে আমাকে তা জানাবেন।"

'কালচে মোটা লোকটা কালো গোঁফের নিচে মুচকি হেসে বলল, "সেনর বেশ ভালো লোক। আসুন না আমার জাহাজে, খাবেন কিছু ওয়াইনের 'গ্লাস'?"

'ক্ল্যান্সি বংশের লোক তো, তাই দু'মিনিটের মধ্যে বিদেশী মানুষটার সাথে বসে গেলাম জাহাজেরই এক কেবিনের মধ্যে, একটা বোতল দু'জনের মাঝখানে রেখে। শুনতে পাচ্ছিলাম ভারী ভারী বাক্সগুলো জাহাজের খোলের মধ্যে বোঝাই করা হচ্ছে। আমি হিসেব করলাম কমপক্ষে প্রায় দু'হাজার উইনচেস্টার ওই মালের মধ্যে আছে। আমি আর বাদামি লোকটা বোতল শেষ করছি, ফের স্টুয়ার্ডকে

বলা হল আরেক বোতল আনতে। বোতলের বস্তুর সঙ্গে ক্ল্যান্সির সংমিশ্রণ ঘটে যাওয়া মানেই পারতপক্ষে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার উস্‌কানি। গ্রীষ্মমণ্ডলের জায়গায়-জায়গায় এই ধরনের বিপ্লবের কথা আমি প্রচুর শুনেছি, আমারও ইচ্ছা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে হাত মক্‌শো করার।

"আপনি আপনার দেশের মধ্যে আলোড়ন জাগাতে চান, তাই তো মনসিয়ার ?" —চোখ টিপে বলি আমি, যাতে সে বোঝে আমি ব্যাপারটা বুঝে গেছি।

'টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বলে বেঁটে লোকটা, "হ্যাঁ, তা বটে। খুব বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটবে। বহু বছর ধরে দেশবাসীরা সহ্য করে এসেছে শুধু প্রতিশ্রুতি আর যা-হবে-না তাই হবার কথা। বড় কিছু একটা করে দেখাতেই হবে। হ্যাঁ, আলবৎ! শিগগিরই আমাদের দলবল রাজধানী শহরে আঘাত আনবে।"

'আরও কিছু পানীয় আর উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে বলি, "ঠিক কথা বলেছেন, আর সেই সঙ্গে বললামই তো—ভীভা! বেঁচে থাকুক! সে যুগের লবঙ্গপাতা—মানে বলছি, কলাপাতা বা তেজপাতা, যাই আপনাদের পদদলিত রাজ্যের পতাকা প্রতীক হোক—তা যেন চিরকাল ওড়ে।"

'গোলগাল লোকটা বললে, "ধন্যবাদ—হাজার হাজার! বন্ধুর মতোই বলে ফেলেছেন কথাগুলো। আমাদের লক্ষ্য সাধনের জন্য এখন চাই অনেক মানুষ যারা এ-কাজ করবে, ওই পতাকা তুলে ধরবে। আঃ যদি হাজারজন শক্তসমর্থ লোক পেতাম জেনারেল ডি ভেগাকে সাহায্য করতে, যাতে তিনি তাঁর দেশের ওই সাফল্য আর গৌরব আনতে পারেন! কিন্তু ভাল কাজের মানুষ পাওয়া যে কত শক্ত, কত কঠিন।"

'টেবিলের ওপর ঝুকে ওর হাতটা চেপে ধরে বলি, "মনসিয়ার, আপনার দেশটা কোথায় তা জানি না, তবে আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে তার জন্য। একজন ক্ল্যান্সির হৃদয় কোনো পীড়িত জাতির দুর্দশার দিকে কখনো চোখ বুজে থাকেনি। আমাদের বংশ জলদস্যুর বংশ, পেশায় বিদেশী। আপনি যদি জেমস্ ক্ল্যান্সির বাহুর জোর আর তার রক্ত দিয়ে আপনার দেশের উপকূল বিপদ্‌মুক্ত করতে চান তো আমি আপনার হুকুমের গোলাম।"

'জেনারেও ডি ভেগা তো আনন্দে উপচে পড়ে তাঁর ষড়যন্ত্র আর বিপদ্ মুক্তিতে আমার সমবেদনা 'বাজেয়াপ্ত' করে নিলেন। টেবিলের ওপর দিয়েই আমার সঙ্গে কোলাকুলি করতে গেলেন, কিন্তু মোটা হওয়ার দরুন, আর বোতলে কিছু না থাকায় তাঁর বাধা হল। এইভাবে ডাকাত-সেপাইদলে আমি 'স্বাগত' হলাম। তারপর জেনারেল লোকটা বললেন তাঁর দেশের নামটি গুয়াটেমালা। —কী যেন সমুদ্রটার পাড়ে, যে-কোনো দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। জলভরা চোখে তাকালেন আমার দিকে, আর মাঝে মাঝে 'ওগরাতে' লাগলেন কথাটা— "আঃ বড় বড় হিম্মতওয়ালা মানুষ! এই তো আমার দেশের প্রয়োজন!"

'তিনি তো ওই নামেই নিজের 'বদনাম' জানালেন—জেনারেল ডি ভেগা! একটা দলিল বের করে আমাকে সই করার জন্য দিলেন, যা আমি করলাম চমৎকার লাতা-পাতার অক্ষরে আব শেষের লেজটুকু দিয়ে।

'জেনারেল এবার ব্যবসায়ীর সুরে বললেন, "তোমার রাহা-খরচ কাটা যাবে তোমার বেতন থেকে।"

"না, যাবে না!" গরম হয়ে বলি আমি, "আমার রাহা-খরচ আমি নিজেই দেব।" আমার ভেতরের পকেটে ছিল একশো-আশি ডলার, অতএব কোনো হেঁজিপেঁজি সেপাই হতে যাচ্ছি না আমি, সেপাইগিরি করব শুধু খওয়া-পরার বদলে।

'দু'ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ ছাড়ছে। কিছু দরকারি জিনিই গুছিয়ে নেবার জন্য ডাঙায় চলে গেলাম। জাহাজে ফিরে গর্বসহকারে জেনারেলকে দেখালাম আমার পোশাক। চমৎকার একটা চিন্‌চিলা লোমের ওভারকোট। মেরু অঞ্চলের ডবল জুতো। ফারের টুপি, কানঢাকা, লোমের আস্তর-দেয়া মনোহর দস্তানা আর উলের মাফলার।

'বেঁটে জেনারেল বললেন, "যা'চ্চলে! এসব পোশাক কেমন করে গরম ক্রান্তি-মণ্ডলে চলবে?' তারপর তাঁর পেটফাটা হাসি, ডাকলেন ক্যাপ্টেনকে, ক্যাপ্টেন ডাকল ভাণ্ডারীকে। তাবা ডেকে চীফ ইঞ্জিনীয়রকে আনল, লাইন দিয়ে কেবিনে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, ঠাট্টা করতে লাগল ক্ল্যান্সির গুয়াটেমালার সজ্জা দেখে।

'আমি একটু গম্ভীব হয়ে চিন্তা করি. জেনারেলকে আবার বলি তাঁর দেশের বর্ণনা দিয়ে নামটা জানাতে। তিনি যখন বলেন, আমি বুঝি ওটা ছিল কামটাট্‌কা, যাব নাম আমি মনের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছি। সেই থেকে আমার বিপত্তি—নাম, আবহাওয়া আর ভূগোলেব ব্যাপারে দুটো দেশকে আলাদা করতে পারি না।

'আমি আমাব যাত্রার ভাড়া দিয়েছি, চব্বিশ ডলার, পয়লা কেবিনে—আর খাওয়াদাওয়া করছি অফিসারদের সঙ্গে বসে। নিচের ডেকে রয়েছে একদল দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, প্রায় চল্লিশজন, মনে হয় দাগো বা ওইরকম কিছু। একটু অবাক হই ভেবে এত সব লোক কেন যাচ্ছে।

'যাক, তিনদিন বাদে তো আমরা চললাম সেই গুয়াটেমালার ধার দিয়ে। দেশটা কিন্তু নীল, হলদে নয যেমন মানচিত্রে ভুল বঙে দেখায়। আমবা উপকূলের একটা ছোট শহরে নামি. সেখানে এক সারি গাড়ি একটা ছোট ছিমছাম রেললাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। দাগোদের দলও গাড়িতে উঠল, জেনারেল আর আমি বসলাম সামনের কামরাটায়। হ্যাঁ, আমি আর জেনারেলই তো এখন বিপ্লবের সামনের সারিতে, সারি দিয়ে গাড়িও বের হল বন্দর শহরটা ছেড়ে। পুলিসের লোক যতটা তাড়াতাড়ি দাঙ্গা থামাতে দৌড়োয়, আমাদের গাড়ি চলেছে তেমনি বেগে। ভূগোলের বাইরে যত ঝাপসা দৃশ্য দেখা যায় তারই মধ্যে নজরে-পড়া জায়গা ফুঁড়ে চলেছে গাড়িটা। সাতঘণ্টায় চল্লিশ মাইল পেরুলাম। এর পর আর

রেললাইন নেই। এটা একটা ক্যাম্পের মতো জায়গা, জঙ্গলে মনমরা এক ভ্যাপসা খাড়ড়ার মধ্যে। ওরা সামনের দিকে জঙ্গলের গাছ কেটে সাজাচ্ছে রাস্তাটাকে আরো বাড়াবার জন্য। মনে মনে বলি, "এই হল বিপ্লবীদের মনের মতো কল্পনার জায়গা। এখানেই ক্ল্যান্সি তার উন্নত জাতগুণে আর আইরিশ বিপ্লবী কায়দায় এদেশের মুক্তির জন্য প্রচণ্ড আঘাত হানবে।"

'ওরা ট্রেন থেকে বাক্সগুলো নামায, আর সজোরে ওগুলোর ডালা খুলে ফেলতে থাকে। প্রথম যেটা খোলা হল দেখলাম, জেনারেল ডি ভেগা তা থেকে উইনচেস্টার রাইফেলগুলো নিয়ে বিলিয়ে দিলেন আশেপাশের কিছু গুণ্ডা চেহারার ছটফটে সেপাইয়ের হাতে। এরপর খোলা হল অন্য বাক্সগুলো—বিশ্বাস কর, চাই না-কর—একটা বন্দুকও আর দেখা গেল না। সমস্ত বাকি বাক্স বোঝাই—গাঁইতি আর কোদালে।

'আর তারপর—ক্রান্তি এলাকা শোচনীয় দুর্ভাগ্যে মরুক! —গর্বিত ক্ল্যান্সি আর অপমানিত দাগোদের প্রত্যেককে কাঁধে বইতে হল হয় গাঁইতি, নয় কোদাল, আর মার্চ করে যেতে হল ওই নোংরা ছোট রেলরাস্তার কাজে। হ্যাঁ! এই কাজের জন্যই দাগোদের জাহাজে আনা হয়েছে, আর এর জন্যই কাগজে সই করেছে জলদস্যু ক্ল্যান্সি, যদিও সে-সময় তার জানা ছিল না ব্যাপারটা। পরের কয়েকদিনে আমি সবই বুঝে গেলাম। মনে হয় ও রাস্তাটায় কাজ করার উপযুক্ত খাটিয়ে লোক পাওয়া কঠিন হচ্ছিল। দেশের বুদ্ধিমান নেটিভরা এমন অলস যে কাজ করতে চায় না। আর বাস্তবপক্ষে, সাধু ব্যক্তিরাও জানেন সেটা অপ্রয়োজনীয়। এক হাত বাড়ালেই তারা পৃথিবীর সেরা আর দামি ফলগুলো পেয়ে যায়, আর অন্য হাত গুটিয়ে দিনের পর দিন ঘুমোতে পারে—শুনতেও পায় না সকাল সাতটার সিটি কিংবা সিঁড়ির গোড়ায় ভাড়া আদায়কারীর পায়ের শব্দ। তাই নিয়মিত স্টীমারগুলো যায় যুক্তরাষ্ট্রে, খাটিয়ে মজুরদের ফুসলিয়ে আনবার জন্য। সাধারণত আমদানি করা গাঁইতি-কুলিরা দু'তিনমাসেই মরে যায় পচা-জল খেয়ে, নিঃশ্বাসে উগ্র গরমদেশের হাওয়া টেনে। সেই মতলবেই ওরা চুক্তিতে সই করায় একবছর মেয়াদের, আর বেচারিদের পালানো বন্ধ করতে মোতায়েন রাখে সশস্ত্র রক্ষী।

'এইভাবেই আমি ক্রান্তীয় দেশে দোতরফা ধোঁকা খেলাম, আমার একটা পারিবারিক ভুলে, নিয়মের বাইরে অন্য জায়গায় ঝামেলা খুঁজতে গিয়ে।'

'ওরা আমায় একটা গাঁইতি দিয়েছিল, সেটা নিলামও অকুস্থলে একটা বিদ্রোহ ঘটাবো কল্পনা করে। কিন্তু গার্ডগুলো রয়েছে, যেমন তেমন ভাবে উইনচেস্টার তাক করে, তাই এখন হঠাৎ কিছু করার চেয়ে প্রাণ বাঁচানোই বড় তাগিদ বলে বিচার করি। আমাদের দলে এখন একশো মজুর রয়েছে কাজে যাবার জন্য, হুকুম হল নড়বার। আমি সারি ছেড়ে এগিয়ে গেলাম জেনারেল ডি ভেগার সামনে। তিনি চুরুট খাচ্ছেন আর উপভোগ করছেন দৃশ্যটা, তৃপ্তি আর গৌরব নিয়ে।

আমার দিকে চেয়ে ভদ্রভাবে শয়তানি হাসি হাসলেন—'শক্তসমর্থ জোয়ানদের জন্য গুয়াটেমালায় তো প্রচুর কাজ হে! হ্যাঁ, মাসে তিরিশ ডলার, ভাল মাইনে! তুমি শক্ত বেপরোয়া মানুষ। মেরীর দিব্যি, এ রেলরাস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেব রাজধানী অবধি। ওরা তোমাকে কাজে যেতে বলছে। বিদায়, শক্ত মানুষ।"

'তবু দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, "মনসিয়ার, এক সামান্য নিরীহ আইরিশ মানুষকে একটি কথা বলবেন? —আপনার ওই আরশোলা-ঠাসা স্টীমারে যখন পা রাখলাম, আপনার টোকো ওয়াইনে মুক্ত বিপ্লবী-মনোভাব ঢেলে দিলাম, তখন কি ভেবেছিলেন আমি আপনার এই হতচ্ছাড়া সামান্য রেলরাস্তার গাঁইতি চাল্লাবার ষড়যন্ত্র করছিলাম? আর আপনি যখন দেশপ্রেমের আবৃত্তি করে জবাব দিলেন, তারকা-লাঞ্ছিত স্বাধীনতার লক্ষ্যের কথা বলে, তখন কি আপনার মতলবের ধ্যান ছিল আমাকে আপনার এই ইতর, হীন, বুকে-হাঁটা দেশের খুঁটো-টানা শেকল-বাঁধা দাগোদের দলে আমাকেও ভিড়িয়ে দেবেন?"

'জেনারেল লোকটা তাঁর ভুঁরিটাকে আরো চওড়া করে হো-হো করে হাসলেন। হ্যাঁ অনেকক্ষণ উঁচু গলায় হাসলেন, আর আমি, ক্ল্যান্সি দাঁড়িয়ে রইলাম সবুর করে।

'অবশেষে চিৎকার করে বললেন, "দেখছি তুমি একটি ভাঁড়! আমাকে হাসিয়েই মেরে ফেলবে বুঝি! হ্যাঁ, আমার দেশকে সাহায্য করতে শক্তসমর্থ সাহসী লোক পাওয়া কঠিন বৈকি। বিপ্লব? বলেছিলাম নাকি বিপ্-বিপ্-বিপ্লবের কথা? একটি অক্ষরও নয়। বলেছিলাম গুয়াটেমালার প্রয়োজন শক্তসমর্থ লোকের। ব্যাস্। ভুলটা তোমারই। রক্ষীদের জন্য রাখা বন্দুকের ওই একটি বাক্সই তুমি দেখেছিলে, ভাবলে সব বাক্সেই বন্দুক আছে? না, না। গুয়াটেমালায় কোন যুদ্ধবিগ্রহ নেই। কিন্তু কাজ? যথেষ্ট। ভাল কাজ, তিরিশ ডলার মাসে। তুমি একট গাঁইতি কাঁধে নেবে সেনর, আর মাটি খুঁড়বে গুয়াটেমালার মুক্তি আর উন্নতির জন্য। কাজে যাও এখন। রক্ষীরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

'চাপা গলায়, কিন্তু প্রচণ্ড রাগ আর বিরক্তি নিয়ে বলি, "বেঁটে মোটা বাদামি পুডল্ কুত্তা, শিগগিরই তোমার আক্কেল হবে। হয়তো এক্ষুনি নয়, তবে যে মুহূর্তে জে. ক্ল্যান্সি তোমার জবাব হিসেবে কিছু নক্শা ছক্বার সুযোগ পাবে।"

'দলের সর্দার আমাদের হুকুম দিলে কাজে যেতে। গিনিরাজ্যের লোকগুলোর সঙ্গে আমিও পা বাড়াই, আর যাবার সময় শুনতে পাই একজন বিশিষ্ট দেশভক্ত ও মানুষ-হরণকারী প্রাণ খুলে হাসছে।

'বড় শোচনীয় ঘটনা যে আটটি সপ্তাহ আমাকে রাস্তা তৈরি করতে হল অভদ্র দেশটার জন্য। দিনে বারো ঘণ্টা করে ডাকাত-সৈনিকের কাজ করলাম একটা ভারী গাঁইতি আর কোদাল সম্বল করে, কেটে উড়িয়ে দিলাম সুদৃশ্য বনগুলো যা চলার অধিকারের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সব জল্লা জায়গায় কাজ

করি যার গন্ধ লীক্-করা গ্যাস-পাইপের মতো, পায়ে মাড়াই দামি-দামি হট্‌হাউস্‌যোগ্য চারাগাছ আর শবজির চমৎকার ঝাড়গুলো। ভূগোলের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না এমন সব অদ্ভুত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দৃশ্য। গাছগুলো গগনচুম্বী, নিচের গুল্মঘাস কাঁটা আর ছুঁচে ভরা; মাথার ওপর লাফ দিচ্ছে বাঁদর, জলে কুমির আর গাছে গোলাপি-লেজ মকিং বার্ড, আর আমরা হাঁটু ডোবা পচা জলে দাঁড়িয়ে শেকড় ধরে নিজেদের সামলাচ্ছি গুয়াটেমালার মুক্তির জন্য। রাতে ক্যাম্পে আগুনের ধোঁয়া দিই মশা তাড়াতে, ধোঁয়ার মধ্যেই বসে থাকি, আর গার্ডগুলো আমাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। রাস্তায় দু'শো লোক কাজ করছে—বেশির ভাগ গিনির লোক, নিগ্রো, স্পেনীয় আর সুইডেনের লোক। তিনজন কি চারজন ছিল আইরিশ।

'হ্যালোরান নামে এক বুড়ো আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। সে আয়র্ল্যাণ্ডের মানুষ, তার হক আছে, নিজস্ব মতও আছে। এক বছর ধরে সে রাস্তার কাজ করছে। ওরা তো বেশির ভাগই ছ'মাসের বেশি বাঁচে না। লোকটা শুকিয়ে হাড়িডসার, প্রত্যেক তেসরা রাতে ঠাণ্ডায় কাঁপে।

'বলল, "প্রথম যখন আসবে, ভাববে এবারই সব ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু ওরা প্রথম মাসের মাইনে থেকে তোমার রাহা-খরচ কেটে রাখে, আর যত দিন যায়, গরমের দেশ তোমাকেই একেবারে পেড়ে ফেলে। তোমার চারদিকে ঘেরা ঘোর-বুনো জঙ্গল, জঘন্য সব জানোয়ারে ভরা—সিংহি বেবুন আনাকোণ্ডা সাপ—ওৎ পেতে বসে আছে তোমায় গিলবার জন্য। সুয্যির কড়া রোদে তোমার মজ্জা অবধি শুকিয়ে যায়। ওই যে পদ্য বইয়ে লেখে, 'লেটুস্-ভোজীর' মতো অবস্থা হয়। জীবনের সব উঁচু 'ওনুভূতি'—যেমন দেশভক্তি, প্রতিশোধ, আন্দোলন, 'পোস্কার' জামার মায়া—সব ভুলে যেতে হয়। তোমার কাজ করো, কিরাসিন তেল গেলো, আর দাগো-ঠাকুরের হাতে রান্না পচামন্দ সব খাও। পাইপে তামাক ঠেসে শুধু নিজেরেই বল: 'পরের হপ্তায় ঠিক ভেগে যাব,' তারপর শুতে গিয়ে নিজেরেই বল মিথ্যেবাদী, কারণ নিজেই জানো কক্ষনো ওটা পারবে না।"

'আমি শুধোই, "এই জেনারেলটা কে হে, নিজেকে 'ডি ভেগা' বলে?"

'হ্যালোরান বলে, "ও লোকটাইতো রেলরাস্তা পুরো করতে চেষ্টা করছে। আগে কাজটা ছিল পাইভেট কর্পোরেশনের হাতে, কিন্তু সেটা ধসে গেল, তারপর গভর্নমেন্ট নিল নিজের হাতে। ডি ভেগি বড় রাজনীতির নেতা প্রেসিডেন্ট হতে চায়। লোকে চায় রেলরাস্তা পুরো করতে, কারণ তাদের কড়া ট্যাক্সো দিতে হচ্ছে এর জন্য। ডি ভেগি চায় নিজের প্রচার, তাই এটাকে ঠেলছে।"

'বলি, "কোনো মানুষকে ভয় দেখানো আমার পথ নয়, কিন্তু ওই রেলরাস্তার লোক আর জেমস্ ও'ডাউড ক্ল্যান্সির মধ্যে একটা হিসেব নিকেশ করার আছে!"

'হ্যালোরান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "এক সময় তো ওই পথ আমারও ছিল

হে, পরে হয়ে দাঁড়ালাম 'লেটুস্'-খোর। দোষটা এই গরমদেশের মাটিতে। মানুষের হাড়পাঁজরায় নতুন রস ভরে দেয়। কবি যেমন বলেন, এ হল এমন দেশ সবই যেখানে 'ভোজনের পরের অবস্থা'! কাজ করি, পাইপ টানি, আর ঘুমিয়ে পড়ি। আর জীবনে আছেটাই বা কী! দেখবে, শিগগিরই দেখবে, তোমারও ওই অবস্থা হবে। ক্ল্যান্সি, কোনো 'অনুভূতিই' অন্তরে পুষো না।"

'আমি বল্লি, "ও না-ভেবে পারি না, আমার রক্তে রক্তে ওই ভাবনা। এই আঁধার দেশের বিপ্লবী ফৌজে নাম লিখিয়েছিলাম এই সৎ বিশ্বাসে যে এর মুক্তি, সম্মান আর রুপোর মোমদানির জন্য লড়ব, আর তার বদলে এখন কিনা এর প্রাকৃতিক দৃশ্য ছেঁটে ফেলছি, শেকড় ধরে টানছি। ওই জেনারেল লোকটাকেই এর জন্য দাম শুধতে হবে।"

'দু'মাস রেলরাস্তায় কাজ কবার পর পালিয়ে যাবার প্রথম সুযোগটা পেলাম। একদিন আমাদের দলটাকে তৈরি-হয়ে-যাওয়া লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তে পাঠানো হয়েছিল কিছু কাঠের খুঁটো টেনে আনতে, ওগুলো ব্যারিওস্ বন্দরে থেকে সুঁচলো করে আনা হয়েছিল। জিনিসগুলো এসেছে একটা ঠেলা হাতগাড়িতে, ফিরে যাবাব সময় দেখলাম গাড়িটা লাইনের ওপরেই থেকে গেল।

'রাত বারোটা নাগাদ আমি হ্যালোরানকে ঠেলে তুললাম, ওকে বললাম আমার মতলবটার কথা।

'হ্যালোরান বললে, "পালিয়ে যাব? হে ভগবান! তুমি সত্যিই সেটা বোঝাচ্ছ, ক্ল্যান্সি? ওরে, আমার সে স্নায়ুর জোরই নেই! বড্ড শীত করছে, ঘুমোতেই পারিনি। পালিয়ে যাবে? আমি তো তোমায় বলেছি ক্ল্যান্সি, 'লেটুস্' খেয়েছি। আমার জোরই নেই শরীরে। গরম এলাকাটাই সব্বোনাশ করল। কবি যেমন বলেছেন : 'ভুলে যাই ফেলে-আসা বন্ধুদের: নিচু এই 'লেটুসের' দেশেই পড়ে থাকব শুয়ে থাকব কাত হয়ে!' তুমি বরং যাও ক্ল্যান্সি, আমি থেকে যাই, কেমন! এমন কাঁচা রাত্তিরে এত ঠাণ্ডা, আমার যে ঘুম পাচ্ছে।"

'তাই, হ্যালোরানকে ছেড়ে আসতে হল। নিঃশব্দে জামাজুতো পরে আমি আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ি। রক্ষীটা এগিয়ে আসতেই একটা ডাব তুলে তাকে ধপাস্ করে কুপোকাত করি। ছুটে চলি রেলরাস্তার দিকে। হাতগাড়িটার ওপর উঠে ওটাকে লাইনের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিই। ভোর হবার আগেই মাইলখানেক দূর থেকে দেখতে পাই ব্যারিওস্ বন্দরের আলো। ওখানে গাড়ি থামিয়ে আমি হেঁটে যাই শহরেব দিকে। ও শহরের সরকারী বাড়িগুলোর মধ্যে অতি সাবধানে ইতস্তত করে ঢুকি। গুয়াটেমালার সেপাইদের নিয়ে আমার ভয় নেই, তবে তার লোক নিয়োগের দপ্তরে হাতাহাতি লড়তে হবে ভেবে বুক আমার কেঁপে ওঠে। এ এক দেশ যা সহজেই কাজের লোক ভাড়া করে, অনেক কাল ধরেও রাখে। সত্যি বলছি, আমি বেশ কল্পনা করতে পারি কোনো সুন্দর শান্ত রাতে পাহাড়ের এ-ধার

থেকে ও-ধারে আমেরিকা-দেবী আর গুয়াটেমালা-দেবী গল্পগাছা করছেন; আমেরিকা-দেবী বলছেন, "আর বোলো না ভাই, কী মুশকিল যে হয়েছে এই কাজের লোকগুলো নিয়ে, সেনোরা!" গুয়াটেমালা দেবী বললেন, "আইন করেছেন যে এখন! আর বলবেন না মা'ম্! এদিকে আমার লোক কিন্তু ছেড়ে যাবার নামটি করে না—হি-হি! মা'ম্!" মুখ লুকিয়ে হাসেন গুয়াটেমালা-দেবী।

'আমি কেবল চিন্তা করছি তখন, কীভাবে এ-গ্রীষ্মদেশ থেকে সরে পড়া যায় আবার মজুর-ভাড়ার খপ্পরে না পড়ে। অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখতে পেলাম একটা স্টীমার বন্দরে ঢুকছে, চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমি একটা ছোট ঘেসো পথ ধরে নেমে গেলাম জলের কাছে। বালুর চড়ায় দেখি একজন ছোটখাটো বাদামি নিগ্রো, এখনি বোধহয় ডিঙি চালিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

'বললাম, "দাঁড়াও ভাই সাম্বো, ইংরিজি চলে?"

'সুন্দর দাঁত বের করে হাসল সে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব চলে।"

'জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী জাহাজ? কোথায় যাচ্ছে? আর খবর-টবরও শোনাও, আজ ক'তারিখ?"

'বেশ অমায়িক আর সহজ বাদামি লোকটা, সিগারেট পাকাতে পাকাতে বলল—"ও স্টীমার 'কানচিটা', নিউ অর্লিন্স থেকে এসেছে কলা বোঝাই করতে। কাল রাতে বোঝাই করা হয়ে গেছে। মনে হয় এক-দু' ঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে। দিনটা বেশ ভালই যাবে মনে হয়। হয়তো আপনি খুব বড় একটা যুদ্ধের কথা শুনে থাকবেন? কী মনে হয়, জেনারেল ডি ভেগাকে ধরতে পারবে না সিনর? হ্যাঁ? না?"

'বলি, "সেটা কী ব্যাপার সাম্বো? বড় যুদ্ধ? কাদের যুদ্ধ? আমি দু'মাস সোনার খনির ভেতরে কাজ করছিলাম, কোনো খবরই জানতে পারিনি।"

'ইংরেজি বলতে পেরে বড় গর্বিত নিগ্রো লোকটা—'ওঃ এক হপ্তা আগে গুয়াটেমালায় সে কী ভীষণ যুদ্ধ! জেনারেল ডি ভেগা, সে প্রেসিডেন্ট হতে চায়। ফৌজ জোগাড় করেছিল—এক-পাঁচ-দশ হাজার লোক গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়তে। আর গভর্নমেন্টও পাঠাল পাঁচ-চল্লিশ-একশো হাজার সেপাই বিপ্লব দমাতে। কাল ওরা বড় যুদ্ধ করেছে লোমাগ্রান্ডেতে—সে হল পাহাড়ের উনিশ কি পঞ্চাশ মাইল ভেতরে। গভর্নমেন্টের সেপাইরা চাবকালো জেনারেল ডি ভেগাকে—উঃ, ভীষণ বিশ্রিভাবে। তার দলের পাঁচশো-ন'শো-দু' হাজার লোক মরল। বিপ্লব তো গুঁড়ো হল, থেমে গেল চট্‌পট। জেনারেল একটা বড় খচ্চরে চেপে তাড়াতাড়ি ভোঁ দৌড়। হ্যাঁ, বলছি কী! জেনারেল, সে তো পালাল, তার সেপাইরা খতম। আর গভর্নমেন্টের ফৌজ, তারা খুব চেষ্টা করল জেনারেলকে ধরতে। তাকে পেলে গুলি করে মারত। তোমার কি মনে হয়, সিনর, ধরতে পারবে তাকে?"

'বললাম, "ঈশ্বর করুন তাই হয়! একজন ক্ল্যাঙ্গির লড়াইয়ের এলেম যদি কোদাল আর গাঁইতি দিয়ে মাটি খোঁড়ার কাজে লাগানো হয়, তার বিচার করবে

নিয়তি। তবে, এটা ঠিক বিদ্রোহের প্রশ্ন ততটা নয়, বুঝলে ক্ষুদে মানুষ, যতটা ভাড়া করা মজুরের বিষয়ে। আমি তোমার মহান মর্যাদাহীন দেশের ভদ্র কেরানি বিভাগের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিতে ব্যগ্র। তোমার ছোট ডিঙিতে করে আমায় স্টীমারটাতে উঠিয়ে দাও, তোমায় পাঁচ ডলার দেব—সিঙ্কার পেসারস্—" "সিঙ্কার পেসারস্"—বলি আমি এখানকার সবুজের ভাষায় টাকার দর কমিয়ে।

'"সিঙ্কো পেসো?" আওড়ায় ক্ষুদে মানুষ, "পাঁচ ডলি, দেবেন তো?"

'ক্ষুদে মানুষটা অত বাজে লোক নয়। প্রথমে তার একটু দ্বিধা ছিল, দেশ-ছাড়া যাত্রীদের কাগজ পাসপোর্ট রাখতে হয়, কিন্তু শেষ অবধি সে আমাকে নিয়েই গেল স্টীমারের পাশে।

'তখন সবে ভোর হতে শুরু করেছে, ডেকের ওপর জনপ্রাণী দেখতে পাই না। জল শান্ত নিস্তরঙ্গ, নিগ্রো লোকটা আমায় ডিঙি থেকে উঁচুতে তুলে ধরল আর আমি, ডেকের যে-অংশটা ফল বোঝাই করার জন্য নিচু করে-কাটা, সেখান দিয়ে উঠে পড়লাম। ডেকের নিচে যাবার ঢাকনাগুলো খোলা, নিচু হয়ে দেখি কলার ঝুড়ি খোলের মধ্যে বেশ উঁচু করে ডাঁই করা। মনে মনে ভাবি, "ক্ল্যান্সি, তুমি বরং তলায় লুকিয়েই চলে যাও, সেটাই নিরাপদ। স্টীমারের লোকরা তোমায় ফের পাঠাতে পারে মজুর-নিয়োগের দপ্তরে, তাই চারদিকে নজর রাখবে যাতে আবার না ও অঞ্চলের খপ্পরে পড়ো।"

'তাই সহজেই নেমে পড়ি কলাগুলোর মাঝখানে, আর একটা গর্ত করে নিই লুকোবার জন্য। ঘন্টাখানেকের মধ্যে শুনতে পেলাম ইঞ্জিন চলছে, টের পাই জাহাজও নড়ছে, অতএব সমুদ্রের দিকেই চলেছি। ওপরে ঢাকনাগুলো ওরা বাতাস চলাচলের জন্য খোলা রেখেছিল, একটু বাদে যথেষ্ট আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেলাম সবই। বেশ খিদে পেয়েছিল, ভাবলাম একটু ফলাহার করে প্রাতরাশটা সারি। যে গর্তটা করেছিলাম তার ভেতরেই সোজা হয়ে দাঁড়াই। ঠিক তক্ষুনি দেখলাম আরেকটি মানুষ, দশফুট দূরে গুঁড়ি মেরে বেরুচ্ছে। হাত বাড়িয়ে একটা কলা ছাড়িয়ে নিয়ে গোটাটাই মুখে পুরল। একটা নোংরা লোক, কালো মুখ, ছন্নছাড়া পোশাক, চেহারাটাই বিদ্ঘুটে। হ্যাঁ একেবারে কমিক ছবির মুষ্টিযোদ্ধার মতো মোটা। আরেকবার চেয়ে দেখি, এ তো আমার সেই জেনারেল বান্দা, ডি ভেগা, মহান্ বিপ্লবী, খচ্চর-সওয়ারী, গাঁইতি খন্তার আমদানিকারী। আমাকে দেখে জেনারেল ইতস্তত করতে লাগল মুখে কলা পুরে আর ডাবের মতো বড় চোখ করে।

'আমি বললাম, "চুপ, একটি কথা নয়। নয়তো ওরা আমাদের বাইরে নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। মুক্তির জয় হোক্!" ওটুকু যোগ করে তাঁর দেশভক্তির উৎসমুখে ঠেলে দিই একটি কলা। এটা নিশ্চিত যে জেনারেল আমাকে চিনতে পারবে না। গরম এলাকার নোংরা কাজ আমার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। আধ-ইঞ্চি কড়া দাড়ি

গজিয়েছে মুখে, আর উর্দিটা লাল শার্ট, নীল পাতলুনের।

'কথা বলার মতো অবস্থা হতেই জেনারেল শুধোলো, "সেনর কীভাবে জাহাজে এলেন?"

'বললাম, "খিড়কি দরজা দিয়ে—শশ্! মুক্তির জন্য বড়ো গৌরবময় আঘাত হেনেছিলাম, কিন্তু আমরা হেরে গেলাম ওদের সৈন্যসংখ্যার কাছে। সাহসী লোকের মতো আসুন পরাজয় মেনে নিই, খাওয়া যাক্ আরেকখানা কলা।"

"কলার কাঁদির ওপর চোখের জল ফেলে জেনারেল বলল, "আপনি কি মুক্তির সপক্ষে লড়ছিলেন, সেনর?"

'বললাম, "শেষ অবধি। আমিই তো অত্যাচারী শাসকদের চামচাদের বিরুদ্ধে শেষ মরীয়া যুদ্ধটা করলাম। কিন্তু আমায় পাগল করে দিয়েছিল, বাধ্য হলাম পেছু হটতে। আপনি জেনারেল যে খচ্চরে চেপে পলালেন সেটা তো আমিই জোগাড় করে এনেছিলাম। ওদিকের ওই পাকা কাঁদিটা একবার এদিকে ঠেলে দেবেন, জেনারেল? ঠিক নাগাল পাচ্ছি না হাতে। ধন্যবাদ।"

'জেনারেল আবার ফুঁপিয়ে ওঠে, "এই কথা বলছেন সাহসী দেশভক্ত? হায় ভগবান! এই সময় আপনার ভক্তির জন্য একটা পুরস্কারও দেবার মতো নেই আমার কাছে! কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছি মাত্র। ছ্যা-ছ্যা; কী শয়তান জানোয়ার ছিল ওই খচ্চরটা! ঝড়ের মধ্যে পড়া জাহাজের মতো কেবলই ধাক্কা খেয়েছি। কাঁটা গাছ-লতায় আমার চামড়া ফুঁড়ে ফেটে গেছে। জাহান্নমের জানোয়ারটা খালি গাছে-গাছে গুঁতো খায়, আর আমার পা'দুটো জর্জরিত হয়। রাতে পৌঁছোলাম ব্যারিওস্ বন্দরে। খচ্চরের বাহন থেকে তো মুক্তি পেলাম, তাড়াতাড়ি ছুটলাম সমুদ্দুর কিনারা ধরে। দেখলাম একটা ছোট্ট নৌকো বাঁধা। আমি নৌকো চালিয়ে চলে এলাম স্টীমারের ধারে। ডেকের ওপর কোনো মানুষ দেখতে পাই না, তাই পাশে ঝোলা একটা দড়ি ধরে উঠে পড়ি জাহাজে। তারপর কলাগুলোর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। মনে ভাবি, যদি জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখতে পায় তা'হলে আমায় তো আবার ছুঁড়ে দেবে গুয়াটেমালার হাতে। ব্যাপারটা ঠিক হবে না, গুয়াটেমালা জেনারেল ডি ভেগাকে গুলি করে মারবে। তাই লুকিয়ে চুপ করে বসে থাকি। জীবনটাই আসল গৌরবের তো! স্বাধীনতা ভাল কথা, তবে প্রাণের চেয়ে বেশি দাম নয় তার—এই আমার কথা।"

'যেমন বলেছিলাম, তিনদিনের যাত্রা নিউ অর্লিন্স অবধি। জেনারেল লোকটা আর আমি, দুজনেই দারুণ শেয়ানা। কলা খেতে-খেতে 'চোখে বিস্বাদ', 'জিভে চক্ষুশূল' হয়ে উঠেছে, তবে ওর দৌলতেই তো রাহা-খরচটা বেঁচে যাচ্ছে দু'জনের। রাতে আমি সাবধানে গুঁড়ি মেরে বেরুলাম, নিচের ডেকে এক বালতি টাটকা জলও পেলাম।

'জেনারেল তি ভেগাটি খালি বড়-বড় কথা আর বাণী আওড়ায়। মুখের আগল খুলে দিয়ে যাত্রার একঘেয়েমি যেন আরো বাড়িয়ে দেয়। তার ধারণা আমি তারই দলের একজন বিপ্লবী। বলেছে, ওর দলে নাকি অনেক আমেরিকান আর অন্য বিদেশীরাও রয়েছে। খালি হামবড়াই আর জাঁক করে হাজার রকম কথা, আর নিজেকে ভাবে একজন মহা-নায়ক। তার ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল বলে যত আপসোস তার নিজেকে নিয়েই। ক্ষুদে ফানুসটা একটি কথাও উচ্চারণ করে না ওর যেসব অসভ্য গাধাগুলো গুলি খেয়ে মরল তাদের জন্য, তারা তো ওরই বিদ্রোহে মরতে গিয়েছিল।

'দ্বিতীয় দিনেও তার কী দেমাক আর নাক উঁচু ভাব! অথচ সে নেহাৎই জাহাজের খোলে-লুকনো একটি কুচক্রী, খচ্চর আর চুরি-করা কলার ওপর বেঁচে আছে। আমাকে বলছিল ওর বানানো সেই মহান্ রেলরাস্তাটার কথা। শোনাল একটা হাস্যকব ঘটনার বর্ণনাও—নিউ অর্লিয়ন্স থেকে কীভাবে সে ভুলিয়ে ভালিয়ে একটা বোকা আইরিশম্যানকে নিয়েছিল ওর সরু-গেজের খুদে 'লাশঘরের' লাইনে গাঁইতি চালাবার জন্য। নোংরা বেঁটে জেনারেল যেভাবে বলছিল অপমানকর কাহিনীটা যা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে—ক্ল্যান্সি নামের এক বেপরোয়া বোকা চিড়িয়াব কাটা ল্যাজে কেমন করে নুনের ছিটে লাগিয়েছিল সে। তারপব কী হাসি, একটানা হা-হা হাসি। কালোমুখ, জাতিচ্যুত বিদ্রোহী, গলা অবধি কলার কাঁদিতে দাঁড়িয়ে হাসছে। দেশ বা বন্ধু বলতে কেউ তাব নেই, তবু হাসে!

'মুখ চেপে ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ হেসে বলে, "সেনর, অমন আইরিশ ভাঁড়টার কথা শুনলে আপনি হাসতে হাসতে মরে যাবেন। আমি বললাম, গুয়াটেমালায় চাই শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ। সে বললে, আমি আপনাদেব দলিত দেশটার জন্য কড়া আঘাত হানব। বললাম, সে তো তুমি করবেই। আঃ এমন সঙের আইরিশ। জেটিতে একটা বাক্স খুলে যেতে দেখেছিল, তাতে রক্ষীদের জন্য রাইফেল ঠাসা। সে ভাবল সব বাক্সেই বুঝি বন্দুক বয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে শুধু গাঁইতি খন্তা। হ্যাঁ। আব সেনর, আপনি যদি তাব মুখটা দেখতেন যখন তাকে কাজে লাগানো হল!"

'এইভাবে তো মজুর-নিয়োগ দপ্তরের প্রাক্তন কর্তা জাহাজ-যাত্রার একঘেয়েমি বাড়াতেই লাগল নানা মজাব তামাশা আর গল্প শুনিয়ে। তবে মাঝে মাঝে আবার কলার কাঁদির ওপর কাঁদলও হারানো মুক্তির লক্ষ্য, আর খচ্চরের ওপর বক্তৃতা করে।

'নিউ অর্লিয়ন্সের জেটিতে স্টীমারের ধাক্কা লাগতে এক মধুর আওয়াজ পেলাম যেন। একটু বাদেই শুনলাম শত-শত খালি পায়ের পট্পট শব্দ—দাগো কুলির দল ফসলের বোঝা খালাস করতে লাফিয়ে পড়ছে ডেকে আর খোলের ভেতর। আমি আর জেনারেল খানিকক্ষণ হাত লাগালাম কাঁদিগুলো এগিয়ে দিতে, ওরা

ভাবল আমরা কুলিদলেরই লোক। প্রায় আধঘন্টা বাদে আমরা গুটিগুটি স্টীমার থেকে নেমে পড়লাম ঘাটে।

'এবার অচেনা-অজানা ক্ল্যান্সি সম্মান পেল এক বিরাট বিদেশী জলদস্যু শক্তির প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করার। আমি প্রথমেই জেনারেল আর নিজের জন্য কিনলাম অনেকগুলো বড় বোতলের পানীয়, আর জলখাবার—যার মধ্যে কলাটা নেই। জেনারেল আমার পাশে গট্‌গট করে হেঁটে চলল, সব ব্যবস্থার ভার আমার ওপর ছেড়ে। আমি তাকে লাফায়েৎ স্কোয়ার অবধি নিয়ে যাই, তাকে ছোট পার্কের একটা বেঞ্চে বসিয়ে দিই। সিগারেট তো তার জন্য এনেছিলামই, সে ধপ্ করে বেঁটে মোটা তুষ্ট ভবঘুরের মতো বসল আসনে। ওকে বেশ ঘুরে-ফিরে দেখি, যা দেখি তাতে আনন্দই পাই। স্বভাবে ও সংস্কারে সে বাদামি, আর এখন, নোংরা আর ধুলোর ছোপ মেখে ডোরাকাটা। ওর খচ্চরটাকে ধন্যবাদ দিতে হয় ওর ছেঁড়াখোড়া ধুকড়ি পোশাকের জন্য। হ্যাঁ, জেনারেলের চেহারা এবার পছন্দ হয়েছে ক্ল্যান্সির।

'আমি খুব নরম-সরমভাবে একটা প্রশ্ন রাখি, কোনো গতিকে কারো কিছু টাকা গুয়াটেমালা থেকে এনেছে কিনা। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঠেকায় বেঞ্চের পিঠে। একটা সেন্ট্‌ও নয়। ঠিক আছে। অবশ্য হতে পারে, ওর কোনো-কোনো বন্ধু ক্রান্তি-এলাকা থেকে তাকে পরে তহবিলের টাকা পাঠাবে—বললে সে। নজরে পড়ার মতো কিছু সম্বল যে ওর নেই তা জলের মতো পরিষ্কার।

'আমি তাকে বললাম আসন ছেড়ে যেন চলে না যায়, আর আমি নিজে চলে গেলাম পয়ড্রাস আর ক্যারোণ্ডেলেটের কোণটিতে। ওখান থেকেই শুরু বীটের পুলিস ও'হারার এলাকা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও'হারা চলে এল সঙ্গে। প্রকাণ্ড চেহারার চমৎকার লোক, লাল মুখ, চক্‌চকে বোতাম, হাতে ঘোরায় বেটন। চমৎকার ব্যাপার হবে ও'হারার পবিত্র এলাকার মধ্যে গুয়াটেমালার ঢুকে পড়া। আর ড্যানি ও'হারার পক্ষেও বেড়ে মজা হবে হপ্তায় একবার কি দু'বার বেটন চালিয়ে বিপ্লব আর বিদ্রোহ দমন করা।

'"পঞ্চাশ-ছেচল্লিশ কি এখনো চালু রয়েছে ড্যানি?"—ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি আমি।

'ও'হারা আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, ভাল রকম। ওর খানিকটা চাই নাকি?"

'পঞ্চাশ-ছেচল্লিশ হল বিখ্যাত শহর-আইনের ধারা, ওতে অধিকার দেওয়া আছে পুলিশের কাছে থেকে যারা অন্য অপরাধগুলো গোপন রাখতে সমর্থ হয় তাদের গ্রেপ্তার করা, শাস্তি দেওয়া, আর জেলে পোরা।

'আমি বলি, "জিমি ক্ল্যান্সিকে চিনতে পারলে না তুমি? আচ্ছা মুখপোড়া দত্যি!" অতএব, ক্রান্তি-এলাকার কলঙ্কজনক পোঁচড়ার নিচে আমাকে যখন চিনতে পেরেছে

ও'হারা, তখন একটা বাড়ির দরজা-মুখে তাকে ঠেলে নিয়ে বললাম আমি কী চাই, আর কেন চাই। ও' হারা বললে, "ঠিক আছে জিমি। ফিরে গিয়ে বেঞ্চি আঁকড়ে বোসো। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

'অতটাই সময় নিয়ে ও'হারা হেঁটে চলে এল লাফায়েৎ স্কোয়ারে। দেখল দু'টি ক্লান্ত প্রাণী নোংরা করছে একটা বেঞ্চি আসন। আরো দশ মিনিটে আমি জে. ক্ল্যাঙ্কি, আর জেনারেল ডি ভেগা, গুয়াটেমালার প্রেসিডেন্টপদ প্রার্থী—চলে এলাম থানা বাড়িতে। জেনারেল ভীষণরকম ভীত, চাইছে আমি তার মর্যাদা আর খ্যাতির গুণকীর্তন করি।

'আমি পুলিসকে বলি, "এ লোকটা ছিল রেলরাস্তা তৈরির দালাল। এখন ফতুর হয়ে বসে পড়েছে। চাকরি হারিয়ে এখন হয়েছে ছোটখাটো ছারপোকা।"

'খুদে সোডা-মেশিনের ফোয়ারার মতো হিসিয়ে উঠল জেনারেল "বা-বা-বাঃ! সেনর, তুমি আমার দেশে আমারই ফৌজে থেকে লড়াই করলে, মিছে কথা বলছ কেন এখন? তোমার বলা উচিত আমি সেই জেনারেল ডি ভেগা, যে নিজেই সেপাই, গোপন ষড়যন্ত্রের একজন নায়ক—"

'"রেল রাস্তার মজুর", আবার আমি বলি, "পেটুক শুয়োর। কোনো কাজের নয়। চুরি-করা কলা খেয়ে তিনদিন কাটিয়েছে। দেখুন না ওকে। দেখলেই তো বোঝা যায়।"

'যাহোক, জেনারেলের ওপর থানাদারের হুকুম হল পঁচিশ ডলার অর্থদণ্ড, নয়তো ষাটদিনের ঘানি। তার কাছে তো একটি পয়সাও নেই, তাই মেয়াদি খাটাই মেনে নেয় সে। আমায় ছেড়ে দিল, জানতাম ছাড়বেই, কারণ দেখাবার মতো টাকা আমার ছিল, তা ছাড়া ও' হারাও আমায় চেনে। ষাট দিন! মানে ঠিক সেই ষাটটি দিন যখন আমি কাম্—থুড়ি, গুয়াটেমালার বিরাট দেশে গাঁইতি চালিয়েছিলাম।'

এবার থামল ক্ল্যাঙ্কি। কড়া রোদপোড়া মুখে এবার একটা তৃপ্তির চিহ্ন।

জিজ্ঞেস করল, 'একটু আমার সঙ্গে ওই মোড়টার দিকে আসবে? যদি অবশ্য কিছু মনে না কর। ওখানে গেলে তোমায় আমি দেখাব আদালতের এক নম্বর নিদর্শন বস্তু। আমি নিজেও ওখানে যাই, দশ মিনিট বাদে-বাদে, জিনিসটিকে দেখতে। চল, সময় প্রায় হয়ে এল।'

ওর সঙ্গে চলে গেলাম আরসুলাইন্‌সের মোড়ে, রাস্তা ধরে খানিকটা হেঁটে গেলাম। থানা জেলখানার রক্ষীদের তত্ত্বাবধানে একদল লোক কাজ করছে—জঘন্য নোংরা রাস্তাটা সাফাইয়ের কাজ। ওইভাবে ওরা অর্থদণ্ড দিতে না পারার বদলে গায়ে খেটে জরিমানা শোধ করছে।

পাশের ফুটপাতে ক্ল্যাঙ্কি আমায় দাঁড় করালো, ঠিক উল্টো দিকে একটা বেঁটে, মোটা-গোল, কালচে মুখচোখ, বিদেশী চেহারার লোক প্রাণপণে যুঝছে ভারি লোহার একটা মাটি-আঁচড়ানো 'বিদা' নিয়ে। গরমটা পড়েছে জবরর, প্রায় ক্রান্তিমণ্ডলের

মতো, আর বেঁটে লোকটার ছেঁড়া জামার এখানে ওখানে ফুটে উঠেছে বড় ঘামের দাগ।

ক্ল্যান্সি চড়া গলায় ডাকল, 'এই যে, মনসিয়ার।' বেঁটে লোকটা চোখ তুলে কপাল কুঁচকে তাকাল। 'মোটা, ষণ্ডাগুণ্ডা মানুষ', ফুর্তিভরা গলায় ক্ল্যান্সি চেঁচাল, 'এই রকমই তো চাই নিউ অর্লিয়ন্সে। হ্যাঁ, সৎ কাজ করে যাবার জন্য। বাঃ বাঃ! আয়ার্ল্যাণ্ডই এখন জাঁক দেখাবে!'

' লবঙ্গের পাতা—আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় চিহ্ন। তালপাতা—ক্রান্তিমণ্ডলের প্রতীক।

The Shamrock and the Palm. এইন্‌স্লি'জ, ১৯০৩

অদৃষ্টের বিচিত্র পথ

নানা পথে খুঁজেছি আমার ভাগ্য।
সরল হৃদয়, সবল, প্রেমের জ্যোতিতে উজ্জ্বল—
দেবে না কি শক্তি মোরে এরা
সে-নিয়তি মাড়িবার, গড়িবার, ভাঙিবার
নিজ-হাতে রচিয়া তোলার'?

—ডেভিড মিগ্‌নোর অপ্রকাশিত কবিতা

গান শেষ হল। কথাগুলো ডেভিডের; আবহাওয়া কোনো পল্লীর। সরাইখানার টেবিল ঘিরে অভ্যাগতরা তুমুল হর্ষধ্বনি করলেন, কারণ তরুণ কবিটিই সুরার খরচ জুগিয়েছে। শুধু উকিল ম. পাপিনো, পংক্তিগুলো শুনে একটু মাথা নাড়লেন—কারণ উনি বইয়ের পোকা, তা'ছাড়া অন্যদের সঙ্গে মদ্যপানও করেননি।

ডেভিড গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে, রাতের বাতাস সেখানে ওর মাথা থেকে সুরার বাষ্প উড়িয়ে দেয়। তখনই ওর মনে পড়ে যায়, সেদিন সে ঝগড়া করেছিল ইভোনের সঙ্গে, আর ও তাই মনস্থ করেছিল রাতেই নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে বাইরের বিশাল পৃথিবীতে, খ্যাতি ও মর্যাদা খুঁজতে।

মহা উল্লসিত হয়ে মনে-মনে ভেবেছিল, 'আমার কবিতাগুলো যখন লোকের মুখে মুখে ফিরবে, তখন ওর হয়তো মনে পড়বে আজকের কড়া কথাগুলো যা ও আমায় শুনিয়েছিল।'

সরাইখানার হুল্লোড়বাজরা ছাড়া গোটা গ্রামই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবার কুটিরঘরের ছায়ায় গুঁড়ি মেরে ও নিঃশব্দে ঢুকল নিজের কামরায়, সামান্য যা কিছু কাপড়চোপড় একটা পুঁটলির মতো করে নিল। পুঁটলিটা একটা ছড়ির মাথায় লটকে সে মুখ ফেরাল রাস্তার দিকে। রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে ভেরনয় থেকে।

রাতের খোঁয়াড়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে ওর বাপের ভেড়ার পাল। ও পাশ কাটিয়ে যায়। রোজ এই ভেড়াগুলোকেই ও চরাতে নিয়ে যেত, ওদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ও বসে-বসে টুকরো কাগজে কবিতা লিখত। দেখতে পাচ্ছে ঈভোনের ঘরের জানলায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ একটা দুর্বলতা মুহূর্তের জন্য ওকে পেয়ে বসে, ওর মন টলে যায়। হয়তো ও-আলোটার মানে ঈভোনের অনুশোচনা, ঘুমোতে পারেনি, ওর মনে রাগ, হয়তো ফের সকাল হলে—কিন্তু না! ও এখন সংকল্পে স্থির। ভেরনয় ওর উপযুক্ত স্থান নয়। এখানে একটিও প্রাণী নেই যাকে ওর ভাবনাচিন্তার সমঝদার বলা যায়। ও রাস্তার ওপারেই বরং রয়েছে ওর ভাগ্য, ওর ভবিষ্যৎ।

ঝাপসা জ্যোৎস্না-ধোয়া খোলা মাঠটার ওপর দিয়ে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা, চষা খেতের আলের মতো সিধে। গাঁয়ের লোকদের ধারণা ওটা অন্তত্পক্ষে প্যারিস্ অবধি গিয়েছে। আর ওই প্যারিস নামটাই কবি বিড়বিড় করে বলতে থাকে চলার সময়। ডেভিড তো এর আগে কখনো ভেরনয় ছেড়ে এত দূর আসেনি!

বাঁদিকের পথ

অতএব, পাঁচ ক্রোশ গিয়ে রাস্তাটা হয়ে গেছে গোলকধাঁধা। আরো চওড়া একটা অন্য রাস্তার সঙ্গে সমকোণে জুড়ে গিয়েছে। অনিশ্চিত ডেভিড কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ধরে বাঁদিকের পথ।

আরো জাঁকালো এই উঁচু রাস্তার ওপর ধুলোর মধ্যে ছাপ রেখে গেছে কোনো সদ্য চলে-যাওয়া গাড়ির চাকা। আধঘন্টা বাদে হদিশ পাওয়া গেল এই দাগের সূত্রের, স্বচক্ষেই সে দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড গাড়ি—কিন্তু সেটা আটকা পড়েছে উঁচু টিলার নিচে ছোট একটা সোঁতার কাদার মধ্যে। গাড়ির চালক আর সহিসরা চেঁচাচ্ছে আর ঘোড়াদের লাগাম ধরে টানাটানি করছে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিপুলবপু কালো পোশাকপরা লোক, আর লম্বা হাল্কা আংরাখা জড়ানো এক পাতলা মহিলা।

চাকরগুলোর কাজের মধ্যে কৌশলের অভাব ডেভিডের নজরে পড়ছে। সে নিঃশব্দে সামাল দিতে শুরু করে ব্যাপারটা—সওয়ারি সহিসদের হুকুম করে ঘোড়ার উদ্দেশে চেঁচামেচি বন্ধ করতে, আর জোর খাটাতে চাকার ওপর। শুধু চালক তার পরিচিত গলায় হুকুমহাকাম করুক। আর ও নিজে গিয়ে গাড়ির পেছনে সবল কাঁধ লাগায়। সবাই মিলে একটি টানেই প্রকাণ্ড গাড়িটাকে তুলে ফেলে শক্ত মাটির ওপর। সহিস-সওয়ারি যার-যার ঘোড়ায় উঠে বসে।

ডেভিড এক-মুহূর্ত এক পায়েই দাঁড়িয়ে ছিল। বিশালবপু ভদ্রলোক তার দিকে হাত নাড়লেন। নিজের চেহারার মতোই দরাজ, সহৃদয় ও অভ্যাস-মসৃণ গলায়

বললেন, "গাড়িতে প্রথমে তুমি ঢোকো।" এ কণ্ঠ বাধ্যতা পেতেই অভ্যস্ত। তরুণ কবির মনে ঈষৎ দ্বিধার ভাব এলেও, তা দ্বিতীয়বারের হুকুমে কেটে গেল। ডেভিডের পা উঠল গাড়ির পা-দানিতে। অন্ধকারে পেছনের আসনে মহিলাটির অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পাচ্ছে সে। উল্টোদিকের আসনে ও প্রায় বসতে গিয়েছে, তখন সেই কণ্ঠস্বর আবার নিজের মর্জি তামিল করালো ওকে দিয়ে: 'তুমি বসবে মহিলাটির পাশে।'

ভদ্রলোক তাঁর বিপুল ওজন ছেড়ে দিলেন সামনের আসনে। গাড়ি চলতে লাগল টিলার চড়াই ধরে। ভদ্রমহিলা তার নিজস্ব কোণটিতে গুটিশুটি নীরব হয়ে বসে আছে। ডেভিড আন্দাজই করতে পারে না সে বৃদ্ধা না যুবতী, তবে তার পোশাক থেকে একটা মিষ্টি হাল্কা সুবাস তার কবি-কল্পনাকে উৎসাহিত করে—রহস্যের পেছনে নিশ্চয় রমণীয়তাই আছে। এ এক মনোজ্ঞ অভিযান যা ও আগে প্রায়ই কল্পনায় অনুভব করত। কিন্তু এখন অবধি সে কোনো সূত্রের হদিশ পাচ্ছে না, কারণ এই অনধিগম্য সঙ্গীদের মধ্যে বসে ওদের মুখে একটি কথাও শুনতে পায়নি।

ঘন্টাখানেক পর গাড়ির জানলা দিয়ে ডেভিড দেখল তারা কোনো শহরের রাস্তা দিয়ে চলেছে। তারপর গাড়িটা থামল একটা বন্ধ, অন্ধকার বাড়ির সামনে। একজন সহিস নেমে অধৈর্যভাবে বাড়ির দরজায় আঘাত করে। ওপরে একটা জালি ঢাকা জানলা খুলে যায়, রাতের টুপিপরা একটা মাথা বেরিয়ে আসে।

'কারা তোমরা এই রাতে অসময়ে ভাল মানুষদের বিরক্ত করছ'? আমার ঘর বন্ধ। এত রাতে কোনো সত্যিকার খদ্দের রাস্তায় বেরোয় না! দরজা ধাক্কানো বন্ধ করে বিদায় হও!'

সহিস এবার তো-তো করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'খোলো খোলো! মঁসেনিয় মার্কি দ্য বোপারতুই এসেছেন যে!'

ওপরের গলায় আওয়াজ ওঠে—'ওঃ হো! ক্ষমা করবেন হুজুর, হাজার বার মাপ চাইছি। আমি জানতাম না—এত রাত হয়ে গেছে তো—এক্ষুনি দরজা খুলে দেব, এ বাড়ি তো হুজুরেরই হেপাজতে!'

ভেতর থেকে শেকল আর আগলের শব্দ হয়। দরজা পুরো খুলে গেল। ঠাণ্ডায় আর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল 'সিলভার ফ্লাগনের" গৃহকর্তা—আধা পোশাকপরা, হাতে মোমবাতি। (মার্কি) মার্কুইসের পেছন পেছন গাড়ি থেকে নামল ডেভিড। তার ওপর হুকুম হল, 'মহিলাটিকে সাহায্য কর।' কবি হুকুম তামিল করে, মহিলাকে নামাতে গিয়ে টের পায় তার ছোট হাতটা কাঁপছে। পরের আদেশটি হল—'বাড়ির ভেতরে চল।'

কামরাটা হল সরাইখানার লম্বা ভোজনকক্ষ। একটা বড় ওককাঠের টেবিল লম্বালম্বি বসানো। সামনের দিকের চেয়ারে বসলেন বিশালদেহী ভদ্রলোক। মহিলা বসলেন

আরেক দিকে দেয়াল ঘেঁষে, ভীষণ ক্লান্তির ভাব নিয়ে। ডেভিড দাঁড়িয়ে রইল, ভাবছিল এখন কী ভাবে ভালোয়-ভালোয় বিদায় নিয়ে ফের নিজের পথে চলবে।

আভূমি নত হয়ে গৃহকর্তা বললে, 'হুজুর প্রভু, য-য্-যদি জানতাম আ-আমার এই সম্মান হ-হবে, আ-আ-আপনার আনন্দের ব্যবস্থা থাকত। আছে শু-শ্-শুধু পানীয় আর ঠাণ্ডা পাখির-মাংস, আর বো-বো-বোধহয়—'

মার্কুইস বললেন, 'মোমবাতি!'—আধ ডজন মোমবাতি এনে সেগুলো জ্বালিয়ে বসিয়ে দিল টেবিলের ওপর।

'যদি মঁসিয়ে ইচ্ছে করেন, একটা বিশেষ বার্গাণ্ডি চেখে দেখতে পারেন—আছে এক বাক্—'

'মোমবাতি'—ফের আঙুল ছড়িয়ে বললেন মঁসিয়।

'নিশ্চয়..... এক্ষুনি .... উড়ে যাচ্ছি হুজুর!'

আরো এক ডজন মোমবাতি জ্বলে উঠল হল-কামরায়। মার্কুইসের বিশাল বপুটি এবার ছড়িয়ে পড়ল চেয়ার উপচে। শরীরের আপাদমস্তক ঢেকেছেন চমৎকার কালো পোশাকে, শুধু তুষারশুভ্র কব্জির আস্তিন আর গলার কুচি-দেওয়া কাপড়টুকু ছাড়া। এমনকি তার তলোয়ারের হাতল আর খাপটাও কালো। একটা বিদ্রূপাত্মক অহংকারের অভিব্যক্তি তার চোখেমুখে। চোমরানো গোঁফের দুই প্রান্ত প্রায় উঠে গিয়েছে তাঁর ব্যঙ্গভরা চোখদুটোর কাছাকাছি।

মহিলাটি নিশ্চল বসেছিল, এবার ডেভিড লক্ষ্য করল সে যুবতী, এবং বিষাদময় এক আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের অধিকারিনী। ওর অবহেলিত সুষমার ধ্যান থেকে আচম্কা ডেভিডের চটক ভাঙল মার্কুইসের গম্‌গমে গলার স্বরে।

'নাম কী তোমার? কী পেশা?'

'ডেভিড মিগনো। আমি কবি।'

মার্কুইসের গোঁফ আরো কুঁকড়ে গেল চোখের কাছে।

'বেঁচে আছ কী করে?'

'আমি রাখালিও করি; বাবার ভেড়ার পাল চৌকি দি'—মাথা উঁচু করে জবাব দিল ডেভিড, তবে গালটা একটু রাঙিয়ে উঠেছে।

'তা'হলে শোনো মাস্টার রাখাল ও কবি, আজ রাতে আচমকা ভুল করেই তোমার কপাল ফিরে গেছে। এ মহিলা আমার ভাইঝি, মাদমোয়াজেল লুসী দ'ভারেনে। অভিজাত বংশের মেয়ে, নিজের অধিকারেই বার্ষিক দশহাজার ফ্রাঁর মালিক। এর কমনীয় সৌন্দর্য তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। এই তালিকা শুনে যদি তোমার রাখাল-হৃদয় তৃপ্ত হয় তা'হলে একটা কথাতেই এ তোমার বধূ হতে পারে। না, মাঝখানে কথা নয়! আজ রাতে ওকে আমি কোঁত্ দা ভিলমো'র প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁর হাতে এর হাত সমর্পণ করার কথা ছিল পাকা। অতিথিরা উপস্থিত ছিল; পুরোহিত অপেক্ষা করছিল; পদমর্যাদা ও সম্পদের দিক

থেকে একজন সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ। তখন কিনা, বেদির সামনে এই কন্যা, এমনিতে শান্ত কর্তব্যপরায়ণা, হঠাৎ বাঘিনীর মতো খেপে ফিরল আমার দিকে, তারপর আমার ওপর নিষ্ঠুরতা আর অপরাধের দোষারোপ—হাঁ-করে চেয়ে-থাকা পুরোহিতের সামনেই সে ভঙ্গ করল ওর বিবাহে আমার চুক্তিবদ্ধ শপথ। তখনই এবং সেখানেই, আমিও দশ হাজার শয়তানের দিব্যি করে প্রতিজ্ঞা করলাম, বিয়ে ওকে দেবই, প্রাসাদ ছেড়ে প্রথম যে-ব্যক্তির দেখা পাব তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব—তা সে রাজপুত্রই হোক, চোর বা ছিঁচকে মজুর, যাই হোক। তা, মেষপালক, তুমিই প্রথম। মাদ্‌মোয়াজেলের আজ রাতেই বিয়ে হবে। তুমি না হলে আর কেউ। তোমার হাতে এখন দশ মিনিট সময় সিদ্ধান্ত নেবার। কোনো কথা বা প্রশ্ন তুলে অযথা বিরক্ত কোর না আমায়। দশ মিনিট, রাখাল বালক, দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়টা।'

মার্কুইস্ টেবিলের ওপর সাদা আঙুলগুলো থাবড়ে সজোরে ড্রাম বাজাতে লাগলেন। অপেক্ষা করার ভান করছেন যেন। মনে হচ্ছিল কোনো বিরাট বাড়িব দরজা জানলা এমনভাবে বন্ধ যে কেউ আসতে পারবে না। ডেভিড হয়তো কথা বলত, কিন্তু ওই প্রকাণ্ড লোকটার আচরণ ওব মুখ বন্ধ কবে দিয়েছে। তার বদলে, ও মহিলাটির চেয়াবেব পাশে গিয়ে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

'মাদ্‌মোয়াজেল', বলতে শুরু করে ও; অবাক হয়ে যায় এমন লাবণ্যময়ী সুন্দরীর সামনে কেমন করে অনায়াসে ওর মুখে এসে যাচ্ছে কথাগুলো—'আপনি তো শুনলেন আমি বলেছি আমি একজন মেষপালক। মাঝে মাঝে কল্পনাও করেছি যে আমি এক কবি। কবিত্বের প্রমাণ যদি হয় সৌন্দর্যের আরাধনা আর সমাদর, তাহলে এখন দ্বিগুণ হল আমার কল্পনাশক্তি। আমি কি কোনো প্রকারে আপনার সেবা করতে পারি, মাদমোয়াজেল?'

যুবতী নারী শুকনো বিষাদমাখা চোখে তাকাল ওর দিকে। ডেভিডের সরল উজ্জ্বল মুখ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার গাম্ভীর্যে নিথর। ওর দৃঢ় ঋজুদেহ, আর নীল চোখের তরলিত সমবেদনা,—বোধহয় মেয়েটির নিজেরও দীর্ঘ-বঞ্চিত সহায়তা ও সহৃদয়তার জন্য আকুতি, —দুয়ে মিলে তাই মেয়েটির চোখে হঠাৎ জাগিয়ে তুলল অশ্রুজল।

নিচু গলায় সে বলল, 'মঁসিয়, আপনাকে তো সদয় আর অকপট বলেই মনে হয়, উনি আমার কাকা, আমার বাপের ভাই, একমাত্র স্বজন। উনি আমার মাকে পছন্দ করতেন, কিন্তু আমায় ঘেন্না করেন কারণ আমি নাকি হুবহু মায়ের মতো। আমার জীবনটাকে যেন একটানা আতঙ্কে বিষিয়ে তুলেছেন উনি। ওঁর চেহারা দেখলেই ভয় করে আমার, আগে কখনো ওঁর অবাধ্য হবার সাহস করিনি। কিন্তু আজ রাতে আমায় বিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন আমার চেয়ে তিনগুণ বয়েসের এক বুড়োর সঙ্গে। মঁসিয় আমাকে ক্ষমা করবেন আপনার ওপর এই আপদ টেনে

এনেছি বলে। এমন পাগলের কাজ করতে উনি জোর জবরদস্তি করলেও আপনি অবশ্য অস্বীকারই করবেন। কিন্তু আপনার সহৃদয় কথাগুলোর জন্য অন্তত আমাকে ধন্যবাদ দেবার সুযোগ দেবেন। বহুদিন হল কেউ আমার সঙ্গে কথাই বলেনি।'

কবির চোখে এখন সহৃদয়তা ছাড়াও বুঝি আর কিছু ছিল। সে যে কবি তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ঈভোন এখন বিস্মৃত। এই অপূর্ব নতুন মাধুরিমা সমস্ত সজীবতা আর লাবণ্য নিয়ে গ্রাস করেছে তাকে। ও বরতনুর মৃদু সুবাস কত অদ্ভুত আবেগে যেন ভরে তুলছে তাকে। কবির কমনীয় দৃষ্টি উষ্ণ হয়ে ঝোঁকে মেয়েটির দিকে—মেয়েটিও তৃষিত নয়নে ফিরে তাকায়।

ডেভিড বলল, 'আমায় দশটি মিনিট সময় দেয়া হয়েছে একটা কাজ সেরে ফেলতে, যা করতে হয়তো আমায় বহু বছর উৎসর্গ করতে হত। আমি বলব না যে আমি তোমায় দয়া করছি, মাদ্‌মোয়াজেল; সেটা সত্যি কথা হবে না—আমি তোমায় ভালবেসেছি। এখনই তোমার কাছে আমি ভালোবাসা দাবি করতে পারি না, তবে এই নিষ্ঠুর লোকটাব হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করতে দাও; সময়মতো ভালবাসাও হয়তো এসে যাবে। আমার ধারণা আমার ভবিষ্যৎ আছে, চিরদিন রাখাল হয়ে থাকব না। এখন আমি সারা মনপ্রাণ দিয়ে তোমায় আগলে থাকব, তোমার জীবনের দুঃখ কিছুটা ঘোচাব। তুমি তোমার ভাগ্য আমার হাতে সঁপে দেবে, মাদ্‌মোয়াজেল?'

'আঃ, দয়ার খাতিরে নিজেকে বলি দিতে যাচ্ছ তুমি!'

'ভালবাসাব খাতিরে। সময় প্রায় হয়ে গেল, মাদ্‌মোয়াজেল।'

'পরে আপশোস করবে, আমায় ঘেন্না করবে।'

'শুধু তোমাকে সুখী করবার জন্যই আমি বেঁচে থাকব, তোমার যোগ্য হবার চেষ্টা করব।'

আংরাখার তলা থেকে মেয়েটির ছোট সুন্দর হাত সন্তর্পণে উঠে এল ওর হাতে।

ফিসফিসিয়ে বলল মেয়েটি, 'আমার জীবন দিয়ে ভরসা রাখব তোমার ওপর। আর ভালবাসা—ভালবাসাও খুব একটা দূবে থাকবে না, যেমন ভাবছ। বল ওঁকে। একবার ওঁর চোখের দাপট থেকে দূরে থাকলে হয়তো ভুলেই যাব সব।'

ডেভিড গিয়ে দাঁড়াল মার্কুইসের সামনে। কালো মূর্তিটা নড়েচড়ে উঠল, বিদ্রূপভরা চোখদুটো তাকাল হলের বড় ঘড়িটার দিকে।

'এখনো দু'মিনিট বাকি আছে। একজন রাখালেব আট মিনিট লেগে গেল ঠিক করতে, সে এক সুন্দরী অর্থশালিনী কন্যাকে গ্রহণ করবে কিনা! বলো হে রাখাল, তুমি মাদ্‌মোয়াজেলের স্বামী হতে প্রস্তুত?'

গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে ডেভিড বলল, 'মাদ্‌মোয়াজেল আমার অনুরোধে স্ত্রী হতে স্বীকৃত হয়ে আমাকে অশেষ সম্মান দিয়েছেন।'

মার্কুইস বললেন, 'ভাল বলেছ হে! তোমার মধ্যে অমাত্যসুলভ গুণ এখনই দেখতে পাচ্ছি, মাস্টার মেষপালক। মাদ্‌মোয়াজেলের ভাগ্যে হয়তো এর চেয়েও বাজে কোনো পুরস্কার জুটতে পারত। এখন, যতো তাড়াতাড়ি চার্চ আর শয়তান সম্মতি দেয়, কাজটা সুসম্পন্ন করা যেতে পারে।'

তলোয়ারের বাঁট দিয়ে সজোরে শব্দ করলেন টেবিলে। গৃহকর্তা এল, হাঁটু কাঁপছে তার, সঙ্গে এনেছে আরো মোমবাতি, কর্তার খেয়াল আগেই আন্দাজ করেছে এই ভরসায়। মার্কুইস্ বললেন, 'একজন পুরুত ডাকো, পুরুত! বুঝতে পেরেছ? দশ মিনিটের মধ্যে একজন পুরুতকে ডেকে আনো এখানে, নতুবা—'

গৃহকর্তা মোমবাতিগুলো ফেলে ছুটে গেল।

পুরোহিত এলেন, ঘুমে ভারী চোখ, উশ্‌কোখুশ্‌কো চেহারা। তিনি মন্ত্র পড়ে ডেভিড মিগ্‌নো আর লুসী দ'ভারেনেকে স্বামী-স্ত্রী ঘোষণা করলেন, মার্কুইসের ছুঁড়ে-দেয়া একটা সোনার মোহর পকেটস্থ করে আবার কেটে পড়লেন অন্ধকারের মধ্যে।

গৃহকর্তার দিকে অলক্ষুণে আঙুলগুলো ছড়িয়ে মার্কুইস হুকুম করলেন—'সুরা'! সুরা যখন এল, বললেন, 'গেলাসগুলো ভরে দাও!' মোমবাতির আলোয় তিনি টেবিলের মাথায় বসেছেন, অহমিকা আর গরলের কালো পাহাড়। যখন ভাইঝির দিকে নজর করলেন, কোনো পুরনো প্রেমের স্মৃতি যেন, ওর চোখে বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুরার পাত্র তুলে বললেন, 'আমি যা বলি তা শোনার পর পান কর। তুমি যাকে আজ বিয়ে করলে সে তোমার জীবন কদর্য বিপর্যস্ত করে তুলবে। ওঁর মধ্যে যে বংশধারার রক্ত বইছে তা কপট কালো মিথ্যা আর লাল ধ্বংসের রক্ত। তোমার অপমান আর আশঙ্কা ডেকে আনবে এই স্ত্রী। যে শয়তান ওর ওপর ভর করেছে তা ছড়িয়ে আছে ওর চোখে, চামড়ায়, মুখে—যা একজন সরল চাষীকেও প্রতারণা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মঁসিয় কবি, এই হল তোমার সুখী জীবনের অঙ্গীকার। এবার পান কর। শেষ পর্যন্ত, মাদ্‌মোয়াজেল, তোমার হাত থেকে রেহাই পেলাম!'

মার্কুইসও পান করলেন। একটা হ্রস্ব আর্তস্বর, যেন কোনো আকস্মিক আঘাতের যন্ত্রণায়—বেরিয়ে এল মেয়েটির কণ্ঠ থেকে। ডেভিড হাতে গ্লাস নিয়ে তিন পা এগিয়ে গিয়ে মার্কুইসের সামনে দাঁড়াল। এখন আর ওর মধ্যে মেষপালকের মেজাজ কিছু নেই বলতে গেলে।

শান্তভাবে বললে, 'আপনি এই মাত্র আমাকে সম্মান দিয়ে "মঁসিয়" বললেন। তাহলে বোধহয় আমি আশা করতে পারি মাদমোয়াজেলের সঙ্গে আমার বিয়ে আমাকে আপনার কাছাকাছি এনে দিয়েছে—ধরা যাক্ প্রতিবিম্বিত মর্যাদা—দিয়েছে মঁসেনিয়'র সামনে আমার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবার অধিকার, অন্তত একটা ছোটখাট কাজের বিষয়ে। বিষয়টা আমার মনের মধ্যেই আছে!'

'সেটা তুমি আশা করতে পার, মেষপালক', ব্যঙ্গভরে বললেন মার্কুইস। ডেভিড এবার তার গ্লাসের মদ সিধে বিদ্রূপভরা চোখ দুটোর ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে হয়তো আমার সঙ্গে লড়তেও আপত্তি হবে না আপনার?'

মহান্ প্রভুর ক্রোধ এমন অকস্মাৎ উপচে পড়ল যেন মহাকালের শিঙা। তিনি সড়াক্ করে কালো খাপ থেকে তাঁর তলোয়ার বের করলেন; ঘুরঘুর-করা গৃহকর্তাকে হুকুম দিলেন 'একটা তরোয়াল দাও তো ওই হতচ্ছাড়াকে!' তারপর মহিলার দিকে ফিরে এমন বিকট হাস্য করলেন যে তার বুক শুকিয়ে গেল, বললেন, 'আমার পেছনে অনেক খেটেছ তুমি, মাদাম। মনে হচ্ছে এখন তোমাকে এক রাতের মধ্যেই নতুন বিয়ে দিয়ে আবার বিধবা বানানো দরকার।'

ডেভিড বলল, 'আমি তরোয়াল-খেলা জানি না।' মহিলার সামনে সেটা স্বীকার করতে লজ্জায় লাল সে।

"আমি ত্যরোয়াল খ্যালা জানি না!"—ভেংচে বলেন মার্কুইস্ 'তাহলে কি চাষাভুষোদের মতো ওক-কাঠের মুগুর নিয়ে খেলব? এই যে ফ্রাঁসোয়া, পিস্তলগুলো দাও আমায়!'

একজন সহিস দু'খানা বড় চকচকে পিস্তল নিয়ে এল গাড়ির গদি থেকে, রুপোর নক্শা করা। একখানা মার্কুইস ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওপর ডেভিডের হাতের কাছে। চেঁচিয়ে বললেন, 'টেবিলের অন্যদিকটাতে যাও! একজন রাখালও পারে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে! ওদের কেউ আবার দ্য-বোপারতুইয়ের অস্ত্রে জান দিয়ে মানও পেয়েছে।'

লম্বা টেবিলের দুই প্রান্ত থেকে পরস্পরের মুখোমুখি হল মেষপালক আর মার্কুইস। বাড়ির মালিক ভয়ে কাতর হয়ে হাওয়া আঁকড়ায় আর তোত্‌লায়: 'ম-ম্-মঁসেনিয়, ঈশ্বরের দোহাই! আমার বাড়িতে নয়!—রক্তপাত করবেন না, আমার নিয়মরীতি বিগ্ড়ে—' মার্কুইসের মারমুখো দৃষ্টির সামনে তার জিভ আড়ষ্ট।

'কাপুরুষ! এবার খানিকক্ষণ দাঁত কিড়িমিড়ি বন্ধ করে আমাদের শুরু করার আওয়াজ দাও, যদি সে সাধ্যি থাকে।'

গৃহকর্তা দুম করে মেঝেতে হাঁটু ঠেকাল। তার ভাষা ফুরিয়ে গেছে, এমন-কি শব্দগুলোও উপে গেছে তাকে ছেড়ে। তবু অঙ্গভঙ্গি করে সে নিজের গৃহ আর রীতির নামে শান্তির আবেদন জানায়।

মহিলা পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'শুরুর আওয়াজ আমিই দেব।' সে ডেভিডের কাছে গিয়ে তাকে মিষ্টি একটা চুমো দিল। মেয়েটির চোখ ঝিকমিক করছে, গালে ফুটে উঠেছে রঙের আভা। দেয়ালে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে, দু'জন মানুষ পিস্তল সিধে করে সবুর করতে লাগল ওর সময় গোনার।

'আঁ... দো..... তোয়া!'

দুটো বন্দুকের আওয়াজই একসঙ্গে এমন তাড়াতাড়ি এল যে মোমবাতিগুলোও একবারেই নিভে গেছে। মার্কুইস দাঁড়িয়ে হাসতে থাকলেন, তাঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলো

টেবিলের কোণে ছড়িয়ে রাখা। ডেভিড সিধে খাড়া; মাথাটা ধীরে, খুব ধীরে ফেরাল চোখ ঘুরিয়ে তার স্ত্রীকে খুঁজতে। তারপর ঝোলানোর জায়গা থেকে যেমন পোশাক খসে পড়ে, তেমনিভাবে সে মেঝের ওপব বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ত্রাস আর হতাশায় আর্তনাদ করে বিধবা যুবতী ছুটে এসে দাঁড়াল ওর পাশে। ঝুঁকে পড়ে ওব জখমটা দেখতে পেয়ে যখন মুখ তুলল, তখন আবার সেই পুরনো বিষাদের চিহ্ন সেই মুখে। চাপা গলায় ফিসফিস্ করে বললে, 'হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে।... আহা রে, ওর হৃদয়!'

মার্কুইসের গম্ভীর গলা শোনা যায়, 'এসো! সোজা গিয়ে বস গাড়িতে। ভোরের আলো ফোটার পর আমার হাতে আর থাকছো না! বিয়ে তোমায় দেবই আবার, আজ রাতেই কোনো জ্যান্ত স্বামীর হাতে। এর পর যাকেই পাব, বুঝলে মহিলা, সে রাস্তার ডাকাতই হোক, কি চাষাভুষোই হোক্। রাস্তায় যদি কাউকে না পাই, তাহলে যে-চৌকিদারটা আমার ফটক খুলবে, তাকেই। যাও বেরিয়ে গাড়ির মধ্যে!'

নির্দয় আর বিশালদেহী মার্কুইস, সেই আগের মতো আংরাখার রহস্যে ঢাকা মহিলা, অস্ত্রধারী সহিসরা—সবাই একসঙ্গে এগোয় গাড়ির দিকে। ভারী চাকা গড়িয়ে-যাওয়ার শব্দ প্রতিধ্বনি তোলে ঘুমন্ত পল্লীর মধ্যে। 'সিলভার ফ্লাগন'-এর হলঘরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় গৃহকর্তা নিহত কবির দেহের সামনে দাঁড়িয়ে হাত মোচড়ায়, ওদিকে চব্বিশ খানা মোমবাতির শিখা নেচে চলেছে, অস্থিরভাবে কাঁপছে টেবিলের ওপর।

ডানদিকের পথ

পাঁচ ক্রোশ গিয়ে তাই রাস্তাটা হয়ে যায় গোলকধাঁধা। আরো চওড়া একটা অন্য রাস্তার সঙ্গে সমকোণে জুড়ে গিয়েছে। অনিশ্চিত ডেভিড কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপব ধরে ডানদিকের পথ।

পথ কোথায় চলে গেছে তা সে জানে না, কিন্তু আজ রাতে ভেরনয়কে পিছে ফেলে চলে যেতে হবে, এ ওর দৃঢ় সংকল্প। পাঁচ ক্রোশ পেরিয়ে ও একটা বিশাল প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, দেখল সেখানে সদ্য উদ্‌যাপিত কোনো উৎসবের চিহ্ন। প্রত্যেক জানলায় আলো জ্বলছে, মস্ত পাথরের তোরণদ্বার থেকে ভেতরে, ধুলোর ওপর অতিথিদের গাড়ির চাকার জালি কাটা দাগ।

পাঁচ ক্রোশ পথ আরো যেতে ডেভিড ক্লান্ত। রাস্তার ধারে পাইন ডালের শয্যায় সে খানিক সময় ঘুমোল আর জিরোল। তারপর উঠে আবার নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা। এই ভাবে পাঁচ দিন সে বড় সড়কে হেঁটে, প্রকৃতির আপন সুগন্ধ শয্যায় চাষীদের মাচানে শুয়ে, তাদের আতিথ্যপূর্ণ কালো রুটি খেয়ে, ঝরনার জল অথবা উৎসুক ছাগপালকের হাতের দুধ খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে।

অবশেষে সে একটা বড় সেতু পার হল, পা রাখল এমন এক হাস্যময় শহরে—যেখানে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গার চেয়ে বেশি কবি জয়মাল্য পেয়েছে, অথবা মাটিতে মিশিয়ে গেছে। প্যারিস যখন ওর কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে শোনাল প্রাণোচ্ছল সাদর-সম্ভাষণ—ওর নিশ্বাস হল আরো দ্রুত; এ সম্ভাষণ তো মানুষের কণ্ঠ, পায়ের শব্দ, আর চাকার আওয়াজ থেকে।

রু কঁতি'র একটা উঁচু পুরনো বাড়ির টিনের ছাতের ঘরে ভাড়া দিয়ে ওর একটা আস্তানা জুটল। ধাতস্থ হয়ে বসল একটা কাঠের চেয়ারে, শুরু করল কবিতা রচনা। ও রাস্তাটা এক সময় ছিল প্রতিপত্তিশালী নামকরা নাগরিকদের আশ্রয়স্থল, এখন এসেছে যাদের দখলে তারা অবনতির পথে বরাবরই পা বাড়ায়।

বাড়িগুলো উঁচু-উঁচু, এখনো ধারণ করছে কিছু ভগ্ন মর্যাদা, তবে বেশির ভাগই খালি পড়ে আছে, শুধু ধুলো আর মাকড়সা। রাত হলে এ-পাড়ায় তরোয়ালের সংঘর্ষ আর হুল্লোড়বাজদের চিৎকার, ওরা অস্থিরভাবে সরাইখানাগুলোয় ছোটাছুটি করে বেড়ায়। এক সময় যেখানে ছিল ভদ্রমানুষের বসতি, এখন সেখানে পচা-গলা অমার্জিত উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু ডেভিড এখানে পেয়েছে তার টায়টোয় সঙ্গতির মাপে একটা আস্তানা। দিনের আলো বা মোমবাতির আলোয় সে মাথা গুঁজে আছে শুধু কাগজে আর কলমে।

একদিন বিকেলে সে নিচুতলার জগৎ থেকে দানা-চানা হাতড়ে ফিরে আসছে, একটু রুটি, দই, আর পাতলা ওয়াইনের একটা বোতল সঙ্গে নিয়ে। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেকটা পথ উঠতেই সে সাক্ষাৎ পেল, বরং বলা যায় আচমকা দেখতে পেল (কারণ মেয়েটি সিঁড়িতে বসেছিল)—একটি যুবতী যার সৌন্দর্য মোক্ষম কবি-কল্পনাকেও উপেক্ষা করতে পারে। একটা ঢিলে গাঢ়-রঙের আংরাখা খানিকটা খোলা, নিচে দেখা যাচ্ছে দামি গাউন। প্রতিটি চিন্তার আভাসের সঙ্গেই দ্রুত বদলে যাচ্ছে চোখের চাউনি। এক মুহূর্তেই যেন বালিকার সরল ছলাহীন গোল-গোল চোখ হয়ে যাচ্ছে যাযাবরীর মতো দীঘল, ছলনাময়। এক হাতে তুলে ধরেছে গাউনটা, একটা ছোট উঁচুগোড়ালির জুতো নিরাবরণ করে, সেটার ফিতেগুলো বাঁধন-খোলা হয়ে ঝুলছে। এমনই স্বর্গীয় সে, নিচু হতে এতই অপারগ, অন্যকে মোহিত করতে বা হুকুম দিতে এমনই অভ্যস্ত! হয়তো সে ডেভিডকে আসতে দেখেছিল, আর তাই ওর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আহ্, মঁসিয়ে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন এভাবে সে সিঁড়ি দখল করেছে, এই জুতোটাই তো!—হতচ্ছাড়া জুতো! কিছুতেই এঁটে থাকছে না যে! আ! মঁসিয়ে যদি দয়া করে একটু কষ্ট করতেন!

জুতোর দু'ধারের ফিতে জুড়ে বাঁধতে গিয়ে কেঁপে উঠে কবির আঙুল। তারপরে হয়তো সে মেয়েটির বিপজ্জনক উপস্থিতি থেকে পালিয়েও বাঁচত, কিন্তু চোখদুটো যে হয়ে গেল দীর্ঘায়িত যাযাবরীর মতো ছলনাময়, আর তাকে মোহিত করে

রাখল। টক ওয়াইনের বোতলটা ধরে ও কাত হয়ে রইল রেলিঙের ধারে। মহিলা হেসে বললে, 'এমন ভাল লোক আপনি! মঁসিয় বুঝি এবাড়িতেই থাকেন?'

'হ্যাঁ মাদাম, আমি-আমি সেইরকমই তো মনে করি।'

'তা'হলে বুঝি তেতলায়?'

'না মাদাম, আরো ওপরে।'

মহিলা একটুও অধৈর্যভাবের আভাস না দিয়ে আঙুল নাড়তে থাকে।

'মাপ করবেন। আমি নিশ্চয় ভেবে কিছু বলিনি। মঁসিয় ক্ষমা করবেন তো? তিনি কোন্ ঘরে থাকেন তা জিজ্ঞেস করাটা নিশ্চয়ই আমার শোভা পায় না?'

'ও কথা বলবেন না মাদাম। আমি আছি ওই—'

'না, না, না; আমাকে বলবেন না। এখন দেখছি একটা ভুলই করেছি। কিন্তু এবাড়িতে, এবং এর সবকিছুতে আমার যে আগ্রহ তা যে কোনোমতে হারাতে চাই-না। এটা একসময় আমারই বসতবাড়ি ছিল। একেকবার এখানে আসি শুধু আমার পুরনো সুখের দিনগুলো স্মরণ করতে। আমার যদি এইটেই অজুহাত হয়, তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'তা'হলে শুনুন, কোনো অজুহাতের প্রয়োজন আপনার নেই',—তোতলায় কবি—'আমি একেবারে ওপর তলায় থাকি—ছোট কামরাটা, যেখানে এই সিঁড়ি ঘুরে গেছে।'

মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে মহিলা প্রশ্ন করলে, 'সামনের ঘরটা নাকি?'

'পেছনেরটা, মাদাম।'

যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে মহিলা।

সেই সরল, বড় গোল চোখ কাজে লাগিয়ে এবার বলে, 'তাহলে আপনাকে আব আটকাবো না মঁসিয়। আমার বাড়িটার ওপর একটু নজর রাখবেন! হায়! এখন এর স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল। বিদায়, আপনার অসীম দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানবেন।'

সে চলে গেল, রেখে গেল শুধু একটা স্মিতহাসি আর মিষ্টি সুগন্ধির রেশ। ডেভিড যেন ঘুমের ঘোরে উঠল সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু ঘুম অবশেষে ভাঙল, তবে সেই হাসি আর সুবাস রয়েই গেল ওর সঙ্গে। পরেও বুঝি কখনো তা ওকে একেবারে ছেড়ে চলে যায়নি!

এই মহিলা যার সম্পর্কে ও কিছুই জানে না, তাকে নিয়েই চলল ওর রচনা—চোখ নিয়ে গীতিকাব্য, হঠাৎ-জাগা প্রেম নিয়ে চারণ কবিতা, কোঁকড়া চুলের স্তবগাথা, আর তনু পদের পাদুকা নিয়ে সনেটপদ্য।

কবি সে নিশ্চয়ই ছিল, নইলে ঈভোনকে ভুলবে কেন? এই নতুন পেলব কমনীয়তা ওকে আচ্ছন্ন করল সতেজ মুগ্ধতায়। ওর মধ্যে অদ্ভুত আবেগ অনুভূতি জাগাল মহিলার মৃদু সৌরভ।

* * *

এক বিশেষ রাতে ওই বাড়িরই তেতলার এক কামরায় এক সঙ্গে টেবিল ঘিরে বসে ছিল তিন ব্যক্তি। টেবিলটা, তিনটে চেয়ার, আর একটা জ্বালানো মোমবাতি ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। ওদের একজন বিশালকায় মানুষ, কালো পোশাকপরা। তার চুমরোনো গোঁফের প্রান্ত একেবারে প্রায় উপহাস-ভরা চোখ অবধি উঠেছে। অন্যজন এক মহিলা, যুবতী এবং সুন্দরী যার চোখজোড়া কখনো শিশুর মতো সরল, গোল-গোল, কখনো-বা যাযাবরীর মতো দীঘল, ছলনাময়—কিন্তু এখন তা অন্য চক্রান্তকারীদের মতোই তীক্ষ্ণ আর উচ্চাশায় ভরা। তৃতীয় ব্যক্তি কবিৎকর্মা লোক, লড়াকু, সাহসী, অসহিষ্ণু ধরনের কর্মী, মুখে যেন ইস্পাত-গলা আগুনের শ্বাস। অন্যরা তাকে ক্যাপ্টেন দেস্‌রোল বলে ডাকছে।

টেবিলের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করে ক্যাপ্টেন সংযত উগ্রতার সঙ্গে বলে :

'আজ রাতে। আজ রাতে যখন তিনি মধ্যরাতের প্রার্থনা সভায় যাবেন। এই সব ষড়যন্ত্র করে আমি হয়রান, কোথাও কোনো দিশা মিলছে না। খালি সংকেত, ইশারা, গুপ্তভাষা আর গোপন সভা, এই সব বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে পড়েছি আমি। আসুন, সত্যিকারের বেইমান হই। যদি তাঁর হাত থেকে ফ্রান্সকে মুক্তই করতে হয়, তো তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করি—এই সব ফাঁদ আর জাল নিয়ে শিকার খোঁজা নয়। বলছি, আজ রাতেই। যেমন আমার কথা তেমনি কাজ। আজ রাতে যখন তিনি প্রার্থনাসভায় যাবেন।'

মহিলা তার দিকে তাকায় আন্তরিকতাভরা চোখে। মেয়েমানুষ যত নিষ্ঠাভরেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকুক, সর্বদা সে উদ্ধত সাহসের কাছেই মাথা নোয়াবে। বিশালকায় লোকটি তার চুমরোনো গোঁফে তা দেয়।

আচরিত অভ্যাসে কোমল গম্ভীর গলায় বলে, 'প্রিয় ক্যাপ্টেন, এইবার আমি আপনার সঙ্গে একমত। অপেক্ষা করে কোনো লাভই হবার নয়। প্রাসাদরক্ষীদের যথেষ্ট লোক আমাদেরই দলে, নিরাপদে অভিযান করতে অসুবিধা হবে না।'

আবার টেবিলে ঘুষি মেরে বলে ক্যাপ্টেন দেস্‌রোল, 'আজ রাতে। শুনেছেন তো মার্কুইস্; আমার হাতেই কাজটা খতম হবে।'

নরমভাবে প্রকাণ্ড মানুষ বলল, 'কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন আসছে। প্রাসাদে আমাদের অনুগামীদের খবর পাঠাতে হবে, একটা সংকেতচিহ্নও ঠিক করতে হবে। আমাদের সবচেয়ে কট্টর লোকদের চলতে হবে রাজকীয় শকটের সঙ্গে। এখন এই সময় কোন্ বার্তাবাহক পারবে দক্ষিণ তোরণ অবধি পৌঁছোতে ? রিবুকে বসানো হয়েছে সেখানে; একবার তার হাতে বার্তা পৌঁছে গেলে সবকিছুই ঠিকমতো চলবে।'

মহিলা বললে, 'বার্তা পাঠাব আমি।'

'আপনি কাউন্টেস্?' মার্কুইস ভুরু উঁচু করে বলে, 'আপনার নিষ্ঠা গভীর তা তো আমরা জানি, কিন্তু!—'

'এ বাড়িরই চিলেকোঠায় থাকে এক গ্রামের যুবক, তার চরানির ভেড়াগুলোর মতোই অকপট আর নরমসরম। তার সঙ্গে দু'তিনবার সিঁড়ির ওপর সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। যে ঘরটায় সাধারণত আমাদের বৈঠক হয় তারই গা-ঘেঁষে ও থাকে বলে আমার ভয় ছিল, তাই নানা জেরা করি ওকে। সে এখন আমার, যদি তাই চাই। সে চিলেঘরে বসে কবিতা লেখে, আমার ধারণা আমার স্বপ্নও সে দেখে। প্রাসাদে আমাদের বার্তা ওকেই নিয়ে যেতে হবে।'

মার্কুইস চেয়ার থেকে উঠে মাথা নোয়ায়, 'আমার কথাটা আপনি শেষ করতে দেননি কাউন্টেস্। আমি বলতে গিয়েছিলাম, আপনার নিষ্ঠা গভীর, কিন্তু আপনার বুদ্ধি আর মোহিনীশক্তি আরো বহুগুণ প্রখর।'

চক্রান্তকারীরা যখন এইসব নিয়ে ব্যস্ত, ডেভিড তখন তার কবিতার পংক্তিগুলো ঘষামাজা করছে, সেগুলোর উদ্দিষ্টা হল "সিঁড়িপথের ক্ষণিকা"। ও একটা ত্রস্ত করাঘাত শুনতে পেল নিজের দরজায়, দুরু-দুরু বুকে দরজা খুলল, দেখল মহিলাটিই তো দাঁড়িয়ে আছে, বেপথু অবস্থায় হাঁপাচ্ছে, চোখজোড়া শিশুর মতো পুরো খোলা, অকপট।

'মঁসিয়', কোনো রকমে দম নিয়ে বলল সে, 'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে ভাল সৎমানুষ বলেই বিশ্বাস করি, আর অন্য কারুর সাহায্যের কথা মনেও ভাবিনি। রাস্তার ওই জাঁক-দেখানো লোকগুলোর ভেতর দিয়ে কেমন করে যে পালিয়ে এসেছি! মঁসিয়, আমার মা মরণাপন্ন। মামা রাজার প্রাসাদে রক্ষীদের একজন ক্যাপ্টেন। একজনকে ছুটে যেতেই হবে তাঁকে আনতে। আমি কি আশা করতে—'

'মাদমোয়াজেল',—ডেভিড সেবা করবার আশায় উদগ্রীব, চোখ উজ্জ্বল করে বলে, 'আপনার ইচ্ছাই আমার ওড়বার ডানা হবে। শুধু বলুন কীভাবে তাঁর কাছে যেতে হবে।'

মহিলা একটা শিলমোহর-করা কাগজ তার হাতে গুঁজে দেয়।

'দক্ষিণ দিকের দরজায় যাবেন—মনে রাখবেন দক্ষিণ দরজা,—সেখানকার প্রহরীদের বলবেন: "বাজপাখি তার বাসা ছেড়েছে"। তাতেই ওরা আপনাকে ছেড়ে দেবে, আপনি চলে যাবেন প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণ দ্বারে। ওই কথাগুলোই ফের বলবেন, আর ওদের মধ্যে যে-লোকটি জবাব দেবে "যখন খুশি আসুক উড়ে", তারই হাতে দেবেন চিঠিখানা। এ সংকেতবাক্য আমার মামাই আমাকে বিশ্বাস করে দিয়েছিলেন, মঁসিয়, কারণ এখন দেশে যা গণ্ডগোল, লোক রাজার প্রাণনাশের চক্রান্ত করছে,—এই সংকেতবাক্য ছাড়া কোনে লোকই রাতে প্রাসাদের চত্বরে ঢুকতে পারে না। যদি আপনার ইচ্ছে হয় মঁসিয়, এ চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছে দিন, যাতে মা চোখ বুজবার আগে একবারটি তাঁকে দেখতে পান।'

সাগ্রহে ডেভিড বলে, 'দিন ওটা আমাকে। কিন্তু এতরাতে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে না? আমি—'

'না, না—আপনি ছুটুন। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। কোনো সময়',—মহিলা দীঘল ছলনাময় চোখে বললে, 'চেষ্টা করব আপনার সততার জন্য ধন্যবাদ জানাতে।'

কবি তার বুকের কাছে চিঠি গুঁজে, লাফ মেরে নেমে গেল সিঁড়ি ধরে। ও যখন চলে গেছে মহিলা ফিরে গেল নিচের তলার কামরায়।

মার্কুইসের ভুরুতে প্রশ্নের চিহ্ন।

মহিলা বলল, 'চলে গেছে, ওর নিজের ভেড়াগুলোর মতোই হুড়বড় করে বোকার মতো, চিঠি পৌঁছে দিতে।'

টেবিল আবার কেঁপে উঠল ক্যাপ্টেন দেস্‌রোলের ঘুষিতে। চেঁচিয়ে উঠল, 'দুত্তোরি, আমার পিস্তল যে ফেলে এসেছি, হায় ভগবান্। ও ছাড়া কিছুতে আমার ভরসা নেই।'

মার্কুইস তার ক্লোকের তলা থেকে একটা চক্‌চকে বড়োসড় অস্ত্র বের করল, রুপোর কারুকাজ করা—'এইটা নিন্। এর চেয়ে ভাল আর হয় না। কিন্তু সাবধানে রাখবেন, কারণ এতে আমার বংশের প্রতীকচিহ্ন রয়েছে, আর আমি ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি। আমাকে প্যারিস থেকে আজ রাতে অনেক দূর সরে যেতে হবে। কালকের মধ্যে আমাকে নিজের প্রাসাদে থাকতেই হবে। আপনি আগে চলুন, প্রিয় কাউন্টেস্।'

মার্কুইস ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন। জোব্বাঢাকা মহিলা আর দু'জন ভদ্রলোক মৃদুপদে সিঁড়ি দিয়ে নামল। তারপর রু কঁতির সরু পার্শ্বপথে-চলা মানুষের ভিড়ে তারা হারিয়ে গেল।

ডেভিড ছুটছে। রাজার প্রাসাদের দক্ষিণ ফটকে একটা যুদ্ধকুঠার ঠেকল ওর বুকে, কিন্তু ও তার ধারালো দিকটা ফিরিয়ে দিল এই কথা বলে: "বাজপাখি তার বাসা ছেড়েছে।"

রক্ষী বলল, 'চলে এস ভাই, তাড়াতাড়ি যাও ওদিকে।'

প্রাসাদের দক্ষিণ সিঁড়িতে ওরা ছেঁকে ধরল তাকে, কিন্তু এবারও দর্শক রক্ষীদের সম্মোহিত করল সেই সংকেতশব্দগুলো। ওদের একজন এগিয়ে এসে বলতে শুরু করেছে, 'যখন খুশি—' সঙ্গেসঙ্গে রক্ষীদের দলে একটা চাঞ্চল্য যেন অবাক করে দেয় তাকে। সতর্ক চোখ আর সৈনিকসুলভ চালচলনের একটি লোক হঠাৎ দল ঠেলে এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে টেনে নিল ডেভিডের হাতের চিঠিটা। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে'। ওকে টেনে নিল ভেতরের বড় হলঘরে। তারপর চিঠিটা খুলে পড়ল। মাস্কেটিয়ারের উর্দিপরা একজনকে সে ইশারা করে ডাকল: 'ক্যাপ্টেন তেত্রো, তুমি এখুনি দক্ষিণ তোরণ আর দক্ষিণ ফটকের প্রহরীদের গ্রেপ্তার কর। আটকে রাখ ওদের। ওদের জায়গায় পরিচিত রাজভক্তদের বসিয়ে দাও।' তারপর ডেভিডের দিকে ফিরে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো।' সে ডেভিডকে একটা করিডর, আর বহিঃকক্ষের ভেতর দিয়ে নিয়ে এক সুপরিসর কামরায় হাজির করল। সুগম্ভীর

পোশাকপরা এক বিষণ্ণ মানুষ সেখানে বসে আছেন। একটা বিশাল চামড়া-মোড়া আসনে বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন। ওই মানুষকেই সম্বোধন করল ডেভিডের সঙ্গী:

'হুজুর, আপনাকে বলেছিলাম রাজপ্রাসাদ থিকথিক করছে বেইমান আর গুপ্তচরে—ইঁদুরভরা নালার মতো। আপনি ভেবেছিলেন, হুজুর, ওসব আমার অসার কল্পনা। ওদের আশকারা পেয়েই এ লোকটা আপনার দরজা গোড়া অবধি চলে এসেছিল। এর হাতে একটা চিঠি ছিল যেটা আমি আটক করেছি। আমি একে হুজুরের কাছেই নিয়ে এসেছি, যাতে মহানুভব আর মনে না-করেন যে আমার উৎসাহ মাত্রাছাড়া।'

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে রাজা বললেন, 'আমি ওকে জেরা করব।' ডেভিডের দিকে তাকালেন ভারী চোখে, একটা অস্বচ্ছ পর্দা পড়েছে সে-চোখে। কবি হাঁটুদুটো নোয়াল।

রাজা শুধোলেন, 'কোথা থেকে এসেছ?'

'ইয়রে-এ'লোয়া জেলার ভেরনয় গ্রাম থেকে, হুজুর।'

'প্যারিসে তুমি কী কাজ কর?'

'আমি ... আমি কবি হতে চাই হুজুর।'

'ভেরনয়ে কী করতে তুমি?'

'বাবার ভেড়ার পাল চরাতাম।'

রাজা আবার নড়ে বসলেন, তাঁর চোখের পর্দা সরে গেছে।

'আহ্! মাঠে-মাঠে?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'মাঠেই তোমার দিন কাটত; ভোরের ঠাণ্ডায় বেরিয়ে যেতে, আর বেড়ার ধারে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে। ভেড়াগুলো ছড়িয়ে পড়ত টিলার ওপর; তুমি তাজা ঝরনার জল খেতে, ছায়ায় বসে মিষ্টি বাদামি রুটি খেতে, আর নিশ্চয়ই কান পেতে শুনতে ঝোপের মধ্যে কোকিলের গান। তাই না হে মেষপালক?'

'ঠিক তাই, হুজুর,' একটা নিশ্বাস ফেলে জবাব দিল ডেভিড, 'তা ছাড়া, ফুলে-ফুলে মৌমাছির গুনগুন, আর হয়তো পাহাড় থেকে আঙুর-জোগাড়েদের গান।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—' অধীরভাবে বললেন রাজা—'হয়তো তাদের গান, কিন্তু কোকিলের ডাক তো নিশ্চয়ই। ঘনঘনই ডাকে ঝোপের আড়ালে, তাই না বল?'

'তবে ইয়রে-এ'লোয়ার মতো মিঠে আর কোথাও নয়। আমি যে কবিতাগুলো লিখেছি তার কয়েকটাতে তাদের গান প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।'

আগ্রহভরে রাজা বললেন, 'আবৃত্তি করতে পার কবিতাগুলো? অনেককাল আগে আমি শুনতাম কোকিলের ডাক। তাদের গান ঠিকমতো লিখতে পারলে

সে তো একটা রাজত্বের চেয়েও ভাল। তারপর বুঝি ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে এনে খোঁয়াড়ে পুরতে আর শান্তিতে চুপচাপ বসে তোমাদের চমৎকার রুটি খেতে! ও কবিতাগুলো শোনাতে পার, রাখাল?'

সাগ্রহ মর্যাদার সঙ্গে ডেভিড বলল, 'হুজুর, কবিতাগুলো এই রকম:

"অলস রাখাল, দেখ তোমার ভেড়ার ছানা,
কেমন নাচে মাঠের মাঝে আনন্দে!
হাওয়ায় কেমন দেবদারুরা দোলে
প্যান-দেবতা বাজান বেণু নির্ঝরিণীর প্রান্তে।

"তোমরা মোদের ডাক শোনো ওই মগডালে,
নামতে দেখ ছোঁ মেরে ওই ভেড়ার পালে:
একটু পশম দাও না ধার, রাখব বাসা 'ওমে'
দেবদারুর ওই ডালে—"

একটা কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল মাঝখানে, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে মহানুভব হুজুর, তা'হলে এই পদ্য-লেখককে দু'একটা প্রশ্ন করি। সময় হাতে খুবই কম। আপনার নিরাপত্তার জন্য আমার উৎকণ্ঠা যদি আপনার বিরক্তিজনক হয়, তা'হলে ক্ষমা ভিক্ষা করি।'

রাজা বললেন, 'ডিউক দোমালের রাজভক্তি এমনই সুপ্রমাণিত যে তা বিরক্তি জন্মাতে পারে না।'—চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন তিনি, চোখের ওপর আবার নেমে এল পর্দা।

ডিউক বলল, 'প্রথমত, এ যে চিঠিটি এনেছে তা আপনাকে পড়ে শোনাব:

"আজ রাতে যুবরাজের মৃত্যু বার্ষিকী। উনি ওঁর রীতিমাফিক যদি পুত্রের আত্মার কল্যাণে মধ্যরাত্রির প্রার্থনাসভায় যান, তা'হলে বাজপাখিও আঘাত হানবে—ক এস্প্লানাদের কোণটিতে। রাজার ইচ্ছা যদি সেইরকমই হয়, তা'হলে প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ওপরতলার কামরায় লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখবে, যাতে বাজপাখির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।"

কড়া গলায় ডিউক বললেন, 'সখী, তুমি এই কথাগুলো শুনলে। কে তোমাকে বার্তাটা দিয়েছিল এখানে আনতে?'

ডেভিড অকপটেই বলল, 'প্রভু ডিউক, আপনাকে আমি বলব। একজন মহিলা এটা আমায় দিয়েছিলেন। বললেন তাঁর মা অসুস্থ, আর এই চিঠি পেলে তাঁর মামা তার শয্যাপাশে ছুটে যাবেন। আমি ও-চিঠিটার মানে কিছু বুঝলাম না, তবে এটুকু হলপ করে বলতে পারি তিনি সুন্দরী ও খুবই ভাল।'

'মহিলার চেহারার বর্ণনা দাও!' হুকুম ডিউকের—'আর তুমি তার ধোঁকার শিকার হলে কেমন করে?'

একটা নরম হাসি দিয়ে ডেভিড বলল, 'বর্ণনা দেব! জাদু দেখাবার জন্য ভাষাকে হুকুম করতে হবে। বেশ তো, উনি উজ্জ্বল রোদ আর গাঢ় আঁধার দিয়ে তৈরি। অ্যালডার লতার মতো তাঁর তনু, তারই লাবণ্য চলাফেরায়। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তা বদলে যায় কখনো গোল-গোল, কখনো আধো ঢাকা, দুটো মেঘের মাঝে সূর্যের উঁকির মতো। যখন আসেন তখন যেমন তাঁকে ঘিরে স্বর্গ হাসে, আবার যখন যান তখন শুধু শূন্যতা আর হথর্ন ফুলের সুবাস রেখে যান। উনি এসেছিলেন আমার কাছে, রু কঁতি, উনত্রিশ নম্বরে।'

রাজার দিকে ফিরে ডিউক বললেন, 'এই সেই বাড়ি! ও বাড়ির ওপর আমরা নজর রেখেছিলাম। কবির জিভের দৌলতে চিনতে পারলাম কুখ্যাত কাউন্টেস্ কেবেদো'র পুরো আদলটা।'

ডেভিড ব্যগ্রভাবে বললে, 'মহানুভব হুজুর, আর আমার প্রভু ডিউক, আশা করি আমার দুর্বল ভাষা কোনো অবিচার করেনি। আমি ওই মহিলার চোখের দিকে চেয়ে দেখেছি। জীবন বাজি ধরে বলতে পারি উনি এক দেবদূত, তা তিনি চিঠিটা দিন বা না দিন।'

ডিউক স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'তার প্রমাণ আমি নেব তোমার কাছ থেকে। রাজার মতো পোশাক পরে, তুমি নিজেই মাঝরাতে তাঁর গাড়িতে চেপে প্রার্থনা সভায় যাবে। এ পরীক্ষা দিতে রাজি তুমি?'

ডেভিড হাসল। বলল, 'আমি ওঁর সে-চোখ দেখেছি, সেখানেই পেয়েছি প্রমাণ। আপনার প্রমাণ যেভাবে খুশি নিন্।'

বারোটা বাজার আধঘন্টা আগে ডিউক দ্যোমালে নিজের হাতে একটা লাল বাত্তি বসিয়ে দিল প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম বাতায়নে। ঘন্টা বাজার দশমিনিট আগে ডেভিড, রাজার পোশাকে তার বাহুর ওপর ভর করে বেরিয়ে এল রাজার খাসকামরা থেকে—আপাদমস্তক রাজপোশাক, মাথাটা ক্লোকের মধ্যে গোঁজা—এগিয়ে গেল অপেক্ষমান গাড়ির মধ্যে। ডিউক তাকে ভেতরে বসতে সাহায্য করল, তারপর দরজা ভেজিয়ে দিল। বোঁ করে ঘুরে গাড়ি চলল ক্যাথিড্রাল যাবার পথে।

রু এসপ্লানাদের কোণে একটা বাড়ি থেকে নজরদারি করছিল ক্যাপ্টেন তেত্রো আর কুড়িজন শাস্ত্রী—তারা চক্রান্তকারীদের ওপর, হাজির হওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

কিন্তু মনে হল কোনো কারণে, চক্রান্তকারীরা তাদের নকশায় খানিকটা অদলবদল করেছে। রাজকীয় শকট যখন রু ক্রিস্তফে পৌঁছোলো,—রু এসপ্লানাদ থেকে যেটা এক চত্বর আগেই, সে রাস্তা থেকে ছুটে বেরুল ক্যাপ্টেন দেস্‌রোল, তার সঙ্গে একদল ভাবী রাজহন্তা। তারা হামলা করল রাজশকটের ওপর। গাড়ির রক্ষীরা আচমকা আগেভাগে আক্রমণে ভ্যাবাচাকা খেলেও নেমে এসে বীরের মতো লড়তে লাগল। সংঘর্ষের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ক্যাপ্টেন তেত্রোর বাহিনী ছুটে এল রাস্তা

ধরে খট্মট করে ওদের বাঁচাতে। কিন্তু এর মধ্যে মরীয়া হয়ে দেস্রোল রাজার গাড়ির দরজা জোর করে টেনে খুলেছে। সে সিধেই নিজের অস্ত্র ভেতরের অন্ধকার মূর্তিটার দেহের ওপর রেখে চালিয়ে দিল গুলি।

এখন, রাজভক্ত সেপাইদের হাতের কাছে পেয়ে রাস্তাটা যেন সচকিত হয়ে উঠল চিৎকারে, আর কোষমুক্ত তরোয়ালের শব্দে। কিন্তু ভয়ার্ত ঘোড়াগুলো পালিয়ে গেছে। গাড়ির নরম গদির ওপর পড়ে আছে হতভাগ্য সাজানো রাজা আর কবির মৃতদেহ—মঁসেনিয়, মার্কুইস দ'বোপারতুইয়ের পিস্তলের এক গুলিতে সে নিহত।

সদর রাস্তা

পাঁচ ক্রোশ গিয়ে তাই রাস্তাটা হয়ে যায় গোলকধাঁধা। আরো চওড়া একটা অন্য রাস্তার সঙ্গে সমকোণে জুড়েছে। ডেভিড অনিশ্চিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, শেষে বসে পড়ল পথটার ধারেই বিশ্রাম নিতে।

ওই রাস্তাগুলো কোন্ দিকে গেছে তা ও জানে না। যে পথেই যাক সেখানেই যেন এক বিশাল পৃথিবী ওৎ পেতে আছে বিপদ আর নিয়তি নিয়ে। তারপর সেখানেই বসে থাকতে-থাকতে চোখ পড়ে একটা উজ্জ্বল তারার ওপর। ও আর ঈভোন দু'জনে মিলে তারাটার নাম রেখেছিল নিজেদেব নামে। এই ভাবে এসে গেল ঈভোনের চিন্তা, ভাবল একটু বেশি রকম গোঁয়ার্তুমি করে ফেললাম না তো! দুজনের ভেতরে একটু গরম কথা হয়েছিল বলেই কি তাকে ছেড়ে, বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসতে হবে? ভালবাসা কি এতই ঠুন্‌কো জিনিস যে সামান্য ঈর্ষা, যা প্রেমেরই লক্ষণ, তাকে ভেঙে দিতে পারে? সন্ধ্যার ছোটখাটো হৃদয়বেদনা, সে তো সকাল হলেই সেরে যায়। এখনো সময় আছে ঘরে ফিরে যাবার, সুখনিদ্রামগ্ন ভেরনয় গ্রামের কেউ কিছু জেনে ফেলবার আগেই। ওর হৃদয় তো ঈভোনেরই; যেখানে ও চিরকাল কাটিয়েছে সেখানে বসেই কবিতা লিখতে পারবে, সুখেরও খোঁজ পাবে।

ডেভিড উঠে দাঁড়ায়, মনের অশান্তি ঝেড়ে ফেলে, সেই সঙ্গে প্রলোভনের বেয়াড়া মেজাজটাও। যে রাস্তায় ও এসেছিল সেদিকেই এবার অবিচলভাবে মুখ ফেরায়। যতক্ষণে ভেরনয়ের রাস্তায় পুনর্যাত্রা করে, ততক্ষণে ঘোরাঘুরির শখ ওর মিটে গেছে। ভেড়ার খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেড়াগুলো খরবর করে ছুটে আসে এতক্ষণ বাদে ওর পায়ের শব্দ পেয়ে। ঘরোয়া আওয়াজে উষ্ণ হয় ওর হৃদয়। নিঃশব্দে ও গুঁড়ি মেরে ঢোকে নিজের ছোট কামরাটিতে, শুয়ে পড়ে, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় আজ রাতে ওকে আর নতুন রাস্তায় ঘুরে পা ব্যথা করতে হল না! বেঁচে গেছে।

মেয়েমানুষের মন ও কত ভালই না বোঝে! পরদিন সন্ধ্যায় ঈভোন গিয়েছিল একটা রাস্তার কুয়োর ধারে। ওখানেই জটলা করে যুবক-যুবতীরা—যাতে গ্রামের যাজক মশাই কিছু কাজ হাতে পান তাঁর পুরুতের ব্যবসায়। ঈভোন তেরছা নজরে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু ডেভিডকেই, যদিও ও দাঁতে-দাঁত চেপে আছে কিছুতেই হার মানবে না। ওর ওই চেহারা দেখতে পেল ডেভিড। খুব সাহস করে ওর মুখের সামনা সামনি হল, কথা আদায় করল যে সে ভুলই করেছিল, আর তার পরে একসঙ্গে ঘরে ফেরার পথে পেল একটা চুম্বনও।

তিনমাস বাদে ওদের বিয়ে হল। ডেভিডের বাপ চতুর লোক, বর্ধিষ্ণু তো বটেই। তিনি ওদের এমন বিয়ে দিলেন যার ধুমধামের খবর পাঁচ ক্রোশ দূরেও ছড়িয়েছে। যুবক যুবতী দু'জনেই গ্রামের প্রিয়। রাস্তায় বিয়ের মিছিল বেরুল, সবুজ মাঠে নাচগান হল, অতিথিদের আনন্দ দিতে ওরা 'দ্রু' থেকে পুতুলনাচ, বাজিকরের দলও এনেছিল।

তারপর এক বছর কাটতে ডেভিডের বাপ মারা গেলেন। ভেড়া আর কুটির-বাড়ি এসে চাপল ডেভিডেরই ঘাড়ে। এমনিতেই গাঁয়ের সবচেয়ে উপযুক্ত মেয়ে ওর বউ। ঈভোনের দুধের বালতি আর পেতলের হাঁড়িকুড়ি ঝক্‌ঝক্ করে আর যখন ওগুলোতে রোদ পড়ে, ওফ! আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে ও রাস্তায় গেলে। কিন্তু চোখ রাখুন ওর আঙিনার দিকে—সুন্দর কেয়ারি করা, মন উতলা-করা ফুলবাগিচা চোখ জুড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, ওর গানও হয়তো শুনতে পারেন, সেই পেরে গ্রুনোর কামারশালাব জোড়া বাদামগাছ থেকে।

কিন্তু এরপর একদিন এল, যেদিন ডেভিড তার দীর্ঘ-অব্যবহৃত দেরাজ থেকে বের করল কাগজ। আর পেন্সিলের গোড়া চিবুতে শুরু করল। বসন্ত আবার এসেছে, স্পর্শ করেছে ওর হৃদয়। কবি তো সে বটেই, কারণ ঈভোনকে এখন সে প্রায় ভুলতে বসেছে। মাটির এই চমৎকার নতুন সাজ, ওকে টেনে রাখে। মোহিনীমায়া আর লাবণ্য দিয়ে বন আর মাঠের সুগন্ধ ওকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়। আগে রোজই নিজেদের ভেড়ার পাল নিয়ে বেরুত, আর রাতে নিরাপদে তাদের ফিরিয়ে আনত। কিন্তু আজকাল সে বেড়ার ধারে টানটান শুয়ে টুকরো কাগজগুলোতে জোড়াতাড়া দেয় নানা শব্দ। ভেড়াগুলো এদিক-উদিক চলে যায়, আর নেকড়েরা টের পায় কঠিন-কঠিন কবিতা মানেই সহজলভ্য মেষমাংস। তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, বাচ্চাগুলোকে তুলে নিয়ে সরে পড়ে।

ডেভিডের কবিতার ভাণ্ডার যতোই বড় হতে থাক, ততোই ছোট হতে থাকে ভেড়ার পাল। ঈভোনের নাক আর মেজাজ সপ্তমে চড়ে, রূঢ় হতে থাকে কথাবার্তা। ওর হাঁড়িকুড়ি বালতি ম্যাড়মেড়ে হয় বটে তবে চোখ হয় খরোজ্জ্বল। ও সরাসরিই কবিকে বুঝিয়ে দিল কবির অবহেলার ফলেই ভেড়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অভিশাপ টেনে আনছে ঘর-গেরস্তালিতে। ডেভিড একটি ছোক্‌রাকে রাখল ভেড়া পাহারা

দিতে, বাড়ির ছোট চিলেঘরে নিজেকে আটক করে সে লিখতে থাকল আরো-আরো কবিতা। ছোকরাটিও স্বভাবে কবি, তবে লেখা-টেখার উপায় সে বোঝে না, তাই ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় সময়টা। নেকড়েদেরও বেশি সময় লাগল না আবিষ্কার করতে যে ঘুমোনো আর কবিতা লেখা একই ব্যাপার বলতে গেলে! ঈভোনের বদমেজাজও বেড়ে চলল সমান হারে। কখনো কখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে সে ডেভিডের উঁচু জানালার দিকে উচ্চকণ্ঠে গালাগাল ছোঁড়ে। তখন তার গলা আপনি শুনতে পাবেন সেই পেরে-গ্রুনোর কামারশালার জোড়া-বাদামগাছ থেকে।

দয়ালু, জ্ঞানী, নাক-গলানো উকিল ম. পাপিনো ব্যাপারটা দেখলেন—যে-ভাবে তার নাক তাক ক'রে সবকিছুই দেখেন বরাবর। নাকে বিরাট এক টিপ নস্যি গুঁজে তৈরি হয়ে, গেলেন ডেভিডের কাছে।

'বন্ধু মিগ্নো, আমি তোমার বাপের বিয়ের প্রমাণপত্রে শিলমোহর করেছিলাম। এখন তার ছেলের 'দেউলিয়া' প্রমাণপত্রে সই করতে বাধ্য হলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। কিন্তু সেই ব্যাপারই তুমি ঘটাতে চলেছ। আমি একজন পুরনো বন্ধুর মতোই বলছি। এবার শোনো যা বলব। আমার ধারণা, তুমি নিজের পুরো মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছ কাব্যরচনায়। দ্রু'তে আমার এক বন্ধু আছেন, মঁসিয়ে ব্রিল—জিওর্জে ব্রিল। এক-ঘর বোঝাই কেতাবের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা করে বসবাস করেন। উনি পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রতি বছরই প্যারিস যান, নিজেও অনেক বই লিখেছেন। উনি বলে দিতে পারেন রোমান আমলের সুড়ঙ্গগুলো কবেরে খোঁড়া হয়েছিল, তারাগুলোর নাম ওরা কেমন করে পেল, আর কেনই বা টিট্টিভ পাখির লম্বা ঠোঁট। তোমার কাছে যেমন ভেড়ার 'ব্যা' অর্থপূর্ণ, তেমনই বুদ্ধিদীপ্ত ওঁর কাছে কবিতার অর্থ ও রূপ। আমি তোমাকে একটা চিঠি দেব ওঁর জন্য, তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে নিজের কবিতা, তাকে সেগুলো পড়ে শোনাবে। তখনই তুমি জানবে তোমার আরো কবিতা লেখার প্রয়োজন আছে, না মনোযোগ দেবে বউ আর কাজকর্মের দিকে?'

ডেভিড বলল, 'লিখুন চিঠি। আমি দুঃখিত আপনি আগে এসব কথা আমায় বলেননি।'

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সে কবিতার মূল্যবান্ গোছাটি বগলদাবা করে, ধরল দ্রু-এর রাস্তা। দুপুর নাগাদ মঁসিয়ে ব্রিলের দরজা-গোড়ায় সে পায়ের ধুলো ঝাড়ল। পণ্ডিত ভদ্রলোক, ম. পাপিনোর চিঠির শিলমোহর খুললেন। চকচকে চশমা দিয়ে আদ্যোপান্ত পড়লেন, প্রখর সূর্যের জলপানের মতো পিপাসার্তভাবে। ডেভিডকে নিয়ে ঢুকলেন নিজের পাঠকক্ষে, সমুদ্র প্রমাণ বইয়ের গাদার মধ্যে দ্বীপের মতো ছোট একটি একট আসনে বসালেন তাকে।

বিবেক বলে কিছু মঁসিয়ে ব্রিলের আছে। একগাদা পাণ্ডুলিপি যা আঙুল সমান মোটা, আর অসাধ্য রকম গোল-পাকানো, তা দেখে একটুও পেছ-পা হলেন না তিনি। হাঁটুর ওপর চেপে চেপে ভাজ সোজা করলেন, তারপর পড়তে শুরু

করলেন ওগুলো। কোনো কিছুই তুচ্ছ মনে করলেন না, পোকার মতো কুরে কুরে বাদামের শাঁস খাওয়ার মতো পুরোটাই খতিয়ে দেখলেন।

এর মধ্যে ডেভিড একলা দ্বীপে বসে কাঁপতে লাগল অত কেতাবপত্রের ঢেউয়ের মাঝে, ওর কানের কাছে যেন ওরা গরজাচ্ছে। ও-সমুদ্রে যাত্রার করার মতো কোনো মানচিত্র বা কম্পাস নেই ওর কাছে। ভাবল অর্ধেক পৃথিবী মানেই বুঝি বই লেখা।

মঁসিয়ে ব্রিল কবিতাগুলোর শেষ পাতা অবধি 'কুরে' দেখলেন। তারপর নাক থেকে চশমাটা নামিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার পুরনো দোস্ত পাপিনো ভাল আছেন তো?' ডেভিড বলল, 'বহাল তবিয়তেই আছেন।'

'মঁসিয় মিগ্নো, আপনার ভেড়া কতগুলো আছে?'

'কাল যখন গুনেছিলাম, তিনশো ন'টা ছিল। ওদেব বড় খারাপ দিন যাচ্ছে। আটশো পঞ্চাশ থেকে কমে এখন ওই ক'টা দাঁড়িয়েছে।'

'আপনার তো স্ত্রী আছে, ঘর আছে, বেশ আরামেই থাকতেন। ভেড়া থেকে আপনার যথেষ্ট আয় ছিল। আপনি ওগুলোকে নিয়ে মাঠে যেতেন, তাজা হাওয়ার মধ্যে সময় কাটাতেন, আর তুষ্টিকর মিষ্টি রুটি খেতেন। শুধু আপনার দরকার হত একটু সতর্ক থাকা, আর বেশ প্রকৃতির কোলে মাথা এলিয়ে শুনতেন ঝোপগুলো থেকে কোকিলের ডাক। এতদূর পর্যন্ত আমি ঠিক বলেছি তো?'

'সেইরকমই তো ছিল', বলল ডেভিড।

''আপনার সব কবিতাই তো পড়লাম,' বলে চললেন মঁসিয়ে ব্রিল, তাঁর চোখ ঘুরছে গ্রন্থ সম্ভারের মধ্যে, যেন দিক্‌চক্রবালে কিছু বিক্রির মওকা খুঁজছেন—'ওই দেখুন দূরে, জানলার ভেতর দিয়ে, ওই গাছটায় কী দেখছেন বলতে পারেন, মঁসিয় মিগ্নো?'

ডেভিড সেদিকে চেয়ে বলল, 'একটা কাক দেখতে পাচ্ছি।'

মঁসিয়ে ব্রিল বললেন, 'ওই একটা পাখি, যা আমি কখনো কর্তব্য এড়িয়ে যাবার ঝোঁক দেখালেই আমায় সাহায্য করে। আপনি ওই পাখি চেনেন মঁসিয় মিগ্নো: ও হল বাতাসের দার্শনিক। ভাগ্যে যা আছে তা মেনে নিয়েই ওর সুখ। অমন খোশমেজাজি দরাজ-ডাকের পাখি আর নেই, চোখদুটো খেয়ালে ঘুরঘুর, পায়ে ফুর্তিভরা নাচ। যা চায় তা মাঠঘাটেই পেয়ে যায়। কখনো আপসোস করে না, ওরিওলের মতো আমার মাথায় চুড়োর বাহার নেই বলে! আর প্রকৃতি তার কণ্ঠে কতরকম স্বর দিয়েছে তা তো শুনেছেন মঁসিয় মিগ্নো? রাতের পাপিয়াকে কি ওর চেয়ে সুখী মনে করেন?'

ডেভিড উঠে দাঁড়াল। কাকটা ডালে বসে কর্কশকণ্ঠে ডাকছে।

ধীরে ধীরে সে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাই মঁসিয় ব্রিল। তা'হলে অতসব 'কা-কা' শব্দের মধ্যে একটাও পাপিয়ার স্বর পাননি?'

'থাকলে তা পেতাম নিশ্চয়ই, ফস্কে যেত না,'—একটা শ্বাস ফেলে বললেন মঁসিয়ে ব্রিল, 'প্রত্যেকটা শব্দ পড়েছি। কবিতার মতো বাঁচুন, মশাই, কবিতা আর লিখতে যাবেন না।'

ডেভিড আবার বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ! এবার আমি ফিরে যাব নিজের ভেড়াদের কাছে।'

'আপনি যদি ডিনারে বসতেন আমার সঙ্গে,'— গ্রন্থকীট বললেন, 'আর আঘাতটা অবহেলা করতেন, তা'হলে কারণগুলো বিশদভাবে বলতাম।'

'না-না', বললেন কবি, 'আমাকে ফিরতে হবে ভেড়াদের সঙ্গে মাঠে কা-কা করতে।'

কবিতাগুলো বগলদাবা করে সে ভেরনয়ের রাস্তা ধরে স্খলিতচরণে ফিরছিল। গ্রামে পৌঁছে সে মোড় ঘুরে ঢুকল ৎসাইগ্লার নামে এক ব্যক্তির দোকানে, লোকটা আর্মেনীয় ইহুদি,—হাতে যা-কিছু আসে তা বিক্রি করে দেয়।

ডেভিড বলল, 'ভাই, জঙ্গল থেকে নেকড়ে বাঘ এসে টিলার মাঠে আমার ভেড়াগুলোকে মহা জ্বালাতন করছে। ওদের বাঁচাবার জন্য আমায় বন্দুকজাতীয় কিছু কিনতেই হচ্ছে। তা তোমার কাছে কী আছে সেরকম?'

'ভাই মিগ্নো, আমার আজ দিনটাই খারাপ,'—দুপাশে হাত ছড়িয়ে ৎসাইগ্লার বলল, 'কারণ আমাকে তা'হলে বেচতে হয় এমন অস্ত্র যার দশভাগের একভাগ দামও ও-কাজে উঠবে না বুঝতে পারছি। সবে গত হপ্তায় এক ফেরিওলার কাছ থেকে কিনেছি একগাড়ি-বোঝাই মাল, সে আবার ওটা শস্তার দরে কিনেছিল রাজার এক কমিশনারের কাছ থেকে। ওগুলো নাকি কোন্ এক প্রাসাদের মাল, মালিক ছিল এক বিরাট জমিদার—নাম উপাধি কিছু জানি না—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে নির্বাসিত। মালগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাছা-বাছা বন্দুক আছে। এই পিস্তলটা দেখ না—আঃ রাজপুত্রের উপযুক্ত অস্ত্র। তোমার জন্য শুধু চল্লিশ ফ্রাঁ, বন্ধু মিগ্নো—পাইকিরি দামে দশ ফ্রাঁ ক্ষতি হচ্ছে যদিও। তবে, একটা পুরনো মাস্কেটবন্দুকও আছে—'

'এতেই কাজ হবে,'—কাউন্টারের ওপর টাকাটা ছুঁড়ে দিল ডেভিড—'গুলি পোরা আছে তো?'

'সে সব ভরে দিচ্ছি। গুলি আর কিছু বারুদের জন্য আরো দশ ফ্রাঁ যোগ কর।'

ডেভিড ওর কোটের ভেতর পিস্তলটা পুরে নেয়, চলতে থাকে বাড়ির দিকে। ঈভোন এখন ঘরে নেই। ইদানিং সে বড় বেশি ঘোরাঘুরি করছে পড়শিদের মধ্যে। রান্নাঘরে কিন্তু উনোনের আভা দেখা যাচ্ছে। ডেভিড রান্নাঘরের দরজা খুলে ওর কবিতাগুলো ছুড়ে দেয় জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে। আঁচটা গনগনে হয়ে উঠতে ওগুলো চিমনির মধ্যে কর্কশ শব্দে গেয়ে ওঠে যেন।

কবি বলে, 'কাকদের গান!'

ওপরের চিলের ঘরে গিয়ে ডেভিড দরজা বন্ধ করে। পল্লীটা এমন নিস্তব্ধ যে জনা কুড়ি লোক শুনতে পেল বড় পিস্তলটার গর্জন। ওরা দল বেঁধে ছুটে গেল ওখানে। সিঁড়ির ওপর থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটি লোক কবির দেহখানা তার বিছানায় রাখে, বেচারা কালো কাকের ছেঁড়া পালক ঢাকা দিয়ে তাকে ঠিকঠাক শুইয়ে দেয়। মেয়েরা সোৎসাহ সহানুভূতির বিলাসে কিচিরমিচির করে। তারপর কেউ ছুটে যায় ঈভোনকে খবর দিতে।

প্রথম আগন্তুকদের মধ্যে স্বভাবতই আছেন ম.পাপিনো, তাঁর নাকই তাঁকে টেনে এনেছে—তিনি অস্ত্রটা তুলে নিলেন, একবার চোখ বুলোলেন ওটার রুপোর কারুকাজগুলোর ওপর। তাঁর মেজাজে দুঃখবোধ আর সমঝদারির মিশ্র অনুভূতি।

গ্রাম্য যাজককে আড়া‌ন নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন: 'ওটা মঁসেনিয় মার্কি দ'বোপারতুই-এর বংশ-প্রতীক আর অস্ত্র।'

Roads of Destiny. এইন্স্লি'জ, ১৯০৩

শান্তির বসন

বড় শহরে রহস্যের ঘটনাগুলো এমন তাড়াতাড়ি, পর-পর ঘটে যায় যে পত্রিকার পাঠক-সাধারণ, এমনকি জনি বেলচেম্বার্সের বন্ধুরাও তিন বছর আগে তার আকস্মিক ও ব্যাখ্যাহীন অন্তর্ধানের ব্যাপারটায় এখন আর বিস্ময় প্রকাশ করে না। এই বিশেষ রহস্য এখন অবশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু সমাধানটা এমনই অদ্ভুত, সাধারণ মানুষের চোখে এমন অবিশ্বাস্য, যে মাত্র গুটিকয় বাছা মানুষ যারা বেলচেম্বার্সের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল তারাই শুধু এতে পুরোপুরি আস্থা রাখে।

সকলেরই ভালো করে জানা যে জনি বেলচেম্বার্সের জায়গা ছিল সমাজের উচ্চকোটির অতি নিভৃত অন্তরঙ্গ চক্রে। ফ্যাশনদুরস্ত লোকদের মতো লোক-দেখানো ঠাট-বাট ওর ছিল না, তারা তো অর্থ আর আড়ম্বর উন্মাদের মতো জাহির করে। এসব তার না থাকা সত্ত্বেও সব ব্যাপারেই অগাধ ব্যক্তিগত জ্ঞান, সমাজের উচ্চপদে তার অবস্থানকে দিয়েছিল যথাযোগ্য মর্যাদার জলুস। তার প্রতিভা, বিশেষ করে পোশাকের ক্ষেত্রে, সমুজ্জ্বল। এ ব্যাপারে সে নকলকারীদের পক্ষে হতাশার কারণ। সর্বদা সঠিক পোশাকে, সুন্দরভাবে ছিমছাম সাজা—আর আলমারিতে পোশাকের গোনাগুন্তি নেই—এই পরিচয়েই তাকে মনে করা হত নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি, সুতরাং গোটা আমেরিকারও। গট্‌হ্যামে এহেন দর্জি নেই যে বিনিপয়সায় বেলচেম্বার্সের পোশাক তৈরি করে দিতে পারলে নিজেকে ভাগ্যশালী ও কৃতার্থ

মনে না করত। ওর সে-পোশাক পরা মানেই অতি দুর্মূল্য এক বিজ্ঞাপন। ট্রাউজারের ওপর ছিল ওর বিশেষ ভক্তি। পুরো নিখুঁত না হলে ও সেদিকে ফিরেও তাকাবে না। সামান্য অবাঞ্ছিত ভাঁজটুকুও ওর নজর বেশিক্ষণ এড়াবে না, তাড়াতাড়ি দাগও তুলিয়ে নেবে কোথাও তা থাকলে। একজন লোককে সে সর্বদাই নিজের ঘরে বসিয়ে রাখত তার প্রচুর জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতে। ওর বন্ধুরা বলত তিনঘণ্টা ওর সীমা, পোশাক ফের বদল করার আগে অতটাই সময় সে পরবে, তারপরে আর নয়।

হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল বেলচেম্বার্স। তিনদিন অবধি ওর বন্ধুরা কেউ অবশ্য কিছু আশঙ্কা করেনি। তারপর তারা শুরু করল চিরাচরিত অনুসন্ধান পদ্ধতি। সবকিছুই ব্যর্থ হল। একেবারেই কোনো সূত্র সে পেছনে রেখে যায়নি। তারপর শুরু হল সম্ভাব্য উদ্দেশ্যের সন্ধান, কিন্তু তাও কিছু পাওয়া গেল না। তার কোনো শত্রু ছিল না, কোনো ধারদেনা ছিল না, কোনো মহিলাও ছিল না। ব্যাঙ্কে তার জমা রয়েছে কয়েক হাজার ডলার। কখনো কোনো মানসিক বিকৃতির দিকে ঝোঁক দেখায়নি; প্রকৃতপক্ষে বিশেষ রকম শান্তধীর ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ ছিল তার। বেপাত্তা মানুষটার খোঁজখবর করতে সব রকম উপায়ই গ্রহণ করা হল, কিন্তু সবই বিফল হল। এ হল সেই ধরনের একটা ঘটনা—যা সম্প্রতিকালে খুবই বেড়ে গেছে—যেখানে মানুষ মনে হয় মোমবাতির শিখার মতো উপে গেল, অথচ সাক্ষী হিসেবে রেখে গেল না একটু ধোঁয়ার রেশও।

মে মাসে বেলচেম্বার্সের দুই পুরনো বন্ধু টম্ আয়ার্স আর ল্যান্সেলট গিলিয়াম মহাসাগরের ওপারে গিয়েছিল সামান্য পর্যটন করতে। ইতালি আর সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে বেড়াতে তারা একদিন শুনল সুইস্ আল্পস্ পাহাড়ে এক মঠের কথা, সেখানে নাকি বাঁধা-ধরা ট্যুরিস্ট-ভোলানো আকর্ষণগুলো ছাড়াও আরো কিছু আছে। সন্ন্যাসীদের মঠ, মামুলি দৃশ্যসন্ধানীদের পক্ষে প্রায় দুরধিগম্য, কারণ তা পর্বতের চূড়ান্ত এবড়োখেবড়ো খাড়া কিনারা ঘেঁষে। এ মঠের যে আকর্ষণগুলো বিদ্যমান অথচ বিজ্ঞাপিত নয়, তা হল, প্রথমত সন্ন্যাসীদের তৈরি একটা বিশিষ্ট স্বর্গসুলভ বল ও স্ফূর্তিদায়ক পানীয়, যা নাকি 'বেনেডিকটাইন' আর 'শার্তরে-জে'র চেয়েও উপাদেয়। দ্বিতীয় আকর্ষণ একটা বিরাট পেতলের ঘন্টা, এমন নিখাদ আর সূক্ষ্মমাপে ঢালাই-করা যে, তিনশো বছর আগে প্রথম বাজানোর পর থেকে আজও তার আওয়াজ শেষ হয়নি। শেষ বিষয়টা—কোনো ইংরেজ কখনো এর চৌহদ্দির মধ্যে পা ফেলেনি। আয়ার্স আর গিলিয়াম ঠিক করল এই তিনটে বিবরণই তদন্ত করে দেখতে হয়।

সেন্ট গোঁদ্রাউয়ের মঠটিতে পৌঁছোবার জন্য দু'জন গাইডের সাহায্য নিয়ে তাদের দু'দিনের পথ যেতে হল। একটা হিম জমাট হাওয়া-ঝেঁটানো পর্বত কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে মঠটা, তুষার জমে আছে চারদিকে, আর বিপজ্জনক স্তূপাকারে এদিক-ওদিক

সরে যাচ্ছে। ওদের বেশ আতিথ্যসহকারেই আপ্যায়ন জানাল সন্ন্যাসীভ্রাতারা; কালেভদ্রে কোনো অতিথি এলে তাদের আনন্দবিধানই ওদের কর্তব্য। তারা সেই. মূল্যবান সঞ্জীবনী খেল, দেখল তেজ ও ফুর্তি জাগাবার মতো বিরলই এ পানীয়। ওরা সেই বিরাট চির-প্রতিধ্বনিময় ঘন্টাটির আওয়াজ শুনল; আব এও জানল যে সারা পৃথিবীর সর্বকোণ দাপিয়ে-বেড়ানো ইংরেজদের মধ্যে ওরাই প্রথম ভ্রমণকারী হয়ে এই ধূসর পাথরের চৌহদ্দিতে পা দিয়েছে।

এখানে আসার দিন বিকেলেই তিনটে নাগাদ দুজন যুবক গট্‌হ্যামবাসী মঠের বিপুলায়তন ঠাণ্ডা হলকামরায় ভ্রাতা ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখল সাধুরা কেমন সার বেঁধে যাচ্ছে ভোজনকক্ষের দিকে। পাশাপাশি দু'জন দু'জন মাথা অবনত করে ধীরে নিঃশব্দে এগুচ্ছে কর্কশ পাথরের মেঝের ওপর স্যাণ্ডালপরা পা ফেলে। মিছিলটা ধীরে এগিয়ে যেতে আয়ার্স হঠাৎ গিলিয়ামের বাহু চেপে ধরে। উদ্‌গ্রীব ফিস্‌ফিসানি তার গলায়—'তোমার ঠিক উল্টোদিকের লোকটাকে দেখ তো! এদিকের সারিতে, কোমরে হাত—ও যদি জনি বেলচেম্বার্স না হয় তো বলব কোনো কালেই তাকে দেখিনি!'

গিলিয়াম দেখল এবং চিনতেও পারল ফ্যাশনের রত্নটিকে। অবাক হয়ে বলল, 'বুড়ো বেল এখানে আবাব কী শয়তানি করছে? টমি, এ নিশ্চয় সে নয়! বেলের ধর্মে মতি ছিল বলে তো কখনো শুনিনি। বরং ওর মুখে শুনেছি চার-ঘোড়ার গাড়ি ঠিক মতো বাঁধা না হলে তাকে চার্চের কাঠগড়ায় উঠতে হবে, এই সব দুর্বাক্য।'

'নিঃসন্দেহেই এ বেল', দৃঢ় স্বরে বলল আয়ার্স, 'তা যদি না হয়, আমাকে এখনই চোখের ডাক্তার দেখাতে হবে! কিন্তু ভেবে দেখ তো, পোশাক-জগতের মধ্যমণি, গোলাপি চায়ের পরমভক্ত আজ এখানে ঠাণ্ডি বরফঘরে নস্যি-রঙের 'বাথরুব জোব্বা' পরে তপস্যা করছে! কিছুতেই সোজাভাবে নিতে পারছি না ব্যাপারটা। চল ওই হাসিখুশি বুড়োটাকে জিজ্ঞেস করি, ওই তো আমাদেব খাতিবযত্ন করছে।'

ভ্রাতা ক্রিস্টোফারের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করা হল। ততক্ষণে সন্ন্যাসীরা ভোজনকক্ষে চলে গছে। ওরা ঠিক কার কথা বলছে উনি বুঝতে পারলেন না। বেলচেম্বার্স? ওহো, সেন্ট গোঁড্রাউয়ের ভ্রাতারা যে দীক্ষা নেবার সময়ই তাদের জাগতিক নাম বিসর্জন দেন। ভদ্রলোকরা কি কোনো ভ্রাতার সঙ্গে কথা বলতে চান? ওরা যদি ভোজনকক্ষে একবারটি গিয়ে দেখিয়ে দেন কার সঙ্গে ওরা দেখা করতে চান, তাহলে যিনি কর্তা, মাননীয় মঠাধ্যক্ষই নিঃসন্দেহে তাকে সম্মতি দেবেন।

আয়ার্স আর গিলিয়াম ডাইনিং হলঘরে ঢুকে ভ্রাতা ক্রিস্টোফারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ওদের আগের দেখা সেই ব্যক্তিকে। হ্যাঁ, ওই তো জনি বেলচেম্বার্স। এখন পরিষ্কারই ওরা দেখতে পাচ্ছে তার মুখ, মলিনবদন ভ্রাতাদের মধ্যে বসে আছে, একবারও মাথা তুলছে না, মোটা বাদামি বাটি থেকে মাংসের জুষ খাচ্ছে।

মঠাধ্যক্ষ ভ্রমণকারী দুজনকে অনুমতি দিয়েছেন, একজন ভ্রাতার সঙ্গে তারা কথা বলতে পারে। ওরা তার অপেক্ষায় বসে রইল অভ্যর্থনা কক্ষে। স্যাণ্ডেল-পরা, মৃদু পায়ে সে যখন হেঁটে এল, আয়ার্স আর গিলিয়াম দুজনেই ধাঁধায় পড়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। জনি বেলচেম্বার্স্ তো বটেই—তবে একেবারে অন্য রূপে! তার পরিষ্কার কামানো মুখমণ্ডলে অনির্বচনীয় শান্তি, প্রাপ্তির তুরীয়ানন্দ, বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ সুখের অভিব্যক্তি। দেহ গঠন সগর্বে ঋজু, চোখে প্রশান্ত কমনীয় আলোর দীপ্তি। নিউইয়র্কের দিনগুলোর মতোই সে ছিমছাম ফিটফাট, কিন্তু কত আলাদা পোশাক তার পরিধানে! মনে হয় এখন সে মাত্র একটাই বসন পরেছে—পুরু বাদামি কাপড়ের ঢিলে আংরাখা, কোমরের কাছে সুতীর পাকানো দড়ি বাঁধা, আর নেমে গেছে প্রায় পা অবধি ঢিলে সিধে ভাঁজে। সেই পুরনো অনায়াস মনোরম ভঙ্গিতেই সে তার অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করল। এ সাক্ষাৎকারে কোনো অপ্রতিভ ভাব থাকলেও জনি বেলচেম্বার্স তার অভিব্যক্তি দেখায়নি। কামরাটাতে বসবার আসন নেই, তাই দাঁড়িয়েই ওদের কথাবার্তা বলতে হল।

আয়ার্স একটু বিমূঢ়ভাবে বলল, 'তোমায় দেখে খুশি হলাম, ওল্ডম্যান। তোমাকে এইরকম জায়গায় পাব বলে প্রত্যাশাই করিনি। অবশ্য মোটের ওপর অভিপ্রায়টা তোমার মন্দ নয়। সমাজ বিশ্রিরকম কৃত্রিমতায় ভরা। ওসব মাথা-ঘোরানো নাগরদোলা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চয় স্বস্তি পাচ্ছ এখন—ইয়ে... ধ্যান... তোমার গিয়ে প্রার্থনা, নামগান.. এইসবের মধ্যে অবসর নিতে পেরে।'

'ওসব ছাড়ান দাও তো টমি,'— ফুর্তিভরা গলায় বেলচেম্বার্স বললে, 'ভয় পেও না, তোমাদের হাতে আমাদের থালা চালান করছি না। এই সব আগড়ম-বাগড়ম আমাকে করতেই হয় বাকি এই বুড়োদের সঙ্গে, কারণ ওগুলোই নিয়ম। আমি এখানে ব্রাদার অ্যামব্রোজ, বুঝলে। আমায় দশ মিনিট সময় দেয়া হয়েছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে। গিলিয়াম, তোমার ওয়েস্টকোটের এটা নতুন ছাঁদ বুঝি? আজকাল কি ব্রডওয়েতে ওরা এইগুলো পরে?'

গিলিয়ামও প্রফুল্লকণ্ঠে বলে, 'সেই পুরনো জনিই আছ দেখছি। তাহলে কোন্ ভূতের... মানে বলছি কিসের তাড়নায়... দুত্তোরি, কেন বল তো এটা করলে তুমি ওল্ড ম্যান?'

প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় আয়ার্সের আর্জি: 'ভাই, ও স্নানঘরের জোব্বাটা খুলে ফেল, আমাদের সঙ্গে চল ফিরে। আগের সেই পুরনো দলবল তোমায় পেলে খুশিতে পাগল হবে। এ তো তোমার লাইন নয়, বেল। তুমি যখন কোনো কারণ না দেখিয়ে বিদায় নিলে, আমি জানি আধডজন মেয়ে গোপনে কেঁদেছিল। পদত্যাগপত্র দাও, কি রেহাই চাও, কিংবা যা কিছু করতে হয় এ বরফ কারখানা থেকে মুক্তি পেতে, তাই কর। তোমার চোখে ছানি পড়ে যাবে বেল—আর ভগবান্ এ কী! তোমার পায়ে তো মোজাই নেই!'

বেলচেম্বার্স ওর স্যাণ্ডেল-পরা পায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

সান্ত্বনার সুরে বলে, 'বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পার না। আমাকে ফিরে যেতে

বলছ সেটা তোমাদের সুন্দর মনোভাবের পরিচয়, কিন্তু সেই পুরনো জীবন আমাকে কিছুতেই ফিরে পাবে না আর। আমার সমস্ত উচ্চাশার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁচেছি এইখানে এসে। আমি সম্পূর্ণ সুখী আর তৃপ্ত। আর বাকি জীবনটাও এখানেই থেকে যাব। এই ঢিলে জোব্বাটা দেখছ যা আমি পরে রয়েছি?'—বেলচেম্বার্স সাদরে স্পর্শ করে তার সিধে ঝুলে-যাওয়া বসনটি—'অবশেষে এমন জিনিস পেয়েছি যা আমার হাঁটুর কাছে ফুলে থাকবে না। আমি পেয়ে গেছি—'

এই সময়ে বিশাল পেতলের ঘন্টাটার গম্ভীর নাদ প্রতিধ্বনি তুলল মঠগৃহের মধ্যে। ওটা নিশ্চয় এক্ষুনি উপাসনায় বসার ডাক। কারণ ভ্রাতা অ্যামব্রোজ মাথা নোয়াল, ফিরে চলে গেল কামরা ছেড়ে, একটা কথাও না বলে। পাথরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় শুধু সামান্য হাত নেড়ে হয়তো ওর পুরনো বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। ওরাও আর দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে দেখা না করে মঠ ছেড়ে চলে এল।

আর এই কাহিনীটাই টমি আয়ার্স আর ল্যান্সেলট গিলিয়াম সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তাদের সর্বশেষ ইউরোপীয় সফর থেকে ফিবে।

The Robe of Peace, এইন্‌স্‌লি'জ, ১৯০৩ (এস্. এইচ্. পিটার্স ছদ্মনামে)

একটি ডলারের মূল্য

১

রিওগ্রাণ্ডি নদী-সীমারেখার এপারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলা, সেখানকার জেলা-বিচারপতি একদিন সকালের ডাকে পেলেন এই চিঠিখানা:

"বিচারক:

আমাকে চার বছর জেলের ঘানি টানতে পাঠাবার সময় আপনি বড় বক্তৃতা করেছিলেন। অনেক কড়া গালাগালের মধ্যে আমায় 'র‍্যাট্‌ল সাপও' বলেছিলেন। হয়তো আমি তাই—মোটের ওপর এখন আমার 'ঝুমঝুমি' শুনতে পাচ্ছেন। খোঁয়াড়ে ঢোকার এক বছর বাদে, আমার মেয়েটি মারা গেল—ওরা বলে নাকি অনাহার আর অপমান এর কারণ। জজসাহেব, আপনারও তো একটি মেয়ে আছে, আর আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছি নিজের কন্যাকে হারালে কেমন লাগে। আর ওই জেলা এ্যাটর্নিকেও আমি ছোবল মারব, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো সেই করেছিল। আমি এখন খালাস পেয়েছি, হয়তো 'ঝুমঝুমি' সাপও বনে গেছি পুরোপুরি। আমার তো সেই রকমই লাগে নিজেকে। আমি বেশি কথা বলি না,

কিন্তু এই হল আমার 'ঝুমঝুমি'র আওয়াজ। খেয়াল করবেন কখন ছোবল দিই। সম্মান সহকারে—

ব্যাট্‌ল সাপ।"

বিচারপতি ডেরওয়েন্ট অবহেলাভরে চিঠিখানা একপাশে ছুঁড়ে দিলেন। এ রকম ধরনের চিঠি পাওয়া তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়—এগুলো আসে কিছু মরীয়াগোছের মানুষের কাছ থেকে, যাদের দণ্ডদান করতে হয়েছে তাঁকে। উনি আতঙ্ক বোধ করেন না। পরে চিঠিটা দেখান তরুণ জেলা এ্যাটর্নি লিট্‌লফিল্ডকে, কারণ শাসানির চিঠিতে তার নামও রয়েছে। জজসাহেব নিজের ও সহযোগীদের মধ্যে ঘটিত কোনো ব্যাপারে খুব আদবকেতা মেনে চলেন।

লিট্‌লফিল্ড অবশ্য নিজের দিক থেকে পত্রলেখকের ঝুমঝুমির জবাবে একটা ব্যঙ্গ-হাসি হাসেন; কিন্তু আবার সামান্য ভুরুও কোঁচকান জজের মেয়ের উল্লেখে, কারণ ন্যান্সি ডেরওয়েন্টকে উনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আগামী শীতকালে।

লিট্‌লফিল্ড আদালতের কেরানির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বসে পুরনো রেকর্ডগুলো খতিয়ে দেখেন। তাদের সিদ্ধান্ত হয়, চিঠিটা বোধহয় পাঠিয়েছে মেক্সিকো স্যাম, লোকটা বর্ণসংকর, সীমান্ত দুর্বৃত্ত, চার বছর আগে মানুষ খুনের দায়ে তার জেল হয়েছিল। এর পর নানা সরকারী কাজের ভিড়ে লিট্‌লফিল্ডের মাথা থেকে ব্যাপারটা মুছে যায়, আর প্রতিশোধকামী সাপের ঝুমঝুমিও ভুলে যান ওরা।

ব্রাউন্‌স্‌ভিলে তখন আদালতের বৈঠক চালু আছে। মোকদ্দমার বিচার বেশির ভাগই হবে চোরাচালান, মুদ্রা জাল, পোস্টাপিস-ডাকাতির অভিযোগ আর রাষ্ট্রীয় সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের অপরাধ নিয়ে। একটা মামলা হবে এক যুবক মেক্সিকান রাফায়েল অর্টিসের বিরুদ্ধে। তাকে একজন শেয়ানা ডেপুটি মার্শাল হাতে নাতে ধরেছে একটা জাল রুপোর ডলার চালাবার সময়। আগেও তাকে সন্দেহ করা হত নানা অসৎ কাজে, কিন্তু এবারই প্রথম তাকে প্রমাণযোগ্য অপরাধে ধরা গেল। অর্টিস জেল-হাজতেই আরামে বসে রইল, শুধু তামাকপাতার বিড়ি খায় আর সবুর করে বিচারের জন্য।

ডেপুটি কিলপ্যাট্রিক জাল ডলারটা এনে জেলা এ্যাটর্নিকে দিয়েছে আদালত-বাড়িতে তাঁর নিজস্ব দপ্তরেই। ডেপুটি, আর একজন ওষুধের দোকানী, হলপ করে বলার জন্য প্রস্তুত যে ওই জাল মুদ্রা দিয়েই অর্টিস এক শিশি ওষুধ কিনেছিল। মুদ্রাটি অতি ওঁচা ধরনের মেকি, নরম, ম্যাড়মেড়ে, মূলত তামা দিয়ে তৈরি। পরদিন সকালে অর্টিসের মামলার দলিলপত্র আদালতে পৌঁছোবার কথা, জেলা এ্যাটর্নি তাই মামলার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

'মুদ্রাটা যে বাজে তা প্রমাণ করার জন্য দামি কোনো বিশেষজ্ঞকে দেখাবার প্রয়োজন নেই, কী বল কিল্?'—হাসলেন লিট্‌লফিল্ড। টেবিলের ওপর ডলারমুদ্রাটা বসাতে গিয়ে আওয়াজ উঠল ভোঁতা, যেন এক দলা পুটিং।

ডেপুটি তার কোমরবন্ধনী ঢিলে করে বলল, 'দো-আঁশলাটা এবার গারদেই ঢুকে গেছে ধরে নিতে পারি। আপনার হাতেই মরল। যদি প্রথমবারের গলতি হত, বলা যেত এই মেক্সিকানগুলো ভাল-টাকা মন্দ-টাকায় তফাত বোঝে না। কিন্তু এই বেঁটে হলদে বদমাশটা বড় একদল জালিয়াতের সঙ্গী। আমি জানি। এইবারই পয়লা ওকে হাতে-নাতে ধরতে পারলাম। নদীর পাড়ে মেক্সিকানদের বস্তিতে ওর এক মেয়েবন্ধুও আছে। ওর ওপর নজর রাখতে গিয়ে একদিন তাকে দেখেছি, ফুলবাগিচায় লাল বকনা-গাইয়ের মতো দেখনসই।'

জাল ডলারটা লিট্‌লফিল্ড পকেটে পুরলেন, আর একটা খামের মধ্যে ভরলেন তাঁর মামলার স্মারকপত্রগুলো। ঠিক সেই সময় দরজার সামনে দেখা দিল একটা ঝলমলে হাসিখুশি মুখ—বালকের মতো সরল উৎফুল্ল—ভেতরে চলে এল ন্যান্সি ড্যেরওয়েস্ট।

লিট্‌লফিল্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'ও বব, কোর্ট না আজ বারোটার সময় মুলতুবি রাখা হল কাল সকাল অবধি?'

'তা তো হল,' বললেন জেলা এ্যাটর্নি, 'এতে আমি খুশি। হাতে একগাদা আইনের নির্দেশ খতিয়ে দেখার আছে, আর,—'

'ব্যাস্, এই না হলে এ্যাটর্নি! এবার বুঝি বাবার সঙ্গে বসবে আইনের বই, বা নির্দেশ, বা ওইসব ঘাঁটতে? আমি চাই আজ বিকেলে তুমি আমায় তিতির-শিকারে নিয়ে চল। 'লং প্রেইরির' মাঠ ওগুলোতে এখন ভরে গেছে। না বলতে পারবে না, কিন্তু! আমার নতুন বারো ঘরা হ্যামারলেস্ বন্দুকটা পরখ করতে চাই। সহিসদের আস্তাবলে হুকুম পাঠিয়েছি বাকবোর্ড ঘোড়াগাড়িতে 'ফ্লাই' আর 'বেস্'কে জুড়তে; ওরা গুলিগোলা চললেও তা চমৎকার সইতে পারে। আমি তো নিশ্চিতই ছিলাম তুমি যাবে।'

শীতকালে ওদের বিয়ে হবার কথা। তাই জুলুস এখন চূড়ান্তে। শেষ অবধি তিতিরপাখিরই জয় হল—আজ বিকেলে, হার মানলেন আস্তিন-আঁটা আমলারা। লিট্‌লফিল্ড কাগজপত্র সরিয়ে রাখতে শুরু করেন।

দরজায় একটা টোকার শব্দ। কিলপ্যাট্রিক এগিয়ে যায়। সুন্দরী কালো-চোখ একটি মেয়ে কামরার ভেতর ঢুকল। মুখের ত্বকে লেবু রঙের অতি হালকা একটা আমেজ। মাথার ওপর, আর গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে একটা কালো শাল।

মেয়েটা স্পেনীয় ভাষায় একরাশ কথা বলে, যেন বিষণ্ণ সঙ্গীতের শোক-ধারা। লিট্‌লফিল্ড স্পেনীয় বোঝেন না। ডেপুটি ও-ভাষাটা জানে, ও-ই তর্জমা করে দিতে লাগল মেয়েটির কথাগুলো—দফায় দফায়, এককে বার হাত তুলে ওর বাক্যস্রোত রুখে।

'মিঃ লিটলফিল্ড, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে ও। ওর নাম জয়া ট্রেভিনাস্। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় এই... মানে এই রাফায়েল অর্টিসের

সঙ্গে এ জড়িত কিনা। ও হল... আসলে তার মেয়ে-বন্ধু। বলছে, সে নাকি নিরপরাধ। বলছে টাকাটা ওই বানিয়েছিল, তাকে দিয়েছিল চালাবার জন্য। একে বিশ্বাস করবেন না মিঃ লিট্‌লফিল্ড। মেক্সিকান মেয়েগুলোর এই হল ধরন ধারণ—একবার কোনো ছোকরার ওপর মন পড়লে তার জন্য মিথ্যেকথা বলবে, চুরি করবে, খুনও করতে পারে। প্রেমে-পড়া কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করবেন না!'

'মিস্টার কিল্‌প্যাট্রিক!'

ন্যান্সি ডোরওয়েন্টের ক্রুদ্ধ চিৎকারে ডেপুটি এক মুহূর্ত হিমসিম খেয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে নিজের ভাবনাগুলোরই ভুল উধৃতি দিয়েছে, তাই আবার তর্জমা করতে শুরু করে:

'এ বলছে, যদি লোকটাকে ছেড়ে দেন তা'হলে তার জায়গায় এ জেলে থাকতেও রাজি। বলছে, ওষুধ না পেলে ও মরে যাবে একথাই নাকি ডাক্তাররা বলেছিল তাই লোকটা একটা তামার ডলার চালাতে গিয়েছিল ওষুধের দোকানে। বলছে ওতেই এর নাকি জীবন রক্ষা হয়। এই রাফায়েলটি বোধ হয় এর প্রিয়পাত্র, তা হতে পারে। ওর কথার মধ্যে প্রেম ইত্যাদি নানা বিষয় আছে যা আপনি শুনতে চাইবেন না।'

জেলা এ্যাটর্নির কাছে এ এক মান্ধাতার গল্প।

বললেন, 'ওকে বলে দাও আমি কিছু করতে পারি না। কাল সকালে মামলা উঠবে আদালতে, সেখানেই তাকে নিজের জন্য লড়তে হবে।'

ন্যান্সি ডোরওয়েন্ট অত কঠিন হয়ে উঠতে পারেনি। জয়া ট্রেভিনাসের দিকে সে সমবেদনার আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল, তারপর ফের দেখছিল লিট্‌লফিল্ডকে, পালা করে। ডেপুটি মার্শালটি ওদিকে জেলা এ্যাটর্নির বক্তব্যগুলো বলছে মেয়েটিকে। সে নিচু গলায় একটা-দুটো কথা বলল, তারপর মুখ ঘিরে শালটা টেনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জেলা এ্যাটর্নি জিজ্ঞেস করলেন—'কী বলল এখনই ও?'

ডেপুটি বলে, 'এমন কিছু নয়! বলছিল: "একজনের জীবন যদি"... দাঁড়ান, কথাটা কী বলছিল ভাবি.. হ্যাঁ, "আপনার ভালবাসার পাত্রীর যদি কখনো বিপদ হয়, স্মরণ করবেন রাফায়েল অর্টিস্‌কে"।'

কিলপ্যাট্রিক করিডর ধরে চলে যায় মার্শালদের দপ্তরের দিকে।

ন্যান্সি শুধোয়, 'বব, তুমি কিছুই করতে পার না ওদের জন্য? একটা সামান্য ব্যাপার—নেহাৎ একটা অচল ডলার—তাতেই নষ্ট হবে দুটো জীবনের সুখশান্তি! মেয়েটা তো মরণাপন্ন ছিল, আর সে ওকে বাঁচাবার জন্যই কাজটা করেছিল। আইনে কি সমবেদনার দাম নেই?'

'ন্যান, আইনের শাস্ত্রে এর কোনো স্থান নেই। বিশেষ করে কোনো মোকদ্দমায় যখন জেলা এ্যাটর্নির কর্তব্য আছে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি অভিযোগকারী-পক্ষ

প্রতিশোধ খুঁজবে না; কিন্তু যখন মোকদ্দমা আসবে তখন লোকটার দণ্ড হয়েই গেছে বলা যায়। মেকি ডলারটা চালাতে চেষ্টা করেছিল বলে সাক্ষীরা হলপ নেবে, আর ওটা এই মুহূর্তে আমার পকেটেই রয়েছে এক নম্বব প্রমাণ হিসেবে। জুরিদের মধ্যে কোনো মেক্সিকান নেই, ওরা আসন ছাড়ার আগে দেশী মেক্সিকানটিকে অপরাধী বলেই রায় দিয়ে বেরুবে।'

২

সেদিন বিকেলে তিতির শিকার ভালই হল, মৃগয়ার আনন্দে ভুলে যাওয়া হল রাফায়েলের মোকদ্দমা, জয়া ট্রেভিনাসের মর্মবেদনা। জেলা এ্যাটর্নি আর ন্যান্সি ডোরওয়েন্ট গাড়ি চালিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে তিন মাইল পথ গেল মসৃণ ঘাসঢাকা পথ ধরে। তারপর ধরল ঢেউ খেলানো প্রেইরি-মাঠের পথ—ওদের লক্ষ্য পিয়েদ্রা খাড়ির কাছে ঘন বড়গাছের সারিটা। ওই খাড়ি পেরুলেই লং প্রেইরি, তিতির শিকারীদের প্রিয় জায়গা। ওরা খাড়ির কাছে আসার সময় শুনল ডানদিক থেকে একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ, কদমচালে ছুটে আসছে, দেখল কালো চুল আর কটা মুখওয়ালা একটা লোক জঙ্গলের দিকে তেরছা রাস্তায় ঘোড়া চালিয়ে আসছে—যেন ওদের পেছন থেকেই এল, এই রকম ভাবটা।

মানুষের মুখ খুব ভালই মনে থাকে লিট্‌লফিল্ডের। বললেন, 'কোথায় যেন দেখেছি লোকটাকে, তবে জায়গাটা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। বোধহয় কোনো র‍্যাঞ্চমালিক হবে, সংক্ষিপ্ত পথে ঘরে ফিরছে।'

লং প্রেইরিতে ওরা ঘণ্টাখানেক কাটায়, গাড়ি থেকেই গুলি চালিয়ে শিকার করে। ন্যান্সি ডোরওয়েন্ট খুব খাটিয়ে, বার দুনিয়ার 'পশ্চিমী' মেয়ে। বারো-ঘরা বন্দুকটা নিয়ে ও বড় খুশি। সঙ্গীর এক-কুড়ির জায়গায় ও দু'থলি শিকার ভরে ফেলেছে।

ধীর দুলকি চলে ওরা বাড়ির দিকে যাত্রা করে। পিয়েদ্রা খাড়ির একশো গজের মধ্যে আসতেই একটা লোক দারুবনের আড়াল থেকে ঘোড়া চালিয়ে বেরিয়ে সরাসরি ওদের দিকে আসতে লাগল।

মিস্ ডোরওয়েন্ট বলল, 'একেই যেন দেখলাম তখন পেছন থেকে আসতে?'

ওদের মধ্যে দূরত্বটা কমে আসতে, জেলা এ্যাটর্নি হঠাৎ নিজেদের ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে ধরলেন, চোখ স্থির রেখেছেন এগিয়ে-আসা ঘোড়সওয়ারের দিকে। ও লোকটা তখন জিনসাজের ভেতরের খাপ থেকে একটা উইনচেস্টার রাইফেল বের করে নিজের এক বাহুর ওপর রাখে।

'এবার তোমায় চিনেছি বাছাধন, মেক্সিকো স্যাম,'—বিড়বিড় করে বলে লিট্‌লফিল্ড—'তুমিই ওই ভদ্র চিঠিটার মধ্যে ঝুমঝুমি বাজিয়েছিলে!'

মেক্সিকো স্যাম কোনো কিছু বেশিক্ষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখে না। আগ্নেয়াস্ত্রের

সমস্ত ব্যাপারেই তার তীক্ষ্ণ নজর। তাই রাইফেলের ভালরকম পাল্লা যখন আসে অথচ 'আট ঘরার' বিপদ থেকে দূরে, তখনই সে উইনচেস্টারটা তুলে গুলি ছোঁড়ে 'বাকবোর্ড' গাড়ির আরোহীদের ওপর। প্রথম গুলিটা ফাটিয়ে দিল আসনের পেছনদিক—লিট্‌লফিল্ড আর মিস্ ড্রেরওয়েন্টের কাঁধ দুটোর মাঝে দু-ইঞ্চি পরিমিত জায়গা। দ্বিতীয় গুলিটা ভেদ করে গেল সামনের বোর্ড আর লিট্‌লফিল্ডের পাতলুনের পায়ের কাপড়।

জেলা এ্যাটর্নি তাড়াতাড়ি ন্যান্সিকে নামিয়ে দিলেন গাড়ির বাইরে জমির ওপর। ও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করেনি। ওর ছিল সেই সীমান্ত এলাকার সহজাত বুদ্ধি যা জরুরি অবস্থায় যে-কোনো পরিস্থিতি মেনে নেয় বিনা বিতর্কে। ওরা দুজন হাতে রেখেছে বন্দুক, আর লিট্‌লফিল্ড তাড়াহুড়ো করে কয়েক মুঠো কার্তুজও তুলে নিলেন আসনে-রাখা পেজ্‌বোর্ডে বাক্স থেকে। পকেটে ঠেসে বোঝাই করলেন সেগুলো।

হুকুম করলেন, 'ঘোড়াদুটোর পেছনে লুকোও, ন্যান। ও লোকটা একটা গুণ্ডা, আমি একবার জেলখানায় পাঠিয়েছিলাম। এখন শোধ তুলতে চাইছে। ও জানে আমাদের বন্দুকের গুলি এতদূর থেকে ওকে ছুঁতেও পারবে না।'

ন্যান্সি স্থিরভাবে বলে, 'ঠিক আছে বব, আমি ঘাবড়াচ্ছি না। কিন্তু তুমিও একটু কাছে এস।.... এ্যাই এ্যাই বেস্! এখন সোজা হয়ে দাঁড়া একটু!'

বেসের ঘাড়ের চুলে হাত বোলায় ও। লিট্‌লফিল্ড বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আর মনে মনে চাইছেন ডাকাতটা যেন পাল্লার মধ্যে আসে।

কিন্তু নিরাপদ জায়গায় থেকেই মেক্সিকো স্যাম তার প্রতিশোধের খেলা খেলছে। সে তো আর তিতির পক্ষী নয়, অন্য ধরনেব পাখি। সঠিক নজরে সে একটা কল্পিত পরিধিরেখা টেনে নিয়েছে পাখি-মারা বন্দুকের বিপজ্জনক এলাকা ঘিরে, আর এই রেখার ওপরেই সে চরে বেড়াচ্ছে এখন। ওর ঘোড়া বোঁ করে ডানদিকে ঘুরল একবার, আর ওর বলির আসামীরাও সেই সময় তাদের 'অশ্ব'-প্রাচীরের নিরাপদ আড়ালে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বুলেট ছুঁড়ে জেলা এ্যাটর্নির টুপি ফুটো করে দিল। একবার সে চক্কর দিতে গিয়ে বোধহয় হিসেবে ভুল করেছিল। তাই সীমারেখার এধারে এসে পড়ে। লিট্‌লফিল্ডের বন্দুক ঝলক্ দিয়ে ওঠে, মেক্সিকো স্যাম মাথা নিচু করল নিষ্ফল গুলির চড়বড়ানির সামনে। দু'একটা গুলি ওর ঘোড়াকেও হুল ফুটিয়েছে, ঘোড়াটা লাফ দিয়ে ফিরে আসে নিরাপদ এলাকায়।

দুর্বৃত্ত আবার গুলি চালায়। ন্যান্সি ড্রেরওয়েন্টের তরফ থেকে সামান্য একটা আর্তধ্বনি আসে। লিট্‌লফিল্ড বোঁ করে ঘুরে জ্বলন্ত চোখে তাকান, দেখতে পান মেয়েটির গাল বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

'আমি আঘাত পাইনি বব—শুধু একটা চিলতে ছিটকে গেছে। মনে হয় লোকটা গাড়ির চাকায় মেরেছিল।'

'হা ভগবান্, এই সময় সঙ্গে যদি হরিণশিকারের গুলিও কিছু থাকত!'. গুঙিয়ে ওঠেন লিটলফিল্ড।

গুণ্ডাটা ঘোড়া স্থির করে খুব সতর্ক তাক্ করেছে এবার। 'ফ্লাই' ঘোড়াটা ফোঁস্ করে উঠে তার সাজের মধ্যেই পড়ে যায় কাঁধে আঘাত পেয়ে। 'বেস্' এখন ধারণা পাল্টেছে, বুঝে গেছে এটা তিতির শিকার নয়, তাই সেও লাগামদড়ি ছিঁড়ে ছুটে গেল প্রাণপণে। মেক্সিকান স্যাম একটা বুলেট পাঠাল পরিষ্কারভাবে, ন্যান্সি ডোরওয়েস্টের শিকার-জ্যাকেটের উদ্গত অংশ দিয়ে।

লিট্‌লফিল্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শুয়ে পড়—শুয়ে পড়! একেবারে ঘোড়ার গা ঘেঁষে মাটির সঙ্গে চেপ্‌টে শুয়ে পড়—হ্যাঁ ওই রকম।'—কাত হয়ে পড়ে-থাকা ফ্লাইয়ের পিঠের কাছে ঘাসের ওপর প্রায় ঠেলেই দিলেন ওকে। কোনো অদ্ভুত কারণে সেই মুহূর্তটিতে তাঁর মনে পড়ে গেল মেক্সিকান মেয়েটির কথাগুলো: 'আপনার ভালবাসার পাত্রীর যদি কখনো বিপদ হয়, স্মরণ করবেন রাফায়েল অর্টিস্‌কে।''

লিট্‌লফিল্ড একটা বিস্ময়ের আওয়াজ করেন।

'ঘোড়ার পিঠের ওপর দিকে গুলি চালাও, ন্যান! যত তাড়াতাড়ি পার, গুলি চালিয়ে যাও। ওকে জখম করতে পারবে না ঠিকই, তবে এক মিনিট গুলি চালিয়ে ওকে ঠেকাও, এর মধ্যে আমি একটা মতলব কাজে লাগাতে চেষ্টা করি।'

ন্যান্সি চট করে একবার আড়চোখে দেখে নিল লিট্‌লফিল্ডকে। দেখল সে একটা পকেট-ছুরি বের করে ভাঁজ খুলছে। তারপর সে হুকুম তামিল করতে মাথা ফেরাল, দ্রুত বেগে দুশমনকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকল।

মেক্সিকো স্যাম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল যতক্ষণ-না এই নিষ্ফল গুলিবর্ষণ থামে। ওর হাতে প্রচুর সময়, তাই পাখি-মারা গুলির ঝুঁকি নিতে চায় না—একটু সাবধান হলেই যেখানে চলে সেখানে অযথা কেন চোখটাকে জখম করবে? ওর ভারী কানাতওয়ালা স্টেট্‌সন টুপিটা মুখ অবধি টেনে দিল যতক্ষণ না গুলি ছোঁড়া শেষ হয়। তারপর ও একটু কাছে এগিয়ে এল, সাবধানে লক্ষ্য স্থির ক'রে, ভূপতিত ঘোড়াটার ওপর দিয়ে তার শিকারদের যা-কিছু নজরে পড়ে, তার ওপরেই গুলি চালিয়ে দেয়।

কিন্তু ওদের দুজনের কেউই নড়ল না। ঘোড়াটাকে দাবড়ে সে আরো কয়েক পা আগে বাড়াল। দেখতে পেল জেলা এ্যাটর্নি এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠলেন আর ইচ্ছে করেই শটগানটা সিধে বাগিয়ে ধরলেন। স্যাম তার টুপিটা আরো টেনে দিল কপালের ওপরে, ছোট ছর্‌রার নির্দোষ পট্‌পট আওয়াজ শুনবার জন্য সবুর করে থাকল সে।

একটা বিরাট আওয়াজ করে শটগানের অগ্নিশিখা জ্বলে। মেক্সিকো স্যাম একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একেবারে লুটিয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠে, তারপর ধীরে গড়িয়ে পড়ে ঘোড়া থেকে—মৃত র‍্যাট্‌ল সাপের মতো!

৩

পরদিন সকালে আদালত খুলল দশটার সময়, ডাক পড়ল 'যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাফায়েল অর্টিসের' মোকদ্দমার। জেলা অ্যাটর্নি, ব্যাণ্ডেজ করে হাত ঝোলানো—এই অবস্থায় দাঁড়ালেন, আদালতকে সম্বোধন করলেন।

বললেন, 'মাননীয় বিচারপতি, আপনার সন্তোষের জন্য নিবেদন, এই মামলায় আমি অভিযোগ প্রত্যাহার করতে ইচ্ছা করি। আসামী যদি দোষীও হন, সরকারের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ নেই তার দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করার। এই মামলা উত্থাপন করার জন্য যে জালমুদ্রাটিকে প্রমাণ স্বরূপ ধরা হয়েছিল সেটাকেই এখন সাক্ষ্য হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাই অনুরোধ জানাই, মামলা খারিজ করা হোক।'

দুপুর বেলার বিরতিকালে ডেপুটি কিলপ্যাট্রিক এসে ঢোকে জেলা এ্যাটর্নির দপ্তরে। বলে:

'একটু আগেই গিয়েছিলাম বুড়ো মেক্সিকো স্যামকে এক ঝলক দেখে আসতে। ওরা তাকে শেষ শয্যায় শুইয়ে রেখেছে। বুড়ো মেক্সিকো যে বড় শক্ত কাঠামোর মানুষ ছিল তা তো জানি। ছোকরা ওদিকে ভেবে অবাক হচ্ছে আপনি কী দিয়ে ওকে গুলি করেছিলেন! কেউ বলছে নিশ্চয় পেরেকই ছিল বন্দুকে। আমি তো কখনো দেখিনি বন্দুকে এমন কিছু থাকতে পারে যা ওর মতো শরীরও ঝাঁঝরা করে দিতে পারে।'

'আমি ওকে গুলি করেছিলাম', জেলা এ্যাটর্নি বলেন, 'তোমার জাল-মুদ্রা মোকদ্দমার এক নম্বর প্রমাণবস্তুটা দিয়েই। আমার পক্ষে, এবং অন্য কারুর পক্ষেও, এটা সৌভাগ্যের বস্তুই বটে—যদিও অচল বলতে ডাহা অচল ছিল টাকাটা! খুব চমৎকারভাবে ওটাকে কেটে-কেটে 'স্লাগ্' বানিয়েছিলাম। শোনো কিল্, তুমি একবার যেতে পার না বস্তিতে, খুঁজে দেখতে মেক্সিকান মেয়েটা কোথায় থাকে? মিস্ ডোরওয়েন্ট জানতে চেয়েছিলেন।'

One Dollar's Worth. মানসিজ্, ১৯০৩ (সিডনি পোর্টার নামে)

আত্মশুদ্ধির মূল্য

জেলখানার 'জুতো-কারখানা'য় অক্লান্ত পরিশ্রমে জুতোর ওপরতলি সেলাই করে যাচ্ছিল জিমি ভ্যালেন্টাইন। এমন সময় প্রহরী এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল সামনের দপ্তরে। সেখানে ওয়ার্ডেন নিজে জিমির হাতে তুলে দিল রেহাই নির্দেশ, সেদিন সকালেই ওতে গভর্নর স্বাক্ষর করেছেন। জিমি ক্লান্ত ভাব করে সেটা হাতে নিলে। চার-বছরের সাজার প্রায় দশমাস সে জেল খেটেছে। বড় জোর আরো তিনমাস সে এখানেই থাকত বলে তার প্রত্যাশা ছিল। জিমি ভ্যালেন্টাইনের মতো লোকের যখন বাইরের জগতে এত বন্ধু, তখন জেলে আশ্রয় পেলেই বা তার মাথা মুড়োবার কী আছে?

ওয়ার্ডেন বললে, 'দ্যাখো ভ্যালেন্টাইন, কাল সকালে ছাড়া পাচ্ছ তুমি। এবার একটু তরতাজা হও, নিজেকে মানুষের মতো দেখাও। মনের দিক থেকে তুমি তেমন খারাপ লোক নও। সিন্দুক-টিন্দুক ভাঙা বন্ধ কর, সিধে জীবন কাটাও।'

'আমি?'—অবাক হয়ে বলে জিমি, 'কেন, জীবনে তো কখনো কোনো সিন্দুকই ভাঙলাম না!'

'না, তা কি ভেঙেছ!'-হেসে ফেলে ওয়ার্ডেন, 'নিশ্চয়ই ভেঙেছ। দেখা যাক হিসেবটা এবার। স্প্রিংফিল্ডের কাজটা করতে গিয়ে ঘানি টেনেছিলে কেমন করে? সেটা কি এই জন্য যে সমাজের কোনো রাঘব-বোয়ালকে বিপদে ফেলবার ভয়ে ইচ্ছে করেই ঘটনাস্থলে না-থাকার প্রমাণ দিতে চাওনি? নাকি সেটা ছিল বুড়ো ইতর জুরিদের জন্য সাজানো যাতে তারা তোমাকে জেলে পাঠান? তোমাদের মতো নিরীহ বলির পাঁঠাদের পক্ষে সবসময়ই হয়-এটা, নয়-ওটা।'

'আমি?'—ধর্মপুত্রের মতো অবাক চোখে চায় জিমি, 'কেন ওয়ার্ডেন, জীবনে কখনো স্প্রিংফিল্ডে গেলামই না!'

ওয়ার্ডেন হেসে বলে, 'একে ভেতরে নিয়ে যাও ক্রোনিন। বাইরে যাবার পোশাক-টোশাক গুছিয়ে দাও। সকাল সাতটায় এর তালা খুলে দিও, তখন ও চলে আসবে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে। ভ্যালেন্টাইন, তুমি বরং আমার কথাগুলো ভেবে দেখো।'

পরদিন সকাল সোয়া-সাতটা নাগাদ জিমি এসে দাঁড়াল ওয়ার্ডেনের বাইরের দপ্তরে। ওর পরনে একটা রেডিমেড স্যুট, বিশ্রিরকম কাটছাঁট, পায়ে একজোড়া শক্ত মশমশে জুতো—এগুলোই সরকার দেয় তার খালাস পাওয়া, আবশ্যিক অতিথিদের।

কেরানি তার হাতে দেয় একটা রেল-টিকিট, আর পাঁচ-ডলার-নোট— আইন প্রত্যাশা করে ওই টাকা দিয়েই সে সৎ নাগরিকত্ব আর উন্নতির পথে পা বাড়াবে।

ওয়ার্ডেন তাকে দেয় চুরুট, করমর্দনও করে। ভ্যালেন্টাইন, ৯৭৬২,—নথিপত্রে লেখা হয়েছে "গভর্নর কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত"; এবার বাইরের রোদে হেঁটে বেরিয়ে আসে মিস্টার ভ্যালেন্টাইন।

পাখির গান, দোলায়মান সবুজ গাছ, ফুলের সুবাস—একেবারেই উপেক্ষা করে জিমি সিধে হন্‌হন করে চলল একটা রেস্তোরাঁর দিকে। সেখানেই ও স্বাদ নিল মুক্তির প্রথম মিঠে আনন্দের—ঝলসানো মুরগি আর এক বোতল সাদা ওয়াইনের আকারে। তারপরে এল চুরুট, যেটা ওয়ার্ডেনের দেওয়া চুরুটটার চেয়ে এক ধাপ উঁচু মানের। সেখান থেকে সে গয়ংগচ্ছভাবে চলল রেল স্টেশনের দিকে। দরজার কাছে বসা একটি অন্ধ লোকের টুপিতে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে বসল নিজের ট্রেনে। তিন ঘন্টা বাদে ও নামল সরকারী সীমার কাছে একটা ছোট শহরে। মাইক ডোলান নামে একটি লোকের কাফেতে ঢুকে, করমর্দন করল মাইকের সঙ্গে। সে একাই বসে ছিল বারের ওপাশে।

মাইক বললে, 'দুঃখিত জিমি ভাই, কাজটা আরো তাড়াতাড়ি সারতে পারিনি। তবে স্প্রিংফিল্ড থেকে প্রতিবাদ আন্দোলনটা করতে পেরেছিলাম, আর গভর্নর তাতেই প্রায় কাত। ঠিক আছে তো ভাই?'

'চমৎকার', বললে জিমি, 'আমার চাবিটা আছে?'

নিজের চাবি নিয়ে সে ওপর-তলায় চলে গেল, পেছনের দিকের একটা কামরার দরজা খুলল। ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিল, সব সেরকমই আছে। মেঝের ওপর এখনো পড়ে রয়েছে বেন্ প্রাইসের কলার-বোতামটা—সেদিন জিমিকে জবরদস্তি গ্রেপ্তার করতে এসে নামজাদা গোয়েন্দার শার্টের গলাবন্ধ থেকে খুলে পড়ে ওটা।

দেয়াল থেকে একটা ভাঁজ করা-বিছানা টেনে নিয়ে জিমি দেয়ালের একটা প্যানেল ভেতরে ঠেলে দিল। তারপর বের করল একটা ধুলো ভরা স্যুটকেস্। এবার সে স্যুটকেস্ খুলে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকল সিঁধেল চুরির যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে—যা নাকি পূর্বাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। একটা পুরোদস্তুর সেট্, বিশেষ উত্তাপের ইস্পাতে তৈরি, সর্বাধুনিক ছাঁদের ড্রিল মেশিন, খাঁজ কাটার, তুরপুন ঘোরাবার, বেঁধবার বা আঁটবার হাতিয়ার, লোহা বাঁকাবার জিমি, ক্ল্যাম্প্, বর্মা—এর মধ্যে আবার জিমির নিজস্ব আবিষ্কার দু'তিনটে নতুন জিনিসও আছে, যা নিয়ে তার গর্ব। ওগুলো বানিয়ে নিতে তার সাতশো ডলার খরচা হয়েছিল—যেখান থেকে বানিয়েছিল তারা শুধু পেশাদারদের জন্যই বানায়।

আধঘন্টার মধ্যে জিম নিচের তলায় চলে এল, একেবার কাফের ভেতর দিয়ে। এখন তার পরনে রুচিসম্মত মানানসই পোশাক। হাতে রয়েছে সাফসুতরো পরিষ্কার স্যুটকেসখানা।

মাইক ডোলান অমায়িক কণ্ঠে বললে, 'কাজ আছে বুঝি হাতে?' জিম ধাঁধায় পড়ার মতো বললে, 'আমি? বুঝলাম না কথাটা। আমি প্রতিনিধিত্ব করছি।

নিউইয়র্ক-অ্যামালগ্যামেটেড-শর্টস্ন্যাপ-বিস্কিট-ক্র্যাকার এ্যাণ্ড ফ্র্যাজল্‌ড্‌-হুইট কোম্পানিকে।

ওর এই বিবৃতিটা এত আনন্দ দিল মাইককে, যে জিমিকে তৎক্ষণাৎ ওখানেই বসে এক গ্লাস সোডা-মিল্ক খেয়ে নিতে হল। ও কখনো কড়া পানীয় খায় না।

'ভ্যালেন্টাইন ৯৭৬২' জেল থেকে খালাস পাবার এক সপ্তাহ পর ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের রিচ্‌মণ্ডে একটা সুপরিকল্পিত পরিচ্ছন্ন সিন্দুক ভাঙার ঘটনা ঘটল, যার উদ্ভাবক সম্বন্ধে কোনো সূত্রই পাওয়া গেল না। মাত্র আটশো ডলার খুঁজে পাওয়া গেল সব মিলিয়ে। এরও দু'সপ্তাহ পর, লোগানস্পোর্টে একটা পেটেন্ট-করা, উন্নতধরনের 'সিঁধ-প্রতিরোধক' সিন্দুক ঠিক যেন মোলায়েম মাখনের মতো খোলা হল, আর উধাও হল তা থেকে পনের শো ডলারের মতো, কারেন্সি নোটে; সিকিউরিটি বা রুপো স্পর্শই করা হয়নি। এতেই আগ্রহ বাড়ল দুর্বৃত্ত-শিকারীদের। তারপর একদিন জেফার্সন-সিটির একটা সাবেকি ধরনের ব্যাঙ্ক-সিন্দুকে হল যেন অগ্ন্যুৎপাত, সক্রিয় সিন্দুকের জ্বালামুখী থেকে বেরিয়ে এল পাঁচ হাজার ডলারের ব্যাঙ্ক-নোট। এবার ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি বলেই ব্যাপারটা আনা হল বেন প্রাইসের 'বিশেষজ্ঞ' নজরে। নথিপত্র তুলনা করে লক্ষ্য করা গেল এই সিন্দুকভাঙার সিঁধেল চুরিগুলোর মধ্যে অদ্ভুত একটা সাধারণ মিল রয়েছে। বেন্‌ প্রাইস ডাকাতির অকুস্থলগুলোতে তদন্ত করলেন। একটা মন্তব্য শোনা গেল তাঁর মুখে :

'ওতে তো চালিয়াৎ জিম ভ্যালেন্টাইনের স্বহস্তের ছাপ! আবার কারবারে হাত লাগিয়েছে তাহলে। ওই 'কম্বিনেশন' হাতলটা দেখ—ভিজে মাটি থেকে মুলো তোলার মতোই অনায়াসে উপড়ে ফেলা হয়েছে। কেবল ওর কাছেই আছে সে ধরনের ক্ল্যাম্প, যাতে এটা করা সম্ভব। আর কেমন পরিষ্কারভাবে তালাগুলোকে ঘাট থেকে তোলা হয়েছে তাও দেখ! জিমিকে ড্রিল করে একটা ছেঁদাও করতে হয়নি। হ্যাঁ, মনে হয়, মিঃ ভ্যালেনটাইনকেই আমার চাই। এর পর সে যখন ঘানি টানবে, তখন মেয়াদে রেহাই দেওয়া চলবে না, দয়া দেখাবার মতো বোকামোই করা চলবে না।'

জিমির অভ্যাসগুলো বেন প্রাইসের জানা ছিল। স্প্রিংফিল্ডের মামলাটায় কাজ করার সময়ই এসব জেনেছিলেন তিনি। লম্বা লাফে চট্‌পট দূরে সরে পড়া, কোনো সাঙ্গোপাঙ্গ না রাখা, আর ভাল সমাজের প্রতি রুচি—এই পদ্ধতিগুলো নিয়েই মিঃ ভ্যালেন্টাইন লক্ষ্যণীয় হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের সফল ফাঁকিদার হিসেবে। বেন্‌ প্রাইস যে কৌশলী পলাতক সিন্দুক সিঁধেলটির পেছু নিয়েছেন, তা প্রকাশ্যেই জানানো হল। হাঁফ ছেড়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন 'সিঁধ প্রতিরোধক' সিন্দুকের মালিকরা।

আরকান্‌সাসের ব্ল্যাকজ্যাক এলাকায় একটা ছোট শহর এলমোর, রেলরাস্তা থেকে পাঁচ মাইল ভেতরে। একদিন বিকেলে সেখানেই জিমি ভ্যালেন্টাইন তার

সুটকেস্‌টি সহ নেমে পড়েছে ডাক-গাড়ি থেকে। জিমিকে দেখাচ্ছে যেন কোনো সিনিয়র যুবক ক্রীড়া প্রতিযোগীর মতো, কলেজ থেকে সবে দেশে ফিরে এল! কাঠের পার্শ্ব-পথ ধরে সে এগোল হোটেলের দিকে।

একটি যুবতী মহিলা রাস্তা পেরিয়ে, এক কোণে ওর পাশ কাটিয়ে একটা দরজার ভেতরে ঢুকল—দরজার ওপর সাইনবোর্ডে লেখা "এলমোর ব্যাঙ্ক"। জিমি ওর চোখের দিকে চেয়েছিল, নিজেকে মুহূর্তে ভুলে গিয়ে, হয়ে গিয়েছিল অন্য এক মানুষ। মেয়েটি চোখ নামিয়ে নেয়, সামান্য লাল হয়ে ওঠে। জিমির স্টাইল আর চেহারার যুবক এলমোরে সচরাচর দেখা যায় না।

ব্যাঙ্কের সিঁড়ির ওপর অলসভাবে গড়ানো একটি ছোকরাকে ধরল সে, যেন এই ব্যাঙ্কেরই ও একজন শেয়ার হোল্ডার। শহরটা সম্বন্ধে তাকে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করল, আর ফাঁকে ফাঁকে তার হাতে গুঁজে দিতে লাগল খুচরো পয়সা। এর মধ্যে একসময় যুবতী মহিলাটি বেরিয়ে এল। স্যুটকেস্ হাতে যুবকটিকে রাজকীয়ভাবে অবহেলা করে সে এগিয়ে গেল নিজের রাস্তায়।

একটা আপাত নির্দোষ ছলা করে জিমি জিজ্ঞেস করে, 'ওই অল্পবয়েসী মহিলাটি মিস্ পলি সিম্প্‌সন না?'

'না-না', বলে ছেলেটি, 'উনি আনাবেল এ্যাডাম্‌স্। ওঁর বাবা এ ব্যাঙ্কের মালিক। আপনি এলমোরে এসেছেন কেন'? ওই ঘড়ির চেন্‌টা কি সোনার? আমার একটা বুলডগ চাই। আরো পয়সা আছে সঙ্গে?'

জিমি গেল প্ল্যান্টার্স হোটেলে, সেখানে নিজের নাম লেখাল 'রালফ্ ডি. স্পেনসার' বলে, আর ওই নামেই নিল একখানা কামরা। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কেরানিকে জানাল নিজের পেশা। বলল, এলমোরে এসেছে একটা ব্যবসার জায়গা খুঁজতে। শহরে এখন জুতোর ব্যবসা কেমন? জুতোর ব্যবসার কথাই মাথায় এসেছিল ওর। এ ব্যাপারে কোনো সুযোগ আছে কিনা?

জিমির পোশাক আর ব্যবহারে মুগ্ধ কেরানি। সে নিজেও এলমোরের মুষ্টিমেয় ফ্যাশনদুরস্ত যুবকদের কাছে নমুনা স্বরূপ, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে কোথায় তার দোষত্রুটি। জিমির জুতো বাঁধবার কৌশল দেখতে-দেখতেই সে সরল মনে সব খবরাখবর জানিয়ে দিল।

হ্যাঁ, জুতোর লাইনে ব্যবসা তো মন্দ চলা উচিত নয়। এ-শহরে নিছক আলাদা জুতোর দোকান বলে কিছু নেই। শুকনো-মাল হরেকমালের দোকানে বিক্রি হয় জুতো। ব্যবসা অবশ্য সব লাইনেই মোটামটি ভাল। আশা করি মি. স্পেনসার এলমোরেই জায়গা বেছে নেবেন। বাস করার পক্ষে এ শহরটা মনোরমই লাগবে তাঁর। লোকজনও বড় মিশুক।

মি. স্পেনসার ভাবছেন এ শহরে ক'টা দিন কাটিয়ে যাবেন, বুঝে নেবেন পরিস্থিতিটা। না, কেরানিবাবুকে আর 'বয়' ডাকতে হবে না, ওঁর স্যুটকেস নিজেই বয়ে নিয়ে যাবেন; বেশ ভারী তো ওটা।

জিমি ভ্যালেন্টাইনের ভস্ম থেকে রালফ্ স্পেনসার নামে যে জন্মান্তরিত পক্ষীটির আবির্ভাব ঘটল—আকস্মিক, হৃদয়-পরিবর্তক প্রেমের আগুনের ছোঁয়ায় দগ্ধ ভস্ম থেকে—সে রয়ে গেল এলমোরেই, এখানেই উন্নতি করতে লাগল সে। একটা জুতোর দোকানই খুলেছে, ব্যবসাও বেড়ে চলেছে ভাল রকম।

সামাজিক দিক থেকেও সে সাফল্য পেয়েছে, যথেষ্ট বন্ধুবান্ধব তার। তারপর একদিন তার মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ হল। মিস্ আনাবেল এ্যাডামসের সঙ্গে পরিচয় হল, আর ক্রমেই বেশি করে তার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হতে লাগল সে।

একবছর বাদে মি. রালফ্ স্পেনসারের অবস্থাটা দাঁড়াল এই: শহরের সমাজে সে মর্যাদা পেয়েছে, তার জুতোর দোকান উন্নতি করছে, এবং আর দু'হপ্তার মধ্যে সে আর আনাবেল বিবাহবদ্ধ হবে, এতে তারা বাগ্‌দত্ত। চিরাচরিত, অধ্যবসায়ী, মফঃস্বল ব্যাঙ্কমালিক অ্যাডাম্‌স্, স্পেনসারকে পছন্দই করেছেন। আনাবেলের কাছে যেমন পিতৃস্নেহ, ততটাই গর্ব হবু স্বামীকে নিয়ে। মিঃ অ্যাডাম্‌সের পরিবারে, আর আনাবেলের বিবাহিতা বোনের ঘরে সে এখন এমনই ধাতস্থ যে তাকে পরিবারেরই এক সদস্য বলে ধরা হয়।

একদিন জিমি তার কামরায় বসে লিখল এই চিঠিখানা, সেন্ট্ লুইসের এক পুরনো বন্ধুর নিরাপদ ঠিকানায় পোস্ট করে দিল:

"প্রিয় দোস্ত,—আমি তোমায় আগামী বুধবার রাতে, ন'টার সময়, লিট্‌ল-রকে সালিভানের ডেরাতে চাই। আমার কিছু ছোটখাটো ব্যাপার তোমাকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে চাই। তা ছাড়া, তোমাকে উপহার দিতে চাই অমার যন্ত্রপাতির বাক্সটা। আমি জানি তুমি ওগুলো পেলে খুশি হবে—একহাজার ডলার দিলেও ওগুলোর জুড়ি তৈরি করতে পারতে না। দেখ বিলি, এক বছর হল আমি পুরনো ধান্দা ছেড়ে দিয়েছি। আমার এখন একটা চমৎকার দোকান। সদুপায়ে ভাল উপার্জন করছি। আর দু'হপ্তা বাদেই বিয়ে করতে চলেছি পৃথিবীর সেরা মেয়েটিকে। এই একমাত্র জীবন, বিলি—সিধে রাস্তায় চলা। এখন লক্ষ ডলার দিলেও অন্য কারুর একটা পয়সায় হাত ছোঁয়াব না। বিয়েব পর সব বিক্রি করে চলে যাব পশ্চিমে, সেখানে পুরনো ঝামেলা নিয়ে নতুন করে আমার বিরুদ্ধে লাগার বিপদ নেই। আমি বলছি বিলি, মেয়েটি একটি দেবদূত। আমায় সে বিশ্বাস করে, আমিও আর কোনো টেরাবাঁকা কাজ করব না, সারা দুনিয়া হাতে পেলেও। সালি'র ওখানে থেকো কিন্তু নিশ্চয় করে, কারণ তোমার দেখা আমায় পেতেই হবে। সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসব।—

তোমার পুরনো দোস্ত,

জিমি।"

জিমি এই চিঠিটা লেখাব পববর্তী সোমবারে বেন্ প্রাইস একটা ভাড়া বগিগাড়িতে

চেপে ঢক্‌ঢক্‌ করে এসে নামলেন এলমোরে। শহরের সর্বত্র নিজস্ব নীরব পদ্ধতিতে টহল মেরে এসে অবশেষে পেয়ে গেলেন তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয়। স্পেনসারের জুতোর দোকানের উল্টোদিকে একটি ওষুধের দোকান থেকে ভাল ভাবে নজর করে দেখলেন রাল্‌ফ স্পেন্‌সারকে।

মনে মনে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তুমি ব্যাঙ্কারের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছ জিমি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি জানি না!'

পরদিন সকালে জিমি প্রাতরাশ খেতে গেল অ্যাডামস্‌দের বাড়িতে। সেদিন সে লিট্‌ল-রকে যাচ্ছে নিজের বিয়ের স্যুটের অর্ডার দিতে, আর আনাবেলের জন্য সুন্দর কিছু কিনে আনতে। এলমোরে আসার পর এই হবে ওর প্রথম শহর ছেড়ে যাত্রা। ওর শেষ "পেশাদারী কাজের" পর এক বছরেরও বেশি কেটে গেছে, তাই ভেবেছিল এবার নিরাপদে সাহস করে বেরুতে পারে।

প্রাতরাশের পর বেশ একটা বড়সড়ো পারিবারিক দল একসঙ্গে চলল শহরের ব্যস্ত এলাকায়—মিঃ অ্যাডামস্‌, আনাবেল, জিমি, আর আনাবেলের দিদি তার দুই ছোট মেয়েকে নিয়ে—বয়েস যথাক্রমে পাঁচ আর নয়। জিমি এখনো যে-হোটেলের বাসিন্দা সেই হোটেলে এল ওরা, জিম ছুটে গেল নিজের কামরায় আর ফিরে এল ওর স্যুটকেসটা সঙ্গে নিয়ে। এরপর তারা গেল ব্যাঙ্কে। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল জিমির ঘোড়া, বগিগাড়ি, আর ডল্‌ফ্‌ গিবসন—ও লোকটাই তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

কাজ-করা ওককাঠের উঁচু রেলিং পেরিয়ে সবাই ঢুকে গেল ব্যাঙ্কের ভেতরের অফিসের মধ্যে—জিমি সমেত, কারণ মি., অ্যাডামসের হবু জামাই এখন সর্বত্রই স্বাগত। মিস্‌ আনাবেলকে বিয়ে করবে যে সুদর্শন মানানসই যুবকটি, তাকে কেরানি কর্মচারীরা সম্ভাষণ জানিয়ে তৃপ্ত হল। জিমি তার স্যুটকেটা মেঝেতে রেখেছে। আনাবেলের প্রাণে ফুর্তি, যৌবনে উচ্ছল হৃদয়। সে জিমির টুপিটা মাথায় পরে, তুলে ফেলল স্যুটকেসটা—'চমৎকার ড্রাম বাদকের মতো দেখাচ্ছে না আমায়? উঃ রাল্‌ফ, কী ভারী এটা! মনে হচ্ছে যেন সোনার ইঁট দিয়ে ভরা।"

জিমি ঠাণ্ডা মাথায় বলে, 'ওর মধ্যে প্রচুর নিকেল-করা "শু-হর্ন্‌" রয়েছে যে—ফেরত দিতে যাচ্ছি। ডাকে পাঠানোর খরচাটা বেঁচে যায় সঙ্গে নিয়ে গেলে। ভয়ানক রকম হিসেবী হয়ে যাচ্ছি তো!'

এলমোর ব্যাঙ্ক সবে একটা নতুন সিন্দুক আর ভল্ট্‌ বসিয়েছে। মিঃ অ্যাডামসের দারুণ গর্ব ওটা নিয়ে, সবাইকে ডেকে-ডেকে দেখান। ভল্টের কুঠরিটা ছোট হলেও ওটার দরজা নতুন, পেটেন্ট-প্রাপ্ত। একটা একক হাতলের সঙ্গে যুগপৎ তিনখানা নিরেট ইস্পাতের হুড়কো আঁটা, তার ওপরে 'সময়-বাঁধা' তালাও আছে। মিঃ অ্যাডামস উল্লাসভরে ওটার কৌশল পদ্ধতি বোঝালেন মিঃ স্পেনসারকে। সে

বিনীত কৌতূহল দেখাল বটে, তবে খুব বুদ্ধিমানেব ঔৎসুক্য নয়। মে আর আগাথা, দুটি বাচ্চাই দারুণ খুশি চক্চকে কলকব্জা আর মজার ঘড়ি, হাতল ইত্যাদি দেখে।

ওরা যখন ভেতরে ব্যস্ত, বেন প্রাইস্ হেলে-দুলে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে নিস্পৃহভাবে তাকালেন রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ভেতরদিকে। টেলারকে বললেন তিনি কিছু চান না, শুধু একজন চেনাজানা লোকের জন্য অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ মহিলাদের মুখ থেকে দু'একবার আর্তনাদ শোনা গেল, তারপর একটা উত্তেজনার আলোড়ন। ন'বছর বয়েসের মেয়েটি, মে যার নাম, সে খেলার আনন্দে মশগুল হয়ে আগাথাকে ভল্টের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। তারপব হুড়কো টেনে কম্বিনেশন তালাঘড়ির হাতলটা ঘুরিয়ে দেয়, যেমন মিঃ অ্যাডামস্‌কে করতে দেখেছিল।

বুড়ো ব্যাঙ্কার হাতলের কাছে লাফিয়ে গিয়ে এক মুহূর্ত টানাটানি করলেন সেটা। গোঙানির সুরে বললেন, 'দরজা তো খোলা যাবে না .... ঘড়িটাতে চাবি দেওয়া হয়নি, কম্বিনেশনের নম্বরও সাজানো ছিল না!'

আগাথার মা উন্মাদের মতো আবার চিৎকার করে ওঠে।

কাঁপা হাত শূন্যে তুলে মিঃ অ্যাডামস্ বলেন, 'চুপ চুপ! সবাই একটু চুপ থাকো তো!... আগাথা!'— যতটা উঁচু গলায় পারেন, ডাকলেন—'আমার কথা শোনো!' পরবর্তী নীরবতাটুকুর সময় ওরা শুধু শুনতে পাচ্ছিল বালিকাটির ক্ষীণ আর্তনাদ,—অন্ধকার ভল্টের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কে সে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে।

ওব মা কেঁদে উঠল—'আমার বাছা রে! ও যে ভয়েই মরে যাবে। দরজাটা খোলো না তোমরা! উঃ ভেঙে ফেল ওটা! তোমরা পুরুষরা কি কিছুই করতে পারছ না?"

কাঁপা গলায় মিঃ অ্যাডামস্ বলে উঠলেন, 'লিট্‌ল-রকের এদিকে কোনো মিস্তিরিই পাওয়া যাবে না, যে এ-দরজা খুলতে পারে। হায় ভগবান্!.... স্পেনসার, কী করব আমরা? ওই বাচ্চাই বা কতক্ষণ ওটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে! ভেতরে যথেষ্ট হাওয়া নেই, তার ওপর ভয়েই তো ওর তড়কা লেগে যাবে।'

আগাথার মা এখন উন্মাদিনী—হাত দিয়েই ভল্টের দবজা ধাক্কাচ্ছে। কে যেন বাতুলের মতো প্রস্তাব দিল ডিনামাইট প্রয়োগ করার। আনাবেল তাকায় জিমির দিকে, ওর বড়-বড় চোখ দুটো যন্ত্রণাভরা, কিন্তু এখনো একেবারে হতাশ নয়। মেয়েমানুষ তার আরাধ্য পুরুষের পক্ষে কোনো কিছুই দুঃসাধ্য বলে মনে করে না।

'তুমি কিছু করতে পার না রাল্‌ফ?.. দেখ না চেষ্টা করে?'

ঠোঁটে একটা অদ্ভুত মৃদু হাসি, আর চোখে ব্যগ্রতা নিয়ে ওর দিকে তাকায় সে। বলে, 'আনাবেল, তুমি যে গোলাপ ফুলটা এঁটে রেখেছ ওটা দেবে আমাকে?'

কথাটা ঠিক শুনল কিনা আদৌ বিশ্বাস করতে না পেরে আনাবেল তার পোশাকের

বুক থেকে গোলাপের কুঁড়ি খুলে নিয়ে দিল ওর হাতে। জিমি ওটা নিজের ভেস্টপকেটে গুঁজে, কোটটা খুলে ফেলল, গুটিয়ে নিল শার্টের আস্তিন। এ কাজটির সঙ্গেই বিদায় হল রালফ্ ডি. স্পেনসার, আর জিমি ভ্যালেন্টাইন এল তার স্থান নিতে।

সংক্ষিপ্ত হুকুম দিল, 'দরজার কাছ থেকে সরে যান, আপনারা সবাই!'

টেবিলের ওপর স্যুটকেসটা রেখে সেটাকে পুরো চিৎ করে খুলে দিল। এই মুহূর্তটি থেকে ও একেবারে ভুলে গেল অন্য কারুর উপস্থিতি। প্রত্যেকটা চকচকে অদ্ভুত আকৃতির যন্ত্র সে সাজিয়ে রাখল দ্রুত শৃঙ্খলার সঙ্গে, আর বরাবর যেমন কাজের সময় করে, গুনগুনিয়ে শিস্ দিয়ে চলল নিজের মনে। অন্যরা সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওকে দেখছে গভীর নীরবতায়, নিশ্চল হয়ে।

এক মিনিটের মধ্যে জিমির প্রিয় ড্রিল যন্ত্রটা মোলায়েমভাবে ছেঁদা করতে থাকল ইস্পাতের দরজা। দশ মিনিটের মধ্যে—নিজেরই সিঁধ কাটার রেকর্ড ভঙ্গ করে—সে সরিয়ে দিল হুড়কোগুলো, দরজা উন্মুক্ত করে দিল।

আগাথা, প্রায় মূর্ছিত হলেও নিরাপদ আছে,—তাকে জড়িয়ে তুলে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

জিমি ভ্যালেন্টাইন নিজের কোট পরে নেয়, হেঁটে চলে যায় রেলিঙের বাইরে সামনের দরজার দিকে। যাবার সময় ওর মনে হল যেন দূর থেকে একটা আওয়াজ এল 'রালফ্!' বলে—গলার আওয়াজটা সে একসময়ে চিনত। কিন্তু তবু ইতস্তত করে না সে একবারও।

দরজার কাছে প্রায় ওর রাস্তা রুখে একটি লম্বা চওড়া মানুষ।

এখনো জিম ওর অদ্ভুত হাসিটা মুখে রেখেই বলে 'হ্যালো বেন্! শেষ অবধি এসে পড়লে তাহলে? বেশ, চল যাই। এখন আর ইতরবিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না আমার।'

এবার কিন্তু বেন্ প্রাইসের আচরণটা হল অদ্ভুত আলাদারকম।

তিনি বললেন, 'আপনি বোধ হয় ভুল করছেন মিঃ স্পেনসাব। আপনাকে চিনতে পেবেছি এমনটা ভাববেন না। আপনার গাড়িটা তো সবুর করছে, তাই না?' বলেই বেন্ প্রাইস ঘুরে চলে গেলেন রাস্তা ধরে।

A Retrieved Reform, কসমোপলিটান, ১৯০৩

গাড়ি যখন অপেক্ষা করছে

গোধূলির আলো জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই ছাইরঙা পোশাকের মেয়েটি এল শান্ত ছোট্ট পার্কের নিভৃত কোণটিতে। সে একটা বেঞ্চিতে বসে বই পড়তে লাগল—কারণ এখনো আধঘন্টা যে আলো থাকবে তাতে ছাপার অক্ষর পড়া যায়।

আবার বলা যাক্: মেয়েটির পোশাক ছাইরঙা, এবং এতটা সাদাসিধে যে তাতে ওটার ছাঁদ আর পারিপাট্যের নিখুঁত-গুণ চাপা পড়ে যায়। একটা বড়-জালির ঘোমটা ওর পাগড়ি-টুপি আর মুখটাকে বন্দী করে রেখেছে, সে-মুখ একটা প্রশান্ত অচেতন সৌন্দর্য নিয়ে ওর ভেতর থেকেই যেন জ্বলজ্বল করে। আগের দিনও একই সময় সে ওখানে এসেছিল, এবং তারও আগের দিন; আর সেটা জানত শুধু একজনই।

যে যুবকটি তা জানত সে কাছেপিঠেই ঘুরঘুর করছে। তার একমাত্র ভরসা এখন ভাগ্য, তার উদ্দেশেই সে এখন ধূপ জ্বালিয়ে চলেছে যেন। ওর ভক্তির একটা পুরস্কারও মিলল, কারণ পাতা ওল্টাবার সময় মেয়েটির আঙুল থেকে খসে পড়ল বইখানা আর বেঞ্চিতে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ল পুরো এক গজ দূরে।

এক মুহূর্তও লোভ সম্বরণ করতে না পেরে যুবকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল বইটার ওপর, ফিরিয়ে দিল মালিকের হাতে। ওর মেজাজে যেন বাগবাগিচা বা জনসমাগমের জায়গার সেই বারফট্টাই ভাব,—বাহাদুরি আর আশার মিশ্রণ, সেইসঙ্গে বীটের পুলিসম্যানটা সম্পর্কে একটু সশ্রদ্ধ ভয়। মধুর কণ্ঠে সে একটা অবান্তর মন্তব্য করল আজকের আবহাওয়া নিয়ে—আলাপ শুরু করার এই ধরতাইটাই কিন্তু পৃথিবীর বহু অশান্তির মূলে। একটু দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল নিজের ভাগ্য-পরিণতির।

মেয়েটি কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করল তাকে। যুবকটির সাধারণ ছিমছাম পোশাক আর চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্বের অভিব্যক্তি নেই।

ইচ্ছাকৃতভাবে দরাজ কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে মেয়েটি বললে, 'আপনি বসতে পারেন ইচ্ছে করলে। সত্যি বলতে, আমি তাই চাইছি। এ আলোতে আর পড়া যায় না। বরং কথা বলতে পারলেই ভাল হত।'

ভাগ্যশ্রীর বশংবদ ভৃত্য এবার সৌজন্য দেখিয়ে বসে পড়ল মেয়েটির পাশের আসনে।

এবার যুবকটি পার্কের সভাপতিরা যে গৎ ধরে বক্তৃতা শুরু করে সেই সুরেই বলল, 'আপনি কি জানেন? জানেন কি যে আমি বহু, বহুদিন পরে আপনার মধ্যে দেখছি সবচেয়ে হতবুদ্ধিকারিণী মেয়েটিকে? গতকালই নজর করেছিলাম আপনাকে। আপনি কি টের পেয়েছিলেন মধুলতিকা, যে আপনার ওই সুন্দর

উজ্জ্বল চোখজোড়া একজনকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে?'

মেয়েটি বরফ-কঠিন গলায় বললে, 'যেই হোন্ আপনি, আপনার মনে রাখা উচিত যে আমি একজন ভদ্রমহিলা। যে মন্তব্যটা এইমাত্র করলেন সেটা আমি ক্ষমা করব এই কারণে যে আপনার ভুলটা নিঃসন্দেহেই অস্বাভাবিকরকম কিছু নয়—বিশেষত আপনার সামাজিক চক্রের মধ্যে। আমি আপনাকে বসতে অনুরোধ করেছিলাম; তার মানে যদি দাঁড়ায় আমাকে আপনার 'মধুলতিকা' বানানো, তাহলে মনে করুন সে অনুরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছি।'

যুবক অনুনয় করল, 'আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।' তার তুষ্টভাবটা বদলে এখন এসেছে অনুশোচনা আর পরম বিনীত ভাব—'বুঝলেন ওটা আমারই দোষ হয়েছে—মানে, জানেন তো পার্কে যেসব মেয়েরা আসে—আপনি অবশ্য তা জানবেন কী করে, নিশ্চয়ই তো, কিন্তু—'

'এ প্রসঙ্গটা বাদ দেবেন দয়া করে! জানি তো বটেই।... এবার বলুন তো। এই যে সব মানুষ যাচ্ছে আসছে, ভিড় করছে নিজের রাস্তায়, এই পথ ধরেই, এদের কথা বলুন। কোথায় যাচ্ছে এরা? এত তাড়াহুড়ো কেন করছে? ওরা কি সুখী?'

প্রেম জানাবার মেজাজটা চটপট ঝেড়ে ফেলেছে যুবক। ওর এখন সবুর করে থাকার পালা; ওকে কী ভূমিকায় নামতে হবে সেটা ও এখনই আন্দাজ করতে পারছে না।

মেয়েটির মনোভাব মেনে নিয়ে সে জবাব দেয়, 'ওদের লক্ষ্য করে যাওয়া তো সত্যিই কৌতূহলজনক। জীবনের এ হল আশ্চর্য নাটক। কেউ যাচ্ছে নৈশভোজনে, কেউ... ইয়ে.. মানে অন্য কোথাও। ওদের যে কী ইতিহাস ভাবলে অবাক হতে হয়।'

মেয়েটি বলে, 'আমি অবাক হই না। আমার অতটা কৌতূহল নেই। আমি এখানে এসে বসি, কারণ শুধু এখান থেকেই কান পেতে শুনতে পাই মানবজগতের বিপুল, সামগ্রিক হৃদয়স্পন্দন। জীবনে আমার ভূমিকা সেখানেই, যেখানে তার স্পন্দন একেবারেই অনুভব করা যায় না। ধরতে পারছেন, কেন এই কথাগুলো বললাম, মিস্টার—?'

'পার্কেনস্ট্যাকার'—ধরিয়ে দিল যুবক। এবার তাকে আগ্রহী, আশান্বিত মনে হচ্ছে।

'না,' মেয়েটি তার পেলব আঙুল তুলে একটু হেসে বললে, 'আপনি সেটা সঙ্গে সঙ্গেই চিনে ফেলবেন। ছাপার অক্ষর থেকে নিজের নাম সরিয়ে রাখা অসম্ভব। এমনকি নিজের ছবিও নয়। এই ঘোমটা আর এই টুপি আমার পরিচারিকার, এতেই আমার ছদ্মবেশ। শোফারটা যে কেমনভাবে এটার দিকে তাকায়, তা যদি দেখতেন! ভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি না! খোলাখুলি বলতে গেলে, পবিত্র থেকে

পবিত্রতম সমাজের পাঁচ-ছ'টি নামই আছে যার একটা আমার, জন্মের আকস্মিক দৌলতে! আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, মিঃ স্ট্যাকেনপট—'

'পার্কেনস্ট্যাকার,' সবিনয়ে শুধরে দেয় যুবক।

'—হ্যাঁ মিঃ পার্কেনস্ট্যাকার, কারণ আমি একবার অন্তত কথা বলতে চেয়েছি একজন স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে—এমন একজন যাকে ঘৃণ্য সম্পদের জৌলুস আর তথাকথিত সামাজিক নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়নি। ওহ্! আপনি জানেন না আমি এসবে কতো ক্লান্ত—শুধু টাকা, টাকা, টাকা! আর যে লোকগুলো আমায় ঘিরে থাকে, সব এক-নক্শায় গড়া ছোট পুতুলের মতো নাচে। আমোদ আহ্লাদে ধিক্কার জাগে মনে, গয়না, রত্ন, ভ্রমণ, সমাজ, সবরকমের বিলাসিতা হয়রান করে দেয় আমাকে।'

সাহস করে যুবক বলে, দ্বিধার সঙ্গে, 'আমি তো সবসময় ভাবতাম টাকা বড় ভাল জিনিস।'

'যোগ্যতাটাই কাম্য। কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ থাকবে আপনার—!' হতাশার ভঙ্গি করে মেয়েটি কথা শেষ করে। 'তখন আসবে একঘেয়েমি,' বলে আবার শুরু করে, 'ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে। ড্রাইভ করা, ডিনারে যাওয়া, থিয়েটার বলনাচ নৈশভোজন, আর এসবের ওপর আবার বাড়তি টাকার ঝল্কানি। সময়-সময় তো শ্যাম্পেন গ্লাসে বরফের সামান্য টিংটিং শব্দই আমায় পাগল করে দেয়।'

অকৃত্রিম আগ্রহ দেখায় মিঃ পার্কেনস্ট্যাকার।

বলে, 'বরাবরই আমি ধনী ফ্যাশনদুরস্ত সমাজের কথা পড়তে আর শুনতে ভালবাসি। আমি বোধহয় একটু গোঁ-ধরা গোছের মানুষ। তবে সঠিক খবরাখবরই রাখতে চাই। এখন, আমার ধারণা ছিল শ্যাম্পেন বোতলের মধ্যেই ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়, গ্লাসে বরফ রেখে তো নয়।'

খুব অকপট একটা মজা পেয়ে যেন বাজনার সুরে হাসে মেয়েটি।

'আপনার জানা উচিত' বুঝিয়ে বলার সুরে ওর ব্যাখ্যা: 'যে আমরা, অ-কেজো শ্রেণীর মানুষরা, পুরনো রীতি থেকে সরে যাওয়ার আনন্দেই বেশি ভরসা রাখি। ঠিক এই সময়টিতে শ্যাম্পেনের গ্লাসের মধ্যে বরফ রাখাটাই একটা খুশখেয়াল হয়েছে। ওয়ালডর্ফে ডিনার খেতে এসে অভ্যাগত 'টারটারির প্রিন্স' ওটাই তো চালু করে গেলেন। এখন শিগ্গিরই অন্যসব খেয়ালের জন্য হবে। যেমন ধরুন, ম্যাডিসন এ্যাভিন্যুতে এ সপ্তাহে ডিনার পার্টিতে প্রত্যেক অতিথির প্লেটে দেয়া হল সবুজ চামড়ার দস্তানা, ওটা পরেই তারা জলপাই খাবেন।'

সবিনয়ে যুবক মেনে নেয়, 'তাই তো। অন্তরতম চক্রের বিশেষ খেয়ালখুশির খবর তো সাধারণ জনতা পায় না।'

যুবকের ভ্রান্তি-স্বীকার সামান্য মাথা নুইয়ে গ্রহণ করে মেয়েটি আবার বলে, 'একেকবার আমি ভেবেছি যদি কাউকে ভালবাসতেই হয় তা'হলে তাকে হতে

হবে নিচুতলার মানুষ। এমন একজন, যে শ্রমিক, কিন্তু অলস নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে শেষ অবধি আমার ঝোঁকের চেয়েও বেশি প্রবল হবে উচ্চবংশ আর ধনসম্পত্তির দাবিটাই। ঠিক এক্ষুনি, আমায় চেপে ধরেছে দুজন। একজন একটা জার্মান রাজ্যের গ্র্যাণ্ড ডিউক। মনে হয় তার একটি স্ত্রীও আছে, বা ছিল কোথাও, যে তার মাতলামি আর নিষ্ঠুরতায় পাগল হয়ে পালিয়েছে। অন্যজন হল এক ইংরেজ মার্কুইস্, এমনই শীতল আর অর্থগৃধ্নু যে তার চেয়ে বরং ডিউকের নারকীয়তাই বেশি পছন্দ করি। কিন্তু কিসের প্রেরণায় আমি এসব কথা আপনাকে বলছি মিঃ প্যাকেনস্টেকার?'

'পার্কেনস্ট্যাকার', দম ফেলে যুবকটি, 'বাস্তবিক আপনার জানার কথা নয় আপনার গোপনীয় কথা কত সমঝদারির সঙ্গে নিচ্ছি আমি।'

একটা শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক চাউনি দিয়ে তাকে যাচাই করে মেয়েটি, দুজনের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যে সেটাই মানানসই।

জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ব্যবসার লাইনটা কী, মিঃ পার্কেনস্ট্যাকার?'

'খুব সামান্য কিছু। তবে সংসারে উঠে দাঁড়াবার আশা রাখি। আপনি কি সত্যিসত্যি আন্তরিকভাবে বলেছিলেন কথাটা, কোনো নিচুতলার মানুষকে ভালবাসতেও পারেন?'

'বাস্তবিকই তো। তবে বলেছিলাম 'পারতাম'। ওই গ্র্যাণ্ড ডিউক আর মার্কুইস্ রয়েছেন, জানেন তো। হ্যাঁ, যাকে চাইতে পারতাম, এমন লোক অতি দীন পেশাতে থাকলেও আমার আপত্তি ছিল না।'

পার্কেনস্ট্যাকার ঘোষণা করল, 'আমি একটা রেস্তোরাঁয় কাজ করি।'

মেয়েটি খানিকটা সংকুচিত হল।

একটু মিনতির সুরে বললে, 'ওয়েটার নন্ নিশ্চয়ই? পরিশ্রম মহৎ বস্তু, কিন্তু—ব্যক্তিগত সেবা, বুঝলেন না—খাস পরিচারক আর—'

'আমি ওয়েটার নই। আমি হল্যাম ক্যাশিয়ার, ওই—' পার্কের অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে ওরা দেখল রাস্তার ওধারে জ্বলজ্বল করছে বিজলির সাইনবোর্ড "রেস্তোরাঁ" লেখা।—'ওই রেস্তোরাঁটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানেই আমি ক্যাশিয়ার।'

বাঁ-কবজিতে দামি ডিজাইনের ব্রেসলেটের ওপর বসানো ছোট ঘড়িটা দেখেই মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বইখানা ওর কোমরে ঝোলানো একটা ঝকমকে বটুয়ার মধ্যে ঢোকান, যদিও অবশ্য ওটার পক্ষে বইটা একটু বেশি বড়।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাজে যাচ্ছেন না কেন?'

'আমার তো রাতের ডিউটি।' বললে যুবক, 'আরো একঘণ্টা দেরি আছে আমার পালা শুরু হতে। আবার কি দেখা পাবার আশা করতে পারি না?'

'জানি না। হয়তো,— তবে শখটা আমার পরে নাও জাগতে পারে। এবার আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হয়—একটা ডিনার আছে, তারপর বক্সে বসে অভিনয় দেখা—আর, ওহো! আবার সেই পুরনো চক্করে ঘোরা। হয়তো পার্কের উত্তর কোণে একটা গাড়ি লক্ষ্য করেছিলেন আসার সময়? সাদা বডি যেটার?'

'আর লাল রানিং গীয়ার?'—চিন্তিতভাবে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে যুবক।

'হ্যাঁ, ওটাতে করেই আসি সবসময়। পিয়ের আমার জন্য অপেক্ষা করছে ওতে। ওর ধারণা আমি স্কোয়ারের ওধারে বিভাগীয় বিপণিতে গেছি কেনাকাটা করতে। চিন্তা করুন, জীবন কী বাঁধনেই বাঁধা যে একজন শোফারকেও ধোঁকা দিতে হয় আমাদের। শুভরাত্রি!'

পার্কেনস্ট্যাকার বলে, 'কিন্তু এখন যে অন্ধকার, আর পার্কে সব বাজে বাজে লোকের ভিড়। আমি কি একটু হেঁটে—?'

'আমার ইচ্ছার প্রতি যদি আপনার সামান্য সম্ভ্রমও থাকে', মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলে, 'তাহলে আমি চলে যাবার পর অন্তত দশ মিনিট এই বেঞ্চেই বসে থাকবেন। আমি আপনাকে কোনো দোষ দিতে চাই না, তবে আপনি হয়তো জানেন মোটরগাড়িগুলোতে সাধারণত মালিকের নামের অক্ষরগুলো বসানো থাকে। আবার বিদায় নিচ্ছি, শুভরাত্রি।'

আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মেয়েটি দ্রুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপে চলে গেল। পার্কের কিনারার ফুটপাতে পৌঁছোনো অবধি যুবক তার লাবণ্যময় দেহকাণ্ড লক্ষ্য করে গেল। তারপর মেয়েটি রাস্তা ধরে কোণটার দিকে এগিয়ে গেল,— যেখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। এবার যুবক বেইমানের মতো নির্দ্বিধায় পার্কের গাছ আর ঝোপঝাড়ের ফাঁকে লুকিয়ে চুরিয়ে এগোতে লাগল মেয়েটির পথেরই সমান্তরাল রাস্তায়, সোজা তার দিকে নজর রেখে।

কোণটি অবধি পৌঁছে মেয়েটি একবার আড়চোখে দেখেছিল গাড়িটা, তারপর সেটা পার হয়ে এগোতেই থাকল রাস্তার ওপাশের দিকে। একটা দণ্ডায়মান ট্যাক্সির আড়ালের সুযোগ নিয়ে যুবক মেয়েটির চলাফেরা ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করে। পার্কের উল্টোদিকের রাস্তার ফুটপাত ধরে মেয়েটা জ্বলজ্বলে সাইনবোর্ড লাগানো রেস্তোরাঁটায় ঢুকে গেল। জায়গাটা ওই ধরনেরই খোলামেলা আলোকোজ্জ্বল ভোজনগৃহের মতো, সাদা রং আর কাঁচের ছড়াছড়ি, যেখানে কেউ বসে শস্তায় এবং দৃষ্টির সামনে বসে ভোজন করতে পারে। মেয়েটি রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে ঢুকে গেল পেছনের কোনো নিভৃত জায়গায়, তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল টুপি আর ঘোমটা বিসর্জন দিয়ে।

ক্যাশিয়ারের ডেস্কটা অনেকটা সামনের দিকেই। টুলের ওপর থেকে একটি লাল-চুলো মেয়ে নেমে এল, নামবার সময় তীক্ষ্ণভাবে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে। ছাইরঙা পোশাকের মেয়েটি উঠে দখল করল তার জায়গা।

যুবকটি পকেটের মধ্যে হাত গুঁজে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল আগের ফুটপাত ধরে। কোণটির কাছে আসতে তার পা ঠেকল ওখানে পড়ে-থাকা একটা ছোট, পেপার-মলাট বইয়ের গায়ে, ধাক্কা খেয়ে সেটা ছিটকে গেল ঘাসের কিনারা অবধি। মলাটের চাকচিক্য দেখে সে চিনতে পারল—এই বইটাই তো পড়ছিল ওই মেয়েটা।

অবহেলাভরে বইখানা তুলে নিল সে, দেখল মলাটের নাম : "নতুন আরব্য উপন্যাস", লেখকের নাম স্টিভেনসন। আবার ওটাকে ঘাসের ওপর ফেলে দিল সে ; মিনিটখানেক কিছুই ঠিক করতে না পেরে এদিক-উদিক হেঁটে বেড়াল। তারপর সে পা রাখল গাড়িটায়, গদির ওপর কাত হয়ে বসে শোফারকে বলল শুধু ক'টা শব্দ : 'ক্লাবে চলো, আঁরি!'

While the Auto Waits, এইন্‌স্‌লি'জ্‌, ১৯০৩

শীত ও বসন্ত

দেয়ালে-ঝোলানো তরোয়ালটার দিকে বিমর্ষনয়নে তাকান ক্যাপ্টেন। কাছেই আলমারি-খোপে সাজানো তাঁর বিবর্ণ উর্দি—আবহাওয়ার আর দেশসেবার সুবাদে দাগি আর জীর্ণ। সেই যুদ্ধের আতঙ্কের পুরনো দিনগুলো থেকে যেন কত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে মনে হয়।

আর এখন, দেশের কঠিন দিনগুলোতে এমন অভিজ্ঞ হয়েও তিনি বাধ্য হলেন আত্মসমর্পণ করতে, পুরোপুরি, এক নারীর নরম চোখ আর হাসিমাখা ঠোঁটের কাছে। নিঃশব্দ কামরাটায় বসে হাতে ধরে রেখেছেন তারই কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা—আর এই চিঠির ফলেই তাঁর এমন বিমর্ষ চেহারা। চিঠির সেই মারাত্মক অংশটা তিনি আবার পড়লেন, যা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করে দিয়েছে।

তুমি আমাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়ে যে সম্মান জানিয়েছ তা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে সরাসরিই কথাগুলো বলা ভাল। আমার তরফে এটা করার কারণ আমাদের দুজনের বয়েসের বিরাট পার্থক্য। আমি তোমাকে খুব, খুবই পছন্দ করি, কিন্তু আমি নিশ্চিত আমাদের বিবাহ সুখের হবে না। এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আসল কারণটা জানিয়ে দিলাম বলে আমার সততার তারিফ করবে।

ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের ওপর মাথাটা রাখলেন। হ্যাঁ, ওদের মধ্যে বয়েসের তফাত তো অনেক বছরেরই। কিন্তু উনি শক্তসমর্থ, পরিশ্রমী, তাছাড়া সামাজিক মর্যাদা ও সম্পত্তি তাঁর দুই-ই আছে। তাঁর ভালবাসা, তাঁর সযত্ন আদর, আর যে সুযোগ-সুবিধাগুলো তিনি ওকে দিতে পারতেন, তা কি ওকে ভুলিয়ে দিতে পারত না বয়েসের তারতম্যের প্রশ্নটা? তা ছাড়া, উনি একরকম নিশ্চিত যে তার জন্য মেয়েটি সত্যিই খুব ভাবে।

ক্যাপ্টেন করিৎকর্মা মানুষ। কর্মক্ষেত্রে তাঁর সুনাম ছিল তৎপরতা আর চট্ করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার জন্য। উনি ওর সঙ্গে দেখা করবেন ; আবার ব্যক্তিগতভাবে

আবেদন জানাবেন বিষয়টি নিয়ে। বয়েস! —বয়েস কোত্থেকে আসছে ওঁর আর ওঁর ভালবাসার পাত্রীর মধ্যে?

টেনেসীর পুরনো দক্ষিণী এক শহরে থাকে মেয়েটি, সেখানে যাবার ট্রেন ধরলেন উনি। দু'ঘন্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর বৃহত্তম লড়াইটার উদ্দেশে অনেকটা মার্চ্ করে যাবার ধরনে।

সুদৃশ্য বারান্দাঘেরা সাবেকি বাড়িটার সিঁড়িতে বসেছিল থিওডোরা ডেমিং, উপভোগ করছিল গ্রীষ্মের গোধূলিকাল। ঠিক সেই সময় গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে ক্যাপ্টেন এসে দাঁড়ালেন নুড়িপাথর-ঢাকা হাঁটাপথে। থিওডোরা তাঁকে হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করল, কোনো অপ্রতিভ ভাব নেই তাতে। ক্যাপ্টেন যখন ওর সিঁড়ির এক ধাপ নিচে দাঁড়িয়েছিলেন তখন কিন্তু ওঁদের বয়েসের পার্থক্যটা তেমন বেশি মনে হচ্ছিল না। উনি দীর্ঘকায়, ঋজুদেহ, চামড়ায় বাদামি রং-ধরা, চোখ নির্মল। মেয়েটি কমনীয় নারীত্বে পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা।

থিওডোরা বললে, 'আমি তোমায় প্রত্যাশা করতে পারিনি। তবে যখন এসেই পড়েছ তখন এই সিঁড়িতেই বসতে পার। আমার চিঠিটা পাওনি তুমি?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'পেয়েছি, আর সেইজন্যেই এসেছি। আমি বলছি এবার, থিও, তুমি তোমার জবাবটা আরেকবার বিচার করে দেখ। দেখবে না?'

থিওডোরা তাঁর দিকে চেয়ে একটা মৃদু হাসি দিলে। ক্যাপ্টেন তাঁর বয়েসের দিক থেকে ভাল জায়গাতেই পৌঁছেছেন। তাঁর শক্তি, স্বাস্থ্যবান চেহারা, পৌরুষ, সত্যিসত্যিই ওর বড় প্রিয় হয়তো... যদি—

'না, না', বলে মাথা নাড়লে সে সুস্পষ্টভাবে, 'ও নিয়ে আর প্রশ্ন ওঠে না। তোমাকে পছন্দ করি দারুণ, কিন্তু বিয়ে চলবে না। আমার বয়েস আর তোমার! কিন্তু— আর আমাকে দিয়ে বলাতে চেয়ো না কথাটা, চিঠিতেই তো সব বলেছি।'

ক্যাপ্টেনের বাদামি মুখটাই সামান্য আরক্ত হল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মলিনচোখে গোধূলির দিকে চেয়ে। বনের রেখা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, তার ওপাশেই তো ছিল একটা খোলা ময়দান, সেখানে নীল উর্দিপরা ছোকরারা একসময় শিবির গড়েছিল—সমুদ্র অবধি মার্চ করে যাবার আগে। এখন মনে হচ্ছে যেন কত কাল আগের কথা! সত্যিই, নিয়তি আর কাল তাঁকে ভয়ানক রকম ঠকিয়েছে। মাত্র ক'টা বছর এসে বাগড়া দিল তাঁর আর সুখের মাঝখানে!

থিওডোরার হাত ধীরে নেমে এসে স্থান নিল তাঁর দৃঢ় বাদামি হাতের মুঠোর ওপরে। সে অন্তত অনুভব করতে পারছে প্রেমেরই কাছাকাছি সেই গভীর মমতাটুকু।

শান্ত গলায় বললে, 'অমন কঠিনভাবে নিও না, দয়া করে। যা হল তা ভালোর জন্যই হল। অনেক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে নিজেই বিচার করে দেখছি। একদিন তুমি খুশিই হবে যে তোমার হবে যে তোমার সঙ্গে বিয়েতে আমি রাজি হইনি। কিছুদিনের

জন্য হয়তো বড় সুন্দর, চমৎকার হত সবকিছু—কিন্তু ভেবে দেখ একবার! ক'টি সংক্ষিপ্ত বছরের মধ্যেই আমাদের রুচি কত পৃথক হয়ে যেত। একজন চাইত আগুনের পাশে বসে বইপত্র পড়তে, কিংবা সন্ধ্যার সময় বাত বা স্নায়ুবেদনার চিকিৎসা নিয়ে, তখন অন্যজন হয়তো পাগল হয়ে উঠেছে বলনাচ, থিয়েটার আর বাইরে নৈশাহারের তাগিদে। না, প্রিয় বন্ধু! এটা ঠিক শীত আর গ্রীষ্মের ব্যাপার না হলেও হেমন্ত আর বসন্তের মতো তো বটেই।

'আমাকে দিয়ে তুমি যা করাতে চাইবে, থিও, বরাবরের মতো তাই করবো। যদি বল তো—'

'না, তা তুমি করবে না। তোমার এখন মনে হচ্ছে তাই করবে, কিন্তু তুমি তা করবে না। আর কিন্তু জিজ্ঞেস কোর না আমাকে।'

যুদ্ধে হেরে গেলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু তিনি বাহাদুর সৈনিক। যখন শেষ বিদায় জানাতে উঠলেন, তাঁর মুখের চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ, কাঁধ-জোড়া দু'পাশে ছড়ানো।

সে-রাতে উত্তরমুখো ট্রেন ধরলেন তিনি। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর নিজস্ব কামরায়, তরোয়ালটা আগের মতোই দেয়ালে ঝুলছে। ডিনারের জন্য পোশাক পরছেন, সাদা টাইখানায় খুব যত্ন করে 'বো'-গিঁট দিলেন। একই সময় অবশ্য নিজের মনে কিছু ব্যথিত স্বগতোক্তিও করছেন।

'আমার মর্যাদার দিব্যি, মনে হচ্ছে থিওর কথাই শেষষ অবধি ঠিক। ও যে রসালো পীচফলের মতো তা কেউ অস্বীকার করবে না, তবে খুব উদারভাবে হিসেব করলেও সে আঠাশ তো বটেই।'

কারণ, বুঝতেই পারছেন ক্যাপ্টেনের বয়েস মাত্র উনিশ, আর চাট্টানুগার প্যারেড-ময়দান ছাড়া কোথাও তাঁর তরোয়াল খাপ ছেড়ে বেরোয়নি—'স্পেন-আমেরিকান' যুদ্ধে অতটাই এগুতে পেরেছিলেন তিনি।

October and June, এইন্‌স্‌লি'জ, ১৯০৩ (এস্. এইচ, পিটার্স ছদ্মনামে)

ঠিকে ভুল–ভুলে ঠিক

মার্কুইস্ আর মিস স্যালি

অজানিতেই বুড়ো ব্যাস্‌কম একটা মর্যাদা পেয়ে গেলেন বিধির নির্বন্ধে একই দিনে ব্লোরোডেলের মাননীয় মার্কুইসের সঙ্গে পরলোক গমন করে।

মার্কুইস থাকতেন লণ্ডনের রিজেন্ট স্কোয়ারে। বুড়ো বিল বাস করতেন টেক্সাসের

হার্ডেমান জেলায়, 'খোঁড়া-হরিণ' উপত্যকায়। যে আকস্মিক বিপৎপাত মার্কুইসকে গ্রাস করেছিল তা হল একটি বুদ্‌বুদের বিস্ফোরণ, যাকে সবাই জানে "মধ্য-ও দক্ষিণ আমেরিকার মেহগিনি এবং কাউচুক-রবারের একচেটে বাণিজ্য" বলে। বুড়ো বিলির ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলেও ছিল কালমূর্তির রূপে নিয়ে একদল সভ্য রেড-ইণ্ডিয়ান গরু-ডাকাতের হানা, উপনিবেশ এলাকা থেকে এসে তারা পুরো চারশো গরুই নিয়ে পালায়, আর পশ্চাদ্ধাবনকারী বুড়ো বিলকে তারা গুলি করে মারে। এই দুই বিপর্যয়ের ফলাফলের সমীকরণ করতে গিয়েই বুঝি মার্কুইস্‌ও আত্মহত্যা করলেন—যখনই তিনি বুঝলেন এখন তাঁর যথাসর্বস্ব বলতে মাত্র পনেরটি শিলিং সম্বল, প্রতি পাউণ্ডের ধার শুধতে।

ছ'টি মাতৃহীন ছেলেমেয়ের পরিবার রেখে চলে গেলেন বুড়ো বিল। ওদের কপালে একটা লাল খোজা-বলদও রইল না, একটা যে কিনে নেবে তার লাল পয়সাটিও নেই।

মার্কুইস রেখে গিয়েছিলেন একটি যুবক সন্তান, সে আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এসে টেক্সাসের গোঁজ-সীমানায় একটা বড়সড়ো 'গোয়াল-ভরা' র‍্যাঞ্চ তৈরি করে বসে। এই যুবক যখন দুঃসংবাদটা পেল, সে ঘোড়ায় চেপে চলে গেল শহরে। একমাত্র নিজের ঘোড়া, জিনসাজ, উইনচেস্টার বন্দুক, আর পকেটের ডলার ছাড়া, বাদবাকি সর্বস্ব সে তুলে দিল তার উকিলদের হাতে—নির্দেশ রইল র‍্যাঞ্চ বেচে তাঁরা টাকা পাঠাবেন লণ্ডনে, ওর বাপের ঋণ শোধ করতে তা ব্যয় হবে। তারপর সে ঘোড়ায় চেপে চলল দক্ষিণ মুখো।

একই দিনে দুটি আলাদা পথ ধরে দুটি ছোকরা এল লিট্‌ল পিয়েদ্রার "ডায়মণ্ড ক্রস্‌" র‍্যাঞ্চে। দুজনেই কাজ খোঁজে তাদের কাছে। দুজনেরই নিখুঁত ফিটফাট কাউবয়দের পোশাক। একজন সিধে টান-চেহারার লোক, সুন্দর সুপুরুষ নাক মুখ, ছোট বাদামি চুল, মুখখানা পরিষ্কার কামানো, রোদে পুড়ে সোনালি বাদামি। অন্য আবেনকারীটি মোটাসোটা, চওডা-কাঁধ সতেজ লাল চামড়ায় একটু যেন ছোপ, লালচে কোঁকড়া চুল; প্রায় সাদামাটা মুখখানা আকর্ষণীয় তার সহাস্য চোখ আর সকৌতুক ঠোঁটজোড়ার জন।

ডায়মণ্ড ক্রসের তদারককারী কর্মচারীর মত হল তিনি দুজনকেই চাকরি দিতে পারেন। আসলে সেদিন সকালেই তাঁর কাছে খবর পৌঁছে গেছে যে কর্মী-শিবিরের বাবুর্চি—তাঁর দলের সবচেয়ে দরকারি লোকটা—নিজের খচ্চরে চেপে সটকান দিয়েছে কারণ সে দলবলের ঠাট্টাতামাশা আর ফন্দি ফিকিরের শিকার হওয়া সহ্য করতে পারেনি।

তদারককারী জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের কেউ রান্না করতে জান?'

'আমি জানি,' সঙ্গে সঙ্গেই বলে লাল চুলো ছোকরা। 'শিবিরে রান্না করার আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। যতদিন-না অন্য কোন কাজ আমায় দিচ্ছেন ততদিন

এটাই করতে আমি রাজি।'

তদারকারী তারিফের সুরে বলেন, 'এই তো চাই, পুরুষের মতো কথা। আমি তোমায় একটা চিরকুট দেব সপ্তার্সের নামে, সপ্তার্স তোমায় কাজে বহাল করবে।'

অতএব, ডায়মণ্ড ক্রসের কর্মী তালিকায় জন ব্যাসকম আর চার্লস নরউডের নাম যোগ হল। নৈশ ভোজনের পরেই দু'জন যাত্রা করল গরু-ঘেরাও শিবিরের উদ্দেশে। ওদের পথের নির্দেশ সিধে আর সংক্ষিপ্ত: "পাহাড়ি খাত ধরে পনের মাইল গেলেই পৌঁছে যাবে সেখানে।" দু'জনেই দূরদেশের আগন্তুক, জোয়ান তেজী মানুষ, ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে দীর্ঘ কাল অশ্বারোহণে, —অতএব ভবিষ্যতে তাদের দুজনের মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল তার সূত্রপাত হল আজ বিকেলেই, 'কানাডা ভের্দার' এই ছোট গিরিখাতে এঁকেবেঁকে পথ চলার সময়।

সূর্যাস্তের পর পরেই ওরা পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থলে। ঘেরাও-শিবিরের প্রধান তাঁবুটা একটা লম্বাগোছের জলাশয়ের ধারে, বেশ স্বচ্ছন্দ অবস্থানে, বড় গাছ গাছালির নিচে সাজানো। এখানে-ওখানে ঘেসো জমির ওপর অনেকেগুলো ছোট A-আকারের তাঁবুও আছে। দেয়ালওয়ালা বড় তাঁবুটায় ভাঁড়ারের ব্যবস্থা। দেখলে বোঝা যায়, অনেক দিন ধরে থাকার মতলবেই শিবিরটা গড়া।

গরু-ঘেরাওদলের দল এসেছিল কয়েক মুহূর্ত আগেই। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হয়ে—কিন্তু ভোজনশূন্য শিবিরে। পলাতক বাবুর্চির নামে শাপশাপান্ত করতে গিয়ে কে কাঁকে ছাড়িয়ে যাবে তার প্রতিযোগিতায় নেমেছে ছোকরারা। ওরা যখন পনির জিনসাজ নামিয়ে তাদের পায়ে ঢিলে দড়ি বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছে, সেই সময় নবাগতরা ঘোড়ায় চড়ে এসে পিঙ্ক সপ্তার্সের সন্ধান করল। শিবিরের কর্তা বেরিয়ে আসতে তার হাতে দেওয়া হল তদারককারীর চিরকুটখানা।

পিঙ্ক সপ্তার্স কাজের সময় সর্দার হলেও, শিবিরে সে রসিক-চূড়ামনি—শিবিরে রাঁধুনি থেকে সুপারিটেণ্ডেণ্ট, প্রত্যেকেই সমান। চিরকুট পড়ে নিয়ে সে তাঁবুর দিকে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, উচ্চস্বরে ঘোষণা জানাবার মতো 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করার সম্মতি দিন "মাননীয় মার্কুইস ও মিস্ স্যালি"-কে।'

দুজন আগন্তুকই এ কথায় কেমন এক হতভম্ব ভাব প্রকাশ করল। সদ্য নিয়োজিত রাঁধুনি চমকে উঠল মুখে অবাক ভাব করে, কিন্তু যখনই তার মনে পড়ল পশ্চিম টেক্সাসের প্রত্যেকটি গো-শিবিরেই পুরুষ-রাঁধুনিকে ডাকা হয় "মিস স্যালি" বলে, তখন সে নিজের লোকসান মেনেই মুখে বোকা হাসি ফুটিয়ে আবার ধাতস্থ ভাবটা ফিরিয়ে আনল।

তার সঙ্গীটিকে কিন্তু কম অস্থির দেখায়নি, ঠোঁট কামড়ে রাগ দেখিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নিজের পনিতে ফের উঠতে যাবার ভঙ্গি করে সে হাতও বাড়ায় জিনের ডগার দিকে ; কিন্তু মিস স্যালি এবার তার বাহু ছুঁয়ে হাসতে হাসতেই বলে, 'আরে ছেড়ে দাও মার্কুইস ; ওটা তো সপ্তার্সের শ্রদ্ধারই কথা। তোমার

ওই সম্ভ্রান্ত ভাব আর টিকোলো নাকটার জন্যই সগুার্স তোমায় ওনামে ডেকে সম্মান জানিয়েছে।'

সে ঘোড়ার জিনসাজ নামায়, আর মার্কুইসও এবার শান্ত হয়ে ওর উদাহরণই অনুসরণ করে। মিস স্যালি তার আস্তিন গুটিয়ে লাফিয়ে ওঠে খাবারের ওয়াগনগাড়িতে আর চেঁচাতে থাকে:

'আমি তোমাদের নতুন রাঁধুনি—কসম খাই! তোমরা ছোকরারা কেউ উনোনের কাঠ কুড়িয়ে আনো, আমি তোমাদের তিরিশ মিনিটের মধ্যে গরমাগরম খাবার দেব, গ্যারান্টি দিচ্ছি।' —মিস স্যালি যেভাবে খাবাবের গাড়ি তন্নতন্ন করে কফি, ময়দা বেকন বের করে, যেমন তার সকৌতুক উৎসাহ, অবিলম্বে শিবিরের সাথীদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিল সে।

পরে অবশ্য মার্কুইসও দিনে-দিনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল, প্রমাণ করল সেও একজন ফুর্তিবাজ চমৎকার লোক; সর্বদাই কিঞ্চিৎ গম্ভীর, শিবিরের উৎকট হুল্লোড়বাজির মধ্যে ততটা না থাকলেও ছোকরারা কিন্তু ক্রমেই ওর এই গম্ভীর ভাবকে খাতির করতে শেখে—অতএব সগুার্স যে উপাধিটা তাকে দিয়েছে তা তারা মেনেই নিতে শেখে, এমনকি এজন্য তাকে পচ্ছন্দও করে। সগুার্স তাকে ভার দিয়েছিল ছাপ-মার্কা দেবার সময় গরুর পাল আটকে রাখার। ও যে একজন কৌশলী ঘোড়সওয়ার, যেমন ল্যাসো ছোঁড়া তেমনি ওদের মতোই ছাপমারা খোঁয়াড়ের কাজে দড়ো, তা সে প্রমাণ করে দিল।

পরস্পরের পরম অন্তরঙ্গ সাথী হয়ে দাঁড়ায় মার্কুইস আর মিস স্যালি। রাতের ভোজনের পরে সব সাফ সুতরো করে, দেখবেন ওরা দুটিতে এক জায়গায়—মিস্ স্যালি "ব্রায়ার শেকড়ের" পাইপ ধরিয়ে ধূমপান করেছে আর মার্কুইস, হয় চামড়ার চাবুকের হাতল পাকাচ্ছে নয়তো এক জোড়া পা-বাঁধা চামড়া ঘষে সই করছে।

তদারককারী বলেছিলেন রাঁধুনির কাজের ব্যাপারে নজর রাখবেন, তা সেটা তিনি ভোলেননি। বেশ ক'বার শিবির দেখতে এসে তিনি ওর সঙ্গে লম্বা আলোচনা করলেন। মনে হয় মিস্ স্যালির প্রতি তার বিশেষ সুনজর পড়েছে। একদিন বিকেলে শিবিরগুলো দর্শন করে র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে তিনি ওকে বললেন:

'কাল সকালে একটি লোক আসবে তোমার জায়গা নিতে। সে আসা মাত্র তুমি চলে আসবে র‍্যাঞ্চে। আমি চাই তুমি র‍্যাঞ্চের হিসেবপত্র আর চিঠিপত্র লেখালেখির ভার নাও। মনে হয় ঠিক যে-মানুষটাকে আমি খুঁজছিলাম সে তুমিই। এমন উপযুক্ত কাউকে আমি চাই যার ওপর ভবসা করতে পারি, আমার অনুপস্থিতিতে সব ঠিকঠাক রাখতে পারবে। মাইনে ভালোই পাবে। নিজেদের স্বার্থ দেখতে এমন একজন লোক থাকলে তো ডায়মণ্ড-ক্রস্ সত্যিকারের নমুনা দেখাবে!'

যেন এরকম একটা নির্দেশ শুরু থেকেই প্রত্যাশা করছিল মিস্ স্যালি। নরম ভাবে বলল, 'ঠিক আছে, আমার বউকে যদি র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসি তাতে আপনার

আপত্তি নেই তো?'

'তুমি বিবাহিত?' একটু ভ্রূকুটি করে বললেন তদারককারী, 'তুমি তো আগে কথা বলার সময় সেটা উল্লেখ করোনি।'

'কারণ আমি বিবাহিত নই', বললে রাঁধুনি, 'তবে বিয়ে করতে চাই। ভেবেছিলাম সবুর করব যতদিন-না পাকা ছাদের তলায় কোনো কাজ পাই। আমি তো তাকে গরুর শিবিরে বাস করতে বলতে পারি না।'

তদারককারী বললেন, 'তা ঠিক। বিবাহিত মানুষের পক্ষে শিবির তেমন ভাল জায়গা নয়—কিন্তু—বেশ তো, র‍্যাঞ্চ বাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে, আর যদি তুমি আমাদের সঙ্গে ভাল মানিয়ে নিতে পার, তা তোমার সাধ্যে কুলোলে তুমি বোধহয় পারবেও। তুমি তাকে লিখে দাও চলে আসতে।'

'ঠিক আছে,' আবার বললে মিস্ স্যালি, 'কাল সকালে শিবির থেকে ছাড়া পেতেই তাহলে চলে আসছি ওখানে।'

সে রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। রাত্রিভোজনের পর গরু-ছাপমারা কাউবয়রা শুকনো চাপড়া মেস্কিট ঘাসের একটা বড় আগুন জ্বালিয়ে তারই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। ওদের স্বাভাবিক রঙ্গ তামাশা আর চাপান-উতোরের বিনিময় এখন থিতু হয়ে প্রায় নীরব হতে বসেছে, কিন্তু গরু শিবিরের নীরবতা মানেই কোনো শয়তানি পাকিয়ে ওঠার ইঙ্গিত।

মিস্ স্যালি আর মার্কুইস একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আলোচনা করছিল লম্বা পাড়ির রাস্তায় ঘোড়ার ছোট রেকাব কি লম্বা রেকাব কোন্‌টা বেশি কাজের, তাই নিয়ে। একটু বাদেই মার্কুইস উঠে একটা গাছের কাছে গেল কিছু কাঁচা চামড়ার ফালি পরীক্ষা করতে, একটা ল্যাসো বানাবে বলে সে ওগুলো পাকা করছিল। সে চলে যেতেই একটা ছোট দমকা বাতাস এসে মিস স্যালির চোখের ওপর উড়িয়ে দিল কতগুলো তামাকের গুঁড়ো, সিগারেট থেকে—"শুকনো-খাড়ি" স্মিদারস্ তখন হাতে পাকাচ্ছিল ওই সিগারেট। রাঁধুনি চোখ রগরাতে শুরু করতেই জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর চোখ থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে, কাংস্যানিন্দিত কণ্ঠের জন্য যাকে সাবই 'গ্রামোফোন' ডেভিস্ বলে ডাকে—সে তড়াক্ করে উঠে একটা বক্তৃতা জুড়ে দিল:

'শুন হে ভ্রাতৃগণ, নাগরিকসকল! আমি একটা পেরশ্নো রাখতে চাই। মানুষের ধারণা হয় না চরম দুঃখজনক দৃশ্য কী হতে পারে?' সবাই হৈ-হৈ করে তার প্রশ্নের জবাব দিতে যায়।

'হঠাৎ বাঁধ ভেঙে-যাওয়া বন্যা!'

'হাতে ছাপ-মারার লোহা নেই, অথচ নতুন বাছুর হয়েছে!'

বুড়ো টলার, মোটা ছাপ-মারা মজুর, বলল, 'চুপ মারো হে অখদ্যে পণ্ডিতরা, 'ফোনি'ই জানে সেটা কী। আমাদের বলতে যাবে বলেই সবুর করছে।'

'গ্রামাফোন' ফের শুরু করে—'না হে ভাতৃগণ, নাগরিকগণ, এসব নয়। তোমরা যে দৃশ্যগুলো বলেছ তা দুঃখ জাগায় বটে, অনেক দূর গেলে কাছাকাছিই সমাধান, তবে এগুলো জবাব হল না। এখানে চরম দুঃখজনক দৃশ্য ওই যে—' সে আঙুল দেখায় মিস স্যালির দিকে, সে এখনো জলধারা-বওয়া চোখ রগড়াচ্ছে—'কেঁদে চোখের জলে ভাসছে মিষ্টি-কথার ফাঁদে পড়া সরল বিশ্বাসী। আমরা কি মানুষ, নাকি বন-বেড়াল যে আমাদের মিস্ স্যালির এই ভালবাসার অপমান চেয়ে-চেয়ে দেখব—ওই একজন অতি-অভিজাত লোকের হাতে? সে বান্দা আমাদের মধ্যে সেঁধিয়েছ তার আহা-মরি রূপ আর চক্চকে উপাধি নিয়ে, আর আমাদের যে চমৎকার পেরানিটাকে বাঁচাবার কথা, তাকেই জ্বালা দিয়ে কাঁদাচ্ছে! আমরা কি পুরুষের মতো কিছু করে দেখাব, নাকি ভ্যাদ্ভেদে রুটি খাব ওর একগাদা চোখের জলে ঠাসা ময়দা থেকে?'

খিচ্খিচ্ করে নাক টেনে 'শুকনো-খাড়ি' বলল, 'এ ভয়ানক লজ্জার কথা হল—এতো মানুষের মতো নয়। তাই আমি দেখতাম বেটা ছুঁচো প্রায়ই ওর পাশে ঘুরে মিঠে-মিঠে কথা বলে। আর সে কিনা মার্কুইস! ওটা একটা উপাধি তো, তাই না হে 'ফোনি?'

'বুনো-খড়ির' কিড ব্যাখ্যা করতে এগোয়—'ওয়া প্রায় ধরো, রাজার মতো, তবে একটু নিচের তলার। আন্দাজ হয় ওটা গোলাম আর দহলার মাঝামাঝি কোথাও।'

গ্রামাফোন-চোঙা আবার বলে ওঠে, 'আমার কথার ভুল মানে করো না, অ-অভিজাতদের নিচে নামিয়ে দিয়েছি বলে। ওদের কয়েকজন খাঁটি মানুষ, ওয়াটসনের ছোকরাদের সঙ্গে অনেক দূর অবধি যেতে পারে। আমি নিজে তাদের 'পালে ভিড়েছি', ফোর্ট ওয়ার্থের মেয়রের সঙ্গে হাতির মিছিল দেখেছি, কেটির জেনারেল যাত্রী এজেন্টের সঙ্গে পেঁচার ডাক শুনেছি পর পর নাম বলা যায়। কিন্তু, একজন মার্কুইস যখন একটি রাঁধুনি-মহিলার নিরীহ ভালবাসা নিয়ে বাঁদর নাচ দেখায়, তখন জিজ্ঞেস করি সে কাজের যোগ্য শাস্তি কী?'

'চামড়া, চাবুক!' চেঁচিয়ে বলে শুকনো-খাড়ি স্মিদারস্।

'শুনলো তো, দয়ালু বিচারক!' —সায় দেবার কায়দা কিডের।

কাউবয়রা সমস্বরে সম্মতি জানাল, 'তোমার সঙ্গীসাথী হাজির।'

'মার্কুইস তাদের মতলব বোঝার আগেই ওদের দুজন তার দুই বাহু ধরে টেনে নিয়ে গেল গাছের গুঁড়িটার দিকে। স্ব-নিযুক্ত দণ্ডদাতা 'গ্রামাফোন' ডেভিস্ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল একজোড়া শক্ত চামড়ার পট্টি হাতে নিয়ে।

তাদের এই অভব্য খেলা-তামাশার মধ্যে এই প্রথম তারা মার্কুইসের গায়ে হাত দিয়েছে।

মার্কুইস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জ্বলন্ত চোখে শুধোয়, 'এসবের মানে কী? কী চাও?'

রুর ফেলোজ্ (পাকড়ে ধরা ছোকরাদের অন্যতম) ওর কানে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ঘাবড়িও না মার্কুইস, এসব হচ্ছে তামাশা। মেজাজ না দেখিয়ে মেনে নাও, অল্পের ওপর দিয়েই ছেড়ে দেবে ওরা। শুধু গুঁড়িটার ওপর তোমায় চ্যাংদোলা করে রাখবে, আর চামড়ার ফালি দিয়ে আট-দশবার চাপড়াবে মাত্র। খুব কিছু ব্যাথা লাগবে না।'

রাগের হুঙ্কার দিয়ে, সাদা দাঁত ঝকমকিয়ে, মার্কুইস হঠাৎ এক বিস্ময়কর শক্তি প্রকাশ করে বসল। বাহু দুটো এমন জোড়ে হ্যাঁচকা টেনে ছাড়িয়ে নিল যে চারজনই টলে গুঁড়ির কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়ল। একটা রাগের চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে, আর মিস স্যালিও তামাক-মুক্ত পরিষ্কার চোখে তা দেখে তৎক্ষণাৎ মিশে গেল পাছড়াপাছড়ি-করা দলের মধ্যে।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই ওদের কানে এল উচ্চকণ্ঠে 'হ্যালো!' বলে একটা আওয়াজ। আর লম্ফমান চারটে মাস্ট্যাং ঘোড়ায় টানা একটা বাক্‌বোর্ড গাড়ি গোঁত্তা খেয়ে ঢুকল শিবির-আগুনের আলোর বৃত্তের মধ্যে। সবাই ফিরে তাকাল দেখতে, আর যা দেখল তাতে ওদের মন থেকে উপে গেল গ্রামাফোন ডেভিসের মান্ধাতার কালের সান্ধ্য উৎসব চরিতার্থ করার সব চিন্তাই। মার্কুইসের চেয়েও বড় 'খেল্' এবার হাতে আসছে, তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে ওর চেয়ে রইল অগ্রসরমান শিকারের দিকে।

ঘোড়ার গাড়ি আর দলবল হল স্যাম হলীর। স্যাম 'বিগ মাডি' খামারের মালিক। সেই গাড়ির চালক, আর তার সঙ্গে একজন মোটাসোটা, পরিষ্কার দাড়ি-কামানো লোক, ফ্রক-কোট, উঁচু সিল্কের হ্যাট-পরা। উনি জেলার বিচারপতি মিঃ ডেভ হ্যাকেট, পুনর্নির্বাচনে প্রার্থী। স্যাম তাঁকে জেলায়-জেলায় নিয়ে গো-শিবিরগুলোতে ঘুরছে, সরকারী ভোটারদের একটু ঝাঁকিয়ে চাঙা করতে।

ভদ্রলোকেরা বেরিয়ে ঘোড়া বাঁধলেন মেস্কিটের ঝাড়ে, হেঁটে এলেন আগুনের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের প্রত্যেকটি লোক—মার্কুইস, মিস স্যালি আর পিঙ্ক সণ্ডার্স ছাড়া আর সবাই—ভয়ানক একটা চিৎকার করে উঠল ছদ্ম-আতঙ্কে, আর চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিল। সণ্ডার্সকেই গৃহকর্তার কাজ করতে হয়।

হ্যাকেট চেঁচিয়ে আক্ষেপ জানালেন, 'আরে মেলো যা! আমরা কি এতই কুৎসিত দেখতে? কেমন আছ হে মিঃ সণ্ডার্স? আবার দেখতে পেয়ে খুশি হলাম।... আমার টুপিটা নিয়ে কী করছ হলী?'

চিন্তিতভাবে হলী বলল, 'এই টুপিটা নিয়ে আমার ভয় ছিল।' হ্যাকেটের মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে সে নিজের হাতে রেখেছিল, আর সন্দিহান চোখে তাকাচ্ছিল

আগুনের আলোর বাইরে ছায়াগুলোর দিকে। সেখানে এখন পুরো স্তব্ধতা। 'তোমার কী মনে হয় সণ্ডার্স?'

পিঙ্ক দাঁত বের করে হাসে। যেন নিঃস্বার্থ উপদেশ দিচ্ছে এইরকম সুরে বলে, 'ওটাকে বরং একটু উঁচুতে তুলে দিন। আলোটা তো খুব পরিষ্কার নয় এখানে। আমার মাথার ওপর তো ওটা রাখবেই না।'

খাবাবের-গাড়ির পেছনের চাকার মাঝখানে পা রেখে হলী টুপিটা টাঙিয়ে দেয় একটা ওকগাছের শাখায়। ওরা পা ফিরে মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, সঙ্গে সঙ্গে এক ডজন ছ'ঘরা বন্দুকের নির্ঘোষ আকাশ বিদীর্ণ করে, আর হ্যাটখানা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে যায় মাটিতে

যেন এক কুড়ি র‍্যাটল সাপ হিসিয়ে ওঠার শব্দ শোনা গেল। এবার চতুর্দিকের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল কাউবয়রা—উঁচু-উঁচু পা ফেলে হাস্যকর বাড়াবাড়ি রকমের সতর্কতার সঙ্গে। পরস্পরকে 'হুশ্' করে সাবধান করতে লাগল এগোবার সময় পুরোদস্তুর নজর রেখে চলবার জন্য। হ্যাটের চারদিকে গোল হয়ে ওরা একটা সুগম্ভীর সুপরিসর চক্র তৈরি করল, প্রকাশ্য, শঙ্কার সঙ্গে তাকাতে লাগল ওটার দিকে, আর প্রতি মুহূর্তেই 'এই বুঝি বিপদ' ভেবে পালাবার চেষ্টায় ছোট খাটো হুড়োহুড়ি সৃষ্টি করতে লাগল।

একজন ভয়-পাওয়া গলায় বললে, 'এ-সেই নোংরা ছুঁচো, রাত্রে যেগুলো উঁচুনিচু জমিতে ছুটে বেড়ায় আর ডাকে "উইল-ওয়ালো!" বলে।'

আরেকজন ঘোষণা করল, 'এ তো বিষাক্ত কাইপুটাম, যা মরে যাবার পরেও দাঁত বসায়, আর মাটিতে পোঁতার পরেও চেল্লায়।'

গ্রামাফোন ডেভিস বলল, 'লোমশ জীবদের এ হল সর্দার। কিন্তু এখন মরে পাথর হয়েছে, ভাই সব!'

শুকনো-খাড়ি আপত্তি তোলে, 'বিশ্বাস নেই ভাই, শুধু মরার ভান করে আছে। এটা সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে কোলাব্যাং হাইগোলাকাম-খিঁচুনি। ওটাকে ধ্বংস করার একটাই উপায় আছে'

২৪০-পাউণ্ড-ওজনের কাউবয় বুড়ো টলারকে সে এগিয়ে নিয়ে গেল। বুড়ো টলার মাটির ওপর টুপিখানা সোজা করে রেখে গম্ভীরভাবে বসে পড়ল ওটার ওপর, আশ্কে পিঠের মতো চেপ্টা হয়ে গেল টুপিটা।

হ্যাকেট এই সব কার্যকলাপ বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন। স্যাম হলী দেখল তাঁর রাগের মাত্রা যেন চড়ে যাচ্ছে, তাই বললে:

'জজ সাহেব, এখানেই আপনার হার-জিতের পরীক্ষা। ডায়মণ্ড-ক্রসে আছে ষাটখানা ভোট। ছোকরারা আপনার হিম্মত যাচাই করে নিতে চায়। এটাকে তামাশা হিসেবে ধরুন, তাতে আপানর কিছু লোকসান হবে না বলেই মনে হয়।' —হ্যাকেটও

'গ্রামোফোন' কড়া গলায় মার্কুইস্‌কে সম্বোধন করে—'বেইমান নেকড়ে! এই চ্যাপটা-গতর তবু সরলবিশ্বাসী কাপড়ের পুঁটলিটার যে নোকসান তুমি করেছ তা মিটিয়ে ফেলতে চাও? তা হলে গুটিগুটি এগোও বেদির দিকে, নইলে তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ওখানে টেনে নিয়ে যাব, সেটা ভাল হবে?'

মার্কুইস তার টুপিটা পেছনে ঠেলে, কিছু তোয়াক্কা নেই ভাব করে উঁচু শিমের বস্তায় হেলান দেয়। তার গালদুটো লাল, চোখ চক্‌চক করছে। বলল, 'চালাও তোমাদের ইঁদুর-নিধন!'

একটু বাদে একটা মিছিল এসে দাঁড়াল গাছের নিচে যেখানে হ্যাকেট, হলী আর সণ্ডার্স বসে পাইপ ফুঁকছে।

খোঁড়া ওয়াকার ছিল মিছিলের সর্বাগ্রে, নিংড়ে বার করছে তার কনসার্টিনা থেকে একটা করুণ সুর। ওর পেছনেই আসছে বর-বধূ। রাঁধুনি তার কোমর ঘিরে এঁটেছে একটা জাঁকালো 'নাভাজো' কম্বল, এক হাতে মোমের মতো সাদা 'স্প্যানিশ-ছোরা' ফুল, পেল্লায় আকার, দশসের ওজন। মেস্কিটের ডাল আর হলদে রাটামা ফুল দিয়ে অলংকৃত ওর হ্যাটখানা। কোথা থেকে একটা মশারি উদ্ধার করে তা দিয়ে ঘোমটার জালি করা হয়েছে। ওদের পেছন-পেছন হোঁচট খেয়ে আসছে 'গ্রামোফান' ডেভিস্—সে কনের বাপের ভূমিকায়, জিনসাজের কম্বলে মুখ রেখে এমন ফুঁপিয়ে কাঁদছে যে এক মাইল দূর থেকে শোনা যায়। পেছনে দুজন দুজন করে গরু-ছাপমারা উচ্চকণ্ঠে কনের রূপের প্রশংসা করছে—ফ্যাশনদুরস্ত বিয়েগুলোতে দর্শকরা সে-রকমই করে কিনা!

মিছিল সামনে এসে থামতে হ্যাকেট উঠে দাঁড়ান। তারপর দাম্পত্য জীবনের ওপর একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে প্রশ্ন করেন:

'কী নাম তোমাদের?'

রাঁধুনি জবাব দেয়, 'স্যালি আর চার্লস্‌।'

'হাতে হাত ধরো, চার্লস্‌ এবং স্যালি।'

এর চেয়ে অদ্ভুত বিয়ে বোধহয় কখনো হয়নি। কারণ বিয়ে তো ওটা ছিলই—যদিও উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ওরা ছাড়া কেউ সেটা জানত না।

অনুষ্ঠান শেষ হতে কাউবয়রা সমস্বরে চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানায়, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই সাঙ্গ করে তাদের ভাঁড়ামো, আজ রাতের মতো। পর পর কম্বল খোলা হয়ে যায়, আর ঘুমই ওদের কাছে তখন আসল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

রাঁধুনি (অলংকারাদি থেকে মুক্ত) আর মার্কুইস আরো কিছুক্ষণ দাঁড়ায় খাবার-গাড়ির ছায়ার আড়ালে। মার্কুইস ওর মাথাটা এলিয়ে দেয় রাঁধুনি-স্বামীর কাঁধে।

ও বলছিল, 'কী যে করব তখন ভেবেই পাইনি—বাবা চলে গেছেন আর আমরা বাচ্চাকাচ্চারা দানা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, চুরিচামারি করছি। বাবাকে কত সাহায্য করতাম গরুর রাখালি কাজে! পরে ভাবলাম 'কাউবয়ই' হয়ে যাব। তা-ছাড়া তে

বেঁচে থাকার মতো কোনো অবলম্বনই পাচ্ছিলাম না। যদিও একাজে খুব একটা ভক্তি ছিল না এখানে আসার পর, হয়তো চলেই যেতাম, যদি-যদি-না—'

'যদি-না কী?'

'তুমিই জানো। একটা কথা বল আমায়। কখন তুমি প্রথম ...মানে কীভাবে বুঝলে তুমি—'

'ও, সে তো যখনই এসে শিবিরে ঢুকলাম, সন্ডার্স চেঁচিয়ে উঠল "মার্কুইস আর মিস্ স্যালি এসেছে" বলে। দেখলাম ও নামটায় কেমন বিচলিত হয়ে পড়লে তুমি, আর আমার সন—'

'কী আস্পদ্দা গো তোমার!' ফিস্‌ফিসিয়ে বলে মার্কুইস, 'সে আমাকেই "মিস্ স্যালি" বলে ডাকল বলে আমি ভেবেছি, এমন ধারণা হল কেন তোমার?'

শান্ত কণ্ঠে রাঁধুনি জবাব দিল, 'কারণ আমি তো মার্কুইসই। আমার বাবা ছিলেন বোরোডেলের মার্কুইস। কিন্তু তুমি ওটা মাফ করে দিও; দেবে না স্যালি? এ আসলে আমার দোষ নয়, তা তো জানো।'

The Marquis and Miss Sally, এভরিবডি'স, ১৯০৩

দান-পত্র!

জর্জিয়া রাজ্যের 'ওকোচি'-তে বাজার যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় জে. পিঙ্কনি ব্লুম সেখান থেকে বেরিয়ে এল 'নোটের তাড়া' সঙ্গে নিয়ে। ওকোচিও বেরিয়ে এসেছে আধ-মিলিয়ন ডলার ঋণ রেখে (যার ওপর 'শহর-সম্পত্তি' ট্যাক্স ২½%); আর পৌরসভা মুখ লুকোবার ঝোঁক দেখাচ্ছে শহরের পেছন-গলিগুলোতে। এসব ঘটল কিন্তু কোনো এক 'উত্তুরে' পর্যটকের বিবরণ ও বর্ণনার ফলেই—সে এক সর্বনাশা মিল খুঁজে পেয়েছিল এখানকার নদী কোলুসার সঙ্গে নিউইয়র্কের হাডসন নদীর! ওকোচির ধারণা হয়েছিল নিউইয়র্ক একাই 'ঝিলজঙ্গলের কুমির' এমন জাঁক সে যেন না করে। আর তখনই এল দক্ষিণাঞ্চলের নিরীহ কিন্তু একগুঁয়ে সেই অজস্র মানুষ, যারা আরো তুলো-কারখানা গড়ার জন্য চেঁচায়, বাজার-দর এক ডলার হলেও সেই স্টক কেনে (যদি অবশ্য সে ডলারটিও ধারে পাওয়া যায়)। একজন পর্যটকের নিরীহ প্রশংসার ওপরেও তারা জুড়ে দিল মারাত্মক কর্মতৎপরতা—ফলে পতন হল ওকোচির।

ছোটখাটো একটা পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করে এঁকে বেঁকে গেছে কোলুসা নদী। ওকোচি পার হয়ে মিষ্টিমধুর ইণ্ডিয়ান-স্বরক্ষেপের মতোই লঘুছন্দে পড়েছে চাট্টাহুচির জলে।

ওকোচি যেন জেগে উঠেছিল ডাকঘরের খুপরির রোদ-গরম আসন থেকে। গ্যালিস্ এঁটে ঝোলা-প্যান্ট উঁচিয়ে সে শহরের এক মাইল ওপর দিকে কোলুসা নদীর আড়াআড়ি বেঁধে ফেলল একটা গ্র্যানিটের বাঁধ—২৪০ ফুট লম্বা আর ৬০ ফুট উঁচু। তার ফলে ছোট পাহাড়ের কোলে শহরের পেছন থেকে কুড়ি মাইল জুড়ে গড়ে উঠল একটা ঢেউ-খেলানো ঝক্‌মকে হ্রদ। এই ভাবে পৌর প্রতিযোগিতার বিরাট খেলায় নেমে ওকোচি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল সেই বিখ্যাত নজর কাড়া হাডসন-নকশার সঙ্গে। এটা মেনে নেয়া হল যে দৃশ্যসৌন্দর্য আর মহনীয়তায় এখানকার বাঁধ-স্তম্ভগুলোর জুড়ি পাওয়া ভার। 'ছবির কার্ড' তো হল, সঙ্গে সঙ্গেই এল বাণিজ্যিক গুরুত্বের তুরুপ-টেক্কা। এই বাঁধ থেকে উৎপন্ন হবে চোদ্দ হাজার অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ। বর্ষণের শেষে সবুজ শস্যের শিষের মতো গজিয়ে উঠবে তুলোর মিল, ফ্যাকটরি আর সাজসরঞ্জাম তৈরির কারখানা। সুতোর টাকু, মেশিনের চাকা, আর মোটর ইঞ্জিন গুঞ্জন তুলবে ওকোচির ক্ষুরবুদ্ধির জয়গানে। লেকের ওপর দর্শনীয় উচ্চতায় মাথা তুলবে অপরূপ সব দামি ভিলা, পুঁজিপতিদের মনোহর গ্রীষ্মাবাস। কোটিপতিদের 'নাপ্‌থা'-লঞ্চগুলো রোমাঞ্চকর গুহায়-গুহায় থুতু ছেটাবে; তাজা শ্যামলিমায় ঢাকা টিলাগুলো নেবে কাঠখোট্টা চত্বর, লন আর পার্কের রূপ। ওকোচিতে টাকা খরচ হবে জলের মতো, আর জল হয়ে দাঁড়াবে টাকা।

একটা ভাল উপনিবেশ-শহরের নিয়তি খুব দ্রুতই বলে দেয়া যায়। পুঁজি সিদ্ধান্ত করল আর বিনিয়োগ করা চলবে না। বড়বড় যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে শুধু নিসর্গদৃশ্যটাই পূর্ণ রূপ পেল। বনঘেরা পাহাড়চুড়ো, সুগম্ভীর গ্রানিটের আকর্ষণীয় অন্তরীপ, সৈকত আর উপত্যকার সুন্দর সবুজ ঢাল—এরাই ওকোচিকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে রাখল কৃপণ সোনার অক্ষমতা থেকে। সূর্যাস্তই তার সোনা মাখিয়ে দেয় স্বপ্নময় হ্রদ আর গুহায়, এমনই তার জেল্লা যে সব ক্ষোভ যেন তাতেই মিটে যায়। দেশ আর রক্তের যা ধাত, তাতেও ওকোচি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। লড়াইয়ের ময়দান থেকে সে ঠেলে ওঠে, পাতলুনের গ্যালিস্ বেল্ট্ ঢিলে করে আবার বসে ডাকঘরের টুলে, আর তামাক চিবোয়। পৌর পরিষদের উদ্দেশে অলস সুরে বিদ্রূপ করেই তার সান্ত্বনা, পরিষদের অবশ্য দোষ নেই, তবু সদস্যরা—যেমন আগেই বলেছি—শহরের আনাচকানাচ খোঁজেন আর ঘর্মাক্ত হয়ে হিসেব কষেন ডুবে-যাওয়া তহবিল আর প্রাপ্য সুদের আদায় নিয়ে।

ওই ঋণের বোঝা যাদের গোলাপি ভবিষ্যতের দিকে বয়ে নিয়ে যাবার কথা—ওকোচির যুববৃন্দ, কিন্তু যৌবনের বেহিসেবি আনন্দেই সব ব্যর্থতা মেনে নিয়েছে। কারণ এখানে জীবনের যৎসামান্য প্রমোদের মধ্যেও রয়েছে খেলা—সরোবর জলাশয়ে আর জলযান চালনায়। প্রমোদতরীর টুপি আর লম্বা নেকটাই দুলিয়ে তারা লেকের শেষ সীমা অবধি ছেয়ে ফেলে। মেয়েরা নাবিক-গেঞ্জি, জামা পরে, তাতে নীল আর গোলাপি নোঙরের ছাপ। ছোকরাদের ট্রাউজার নিচের দিকে ঢোলা,

আর হাতগুলোতে বহু-চালিত দাঁড়ের সগর্ব কড়া-পড়ার নিশানা। জেলে মেছোরা বুঁদ হয়ে থাকে গভীর এক সহনশীল আনন্দে। পালতোলা নৌকো, দাঁড়-বাওয়া নৌকো, জলের ক্ষমাশীল নরম বুকে দাগ কেটে যায়। দুটো ক্ষুদে পর্যটন স্টীমার বোট বানানো হয়েছিল, তারাই মনোরম জলপথে আসা যাওয়া করে। ওকোচি দার্শনিক ভাব দেখিয়ে সোনার চামচ দিয়ে কচ্ছপের স্যুপ খাবার আশা ত্যাগ করেছে আর এখন ফিরে এসেছে তার নিয়মিত ভোজ্যবস্তুতে, খুব অখুশি মনে নয় অবশ্য—অলস পদ্ম আর ভুট্টার হালুয়া-ভাজাতে। আর নানা প্রতিশ্রুতির এই নিমজ্জমান পোত থেকেই বেরিয়ে এসেছে আমাদের জে. পিঙ্কনি ব্লুম, তার "নোটের তাড়া" আর উঠতি ভাগ্যের উজ্জ্বল হাসি মুখে নিয়ে।

বলাই বাহুল্য জে. পিঙ্কনি জর্জিয়ার মাটির সন্তান নয়। সে এসেছিল "উত্তর" নামক সেই কাটছাঁট করিৎকর্মা অঞ্চল থেকে। নিজেকে বলত "প্রোমোটার", আর ওর শত্রুরা ওর বর্ণনা দিত "অসাধু জোচ্চোর" বলে। ওকোচি নিয়েছিল এর মধ্য পন্থা—তার মতে সে একটা "ইয়াঙ্ক", তার একচুল ওপরেও নয়, নিচেও নয়।

লেক ধরে অনেকটা পেছিয়ে—শহরের আঠারো মাইল ওপরে—একটা 'জোচ্চুরি'-র সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল এই ফুর্তিবাজ, তেজি-বাজার সন্ধানীর চোখ। সেখানে অত্যন্ত খাড়াই জমির পাঁচশো একর জায়গা সে কিনে নিয়েছিল একর-প্রতি পঁয়তাল্লিশ সেন্ট দরে, ওটাকেই সে ছড়িয়ে সাজিয়ে নানা-ভাগে ভাগ করে দেখাল 'স্কাইল্যাণ্ড' নগরী হিসেবে—দক্ষিণের "সুইজারল্যাণ্ডে" এ যেন শহরের রাণী! রাস্তা-এভিন্যু জরিপ করা হল; নকশা হল সাধারণ-ব্যবহার্য পার্কের; কেন্দ্রীয় চত্বরের কোণগুলো বিশেষভাবে সংরক্ষিত থাকল রঙ্গালয়, বাণিজ্য দপ্তর, বক্তৃতামঞ্চ, বার, বিদ্যালয় আর "প্রদর্শনী হলের" জন্য। প্লটের জন্য দাম ধরা হল পাঁচ থেকে পাঁচশো ডলার অবধি। কোনোক্রমেই কোনো প্লটের দাম পাঁচশো ডলারের ওপরে হবে না।

ওকোচির বাজার যখন তুঙ্গে উঠছে তখন জে. পিঙ্কনির ইস্তেহার, মানচিত্র আর বিবরণীপত্র ডাক মারফত যেন উড়ে যাচ্ছে দেশের কোণে-কোণে। নিয়োগকারীরা তাদের টাকা পাঠাচ্ছেন ডাকে, আর 'স্কাইল্যাণ্ড রিয়েল এস্টেট কোং (জে. পিঙ্কনি ব্লুম)' প্রত্যেককে ফেরত ডাকে পাঠাচ্ছে একটা করে দলিল, যথাযথভাবে রেকর্ডভুক্ত এবং সেরা জমির স্বত্ব দান করে—প্রতিদিনের প্রাপ্য দরে। এই গোটা সময়টিতেই কিন্তু 'স্কাইল্যাণ্ড বাণিজ্য দপ্তরের' নির্বাচিত জমির ওপর বনবেড়াল কর্কশকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে, প্রদর্শনী-হলের জায়গার ওপর লেজ লট্‌কে দুলছে অপোসাম, আর রঙ্গশালার শ্রোতা ছোকরা কাঠবেরালিদের ডেকে ডেকে করুণ আবৃত্তি শুনিয়ে যাচ্ছে পেঁচারা। পরে যখন দ্রুত টাকা আসতে শুরু করে, তখন পিঙ্কনি তাড়াতাড়ি হবু নগরীতে খাড়া করে আধ ডজন শস্তা কাঠের বাক্সবাড়ি, আর বুঝিয়ে শুঝিয়ে কিছু স্থানীয়

দেশি আদমিকে ওগুলোতে বসিয়ে দেয়—তারাই ভূমিকা নেয় পরবর্তী প্রচারপত্রে "শহুরেবাসীর"। অতএব আরো লোভনীয়, আরো লাভজনক হয় ব্যাপারটা।

তাই, স্বপ্ন যখন মিলিয়ে গেল, আর ওকোচি খাবি খেতে লাগল ঝঞ্ঝাট আর সম্পত্তিকর আড়াই শতাংশের হিসেব নিয়ে, সেই সময় জে. পিঙ্কনি ব্লুম তার বাহান্ন ইঞ্চি কোমরে বাঁধল নরম চামড়ার বেল্ট্, তার মধ্যে আট হাজার ডলারের বড় নোট—বলল সব সাচ্চা নোট (না, সে চেক্ বা ব্যাঙ্কারদের শীতল জেরা মোটেই পছন্দ করে না।)।

নতুন কোনো মুখরোচক এলাকায় সরে পড়ার আগে সে একটা শেষ দফা পাড়ি দিচ্ছিল স্কাইল্যাণ্ডস্-এর উদ্দেশে। স্কাইল্যাণ্ডসে এখন নিয়মিত ডাকঘর, আর চুক্তি অনুযায়ী স্টীমবোট 'ডিক্সি বেল' সেখানে হপ্তায় দু'দিন ডাকের থলি (বেশির ভাগই খালি) ডেলিভারি দিতে যায়। ওখানে একটা ছোট খাটো কাজ আছে নিষ্পত্তি করার—পোষ্টমাস্টারকে তার হাল্‌কা কিন্তু একাকী পরিষেবার জন্য কিছু প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হবে আর কড়ার অনুযায়ী "অধিবাসী"-দেরও একমাসের ঘরোয়া রেশন দিয়ে আসতে হবে। এর পর আর স্কাইল্যান্ডস্ কোনো পাত্তাই পাবে না পিঙ্কনির। এইসব বিপজ্জনক খাড়া, অকেজো অনুর্বর জমির মালিকরা হয়তো আসবে, স্বচক্ষে দেখবে তাদের ন্যস্ত বিশ্বাসের বস্তুটি, আর তখন হয়তো ছেড়ে যাবে তাদের যোগ্য ভাড়াটে বুনো শুয়োর, গাছাপাতা মুড়োনো ধেড়ে ইঁদুরের হাতে। মোট কথা, 'স্কাইল্যাণ্ড রিয়েল এস্টেট কোম্পানির' কাজ শেষ।

ছোট স্টীমবোট 'ডিক্সি বেল্' তার নিয়মিত হ্রদের উৎরাই যাত্রার জন্য তৈরি। এমন সময় একটা প্যাঁকাটি চেহারার ভাড়া-ঘোড়ার-গাড়ি খড়বড় করে এসে দাঁড়ায় জেটির কাছে। কালো পোশাকপরা একজন দীর্ঘকায় বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন, ভদ্র অথচ সতেজভঙ্গিতে বোটকে ইশারা করেন সবুর করতে। 'ডিক্সি বেল্'-এর কাছে অবশ্য সময়ের গুরুত্বই নেই বলতে গেলে। ক্যাপ্টেন ম্যাকফারল্যাণ্ড হুকুম দেয়, যেন আর দুজন শেষ যাত্রীকে তুলে নেয় জাহাজ। দুজন, কারণ দীর্ঘকায় বয়স্ক ভদ্রলোকের বাহুতে ভর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন একটি ছোটখাটো বয়স্কা মহিলাও। বাঁ কানের ওপর থেকে সামান্য ক'গাছি ধূসর কোঁকড়া চুল ঝুলে রয়েছে তাঁর।

ক্যাপ্টেন ম্যাকফারল্যাণ্ড হালের চাকা নিয়ে ব্যস্ত, তাই অন্য একমাত্র যাত্রী হিসেবে পিঙ্কনি ব্লুমের মনে হল তাকেই হয়তো বোটের নতুন অতিথিদের আপ্যায়নে ভূমিকা নিতে হবে। সন্দেহ নেই ওরা দৃশ্য-দর্শনের পর্যটনেই বেরিয়েছে। তাজা গোলাপি মুখে স্বচ্ছ, শিশুর হাসি নিয়ে ব্লুম এগিয়ে যায়। অকপট আন্তরিকতার সেই মেজাজটা রাখে যা কোনোরকম ধোঁকাবাজি থেকে মুক্ত, একমাত্র নিখুঁত হিসেবের গুণে। ওর আদবকেতার মধ্যে সেই চটজলদি মোক্ষম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা—নিজের পেশার সঙ্গে তা খুবই খাপ খেয়ে যায়। এইসব মানসিক পণ্যসম্ভার

সামনে রেখেই সে এগিয়ে গেল কর্নেল এবং মিসেস ব্লেলক্‌কে স্বাগত জানাতে। সেনাপতি কিংবা বিবাহ আসরের কর্তার মতো অনায়াস শোভনতায় দুজন যাত্রীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ওপরের ডেকে। সেখান থেকেই দর্শকের কাছে নিসর্গদৃশ্যটা দেখাবে ভরপুর, মনোমুগ্ধকর। সেখানে আরামদায়ক ডেক-চেয়ারে বসলেন তাঁরা, জুড়তে লাগলেন এলোমেলো পংক্তিগুলো যা পরে এক সুবোধ্য অনুচ্ছেদের রূপ নেবে ছোট-ছোট ঘটনার এক বড় ইতিহাসের মধ্যে।

কর্নেল ব্লেলক্ তাঁর চওড়া-কানাত, কিছুটা আকারহীন, কালো ফেল্টের টুপি সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমাদের দেশ হল মশাই হলি-স্প্রিংসে, মানে জর্জিয়ার হলি-স্প্রিংস্। আপনার পরিচয় পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি, মিঃ ব্লুম। মিসেস ব্লেলক্ আর আমি সবে আজ সকালে ওকোচিতে পৌঁচেছি, কাজের সূত্রে। আমাদের রাজ্যের এ-অংশটায় ইদানিং যে দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তার সঙ্গেই যুক্ত একটা জরুরি কাজ।'

কর্নেল ঝাঁ করে হাত দিয়ে পরিপাটি করে নিলেন লম্বা মসৃণ পাকা চুলগুলো। তাঁর কালো চোখজোড়া মোটা-কালো-ভুরুর নিচে এখনো জ্বলে,—একজন ব্যবসায়ীর মুখে সে-চোখ যেন মানানসই মনে হয় না। তাঁকে বরং চার্লসের রাজত্বের আমল থেকে বংশ পরম্পরায় আসা কোনো বুড়ো অমাত্যর মতোই দেখায়, শুধু হাল আমলের স্যুট্‌টা নতুন করে পরা, সুন্দর, তবে সুতো-খোলা জীর্ণ-সেলাই, মোটা পশমি বনাতের।

'হ্যাঁ স্যর',— পুরো দিলখোলা প্রচারপত্রিকার সুরে মিঃ ব্লুম বলল, 'ওকোচিকে ঘিরে যেন ঘূর্ণি উঠেছে। বৃহত্তম শিল্প জাগরণ, জর্জিয়ার এই প্রথম প্রাকৃতিক উৎস নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠা। আপনি কি কষ্টেসৃষ্টে একটু জায়গা করে নিতে পেরেছেন ওই সোনামোড়ো স্বপ্নসৌধের মধ্যে, কর্নেল?'

কর্নেল বিনীত সন্দেহের মধ্যে ইতস্তত করে বললেন, 'আজ্ঞে স্যর, আপনার প্রশ্নটা যদি বুঝে থাকি তাহলে বলতে পারি একটা বিনিয়োগের সুযোগ নিয়েছিলাম, যেটা আমার বিশ্বাস, বেশ লাভজনকই প্রমাণিত হবে—হ্যাঁ স্যর, আমার তো ধারণা এতে আর্থিক লাভ আর স্বচ্ছন্দ বসবাস, দুটোই হবে।'

খর্বকায়া বয়স্কা মহিলাটি এবার ধূসর কোঁকড়া চুল নেড়ে, প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে পিক্কনি ব্লুমকে বোঝালেন, 'কর্নেল ব্লেলক্ ব্যবসা নিয়ে এমন মাথা ঘামান, ওতেই ডুবে আছেন। টাকা খাটানো, বাজারের হাল, বিনিয়োগ আর ওই সব ব্যাপারে তাঁর মগজও খেলে কত! আমি তো তাঁকে জীবনের পথে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে নিজেকে দারুণ ভাগ্যবতী মনে করি। আমি আবার শিক্ষার ওই দুরূহ অথচ অত্যন্ত জরুরি ব্যাপারগুলোতে একেবারেই আনাড়ি কিনা।'

কর্নেল ব্লেলক্ উঠে দাঁড়িয়ে 'বাও' করলেন—এমন শির ঝোঁকানো শুধু সিল্কের মোজা, লেসের কুঁচি আর মখমলের সঙ্গেই খাপ খায়।

প্রোমোটারের দিকে একবার হাতটা দুলিয়ে তিনি বললেন, 'যদি তুলনাই করতে হয় তবে বলব, দৈনন্দিন কাজের বাস্তব বিষয়গুলো আমাদের জীবনের চলবার পথে বাগিচায়-হাঁটার সমতুল্য—শুধু দু'ধারে দেখে যান সেই পথ উজ্জ্বল-করা ফুলগুলো। আমার আনন্দ শুধু একটা-দুটো ওইরকম পথের নক্শা করে দিতে পেরে। মিসেস ব্লেলক্ হলেন্ স্যর, সেই ভাগ্যবান্ উচ্চস্তরের মানুষ যাদের জীবনের ব্রত ফুলগুলোকে বাড়িয়ে তোলা। আপনি হয়তো পড়েছেন, মিঃ ব্লুম, দক্ষিণী মহিলাকবি "লোরেল্লার" সেই লাইনগুলো? ওই নামেই তো মিসেস ব্লেলক্ বহু বছর ধরে দক্ষিণের পত্রিকাগুলোতে লিখেছেন।'

মি. ব্লুমের অকপট মুখমণ্ডলে পরিষ্কার না-বুঝতে পারার ছাপ ফুটে উঠেছে। বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কর্নেলেরই মতো—আছি পথ-বানাবার ব্যবস্থাতেই—কখনো তাই সময় পাইনি, এমনকি ফুলও শুঁকে দেখার। কবিতার লাইনে তো কখনোই কিছু ভাবিনি। তবু তা নিশ্চয়ই চমৎকার হবে—অতি চমৎকার।'

মিসেস ব্লেলক্ হাসলেন—'আমার হৃদয় বাসা বেঁধে আছে নিজের অঞ্চল ভূমিতে।...পিটন, আমার শালখানা দেবে দয়া করে? দূরের সবুজ পাহাড় থেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।'

কর্নেল তাঁর কোটের প্রান্তের পকেট থেকে একটা ছোট বোনা-রেশমের শাল বের করে সযত্নে মহিলার কাঁধে জড়িয়ে দেন। মিসেস্ ব্লেলক্ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর ভাবব্যঞ্জক চোখদুটো ফেরান—এখনো সে চোখ শিশুর মতো নির্মল, যেন অন্য পৃথিবীর। চোখ ফেরান ধীরে সরে-যাওয়া উঁচু পাহাড়ি ঢালের দিকে।

অনাবিল প্রভাতী হাওয়ায় পাহাড়গুলোকে খুব স্পষ্ট আর মহিমময় দেখায়। ওরা লোরেল্লার সাড়া-পাওয়া আত্মার সঙ্গে যেন পরিচিত ভাষায় আলাপ করে। স্বঘোরে উনি বিড়বিড় করে বলেন—'আমার দেশের পাহাড়! দেখ গাছের পাতা কেমন সূর্য পান করছে নিচু খাত আর কন্দর থেকে।'

ওঁর মনের ভাব পিঙ্কনি ব্লুমের কাছে ব্যাখ্যা করে কর্নেল বলেন, 'মিসেস্ ব্লেলকের কুমারী জীবন কেটেছিল উত্তর জর্জিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে! তাই পাহাড়ের হাওয়া আর পাহাড়ের দৃশ্য ওঁর মনে ফিরিয়ে আনে সেই দিনগুলো। হলি স্প্রিংস্, যেখানে আমরা কুড়ি বছর ধরে বাস করছি, সেটা হল নিচু আর সমতল ভূমি। এত দীর্ঘদিন সেখানে থেকে ওঁর স্বাস্থ্য আর মনের তেজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই আমার আশঙ্কা। আমরা বায়ুপরিবর্তনে বেরিয়েছি, তার একটা বিশেষ কারণও তাই। মাইডিয়ার, তোমার লেখা সেই লাইনগুলো মনে পড়ে না—"জর্জিয়ার পাহাড়" নাম ছিল যে কবিতাটার? দক্ষিণের পত্র-পত্রিকাগুলো ব্যাপকভাবে ছেপেছিল সেই কবিতা, আটলান্টার সমালোচকরা তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল!'

অভিব্যক্ত প্রীতির দৃষ্টিতে মিসেস ব্লেলক্ চোখ ফেরালেন কর্নেলের দিকে। বুকের ওপর নেমে-আসা রুপালি কোঁকড়া চুলে এক মুহূর্ত আঙুল ছুঁয়ে আবার

তাকালেন পাহাড়গুলোর দিকে। কোনো ভূমিকা বা ভনিতা বা দ্বিধা না করেই বেশ শিহরণ জাগানো গাঢ় স্বরে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন:

"জর্জিয়ার সেই পাহাড়!—
কেন উতলা হলে মন?
মাঠ, ফুল আর দ্রাক্ষাকুঞ্জে ছাওয়া
এ নিভৃত সমতল—বুঝি হয়নি মনের মতন?
"আহা, এখানে যে মন্থরগতি নদী
সে যেন জঠরেই পাক খেয়ে-খেয়ে মরে!
আর আমার আকুল হিয়া,
ফিরে পেতে চায় সেই জর্জিয়া গিরি।
"ঘন যবনিকা রাত্রি
গুঁড়ি মেরে চলি ঘুমের অলস পাখায়—
ফিরে যাই মোর মনের আরামে, ঢালু পাইনের বনে,
সেখানেই মোর যাত্রা হয় যে সাঙ্গ।
আকাশ—সে তো ওদেরই মাথার কাছে,
মাটির হাহাকার থেকে দূরে, সে অনেক দূরে।
একবার শুধু স্বপ্নে হলেও
দেখতে চাই যে সেই পাহাড়েরই স্বপ্ন।
"বাগিচার ধারে তৃণের শয্যা
সেই তো আমার কামনার আশ্রয়;
ছোট পাখিদের মিলিত কাকলি সেথা
ভুলিয়ে দেবে যে চারণকবির গানও।
"যে-দিন নামবে মহা-ছেদকের হাত
সেদিনও কিন্তু ত্রস্ত হব না।
তিনি এসে মোর হাতটি ধারণ করে
নিয়ে যে যাবেন—পাহাড় জর্জিয়ায়!"

জে পিঙ্কনি ব্লুম সোৎসাহে বললে, 'এতো দারুণ জিনিস, মা'ম্! কবিতা যেটুকু পড়েছি, তার চেয়ে আরো বেশি করে যদি পড়তাম! আমিও তো মানুষ হয়েছি পাইনের পাহাড়েই।'

মিসেস ব্লেলক্ মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'পাহাড় চিরকালই তার সন্তানদের ডাকে। আমার মনে হয়, এই সুন্দর পাহাড়গুলোতে জীবন আবার আশার গোলাপি রং নিয়ে ফিরবে।... পিটন্—একটু যদি কষ্ট কর, কিউর‍্যান্ট ওয়াইনটা একটু চেখে দেখব। এই ভ্রমণ, যদিও খুবই আনন্দের, তবু একটু অবসন্নও করেছে আমায়।'

কর্নেল ব্লেলক্ আবার তাঁর প্রাচুর্যের ঝুলি সেই কোটে হাত ঢোকালেন, বের

করে নিলেন একটা শক্ত কাঁক-দেওয়া যেমন-তেমন দেখতে কালো বোতল। মিঃ ব্লুম সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল—'আমি একটা গ্লাস এনে দিই মা'ম্। কর্নেল, আপনি সঙ্গে আসুন তো, একটা ছোট টেবিলও দুজনে নিলে আনতে পারি। আর কিছু ফল, আর এক কাপ চা। দাঁড়ান ম্যাক্‌কে বলছি।'

মিসেস্ ব্লেলক্ আয়েশ করে হেলান দিয়ে শুলেন। দক্ষিণী মহিলাদের প্রশান্ত সৌষ্ঠব নিয়ে কিছু উঁচু ঘরানার নারী এখনো বজায় রেখেছেন তাঁদের রাজকীয় বিশেষাধিকার। কর্নেল তাঁর প্রেমপর্বের দিনগুলোর মতোই সুসভ্য আর যত্নবান্ মেজাজে, আর পিঙ্কনি ব্লুম তার আধা-পেশাগত, আধা পুনর্জাগরিত কোনো অনামা, দীর্ঘবিস্মৃত ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে, বেশ একটা বিচিত্র অথচ মনোযোগী রাজদরবার গড়ে তুলেছেন। হলিস্প্রিংসের ফলপাকড় থেকে ঘরে-তৈরি কিউর‍্যান্ট সুরা হাতে হাতে বিলি হয়। তারপর জে. পিঙ্কনি শুনতে থাকে হলি-স্প্রিংসের জীবনযাত্রা নিয়ে কিছু কথা।

ব্লেলক্‌দের কথাবার্তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় স্প্রিংসের অবস্থা এখন তথৈবচ। এক-তৃতীয়াংশ বাসিন্দা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ব্যবসাবাণিজ্য নেমে এসেছে শূন্যে—কর্নেল তো ব্যবসা ব্যাপারে সুপণ্ডিত, তিনি পুঁজি খাটাবার সমস্ত রকম ক্ষেত্র সতর্কভাবে যাচাই করে অবশেষে তাঁর সামান্য সম্পত্তি আটশো ডলারে বেচে দিয়েছেন, আর সেটা নিয়োগ করেছেন ওকোচির খাতা অনুযায়ী কোনো নব উন্মুক্ত উদ্যোগে।

মিঃ ব্লুম বলল, 'জিজ্ঞেস করতে পারি কি স্যর, ব্যবসার কোন্ বিশেষ লাইনে আপনি ঢোকালেন মুদ্রাটা? আমি ও-শহরটাকে যেমন ভাল করে জানি, ডাক বিভাগের বেআইনি ব্যবহারের নিয়মকানুনগুলোও জানি। আমি হয়তো আপনাকে আন্দাজ দিতে পারতাম, ওদের খেলাটা চালিয়ে যেতে দিতে পারবেন কি না।'

জে. পিঙ্কনির কেমন যেন একটা দয়ার্দ্র অনুভূতি এসে গিয়েছিল অতীত দিনের এই অকপট-বিশ্বাসী দুই প্রতিনিধির ওপর। ওঁরা এত সরল, বাস্তববুদ্ধিহীন, আর নিঃসন্দিগ্ধ! ভাগ্যিস তার কাছে কোনো সোনার ইট নেই; সঙ্গে কুখ্যাত পশ্চিমী "ব্যাড বয় রৌপ্য খনির" স্টক-বইও নেই। যে-মানুষগুলোকে তার এমন ভাল লেগে গেছে তাদের ওপর এসব চাপানো তার পছন্দ হত না ঠিকই; তবে কিছু প্রলোভন আছে যা আকর্ষণীয় হলেও রুখতে হয়।

একটু থেমে রাণীর শালটা গুছিয়ে দিলেন কর্নেল ব্লেলক্। বললেন, 'না স্যর, ওকোচিতে কোনো টাকা নিয়োগ করিনি। বাণিজ্যের অবস্থা বেশ খুঁটিয়েই লক্ষ্য করলাম তো, আমার ধারণা পুরনো স্থায়ী শহরগুলো উপযুক্ত বিনিয়োগ ক্ষেত্র নয়, বিশেষ করে পুঁজি যেখানে সীমাবদ্ধ। কয়েক মাস আগে এক বন্ধুর দয়ায় হাতে এসেছিল একটা মানচিত্র আর বিবরণ, এই নতুন শহর স্কাইল্যাণ্ডের—যেটা হ্রদের ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। বর্ণনাটা এত মুগ্ধকর, এমন সুযুক্তি দিয়ে শহরটার

ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে, আর এমন আকর্ষণীয় কায়দায় এর ক্রমোন্নতির ছবি দেখানো হয়েছে যে আমি এতে প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করব বলেই সিদ্ধান্ত করলাম। আমি অতি সযত্নে প্রস্তাবিত বাণিজ্য এলাকার কেন্দ্রের একটি প্লট বেছে নিয়েছি, যদিও তালিকা অনুযায়ী সেটার দামই ছিল সর্বোচ্চ—পাঁচশো ডলার—অবিলম্বেই কিনে ফেললাম জায়গাটা।'

'আপনিই কি সেই লোক... মানে বলছি স্কাইল্যাণ্ডের একটা জমির জন্য পাঁচশো ডলার দিয়েছেন আপনি ?'—জিজ্ঞেস করল পিঙ্কনি ব্লুম।

একজন সাদাসিধে লক্ষপতি যেভাবে তার সাফল্যের ব্যাখ্যা করেন সেই সুরে জবাব দিলেন কর্নেল, 'তা তো দিয়েছি স্যর! জমিটা খুব চমৎকার জায়গায়—একই চত্বরে রয়েছে রঙ্গশালা; আর বাণিজ্যদপ্তর থেকে মাত্র দুচত্বর ছাড়িয়েই। মনে হয় যেন দৈবক্রমেই ঘটে গেল কেনার ব্যাপারটা। আমার ইচ্ছে, দেরি না করে এখুনি একটা ছোট বাড়ি তুলে ফেলব, আর খুলব একটা ছোট খাটো বই-আর স্টেশনারির দোকান। অতীত বছরগুলোতে নানা আর্থিক দুর্ভোগেই তো ভুগলাম, এখন মনে করি এমন একটা ব্যবসা নিয়ে বসি যা আমার দু'বেলার আহার অন্তত দেবে। বই আর মনোহারির ব্যবসাটা ছাপোষা হলেও আমার পক্ষে একেবারে বেমানান বা অসুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না। আমি ভার্জিনিয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ের স্নাতক; আর মিসেস ব্লেলকের রস-রচনা ও কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে অদ্ভুত পরিচয়, আমাদের সাফল্যের পথে অনেক দূর অবধি পৌঁছে দিতে পারে। অবশ্য মিসেস্ ব্লেলক্ স্বয়ং কাউন্টারের পেছনে বসে কাজ করবেন না। আমার হাতে এখনো যা তিনশো ডলার মতো রয়েছে তাতে বাড়িটা বানিয়ে নিতে পারি, জমিটাকে বন্ধকী শর্তে রেখে। আটলান্টায় আমার এক বন্ধু আছেন, একটা বড় কেতাব দোকানের অংশমালিক, তিনি রাজি হয়েছেন অত্যন্ত সহজ কিস্তিতে আমাকে ধারে মালের স্টক দিতে। তাই আমার আশা করতে বাধা নেই স্যর, মিসেস্ ব্লেলকের স্বাস্থ্য ও সুখ হাওয়া-বদলের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যাবে। আমি তো এখনই কল্পনায় দেখতে পাই জর্জিয়ার বীরদের সেই আশা-নিরাশার গোলাপ ফুলগুলো আবার ফিরে আসছে।'

এরপর আবার সেই আশ্চর্য ঝুঁকে-পড়ে কুর্নিশ। কর্নেল আলতো করে ছুঁলেন কবির পাংশু গণ্ডদেশ। বালিকার মতো লজ্জারুণ হয়ে মিসেস ব্লেলক্ কোঁকড়া চুল ঝাঁকালেন, আর কর্নেলকে দিলেন বঙ্কিম তিরস্কারের মৃদু খোঁচা। চিরকালীন যৌবনের রহস্য—তুমি কোথা? প্রতি পলেই জবাব আসে—"এখানে, এখানে।" নিজের বুকের স্পন্দন কান পেতে শোনো, হে পরিশ্রান্ত বহিরঙ্গ-জাদুর সন্ধানী!

মিসেস্ ব্লেলক্ বললেন, 'হলি স্প্রিংসের সেই বছরগুলো ছিল যেন কত দীর্ঘ, ফুরোতেই চাইত না। কিন্তু এখন তো প্রতীক্ষিত দেশ চোখের সামনে—স্কাইল্যাণ্ড! বড় চমৎকার নামটি।'

'কর্নেল বললেন, 'নিঃসন্দেহে মোটামুটি ভাড়ায় কোনো মাঝারি হোটেলে আরামদায়ক থাকার জায়গা পেয়ে যাব। আমাদের ট্রাঙ্ক-বাক্স রয়ে গেল ওকোচিতে, নিজেদের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেলে ওগুলো আনিয়ে নেব।'

পিঙ্কনি ব্লুম একটু রেহাই চেয়ে এগিয়ে গেল, দাঁড়াল হালের চাকা নিয়ে ব্যস্ত ক্যাপ্টেনের কাছে। বলল, 'ম্যাক, তোমার মনে আছে একবার বলেছিলাম স্কাইল্যাণ্ডের জমির একটা পাঁচশো-ডলার প্লট বেচে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে,' দাঁত বের করে জবাব দিল ক্যাপ্টেন ম্যাকফারল্যাণ্ড।

'দেখ, সাধারণভাবে আমি ভিতু মানুষ নই', বলে চলল প্রেমোটার—'কিন্তু বরাবরই বলতাম ওই জমিটা যে হাঁদা-লোকটা কিনেছে তার কখনো সাক্ষাৎ পেলেই আমি টার্কি-মোরগের মতো ছুটে পালাব। এখন, ওই পথ-হারানো বুড়ো আনাড়িটাকে দেখছ ওখানে? ওই সেই বান্দা যে পুরস্কারের টিকিটটা কেটেছিল। ওই একটাই পাঁচশো ডলারের প্লট এ-পর্যন্ত বিকিয়েছে। বাকি সব দশ থেকে দুশো ডলারের সারিতে। ওর গিন্নি কবিতা লেখে, জর্জিয়ার টিলাগুলো নিয়ে একটা পদ্য লিখেছিল যেটা জর্জিয়ায় খুব নাম করেছে। ওরা স্কাইল্যণ্ডে যাচ্ছে একটা বইয়ের দোকান খুলতে।'

ম্যাকফারল্যাণ্ড আরেকবার দাঁত বের করে বলল, 'বেশ, এ তো তোমার পক্ষে ভালই হল হে জে.পি.। এখন ওদের শহর ঘুরে দেখাতে পার, যতক্ষণ-না ওরা নিজেদের ঘরের আরাম খুঁজে পেতে শুরু করে!'

'ওর কাছে তিনশো ডলার আরো আছে, তা দিয়ে বাড়ি আর একটা দোকান বানাবে।' যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে থাকে পিঙ্কনি, 'আর তার ধারণা ওখানে একট রঙ্গালয়ও আছে।'

ক্যাপ্টেন ম্যাকফারল্যাণ্ড বেশ খানিকক্ষণ চাকা থেকে হাত তুলে নিয়েছে, এবার একটা শয়তানি চাপড় মারল নিজের পায়ে।

চোখ টিপে তারিফের সুরে বলল, 'মোটা বুড়ো বদমাশ!'

শীতলকণ্ঠে পিঙ্কনি বলল, 'ম্যাক, তুমি একটা গাধা।' সে ফিরে ব্লেলক্‌দের দলে যোগ দিল। বসল বটে কথা বলল খুব কম। যখনই মনে-মনে কোনো মতলব ভাঁজে তার চিহ্ন হিসেবে পরিষ্কার ঘোঁচ জেগে ওঠে ওর দু'ভুরুর মাঝখানে, এবারও তাই।

বলে উঠল খানিক বাদেই, 'এই সব হঠাৎ তেজি বাজারের সঙ্গে যথেষ্ট ধোঁকা-জোচ্চুরি জড়িত থাকে। ধরুন এই স্কাইল্যাণ্ড যদি সেরকম একটা হয়ে দাঁড়ায়—মানে ধরুন ব্যবসা যদি সেখানে ঝিমিয়ে থাকে, জমিস্বত্ব বেচার তেমন হিড়িক না থাকে?'

স্ত্রীর চেয়ারের পিঠে হাত রেখে কর্নেল ব্লেলক্ বলেন, 'দেখুন ডিয়ার স্যর, তিন-তিনবার আমি অন্য লোকের ধোঁকায় পড়ে দাবিদ্র্যের চরমে পৌঁছেছিলাম,

কিন্তু তবু এখন অবধি আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারাইনি। যদি আবার ঠকেও থাকি, তবু আমরা স্বাস্থ্য আর তৃপ্তির ফসলটুকু তো তুলেই নেব, জাগতিক লাভ হয়তো থাকবে না। পৃথিবীতে প্রতারক মতলবী অনেক আছে আমি জানি, যারা অসাবধান মানুষকে ফাঁদে ফেলতে চায়, কিন্তু তারাও যে একেবারে খারাপ, তা তো নয়।... ডিয়ার, তোমার মনে পড়ে সেই পংক্তিগুলো "তিনিই এগিয়ে দেন"? যেটা তুমি হলি-স্প্রিংসে আমাদের চার্চের সঙ্গীতের জন্য লিখে দিয়েছিলে?'

মিসেস্ ব্লেলক্ বললেন, 'সে তো চার বছর আগের কথা। হয়তো দু-একটা পংক্তি আবার বলতে পারি।

"পুরনো পাঁকেই ফুটে ওঠে লিলি,
গভীর সাগর শৈবালে জাগে মুক্তো,
এখন যা আছে সেথায় সুপ্ত, মঙ্গলময়
সে সবই দেবেন আপনি, যথাসময়।

"অবশেষে সেই কঠিন বুকেও
আসে মায়াভরা স্নেহ,
আশিসের মতো তিনিই এগিয়ে দেন
কারো দুর্দিনে হতে সহায়
কারো মুখে দিতে হাসি।"

'বাকি আমার মনে পড়ছে না। ও কবিতায় কিছু বড় কথা নেই। একজন প্রিয় বন্ধু গানের সুর দেবেন বলে লেখা হয়েছিল।'

'তা যাই বলুন পদ্যটা বেশ ভাল', মিঃ ব্লুম বলে ফেলেন, 'কোথাও যেন একটা ঘা দেয় ঠিকই। আন্দাজ করি ওটার বক্তব্য আমি বুঝে নিয়েছি। বলতে চাইছে অতি গভীর-জলের ফেরেববাজও কোনো- না-কোনো সময় আপনাকে সেরা জিনিসটাই দেবে।'

মিঃ ব্লুম চিন্তিতভাবে আবার সরে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে, দাঁড়িয়ে কিছু গভীরভাবে ভাবতে লাগল।

আনন্দে অধীর হয়ে ম্যাকফারল্যাণ্ড কিচমিচিয়ে উঠল—'এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চয় দেখবে স্কাইল্যাণ্ডের উঁচু চুড়ো আর সোনালি গম্বুজের ছবি!'

'গোল্লায় যাও তুমি', বলল ব্লুম। এখনো চিন্তাবিষণ্ণ সে।

এবার বাঁদিকের পাড়ে, ওদের চোখে ঝলক দিয়ে উঠেছে একটা সাদা গ্রাম, পাহাড়ের সেই মাথায় একেবারে, সবুজ গাছের আড়ালে যেন চাপা পড়া। ওটা হল 'কোল্‌ড্ ব্রাঞ্চ'— কোনো আচমকা উঠতি শহর নয়, তবে বহু বছর ধরে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠা। আঙুরখেত আর ফসলি মাঠের কিনারায় কোল্‌ড্ ব্রাঞ্চের অস্তিত্ব। জেলার চওড়া সরকারী রাস্তাটা ওই পাহাড়ের ঠিক পেছন দিয়েই গেছে।

ওকোচির স্পর্ধিত সরোবরের চঞ্চল উচ্চাশার সঙ্গে কোনো সমগুণের মিলই নেই কোল্‌ড্‌ ব্রাঞ্চের।

জে. পিঙ্কনি হঠাৎ বলে উঠল, 'ম্যাক! আমি চাই তুমি কোলড্‌ ব্রাঞ্চে বোট রোখো। যখন নদী উঁচুতে ছিল ওরা সে সময় একটা ঘাটের পথ ব্যবহার করত, সেটা ওখানে আছে।'

আরও চওড়া হাসি দিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, 'সেটা পারব না। আমার জাহাজে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ডাক আছে। ঠিক আজকেই বোটখানা সরকারের কাজে মোতায়েন আছে। তুমি চাও স্যাম-চাচা বেচারি বুড়ো ক্যাপ্টেনকে জাহাজের তলা থেকে টেনে বের করে ফেলে দিক? আর এই সময় অত বড় শহর স্কাইল্যাণ্ড ডাকের জন্য হা-হুতাশ করছে? আমি তোমার বাড়াবাড়ি দেখে শরম বোধ করছি, জে.পি।'

প্রায় যেন ফিসফিস করে বলল জে. পিঙ্কনি—এটা তার শাসানির কণ্ঠ: 'ম্যাক, একটু আগেই "ডিক্সি-বেল"-এর ইঞ্জিন-ঘরটা দেখে নিয়েছি। একটা নতুন বয়লার চায় এমন লোকের খোঁজ রাখো নাকি তুমি? সিমেন্ট, ব্ল্যাক-জাপানের খুঁত আমার চোখে লুকোনো যায় না। তা ছাড়া ওই বিল্ডিংয়ের শেয়ার, ঋণ যেগুলো মেরামতির নামে চালিয়েছ—সেসব তো তোমারই ছিল নিশ্চয়। এসব বিষয় উল্লেখ করতে আমার ঘেন্না হয়, তবু—'

'ওঃ ছাড়ান দাও তো জে.পি,' বললে ক্যাপ্টেন, 'তুমি জানো আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমি তোমায় কোল্‌ড্‌ ব্রাঞ্চে নামিয়ে দেব, তাই যদি বল।'

মিঃ ব্লুম বলল, 'অন্য যাত্রীরাও সেখানেই নামছে কিন্তু।'

আরেকটুক্ষণ কথাবার্তা চলল, তারপর দশ মিনিটের মধ্যে "ডিক্সি বেল" নাক ঘোরাল বাঁ তীরের একটা ছোট, কাঠের মচ্‌মচে জেটির দিকে। ক্যাপ্টেন হালের চাকা কোনো খালাসির হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে এল যাত্রী-ডেকে, তারপর একটা গা-চমকানো ঘোষণা করল: 'সবাই নেমে পড়ুন স্কাইল্যাণ্ডে!'

ব্লেলক্‌-দম্পতি আর জে. পিঙ্কনি ব্লুম জাহাজ থেকে নামলেন, "ডিক্সি-বেলও" লেক ধরে তার নিজের পথে চলে গেল। অক্লান্তশ্রমী প্রোমোটারের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁরা ধীরে ধীরে উঠলেন খাড়া পাহাড়ের ঢাল ধরে। মাঝে মাঝে শুধু জিরিয়ে নিচ্ছেন আর চারদিকের দৃশ্যের তারিফ করছেন। অবশেষে ঢুকলেন তাঁরা কোল্‌ড ব্রাঞ্চ পল্লীতে। মিঃ ব্লুম তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা ছায়াঘেরা রাস্তায় দোতলা বাড়ির সামনে—লেখা রয়েছে "প্রিন্সটপ্‌ সরাইখানা"। এখানেই সে বিদায় চাইল, দু'জনের আন্তরিক ধন্যবাদও পেল তার ঘনিষ্ঠ মনোযোগের জন্য। কর্নেল মন্তব্য করলেন, তাঁর ধারনায় বাকি দিনটুকু তিনি বিশ্রামেই কাটাবেন এবং পরদিন দেখবেন তাঁর নতুন-কেনা জায়গাটা।

কোল্‌ড্‌ ব্রাঞ্চের সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটে জে. পিঙ্কনি ব্লুম। এ শহরটা তার জানা নেই, তবে শহরগুলো তো চেনেই, তাই পায়ের চলাতে কোনো ভুল হয়নি।

একটু বাদেই দেখে কোনো দরজার ওপর সাইন বোর্ড: "ফ্র্যাঙ্ক ই. কুলী, আইনজ্ঞ অ্যাটর্নি ও নোটারি পাবলিক।" মিঃ কুলী একজন যুবক ব্যক্তি, খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ফুর্তিবাজ ঢঙে মিঃ ব্লুম বলে, 'আপনার টুপিটা তুলে নিন্ ভাই, আর একটা ফাঁকা দলিল-কাগজ। চলে আসুন সঙ্গে। আপনার একটা কাজ রয়েছে ভাই।'

শশব্যস্ত মিঃ কুলী যথোচিত সাড়া দিতেই মিঃ ব্লুম বলল, 'এবার বলুন তো শহরে কোনো বইয়ের দোকান আছে?'

উকিল বলল, 'আছে একটা। হেনরী-উইলিয়মের।'

মিঃ ব্লুম বলল, 'আপনি চলুন সেখানে। ও দোকান আমরা কিনে ফেলব।'

হেনরী উইলিয়ম কাউন্টারের পেছনে বসে ছিলেন। দোকানটা তাঁর ছোট, নানা রকমের বই আছে, স্টেশনারি আর আজেবাজে ফ্যান্সি জিনিসও। দোকানের লাগোয়া হেনরীর বসতবাড়ি—একটা সুন্দর কটেজ-ঘর, দ্রাক্ষালতায় ছাওয়া, আরামদায়ক। হেনরী রোগাটে, ঘুমকাতুরে লোক, ব্যবসা নিয়ে তাড়াহুড়ো চায় না।

মিঃ ব্লুম বলল, 'আমি আপনার বাড়ি আর দোকান কিনতে চাই। বেশি দর কষাকষির সময় আমার নেই। আপনার দামটা বলুন।'

'আটশো তো হওয়া উচিত', বললেন হেনরী, আসল মূল্যের বেশি চেয়ে নিজেই হতচকিত হয়েছেন।

মিঃ ব্লুম উকিলকে বললে, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন তো।' এবার সে নিজের কোট, ভেতরকোট খুলে ফেলে শার্টের বোতামও খুলতে উদ্যত হল।

'আপনি কি এ নিয়ে লড়তে চান, অ্যাঁ?'—হেনরী বলতে বলতে লাফিয়ে ওঠেন, দু'বার পায়ের গোড়ালি একসঙ্গে ঠোকেন—'ঠিক আছে পালোয়ান, ভেতরে আসুন আর ওস্তাদের খেল্ দেখান।'

'আপনি আবার জামা খুলবেন না!'—বলে মিঃ ব্লুম, 'আমি একটু ব্যাংকে যাচ্ছি, এই মাত্র।'

বলে সে নিজের টাকা-ভরা বেল্ট্ থেকে আটখানা একশো-ডলার নোট বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল। মিঃ কুলী ওদিকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে গেছেন, তাই এর মধ্যেই সামনে ছড়িয়ে দিয়েছেন দলিলটা, হাত বাড়িয়েছেন কাউন্টারের ওপর কালির দোয়াতখানার দিকে। কোল্ড্ ব্রাঞ্চে এর আগে কখনো এমন তাড়াতাড়ি কাজ হয়নি।

উকিল বললেন, 'আপনার নামটা বলুন দয়া করে।'

মিঃ ব্লুম বললে, 'ওটা বানাবেন পিটন ব্লেলকের নামে। ভগবান্ জানেন কী বানান নামটার!'

তিরিশ মিনিটের মধ্যে হেনরী উইলিয়মের ব্যবসা খতম হল, মিঃ ব্লুম ইটের

'পাশ-পথটিতে দাঁড়াল মিঃ কুলীর সঙ্গে—তাঁর হাতে সই-করা প্রত্যয়িত দলিলখানা ধরা।

পিঙ্কনি ব্লুম বললে, 'পার্টিকে পাবেন পাইন-টপ সরাইখানায়। এটা রেকর্ড ভুক্ত করে নিন, তারপর নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিন। তিনি হাজারো প্রশ্ন করবেন আপনাকে; তাহলে এই নিন ওঁর প্রশ্নের জবাব দিতে না-পারার মুশকিলের জন্য আপনার দশ ডলার পুরস্কার। ইয়ং ম্যান, খুব একটা পদ্য-টদ্য পড়তেন না, তাই নয়?'

কুলী সত্যকার প্রতিভাবান্, এখনো মগজটা রেখেছেন স্থির—'তা, কখনো সখনো পড়ি।'

'ভাল করে পড়বেন, আখেরে লাভ হবে। এরকম কোনো কবিতা কখনো পড়েননি বোধহয়, পড়েছেন?—

'আঁধার থেকেও জেগে ওঠে কিছু সু-চিন্তা,
হয়তো কখনো হাতটি বাড়ায় আসি—
কারো দুর্দিনে হতে সহায়
কারো মুখে দিতে হাসি।'

'পড়িনি বোধ হয়,' বললেন মিঃ কুলী।

'এটা একটা ধর্মগীত।' বললে পিঙ্কনি ব্লুম—'এবার আমায় একটা ঘোড়াগাড়ির আস্তাবল দেখিয়ে দিন তো ভাই, আবার মাটির রাস্তা ধরে ওকোচি ফিরে যেতে হবে।'

Out of Nazareth, পিলগ্রিম, ১৯০৩

আদি পুরুষের প্রত্যাবর্তন

'রেড ফ্রন্ট' ওষুধের দোকানের ওপরতলায় জেফ্ পিটার্সের ঘরে আলো জ্বলতে দেখলাম। তাড়াতাড়ি এগোলাম সেদিকে, কারণ জেফ্ যে শহরে আছে তা জানতাম না। ও হল পরিব্রাজক গোষ্ঠীর মানুষ, হাজার রকম কাজ ওর, আর প্রত্যেকটা কাজ নিয়েই ওর বলার মতো কিছু গল্প থাকে (ওর ইচ্ছে থাকলে অবশ্য)।

দেখলাম জেফ্ তার সুটকেশখানা নতুন করে গোছাচ্ছে ফ্লোরিডায় ছুটবে বলে,—সেখানে একটা কমলালেবুর বাগিচা দেখবে—মাসখানেক আগে ইউকনের খনির স্বত্ব বিনিময় করে ওইটে সে কিনেছিল। পা দিয়ে আমার দিকে একটা

চেয়ার ঠেলে দিল, সেই একই পুরনো কৌতুকময় গূঢ় হাসি তার পোড়-খাওয়া মুখে। আট মাস আগে আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল, কিন্তু ওর সম্ভাষণটা হল এমন যেন রোজই দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে! "সময়" হল জেফ্ পিটার্সের ভৃত্য, আর মহাদেশটাও এমন লম্বাচওড়া যেখানে সে খুশিমতো চলার পথ বের করে নেয়।

কিছুক্ষণ অবধি ফালতু কথার কিনারা ধরেই লড়াই হল আমাদের, পরিশেষে এসে পড়ল ফিলিপিন্‌সের সেই অশান্ত সমস্যার প্রসঙ্গটা।

জেফ্ বলে, 'ওই সব গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জাতিগুলো, বুঝলে, আরো ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারে যদি তাদের ঘোড়ায় থাকে নিজস্ব ঘোড়সওয়ার। ওদেশের মানুষ জানে তারা কী চায়। মোরগ-লড়াই দেখতে সীজন টিকিট, আর রুটিফল গাছে চড়বার মতো দুটি ওয়েস্টার্ন-ইউনিয়ন পর্বতারোহী, ব্যস্ ওইটুকুই। ইউরোপী-মার্কিনী জাতগুলো চায় ওদের ব্যাকরণ শেখাতে আর ঝোলা পাতলুন পরাতে। সে তার নিজের পথেই বরং বেশি সুখী হতে পারত।'

আমি যেন শিউরে উঠি।

বলি, "আরে ভাই, শিক্ষাই তো আসল লক্ষ্য। এক সময়ে ওরা আমাদের সভ্যতার আদর্শেরই সমকক্ষ হবে। এই দেখ না, শিক্ষা কী উপকারই না করেছে (রেড) ইণ্ডিয়ানদের!'

'ও-হো!'—গেয়ে ওঠে জেফ্, আর তার পাইপখানা ধরায় (এটা ভাল সংকেত); বলে, 'হ্যাঁ, বলছ ইণ্ডিয়ানদের কথা! দেখা যাক। আমি আগেই ধরে নিচ্ছি রেড মানুষরা হল প্রগতির ধ্বজাধারী। অন্যসব বাদামি আদমিদেরই জুড়ি সে। ওকে তুমি ফর্সা "এ্যাংলো-স্যাক্সন" কখনোই বানাতে পারবে না। তোমাকে আগে কখনো বলেছি কি আমার বন্ধু জন টম ছোট-ভালুকের কথা? যে সংস্কৃতি আর শিক্ষার দক্ষিণ কর্ণটি চিবিয়ে খেয়েছে? আর কলাম্বাস যখন বালকমাত্র, তখন সে খেলত ছক্কাপাঞ্জার ঘুঁটি? বলিনি বুঝি?'

'জন টম ছোট-ভালুক ছিল শিক্ষিত চেরোকি ইণ্ডিয়ান, যখন আমি উপনিবেশে থাকতাম তখন থেকেই আমার সঙ্গে দোস্তি। পূর্ব অঞ্চলের একটা ফুটবল কলেজের স্নাতক। ওই কলেজগুলো ইণ্ডিয়ানদের বন্দীদের চিতায় তুলে জ্বালাবার বদলে উনোনের ঝাঁঝরি ব্যবহার শেখানোতে বেশি সফল হয়েছে। এ্যাংলো-স্যাক্সন হিসেবে দেখলে জন টমের গায়ে তামাটে রঙের ছোপ-ছোপ। ইণ্ডিয়ান হিসেবে, অতো ফর্সা সাদা মানুষ কখনো দেখিনি। আর চেরোকি হিসেবে? ভদ্রলোক বলতে পয়লা ভোট তারই। আর রাজ্যের পোষ্য বালক হিসেবে তাকে প্রাইমারি পেরুতেই হাবুডুবু খেতে হয়েছে।

'জন টম আর আমি একসঙ্গে যুক্তি করে ওঝা-ডাক্তারি শুরু করলাম (ইণ্ডিয়ানরা বলে 'মেডিসিন")—কী করে আইন বাঁচিয়ে কিছু ভদ্র জোচ্চুরি করা যায়, যাতে কাজগুলো সারতে পারি হৈচৈ করে, পুলিশের বোকামি কিংবা আর সব বড়

ব্যবসাদারদের লোভ না জাগিয়ে। দুজনের মধ্যে প্রায় পাঁচশো ডলার মতো ছিল, চাইলাম সেটাই বাড়িয়ে তুলতে—অমন তো সব ভদ্র পুঁজিপতিরাই চায়।

'তাই একটা মতলব ঠাওরালাম যা মনে হবে সোনার খনির প্রস্তাবপত্রের মতোই সম্মানজনক আর গির্জার লটারিখেলার মতো লাভজনক। তারপর তিরিশ দিনের মধ্যেই আমরা একজোড়া তাজা ঘোড়া আর লাল শিবিরগাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ি কান্‌সাসে, শোওয়া-থাকা গাড়িতে, খানা বাইরে। জন টম হল "চীফ দাওয়াই মালিক," বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান ওঝা আর সাত গোষ্ঠীর দয়ালু মোড়ল। মিঃ পিটার্স, মানে আমি, ব্যবসার ম্যানেজার আর আধা অংশের মালিক। আমাদের একজন তৃতীয় ব্যক্তি প্রয়োজন, তাই চারদিক ঘুরে পেয়ে গেলাম জে. কনিংহাম বিঙ্কলিকে—একটা কাগজের কর্মখালি স্তম্ভে ঝুঁকে পড়ে ছিল। এই বিঙ্কলির আবার 'ঘোড়ারোগ' আছে শেকস্‌পীয়রের নাটকে ভূমিকা নিয়ে, স্বপ্ন দেখে তার অভিনয় নিউ ইয়র্কের মঞ্চে 'দুইশত রজনী' গড়াবে। তবে সে স্বীকার করে উইলিয়ম শেক্স-এর ওপর মাখাবার মতো মাখন তার জন্মেও রোজগার হবে না, তাই একটা সাধারণ রুটিওয়ালার স্তরেও নামতে দ্বিধা নেই এখন, বরং দুশো মাইল গড়াতে রাজি 'মেডিসিন' ঘোড়ার পেছু-পেছু। "তৃতীয় রিচার্ড" ছাড়াও সে সাতাশখানা নিগ্রো-গান আর ব্যাঞ্জোর কারুকাজ জানে, রাঁধতে জানে, ঘোড়াদের দলাই-মলাইও করতে পারে। টাকা কামাবার ধান্দায় আমরা নানা ফিকির চালিয়ে যাই। একটা হল কাপড় থেকে নোংরা তেলের দাগ ইত্যাদি তোলার ম্যাজিক সাবান। আর একটা হল বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান দাওয়াই সাম-ওয়া-টা (মহাত্মার স্বপ্নাদিষ্টে প্রেইরি ভেষজ-অরিষ্ট যা চিকাগোর বড়-চীফ ম্যাক্‌গ্যারিটি ও সিলবারস্টাইন বোতলজাত করেন)। আর অন্যটা হল কানসাস্‌বাসীদের পকেটমারার ছেলেমানুষী ব্যবস্থা—যার ফলে বড় বিভাগীয় বিপণিগুলোর ফতুর হবার অবস্থা। দেখ না ভাই! একজোড়া সিল্ক গার্টার, একটা রংচঙে বই, এক ডজন কাপড়-শুকাবার ক্লিপ, একটা সোনার দাঁত এবং আরও কিছু, সব একসঙ্গে খাঁটি জাপানী সিল্কারিনা রুমালে মুড়ে সুন্দরী মহিলাকে দিচ্ছে মিঃ পিটার্স, জলের দরে—পঞ্চাশ সেন্ট! ওদিকে প্রোফেসর বিঙ্কলি এক চক্কোরে তিন মিনিট করে বাজিয়ে শোনাচ্ছে ব্যাঞ্জো!

'বেশ জবরদস্ত জোচ্চুরিই চালাচ্ছিলাম। শান্তি বজায় রেখে লুটে চললাম কানসাস্‌ রাজ্য,—ওটাকে যে কেন রক্তঝরা কানসাস্‌ বলে তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ রাখব না এই আমাদের পণ। পুরো ইণ্ডিয়ান চীফের পোশাক-পরা জন টম ছোট-ভালুক ভিড় টানে 'দশ-পঁচিশ' খেলার দল আর সরকারী খাস আড্ডাখানা থেকে। যখন পুব দিকে ফুটবলের কলেজে খেলত তখনই আয়ত্ত করেছিল প্রচুর রংদার লব্‌জ, আর ক্লাসগুলোতে শরীর সুঠাম করার ব্যায়াম, চালিয়াতি কুতর্ক। যখন সে লাল ওয়াগনগাড়িতে দাঁড়িয়ে মুখে খৈ ফুটিয়ে চাষীদের বুঝিয়ে বলত হাত-পায়ের ফোলা-হাজা আর মাথার-খুলির অতি চেতনাবোধ নিয়ে, তখন তোমাদের জেফ্‌ যেন কূল পেত না তাড়াতাড়ি ইণ্ডিয়ান দাওয়াই বিক্রি করেও।

'এক রাতে সালিনার পশ্চিমে একটা ছোট শহরের কিনারায় আমরা শিবির করে বসেছি। সব সময় ঘাঁটি বসাতাম কোনো সোঁতার ধারে, একটা ছোট তাঁবু গেড়ে। কখনো কখনো হঠাৎই আমাদের দাওয়াই তো ফুরিয়ে যেত? তখন চীফ দাওয়াই-মালিক স্বপ্নে আদেশ পেত স্বয়ং মানিটু তাকে বলছেন কোনো সুবিধাজনক জায়গা থেকে কয়েক বোতল সাম-ওয়া-টা ভরে নিতে। তখন রাত প্রায় দশটা, এক রাস্তায় অনুষ্ঠান সেরে সবে ঢুকেছি এখানে। আমি লণ্ঠন নিয়ে তাঁবুতে, সারা দিনের লাভের হিসেব দেখছি। জন টম তখনো তার ইণ্ডিয়ান ধড়াচুড়ো খোলেনি, শিবির আগুনের পাশে বসে প্রোফেসরের জন্য তাওয়াতে চমৎকার নরম মাংসের কাবাব ভাজছে, প্রোফেসর ওদিকে শিক্ষিত ঘোড়াগুলোর সঙ্গে গা-চামকানো দাপাদাপি করে তবে খেতে আসবে।

'এমন সময় হঠাৎ অন্ধকার ঝোপগুলোর আড়াল থেকে এল বাজি ফোটানোর মতো দুম্ আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে জন টম ওঁক্ করে উঠে নিজের বুকের কাছ থেকে বের করল একটা ছোট বুলেট, যেটা তাঁর কাঁধের হাড়ের ওপর খোঁচা মেরেছিল। জন টম লাফ দিয়ে ছুটে যায় বাজি ফোটানোর জায়গার দিকে। ফিরে আসে ন'দশ বছরের একটি ছোট ছেলের জামার কলার ধরে। বাচ্চাটার পরনে ভেলভেটিন কোটপ্যান্ট, হাতে একটা ছোট নিকেল-করা রাইফেল, ফাউন্টেন পেনের মতোই বড়।

'জন টম বললে, 'এই যে পাপ্পুজ্, হাউইট্জার নিয়ে কী শিকার করে বেড়াচ্ছ? কারুর চোখেও তো লেগে যেতে পারত। বেরিয়ে এস জেফ্, কাবাবটা তুমিই সামলাও, পুড়তে দিও না, আমি ততক্ষণ এই মটরশুঁটি-শিকারী দস্যুটাকে জেরা করি।'

'বাচ্চাটা যেন কোনো প্রিয় লেখকের লেখা উদ্ধৃত করার সুরে বলে, "কাপুরুষ লাল চর্মধারী! আমাকে যদি চিতার আগুনে ভস্ম করার সাহস কর, তাহলে 'পাংশুবদন' তোমাদের প্রেইরি থেকে সাফ করে দেবে। যেমন... যেমন আর হয় না। এখন আমায় ছেড়ে দাও নয়তো মাকে বলে দেব।"

'জন টম বাচ্চাটাকে একটা শিবির টুলে বসিয়ে দেয়, আর নিজে বসে তার পাশে— "এবার বিগ চীফকে বল কেন তুমি জন আঙ্কেলের গতরে ছিটে গুলি ছুঁড়তে চেয়েছিলে। তুমি জানতে না বন্দুকে গুলি আছে?"

'বাচ্চাটা, বলতে হয় মিষ্টি দুটো চোখ তুলে, তাকায় জন টমের চামড়া-জামা আর ঈগল-পালকগুলো দিকে—"তুমি কি ইণ্ডিয়ান?" জন টম বলে, "তা ঠিকই!" পা দুলিয়ে ছোট ছেলেটি বলে, "সেই জন্যই তো!" বাচ্চাটার স্নায়ুর জোর দেখে আমি প্রায় পুড়িয়েই ফেলেছিলাম কাবাবটা।

'জন টম বলে, "ও-হো, তাই বল! তুমি হলে 'বালক প্রতিশোধকামী', আর তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ মহাদেশ থেকে বুনো লাল মানুষদের তাড়িয়ে দেবে। এই রকমই কতকটা, তাই না খোকা?"

'বাচ্চাটা আর্ধেক মাথা নাড়ে। তারপরেই গোমড়া হয়ে যায়। অন্তত একজন বীর তার খেলাঘরের রাইফেলের সামনে কুপোকাত না হলে ওর মুখ থেকে কথা টেনে বের করা ভদ্রতা নয়।

'জন টম বলে, "এবার পাপ্পুজ, বল তোমার আস্তানাটি কোথায়। কোথায় থাক তোমরা? এতক্ষণ বাইরে আছ দেখে তোমার মা যে কাতর হয়ে পড়বেন। আমায় বল, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।" ছেলেটা দাঁত বের করে বলে, "সেটি পারছ না। আমি হাজার হাজার মাইল দূরে উই দিকে থাকি," হাত ঘুরিয়ে সে দিগন্তের দিকে দেখায়। বলে, "আমি নিজেই ট্রেনে চেপে আসি। এখানে নেমে পড়লাম কারণ কণ্ডাক্টার বলল টিকিটের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।" হঠাৎ খুব সন্দেহের চোখে জন টমের দিকে তাকায়। বলে, "বাজি রাখতে পারি তুমি ইণ্ডিয়ান নও। তুমি তো ইন্ডিয়ানদের মতো কথা বলছ না। হ্যাঁ, দেখতে তাদের মতো, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা তো শুধু দুটো কথা বলে, 'দেনার ভাল' আর 'পাংশুবদন মরবে'। দেখ, আমি বাজি রাখতে পারি তুমি ওই সাজানো ইণ্ডিয়ানদের একজন যারা রাস্তায় দাওয়াই বেচে। আমি একবার একজনকে কুইন্সিতে দেখেছিলাম।"

' "ওসব ছাড়," জন টম বলে, 'আমি সিগ্রেট বাক্সের ছবি কি টামানির কার্টুন, তা নিয়ে ভেবো না। সভার সামনে প্রশ্ন হল তোমাকে নিয়ে কী করা যাবে। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়েছ। তুমি হাওয়েলস্-এর বই পড়। "বালক প্রতিশোধকামীর" পেশার তুমি অপমান করেছ একজন নিরীহ ইণ্ডিয়ানকে গুলি করার চেষ্টা করে, আর কখনোই বলোনি 'মর্ লালচামড়া কুত্তা! বালকের রাস্তা তুই উনিশ বার পেরিয়েছিস্।' এর মানে কী বলতে পার?"

'ছেলেটা এক মিনিট ভাবল। তারপর বলল, "আমি বোধহয় ভুলই করেছি। আমার উচিত ছিল আরো পশ্চিমের দিকে চলে যাওয়া। ক্যানিয়নের মধ্যে ওরা আরো বেশি বুনো।" তারপর ক্ষুদে শয়তানটা জন টমের দিকে হাত বাড়াল, "আমায় মাফ করে দিন স্যর—ভুলে আপনার দিকে গুলি চালিয়েছি। আশা করি আপনার ব্যথা লাগেনি। তবে আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। স্কাউট যখন কোনো ইণ্ডিয়ানকে তার যুদ্ধসাজে দেখে, তখন তার রাইফেল কথা বলবেই।" ছোট-ভালুক এবার হো-হো করে হেসে অবশেষে একটা হনুমান-লাফ দিলে, তারপর ছেলেটিকে দশ ফুট শূন্যে তুলে বসিয়ে নিল নিজের ঘাড়ে। ওদিকে ঘর-পালানো ছোকরা তার জামার কিনারায়, ঈগল-পালকে, আঙুল বুলোচ্ছে আর আহ্লাদে আটখানা হচ্ছে—হীনতর জাতের নাকের ওপর জুতোর গোড়ালি দুলিয়ে এমন আহ্লাদই হয় ফর্সা জাতের। তবে এটা পরিষ্কার, আজ থেকে ছোট-ভালুক আর ওই বালকটা পরস্পরের গলাগলি বন্ধু হল। ছোট বেইমান এর মধ্যেই বুনো মানুষের সঙ্গে শান্তির পাইপ টেনেছে; আর তার চোখে জেগে উঠেছে কল্পনা,— একটা 'টোমাহক" রণকুঠার আর শিশুর সাইজের একজোড়া মোকাসিন জুতো।

'তাঁবুর মধ্যে আমরা রাতের খাবার খাচ্ছি। ছেলেটা আমাকে আর প্রোফেসরকে ধরে নিয়েছে সাধারণ বীর বলে, শিবির দৃশ্যের শোভনীয় পটভূমিতে। ও একটা সাম্‌-ওয়া-টার বাক্সের ওপর বসে আছে, টেবিলের কিনারা ওর গলা অবধি, মুখে কাবাব ঠাসা। তখন জন টম জানতে চায় ওর নাম। মাংস-বোজা গলায় ছোকরা উত্তর দেয়—"রয়"। কিন্তু বাকি নামটা আর পোস্টাপিস ঠিকানা যখন জানতে চাওয়া হল সে মাথা নাড়ে—"ওটা হবে না। তোমরা আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই। এরকম শিবির করে বাইরে থাকা আমার ভাল লাগে। বাড়িতে, পেছনের আঙিনায় আমরা বন্ধুরা মিলে শিবির করেছিলাম। ওরা আমাকে ডাকত 'লাল নেকড়ে রয়' বলে। ওটাকেই আমার নাম হিসেবে ধরতে পার। আমাকে আরেক টুকরো কাবাব দাও প্লীজ।"

'ছেলেটাকে আমাদের কাছেই রাখতে হল। আমরা জানতাম ওকে নিয়ে কোথাও হৈচৈ হচ্ছেই, আর নিশ্চয় তার মাম্মা, হ্যারি আঙ্কেল, জেন পিসি আর পুলিশের কর্তা তুমুল দৌড়োদৌড়ি করছেন ওর সন্ধানে, কিন্তু এর বেশি একটা কথাও বলবেনা সে। দুদিনেই সে "বিগ মেডিসিন" কোম্পানির চোখের মণি হয়ে দাঁড়াল—আমাদের শুধু একটা গোপন আশা ওর মালিকরা আবার হঠাৎ না এসে উদয় হন। লাল গাড়ি যখন ফেরির ব্যবসায় থাকত, ও বসত ভেতরে, আর মিঃ পিটার্সকে বের করে দিত বোতল—যেন দুশো ডলারের মুকুট ত্যাগ করে কোনো রাজপুত্তুর লক্ষ ডলারের হঠাৎ নবাবি পেয়ে তৃপ্ত। একবার জন টম ওকে ওর বাপের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। ও বলে, "আমার কোনো বাবা নেই। আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমার মাকে অনেক কাঁদিয়েছে। লুসি মাসি বলেন সে একটা গরিলা।" "একটা কী?" 'জিজ্ঞেস করে একজন। ছেলেটা বলে, "কোনো রকম গরিলা—ভেবে দেখি—ও হ্যাঁ মানুষের বেশে শয়তান গরিলা। আমি জানি না ওর মানে কী।"

'জন টম ওকে আমাদের মার্কা দিতে চেয়েছিল, একজন ছোট চীফের মতো পোশাক পরিয়ে, পুঁতি আর ঝিনুকের মালা দিয়ে সাজাতে, কিন্তু আমি আপত্তি জানালাম—"আমার কথা হল কেউ ছেলেটিকে হারিয়েছে, তারা ওকে ফিরে পেতে চাইবেই। তুমি আমায় কৌশল করে ওর কাছ থেকে কথা বের করবার সুযোগ দাও, যদি ওর আসল পরিচয় কিছু পাই।"

'তাই সে-রাতে আমিই গেলাম মিঃ রয় ইত্যাদ্দির কাছে শিবির আগুনের ধারে। ওর দিকে বিদ্রূপ আর ঘেন্নার চোখে তাকিয়ে বললাম, "স্নিকেনউইট্‌জেল!" যেন নামটায় আমারই বমি উঠে আসে: "স্নিকেনউইট্‌জেল! থুঃ!"

' "তোমার ব্যাপারটা কী জেফ?"—বড়-বড় চোখ করে ছেলেটি বলে।

'ফের বললাম "স্নিকেনউইট্‌জেল!" থুতু ফেলার মতো—"আজ তোমার শহর থেকে একটা লোক এসেছে দেখলাম, সেই তো বলল তোমার নাম। তুমি যে

নামটা বলতে লজ্জা পেতে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। স্নিকেনউইট্‌জেল! দূর·দূর!"

' "এই যে, কী বলছ," রেগেমেগে ছেলেটা যেন সারা শরীর মোচড়ায়, 'কী ব্যাপার তোমার? ও নাম আমার নয় মোটেই, আমার নাম কনিয়ার্স। তা ব্যাপারটা কি হল তোমার?"

'আমিও ওকে স্বস্তি না দিয়ে, কিছু ভাবার অবসর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বলতে থাকি, "ওটাই শেষ বিচ্ছিরি কথা নয়। আমাদের ধারণা ছিল তুমি কোনো ভাল সচ্ছল পরিবারের ছেলে। এই তো দেখ মিঃ ছোট-ভালুক, চেরোকিদের প্রধান, যার রোববারের কম্বলে নটা ভোঁদড়ের লেজ লাগাবার হক্ আছে, আর প্রোফেসর বিঙ্কলি, যিনি শেক্সপীয়র আর ব্যাঞ্জো দুটোই বাজান, আর আমি, যার শ'য়ে শ'য়ে ডলার আছে গাড়ির ওই কালো টিনের বাক্সটায়—তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হয় কেমন লোকের সঙ্গে আমরা মিশি না-মিশি। ওই লোকটা আমায় বলল তোমার পরিবার থাকে শহর থেকে দূরে কোন্ এক ছোট পুরনো মুরগি-ঘরের গলিতে, সেখানে কোনো ফুটপাত নেই, ছাগলরা তোমাদের টেবিলে বসে খানা খায়।"

'ছেলেটা তখন প্রায় কাঁদতে বসেছে। তো-তো করে বলে, "না তা নয়। সে-সে জানে না কী সে বলছে। আমরা থাকি পপ্‌লার এ্যাভিন্যুতে। আমি ছাগলদের সঙ্গে মিশি না। আপনার ব্যাপারটা কী?"

বিদ্রূপ করে বলি, "পপ্‌লার এ্যাভিন্যু, পপ্‌লার এ্যাভিন্যু। ওটা একটা থাকবার রাস্তা হল! দুটো মাত্র ব্লক গিয়েই তো গন্তের মধ্যে প'ল। এক মুঠো পেরেকও ওটার এপার-ওপার ছুঁড়ে দেয়া যায়। আমার কাছে পপ্‌লার অ্যাভিন্যুর গপ্প কোরো না।"

' "অও! ওটা—ওটা তো ক'মাইল লম্বা। আমাদের নম্বর ৮৬২, তারপরেও অনেক, অনেক বাড়ি রয়েছে। ব্যাপারটা কী—অও, তুমি আমায় হয়রান করছ জেফ্।"

' "বেশ তো এবার," বলি আমি, "হয়তো লোকটা ভুলই করেছে। হতে পারে অন্য কোনো ছেলের কথা বলছিল। যদি তাকে ধরতে পারি অন্যের বদনাম করা তার আমি ঘুচিয়ে দেব।" খাওয়ার পর আমি শহরে চলে যাই, সেখান থেকে টেলিগ্রাম পাঠাই মিসেস্ কনিয়ার্স, ৮৬২, পপ্‌লার এ্যাভিন্যু, কুইন্সি, ইলিনয়-তে, জানাই যে তাদের ছেলে আমাদের সঙ্গে ভালই আছে, দিব্যি আছে, তাদের হুকুম পাওয়া অবধি তাকে এখানে ধরে রাখব। দু'ঘন্টার মধ্যে জবাব এল, ওকে শক্ত করে ধরে রাখুন, মিসেস কনিয়ার্স পরের ট্রেনেই চলে আসছেন।

'পরের ট্রেন আসার কথা পরদিন সকাল ছ'টায়। আমি আর জন টম বাচ্চাটাকে নিয়ে স্টেশনে হাজির থাকি। এখন বিগ চীফ দাওয়াই-মালিককে তেপান্তর খুঁজলেও

পাওয়া যাবে না। তার জায়গায় মিঃ ছোট-ভালুক আছে ইউরোপীয় জাতের মনুষ্য-পোশাকে : তার পেটেন্ট চামড়ার জুতো, নেকটাইয়ের ওপর "সর্বস্বত্বসংরক্ষিত" ছাপ। এসব বস্তু জন টম কলেজ থেকে মেরেছিল মেটাফিজিক্সের সঙ্গে, মুষ্টিযুদ্ধের রক্ষীকে লেঙি দিয়ে। কিছুটা হলদেটে গায়ের রং আর সোজা কালো চুলের গোছা না থাকলে তাকে মনে করা যেত সাধারণ মানুষ,— পত্রপত্রিকা-পড়া আর সন্ধ্যায় আস্তিন গুটিয়ে বাড়ির লন্ সাফাইয়ের উপযুক্ত।

'তারপর ট্রেন এসে পড়ল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছাইরঙা পোশাকপরা, চক্‌চকে-চুল এক ছোটখাটো মহিলা তাড়াতাড়ি চারদিকে চোখ বুলোলেন। "বালক প্রতিশোধ কামী" তাকে দেখেছে আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে "মাম্‌মা" বলে, উনিও "ওহো রে বাছা" বলে কেঁদে উঠলেন। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে। এবার ঝামেলাবাজ লাল-চামড়ার দল বেরিয়ে আসতে পারে তাদের ময়দান-গুহা থেকে, এখন আর 'লাল নেকড়ে" রয়ের রাইফেলের ভয় নেই। মিসেস্ কনিয়ার্স এগিয়ে এসে আমাকে আর জন টমকে ধন্যবাদ দিলেন, ওর মধ্যে মেয়েমানুষ-সুলভ স্বাভাবিক বাড়াবাড়িটা নেই। বোঝাবার জন্য তিনি যতটা প্রয়োজন ততটাই বলেন, কোনো আনুষঙ্গিক ঐকতানের সঙ্গীত নেই। আলাপের প্রসঙ্গে কিছু অশিক্ষিত মামুলি কথা বলি, তাতে মহিলা সহৃদয়ভাবে হাসেন, যেন গত এক হপ্তা ধরেই তিনি আমায় চেনেন।

'ছেলেটি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—এক হপ্তার বাক্যালংকারে যা সম্ভব হয়নি, দু'একটা পাদটীকা আর ব্যাখ্যাতেই সে কাজ যেন সহজ করে দিল সে। আমাদের ঘিরে নাচল, পিঠে ঘুষি মারল, জন টমের পা ধরে উঠতে চেষ্টা করল। "এই হল জন টম, মা," বলল সে, "ও একজন ইণ্ডিয়ান। লাল গাড়িতে ঘুরে ওষুধ বেচে। আমি ওকে গুলি মেরেছি, কিন্তু একটুও খেপে ওঠেনি ও। অন্যজন জেফ। সে-ও এক ফকির। এসো না, চল দেখবে আমাদের শিবির, যেখানে থাকি, আসবে মা?"

'পরিষ্কার বোঝা যায় মহিলাটির ছেলে-অন্ত প্রাণ। উনি ওকে ফের ধরেছেন বুকে, দু'বাহুতে চেপে, আর সেটাই যথেষ্ট। এখন ওকে খুশি করতে যা-খুশি তাই করতে পারেন। মাত্র কয়েক লহমা দ্বিধা করে আরেকবার তাকান এই লোকগুলোর দিকে। মনে হচ্ছিল উনি নিজের মনেই ভাবছিলেন জন টমের কথা—"দেখতে তো ভদ্রমানুষই, অবশ্য যদি মাথার চুলটা কোঁকড়া না হয়।" আর মিঃ পিটার্সকে নস্যাৎ করে দেন এইভাবে—"মেয়েমানুষের কাম্য পুরুষ নয়, তবে মেয়েদের বোঝে এমন এক মানুষ।" অতএব, আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগুই শিবিরের দিকে, যেন পায়চারি করে ফিরছে একদল পড়শি। ওখানে গিয়ে উনি ওয়াগন গাড়িটা পর্যবেক্ষণ করেন, যেখানে ওর ছেলেটি শুতো সে জায়গাটা হাত দিয়ে আদর করে চাপড়ান, আর চোখের চারদিকটা চেপে-চেপে ধরেন রুমাল দিয়ে। আর

এদিকে প্রোফেসর বিঙ্কলি তার 'এক-তারা' ব্যাঞ্জোতে চারণ গান শোনায়, তারপর প্রায় 'নেমেই এসেছিল "হ্যামলেটের" স্বগতোক্তিতে, যদি না একটা ঘোড়া দড়িতে পা বাধিয়ে ফেলত, অতএব তাকে যেতেই হচ্ছে ওকে ঠিক করতে—যাবার সময়ও স্বগতোক্তি ছাড়ে না: "আবার ব্যর্থ হল..." ইত্যাদি।

'আঁধার নেমে আসতে আমি আর জন টম হেঁটে ফিরলাম 'কর্ন্ এক্সচেঞ্জ হোটেল' অবধি, তারপর চারজনই নৈশ ভোজনে বসলাম সেখানে। মনে হয় মুশকিলটা শুরু হয়েছিল তখনই যখন মিঃ ছোট-ভালুক আরম্ভ করল তার উঁচু মেধার বেলুন-ওড়ানোর পালা। আমি টেবিলের ঢাকনা ধরে হাঁ করে শুনি তার উচ্চমার্গের কথা। বিচার করার সাধ্য যতটা আমার আছে, বুঝলাম এই লাল লোকটার জ্ঞান ভাণ্ডার বিপুল। ভাষার দিকটাতে তো ফুলঝুরি, রোমানরা যেমন ম্যাকারনি নিয়ে করে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্রিয়া আর প্রত্যয় দিয়ে অলংকৃত তার মন্তব্যগুলো। উচ্চারণভঙ্গি মসৃণ, তার ভাবনার গিঁটগাঁটের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়। মনে হচ্ছিল আগে যেন কখনো তার কথা শুনেছি, তবে তা নয়। কথাগুলোর আয়তন নয়, কেমনভাবে তা বেরিয়ে আসছে সেটাই দেখার। বেছে-নেয়া বিষয়গুলোও নয়, কারণ সে বলছে অতি সাধারণ জিনিস নিয়ে—ক্যাথিড্রাল, ফুটবল, কবিতা, সর্দিকাশি, আত্মা, মাল পাঠাবার মূল্য হার, আর ভাস্কর্য। মিসেস কনিয়ার্স্ ওর উচ্চারণ বোঝেন, দুজনের মধ্যে কিছু চমৎকার শব্দের আদানপ্রদানও হয়। আর কালেভদ্রে জেফ্ পিটার্স কিছু বস্তাপচা, অর্থহীন কথা ছাড়ে, মাখনটা বা মুরগির আরেকটা ঠ্যাং ইত্যাদি এগিয়ে দেবার জন্য।

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছিল মিসেস্ কনিয়ার্স্ সম্পর্কে খানিকটা মুগ্ধতা যেন বাসা বেঁধেছে জন টম ছোট-ভালুকের হৃদয়ে। মহিলা সেই জাতের যারা লোকের মন খুশিতে ভরে দেন। দেখতে তো ভাল ছিলেনই, আরো কিছু—যা তোমায় বলছি। বড়-বড় দোকানে সাজিয়ে-রাখা পোশাকের মডেলদের তো দেখেছ। দেখলেই মনে হবে তারা ব্যক্তিত্বশূন্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে। চোখ আকর্ষণ করারই তাদের অভ্যাস। তাদের সব ঝোঁক শরীরের বেড় কত ইঞ্চি আর ত্বকের বর্ণ কেমন এই নিয়ে; সেই সঙ্গে পাখার হাওয়া করে মিছে-কল্পনা বাড়িয়ে দেবার কৌশল—যাতে সীলচামড়ার পোশাকটা মনে হবে আঁচিল-ওয়ালা মহিলা আর পয়সাওয়ালা মহিলার পক্ষে সমানই মানানসই। এখন ওই মডেলরাই যদি ডিউটি থেকে ছুটি পায়, আর তুমি তাদের বেড়াতে নিয়ে যাও, তা'হলে প্রথম প্রেরণাতেই বলবে 'চার্লি', আর টেবিলে চড়ে বসবে। তাহলে ওই রকমই কিছু পাচ্ছ মিসেস্ কনিয়ার্সের মধ্যে। আমি বুঝতে পারছিলাম কেমন করে ওই সাদা 'স্কোঅ' (রেডইণ্ডিয়ান রমণী)-টিকে ঘেন্না করার ঝাঁক সামলে রয়েছে জন টম।

'মহিলা আর বাচ্চা রয়ে গেল হোটেলে। বললেন সকালে বাড়ির দিকে রওনা দেবেন। আমি আর ছোট-ভালুক সন্ধ্যা আটটায় বেরিয়ে পড়লাম, ইণ্ডিয়ান দাওয়াই

বেচলাম ন'টা অবধি। জন টম আমাকে আর প্রোফেসরকে ছেড়ে দিল গাড়ি নিয়ে শিবিরে ফিরে যাবার জন্য, আর নিজে রয়ে গেল শহরেই। মতলবটা আমার ভাল ঠেকেনি। কারণ এতে বোঝা যাচ্ছে জন টমের মনের অবস্থা অস্বস্তিজনক, আর তার মানে দাঁড়াবে জল দিয়ে আগুন নেভানো, কিংবা হয়তো সবুজ-ফসল নাচের আসর আর খরচা। চীফ দাওয়াই মালিককে বড় একটা দেখি না ওসবে, তবে একবার গেলে জোর হুড়-হাঙ্গাম হবে নীল উর্দি আর মুগুর উঁচোনো পাংশুবদনদের আস্তানায়।

'সাড়ে ন'টা নাগাদ প্রোফেসর ঢুকে পড়ল লেপের তলায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে এখন নাক ডাকাবে। আর আমি আগুনের পাশে বসে ব্যাঙের ডাক শুনছি। মিঃ ছোট-ভালুক চুপি চুপি ঢুকল শিবিরে, একটা গাছে হেলান দিয়ে বসল। আগুন-জলের কোনো লক্ষণই নেই।

'অনেকক্ষণ পর সে বলল, "জেফ! একটা ছোট্ট ছেলে পশ্চিমে এসেছিল ইণ্ডিয়ান শিকার করতে।"

' "তাতে কী হল?" বললাম আমি, কারণ ভাবতে পারছি না সে কী ভাবছে।

'জন টম বলল, "আর সে ধরেও ছিল একজনকে। না, বন্দুক দিয়ে নয়। আর জীবনেও তো কখনো ভেলভেটিন কাপড়ের স্যুট পরেনি।"—এবার বোধহয় আমি টের পেয়েছি তার ধোঁয়ার সংকেত।

'বললাম, "জানি সেটা আর এও নিশ্চিত জানি ওর ছবি থাকে এখানে-ওখানে প্রিয় হৃদয়ের ফ্রেমে, আর লাল-হোক সাদা-হোক বোকা লোকরাই ওর শিকার।"

'শান্তকণ্ঠে বলে জন টম, "লালের বেলায় তোমার জিত। জেফ্, কতোগুলো ঘোড়া বেচে আমি মিসেস কনিয়ার্সকে কিনতে পারি, বল তো?"

' "কেলেঙ্কারি কথা!" জবাব দিই আমি, "পাংশুবদনদের রীতি এটা নয়।" জন টম উচ্চস্বরে হেসে একটা চুরোট চিবোয়। জবাব দেয়, "না, এটা হল সাদা মানুষের বিয়ের বন্দোবস্তে ডলারেরই সমান বুনো আদমির পণের টাকা। ও আমার জানা আছে। দুটো মানুষজাতের মধ্যে স্থায়ী প্রাচীর। যদি আমার ক্ষমতা থাকত জেফ্, তাহলে প্রত্যেকটি সাদা কলেজ যেখানে লাল মানুষের কখনো পা পড়েছে, জ্বালিয়ে দিতাম মশাল দিয়ে। আমাদের তোমরা কেন একলা ছেড়ে দাও না—আমাদের নিজস্ব ভূতের নাচ, কুকুর ভোজন, আর ধুঁকড়ো "স্কোঅদের" পঙ্গপালের সুপ্ রাঁধতে, মোকাসিন রিফু করতে?"

'আমি কলঙ্কিত বোধ করে বলি, "এবার তুমি নিশ্চয় শিক্ষা নামক চিরকালীন ফুলটির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাচ্ছ না? কারণ ওটা আমি পরি আমার নিজের উন্নতবুদ্ধি শার্টের বুকে, আমি শিক্ষা পেয়েছি", বলি, "এতে তো আমার কোনো লোকসান হয়নি।"

'আমার গদ্যময় বাগড়ার দিকে নজর না দিয়ে ছোট-ভালুক বলেই চলে, "তোমরা আমাদের ল্যাসো ছুঁড়ে আটকাও আর শেখাও জীবনে আর সাহিত্যে কী সৌন্দর্য আছে; পুরুষ ও নারীর মধ্যে যা সদ্‌গুণ তার তারিফ করতে শেখাও। আমার বেলায় কী করেছ? আমাকে একটা চেরোকি ধর্মবাপ বানিয়েছ। শিখিয়েছ আমাদের আদিবাসী কুটিরগুলোকে ঘেন্না করতে, আর সাদা মানষদের আদব কেতা ভালাবাসতে। আমি মাথা তুলে দেখতে পাই প্রতিশ্রুতির দেশে মিসেস কনিয়ার্সকে, কিন্তু আমার স্থান—আরক্ষিত জঙ্গলে।"

'ছোট-ভালুক তার চীফের পোশাকে দাঁড়িয়ে ওঠে, আর হো-হো করে আরেকবার হাসে। বলতে থাকে, "কিন্তু সাদা মানুষ জেফ্! পাংশুবদন একটা রাস্তা রেখেছে। সেটা সাময়িক, তবে তাতে বিরামের সুখ আছে; আর সেটার নাম হুইস্কি।" তারপর সে পথ ধরে সিধে হেঁটে চলে যায় শহরের দিকে। আমি মনে-মনে বলি, "মানিটু দেবতা যেন আজ রাতে ওকে দিয়ে শুধু জামিনযোগ্য অপরাধ করান!" কারণ আমি দেখতেই পাচ্ছি জন টম এবার সাদা মানুষের সান্ত্বনার দিকে ঝুঁকেছে।

'তখন বোধহয় সাড়ে-দশটা হবে, বসে ধূমপানই করে চলেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম রাস্তায় পট্ পট্ শব্দ—মিসেস কনিয়ার্স ছুটে আসছেন। তার চুল এলোমেলো, মুখে এমন একটা ভাব যার মানে হতে পারে—সিঁদেল চোর বা ইঁদুর বা 'ময়দা ফুরিয়ে গেল যে!' বা সব একসঙ্গে মিলে যা হয়। "ওঃ মিঃ পিটার্স।" চেঁচিয়ে উঠলেন, যেমন তাঁরা চেঁচাবেনই—"ওহো হো!" আমি চট্ করে একটু ভেবে নিই, তারপর সংক্ষেপে বলি, "দেখুন, আমরা দু'জন ভায়ের মতো, আমি আর ওই ইণ্ডিয়ান, কিন্তু তবু তাকে দু'মিনিটে শায়েস্তা করব যদি—"

'উনি পাগলের মতো আঙুলের গাঁট মট্‌কে বলেন, "না না! মিঃ ছোট-ভালুকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এ হচ্ছে আমার—স্বামী। আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। ও হো-হো! ঠিক যখন আমার বুকের মধ্যে ওকে ফিরে পেলাম! ওই নিষ্ঠুর বদমাশ! জীবনের সব রকম তিক্ততা সে আমায় গিলিয়েছে। আমার বেচারি ছোট্ট ছানা, যার এখন বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমোবার কথা, তাকেই শয়তানটা উঠিয়ে নিয়ে গেল!"

'শুধোই, "এসব ঘটল কেমন করে? সব বৃত্তান্তটা শুনি।"

'বিস্তারিত বললেন উনি, "ওর বিছানা গুছিয়ে দিচ্ছিলাম, রয় খেলছিল হোটেলের বারান্দায়। তারপর 'সেই' ছুটে এল সিঁড়ি ধরে। রয়ের চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম বাইরে। আমার স্বামী তাকে এর মধ্যেই বগিগাড়িতে তুলে নিয়েছে। আমার ছেলেকে ভিক্ষে চাইলাম আমি। আর সে আমায় দিল এটা।"— বলে উনি মুখ ফেরালেন আলোর দিকে। একটা গাঢ় লাল রক্তের দাগ গাল থেকে মুখ অবধি ছড়ানো। বললেন, "সে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে এটা করেছে।"

'বললাম, "হোটেলে ফিরে চলুন তো, আমরা দেখব কী করতে পারি।" •

'বাকি আরো কিছু তিনি যাবার পথেই বললেন। চাবুক মারার সময় ওঁর স্বামী বলেছিল সে জেনে গিয়েছিল উনি বাচ্চাকে নিতে আসছেন, তাই একই ট্রেনে চড়েছিল সে-ও। মিসেস কনিয়ার্স তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন, আর ওরা সব সময় নজর রাখত ছেলেটার ওপর, কারণ ওঁর স্বামী আগেও চেষ্টা করেছিল ওকে চুরি করতে। বুঝলাম লোকটা রেলরাস্তার কনট্রাকটরের চেয়েও খারাপ লোক। মনে হয় সে বউয়ের টাকা উড়িয়েছে, তাঁকে পিটিয়েছে, তাঁর ক্যানারি পাখিটাকেও মেরেছে, আর সর্বত্র বলে বেড়িয়েছে তার বউ আবেগহীন মেয়ে।

'হোটেলে দেখলাম পাঁচজন ক্ষিপ্ত নাগরিকের গণসভা বসেছে। তারা তামাক চিবুচ্ছে আর এই অত্যাচারের নিন্দা করছে। শহরের বেশির ভাগ লোক দশটার আগে থেকেই নিদ্রিত। আমি মহিলার সঙ্গে চুপিসারে কথা বলি, তাঁকে বলি আমি রাত একটার ট্রেনে পরের শহরে যাব, চল্লিশমাইল পুবে। কারণ ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে মহাত্মা মিঃ কনিয়ার্স বোধহয় ওখানেই রেলগাড়ি ধরবেন। তাঁকে বলি, "আমি জানি না অবশ্য তার কী আইনি অধিকার আছে; তবে তাকে পেলে একটা বেআইনি ঘুষি মারতে পারি বাঁ চোখে, এক-দু'দিন বেঁধেও রাখতে পারি—আর কিছু না-হোক, শান্তি ভঙ্গ করার অপরাধে।"

'মিসেস কনিয়ার্স ভেতরে গিয়ে হোটেলমালিকের বউয়ের গলা ধরে কাঁদেন, উনি একটু আদা-চা তৈরি করছেন যাতে বেচারি মহিলার সব কিছু আরাম হয়। হোটেলমালিক বেরিয়ে আসেন বারান্দায়, নিজের একখানা গ্যালিস আঁটতে-আঁটতে। আমায় বলেন:

"সেই বেডফোর্ড সীগালের স্ত্রী একটা জ্যান্ত টিকটিকি গিলে ফেলার পর এমন উত্তেজনা শহরে কখনো দেখিনি। আমি জানলা দিয়ে দেখেছিলাম লোকটা গাড়ির চাবুক দিয়ে ওঁকে মারছে, আর সবকিছুই। আপনার ওই স্যুটখানার দাম কত হবে স্যর? মনে হয় বৃষ্টি হবে, তাই না? বলুন তো ডক, আপনার ওই ইন্ডিয়ানটা আজ রাতে যেন বেশ নেশার ঘোরে ছিল, তাই তো? আপনি এসে পড়ার খানিক আগেই তো সে এসেছিল, তাকে বললাম এখানকার ঘটনার ব্যাপারটা। সে যেন কেমন অদ্ভুত রকমের একটা ডাক দিয়ে উঠল, তারপর ছুটে চলে গেল। আন্দাজ করছি আমাদের কনস্টেবল তাকে সকাল হবার আগেই হাজতে পুরবে।"

'ভাবলাম একটার ট্রেন ধরতে বাইরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করি। খুব একটা আনন্দে উদ্বেল হইনি। এই তো জন টম গেছে তার নতুন কোনো ফুর্তিতে, আর এই ছেলেচুরির ব্যাপার আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে যা হোক, বরাবরই তো অন্যের ঝামেলা আমাকেই পোয়াতে হয়। ক'মিনিট বাদে-বাদেই মিসেস কনিয়ার্স বেরিয়ে আসছেন বারান্দায়, আর যে-পথে বগিগাড়িটা গেছে সে দিকে চোখ তুলে দেখছেন, যেন প্রত্যাশা করছেন ছেলেটা একটা সাদা পনিতে

চেপে হাতে লাল আপেল নিয়ে ফিরে আসছে। আর,—এটাই তো মেয়েমানুষের মতো, তাই না? বেড়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়। বেড়াল গিন্নি বললেন, "আমি এই গর্তে একটা ইঁদুর সেঁধোতে দেখেছি। তোমরা যদি চাও তো ওদিকে গিয়ে তক্তা ঢাকো; আমি দেখব আমার এদিকের গর্ত।"

'পৌনে-একটা নাগাদ মহিলা আবার বেরিয়ে এলেন, ছটফট করছেন, গলগল করে কাঁদছেন, যেমন মেয়েরা নিজের খুশিতেই করে থাকে, আবার তাকাচ্ছেন রাস্তার দিকে আর কান পেতে শুনছেন। আমি বলি, "দেখুন মাদাম, ঠাণ্ডা চাকার দাগের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। এতক্ষণে ওরা অর্ধেকটা পথ—"। "চুপ" উনি বললেন হাতটা উঁচিয়ে। আর আমি সত্যিই শুনতে পেলাম অন্ধকারে কিছু আসছে খপ্ খপ্ করে; তারপর এল এক বিকট যুদ্ধনাদ—যা ম্যাডিসন স্কোয়ার বাগিচায় "বাফেলো বিলের" ম্যাটিনি শোর বাইরে শোনারই কথা নয়। তারপর সিঁড়ি ধরে উঠে বারান্দার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই অভব্য ইণ্ডিয়ানটা। হলঘরের বাতির আলো তার ওপর, তবু চিনতে পারছিলাম না মিঃ জে. টি. ছোট-ভালুককে—১৮৯১ সালের কলেজের ছাত্র। যা দেখলাম তা হল একজন চেরোকি বীর, এখন সে ভ্রমণ করছে যুদ্ধের পথে। আগুন-জল আর অন্যসব জিনিস এখন তাকে চালাচ্ছে। বাকস্কিনের জামা ছেঁড়াখোড়া, ঝগড়াটে মোরগের মতো মাথার পালকগুলো জটপাকানো। ওর মোকাসিন জুতোয় শত-শত মাইলের ধুলো, আর চোখে সেই দীপ্তি যা আদিবাসীদের নিজস্ব। কিন্তু তার বাহুর মধ্যে বয়ে এনেছে সেই খোকাটিকে, তার চোখ আধবোজা, ছোট-ছোট জুতো দুটো দুলছে, আর একটা হাত আঁকড়ে রয়েছে ইণ্ডিয়ানের জামার কলারে।

' "পাপ্পুজ!" বলে জন টম, লক্ষ্য করি ওর জিভ থেকে অদৃশ্য হয়েছে সাদা আদমির ব্যাকরণ ফুলঝুরি। সে এখন আদি অকত্রিম চেহারার ভালুক-নখ আর তামাটে রং-ধারী। "এনেছি আমি" বলে জন টম বাচ্চাটিকে শুইয়ে দেয় মার কোলে, "পনের মাইল দৌড়েছি—আঘ্—ধরেছিলাম সাদা মানুষকে। আনলাম পাপ্পুজকে।"

'ছোটখাটো মহিলা এখন অশেষ আনন্দে বিহ্বল—ঝামেলা-পাকানো দস্যি ছেলেটাকে যেন জাগাতেই হবে, আর তাকে বুকে জড়িয়ে সবাইকে জানাতেই হবে সে তার মায়ের বুকের আপন ধন। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মিঃ ছোট ভালুকের দিকে তাকাতে তার বেল্টের মধ্যে একটা জিনিস আমার নজর কাড়ল। বললাম, "ম্যাডাম, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আর এই দাপিয়ে-বেড়ানো খোকাটাকেও শুইয়ে দিন। এখন আর কোনো বিপদ নেই, কাল রাতের ছেলেচুরির ব্যাপারটা এবার মিটে গেছে।"

'জন টমকে তাড়াতাড়ি মিঠে কথায় ভুলিয়ে নিয়ে গেলাম শিবিরে। যখন সে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে ঘুমোতে শুরু করল, আমি "সেই জিনিসটা" ওর বেল্ট্

থেকে টেনে বের করলাম আর ফেলে দিলাম এমন জায়গায় যেখানে শিক্ষার দৃষ্টি গিয়ে পড়বে না। কারণ ফুটবলের কলেজগুলো অবধি পছন্দ করে না তাদের পাঠ্য তালিকায় "মাথার চামড়া তুলে নেবার" কলাকৌশল।

'পরদিন সকাল যখন দশটা, জন টম জেগে উঠে চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। আমি খুশি হই ফের ওর চোখে এই উনিশ শতাব্দীর আবির্ভাব দেখে।

'সে জিজ্ঞেস করে, "ব্যাপারটা কী হয়েছিল জেফ?"

'বললাম—"একটু আগুন-জলের বাড়াবাড়ি।"

'জন টম ভুরু কোঁচকায়, কী একটু ভাবে। তারপর সিধেসিধিই বলে, "আর তার সঙ্গে মিশেছিল একটু আকর্ষণীয় শারীরিক ঝাঁকুনি, যাকে বলা হয় 'নিজস্ব প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া'। মনে পড়ছে এবার। ওরা কি চলে গেছে এর মধ্যেই?"

'জবাব দিই, "হ্যাঁ, সাড়ে সাতটার ট্রেনে।"

'জন টম বলে, "আঃ! এই বরং ভাল হল। পাংশুবদন, এবার চীফ দাওয়াই মালিককে একটু জোলাপ বানিয়ে দাও, তাহলেই সে আবার মানুষের বোঝা কাঁধে তুলবে।"

The Atavism of John Tom Little Bear, এভরিবডিস্, ১৯০৩

কর্জা-পত্র

সে সব দিনে গরুভেড়ার পালকরাই ছিল সবার মাথায়। তৃণজগতের দিক্‌পাল, দেশ-গাঁয়ের রাজা, চারণভূমির প্রভু, জানোয়ারের রক্ত মাংসের মালিক। সোনার রথেও চড়তে পারত ওরা, যদি অবশ্য সেদিকে ওদের রুচি থাকত। আসলে গোপালকরা ডলারের আকস্মিক ধান্দাবাজিতে পড়ে গেছে। অ-সভ্যরকমের অতিরিক্ত টাকা তাদের হাতে এসেছে বলেই বোধহয় ওরা মনে করে। কিন্তু টাকা খরচ করবে কীসের পেছনে? দামি পাথর-বসানো পকেট-ঘড়ি, যার বিশালতা পাঁজরায় খোঁচা মারে, তা সে কিনে ফেলেছে; ক্যালিফোর্নিয়ার রুপোর মেক্-বসানো জিন; অ্যাঙ্গোরা চামড়ার জার্কিন-কোট, আর বন্ধুবান্ধব সবাইকে ডেকে হুইস্কির 'বারে' নিয়ে যাওয়া, এসব যখন হয়েই গেছে তখন বাকি কী রইল?

তবে হ্যাঁ, বাড়তি ধন কমাবার ব্যাপারে অতটা সংকীর্ণদৃষ্টি হতে পারে না সেইসব ল্যাসো-ছোঁড়া লক্ষ্মীমন্তরা, যাদের ঘরে বউ-ঝিরা আছে। মেয়েদের পাঁজরা চাপা বুকে লুকিয়ে থাকে মানিব্যাগ হাল্‌কা করার প্রতিভা, বহু বছর সুযোগাভাবে সুপ্ত থাকলেও বন্ধুগণ, কখনোই তা পুরো নির্বাপিত হয় না।

এই ভাবেই চিরহরিৎ ওকবন থেকে বেরিয়ে এসেছিল "বার-সার্ক্‌ল্‌" র‍্যাঞ্চের মালিক লং বিল লঙ্‌লি। স্ত্রী-পরিচালিত মানুষ, ফ্রিও থেকে এলেন সাফল্যের শহুরে আনন্দ উপভোগ করতে। সঙ্গে তাঁর আধ-মিলিয়ন ডলার, আয়ও ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে।

লং বিলকে বলা যায় শিবির-তাঁবু আর মেঠো-পথের "স্নাতক"। ভাগ্য আর মিতব্যয়িতা, শীতল মস্তিষ্ক আর বে-ওয়ারিশ বাছুরের দিকে দূরবীনের মতো প্রখর নজর, তাঁকে কাউবয় থেকে খামারের মালিক বানিয়ে তুলেছে। তারপর এল গরু-ব্যবসার তুঙ্গী বাজার, আর সৌভাগ্যের দেবী ক্যাকটাস-কাঁটার বনে কোনো-ক্রমে পা বাঁচিয়ে এসে তাঁর র‍্যাঞ্চের দোরগোড়ায় উজাড় করে দিলেন প্রাচুর্যের ঝাঁপি।

চাপারোজার ছোট সীমান্ত শহরে লঙ্‌লি গড়ে তুললেন এক মূল্যবান বসতবাড়ি। এখানেই তিনি বন্দী হলেন সামাজিক অস্তিত্বের রথচক্রে। একজন কেউকেটা নাগরিক হওয়া ছিল তাঁর ভাগ্যের লেখা। কিছুকাল প্রথম-খোঁয়াড়ে-আটক 'মাস্টাং' ঘোড়ার মতো নর্তনকুর্দন করলেন। তারপর দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেন চাবুক আর ঘোড়ার রেকাব। হাতে যেন তাঁর সময় নেই তখন। তিনি চাপারোজার ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সংগঠন করে নিজেই নির্বাচিত হলেন প্রেসিডেন্ট রূপে।

একদিন এক অম্বলরুগি ভদ্রলোক, চোখে ডবল আতস-কাঁচ লাগানো চশমা, এসে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের জানলা দিয়ে গলিয়ে দিলেন একটা সরকারী চেহারার ভিজিটিং কার্ড। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা নাচতে শুরু করল এক ন্যাশনাল-ব্যাঙ্ক পরীক্ষকের আঙুলের ইশারায়।

এই পরীক্ষক, মিঃ জে. এডগার টড, হলেন খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত দেখার লোক।

সব কিছু হয়ে যাবার পর, টুপিটা মাথায় বসিয়ে পরীক্ষক-মশাই ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট মিঃ উইলিয়ম লঙ্‌লির খাস কামরায়।

লঙ্‌লি তাঁর ভারী ধীর গলায় বললেন, "তা, কেমন দেখলেন সব? পছন্দ না-হবার মতো কিছু পেলেন আপনার তদন্তে?"

টড বললেন, "ব্যাঙ্কের সব হিসেবই তো ঠিকঠাক মিলেছে মিঃ লঙ্‌লি। আপনাদের ধারকর্জ দেবার ব্যাপারটাও খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে—শুধু একটাই ব্যতিক্রম। আপনারা খুব বিশ্রি একটুকরো নথি বহন করছেন। এমনই খারাপ সেটা যে আমার ধারণা আপনি নিশ্চয় বুঝতেই পারেননি কী মারাত্মক গুরুতর জায়গায় সেটা ফেলেছে আপনাদের। আমি বলছি টমাস মারভিনকে একটা দশ হাজার ডলারের ঋণ, অনুরোধের ভিত্তিতে, দেবার কথা। ব্যক্তিগতভাবে একজনকে যতটা ধার দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে আইনসঙ্গত, টাকার পরিমাণটা শুধু তার চেয়ে অতিরিক্তই নয়, ধার দেওয়াও হয়েছে কোনোরকম সুপারিশ বা অঙ্গীকার জামিন ছাড়াই। এইভাবে আপনারা দু'দিক থেকে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ব্যবসার কানুন ভেঙেছেন, আর নিজেদের দাঁড় করিয়েছেন সরকারী ফৌজদারি অভিযোগের সামনে। এ বিষয়ে একটা রিপোর্ট আমাকে করতেই

হবে মুদ্রাসংক্রান্ত নিয়ামক-কর্তার কাছে, আর সে রিপোর্টের ফল হবে বিষয়টা চলে যাবে বিচার বিভাগের হাতে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁরাই নেবেন। তাহলেই বুঝতে পারছেন কত গুরুতর এই ব্যাপারটা।"

বিল লঙ্‌লি তাঁর সুদীর্ঘ মন্থর দেহের কাঠামোটা এলিয়ে দিলেন ঘোরানো-চেয়ারে। মাথার পেছনে দু'হাতের পাঞ্জা জড়িয়ে একটু বেঁকে তাকালেন পরীক্ষকের মুখের দিকে। পরীক্ষক অবাক হয়ে গেলেন ব্যাঙ্কারের রুক্ষ ঠোঁট ঘিরে একটা হাসি উদ্গত হতে দেখে; তাঁর হালকা-নীল চোখজোড়ায় একটা সহৃদয় ঝিলিকও রয়েছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব যদি তিনি বুঝেও থাকেন তার কোনো ইঙ্গিত নেই তাঁর চেহারায়।

লঙ্‌লি প্রায় আন্তরিক কণ্ঠেই বললেন, "আপনি অবিশ্যি টম মারভিনকে জানেন না। হ্যাঁ, ও-ঋণটার বিষয় আমার জানা আছে। ওটার সঙ্গে কোনো কর্জাপত্রের জামানত নেই---একমাত্র টম মারভিনের মৌখিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া। কোনো কারণে আমি বরাবরই লক্ষ্য করছি একজন লোকের কথা যদি পাকা হয়, তার চেয়ে ভাল নিরাপত্তা আর নেই। ও হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সে-রকম ভাববে না তা আমি জানি। ঠিক আছে, টমের সঙ্গে নয় ওই কর্জার চিঠিটা নিয়ে কথা বলব!"

মিঃ টডের অম্বলটা যেন হঠাৎ খারাপের দিকে মোড় নেয়। বনবাসী ব্যাঙ্কারের দিকে তাকান তাঁর ডবল-আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে।

লঙ্‌লি সহজেই একটা ব্যাখ্যা খাড়া করেন—"দেখুন স্যার, টম খবর পেয়েছিল রিও গ্রাণ্ডি নদীর ধারে রকি ফোর্ডের কাছে দু'হাজার 'আড়াই বছুরে' বাছুর আছে যা জানোয়ার-পিছু আট ডলারে পাওয়া যেতে পারে। আমার ধারণা ওটা বুড়ো লিয়ান্দ্রো গার্সিয়ার পুরনো সম্পত্তি যা সে চোরাচালান করে পাঠায়, তাই চটপট্ বিক্রি করে কিছু লাভ ওঠাতে চায়। আর ওই গরুগুলোরই দাম এখন কানসাস্ শহরে জানোয়ার-পিছু পনের ডলার। টম সেটা জানত এবং আমিও জানতাম। ওর কাছে ছ'হাজার ডলার ছিল, আর আমি তাকে এই দশ হাজার দিলাম ব্যবসাটা সেরে ফেলতে। ওর ভাই এড তিন হপ্তা আগেই গরু নিয়ে আড়তে চলে গেছে। এবার যে-কোনো দিনই এসে পড়বে টাকা নিয়ে। ও ফিরলেই টম কর্জাটা মিটিয়ে দেবে।"

ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক তো শিউরে উঠলেন যেন। হয়তো ওঁর কর্তব্য ছিল এখুনি বেরিয়ে পড়ে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে নিয়ামক-কর্তাকে ঘটনার বিবরণ 'তার' করে জানানো। কিন্তু তা করলেন না। তিন মিনিট ঝাড়া লঙ্‌লিকে জোরালো ফলপ্রসূ ভাষায় বুঝিয়ে চললেন। ব্যাঙ্কারকে অবশেষে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে তিনি ভয়ানক একটা বিপদের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর একটা ক্ষীণ সুযোগ দিলেন বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার।

লঙ্‌লিকে বললেন, "আজ রাতে আমি হিল্‌ডেল যচ্ছি একটা ব্যাঙ্ক পরীক্ষা করতে। ফেরবার পথে আমি চাপারোজা হয়েই ফিরব। কাল ঠিক বারোটার সময়

আসব এই ব্যাঙ্ক দেখতে। এই সময়ের মধ্যে যদি এই কর্জ পরিষ্কার মিটে যায়, তাহলে আর আমার রিপোর্টে ব্যাপারটার উল্লেখই থাকবে না। যদি তা না হয়, তাহলে তো কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।"

এই কথা বলে পরীক্ষক মাথা ঝুঁকিয়ে বিদায় নিলেন।

ফার্স্ট ন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট আরো আধঘন্টা চেয়ারে গড়ালেন, তারপর একটা হাল্কা চুরুট জ্বালিয়ে হেঁটে গেলেন টম মারভিনের বাড়িতে। বাদামি মোটা-কাপড়ের পোশাকপরা র‍্যাঞ্চমালিক মারভিন টেবিলে পা তুলে বসে কিছু ভাবছিল আর কাঁচা চামড়ার চাবুকে বিনুনি পাকাচ্ছিল।

টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লঙ্‌লি বললেন, "টম, এডের কাছ থেকে এখন অবধি কোনো খবর পেয়েছ?"

বিনুনি করতে করতেই মারভিন বলল, "না, এখনো নয়। মনে হয় কদিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে।"

লঙ্‌লি বললেন, "ব্যাঙ্কের পরীক্ষক এসেছিল একজন। আজ আমাদের দপ্তরের চাদ্দিক শুঁকে শেষে বন্দুক তাক করল তোমার ওই কর্জা-চিঠিটার ওপর। তুমি জানো আমি জানি ওটার মধ্যে গলদ নেই, কিন্তু ব্যাপারটা যে ব্যাঙ্ক-কানুনের বিরুদ্ধে! আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম আবার ব্যাঙ্ক পরীক্ষার আগে ও-টাকা তুমি মিটিয়ে দেবেই, তা ওই হারামজাদা বেমক্কা আমাদেরই ধরেছে, টম। এখন ব্যাপার হল, আমার নিজের কাছেই ক্যাশ কম এখন, নয়তো তোমাকে টাকাটা দিতে পারতাম মিটিয়ে দেবার জন্য। আমাকে সময় দিয়েছে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত, ওই সময়ের মধ্যে চিঠির জায়গায় নগদ টাকা দেখাতে হবে, নতুবা—"

"নতুবা কী, বিল?"—শুধোলো মারভিন। লঙ্‌লি ইতস্তত করছেন।

"তা, মনে হয় এর মানে স্যাম চাচার দু'পায়ের ল্যাং খেয়ে যাব।"

চামড়া-বিনুনি নিয়ে মগ্ন মারভিন বলল, "তোমার টাকা আমি সময় মতোই জোগাড় করতে চেষ্টা করব।"

"ঠিক আছে টম", কথা শেষ করে লঙ্‌লি দরজার দিকে ফেরেন—"আমি জানতাম তোমার পক্ষে সাধ্য হলে, জোগাড় তুমি করতেই।"

মারভিন চাবুক রেখে বেরিয়ে গেল শহরের অন্য একমাত্র ব্যাঙ্কে—যেটা বেসরকারী। চালায় "কুপার-এবং-ক্রেইগ্"।

"কুপার",—ওই নামে যে অংশীদার, তাকে বলল মারভিন, "আজ বা কাল আমাকে দশ হাজার ডলার পেতেই হবে। আমার বাড়ি আছে, আরো অনেক কিছু এখানে আছে যার মূল্য ছ'হাজার ডলার, ওগুলোই প্রকৃত জামানত হতে পারে। কিন্তু আমার একটা গরুর ব্যবসা চলছে, যেটাতে আর ক'দিনের মধ্যে ও টাকার অনেক বেশি লাভ উঠে আসবে, তা নিশ্চিত।"

কুপার কাশতে থাকে।

মারভিন বলে, "এবার ঈশ্বরের দোহাই, না বোলো না। অতটাই টাকা আমার ধার রয়ে গেছে একটা কর্জপত্রে। ওটা এখন শোধ দেবার ডাক পড়েছে। আর ডাক দিয়েছে যে, তার সঙ্গে দশ বছর ধরে একই কম্বলের তলায় কাটিয়েছি গরুর ক্যাম্পে, পাহারাদলের ক্যাম্পে। আমার যা কিছু আছে, সবই সে ডেকে চেয়ে নিতে পারে। আমার রক্ত চাইলেও আমি দিতে বাধ্য। তাকে এ টাকা পেতেই হবে যেমন করে হোক। সে ভীষণ একটা ইয়ের মধ্যে—মানে টাকাটা তার প্রয়োজন আর আমাকে তা জোগাড় করতে হবেই। তুমি তো জান কুপার, আমার কথার দাম আছে।"

ভদ্রভাবে সায় দিল কুপার, "তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে জানো তো, আমার একজন অংশীদার আছে। ঋণ আমি খুশিমতো দিতে পারি না। যদি তোমার হাতে শ্রেষ্ঠ জামানতও থাকে, মারভিন, তবু এক সপ্তাহের আগে তো তোমার আশা পূরণ করতে পারছি না আমরা। এক্ষুনি আমরা রকডেলের 'মায়ার ব্রাদার্সে' পনের হাজার ডলার পাঠাচ্ছি তারা তুলো কিনবে বলে। আজ রাতের ছোট-গেজ ট্রেনেই যাচ্ছে টাকাটা। তার ফলে ক্যাশ আমাদের হাতে থাকছে খুবই কম। দুঃখিত, তোমার জন্য ব্যবস্থা করতে পারছি না।"

মারভিন ফিরে গেল তার ছোট, ফাঁকা অফিসে, আবার বিনুনি করতে লাগল চাবুকের লাছিতে। বিকেল চারটে নাগাদ সে গেল ফার্স্ট ন্যাশনালে, লঙ্‌লির ডেস্কের সামনে রেলিঙের ওপর ঝুঁকল।

"আজ রাতে তোমার ও-টাকাটা আমি জোগাড় করতে চেষ্টা করছি—মানে কাল সকালের মধ্যেই, বিল।"

শান্তস্বরে লঙ্‌লি বললেন, "ঠিক আছে, টম।"

সে রাতে ঠিক ন'টার সময় টম মারভিন সাবধানে বেরিয়ে এল তার ছোট কাঠের বসতবাড়িটা থেকে। ছোট শহরের প্রায় প্রান্তেই বাড়িটা, তাই রাতের ওই সময়টাতে কাছেপিঠে লোকজন খুব কম। মারভিন দুটো ছ'ঘরা পিস্তল ঝুলিয়েছে বেল্টে, মাথায় চওড়া কানাতওয়ালা নরম টুপি। একটা নির্জন রাস্তা ধরে সে হন্ হন্ করে চলেছে। তারপর ধরল বালি-পথ, যেটা সরু-গেজ রেললাইনের সমান্তরাল গিয়েছে। অবশেষে এল জলের ট্যাঙ্কের কাছে, শহর থেকে দু'মাইল দক্ষিণে। সেখানে টম মারভিন থেমে পড়ে, একটা কালো সিল্কের রুমাল বের করে মুখমণ্ডলের নিচের দিকে বাঁধে, আর টুপিটাও নিচুদিকে টেনে দেয়।

দশ মিনিটের মধ্যে রকডেল যাবার নৈশট্রেনটা জলের ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়ায়। চাপারোজা থেকে এসেছে।

দু'হাতে দুটো বন্দুক তুলে মারভিন বেরিয়ে আসে একটা ওকবনের ঝাড় থেকে, এগিয়ে যায় ইঞ্জিনের দিকে। কিন্তু সে তিন পা যাবার আগেই দুটো লম্বা বলিষ্ঠ বাহু তাকে পেছন থেকে চেপে ধরে। তাকে মাটি থেকে তুলে ছুঁড়ে দেয়। ঘাসের ওপর মুখ গুঁজে সে উল্টে পড়ে। একটা ভারি হাঁটু যেন ওর পিঠের ওপর চেপে

বসেছে, দুটো কব্জিই পিষে ধরেছে লোহার মতো কঠিন হাতে। ঠিক ওইভাবেই শিশুর মতো আটক রইল সে, যতক্ষণ-না ইঞ্জিন ট্যাঙ্ক থেকে জল নেয়। ট্রেনটা সরে যায় ক্রমেই গতি বাড়িয়ে চোখের অন্তরালে। তারপর ও ছাড়া পেল, উঠে দাঁড়িয়ে সিধে তাকাল বিল লঙ্‌লির মুখের দিকে।

"ব্যাপারটার এভাবে নিষ্পত্তি করতে যাবার কোনো কারণই ছিল না, টম্।" বললেন লঙ্‌লি, "কুপারের সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা হল, তার ও তোমার মধ্যে কী কথা হয়েছিল সেটাও সে বলল। তারপর গেলাম তোমার বাড়ি, দেখলাম তুমি বন্দুক ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসছ। পেছু নিলাম তোমার। চল ফিরে যাই, টম।"

ওরা পাশাপাশি একসঙ্গে হেঁটে চলেছে। মারভিন বলে উঠল, "এই একটাই সুযোগ আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তুমি কর্জার টাকা ফেরত চেয়েছিলে, আর আমি চেষ্টা করেছিলাম সাড়া দিতে। এবার ওরা যদি তোমাকে চেপে ধরে, বিল, তাহলে তুমি কী করবে?"

"তোমাকে চেপে ধরলে তুমি কী করতে বল?"—লঙ্‌লির জবাব।

মারভিন মন্তব্য করে, "আমি কখনো ভাবিনি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকব ট্রেন আটকাবার জন্য। কিন্তু ধার ফেরতের হুকুম হল আলাদা কথা। আমার কাছে চাওয়া মানেই দাবি। আমাদের হাতে আর মাত্র বারো ঘন্টা সময় আছে, বিল, তার পরেই সেই গোয়েন্দাটা ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর। যেমন করে হোক্ ওদের টাকা তুলে দেখাতেই হবে। হয়তো পারব— আরে! 'মহান্ স্যাম হুস্টন!' শুনতে পাচ্ছ তুমি?"

মারভিন ছুটে দৌড়োতে শুরু করে, লঙ্‌লিও ওর পেছন-পেছন। শুনতে পান্ শুধু চমৎকার একটা শিসের শব্দ রাতের আঁধারে কোত্থেকে ভেসে আসছে "কাউবয়ের বিলাপ" গানটার ঘুম-জড়িত সুরে।

ছুটতে ছুটতেই মারভিন বলে, "এই একটাই সুর তো ওর জানা। আমি বাজি রাখতে—"

ওরা মারভিন-বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছে গেছে। সে লাথি মেরে ঢোকে আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মেঝের ওপর রাখা একটা পুরনো ব্যাগে হোঁচট খেয়ে। একটি রোদপোড়া, শক্ত-চোয়াল যুবক, ভ্রমণ-বিবর্ণ, বিছানায় শুয়ে বাদামি সিগারেট টানছিল।

মারভিন দম-আটকানো গলায় জিজ্ঞেস করে—"কী খবর হল, এড?"

"হল কোনো রকম", ঝিমোনো সুরে জবাব দেয় করিৎকর্মা যুবক, "এই তো সবে এলাম সাড়ে ন'টার গাড়িতে। সবগুলোকে সিধে ঝেড়ে দিলাম পনের ডলার দরে। এবার দাদা, দয়া করে ওই ব্যাগটাকে ঘরময় লাথি মেরে বেড়িও না—ওর পেটের মধ্যে সবুজ-নোটে উনত্রিশ-হাজার ডলার আছে!"

A Call Loan, এভরিবডি'স্, ১৯০৩ (সিডনি পোর্টার নামে)

জিমি হেজ্ আর ম্যুরিয়েল

(১)

নৈশ ভোজন সমাপ্ত; শিবিরের মধ্যে নেমে এসেছে সেই নৈঃশব্দ যা মকাই-তুষের সিগারেট পাকানোর অনুষঙ্গী। অন্ধকার মাটি থেকে জলাশয়টাকে দেখায় চকচকে, একখণ্ড ভেঙে পড়া আকাশের মতো। নেকড়েদের চিৎকার। ধুপ-ধুপ্ শব্দে বোঝা যায় পায়ে-দাড়ি বাঁধা পনিগুলো নতুন-নতুন জায়গায় ঘাস খেতে যাচ্ছে। টেক্সাস রেঞ্জারদের সীমান্ত ব্যাটেলিয়নের আধা-ফৌজীদল এখানেই,— আগুনের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে।

শিবিরের ওপরেই ঘন ঝোপ থেকে এল একটা বহু-পরিচিত শব্দ—কাঠের রেকাব-জিনের সঙ্গে ঘষা খেয়ে যেমন মট্‌মট্ করে ওকের ঝাড়। সাবধানে কান পেতে শোনে রেঞ্জাররা। একটা জোরালো উল্লসিত কণ্ঠ যেন আশ্বস্ত করার সুরে বলছে:

'এবার চাঙা হয়ে ওঠ্ ম্যুরিয়েল, বুড়ি মেয়ে, আমরা যে প্রায় এসে পড়েছি! তোর পক্ষে বড় লম্বা দৌড় হল, না রে মান্ধাতা কালের খুদে টাকু-কল? এ হেহে, আবার আমাকে চুম্ খেতে হবে না। অতো জোরে কাঁধ চেপে ধরিস না—জানিস তো এই ছবির ঘোড়াটার চলা একটু গোলমেলে। যদি খেয়াল না রাখা যায়, আমাদের দু'জনকেই পট্‌কে ফেলে দেবে।'

দু'মিনিট আরো সবুর করার পর দেখা গেল একটা ক্লান্ত "পটের ছবির" পনি পায়ে পায়ে ঢুকছে শিবিরের মধ্যে। কুড়ি বছর বয়েসের একটি রোগা লম্বা ছোকরা জিনের ওপর গড়াচ্ছে। যে "ম্যুরিয়েলে"-র সঙ্গে সে কথা বলছিল তার টিকিও দেখা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার সওয়ার ফুর্তিভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'এই যে ভাইসব! এখানে একটা চিঠি আছে লেফ্‌টেনান্ট ম্যানিং-এর জন্য।"

সে ঘোড়া থেকে নামল, জিন নামিয়ে নিল, খুঁটোর দড়ির পাক খুলল, পা-বাঁধা দড়ি বের করল জিনসাজ থেকে। যে সময় লেঃ ম্যানিং, অধিনায়ক, চিঠিটা পড়ছেন, আগন্তুক সযত্নে দড়ির প্যাঁচ থেকে শুকনো কাদা ঝেড়ে ফেলছে—বোঝা যায় ঘোড়ার সামনের পা জোড়া নিয়ে তার বিবেচনা আছে।

রেঞ্জারদের দিকে হাত তুলে লেফটেনান্ট বললেন, 'ছেলেরা! এ হল মিঃ জেম্‌স হেজ্। কোম্পানির নতুন সভ্য হল। এল পাসো থেকে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌লীন একে পাঠিয়েছেন। হেজ্, তোমার রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছেলেরা করে দেবে, তার আগে তোমার পনিটা বাঁধা হোক।'

নতুন রংরুটকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করল রেঞ্জাররা। তবু তীক্ষ্ণ নজর রাখল ওর ওপর, চট্ করে কোনো অভিমতে পৌঁছোল না। একটি মেয়ে তার দয়িতকে বেছে নিতে যতটা বিচার-বিবেচনা করে তার চেয়েও দশগুণ সতর্কতা ও বিচারবুদ্ধি রাখতে হয় সীমান্তে কোনো বন্ধু সাথীকে বেছে নিতে। ওই "পাশের লোকটির" স্নায়ু, আনুগত্য, লক্ষ্য আর ঠাণ্ডা মাথার ওপরেই অনেক সময় নির্ভর করে তাদের জীবন।

তৃপ্তি করে খাওয়া দাওয়া সেরে হেজ্ আগুন ঘিরে-বসা ধূমপায়ীদের সঙ্গে বসল। ওর সাথী রেঞ্জারদের মন থেকে কিন্তু সব প্রশ্ন এখনো ফুরিয়ে যায়নি ওর চেহারাটা দেখে। ওরা শুধু দেখল একজন ঢিলে ঢালা, রোগাটে যুবককে, যার শণের রং রোদ্‌পোড়া চুল, আর বাদামি-লালচে অকপট মুখখানায় ধাঁধায়-পড়া, সরল স্বভাবের হাসি।

নতুন রেঞ্জার বলে, 'সাথীরা, আমি আমার এক মহিলা বন্ধুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। কেউ তাকে কখনো সুন্দরী বলেছে এমনটা শুনিনি, তবে, তার কিছু গুণ আছে তা আপনারা সবাই মেনে নেবেন। বেরিয়ে এস, ম্যুরিয়েল।'

সে নিজের নীল ফ্লানেল শার্টের বুকখানা খুলে দেয়। সেখান থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসে একটা কুনো ব্যাঙ্, কাঁটাওয়ালা। ওটার আঁচিল-গলায কায়দা করে বাঁধা একটা উজ্জ্বল লাল ফিতে। মালিকের হাঁটুর ওপর গুটিশুটি উঠে নিশ্চল বসে থাকে সেখানে।

'এই হল ম্যুরিয়েল', বক্তৃতার ঢঙে হাত নেড়ে বলে হেজ্, 'গুণ অনেক আছে। কখনো মুখে-মুখে জবাব দেয় না, সর্বদা বাড়িতে থাকে, আর একটা লাল পোশাক পরেই সারা হপ্তা কাটায়, রবিবারেও তাই।'

একজন রেঞ্জার দাঁত বের করে বলে, 'দেখ ওই বিচ্ছিরি জানোয়ারটাকে! আমি তো বাবা অনেক কাঁটাওলা ব্যাঙ দেখেছি জীবনে, কিন্তু কাউকে পাশের সঙ্গী বলে বেছে নিয়েছে এমন কোনোটাকে দেখিনি। ওই বিচ্ছিরি জিনিসটা কি তোমাকে আলাদা করে চিনে নিতে পারে?'

'বেশ তো, এটাকে ওদিকে নিয়ে যাও, আর দেখ', বলে হেজ্।

বেঁটে-খাটো এই ক্ষুদে প্রাণী যাকে কুনো ব্যাঙ বলে, ওটা কিন্তু একেবারে নিরীহ। যাদের খর্বাকৃতি বংশধর সে, সেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারদের মতো কুৎসিত হলেও, এ কিন্তু ঘুঘুপাখির চেয়েও শান্ত।

রেঞ্জারটা হেজের হাঁটুর ওপর থেকে ম্যুরিয়েলকে নিয়ে বসল নিজের কম্বলের আসনে। বন্দী মোচড় খায়, খামচি দেয়, লোকটার হাতের মধ্যে প্রবল লড়াই করে। দু'এক মুহূর্ত হাতে রেখে রেঞ্জার তাকে মাটির ওপর বসিয়ে দেয়। বেয়াড়া ভঙ্গিতে চটপট চারটে ঠ্যাং ছড়িয়ে অদ্ভুতভাবে সে এগিয়ে যায়, আর গিয়ে থামে একেবারে হেজের পায়ের কাছে।

অন্য রেঞ্জারটি বলে, 'আরে! আমায় ধরে পেটাও! ক্ষুদে শয়তানটা ঠিক জানে তোমাকে। কখনো ভাবতে পারিনি এই জানোয়ারগুলোর এমন অদ্ভুত বুদ্ধি থাকে!'

(২)

রেঞ্জারদের শিবিরে জিমি হেজ্ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নানা নিরীহ ধরনের সৎপ্রকৃতিসুলভ কৌতুক যেন তার অফুরন্ত, এই সব চিরকেলে রঙ্গতামাশা শিবির-জীবনের উপযুক্তও বটে। কুনো ব্যাঙটাকে ছাড়া কোথাও সে চলে না। ঘোড়া দাবড়াবার সময় জামার বুকের ভেতর, কাম্পে বসলে হাঁটু বা কাঁধের ওপর, রাতে কম্বলের তলায়—কুচ্ছিত ক্ষুদে জীবটা কখনোই তাকে ছেড়ে থাকে না।

জিমি এক বিশেষ ধরনের রসিক যাদের প্রায়ই পাওয়া যায় গ্রাম্য দক্ষিণ আর পশ্চিম তল্লাটে। মজা করার অথবা মগজ থেকে কিছু নতুন কায়দায় রগড় বের করার দক্ষতা না থাকলেও সে একটা হাসির বস্তু আবিষ্কার করেছিল, আর সেইটে নিয়েই মত্ত হয়ে থাকত। বন্ধুবান্ধবদের খুশি করার জন্য জিমির চোখে তাই একটা বেড়ে তামাশা হল পোষা কুনো ব্যাঙটিকে গলায় লাল ফিতে জড়িয়ে দেওয়া। ব্যাপারটা যখন মজারই, তখন এটাকে চালিয়েই যাওয়া হোক্ না কেন এইভাবে?

জিমি আর ব্যাঙ্‌টির মধ্যে যে কী ধরনের মনের খেলা, তা ঠিকমতো কিছুতেই বোঝা যাবে না। একটা কাঁটাওয়ালা কুনো ব্যাঙের পক্ষে এমন স্থায়ী প্রীতির সামর্থ্য কতটুকু তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক কোনো আলোচনাসভা হয়নি। জিমির মনোভাব বোঝা বরং সহজ। ম্যুরিয়েল তার বুদ্ধি-প্রদর্শনীর প্রধান সহায়, তাই সে ওকে পরিচর্যা করে। ওকে ফড়িং ধরে দেয়, আচমকা উত্তুরে হাওয়া থেকে বাঁচায়। তবু তার যত্ন-আত্তিটা আধা-স্বার্থপর। পরে সময় যখন এল ম্যুরিয়েল তাকে এর হাজার গুণ ফিরিয়ে দিল। অন্য ম্যুরিয়েলরাও তাই অন্য জিমিদের হালকা আদর-যত্নের প্রতিদান অনেক বেশিই দিয়েছে বলা যায়!

জিমি হেজ্ অবশ্য এক লাফেই তার সাথীদের পুরো "ভ্রাতৃত্বের" খাতির পেয়ে যায়নি। ওরা তাকে ভালবাসত তার সরলতা আর ভাঁড়ামির জন্য, কিন্তু তার ওপর সর্বদাই ঝুলত মুলতুবি-রাখা বিচারের খাঁড়া। শুধু কাম্পের মধ্যে ফূর্তি করাই তো রেঞ্জার জীবনের সব কথা নয়। ঘোড়া-চোরদের পেছু নেবার আছে, মরীয়া অপরাধীদের তাড়া করা আছে, বেপরোয়া মস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, বনজঙ্গল থেকে ডাকাতদের তাড়ানো, ছ'ঘরা বন্দুকের নল দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এসবই তো তাদের কাজ। জিমি বলে, 'আমি তো বেশির ভাগ সময় গরু-ছাপমারা কাউবয়।' রেঞ্জারদের ধরনে যুদ্ধের পদ্ধতিতে সে অনভিজ্ঞ। তাই রেঞ্জাররা আড়ালে গম্ভীরভাবে বিবেচনা করত, ও কীভাবে বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়াবে। কারণ, এটা জেনে রাখুন—প্রতিটি রেঞ্জার ফৌজীদলের দলগত সম্মান ও গর্বের বিষয় হল ওদের সদস্যদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বীরত্ব।

•দু'মাস হল সীমান্ত এলাকা শান্ত। রেঞ্জাররা উদাসভাবে শিবিরে গড়ায়। তারপর একদিন—সীমান্তের মরচে-পড়া রক্ষীদের মধ্যে উল্লাস জাগিয়ে—এল সেবাস্টিয়ানো সাল্‌ডার। কুখ্যাত মেক্সিকান দুর্বৃত্ত, গরুচোর। সে দলবল নিয়ে রিও গ্রাণ্ডি পার হয়ে এসে টেক্সাসের দিকে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। এসবের যখন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, জিম হেজ্‌ শিগগিরই সুযোগ পাবে নিজের হিম্মত দেখাবার। রেঞ্জাররা তৎপরতার সঙ্গে টহলদারি শুরু করল, কিন্তু সালডারের লোকজন গল্পের "লকিনভারের" মতো, তাদের ধরাই দুষ্কর।

একদিন সন্ধ্যায়, প্রায় সূর্যাস্তকালে, লম্বা চক্কর থেকে ফিরে রেঞ্জাররা খেতে বসেছে। জিন পরানো অবস্থায় ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে হাঁপায়। ছেলেরা বেকন ভাজে, কফি গরম করে। আচম্বিতে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে সেবাস্টিয়ানো সাল্‌ডার দলবল নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে— হাতে তাদের ধূমায়িত ছ'ঘরা বন্দুক, গলায় তীব্র চিৎকার। নিছক একটা বিস্ময়! রেঞ্জাররা ক্রুদ্ধকণ্ঠে শপথ তুলে নিজেদের উইনচেস্টার রাইফেল কাজে লাগায়, কিন্তু হামলাটা ছিল একান্তই মেক্সিকান ঢঙের চমক-দেখানো আক্রমণ। মহা ধুমধামে বীরত্ব দেখিয়ে হামলাদাররা ঘোড়া ছুটিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল নদীর দিকে। রেঞ্জাররা ঘোড়ায় উঠে ওদের তাড়া করেছিল, কিন্তু দু'মাইলের মধ্যেই অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অবসন্ন পনিগুলো, তাই লেফটেনান্ট ম্যানিং হুকুম দেন পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে শিবিরে ফিরে আসার।

তখনই আবিষ্কার হল জিমি হেজ্‌ বেপাত্তা। একজনের মনে আছে, হামলাটা শুরু হবার সময় তাকে দেখেছিল নিজের পনির দিকে ছুটে যেতে। কিন্তু তারপর কেউ আর তাকে নজর করে দেখেনি। ভোর হয়ে গেল, তবু জিমি নেই। হয়তো মারা গিয়ে থাকবে কিংবা আহত, এই অনুমানে ভিত্তি করে ওরা সারা তল্লাট খুঁজল, কিন্তু কোনো লাভ হল না। তারপর ওরা সাল্‌ডার-দলের পালাবার পথ অনুসরণ করল কিন্তু সে সূত্রটাও অদৃশ্য। ম্যানিং-এর সিদ্ধান্ত হল চতুর মেক্সিকানটা নাটকীয় বিদায়-দৃশ্য দেখাবার পর ফের নদী পেরিয়ে চলে গেছে। আর বাস্তবিকই, এর পর তার আর কোনো লুঠতরাজির খবর আসেনি।

এইবার রেঞ্জারদের মধ্যে এল নিজেদের বেদনাস্থল নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়। আগে যেমন বলা হয়েছে, রেঞ্জারদের দলগত সম্মান ও গর্বের বিষয় হল প্রত্যেকটি সদস্যের ব্যক্তিগত সাহসিকতা। আর এখন তারা বিশ্বাস করতে শুরু করল মাথার ওপর মেক্সিকান বুলেটের সাঁই-সাঁই দেখে জিমি হেজ্‌ ঘাবড়ে গিয়েছিল—এ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্ত করাই যায় না। বাক ডেভিস্‌ জানাল, জিমকে ঘোড়ার জন্য ছুটে যেতে দেখার পর তো সালডারের দল থেকে একটা গুলিও চলেনি। তাই গুলির ঘায়ে আহত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না তার। না, সে আসলে তার প্রথম লড়াই থেকে পালিয়ে গেছে; পরেও আর ফিরে আসতে চায়নি, জানত হাজারটা রাইফেলের নলের সামনে দাঁড়াবার চেয়েও সাংঘাতিক হত সাথীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

তাই ম্যাকলীনের বাহিনীর মধ্যে ম্যানিং-এর "সীমান্ত ব্যাটালিয়ন" ফৌজীদলটা আজ বিষণ্ন। তাদের গৌরব পতাকার ওপর এই প্রথম পড়ল একটা কলঙ্কের দাগ। দেশ-পরিষেবার ইতিহাসে আগে কখনো কোনো রেঞ্জার এমন কাপুরুষতা দেখায়নি। জিমি হেজ্‌কে ওরা সবাই ভালবাসত, আর সেইটেই হয়েছে আরো বেদনাদায়ক। দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস গড়িয়ে গেল, তবু অবিস্মৃত কাপুরুষতার এই ছোট মেঘটা কিন্তু ছেয়েই রইল শিবিরের আকাশে।

(৩)

প্রায় একটি বছর পর—বহু শিবির ভূমিতে কাটিয়ে, বহু শত মাইল এলাকা পাহারা আর রক্ষা করে লেফ্‌টেনান্ট ম্যানিং তাঁর সেই মূল দলটাই প্রায় অটুট রেখে ফিরে এলেন পুরনো শিবিরস্থলের মাত্র কয়েক মাইল দূরে একটা নতুন জায়গায়—নদীর ধারে কিছু চোরাচালানের ব্যাপারে নজর রাখতে। একদিন বিকেলে, ঘন মেস্কিট ঘাসের একটা সমতলভূমিতে ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় তারা এসে পড়ল প্রেইরির জলা-জঙ্গলের একটা মাঠে। অলিখিত কোনো বিয়োগান্ত ঘটনার জায়গায় পা রেখেছে তারা।

একটা বড় শুয়োর-গড়ানো জলার মধ্যে পড়ে আছে তিনজন মেক্সিকানের কঙ্কাল। পোশাক দেখেই শুধু তাদের চিনতে পারা যায়। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টা হল একসময়ের সেই সেবাস্টিয়ানো সাল্‌ডার। তার বিশাল, দামি সম্ব্রেরো টুপি, সোনার অলঙ্কারে ভারি—এ টুপি গোটা রিও গ্রাণ্ডি এলাকায় বিখ্যাত—পড়ে আছে তিনটি বুলেটে বিদীর্ণ হয়ে। জলার কিনারায় পড়ে আছে তিন মেক্সিকানের তিন মরচে-ধরা উইনচেস্টার—সবগুলোই তাক করে আছে একটা দিকে।

সেইদিকেই ঘোড়া চালিয়ে পঞ্চাশ গজ গেল ওরা। সেখানে জমির খানিকটা নিচু অংশে শুয়ে আছে আরেকটি কঙ্কাল, তার রাইফেলখানা এখনো সেই তিনজনের ওপর তাক করা। এটা ছিল একেবারে খতম করে দেবার লড়াই। 'একাকী' রক্ষীটিকে চিনবার কোনো উপায় নেই। তার পোশাকপরিচ্ছদ (যা প্রকৃতি এখনো ছেড়ে দিয়েছে কিছুটা চেনার যোগ্য রেখে) দেখলে মনে হবে কোনো খামারমালিক বা কাউবয়ের সাধারণ পোশাক।

ম্যানিং বললেন, 'কোনো গরু-ছাপমারা কাউবয় হবে। একা পেয়ে একে সাবাড় করেছিল ওরা। বাহাদুর ছেলে! মরার আগেও ওদের জোর শিক্ষা দিয়ে গেছে। তাই বলি, ডন সেবাস্টিয়ানোর খবর আর পাই না কেন!'

আর ঠিক তখনই মৃত মানুষটার রোদবৃষ্টিতে খয়ে-যাওয়া জীর্ণ কাপড়ের তলা থেকে মোচড় মেরে বেরিয়ে এল একটা কাঁটাওয়ালা কুনো ব্যাঙ, গলায় বিবর্ণ লাল ফিতে জড়ানো। বসল তার দীর্ঘ-নিস্তব্ধ মনিবের কাঁধের ওপর। মূক ভাষায় শোনাল এক অ-পরীক্ষিত যুবক আর তার "চিত্রার্পিত" পনির কথা—কেমন করে

সে ওদের সব সাথীদের ডিঙিয়ে সেদিন ধাওয়া করেছিল মেক্সিকান হামলাবাজদের, আর কেমন করে যুবকটি তার দলের সম্মান উঁচুতে রেখে নিজে হয়েছিল ভূলুণ্ঠিত।

রেঞ্জার বাহিনী ঘোঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায়, তাদের ঠোঁট থেকে এক সঙ্গে বের হয় একটা বন্য চিৎকার। এই আকস্মিক ধ্বনি একাধারে বিলাপ, ক্ষমাপ্রার্থনা, স্মরণলিপি আর বিজয়োল্লাসের প্রতীক। আপনারা বলবেন, এ তো এক অদ্ভুত স্তুতিগান কোনো মৃত সাথীর দেহের ওপরে! কিন্তু জিম হেজ্ যদি সেটা শুনতে পেত তাহলে নিশ্চয়ই সে বুঝত ব্যাপারটা।

Jimmy Hayes and Muriel, মান্সিজ, ১৯০৩ (সিডনি পোর্টার নামে)

জীবনের নাগরদোলা

ছোটখাটো শান্তিরক্ষার হাকিম (জে.পি) বেনাজা উইড্ডাপ বসেছিলেন দপ্তরের দরজা-গোড়ায়। এলডার কাঠের পাইপ টানছিলেন। জেনিথের দিকে যেতে আধাপথে কাম্বারল্যাণ্ড পাহাড়টা উঠে গেছে, বিকেলের কুয়াশায় নীলচে ধূসর। কলোনির সদর রাস্তায় একটা ছিটফোঁট মুরগি চরে বেড়াচ্ছে বোকার মতো কিক্ কিক্ করে।

রাস্তার অপর দিক থেকে একটা ক্যাঁচকেঁচে গাড়ির চাকার আওয়াজ এল, তারপর একটা মন্থর ধুলোর মেঘ, আর তারপরেই একটা বলদগাড়ি, যাতে বসে রয়েছে র‍্যান্সি বিল্‌ব্রো আর তার স্ত্রী। হাকিমের দরজার সামনে দাঁড়াল গাড়িটা, দু'জনেই নেমে পড়ল নিচে। র‍্যান্সি রোগা ছ'ফুটের, পাঁশুটে বাদামি চামড়া আর হলদে চুলের লোক। ওর শরীরে যেন বর্মের মতো এঁটে আছে পাহাড়ের নিশ্চলতা। মহিলাটি ক্যালিকো-কাপড়ে, বক্রিম, নস্যি-রঙা চুল; আর অজানা কামনায় ভারাক্রান্তা। এসবের মধ্যে ঝিকিয়ে উঠছে বঞ্চিত যৌবনের ঈষৎ বিদ্রোহ যা নিজের লোকসান সম্পর্কে অচেতন।

হাকিম তাঁর জুতোর মধ্যে চটপট পা গলিয়ে নিলেন ঠাট বাজায় রাখার খাতিরে, সরে গেলেন যাতে ওরা প্রবেশ করতে পারে।

পাইনের ডালে বাতাস খেলে-যাওয়ার সুরে মহিলা বলল, 'আমরা-সব বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছি।' কাজের কথাটার মধ্যে কোনো গলতি, বা দ্ব্যর্থতা, বা এড়ানো, বা একচোখোমি, বা নিজের দিকে লোক টানার ইঙ্গিত র‍্যান্সি পেল কিনা বুঝতে সে ওর দিকে তাকাল।

গম্ভীরভাবে মাথা নুইয়ে র‍্যান্সিও বলল, 'বিবাহ-বিচ্ছেদ। আমরা-সব কিছুতে-আর একসনে মিলেমিশে চলতে পারছিনি। পাহাড়ে বাস কত্তি হলে এমনিতেই একা,

তাই মেয়ে পুরুষের মধ্যে টান থাকে। কিন্তুক, এ যদি বুনো বিল্লির মতো খ্যাঁচখ্যাঁচ করে আর প্যাঁচার মতো কেবিনের কোটরে গোমড়া বসে থাকে, কোনো পুরুষের হিচ্চেই হয় না এমন মেয়েছেলের সঙ্গে থাকতে।'

মহিলাও বিশেষ কোনো উত্তাপ না দেখিয়ে বললে, 'এও তো কম ছ্যাঁচড় পেরানি নয়, ইতর জাতগুলোর সঙ্গে মাতলামি করে স্বপন দেখে, আর ভুট্টার দারু খেয়ে চিৎপাত পড়ে থাকে। নোকজনকে জ্বালাতন করে, একগাদা উপোসী ওঁচা কুত্তাকে খাওয়াতে গিয়ে!'

'আর এ তখন তাওযার ঢাকনা ছোঁড়ে',—ব্যান্সির উল্টো ভাষণ—'ফুটন্ত গরম জল ছোঁড়ে কাম্বারল্যাণ্ডের সেরা খটাস্‌-ধরা কুকুরের ওপর, তা'পর আবার যখন সোয়ামীর খাবার বানাতে বসে, রাত ভোর তাকে জাগিয়ে রাখে গালিগালাজ ভ্যান্তারা করে!'

'সে যদি সব সময় ট্যাক্সোওলাদের সঙ্গে কাজিয়া করে, পাহাড়ে নিজের বদনাম ছড়ায় কিপটে বেহদ্দ বলে, তখন কার সাধ্যি রাতে ঘুমোনো?'

জে.পি. হাকিম ইচ্ছে করে নড়েচড়ে বেড়ালেন কর্তব্য করবেন বলে। নিজের এক মাত্র চেয়ার আর একটা কাঠের টুল এগিয়ে দিলেন আবেদনকাবীদের দিকে। টেবিলের ওপর আইনেব বইপত্র খুললেন, দেখলেন সূচীপত্র। তারপর নিজের চশমাটা মুছেই কালির দোয়াতখানা টেনে নিলেন।

বললেন, 'আইন আর বিধানে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয় কিছু বলছে না, মানে এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে। তবে সমবিচারে, সংবিধানে আর উৎকৃষ্ট পথ হিসেবে যা দু-দিকেই চলতে না পারে, তা সওদার যোগ্য নয়। যদি জে.পি হাকিম বর-কনের বিয়ে দিতে পারেন, তা'হলে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটাতে পারেন এটা তো সোজা কথা। অতএব এই দপ্তর বিবাহ-বিচ্ছেদের বায় দেবে, আর তা সুপ্রীম কোর্টকে দিয়ে অনুমোদনও করিয়ে নেবে।'

র‍্যান্সি বিল্‌ব্রো তার ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ছোট তামাক-থলি বের করল। সেটাকে ঝাঁকিয়ে টেবিলের ওপর উপুর কবে দিল একটা পাঁচ-ডলারের নোট। মন্তব্য করল, 'এর জন্য আমায় একটা ভালুকের চামড়া আর দুটো শেয়ালের লোম বেচতে হয়েছে—এই আমাদের সর্বস্ব।'

হাকিম বললেন, 'এই আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়মিত ফী পাঁচ ডলার।'—মুখে একটা ছদ্ম উদাসীন ভাব দেখিয়ে ঘবে-বোনা ভেতর-কোটের মধ্যে পকেটস্থ করলেন নোটখানা। তারপর প্রচুর শারীরিক আয়াস ও মানসিক পরিশ্রম করে আধখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের পাতায মুসাবিদা করলেন তাঁর রায়, আর অন্য আধখানাতে তারই নকল রাখলেন। যে দলিলের বলে র‍্যান্সি বিল্‌ব্রো আর তার স্ত্রী মুক্তি পাবে, সেটা এবার পড়ে শোনালেন ওঁদের :—

"এতদ্বারা সমুদয় ব্যক্তিগণ জানিয়া রাখুন যে, র‍্যান্সি বিল্‌ব্রো এবং তাহার পত্নী এরিয়েলা বিল্‌ব্রো আমার সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকিয়াছিল, এবং তাহারা হলফ লইতেছে যে অতঃপর তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে না, সম্মান করিবে না, অথবা মান্যও করিবে না,—তাহাতে ভালই হোক অথবা মন্দই হোক—সুস্থমনে এবং শরীরে তাহারা রাজ্যের শান্তি ও মর্যাদা অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় মানিয়া লইতেছে। এই বিষয়ে তোমরা ব্যর্থ হইবে না, ঈশ্বর সেই সহায়তাই করুন।—বেনাজা উইড্‌ডাপ, পীডমন্ট জেলার পক্ষে শান্তিরক্ষার হাকিম, টেনেসী রাজ্য।"

হাকিম দলিলের একখানা কপি প্রায় তুলে দিতে যাচ্ছিলেন র‍্যান্সির হাতে। এরিয়েলার গলার আওয়াজে কাজটা বিলাম্বিত হল। দু'জন লোকই ফিরে তাকালেন তার দিকে। ওদের ভোঁতা পৌরুষের মুখোমুখি হয়েছে হঠাৎ একটা কিছু, যা মহিলাটির দিক থেকে প্রত্যাশা করা যায়নি।

'হুজুর, এখুনি ওর হাতে কাগজটি দিবেননি। এখুনো সবকিছু ফয়সালা হয়নি। আগে আমার অধিকারগুলো পেতি হবে। আমার খোর-পোষের টাকা তো পেতিই হবে। একটা কড়িও হাতে না দিয়ে বউকে ছেড়ে দেওয়া কোনো পুরুষের সঠিক কম্ম নয়। আমি সব ছেড়েছুড়ে যাচ্ছি হগব্যাক পাহাড়ে আমার ভাই এড-এর কাছে থাকবো বুলি। আমাকে তো একজোড়া জুতো, কিছু নস্যি আর অন্য জিনিসও নিতে হবে। র‍্যান্সের যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের খ্যামতা থাকে তো আমাকে খোর-পোষ দিক্।'

র‍্যান্সি বিলব্রো হতভম্ব বোবা হয়ে গেছে। আগে তো খোরপোষের কথাই ওঠেনি কোনো। মেয়েছেলেরা সব সময় আচমকা অভাব্য উটকোব্যাপার আমদানি করে।

হাকিম বেনাজা উইড্‌ডাপ বুঝলেন এটা বিচার করে সিদ্ধান্ত করার বিষয়। খোরপোষের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষও নীরব। কিন্তু মহিলার পায়ে তো সত্যিই জুতো নেই। হগব্যাক পাহাড়ের পথও খাড়া আর কাঁকরভরা।

উনি সরকারী সুরে বললেন, 'এরিয়েলা বিল্‌ব্রো! আদালতের সামনে বলুন কতো টাকা আপনি যথার্থ আর যথেষ্ট মনে করেন খোরপোষ হিসেবে?'

এরিয়েলা জবাব দিল, 'আমি তো ভেবেছিলাম জুতো আর সব মিলিয়ে পাঁচ ডলার ঠিক হবে। খোর-পোষ হিসেবে তো ওটা কিছুই লয়, তবে আমার ধারণা ভাই এডের কাছে পৌঁছোনো অবধি ওতেই কাজ হবে।'

হাকিম বললেন, 'টাকার পরিমাণটি অন্যায্য নয়। র‍্যান্সি বিল্‌ব্রো, কোর্ট হুকুম দিচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় প্রকাশ করার আগে ফরিয়াদীকে পাঁচ ডলার পরিমাণ টাকা দিয়ে দিন।'

ভারী নিশ্বাস ছেড়ে র‍্যান্সি বলে, 'আর কোনো টাকা আমার কাছে নেই, যা ছিল সব আপনাকেই দিয়েছি।'

'না হলে কিন্তু'—চশমার ওপর দিয়ে কড়া চোখে তাকান হাকিম, 'আপনি আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে যাচ্ছেন।'

'মনে হয় আপনি কাল অবধি সময় দিলে,' আবেদন জানাল স্বামীটি—'কোথাও কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টাকাটা জোগাড় করতে পারব। কোনো খোরপোষ দিতে হবে এমন কথা তো ভাবিনি।'

বেনাজা উইড্‌ডাপ বললেন, 'মামলা মুলতুবি রইল কাল অবধি, এই সময়ের মধ্যে তোমরা সব নিজেদের এখানে হাজির করবে, আর আদালতের হুকুম মানবে। সে ব্যাপার হলে তবেই বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দান করা হবে।'—বলে উনি দরজার গোড়ায় বসলেন আর জুতোর ফিতে আলগা করতে লাগলেন।

'আমরা তা'হলে বরং জিয়া-পিসের বাড়িতেই যাই আর সেখানে রাত কাটাই'—স্থির করলে র‍্যান্সি। সে বলদগাড়িতে একদিক থেকে উঠল, এরিয়েলা উঠল অন্য দিক থেকে। র‍্যান্সির রশির টান মেনে ছোট লাল বলদটা ধীরে ধীরে নেমে গেল একটা রাস্তার মোড়ে। চাকায় ধুলোর মেঘ তুলে গাড়িটা গাড়িয়ে চলে গেল।

জে.পি বেনাজা উইড্‌ডাপ তাঁর এলডার-নলচে পাইপে ধূমপান করছেন। বিকেলের দিকে এল তাঁর সাপ্তাহিক কাগজ। সেটা পড়তে লাগলেন যতক্ষণ-না গোধূলির আলো লাইনগুলোকে ঝাপ্‌সা করে দেয়। তখন চর্বির মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখেন টেবিলের ওপর, তারপর ফের কাগজ পড়েন যতক্ষণ-না চাঁদ ওঠে—নৈশাহারের সময় জানিয়ে। উনি থাকেন ঘেরা-দেয়া পপলার গাছের কাছে, ডবল-কাঠের কেবিনটায়। ঘরে গিয়ে আহার করবেন বলে তাঁকে ডিঙোতে হয় একটা শাখাপথ, লরেলের ঝোপের জন্য অন্ধকার সেটা। লরেল-ঝোপ থেকে একট কালো পুরুষের মূর্তি বেরিয়ে তাঁর বুকের ওপর রাইফেলের নল রাখল। লোকটার টুপি নিচু করে নামানো, আর মুখের প্রায় সবটাই কিছু দিয়ে ঢাকা।

মূর্তিটা বললে, 'আমি তোমার টাকা চাই, কোনো কথা নয়। আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি, আমার আঙুল তাই এই বন্দুকের ঘোড়ার ওপর কাঁপছে।'

'আমার কাছে যে শুধু পাঁ-পাঁচটা ডলার', বললেন হাকিম, বের করলেন সেটা ভেতর-কোটের পকেট থেকে।

হুকুম এল, 'পাকিয়ে গোল কর, আর এই বন্দুকের নলের মুখে ঢুকিয়ে দাও ওটা।'

নোটটা ছিল কড়কড়ে, নতুন। আনাড়ি আর কাঁপতে-থাকা আঙুলও মুশকিলে পড়ে ওটাকে গোল করে মুড়তে আর রাইফেলে মুখের মধ্যে ঢোকাতে (যেটা আরো মুশকিল)।

ডাকাত বললে, 'এবার মনে হয় তুমি যেতে পার।'

হাকিম আর একটুও দাঁড়ালেন না রাস্তায়।

পরদিন দপ্তর-ঘরের সামনে গাড়িটাকে টেনে এনে দাঁড়াল ছোট লাল বলদ। হাকিম

বেমাজ্জা উইডডাপের পায়ে আগে থেকেই জুতো, কারণ তিনি ওদের প্রত্যাশা করছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই র‍্যান্সি বিলব্রো তার স্ত্রীর হাতে দিল একখানা পাঁচ-ডলারের নোট। সরকারী কর্তার চোখ তীক্ষ্ণ নজরে দেখল সেটা। মনে হয় যেন নোটটা গোল পাকিয়ে একটা বন্দুকের নলে পুরে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হাকিম কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন। এটা সত্য যে অন্য নোটও এরকম কুঁকড়ে থাকা বিচিত্র নয়। তিনি এক-এক করে দু'জনকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি পত্র দিলেন। দু'জনেই 'বোকা বনে যাবার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মুক্তির কড়ার-পত্র ধীরে ধীরে ভাঁজ করছে। মহিলা র‍্যান্সির দিকে সলজ্জ আড়চোখে তাকাল অতি বিব্রত ভাব নিয়ে।

বলল, 'তুমি বোধহয় বলদগাড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছ কেবিনে। তাকের ওপর টিনের বাক্সে রুটি আছে। বেকনটা সেদ্ধ-করার হাঁড়ির মধ্যে আছে কুকুরের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য । আজ রাতে ঘড়িটায় দম দিতে ভুলো না।'

ভদ্র উদাসীন সুরে র‍্যান্সি শুধোলো, 'তুমি তো তোমার ভাই এড্-এর কাছেই যাচ্ছ?'

'ভেবেছিলাম রাত হবার আগেই ওখানে চলে যাব। আমাকে আদর যত্ন করতে ওরা ঝামেলা পোষাবে এমন কথা বলছি না, তবে আমার আর কোথাও যাবার জায়গা তো নেই। রাস্তা তো বেশ ভালই, মনে হয় এখনই রওনা হই। আমি বিদায় নেবার কথা বলব র‍্যান্স—অবশ্য তুমিও যদি "বিদায়" বলার গরজ দেখাও।'

র‍্যান্সি আত্মত্যাগী শহীদের কণ্ঠে বলল, 'জানি না এমন কোন কুকুর আছে যে 'বিদায়" কথাটা বলতে চায় না— যদি-না তুমি নিজে চলে যাবার জন্য এত ব্যস্ত যে সেটাও আমায় বলতে দিতে চাও না।'

এরিয়েলা নীবব। সে সযত্নে পাঁচ ডলারের নোটটা আর তার অনুমতিপত্র ভাঁজ করে পোশাকের বুকের ভেতরে রাখল। বেনাজা উইড্ডাপ সদুঃখে চশমার ভেতর দিয়ে দেখলেন টাকাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর যে কথাগুলো তিনি বললেন তার ফলে তাঁর পদমর্যাদা (নিজের কল্পনা অনুযায়ী) স্থির হয়ে গেল,—হয় দুনিয়ার সমব্যথীদের বিপুল অংশের সঙ্গে, নয়তো বৃহৎ ধন-নিয়োজকদের মুষ্টিমেয় অংশের সঙ্গে।

বললেন, 'র‍্যান্স, আজ রাতে নিজের পুরনো আস্তানায় বেশ একা পড়ে যাবে, তাই না?'

র‍্যান্সি বিলব্রো তাকিয়ে থাকল কাম্বারল্যাণ্ড পাহাড়ের দিকে, দুপুরের রোদে এখন তা নির্মল নীল। এরিয়েলার দিকে চোখ ফেরাল না সে।

বলল, 'একটু একাকী হব তা মানি, কিন্তু লোকে যখন পাগল হয়ে যায়, বিচ্ছেদ চায়, তখন সে-লোককে আটকানো যায় না।'

এরিয়েলা কাঠের টুলটাকে উদ্দেশ করে বলল, 'অন্যরাও তো আছে যারা বিচ্ছেদই চায়; তা ছাড়া কেউ চায় না কেউ থাকুক।'

'কেউ কখনো বলেনি সে তা চায় না।'

'কেউ কখনো এও বলেনি সে তা চায়। আমার মনে হচ্ছে বরং এখনই চলে যাই এড ভাইয়ের কাছে।'

'কেউ ওই বুড়ো ঘড়িটাতে দম দিতে পারে না।'

'তুমি কি চাও আমি তোমার সঙ্গে গাড়ি করে ফিরে গিয়ে ওটাতে দম দিই, র‍্যান্স?'

পাহাড়ি লোকটার মুখে কোনো ভাবের অভিব্যক্তি নেই। কিন্তু সে মস্ত হাতখানা বাড়িয়ে এরিয়েলার শীর্ণ বাদামি হাতটা ধরে। একবার শুধু এরিয়েলার অনুভূতিহীন মুখের আড়াল থেকে জ্যোতির্ময় হয়ে বেরিয়ে আসে ওর আত্মা।

র‍্যান্সি বলে, 'ওই শিকারী কুকুরগুলো কখনো আর তোমায় বিরক্ত করবে না। আমি বোধহয় বড় হীন আর ইতর মন দেখিয়েছি। তুমিই ওই ঘড়িটাতে চাবি দিও, এরিয়েলা।'

এরিয়েলা ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, 'আমার হৃদয়টা পড়ে আছে ওই কেবিনে, র‍্যান্স—তোমারই সঙ্গে। আমি আর পাগল হয়ে যাব না। চল, আমরা যাই, র‍্যান্স, যাতে সুয্যি ডোবার আগে বাড়ি ফিরতে পারি।'

শান্তির রক্ষক হাকিম বেনাজা উইড্‌ডাপ বাধা দেন, ওরা যে তাঁর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই পা বাড়িয়েছে দরজার দিকে।

বললেন, 'টেনেসীরাজ্যের নামে তোমাদের দুজনকে নিষেধ করছি যেন তোমরা রাজ্যের আইন ও সংবিধান ভঙ্গ না কর। দুটো প্রেমানুরক্ত হৃদয় থেকে কলহ ও ভুল বোঝাবুঝির মেঘ সরে যাচ্ছে দেখে আদালত অধিকতর আগ্রহী ও আনন্দ-মুগ্ধ, কিন্তু অত্র আদালতের কর্তব্য হল রাজ্যের সুনীতি ও সংহতি বজায় বাখা। আদালত তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তোমরা আর স্বামী-স্ত্রী নও, বরং নিয়মমাফিক কড়ার-পত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, এবং এই কারণে তোমরা দাম্পত্য ব্যবস্থার সুযোগ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির অধিকারী নও।'

এরিয়েলা র‍্যান্সির বাহু চেপে ধরে। এ কথাগুলোর মানে কি এই যে ঠিক যে-মুহূর্তটিতে ওরা জীবনের শিক্ষার পাঠটি পেল, তখনই ওকে হারাতে হচ্ছে নিজের মানুষটিকে?

'কিন্তু আদালত প্রস্তুত আছে', বলে চলেছেন হাকিম, 'বিবাহ-বিচ্ছেদের রায়ের দ্বারা যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা অপসারণ করতে। আদালত তো অত্রই রয়েছেন বিবাহের গুরু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবার জন্য, এইভাবে আদালত ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে মামলার পক্ষদ্বয় তাদের ইচ্ছায় পুনরায় গ্রহণ করতে পারে সম্মানজনক উন্নততর দাম্পত্য সম্পর্ক। উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য এই অবস্থায় সর্বশুদ্ধ পাঁচ ডলার প্রদেয় হইবেক।'

এরিয়েলা এবার তাঁর কথায় অঙ্গীকারের আলোক দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত

চলে গেল বুকের কাছে। মুক্ত কপোতের অবতরণের মতো নোটখানা নেমে এল হাকিমের টেবিলের ওপর। এরিয়েলার বিবর্ণ গালটা লাল হয়ে উঠেছে র‍্যাঙ্কির হাতে হাত দিয়ে দাঁড়াতে, আর কান পেতে পুনর্মিলনের মন্ত্রটা শুনতে।

র‍্যাঙ্কি তাকে ধরে-ধরে গাড়িতে তুলল, নিজে উঠে বসল ওর পাশে। ছোট লাল বলদটা আবার মোড় নিল, আর হাতে-হাত রেখে দু'জন ফিরে চলল পাহাড়ের দিকে।

শান্তির হাকিম বেনাজা উইড্‌ডাপ বসলেন দোরগোড়ায়, খুলে ফেললেন জুতোজোড়া। আরেক বার তিনি ভেস্ট পকেটে আঙুল দিয়ে নোটখানা পরখ করলেন আরেকবার ধরালেন এল্‌ডারের পাইপ। আরেকবার সেই ছিটেফোঁট মুরগিটা কলোনির সদর রাস্তায় বোকার মতো ক্যাঁক্‌ক্যাঁক্ করে চলে গেল।

The Whirlgig of Life, হার্পার'স্ ১৯০৩

সালভাডরে ৪ঠা জুলাই

গ্রীষ্মের একটি দিনে যখন শহর দেশভক্তির উৎসব আর 'লাল' কলরবে মুখর, বিলি ক্যাসপারিস্ আমাকে বলল এই গল্পটা।

বিলিকে বলা-যায় পুরাণের নায়ক ইউলিসিসের ছোটভাই, তার নিজের খেয়ালে। শয়তানের মতোই সে পৃথিবীর মাটিতে আসে যায়, ঘুরে বেড়ায় 'আগা-মাথা'। হয়তো কাল সকালেই আপনি যখন প্রাতরাশের ডিমটার খোসা ছাড়াচ্ছেন, সে-সময় সে তার ছোট কুমির-চামড়ার সুটকেশটা নিয়ে 'ওকিচোবি' হ্রদের মাঝখানে কোনো শহরের নক্‌শা চুটিয়ে বিক্রি করছে, কিংবা প্যাটাগোনিয়াবাসীদের সঙ্গে ঘোড়ার দরদস্তুর করছে।

একটা ছোট গোল টেবিলের ধারে আমরা বসি। সামনের গেলাসগুলোতে বড়-বড় বরফের টুকরো ভাসছে আর মাথার ওপর ঝুঁকে আছে কৃত্রিম পামগাছ। আর এই দৃশ্যটার মধ্যেই কিছু মনে পড়ে গেল একজনের— তার সম্পত্তির কথা। বিলি চঞ্চল হয়ে উঠে গল্প বলতে শুরু করে।

বলে, "এতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে এক 'চৌঠা জুলাইয়ের' কথা—আমার সাহায্যেই মানা হয়েছিল সেই সালভাডরে। সে সময় আমি সেখানে একটা বরফ-কারখানা চালাচ্ছি, আমার কলোরেডোর রুপো খনিটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবার পর। আমার ছিল একটা চুক্তি, যাকে বলে 'শর্তাধীন সুবিধা'। ওরা আমার কাছ থেকে নগদ এক হাজার ডলার জামিন রেখে ফ্যাকটরিটা বানাতে দেয়, শর্ত হল

ছ'মাস ধরে একটানা বরফ বানিয়ে যেতে হবে। তা যদি করি তবে নিজের টাকা তুলে নিতে পারব, আর যদি না পারি তাহলে সরকার টাকাটা তামাদি করে নেবে। তাই ঘন-ঘন পরিদর্শকরা আসে, মালের অভাব দেখলে আমাকে পাকড়াও করার আশায়।

"একদিন যখন তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রি, ঘড়িতে বেলা দেড়টা বাজে, আর ক্যালেন্ডারে দেখায় তেসরা জুলাই,—দু'দুটো বেঁটে বাদামি তেল-চুকচুকে গোয়েন্দা আসে। লাল পাতলুন পরা। তারা শুট্ করে ঢুকে তদারক শুরু করে। এখন হয়েছে কি, গত তিন হপ্তা ধরে এক পাউণ্ড বরফও তৈরি হয়নি, দুটো কারণে। সালভাডরের কাফেরগুলো মাল কিনবে না; তাদের আপত্তি জিনিসপত্র ওতে রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর আমিও তৈরি করতে পারছি না, কারণ আমি তখন দেউলে। আমি এখনো লেগে রয়েছি স্রেফ আমার হাজার ডলার উদ্ধার করে এদেশ থেকে কেটে পড়ার জন্য। ছ'মাসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ছ'ই জুলাই।

"ঠিক আছে, যতটুকু বরফ আমার আছে তা-ই ওদের দেখাই। একটা কালচে মতো পিপের ডালা খুলি, তাতে চমৎকার একটা একশো-পাউণ্ড বরফের চাঁই রয়েছে—সুন্দর, চোখ চেয়ে দেখার মতো। আবার ডালাটা বন্ধ করতে যাবার আগেই একটা বাদামি টিকটিকি ঝপ করে লাল হাঁটুর ওপর বসে একটা কলঙ্কজনক ভয়ানক হাত বাড়িয়ে দিল আমার সৎবিশ্বাসের 'গ্যারান্টি' মালের ওপর। দু'মিনিট লাগল ওদের সেই চমৎকার কাঁচের ছাঁচের চাঁইটা মেঝের ওপর টেনে বের করে আনতে। ফ্রিস্কো থেকে জাহাজে আনতে ওটার পেছনে আমার পঞ্চাশটা ডলার খরচা হয়েছিল।

"বর্-রফ, অ্যাঁ?'—আমার সঙ্গে অপমানজনক কৌশল খেলল যে-লোকটা, সেই বলল, 'বড়ডো গরম বর্-রফ্। হ্যাঁ। আজকের দিনটাও ওইরকমই গরম, সিনর—হ্যাঁ। হয়তো ওটাকে বের করে ঠাণ্ডা করলেই আরো ভাল হয়। তাই না?'

"বললাম, 'হ্যাঁ, তাই,' কারণ জানি ওরা আমায় পাকে ফেলেছে, 'ছোঁয়া মানেই বিশ্বাস করা। তাই না বাছারা? হ্যাঁ। এখন কেউ হয়তো বলবে যে তোমাদের পাতলুনের পেছনগুলো আকাশী নীল, কিন্তু আমার মতে ওগুলো লাল। অতএব এস, হাত আর পা দিয়েই পরখ করা যাক।' এই বলে দু'জন পরিদর্শককেই মেঝে থেকে বুটের ডগার ওপর তুলে দরজার বাইরে বের করে দিলাম। তারপর ওই অসম্মানজনক কাঁচের চাঁইটার ওপর বসি মাথা ঠাণ্ডা করতে।

"এই ভাবে নিরানন্দেই বসে থাকি সেখানে, টাকার জন্য বাড়িমুখো মন, উচ্চাশা পূরণের একটি কানাকড়িও নেই—আর ঠিক তখনই বাতাসে ভেসে আসে এমন এক সুন্দর গন্ধ যা আমার নাকে এক বছরের মধ্যে ঠেকেনি। এই রকম পাণ্ডব বর্জিত দেশে এ গন্ধ কোত্থেকে আসবে ভগবান জানেন—ভিজে লেবুর খোসা,

চুরুটের গোড়া আর বাসি বীয়রের মেশামিশি—হুবহু সেই চোদ্দ নম্বর স্ট্রীটের 'গোল্ডব্রিক' চার্লির দোকানের, যেখানে বিকেল করে পিনোচি খেলতাম তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতাদের সঙ্গে। ওই গন্ধটা যেন আমার সব ঝামেলা পেছনে ঠেলে দিল। দেশের জন্য মন কাঁদতে লাগল, কাতর হয়ে পড়লাম। আর সালভাডর সম্বন্ধে এমন যাচ্ছে-তাই কথা বলতে লাগলাম যা কোনো বরফ-কারখানা থেকে বেরুনো বেআইনি।

"ওইখানে যখন বসে আছি, ম্যাক্সিমিলিয়ান জোনস এল ওই প্রচণ্ড রোদে, ফট্‌ফটে সাদা পোশাকে। আমেরিকান জোনসের উৎসাহ রবার আর রোজউড কাঠ নিয়ে।

" 'হায় হায় রে!'—ও ঢুকতেই বললাম আমি, মেজাজ এমনিতেই খারাপ,— 'যথেষ্ট নাকাল কি এর মধ্যেই হইনি আমি? জানি তুমি কী চাও। তুমি আবার সেই জনি অ্যামিগার আর বিধবাটার ট্রেনের গল্প শোনাতে চাও। এ মাসে ন'বার এর মধ্যেই শুনিয়েছ।'

"দরজার ভেতরে পা দিয়ে অবাক হয়ে বলল জোন্‌স্, 'বুঝেছি, গরমের ফলে! বেচারি বিলি! জুজুতে ধরেছে, তাই বরফে বসে আছে আর নিজের সেরা বন্ধুদের বদনাম করছে। এই যে মুচাচো!'— আমার এক কর্মচারী রোদে বসে পায়ের ডগা নাচাচ্ছিল, তাকেই ডাকল জোন্‌স। বলল এক্ষুনি পাতলুন পরে ডাক্তারের কাছে ছুটতে।

"আমি বললাম, 'ফিরে এস! ম্যাক্সি, তুমিও বোসো, ভুলে যাও সব। এটা কোনো বরফ নয়, আর কোনো পাগলও এটার ওপর বসে নেই। এ হল একতাল কাঁচের ওপর বসে-থাকা এক ঘর-কাতর প্রবাসী মাত্র, যার মূল্য দিতে হচ্ছে এক হাজার ডলার। হ্যাঁ, বলতো, জনি প্রথমে সেই বিধবাকে কী বলেছিল? আবার শুনতে চাই। ম্যাক্সি—সত্যি বলছি। কী সব বলেছি মনে রেখ না।'

"ম্যাক্সিমিলিয়ান আর আমি বসে আলাপ করি। ওরও ঠিক আমার মতোই ঘেন্না ধরে গেছে এ-দেশের ওপর। রোজউড আর রবারের ওপর অর্ধেক লাভ চাইছে দালাল-জোচ্চোররা। জলের ট্যাঙ্কের নিচে রেখেছিলাম এক ডজন চিট্‌চিটে ফরাসী বীয়রের বোতল, আমি সেগুলোই তুলে নিলাম আর শুরু করলাম দেশের কথা, পতাকা, 'হেইল কলাম্বিয়া', আর ঘরে-ভাজা আলুর কথা। যা কাঁদুনি গাইলাম ওগুলো নিয়ে, যে ও-আশীর্বাদ সত্যিই যাদের জুটছে তারা শুনলে হদ্দ হয়ে যেত। কিন্তু এখন তো আমরা ওগুলো থেকে বঞ্চিত। দেশ না ছাড়লে দেশের ওপর টান আসে না, টাকা একেবারে খরচ না হলে টাকার মায়াও নেই, বউয়ের আকর্ষণ ততোদিনই যতোদিন-না সে গিন্নিদের 'কেলাবে' যোগ দিচ্ছে। আর "অতীত গৌরবের" স্মৃতি তখনই জাগে যখন দেখেন বিদেশী শহরে আপনার কনসালের প্যাঁকাটি-ঘরের ওপর ঝাঁটার মাথায় তা টাঙানো।

"আর ওইখানে বসে জোন্‌স্ আর আমি ঘামাচি মারতে-মারতে আর লাথি মেরে মেঝের উপর থেকে টিক্‌টিকি সরাতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি দেশের জন্য এক-মাত্রা ভক্তি আর দরদে। এই তো আমি, বিলি ক্যাসপারিস, অতিরিক্ত গ্লাসে আসক্ত হয়ে (চাঁইয়ের আকারে), পুঁজিপতি থেকে ভিখিরি—এখন ঘোষণা করছি সব ঝামেলা কেটে গেছে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশের মুকুটহীন রাজা এখন আমি। আর ম্যাক্সিমিলিয়ান জোন্‌স্ লাল-পাতলুন-ক্যালিকো-জুতোপরা অভিজাততন্ত্র আর একনায়কদের ওপর তার রাগের পুরো দাওয়াখানা ঝেড়ে দিচ্ছে। আর আমরা একটা "অনধিকার চর্চার ঘোষণাপত্র" বের করছি যাতে অঙ্গীকার রয়েছে সালভাডরে চৌঠা-জুলাইয়ের উৎসব মানা হবে সমস্ত প্রকার অভিবাদন, বিস্ফোরণ, যুদ্ধের সম্মানতালিকা, বক্তৃতা আর ঐতিহ্য-জ্ঞাত তরল পদার্থ সহকারে। হ্যাঁ, আমি বা জোন্‌স্, কেউই "আত্মারাম খাঁচাছাড়া" হয়ে যাইনি, এখনো নিশ্বাস নিচ্ছি। আমরা বলছি, সালভাডরে হৈ-হুল্লোড় হবে, বাঁদররা বরং সর্বোচ্চ নারিকেল বৃক্ষে চড়ে বসুক, দমকল বিভাগ বের করুক তাদের লাল শার্সি-সাঁটা কাগজ আর দু'খানা টিনের বালতি।

"প্রায় এই সময়েই ফ্যাকটরিতে ঢুকলেন এক স্থানীয় মানুষ—জেনারেল মেরী এস্‌পারঞ্জো ডিঙো 'বদনামে অভিযুক্ত'। তিনি ঝোলে-অম্বলে রাজনীতি ও বর্ণবিলাসে আছেন, আমার আর জোন্‌সের বন্ধু। বিনয়ের অবতার, এক ধরনের জ্ঞানের অধিকারী যা তিনি দু'বছর ফিলিপিন্স্-প্রবাসে আহরণ করেছেন আর সেখানে ডাক্তারী পড়তে পড়তে গুণটা আয়ত্ত করেছেন। সালভাডরবাসী হিসেবে তিনি তেমন ছোটখাটো মারাত্মক লোক নন্, তবে সর্বদা 'গোলাম-বিবি-সাহেব-টেক্কা' সিধে বাজিতে খেলেন।

"জেনারেল মেরীও আমাদের সঙ্গে বসে একটা বোতল খোলেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন ইংরিজি ভাষার মোটামুটি চুম্বক তিনি বুঝে নিতেন, সেই সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তারিফ। একটু একটু করে জেনারেল উঠে দাঁড়ান, দরজা জানলা ইত্যাদি মঞ্চ পথগুলোর দিকে পা টিপে-টিপে যান আর প্রতিবারেই "হিস্!" করে উঠেন। এক গ্লাস জল কিংবা সময় জানতে চাইবার আগে সালভাডরে সবাই এটা করে; ওরা তো দোলনার বয়েস থেকেই ষড়যন্ত্রকারী, আর প্রকাশ্য ঘোষণায় ম্যাটিনি-শোয়ের হীরো!

"তারপর জেনারেল ডিঙো আবার "হিস!" বলে বুক পাতেন টেবিলের ওপর, কঞ্চুষ গ্যাসপার্ডের মতো। বলেন, 'বন্ধুরা, সেনররা, আগামী কাল মুক্তি আর স্বাধীনতার সেই মহান দিবস। আমেরিকান আর সালভাডরীদের হৃদয় একসঙ্গে বেজে ওঠা চাই। তোমাদের ইতিহাস, তোমাদের মহান ওয়াশিংটন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। ঠিক বলেছি কিনা?"

"এখন আমি আর জোনস্ ভাবলাম জেনারেল যে মনে রেখেছেন আগামী চৌঠার কথা এ তো বড় ভাল। এতে আমরা চাঙা বোধ করি। উনি নিশ্চয়

ফিলাডেলফিয়াতেই ঘুরে ঘুরে শুনেছেন ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের যে হাঙ্গামা হয়েছিল তার কথা।

"ম্যাক্সি আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বলি, 'হ্যাঁ আমরা জানি। তুমি আসার আগে সে-কথাই তে' হচ্ছিল আমাদের। আর তুমি তোমার শেষ কপর্দক বাজি রেখে বলতে পার কাল আকাশে-বাতাসে হল্লাবাজি আর ফুর্তির ফোয়ারা। আমরা সংখ্যায় কম, তবে আকাশও ফাটবে, আওয়াজও হবে।'

"কণ্ঠার হাড়ে থাবড়া মেরে জেনারেল বললেন, 'আমিও সাহায্য করব। আমিও তো মুক্তির দলেই। উদার আমেরিকাবাসী, কখনো ভোলা যায় না এমন করে তুলব এই দিনটিকে।'

"জোন্‌স বললে, 'আমাদের চাই মার্কিন হুইস্কি—তোমাদের ওই স্কচের গন্ধ, মৌরির জল বা 'তিন-তারা' হেনেসী কাল চলবে না। আমরা কনসালের পতাকা ধার নেব, বুড়ো বিলফিঙ্গার বক্তৃতা দেবে, আর মাংসের শিককাবাব করব প্লাজাতে।'

"বললাম, 'পটকাবাজি তেমন বেশি হবে না, তবে দোকানগুলো থেকে সব কার্তুজ নিজেদের বন্দুকের জন্য কিনে নেব। ডেনভার থেকে দু'খানা 'নেভি'র ছ'ঘরা এনেছিলাম, সেটা আছে।'

"জেনারেল বললেন, 'একটা কামান আছে। একটা বড় কামান—'বুম্' করবে, আর রাইফেলধারী তিনশো সেপাই আছে গুলি ছুঁড়তে।'

"'আ-হা! জেনারেলিসিমো, তুমি সাচমুচ্ই শেয়ানা চিজ। আমরা এটাকে মিলিত আন্তর্জাতিক উৎসব করে তুলব। দয়া করে জেনারেল, একটা সাদা ঘোড়া আর নীল কাঁধ-পটি লাগিয়ে গ্রাণ্ড মার্শাল হয়ে যেও।'

"চোখ পাকিয়ে জেনারেল বললেন, 'আমি আমার তরোয়াল হাতে ঘোড়ায় চেপে সামনে থাকব, মুক্তির নামে সমবেত সাহসী জনতার আগে-আগে।'

"আমরা প্রস্তাব দিলাম, 'তুমি বরং আগে কমাণ্ডান্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়ে দিও আমরা খানিকটা বাড়াবাড়ি করবই। বুঝলে তো, আমরা আমেরিকানরা ঈগলকে চেঁচাবার সুযোগ দেবার জন্য বন্দুকের মধ্যে পৌর-নির্দেশের কাগজ পুলিন্দা করে ঠেসে দিতে অভ্যস্ত। তিনি হয়তো একদিনের জন্য নিয়ম মুলতুবি রাখবেন। আমাদের পথের বাধা হলে তাঁর সেপাইদের পিটিয়ে শেষে আমরা হাজতে যেতে চাই না, বুঝতে পেরেছ?"

"'হিস্!' বললেন জেনারেল, 'কম্যাণ্ডান্টও যে আমাদেরই সঙ্গে—কায়মনোবাক্যে। উনি আমাদের সাহায্য করবেন। উনি আমাদেরই একজন।'

"সেদিন বিকেলে সব ব্যবস্থাই আমরা করে ফেললাম। জর্জিয়ার একজন তেজী নিগ্রো-যুবক সালভাডরে চলে এসেছিল নৌকোয় ভেসে। মেক্সিকোর এক অপোসাম-শূন্য জায়গায় একটা নিগ্রো কলোনি গড়ে উঠেছিল, সেটা বানের জলে ভেসে যায় বলে সে এখানে আসে। আমাদের মুখে শিক-কাবাব পোড়াবার (বারবিকু)

কথা শুনেই সে আনন্দে কেঁদে উঠে জমিতে গড়াগড়ি দেয়। প্লাজা-চত্বরের মাঝেই একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলে, কয়লার আঁচের ওপর আস্ত জানোয়ারটার অর্ধেক রাখে সারা রাত ধরে রোস্ট্ হবার জন্য। আমি আর ম্যাক্সি যাই শহরের অন্য আমেরিকানদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা সবাই পুরনো দিনের সেই চৌঠা পালন করার মতলব শুনে খুশিতে মশগুল।

"মোট ছ'জন ছিলাম একসঙ্গে—কফি খামারমালিক মার্টিন ডিলার্ড; রেলওয়ের ভদ্রলোক হেনরী বার্ন্‌স্; শিক্ষিত টিনের-ছবিওলা বুড়ো বিলফিঙ্গার, আমি, জোন্‌সি, আর জেরী, বারবিক্যুর সর্দার। শহরে একজন ইংরেজও ছিল স্টেরেট নামে, সে এখানে বসে একটা বই লিখছে "কীটপতঙ্গ জগতে গৃহ-স্থাপত্য" নিয়ে। একজন ব্রিটিশকে আমন্ত্রণ জানাতে হচ্ছে তাঁর নিজের দেশের গুণকীর্তন করতে, এতে আমাদের সংকোচই হচ্ছিল কিছুটা, তবে স্থির করলাম তাঁর প্রতি আমাদের ব্যাক্তিগত শ্রদ্ধার জন্যই ঝুঁকিটা নেব।

"দেখলাম স্টেরেট পাজামা পরে বসে পাণ্ডুলিপির কাজ করছেন, একটা ব্রাণ্ডির বোতল দিয়ে কাগজ-চাপা বানিয়ে।

"জোন্‌স বললে, 'ইংলিশম্যান, উইপোকার বাসার ওপর আপনার গবেষণা একটু রুখতে হচ্ছে যে! কাল হল চৌঠা জুলাই। আপনার মনে দুঃখ দিতে চাই না, তবে আমরা আপনাদের নাস্তানাবুদ করার সেই দিনটা পালন করতে চলেছি সামান্য ভদ্র ইয়ার্কি-তামাশা আর ছ্যাবলামি করে—যা পাঁচমাইল দূর থেকেও শোনা যাবে। আপনি যদি হুইস্কি চাখবার মতো 'চওড়া-গেজের' মানুষ হন তাহলে সুখী হব আপনাকে আমাদের মধ্যে পেলে।'

"স্টেরেট তাঁর চশমাটা নাকের ওপর বসিয়ে বললেন, 'জানেন আমি আপনার ধাষ্টামো দেখে খুশিই হয়েছি, জিজ্ঞেস করছেন আমিও যোগ দেব কিনা—ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন যদি না যাই। আপনার জানা উচিত ছিল, না-ডাকলেও আসতামই আমি। নিজের দেশের সঙ্গে, বেইমানি করে নয়, তবে বেশ একটু বোকা-হুজ্জুতির জন্য।'

"চৌঠা জুলাইয়ের সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম ওই নড়বড়ে পুরনো বরফ কারখানার মধ্যে, গা-গতরে যন্ত্রণা নিয়ে। চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম আমার সব-সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষ, আর আমার বুক তিক্ততায় ভরে উঠল। যেখানে খাটের ওপর আমি শুয়ে, সেখান থেকেই জানলা দিয়ে দেখতে পাই কন্‌সালের আস্তানার ওপর পুরনো ধুকড়ি 'তারা-আর-ডোরা' ঝুলছে। মনে মনে নিজেকেই বলি, 'তুমি সবদিক থেকে বোকা, বিলি ক্যাসপারিস্। আর নির্বুদ্ধিতার সবচেয়ে বড় অপরাধটি বোধহয় এই চৌঠা-অনুষ্ঠানের মতলব, যার ফলে 'অ-প্রশংসার পুরস্কার' জুটবে কপালে। তোমার ব্যবসা তো ফুটে গেছে। শেষ ধাপ্পাবাজিটা করে তোমার হাজার ডলারও গেছে এই ভ্রষ্ট দেশের ভাঁড়ারে। এখন তোমার সম্বল মাত্র পনেরটা চিলি-ডলার,

য়ার মূল্য ছিল গতরাতে শুতে যাবার আগে ছেচল্লিশ সেন্ট করে, এখন আরোই কমে গেছে। আজ তুমি তোমার শেষ সেন্টটা ওড়াতে যাচ্ছ ওই পতাকার নামে হৈ-হৈ করে, কাল ছড়া থেকে কলা চুরি করে খাবে. আর বন্ধুদের ঘাড়ে বসে মদ খাবে। ও পতাকা তোমার কী উপকারটা করেছে? যখন ওটার তলায় ছিলে, যা হোক কিছু করে খেয়েছ। বোকাদের ঠকিয়ে, খনিতে কারচুপি করে, আর নিজের কলোনির জমি বাড়াতে কুমির-ভালুক তাড়িয়ে হাতে কড়া ফেলে দিয়েছ। দেশপ্রেমের কতটা দাম, যখন সেভিংস ব্যাঙ্কের ওই বেঁটে লোকটা তোমার জমা টাকার হিসেব রাখে? ধরো যদি এই কাফেরদের দেশে কোনো ছোটখাটো অপরাধের জন্য চিমটি খাও, আর নিজের দেশের কাছে আবেদন কর রক্ষার জন্য—স্বদেশ তোমার জন্য কী করবে? তোমার আবেদনটা পাঠিয়ে দেবে একটা কমিটির কাছে—একজন রেলের লোক, একজন সেনা-অফিসার, প্রত্যেক মজুর ইউনিয়নের একেকজন সদস্য, আর একজন কালো মানুষ, এই নিয়ে কমিটি, যারা তদন্ত করে দেখবে তোমার কোনো পূর্বপুরুষ কখনো মার্ক হানার কোনো তুতো-ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল কিনা; তারপর সেই কাগজ নথিভুক্ত করে পাঠাবে স্মিথসোনিয়ান পরিষদে, আগামী নির্বাচনের পর অবধি। ওই রকম একটা বেলাইনে তোমার গাড়ি চালিয়ে দেবে তারা-আর-ডোরা।'

"বুঝতেই পারছ আমার তখন নীলগাছের মতো অবস্থা; কিন্তু পরে ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে যখন নিজের উর্দি আর কার্তুজ-গুলি বের করলাম, তারপর চলে গেলাম আমাদের মিলন-কেন্দ্র 'পবিত্র সাধুদের' সেলুনে, তখন অনেক ভাল বোধ করছি। তারপর যখন দেখি অন্য আমেরিকানরাও গদাইলস্করি চালে আমাদের গোপন জায়গায় আসছে তখন খুশি হই ভেবে যে আমিও ওদেরই একজন। ওরা সব ঠাণ্ডা মাথার, সহজ, নজর-কাড়া ব্যক্তি, এক-তাস টেনে যে কোনো খেলায় ঝুঁকি নিতেও পারে, আবার ভালুক, আগুন কিংবা নির্বাসনের বিরুদ্ধে লড়তেও পারে। তাই নিজেকে আবার বলি, 'বিলি, তোমার এখন পনের ডলার, আর আজ সকালেই পরিত্যক্ত এদেশ—সুতরাং উড়িয়ে দাও ওই ডলার, উড়িয়ে দাও এই শহর—যেমন স্বাধীনতা দিবসে যে-কোনো ভদ্র আমেরিকানই করবে।'

"আমার স্মরণে যা আসছে, দিনটা শুরু করলাম চিরাচরিতভাবেই। আমরা ছ'জন—কারণ স্টেরেটও সঙ্গে আছেন—এগোলাম শুঁড়িখানা ধরে-ধরে, যতরকমের কড়া মার্কিন লেবেলের শরাব 'বার' থেকে খুলে নিয়ে। আমরা আশপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব আর অগ্রগণ্যাতার কথা, আর পৃথিবীর যে-কোনো দেশকে দমন, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া, অথবা নির্মূল করার ক্ষমতার কথা। আর মার্কিন-লেবেল বোতলের সংখ্যা যতই বেড়ে যেতে লাগল, ততোই সংক্রামিত হতে লাগলাম দেশপ্রেমের জ্বরে। ম্যাক্সিমিলিয়ান জোন্‌সের আশা, আমাদের প্রাক্তন শত্রু মিঃ স্টেরেট আমাদের অত্যুৎসাহে ক্ষুব্ধ হবেন না। বোতল নামিয়ে

রেখে সে স্টেরেটের করমর্দন করে, বলে, 'একজন সাদা মানুষের সঙ্গে যেমন আরেক সাদা মানুষ—আমাদের হল্লাবাজির মধ্যে যেন ব্যক্তিগত কলঙ্কের দাগ নিঃশেষে মুছে যায়। বাঙ্কার হিল, প্যাট্রিক হেনরী, আর ওয়ালডর্ফ এ্যাস্টরের জন্য, কিংবা ওই ধরনের আরো সব বিক্ষোভ আমাদের দু'জাতের মধ্যে থাকলে আমাদের ক্ষমা করবেন স্যর।'

"স্টেরেট বললেন, 'রকবাজ গুণ্ডাভাইসব, রানীর নামে অনুরোধ করছি মোলায়েম হোন্। আমেরিকার পতাকার তলায় শান্তি ভঙ্গ করার কাজে অতিথি হতে পেরে আমি সম্মানিত। আসুন আমরা আবেগের সঙ্গে গাই 'ইয়াঙ্কি ডুড্ল্'— এই ফাঁকে বারের কর্তাটি আরেক প্রস্থ কচিনিল আর অ্যাকোয়া ফোর্টিস্ পরিবেশন করে অনুষ্ঠান 'প্রশমন' করুন।'

"বুড়ো বিল্‌ফিঙ্গার একধরনের বক্তৃতার ঝোঁকে আচ্ছন্ন, যতবারই আমরা কোথাও থামি, সে বক্তৃতা করে। কোনো নাগরিককে পায়ে মাড়িয়ে দিলেই ব্যাখ্যা করে বলি, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত-ধরনের মুক্তির উষা উদ্‌যাপন করছি, অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় যদি কোনো অমানুষিকতা করে থাকি তো তারাও তাতে যোগ দিলে খুশি হব।

"বেলা এগারোটার সময় আমাদের বুলেটিন বেরুল: 'তাপমাত্রার যথেষ্ট বৃদ্ধি, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য ভয়াবহ লক্ষণের সূচনা।' হাতে হাত জড়াজড়ি করে সরু গলিগুলোতে আমাদের সারি ছড়িয়ে পড়ে, সকলেরই হাতে উইনচেস্টার আর নেভি,—উদ্দেশ্য আওয়াজ করা, কোনো অশুভ মতলবে নয়। একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ডজনখানেক গুলি ছোঁড়া হয়, তারপর একনাগাড়ে পর-পর মার্কিনী ধারার 'হুপ্-হুপ্' চিৎকার—এই শহরে বুঝি এই প্রথম শোনা গেল।

"আমরা ওই আওযাজটা করতেই সবকিছু যেন চাঙা হয়ে উঠল। পাশের একটা গলিতে শুনতে পেলাম পট্ পট্ শব্দ, এবার বেরিয়ে এলেন সাদা ঘোড়ায় চেপে জেনারেল মেরী এস্‌পারাঞ্জা ডিঙ্গো, সঙ্গে দুশো বাদামি ছোকরা, লাল গেঞ্জি পরা, খালি পা—দশ ফুট লম্বা একেকটা বন্দুক টেনে আনছে। জোন্‌স আর আমি তো বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম জেনারেল মেরী, আর উৎসবে তাঁর সাহায্য করার কথা। আরেকবার বন্দুক-স্যালুট দিয়ে রাম-চেঁচানি দিলাম, জেনারেল আমাদের সঙ্গে করমর্দান করে তরোয়াল শূন্যে উঁচোলেন।

"জোন্‌স্ চেচাঁল, 'আঃ জেনারেল! এ যে তোফা হল! ঈগলপাখির কাছে সত্যিকারের আনন্দের বিষয়। নেমে পড়ুন, একটু পান করুন।'

"'পান? না না।' বললেন জেনারেল, 'পানের এখন সময় নেই। মুক্তির জয় হোক!—'

"সমগ্র জনগণের নিমিত্ত! বাকিটা ভুলবেন না!'— বলল হেনরী বার্ন্‌স।

"জয় হোক-টুকুই জোরদার আর ভাল,' বললাম আমি, 'যেমন জর্জ ওয়াশিংটনের

জয় হোক। ইউনিয়নকে ঈশ্বর রক্ষা করুন, আর—' স্টেরেটের দিকে মাথা নুইয়ে বলি, 'রাণীকেও ত্যাগ করবেন না।'

"স্টেরেট বললেন, 'ধন্যবাদ। এর পরের প্রস্থটা আমার। সবাই বারে চলুন। সেনা বাহিনীও আসুন।'

"কিন্তু স্টেরেটের আপ্যায়ন থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম কয়েক চত্বর দূরে প্রচুর গুলিবর্ষণের শব্দে। জেনারেল ডিঙ্গো ভাবলেন ওটা এখনই তদারক করা দরকার। তিনি সাদা ঘোড়াটাকে দাবড়ে চললেন সেদিকেই। সেপাইরাও দৌড়ালো তার পেছু-পেছু।

"জোন্‌স বললে, 'মেরী কিন্তু সত্যিকারের গরম দেশের পাখি। পায়দল-সেপাইদের বের করে এনেছিল চৌঠাকে সম্মান জানাতে। একটু বাদে আমরা ওর সেই কামানটা পাব, আর কিছু জানলা-ভাঙা পটকা ছুঁড়ব সেটা দিয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একটু ঝলসানো মাংস চাইছি। চল প্লাজার দিকে যাই।'

"সেখানে দেখলাম মাংসটা সুন্দরভাবে শিকে পাকানো হয়েছে, আর জেরী বসে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছে। আমরা ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসলাম, আর মাংসের একেকটা টুকরো এল আমাদের টিনের প্লেটে। ম্যাক্সিমিলিয়ান জোনস্ বরাবরই পান করলে একটু নরম-হৃদয় হয়ে যায়। আজকের এই মজায় আনন্দ নিতে জর্জ ওয়াশিংটন আসতে পারলেন না বলে সে হু-হু করে কাঁদে। আমার কাঁধের ওপর কেঁদে পড়ে বলে, 'বিলি! বেচারি জর্জ। ভাবতে পারা যায় তিনি নেই, পটকাবাজিও দেখতে পারছেন না? জেরী, আরেকটু নুন দাও প্লীজ্।'

"যা শুনতে পেলাম তাতে বুঝলাম আমরা যখন ভোজনপর্ব চালাচ্ছি জেনারেল ডিঙ্গো তখন দয়া করে তাঁরও কিছু অবদান জানাচ্ছিলেন আওয়াজ-টাওয়াজ করে। শহরের চারদিকেই বন্দুক চলছে, একটু পরে শুনতে পেলাম সেই কামানটার 'বুম্!' শব্দ, ঠিক যেমনটা তিনি করবেন বলে জানিয়েছিলেন। আর তারপরেই শুরু হল প্লাজার আশপাশ ঘিরে লোকজনের দৌড়োদৌড়ি, কমলালেবু গাছ আর বাড়িগুলোর আড়াল দিয়ে লুকিয়ে-ছাপিয়ে। আমরা নিঃসন্দেহেই সালভাডরে একটা আলোড়ন তুলেছি। আমরা উৎসব নিয়ে গর্ববোধ করি, জেনারেল ডিঙ্গোর প্রতিও কৃতজ্ঞ। স্টেরেট একটা সরস পাঁজরার টুকরো মুখে পুরতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা বুলেট এসে সেটা তাঁর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

"আরেকটা টুকরোর জন্য হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'কেউ দেখছি উৎসব করছে গোল বুলেট দিয়ে। প্রবাসী দেশপ্রেমিকের পক্ষে একটু বেশিরকম উৎসাহী, তাই না?'

"আমি তাঁকে বলি, 'ও নিয়ে ভাববেন না। ওটা নেহাতই আচম্কা ঘটেছে। ওসব হয়, বুঝলেন না, চৌঠার দিনে। নিউ ইয়র্কে দেখেছি একবার 'স্বাধীনতার

ঘোষণা' পড়া হবার পরেই হাসপাতালে আর থানায় "জায়গা নেই" বলে নোটিশ টাঙিয়ে দেয়।'

"কিন্তু এবার জেরীও চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে পায়ের পেছনদিকে হাত রেখে—আরেকটা অত্যুৎসাহী বুলেট সেখানে লেগেছে। তারপর আসে অনেক চেঁচামেচির আওয়াজ, প্লাজার ওপারে একটা গলির মোড় থেকে ছুটে আসতে থাকেন জেনারেল মেরী এসপারাঞ্জা ডিঙ্গো তাঁর ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে, আর পেছনে ছুটে আসে তাঁর দলবল, মোটামুটি সবাই বোমা ফাটাবার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাদের বন্দুকগুলো। আর তাদের সবাইকে তাড়া করে আসছে এক কোম্পানি উত্তেজিত বেঁটে যোদ্ধা, নীল পাতলুন আর টুপি-পরা।

"ঘোড়া থামাবার চেষ্টা করে জেনারেল চেঁচান, 'বন্ধুগণ, সাহায্য। মুক্তির নামে একটু মদত দাও!'

"জোন্‌স বললে, 'ওটা যে কোম্পানিয়া আজুল, প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী দল! কী লজ্জার ব্যাপার! বেচারা বুড়ো মেরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, স্রেফ আমাদের উৎসবে সাহায্য করতে চেয়েছিল বলে। এসো ভাইসব, এ তো আমাদের চৌঠা—একটা পুঁচকে রক্ষীদলকে আমরা তা ভাঙতে দেব নাকি?'

"উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে বুড়ো বিলফিঙ্গার বলল, 'আমার ভোট—'না'! একজন আমেরিকান নাগরিকের বিশেষ অধিকার আছে চৌঠা জুলাইয়ে ইচ্ছেমতো পানভোজন, পোশাক, পংক্তি-মার্চ আর পরাক্রম দেখাবার, তা সে যেদেশেই সে থাকুক না কেন।'

"বুড়ো বিলফিঙ্গার বললে, 'সহনাগরিকবৃন্দ! স্বাধীনতার জন্মের সেই অন্ধকার দিনগুলোতে যখন আমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা অমর মুক্তির আদর্শ ঘোষণা করলেন, তাঁরা কখনো কল্পনাই করতে পারেননি যে ওইরকম একদল নীল বগুলাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে আমাদের বার্ষিকী অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করতে। আসুন আমরা সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখি, একে বাঁচাই।'

"ব্যাপারটা যখন সর্বসম্মত হল, আমরা আমাদের বন্দুক তুলে নিয়ে সদলে আক্রমণ করলাম নীল সেপাইদের। ওদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালালাম, তারপর যুদ্ধনাদ করে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আর ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। আমরা বিরক্ত আমাদের 'বারবিক্যু' নষ্ট করা হয়েছে বলে, তাই তাদের পোয়াটাক মাইল তাড়া করে গিয়েছি। কয়েকজনকে ধরে সজোরে লাথিও মেরেছি। জেনারেলও তাঁর সেপাইদের জড়ো করে ওদের তাড়া করেছেন একযোগে। অবশেষে তারা ঘন কলাবাগানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, একটাকেও আর ঝেড়ে বের করতে পারি না। তাই আমরা বসে পড়ে বিশ্রাম নিই।

"তারপর বাকি সারাদিনটাতে যে কী ঘটেছিল তা বলতে পারব না, থার্ড

ডিগ্রিতে ফেলে পেটালেও বলতে পারতাম না। শুধু মনে পড়ে গোটা শহরে ঢুকে আমরা আরো সেপাই টেনে বের করেছিলাম খতম করার জন্য। আমার মনে আছে বিলফিঙ্গার নয়, অন্য একটা ঢ্যাঙা লোক কোথাও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চৌঠা জুলাই নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ছিল। ব্যস্, শুধু ওইটুকুই।....

"কেউ বোধহয়, আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই পুরনো বরফ কারখানাটাকে টেনে এনেছিল, আর আমার চারপাশে সেটা সাজিয়ে রেখেছিল, কারণ পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম আমি সেখানেই। যখনই নিজের নাম আর ঠিকানা স্মরণ করতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে ময়না তদন্ত শুরু করলাম। আমার শেষ সেন্টটিও অদৃশ্য। আমি এবার ডুবেছি।

"তারপর একটা ছিমছাম কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। বেরিয়ে এলেন জেনারেল ডিঙ্গো আর একজন সিল্ক-টুপি ট্যান-জুতোপরা কর্তাব্যক্তি।

"নিজের মনেই বলি, 'হ্যাঁ এবার বুঝলাম ব্যাপারটা। তুমি ব্যাটা কালাবুস্‌দের পুলিস-কর্তা আর উচ্চ সচিব 'লর্ড'; আর বিলি কাস্‌পারিসকে পাকড়াতে চাও দেশপ্রেম আর ইচ্ছা করে আঘাত করার দায়ে। ঠিক আছে। এখন না-হয় জেলেই থাকা যাবে এমনিতেই।

"কিন্তু মনে হল যেন জেনারেল মেরী হাসছেন, আর কর্তা লোকটা আমার হাত ঝাকাচ্ছে, সে কথাও বলে মার্কিন উপভাষায়।

"'সেনর কাস্‌পারিস, আমাদের লক্ষ্যসাধনে আপনার অকুতোভয় পরিষেবার কথা জেনারেল ডিঙ্গো আমায় জানিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার আর অন্য আমেরিকানো সেনরদের বীরত্ব, এই মুক্তি সংগ্রামকে আমাদের সপক্ষে ঘুরিয়ে দেয়, আমাদের পার্টির জয় হয়। ইতিহাসে এই সাংঘাতিক যুদ্ধ চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।'

"যুদ্ধ মানে? কোন যুদ্ধ?' বলি আমি, আর ভাবতে চেষ্টা করি পুরো অতীত ইতিহাসটা।

"জেনারেল ডিঙ্গো বললেন, 'সিনর কাসপারিস বড় বিনয়ী। ভয়ানক সংঘর্ষের একেবারে মোক্ষম কেন্দ্রে তিনি এনেছিলেন তাঁর দুঃসাহসিক কম্‌পাদ্রেদের। হ্যাঁ। ওঁদের সাহায্য না পেলে বিপ্লব ব্যর্থ হত।'

"বললাম, 'এ আবার কী! কাল একটা বিপ্লব হয়ে গেছে সে কথা বলছ না নিশ্চয়ই? ওটা তো ছিল কেবল চৌঠা—'

"কিন্তু বাকি কথাটা তখনই উহ্য রেখে দিই, মনে হয়েছিল সেটাই ভাল বুদ্ধি।

"কর্তা ব্যক্তি বললেন, 'ভয়ানক যুদ্ধের পর, প্রেসিডেন্ট বলোনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। আজ ঘোষণা অনুসারে কাবালোই প্রেসিডেন্ট। আজ্ঞে হ্যাঁ। নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনে আমি হলাম 'সওদাগরি সুযোগ সুবিধা' বিভাগের প্রধান।

আমার ফাইলে একটা রিপোর্ট পেলাম, সেনর কাস্‌পারিস, যে আপনি আপনার চুক্তি অনুযায়ী বরফ তৈরি করেননি।'—এবার কর্তা একটা সুন্দর হাসি দিয়ে তাকালেন আমার দিকে।

"বললাম, 'ওঃ তা-রিপোর্টটা ঠিকই দিয়েছে বোধহয়। জানি ওরা আমায় ধরে ফেলেছে। ব্যস্‌ এই পর্যন্তই যা বলার।'

"কর্তা বললেন, 'ও কথা বলবেন না।' একটা দস্তানা খুলে তিনি এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন ওই কাঁচের চাঁইটার ওপর।

"মাথা নুইয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বরফ।'

"জেনারেল ডিঙ্গোও এগিয়ে গিয়ে চাঁইটাকে ছোঁন।

"বরফ। হলপ করে বলতে পারি!' বললেন জেনারেল।

"কর্তা বললেন, 'যদি সেনর ক্যাস্‌পারিস্‌ এমাসের ছ'তারিখে ট্রেজারিতে হাজির হন, তাহলে তাঁর জমা দেওয়া এক হাজার ডলার ফেরত পেয়ে যাবেন। বিদায় সেনর।'

"গাড়িটা যখন মাঠের ভেতর দিয়ে চলে গেল, তখন আরেকবার মাথা নোয়াই, আগের চেয়েও নিচে, যতক্ষণ-না আমার টুপি জমি স্পর্শ করে। কিন্তু এবার সেটা ওদের উদ্দেশে নয়। কারণ ওদের মাথার ওপরদিকেই দেখি কনসালের ছাদের ওপর হাওয়াতে উড়ছে পুরনো ঝাণ্ডাটা, আর সেটাকেই আমি অবনত মস্তকে অভিবাদন জানাই।

The Fourth in Salvador / ম্যাকক্লিওর'স, ১৯০৩

টোবিনের হস্তরেখা

টোবিন আর আমি, দু'জনে সেদিন কোনিতে গেলাম,— দুজনে মিলিয়ে হাতে চারটি ডলার, আর টোবিনেরও দরকার একটু বেড়িয়ে আসার। কারণ তার প্রেমিকা কেট্‌ ম্যাহর্নারের ব্যাপারটা রয়েছে। স্লিগো জেলার ওই আইরিশ মেয়েটি তিন মাস আগে আমেরিকার দিকে রওনা হয়েছিল নিজের সঞ্চয় দুশো-ডলার, আর টোবিনের পৈতৃক সম্পত্তি বগ্‌-শানোর একটা সুন্দর কটেজবাড়ি আর শুয়োর বিক্রি থেকে একশো ডলার সঙ্গে নিয়ে, তারপর সে হারিয়ে গেছে। সে আসছে বলে টোবিনকে চিঠিতে জানিয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে কেটি ম্যাহর্নারের নিজেরও দেখা নেই, সামান্য খবরটুকুও আসেনি আর। টোবিন কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, পুলিস যথারীতি আপেলের দোকানের পেছনে, জুয়ার আড্ডাগুলোতে খোঁজ নেয়, কিন্তু আইরিশ মেয়েটির কোনো সন্ধানই পায় না।

তাই, আমি আর টোবিন যাই কোনিতে। ভাবলাম একটু প্যারাশুটে চড়লে আর ভুট্টার খইয়ের গন্ধ পেলে হয়তো ওর মনটা চাঙা হয়ে উঠবে। কিন্তু টোবিন বড় শক্ত মগজের লোক, বিষাদ যেন ওর চামড়ার তলায় ঢুকে গেছে। পোঁ ধরা বেলুনগুলো দেখে দাঁত কিড়মিড় করে, 'নড়াচড়া' ছবি দেখে গালিগালাজ করে, আর যখনই ইচ্ছে কিছু পান করতে চাইলেই পেয়ে যাচ্ছে, তবু বিদ্রূপ করে 'পাঞ্চ-আর জুডি' কমিক-শো দেখে। আর টিনছবি-ওয়ালাদের দেখা পেলে তো কথাই নেই, বেধড়ক পিটিয়ে দেয়।

তাই ওকে ধরে নিয়ে যাই একটা তক্তা-পাতা গলির মধ্যে, যেখানকার আকর্ষণগুলো অমন ভয়ংকর নয়। একটা ছোট ছ'ফুট আটফুটের স্টলের মধ্যে টোবিন ঢোকে। এবার ওর চোখে তবু খানিকটা মানুষের দৃষ্টি।

বললে, 'মজা যদি পাই, তো এখানে। নীলনদের এই আশ্চর্য জ্যোতিষীকে দিয়ে খুঁটিয়ে হাত দেখাব, আর জেনে নেব যা হবার তা হবেই কিনা।'

টোবিন রাশি লক্ষণে বিশ্বাস করে, প্রকৃতির মধ্যে যা অপ্রাকৃত, তাই। মনের মধ্যে পোষণ করে অবৈধ সব ধারণা, যেমন কালো বেড়াল, শুভ সংখ্যা আর খবরের কাগজে আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

যেন একটা জাদুমুগ্ধ মুরগি-খাঁচায় ঢুকেছি আমরা, রহস্যজনকভাবে সাজানো লাল কাপড়ে, হাতের নানা ছবি, যার রেখাগুলো রেললাইনের মাঝখানটার মতো কাটাকুটি। দরজার ওপর সাইনবোর্ড বলছে ইনি হলেন মিশরীয় হস্তরেখাবিদ্ মাদাম জোজো। ভেতরে একজন মোটা মহিলা। লাল জামা পরা, তাতে ছুঁচে-তোলা অদ্ভুত ভাষা আর জানোয়ারের ছবি। টোবিন তাকে দশটা সেন্ট দিয়ে নিজের একখানা হাত বাড়িয়ে ধরে। টোবিনের হাত যেন ঠেলাগাড়ি-টানা ঘোড়ার খুরের দোসর। মহিলা টোবিনের হাত তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন—দেখেন সে 'ব্যাঙের মণি' বা 'বাতিল চটির' খোঁজে এখানে এসেছে কিনা।

মাদাম জোজো বললেন, 'হ্যাঁ গো মনিষ্যি' পাতায় পড়ছি তোমার ভাগ্যরেখা—'

'পাতা পেলেন কোথা?' টোবিন বাধা দেয়, 'পা নয় ওটা! হয়তো তেমন সুন্দর নয়, তবে ওটা আমার হাত।'

মাদাম বললেন, 'রেখা বলছে তুমি দুর্ভাগ্য নিয়ে জীবনকালে পৌঁচেছ। আরো দুর্ভাগ্য সামনে আছে। শুক্রস্থানে—নাকি ওটা কড়া-পড়ার দাগ?—দেখছি তুমি প্রেমে পড়েছিলে। তোমার প্রেমিকার জন্য কিছু ঝামেলা হয়েছে জীবনে।'

'কেটি ম্যাহর্নারের কথাই বলছে, শুনেছ?'—আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা উঁচু গলায় বলে টোবিন।

হস্তরেখাবিদ্ বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি যাকে তুমি ভুলতে পারোনি তাকে নিয়ে বহুত দুঃখ কষ্ট তোমার। চিহ্নরেখা তাক করে আছে তার নামের 'ক' আর 'ম' অক্ষরের দিকে।'

'হিস্! শুনলে ওনার কথা?' টোবিন বলে আমায়।

জ্যোতিষী বলতেই থাকেন, 'নজর রাখবে একটা কাল্চে লোক আর একটা ফর্সা নারীর দিকে, কারণ তারা দুজনেই তোমার বিপদ ঘটাবে। খুব শিগগিরই তোমার জলপথে ভ্রমণের যোগ, আর আর্থিক লোকসান। তবে একটা রেখা দেখছি যা তোমার সৌভাগ্য আনবে। তোমার জীবনে একটি লোক আসছে যে তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। তার বেঁকা নাক দেখলেই চিনতে পারবে তাকে।'

'তার নামও কি লেখা আছে?' জিজ্ঞেস করে টোবিন, 'যখন সে ভাগ্যের ঝুলি এনে ঝেড়েই দিচ্ছে তখন তার নামটা জানা থাকলে অভিনন্দন জানাতে সুবিধা হয়।'

খুব চিন্তার ভাব দেখিয়ে জ্যোতিষী বলে, 'হাতের রেখায় তার নামের উচ্চারণ পাচ্ছি না, তবে ইঙ্গিত করছে একটা লম্বা নাম, তার মধ্যে 'ও' অক্ষরটা থাকবেই। আর কিছু বলার নেই। শুভ সন্ধ্যা! আর দরজা আটকে রেখ না।'

তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসার সময় টোবিন বললে, 'কী করে উনি জানলেন? আশ্চর্য!'

বাইরের গেট দিয়ে যখন ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসছি, একজন নিগ্রো তার জ্বলন্ত চুরুটটা লাগিয়ে দিল টোবিনের কানে, তারপর শুরু হল ঝামেলা। টোবিন তার ঘাড়ে রদ্দা কষায়। মেয়েরা চেল্লাতে থাকে। আমি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁটে মানুষটাকে টেনে বের করে নিয়ে যাই, পুলিস এসে পড়ার আগেই। টোবিন বরাবরই বিটকেল মনের অবস্থার মধ্যে যেন বেশি মজা পায়।

বোটে করে ফিরে যাবার সময় লোকটা চেঁচায়: 'অমন সুন্দরপানা পরিচারকটাকে কে চায়?' তখন টোবিন চেষ্টা করে মাফ চাইতে, গেঁজলার হাঁড়ি থেকে ফেনা কাটিয়ে দিতে, কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখে সে খালাস পেয়ে গেছে প্রমাণের অভাবে! ঝগড়াঝাঁটির সময় কেউ তার খুচরো পয়সা লোপাট করে দিয়েছে। অতএব আমরা শুকনো গলায় বসে থাকি টুলে। আর শুনি ডেকের ওপর ডাগোদের বাজনা। আর কিছু না হোক, টোবিন এবার আরো দমে গেছে,—শুরুতে যেমন ছিলাম আমরা, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া যেন আরো জটিল হয়েছে।

রেলিঙের গায়ে একটা আসনে বসেছিল একটি যুবতী, লাল মোটর গাড়িতে চড়ার উপযুক্ত পোশাকে, চুল যেন না-পোড়া মিরশাউম পাইপের রঙ। পাশ কেটে যাবার সময় অনিচ্ছাতেই টোবিন তার পায়ে লাথি মেরে বসে, আর যেহেতু সে মাতাল হলে মহিলাদের খুব সম্ভ্রম করে চলে, তাই ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজের টুপিটা একটু বেশি রকমই কুঁকড়ে ফেলে। কিন্তু সেটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় আর হাওয়ার টানে চলে যায় বোটের বাইরে।

টোবিন ফিরে এসে বসে পড়ে। আমি ওকে খুঁজতে চেষ্টা করি, কারণ লোকটার ঝামেলার মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে। দুর্ভাগ্য যখন তাকে এমন কোণঠাসা করেছে,

তখন তার পক্ষে এখানকার সেরা পোশাকপরা ক্যাপ্টেনটিকেও লাথি মারা বিচিত্র নয়, বোটের পরিচালনাও তুলে নিতে পারে হাতে।

হঠাৎই টোবিন আমার বাহু চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'জন, জানো আমরা কী করছি? আমরা জলপথে যাত্রা করছি!'

বললাম, 'হ্যাঁ এবার একটু সামলাও নিজেকে। আর দশমিনিটেই আমরা ডাঙায় নামব।'

সে বলল, 'বেঞ্চে বসা ওই ফর্সা মেয়েটিকে লক্ষ্য কর। আর, তুমি কি ভুলে গেছ সেই নিগ্রোটার কথা যে আমার কান পুড়িয়ে দিয়েছিল? আর আমার সেই পয়সাটাও চলে গেল না কি—এক ডলার পঁয়ষট্টি সেন্ট?'

আমি ভেবেছিলাম ও বোধহয় নিজের বিভ্রাটগুলোর একটা হিসেব কষছে, যাতে একটা ভাল ওজর পেয়ে গুণ্ডাবাজি করা যায়—ওটাই তো লোকের দস্তুর। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

টোবিন বলে, 'শোনো জন, ভবিষ্যৎবাণীর জ্ঞান কিংবা বিশ্বাসীদের অলৌকিক কথা শোনার কান তোমার নেই। সেই জ্যোতিষী মহিলাটি আমার হাত দেখে কী বলেছিলেন বল? তোমার চোখের সামনেই তো সব সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বলেছিলেন—একটা কালো লোক আর ফর্সা নারীর দিকে নজর রেখো তারা বিপদ ডেকে আনবে। তুমি ওই নিগ্রোটাকে ভুলে গেছ? সে অবশ্য আমার পাল্লটা ঘুষিও খেয়েছিল আর আমার টুপি জলে পড়ে যাবার মূলে ওই সোনালিচুলো মহিলা—অমন ফর্সা মেয়ে তুমি আরেকটি আমায় দেখাতে পার? আর আমার ভেতর-পকেটে যে এক ডলার পঁয়ষট্টি ছিল বন্দুক-ছোঁড়ার স্টল থেকে বেরিয়ে আসার সময়, সেটা কোথায় গেল?'

যেমন ভাবে টোবিন কথাগুলো বলল, মনে হয় যেন ভবিষ্যৎবাণীর কলাবিদ্যার সঙ্গে ওগুলো বিলকুল মিলে গেছে, যদিও আমার নিজের ধারণা এইসব আকস্মিক ঘটনা কোনিতে বেড়াতে-আসা যে-কোনো লোকেরই হতে পারত, হস্তরেখার তাৎপর্য তাতে কিছু নেই।

টোবিন উঠে ডেকের ওপর পায়চারি করে, লাল খুদে চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্রত্যেক যাত্রীকে। আমি জিজ্ঞেস করি ওর এই সব ভঙ্গির মানে কী। আপনি বুঝতেও পারবেন না টোবিনের মনে কী আছে, যতক্ষণ-না সে হাতে-হাতে কিছু করতে শুরু করে দেয়।

জবাব দেয়, 'তোমার জানা উচিত আমার হাতের রেখায় যে মুক্তির উপায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে তার যাচাই আমায় করতেই হচ্ছে। সেই নাক-বাঁকা লোকটিকে খুঁজছি যে আমায় সৌভাগ্য এনে দেবে। সেটাই এখন বাঁচাবে আমাদের। জন, তোমার জীবনে কখনো এতগুলো দারুণ সোজা-নাকওয়ালা ওঁচা লোক একসঙ্গে দেখেছ?'

ওটা ছিল সাড়ে-নটার বোট, আমরা নেমে বাইশ নম্বর রাস্তা ধরে শহরের ভেতরে চলি। টোবিনের মাথায় টুপি নেই।

রাস্তার মোড়ে একটি ভদ্রলোক গ্যাসবাতির নিচে দাঁড়িয়ে, চড়াই পথের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন চাঁদের দিকে। দীর্ঘকায় মানুষ, ভদ্র পোশাক-পরা, দাঁতের ফাঁকে চেপে রেখেছেন চুরুট। দেখলাম তাঁর নাকটা দু'বার মোচড় খেয়ে নেমেছে গোড়ার হাড় থেকে ডগা অবধি। প্রায় সাপের বাঁকা আদলে। টোবিনও সেটা লক্ষ্য করেছে একই সঙ্গে! পিঠ থেকে হঠাৎ জিন নামিয়ে নিলে ঘোড়ার যেমন হয় তেমনি ঘোঁত্ করে তাকে ছুটতে দেখলাম ভদ্রলোকের দিকে। সে সিধেই গেল লোকটির কাছে, আমিও তাঁর সঙ্গে।

টোবিন ভদ্রলোককে বলল, 'শুভরাত্রি জানাচ্ছি আপনাকে।' তিনি মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন। মিশুক লোক।

টোবিন বললে, 'আপনার নামটা আমাদের জানাবেন? দেখব কতো বড় নাম। হয়তো আমাদের কর্তব্য হতে পারে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।'

উনি এবারও ভদ্রভাবে বললেন, 'আমার নাম ফ্রীডেনহাউসমান—ম্যাক্সিমাস্ জি. ফ্রীডেনহাউসমান।'

টোবিন বললে, 'লম্বায় তো ঠিকই আছে। গোটা নামের বহরটার মধ্যে কোথাও 'ও' রয়েছে কি?'

'না, তা নেই।'

'ও' লাগিয়ে বানান করা যায় না?'—টোবিন বেশ উদ্বিগ্ন।

নাক-ওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, 'তা আপনার বিবেক যদি বিদেশী-শব্দ পছন্দ না করে, তাহলে করতে পারেন—নিজেকে খুশি রাখতে, একেবারে শেষ উচ্চারণে অক্ষরটাকে চোরাই-আমদানি করে।'

টোবিন বললে, 'ভালই হল। এখন আপনার সামনে হাজির জন ম্যালোন আর ড্যানিয়েল টোবিন।'

ভদ্রলোক মাথা নুইয়ে বললেন, 'বহুত তারিফ! এখন বলুন, আপনারা নিশ্চয়ই রাস্তার মোড়ে এসে বানান-শেখার স্কুল করছেন না, তাহলে এভাবে ঘুরে বেড়াবার কিছু যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাবেন?'

ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে টোবিন জবাব দেয়, 'দুটো চিহ্ন দেখতে পেয়েছি আপনার মধ্যে—চিহ্নদুটোর কথা একজন মিশরী জ্যোতিষী বলেছিলেন আমার হাত দেখে। একটা নিগ্রো আদমি আর ফর্সা মহিলার সঙ্গে ঝামেলা, তার ওপর আবার পয়সাকড়ি গচ্ছা, এসব মন্দ থেকে বাঁচাবার জন্য আপনিই আনতে পারেন আমার সু-সময়, সমস্তই হয়েলের সূত্র অনুযায়ী ফলে যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক ধূমপান স্থগিত রেখে তাকালেন আমার দিকে।

শুধোলেন, 'আপনার কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আছে এই বিবৃতির ওপরে?

নাকি আপনিও এক গোয়ালেরই? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি এর অভিভাবক।'

তাঁকে বললাম, 'না, তেমন কিছুই নয়, তবে একটা ঘোড়ার নাল আরেকটার মতোই হবে, এ তো জানা কথা। তাই আমার বন্ধুর হাতের ভবিষ্যৎ-কথা মতো আপনিই ওর সেই সৌভাগ্যের ছবিটি। যদি তা না হয়, তাহলে ড্যানির হাতের রেখাগুলো হিজিবিজি কাটকুট হয়ে গেছে, সে আমি জানি না।'

নাক-মশাই এদিকউদিক তাকিয়ে পুলিস খুঁজতে লাগলেন, বললেন, 'আপনারা তো দুজনই, আপনাদের সঙ্গ দারুণ উপভোগ করলাম, এবার বিদায়, শুভরাত্রি!'

এই বলে ফের মুখে চুরুট গুঁজে তিনি দ্রুতপদে চলতে থাকেন রাস্তা ধরে। কিন্তু টোবিন না-ছোড় হয়ে লেগে থাকে তাঁর একপাশে, আমি অন্য পাশে।

'কী ব্যাপার!' উল্টোদিকের ফুটপাতে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি টুপিটা পেছনে ঠেলে বলেন, 'আমার পেছু নিয়েছেন আপনারা? আমি তো বলছি—' গলাটা খুব উঁচু করে বলেন, 'আপনাদের দেখা পেয়ে আমি ভীষণ গর্বিত। কিন্তু আমার ইচ্ছে আপনাদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া, আমায় এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

টোবিন তাঁর আস্তিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, 'বেশ তো, যান্ না! যান আপনার বাড়িতেই। আমি হত্যে দিয়ে থাকব আপনার দরজার গোড়ায়, যতক্ষণ-না সকালে ফের বেরিয়ে আসেন। কারণ ওই নিগ্রো আর ফর্সা মহিলার অভিশাপ, এক ডলার পঁয়ষট্টি খোয়াবার কাঁটা থেকে আমাকে মুক্ত করার দায় আপনারই।'

উনি আমার দিকে ফিরলেন, যেন আমি পাগল হলেও বেশি বোধশোধ রাখি— বললেন, 'এ এক অদ্ভুত বিভ্রম দেখছি। আপনি ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পারতেন না?'

'দেখুন মশাই,' বলি আমি, 'ড্যানিয়েল টোবিনের মগজ বরাবরের মতোই পরিষ্কার। হয়তো একটু বেচাল হয়েছে পান করার ফলে, তাতে চঞ্চল হয়েছে ঠিকই তবে এমন নয় যে ওঁর বুদ্ধিশুদ্ধি তাতে বিগড়ে যাবার মতো। নিজের বদ্ধ সংস্কার আর বিপদাশঙ্কার গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরিয়ে তো যায়নি, সেগুলো আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলব।' এই বলে আমি জ্যোতিষী মহিলার কথাগুলো জানাই, আর বলি কী করে তাঁর দিকেই সৌভাগ্য বয়ে আনার হেতু হিসেবে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হচ্ছে। পরিশেষে বলি, 'এবার বুঝুন হুজ্জুতির মধ্যে আমার অবস্থানটা। আমি আমার বন্ধু টোবিনের বন্ধু, আমার বিশ্লেষণে। একজন ধনী লোকের বন্ধু হওয়া সহজ, ওতে ফায়দা আছে। একজন গরিব লোকের বন্ধু হওয়াও কিছু কঠিন কাজ নয়, কারণ তাতে আপনি কৃতজ্ঞতার ঠেলায় ফুলে উঠবেন, আপনার ছবিও ছাপিয়ে ফেলবেন কোনো বস্তির সামনে কয়লার উনোন আর দু'হাতে দুটি অনাথ বাচ্চাকে রেখে। কিন্তু একটি জন্ম-গর্দভের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব রাখা সৌহার্দ্যের কলাকৌশলের ওপর রীতিমতো চাপ, আর সেটাই আমি করছি। কারণ, আমার মতে, আমার

হাতে কোনো ভাগ্যরেখা পাবেন না, যা পাবেন তা ওই গাঁইতির হাতলের ছাপটুকু। আর আপনার নাকটি, নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে ট্যারাবেঁকা নাক হলেও, আপনার কাছ থেকে শত জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী এলেও সৌভাগ্যের দুধ দোহন করতে পারবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ। কিন্তু ড্যানির হাতের রেখা পরিষ্কার আপনার দিকে দেখালেও আমি তাকে পরখ করতে সাহায্য করব—যতক্ষণ-না তার আক্কেল হয় যে আপনি অতি শুকনো।'

এর পর ভদ্রলোক ঘুরেই হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠেন। একটা দেয়ালের কোণে হেলান দিয়ে কেবলই হাসতে থাকেন। তারপর টোবিন আর আমার পিঠে চাপড় মেরে আমাদের দুজনকেই দু'হাতে টেনে নিয়ে চলেন।

'ভুলটা আমারই,' বলেন উনি, 'রাস্তার মোড়ে এসে এমন চমৎকার আশ্চর্য মজার কিছু পাব, তা যে প্রত্যাশাই করতে পারিনি! আমার তো নিজেকে প্রায় অযোগ্যই মনে হচ্ছিল। কাছেই একটা কাফে আছে, আরামদায়ক; রাজ্যের উদ্ভট আবোলতাবোল নিয়ে মজা করার মতো। চলুন ওখানে গিয়ে একটু পানভোজন করি আর আলোচনা করি ব্যতিক্রমহীন বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে।'

এই বলে তিনি আমাকে আর টোবিনকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন একটা সেলুনের পেছন-কামরায়, অর্ডার দিলেন পানীয়ের, টেবিলের ওপর রাখলেন টাকা। টোবিন আর আমার দিকে এমনভাবে তাকান যেন আমরা ওঁর ভাই, আমাদের বিলোন চুরুট।

নিয়তির মানুষ এবার বললেন, 'আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমার জীবনের একমাত্র কাজ হল—যাকে বলে সাহিত্য। রাতে বাইরে ঘুরে-ঘুরে আম-জনতার মধ্যে উদ্ভট ব্যাপারগুলো, আর ওপরের জগতে সত্য খুঁজে বেড়াই। আপনারা যখন আমার ওপর এসে পড়লেন, তখন আমি চড়াই রাস্তা আর রাতের প্রধান জ্যোতিষ্কটার মিলনস্থল মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। দ্রুত চলার পথ হল কাব্য আর কলা: চাঁদ তো একটা ঢিমে তালের শুকনো বস্তু, মুখস্থ পথে চলে। কিন্তু এগুলো ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার, কারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা ঠিক বিপরীত হয়ে যায়। আমার আশা একটা বই লিখব, যাতে জীবনে যে অদ্ভুত জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছি তা ব্যাখ্যা করব।'

'তার মানে আপনি আমাকে বইয়ের মধ্যে ঢোকাবেন!' বিরক্তির সঙ্গে বলে টোবিন, 'সত্যিই কি তাই করতে যাচ্ছেন?'

'তা করব না, কারণ মলাটের ভেতর আপনার জায়গা হবে না', বলেন উনি, 'এখন অবধি তো নয়ই। সবচেয়ে ভাল যা করতে পারি তা আপনার সঙ্গ উপভোগ করা, কারণ ছাপা বিষয়ের সীমাবদ্ধতা নষ্ট করার সময় এখনো আসেনি। ছাপার অক্ষরে পড়লে বড় কিম্ভূত দেখাবে আপনাকে। আমি নিজে সম্পূর্ণ একা বসে

আনন্দের এই পাত্রটিতে চুমুক দেব। কিন্তু ভাইরা, আপনাদের ধন্যবাদ আমি দেবই—সত্যিই আমি বাধিত।'

গোফের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে, আর হাতের মুঠোয় টেবিলে কিল মেরে টোবিন বলে, 'আপনার কথাবার্তা আমার ধৈর্যের চক্ষুশূল' (এমন বাক্যবিন্যাস টোবিনের নিজস্ব)। আপনার ওই ট্যারা নাক থেকে সৌভাগ্যের হলপ এসেছিল। কিন্তু এখন দেখছি আপনি ঢাক বাজিয়েই গাছে ফল ধরান। ওই কেতাবপত্রের আওয়াজ তুলে আপনাকে শোনায় ফাটলের ভেতর দিয়ে বেরুনো ফাঁকা হাওয়ার মতো। এখন নিশ্চয়ই মনে করব আমার হাতের রেখা মিথ্যে বলেছিল, যদি না সত্যি হত কালো লোকটা, ফর্সা মহিলাটার আর—'

'হিস্!' দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি শুধু চেহারার আদল দেখেই ভুল পথে চলে যাবেন? আমার নাক, এর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই যা করবার তা করবে। আসুন, আরেকবার এই গ্লাসগুলো ভর্তি করে নিই, কারণ উদ্ভট তত্ত্বকে ভিজিয়ে মোলায়েম রাখতে হয়, ওটা তো শুকনো নৈতিক আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যায় কিনা!'

অতএব, আমার ধারণায়, সাহিত্যের মানুষ ক্ষতিপূরণই করেন—কারণ তিনি খুশি মনে সবকিছুর জন্য খরচা করেন নিজেই; টোবিন আর আমার পুঁজি তো ভবিষ্যৎবাণীতেই ফৌত হয়ে গেছে। কিন্তু টোবিন ব্যথিত, সে নীরবে পান করে যায়, লালের দেখা মেলে ওর চোখে।

আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে পড়ি।, কারণ রাত এগারোটা বেজে গেছে। ফুটপাতের ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়াই। এবার ভদ্রলোক বলেন তাকে বাড়ি যেতেই হবে, আমাদেরও আমন্ত্রণ করেন ওঁরই সঙ্গে পথ চলতে। দু' ব্লক ছাড়িয়ে একটা পাশ-গলিতে এসে হাজির হই, সেখানে পর-পর কতকগুলো ইটের বাড়ি, উঁচু মাথা, সামনে ঝোঁকা, লোহার বেড়া দেওয়া। ওরই একটার সামনে দাঁড়ান ভদ্রলোক, মাথা তুলে চান ওপরের জানলাগুলোর দিকে, দেখেন সেগুলো অন্ধকার।

বলেন, 'এই গরিবের বাড়ি, লক্ষণ দেখে বুঝছি আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই আতিথেয়তা করতে গিয়ে একটু অন্য পথে অভিযান চালাতে হচ্ছে আমায়। আমার ইচ্ছে আপনারা তল-কুঠুরিতে প্রবেশ করুন, ওখানেই আমরা খাওয়াদাওয়া করি, আর প্রয়োজনমতো কিছু খেয়ে নিন। কিছু চমৎকার ঠাণ্ডা মুরগির মাংস থাকবে, পনিরও থাকবে, আর দু'এক বোতল এইল্। আপনাদের স্বাগত জানিয়ে বলছি ভেতরে ঢুকে কিছু খেতে। আমাকে আনন্দ দিয়েছেন বলে আপনাদের কাছে আমি ঋণী।'

আমার আর টোবিনের বিবেক আর পেটের খিদে, দুটোই তখন এ-প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুকূলে। যদিও ড্যানির বদ্ধ-সংস্কার এখনও তাকে কাঁটার খোঁচা

দিচ্ছে—সামান্য একটু পান আর একটু ঠাণ্ডা খাবার কি তার হাতের রেখার প্রতিশ্রুত ভাগ্যের পক্ষে যথেষ্ট হল?

নাক-বাঁকা ভদ্রলোক বললেন, 'সিঁড়ি ধরে নেমে যান, আমি ওপরের দরজা দিয়ে এসে আপনাদের ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। আমি রান্নাঘরে আমাদের নতুন কাজের মেয়েটিকে বলব এক পট গরম কফি দিতে, যাবার আগে খেয়ে যাবেন। সবে তিনমাস হল এদেশে এসেছে, অথচ কাঁচা মেয়ে হলেও কফিটা বানায় চমৎকার।' বললেন, 'ভেতরে আসুন। কেটি ম্যাহর্নারকে এখুনি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

Tobin's Palm. 'ম্যাকক্লিওর'স্', ১৯০৩

কলাশিল্পের বিশারদ

রোডি মোনাহান বলত, 'ব্যবসায়িক বিষয় হিসেবে আমার পছন্দসই হল এমন বৈচিত্র্যময় কিছু যা দেখলে মনে হবে অনেক ভাবনাচিন্তার ফল, কিন্তু আসলে তা নয়। একটু ভদ্রধরনের জোচ্চুরি যা করেস্পণ্ডেন্স কোর্সে ডাকযোগে শেখাবার মতো অতি-পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। লক্ষ্য আমার সুদূরে, কিন্তু জেতার সুযোগটা চাই পাকা: যেমন সমুদ্রগামী স্টীমারে কোনো অপরিচিতের কাছ থেকে 'পোকার' খেলা শিখে নেয়া, নয়তো রিপাবলিকান দলের টিকিটে টেক্সাসের গভর্নর-পদে প্রার্থী হওয়া। আর জেতার নগদ টাকা যখন গুনে নেব, তখন ওর মধ্যে কোনো বিধবা বা অনাথের কানাকড়িটুকুও পেতে চাই না।'

ঘাসে-ছাওয়া ভূমণ্ডলটাই হল মিঃ মোনাহানের জুয়াখেলার সবুজ-বনাতের টেবিল। খেলাগুলো অবশ্য তার নিজের আবিষ্কার। সে ওগুলোর হিসেবকেতাব কষে নীল পেন্সিলের গোড়া দিয়ে—সগর্জনে ধেয়ে-চলা ট্রেনের 'ধূমপায়ী' কক্ষে বসে, অথবা মেরু অঞ্চলের হল-সদৃশ শয়নকক্ষে; কখনো হট্টগোলের কুঠরি-শরাবখানায় বীয়র-সিক্ত টেবিলে, কখনো-বা পল-কাটা কাঁচ-বসানো লাল টেবিলক্লথে কাগজ রেখে; একেক সময় চটজলদি খাবার দোকানের পিছল কাউন্টার-কিনারায় রেখেও।

মিঃ মোনাহান কিন্তু 'হেরো' ডলারের পেছনে ছোটে না। শিকারী কুকুর নিয়ে, শিঙা বাজিয়ে পেছু-তাড়া করেও নয়। বরং সে ভালবাসে দুশমন চকচকে মৌমাছির চাক থেকে আলগোছে তা বের করে নিতে—অজানা-অচেনা নদীর ধারে। তবু মিঃ মোনাহান একজন পাক্কা ব্যবসায়ী, আর তার পরিকল্পনাগুলো অতি-বিশিষ্ট ধরনের হলেও শক্ত ভিতের ওপর গড়া, বাড়ি-কন্ট্রাকটারের নক্শার মতো। আর্থারের

যুগ হলে স্যর রোডি মোনাহান হতো গোল টেবিলের বীর 'নাইট'। এ যুগে অবশ্য সে পবিত্র-পাত্রের (গ্রেইল) খোঁজ না করে জোচ্চুরিই (গ্র্যাফ্‌ট্) খোঁজে।

রোডি একটা দো-আঁশলা মেন্যু-হোটেল থেকে বেঁটেখাটো বাদামি একজন স্পেনীয়কে বেছে নিয়েছিল, যার বপন-করা বীজ থেকেই ওর মনে গজিয়ে ওঠে ছবির পরিকল্পনাটা। বেঁটে লোকটার মুখে যখনই কথা ফুটল, সে ব্যস্ত হল তথ্য-সংগ্রহে। সে বিদেশের মার্কিন কনসালদের চিঠি লিখল, পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে বিশেষ কিছু কেতাব পড়ল। ছোট নীল পেন্সিলের ডগায় ফলাফল বেশ ভালই ফুটে উঠেছে যেন—মনের মতন। তারপর সে যায় নিউইয়র্কের দশম স্ট্রীটে, এক অট্টালিকার উঁচু তলায়—ক্যারোলাস্ হোয়াইটের কাছে। হোয়াইটের স্টুডিও সেখানে। ওরা দুজনেই পরস্পরকে জানে বিশাল 'পশ্চিম' অঞ্চল থেকে, পরে একজন বেছে নিল 'আর্ট', আর অন্যজন হল ভ্রাম্যমাণ বেদুইন।

মোনাহান যখন এল, ক্যারোলাস হোয়াইট তার স্টুডিওতেই 'সসেজ' ভাজছিল আর সিগারেট খাচ্ছিল। এখন তার পকেটে একত্রিশ সেন্ট্ 'সম্বল। কিন্তু 'আর্টের বিষয়ে তার বড়-বড় উচ্চ তাত্ত্বিক চিন্তা, আর বয়েসও তো মাত্র তেইশ।

'পরিকল্পনার' মানুষ বলল, 'ক্যারি, সামান্য দু'হাজার মাইলের যাত্রা, আর একটা ছবি আঁকা—পছন্দ হয়? ফিরে আসা নব্বুই দিনের মেয়াদে, আর কাজটার জন্য পাঁচ হাজার ডলার।'

হোয়াইট শুধোল সসেজের মধ্যে কাঁটা-চামচের খোঁচা মারতে মারতে—'আর ভুট্টার খাবার, না হেয়ার টনিক বিজ্ঞাপনের পোস্টার?'

'না না, বিজ্ঞাপন নয়।'

'কী ধরনের ছবি হবে সেটা?'

'সে লম্বা গল্প', বললে রোডি।

একটা টুলের ওপর থেকে ডাঁই-করা খসড়া স্কেচ নামিয়ে নিল হোয়াইট।

'বোসো, সময় নিয়ে বল। যদি কিছু না মনে কর, যতক্ষণ তুমি কথা বলবে ততক্ষণ আমি চোখ রাখব এই সসেজগুলোর ওপর। ওগুলো "ভ্যান-ডাইক" বাদামি থেকে আরো এক পোঁচ গাঢ় হয়ে উঠুক, নয়তো তুমি সব বেকার করে দেবে।'

যে পরিস্থিতি থেকে সোনার তোফাটা টেনে আনবে বলে রোডি মোনাহান আশা করছে সেটা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

মধ্য আমেরিকার স্পেনীয় মহা-উপসাগর বিধৌত ওই ক্রান্তিমণ্ডলীয় প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে একটা দেশ আছে যেখানে মাথা তুলেছেন এক অসাধারণ শাসক। রাষ্ট্রপতি—বরং বলা যায় ডিক্টেটরটি—এমন এক মানুষ যিনি প্রতিভাবলে ইউরো-মার্কিন শ্বেতকায়দের মধ্যেও একজন কেউকেটা হতে পারতেন, যদি-না সেই প্রতিভা অন্য নানা হীন

চক্রান্তমূলক দুষ্কর্মের সঙ্গে মিশে থাকত। ওয়াশিংটনের উচ্চ দেশপ্রেম (যাঁকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভক্তি করেন) তাঁর নিজের মধ্যেও কিছুটা ছিল, আর ছিল নেপোলিয়নের গোঁ, সেইসঙ্গে সাধুজনদের জ্ঞানও তাঁর অনেকটাই ছিল। এই গুণগুলোর জন্যই হয়তো তাঁর "গৌরবময় মুক্তিদাতা" উপাধি গ্রহণের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত না, যদি-না ওই গুণগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত একটা বিপুল, অদ্ভুত অহঙ্কার। এর ফলেই উনি রয়ে গেলেন নিম্নশ্রেণীর একনায়কদের তালিকায়।

তবু, দেশের জন্য অনেক কিছুই করেছেন তিনি। বজ্রমুষ্টি দিয়ে আঁকড়ে, দেশকে ঝাঁকিয়ে মুক্ত করেছেন অজ্ঞতা, কুঁড়েমি, আর "করে-খাওয়া" জঘন্য শোষক জীবদের হাত থেকে। দেশকে জাতি-পরিষদের একটি শক্তি হিসেবে প্রায় 'জাতে তুঁলেছেন'। প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল আর হাসপাতাল, গড়েছেন রাস্তা, পুল, রেলপথ, আর প্রাসাদ। প্রচুর অর্থদান করেছেন কলাশিল্প আর বিজ্ঞানের সেবায়। উনি চূড়ান্ত স্বৈরাচারী শাসক, প্রজাদের আরাধ্য দেবতা। দেশের সম্পদ যায় তাঁরই হাতে। অন্য রাষ্ট্রপতিরা লুটেরা হয়েছেন অকারণে। ডিক্টেটর লোসাডা ধনসঞ্চয় করেছেন অঢেল, কিন্তু তাঁর দেশবাসীরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ভাগও পেয়েছে।

স্মৃতিস্তম্ভ আর গৌরবের নানা স্মারক চিহ্নের প্রতি তৃপ্তিহীন আসক্তি—এ বুঝি তাঁর বর্মের আসল জোর। প্রত্যেকটি শহরে তিনি তৈরি করিয়ে নিয়েছেন নিজের মর্মরমূর্তি, সেগুলোতে তাঁর মহত্ত্বের গুণগান। প্রত্যেক সরকারী অট্টালিকার দেয়ালে ফলক বসানো হয়েছে তাঁর মহিমার গুণগান আর প্রজাদের কৃতজ্ঞতা-গাথা দিয়ে। সারাদেশের প্রত্যেকটি বাড়ি আর কুটিরে তাঁর ক্ষুদে-মূর্তি আর প্রতিকৃতি ছড়ানো। তাঁর দরবারের একজন মোসাহেব তাঁকে সেন্ট জনের মতো করে এঁকেছিল, মাথায় জ্যোতির্বলয় আর পুরো সামরিক উর্দি-পরা সঙ্গীসাথী নিয়ে। লোসাডা এ-ছবির মধ্যে বেমানান কিছু দেখলেন না, সোজাই টাঙিয়ে দিলেন রাজধানীর একটা গির্জায়! এক ফরাসী ভাস্করকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিলেন একটা মার্বেল পাথরের মূর্তি-ফলক, তাতে ওঁর সঙ্গে আছেন নেপোলিয়ন, আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট, আর দু'একজনের প্রতিকৃতি যাদের উনি সম্মানযোগ্য মনে করেন। পদকসজ্জা সম্মানচিহ্ন ইত্যাদির জন্য সারা ইউরোপ তন্নতন্ন খুঁজেছেন, আর ছলে, কৌশলে, টাকা দিয়ে রাজারাজড়াদের লোভনীয় অর্ডারের মাল হাতাতে চেষ্টা করেছেন। কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর বুকের ওপর এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধ ভরা থাকে—ক্রস্, তারকা, সোনার গোলাপ, পদক আর রিবনে। শোনা যায়, যে-লোক তাঁর জন্য নতুন কোনো সম্মানসজ্জা মাথা থেকে বের করতে পারবে তাকে নাকি অর্থকোষের মধ্যে যতদূর তার হাত ডোবে ততটাই পুরস্কার তুলে নিতে দেওয়া হবে।

এই সেই লোক যাঁর ওপর নজর পড়েছে রোডি মোনাহানের। তাই যারা গতানুগতিক পথে ব্যবসা করে তাদের কাছে এ-নকশাটা আজগুবি স্বপ্ন মনেই হতে পারে। একজন যোগ্য আমেরিকান প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে যদি ক্রান্তি-অঞ্চলে

ঘুরতে ঘুরতে সেই ডিক্টেটরের অবয়ব ক্যানভাসে ধরে রাখার বরাতটা পেয়েই যায়, আর একটা ভাগ পেয়ে যায় সেই 'পেসো'তে যা অকাতরে তাঁর মোসাহেবদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে, সেটা কি বেহিসেবী কল্পনা হবে?

রোডি তার দাম ঠিক করেছিল দশ হাজার ডলার। এর চেয়েও বেশি দাম শিল্পীদের দেয়া হয়েছে প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিতে। তাই সে হোয়াইটকে তার পরিকল্পনাটা খুলে বলে। প্রত্যেকে আলাদা করে এ-অভিযানের অর্ধেক খরচ বহন করবে, আর সম্ভাব্য মুনাফার অর্ধেকটা করে পাবে একেকজন।

স্টুডিওর কাঠখোট্টা আবহাওয়া ছেড়ে দুজন কলাকুশলী বসল গিয়ে একটা কাফের উষ্ণ কোণে। সেখানে অনেক রাত অবধি কাটাল দুজনের মাঝখানে পুরনো এনভেলপ আর নীল পেন্সিলের টুকরো গোড়া নিয়ে।

'ব্লু ক্রেসেন্ট' লাইনের স্টীমার 'অ্যাডোণ্ডে' দু'জন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছে লাস্ গ্রুইয়াসে। একজন প্রশান্ত রাজসিক চেহারার যুবক। অন্যজন তার চেয়ে দশ বছরের বড়, সারা বিশ্বের দিকে হাসিমুখে তাকায় চোখে চতুর কর্তাগিরির দৃষ্টিতে। ওদের আসার একঘণ্টার মধ্যেই জালি-দেয়া জানলার পেছনে সেনোরারা আর বাগানের কুলীরা উত্তেজনাময় খবরটা জানিয়ে দিল পরস্পরকে—বিখ্যাত আমেরিকানো আর্টিস্ট সেনর হোয়াইট আর তার বন্ধু সেনর মোনাহান এসেছেন।

আমেরিকান সেনরদের দেখে ওদের চক্ষু সার্থক। নজরে-পড়া ছাঁটের সাদা লিনেনের পোশাক, আর সুন্দর খড়ের অদ্ভুত টুপি ওদের। মাঝিমাল্লা কুলিদের বখশিস দেয় 'রীয়াল' মুদ্রায়—এদের মূল্য অনেক হলেও কোনো অংশে কম নয় তাদেরও অকৃপণ উদারতা।

নবাগতরা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না লাস্ গ্রুইয়াসে। কাঠফাটা ১১০° ডিগ্রি উত্তাপ চিল-ছোঁ মেরে নেমে আসছে শহরের মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা ন'হাজার ফুট উচ্চতার তৃণশূন্য শিলা থেকে। ফলে বিত্তবান সমাজ ছুটে যায় আগুয়াফেলিজের দিকে। উপকূল ধরে আরো দশমাইল গেলে আগুয়াফেলিজ। অতএব সেখানেই এগিয়ে যায় ভাগ্য-সন্ধানীরা।

আগুয়াফেলিজে অবস্থাটা অনেক সহনীয়। একটা মনোরম সৈকতের ধারে শহরটা, বিকেলের রোদ থেকে আড়াল পায় বড়সড়ো একটা পাহাড় থাকায়। এখানেই দেশের 'আধুনিক' বন্দর, খেলার মাঠ; আর বছরের পাঁচ মাস সরকারী রাজধানী। এখানেই আছে একনায়ক রাষ্ট্রপতির "কাসা মোরেনা"— প্রাসাদোপম 'বাদামি বাড়ি' যেখানে তিনি গরম 'শীতের মাসগুলো' কাটান। গোধূলির আলো নেমে আসার মুখে দুই আমেরিকান প্রথম দেখল আগুয়াফেলিজ শহর। বাতাসে পাকাফল আর কমলালেবু-ফুলের গাঢ় সুবাস, তাজা হয়ে উঠেছে সমুদ্রবায়ুর লোনা স্বাদে। ওরা শুনতে পাচ্ছিল চত্বরের ফুল বাগিচায় ডিক্টেটরের ব্যাণ্ডবাদন, এবার দেখতে

পেল সার বেঁধে গাড়িগুলো দৈনিক সান্ধ্য শোভাযাত্রায় ধীরে-ধীরে চক্কর দিচ্ছে। গ্রাম্য মেয়েরা তাদের কালো চুলে এর মধ্যেই জোনাকিপোকা গুঁজে খালি-পা আর লাজুক চোখে রাস্তাগুলো দিয়ে দুলে দুলে আসছে। চালিয়াত ছেলেরা সাদা পোশাকে, বেতের ছড়ি নাচিয়ে শুরু করে দিয়েছে তাদের 'মন-কাড়ার' পায়চারি। সারা বাতাসে মানবীয় সুগন্ধসার, কৃত্রিম প্রলোভন, ছদ্ম-প্রণয়, আলস্য আর আনন্দের ছড়াছড়ি—মানুষ-সৃষ্ট অস্তিত্বের চেতনা।

রোডি মোনাহান সঙ্গে একটা চিঠি এনেছিল দূতাবাসের মার্কিন সচিবের উদ্দেশে—একজন জবরদস্ত সেনেটরের কাছ থেকে। এটা রোডি বাগিয়েছিল একজন জেলা নেতাকে ধরে, সে ধরাধরি করেছিল এক কংগ্রেসসভ্যকে, উনি আবার নাড়া দিলেন এক রাজনৈতিক গুরুকে, তিনি বেশ সফলভাবেই স্বয়ং সেনেটরকে বশ মানালেন।

সচিব খুশি হয়ে আপ্যায়ন জানালেন দুই ভদ্রলোককে। তিনি ভাবলেন হ্যাঁ, তাই তো। গ্যালারিতে মিঃ হোয়াইটের আঁকা ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন মনে হচ্ছে, তারিফও করেছেন। উনি সুপারিশ করছেন 'হোটেল-ডি-বুয়েন-ডেস্কানসারের' নাম। তিনি দেখবেন যাতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনো বৈঠকের সময় তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়, অন্য বিশিষ্ট নাগরিকদেরও সাক্ষাৎ পাবেন তাঁরা।

এর ক'দিন পর হোয়াইট সমুদ্র-সৈকতে ঈজেল নিয়ে বসল, পাহাড় আর সাগর দৃশ্যের অনেকগুলো লক্ষণীয় স্কেচ্ও করে ফেলল। স্থানীয় বাসিন্দারা তার পেছনে দীর্ঘ আলাপ-মুখর অর্ধচক্র করে লক্ষ্য করে তার কাজ। রোডি সব কিছুর দিকে নিখুঁত নজর রেখে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। সেটা চালিয়েও যাচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে। তার ভূমিকা হল বিখ্যাত আর্টিস্টের বন্ধুর মতো, বাস্তব ব্যাপার আর অবসর তার লক্ষ্য। তার পরিচয়ের দৃশ্যমান প্রতীক হল একটা পকেট ক্যামেরা।

রোডি বলত, 'এ বস্তুর মালিককে ভদ্র, অপেশাদার শিল্পানুরাগী, ব্যাঙ্কে টাকা অথচ নির্ঝঞ্ঝাট বিবেকের লোক মনে করতে হলে প্রমোদতরী অচল, ক্যামেরার পাশে দাঁড়াতে পারে না ওটা। একজন লোক কিছুই করে না অথচ ঘুরে-ঘুরে ছবি তুলে বেড়ায়, দেখলেই বুঝে যাবে সে 'ব্র্যাডস্ট্রিটের' উঁচু তলার লোক। পুরনো মিলিয়নেয়ারদের দেখেছ তো—একবার সবকিছু চর্মচক্ষে দেখে নেবার পর সে ফোটো তোলার দিকেই মন দেয়। লোকে বড়-বড় খেতাব বা চার-ক্যারেট হীরের টাইপিন দেখে যত না মুগ্ধ হয় তার চেয়ে বেশি হয় 'কোডাক' ক্যামেরা দেখে।' তাই, রোডি অমায়িকভাবে পায়চারি করে বেড়ায় আগুয়াফেন্সিজে, প্রকৃতির দৃশ্য আর সংকুচিতা সেনোরিটাদের ছবি তুলে, আর এদিকে হোয়াইট কলাশিল্পের উচ্চতর স্থানে দর্শনীয় ভঙ্গিতে অবস্থান করে।

ওদের আগমনের দু'হপ্তা পরে ফলপ্রসূ হল নকশাটা। একটা বেগবান্ ভিক্টোরিয়া গাড়িতে চেপে হোটেল-ডি-বুয়েন-ডেস্কানসারে এল রাষ্ট্রপতির একজন ব্যক্তিগত পার্শ্বচর। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা সেনর হোয়াইট 'কাসা মোরেনা'তে আসুন একটা লৌকিকতাবর্জিত সাক্ষাৎকারের জন্য।

রোডি তার পাইপটা দাঁতে শক্ত করে ধরল। শিল্পীকে বলল, 'দশ হাজারের এক সেন্টও কম নয়—মনে রাখবে দামটা। আর তা চাই সোনা বা তার সমমূল্যে—এই সব দোকানদারী কাউন্টারের চিজ্, যাকে এরা টাকা বলে, সে-সব ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে দিও না কিন্তু।'

হোয়াইট বলে, 'হয়তো তিনি যা চান তা আদৌ এ নয়।'

'বেরিয়ে পড়!'—দারুণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে রোডি, 'আমি জানি তিনি কী চান। তিনি চান—বিখ্যাত তরুণ আমেরিকান শিল্পী আর তাঁর নিপীড়িত দেশে আস্তানা-গাড়া বোম্বেটেটাকে দিয়ে নিজের ছবি আঁকিয়ে নেবেন। যাও, দূর হও!'

শিল্পীকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া চলে গেল। এক ঘন্টা বাদেই তাকে ফিরিয়ে আনল হোটেলে। রোডি যেন নীরব প্রশ্নবোধক চিহ্ন, ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে।

'এসে পড়েছি!'—হোয়াইটের ঘোষণা, বালকসুলভ মুখটা যেন উপচে-পড়া খুশিতে রাঙা, 'রোডি, তুমি সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। উনি একটা ছবিই চান। সব তোমায় বলছি, ডিক্টেটর লোকটা সত্যিই এক ডিক্টেটর—আগাপাস্তলা, আঙুলের ডগা অবধি! যেন 'সিপিয়া' রঙে জুলিয়াস সীজার, লুসিফার শয়তান, আর উকিল চান্সি ডেপুর সমন্বয় একজন। বিনয়ী অথচ কঠোর—এই তাঁর ব্যবহার। যে কামরাটায় তাঁকে দেখলাম সেটা বুঝি দশ একর জায়গা নিয়ে! দেখতে মিসিসিপির স্টীমবোটের মতো, ওই রকম মসৃণ, আয়না আর সাদা রঙে ঝলমলে। আমি যা কখনো বলতেও পারব না এমন সুন্দর ইংরেজি বলেন। দামের কথা যখন উঠল, আমি বললাম দশ হাজার। আমি ভেবেছিলাম এই বুঝি রক্ষী ডেকে আমায় বাইরে বের করে, গুলি করে সাবড়ে দেবেন। চোখের একটি পলকও ফেললেন না। শুধু একখানা বাদামি হাত নেড়ে অবহেলাভরে বললেন, "যা আপনার মর্জি।" কাল আমায় ফিরে গিয়ে ছবির খুঁটিনাটি আলোচনা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।'

রোডি মোনাহান মাথা নিচু করে থাকে। চেহারায় পরিস্কার ফুটে উঠেছে আত্মধিক্কারের চিহ্ন।

সদুঃখে বলল, 'ক্যারি, আমি হার মেনে যাচ্ছি। অতবড় হুক আর আমার দ্বারা সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। আমার উপযুক্ত লোক-ঠকানে কাজ হতে পারে এখন ঠেলাগাড়িতে কমলালেবু বেচা। সত্যি বলছি আমি যখন দশহাজার বলেছিলাম আমার ধারণা ছিল ওই বাদামি লোকটা হয়তো দু'চার সেন্ট কমাতে পারে। আরে, পনের হাজার বললে হয়তো সে গলেই পড়ত! ক্যারি—বল এখন, এরকম ভুল

করলে বুড়ো মোনাহানকে শিগগিরই কোনো চমৎকার, চুপচাপ, হাবাদের-গারদে দেখতে পাবে না কি?'

'কাসা মোরেনা' যদিও একতলা উঁচু, বাড়িটা কিন্তু বাদামি পাথরের আর ভেতর দিক থেকে প্রাসাদতুল্য বিলাসবহুল। আগুয়াফেলিজের প্রান্ত এলাকায়, চমৎকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফুলের পাঁচিল-ঘেরা বাগিচার মধ্যে; একটা নিচু টিলার ওপর। পরদিন ডিক্টেটরের গাড়ি আবার এসেছিল শিল্পীকে নিয়ে যেতে। রোডি গিয়েছিল সমুদ্রপাড়ে হাঁটতে, সেখানে সে আর তার 'ছবি-বাক্স' এখন সুপরিচিত দৃশ্য। সে যখন হোটেলে ফিরল, হোয়াইট এর মধ্যেই এসে বসে রয়েছে ব্যালকনির আরামকেদারায়।

রোডি বললে, 'তাহলে? তুমি আর মহামান্য মিলে ঠিক করলে কেমন "চিত্তির" তাঁর চাই?'

হোয়াইট উঠে বারান্দায় আগুপিছু পায়চারি করে কয়েকবার। তারপর হঠাৎ থেমে অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে। মুখখানা লাল, একধরনের ক্রুদ্ধ আমোদে উদ্ভাসিত।

একটু কর্কশ গলায় বলে, 'দেখ মোনাহান, যখন তুমি প্রথম আমার স্টুডিওতে এসে একটা ছবির কথা বললে তখন ভেবেছিলাম একটা থেঁতলা ভুট্টা বা হেয়ারটনিকের পোস্টার চাইছ, পেছনে কোনো পাহাড় বা পাশে কোনো মহাদেশ থাকবে, ওইরকম। এখন তুমি আমাকে যেটার দিকে ঠেলে দিয়েছ তার তুলনায় সেগুলো অনেকগুণে ভাল আর্ট হতে পারত। এ ছবি আমি আঁকতে পারব না, রোডি। আমাকে এ আপদ থেকে টেনে বের করতেই হচ্ছে তোমায়। তাহলে তোমাকে বলি কী চাইছে ওই বর্বরটা। আগে থেকেই সে ছক কেটে রেখেছিল, এমন-কি নিজের আইডিয়া নিয়ে একটা খসড়াও করেছিল। বুড়োটা কিন্তু ছবি মোটেই খারাপ আঁকে না। কিন্তু হে চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবি! শুনুন কী দানবীয় চিত্র সে আমাকে দিয়ে আঁকাতে চায়। পটের মাঝখানে তার নিজের চেহারাটি থাকবে, তা তো অবশ্যই। সে চায় জুপিটার-দেবতার মতো অলিম্পাসের মাথায়, পায়ের নিচে মেঘমালা নিয়ে বসা নিজের ছবি। একপাশে দাঁড়াবেন জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর পুরো সামরিক সাজে, হাত রাখবেন ডিক্টেটরের কাঁধে। ছড়ানো ডানা তুলে কোনো দেবদূত আকাশ থেকে ডিক্টেটরের মাথায় লরেলপাতার মুকুট বসিয়ে দেবে—হয়তো তাকে "বসন্তের রানী" করে! পটভূমিতে থাকবে কামান, আরো দেবদূত আর সেনানী। যে লোক ওই ছবি তুলি দিয়ে আঁকবে তার থাকতে হবে কুকুরের হৃদয়, বিস্মৃতির গর্ভে এমনভাবে তলিয়ে যাবে যে তার লেজে টিনের কৌটো বেঁধে দিলেও আর শোনা যাবে না তার আওয়াজ।'

রোডি মোনাহানের সারা কপালে ফুটে উঠেছে ঘামের ফোঁটা। নীল পেন্সিলের গোড়া দিয়ে এমন ছক তো সে আঁকতেই পারেনি। তার পরিকল্পনার কলকব্জা এত দিন বেশ মোলায়েম আপখুশিভাবেই চলছিল। সে আরেকটা চেয়ার টেনে

আনে বারান্দায়, আর হোয়াইটকে বসিয়ে দেয় তার আগের আসনে। বাইরে শান্তভাব দেখিয়ে সে পাইপ জ্বালিয়ে নেয়।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে, 'এবার শোনো ভাই, তোমাতে আমাতে একটা আর্টে-আর্টে কথা হয়ে যাক। তোমার কাছে তোমার শিল্পকলা, আমার কাছে আমার। তোমার হল পবিত্র কলাদেবীর বিষয় যা কালো মদ বা পুরনো জাঁতাকলের ছবি ঘোর অপছন্দ করে। আমার আর্ট হল ব্যবসা। এটা আমারই নকশা ছিল, আর কাজও হয়েছে দুয়ে-দুয়ে চার। ওই ডিক্টেটর লোকটার ছবি তুমি বুড়ো রাজা কোল্ বা ভিনাসদেবী বা একটা নিসর্গ চিত্র বা ফ্রেস্কো, বা একগুচ্ছ লিলি, যেভাবে সে নিজেকে মনে করে সেভাবেই আঁকো না কেন? কিন্তু ছবিটা ক্যানভাসে চড়াও, আর লুটে নাও টাকাটা। তুমি নিশ্চয় আমায় জলে ফেলবে না ক্যারি, খেলার এই পর্যায়ে এসে? ওই দশ হাজারের কথা তো ভাবো!'

'না ভেবে পারছি কোথায়? আর সেটাই খচ্‌খচ্ করে বিঁধছে আমায়। যতো বরাতের কাজ করেছি সব জলাঞ্জলি দিয়ে এখন প্রলোভন হচ্ছে নিজের আত্মাকে ডুবিয়ে দিই ওই ছবিটি আঁকার বদনামের মধ্যে। ওই পাঁচ হাজার আমার দু'বছর প্যারিস ঘোরার খরচ, ওর জন্য আমি আমার বিবেকও বেচে দিতে পারি।'

সান্ত্বনার সুরে রোডি বলে, 'না ভাই, ওটা কি এতই খারাপ? এ একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাবমাত্র। এত টাকার জন্য এত রং আর এত সময়। ছবিটা চিরকালের মতোই চারুকলার প্রশ্নে আঘাত দেবে—তোমার এ ধারণার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। জর্জ ওয়াশিংটন ঠিক আছে, বুঝলে, আর দেবদূতের কথায়ও কারুর কিছু বলার নেই। ও গ্রুপটাকে আমি তেমন খারাপ ভাবি না। যদি জুপিটারের কাঁধে একজোড়া তকমা আর হাতে তরোয়াল দাও, আর মেঘগুলো একটু গোল-গোল মতো করে কালোজামের পোঁচ লাগিয়ে দাও, তাহলে যুদ্ধের দৃশ্য হিসেবে খুব খারাপ দেখাবে না। শুধু তাই, আমরা যদি আগেই দামটা ঠিক করে না ফেলতাম, তাহলে ওয়াশিংটনের জন্য বাড়তি এক হাজার, আর দেবদূতটার জন্য আরো পাঁচশো তাকে দিতেই হত।'

একটা অস্বস্তির হাসি দিয়ে হোয়াইট বলে, 'তুমি বুঝতে পারছ না রোডি। আমরা যারা ছবি আঁকার চেষ্টা করি, আর্ট সম্পর্কে আমাদের বড়-বড় ধারণা আছে। আমি একসময় এমন ছবি বানাতে চেয়েছি যার সামনে দাঁড়িয়ে লোকে ভুলেই যাবে ওটা রঙ দিয়ে আঁকা। আমি চেয়েছি ওদের মনে তা সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো নিঃসাড়ে ঢুকবে, আর ফুটে উঠবে হালকা বিস্ফোরণের মতো। আর এও চেয়েছি তারা অন্যত্র গিয়ে খোঁজ করুক: "উনি আর কী-কী কাজ করেছেন?" কখনো চাইনি যে ওরা আর কিছু খুঁজে পাক—কোনো প্রতিকৃতি নয়, পত্রিকার প্রচ্ছদ নয়, ভেতরের ছবি নয়, এমন-কি কোনো মেয়ের রেখাচিত্রও নয়—একমাত্র

সেই ছবিটি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণেই ভাজা সসেজ খেয়ে টিকে থেকেছি, আর চেষ্টা করেছি নিজের কাছে সত্যনিষ্ঠ থাকতে। কিন্তু পরে, নিজেকে প্ররোচিত করলাম এই প্রতিকৃতিটা বানাতে, হয়তো এতে আমি একটা সুযোগ পাব বিদেশে পড়াশোনা করার। কিন্তু এই গলা ফাটিয়ে-চেঁচাতে-থাকা ব্যঙ্গচিত্রটা! হে ভগবান! দেখতে পাচ্ছ না ওটার স্বরূপ?'

'নিশ্চয় পাচ্ছি,' রোডি যেন একটা শিশুর সঙ্গে কথা বলে নরম সুরে, হোয়াইটের হাঁটুর ওপর তার লম্বা আঙুল—'তোমার শিল্প ওই ভাবে কাদায় আটকা পড়ে থাকবে সেটা ভাল নয়। আমি জানি। তুমি চেয়েছিলে একটা বড় ছবি আঁকতে, যেমন গেটিস্‌বার্গ্‌ যুদ্ধের প্যানোরামা দৃশ্য। কিন্তু আমায় একটা ছোট মন-গড়া নক্‌শা করতে দাও নিজের বিবেচনার জন্য। আজ অবধি এই পরিকল্পনার ওপর আমাদের খরচ হয়েছে তিনশো পঁচাশি ডলার। দু'জনে মিলে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যতটুকু পেরেছি তাই আমাদের পুঁজি। নিউইয়র্কে ফিরে যাবার মতো প্রয়োজনীয় টাকা আমাদের আছে। ওই দশ হাজারের মধ্যে আমার অংশটা চাই ইডাহোতে একটা তামার খনির দাঁও পুরো করতে, তাতে পাব এক লাখ। সেটাই হল এ ব্যাপারের বৈষয়িক দিকটা। তুমি তোমার আর্টের মগডাল থেকে নেমে এস ক্যারি। বাগিয়ে নাও ওই থলিভরা ডলার।'

'রোডি, আমি চেষ্টা করব। আমি বলছি না যে করবই, তবে চেষ্টা করব। আমি লেগে পড়ছি এবার, কাজটা টেনেও নিয়ে যাব যদি পারি।'

হৃষ্টকণ্ঠে রোডি বললে, 'এই তো কাজের কথা। ভাল ছেলে! এবার আরেকটা ব্যাপার। ছবিটা জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাও—যত শিগ্রি পার কাজটা ভিড় লাগিয়ে শেষ করে ফেল। যদি দরকার হয় দু'জন ছোকরাকেও নিতে পার রঙ মেশানোর কাজে সাহায্য পেতে। আমি শহরে ক'টি জিনিসের ইঙ্গিত পেয়েছি। এখানকার লোক মিঃ ভিক্টেটর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষণ করতে শুরু করেছে। তারা বলে তিনি বড ঢালাওভাবে সুযোগসুবিধা বিলি করছেন। অভিযোগ করছে তিনি নাকি ইংলণ্ডের সঙ্গে দহরম-মহরম করছেন দেশটাকে বেচে দেবার জন্য। আমরা চাই কোনো গোলমাল পাকিয়ে ওঠার আগেই ছবি শেষ করে আমাদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে।'

কাসা মোরেনার বিশাল চত্বরে ডিক্টেটর একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাস্‌ টাঙিয়ে দিয়েছেন। ওটার নিচে হয়েছে হোয়াইটের অস্থায়ী স্টুডিও। প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে মহান্‌ ব্যক্তি বসেন শিল্পীর সামনে।

হোয়াইট বিশ্বস্তভাবে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কাজের অগ্রগতির সঙ্গে মাঝে-মাঝে ওর আসে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা, অনন্ত আত্ম-বিরূপতা আর উৎকট উল্লাস। রোডি বিজ্ঞ সেনাপতির ধৈর্য নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়, খুশি করে, তর্কও করে—এই ভাবে তাকে লাগিয়ে রাখে কাজে।

একমাস কেটে যাবার পর হোয়াইট জানিয়ে দিল ছবির কাজ শেষ—জুপিটার, ওয়াশিংটন, দেবদূত, মেঘপুঞ্জ, কামান, সবকিছু। রোডিকে খবরটা দেবার সময় ওর মুখখানা ফ্যাকাশে, মুখ লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। বলল, ডিক্টেটর ছবি দেখে খুবই খুশি। 'দেশনায়ক ও বীরদের জাতীয় গ্যালারিতে' টাঙানো থাকবে ছবিটা। আর্টিস্টকে বলা হয়েছে পরদিন কাসা মোরেনায় গিয়ে প্রাপ্য অর্থ নিতে। নিরূপিত সময়ে সে নীরবে হোটেল থেকে বেরুল তাদের সাফল্য নিয়ে রোডির উৎসাহিত মন্তব্য শুনতে-শুনতে। একঘণ্টা বাদে সে ফিরল নিজের কামরায়। রোডি সেখানে আগেই বসে প্রতীক্ষা করছিল। মেঝের ওপর টুপিটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বসল টেবিলে।

'মোনাহান,'—ধরা-ধরা কষ্ট-ক্লিষ্ট গলায় বলল সে, 'পশ্চিমের দিকে আমার ভাই একটা ছোট ব্যবসা চালায়, তাতে আমার সামান্য টাকা আছে। আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করার সময় ওই টাকাতেই আমার চলছিল। আমার ওই অংশটা তুলে নিয়ে তোমার এ পরিকল্পনায় যে ক্ষতি হল তা পূরণ করে দেব।'

'ক্ষতি!' অবাক হয়ে লাফিয়ে উঠল রোডি—'ছবিটার জন্য টাকা পাওনি?'

'হ্যাঁ পেয়েছিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো ছবিও নেই, কোনো মজুরিও নেই। যদি তোমার শুনতে মন চায়, তাহলে সবটা শুনে তৃপ্ত হও। প্রেসিডেন্ট আর আমি তাকিয়েছিলাম ছবিটার দিকে। তাঁর সেক্রেটারি একটা দশহাজার ডলারের ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট এনে আমার হাতে দিল, নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কের ওপর। ওটা ছোঁবামাত্র আমি পাগল হয়ে গেলাম। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিলাম মেঝের ওপর। চত্বরের ভেতরে একজন মিস্তিরি থামগুলোর ওপর নতুন করে রঙ করছিল। তার রঙের বাল্‌তিটা ছিল বেশ সুবিধাজনক জায়গায়। তার বুরুশখানা তুলে নিয়ে এক কোয়ার্ট নীল রঙ ছুপিয়ে দিলাম দশ হাজার ডলারের দুঃস্বপ্ন ওই গোটা ছবিটার ওপর। একবার মাথা নুইয়েই আমি বেরিয়ে চলে এলাম। রাষ্ট্রপতির নড়াচড়া নেই, মুখে কথা নেই। এই প্রথম বোধহয় তিনি বিস্মিত। রোডি, তোমার পক্ষে ব্যাপারটা কঠিন হল, তবে এটা না করে পারিনি আমি।'

মনে হল আগুয়াফেলিজে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে একটা এলোমেলো ক্রমমবর্ধমান গুঞ্জন, মাঝে-মাঝে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ চিৎকারে। "বাজো এল্ ট্রেইডর—বেইমান মুর্দাবাদ!" এই রকম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে যেন।

তিক্তকণ্ঠে হোয়াইট বলে উঠল, 'ওই শোনো! অতটা স্পেনীয়ভাষা আমার জানা আছে। ওরা চেঁচাচ্ছে "বেইমান নিপাত যাক্" বলে। আগেও শুনেছি ও চিৎকার। আমার ধারণা ওরা আমাকেই বলছিল। আমি আর্টের সঙ্গে বেইমানি করেছি। ছবিটা জাহান্নমে যেতই।'

'তোমার ক্ষেত্রে আরো যোগ্য হত "ডাহা মূর্খ নিপাত যাক" বললে!'—উত্তাপের ঝোঁকে বলল রোডি, 'তুমি পুরনো ন্যাকড়ার মতো দশহাজার ডলারের চেক ছিঁড়ে ফেললে যেহেতু পাঁচ ডলার-দামের রঙ খরচা করে বিবেকে আঘাত

পেয়েছিলে? এর পরে যখন কোনো মতলব হাসিল করতে কোনো অংশীদার নেব, তখন তাকে পাঠাব উকিলের কাছে হলপ নিতে যে সে "আদর্শ" শব্দটাই কখনো শোনেনি।'

ক্রুদ্ধ ফ্যাকাশে রোডি গটগট করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। তার রাগের দিকে তেমন নজরই দিল না হোয়াইট। যে ভয়ংকর আত্মধিক্কার থেকে সে মুক্ত হয়েছে তার তুলনায় রোডি মোনাহানের বিদ্রূপ তো সামান্য ব্যাপার।

আগুয়াফেলিজে উত্তেজনা আরো বেড়ে গেছে। একটা বিস্ফোরণ বোধহয় আসন্ন। এই বিক্ষোভের কারণ হল শহরে এক হোঁতকা, গোলাপি-গাল ইংরেজ সাহেবের উপস্থিতি। বলাবলি হচ্ছে সে নাকি তার গভর্নমেন্টের দালাল হয়ে এসেছে একটা চুক্তি নিষ্পন্ন করতে, যা দ্বারা ডিক্টেটর দেশটাকে তুলে দেবেন এক বিদেশী শক্তির হাতে। অভিযোগ উঠেছে তিনি শুধু অমূল্য নিয়োগ-সুযোগগুলোই বিতরণ করছেন না, এমন-কি রাষ্ট্রীয় ঋণও হস্তান্তর করে দিচ্ছেন বৃটিশদের, শর্তের গ্যারান্টি হিসেবে শুল্ক ভবনগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন তাদের হাতে। অনেক সহ্য-করা মানুষগুলো এবার তাদের প্রতিবাদের তীব্রতা টের পাইয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সেই রাতেই আগুয়াফেলিজে এবং অন্য শহরগুলোতে তাদের রোষ ফেটে পড়ল। সগর্জন জনতা অস্থির কিন্তু মারমুখো হয়ে পথে পথে ঘুরছে। তারা প্লাজা চত্বরের মাঝখানে-দাঁড়ানো ডিক্টেটরের বিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তি উপড়ে ফেলে দেয়, ভেঙে খান খান করে আকারহীন টুকরোয়। সরকারী অট্টালিকার দেয়াল থেকে "গৌরবময় মুক্তি দাতা"-র মহিমা ঘোষণা-করা ফলকগুলো টেনে নামায়। ধ্বংস করে সরকারী দপ্তরে তার প্রতিকৃতিগুলো। কাসা মোরেনাও আক্রমণ করেছিল তারা, কিন্তু শাসকের অনুরক্ত বিশ্বাসী সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে সরে পড়ে। সারা রাত ধরেই চলে বিক্ষোভ।

লোসাডার মহাপ্রতাপ দেখা গেল পরের দিন—দুপুর নাগাদ ফিরে এল শৃঙ্খলা, আর তিনিই রয়ে গেলেন এখনও একনায়ক। ইংলণ্ডের সঙ্গে কোনো রকমের কোনো সমঝোতার কথা অস্বীকাব করে ঘোষণাপত্র বের করলেন। গোলাপি-গাল ইংরেজ স্যর স্ট্যাফোর্ড ভন নিজেও প্রাচীরপত্রে আর ছাপা ইস্তাহারে জানালেন যে তাঁর এখানে উপস্থিতির কোনো আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নেই। তিনি বিনা-মতলবের ভ্রমণকারীমাত্র। সত্যি বলতে (তাঁর বিবৃতি) রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তিনি কথাই বলেননি কিংবা আগমনের পরে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেননি কখনো।

এদিকে গণ্ডগোলের সময় 'ব্যর্থ আর্টের' অভিযাত্রীরা প্রস্তুত হচ্ছিল দেশে ফিরে যাবার জন্য। আর দু'তিন দিনের মধ্যে যে জাহাজ রওনা হবে তাতেই তাদের যাত্রা করার কথা। দুপুর নাগাদ অশান্ত রোডি তার কামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্থর প্রহরগুলো একটু গতিশীল করে তোলার আশায়। শহর এখন এমন নিঝুম যে মনেই হয় না শান্তি কখনো তার লালটালির বসতিগুলো ছেড়ে বিদায় নিয়েছিল।

বিকেলের মাঝামাঝি, রোডি হোটেলে ফিরে এল রীতিমতো বিশেষ ধরনের এক মেজাজ নিয়ে। নিজের ছোট কামরাটার মধ্যে আশ্রয় নিল যেখানে সে তার ফোটোগুলো ডেভেলপ করে।

পরে সে যখন বারান্দায় বেরিয়ে হোয়াইটের কাছে এল, তার মুখে এক ঝক্‌ঝকে, ভয়ানক শিকারীর হাসি।

'জানো এটা কী?' বলে তুলে ধরল একটা ৪×৫ কার্ডবোর্ডে বসানো ফটোগ্রাফ। অলস কণ্ঠে হোয়াইট আন্দাজ করল, 'হবে কোনো সৈকতে স্নানরতা সেনোরিটার ছবি—অনুপ্রাসটা অনিচ্ছাকৃত।'

'ভুল', চক্‌চকে চোখে বলল রোডি, 'এটা হল গুলতির তাক্। ডিনামাইটের কৌটো। সোনার খনি। এটা তোমার ডিক্টেটর মশাইয়ের কুড়ি হাজার ডলারের খোলা ড্রাফ্‌ট্, হ্যাঁ স্যার,—এবারে কুড়ি হাজার, আর কোনো ছবিও নষ্ট করা নয়। আর্টের নীতিজ্ঞান কোনো বাধা নয় এখানে। আর্ট! তোমার ওই গন্ধওয়ালা ছোট রঙের টিউব? হাঃ! একটা কোডাক দিয়েই তোমায় মেরে রেখেছি। একটু তাকিয়ে দেখ।'

হোয়াইট ছবিটা নিজের হাতে নিয়ে, লম্বা একটা শিস্ দিলে।

সবিস্ময়ে বললে, 'হে ভগবান্! তবে এটা দেখাতে গেলে শহরে টি-টি পড়ে যাবে না? কী করে তুমি এটা তুললে, রোডি?'

'ডিক্টেটরের বাড়ির পেছনের-বাগান ঘিরে উঁচু পাঁচিলটা তো জান? আমি ওখানে গিয়েছিলাম শহরের একটা পুরো দৃশ্য নেবার চেষ্টায়। হঠাৎ দেখলাম দেয়ালে একটা ফাটল। একটা পাথর আর অনেকটা প্লাস্টার বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। ভাবলাম দেখি ডিক্টেটর মশাই কেমন বাঁধাকপি ফলিয়েছেন তার বাগানে। প্রথমেই যা দেখলাম, এই স্যার ইংলিশম্যানটি আর উনি, কুড়ি ফুট দূরে একটা ছোট টেবিলের পাশে বসে আছেন। সারা টেবিলে ছড়ানো আছে দলিলপত্র, আর বোম্বেটেদের মতো দুজনে মারপ্যাঁচ কষছেন ওগুলো নিয়ে। বাগানের একটা চমৎকার কোণ ওটা, পামগাছ আর কমলালেবু গাছের আড়ালে, একান্ত আর ছায়াঘেরা। ওরা হাতের কাছেই ঘাসের ওপর রেখেছেন বালতিভরা শ্যাম্পেন বোতল। বুঝলাম এইটেই সেরা সময় আমার "আর্টের" মোক্ষম ঘা হানতে। তাই ক্যামেরাটাকে ফাটলের মুখে তুলে ধরি আর বোতাম টিপি। ঠিক যখনই ওটা করছি, ওই বুড়ো-দুটোও ব্যবসার নিষ্পত্তি সেরে হাতে-হাত মিলিয়েছেন—ছবিতেও দেখছ ওই কাজই ওরা করছে।'

রোডি মাথায় টুপি আর গায়ে কোট চাপায়।

হোয়াইট জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে যাচ্ছ তুমি?'

রোডি আহত কণ্ঠে বলে, 'আমি? কেন, আমি তো যাচ্ছি একটা গোলাপি ফিতেয় বেঁধে এটাকে 'যা-না-বলে-তাই'য়ের ওপর ঝুলিয়ে দিতে, অবশ্যই। তোমার

কথায় আমি অবাক হয়ে যাই। কিন্তু আমি যখন বাইরে থাকব, তুমি একটু হিসেব কষতে চেষ্টা কোরো কোন্ আড়ম্বর-লোভী একনায়ক এই আর্টের কাজটা কিনে নিতে সবচেয়ে আগ্রহী হবেন তাঁর ব্যক্তিগত 'সংগ্রহের'জন্য—স্রেফ এটাকে প্রচার থেকে বাঁচাতে।'

সূর্যাস্তের লাল যখন নারকোলগাছগুলোর মাথায় লেগেছে সেই সময় রোডি মোনাহান ফিরে এল কাসা মোরেনা থেকে। আর্টিস্টের প্রশ্নসূচক দৃষ্টির জবাবে একটু মাথা নুইয়ে, একটা খাটের ওপর শুয়ে পড়ল মাথার নিচে হাত রেখে।

'দেখা করেছিলাম। নিরীহ ভালমানুষের মতো টাকাটা দিয়ে দিল। ওরা তো প্রথমে আমাকে ঢুকতেই দেয়নি ভেতরে। তাদের বললাম খুব জরুরি কাজ আছে। হ্যাঁ, ডিক্টেটর লোকটার বহু কিছু করার ক্ষমতা আছে সন্দেহ নেই। চমৎকার ব্যবসার জাল ফেঁদে রেখেছে মগজ খাটিয়ে। আমাকে আর কিছু বলতে হল না, শুধু ফোটোগ্রাফটা তুলে দেখানো আর আমার দরটুকু জানানো ছাড়া। সে একবার খালি হাসল, হেঁটে গেল সিন্দুকের কাছে, বের করে দিল নগদ টাকা। টেবিলের ওপর একুশ হাজার কড়কড়ে নতুন আমেরিকান সরকারী নোট রাখল, যেমন করে আমি এক ডলার-সিকি ডলার ছেড়ে দিই বখশিস্। নোটগুলোও তাজা—দশ একর জমির বুনো ঘাস চড়বড় করে পুড়লে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি কড়কড়ে।'

উৎসুক হয়ে হোয়াইট বলে, 'দেখি দেখি একটু ছুঁয়ে। কখনো হাজার-ডলারের নোট চোখে দেখিনি।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয় না রোডি।

অন্যমনস্কভাবে বলে, 'ক্যারি, তোমার শিল্প নিয়ে বড় গর্ব, তাই না? অনেক কিছুই ভাব।'

হোয়াইট নিঃসঙ্কোচে বলে, 'আমার নিজের বা বন্ধুদের আর্থিক সদ্গতি হবার চেয়ে বেশি তো বটেই।'

রোডি শান্তভাবে বলতে থাকে,' আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্যদিক থেকে বোকা।' এখনো আমি নিশ্চিত নই সেটা ঠিক কিনা। কিন্তু তুমি যদি বোকা হয়ে থাক, তাহলে আমিও তাই। অনেক ধরনের মজার ব্যবসায়ে নাক গলিয়েছি, ক্যারি, কিন্তু সর্বদাই শেষ অবধি বেরিয়ে আসতে পেরেছি মোটামুটি গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়ে, তারপর অন্য লোকটার মগজ আর পুঁজির সঙ্গে টক্কর দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা যখন এল ... মানে যখন শেষ লড়াই ছাড়া রাস্তা নেই ,... ছি, এটা কি মরদ লোকের খেলা হল? মনে হয় আমার। এর যেন কী একটা নাম আছে, তুমি তো জান.... আরে বলোই না ছাই, বুঝতে পারছ না? একটা মানুষের তখন মনে লাগে—আরে তোমার ওই হতভাগা আর্টের মতোই খানিকটা—সে—মানে আমি ছিঁড়ে ফেলি ওই ফোটো, টুকরোগুলো রাখি সেই নোটের তাড়ার ওপর, তারপর গোটা জিনিসটাই ঠেলে ফিরিয়ে দিই তার দিকে, টেবিলের ওপর দিয়ে। বলি—'মাপ করবেন মিঃ লোসাডা, আমার মনে হয় আমি দামটার বেলায় ভুল

করেছিলাম। ওই ফোটো ফিরে পাবার জন্য আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।' এবার ক্যারি, পেন্সিলটা বের কর তো, আমি কিছু হিসেব কষব। আমাদের পুঁজি থেকে খানিকটা তো বাঁচাবই, নিউইয়র্কে ফিরে তোমার আস্তানায় বসে কিছু ভাজা সসেজ চিবুবার জন্য।'

Masters of Arts, এভরিবডি'স্, ১৯০৩

নিঃসঙ্গ পথ

আমার পুরনো বন্ধু ডেপুটি-মার্শাল বাক ক্যাপার্টন। উস্কোখুস্কো, কফি-বাদামী রঙ, পিস্তলসজ্জিত, রেকাব-পায়ে, চোখে সতর্ক নিশ্চিত দৃষ্টি নিয়ে তাকে ঝপ্ করে বসতে দেখলাম মার্শালের বাইরের দপ্তরের চেয়ারে। পায়ে রেকাব-চাকতির টুং টাং।

আদালত বাড়িটা এমনিতেই এখন প্রায় জনশূন্য, তাছাড়া বাক মাঝে-মাঝে আমাকে এমন সব গল্প শোনায় যা ছাপার অযোগ্য, তাই ভেতরে চলে যাই তার পেছন-পেছন। ওর একটা দুর্বলতা আমার জানা আছে, তারই সাহায্যে ওকে গল্প বলতে ওস্কাতে পারি। মিষ্টি ভুট্টার খোসা-মেশানো সিগারেট পাকিয়ে দিলে তা ওর গলায় মধুর মতো। ও ·৪৫ বোরের পিস্তল দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে বটে, কিন্তু সিগারেট পাকাবার কায়দাটা ও কোনোদিনও রপ্ত করতে পারল না।

ও যে-গল্পটা শোনালো তা কিন্তু আমার দোষে নয় (কারণ সিগারেটটা আমি আঁটসাট আর মোলায়েম করেই পাকিয়েছি), যার ফলে ওক বনের কোনো অভিযানকারীর কাহিনীর বদলে শুনলাম ওরই নিজস্ব খেয়াল থেকে উদ্ভাবিত কোনো বৃত্তান্ত—দাম্পত্য বিষয় নিয়ে! তাও আবার বাক ক্যাপার্টনের মুখে। কিন্তু তবু বলে রাখছি, আমার সিগারেটের মধ্যে কোনো খুঁত ছিল না, সে বিষয়ে আমাকে পুরোপুরি মাফ করতেই হবে আপনাদের।

বাক বললে, 'আমরা সবে তখন জিম আর বাড গ্রানরেরিকে গ্রেপ্তার করে এনেছি। ট্রেন ডাকাতি, বুঝতে পারছ। গত মাসে আরানসাস্ গিরিখাতে ট্রেন রুখেছিল। নিউসেসের দক্ষিণে "টুয়েন্টি-মাইল" নাসপাতি-বাগানের ফ্ল্যাটে ধরলাম ওদের।

'ওদের আটকাতে খুব ঝামেলা হয়েছিল বুঝি?' জিজ্ঞেস করি আমি,—কারণ এবার পাচ্ছি সেই বস্তুর গন্ধ, যার জন্য আমার মহাকাব্য-লোভী মন ব্যগ্র।

'কিছুটা ঝামেলা হয়েছিল বৈকি', বলে একটু ক্ষান্তি দিলে। ওর মন বোধহয় সূত্র ছেড়ে অন্য কোথাও ধাবমান। তারপর আবার বলতে শুরু করল—'মেয়েমানুষদের ব্যাপারটাই অদ্ভুত, বুঝলে, বটানির যে জায়গাটা তাদের নেবার কথা তাও যেন উদ্ভুটে। আমায় যদি তাদের শ্রেণীবিভাগ করতে দেওয়া হত, বলতাম তারা 'লোকো' মানুষ-রূপী বিষ—শেওলার আগাছা। কখনো কোনো ব্রঙ্কো ঘোড়াকে লোকো চিবুতে দেখেছ? দু'ফুট চওড়া একটা জলের সোঁতার দিকে তাকে নিয়ে যাও, দেখবে সে ভড়কে লাফ দিয়ে তোমারই ওপর পড়ছে। ওর কাছে তখন ওটা মিসিসিপির সমান। পরের খেপেই আবার সে হয়তো যাত্রা করবে এক-হাজার ফুট গভীর ক্যানিয়ন ধরে, যেন ওটা ওর কাছে প্রেইরি মাঠের কুকুর-গাড্ডা। একই ব্যাপার বিয়ে-করা পুরুষদেরও।

'আমার মনে পড়ছে পেরি রাউন্ট্রির কথা। বিবাহ-অপরাধটি করে ফেলার আগে সে'ই ছিল আমার সঙ্গী, পার্শ্বচর। সে-সব দিনে আমি আর পেরি কোনো রকম অশান্তির অভাব দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। আমরা ঘুরে-ঘুরে হৈ-চৈ তুলতাম আকাশে, যাতে তারা কাজে নেমে পড়ে। এই দেখ না, আমি আর পেরি যখন কোনো শহরে মজা করতে চাইতাম, তখন তো আদমশুমারির লোকদের পোয়াবারো! আমরা তো মার্শালের ডাণ্ডা গুনেই ঠাণ্ডা, ওদিকে যে গোটা জনসংখ্যার হিসেব পেয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু তারপর এল এই মারিয়ানা 'শুভরাত্রি' মেয়েটি, পেরির দিকে কেমন যেন তীর্যক নয়নে তাকাল, আর তখনই সে হয়ে গেল লাগাম-সচেতন ভগ্ন-জিন—মানে প্রায় আমার চোখের ওপর দিয়েই!

'ওর বিয়েতে ডাকেও নি আমায়। আমার ধারণা ওর বধূটি আমার পেডিগ্রি-কুলুজি জেনে গেছে, মেপে নিয়েছে আমার অভ্যাসের সদর-ভাগের নক্শা, তারপর স্থির করেছে বাক ক্যাপার্টনের মতো দাম্পত্য-গণ্ডির বাইরে ফুঁসিয়ে-বেড়ানো, বশ-না-মানা মাস্টাং-ঘোড়ার সঙ্গ ছাড়লেই বরং পেরি ডবল-সাজে দৌড়োবে ভাল। অতএব, ছ'টি মাস কেটে যাবার পর তবে আবার একদিন দেখা হল পেরির সঙ্গে।

'একদিন শহরের কিনার দিয়ে চলেছি, দেখি মানুষের মতো কী যেন একটা, কোনো ছোট বাড়ির ছোট বাগানে ঝাড়ি দিয়ে জল ঢালছে গোলাপঝাড়ের ওপর। মনে হল ওটার মতো কিছু যেন আগে দেখেছি, তাই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম, ওর মার্কাটা চিনতে চেষ্টা করলাম। পেরি রাউন্ট্রি তো নয় ওটা, তবে দাম্পত্য তাকে যেমন জড়ভরত জেলিমাছ বানিয়েছে তারই এক নমুনা বলা যায় ওকে!

'ওই মারিয়ানা যা করেছে তা স্রেফ মানুষ খুন। চেহারাটা বেশ ভালই আছে ওর, কিন্তু পরনে সাদা কলারের জামা আর জুতো, আর এক-মিনিটেই তুমি বলে দিতে পারবে, সে মিহি সুরে কথা বলবে, সে নিয়মিত ট্যাক্সো দেয়, মদ্যপান করার সময় কড়ে আঙুলটি আল্‌গা রাখে—যেমন ভেড়াখামারের মালিক বা নাগরিকরা

.হন। কী হাউইবাজি রে! কিন্তু আমি পেরির এই অধঃপতন আর ভীতু মার্কা ভাব সইতে পারি না একেবারে।

'সে গেটের কাছে এসে আমার হাত ঝাঁকায়। আমি ঠাট্টার সুরে বলি, দানা-মুখে তোতাপাখির মতো: "মাফ করবেন, মিঃ রাউনট্রি বোধহয়? মনে হচ্ছে একসময় আপনার সাহচর্যেই তৃপ্তি পেতাম, যদি না ভুল করে থাকি।"

"ওঃ, গোল্লায় যাও তুমি বাক,"—ভদ্রভাবেই বলল পেরি, আর সেটাই আমি ভয় করেছিলাম।

'বললাম, "তাহলে বল তো জল-ঝাড়ির হতভাগা পোকা-পড়া আংটা! ওঁচা ঘর-পোষা জানোয়ার! তুমি চলে গিয়ে এ কাজ করতে গেলে কেন? নিজের দিকে চেয়ে দেখ, সুন্দর ভদ্র, ঝগড়াঝাঁটি নেই—জুরিদের সঙ্গে বসার আর কাঠের ঘরের দরজা মেরামত করার উপযুক্ত লোক। এক সময় তুমি মানুষ ছিলে। এসব কাজে আমার ভয়ানক বিতৃষ্ণা। তুমি ঘরের ভেতরে যাচ্ছ না কেন, পরিপাটি ঘর গুছিয়ে ঘড়িতে দম দিচ্ছ না কেন? এখানে বাইরের হাওয়ায় এভাবে দাঁড়িয়ে কেন? আবার কোন্ খরগোশ এসে তোমায় কামড়ে দেবে যে!"

'পেরি এবার নরম সুরে, একটু দুঃখভাব করেই বলল, "বাক, তুমি বুঝতে পারছ না। বিবাহিত পুরুষকে অন্যরকম হতেই হয়। তোমার মতো এক পোড়-খাওয়া পুরনো ঝড় থেকে সে নিজেকে আলাদা মনে করবেই। শহর তোলপাড় করে তাদের গোড়া উপড়ে দেখা, ফ্যারো তাসের খেলা, আর লাল-মদের ওপর তাকিয়ে থাকা, এই সব ধরনের চপল বুদ্ধির কাজ নেহাতই অপরাধজনক সময়ের অপচয়।"

' "একটা সময় ছিল," বলতে গিয়ে বোধহয় একটু দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছি—"যখন বিশেষ এক ছোট্ট মেরির পোষা ভেড়াকে দেখেছি দুষ্টুমিভরা ছটফটে জীবনের শিক্ষা নিতে। আমি কখনো প্রত্যাশা করিনি পেরি, যে একটা পুরো মাপের মহামারী-রূপ থেকে তোমাকে এমন খেলো একটা মানুষের ভগ্নাংশ হয়ে যেতে দেখব। এই তো নেকটাই পরেছ, ঘরোয়া কাঁদুনির ভাষায় ন্যাকা বোকা কথা বলছ, যা আমাকে কোনো দোকানদার বা মহিলার কথাই মনে করিয়ে দেয়। দেখলেই মনে হয় এই বুঝি ছাতা নেবে, গ্যালিস্ আঁটবে আর সন্ধ্যা হলেই ঘরমুখো!"

'পেরি বলল, "ওই খুদে মহিলাটি কিন্তু উন্নতিও করেছে আমার। তুমি বুঝতে পারবে না বাক। বিয়ে করার পর থেকে এক রাতও আমি বাড়ির বাইরে থাকিনি।"

'যতক্ষণ পেরি আর আমি কথা বলি—সত্যি বলছি—ততক্ষণই ওই লোকটা কেবল আমার কথার ফাঁকে বাগড়া দেয়, তার বাগানের ছ'খানা টমাটোর চারার গল্প শোনাতে। সোজা আমার নাকের নিচে ঠুসে দেয় তার কৃষিকাজের "অবনতি",—আর তাও কিনা যখন আমি বলছি সেই কালিফোর্নিয়া পীট্-এর আস্তানায় ফ্যারো-তাসের খেলুড়েটাকে আলকাতরা-তুলো মাখিয়ে মজা করার কথা! কিন্তু একটু একটু করে যেন পেরির জ্ঞানগম্যি ফিরে আসে।

'সে বলে, "বাক! একথা স্বীকার করব যে একেকসময় একটু একঘেয়ে বোধ করি। খুদে মহিলাটির সঙ্গে আমি পুরোপুরি সুখী নই, একথা বলছি না। কিন্তু পুরুষেরও বোধহয় মাঝে-মধ্যে উত্তেজনার প্রয়োজন হয়। এখন, বলছি তোমায়: বিকেলে মারিয়ানা বেরিয়েছে দেখাসাক্ষাৎ করতে, সাতটার আগে বাড়ি ফিরবে না। আমাদের দু'জনেরই ওই সীমা—সাতটা পর্যন্ত, ওর বেশি এক মিনিটও আমরা কেউ বাইরে থাকি না, যদি না এক সঙ্গে কোথাও যাই। এখন আমি খুশি যে তুমি এসে পড়েছ বাক, কারণ আমার ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে মিলে খুব হৈ-হৈ করি প্রাণভরে, আগের দিনগুলো মনে করে। তুমি বলছ আজ বিকেলে একসঙ্গে একটু ফুর্তি করি? —নিশ্চয়, বড় চমৎকার হবে সেটা।"

'বন্দী ওই পুরনো রেঞ্জার-সওয়ারটার পিঠে এক চাপড় মেরে তাকে তার ছোট বাগানের অর্ধেকটাই পার করে দিই! চেঁচাই—"শুক্‌নো বুড়ো কুমির, টুপিটা তুলে নাও! তুমি এখনো অতটা মরে যাওনি দেখছি। দাম্পত্যের বেনোজলে আটকা পড়লেও খানিকটা মানুষ এখনো রয়েছ। এ শহরটা আমরা চষে ফেলব, দেখব কোথায় এর প্রাণ পক্ষী। বোতলের কাঁক্ খোলার যত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আছে ওগুলো উজাড় করে তা পরীক্ষা করব।" পেরির পেটে খোঁচা মেরে বলি, "ওহে বুড়ো শিংছাড়া দামড়া গরু, তোমার বাক-খুড়োর সঙ্গে পাপের পথে পা বাড়ালে এখনো শিং গজাবার কিছু আশা আছে।"

"আমাকে কিন্তু সাতটার মধ্যে ঘরে ফিরতে হবে, বুঝলে।"

"তা তো বটেই" বলে নিজেই চোখ টিপি, জানি তো একবার পেরি রাউনট্রি মদের দোকানীর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে মেতে উঠলে অমন কত সাতটা বেজে যাবে ওর ঘরে ফিরতে!

'শহরে আমরা গেলাম "গ্রে মিউল" সেলুনে—রেলস্টেশনের ধারে পুরনো পোড়া-ইটের বাড়িটা।

'দরজা-গোড়ায় একখানা 'খুর' বেখেই বললাম, 'কী খাবে ঠিক করেছ?"

'পেরি বললে, "কোনো সালসা।"

'লেবুর খোসায় পা পিছলে পড়ার অবস্থা তখন আমার! বললাম—"আমাকে তুমি যত খুশি অপমান কর, কিন্তু বারের মালিকটাকে চম্‌কে দিও না পেরি। ওর হার্টের ব্যামো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এবার তোমার জিভ জড়িয়ে গেছে।" অর্ডার দিই, "লম্বা গ্লাস আর বরফ-বাক্সের বাঁ পাশের ওই বোতলটা"।

'পেরি আবারও বলে "সালসা খাব।" তবে একটু বাদেই ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি কোনো বিরাট মতলব ওর মাথায় এসেছে যা এখুনি উদ্গীরণ করতে চায়।

'খুব উৎসাহিত হয়ে বলে, "বাক, কী করব আমরা, বলছি! আজকের দিনটাকে আমরা মনে রাখার-মতো দিন বানাব। বড্ড ঘর-কুনো হয়ে গিয়েছি তো, তাই

একটু বাঁধন-ছাড়া হতে চাই। পুরনো দিনগুলোর চূড়ান্ত আজ ফিরিয়ে আনব আমরা। এখানকার পেছনের কামরায় গিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে-ছটা অবধি চেকার খেলব।”

‘আমি বারের ওপর ঝুঁকে কান-কোচকানো মাইককে বলি (কারণ নজর রাখছিল সে-ই): “ভগবানের দোহাই কাউকে কিছু বোলো না। তুমি তো জান এককালে পেরি কে জিনিস ছিল? কী একটা জ্বর হয়েছে ওর, ডাক্তার বলছে ওকে আমোদের মধ্যে রাখতে।”

‘পেরি বললে, “মাইক, চেকারের বোর্ড আর ঘুঁটিগুলো দাও। এসো বাক, একটু উত্তেজনার জন্য আমি হন্যে হয়ে উঠেছি।”

‘পেছনের কামরায় ঢুকলাম পেরির সঙ্গে। দরজা বন্ধ করার আগে মাইককে বললাম—“ঘুনাক্ষরেও ফাঁস করে দিও না যে বাক ক্যাপার্টনকে তুমি সালসার সঙ্গে গলাগলি, কিংবা চেকার খেলার চর্চা করতে দেখেছ, নইলে তোমার অন্য কানটাও কাঁটা-চামচে করে দেব, মনে থাকে যেন।”

‘দরজায় তালা বন্ধ করে আমি আর পেরি বসলাম চেকার খেলতে। ঘরোয়া টুকিটাকির নমুনা ওই বুড়ো হতভাগা ওখানে বসে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে যখনই আমার কোনো বোড়ের ঘুঁটি কাত করতে পারছে, আর আমার রাজার লাইনে এলেই যতো বিরক্তিকর অঙ্গভঙ্গি করছে—এসব দেখলে তো একটা ভেড়া-পাহারার কুকুরও লজ্জায় মরে যাবে। এই লোক, যে একসময় ‘কেনো’ খেলায় ছ’টা বোর্ড ফুটো করে দিতে পারলে তৃপ্ত হত, কিংবা ফারো-খেলুড়েদের ঘাম ছুটিয়ে দিত—তাকেই কিনা দেখছি স্কুল-বাচ্চাদের উৎসবে স্যালি লুইসার মতো চেকারঘুঁটিগুলো ঠেলে দিতে! আমার তো ভাই মনস্তাপেই দম ঘুটে যায়।

‘তা ছাড়া আমি বসেছি কালো ঘুঁটি নিয়ে, ঘেমে উঠছি কেউ আবার তা জেনে ফেলবে কিনা। তারপর একটু চিন্তা করি এই বিবাহ-ব্যাপারটা নিয়ে, কীভাবে যেন মনে হয় এ হল সেই স্যামসন-পত্নী ডিলাইলা দেবীরই খেলা। সে তার স্বামীর চুল ছেঁটে দিয়েছিল; তো সবাই জানে একজন মেয়েছেলের হাতে চুল ছাঁটা হলে পুরুষটার মাথা কেমন বদখত দেখায়! তারপর যখন পড়শিরা এসে তাকে ঠাট্টা করতে লাগল, সে এমনই লজ্জায় পড়ল যে জোর খাটিয়ে লাথি মেরে গোটা বাড়িটাকেই নামিয়ে দিল সকলের মাথার ওপর। মনে মনে ভাবি, “এই তো বিবাহিত পুরুষ! হল্লাবাজি আর বেহেডপনার সব তেজ আর প্রবৃত্তিই তারা হারিয়ে ফেলে। তারা মদ খায় না, তারা বাঘের পেছু নেয় না, এমনকি লড়তেও চায় না। তাহলে কেন বিয়ে করতে যায়, বিবাহিত থাকতে চায়?” নিজেকেই প্রশ্ন করি।

‘কিন্তু পেরি মনে হচ্ছে যেন দারুণই মজা পাচ্ছে।

‘বলে, “বাক বুড়ো ঘোড়া, আমাদের জীবনে যত মজা পেয়েছি তার মধ্যে এটাই যেন সেরা নরক-গুলজারের রগড়, তাই না? এমন উদ্দীপনা আগে কখনো

পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। দেখ ভাই, বিয়ে করার পর থেকেই তো বাড়ি-ঘেঁষা হয়ে রয়েছি, এমন হুল্লোড়বাজি বহু কাল করিনি।"

'হুল্লোড়বাজি! হ্যাঁ, তাই তো বলছে ও—গ্রে মিউলের পেছন-কামরায় বসে চেকার খেলা! মনে হচ্ছিল, জলের ঝাড়ি নিয়ে ছ'খানা টমাটো চারার পাশে দাঁড়ানোর তুলনায় নিজেকে বুঝি কিছুটা দুর্নীতিগ্রস্ত আর অনেকটা লোচ্চার কাছাকাছি ভাবছে ও!

'একটু বাদে-বাদেই পেরি ঘড়ি দেখছে আর বলছে, "আমায় ঘরে ফিরতেই হচ্ছে, বুঝলে বাক্—সাতটার সময়।"

'আমিও বলি, "বেশ তো, লাফ মেরে বেরিয়ে পড়, ছুটে চলে যাও। এখানে তো এই উত্তেজনা আমায় মেরে ফেলতে বসেছে। এখন যদি একটু না শোধরাই, এই চেকারে মজে-যাওয়ার চাপটা একটু হাল্কা না করি, তাহলে আর আমার স্নায়ু বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।"

'তখন বোধহয় সাড়ে ছ'টাই বাজে—রাস্তায় যেন কোনো গোলমাল শুরু হয়েছে মনে হল। একটা চিৎকার, ছ-ঘরার গুলি ছোঁড়া, আর প্রচুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে কোনো অভিযান।

'অবাক হয়ে বলি, "ওটা আবার কী?"

'পেরি বলে, "ও কিছু উটকো ঝামেলা বাইরে। হ্যাঁ এবার তোমার চাল। এই শেষ খেলাটাই খেলতে পারব, সময় আছে।"

'বললাম, "একটু জানলা দিয়ে উঁকি মারা যাক, দেখি। একজন সামান্য মানুষের পক্ষে তো আর নিজের রাজার কিস্তি দেখা আর একটা না-জানতে পারা গোলমাল শোনা একই সঙ্গে সম্ভব বলে আশা করতে পারো না!"

'গ্রে মিউল সেলুনটা পুরনো স্পেনীয় পোড়া-ইটের বাড়ি, পেছনের কামরায় শুধু দুটো ছোট-ছোট একফুট চওড়া জানলা, তাতে লোহার গরাদ। একটা দিয়ে উঁকি মারি, দেখতে পাই হল্লাবাজির কারণটা।

'সেই ট্রিম্বলের দঙ্গলটা এসেছে—দশজন আছে দলে। টেক্সাসের দুর্বৃত্ত আর ঘোড়াচোরদের সবচেয়ে জঘন্য দল, ডাইনে-বাঁয়ে গুলি চালিয়ে রাস্তা ধরে আসছে। সোজা গ্রে মিউলের দিকেই। তারপর তারা আমার নজরের বাইরে চলে গেল, কিন্তু আমরা শুনতে পেলাম তারা সামনের দরজাটার দিকে গেছে, ঘোড়া নিয়ে। তারপর তারা গোটা সেলুনটা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল। শুনলাম বারের পেছনের বড় আয়নাটা ঘা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে পড়ল, বোতলগুলো ভেঙে পড়ছে। দেখতে পাচ্ছিলাম কান-কোঁচকানো মাইক এপ্রনপরা অবস্থায় চত্বরের ভেতর দিয়ে শেয়ালের মতো ছুটছে, আর বুলেটগুলো তার চারপাশ ঘিরে ধুলো ওড়াচ্ছে। তারপর গুণ্ডার দলটা গেল সেলুনের ভেতর, যা ভাল লাগে তাই পান করছে, আর যা পছন্দ নয় তা ভাঙছে।

'আমি আর পেরি দু'জনেই চিনি এ দলটাকে, আর ওরাও আমাদের চেনে। পেরি বিয়ে করার আগের বছর, সে আর আমি একই রেঞ্জার বাহিনীতে ছিলাম। ওই দলটার সঙ্গে লড়েছিলাম সেই সান মিগুয়েলে, খুনের অপরাধে ধরে এনেছিলাম বেন ট্রিমব্‌ল আর দু'জনকে।

'বলি, "আমরা বেরুতে পারব না। যতক্ষণ-না ওরা চলে যায়, আমাদের এখানেই থাকতে হবে।"

'পেরি ওর ঘড়ি দেখে। বলে, "সাতটা বাজতে পঁচিশ। খেলাটা আমরা শেষ করতে পারি। তোমার চেয়ে আমার দুটো বোড়ে বেশি। এবার তোমার চাল, বাক। জানো তো আমায় সাতটার সময় ঘরে ফিরতেই হবে।"

"আমরা বসে আবার খেলতে শুরু করি। ট্রিমবলের দলটা বাড়ি লণ্ডভণ্ড করছে ঠিকই। বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে মদ্যপান করে চলেছে। একটুক্ষণ খায়, একটু চেঁচায়, তারপরেই গুলি ছুঁড়ে কটা বোতল বা গ্লাস ভাঙে। দু'তিনবার তারা এসেছিল আর চেষ্টা করেছিল আমাদের দরজা খুলতে। তারপর আবার কিছু গুলি ছোঁড়াছুড়ি হল বাইরে, আবার উঁকি দিলাম জানলা থেকে। হ্যাম গসেট শহরের মার্শাল, রাস্তার ধারের দোকানপাট আর বাড়িগুলো তার হেপাজতে। সে চেষ্টা করছে জানলা দিয়ে ঢুকে দু'একটা ট্রিম্‌ব্‌ল-সাগরেদকে পাকড়াতে।

'চেকারের সেবারের খেলাটায় আমি হারলাম। বলতে বাধা নেই তিনবার রাজা খুইয়েছি, বাঁচাতে পারতাম যদি একটু শান্ত পরিবেশে বসতে পারতাম। ওই কাঁদুনে বিবাহিত লোকটা কিন্তু ঠিক বসে আছে, খিক্‌খিক্ করে হাসছে যখনই একটা বোড়েকে তুলে নিতে পারছে,— ভুট্টার দানা-তোলা বোকা মুরগির মতো।"

'খেলাটা শেষ হতে পেরি উঠে দাঁড়ায়, ঘড়ির দিকে তাকায়।

'বলে, "বেড়ে সময় কাটল হে! কিন্তু এবার আমাকে যেতে হয়। এখন পৌনে-সাতটা, আমায় সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে, বুঝলে?"

'ভাবলাম ও তামাশা করছে।

'বললাম, "আরে, আধঘণ্টা-একঘণ্টার মধ্যেই তো ওরা বেরিয়ে যাবে, নয়তো বেহুঁশ মাতাল হয়ে পড়ে থাকবে। তুমি বিয়ে করে এমন হয়রান নিশ্চয়ই হয়ে পড়োনি যে আবার হঠাৎ আত্মহত্যা করবে?"

আমার কথায় এবার ও-ই হাসল।

'বলল, "একবার বাড়ি ফিরতে আধঘণ্টা দেরি করে ফেলেছিলাম। মারিয়ানাকে দেখলাম রাস্তায়, আমাকে খুঁজছে। তখন যদি ওকে তুমি দেখতে, বাক—কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। ও জানে কী বিশ্রি ধরনের ঘুমকাতুরে ছিলাম আমি, হয়তো কোনো বিপদ হয়ে থাকবে, ভেবেছিল সে। এর পর থেকে কখনো দেরি করে বাড়ি ফিরি না। এবার তাহলে বিদায় নিতে হয়, বাক্।"

'আমি ওর আর দরজার মাঝখানে পথ রুখে দাঁড়াই।

'বলি, "বিয়ে-করা মানুষ! আমি জানি যে-মুহূর্তে পুরুত তোমায় বুঝিয়ে দিল, তখনই বোকার দলে নাম উঠল তোমার। কিন্তু কখনো কী মানুষের মতো একটুও চিন্তা কর না তুমি? ওখানে দশটা গুণ্ডা বসে আছে, হুইস্কি খেয়ে বুঁদ, খুন করার জন্য হন্যে হয়ে আছে। দরজার দিকে আদ্ধেক পথ যাবার আগেই ওরা তোমায় মদের বোতলের মতো নিঃশেষ করে খাবে। এবার একটু বুদ্ধিমান তো হও। অন্তত বুনো-শুয়োরের কৌশলটা নাও। চুপ মেরে বসে থাকো যতক্ষণ-না আমরা বেরুবার সুযোগ পাই।"

'দাঁড়ে-বসা চিন্তাহীন তোতাপাখির মতো ওই অল্লমগজের স্ত্রৈণ লোকটা ফের বলে, "আমায় যে সাতটার মধ্যে ফিরতেই হবে, বাক। মারিয়ানা আমার জন্য পথ চেয়ে থাকবে।" এবার সে নিচু হয়ে চেকার টেবিলের একটা পায়া খুলে নেয়। বলে, "ওই ট্রিম্‌বেলের দলের ভেতর দিয়েই যাব, বেড়াগাছের ভেতর সুতোগাছির মতো। ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই, কিন্তু সাতটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছুতেই হবে। তুমি আমার পেছন থেকে দরজায় তালা মেরে দাও, বাক। আর ভুলো না—পাঁচটা দানের মধ্যে তিনটেতে আমিই জিতেছি। আরো খেলতাম হয়তো, কিন্তু মারিয়ানা—"

"চুপ কর তো বুড়ো পাগলা-গাড়ি!" বাধা দিয়ে বলি, "কখনো দেখেছ্ তোমার বাক্-খুড়োকে ঝামেলা দেখলে দরজা বন্ধ করে দিতে? আমি বিয়ে করিনি, কিন্তু 'মর্মন্‌দের' মতো গাধাও নই। চার থেকে একটা গেলে তিনটে থাকে"—বলে আমি টেবিলের আরেক পায়া খুলে নিই—"সাতটার মধ্যেই ঘরে ফিরব আমরা, স্বর্গীয় হোক কি অন্য কিছুই হোক। তোমায় ঘর অবধি পৌঁছে দিতে পারি? সালসা-খাওয়া, চেকারভক্ত!— মৃত্যু আর সর্বনাশের রাস্তা দেখেছ বুঝি?"

'আমরা আলগোছে খুললাম দরজাটা, তারপর পা ফেলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। গুণ্ডা দলের কিছু অংশ দাঁড়িয়েছিল বারের সামনে। বাকিরা হাতে হাতে মদ পৌঁছে দিচ্ছিল, দু-তিনজন আবার দরজা বা জানলা থেকে উঁকি মেরে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল মার্শালের সেপাইদের দিকে। কামরার মধ্যে এমন ধোঁয়া যে আমরা দরজার দিকে অনেকটা এগিয়ে যাবার পরও ওদের চোখ পড়েনি আমাদের ওপর। তারপর বেরি ট্রিমব্‌লের গলা শুনলাম কোথা থেকে চিৎকার করে উঠল: "আরে, বাক ক্যাপার্টন এখানে এল কী করে?"

'বলেই সে একটা বুলেট ছুঁড়ে আমার কাঁধের একদিকের চামড়া তুলে দিল। বুঝতে পারলাম তাক্‌টা ফস্কে গেছে বলে সে মর্মাহত, সার্দার্ন প্যাসিফিক রেলওয়ের দক্ষিণে বেরির মতো পাকা বন্দুকবাজ কেউ নেই। কিন্তু সেলুনের ধোঁয়া তখন এমন গাঢ় যে ভালভাবে গুলি চালানো মুশকিল।

'টেবিলের পায়া দিয়েই আমি আর পেরি দুটো গুণ্ডাকে ছাতু করি—-টা তো আর বন্দুকের মতো তাক্ ফস্কায় না। আর দরজা দিয়ে ছুটে বেরুবার সময় বাইরের

দিকে নজর-রাখা একটি লোকের হাত থেকে আমি ছিনিয়ে নিই তার উইনচেস্টার। পেছন ঘুরে এবার মিঃ বেরির সঙ্গে হিসেব নিকেশটা করি।

'আমি আর পেরি দু'জনেই ঠিকঠাক বেরিয়ে এসে মোড় অবধি পৌঁচেছি। আমি অমনভাবে বেরিয়ে আসতে পারব বলে খুব একটা আশাই করিনি, কিন্তু ওই বিবাহিত লোকটার কাছে হার মানতেও চাইনি। পেরির ধারণায় আজকের আসল ঘটনা হল চেকার খেলা, আর আমার বিচারে গ্রে মিউল সেলুন থেকে টেবিলের পায়া মাথায় তুলে বেরিয়ে আসার মতো ভদ্রস্থ খেলাটিই হল খবরের কাগজের হেডলাইন হওয়ার উপযুক্ত।

'পেরি বললে, "তাড়াতাড়ি চল, সাতটা বাজতে এখনো দু'মিনিট, আর আমাকে বাড়ি ফিরতে—"

"ওঃ চুপ কর! বলি আমি, "সাতটার সময় আমারও সময় দেয়া ছিল—একটা ময়না তদন্তের ব্যাপারে আমি আসল কীর্তিমান, তবু তো আমি হাত-পা ছুঁড়ছি না যেতে পারছি না বলে!"

'পেরির ছোট বাড়ির পাশ দিয়ে আমার যাবার কথা। তার মারিয়ানাদেবী ফটকেই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা পৌঁছোলাম সাতটা বেজে পাঁচে। মহিলার গায়ে একখানা নীল র‍্যাপার, চুলগুলো বাচ্চা মেয়ের মতো টান করে বাঁধা, মানে যখন তারা নিজেদের বড়-বড় দেখাতে চায়। একেবারে কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত আমাদের দেখতে পায়নি, কারণ অন্য দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল। তারপর মহিলা একটু পেছিয়ে যেতেই দেখতে পেল পেরিকে: একটা কেমন ধরনের ভাব সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল—সেটা বর্ণনা করা আমার কম্ম নয়। শুনলাম সে লম্বা একটা নিশ্বাস ছাড়ল, ঠিক গাই যেমন করে, তার বাছুরটিকে নিজের খোঁয়াড়ে ছেড়ে দিলে। বলল, "তোমার দেরি হল, পেরি।"

'ফুর্তিভরে পেরি জবাব দিল, "মাত্র পাঁচ মিনিট! আমি আর বুড়ো বাক চেকার খেলছিলাম কিনা।"

'পেরি মারিয়ানার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর দু'জনেই বলে ভেতরে আসতে। না স্যর-রি, আজ অনেক কারবার হয়েছে বিবাহিতদের সঙ্গে! বলি, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে, আমার পুরনো সাথীর সঙ্গে খুব চমৎকার কাটিয়েছি বিকেলটা—"বিশেষ করে" পেরিকে একটু জ্বালাতন করবার জন্য বলি, "ওই খেলাটার সময় যখন টেবিলের পায়াগুলো খুলে বেরিয়ে এল।" কিন্তু আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম ওর বউকে কিছু জানতে দেব না।

'ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছি', বলে চলে বাক—'একটা কিছু এর মধ্যে আছে যা আমার ধারণা ওলটপালট করে দিচ্ছে, আর কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছি না।'

শেষ সিগারেটটা পাকিয়ে বাকের হাতে তুলে দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার সেটা?'

'তা, তোমাকে আমি বলব: পেরিকে নিরাপদে খোঁয়াড়ে ফিরতে দেখে সেই ক্ষুদে মহিলা যখন ঘুরে ওর দিকে তাকাল, সেই দৃষ্টি, যা আমিও দেখলাম—আর তার পরই এক মিনিটে বুঝে ফেললাম কেন তার ওই দৃষ্টি আমাদের সমস্ত কীর্তিকলাপকে ছাপিয়ে গেছে—সারসাপারিলা, চেকার, আর সব কিছু—আর এই খেলায় কিন্তু পেরি রাউন্ট্রি মোটেই বেহদ্দ গাধাটি নয়!'

The Lonesome Road এইনস্লি'জ, ১৯০৩

ঘুমের সঙ্গে লড়াই

টম হপকিন্স কেমন করে ভুলটা করল, আমি কখনো তা ভাল করে বুঝতেই পারলাম না। কারণ সে একটা পুরো 'টার্ম' মেডিকেল কলেজে পড়েছে (মানে তার পিসিমার বিষয়সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার আগে)—আর তাকে ভেষজ বিজ্ঞানের উত্তম ছাত্র বলেই গণ্য করা হত।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা দুজন একসঙ্গে একটা 'কল' সেরে এসেছি। ফিরেই টম আমার কামরায় ছুটে এল, তার নিজের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে যাবার আগে একটু ধূমপান আর গল্প করার লোভে। আমি তখন অল্পক্ষণের জন্য অন্য কামরাটায় ঢুকেছি, এমন সময় টমের ডাক শুনতে পাই:

"ও বিলি, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, চার গ্রেন মতো কুইনিন খেয়ে নিচ্ছি—আর ভীষণ শীত করছে, শরীর খারাপ লাগছে। বোধহয় ঠাণ্ডা লেগে গেছে।"

আমি উঁচু গলায় জবাব দিলাম, "ঠিক আছে। বোতলটা ওই দু'নম্বর তাকে। ইউক্যালিপটাস্ সিরাপের চামচটা নিয়ে এক চামচ খেয়ে ফেল। তেতোটাও কেটে যাবে।"

আমি ফেরার পর দু'জনে বসলাম আগুনের ধারে। চলতে থাকল আমাদের পাইপ টানা। প্রায় আট মিনিটের মধ্যে টম ঢলে পড়ল মৃদু মূর্ছার মধ্যে।

আমি সোজা গিয়ে ওষুধের আলমারিটায় উঁকি দিই।

"নিরেট গেঁয়ো ভূত একটা!" গজরে উঠি, "টাকায় মগজের কী ক্ষতি করে দেখ!"

মরফিনের বোতলটা ছিপি-খোলা দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমনটি রেখেছিল টম।

ওপরতলার বোর্ডার আরেক তরুণ এম-ডি'কে টেনে বের করলাম, তাকে পাঠালাম দু'চত্বর দূরে বুড়ো ডাঃ গেল্‌স্‌কে ডেকে আনতে। টম হপকিন্সের এত পয়সা যে নিতান্ত উঠতি পেশাদার ছোকরা ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসা করানো চলে না।

গেল্‌স্‌ যখন এলেন, আমরা ডাক্তারী পেশা-সম্মত সমস্ত সম্ভাব্য দামি চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম টমের জন্য। প্রথমে তীব্র প্রতিষেধকগুলো দেবার পর, আমরা ওকে ঘন-ঘন মাত্রায় সাইট্রেট অব ক্যাফিন আর কড়া কফি খাওয়ালাম, দু'জনে ধরাধরি করে মেঝের ওপর ওকে হাঁটালাম। বুড়ো গেল্‌স্‌ চিম্‌টি কাটলেন, ওর গালে চাঁটি মারলেন, আর দারুণ পরিশ্রম করলেন দৃষ্টির অনতিদূরেই একটা বড়সড়ো চেক্‌ কল্পনা করে। ওপরের তলার তরুণ এম-ডি. ভাবাচ্ছন্ন টমকে একটা জাগিয়ে-তোলা, প্রাণখোলা লাথি মেরে, ক্ষমা চাইল আমার কাছে।

বলল, "লোভ সামলাতে পারিনি। জীবনে কখনো কোনো লক্ষপতির পেছনে লাথি মারিনি তো! আর হয়তো সুযোগও পাব না।"

দু'ঘন্টা বাদে ডাঃ গেল্‌স্‌ বললেন, "এখন ঠিক আছেন উনি। কিন্তু আরো একটি ঘন্টা ওঁকে জাগিয়ে রাখবেন। ওটা করতে পারেন ওঁর সঙ্গে কথা বলে, আর মাঝে-মাঝে ওঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে। যখন নাড়ি আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হবে, তখন ওঁকে ঘুমোতে দেবেন। এখন ওঁকে আপনার সঙ্গেই ছেড়ে যাচ্ছি আমি।"

টমকে একটা গদি-শয্যায় শুইয়ে দিয়েছি আমরা, আমি ওর সঙ্গে একলা এখন। খুব নিশ্চল শুয়ে আছে, চোখের পাতা আধবোজা। আমি শুরু করি ওকে জাগিয়ে রাখার কাজ।

বলি, "বুড়ো খোকা, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ, তবে টেনেও রাখতে হয়েছে আমাদের। যখন ক্লাসের লেকচার শুনতে টম, তখন কি কোনো অধ্যাপক কথা-কথায়ও বলেননি 'কুইনিয়ার' বানানটা ম-র-ফি-য়া নয়? বিশেষ করে চারগ্রেন মাত্রার বেলায়? কিন্তু এসব আর তোমার ওপর চাপাব না যতক্ষণ-না পায়ের ওপর খাড়া হয়ে উঠছ। তবে তোমার হওয়া উচিত ছিল ওষুধ-বিক্রেতা, টম, দারুণ রকম প্রেস্‌ক্রিপশনের ওষুধ বিলোতে পারতে।"

টম একটা ক্ষীণ বোকা হাসি দিলে আমার দিকে।

বিড়বিড় করে বললে, "ব্লি, মনে হচ্ছে ঠিক যেন্‌ গুন্‌গুনে পাখির মতো দাউন দামি গোল্‌-আপের ওপো দিয়ে ঘুয়ে বেয়াচ্ছি। আমায় বিয়ক্ত কোরো না, একুন ঘুমোবো।"

আর দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। কাঁধ ধরে ঝাঁকালাম।

কড়া গলায় বললাম, 'না টম, এভাবে চলবে না। বড় ডাক্তার বলে গেছেন

অন্তত এক ঘন্টা তোমায় জেগে থাকতে হবে। চোখ খোল। তুমি এখনো পুরো ঠিক হওনি জানো? জেগে থাক, জেগে থাক!"

টম হপকিন্সের ওজন একশো আটানব্বুই পাউণ্ড। আমার দিকে আরেকটা নিদ্রাতুর কেঠোহাসি দিল সে, তারপরেই আরো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল। আমার উচিত তাকে হাঁটানো, কিন্তু সে তো হবে ক্লিওপেট্রা-স্তম্ভ নিয়ে ওয়লট্জ নাচার চেষ্টার মতো! টমের নিশ্বাস এবার নাক-ডাকাতে পরিণত হয়, আর সেটা মরফিয়া বিষক্রিয়ার ব্যাপারে বিপজ্জনক লক্ষণ।

তখন ভাবতে শুরু করি আমি। তার শরীরটাকে তো তুলতে পারি না, তাই চেষ্টা করতে হবে তার মনটাকে উত্তেজিত করার। একটা আইডিয়া এল মাথায়: "ওকে চটিয়ে দাও।" ভাবলাম "বেশ, কিন্তু কী ভাবে?" টমের বর্মে কোনো ছিদ্র নেই। সকলের প্রিয় বুড়ো ছেলে। যেন স্বয়ং সৎ প্রকৃতি, আর সাহসী ভদ্রমানুষ। চমৎকার, নিষ্ঠাবান, সূর্যালোকের মতো নির্মল। দক্ষিণের কোনো জায়গা থেকে এসেছে, সেখানে এখনো আদর্শ, নীতিবোধ কিছু টিঁকে আছে। নিউইয়র্ক তাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু নষ্ট করতে পারেনি। ওর সেই সাবেকী ধরনের, বীরত্বময় সম্মানবোধ রয়েছে মহিলাদের প্রতি, সেটা— পেয়েছি!— এই তো আমার বুদ্ধিটা এসে গেছে! কল্পনায় ব্যাপারটা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম দু'এক মিনিট। বুড়ো টম হপকিন্সের ওপর সহসা এমন চমকপ্রদ বুদ্ধি খাটানোর কথা ভেবে নিজেই উল্লসিত হই। তারপর তার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকাতে থাকি যতক্ষণ না তার কান সজাগ হয়। সে অলসভাবে চোখ মেলে চায়। আমি বিচ্ছিরি একটা বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি নিয়ে তার নাকের দু'ইঞ্চির মধ্যে তুলে ধরি আমার আঙুল।

কাটা-কাটা পরিষ্কার উচ্চারণে বললাম, "দেখ হপ্‌কিন্স, তুমি আর আমি বরাবর ভাল বন্ধুই ছিলাম, কিন্তু আজ তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তুমি যা করেছ তারপর তোমার মতো একটা বদমাশের সামনে ভবিষ্যতে আমার দরজা বন্ধই থাকবে।"

টমের মধ্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখা গেল না।

সে শান্তভাবে বিড়বিড়িয়ে বলল, "তোমার ব্যাপার কী বিলি? গায়ে পোশাক ফিট হচ্ছে না?"

আমি বলেই চললাম, "আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম—ভগবান না করুন—তাহলে বোধহয় চোখ বন্ধ করার সাহসই পেতাম না। সেই মেয়েটির ব্যাপার কী, যাকে তুমি সঙ্গীহীন দক্ষিণের পাইনবনে একা ছেড়ে চলে এলে, আর সে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে? তোমার এই হতচ্ছাড়া টাকার মুখ দেখার পর তুমি তাকে ভুলেই গেছ?... হ্যাঁ, আমি জানি আমি কিসের কথা বলছি। যখন গরিব মেডিকাল-ছাত্র ছিলে, তখন তাকে দিয়েই তোমার বেশ চলছিল। কিন্তু এখন যেহেতু লক্ষপতি হয়েছ, পরিস্থিতিটাই বদলে গেল। ভেবে অবাক হই, এখন সে ওই অদ্ভুত শ্রেণীর লোকগুলোর কীর্তিকলাপ দেখে কী মনে

করে—যাদের সে পুজো করতেই শিখেছে?—মানে ওই দক্ষিণী ভদ্দর লোকদের কথা বলছি। আমি দুঃখিত হপকিন্স যে এসব বিষয়ে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। কিন্তু আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি তুমি এমন চমৎকার করে সেটা ধামাচাপা দেবে, আর সুন্দর অভিনয় করে যাবে। আমি ভাবতাম তুমি এসব অমানুষ কারসাজির ঊর্ধ্বে।"

বেচারি টম। ঘুমের ওষুধের বিরুদ্ধে তার অক্লান্ত লড়াই দেখে আমি তো হাসিই চাপতে পারি না বলতে গেলে। সে পরিষ্কার রেগে উঠেছে, কিন্তু তাকে দোষ দিতে পারি না—টমের হল দক্ষিণীসুলভ মেজাজ। ওর চোখদুটো এখন পুরো খোলা, তাতে যেন চিকমিক্ করে আগুনও জ্বলতে দেখা যায়। কিন্তু নেশার ঘোর এখনো তার মন আচ্ছন্ন আর জিভ এঁটে রেখেছে।

সে তোতলাতে থাকে, "গো-গোল্লায় যাও তুমি। তো-তোমার মাথা ভেং-গে দেব।"

সে গদি ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করে। আয়তনে বড় হলেও এখন সে দুর্বল। এক হাতেই তাকে ঠেলে শুইয়ে দিই। সে ফাঁদে পড়া সিংহের মতো কট্‌মট করে চেয়ে পড়ে থাকে।

মনে-মনে ভাবি, বুড়ো ছিটেল, এতেই তুমি কিছুক্ষণ সজাগ থাকবে। আমি উঠে পাইপ ধরাই, ধূমপানের বড্ড প্রয়োজন ছিল। একটু পায়চারি করি, আর নিজের বুদ্ধির তারিফ করি নিজেই।

একটা নাক-ডাকার মতো আওয়াজ!— ঘুরে তাকাই। টম আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি এগিয়ে গিয়ে চিমটি কাটি ওর চোয়ালে। হাবার মতো মিষ্টি, নালিশশূন্য চোখে তাকায় আমার দিকে। আমি পাইপ চিবিয়ে ধরে আবার তাকে শোনাই একগাদা কড়া কথা।

অপমান করার সুরে বলি, "আমি চাই তুমি সুস্থ হয়েই বেরিয়ে চলে যাও আমার কামরা থেকে—যত তাড়াতাড়ি হয়। আমি তো বললামই তোমার সম্বন্ধে আমি কী ভাবি। যদি আত্মসম্মান বা সততার ছিঁটেফোঁটাও তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করার আগে দু'বার ভেবে নিও। মেয়েটি তো গরিব, তাই না?" ব্যঙ্গ করে বলি, "আমাদের পক্ষে একটু বেশি সাদামাটা, চটকশূন্য, যেহেতু আমাদের টাকা আছে ওর সঙ্গে ফিফ্‌থ এ্যাভিন্যুতে হাঁটতে লজ্জা পাও, তাই না? হপকিন্স, তুমি একটা জানোয়ারের চেয়েও সাতচল্লিশ গুণ জঘন্য। কে তোমার টাকার পরোয়া করে? আমি তো করি না। বাজি রেখে বলতে পারি ওই মেয়েটিও করে না। হয়তো তোমার ওটা না থাকলে, তুমি বেশি পুরুষ মানুষ হতে। এমনিতেই তুমি নিজেকে একটা কুত্তা বানিয়ে ফেলেছ, আর—" ভাবলাম এটা বেশ নাটকীয় হল—"হয়তো একটা বিশ্বস্ত হৃদয় ভেঙেও

দিয়েছ।" (বুড়ো হপকিন্স বিশ্বস্ত হৃদয় ভাঙবে!) "এবার যত তাড়াতাড়ি পারি তোমায় বিদায় করব।"

টমের দিকে পেছন ফিরে, আয়নায় আমার নিজের চেহারার দিকে চেয়ে নিজেই চোখ টিপি। আওয়াজ পেলাম সে নড়াচড়া করছে—বোঁ করে ফিরে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে একশো-আটানব্বই পাউণ্ড আমার ঘাড়ের ওপর পড়ুক, তা চাইনি। কিন্তু টম কেবল খানিকটা মোচড় দিয়ে শুয়েছে, একটা বাহু রেখেছে নিজের মুখের ওপর। এবার কিছু বলল যা আগের চেয়ে পরিষ্কার।

"বিলি, আমি কিন্তু ... তোমাকে এভাবে বলতে পারতাম না ... যদিও-বা শুনতাম লোকে... তোমার নামে মিথ্যে .. বদনাম করছে।.... তবে হ্যাঁ ... যখ্.. যখনি উঠে দাঁড়াব... তো-তোমার ঘাড় ...একেবারে মট্‌কে দেব ... ভুলো না।"

এবার কিন্তু আমার একটু লজ্জাই হল। কিন্তু সবই তো টমকে বাঁচাবার জন্য। সকালে যখন তাকে বুঝিয়ে বলব, দু'জনে মিলে কতই না হাসব।

প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে টম গভীর, স্বাভাবিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল। ওর নাড়ি টিপে দেখলাম, কান পেতে নিশ্বাসের শব্দ শুনলাম, দিলাম ওকে ঘুমোতে। সবকিছুই স্বাভাবিক, টমও বিপদ থেকে উত্তীর্ণ। আমি অন্য কামরাটায় গিয়ে সোজা ঢুকলাম বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি টম উঠে পড়েছে, পোশাক পরছে। এখন পুরোই আবার নিজের স্বাভাবিক মেজাজে—শুধু সামান্য স্নায়বিক কাঁপুনি ছাড়া, আর জিভটা এখনো জড়ানো, খরখরে।

কী ভাবতে ভাবতে বলল, "কী গাধার কাজ করেছি! ডোজ্‌টা নেবার সময়ই আমার মনে হচ্ছিল কুইনিন বোতলটা অমন আজব দেখতে কেন। আমার জ্ঞান ফেরাতে খুব মুশকিল হয়েছিল বুঝি?"

বললাম, 'না'। ওর স্মৃতি সমস্ত ব্যাপারটাতেই তিক্ত হয়ে আছে মনে হল। সিদ্ধান্ত করলাম ওকে জাগিয়ে রাখবার জন্য আমার সমস্ত প্রয়াস ও বিলকুল ভুলে গেছে, কিছু জানানো বোধহয় ঠিকও হবে না। ভাবলাম, অন্য কোনো সময়, যখন ও খোশমেজাজে থাকবে, তখন ওই নিয়ে দু'জনে বেশ মজা করা যাবে।

টম যাবার জন্য তৈরি হয়েও দরজা খোলা রেখে একটু থামল। আমার সঙ্গে করমর্দন করে নিচু গলায় বলল:

'বুড়ো ইয়ার, আমাকে নিয়ে এত ঝামেলা পোয়ালে তাই বাধিত রইলাম—আর যা-যা বলেছিলে তার জন্যও। আমি এখুনি গিয়ে খুদে মেয়েটিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।'

At Arms with Morpheus, এইন্‌স্লিজ, ১৯০৩ ("এস্. এইচ্. পিটার্স ছদ্মনামে)

হাস্যরসিকের স্বীকারোক্তি

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কেবল 'তা'-ই দেওয়া হচ্ছিল—অবশ্য বেদনাহীনভাবে—তারপর একদিন ভেঙে পড়ল আমারই ওপর। লোকে বলল আমিই 'সে'।

কিন্তু হামজ্বর না বলে ওরা এটাকে বলেছে হাস্যরস।

দোকানের কর্মচারীরা সিনিয়র অংশীদারের ৫০তম জন্মদিনে একটা রুপোর কলমদান এনেছিল উপহার দেবে বলে। আমরা তাঁর দপ্তরে ভিড় করে ঢুকলাম। আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল মুখপাত্র হিসেবে, এক-হপ্তা মুসাবিদা করে তৈরি একটা ছোট বক্তৃতা দিলাম আমি।

আকস্মিক সাফল্য পেয়ে গেল সেটা। বক্তৃতা অনুপ্রাস, তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, আর এমন কৌতুককর মারপ্যাঁচে ভরা যে গোটা বাড়িটাই উল্লাসে ভেঙে পড়ে আর-কি (পাইকারি লোহালক্কড়ের লাইনে বেশ জবরদস্ত বাড়ি অবশ্য)। বুড়ো মার্লো সাহেব সত্যিই ঠোঁট চিরে হেসে ফেলেছিলেন, আর কর্মচারীরাও তা দেখতে পেয়ে জুড়ে দেয় প্রবল হাস্য।

ব্যস্, সেদিন সেই সকাল ন'টা থেকেই প্রতিষ্ঠা পেল হাস্যরসিক হিসেবে আমার খ্যাতি।

এরপর কয়েক হপ্তা ধরে আমার সহযোগী কেরানিরা সমানেই আমার আত্মগর্বের শিখায় হাওয়া দিয়ে চলল। একে একে আসে আর বলে, একটা দারুণ চতুর বক্তৃতা ছিল সেটা, তারপর নিজেরাই আমার কৌতুকের একেকটা বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যানা দেয় আমার কাছে।

ক্রমে বুঝে গেলাম যে ওটা আমায় তুলে ধরে রাখতে হবে, সেটাই তারা চায়। অন্যরা হয়তো ব্যবসার ব্যাপার আর সাবাদিনের কাজকর্ম নিয়ে গম্ভীর বিবেচনার কথা বলতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ওবা প্রত্যাশা করে বেশ মজাদার আর প্রাণখোলা কিছু।

আমার কাছে চায় বাসনপত্র নিয়ে ব্যঙ্গরসিকতা, পাথরের পণ্যদ্রব্য নিয়ে হালকা কৌতুক। আমি হলাম দু'নম্বর হিসাবরক্ষক, আর আমি যদি কিছু ভাঁড়ামো মন্তব্য না করেই ব্যালান্সশীট দেখাই, অথবা কলের লাঙলের চালান-কাগজে হাসির কিছু না পাই, তা হলে মুখ গোমড়া করে অন্য কেরানিরা।

ক্রমে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, আমি হয়ে দাঁড়াই একটি স্থানীয় "চরিত্র"। শহরটা আমাদের ছোট, তাই সেটা সম্ভব হয়। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রায়ই আমার উক্তিগুলো উদ্ধৃত হয়। সামাজিক সম্মিলনগুলোতে তো আমি না-হলেই-নয়।

আমার বিশ্বাস চটজলদি স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যুত্তর দেবার মতো বুদ্ধি আর ক্ষমতা আমার যথেষ্টই ছিল। তারপর অভ্যাস করে-করে এই প্রতিভাটা আরও মার্জিত,

উন্নত করলাম। আমার কৌতুকের প্রকৃতিটা ছিল সদয়, অমায়িক, কাউকে কখনো বিদ্রূপ করা বা খোঁচা দেওয়া নয়। আমাকে আসতে দেখলে লোকে এমনিতেই হাসিমুখ করত, আর দলের মধ্যে ভিড়বার আগেই তৈরি হয়ে যেত আমার কথা, যা সেই হাসিকে চওড়া করে দিত উচ্চহাস্যে।

আমি অল্প বয়েসে বিয়ে করেছি। আমার চমৎকার একটি তিনবছরের ছেলে আর পাঁচ বছরের মেয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা থাকতাম একটা আঙুরলতা-ছাওয়া কুটিরবাড়িতে, আর ছিলামও বেশ সুখী। লোহার জিনিসের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হিসেবরক্ষক হিসেবে আমার যা বেতন, তাতে বাড়তি সম্পত্তির অনুষঙ্গী উৎপাতগুলো অন্তত দূরে থাকত।

যখন-তখন সময় পেলেই কিছু কৌতুক বা উদ্ভটবাক্য লিখে ফেলেছি, যখন ভেবেছি মন্দ হয়নি, কোনো বিশেষ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি—যারা এগুলো ছাপে। সবগুলোই সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। কয়েকজন সম্পাদক তো লিখেও জানিয়েছেন আরো লেখা পাঠাবার জন্য।

একদিন আমি এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি প্রস্তাব করেছেন তাঁর কাগজের একটি 'কলম' ভরার জন্য যেন কিছু রস-রচনা পাঠাই; তিনি এও ইঙ্গিত করেছেন যে লেখাটি মনঃপূত হলে প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত এই রকম রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। তাই করলাম আমি। আর দু'হপ্তা বাদেই তিনি এক বছরের জন্য একটা চুক্তি-প্রস্তাব করলেন, তার জন্য যে অঙ্কটা দেবেন বললেন, লোহালক্কড়ের প্রতিষ্ঠান আমাকে যা দেয় তার তুলনায় তা অনেকটা বেশি।

আনন্দে উদ্বেল হলাম। আমার স্ত্রী তো আমার সাহিত্যিক সাফল্যের জন্য এর মধ্যেই মনে-মনে আমার মাথায় মুকুট চড়িয়েছিল।—অক্ষয় চিরহরিৎ লতাপাতা দিয়ে। সে রাতে আমরা চিংড়ির পুরু কাটলেট আর জামের সুরা দিয়ে নৈশভোজন করলাম। এইবার একটা সুযোগ এসেছে একঘেয়ে খাটুনি থেকে নিজেকে মুক্ত করার। লুইসার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে খুব গুরুতর আলোচনা হল। আমরা একমত যে এবার আমার গোলার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোই হাস্যরসের সেবায় মন দেওয়া উচিত।

আমি চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। আমার সঙ্গী কেরানিরা আমায় একটা বিদায়-ভোজও দিল। সেখানে যে বক্তৃতা দিলাম তা উজ্জ্বল চাকচিক্যময়। "গেজেটে" তা পুরোটাই ছাপা হয়েছিল। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি ঘড়ির দিকে তাকাই।

"উঃ বড় দেরি হয়ে গেল।" বলেই হাত বাড়াই পোশাকের দিকে। লুইসা আমায় মনে করিয়ে দিল আমি আর লোকালক্কড় আর কনট্রাকটরের মাল-সরবরাহের ক্রীতদাস নই। আমি এখন পেশাদার রস-রচনার সাহিত্যিক।

প্রাতরাশের পর আমাকে সগর্বে নিয়ে গেল রান্নাঘরের ওপাশে একটা ছোট

কামরায়। লক্ষ্মী মেয়ে! ওখানে আমার টেবিল-চেয়ার, রাইটিং প্যাড, কালি, আর পাইপের ট্রে সাজানো। আর লেখকের জন্য সব রকম বন্দোবস্ত—তাজা গোলাপ আর মিষ্টি ফুলের সাজি, দেয়ালে গেল-বছরের ক্যালেণ্ডার, অভিধান, আর অনুপ্রেরণার ফাঁকে-ফাঁকে মুখে ফেলবার জন্য ছোট পুরিয়া-ভর্তি চকোলেট।

কাজে বসাই নিজেকে। ওয়ালপেপারে আরবি নক্‌শা কিংবা তুর্কি কিংবা-হয়তো চতুষ্কোণ ছক। একটা ছবির দিকে রাখি চোখদুটো। কোনো হাস্যকর পরিস্থিতির কথা ভাবতে থাকি।

একটা কণ্ঠস্বর চমকে দিল আমাকে—লুইসার গলা।

বললে, "খুব ব্যস্ত যদি না থাক ডিয়ার, তাহলে খেতে এস।"

আমি ঘড়ি দেখলাম। হ্যাঁ, কঠিন মহাকাল এর মধ্যে আমার পাঁচটি ঘন্টা কেড়ে নিয়েছেন। খেতে চললাম।

লুইসা বললে, "প্রথমদিকে খুব বেশি পরিশ্রম কোর না যেন। গ্যেটে, নাকি নেপোলিয়ন?— বলেছিলেন মানসিক পরিশ্রমের জন্য দিনে পাঁচ ঘন্টাই যথেষ্ট। আজ বিকেলে আমাকে আর বাচ্চাদুটোকে বনের দিকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবে না?"

মানলাম, আমি সত্যিই একটু ক্লান্ত। অতএব বেড়াতে গেলাম বনে।

কিন্তু শিগগিরই হয়ে গেলাম পুরোদমে চালু। এক মাসের মধ্যে লোহরি মাল পাঠানোর মতো নিয়মিত পাঠাতে শুরু করলাম লেখা।

পেলামও সাফল্য। সাপ্তাহিকে আমার স্তম্ভ আলোড়ন তুলেছে, সমালোচকরা আলাপনসূত্রে উল্লেখ করছেন আমাকে—রঙ্গরসের ক্ষেত্রে নতুন কিছু দিচ্ছি বলে। অন্য প্রকাশনাগুলোতেও লেখা পাঠিয়ে তখন আমার আমদানিটা বেশ বাড়িয়ে তুলেছি।

এ-ব্যবসার কৌশলটা আমি শিখে নিয়েছি। যে-কোনো মজার উদ্ভাবনা মাথায় এলেই দু'ছত্র তামাশা বানিয়ে এক ডলার উপার্জন করি। ওটাকেই আবার গোঁপদাড়ি লাগিয়ে স্রেফ চারছত্র বানিয়ে হাজির করলে ওর উৎপাদন মূল্য বেড়ে যায়। একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, একটু ছন্দোবদ্ধ করলে তো লঘু ছন্দের 'সামাজিক কবিতা', সুন্দর পদাবরণ আর অলঙ্করণ করে ছাপালে তাকে আর চেনাই যাবে না।

পয়সা জমাতে শুরু করি, নতুন কার্পেট, একটা বৈঠকখানার অর্গানও কিনে ফেলি। আমার পড়শিরা এখন আমাকে একজন কেউকেটা নাগরিক বলে মনে করেন—আগের সেই ফুর্তিবাজ ফষ্টিনষ্টি-করা ছোকরাটি নয়, যে হার্ডওয়্যারের গোলায় কেরানিগিরি করত।

পাঁচ কি ছ'মাস পর, আমার কৌতুকরস থেকে কেন স্বতস্ফূর্ততা জিনিসটা বিদায় নিল। ঠোঁট থেকে আর অনায়াসেই খসে পড়ে না চটকদার মজার কথাগুলো। বিষয়বস্তুর অভাবে একেকসময় বেশ মুশকিলে পড়ি। টের পাই এবার অন্য বন্ধুদের

কথাবার্তার ভেতর থেকেই কিছু উপযুক্ত আইডিয়া কান পেতে শুনে নিতে শুরু করেছি। একেকসময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেয়ালের নক্শা কাগজের দিকে চেয়ে পেন্সিল চিবুতে চিবুতে চেষ্টা করেছি নতুন কোনো স্বতোৎসারিত কৌতুকের এক-আধটা মজাদার বুদ্‌বুদ্‌ রচনা করতে।

আর তারপর আমার পরিচিত বন্ধুদের কাছে হয়ে দাঁড়াই একটা উৎপাত বিশেষ, একটা পিশাচ, অপয়া অনামুখো ছারপোকা। মজা-মাটি-করা মূর্তিমান বেরসিকের মতো ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি—উৎসুক, খেপাটে লোভীর মতো। যেন ওদের মুখ থেকে কোনো দুর্দান্ত কথা, চমকদার বুদ্ধির উপমা বা কটুঝাল বক্তব্য খসে পড়ামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ব—হাড়ের টুকরোর ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া কুকুরের মতো। নিজের স্মৃতির ওপর আস্থা রাখার সাহস আমার আর নেই, তাই একটু আড়ালে সরে অপরাধীর মতো, ইতরের মতো আমার সদা-হাজির নোটবইয়ে লিখে রাখি—নতুবা আমার জামার আস্তিনে—ভবিষ্যতে সেটা ব্যবহার করার মতলবে।

আমার বন্ধুরা আমায় করুণার চোখে অবাক হয়ে দেখে। আগের সে মানুষ আর আমি নেই। আগে যেখানে ওদের আনন্দ আর ফুর্তি জোগাতাম, এখন বসে থাকি ওদের ওপর ছোঁ মারার জন্য। এখন আমার কোনো হাসির কথা ওদের মুখে হাসি জোগাবার মতো নয়। সেগুলোর দাম এখন বড় বেশি। আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় তো আর বিনা পারিশ্রমিকে বিলিয়ে দিতে পারি না!

আমি হলাম নিরানন্দ শেয়ালের মতো, যে বন্ধু-কাকদের গুণগান করে, যাতে তারা চঞ্চু থেকে কিছু লোভনীয় বুদ্ধির গ্রাস মাটিতে ফেলে দেয়।

প্রায় প্রত্যেকেই আমায় এড়াতে শুরু করে। আমি এখন হাসতেই ভুলে গেছি, এমনকি উক্তিগুলো আত্মসাৎ করার জন্য যতটুকু হাসি খরচা করতে হয় সেটুকুও দিই না।

উৎস-বস্তুর খোঁজে লুটতরাজি করতে কোনো স্থান-কাল-পাত্র বা বিষয়ই বাদ দিই না। এমন কি গির্জাঘরেও আমার নীতিভ্রষ্ট কল্পনা হানা দেয় সুগম্ভীর আসনসারি আর থামগুলোর মধ্যে। পুরোহিত ওই যে লম্বা স্তবগাথা শোনাচ্ছেন, ওর মধ্যেও আওড়াতে থাকি নতুন নতুন শব্দ, যদি আমার মনের চালুনির ফাঁক দিয়ে ধরে ফেলতে পারি কোনো জুৎসই অনুপ্রাস বা মারপ্যাঁচের কথা। গায়কদের সুগম্ভীর গীতেও কল্পনা করি পুরনো ভজনের সঙ্গে নতুন কোনো ভাঁড়ামির লুকোচুরি।

আমার শিকারের আরেকটা জায়গা হল নিজস্ব বাড়ি। আমার স্ত্রী অনন্যা ধরনের মেয়েমানুষ, প্রাণখোলা, সহানুভূতিশীলা, আবেগময়ী। একসময়ে তার কথাবার্তায় আমার আনন্দ হত, অনবদ্য উপভোগের উৎস ছিল তার নানা মতামত। এবার তাকেই নিয়ে পড়লাম। যে সব মজার-মজার কিন্তু প্রীতিকর অসঙ্গতি মেয়েলি মনের বিশেষত্ব, তার স্বর্ণখনিই বলা যায় তাকে।

তার যত বোকাবুদ্ধি আর তামাশা মুক্তোর মতো বাজারে বেচি আমি, সেগুলো শুধু পবিত্র, গৃহাভ্যন্তরেই থাকার যোগ্য। শয়তানি ধূর্তবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে কথা বলতে উৎসাহিত করি। কোনো সন্দেহ না করে ও নিজের হৃদয় মেলে ধরে। আর আমি শীতল, সাদামাটা কাগজে ছাপিয়ে সেগুলো পরিবেশন করি পাঠকদের সামনে।

'সাহিত্যিক' জুডাস্-এর মতো গুরুকে চুম্বনও করি, তাঁর সঙ্গে বেইমানিও করি। রৌপ্যমুদ্রার লোভে তার মিষ্টি গোপন কথাগুলোকে ভাঁড়ামির চুনোট পাজামা পরিয়ে নাচাই বাজারের চত্বরে।

আদরের লুইসা! কত রাতে ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে—কোমল মেষশাবকের ওপর নিষ্ঠুর নেকড়ের মতো—শুনতে চেষ্টা করেছি ঘুমের ঘোরে ওর মৃদু উচ্চারিত কথা, হয়তো ওরই মধ্যে কোনো 'ভাবনা' পেয়ে যাব যা পরের দিন আমার জাঁতাকলে পেষা হবে। এর চেয়েও খারাপ কিছু আসবার ছিল এবার।

ঈশ্বর রক্ষা করুন! এর পরেই আমার হিংস্র নখর পড়ল আমার বাচ্চা শিশুদুটির অবান্তর উড়ো কথাবার্তাগুলোর ওপর।

গাই আর ভায়োলা ছিল ছেলেমানুষি, খেয়ালি চিন্তা আর বক্‌বকানির দুটি উচ্ছল ফোয়ারা। আমি দেখলাম এদের ধরনের কৌতুকের তৈরি বাজার, তাই এক পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগ খুলে দিলাম "শিশুজগতের মজার ভাবনা" দিয়ে। ইণ্ডিয়ান শিকারী যেমন হরিণের পেছু নেয় সেইরকম ওদের পেছু নিতে শুরু করলাম। কখনো সোফা বা দরজার পেছনে লুকিয়ে, উঠোনের ঝোপঝাড়ের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে আড়ি পেতে শুনতে লাগলাম খেলার সময় ওদের কথা। লোভী শকুনের সব গুণ আমার ছিল, কেবল অনুশোচনাটাই ছিল না।

একবার যখন মাথা থেকে কিছুই বেরুচ্ছে না, এদিকে পরের ডাকেই আমার লেখা পাঠাতে হবে, আমি মরীয়া হয়ে উঠোনের শুকনো ঝরা পাতাগুলোর মধ্যে ঢুকে ওৎ পেতে রইলাম, জানতাম ওরা এদিকেই খেলতে আসবে। আমি বিশ্বাসই করতে পারি না গাই আমার লুকোবার জায়গাটা বুঝে গেছে (কিন্তু যদি জেনেও থাকে তবু তাকে আমি দোষ দিতে পারি না) যখন সে পাতাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। ফলে আমার নতুন পোশাকটা তো পুড়ে গেলই, হয়তো তার বাপও পুড়ে মরত।

শিগগিরই আমার নিজের ছেলেমেয়েরা আমায় মড়কের মতো এড়িয়ে চলতে শুরু করে। প্রায়ই গোমড়া ভূতের মতো আমি যখন ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই শুনতে পাই ওরা বলাবলি করছে: 'এই রে, বাবা এসে পড়েছেন!' তারপর তারা খেলনাপত্র গুটিয়ে হড়বড় করে পালায় অন্য কোনো নিরাপদ লুকোবার জায়গায়। তখন এক হতচ্ছাড়া অবস্থা আমার!

কিন্তু তবু, উপার্জনের দিক থেকে মন্দ চলছিল না আমার। প্রথম বছরটা কেটে যাবার আগেই এক হাজার ডলার বাঁচিয়ে ফেলেছি, বাস করেছি সচ্ছলতার মধ্যেই।

কিন্তু তার জন্য কী দাম দিতে হয়েছে আমায়। 'অস্পৃশ্য' ঠিক কাকে বলে ভাল করে জানা নেই আমার, কিন্তু শুনতে যেমন শোনায়, সবদিক থেকে আমি এখন তাই। আমার বন্ধু নেই, আমোদপ্রমোদ নেই, জীবনে কোনো আনন্দই নেই। পারিবারিক সুখ তো জলাঞ্জলি গেছে। আমি এক মৌমাছি—জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলো থেকে ইতর লোভীর মতো মধু খেয়েছি, আমার বিষ হুলের জন্য আমি এখন ভীতিজনক, বর্জিত।

একদিন একটি লোক কিন্তু হাসিখুশি বন্ধুত্বের হাসি মুখে নিয়ে কথা বলল আমার সঙ্গে। আমি পিটার হেফেলবাওয়ারের অন্ত্যেষ্টি-সামগ্রীর দোকানটার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম সে-সময়। পিটার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমায় অভিবাদন জানাল। আমি থমকে দাঁড়াই, ওর সম্ভাষণে বুকটার ভেতর অদ্ভুত মোচড় দিয়ে ওঠে। আমায় ভেতরে ডাকল সে।

ঠাণ্ডা, বাদলা দিনটা। একেবারে পেছনের কামরায় ঢুকলাম দুজনে, সেখানে ছোট চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। একজন খদ্দের এল, পিটার আমায় একা রেখে বাইরে গেল খানিকক্ষণ। একটুবাদেই টের পেলাম একটা নতুন অনুভূতি আমার ওপর ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে। একটা সুন্দর প্রশান্তি আর তৃপ্তির চেতনা। চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখি জায়গাটা। সার-সার রোজউড কাঠের চকচকে কফিন, কালো পর্দা, অস্থায়ী কাঠের পায়া, শবযানের পালক সজ্জা, শোকচিহ্নের কাপড়, ফালি ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম এই বিমর্ষ-গম্ভীর ব্যবসার জন্য। এখানে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, নীরবতাও—সুগম্ভীর সমাধি আর উচ্চচিন্তার আশ্রয়ভূমি যেন। জীবনের একেবারে কিনারায় এসে এখানে চির বিশ্রামের চেতনায় আবিষ্ট এক ক্ষুদ্র তপস্যা স্থল।

এখানে ঢুকবার সময় দরজার কাছেই যেন আমায় ত্যাগ করে গিয়েছিল সংসারের যাবতীয় মূঢ়তা। কোনো ঝোঁকই অনুভব করিনি ওইসব গম্ভীর আর মহিমামণ্ডিত বস্তু থেকে কৌতুকময় চিন্তা নিংড়ে বার করতে। আমার মন যেন হাত-পা মেলে কৃতজ্ঞ বিশ্রামে ঢলে পড়েছে কোনো মৃদু ভাবনা-আবৃত শয্যায়।

পনের মিনিট আগেও ছিলাম এক পরিত্যক্ত হ্যসরসিক। এখন আমি ধীরস্থির সহজ এক দার্শনিক। রঙ্গরসের কবল থেকে, চমক-দেওয়া বাক্-ছলের তাড়া খাওয়া আর হাঁফ-ধরানো ভাঁড়ামোর ইতর পোঁ-ধরা থেকে, চটজলদি জবাবের পেছনে অক্লান্ত দৌড়নোর হাত থেকে মুক্তির আশ্রয় পেয়ে গিয়েছি।

হেফেলবাওয়ারকে তেমন ভাল চিনতাম না। ও যখন ফিরে এল আমি ভাবলাম ওই কথা বলুক, ভয় ছিল ওর এই চমৎকার কবিতার মতো ঐকতানের আশ্রমে সে আবার যেন কোনো বেখাপ্পা সুরে না গেয়ে বসে।

কিন্তু না। অকৃত্রিম সুরেই বেজে উঠল সে। আমি একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম। পিটারের মতো অমন চমৎকার ভোঁতা ম্যাড়মেড়ে কথাবার্তা যে কোনো মানুষের

হয়, আগে তা জানতাম না। এর তুলনায় "মরু-সাগর" তো ফোয়ারা! কখনো কোনো বুদ্ধির চমক বা ফুলকি ওর কথাগুলোকে বিগড়ে দেয়নি। মামুলি নিরস কথা কালোজামের মতো বক্‌বক্‌ করে বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে,—গত হপ্তার পুরনো 'টেলিগ্রাফ ফিতের' চেয়ে বেশি আলোড়ন জাগায় না তা! কম্পিত বুকে আমি আমার একটা সেরা চোখা তামাশা চালাই ওর ওপর। ভোঁতা অথর্ব হয়ে ফিরে আসে সেটা, নিষ্ফল। সেই মুহূর্তে থেকে লোকটাকে ভালবেসে ফেলি।

প্রতি হপ্তায় দু-তিনটে সন্ধ্যা আমি লুকিয়ে চুরিয়ে হেফেলবাওয়ারের আস্তানায় যাই, ওর পেছনের ঘরটায় বসে আনন্দ লাভ করি। ওটাই আমার একমাত্র ফুর্তি। আজকাল ভোর থাকতেই উঠি, তাড়াহুড়ো করে কাজ সারি, যাতে আমার আশ্রয়স্থলে আরো বেশি সময় কাটাতে পারি। আর কোনো জায়গাই নেই যেখানকার বাতাবরণ থেকে আমি কিছু না-কিছু কৌতুকের খোরাক পেয়ে না যাই। কিন্তু পিটারের কথাবার্তায় এমন কোনো ফাঁক খুঁজেই পাই না, হাজার চেষ্টায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলেও নয়।

এর প্রভাবে আমার মানসিক অবস্থারও উন্নতি হল। প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন হয় তার মেহনত থেকে অবসরবিনোদনের। আমার আগের বন্ধুদের দু'একজনকে অবাক করে দিই পথে যেতে-যেতে তাদের একটু স্মিত হাসি বা সামান্য খুশির কথা বিলিয়ে। অনেক সময় আমার পরিবারকেও হতভম্ব করে দিয়েছি দীর্ঘ সময় তাদের মধ্যে অবসর যাপন করে অবশেষে একটু হাসির কথা বলে।

রসিকতার দুঃস্বপ্ন এতকাল এমন করে আমার ঘাড়ে চেপেছিল যে মুক্ত স্কুল-বালকের উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমার ছুটির ঘণ্টাগুলোর ওপর।

আমার কাজের ক্ষতি হতে শুরু করে। আগে সেটা যা ছিল এখন আর তা তেমন বেদনাদায়ক বোঝার মতো নয় আমার পক্ষে। প্রায়ই ডেস্কে বসে শিস দিয়ে উঠি, আর লিখি আগের চেয়েও সাবলীলভাবে। অধৈর্য হয়ে কাজ শেষ করতে চাই—আমার হিতকর নিভৃতাবাসে ছুটে যাবার আগ্রহে, মাতাল যেমন তার শুঁড়িখানায় যেতে চায়।

আমার স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে আমি কোথায় গিয়ে বিকেলগুলো কাটাই। আমি ভেবেছিলাম তাঁকে এসব না বলাই সবচেয়ে ভাল, মেয়েছেলেরা এসব জিনিস বোঝে না। হায় বেচারি! একদিন এথেকে সে একটা বিশ্রি আঘাতই পেয়ে গেল।

একদিন বাড়িতে বয়ে এনেছিলাম একটা রুপোর কফিন-হাতল, কাগজ-চাপা হিসেবে, আর-একটা শবাধারের ফেঁসো পালক আমার কাগজপত্রগুলো ঝাড়পোঁছ করতে।

চেয়েছিলাম ওগুলো থাকবে আমার লেখার টেবিলে, আর আমি বসে ভাবব হেফেলবাওয়ারের ওই পেছনের ঘরটার কথা। কিন্তু লুইসা ওগুলো দেখে ফেলেছে,

আর চেঁচিয়ে উঠেছে আতঙ্কে। ওগুলো আনার জন্য কিছু উড়োযুক্তি দেখিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, কিন্তু ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারি সংস্কার এখনো ওর মন থেকে কাটেনি। অবশ্য জিনিসদুটো তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলতেই হল।

একদিন পিটার হেফেলবাওয়ার আমার সামনে এমন একটা প্রলোভন তুলে ধরল, যে আমি প্রায় বিহ্বল হবার জোগাড়। নিজস্ব বুদ্ধিমতে, আবেগশূন্য পদ্ধতিতে সে তার হিসেবপত্রের খাতাগুলো আমায় দেখাল, ব্যাখ্যা করে বোঝাল যে তার ব্যবসা আর লাভ দুটোই দ্রুত বেড়ে চলেছে। সে ভেবেছিল একজন অংশীদার নেবে যার নগদ টাকা আছে। সে অন্য জানাশোনা কারুর চেয়ে বরং আমাকে নেওয়াই পছন্দ করে। সেদিন বিকেলে যখন তার আস্তানা ছেড়ে আসি, পিটার পেয়ে গেল আমার হাজার ডলারের চেক, যে-টাকা আমি ব্যাঙ্কে জমিয়েছিলাম——এইভাবে হয়ে গেলাম তার অন্ত্যেষ্টি-ব্যবসার একজন অংশীদার।

মাথায় প্রবল আনন্দের উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, অবশ্য কিছু পরিমাণ সংশয়ও তাতে মেশানো। স্ত্রীকে ব্যাপারটা জানাতে হবে ভেবে আমি শঙ্কিত। কিন্তু খোশ মেজাজ নিয়েই ঘরে ঢুকলাম। ব্যঙ্গরসিকতার বিষয় ছেড়ে দেব, আবার জীবনের আপেল ফলগুলো উপভোগ করব——সেগুলোকে নিংড়ে মণ্ড করে কয়েক ফোঁটা কড়া মদ পাবলিককে গিলিয়ে খুশি করার বদলে——সেটাই যে কতবড় আশীর্বাদের বর হবে!

খাবার টেবিলে বসে লুইসা আমাকে কিছু চিঠিপত্র দিল যা আমার অনুপস্থিতিতে এসেছে। তার মধ্যে বেশ কিছু অ-মনোনীত পাণ্ডুলিপিও আছে। যখন থেকে হেফেলবাওয়ারের ওখানে যেতে শুরু করেছি, ওই রকম অনেক লেখাই আমার ফেরত আসছে, ভীতিজনক মাত্রায়। ইদানিং আমার কৌতুকরচনা আর রঙ্গরস যথেষ্ট সাবলীলভাবেই লিখে পাঠাচ্ছিলাম। এর আগে কাজ করতাম ইট-মিস্তিরির মতো, ধীরে আর কষ্টকর ভাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই খুললাম একখানা চিঠি। যে-সাপ্তাহিক কাগজে নিয়মিত চুক্তিতে লিখতাম তারই সম্পাদকের। ওই সাপ্তাহিক কিস্তির লেখাটাই কিন্তু এখনো আমাদের আসল বল-ভরসা। চিঠিটা এইরকম:

"প্রিয় মহাশয়, আপনি অবগত আছেন আমাদের বছরের চুক্তির মেয়াদ বর্তমান-মাসেই শেষ হচ্ছে। কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করেই জানাচ্ছি যে আগামী বছরে চুক্তির মেয়াদ বাড়াবার আগ্রহ আমাদের নেই। আপনার কৌতুকরচনার রীতি আমাদের যথেষ্টই তৃপ্ত করেছে, আমাদের পাঠকদের একটা ব্যাপক অংশকে তা আনন্দ দিয়েছে। তবে গত দু'মাস যাবৎ আমরা এর গুণগত মানে বেশ কিছুটা অবনতি লক্ষ্য করেছি।

"আপনার আগের লেখাগুলোতে দেখা গেছে স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, স্বাভাবিক

কৌতুক ও হাস্যরসের প্রতিফলন। কিছুকাল হল তা কষ্টকল্পিত, জোর করে লেখা, যেন তাতে প্রত্যয়ের অভাব, বলে মনে হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে কঠোর শ্রম ও বেগার খাটুনির যাতনাদায়ক চিহ্ন।

"আবার সদুঃখে জানাই ভবিষ্যতে আপনার কোনো রচনা আমরা গ্রহণ যোগ্য মনে করব না। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত

—সম্পাদক।"

চিঠিটা আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। পড়ার পর তার মুখখানা হয়ে গেল অতিরিক্ত লম্বা, চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

গোঁসাভরে বলে উঠল, 'ইতর বুড়োটা! আমি জানি তোমার লেখা ঠিক আগের মতোই ভাল। বরং এখন তোমার আদ্ধেক সময় লাগে ওগুলো লিখে ফেলতে।" তারপরেই, মনে হল এবার লুইসার বোধহয় খেয়াল হবে চেকগুলো আর আসছে না। সে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে—'ও জন! এখন কী করবে গো তুমি?'

জবাবে আমি উঠে পড়ি, খাবার টেবিল ঘিরে একটা পল্‌কা-নাচ নাচি। আমি নিশ্চিত লুইসা ভেবেছে বিপদে পড়ে আমি পাগল হয়ে গেছি; আর বাচ্চাদুটো বোধহয় সেটাই আশা করছে, তাই তারা হৈচৈ খুশিতে চেঁচামেচি করে আমার পেছু নেয় আর আমার তালে-তালে ঘোরে। আমি এখন আগের দিনগুলোর মতো ওদের 'বুড়ো' খেলার-সাথী।

চেঁচিয়ে উঠি—'আজ রাতে থিয়েটার! ওর কম কিছু চলবে না। আর দেরি করে পাগলের মতো জঘন্য নৈশভোজন আমাদের সকলের—প্যালেস্ রেস্তোরাঁয়! লাম্‌টি-ডিড্‌ল্-ডি-ডী-ডি-ডাম্।'

আমার এই উল্লাসের কারণটা এবার ব্যাখ্যা করে জানালাম, আমি এক বর্ধিষ্ণু অন্ত্যেষ্টিসরঞ্জাম ব্যবসায়ের শরিক হয়েছি, ওইসব লিখিত তামাশা এখন ছাই মেখে মেটা কম্বলের তলায় মাথা গুঁজুক, আমার কিছু এসে যায় না।

যে-কাজ আমি করেছি তার সাফাই হিসেবে সম্পাদকীয় চিঠিটা হাতে নিয়ে আমার স্ত্রী আর কোনো আপত্তিই জানাতে পারল না। শুধু সামান্য দু'একটা মৃদু তিরস্কার—যখন মেয়েরা এসব ভাল জিনিস বুঝে উঠতে পারে না। যেমন সেই পিটার হেফ্—না এখন "হেফেলবাওয়ার এণ্ড কোম্পানির" পেছনের ঘরখানা। ও বুঝবে না।

উপসংহারে, একথাই বলব যে আজ আমার মত সর্বজনপ্রিয়, আনন্দোচ্ছল, মজাদার কথার মানুষ আর কাউকেই পাবেন না এ শহরে। আমার কৌতুক নিয়ে আবার দামামা, আবার উদ্ধৃতি: এখনো স্ত্রীর অন্দরমহলের কথাবার্তায় আনন্দ পাই, যদিও কোনো বৈষয়িক লাভের চিন্তা ছাড়াই। আর গাই ও ভায়োলা নির্ভয়ে আমার পায়ের কাছে বসে খেলে, চালিয়ে যায় তাদের ছেলেমানুষি তামাশা—সেই ভয়ংকর অত্যাচারীটা আর নেই তাদের পায়ে পায়ে, নোটবুক হাতে ঘুরতে।

ব্যবসা আমাদের চমৎকার ফেঁপে ফুলে উঠছে। আমি হিসেবে রাখি, দোকান দেখি। আর পিটার দেখে বাইরের ব্যাপারগুলো। সে বলে আমার উদারতা আর প্রাণবন্ত ভাব যে-কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে বানিয়ে দিতে পারে মজাদার "আইরিশ" নিশি-জাগরণ।

Confessions of A Humorist. এইন্‌স্লি'জ, ১৯০৩

পদ্মমধু আর কাঁটা-গাছ

স্পেনীয় সমুদ্রের আরো নানা গল্প আছে। ঝোড়ো ক্যারিবীয় উপসাগর-বিধৌত ওই ভয়াল সৈকতভূমি যেন সমুদ্রের সামনে খাড়া করে দিয়েছে উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের দুর্দম প্রাচীর। দূর থেকে মাথার ওপর দেখা যায় দাম্ভিক কর্ডিলেবা পাহাড়। ও অঞ্চল এখনো রহস্য আর রমন্যাসের উপাদানে ঘেরা।

ও-পর্বতের একেকটা গিরিখাত থেকে প্রতিধ্বনি জাগে জলদস্যু আর বিপ্লবীদের। ওরা ঘনসবুজ জঙ্গলে বল্লম আর ছোরা দিয়ে যে খোরাক বানায়, তার ওপর একটানা চক্কোর দেয় কণ্ডর-শকুন। ঐতিহাসিক তিনশো মাইলের রোমাঞ্চকর উপকূল ধরে যে-সব পুরনো শহর, তারা বারবার হাত বদল হয়েছে—কখনো জলদস্যুদের মধ্যে, কখনো হঠাৎ-জেগে-ওঠা বিদ্রোহীদের গোষ্ঠীর মধ্যে। একশো বছর ধরেও ভাল করে জানে না তাদের আসল প্রভু কে। পিজারো, বাল্‌বোয়া, স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক, আর বলিভার তাঁদের যথাসাধ্য করেছিলেন তাদের খৃষ্টান-জগতের বন্দর বানাতে। স্যর জন মর্গান, লাফীৎ, আর অন্য বিখ্যাত সমুদ্র-পর্যটকরা ধ্বংস-দেবতার নামে বোমা আর গোলা ফেলেছিলেন সেখানে।

সেই খেলা এখনো চলছে। টিনছাপা-ওয়ালা, ফোটো বড়-করার দঙ্গল, কোডাক হাতে ভ্রমণকারীরা পেয়ে গেছে এ রাজ্যের সন্ধান। জার্মানি, ফ্রান্স আর সিরিয়ার ফেরিওয়ালারা কাউন্টারের ওপর দিয়ে খুচরো পয়সা বাগিয়ে নেয়। ভদ্রলোক ভাগ্যসন্ধানীরা শাসকের প্রতীক্ষালয়ে ভিড় করে রেললাইন গড়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে, কন্‌সেশন আদায়ের লোভে। এই ছোট ছোট অপেরারসিক ভোজনপ্রিয় জাতিগুলো সরকার আর ষড়যন্ত্র নিয়ে খেলা করে, যতক্ষণ-না একদিন কোনো বিশাল নিঃশব্দ কামান-জাহাজ এসে দাঁড়ায় উপকূলের কাছে, আর সাবধান করে দেয় ওরা যেন তাদের খেলনা না ভাঙে। এই শেষ কিছু দিনের মধ্যেই জনি অ্যাট্‌উড *স্পেনীয় সমুদ্রের প্রান্তে নিহতদের তালিকায় নিজের 'কিছু কাজের নমুনা'* যোগ করেছিল। জুতোর বাজার লক্ষ্যণীয়ভাবে চালু করে, আর বাজে ঘৃণ্য আগাছা

'কৃকেলবার'-কে জাতে তোলার অপূর্ব ক্ষমতা দেখিয়ে। ওটা ছিল অজ্ঞাত অখ্যাত বস্তু, হয়ে দাঁড়াল আন্তর্জাতিক ব্যবসার একটা মূল্যবান উপাদান।

ঝামেলাটা শুরু হয়েছিল একটা প্রেমের ঘটনা থেকে—মানে, ঝামেলা এতে শুরুই হয়, শেষ হতে চায় না। জনি যে ছোট দক্ষিণী মার্কিন শহরটায় বাস করত, সেখানে এক ভদ্রলোক এলেন হেম্স্লেটার নামে। সেখানে একটা সওদাগরি দোকান খুলবেন বলে। তাঁর পরিবারে একটিই মেয়ে যার নাম রোজিন—'হেম্স্লেটার' পদবিটার দুঃখ মিটিয়ে দিয়েছে প্রথম নামটা। এই যুবতী মেয়েটির সম্পদ তার দেহসৌন্দর্য, যা শহুরে ছোকরাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। যারা ভয়ানকভাবে আলোড়িত হয়, তাদেরই একজন হল জনি—বিচারপতি অ্যাটউডের ছেলে। ওঁরা থাকেন ডালেসবার্গের প্রান্তে একটা উপনিবেশ-আমলের অট্টালিকায়। একে ভাল আচরণ ও সৎ মানসিকতার যুবক, তায় রাজ্যের প্রাচীনতম পরিবারের বংশধর, তাই আশা করা অন্যায় হত না যে তার প্রীতির প্রতিদান দেবে ঈপ্সিতা রোজিন, এবং সাদরে গৃহীতও হবে মহিমামণ্ডিত অথচ প্রায়-শূন্য ঔপনিবেশিক বাড়িটিতে। কিন্তু, না। দিগন্তের কালো মেঘটি এসেছে প্রতিবেশী এলাকার এক তরতাজা চতুর তরুণের বেশে—সে উচ্চবংশের অ্যাটউডের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়াইতে নামতে সাহস দেখাচ্ছে।

এক রাতে, জনি প্রস্তাবটা তুলে ধরল রোজিনের সামনে—তরুণদের কাছে এ এক প্রশ্ন যার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুষঙ্গগুলো সবই ছিল—চাঁদের আলো, করবীর ফুল, ম্যাগ্নেলিয়া, অনুকারী পাখির গান। ওই উঠতি তরুণ খামার-মালিক পিঙ্কনি ডসনের ছায়া ওদের দুজনের মধ্যে এসে পড়েছিল কিনা তা জানা যায়নি, কিন্তু, জনি প্রত্যাখ্যাত হল। একজন অ্যাটউডের রক্ত কি আর প্রত্যাখ্যান সইতে পারে? জনি আভূমি নত হলেও প্রস্থান করল মাথা উঁচিয়ে, কিন্তু সে মর্মাহত আর বিক্ষত হল নিজের অন্তরে আর বংশমর্যাদায়। একজন হেম্স্লেটার কিনা প্রত্যাখ্যান করল কোনো অ্যাটাউডকে!

সে বছরে অন্যসব আকস্মিক ঘটনার একটি হল প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীর নির্বাচন। বিচারপতি অ্যাটউড ডেমোক্রেটিক দলের লড়াকু ঘোড়া। জনিও কলকাঠি নাড়তে লাগল। সে এবার চলে যাবে—দূরে! রোজিনা কখনো আর ওর মুখ দেখতে পাবে না। হয়তো আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই রোজিন পেছনপানে তাকিয়ে আপশোস করবে, ওর নির্মল বিশ্বস্ত ভালবাসার কথা ভেবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজনীতির চাকা ঘোরে, আর জন ডি-গ্র্যাফেনরিড আটউড মার্কিন কনসালের পদ গ্রহণ করে আসে ভাইবোরায়। চলে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে হেমস্লেটারদের বাড়ি ঢোকে বিদায় জানাতে। পিঙ্ক ডসন অবশ্যই সেখানে ছিল, গল্প করছিল নিজের ৮০ একর খামারজমি, তিন-মাইল মাঠ, ২০০-একর পশুচারণ ভূমি আর ৪০-একর টিলা জমি নিয়ে। জনি এমন শীতলভাবে রোজিনের সঙ্গে করমর্দ করলে

যেন এই এক-হপ্তার জন্য সে ভিকস্বার্গে ঘুরে আসতে যাচ্ছে।

পিঙ্ক ডসন বললে, 'ওখানে যদি টাকা খাটানোর মতো ভাল কিছু পেয়ে যাও জনি, তবে আমাকে শুধু একবারটি জানিও, কেমন? বোধহয় আমি হাজার দুয়েক মতো যে-কোনো সময় তুলে পাঠাতে পারব লাভজনক মনে হলে।'

'ঠিক আছে পিঙ্ক', জনি খুশিভাবেই বললে, 'যদি তেমন কিছুর সন্ধান পাই, নিশ্চয় জানাব তোমায়।'

অতএব জনি চলে গেল নিউ অর্লিয়ন্সে, সেখান থেকে একটা জাহাজ ধরে সোজা চলে গেল ভাইবোরায়, নিজের কাজের জায়গায়।

ভাইবোরা হল হাজার তিনেক বাসিন্দা নিয়ে শহর, একটা ছোট অর্ধচন্দ্র আকারের পোতাশ্রয়ের বাঁকে। পলিমাটির এক ফালি সরু জমির ওপর, পেছনে বিষণ্ন পাহাড় সারি আর সামনে সমুদ। অধিবাসীরা ক্যরিবীয়, স্পেনীয়-ইণ্ডিয়ান বর্ণসংকর আর নিগ্রো, তা ছাড়া প্রায় আধডজন অন্য জাতের গোলমেলে পাঁচমেশালি গাঁজলা। রাস্তা বলতে লাল-টালি বেঁটে বাড়িগুলোর ফাঁকে সরু ঘাস-গজানো জায়গা। ওই ঘাসের মধ্যে বাসিন্দাদের খালি পায়ের ঘষায় তৈরি কাটাকুটি পথ। কিছুটা উন্নত জাতের প্রতিভূ রয়েছে দু-তিনজন আমেরিকান, চার-কি-পাঁচজন জার্মান আর ফরাসী। শহরের জীবন ও আয়ের একমাত্র উৎস ফল, অল্প রবার, আর কিছু দামি কাঠের রপ্তানি থেকে।

জন ডি-গ্র্যাফেনরিড অ্যাটাউড, নতুন নিযুক্ত কনসাল, এসেই কাজে নেমে পড়েছে—কাজ বলতে প্রধানত হ্যামকে গা এলিয়ে থাকা, আর রোজিন হেম্‌সলেটারকে ভুলতে চেষ্টা করা। ধরেই নিন, এক বছর ধরে তার এই একমাত্র কাজ। এর পর শুরু হবে সেই কীর্তি কাহিনী যা জনিকে বীরনায়ক করে তুলবে বাণিজ্য, চাষবাস আর প্রেমের ক্ষেত্রে।

জনি হয়ে পড়েছে "পদ্ম-ভোজী" —শেকড়, নাল আর ফুলশুদ্ধ। উষ্ণ মণ্ডল তাকে পুরো গিলে ফেলল। যারা পদ্ম ভোজন করে তারা কিন্তু সরাসরি এটা খায় না, যেমন কোনো স্বাস্থ্যকর স্যালাড খাওয়া উচিত। তারা খায় কোনো 'শয়তানি' চাটনি সহযোগে, আর সেক্ষেত্রে শৌণ্ডিকরাই হয় পাচক পরিবেশক। তাই জনির খাদ্যতালিকায় সেটা হয়ে যায় ব্রাণ্ডি আর দিশি লাল রাম্‌। ভাইবোরয় ওর অন্তরঙ্গ ইয়ার এক আমেরিকান—বিল কিওঘ্‌। বিলির উৎসাহ মেহগিনি কাঠে। রাতে দু'জন কনসাল-বাড়ির ছোট বারান্দায় বসে, আর সোল্লাসে চিৎকার করে অভব্য গান গায়—যতক্ষণ-না স্থানীয় লোকরাও বাইরের ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় ঘাড় নেড়ে নিজেদের মধ্যে স্পেনীয় ভাষায় বলাবলি করে 'শয়তান আমেরিকানো'-দের কাজকম্ম নিয়ে।

একদিন জনির বেয়ারা-ছোকরা ডাকের চিঠিপত্র এনে টেবিলের ওপর ডাঁই

করে রাখে। হ্যামক থেকেই ঝুঁকে পড়ে জনি নিরুৎসাহে চার-পাঁচখানা চিঠি আঙুল দিয়ে ঘাঁটে। কিওঘ্ তার বাঁশের কুটির থেকে পাজামা পরেই চলে এসেছে, যদিও এখন প্রশস্ত দ্বিপ্রহর। সে ধূমপান করছে, আর অলসভাবে কাগজ-কাটা ছুরি দিয়ে টেবিলের-ওপর-আসা একটা কেন্নোর পা কাটছে। জনি এখন পদ্ম ভোজনের সেই পর্বে যখন সারা দুনিয়াই কারুর মুখে বিস্বাদ ঠেকে।

বিরক্তির সুরে সে বললে, 'ওই এক গতের সব চিঠি। বোকা লোকগুলো এদেশের খবর জানতে চিঠি লেখে। কফি আর ফলের চাষ নিয়ে সবকিছু জানতে চায়, আর চায় বিনা কাজে ভাগ্য গড়ে তোলার ফিকির। অর্ধেক লোকই আবার জবাবী চিঠির জন্য ডাকটিকিট পাঠায় না। ওরা বুঝি ভাবে চিঠি লেখা ছাড়া কনসালের আর কোনো কাজ নেই। বুড়ো খোকা, আমার হয়ে চিঠিগুলো পড়তো, দেখ ওরা কী চায়। বড় মাথা ঘুরছে, নড়তে পারছি না।'

কোনোরকম বদ-মেজাজ কিওঘের ধাতেই সয় না, তাই সে টেবিলের ধারে চেয়ার টেনে গোলাপি-রাঙা হাসিমুখে সব মেনে নিয়ে বসে পড়ে। একটা করে লেফাফা কাটতে শুরু করে। চারটে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার নাগরিকদের কাছ থেকে, যারা ভাইবোরার কনসালকে তথ্যের 'বিশ্বকোষ' বলে ধরে নিয়েছে। লম্বা-লম্বা প্রশ্ন করেছে তারা, নম্বর দিয়ে সাজিয়ে—নিজের গভর্নমেন্টের সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে কনসাল সেদেশ সম্বন্ধে যা কিছু জানেন—জল-হাওয়া, উৎপন্ন দ্রব্য, সম্ভাবনা, আইন, বাণিজ্যিক সুযোগ আর পরিসংখ্যান।

অ-নড় কর্মকর্তা বললে, 'বিলি, তুমিই ওদের একলাইন করে লিখে দাও না! বল ওদের সর্বশেষ সংস্করণ কনসাল-রিপোর্ট দেখে নিতে। বলে দাও স্বরাষ্ট্রদপ্তর খুশি হয়ে ওদের সাহিত্যের সেই রত্নগুলো উপহার দেবে। আমার নাম সই করে দাও! বিলি, তোমার কলমে খোঁচার আওয়াজ তুলো না; আমার চট্‌কা ভেঙে যাবে।'

কিওঘ স্মিতকণ্ঠে বললে, 'নাক ডাকিও না, তাহলেই তোমার সব কাজ করে দেব। তোমার বেশ কিছু সহায়ক দরকার যাই বল। তোমার রিপোর্ট তৈরি কর কী করে, তাও বুঝি না! একমিনিট জেগে থাক তো! —এই যে আরো একখানা চিঠি—তোমার নিজের শহর ডালেসবার্গ থেকেই।'

'তাই নাকি?' বিড়বিড়িয়ে বলল জনি, কেতামাফিক মৃদু উৎসাহ দেখিয়ে—'কী লিখেছে ওতে?'

কিওঘ বুঝিয়ে বললে, 'পোস্টমাস্টার লিখেছেন। বলছেন শহরের একজন তোমার কাছে কিছু তথ্য আর উপদেশ চায়। বলছেন, নাগরিকটির মাথায় মতলব এসেছে তুমি যেখানে আছ সেখানে এসে একটা জুতোর দোকান খুলবেন। জানতে চাইছে ও-ব্যবসাতে লাভ হবে কিনা, তোমার কী ধারণা। সে নাকি সারা উপকূলভাগ জুড়ে উন্নতির কথা শুনেছে। তাই কোনো নিচের তলার ঘরে জায়গা চায়।'

গরম হাওয়া আর খাট্টা মেজাজের মধ্যেও জনির হ্যামক দুলে ওঠে হো-হো হাসিতে। কিওঘও হাসে; আর বইয়ের তাক থেকে পোষা বাঁদরটা কিচ্‌মিচ করে তীক্ষ্ণ সমর্থন জানায় ডালেসবার্গের চিঠির এহেন সশ্লেষ অভ্যর্থনায়।

কনসাল সবিস্ময়ে বলে, 'হে হরি! জুতোর দোকান! এর পর আরো কী চাইবে তাই ভাবি! বোধহয় ওভারকোটের ফ্যাকটরি। বিলি, তুমিই বল—আমাদের তিন হাজার বাসিন্দার মধ্যে কতজন কোনো কালে পায়ে জুতো দিয়েছে বলে তোমার ধারণা?'

কিওঘ বিবেচকের মতো ভাবে।

'তা বলতে ধর—এই তুমি আর আমি, আর—'

'আমি নয়', তৎক্ষণাৎ ভুলক্রমে বলে জনি, একটা বাজে হরিণচামড়ার 'জাপাটো' পরা পা শূন্যে তুলে—'ছ মাসের মধ্যে আমি কোনো জুতোর খপ্পরে পড়িনি।'

'তোমার তো তাও আছে', বলতে থাকে কিওঘ, 'আর আছে ব্রিজার, হেনশেল, লুট্‌জ্, আর ব্ল্যানচার্ড, দু'জন শ্লেট-মিস্তিরি, আর সংক্রমণ প্রতিরোধের ডাক্তার, আর কলা কোম্পানির ওই ইতালিয়ান দালালটার, আব বুড়ো ডেলগাডোর—না, সেতো আবার স্যাণ্ডেল পরে। সেপাই কমাণ্ডার প্যারেডের দিনে বুট পরে, আর বিচারপতি বিচারের সময় কাপড়ের জুতো পরে। আর-হ্যাঁ সেদিন রাতে একজোড়া লাল চামড়ার চটি পায়ে দিয়েছিলেন মাদামা মার্সেডিস্‌-কুইনেটরো-টোমাবিল্লা-ওলিভেরাস-ঈ-গুয়েরা। এই মোটামুটি। থানার সেপাইরা? না, না—ওদের জুতো পরার অনুমতি কেবল মার্চ করার সময়। শহরে ওরা ঘাসের মধ্যে পায়ের ডগা ঘোরায়।'

কনসাল বললে, 'তা কথাটা ঠিকই। তিন হাজারের মধ্যে কুড়িজনের বেশি জানেই না হাঁটতে গেলে পায়ে চামড়ার দরকার হয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভাইবোরা হল উদ্যোগী জুতোর দোকানের পক্ষে সঠিক শহর—যারা জুতো ছেড়ে চলতে জানে না!—ভাবি, বুড়ো প্যাটার্সন কি আমার সঙ্গে তামাশা করতে চেষ্টা করছে? সে বরাবরই ওই সব জিনিস করত, যাকে সে ঠাট্টা বলে। তাকে একটা চিঠি দাও বিলি। আমি বলে দেব কী লিখতে হবে। ওকেও একটু পাল্‌টা তামাশা দেখানো যাবে।'

কিওঘ কালিতে কলম ডুবিয়ে নিল, চিঠি লিখতে লাগল জনির নির্দেশমতো বয়ানে। অনেক বার থেমে, সেইসঙ্গে ধূমপান, বোতল-গেলাসের ইতস্তত চালাচালি, ইত্যাদির পর অবশেষে নিচের জবাবটি তৈরি হল ডালেসবার্গের পত্রের:

মিঃ ওবাডিয়া প্যাটার্সন,

ডালেসবার্গ, মিসিঃ

প্রিয় মহাশয়—আপনার ২রা জুলাইয়ের পত্রের জবাবে সবিনয়ে জানাইতেছি যে আমার মতে মনুষ্য-জগতে ভাইবোরা শহর অপেক্ষা এমন আর কোনো

স্থান নাই যেখানে প্রথমশ্রেণীর পাদুকালয়ের প্রয়োজন এত বেশি অনুভূত হয়——চর্মচক্ষেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এখানে ৩০০০ অধিবাসী, অথচ একটিও জুতার দোকান নাই! অবস্থাই ইহার সাক্ষ্য দিবে। এই উপকূলভাগটি দ্রুতই উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যস্থল হইতেছে, কিন্তু একমাত্র পাদুকার ব্যবসায়ই করুণ-ভাবে অবহেলিত বা উপেক্ষিত। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের নাগরিকদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিই বর্তমানে পাদুকাহীন।

উপরে উল্লিখিত অভাবগুলি ছাড়াও এখানে অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন একটি সুরাচোলাই কারখানা, উচ্চ গণিতের কলেজ, কয়লার গোলা এবং নির্মল বুদ্ধিসম্পন্ন 'পাঞ্চ্-ও-জুডি" প্রদর্শনীর। আপনার বাধিত——

জন ডি গ্র্যাফেনরিড অ্যাটউড।
ভাইবোরাস্থিত যুঃ রাঃ কনসাল

পুনশ্চ:—— ওবাডিয়া আঙ্কেল! পুরনো শহরটা কেমন চলছে ক্যাঁচকোঁচ করে? তুমি আর আমি না থাকলে গভর্নমেন্ট কী করত বলতো? শিগ্রি একটা সবুজমাথা টিয়া আর এক কাঁদি কলার জন্য অপেক্ষা কোর, তোমার পুরনো দোস্তের কাছ থেকে——

জনি।

কনসাল ব্যাখ্যা করল, 'ওই লেজটুকু যোগ করে দিলাম যাতে আঙ্কেল ওবাডিয়া চিঠির সরকারী মেজাজ দেখে বিরক্ত না হন। এবার বিলি, চিঠিটাকে যথাব্যবস্থা করে পাঞ্চোকে দিয়ে জাহাজঘাটায় পাঠাও। 'এরিয়াড্‌নে" জাহাজে আজ ফলের রসদ বোঝাই হলে কালই ডাক নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।'

ভাইবোরায় রাতের কর্মসূচী কখনোই বদলায় না। বাসিন্দাদের আমোদপ্রমোদ যেমন নীরস তেমনি ঘুমপাড়ানি। লোকেরা খালি পায়ে, নিরুদ্দিষ্টভাবে চুপচাপ ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেকের হাতে জলন্ত চুরুট বা সিগারেট। আবছা-আলো রাস্তার দিকে তাকালে মনে হবে পাগল জোনাকির মিছিলের সঙ্গে মিলে বাদামি-কালো ভূতের জটপাকানো ধাঁধা। মন-মরা রাতের বিষণ্নতার সঙ্গে আবার সুর মেলায় একেক বাড়ি থেকে ঘুমন্ত গীটারের টুংটাং। চারণ গাইয়ে দলে ধুয়ো-ধারীর খঞ্জনি বাজাবার মতো বনবাদাড়ে কট্‌কট্ করে পেল্লায় গেছো ব্যাঙগুলো। ন'টা বাজতে না বাজতেই রাস্তা ফাঁকা, সবাই শুয়ে পড়ে।

কনসাল-ভবনেও যে অন্য রকম কিছু হয়, তা নয়। কিওঘ রাত করে আসে, কারণ ভাইবোরা নর্দমার ঝাঁঝরির কাছে, আর সমুদ্রের মুখোমুখি কনসালের বাড়িটাই একমাত্র সুশীতল জায়গা। ব্রাণ্ডি তো চলতেই থাকবে, দশটা নাগাদ স্বেচ্ছানির্বাসিত জনির হৃদয়ে শুরু হবে ভাবাবেগের আলোড়ন। তখন সে কিওঘকে বলবে তার সমাপ্ত রমন্যাস-কাহিনী। প্রতি রাতে কিওঘকে প্রস্তুত থাকতে হয় অনলস সমবেদনা নিয়ে।

'কিন্তু এক মিনিটের জন্যও ভেবো না'—জনি সর্বদাই তার দুঃখের গল্পের উপসংহারে বলে—'ওই মেয়েটার জন্য আমি আপসোসে মরছি, বিলি। ওকে আমি ভুলে গেছি। আমার মনে ওর প্রবেশই নেই বলতে গেলে। এখনই সে যদি ওই সামনের দরজাটা দিয়ে ঢোকে, তবু আমার নাড়ি কিছুমাত্র চঞ্চল হবে না। অনেক আগেই সবকিছু ফুরিয়ে গেছে।'

কিওঘ জবাবে বলে, 'সে কি আর জানি না! নিশ্চয় তুমি তাকে ভুলে গেছ। ওটাই তো ঠিক কাজ। তার পক্ষে উচিত হয়নি ডিঙ্ক পসন্ যে ঘুষিগুলো তোমার ওপর চালাচ্ছিল, তা শোনা।'

কণ্ঠস্বরে দুনিয়ার তাচ্ছিল্য মিশিয়ে জনি বলে—'পিঙ্ক ডসন! ইতর সাদা ওঁচা! তবে পাঁচশো একর জমিটা ছিল, সেটা ভাববার কথা। হয়তো কোনোদিন তার ওপর ঝাল ঝাড়তে পারব। আমি কেমন মস্তানি করতাম তা সবই সে রোজিনকে বলত, ওর কান ভরত। ঠিক আছে! কোনোদিন তো নোংরা কাজ করিনি, মিসিসিপির প্রত্যেকটা লোক জানে অ্যাটউড বংশকে। বলো বিলি তুমিও কি জানতে আমার মা ছিলেন ডি-গ্র্যাফেনরিড ঘরের মেয়ে?'

'তাই নাকি, সে তো জানতাম না?' কিওঘ বলে। এই নিয়ে প্রায় তিনশোবার শুনল কথাটা।

'ঘটনা। হ্যানকক্ জেলার ডি-গ্র্যাফেনরিডরা। যা হোক, ওই মেয়েটার কথা আমি আর কখনোই ভাবি না। তাই না বিলি?'

এই পর্যায়ে এসে জনি শান্ত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। কিওঘ অলসভাবে হেঁটে চলে যায় প্লাজার ধারে ক্যালাবাশ গাছের নিচে নিজের আস্তানায়।

দু'একদিনের মধ্যেই ভাইবোরার 'নির্বাসিতরা' ভুলে গেছে ডালেসবার্গের পোস্টমাস্টারের চিঠি আর তার জবাব পাঠাবার কথা। কিন্তু ২৬শে জুলাই সেই জবাবের ফল ধরল ঘটনাপল্লীর তরুশাখায়।

"আণ্ডাডর" নামে একটা ফলপাকড়ের জাহাজ নিয়মিতই ভাইবোরায় আসে। জাহাজটা পোতাশ্রয়ে ঢুকে নোঙর ফেলল। সংক্রামক-ব্যাধির ডাক্তার আর শুল্কবিভাগের লোকরা নৌকো চালিয়ে কর্তব্য কাজ করতে গেছে, সমুদ্রপাড়ে সার করে দাঁড়িয়েছে দর্শকরা।

এক ঘন্টা পর বিলি কিওঘ এল কনসাল-দপ্তরে, ঝকঝকে হাল্কা লিনেনের পোশাক পরনে, মুখে সুতৃপ্ত হাঙরের মতো দাঁত বের-করা হাসি।

জনি 'হ্যামকে' গড়াচ্ছিল। কিওঘ বলল, 'আন্দাজ করতে পার কিছু?'

অলস জবাব জনির—'এই গরমে কোনো আন্দাজ-টান্দাজ নেই।'

'আরে, তোমার জুতোর দোকানের লোক এসে পড়েছেন যে?'—মুখের মধ্যে তামাকের দলা ঘোরায় বিলি—'সঙ্গে এত মাল যে টেরা-ডেল-ফিউগো অবধি সারা মহাদেশে জোগান দেয়া যায়। এখন ঠেলাগাড়িতে করে ওঁর মাল যাচ্ছে

কাস্টম্‌সে। ছয় বজরা বোঝাই মাল পাড়ে তুলেছে, আবার দাঁড় বেয়ে গেছে বাকি মালের জন্য। ওঃ হো-হো, কী মজাই না হবে ভগবান, যখন উনি তামাশাটা ধরে ফেলবেন আর দেখা করবেন মিস্টার কনসালের সঙ্গে! শুধু ওই একটা মজার মুহূর্ত দেখবার জন্য ন'বছর এই জঙ্গল রাজ্যে থাকতেও আপত্তি নেই আমার।'

কিওঘ তার আনন্দ-উল্লাস সহজভাবে নিতেই ভালবাসে। সে মাদুরের ওপর একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ে। তার ফুর্তির চোটে দেয়াল অবধি কাঁপছে। জনি খানিকটা মোচড় খেয়ে বসে চোখ পিটপিট করে।

বলে, 'কেউ কি অতই বোকা যে আমার ওই চিঠিটাকে গুরুত্ব দিয়েছে, বলতে চাও?'

আনন্দে খাবি খেতে খেতে কিওঘ বলে, 'স্টক করা মাল চার-হাজার ডলারের! যেখানে যা নয়, সেখানে তাই বেচতে যাওয়া! উনি জাহাজভর্তি তালপাখা নিয়ে গেলেন না কেন উত্তরমেরুর দ্বীপে! তাই তো প্রায় ব্যাপারটা? অদ্ভুত বুড়োকে তো দেখলাম সমুদ্রের ধারে। যখন চশমা লাগিয়ে চোখ মিটমিট করে ঘিরে-দাঁড়ানো পাঁচশো কি-ওই রকম খালি-পা নাগরিককে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তুমি সেখানে থাকলে পারতে কিন্তু!'

'তুমি সত্যি কথা বলছ, বিলি?'—দুর্বলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে কনসাল।

'বলছি না তো কী? আহাম্মক-বানানো লোকটার কন্যাটিকে যদি দেখতে—যাকে উনি সঙ্গে এনেছেন! আহা, কী রূপ! যেন বল-নাচের আসরে কোনো মধ্যমণি। এখানকার সেনোরিটারা তার কাছে আলকাতরার পুতুল।'

'হ্যাঁ, বলে যাও, তাতে তোমার গাধার হাসিটা বন্ধ থাকবে। একটা বয়স্ক লোককে হায়নার মতো হাসতে দেখলে গা জ্বলে আমার।'

'নাম হল হেমস্‌লেটার। উনি একজন—ওকী! এবার কী হল তোমার?'

হ্যামক থেকে বেরিয়ে আসতে জনির মোকাসিনপরা পা' দুটো ঠক্‌ করে মেঝেতে ঠেকে।

কড়া গলায় সে বলে, 'ওঠ তো হাঁদারাম, নয়তো এই কালির দোয়াত দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেব। ওই তো রোজিন আর তার বাবা। উঃ বুড়ো প্যাটার্সনটা একটা হাবা, মুখ্যু! তুমি এখানে উঠে এস বিলি কিওঘ, আমায় সাহায্য কর। এবার কী করব আমরা বল তো? সারা দুনিয়া কি পাগল হয়ে গেল?'

কিওঘ উঠে নিজের পোশাক ঝাড়ে। ফিরিয়ে আনে ভদ্রতাসম্মত আচরণ। গম্ভীর হবার চেষ্টায় খানিকটা সফলও হয়। বলে, 'জনি, পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তুমি না বলা অবধি বুঝতে পারিনি যে মেয়েটি তোমারই সেই মেয়ে। প্রথম কাজ হল তাদের একটা আরামপ্রদ আস্তানা জোগাড় করে দিতে হবে। তুমি ওখানে গিয়ে নিজের কাজের ফলভোগ কর, আমি যাই হেনশেলদের বাড়ি,

দেখি মিসেস হেনশেল ওদের জায়গা দিতে পারেন কিনা। ওদের বাড়িটাই শহরের সেরা বাড়ি তো।'

কনসাল বলে, 'বেঁচে থাকো বিলি! জানতাম তুমি আমায় জলে ফেলবে না। একদিন তো দুনিয়া শেষ হচ্ছেই, দেখি আর দু'একদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি কিনা।'

কিওঘ ছাতা মেলে ধরে যাত্রা করল হেনশেলদের বাড়ি। জনি পরল কোট আর টুপি। ব্রাণ্ডি বোতলটা একবার তুলে নিয়েছিল, কিন্তু না খেয়েই আবার নামিয়ে রাখল, তারপর বীরের মতো রওনা হল সমুদ্রতীরের দিকে।

কাস্টমস্-বাড়ির দেয়ালের ছায়ায় দেখল মিঃ হেমস্লেটার আর রোজিনকে—একদল শহরবাসী হাঁ করে তাদের ঘিরে দেখছে। "আণ্ডাডোরের" ক্যাপ্টেন তখন হাঁসফাস-করা শুল্ক অফিসারদের তর্জমা করে বোঝাচ্ছে নবাগতরা কী ব্যবসা নিয়ে এসেছেন। রোজিনকে দেখাচ্ছে স্বাস্থ্যময়ী, খুবই প্রাণবন্ত। সকৌতুক আগ্রহ নিয়ে চারদিকের অদ্ভুত অচেনা দৃশ্য চেয়ে-চেয়ে দেখছে। পুরনো অনুরক্ত প্রণয়ীকে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে ওর সুগোল কপোল ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে। মিঃ হেম্সলেটার বড় সৌহার্দ্যের সঙ্গে জনির করমর্দন করেন। উনি এক বুড়োটে বাস্তববুদ্ধিহীন মানুষ— ছন্নছাড়া অসংখ্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর একজন, যিনি অনবরতই পরিবর্তন খোঁজেন।

বললেন, 'জন, ফের তোমার দেখা পেয়ে বড় খুশি হলাম—"জন"বলে ডাকাতে পারি তো? আমাদের পোস্টমাস্টারের খোঁজখবরের জবাবে তোমার সদয় পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমার তরফ থেকে লিখবার জন্য সে নিজেই আগ্রহী হয়েছিল। আমি একটা অন্যরকম ব্যবসা খুঁজছিলাম যাতে মুনাফাটা বেশ মনোগ্রাহী হয়। কাগজ পড়েছিলাম এই উপকূলের দিকটা নাকি নিয়োগকারীদের খুবই আকর্ষণ করছে। তোমার উপদেশের জন্য আমি যারপর-নাই কৃতজ্ঞ। আমার যা কিছু ছিল সব বেচে দিয়েছি, আর টাকাগুলো ঢেলেছি উত্তরাঞ্চলে যত সেরা জাতের জুতো কেনা যায় তা স্টক করতে। জন, তোমাদের এ-শহরটা তো ছবির মতো। আশা করি ব্যবসাটাও জমবে ভাল,—যেমন তোমার চিঠি থেকে ধারণা করতে পেরেছি।'

জনির যন্ত্রণা খানিকটা হ্রস্ব হল কিওঘের আগমনে। সে তাড়াহুড়ো করে এসেছে জানাতে যে মিসেস হেনশেল খুব খুশি হয়ে দুটো কামরা ছেড়ে দেবেন মিঃ অ্যাটউডের বন্ধুদের সেবায়। অতএব মিঃ হেমস্লেটার ও তাঁর মেয়েকে তক্ষুনি সেখানে নিয়ে যাওয়া হল, ওদের ভ্রমণের ধকল থেকে বিশ্রাম নিতে ছেড়ে দেয়া হল। আর জনি ওদিকে দেখতে গেল যাতে কাস্টমস্ বাড়িতে জুতোর প্যাকিংগুলো খুলে পরীক্ষা করার পর সেগুলো নিরাপদে রাখা হয়।

সে রাতে কনসালের হাওয়া-খেলানো বারান্দায় বসে মরীয়া হয়ে মাথা ঘামাল সে আর কিওঘ।

জনির চিন্তার গতি বুঝতে পেরে কিওঘ প্রস্তাব করল, 'ওদের দেশে ফেরত পাঠাও।'

কনসাল একটু নীরব থেকে বলল, 'সে আমি পাঠাতাম, তবে তোমাকে আমি মিছে কথা বলেছি বিলি।'

অমায়িকভাবে কিওঘ বললে, 'আরে ঠিক আছে, ছাড়ান দাও।'

জনি ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাকে একশোবার শুনিয়েছি মেয়েটিকে আমি ভুলে গিয়েছি, তাই না?'

'প্রায় তিনশো পঁচাত্তর বার', মেনে নিল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

কনসাল ফের বলল, 'প্রতি বারই আমি মিছে কথা বলেছি। এক মিনিটের জন্যও ওকে ভুলিনি। শুধু একবার "না" বলেছিল, এই কারণেই একগুঁয়ে গাধার মতো পালিয়ে গেলাম! আর এমনই অহংকারী নির্বোধ আমি যে একবার ফিরেও গেলাম না। হেনশেলদের ওখানে দু'এক মিনিট কথা বলেছিলাম রোজিনের সঙ্গে। একটা ব্যাপার বুঝলাম। তোমার মনে আছে সেই চাষা লোকটার কথা যে ওর পেছনে লেগেছিল?'

'ডিঙ্ক্ পসন?'

'পিঙ্ক্ ডসন। তা সে কোনো ধর্তব্যের লোকই ছিল না ওর কাছে। ও বলল, আমার সম্পর্কে যে-সব বাজে বাজে কথা ছোকরাটা বলত ওকে, তা আদৌ বিশ্বাসই করেনি ও। কিন্তু এখন যে আমি জালে পড়ে গেছি বিলি। আমার যেটুকু বা সুযোগ ছিল তা নষ্ট করে দিয়েছে ওই হতচ্ছাড়া ঠাট্টার চিঠিখানা। যখন সে জানবে তার বুড়ো বাপকে একটা তামাশার শিকার করা হয়েছে, যে অপরাধ কোনো ভদ্র ইস্কুলের ছেলেও করে না, তখন তো আমায় ঘেন্না করবে। জুতো! ভাইবোরায় উনি তো কুড়ি জোড়া জুতোও বেচতে পারবেন না।—কুড়ি বছর ধরে এখানে দোকান রাখলেও। এই ক্যারিব বা স্পেনীয় বাদামি ছেলেদের এক জোড়া জুতো পরিয়েই দেখ না সে কী করে? মাথায় ভর করে পা উলটে থাকবে আর চেঁচাবে যতক্ষণ-না পা থেকে জুতো ছুঁড়ে ফেলা যায়। ওদের কেউ কখনো জুতো পরেনি, ভবিষ্যতেও কখনো পরবে না। আমি যদি ওদের দেশে ফিরতে বলি, তা হলে পুরো ব্যাপারটাই ওদের খুলে বলতে হবে, আর তখন সে কী ভাববে আমাকে? এখন যেন মেয়েটাকে আরো বিশেষভাবে চাইছি বিলি, আর ঠিক এই সময়ে যখন তাকে নাগালের মধ্যে পেলাম তখনই চিরকালের মতো হারাতে বসেছি তাকে, কারণ পারা যখন ১০২ ডিগ্রিতে, আমি কিনা চেষ্টা করলাম ফাজলামি করতে।'

কিওঘ আশাবাদী, সে বলল, 'আহা, ফুর্তি বাজায় রাখ। ওদের দাও না দোকান খুলতে। আমিও চুপ করে বসে থাকিনি আজ বিকেলে। কোনো রকমে জুতোর একটা সাময়িক বাজার গরম করে তুলতে পারব না আমরা? দোকানের দরজা

খুললেই আমি কিনব ছয় জোড়া। আমি ঘুরে ঘুরে সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে দিয়েছি বিপদটা। লুট্‌জ্ কিনবে আধডজন, ক্ল্যানচার্ড চার জোড়া, অন্যরা তিন থেকে পাঁচ জোড়া অবধি। বুড়ো লেকুভ তো ডজন জো… কিনবেই, কারণ সে মিস্ হেমস্‌লেটারকে এক ঝলক দেখেছে, আর সে হল ফরাসী জাতের মানুষ।'

জনি বলল, 'চার হাজার ডলারের স্টকের জন্য এক ডজন খদ্দের! ওতে কাজ হবে না। একটা মস্ত সমস্যা আছে সমাধান করার। বিলি, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমাকে একটু একা ছাড়ো। এটা আমাকে নিজে-নিজেই করতে হবে। তিন-তারা বোতলটা সঙ্গে নিয়ে যাও—না স্যর, যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের জন্য এর একটি ফোঁটাও আর নয়। আমি আজ রাতে বসব এখানে, চিন্তার ছিপি খুলব এখন। কোথাও যদি একটু নরম মাটি পাই, জেঁকে বসব সেখানে। আর যদি না পাই তাহলে জাঁকালো উষ্ণ মণ্ডলের ভাগ্যে আছে আরেকটি হতভাগ্য।'

কিওঘ বুঝল ওর দ্বারা কোনো কাজ হবে না, তাই বেরিয়ে গেল। জনি এক মুঠো চুরুট ঢালল টেবিলে, তারপর গা এলিয়ে দিল আরামকেদারায়। যখন হঠাৎ দিনের আলোর ঝলকানি জাগে, তখনো সে বসে আছে সেখানে। তারপর একটা মৃদু সুরে শিস্ ভাঁজতে ভাঁজতে উঠে পড়ে, চলে যায় স্নান করতে।

ন'টার সময় সে হেঁটে যায় জীর্ণ ক্ষুদে টেলিগ্রাফ অফিসটাতে। আধঘন্টা লাইন খালি পাবার অপেক্ষায় বসে থাকে। অবশেষে প্রতীক্ষার ফলস্বরূপ তেত্রিশ ডলার খরচ করে নিম্নলিখিত বয়ানটি পাঠায় তারযোগে:

পিঙ্কনি ডসন সমীপে,

ডালেসবার্গ, মিসি:

> পরবর্তী ডাকে তোমার কাছে একশো ডলারের ড্রাফ্‌ট্ আসছে। এক্ষুনি পাঁচশো পাউণ্ড কড়া, শুকনো কক্‌লবার জাহাজযোগে পাঠাও। এখানে আর্টের প্রয়োজনে নতুন ব্যবহার। বাজার দর পাউণ্ড কুড়ি সেন্ট। আরো অর্ডারের সম্ভাবনা। শীঘ্র করো।

তিন-চারদিনের মধ্যেই মিঃ হেমস্‌লেটারের দোকানঘরের জন্য সমুদ্রসৈকতের সমান্তরাল প্রধান শড়কের ওপর একটা উপযুক্ত বাড়ি পাওয়া গেল। ভাড়া মোটামুটি, জুতোর পশরা বেশ চমৎকারভাবে তাকের ওপর সাদা ছিমদাম বাক্সে সাজানো হয়েছে।

জনির বন্ধুরা তাকে নিষ্ঠাভরেই সাহায্য করেছে। প্রথম দিন কিওঘ প্রতি-ঘন্টায় একবার করে দোকানে আসে আর এক জোড়া করে জুতো কেনে। নানা রকমের জুতো—চ্যাপটা-সোল, গেইটার, বোতামলাগানো কেড্‌স্, গামবুট, সোয়েড চটি, নিচু কাফ-চামড়ার জুতো, নাচের পাম্‌প্‌শু কেনা হয়ে যাবার পর সে জনিকে বের করে খোঁজ নিতে, আর-কোনোরকমের জুতো আছে কিনা। অন্য ইংরেজি-ভাষীরাও তাদের ভূমিকা পালন করেছে স্বমর্যাদায়, একাধিকবার প্রচুর পরিমাণে

কিনে। কিওঘ তাদের ধরাধরি করে পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করেছে। এই ভাবে ব্যবসা ভালই চলল সপ্তাহ-ভর। এ পর্যন্ত যা বিক্রিবাটা হয়েছে তাতে মিঃ হেমস্‌লেটার সন্তুষ্ট। কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন স্থানীয় অধিবাসীদের এমন পেছিয়ে-পড়া রীতিনীতি দেখে।

জনি ব্যাখ্যা করল, 'ওরা? ভয়ানকরকম লাজুক তো। শিগগিরই অভ্যাস হয়ে যাবে ওদেরও; মাড়ুরোদের সঙ্গে ভালই ব্যবসা চলবে আপনার।'

কনসাল 'তার' পাঠাবার দু'সপ্তাহ পর একটা ফলের জাহাজে ওর নামে এল একটা বিরাট রহস্যময় বাদামি বস্তা, কোনো অজ্ঞাত-পরিচয় মাল নিয়ে। শুল্ক বিভাগের লোকদের ওপর জনির প্রভাব যথেষ্ট, তার ফলে বাঁধা-ধরা শুল্ক পরীক্ষা ছাড়াই মাল ছাড়িয়ে নিল সে। বস্তাটা কনসাল বাড়িতে আনিয়ে পেছনের ঘরে চমৎকারভাবে গাদা করে রাখল। সে রাতে বস্তার একটা কোণা কেটে ভেতর থেকে বের করল একমুঠো ককল্‌বার। আগস্ট মাসের পাকা জিনিস, বাদামের খোলার মতো শক্ত, গায়ে দেদার খাড়া-খাড়া কাঁটা—ছুঁচের মতোই তীক্ষ্ণ আর শক্ত। জনি আরেকবার তার সেই ছোট্ট শিস্ দিয়ে উঠল। বিলি কিওঘকে খুঁজতে বেরুল এবার।

রাত একটু বাড়লে ভাইবোরা যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, সে আর বিলি নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, ওদের কোটগুলো বেলুনের মতো ফোলা। প্রধান সড়কটা আগাগোড়া এদিক উদিক ঘোরে, সাবধানে বালিতে গুঁজে দেয় আগাছাগুলো, তারপর প্রতিটি ফুটপাতে, নীরব বাড়িগুলোর মাঝে প্রতিগজ ঘাসের মধ্যে। যেখানেই কোনো পুরুষ, স্ত্রীলোক বা শিশুর পা পড়ে এমন কোনো জায়গাই বাদ দেয় না ওরা। এবার ওরা ধরল পাশের অলিগলি, কোনোটাই ছেড়ে দেয় না। কাঁটাওয়ালা আগাছার ডাঁই থেকে কেবলই ওগুলো তুলে নিয়ে যায়, বার-বার এসে। শয়তান যেমন নির্ভুল ভাবে বিষকাঁটা ছড়ায় বা সাধু পল যেমন ধৈর্য ধরে বীজ বোনেন, তেমনিভাবেই ওগুলো ওরা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তারপর অবশেষে, শেষ রাতে ওরা নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোয়—যেমন বড় বড় জেনারেলরা ঘুমোন তাঁদের সংশোধিত কৌশল অনুযায়ী পরিকল্পনা ছকে ফেলার পর।

ভোরের আকাশ রাঙিয়ে উঠতেই, মাংস আর ফলের আড়তদাররা তাদের মাল সাজাতে থাকে ছোট বাজার-বাড়িটায়। তারপর হেলেদুলে আসতে থাকে মহিলারা—প্রত্যেকটা মাটির বাড়ি, তালপাতার কুঁড়ে, খড়-ছাওয়া কুটির আর প্রায়ান্ধকার আঙিনা থেকে—কেউ কালো, কেউ বাদামি, কেউ লেবু-রঙা, বাদামি-ধূসর, কেউ হলদে বা তামাটে। ওরা বাজার-করার মহিলা—পরিবারের খোরাকি কাসাভা, কলা, মাংস, মুরগি আর কচ্ছপ সওদা করবে। ওদের কাঁধ-কাটা, হাতাশূন্য জামা, পায়ে জুতো নেই, একখানাই ঘাগরা, হাঁটুর নিচে অবধি। অবিচল

ভাবে, বড়বড় চোখ নিয়ে ওরা দরজা থেকে বেরিয়ে আসে সরু পথগুলোতে, কিংবা রাস্তার নরম ঘাসের ওপর।

একেবারে প্রথম যে বেরিয়ে এল সে কোনো অনিশ্চিত ধ্বনি করে চেঁচাতে থাকে, আর এক-পা তুলে নেয় সঙ্গেসঙ্গেই। আরেকটা পা নামে, আর সে বসে পড়ে আতঙ্কের চিল-চিৎকার করে। কোনো নতুন যন্ত্রণাদায়ক পোকা পায়ের তলায় কামড় দিয়েছে ভেবে পায়ের তলা খোঁজে। সরু গলির এপার ওপার থেকে পরস্পরকে সচীৎকারে জানায়—'কোন্ শিংতোলা শয়তান!' কেউ চেষ্টা করে পথ ছেড়ে ঘাসে নামতে, কিন্তু সেখানেও তারা কামড় খায়, অদ্ভুত কাঁটাওয়ালা কিছুর দলা হুল ফোটায় তাদের। ওরা বসে পড়ে ঘাসের ওপরেই। আর চীৎকার কান্না জুড়ে দেয় বালিঢাকা পথের ওদিককার বোনদের সঙ্গে সমস্বরে। সাবা শহরেই শোনা যায় মেয়েলি বক্‌বকানির নালিশ। বাজারের দোকানদাররা ভাবে আজ কোনো খদ্দের আসছে না কেন!

তারপর আসে পুরুষরা, যারা পৃথিবীর প্রভু। তারাও এবার লাফাতে শুরু করে, নাচে, খোঁড়াতে থাকে, শাপ-শাপান্ত করে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মতো, কিংবা ঝুঁকে পড়ে আক্রান্ত পা আর গোড়ালি থেকে আপদটাকে খুঁটে তুলতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ সোচ্চারেই ঘোষণা করে এ কোনো অজানা জাতের বিষাক্ত কীট।

তারপর বাচ্চারা বেরিয়ে আসে তাদের সকালবেলার খেলায়। এবার হৈচৈয়ের মধ্যে যোগ হয় খোঁড়াতে-থাকা বাচ্চাদের হাউ-হাউ কান্না। কাঁটা আগাছায় আক্রান্ত শিশুরা। দিন বাড়ার সঙ্গে প্রতি মিনিটে নতুন নতুন বিপন্ন মানুষ।

প্রতিদিনকার নিয়মে আজও রাস্তার ওধারের 'পানাদেরিয়া' থেকে তাজা রুটি সংগ্রহ করতে সম্মানিত গৃহদ্বার থেকে বেরিয়েছেন ডোনা মেরিয়া কাস্টিলাস্ ঈ-বুয়েনভেঞ্চুরা ডিলাস কাসাস্। শ্রীমতীর পরনে ফুলফুলে হলদে সাটিনের ঘাগরা, মোটা লিনেনের শেমিজ, মাথায় স্পেনীয় তাঁতের তৈরি বেগুনি ম্যান্টিলা। কিন্তু হায়, তাঁর লেবু-রঙা পা দুটো যে খালি। তাঁর চালচলনে রাজসিক ভাব— হবেই তো, পূর্বপুরুষরা যে আরাগঁর অমুকের-তমুক বংশ! মখমল ঘাসে সবে তিনটে পা এগিয়েছেন, আর তাঁর অভিজাত পদতল পড়েছে জনির আগাছার ছোবড়ার ওপর। ডোনা মারিয়া কাস্টিলাস,—ইত্যাদি, একেবারে বনবিড়ালের মতো ওয়াঁও করে উঠলেন। ঘুরেই পড়ে গেলেন হাত আর হাঁটুর ওপর, তারপর হামাগুড়ি—হ্যাঁ, মাঠের জানোয়ারের মতোই হামা দিয়ে ফিরলেন তাঁর সম্মানিত দরজা প্রান্তে।

'জাস্টিস-অব-পীস্' ডন সেনিওর ইলদেফোনসো ফ্রেদেরিকো ভালদাজার, ২৮০ পাউণ্ড ওজন, —চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বপুটিকে প্লাজার কোণের ক্যান্টিনায় টেনে নিয়ে প্রভাতী তৃষ্ণা মেটাবেন। তাঁর পাদুকাহীন পায়ের প্রথম পদক্ষেপটাই ঠাণ্ডা ঘাসের মধ্যে ধাক্কা খেল কোনো লুকোনো 'মাইনের' সঙ্গে। ধসে-পড়া গির্জার

মতো পড়ে গেলেন ডন ইল্‌দেফোনসো, চেঁচিয়ে বললেন তাঁকে এক মারাত্মক কাঁকড়া বিছে কামড় দিয়েছে। সর্বত্রই জুতোহীন নাগরিকরা লাফাচ্ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, খোঁড়াচ্ছে আর পা থেকে খুঁটে তুলছে বিষাক্ত কীট,—যা এক রাতের মধ্যে কোথা থেকে তাদের জ্বালাতে এসেছে।

প্রথম যে-লোকটা এর প্রতিকার খুঁজে পেল সে নাপিত সাইমন বেনভিডেস—লোকটা অনেক দেশ ঘুরেছে, শিখেছেও অনেক কিছু। একটা পাথরের ওপর বসে সে নিজের পা থেকে কাঁটা তোলে আর বক্তৃতা দেয়:

'এই শয়তানের পোকাগুলোকে দেখুন বন্ধুরা! আমি এগুলো ভালই চিনি। এরা পায়রার ঝাঁকের মতো আকাশ দিয়ে উড়ে যায়। এগুলো হল মরা পোকা, যা রাতের বেলায় মাটিতে পড়েছে। ইউকাটানে দেখেছি এগুলো কমলালেবুর মতো বড়। শুধু তাই নয়। সাপের মতো ফোঁসায় আর বাদুড়ের মতো ডানা এদের। এখন শুধু জুতো—জুতোই একমাত্র প্রয়োজনের জিনিস! জাপাটো! আমার চাই জাপাটো!'

সাইমন কেতরে-কেত্‌রে মিঃ হেমস্‌লেটারের দোকানে ঢুকে জুতো কিনে ফেলল। বেরিয়ে এসে গদাই লস্করি চালে রাস্তা ধরে হাঁটল। পুরুষ, মহিলা, শিশু সব'ই এবার 'রা' তুলেছে—জাপাটো! সেদিন মিঃ হেমস্‌লেটার বেচলেন তিনশো জোড়া জুতো।

প্রতি রাতেই জনি আর কিওঘ বোনে ফসল, আর তা দিনের বেলায় ডলার হয়ে ফলে। দশ দিনের মধ্যে জুতোর ভাণ্ডারের তিনভাগের দু'ভাগ কাবার হয়ে গেল। 'কক্‌লবারের' রসদও ফুরিয়ে গেছে। জনি আরও পাঁচশো পাউণ্ড চেয়ে পিঙ্ক ডসনকে 'তার' পাঠাল আগের মতোই কুড়ি সেন্ট দরে।

এক রাতে রোজিনকে একটা আমগাছের তলায় নিয়ে গিয়ে জনি সব কিছু খুলে বলল। এবার সে একটা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল যা একবার ওকে আগেও জিজ্ঞেস করেছিল। এবার উপসংহারে শুধু ওস্তাদের সুর—'এবার বল তুমি কী করবে এ-ব্যাপারে?'

রোজিন ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে, 'বড় দুষ্টু লোক তুমি। আমি কী করব এবার? কী করে আর করব কিছু? আমি তো বরাবরই বুঝি এ ব্যাপারে শুধু একজন পুরুতই সবকিছু করতে পারেন।'

জনি ঝাঁ করে ছুটে গেল রাস্তায়, কিওঘকে টেনে বের করে, সঙ্গে নিয়ে এল এক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পুরোহিতকে, যার গির্জাটা এক লেবু-ঝোপের আড়ালে। তারা সবাই মিলে গেল হেনশেলদের বাড়ি। জনি আর রোজিনের বিয়ে হয়ে গেল। মিসেস্ হেনশেল আনন্দে হাপুস-নয়নে কাঁদলেন। এবার জনি দোকানে গিয়ে মিঃ হেমস্‌লেটারকে সম্বোধন করল 'শ্বশুর মশায়' বলে, তাঁকেও খুলে বলল সবকিছু। মিঃ হেমসলেটার চোখে চশমা এঁটে বললেন, 'তোমাকে এক

অসাধারণ ফন্দিবাজ ছোকরা বলে তারিফ করি। এবার বাকি জুতোগুলোর কী হবে?'

'কক্লবারের' দ্বিতীয় চালানটা যখন এল, জনি সেগুলো, আর বাকি জুতোগুলো একটা ডিঙিতে বোঝাই করে সোজা চালিয়ে নিয়ে গেল ক্যারিজোতে। ক্যারিজো আরো বারো মাইল ভাঁটির দিকে। সেখানে ভাইবোরার সাফল্যেরই পুনরাবৃত্তি করল সে। ফিরল এক থলি টাকা নিয়ে, একটা জুতোর ফিতেও এবার ফিরিয়ে আনেনি।

যখনই সে নিজের ইস্তফাপত্রটা ডিপার্টমেন্ট থেকে গ্রাহ্য করিয়ে নিতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল যুক্তরাষ্ট্রে, তার সুখী স্ত্রী আর মিঃ হেমস্লেটার সমভিব্যহারে। শ্বশুরের অবশ্য ধারণা তাঁর নিজের ব্যবসাবুদ্ধির জোরেই পাদুকা-প্রতিষ্ঠানের সাফল্য। কিওঘ নিযুক্ত হল সাময়িক কনসাল হিসেবে।

জনিরা চলে যাবার চারদিন পর একটা তিন-মাস্তুল স্কুনার-জাহাজ নোঙর করল পোতাশ্রয়ে। ডিঙিতে চড়ে পাড়ে এল এক রোদ-পোড়া চামড়ার যুবক, চোখে চালাকচতুর ভাব। কনসাল দপ্তরের রাস্তাটা জেনে নিয়ে সেখানে হাজির হল উত্তেজিত পায়ে।

কিওঘ একটা সরকারী চিঠির প্যাডে 'আঙ্কেল স্যামের' ব্যঙ্গচিত্র আঁকছিল সে সময়। চোখ তুলে আগন্তুকের দিকে তাকায়।

রোদপোড়া যুবক গম্ভীর দরকারি-কাজের স্বরে বলে, 'জনি অ্যাটউড কোথায়?'

স্যাম-খুড়োর ছাগল দাড়িটা সযত্নে আঁকতে আঁকতে কিওঘ বলে, 'চলে গেছেন।'

বাদামি লোকটা বলে, 'ঠিক যেমন ভেবেছি! কাজে মন না দিয়ে কেবল ফুর্তি করে বেড়ানো।'

'এই মুহূর্তে আমিই কাজ দেখছি'— খুড়োর জামায় বড়-বড় তারা আঁকতে গিয়ে মন্তব্য করে কিওঘ।

'আপনিই কি—তাহলে বলুন!—ওই জিনিস একগাদা রেখেছি জাহাজের পাটাতনের নিচে, জাহাজ এখন ওই সমুদ্দুরে। সাড়ে চার টন এনেছি! কারখানা কোথায়?'

'কী জিনিস? কোন্ কারখানা?' সামান্য কৌতূহল দেখিয়ে এবার নতুন কনসাল প্রশ্ন করে।

আগন্তুক বলে, 'কেন? ওই কক্লবার। জানেন তো। কারখানা কোথায় যেখানে আপনারা ওগুলো ব্যবহার করেন? এই লটের মালে ভাল ছাড় দেব আপনাদের। একমাস ধরে দশ মাইল দূর অবধি লোক লাগিয়ে ওগুলো তুলেছি। এই জাহাজও ভাড়া করেছি ওগুলো আনতে। না হয় পনের সেন্ট পাউণ্ড দরেই নেবেন। জাহাজটা কি বন্দরের ভেতরে এনে বাঁধব?'

কিওঘের লালচে মুখে একটা চূড়ান্ত, বলা যায় অবিশ্বাস্য উল্লাস যেন ফুটে ওঠে। সে পেন্সিল নামিয়ে রাখে। চোখদুটো যেন গিলতে থাকে আগন্তুককে।

সে কেঁপে ওঠে পাছে এই অভূতপূর্ব আনন্দটা আবার না মাটি হয়ে যায় স্বপ্নের মতো।

কিওঘ সনির্বন্ধে বলে, 'ঈশ্বরের দোহাই, বলুন তো আপনি কি ডিঙ্ক্ পসন?'

'আমার নাম পিঙ্ক্ ডসন'— আগাছা-বাজারের একচেটে ব্যবসায়ী বলে।

কিওঘ ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে নেমে, মাদুরের প্রিয় এলাকাটার দিকে এগোয়।

সেই ভ্যাপসা গরম দুপুরটিতে ভাইবোরায় কিন্তু আওয়াজপত্র তেমন হয়নি। যেটুকু হয়েছিল সে বলা যায় একজন আইরিশ আমেরিকানের অন্যায্য রকম হাসির শব্দ, যা শুনে হতবাক্ হয়ে তাকিয়েছিল এক চালাকচতুর রোদপোড়া যুবক। অবশ্য বাইরের রাস্তায় 'জুতো-পরা' পায়ের মশ্‌মশ্ শব্দও ছিল। আর ছিল স্পেনীয় সমুদ্রের তীর বরাবর আছড়ানো সাগর ঢেউয়ের নির্জন ছল্‌কানির আওয়াজ।

The Lotus and the Cockleburrs, এভরিবডি'স্, ১৯০৩

আসল বক্তব্য

কাগজের জন্য বিশেষ রচনাগুলো একটু চিত্রিত করতে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে কিছু নিচু-মানের ছবিও এঁকেছি। স্বাভাবিকভাবেই কাগজের 'শিল্পী বিভাগের' সঙ্গে কিছুটা 'আদায়-কাঁচকলায়' পরিচিতিও রয়েছে আমার। ওই ভাবেই চিনেছি ক্লে-কেও। ছবির ব্যাপারের যান্ত্রিক দিকটা নিয়ে ক্লে'র বিশেষ কিছু কাজকর্ম থাকে—এপ্রন পরে, হাত দুটোয় রাসায়নিকের দাগ। বেঁটেখাটো মানুষ, এক মুখ কোঁকড়া লাল দাড়ি—অনেকটা লাল আইরিশ 'সেটার' কুকুরের লোমের মতো। মদ্যপানে ওর পরম আসক্তি, ফলে ওর মাথার ওপর সব সময় ঝোলে বরখাস্তের খড়্গ।

একদিন বিকেলে ক্লে এসে দাঁড়ায় আমার ডেসকের সামনে,—হাবভাবে পরিষ্কার সে কোনো আর্জি নিয়ে এসেছে। ভয়ংকর কিছু উদ্‌ঘাটনের আশঙ্কায় মুখ বুজে থাকি।

'বুঝলেন বুড়ো-দা', বলল সে (আমাকে "বুড়ো-দা" বলার কোনো অধিকার নেই অবশ্য তার)—'আমি বড় গ্যাঁড়াকলে পড়েছি, তাই ভাবলাম আপনি হয়তো আমায় সাহায্য করতে পারেন।'

'সংবাদপত্রের' কর্মীরা হল ভাই বেরাদার—তার মধ্যে যতই তারতম্য আনুক হুইস্কি কিংবা শনিবার সন্ধ্যায় পারিতোষিকের লেপাফা। তাই একটা হাত ধীরে চালিয়ে দিই পকেটে, সেখানে একটা কড়কড়ে পাঁচডলারের নোট আর রুপোর নতুন ডলার পাঁচটা এখনো রয়েছে। এই তো এক ঘন্টা আগেই পেয়েছি

বিজিনেস্-ম্যানেজারকে আনত 'সালাম' ঠুকে—সামনের সপ্তাহের বেতন থেকে আগাম।

ক্লে একটা ত্যাগস্বীকারের ধার্মিক ভঙ্গি করে হাত তোলে—'না স্যর। ধার নেবার ইচ্ছে আমার নেই।'

স্বস্তির নিশ্বাসটা চাপবার চেষ্টা করি।

ক্লে বলে, 'কিন্তু পাঁচটা ডলার আমার চাই।'

আমি ওর দু'রকমের বক্তব্য মেলাতে চেষ্টা করি কর্মস্থলে লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে, কিন্তু কোনো হদিশ পাই না। ক্লে ব্যাখ্যা করে, 'আপনার কাজে লাগবে এমন একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য কাহিনী আছে আমার কাছে। কাগজের অন্তত দেড় কলম জায়গা তো নেবেই। এমনিতে হয়তো কিছুই চাইতাম না গল্পটার জন্য, বুড়োদা, কিন্তু বড় গাড্ডায় পড়েছি যে—একেবারে দেউলে অবস্থা। ওটা কাগজে লিখে আপনি অন্তত পনের ডলার তো কামাবেনই, তাই পাঁচটা ডলারও দিতে আপনার অসুবিধা হবে না মূল বিষয়টার জন্য। একদিন ওই পাঁচ ডলারও ফিরিয়ে দেব, বুঝলেন, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ফেরত আমি দেবই।'

মনে মনে ওই পাঁচডলারকে বিদায় করেছি, কারণ কলেজ ছাড়াও বাইরে আমি সংবাদিকতা শিখেছি। বললাম, 'আসল খ্যাঁচ্টা কোথা বলো তো?'

লোভ দেখানোর সুরে ক্লে বললে, 'একেবারে গুলগুলে পাকা ফল। এই তো ঘন্টাখানেক আগে ব্যাপারটা জানলাম। রবিবাসরীয় ভোরের কাগজের জন্য পরম মুখরোচক। রহস্যের মতো করে লিখুন, বুঝলেন, আর চাটনি হিসেবে সাজিয়ে দিন যাবতীয় কল্পনা-আবেগ, একেবারে লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে। এবার শুনুন। একটি মেয়ে শহরে এসে পড়েছে কোনো লোককে খুঁজতে। গ্রামদেশ থেকে— ওইসব সহজ সরল, সর-ডোবানো রসাল ফল, দুধে-গোলাপে ছিঁচকাঁদুনে ধরনের মেয়ে যারা আফ্রিকার জঙ্গলে বরফ-দলার মতোই এই শহরের পক্ষে বেমানান। স্টেশন থেকে দু'ব্লক দূরে দেখা পেয়েছি ওর, ঝটপট করেই বলে ফেলল তার পুরো ইতিহাস, যেন আমি ওর কতকালের চেনা পীটু খুড়ো। তিরিশ হাজার মানুষের এই শহরে এসেছে একটি বান্দাকে খুঁজে বের করতে যার ঠিকানার আগামাথা নেই—ওই ধরনেরই কোনো বোকাবুদ্ধি। ব্যাপারটার মধ্যে রোমান্স গোছের কিছু মিশে আছে। তার বিয়ে করার কথা জর্জকে, আর সে কাউকে না বলে শহরে পালিয়ে এসেছে কোন্ এক হেন্'কে খুঁজে বের করতে—ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা? রোববারের রচনা হিসেবে জবরদস্ত কাহিনী হবে। মেয়েটা সবকিছু শেষ অবধি আপনাকে বলবে, আর আপনিও চমৎকার সাজিয়ে নিতে পারবেন। মিঃ উইনস্লো, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কী দারুণ একটা রবিবাসরীয় প্যানপ্যানানি পেয়ে যাচ্ছেন?

'তা ছাড়া আর একটা হল, লোক জানাজানি হবার আগেই ওকে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে, না হলে নানা কথা উঠবে। তাছাড়া ওর ওপর নজর না রাখলে

এ শহরে ও নানা বিপদেই পড়তে পারে। একটা বোর্ডিং বাড়িতে ওকে তুলে দিয়েছি, যেখানে ওর খাওয়া-থাকার খরচায় টান পড়বে, কারণ আমার কাছে একটি পয়সা ছিল না, ওর কাছেও নেই। আপনি এসে ওর সাক্ষাৎকার নিন, মিঃ উইনস্‌লো। আপনি তো অনেক মালমশলাই পাবেন, —আর পাঁচ ডলার আমার কত কাজে লাগবে তা আপনি আন্দাজই করতে পারছেন না।'

বললাম, 'দেখ ক্লে, তুমি হলে আর্ট বিভাগের লোক, তাই কিছুটা কল্পনাশক্তি তোমার আছে বলেই ধরা যায়। একবার শুধু ভাবো বুড়ো আর্ডলের মুখখানার কথা, যদি শহরে বেড়াতে-আসা একটা গ্রাম্য মেয়ের গল্প তাড়া বেঁধে তার হাতে দিই। তুমি কি কল্পনাও করতে পার না আমার সুনিশ্চিত বরখাস্ত হবার সম্ভাবনা? ছলাকলাহীন আবেগের বশে কোনো পল্লী বালিকার নগরদর্শন তো শহুরে বাজারে তেতো পাঁচনের সামিল।'

ক্লে-কে এমনই হতভাগ্য, অভাবী আর দমে-যাওয়া, দরিদ্র বিনয়ী উপযাচকের মতো দেখায় যে আমি পেছু হটতে বাধ্য হই। এও হতে পারে যে মেয়েটার সত্যিই বড় সাহায্যের প্রয়োজন, অথচ অসহায় ক্লের সামান্য ক্ষমতায় সেটুকুও দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার অন্য লেখার ওপর কাগজ-চাপা ঢেকে জানালাম ওর সঙ্গে আমি যেতে রাজি। যদিও অন্তর থেকে তেমন ভরসা আমার নেই।

ক্লে যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে, তার যা হতচ্ছাড়া দুর্গতির চেহারা, ধুকড়ি কোটে গলা অবধি বোতাম-আঁটা, জীর্ণ টুপি, যে আমি বাধ্য হয়ে কিছু বাড়তি খরচ করে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিলাম। ওতে চেপেই ক্লে'র নির্দেশিত পথে পৌঁছোলাম শহরের এক এঁদো রাস্তায়—সেখানে সব শেওলা-ধরা লাল ইটের বাড়ি, ছন্নচ্ছাড়া দৃশ্য। ওরই মধ্যে একটা—নামেই বোর্ডিং বাড়ি, বাইরেটা ছদ্ম আপ্যায়নের পরিচয় দিচ্ছে। সেখানে নামলাম আমরা। দরজার ঘন্টার শব্দে ক্লে যেন ফ্যাকাশে, জঘন্য পোশাকে যেন তাঁর কাঁপুনি ধরেছে। কড়া মনিবানীদের সঙ্গে ক্লে'র অনেক কালের অভিজ্ঞতা, তাতেই তাদের সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালে ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। জবাবে সাড়া পাওয়ামাত্র সে আপত্তিকর তাড়াহুড়ো করে একটি ডলার গুঁজে দেয়, দরজা খুলতেই,—এক ভারিক্কি মহিলার হাতে (ডলারটা ও আমার কাছ থেকেই আগাম নিয়েছিল)। ওই টাকাটার জন্যই গ্রামের সেই যুবতী মেয়েটি আটক পড়ে রয়েছে এখানে।

সন্তুষ্টা মনিবানী এবার মোটা গলায় বললে, 'মেয়েটা রয়েছে দোতলার বসার ঘরে।' আমি আর ক্লে উঠে গেলাম সেখানে। প্রায় বছর উনিশেকের একটি অতি সুন্দরী যুবতী বসে আছে টেবিলের ধারে। চোখমুখের মধ্যে সাম্প্রতিক দুঃখের চিহ্ন, তবে অশোভনীয় নয়। একটা আধ-খাওয়া মিষ্টি টফির টুকরো রয়েছে টেবিলের ওপর, ওর হাতের নাগালের মধ্যেই। ক্লে আমার পরিচয় দিতে, মাথা নোয়ালাম মিস্ রোজা রেডফিল্ডের দিকে— এতক্ষণে সত্যিকারের তারিফ আর আগ্রহ জেগে

উঠেছে আমার। ক্লে আমাকে তার "বন্ধু" বলে ছাপ মেরে দিয়েছে বলে সামান্য আঁতকে-ওঠা ভাব চেপে রাখতে পারিনি। মানুষ এত নিচেও নামতে পারে যখন সৌন্দর্য, অহঙ্কার আর জীর্ণ পোশাক এক জায়গায় মেলে!

মিস্ রেডফিল্ডের চোখে এখনো জল জেগে আছে। টফির সান্ত্বনা হারতে-হারতেও লড়ে চলেছে একাকীত্বের বিরুদ্ধে। অশ্রুসিক্ত নীল চোখদুটো আশা আর আগ্রহ নিয়ে তাকায় ক্লে'র দিকে।

'ওকে খুঁজে পেলেন?'—গোলাপী যৌবনের সবটুকু প্রত্যাশার গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

ওর দ্রবিত ফুটন্ত সজীবতার পাশে একটা মূর্তিমান বিসদৃশতা নিয়ে ক্লে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের কাছে। ওর একটা হাত বিবর্ণ কোটের বুকের ভেতরে পোরা। বাদামি দাড়িগুলো প্রায় ওর চোখ অবধি মুখ ঢেকে রেখেছে। ক্লে আমাকে তার বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়াতে আমি ক্ষুব্ধ।

সে বললে, 'না, তাকে আমি খুঁজে পাইনি, তবে মিঃ উইনস্লোকে সঙ্গে এনেছি, যে উপদেশ আমি তোমায় দিয়েছি সেই একই উপদেশ উনিও দেবেন।'

যুবতীটি প্রত্যাশাভরা চোখে তাকায় আমার দিকে।

অথৈ জলে পড়ে আমি বলতে শুরু করি, 'যদি ঘটনাগুলো ভাল করে জানা থাকত—'

মিস্ রেডভিল্ড উৎফুল্লভাবে বলে, 'আরে দূর, অত খারাপ নয় ব্যাপারটা। কোনো ঘটনাই এতে নেই। আমি শুধু শহরে এসেছিলাম দেখতে যদি হেন্-এর খোঁজ পাই। আমি একটি গেঁয়ো হাবা মেয়ে।'—মুখ জুড়ে ওর ঝলমলে সিক্ত হাসি—'ভেবেছিলাম তাকে পেয়েও যেতে পারি। আপনাদের এক ধরনের নাম-ঠিকানার কেতাব থাকে না যাতে লোকের খোঁজ পাওয়া যায়? মিঃ ক্লে'র সঙ্গে আমার হঠাৎই দেখা হলে, উনিই আমাকে এখানে আনলেন। বাপ রে, কী বিরাট শহর, মিঃ উইনস্লো! আমার আসার ইচ্ছে ছিল না। আমি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলাম এলা পীর্জের সঙ্গে সারাদিনটা কাটাব বলে, এর মধ্যে ট্রেন এসে দাঁড়াল। আমি বুড়ো পম্পিটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে, ঘোড়ায়-চড়ার স্কার্টখানা বদলে সোজা উঠলাম ট্রেনে। ভাড়া দেবার পয়সাটুকুই যা সঙ্গে ছিল। ভাবছিলাম হেন্-এর কথা, আর তখন আর সা-স্-সামলাতে পারিনি।'

সরল যৌবনের নিলাজ অশ্রু ঝরে পড়ে ওর চোখ থেকে। বাহুর ওপর মাথা ঠেকিয়ে ও কেঁপে ওঠে নিজের উদ্রিক্ত বেদনার সাময়িক আঘাতে। হঠাৎই আবার কোনো রামধনু প্রতিশ্রুতির বর্ষা-হাসি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে ওর মুখে।

'জর্জ পাগল হয়ে যাবে যখন জানতে পাবে আমি চলে এসেছি! তবে আমি গ্রাহ্য করি না। যদি হেন্'কে পেয়ে যাই তাহলে আর ফিরছি না। হেন্ গ্রীন ভ্যালি ছেড়ে গেছে আজ চার বছর হল। আমার অপেক্ষা করার কথা ছিল,

আমি তা করেছি। আমরা দু'জনে মিলেই বেরুতাম সব সময়। এক বছর আগে পর্যন্ত ও প্রতি-হপ্তায় আমায় চিঠি লিখত। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে ওর। সে তো ভোলার লোক নয়।'— প্রমাণ হিসেবে রোজা ওর রুপোর ব্রেস্‌লেটে বাঁধা একটা চুড়ি তুলে দেখায়—'এই হল আমাদের পরস্পরকে মনে রাখার শপথ-চিহ্ন। একটা রুপোর সিকি দু'ভাগে কেটে একেক ভাগ রেখেছি একেক জন।'

ক্লে বলল, 'মিস রেডফিল্ড, তুমি এই হেন্ ছেলেটির বর্ণনা দিতে পার? তুমি তো বলেছিলে তার নাম মার্টিন?'

'বর্ণনা নিশ্চয় দিতে পারি। অত সুন্দর বাদামি চোখ আর হয় না, ঢেউ-খেলানো চুল, আর ছোট এক জোড়া কোঁকড়া গোঁপ—যে কোনো কাজের পক্ষেই মিষ্টি।'

ক্লে জিজ্ঞেস করে, 'আর তার বাঁ-থুতনিতে কি আধ ইঞ্চি লম্বা একটা কাটা দাগ ছিল?'

'ও হ্যাঁ, সে তো ছিল। আগে সে কথা বলিনি? একবার খেলার ছলে ওখানেই তো আমার কাঁচির খোঁচা লেগেছিল। আপনি নিশ্চয় তাকে দেখেছেন, মিঃ মে—মানে ক্লে! কোথায় সে? কেন আমায় চিঠি লেখেনি?'

'তোমাকে জানাতে আমার দুঃখই হচ্ছে, মিস রেডফিল্ড'—লাল দাড়ির চাপড়ায় বিচলিতভাবে বিলি কাটতে কাটতে বলল ক্লে—'হেন্ মার্টিন মারা গেছে। প্রায় এক বছর আগে। আমি তাকে ভালই চিনতাম। প্রায়ই তার মুখে শুনতাম, একটু টাকা করতে পারলেই সে গ্রীন ভ্যালিতে ফিরে যাবে। বছর খানেক আগে মদ ধরেছিল, আর অবস্থাও ভাল যাচ্ছিল না তার। সে জানত জীবনে সে ব্যর্থ, আর আন্দাজ করি সেই কারণেই সে চিঠি লেখা বন্ধ করেছিল।'

আবার মিস্ রোজা কাঁদতে শুরু করে। মাথা নিচু করে কাঁদে আর চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলে তার টফিগুলো। আমি একটা অপ্রাসঙ্গিক লোকের মতো বসে থাকি, ভাবি না-এলেই হত, মিস্ রোজা তেমন সুন্দরী আর কোথায়! কখনো ক্লে'র সঙ্গে দেখা না হলেই বোধহয় ভাল হত। ক্লে তখনো টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে; নোংরা আর বিষণ্ন, কোটের এবড়োখেবড়ো সেলাই খুঁটছে। আবার মুখ খুলল সে:

'হেন্ মার্টিন যতই বোকামি আর মাতলামি করুক, গ্রীন ভ্যালিকে সে কখনো ভুলতে পারেনি। ওখানেই তার মন পড়ে থাকত সব সময়। কিন্তু পরে ওর অবস্থার এতই অবনতি যে শেষমেষ আশা ছেড়ে দিল সে। কিন্তু ভুলে যায়নি কখনোই, তাই বলত সে মরে গেলে ওই আধখানা সিকি, যা সে সব সময় কাছে রাখত, তা যেন ওর সঙ্গেই কবরে দেয়া হয়।'

মিস্ রোজার ফোঁপানি কান্না এবার প্রায় হিস্টিরিয়া হবার দাখিল। ক্লের ওপর আমার বেশ রাগ হতে থাকে কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে ও একবগ্‌গার মতো লেগে আছে? তারপর হঠাৎই একটা ধারণা মাথায় আসে—লোকটা অভিনয়

করছে! নিজের পাঁচ ডলার রোজগার করতে আর আমার টাকার জন্য ভাগদৌড় করতে ও এই শস্তা অতি-নাটকের আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো মিথ্যে কথাই বলেছে ওই কাপুরুষ মার্টিনকে সে জানে বলে, আর তার করুণ মৃত্যুর গল্পটাও ফেঁদেছে—যদিও তার মৃত্যুতে কোনো আগ্রহ নেই আমার। একটা গ্রাম্য খুদে মেয়ের নিরীহ পলায়ন অভিযান থেকে এইভাবে ফায়দা তোলা আমার কাছে হীন ঘৃণ্য কাজ বলে মনে হয়। আর্ট বিভাগের ওই জঘন্য লোকটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না এই সংকল্পই করি।

ক্লে বললে, 'জিজ্ঞেস করতে পারি—যে লোকটাকে কথা দিয়েছ বিয়ে করবে বলে—তাকে তোমার প-প-পছন্দ কিনা?'

যেন লবণাক্ত সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা দেবীর মতোই নিজের চোখের লোনা জল সরিয়ে মেয়েটি বললে, 'জর্জ? নিশ্চয় পছন্দ করি তাকে। কী দারুণ ভালবাসে আমায়, তাছাড়া ওর বাপ একটা খামারবাড়িও দিচ্ছেন ওকে। একটু ঢিলে গোছের অবিশ্যি, তাও—জর্জকে আমি পছন্দই করি, কিন্তু, হে-হে-হেনের কথা যে কেবলই মনের মধ্যে—'

'দেখ মিস্ রেডফিল্ড!'—বেশ কর্তাত্তির সুরে বলে ক্লে, আরেকটি কান্নার ঢল রুখে দেয় সাফল্যের সঙ্গে—'এসো এবার অন্য ব্যাপারে কথা বলি। তোমার এখন যেটা করতে হবে তা হল যত তাড়াতাড়ি পার বাড়ি ফিরে যাও, এইভাবে পালিয়ে আসার কথা ভুলে যাও আর বিয়ে করে ফেল জর্জকে। মিঃ উইনস্লো, আপনিও তাই বলুন তো একে!'

অবশেষে আমি খানিকটা 'কাজে এলাম'। ক্লে বসে পড়ল সওয়াল জবাবের শেষে উকিলের মেজাজ নিয়ে। মিস রেডফিল্ড আমার দিকে তাকাল প্রত্যাশাভরা চোখে। আমি জ্যোতিষীর মতো গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলাম।

'মিস রেডফিল্ড, একটা পুরনো কথা আছে—যাকে আমরা প্রথম ভালবাসি তার সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বিবাহ ঘটে না। হয়তো সেটাই সবচাইতে ভাল। আমাদের প্রথম যৌবনের ভাব ভালবাসা প্রায়ই বর্ষিত হয় অযোগ্য পাত্রের ওপর। এই মিঃ-ইয়ে মানে—মার্টিন মনে হয় আপনাকে সুখী করার মতো লোক নয়। সময়ে আপনি তাকে ভুলেও যাবেন। মিঃ ক্লে আপনাকে সঠিক বুদ্ধিই দিয়েছেন। আমি কেবল তার কথারই ওপর সায় দিতে পারি, আপনি যত শিগগির সম্ভব ঘরে ফিরে যান। জর্জকেই-ইয়ে—বিয়ে করুন যদি নিজের মন থেকে তেমনই সাড়া পান। সে নিঃসন্দেহে উপযুক্ত যুবক—আর তার খামারটাও কাজেরই হবে। যেমন আগে বলেছি, সময়ই মনের সব দুঃখ মিটিয়ে দেবে, কমিয়ে দেবে সমস্ত অনুশোচনা, আর মিঃ মার্টিনের স্মৃতিও ধীরে ধীরে মুছে যাবে—সেটাই তো হওয়া উচিত।'

শেষ কথাগুলো মনে হল, ঠিকভাবে সাজানো হয়নি, তবে ও কথা ক'টি ছাড়া আমার ছোট বক্তৃতাটা বেশ পরিচ্ছন্ন আর যথার্থ হয়েছে বলেই ধারণা হল;

মিস রোজা যেন এবার সত্যিই শান্ত হয়েছে, খানিকটা আত্মস্থও হয়েছে। কিন্তু বিষণ্ণ আর সান্ত্বনার অযোগ্য ওই ক্লের ওপর সবটাই যেন জলে-যাওয়ার মতো বেকার হয়েছে। লোকটাকে যেন আরো বেশি অপছন্দ করতে শুরু করি।

তিনজনে মিলে পরামর্শ হয়। মিস্ রেডফিল্ড মেনে নিয়েছে যে তার ছোট অভিযানটা জানাজানি হয়ে যাবার আগে গ্রীন ভ্যালিতে ফিরে যাওয়াই তার পক্ষে শোভনীয় হবে । তা ছাড়া নরমসরমভাবে তাকে বুঝিয়েও দেয়া হয় তার শহরে আসার ঘটনাটা যেন জর্জের কাছে পুরোপুরি চাপা থাকে।

আধঘন্টার মধ্যেই সে ট্রেনে চাপবে, ওতেই আবার ফিরে যাবে গ্রীন ভ্যালি। ও নিশ্চিত যে বুড়ো পম্পি-ঘোড়াটা এখনো গাছেই বাঁধা আছে, মিস্ পীজের বাড়ি সিধেই চলে যেতে পারবে ও। অতএব ওর দিনের কর্মসূচীতে কোনো হেরফের হয়েছে বলে কাকপক্ষীও ধারণা করতে পারবে না। এ সমস্ত কাজের জন্য এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার।

মিস্ রোজা আবার যেন তরতাজা হয়ে উঠেছে। ফুটকি-তোলা সুইস্ জামা আর নাবিক-টুপিতে তাকে এমন মিষ্টি আর সতেজ দেখাচ্ছে যে আমারও এ অভিযানে বেশ উৎসাহ জাগে। ভ্রমণে মিঠাই আর গোলাপ ফুলের ব্যবস্থা করতে চাই আমি, কিন্তু ক্লে বুঝিয়ে দেয় ওসবের সময় নেই এখন।

বোর্ডিং বাড়ি থেকে বের হই আমরা—সাবধানে সিঁড়ি ধরে গুটিশুটি নামে ক্লে, তার চিরকালের অভ্যাসে,—আর ছোটে রেলস্টেশনের দিকে। দলে আমিও থাকি, সেটা প্রয়োজন কারণ আমিই আসল দূত— ভাড়াটা তো আমাকেই গুনে দিতে হবে। মিস্ রোজা সঙ্গে টাকা আনেনি, আর ক্লের সঙ্গে তো সামান্য খুচরো পয়সারও সম্পর্ক নেই।

গ্রীন ভ্যালির একটা টিকিটের ভাড়া তিন ডলার আমিই দিই, আর যুবতীটিকে বসিয়ে দিই গাড়িতে। ট্রেন ছাড়ার সময় জানলার বাইরে ঝোঁকে মেয়েটি, আর প্ল্যাটফর্ম ধরে ফিরে আসি আমি আর ক্লে, তার কৃতজ্ঞ আর মনোরম বিদায়ের হাতছানি গ্রহণ করে। নিরপেক্ষভাবে দু'জনকেই সে বিদায় জানিয়েছে, দেখলাম তার কোচখানা যখন দূরে চলে গেছে তখনো তার ছোট রুমালখানা উড়ছে।

অচঞ্চল ক্লে ফিরে তাকাল আমার দিকে, ভবঘুরে চেহারার মধ্যেও একটা বিক্ষিপ্ত শঙ্কাভরা দৃষ্টি ওর চোখে। আমি আমার পাঁচ ডলারের নোটখানা ওর হাতে দিলাম, কারণ আমার হিসেবে ওই টাকাই তার কাছে ধারি।

একটু যেন ভয়ে-ভয়েই বললে, 'এ থেকে আপনি একটা গল্প বানাতে পারবেন তো, মিঃ উইনস্লো? কোনো রকমে ধরুন দেড় কলম? যার জন্য বেরিয়েছিলেন তা কামাবার পক্ষে যথেষ্টই, কি বলুন?'

'নিশ্চয়ই নয়', জবাব দিলাম আমি, 'একটা প্যারাও হবে কিনা সন্দেহ। তবে দুজনেরই বোধ হয় তুষ্ট থাকা উচিত। একটা চমৎকার ছোট মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পেরেছি আমরা। এই নাও তোমার টাকা।'

'না, না। টিকিটের দাম তিন ডলার, আর বোর্ডিং হাউসের মনিবানীকে দিলাম যে এক ডলার— সে আমারই পাঁচ ডলার থেকে। আপনি আমাকে বাকি ডলারটা হয়তো দিতে পারেন; আজ রাতে আরেক বার মাতাল হবার সুযোগ পাব।'

একটা রুপোর ডলার দিই তার হাতে। শোচনীয় রকম নীল দেখাচ্ছে তাকে। আমি তো জানি সুরার ক্রীতদাস যারা, তাদের কত বিচিত্র পরিকল্পনা আর আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দেয় তাদের প্রভু, মানে সুরা। তাই একটু নরম হই ওর ওপর।

প্রস্তাব জানাই—'আসবে নাকি গাড়িতে? ফিরে যাবার জন্য?'

'নাঃ, আমি হাঁটব। আমি খুব দুঃখিত মিঃ উইনস্‌লো, যে এই বিষয়টার মধ্যে লেখার মতো কিছু পেলেন না আপনি। বুঝলেন তো, অবস্থাটা আমার কাছেই বড় কঠিন হয়ে উঠেছিল কিনা!'

বললাম, 'সে যাক্‌গে, ও নিয়ে আর ভেব না তুমি। আমরা ছোট্ট মেয়েটাকে সাহায্য করেছি, তাই খরচ-খরচা নিয়ে আপসোসের কিছু নেই আমাদের।'

ক্লে তার ধুকড়ি কোটের বোতাম খুলতে লাগল নিরাপদ জায়গায় ডলারটা গুঁজে রাখবে বলে। ওর বুক পকেটে দেখলাম একটা শস্তা নিকেল-করা ঘড়ির চেন। তা থেকে মাদুলির মতো ঝুলছে একটা থেঁতলা রুপোর সিকির আধখানা ভাগ।

ওটা চেপে ধরে আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—'এ কী!'

ক্লে ভোঁতা গলায় বললে, 'হ্যাঁ, ঠিকই। আমার পুরো নাম হেনরী ক্লে মার্টিন।'

The Point of the Story এভরিবডিজ, ১৯০৩ (সিডনি পোর্টার ছদ্মনামে)

রাজকন্যা ও পুমা

রাজা আর রানী—এ দু'জন থাকতেই হবে অবশ্য। রাজা ছিল ভয়ানক এক বুড়ো, ছ'ঘরা পিস্তল আর রেকাব তার সদাসঙ্গী, চেঁচাত এমন সাংঘাতিক গলায় যে প্রেইরির র‍্যাটেল সাপগুলো পালিয়ে কূল পেত না কাঁটা-নাসপাতিগাছের তলায় তাদের যার-যার গর্তে। রাজ-পরিবার গড়ে ওঠার আগে লোকটাকে সবাই ডাকত "মিন্‌মিনে বেন" বলে। তারপর যখন সে পঞ্চাশ-হাজার একর জমি আর তার গোনার অসাধ্যি গরুভেড়ার মালিক হল তখন ওরা তার নাম দিল ও'ডোনেল, "গরুর পালের রাজা"।

রানী ছিল লারেদোর এক মেক্সিকান মেয়ে। ভালমানুষ, নরমসরম লালচে-বাদামি বউটি হয়ে এসেছিল সে। বেনকে শেখাতেও পেরেছিল কী করে বাড়িতে থাকলে গলার স্বরটি নিচু রাখতে হয়—যাতে থালাবাসনগুলো ভেঙে না পড়ে! বেন

যখন রাজা হয়েছে তখনও রানী এস্‌পিনোজা-র‍্যাঞ্চের বারান্দায় বসে ঘাসের মাদুরপাটি বুনত। তারপর যখন ধনসম্পদ এমনই অনিবার্যরকম অত্যাচারের মতো বেড়ে উঠল যে ওয়াগনে চাপিয়ে সেন্ট আন্তোনে থেকে আনতে হল গদি-মোড়া চেয়ার আর মধ্যিখানের টেবিল, তখন মহিলাটি তার মসৃণ কেশ কালো মাথা নিচু করে 'ড্যানে'র ভাগ্যই মেনে নিল।

'রাজসিক অমর্যাদা' এড়াবার জন্য গোড়াতেই রাজা-রানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ওরা এই কাহিনীর মধ্যে থাকছে না। এ কাহিনী হল "রাজকন্যার সুখ চিন্তা আর কাজ-ভণ্ডুল করা সিংহের" উপাখ্যান।

শেষ বেঁচে-থাকা কন্যা, মানে রাজকন্যাটি জোসেফা ও'ডোনেল। সে তার মায়ের উত্তরাধিকারে পেয়েছিল নিবিড়-উষ্ণ প্রকৃতি আর কালচে নাতি-উষ্ণমণ্ডলের সৌন্দর্য। আর রাজসিক বেন ও'ডোনেলের তরফ থেকে কন্যাটি পেয়েছিল অসম-সাহস, বাস্তব বুদ্ধি, আর শাসন করার যোগ্যতা। ওই তিনটি গুণের সমাহার দেখতে বহু মাইল অবধি ছুটে যাওয়া চলে। জোসেফা যখন ঘোড়ায় চেপে কদমচালে ছুটত তখন সুতোয়-বাঁধা দোলায়মান টমাটোর টিন, ছ'টার মধ্যে পাঁচটাই গুলি করে ফুটো করতে পারত। ঘন্টার পর ঘন্টা পোষা সাদা বেড়ালছানা নিয়ে খেলত, যত অসম্ভব রকমের পোশাক পরাত সেটাকে। পেন্সিলের তোয়াক্কা না করে মুখে-মুখেই বলে দিতে পারত আড়াই-বছুরে ১৫৪৫টা গাই সাড়ে আট ডলার মাথাপ্রতি দরে কত বাছুর দিলে কত টাকা আসবে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় এসপিনোজা খামারটা চল্লিশ মাইল লম্বা, তিরিশ মাইল চওড়া—কিন্তু বেশির ভাগটাই লীজ-দেওয়া জমি। এ জমির প্রত্যেকটা মাইল জোসেফা তার পনিতে চেপে নখদর্পণে রেখেছিল নিজের। এলাকার প্রতিটি গরুছাপমারা কাউবয় ওকে চাক্ষুষভাবে চিনত, তারা ছিল ওর ভক্ত অনুগত। এসপিনোজার একদল কাজের লোকের মুখপাত্র রিপ্‌লি গিভেন্স একদিন ওকে দেখেছিল, তারপরেই সে সংকল্প করে একটা রাজকীয় বিবাহ-সম্পর্কের। ঔদ্ধত্য? না। সেসব দিনে নিউসেস্ দেশ-এলাকায় একজন মানুষ মানেই মানুষ। তাছাড়া 'গাভীকূলের রাজা' উপাধিটা কোনো সত্যিকার রাজকীয় রক্তের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। বেশির ভাগ সময় এর একমাত্র তাৎপর্যই ছিল উপাধিধারীর মুকুটটি গরু চুরির কলাবিদ্যায় তার অপূর্ব নিপুণতার প্রতীক।

একদিন রিপ্‌লে গিভেন্স ঘোড়ায় চড়ে 'ডবল এল্‌ম্' র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল একদল যূথভ্রষ্ট বাছুরের খোঁজে—সবে এক বছর বয়েসে পড়েছে তারা। ফেরবার সময় তার কিছুটা দেরিই হয়েছিল রওনা দিতে। যখন সে নিউসেস্ জেলার 'সাদা ঘোড়া' নদীর মোড়টা পেরুতে যাচ্ছে তখন সূর্যও ডুবল। ওখান থেকে তার নিজের শিবির ষোল মাইল দূরে। আর এসপিনোজা র‍্যাঞ্চটার দূরত্ব বারো মাইল। গিভেন্স ক্লান্ত, সে ঠিক করল এই নদীর মোড়টাতেই রাত কাটাবে।

নদীর বালুশয্যায় একটা চমৎকার জলাশয় আছে। পাড় ঘিরে বড়-বড় গাছের

ঘন বন, তলার দিকে নলখাগড়ার ঝাড়। জলাশয় থেকে পঞ্চাশ গজ পেছনে কিছুটা জায়গা জুড়ে কোঁকড়া মেস্কিট ঘাস—ওগুলো ঘোড়ার খাবার হিসেবে, আর ওর নিজের শয্যার পক্ষেও উপযুক্ত জিনিস। গিভেন্স ঘোড়াটাকে খুঁটো বেঁধে ছেড়ে দেয়, আর নিজের জিনসাজের কম্বল ছড়িয়ে দেয় শুকোবার জন্য। একটা গাছের নিচে পিঠ ঠেকিয়ে বসে সিগারেট পাকাতে থাকে। হঠাৎ নদীর ধারের ঘনবনের ভেতর কোথাও থেকে একটা ক্রুদ্ধ কম্পিত আর্তনাদ জাগে। দড়ির প্রান্তে ঘোড়াটা নাচতে শুরু করে, বেশ বোঝা যায় ভয় পেয়ে, ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়ছে। গিভেন্স সিগারেটে টান দেয় বটে, সেই সঙ্গে ধীরেসুস্থে হাতও বাড়ায় ঘাসের ওপর পড়ে-থাকা পিস্তলের বেলটের দিকে। পরখ করবার জন্য ওর অস্ত্রের সিলিন্ডারটা ঘোরায়। জলাশয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 'গ্যার'-মাছ সজোরে ঝাঁপ খায়। বেড়ালনখীর ঝাড়ের চারদিক দিয়ে লাফাচ্ছিল একটা ছোট বাদামি খরগোশ, সে বসে দাড়ি নাচায় আর কৌতুকভারে তাকিয়ে থাকে গিভেন্সের দিকে। ফের ঘাস খেতে শুরু করে পনি ঘোড়াটা।

তবে সূর্যাস্তের পর কোনো মেক্সিকান সিংহ জঙ্গলের কাছে তারস্বরে গান গাইলে মোটামুটি সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। ওর গানের আসল মানে হতে পারে ছোট বাছুর বা মোটা ভেড়ার অভাব পড়েছে, আর সে নিজের মাংসাশী চরিত্রের পরিচয় আপনাকেও দিতে পাবে।

ঘাসের ওপর একটা খালি ক্যান পড়ে ছিল—ফলের। হয়তো আগে কেউ বেড়াতে এসে ফেলেছিল। ওটার ওপর নজর পড়তে গিভেন্স একটা খুশির আওয়াজ করে। জিনের পেছনে বাঁধা কোটের পকেটে কিছুটা পেষা কফি রয়েছে। কালো কফি আর সিগারেট! এর চেয়ে লোভনীয় জিনিস কোনো র‍্যাঞ্চ-ওয়ালা কখনো ছেড়ে দিতে পারে?

দু'মিনিটের মধ্যে সে একটা ছোট ছিমছাম আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে ফেলল। ক্যান হাতে এগুতে থাকল জলাশয়টার দিকে। জলের কিনারা থেকে যখন সে পনেরো গজের মধ্যে, দেখল ঝোপের ফাঁকে একটা টাটুঘোড়া। পাশের দিকে জিনবাঁধা, লাগামটা আলগা ছেড়ে দেওয়া; ঘাস খেয়ে চলেছে—তার বাঁ-দিকটায়, সামান্য একটু দূরেই। জলাশয়ের পাড় থেকে হাত আর হাঁটুতে ভর করে উঠে দাঁড়াচ্ছে জোসেফা ও'ডোনেল। ও জল খাচ্ছিল, এবার হাতের তালু থেকে বালি ঝেড়ে ফেলছে। দশ গজ দূরে, মেয়েটার ডান দিকে একটা সাকুইস্টা ঝোপের অন্তরালে, গিভেন্স দেখতে পেল মেক্সিকান সিংহটার আধা-লুকোনো গুঁড়ি-মেরে-বসা দেহাবয়ব। ওটার বাদামি-হলদে চোখের গোলা ক্ষুধার্তভাবে জ্বলজ্বল করছে—চোখ থেকে ছ'ফুট দূর অবধি সোজা খাড়া হয়ে আছে ওর লেজের ডগা। যেন পয়েন্টার কুকুরের লেজ। ঝাঁপ দেবার আগে বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের যেমন হয় তেমনি চঞ্চল গতিতে দুলে উঠেছে পাছার দিকটা।

গিভেন্সের যা করার ছিল তাই করল। ওর ছ'ঘরা পিস্তলটা তো পঁয়ত্রিশ গজ দূরে ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। সে প্রচণ্ড একটা চিৎকার করে ছুটে গেল সিংহ আর রাজকন্যার মাঝখানে।

যে 'হৈচৈ'টা এবার হল—গিভেন্স পরে এভাবেই বলেছিল—তা ছিল সংক্ষিপ্ত আর কিছুটা গোলমেলে। আক্রমণের রেখায় যখন সে এসে দাঁড়ায়, দেখতে পায় শূন্যে একটা আবছা ঝলক, শুনতে পায় দুটো হালকা বিস্ফোরণের শব্দ। তারপর একশো-পাউণ্ড ওজনের মেক্সিকান সিংহটা হুড়মুড় করে এসে পড়ে ওর মাথার ওপর, আর একটা ভারী ঝাপ্‌টা মেরে ওকে মাটির ওপর চেপটা করে শুইয়ে দেয়। ওর মনে আছে চিৎকার করে ও বলেছিল—'ছাড় তো এখন—এভাবে গুঁতোগুঁতি ঠিক হচ্ছে না।' তারপর সে একটা পোকার মতো সিংহের তলা থেকে গুঁড়িমেরে বেরিয়ে আসে—মুখভর্তি ঘাস আর কাদাময়লা নিয়ে, আর ওর মাথার পেছনে তখন একটা মস্ত ডেলা, জলা-এল্‌ম্ গাছের শেকড়ে ধাক্কা খেয়ে। সিংহটা নিশ্চল পড়ে আছে। গিভেন্স দুঃখিতভাবে, কিছু নোংরা ব্যাপার সন্দেহ করে, সিংহের দিকে মুঠি পাকিয়ে হাত নেড়ে চেঁচাল—'আবার তোকে শিক্ষা দেব কুড়ি—' তারপরেই নিজেকে সামলে নিল।

জোসেফা দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের জায়গায়, রুপোর ঘোড়াওয়ালা ·৩৮ পিস্তলে নতুন করে গুলি ভরছে। খুব একটা কঠিন শিকার হয়নি। ওই সুতোয় ঝোলানো টমাটো-টিনের চেয়ে অনেক সহজে তাক করা গেছে সিংহের মাথাটা। ওর মুখের কোণে আর কালো চোখে ফুটে উঠেছে একটা খোঁচা-মারা, উস্কানি-দেয়া, মাথা খারাপ-করা হাসি। সম্ভাবনাময় 'উদ্ধারকারী বীরপুরুষ' টের পাচ্ছে তার সব মতলব পণ্ড-করা আগুন এবার পুড়িয়ে দিচ্ছে তার অন্তঃস্থল অবধি। এইবারই তার সুযোগ এসেছিল—, যে সুযোগটার স্বপ্ন দেখত সে—কিন্তু তার গ্রহের অধিপতি মদন-দেবতা হলেন না, হলেন নারদ। বনের বিদূষক অর্ধদেবতারা তো নিশ্চয়ই নীরব চাপা উল্লাসে চেপে ধরেছে তাদের পেট। এ যেন কোনো ব্যঙ্গ-নাটকের মতো—সিনর গিভেন্স আর তার খড়-ঠাসা সিংহের মধ্যে মজার মুষ্টিযুদ্ধ!

জোসেফা ইচ্ছে করেই চড়া তেতো-মিষ্টি গলায় বলে—'আরে, আপনি মিঃ গিভেন্স? আপনি তো চিৎকার করেই আমার শিকারটা প্রায় ভণ্ডুল করে দিয়েছিলেন। পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছে আপনার?'

শান্ত গলায় গিভেন্স বলে, 'ও না, তেমন কিছু চোট পাইনি।' মর্যাদা হারিয়ে মাথা নিচু করে সে জানোয়ারটার পেটের তলা থেকে নিজের সেরা স্টেট্‌সন টুপিটা টেনে বের করে। চমৎকার কমেডির ঢঙে তুবড়ে কুঁকড়ে গেছে ওটা। এবার সে হাঁটু গেড়ে বসে মরা সিংহের ভয়ংকর চোয়াল-বের-করা মাথায় ধীরে ধীরে আঙুল বোলায়।

শোকার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'বেচারা বুড়ো বিল্।'

তীক্ষ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করে জোসেফা, 'ও আবার কী?'

'তুমি হয়তো জানতে না মিস্ জোসেফা,'—গিভেন্সের গলায় দুঃখকেও ছাপিয়ে-ওঠা মর্যাদাবোধের সুর, 'তোমাকে কেউ দোষ দেবে না। আমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সময়মতো তোমাকে তা বলতে পারিনি।'

'কাকে বাঁচাবার কথা বলছেন?'

'কেন, বিলকে! সারাটা দিন খুঁজেছি ওকে। বুঝলে, দু'বছর ধবে ও আমাদের পোষা জানোয়ার ছিল। বেচারা বুড়ো, তুলোর লেজওয়ালা একটা খরগোশকেও আঘাত করার ক্ষমতা ছিল না ওর। সাথীরা যখন শুনবে, সকলেরই বুক দুঃখে ভেঙে যাবে। তুমি অবশ্য কী করে জানবে যে বিল তোমার সঙ্গে নেহাৎই খেলবার চেষ্টা করছিল।'

জোসেফার কালো জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন স্থির হয়ে থাকে ওর দিকে। এ পরীক্ষায় গিভেন্স অবশ্য সফলভাবেই উত্তীর্ণ হয়। বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে মাথার হলদে-বাদামি চুলগুলো ঘাঁটে। তার চোখে দুঃখের চিহ্ন, সঙ্গে খানিকটা নরম তিরস্কারও মিশে আছে। ওর নরম চেহারার মধ্যেই যেন একটা অনস্বীকার্য শোকের ভঙ্গি। জোসেফা বিচলিত হয়।

একটা শেষ প্রতিরোধ খাড়া করার মতো প্রশ্ন করে, 'তোমার পুষ্যিপুত্তুর এখানে কী করছিল? 'সাদা-ঘোড়া' মোড়ের কাছে তো কোনো শিবির নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় গিভেন্স, 'কাল বুড়ো বদমাশটা শিবির থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। নেকড়েগুলো যে ওকে সাবাড় করে দেয়নি সেটাই আশ্চর্য। আমাদের জিনসাজের লোক জিম ওয়েবস্টার, বুঝলে, গেল হপ্তায় একটা ছোট টেরিয়ার কুকুরের বাচ্চা এনেছিল ক্যাম্পে। বিলের জীবন যেন বেহাল করে দিয়েছিল বাচ্চাটা। সর্বত্র ওকে তাড়িয়ে বেড়াত, একেক সময় ঘন্টার-পর ঘন্টা ওর পেছনের পা কামড়ে চুষতে থাকত। রোজ রাতে ঘুমোবার সময় হলে বিল চুপিচুপি কোনো ছোকরার কম্বলের তলায় ঢুকত। কুকুরটাকে এড়াবার জন্য ওর মধ্যেই ঘুমোত। মনে হয় খুব নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল, নতুবা পালাত না অমন করে। ক্যাম্পের চোখের আড়াল হতে সবসময়ই ভয় পেত।'

হিংস্র জন্তুটার দিকে তাকায় জোসেফা। গিভেন্স মৃদু চাপড় দিচ্ছে ওর একটা ভয়ঙ্কর থাবায়—যা হয়তো এক ঝাপটেই মেরে ফেলতে পারত একটা এক-বছুরে বাছুরকে। মেয়েটির জলপাইরঙা শামলা গালে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে একটা রক্তিম ঝলক। এ কি সেই লজ্জার আভাস, একটা অপমানজনক শিকারকে ধরাশায়ী করে ফেললে খাঁটি শিকারীর যেমনটা হয়? জোসেফার চোখদুটো কোমলতর হয়, অবনত পল্লব থেকে দূর হয়ে যায় সবরকমের ঝলমলে বিদ্রূপ।

বিনীত কণ্ঠে বলে, 'আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু এমন বিশাল দেখাচ্ছিল ওকে আর এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠেছিল যে—'

মৃতের সপক্ষে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল গিভেন্স, 'বেচারা বুড়ো বিলের খিদে পেয়েছিল। শিবিরে আমরা বরাবরই ওকে লাফিয়ে উঠে খাবার খেতে শিখিয়েছি। এক টুকরো মাংসের জন্য গড়াগড়ি খেত বেচারা। যখন তোমায় দেখল, ভেবেছিল তোমার কাছ থেকে কিছু খাবার পাবে।'

হঠাৎ জোসেফার চোখদুটো বড়-বড় হয়ে যায়।

সভয়ে বলে, 'আমি যে আপনাকেই গুলি করে বসতাম আরেকটু হলে! আপনি সিধে মাঝখানে চলে এসেছিলেন। নিজের পোষা জন্তুকে বাঁচাতে আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন! সেটা সত্যিই ভাল, মিঃ গিভেন্স। যে মানুষ পশুদের ভালবাসে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

হ্যাঁ, এবার ওর চোখে তারিফও ফুটে উঠেছে বটে। তাহলে, বিপরীত নাটকের ধ্বংসাবশেষ থেকেও একজন বীরনায়ক বেরিয়ে আসতে পারে? গিভেন্সের মুখভাব দেখেই তাকে 'পশুক্লেশ নিবারণী সংঘের' একটা উঁচু পদ দেয়া যেতে পারে বোধ হয়।

বলে, 'আমি বরাবরই ওদের ভালবাসি। ঘোড়া, কুকুর, মেক্সিকান সিংহ, গরু, কুমির—'

'কুমির, অ্যাঃ, আমি ঘেন্না করি!' তৎক্ষণাৎ বাগড়া দেয় জোসেফা—'গুঁড়ি মেরে চলে, কাদামাখা জীব!'

'কুমির বলেছিলাম বুঝি?' একটু হেসে গিভেন্স বলে, 'আসলে আমি বোঝাচ্ছিলাম হরিণ।'

জোসেফার বিবেক আরো কিছু ত্রুটি সংশোধন করে নেয়। সে অনুতপ্তভাবে হাত বাড়ায়। ওর দুটি চোখেই উদ্গত অশ্রু চিকচিক্ করছে।

'আমায় ক্ষমা করুন মিঃ গিভেন্স, করবেন না? আমি তো একটি মেয়ে মাত্র, আর প্রথমে ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলেন! বিলকে গুলি করে মেরেছি বলে আমি ভীষণ, ভীষণ দুঃখিত। বোঝাতে পারছি না কী লজ্জা বোধ করছি। কোনো রকমেই এমন কাজ করতাম না।'

প্রসারিত হাতটা হাতে নিল গিভেন্স। ওটা হাতেই ধরে রইল যতক্ষণ না তার মনের উদারতা বিল্‌কে হারানোর দুঃখকেও অতিক্রম করে। অবশেষে পরিষ্কার বোঝা গেল সে মেয়েটিকে ক্ষমা করেছে।

'মিস্ জোসেফা, এ. প্রসঙ্গটা দয়া করে আর কখনো উল্লেখ কোর না। বিল যে-ভাবে তাকিয়েছিল তাতে যে-কোনো মহিলাই ভয়ে আঁতকে উঠত। আমি আমার সাথীদের বেশ করে বুঝিয়ে বলব।'

'আপনি নিশ্চিত যে আমাকে আর ঘেন্না করছেন না?' আবেগবশেই একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল ও। চোখদুটো ওর মিষ্টি—মানে মনোরম অনুতাপের ভঙ্গিতেই আবেদন-মাখা আর মিষ্টি—'আমি তো-আমার বেড়ালছানাকে কেউ মেরে ফেললে

তাকে ঘেন্নাই করতাম। আর আপনি ওকে বাঁচাতে গিয়ে কী অসম সাহসে, মমতা বুকে নিয়ে, গুলি খাবার ঝুঁকিটা নিলেন! খুব অল্প লোকই এমন করতে পারত!' পরাজয় থেকে এবার জয় অর্জনের পালা! ব্যঙ্গকৌতুক পরিণত হল নাটকে! সাবাস্, রিপলে গিভেন্স!

এখন গোধূলি সন্ধ্যা। মিস্ জোসেফাকে নিশ্চয়ই একা ঘোড়ায় চড়ে র‍্যাঞ্চ বাড়ি ফিরতে দেয়া যায় না। নিজের পনিটার আপত্তিজ্ঞাপক চোখ পাকানো সত্ত্বেও গিভেন্স তার ওপর জিনসাজ চড়ায় আর রওনা দেয় মেয়েটির সঙ্গে। মসৃণ ঘাসের ওপর দিয়ে ওরা পাশাপাশি কদমচালে ছোটায় ঘোড়া—রাজকন্যা, আর জীবজন্তুদের প্রতি সদয় একটি মানুষ। সুফলা মাটি আর সুন্দর ফুলের প্রেইরি সুবাস ওদের চারদিকে ঘন আর মিষ্টি হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারা-খচিত আকাশ যেন সুবিশাল বিশ্বের কিনারা অবধি ঢেকে রেখেছে তুঁত-রঙা আবরণের মতো। কয়োট-নেকড়েগুলো পাহাড়ে পাহাড়ে চেঁচায়। ভয় নেই! তবু—

জোসেফা আরও কাছাকাছি আসে। একটা ছোট হাত যেন কিছু হাতড়ে খোঁজে। গিভেন্স নিজের হাতে সেটাকে তুলে নেয়। পনি দুটো কিন্তু সমান গতি বজায় রেখেছে। হাতদুটো খানিকক্ষণ একসঙ্গে জুড়ে থাকে। একটি হাতের মালিক ব্যাখ্যা করে:

'আগে কখনো ভয় পাইনি, কিন্তু ভেবে দেখুন! একটা সত্যিকারের সিংহই যদি এসে পড়ত, কী ভয়ানক হত তাহলে! বেচারী বিল! তাও ভাল যে আপনি আমার সঙ্গে এসেছেন!'

বুড়ো ও'ডোনেল বসে ছিলেন র‍্যাঞ্চের বারান্দায়।

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে রিপ্, তুমি?'

জোসেফা বললে, 'আমার সঙ্গে এলেন ঘোড়ায় চেপে। রাস্তা হারিয়ে ফেলে বড্ড দেরি হয়ে গেল যে!'

গাভীকুলের রাজা বললেন, 'বড় কৃতজ্ঞ হলাম, রিপ, রাতটা এখানেই কাটিয়ে ভোর নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে যেও।'

কিন্তু গিভেন্স শোনবার মানুষ নয়। সোজাই চলে যাবে শিবিরের দিকে। ভোর হলেই একপাল গরুকে যাত্রা করাতে হবে তাদের পথে। তাই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েই সে ঘোড়া দাবড়াল।

এক ঘন্টা বাদে, সব বাতি যখন নিভে গেছে, জোসেফা রাতের পোশাক পরে এল নিজের কামরার দরজায়। ইট-ছাওয়া হলকামরার পথ দিয়ে ওপাশের রাজার ঘরের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় বলল:

'শুনছ বাবা, ওই বুড়ো মেক্সিকান সিংহটাকে তো চেনো যাকে ওরা ডাকে

"কান-কোঁচকানো শয়তান" বলে ? আরে যেটা মার্টিনদের ভেড়া চালক গঞ্জালেস্‌কে মেরেছিল, আর সালাডো রেঞ্জের প্রায় পঞ্চাশটা বাছুর ? আমি তার দফা নিকেশ করে দিয়েছি আজ বিকেলে, সাদা ঘোড়া মোড়ের কাছে। আমার ·৩৮-বোরটা থেকে দুটো বুলেট ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিলাম। ছেঁড়া বাঁ-কানটা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম, বুড়ো গঞ্জালেস তো ওটাই ভোজালি দিয়ে কেটে দিয়েছিল। বাবা, তুমিও কিন্তু অত ভাল একটা শিকার করতে পারতে না।'

রাজকীয় শয়নকক্ষের অন্ধকার থেকে 'মিনমিনে' বেন গর্জে উঠলেন—'আচ্ছা ডানপিটে মেয়ে তো!'

বুনো রাজ্যের বড়দিন

গোলমালের মূল কারণটা তৈরি হতে লেগেছিল কুড়ি বছর। কুড়ি বছর বাদে তার প্রকৃত মূল্য বোঝা গেল।

'সানডাউন' র‍্যাঞ্চের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোথাও বাস করলেই আপনি জানতে পারতেন ব্যাপারটা। ব্যাপার আর কিছুই নয়—এক রাশ মেঘবরণ চুল, এক জোড়া অদ্ভুত সরল, ঘন-বাদামি চোখ, আর হাসি, যা গোপন স্রোতস্বতীর মতোই প্রেইরির বুকে তরঙ্গ তোলে। নামটি হল রোজিটা ম্যাক্‌মুলেন, সে 'সানডাউন' ভেড়ার খামার মালিক বুড়ো ম্যাকমুলেনের মেয়ে।

দু'জন কন্যা-প্রার্থী এসেছিল দুটি লালছে ছিটফোঁট ঘোড়ায় চেপে, একটু বিশদভাবে বর্ণনা দিলে—একজন চিত্রবিচিত্র বাদামি-নারঙ্গী, আরেকজন মাছি-পড়া বাদামি ঘোড়ায়। একজনের নাম ম্যাডিসন লেন। অন্য জন সেই নামজাদা 'ফ্রিও কিড'—অবশ্য সে-সময় তাকে কেউ 'ফ্রিও কিড' বলে ডাকতো না, কারণ এ বিশেষ আখ্যার সম্মান সে তখনো অর্জন করেনি। তার নাম ছিল তখন স্রেফ জনি ম্যাক্‌রয়।

অবশ্য এটা ধরে নেয়া ঠিক হবে না মনোরমা রোজিটার একুনে এই দু'জনই মাত্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সানডাউন র‍্যাঞ্চের ঘোড়া-বাঁধা খুঁটোয় আরো ডজন খানেক ছোকরার ব্রঙ্কো-ঘোড়া নিয়মিত লাগাম-কাঠি চিবুতো। ড্যান ম্যাকমুলেনের ভেড়ারা ছাড়াও আরো অনেকেই ভেড়া-চোখ করে তাকিয়ে থাকত ওই সাভানা-খামারটির দিকে। কিন্তু অন্য ঘোড়ওয়ারীদের হারিয়ে ম্যাডিসন লেন আর জনি ম্যাক্‌রয়ই এগিয়ে গেল সবার আগে। তাই তাদের নাম আসে তালিকার শীর্ষে।

অবশেষে ঘোড়দৌড়ে জিত হল ম্যাডিসন লেনের। সে নিউসেস্‌ জেলার এক যুবক খামার-মালিক। এক ক্রিস্‌মাসের দিনে রোজিটার সঙ্গে বিয়ে হল তার। গোপালক আর মেষপালকেরা হাতিয়ারবন্দ্‌, উল্লসিত, উচ্চকণ্ঠ, আর উদাত্ত হয়ে

দল বেঁধে যোগ দিল বিবাহ উপলক্ষে উৎসবে—তারা এ জন্য নিজেদের বংশ-বংশের ঘৃণা দ্বেষও বর্জন করেছিল সেদিন।

সানডাউন র‍্যাঞ্চ সেদিন ঝংকৃত, হাসিতামাশা আর ছ'ঘরা পিস্তলের বিস্ফোরণ-নাদে। বেল্ট-বগলেশের ঝলক আর চোখের চমক, গরুপালের রক্ষকদের উচ্চকণ্ঠ অভিনন্দনে।

কিন্তু বিবাহের ভোজ যখন চূড়ান্ত প্রাণবন্ত পর্যায়ে,সেই সময় সেখানে আবির্ভাব হল জনি ম্যাক্রয়ের। সে যেন ভূতাবিষ্টের মতো, ঈর্ষার দংশনে আক্রান্ত।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতের মধ্যে .৪৫ বোরের পিস্তল নেড়ে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'আমি তোমাদের একটা বড়দিনের উপহার দিচ্ছি!' তখনই বিনা বাছবিচারে গুলি চালাবার খ্যাতি সে খানিকটা অর্জন করেছিল।

ওর প্রথম বুলেটটা ম্যাডিসন লেনের ডান কানের লতিটা পরিষ্কার উড়িয়ে দিয়েছে। ওর বন্দুকের নলচেটা এক ইঞ্চি সরে গেল। পরের গুলিটা নিশ্চয়ই আঘাত করত কন্যাটিকে—যদি না কারসন নামে এক ভেড়াপালক নিজের মগজটা ভাল মতো উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে মজবুত রাখত সে-সময়। বিয়ের দলবল তো তাদের বন্দুক-পিস্তলগুলো হয় কোমরবন্দের মধ্যে, নয়তো দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল টেবিলে খেতে বসার সময়, তাদের সুরুচির পরিচয় দেবার জন্য। কিন্তু কারসন দারুণ তৎপরতার সঙ্গে তার হরিণমাংসের রোস্ট্ আর শিমের থালাটা তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে দিয়েছে ম্যাকরয়ের দিকে, ফলে ম্যাক্রয়ের তাক্ই ফস্কে গেল। ওর দ্বিতীয় বুলেটটা শুধু রোজিটার মাথার দু'ফুট ওপরে ঝোলানো স্প্যানিশ-ড্যাগার ফুলের সাদা স্তবকটাই নষ্ট করে দিল।

অতিথিরা তাদের চেয়ার ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল যার-যার বন্দুকের খোঁজে। বিয়ের অনুষ্ঠানের বর-কনের দিকে গুলি ছোঁড়াকে গর্হিত কাজ বলে মনে করা হত। প্রায় ছ'সেকেণ্ডের মধ্যে গোটা কুড়ি বুলেট ছুটল ম্যাকরয়কে লক্ষ্য করে।

জনি চেঁচিয়ে উঠল, 'এর পরের বারে আরো ভাল করে গুলি চালাব আর পরের বারটা তো আসছেই!' দরজার দিকে পেছিয়ে সে দ্রুতবেগে ছুটে পালাল। মেষপালক কারসন তার প্লেট ছোঁড়ার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরেকটু কেরামতি দেখাবার চেষ্টায় সবার আগে গিয়ে পড়ল দরজার কাছে। অন্ধকার থেকে ম্যাকরয়ের বুলেট এসে তাকে ধরাশায়ী করল।

পশুপালকরা এবার যেন ছোঁ মেরে পড়ল, প্রতিশোধ নিতে হবে বলে চেঁচাতে থাকল—কারণ একজন ভেড়াপালক খুন হয়ে গেলে সবসময়েই যে প্রায়শ্চিত্তের অভাব হয়, তা নয়—এ পরিস্থিতিতে খুনটা নিশ্চিত অসভ্যতা। কারসন নির্দোষ ব্যক্তি; বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনে তার কোনো হাত ছিল না, কেউ কখনো শোনেওনি সে তামাশা করে অতিথিদের বলেছে, যেমন বলা হয়—'বছরে একবারই তো বড়দিন আসে।'

কিন্তু ধাবনকারীদের দল ব্যর্থ হল প্রতিশোধ গ্রহণে। ম্যাকরয় তার ঘোড়ায় চেপে ছুটে পালিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে গালাগাল করেছে, শাসিয়েছে, তারপর অদৃশ্য হয়েছে বনের মধ্যে—যেখানে ওর লুকোবার সুবিধা।

সেই রাতেই জন্ম হল 'ফ্রিও কিডের'। রাজ্যের ওই অংশটাতে তার নাম হয়ে গেল "বদ লোক" বলে। তার বিবাহ-প্রস্তাব মিস্ ম্যাকমুলেন প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই সে হয়ে দাঁড়াল একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। পুলিশ অফিসাররা কারসনের হত্যাকারী হিসেবে তাকে পেছু তাড়া করে গেলে, দু'জন অফিসারকে সে খুন করে বসল, আর তার ফলে শুরু হল তার ফেরারি দস্যু জীবন। দু'হাতেই গুলি চালাতে অদ্ভুত ওস্তাদ হয়ে উঠেছে সে। হঠাৎ এক্কেকটা শহরে বা কলোনিতে তার আবির্ভাব হয়। সামান্য ছুতো পেলেই কারো সঙ্গে সে ঝগড়া বাধায়, লোকটিকে সাবাড় করে দেয়, আর উপহাস করে আইনের রক্ষক অফিসারদের। এমন ঠাণ্ডা-মস্তিষ্ক, এমন ভয়ংকর, এমন ক্ষিপ্র আর অমানুষিক রক্তপিপাসু সে, যে তাকে ধরতে শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে কিছু ক্ষীণ তৎপরতাই দেখানো সম্ভব হয়। অবশেষে সে যখন গুলি খেয়ে মরল একটি বেঁটেখাটো একহাত-নুলো মেক্সিকানের হাতে (যে নিজেই প্রায় ভয়ে মরবার মতো হয়েছিল)—তখন ফ্রিও কিডের মাথার ওপর ঝুলছিল আঠারোটি খুনের মামলা। এর মধ্যে অর্ধেকই মরেছিল ন্যায়সংগত দ্বৈরথ যুদ্ধে— অর্থাৎ কে-কতো তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করে গুলি চালাতে পারে তার ভিত্তিতে। আর অন্য অর্ধাংশকে সে খুন করেছিল স্রেফ উচ্ছৃঙ্খলতা আর নিষ্ঠুরতার বশে।

ওর ঔদ্ধত্য আর বেপরোয়া সাহস নিয়ে অনেক গল্পই চালু আছে সীমান্তবরাবর এলাকায়। কিন্তু অন্য অনেক দুর্বৃত্তের বেলায় মাঝেমধ্যে যে উদারতা, এমন-কি কোমলতারও সন্ধান মেলে, তা ওর মধ্যে আদপেই ছিল না। নিজের ক্রোধের পাত্রের ওপর সে নাকি কোনো দয়া দেখায়নি কোনোকালেও। তা সত্ত্বেও, এ ক্রিস্‌মাস উৎসবে অথবা প্রতিটি ক্রিসমাস পরবেই, কারো যদি সামান্য গুণও আছে বলে জানা যায়, তাহলে তার তারিফ করাই উচিত—যদি সেটা সম্ভবপর হয়। ফ্রিও কিড যদি কখনো নিজের হৃদয়ে উদারতার স্পন্দন অনুভব করে থাকে, অথবা তেমনি দয়ার কাজ করেও থাকে, তা ঘটেছিল এমনই একটি দিনে। একই পরবের সময়—আর তা ঘটেছিল এই ভাবে :

প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থতার তিক্ততা নিয়ে কারুর একেবারেই উচিত নয় 'রাটামা' গাছের ফুলের গন্ধ শোঁকা। স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তুলে তা বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

এক ডিসেম্বর মাসে সেবার ফ্রিও অঞ্চলের কোনো রাটামা গাছে ফুটেছিল বিস্তর ফুল, কারণ শীতকালটা সেবার যেন বসন্তকালের মতোই গরম। ওই রাস্তা

ধরে ঘোড়ায় চেপে চলেছিল ফ্রিও কিড আর তার সহচর, খুনের দোসর মেক্সিকান ফ্র্যাঙ্ক। কিড তার মাস্টাং ঘোড়ার লাগাম টেনে, গুম হয়ে কিছু ভাবতে-ভাবতে, বসেই রইল জিনের ওপর, ভুরু দুটো তার ভয়ানক কোঁচকানো। ওর বরফঠাণ্ডা লৌহবর্মের নিচেই কোথাও তাকে স্পর্শ করেছে একটা ঘন, মিষ্টি সুগন্ধ।

চিরাচরিত মৃদু টানা স্বরে সে মন্তব্য করে, 'মেক্স, কিসের কথা যে ভাবছিলাম জানি না। একটা ক্রিসমাসের উপহার, যা আমার দেবার কথা, সেটা বেমালুম ভুলেই গেলাম? কাল রাতেই যাব ঘোড়ায় চেপে, ম্যাডিসন লেনকে তার নিজের বাড়িতেই খুন করব। সে তো আমারই প্রিয়পাত্রীকে দখল করেছে—সে যদি মাঝখানে বাগড়া না দিত তা'হলে রোজিটা আমাকেই গ্রহণ করত। এতদিন সব ভুলে থাকলাম কী করে তাই তো অবাক হয়ে ভাবছি।'

মেক্সিকান বললে, 'আঃ ছাড়ো তো কিড! বোকার মতো কথা বোলো না। তুমি নিজেই জানো ম্যাড লেনের বাড়ির এক মাইলের মধ্যেও যেতে পারবে না কাল রাতে। পরশুদিন বুড়ো এ্যালেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল ম্যাড নাকি এবার বাড়িতেই ক্রিসমাসের হুল্লোড় করছে। ম্যাডের বিয়ের উৎসবটা তুমি কীভাবে পন্ড করেছিলে আর কী বলে শাসিয়েছিলে, তা তো তোমার মনে আছে। তুমি কি মনে কর ম্যাড লেন তার চোখ খোলা রাখবে না—কোনো 'মিস্টার কিডের' জন্য? এসব আজেবাজে কথা বলে তুমি আমায় কিন্তু বিলকুল হয়রান করছ কিড।'

একটুও গরম না দেখিয়ে ফ্রিও কিড আবার বলল, 'আমি যাচ্ছি, ম্যাডিসন লেনের ক্রিসমাসের মোচ্ছবে, তাকে খুন করব। অনেক আগেই এটা আমার করার কথা। আরে মেক্স, জানো না, দু'হপ্তা আগেও আমি স্বপ্ন দেখেছি—রোজিটা তাকে বিয়ে না করে যেন আমাকেই বিয়ে করেছে, আর আমরা দু'জন একটা বাড়িতে বাস করছি আর সে যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে—আঃ কী জ্বালা! আর সেই কিনা পেল রোজিটাকে! লোকটাকে আমি সাবাড় করব—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ক্রিস্‌মাসের আগের রাতে সে দখল করেছিল রোজিটাকে, আর আমিও একই দিনে তাকে খতম করব।'

মেক্সিকান বুদ্ধি দিল, 'আত্মহত্যার অন্য অনেক উপায় আছে কিড, তুমি বরং গিয়ে শেরিফের কাছেই নিজেকে সঁপে দাও না কেন?'

'খুন তাকে করবই।' সাফ জানাল কিড।

এপ্রিলের মতোই উষ্ণ এবারের ক্রিস্‌মাস-পর্ব রাতটা। হয়তো বা দূর-থেকে আসা কোনো তুষারপাতের ইঙ্গিতও ছিল বাতাসে, কিন্তু সেটা সোয়াদ জাগায় লিমনেড জলের—খানিকটা বিলম্বিত প্রেইরি ফুলের হাল্‌কা সুবাস, আর মেস্কিট ঘাসের।

রাত নেমে আসার সঙ্গে র‍্যাঞ্চ-বাড়ির পাঁচ-ছ'খানা ঘরে উজ্জ্বল আলো দেখা

দেয়। একটি কামরায় রাখা হয়েছে ক্রিস্‌মাস-গাছ, কারণ লেনদের একটি তিনবছরের ছেলে আছে, আর কাছাকাছি র‍্যাঞ্চ-বাড়িগুলো থেকেও ডজনখানেক বা তারো বেশি অতিথি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাত আঁধার হতে ম্যাডিসন লেন জিম বেলচারকে এবং তার খামারের আরো তিনজন কাউবয়কে ডেকে নিল একপাশে। বলল, 'এবার দেখ ভাই, চোখের নজর পুরো খোলা রাখতে হবে। বাড়ির চারপাশে টহল দেবে, আর রাস্তাটার দিকে লক্ষ্য রাখবে। তোমরা তো সবাই চেনো 'ফ্রিও কিড'কে, ওই নামেই তার পরিচয় এখন,—তাকে দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়বে—কোনো প্রশ্ন করা নয়। তার ফিরে আসার ভয় আমি করি না, কিন্তু রোজিটা ভয় পায়। বিয়ের পর থেকে প্রত্যেক ক্রিস্‌মাসেই তার ভয় এই বুঝি সে এল।'

অতিথিরা খোলা ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়ায় চেপে এসেছে, সবাই ভেতরে গিয়ে আরাম করে বসছে।

সন্ধ্যারাতটা তো আনন্দেই কেটে গেল। রোজিটার চমৎকার ভোজন-পরিবেশন অতিথিরা খুবই উপভোগ করল ও তারিফও জানাল। পরে তারা দল বেঁধে একেকটা কামরার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, অথবা চওড়া "গ্যালারি" বারান্দায় বসে ধূমপান আর গল্পগাছা শুরু করে দিল।

ক্রিস্‌মাস্ গাছটা অবশ্য বাচ্চাদের খুবই খুশি করেছে। আরো খুশি হয় তারা যখন সাণ্টা ক্লস্ (বড়দিনের বুড়ো) স্বয়ং জাঁকাল সাদা দাড়ি আর জোব্বা পড়ে আবির্ভূত হয়, আর তাদের খেলনা বিতরণ করতে থাকে।

ছ'বছরের খোকা বিলি স্যাম্প্‌সন ঘোষণা করে, 'আরে এ তো আমার বাবা। আগে তাকে দেখেছি এগুলো পরতে।'

বার্কলি নামে এক ভেড়া-রক্ষক লেনের খুব পুরনো বন্ধু; সে বসে ধূমপান করছিল বারান্দায়। রোজিটা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে ওকে দাঁড় করাল। বলল, 'ইয়ে, মিসেস্ লেন, আশা করি এই ক্রিসমাসে আপনি ওই ম্যাক্‌রয় লোকটাকে ভুলে গেছেন, মানে যে লোকটাকে আপনি ভয় পেতেন? ম্যাডিসন আর আমি তাকে নিয়ে কথা বলছিলাম, বুঝেছেন।'

রোজিটা হেসে বললে, 'সে প্রায় ভুলেই গিয়েছি, কিন্তু এখনো একেকসময় ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেই ভয়ংকর মুহূর্তটা কখনো ভুলতে পারি না যখন সে আমাদের দুজনকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।'

বার্কলি বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে হৃদয়হীন দুরাত্মা সে। সীমান্ত বরাবর সমস্ত নাগরিকেরই উচিত তাকে খুঁজে বের করা, নেকড়ের মতো শিকার করে মারা।'

রোজিটা বলল, 'বড় জঘন্য সব অপরাধ করেছে সে। কিন্তু—আমি ঠিক বুঝি না—মনে হয় প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু ভাল কোথাও নিশ্চয়ই আছে। সে তো সব সময় খারাপ ছিল না—সেটা আমি জানি।'

রোজিটা কামরাগুলোর ভেতর দিয়ে হলঘরে চলে গেল। ছদ্ম দাড়িগোঁপ জোব্বা পরা সান্টা ক্লস্ও তখন সবে বেরিয়ে আসছে।

'আমি জানলা দিয়ে শুনলাম, মিসেস লেন, আপনি যা বললেন,' বলল সে, 'আমি আপনার স্বামীর জন্য একটা ক্রিসমাস উপহার পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার বদলে একটা রেখে গেলাম আপনারই জন্য। আপনার ডানদিকের ঘরে সেটা রয়েছে।'

রোজিটা উচ্ছল হয়ে বললে, 'ওঃ ধন্যবাদ, দয়ালু সান্টা ক্লস্!'

রোজিটা কামরাটার ভেতর ঢুকল, আর সান্টা ক্লস্ও পা ফেলল আঙিনার ঠান্ডা হাওয়ায়।

কামরার মধ্যে ম্যাডিসন ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পায় না রোজিটা। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে আমার জন্য যে উপহারটা রেখে গেছে বলল সান্টা ক্লস্, সেটা কোথায়?' ওর স্বামী হাসতে হাসতে বলে, 'উপহারের মতো কিছুই তো দেখলাম না এখানে—যদি না সে উপহার বলতে আমাকেই বুঝিয়ে থাকে!'

* * *

পরদিন এক্স্ ও র‍্যাঞ্চের প্রধান কর্মী গ্যাব্রিয়েল র‍্যাড হঠাৎ এসে ঢোকে লোমা আল্টার ডাকঘরে।

'যাক্, শেষ অবধি ফ্রিও কিডের কপালে জুটল তামার বুলেটের দাওয়াইটা!' পোস্টমাস্টারকে খবর দেয় সে।

'তাই নাকি? কী করে ঘটল ব্যাপারটা?'

'বুড়ো স্যানচেজের মেক্সিকান ভেড়া-রক্ষকদেরই কেউ করেছে কাজটা— ভাবুন দেখি! শেষে একটা ভেড়া-রক্ষকের হাতে খুন হল ফ্রিও কিড! গত রাতে, বারোটা নাগাদ, মেক্সিকান লোকটা তাকে শিবিরের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেতে দেখে, তখন সে এমন ভয় পেয়ে যায় যে উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে সিধেই গুলি চালিয়ে তাকে খতম করে দেয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল কিড তখন পুরোদস্তুর সাদা গোঁপদাড়ি, আর আপাদমস্তক সান্টি ক্লসের পোশাক পরা। ভাবুন তো, 'ফ্রিও কিড' খেলছিল স্যান্টি বুড়োর ভূমিকায়!'

"A Chaparral Christmas Gift", *এইন্সলি'জ্*, ১৯০৩

পিমিয়েণ্টার আশুকে-পিঠে

ফ্রিও এলাকার নিচুজমিতে একপাল গরু ঘেরাও করতে গিয়ে আমার হল বিপত্তি—মরা মেস্কিট ঘাসের বিক্ষিপ্ত ডগায় আমার কাঠের রেকাব বেধে এমনই মোচড় খেয়ে পড়লাম যার ফলে এক সপ্তাহ পড়ে থাকতে হল শিবিরে।

আমার এই জোর-করে চাপানো কুড়েমির মধ্যেই তৃতীয় দিনে কোনোক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছোলাম খাবার-গাড়িটার কাছে। অসহায়ের মতো চিৎ হয়ে পড়ে শুনতে হল জাডসন ওডোমের বাক্যবাণগুলো। জাডসন ক্যাম্পের বাবুর্চি। সে স্বভাবগতভাবে স্বগতোক্তি পরায়ণ, কারণ নিয়তি তাকে স্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্তিবশে বসিয়ে দিয়েছে এমন এক পেশায়, যেখানে সে বেশির ভাগ সময়ই শ্রোতা-বঞ্চিত।

জাডের কঠিন নীরব মরুভূমিতে আমি তাই অমৃত স্বরূপ।

মাঝে-মাঝেই আমার আক্ষেপময় বাসনা জাগে কিছু খেতে, যা মোটা 'ডাল রুটির' পর্যায়ে পড়ে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের রান্নাঘরটি—"প্রথম ভালবাসার মতো গভীর, আর নানা আপসোসে ভারাক্রান্ত," তাই একবার ওকে প্রশ্ন করে বসি: 'জাড, তুমি আশকে পিঠে বানাতে পার?'

জাড তার 'ছ' ঘরা'র মতো মুগুরখানা নামিয়ে রাখে—ওটা দিয়ে সে এ্যান্টিলোপ হরিণের মাংস ঠাসতে যাচ্ছিল। সোজা আমার ওপর এসে দাঁড়ায় শাসানির ভঙ্গি নিয়ে—আমি তো সেরকমই বুঝলাম। আমার সেই অনুভূতি আরো বাড়ে ওর আপত্তিকর মারমুখো দৃষ্টি দেখে। একটা শীতল সন্দেহভরে ওর ফ্যাকাশে নীল চোখদুটো আমার ওপর স্থিরনিবদ্ধ। কথায় বাড়াবাড়ি রকম তিক্ততা না থাকলেও খোলাখুলিই বলে সে, 'বল তো তুমি, ওটা সিধেসিধি জানতে চেয়েছ, না কোনো ছিঁচকে টোপ ফেলবার মতলবে? কোনো ছোকরা বুঝি আমাকে আর আশকেপিঠে নিয়ে কিছু গপ্পো করেছে তোমার কাছে?'

আমি আন্তরিক ভাবে বলি, 'না, জাড, আমি জানবার জন্যই বলেছি। আমার মনের অবস্থা এখন এমন যে একপ্রস্থ মাখন-মাখা বাদামি আশকে পিঠে—নিউ অর্লিন্সের পয়লা আখের রসে ডোবানো—পেলে আমার ঘোড়া আর জিনসাজও দিয়ে দিতে পারি তার বদলে। কেন, আশকে পিঠে নিয়ে কোনো গল্প ছিল নাকি?'

জাড যখন দেখল আমি কোনো পরোক্ষ উল্লেখের ধার দিয়েও যাচ্ছি না, তখন সে একটু নরম হল। খাবারের গাড়িতে গিয়ে কিছু রহস্যময় থলে আর টিনের কৌটো নিয়ে এসে সাজাল হ্যাকবেরি গাছটার ছায়ায়, যেখানে আমি শুয়ে রয়েছি। আমি তাকে লক্ষ্য করে যাই, ধীরেসুস্থে জিনিসগুলো গোছাচ্ছে আর কতো রকমের দড়ি, সুতো খুলছে।

কাজের ফাঁকেই জাড বলল, 'না, গল্প নয় সেটা। তবে আমার সঙ্গে ওই 'মায়ার্ড-মিউল-কানাডার' গোলাপি-চোখো কুড়ে লোকটা, আর মিস্‌ উইলেলা লেরাইটের মধ্যে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তারই স্বাভাবিক যুক্তিসহ পরিণতি বলা যায় সেটাকে। আমার আপত্তি নেই তোমাকে বলতে।

'সান মিগুয়েলে তখন আমি বুড়ো বিলি টুমে'র হয়ে গরু দাগানোর কাজ করছি। একদিন আমার ভীষণ ইচ্ছে হতে লাগল কিছু টিনের খাবার খাব—যার সঙ্গে কোনো গরুভেড়া শুয়োরের সম্পর্ক নেই, খুঁটে খাবার মাপেও নয়। তাই, নিজের ঘোড়ায় চেপে চলে গেলাম সোজা এম্‌স্‌লি টেলফেয়ার খুড়োর দোকানে—নিউসেসের পিমিয়েন্টা নদীর পারঘাটায়।

'বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ একটা মেস্কিট-ঝাড়ের ওপর লাগামছড়া ফেলে আমি কুড়ি গজ হেঁটে ঢুকে পড়লাম এম্‌স্‌লি খুড়োর দোকানে। কাউন্টারের সামনে চড়াও হয়ে খুড়োকে বললাম, পৃথিবীর যতো ফল-ফলার ধ্বংস করার সময় এসে গেছে, আর সবুর করা যায় না। এক মিনিটের মধ্যে হাতে এসে গেল ফল কাটার ছুরি, লম্বা-হাতল চামচের ব্যাগ, তারপর এক-এক করে এসে গেল এপ্রিকট, আনারস, চেরী আর সবুজ কুলের খোলা টিনগুলো। এমসলি খুড়ো দা' দিয়ে হলদে ঢাকনাগুলো কুপিয়ে খুলতে ব্যস্ত। আপেলের ভিড়ের সামনে নিজেকে আমার বাবা আদমের মতো লাগছিল। কাউন্টারের পাশে রেকাবের খোঁচা মেরে আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম চব্বিশ-ইঞ্চির চাম্‌চে, এমন সময় আমার নজর চলে গেল জানলার বাইরে এমস্‌লি খুড়োর বাড়ির ভেতরের আঙিনায়, সেটা দোকানঘরের ওপাশেই।

'একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে—সাজসজ্জায় সদ্য আমদানি মহিলার ছাপ—ক্রকেটের ব্যাট বল লোফালুফি করছে, আর মজা পাচ্ছে আমার টিন জাত ফলের ব্যবসা বাড়াবার উদ্যম দেখে।

'আমি কাউন্টার থেকে সড়াক করে নেমে কোদাল-চামচেটা গছিয়ে দিলাম খুড়োর হাতে।

'উনি বললেন, "ও তো আমার ভাইঝি মিস্‌ উইলেলা লেরাইট, প্যালেস্টাইন থেকে এসেছে বেড়াতে [ডালাসের কাছে, একটি শহর] তুমি চাও তো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'?"

"মনে-মনে বলি, পবিত্র ভূমি! চিন্তাগুলোকে এককোণে চাপতে গিয়ে এদিক-উদিক গরুর মতো ছুটে যায়। কিন্তু কেন নয়? দেবদূত তো সেখানেও আছে—এবার খোলা গলাতেই বলি—"ও হ্যাঁ এমস্‌লি খুড়ো, মিস্‌ লেরাইটের সঙ্গে আলাপ করে খুবই সুশিক্ষা পাব।"

'তাই এমস্‌লি খুড়ো আমায় নিয়ে গেলেন ভেতরের আঙিনায়, আর দুজনকে জানালেন পরস্পরের পরিচয়।

'মেয়েমানুষকে লজ্জা তো কোনো কালেও করিনি। আমি তো বুঝি না কেন

অনেক পুরুষ যারা প্রাতরাশের আগে বুনো ঘোড়াকে বশ মানায় আর অন্ধকারেই দাড়ি কামায়, তারা কেন ক্যালিকো পোশাক্ পরা কাউকে এক নজর দেখলেই অমন ঘেমে-নেয়ে ওঠে, নুলো ঠুঁটো হয়ে এটা-ওটা ওজর খোঁজে! আট মিনিটের মধ্যে আমি আর মিস্ উইলেলা ক্রকেট-বল ছুঁড়তে লাগলাম পরস্পরের তুতো-ভাইয়ের মতো, বন্ধুভাবে। সে আমায় ঠাট্টা করল গপ্‌গপ্ করে টিনের ফল খাচ্ছিলাম বলে, আর আমিও ওকে বলতে ছাড়লাম না কেমন করে ঈভ নাম্নী এক রমণী প্রথম মুক্ত-ঘাস চারণভূমিতে ফলের ঝামেলা শুরু করেছিল—'সে তো প্যালেস্টাইনেই, তাই না?" বলি আমি সহজেই, চট্‌পট্ যেন এক-বছুরে বাছুরের গলায় দড়ি পরাচ্ছি!

'এইভাবেই মিস্ উইলেলা লেরাইটের কাছাকাছি এসে একটা অন্তরঙ্গতা পেলাম; আর সেই মনোভাবটাই যেন দিনে-দিনে বেড়ে চলল। সে স্বাস্থ্যের কারণে বেড়াতে এসেছিল পিমিয়েন্টার ধারে, ওইখানেই রইল কিছুদিন। ওখানকার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, আর জল-হাওয়া তো প্যালেস্টাইনের চেয়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ গরম। আমি কিছুদিন অবধি ফি হপ্তায় একবার করে তাকে দেখতে যেতাম, তারপর হিসেব কষে দেখলাম যদি যাওয়ার পরিমাণ দু'গুণ বাড়াই, তাহলে দেখাও হবে দুবার করে বেশি।

'তৃতীয় যাত্রার বেলায় এক সপ্তাহ আমার ফস্‌কে গেল, আর সেইবারেই খেলাটা পণ্ড করে দিল সেই আশকে-পিঠে আর গোলাপি-চোখো কুঁড়েটা এর মধ্যে ভিড়ে।

'সেদিন বিকেলে যখন কাউন্টারে গিয়ে বসেছি মুখে একটা পীচফল আর দুটো কিশমিশ নিয়ে, এমস্‌লি খুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম মিস্ উইলেলা কেমন আছে।

'"কেন ও তো জ্যাকসন বার্ডের সঙ্গে গেছে ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে। ওই যে ভেড়া মালিক ছেলেটা 'মায়ার্ড-মিউল-কানাডার'।" বললেন খুড়ো।

'পীচফল আর কিশমিশের বিচিগুলো আমার গলায় ঢুকে গেল। মনে হয় কেউ যেন আমার অনুপস্থিতিতে কাউন্টারের লাগাম ধরেছিল। আমি বেরিয়ে পড়লাম। সোজা হেঁটে গেলাম যতোক্ষণ-না মেস্কিটঝাড়ে ঘষা খাই, সেখানেই আমার ঘোড়াটা বাঁধা।

'ঘোড়াটার কানে-কানে বলি, "ও তো ঘোড়া দাবড়াতে গেছে বার্ডস্টোন জ্যাকের সঙ্গে, আরে শীপ ম্যান'স কানাডার সেই ভাড়াকরা খচ্চরটার সঙ্গে! বুঝতে পেরেছিস কিছু, বুড়ো কদমচাল চামড়া?"

'আমার ব্রংক্ ঘোড়া শুধু কাঁদে, নিজের মতো করে। ওকে তো গরু-তাড়ানো ঘোড়া করে গড়া হয়েছে, ও কি বুঝবে কুঁড়ে ভেড়া-চরানো বান্দাকে?

'আমি ফিরে গিয়ে এমস্‌লি খুড়োকে বলি, "আপনি বললেন সে ভেড়ার মালিক?"

'খুড়ো আবার বললেন, "বললাম তো ভেড়ার মালিক। জ্যাকসন বার্ডের কথা

তো নিশ্চয়ই শুনেছ। তার আট বর্গমাইল চরানির জমি আর মেরুবৃত্তের দক্ষিণে সেরা কট্‌সওল্ডের ভেড়া চার হাজার।”

‘আমি বেরিয়ে গিয়ে দোকানের ছাঞ্চির নিচে মাটিতেই বসি, আর হেলান দিই একটা কাঁটা নাসপাতির গাছে। মনের অজান্তে হাত দিয়ে বালি তুলি নিজের বুটজুতোর মধ্যে আর নিজের মনেই বকি লোকটার ‘জ্যাকসন’-ঝুঁটিওয়ালা নামটা নিয়ে।

‘কখনো কোনো ভেড়াওয়ালার ক্ষতি করতে আমি চাইনি। একদিন একজনকে দেখেছিলাম ঘোড়ায় চড়ে ল্যাটিন ব্যাকরণ বই পড়তে, তাকে কখনো স্পর্শও করিনি! বেশিরভাগ গরুপালক যেমন করে, তেমন বিরক্ত ওরা কখনো করেনি আমায়। এখন তুমি তো আর কাজে যাচ্ছ না, আর কুড়ে কামচোট্টাদের খোঁচাচ্ছও না, নোকসানও করছ না, যেহেতু তারা টেবিলে বসে খায়, ছোট জুতো পরে আর নানা বিষয় নিয়ে তোমাকে বলে? ঠিক তোমার মতোই আমিও তাদের এড়িয়ে যাব মাঠের খরগোশের মতো; বড় জোর একটু মিষ্টি কথা, কিংবা আবহাওয়ার কথা, তাই বলে একসঙ্গে বসে রেস্তোরাঁ সাফ করা নয়। কোনো কুড়ে কামচোরের সঙ্গে শত্রুতা কিছু কাজের জিনিসই নয় আমার মতে। আর যেহেতু আমি উদারতা দেখিয়েছি, ওদের বেঁচে থাকতে বাধা দিইনি, তাই একজন এখন মিস লেরাইটের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারছে!

‘রোদ পড়ে যাবার এক ঘন্টার মধ্যেই দু’জন ফিরে এসে এম্‌স্‌লি খুড়োর ফটকের সামনে নামে। ভেড়ার লোকটা ওকে নামতে সাহায্য করে। দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খুব হাসি তামাশা আর বুদ্ধির কথা বলে দুজনে। তারপর এই পালকতোলা জ্যাকসনটি উড়ে বসে তার জিনের ওপর, ছোট্ট বয়ামের-ঢাকনি টুপিটা একটু তুলে দুলকি চালে ছুটে যায় তার মাটন খামারের দিকে। এতক্ষণে আমিও আমার বুট থেকে বালি ঝেড়ে কাঁটা-নাসপাতি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর যতোক্ষণে সে পিমিয়েন্টা ছেড়ে আধমাইল রাস্তা চলে যায়, আমি আমার ব্রংকে চড়ে ছুটে গিয়ে তার পাশ ধরি।

‘বলেছিলাম কুড়ের বাদশাটি গোলাপি-চোখো, কিন্তু তা নয়। ওর চোখের ব্যবস্থা যথেষ্টই ধূসর, কিন্তু চোখের পল্লব গোলাপি, আর মাথার চুল বেলে-রঙ—এতেই খানিকটা বুঝবে। ভেড়ার লোক? ভেড়ার বাচ্চার লোক বলতে পার কোনোক্রমে। ছোট্ট মানুষ, মাথাটা ডুবে আছে হলদে রেশমি রুমালের মধ্যে, আর জুতো ফাঁস-গিঁটে বাঁধা।

‘ওকে বললাম, “শুভ সন্ধ্যা! এখন এমন এক ঘোড়া-মালিকের সঙ্গে পথ চলছ যাকে সবাই ডাকে ‘মোক্ষম-ন্যায়বিচারী’ জাডসন বলে, কারণ আমার গুলি চালাবার রীতি। যখন কোনো অপরিচিত লোককে আমার পরিচয় দিতে চাই, তখন

পিস্তল বের করার আগেই নিজেকে হাজির করি, কারণ একটা ভুতের সঙ্গে হাত মেলানো আমার কোনোকালেও আসে না।"

'ছোকরা এমনিই বলে বসল, "আ-হা! আমি খুশি হলাম আপনাকে জানতে পেরে, মিঃ জাডসন! আমি হলাম মায়ার্ড-মিউল র‍্যাঞ্চের জ্যাকসন বার্ড।"

'ঠিক সেই সময় আমার একটা চোখ দেখল টিলা থেকে নেমে আসছে একটা তিতির, ঠোঁটে টারান্টুলা মাকড়শার বাচ্চা নিয়ে, আর আমার অন্য চোখটা দেখল জলা-এল্‌ম্‌ গাছের মরা ডালে বসে আছে একটা খরগোশ-ধরা চিল। আমি আমার ·৪৫ পিস্তলটা দিয়ে পর পর দুটোকেই সাবাড় করে দিলাম—স্রেফ ওকে দেখাবার জন্য। বললাম, "তিনটার মধ্যে দুটো গেল। যেখানেই যাই না কেন, 'বার্ড'গুলো আমার নজরে পড়ে যাবেই।"

'চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে জ্যাকসন বার্ড বলল, "চমৎকার গুলি চালান তো! তবে তিন-নম্বর গুলিটা অনেক সময় তাক ফস্‌কে যায় না আপনার? কী মনে হয় মিঃ জাডসন, গেল হপ্তা বড়ো সুন্দর বৃষ্টি হয়েছিল না? কচি ঘাসগুলোর পক্ষে?"

'ওর টাটুঘোড়াটার পাশে আমার ঘোড়া ঘেষিয়ে নিয়ে বললাম, "উইলি! তোমার মুগ্ধ বাপ-মা হয়তো জ্যাকসন নামটা দিয়ে তোমার বদনামই করেছে, তবে তুমি নিশ্চয়ই পালক খসিয়ে হয়ে গেছ একটা কিচমিচে উইলি—এখানেই ইতি করা যাক্‌ ওইসব বৃষ্টি আর আবহাওয়ার বিশ্লেষণ, এবার এসো কাজের কথায়, যা তোতাপাখিদের শব্দকোষে নেই। ওই একটা বদ-অভ্যাস তুমি পেয়েছ পিমিয়েন্টার যুবতি মহিলাদের সঙ্গে ঘোড়া দাবড়িয়ে। .... অনেক বার্ডই দেখেছি যাদের এর চেয়েও শস্তায় টোস্টের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। মিস্‌ উইলেলা নিশ্চয়ই বসে নেই কোনো টুনটুনি পাখি ভেড়ার লোম থেকে তার বাসা বুনে দেবে বলে—বিশেষ করে পক্ষীবিদ্যায় জ্যাকসনী বংশের কোনো পাখি? এখন বল, তুমি বিদায় হতে যাচ্ছ? না চাইছ এই মোক্ষম-ন্যায় বিচারীর সঙ্গে পাল্লা দিতে? যেমন আমার নাম তেমনি কাম।"

'জ্যাকসন বার্ড একটু রাঙা হয়ে উঠল, তারপরে হেসে ফেলে বলল, "আরে মিঃ জাডসন, আপনি ভুল ধারণা করেছেন। আমি মিস্‌ লেরাইটের সঙ্গে বার কয়েক দেখা করেছি বটে, তবে আপনি যা কল্পনা করেছেন সেরকম উদ্দেশ্যে নয়। আমার আগ্রহ নিতান্তই ভোজনরসিকতা সংক্রান্ত।"

'আমি আমার পিস্তলের দিকে হাত বাড়াই।

'বলি, "যে নোংরা শেয়াল কোনো অসম্মানের কথা উচ্চারণ—"

"দাঁড়ান এক মিনিট,' বললে বার্ড, "আমায় বুঝিয়ে বলতে দিন। একটা বউ নিয়ে আমি কী করব? আপনি যদি একবারটি আমার ওই খামার-বাড়ি দেখতেন!

নিজের রান্নাবান্না রিপু-সেলাইয়ের কাজ আমি নিজেই করি। ভেড়া পালন করে সবচেয়ে বড় আনন্দ যেটা আমি পাই তা হল—খাওয়ার আনন্দ। মিঃ জাডসন, আপনি কখনো মিস্ লেরাইটের হাতের আশকে-পিঠে চেখে দেখেছেন?"

'"আমি? না তো! আমি কখনো জানতেই পাইনি তার কোনো রান্নাবান্নার গুণ আছে!"

'সে বললে, "আরে, সেগুলো যেন সোনার রোদে গড়া, এপিকিউরাসের দিব্য আগুনে তপ্ত, মধু-বাদামি। আমি ওই আশকে পিঠের পাক-প্রণালী জানবার জন্য জীবনের দুটো বছর অনায়াসে দিয়ে দিতে পারি। ওই কারণেই তো মিস্ লেরাইটের কাছে যাই। কিন্তু এখন অবধি ওর মুখ থেকে বের করতে পারলাম না রান্নার নিয়মটা। এটা নাকি এক পুরনো প্রণালী, ওদের পরিবারের মধ্যে রয়েছে পঁচাত্তর বছর ধরে। ওরা বংশের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মকে দেবে, কিন্তু বাইরের কারুর কাছে কখনো হাতছাড়া করবে না। যদি ওই পাক-প্রণালী একবার জানতাম, তাহলে নিজের হাতে তৈরি করতাম র‍্যাঞ্চে বসে, আমার সুখেরও অবধি থাকত না।"

'আমি তাকে বলি, "তুমি কি বাছা নিশ্চিত যে আসলে তুমি ওই পিঠে-বানানো হাতটাকেই পাকড়াতে যাচ্ছ না?"

'"নিশ্চয়," বলে জ্যাকসন, "মিস্ লেরাইট দারুন ভালো মেয়ে, কিন্তু এটুকুও হলপ করে বলতে পারি আমার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়, স্রেফ ভোজন—" পিস্তলের খাপের দিকে আমার হাত নামতে দেখে সে উপমাটা বদলায়—"স্রেফ আশকে-পিঠে বানানোর নিয়মটার একটা নকল বাগানোর ইচ্ছে"—এভাবেই শেষ করে কথাটা।

'ন্যায়পরায়ণ হবার চেষ্টা করেই বলি, "তুমি খুব একটা খারাপ বেঁটেমানুষ নও। আমি তো ভেবেছিলাম তোমার কিছু ভেড়াকে অনাথ করে ছাড়ব, তবে এবারের মতো তোমায় ফুটে যেতে দিচ্ছি। কিন্তু হ্যাঁ, শুধু আশকে-পিঠে নিয়েই থেকো আগাগোড়া, আবার যেন নবম ভাবকে শরবত বলে ভুল কোর না, তাহলে তোমার খামারে উড়বে গানের কলি আর তুমি সেটা শুনবারও অবসর পাবে না।"

'"ভেড়া পালক বলল, "আমি যে খাঁটি মানুষ তার প্রমাণ দিতে আমি আপনার সাহায্য চাই। আপনি আর মিস্ লেরাইট তো আরো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, হয়তো উনি আমার জন্য যা করবেন না, তা আপনার খাতিরেই করবেন। আপনি যদি ওই আশকে পিঠের নিয়মের একটা কপি জোগাড় করে দিতে পারেন, তাহলে এ জন্মেও আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করব না, কথা দিতে পারি।"

'"এটা মন্দ কথা নয়," বলে আমি জ্যাকসন বার্ডের করমর্দন করি, "আমি ওটা সম্ভব হলে তোমাকে জোগাড় করে দেব, খুশি হয়েই করব।" তারপর সে

পিয়েদ্রার বিশাল নাসপাতি জমির কাছে মোড় ঘুরে চলে গেল মায়ার্ড-মিউলের দিকে; আমিও ঘোড়া ছোটালাম উত্তরপশ্চিমে বুড়ো বিল টুমি'র খামারের দিকে।

'পাঁচ দিন পর আবার আমার সুযোগ হল পিমিয়েন্টার দিকে যাবার। এমস্‌লি খুড়োর ওখানে বসে বেশ কাটল চমৎকার সন্ধ্যাটা—মিস উইলেলা আর আমার মধ্যে। সে একটু গান গাইল, পিয়ানোর ওপর অনেক কসরত করল সেরা অপেরার উধৃতিগুলো বাজিয়ে। আমি দেখালাম র‍্যাটেলসাপের নকল-নাচ, বললাম স্নেকি ম্যাক্‌ফি'র নতুন পদ্ধতিতে ছাগল ছাড়াবার কায়দা, বর্ণনা দিলাম একবার আমি কীভাবে সেন্ট্ লুইস্ ভ্রমণ করেছিলাম। মোটের ওপর পরস্পরের কাছে আমাদের মূল্য যেন অনেকটাই বেড়ে গেল। ভাবলাম এবার যদি জ্যাকসন বার্ডটাকে কায়দা করে সরাতে পারি তাহলেই আমার বাজিমাত। আশকে-পিঠের প্রণালীটা জোগাড় করলে সে যা কথা দিয়েছে তা মনে পড়ল। তাই ভাবলাম এবার মিস্ উইলেলাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেটা বের করে ওকে দিয়ে দেব। এর পরও যদি বার্ডিকে মায়ার্ড-মিউলের বাইরে ধরি, তাহলে তাকে গাছের মগডালে চড়তে হবে।

'তাই তার প্রায় দশটা নাগাদ আমি একটা মনগলানো হাসি দিয়ে মিস্ উইলেলাকে বললাম, "এবার বলি,—সবুজ ঘাসের ওপর একটা লাল বলদের দৃশ্যের চেয়েও আমি বেশি পছন্দ করি যেটা, তা হল চমৎকার গরমাগরম, আখের গুড়ে রসানো আশকে পিঠের সোয়াদ।"

'মিস্ উইলেলা পিয়ানো টুলের ওপর সামান্য ভড়কে উঠে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

'বলল, "হ্যাঁ, ওগুলো সত্যি চমৎকার। কী যেন রাস্তাটার নাম বললেন, মিঃ ওডোম, সেন্ট লুইসের যেখানে আপনি টুপিখানা খুইয়েছিলেন?

'চোখ টিপে বললাম, "আশকে-পিঠে এ্যাভিন্যু,"—অর্থাৎ তাকে দেখাতে চাইলাম ওদের পারিবারিক রন্ধন-প্রণালীটার পেছনে আমি লেগেই রয়েছি, অত সহজে আমাকে বিষয়টা থেকে সরানো যাচ্ছে না—'এবার বল মিস্ উইলেলা, শোনা যাক্ কেমন করে ওটা তোমরা বানাও। গাড়ির চাকার মতো আমার মাথার মধ্যে এখন আশাকে পিঠেই ঘুরছে। এবার চালু করে দাও—এত পাউণ্ড ময়দা, আট ডজন ডিম, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন করে ফর্দের ফিরিস্তি চলে?"

'মিস্ উইলেলা আমার দিকে, যাকে বলে, চকিত অপাঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে বললে, "এক সেকেণ্ড আমার মাফ করবেন প্লীজ"—বলে সে টুল থেকে নেমে গেল। চলে গেল পাশের কামরাটায় আর সঙ্গেসঙ্গেই বেরিয়ে এলেন এমস্‌লি খুড়ো, শুধু শার্ট গায়ে, হাতে একটা জলের কুঁজো। তিনি একটা গ্লাস টেবিলে রাখবার জন্য ঘুরতেই দেখতে পেলাম তাঁর পেছন-পকেটের ওপর একটা ·৪৫ পিস্তল। ভাবলাম, ওরে বাবা! এ পরিবারটা দেখছি রন্ধন-প্রণালীর অনেক মূল্য দেয়,

প্রয়োজনে বন্দুক দিয়েও রক্ষা করে। আমি তো বহু পরিবারকে জানি যারা বংশগত প্রতিশোধের জন্যও এতটা করে না।'

'এমস্‌লি খুড়ো বললেন, "এই জলটা খেয়ে নাও,"—গ্লাস তুলে দেন আমার হাতে—"বড়ো বেশি ঘোড়া দাবড়েছ আজ, জাড,—একটু যেন বেশি উত্তেজিত। এখন অন্যকিছু ভাবার চেষ্টা কর দেখি!"

'প্রশ্ন করলাম. "এমস্‌লি খুড়ো, আপনি জানেন আশ্‌কে পিঠে কীভাবে বানাতে হয়?"

'"আমি বাবা অন্যদের মতো অতো ভাল করে নিয়ম-টিয়ম জানি না, তবে বোধহয় ওতে এক ঝাড়ি প্লাস্টার অব-প্যারিস লাগে, তাতে কিছু ময়দার কাঁই, সোড়া, ভুট্টা। মেশাতে হয় ডিম আর মাখনের সঙ্গে, যেমন মেশায় আর কি! বুড়ো বিল কি এবারও কানসাস-সিটিতে বীফ পাঠাতে যাচ্ছে নাকি?"

'সে রাতে আশকে পিঠের ব্যাপারে অতোটাই জ্ঞান অর্জন করলাম। সন্দেহ নেই জ্যাকসন বার্ডকেও বড় কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাই ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আমি খানিকক্ষণ খুড়োর সঙ্গে নিচু শিঙের গাই আর সাইক্লোন নিয়ে কথা বলি। অবশেষে মিস্ উইলেলা এসে 'শুভরাত্রি' জানালে, রওনা হই র‍্যাঞ্চের খোলা হাওয়ার পথে।

'এক হপ্তা বাদে ফের দেখা হল জ্যাকসন বার্ডের সঙ্গে—সেও পিমিয়েন্টা থেকে বেরিয়ে আসছে আর আমিও সেখানে যাচ্ছি। রাস্তার ওপর থেমে আমরা কিছু হাল্‌কা ঠাট্টাতামাশা করি।

'জিজ্ঞেস করলাম, "আশকে পিঠে বানাবার পদ্ধতি এখনো কিছু জানতে পারনি?"

'"আরে, জানলাম আর কোথায়।" বললে জ্যাকসন, "আমি তো সেদিকে কোনো সুবিধাই করতে পারছি না মনে হয়। আপনি চেষ্টা করেছিলেন?"

'বললাম, "তা তো করেছি। সে যেন বাদামের খোসা দেখিয়ে প্রেইরির কুকুরকে গর্ত থেকে বের করা! ওই আশকেপিঠের প্রণালীটা বোধ হয় কোনো মজার কল হবে,—যেভাবে ওরা সেটাকে আটকে রাখতে চায়।"

"আমি তো এবার হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত," এমনভাবে স্খলিত উচ্চারণে বললে কথাটা যে জ্যাকসনের জন্য আমার কষ্ট হতে লাগল—"কিন্তু সত্যিই চেয়েছিলাম কেমন করে ও-পিঠে বানাতে হয় জেনে রাখি, একা র‍্যাঞ্চে বসে খাব বলে", বললে সে, "একেক রাত জেগেই কাটাই ওগুলোর অপূর্ব স্বাদের কথা ভেবে।"

'আমি বলি, "তুমি চেষ্টা করে যাও, আর আমিও তাই করব। একজন না-একজন দড়ির ফাঁস ফেলবই ও গরুর শিঙে, দেরি হবে না। আচ্ছা জ্যাকি, এবার বিদায় হই!"

'বুঝলে ভাই, এতদিন আমরা দুজন দারুন শান্তির সম্পর্কের মধ্যেই আছি। যখন দেখলাম মিস উইলেলার দিকে সত্যিই ওর টান নেই, তখন থেকে ওই

বেলে-রঙের চুলওয়ালা কুড়েটার ওপর বড় মায়া পড়ে গেল। ওর ভোজনপ্রিয়তার উচ্চাশায় সাহায্য করতে আমি মিস্ উইলেলার কাছ থেকে প্রণালীটা বাগাবার চেষ্টা চালিয়ে যাই। কিন্তু যতোবারই "আশকে পিঠে" নামটা উল্লেখ করি সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ চলে যায় কোন্ সুদূরে, উশ্‌খুশ করে প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করে। তবু যদি ওকে ওই ব্যাপারেই আটকে রাখি তা'হলে বেরিয়ে গিয়ে সে এমস্‌লি খুড়োকে ধরে আনে জলের কুঁজো আর পেছন পকেটের 'হাউইটজার', সমেত।

'একদিন সুন্দর একগুচ্ছ নীল ভারবেনা ফুল নিয়ে কদমচালে ছুটে যাই দোকানবাড়িতে—"পায়জন্‌ড্-ডগ" প্রেইরির বুনো ফুলবাগান থেকে আমার নিজের হাতে তোলা। এমস্‌লি খুড়ো এক চোখ বুজে ওগুলো দেখে বললেন:

"খবরটা শোনোনি বুঝি তুমি?"

'আমি জিজ্ঞেস করি, "গরু চুরি গেছে?"

'উনি বললেন, "উইলেলা আর জ্যাকসন বার্ডের বিয়ে হয়ে গেল কাল, প্যালেস্টাইনে। এই তো সকালে চিঠি পেলাম একখানা।"

'একটা বিস্কুটের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিলাম ফুলগুলো। খবরটাকে যেতে দিলাম আমার কানে, তারপর সার্টের বাঁ পকেটের নিচে, তারপর একেবারে পায়ের তলায়।

'বললাম, "আপনি আরেকবার আবার বলবেন ব্যাপারটা, এমসলি খুড়ো? হয়তো আমার কান খারাপ হয়ে গেছে, কিংবা আপনি শুধু বলেছেন কচি বলদের দাম হয়েছে ৪.৮০ করে, বা ওই রকমই কিছু!"

'এমস্‌লি খুড়ো বললেন, "কাল ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, আর বিবাহ-ভ্রমণ করতে ওরা চলে গেছে ওয়াকো, নায়াগ্রা প্রপাত। কেন, তুমি কি আগাগোড়াই কোনো লক্ষণ ধরতে পারোনি? সেই যেদিন জ্যাকসন বার্ড উইলেলাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলে গেল, তখন থেকেই তো তার প্রেম নিবেদনের সূত্রপাত!"

'আমি প্রায় চিৎকার করার মতোই বলে উঠি, "তা হলে আশকে পিঠে নিয়ে এতসব ভড়কিবাজি করেছিল কেন আমার সঙ্গে? সেটা এবার বলুন!"

'যে-ই আশকে পিঠে কথাটা বললাম সঙ্গে সঙ্গে খুড়ো যেন এড়াবার চেষ্টা করে এক-পা পেছিয়ে গেলেন।

'"কেউ আমাকে তলার দিকের ওঁচা আশকে পিঠে গাছিয়েছে," বলি আমি, "আর আমি সেটা খুঁজে বের করব। আমার ধারণা আপনিই জানেন। মুখ খুলুন, নয়তো এখানেই তাওয়া ভর্তি পিঠের কাঁই তৈরি হয়ে যাবে।"

'কাউন্টার ডিঙিয়ে আমি এমস্‌লি খুড়োর পেছনে ছুটি। উনি পিস্তল বের করতে যান। কিন্তু সেটা খাপের মধ্যে, দু'ইঞ্চির জন্য ফস্‌কে যায় তার নাগাল। আমি ওঁর শার্টের সামনের কলার চেপে ধরি আর ঠেলে নিয়ে যাই কোণের দিকে।

'বলি, "হয় আশকে-পিঠের কথা বলুন, নয়তো পিঠেই বানিয়ে দেব আপনাকে। মিস্ উইলেলাই কি ও পিঠে বানায়?"

'"সে জন্মেও কোনোদিন পিঠে বানায়নি, অন্তত আমি কখনো দেখিনি।" এবার শান্ত কণ্ঠে বলেন, "এবার একটু ঠাণ্ডা হও জাড—ঠাণ্ডা হও। তুমি উত্তেজিত, আর তোমার মাথার ওই জখমটা তোমার বোধশোধ খারাপ করে দিচ্ছে। আশকে-পিঠের কথা ভাববারই চেষ্টা কোর না।"

'আমি বলি, "এমস্‌লি খুড়ো, মাথায় আমার জখমনেই, শুধু স্বাভাবিক চিন্তার সংস্কার আমায় টানে বেঁটে জানোয়ারদের দিকে। জ্যাকসন বার্ড আমায় বলেছিল, সে মিস্ উইলেলার সঙ্গে দেখা করত আশকে-পিঠে তৈরির প্রণালী জেনে নেবার উদ্দেশ্যে, আর আমাকে বলেছিল যা-যা উপকরণ ওতে লাগে তা জোগাড় করে দিতে সাহায্য করতে। আমি তা করতে গেলাম, আর দেখলেনই তো তার ফলাফল! আমি কি একটা গোলাপি চোখো কুড়ের দেওয়া 'জনসন-ঘাসের' নেশায় পড়েছিলাম, না কী?"

'এমস্‌লি খুড়ো বললেন, "আমার শার্টটার ওপর তোমার খামচিটা ঢিলে করবে ভাই, তা হলে সব কথা বলব। হ্যাঁ, মনে হয় জ্যাকসন বার্ড তোমাকে খানিকটা ধোঁকাই দিয়েছিল। যেদিন সে উইলেলার সঙ্গে প্রথম বেড়াতে যায়, তার পরদিনই আমাকে আর উইলেলাকে বলেছিল, তুমি যখনই আশকে পিঠের কথা তুলবে আমরা যেন একটু খেয়াল রাখি। বলেছিল, তুমি নাকি কোন্ ক্যাম্পে ছিলে যখন ওরা আশকে-পিঠে তৈরি করছিল, আর একটি লোক ভাজবার তাওয়া ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেয়। জ্যাকসন বলেছিল যখনই তুমি একটু গরম বা উত্তেজিত হয়ে ওঠো, ওই জখমটা তোমায় যন্ত্রণা দেয়, পাগল মতো করে দেয়, আর তুমি চেঁচাতে থাক আশকে-পিঠে নিয়ে। ও বলেছিল, তোমার মন থেকে আমরা যেন প্রসঙ্গটা ভুলিয়ে দিই, আর তোমায় শান্ত করি, তাহলেই আর কোনো বিপদ তুমি ঘটাবে না। তাই আমি আর উইলেলা যথাসাধ্য করেছি তোমার ভালোর জন্য। তবে হ্যাঁ—ওই জ্যাকসন ছেলেটা একটা বিশেষ ধরনের কুড়ে, নিঃসন্দেহে, অমনটা দেখা যায় না।"

জাডের গল্পটা যখন চলছে, তার মধ্যেই কখন ধীরে-ধীরে নিপুণ হাতে সে থলি আর টিনের জিনিসগুলো মাপ মতো মিশিয়ে নিয়েছিল। তারপর গল্প যখন শেষ হয়ে এল, সে আমার সামনে সাজিয়ে রাখল তৈরি ভোজ্যবস্তুটা। টিনের থালার ওপর এক জোড়া ডগডগে লাল চমৎকার সুরসিত আশকে-পিঠে। কোনো গোপন ভাণ্ডার থেকে সে এক দলা খাঁটি মাখন আর এক বোতল সোনালি শিরকাও বের করে আনল।

জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ব্যাপারটা ঘটেছিল কতোদিন আগে?'

'তিন বছর' বললে জাড, 'ওরা এখন মায়ার্ড-মিউল র‍্যাঞ্চে থাকে। কিন্তু আমি আর কখনো ওদের কারুর সঙ্গে দেখা করিনি। ওরা বলে, যে-সময়টা ও আমাকে পিঠে গাছে চড়াচ্ছিল, সে-সময়ই নাকি জ্যাকসন তার র‍্যাঞ্চ সাজাচ্ছিল দোলনা-চেয়ার

আর জানলার পর্দা দিয়ে। ওঃ সেসব আমি ক'দিনের মধ্যেই ভুলে গেছি। তবে ছোকরাগুলো এখনো নাচাবার চেষ্টা করে।'

'এই পিঠেগুলো কি সেই বিখ্যাত প্রণালীতেই গড়া?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'বলেছি না তোমায়, কোনো প্রণালীই ছিল না? ছোকরারা আশকে পিঠে নিয়ে এত চেঁচায় যে তাদের খিদে পেয়ে যায় ওর জন্যই। আমি তখন খবরের কাগজ থেকে এই প্রণালীটা কেটে বের করি। কেমন লাগছে জিনিসটা?'

'খেতে তো খুব চমৎকার', জবাব দিই আমি, 'তুমিও একটু খাও না কেন?'

পরিষ্কার শুনলাম একটা দীর্ঘশ্বাস।

জাড বলে, 'আমি? আমি কখনো খাই না ওসব।'

The Pimienta Pancakes, ম্যাকক্লিওরস: ১৯০৩

মৌনী আপেলফল

প্যারাডাইস্ শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে—সানরাইজ সিটি পৌঁছুতে যখন আরো পনের মাইল বাকি, যাত্রীবাহী মাল গাড়িটা থামাতে বাধ্য হল কোচোয়ান বিলডাড রোজ। সারাদিন ধরে প্রচণ্ড তুষারপাত হয়েছে। সমান জায়গায় মাপলে পুরো আট ইঞ্চি পুরু। বাকি পথটুকু দিনের বেলাতেও কম বিপজ্জনক নয়—এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের পাথুরে কোণ-জাগানো কিনারা দিয়ে গুড়ি মেরে গেছে। এখন আবার বরফ আর অন্ধকার দুটোই বিপদের ঘোমটা টেনে দেয়াতে সামনে যাত্রার কথা ভাবাই যায় না—বিলডাড রোজের মতে। তাই সে তার চারটি মোটাসোটা ঘোড়া রুখে পাঁচজন যাত্রীকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিল তার সিদ্ধান্তের কথা।

বিচারপতি মেনেফী, যাঁকে লোকে অতি সসম্মানে নেতৃত্ব আর অগ্রাধিকারের গুরুত্ব দেয়, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে। তাঁর উদাহরণে উৎসাহিত আর চারজন সহযাত্রীও তাঁকে অনুসরণ করলেন। তারা প্রস্তুতই আছেন ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে, তাঁদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী তিরস্কার, আপত্তি করতে, অথবা মেনে নিতে। পঞ্চম যাত্রী একটি যুবতি নারী, সে গাড়িতেই বসে রইল।

বিলডাড গাড়ি রুখেছে একেবারে প্রথম পাহাড়ি মোড়টার কিনারায়। সেখানে একটা বেড়া রয়েছে, দুটো লোহার রেলিং—কর্কশ কালো। বেড়ার ওপর থেকে পঞ্চাশগজ দূরে সাদা তুষারপাতের মধ্যে কালো বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট বাড়ি। ওই বাড়ির ওপরেই নামলেন—অথবা বলা যায় উঠলেন—আমাদের বিচারপতি মেনেফী আর তাঁর দলবল; বরফে হাঁটা আর শ্রান্তির ফলে বালকোচিত

'উফ্-আফ্' ধ্বনি করে। ওঁরা চিৎকার করে ডাকলেন, জানলা দরজা ধাক্কালেন—অতিথিবিমুখ নীরবতায় আরো অশান্ত হয়ে চড়াও হলেন সহজভেদ্য বেড়ার ওপর, জোর করে ঢুকলেন বাড়ির মধ্যে।

গাড়ি থেকে যারা নজর রাখছিল, তারা শুনতে পেল আক্রান্ত বাড়ির ভেতর থেকে হুড়োমুড়ি আর চেঁচামেচির শব্দ। একটু বাদেই ভেতরে একটা আলো জ্বলে উঠল, সেটা উজ্জ্বল শিখার মতো উঁচুতেও ধরা হলো খোশমেজাজে। তারপর বরফ-ওড়ানো হাওয়ায় বাইরে ছুটে এল উৎসাহী অভিযাত্রীরা। এবার বিচারক মেনেফীর কণ্ঠস্বর—তূর্য-গম্ভীর, প্রায় অর্কেস্ট্রার নাদে—ঘোষণা করল ওঁদের কষ্টের অবস্থা থেকে মুক্তি আসন্ন। উনি বললেন, বাড়ির একখানি মাত্র সম্বল ঘরে কারুর বসতি নেই, আসবাবপত্রও নেই; কিন্তু মস্ত আগুনের চুল্লি রয়েছে আর ওঁরা আবিষ্কার করেছেন প্রচুর কাঠের লাক্ড়ি, পেছনের দিকের কোঠাতে। অতএব হাড়-কাঁপানো রাতের পক্ষে আশ্রয় আর উত্তাপ সুনিশ্চিত। বিলডাড রোজকে খুশি করার মতো একটা আস্তাবলের খবরও এল—সেটার একেবারে ভগ্নদশা না হলেও ঘরের কাছেই, তাকের ওপর খড়বিচালি রয়েছে।

জোব্বা আর কোট-পরা বিলডাড-রোজ তার আসনে বসেই হাঁকড়ে উঠল—'মশাইরা, ওই বেড়াটার দু'খানা তক্তা ভেঙে দিন না, যাতে গাড়িটাকে সোজা ভেতরে ঢোকাতে পারি। ওটা হল বুড়ো রেডরুথের ঝোপড়ি। আগেই বুঝেছিলাম ওটার কাছাকাছি এসেছি। অগস্ট মাসে ওরা তাকে পাগলা-গারদে ধরে নিয়ে গেছে।'

চারজন যাত্রী খুশি হয়ে লাফিয়ে পড়ল তুষার ঢাকা বেড়ার ওপর। উৎসাহীর দল গাড়িটাকে টেনে ঢালু জায়গা দিয়ে বাড়িটার দরজা অবধি আনে। ওই বাড়িরই মালিককে তার কোনো চূড়ান্ত পাগলামি আজ ঘরছাড়া করেছে। কোচোয়ান আর দু'জন যাত্রী জোয়াল থেকে ঘোড়াগুলোকে আলাদা করতে ব্যস্ত। বিচারক মেনেফী গাড়ির দরজা খুলে মাথা থেকে টুপি নামান।

বলেন, 'এবার মিস গারল্যাণ্ড, আমায় জানিয়ে দিতে হচ্ছে যে আমাদের যাত্রা এখানেই বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হবে। চালক বলে দিয়েছে, রাতে পাহাড়ি পথে চলার ঝুঁকি এত বেশি যে তার কথা চিন্তাও করা চলে না। অতএব এই বাড়ির আশ্রয়েই সকাল অবধি থাকা প্রয়োজন হবে। বিনীতভাবে জানাই সাময়িক একটু অসুবিধা ছাড়া আপনার পক্ষে ভয় পাবার মতো কিছু নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে, বাড়িটা তদারক করে দেখেছি, অন্তত আবহাওয়ার প্রকোপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার উপায় রয়েছে এখানে। আপনাকে যথাসাধ্য আরামের মধ্যেই রাখা হবে। আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করতে অনুমতি দিন।'

বিচারকের পাশে যে যাত্রীটি এল, তার জীবনের লক্ষ্য হল কোথাও তার 'ক্ষুদে গলিয়াথ' হাওয়া-কলটা স্থাপন করা। তার নাম ডানউডি, তবে সেটা কোনো

বিশেষ ব্যাপার নয়। প্যারাডাইস থেকে সানরাইজ সিটির সামান্য পথ যেতে কারুর নামের দরকার নেই, যৎসামান্যেও চলবে। তবু কোনো ব্যক্তি, বিচারক ম্যাডিসন এল, মেনেফীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মর্যাদার ভাগ চাইলে দেয়ালে একটা পেরেক রাখতেই হয় যেখানে হয়তো কখনো ঝুলবে খ্যাতির স্তবকমাল্য। তাই সেই হাওয়া-যান্ত্রিকটি উচ্চকণ্ঠে উৎফুল্লভাবে বলে:

'বোধহয় আপনাকে নৌকো থেকে হেঁটে ওপরে উঠতে হবে, মিসেস ম্যাকফারল্যাণ্ড। এই ঝোপড়ি ঘরটা তো ঠিক "পামার হাউস" নয়, তবে বরফি ঠেকাবে, আর চলে যাবার সময় স্মারক-চামচও খুঁজবে না আপনার ব্যাগ হাট্‌কে। "আমরা" আগুন চালু রেখেছি, "আমরা" আপনাকে শুকনো গরম টুপি দেব, ইঁদুরও তাড়াব, মোটের ওপর সব ঠিকঠাক।'

দু'জন যাত্রী প্রাণপণে লড়ছিল ঘোড়া, বল্‌গাসাজ, বরফের ঝামেলা, সেইসঙ্গে আবার বিলডাড রোজের বিদ্রূপভরা হুকুমহাকামের মধ্যে। ওদের একজন স্বেচ্ছাসেবকের কর্তব্যের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠল—'অ্যাই! তোমাদের কেউ মিস্ সলোমনকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে পারছ না? এই, এই! সামালকে, হতচ্ছাড়া জানোয়ার!'

আবার বিনয়সহকারে জানিয়ে রাখা ভাল, প্যারাডাইস থেকে সানরাইজ সিটি যাত্রার পথে সঠিক নাম ব্যবহার করাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি। যখন বিচারক মেনেফী তাঁর পাকা চুল আর বহুব্যাপ্ত খ্যাতির সুবাদে মহিলাযাত্রীর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তখন সে-ও নিজে থেকে, প্রত্যুত্তরে, সুন্দর মিষ্টি উচ্চারণে একটা নাম বলেছিল যা পুরুষ-যাত্রীদের কর্ণবিবরে বিভিন্ন রূপে প্রবেশ করেছে। পরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়টি এল, একেবারে ঈর্ষাশূন্য না হলেও, সবাই একগুঁয়ে মেজাজ নিয়ে নিজের ধারণাটাই আঁকড়ে রইল। মহিলা যাত্রীর পক্ষে নামের পুনরাবৃত্তি বা সংশোধন, কোনো অযাচিত বিশেষ পরিচিতির প্রয়োজনে না হলেও একটু নীতিশিক্ষা গোছের দেখাতে পারত। তাই মহিলা সমবিচারের অবহেলাতেই নিজেকে ছেড়ে দিল গারল্যাণ্ড বা ম্যাকফারল্যাণ্ড বা সলোমন—যে কোনো নামেই অভিহিত হবার সম্মতি দিয়ে। হাজার হলেও প্যারাডাইস থেকে সানসিটি মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইলেরই তো ব্যাপার—"সহযাত্রী" বলাটাই সেখানে যথেষ্ট—নামে কি আসে যায়!

পথযাত্রীর দল অবিলম্বেই আরাম করে বসেছে গনগনে আগুনের সামনে, সুপ্রসন্ন অর্ধচক্র আসনে। জোব্বা পোশাক, গদি, গাড়ি থেকে সরানোর যোগ্য সবকিছু ভেতরে আনা হয়েছে, কাজের মতো করে সাজানোও হয়েছে। মহিলা যাত্রীটি বেছে নিয়েছিল চুল্লির কাছে একটা জায়গা, অর্ধচক্রের প্রান্তে। যেন প্রজাদের তৈরি প্রায় একটা সিংহাসনেই সসম্মানে বসেছে সে। গদির ওপর বসে সে হেলান দিয়েছে খালি বাক্স, পিপের গায়ে—ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচতে ছড়ানো তার আঙরাখা। মনোরম জুতোঢাকা পা দুখানা সে বাড়িয়ে দিয়েছে কবোষ্ণ উত্তাপের

দিকে। হাতের দস্তানা খুলে নিয়েছে, কিন্তু কাঁধের ওপর জড়িয়ে রেখেছে লম্বা ফারের স্কার্ফ। চঞ্চল আগুনের শিখা কিছুটা প্রকাশ করে, কিন্তু স্কার্ফের আবরণ খানিকটা ঢেকেও রাখে তার মুখখানা—সে-মুখ তারুণ্যের, একেবারেই রমণীসুলভ, সৌন্দর্যের তর্কাতীত আত্মস্থতায় নিখাদ, সুডৌল, আর প্রশান্ত। পৌরুষ আর বীরধর্ম এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাকে খুশি করতে, আরামে রাখতে। সেও তাদের মার্জিত মনোযোগ মেনে নিচ্ছে মনে হয়—তাদের সমাদর ও খাতিরে শ্লেষ-মিষ্ট হয়ে নয়, আবার পালক-মেলা ময়ূরীর মতোও নয়,—যেমন তার জাতের অনেকে অযোগ্য হয়েও সম্মানের ফসলটুকু আত্মসাৎ করতে দ্বিধা করে না। আবার বলদ যেভাবে বিচালি গ্রহণ করে তেমন অবিচল চিত্তেও নয়। কিন্তু এসব সে মেনে নেয় প্রকৃতিরই কোনো নিজস্ব আইনে—যেমন কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মেই শিশিরের বিন্দু হয় লিলিফুলের ভোজ্য।

বাইরে প্রবল ঝড়ের আওয়াজ, ফুটোফাটার ভেতর দিয়ে রেণু রেণু বরফ ঢুকছে, 'বলি'র ছ'টি প্রাণীর পিঠে ঠাণ্ডা চেপে বসেছে। কিন্তু তাই বলে সে-রাতে আদি-প্রকৃতির কোনো প্রতিভূ-রক্ষকের অভাব হয়নি। ঝড়ের সপক্ষে উকিল স্বয়ং বিচারক মেনেফী। আবহাওয়া তাঁর মক্কেল, তাই বিশেষ আবেদন করে হিমঠাণ্ডা জুরী-আসনের সঙ্গীদের বোঝাতে চাইলেন তাঁরা গোলাপের সুন্দর ঝোপে আশ্রয় পেয়েছেন—শুধু সামান্য উৎপাত করছে অক্ষতিকর 'মলয় পবন'। তিনি উজাড় করে দেন তামাশা, রসিকতা, উপাখ্যানের ভাণ্ডার, পাণ্ডিত্যময় হলেও চরমভাবে সফল। তাঁর উৎফুল্ল মেজাজ অবারিতভাবেই ছড়িয়ে পড়ল সকলের মধ্যে। যে যার নিজের চুটকি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছাড়তে লাগল সর্বজনীন উৎসাহের আসরে। এমন-কি মহিলা যাত্রীটিও শেষ অবধি কিছু প্রকাশ করল। ধীর স্ফটিক কণ্ঠে বলল, 'সত্যি বেশ চমৎকার লাগছে।'

একেকবার বিরতির ফাঁকে যাত্রীদের কেউ উঠে ভাঁড়ামো করে ঘরটা ঘুরে ঘুরে তল্লাসী করছে। এখানে প্রাক্তন মালিক বুড়ো রেডরুথের বসবাসের তেমন কিছু সাক্ষ্য কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না।

সোল্লাসে বিলডাড রোজকে বলা হল পুরনো সন্ন্যেসীর ইতিহাসটা একটু জানাতে। যেহেতু গাড়ির কোচোয়ানের ঘোড়াগুলো এখন আরামেই রয়েছে আর তাঁর যাত্রীদেরও সেই রকমই মনে হচ্ছে, তাই তার মনে শান্তি আর ভদ্রতাবোধ ফিরে আসে।

খানিকটা উপেক্ষা ভাব দেখিয়ে বলে বিলডাড, 'বুড়ো জলমুরগিটা এই বাড়ি কুড়ি বছর ধরে আঁকড়ে বসেছিল। কখনো কাউকে দিতোই না তার কাছেপিঠে আসতে। যখনই কোনো যাত্রী-গাড়ি এখান দিয়ে হেঁকে যেত, সঙ্গে সঙ্গে সে ভেতরে মাথা গুঁজে দরজা বন্ধ করে দিত। চিলে-তাকে চরকা-কলগুলো ছিল ঠিকই। স্যাম টিলির দোকান থেকে মুদির জিনিসপাতি, তামাকও কিনত নিয়মিত। গত অগাস্ট মাসে একদিন সে লাল লেপ গায়ে চড়িয়ে, টিলির দোকানে হাজির

হয়ে স্যামকে বলল সে নাকি রাজা সলোমন, আর শিবাদেশের রাণী আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। ওর যতো টাকাকড়ি ছিল সব টেনে এনে—ছোট থলিভর্তি রুপোর টাকা—গছিয়ে দিল স্যামের গদিতে। বুড়ো রেডরুথ স্যামকে বলেছিল, 'তবে যদি জানতে পারে আমার কাছে টাকাপয়সা আছে, তাহলে কিন্তু আসবে না!'

'যখন লোকে শুনল মেয়েমানুষ আর টাকা নিয়ে ওর ওইরকম অদ্ভুত ধারণা আছে, তারা বুঝে গেল লোকটা পাগল হয়ে গেছে, তাই লোক পাঠিয়ে ওকে পাকড়ে ধরে তারা "হাবাদের বাড়িতে" পাঠিয়ে দিল।'

একজন ছোকরা যাত্রী, যার দালালির ব্যবসা, জিজ্ঞেস করে, 'ওর জীবনে কি কোনো প্রেমঘটিত ব্যাপার ছিল যা ওকে নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের দিকে ঠেলে দেয়?'

বিলডাড বললে, 'না, তেমন কিছু শুনিনি কারুর মুখে। নেহাৎ মামুলি কিছু ঝামেলা। লোকে বলে সে নাকি যৌবনকালে একজন যুবতি মহিলার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে উল্টোপাল্টা বিপত্তি বাধিয়েছিল, এই নিয়েই তার দুর্ভাগ্য। তারপরে তাকে ধরল লাল লেপ আঁকড়ে রাখার ব্যারাম, টাকাকড়ির ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি। আমি তো কখনো কোনো রোমান্সের কথা শুনিনি।'

বিচারক মেনেফী আবেগ-প্রভাবিত হয়ে সোচ্চারে বললেন, 'আহা! এ তো নিঃসন্দেহে প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেমের নমুনা।'

বিলডাড জবাব দেয়, 'না স্যর, মোটেই তা নয়। মেয়েটা তো ওকে বিয়েই করল না। প্যারাডাইসের মারমাডিউক মালিগান, রেডরুথেরই সাবেক শহর থেকে আসা একটি লোকের দেখা পেয়েছিল একবার। লোকটা বলেছিল রেডরুথ নাকি চমৎকার এক যুবকই ছিল, তবে তার পকেটে লাথি মারলে টাকার ঝনঝনানি না শুনে শুনতে পেতেন শুধু হাতকড়ির আর এক গোছা চাবির আওয়াজ। এই যুবতি মহিলা—অ্যালিস্ কি ওইরকম কোনো নাম, ভুলে গেছি—তার সঙ্গে সে বিয়ের জন্য বাগদত্তও ছিল। লোকটা বলে সে এমন ধরনের মেয়ে যে গাড়িতে ছুটে এসেও তোমার ভাড়াটি মিটিয়ে দেবে। যাক্, তারপর শহরে আসে এক তরুণ ছোকরা, দারুণ স্বচ্ছল আর সহজ, তার বগিগাড়ি আছে, খনির মালিকানা, অবসর সবই তার পাকা। মিস্ অ্যালিস যদিও পণবদ্ধা, তবু মনে হয় নতুন আগন্তুক আর তার মধ্যে বেশ মিলমিশ গড়ে উঠল। মাঝে মাঝে ডাকঘরে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, কিংবা দুজনে কাজেই যায় সেখানে, আর ওই রকম সব ব্যাপার, যার ফলে অনেক সময় কোনো মেয়েকে বাগদানের আংটি বা অন্য উপহার ফেরত দিতেও দেখা যায়—মানে ওই কবিরা যাকে বলেন না, "লুটের মধ্যেই বখরা"?

'একদিন লোকে দেখল ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রেডরুথ আর মিস্ অ্যালিস্ কথা বলছে। তারপর সে মাথা থেকে টুপিটা তুলে হেঁটে চলে গেল, আর সেটাই নাকি শহরের লোকদের চোখে তাকে শেষ দেখা—মানে এ লোকটা যতোদূর জানে।'

দালালি ব্যবসার ছেলেটি বলল, 'আর ওই মহিলার কোনো খবর?'

'কখনো শোনা যায়নি,' বিলডাডের জবাব, 'আমার খবরের সূত্র ওই বেতো বুড়োটা অবধিই, এর পর আর কিছু নেই, সবই বলে দিয়েছি।'

বিচারক মেনেফী বলতে শুরু করেছিলেন, 'বড়ো দুঃখের—'কিন্তু মাঝপথে তা থেমে গেল উচ্চতর কর্তৃত্বের বক্তব্যে: 'কী মর্মস্পর্শী এক গল্প!' বলে ফেলেছে মহিলাযাত্রী, বাঁশির মতো সুরেলা গলায়। এবার কিছুক্ষণ নীরবতা—শুধু বাইরের বাতাস আর আগুনের মট্‌মট্‌ আওয়াজটুকু ছাড়া।

পুরুষরা সবাই বসেছিল মেঝের ওপর, কোনোমতে টুকরো কম্বল আর ছড়ানো তক্তার ফালি দিয়ে অতিথিবিমুখ ঠাণ্ডাটাকে ঢাকাঢুকি দিয়ে। "ক্ষুদে গলিয়াথের" যন্ত্রবিদ্‌ এর মধ্যে উঠে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে পেশীর খিল ছাড়াতে।

হঠাৎ তার গলা থেকে বেরুল একটা সবিস্ময় বিজয়-ধ্বনি। কামরার একটা অন্ধকার কোণ থেকে তড়বড় করে বেরিয়ে এল সে, হাতের মধ্যে কোনো কিছু উঁচু করে ধরে। একটা আপেল—মস্ত, লাল-ছোপ, নিরেট "পিপিন" জাতের ফল, দেখতেও সুন্দর। ওই কোণেই একটা উঁচু তাকে কাগজের ঠোঙায় ওটা সে আবিষ্কার করেছে। প্রেম-বিধ্বস্ত রেডরুথের কোনো স্মৃতিচিহ্ন নয় নিশ্চয়ই, কারণ ওটার দারুন টাটকা চেহারাই প্রমাণ দিচ্ছে অগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত ওই ছাতাপড়া তাকটিতে পড়ে থাকতে পারে না ওটা। নিঃসন্দেহে সম্প্রতিকালে কোনো রাত্রিযাপনকারী দল খাওয়াদাওয়ার পর পরিত্যক্ত বাড়িতে ওটা ফেলে গিয়েছিল।

ডানউডি (এবার তার অভিযানের সম্মানে একটা নামের উপহার দিতেই হয়) আপেলখানা উঁচিয়ে ধরে বরফবন্দী সহ-অভিযাত্রীদের নাকের ওপর ঘুরিয়ে দেখাল। 'দেখেছেন মিসেস্‌ ম্যাকফারল্যাণ্ড, কী জিনিস পেয়েছি!' গর্বিত কণ্ঠে বলল সে। আগুনের আভায় উঁচু করে ধরল আপেলটা, সে আলোয় আরো যেন টক্‌টকে লাল দেখায় ওটা। মহিলাযাত্রী শান্তভাবে হাসল—সবসময়ই শান্ত।

পরিষ্কার বিড়বিড় করে বলল—'বাঃ কী চমৎকার আপেল!'

সামান্য ক্ষণের জন্য জজ মেনেফী যেন দুমড়ে গেলেন—অবহেলিত, পেছনের সারিতে। দ্বিতীয় স্থান তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করে। ওঁর বদলে নিয়তি কেন এই ভোঁতা, নাকগলানো অভদ্র হাওয়াকল-ওলাটাকে বেছে নিলেন চাঞ্চল্যকর আপেলটাকে খুঁজে বের করতে? তিনি হলে নাটকের এই অঙ্কে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করতেন, একটা উপস্থিত-মতো কল্পিত বক্তৃতা, অথবা কমেডির অংশ—যা তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকাটিকে অক্ষুন্ন রাখত। বাস্তবিকপক্ষে মহিলা যাত্রী যেন সত্যিই এই হাস্যকর ডানবাডি, না উডবাণ্ডিটাকে, তারিফের হাসি দিয়ে দেখছেন, যেন ও বান্দা একটা মহা কীর্তির কাজ করেছে! আর হাওয়াকলের লোকটা ফুলে উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে তারই যন্ত্রের কোনো নমুনার মতো, যেন আকাশে হাত বাড়িয়ে এখন চাঁদ ধরতে চায়!

আনন্দে আত্মহারা ডানউডি যখন তার আলাদিনের আপেল দেখিয়ে সকলের ঠুনকো মনোযোগ আকর্ষণ করছে, সেই ফাঁকে উদ্ভাবন-নিপুণ অইনজীবী একটা মতলব ঠাউরে নিলেন নিজের গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনতে।

গম্ভীর অথচ অভিজাত চেহারার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কেতাদুরস্ত হাসিটি নিয়ে জজ মেনেফী এগিয়ে এসে আপেলটি ডানউডের হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিলেন, যেন পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন। তাঁর হাতে ওটা হয়ে দাঁড়াল "এক নং প্রামাণিক বস্তু'।

তারিফের ঢঙে বললেন, 'চমৎকার আপেল। সত্যি মিঃ ডাড়উইণ্ডি, আমাদের সকলকে আপনি রসদ লুঠের কাজে হার মানিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার একটা কল্পনা আছে মাথায়। এই আপেলটা হবে একটা প্রতীক, একটা চিহ্ন বা নিদর্শন—এ হল সৌন্দর্যের হৃদয়-মন থেকে অর্পিত সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির জন্য উপহার।'

দর্শকরা সোৎসাহে সমর্থন জানাল (একজন ছাড়া)। 'একেবারে লাগসই কথা বলেছেন, তাই না?'—'তেমন-কেউ-নয়' যাত্রীটি বললে দালালী ব্যবসার ছোকরাটিকে।

যার কোনো সাড়াশব্দ নেই সে ওই হাওয়া-মিলের লোকটা। সে দেখল সে একেবারে চুনোপুঁটির দলে পড়েছে। আপেলটাকে প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করার চিন্তা আদৌ ওর মাথায় আসতোই না। ওর ইচ্ছে ছিল সকলের মধ্যে বেঁটে খেয়ে নেওয়ার পর আপেলের দানাগুলো নিয়ে একটা মজার খেলা খেলবে, সেগুলো নিজের কপালে চেপে দিয়ে; আর প্রত্যেকটা দানার নাম দেবে তার পরিচিতা মহিলাদের নামে। একটার নাম দেবে 'মিসেস ম্যাকফারল্যাণ্ড'। যে দানাটা প্রথম কপাল থেকে পড়ে যাবে সে হবে— যাক্‌গে, এখন তো দেরিই হয়ে গেল!

বিচারক মেনেফী জুরীদের বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—'আধুনিক কালে আপেলের স্থান আমাদের ধারণায় যথেষ্ট নিচে, যদিও তা কতকটা অন্যায্যভাবে। বাস্তবিকই রান্না-খাওয়া আর বাণিজ্যিক কাজে এর এত অনবরত ব্যবহার, যে ভদ্র ফলের মধ্যে এটা প্রায় গণ্যই হয় না। পুরা কালে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম ছিল না।। বাইবেল, ইতিহাস, পুরাণের গল্পে আপেল যে অভিজাত শ্রেণীর ফল, তা নিয়ে অজস্র সাক্ষ্য রয়েছে। এখনো আমরা অতি মূল্যবান কিছুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলি "চোখের মণি আপেল"। বাইবেলে পাই "রৌপ্য আপেলের" উপমা। গাছ বা লতার অমন বস্তু আর নেই যা এমন নির্বিশেষে বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত।... আমাকে আর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে হবে না আপেলফলের প্রাচীন মর্যাদার সেই চূড়ান্ত তাৎপর্যময় উদাহরণটির কথা—যখন আমাদের প্রথম পিতামাতা এই ফল খেয়ে ফেলার ফলে মানুষ তার "মঙ্গল ও পূর্ণতার রাজ্য" থেকে চিরতরে নির্বাসিত হল।'

'ওরকম আপেল তো—' বাস্তব জিনিসটার কথা ভাবতে ভাবতে হাওয়া-মিলের লোক বলে—'চিকাগোর বাজারে পিপে-প্রতি ৩.৫০ ডলারে বিকোয়।"

বাগড়া-দেওয়া লোকটার দিকে একটু প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে জজ মেনেফী বললেন, 'আমি এবার সেটা প্রস্তাব করতে চাই তা হল এই। হয়তো বাধ্য হয়েই আমাদের এখানে সকাল অবধি থকতে হবে। হাত-পা গরম রাখার মতো যথেষ্ট কাঠ রয়েছে আমাদের। পরবর্তী প্রয়োজন নিজেদের যতোটা সম্ভব আমোদ আহ্লাদের মধ্যে রাখা যাতে সময়টা একেবারে বেকার বসে না কাটে। আমার প্রস্তাব এই আপেলটা আমরা মিস্ গারল্যাণ্ডের হাতে তুলে দিই। এটা এখন আর ফল নয়, যেমন বলেছি— এটা একটা পুরস্কার, একট উপহার, যা মহৎ মানবীয় চিন্তার প্রতিভূ স্বরূপ। মিস্ গারল্যাণ্ড নিজেও আর ব্যক্তিমাত্র হয়ে থাকবেন না—অবশ্য সাময়িকভাবে আর খুশি মনে এটুকুও যোগ করছি' (সাবেকি দিনের ভদ্রতায় নিচু হয়ে 'বাও' করেন) 'উনি নারীজাতিরই প্রতিনিধিত্ব করবেন, নারীত্বের প্রতীক, সারবস্তু—তাঁদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক হিসেবে। বলতে পারা যায়, ঈশ্বরেরই সৃষ্টির চূড়ান্ত রূপ। এই বেশেই তিনি বিচার ও সিদ্ধান্ত জানাবেন পরবর্তী প্রশ্নের বিষয়ে—

'মাত্র কয়েক মিনিট আগেই এই বাড়ির পূর্বতন দখলকারীর জীবনে যে রোমান্স ঘটেছিল তা নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন অথচ আনন্দজনক নকশা এঁকেছেন আমাদের বন্ধু মিঃ রোজ। যে দু'একটি তথ্য আমরা জেনেছি তাতে উপলব্ধির যোগ্য একটা মনোমুগ্ধকর ক্ষেত্র খুলে যায় চোখের সামনে—মনুষ্য হৃদয়ের অধ্যয়ন, কল্পনার বিশেষ প্রয়োগ তাতে সম্ভব বলেই মনে হয় আমার। সংক্ষেপে বলা যায় তা কোনো কাহিনী রচনার উপযুক্ত কাঠামো। আসুন এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করি। আমাদের প্রত্যেকেই কাহিনীটার একেকটা নিজস্ব ভাষ্য বর্ণনা করব সন্ন্যাসী রেডরুথ আর তার দয়িতাকে নিয়ে—যেখানে মিঃ রোজের গল্প শেষ হল, সেই জায়গা অর্থাৎ ফটকের কাছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার বিদায়ের দৃশ্য থেকে শুরু করে। কিছুটা আমাদের ধরেই নিতে হবে, মেনেও নিতে হবে—রেডরুথের পাগল হওয়া আর বিশ্ব-বিদ্বেষী সন্ন্যাসী হবার মূলে যে সেই যুবতীই, তা মনে করার কোনো হেতু নেই। আমাদের কাহিনী বলা যখন শেষ হবে, তখন মিস্ গারল্যাণ্ড দান করবেন তাঁর "নারী জগতের রায়"। তিনি নারীত্বের বিচারেই সিদ্ধান্ত করবেন কার কাহিনী সেরা এবং সত্যরূপে চিত্রিত করেছে মানবিক ও প্রেমগত আকর্ষণ, সততার সঙ্গে 'নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে' তুলে ধরেছে রেডরুথ-বাগ্দত্তার চরিত্র ও কার্যকলাপ। যাঁর পক্ষে যাবে তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনিই পাবেন এই আপেলের পুরস্কার। আপনারা সবাই যদি রাজি থাকেন, তা'হলে প্রথম গল্পটি আমরা খুশি হয়ে শুনব মিঃ ডিন্উইডির মুখে।'

শেষ কথাগুলো মুগ্ধ করল হাওয়া-কলের মানুষকে। ওকে আব বর্জিত পদার্থের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে না।

উল্লসিত কণ্ঠে সে বলল, 'এতো পয়লা নম্বরের নক্শা, জজসাহেব! রীতিমতো

ছোটগল্পের বিচিত্রানুষ্ঠান! স্প্রিংফিল্ডের এক পত্রিকার প্রতিবেদক ছিলাম আমি, খবরে ঘাটতি পড়লে বানিয়েই লিখে দিতাম। হয়তো নিজের পালা ঠিকমতোই চালিয়ে দেব।'

মহিলাযাত্রী উৎফুল্লভাবে জানাল, 'মনে হয় এটা চমৎকার আইডিয়া। প্রায় খেলার মতোই হবে।'

জজ মেনেফী এগিয়ে গিয়ে বেশ লক্ষণীয় ভঙ্গিতে আপেলটি রাখলেন তার হাতে। বাচনক্ষমতা জাহির করে বললেন, 'অতীত দিনে সবচেয়ে সেরা সুন্দরীকে সোনার আপেল পুরস্কার দিয়েছিল প্যারিস।'

হাওয়া-কলের লোক আবার খুশি হয়ে বললে, 'হ্যাঁ ওই প্রদর্শনীতে তো আমিও ছিলাম, তবে কখনো শুনিনি ওটার কথা। তা ছাড়া, কলকব্জার বিভাগে থাকলাম আর কোথায়? সারাক্ষণ তো মিডওয়েতেই কাটিয়েছি।'

'কিন্তু এবার,' বলতে থাকেন জজ, 'এই ফলই আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে রমণী-হৃদয়ের রহস্য ও দিব্যজ্ঞান। মিস্ গারল্যাণ্ড, আপেলটি নিন আপনি। শুনুন আমাদের রোমান্সের সাদাসিধে গল্প, তারপর আপনার ন্যায্যবিচারে যাকে মনে হয়, তাকেই দিন পুরস্কার।'

মহিলা যাত্রী মিষ্টি করে হাসল। আপেলটা তার কোলে পড়ে রইল আগুরাখা আর শালের ভেতর। সে ঘেরা-দুর্গের প্রাকারে কাত হয়ে অনায়াস আরামে উজ্জ্বল হয়ে বসল। নানা কণ্ঠস্বর আর হাওয়ার শব্দ না থাকলে হয়তো কেউ তার আদুরে ঘড়ঘড় আওয়াজও শুনতে পেত। কেউ গিয়ে আগুনে টাটকা লাকড়ি চাপায়। জজ মেনেফী সুন্দরভাবে মাথা নোয়ান। বলেন, 'এবার আমাদের প্রথম গল্পটা শোনাবেন দয়া করে?'

তুর্কী আসনের ভঙ্গিতে বসেছে হাওয়া-কলের মানুষ। দমকা হাওয়ার জন্য টুপিখানা মাথার অনেকখানি পেছনে ঠেলে-দেওয়া।

কোনো অপ্রতিভ ভাব না করে সে বলতে শুরু করে, 'সমস্যাটা আমি যেভাবে বুঝেছি তা মোটামুটি এই। রেডরুথকে অবশ্য যথেষ্টই নাকাল করেছিল এই ডুবুরি-পাখিটা যার ওড়াবার মতো টাকা ছিল, মেয়েটির কাছ থেকে ওকে আলাদা করতে চেষ্টা করেছিল। তাই রেডরুথ ফিরে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইল ওদের আগের কথা এখনো পাকা রয়েছে কিনা। বেশ কথা, কারুর যখন কোনো মেয়ের ব্যাপারে বাছাই করার ক্ষমতা থাকে, তখন কেউ চায় না অন্য লোক নাক গলাক্ গাড়ি আর সোনার তমসুকি নিয়ে। তা বেশ, সে যায় মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে। বেশ, সে না-হয় একটু গরমই হল, কথাবার্তা করল মালিকের ঢঙে, আর ভুলে গেল যে বাগ্দান বস্তুটা সবসময় নরম সীসের নল-বাঁধা গিঁট নয়। বেশ, আন্দাজ করি এতে অ্যালিসও খেপে উঠল লেসের জোয়ালের নিচে। তা বেশ, চড়া গলায় সেও জবাব শুনিয়ে দিল। বেশ, তখন ও—'

'আরে মোলো যা!'—বাধা দেয় সেই তেমন-কেউ নয় যাত্রী—'ওই অতোগুলো "বেশের" প্রত্যেকটার ওপর যদি আপনি হাওয়া-কল বানাতে পারতেন, তাহলে তো বুড়ো বয়েসে আর করে খেতে হত না আপনাকে, তাই না?'

হাওয়া-কলের লোক ভাল মনেই দাঁত বের করে হাসে।

'আরে ভাই, আমি তো কোনো গাই-ডি-মোপাসং নই, সিধে আমেরিকান কায়দায় বলছি আপনাদের। তা, মেয়েটি এইরকমই কিছু বলেছিল : "মিস্টার গোল্ড-বণ্ড নিছক বন্ধু, কিন্তু আমায় ঘোড়ায় চড়াতে নিয়ে যায়, থিয়েটারের টিকিট কিনে দেয়, যেটা তুমি কখনো কর না। জীবনে কি কোনো শখই করব না যতোক্ষণ তা করতে পারছি?" রেডরুথ বললে, "এসব ভ্যানর-ভ্যানর ছাড়। তোমার কোঁচকানো ভাঁজ-পড়া দস্তানাই এই উইলিকে দাও, নয়তো আমার আলমারির নিচে তোমার চটি সাজানো বন্ধ!"

'এখন, এই ধরনের হুকুমদারি কোনো মেয়ের বেলায় চলে না যার কিছুটা তেজ আছে। আমার বিশ্বাস মেয়েটা বরাবরই প্রিয় হবু-স্বামীকেই ভালবাসত। হয়তো সে চেয়েছিল, যেমন মেয়েরা চায়, একটু মজা আর সামান্য ক্যারামেলের জন্য দৌড়োতে। তারপর এক সময় স্থির হয়ে বসত জর্জের অন্যজোড়া দস্তানা রিপু করতে, আর তার লক্ষ্মী বউ হতে। কিন্তু সে লোকটা তো নিজের খেয়াল নিয়ে মত্ত, কিছুতেই মাথা নোয়াবে না। তাই শেষে, মেয়েটি তার আংটি ফিরিয়ে দিল, তা বেশ; জর্জও নিরুদ্দেশ হয়ে মদ ধরল। হ্যাঁ। ব্যাপারটা হয়েছিল সেই থেকেই। আমার বিশ্বাস দুদিন পরেই মেয়েটি ওই ফ্যান্সি-জামা টাকার কুমিরটাকে খেদিয়ে দেয়, যখন ওর একমাত্র লোকই ওকে ছেড়ে চলে গেল। জর্জ একটা মালের জাহাজে চেপে অজানা দেশে পাড়ি দেয়। ওর বুড়ো মদ-বন্ধুকে নিয়েই বহু বছর কাটিয়ে দেয়, তারপর রাসায়নিক জল আর অ্যাসিডের প্রভাব শুরু হয় ওর ওপর। জর্জ বলে, "এবার চাই সন্ন্যাসীর কুঁড়েঘর, লম্বা দাড়ি আর সেই লুকোনো গুপ্তধন যা ওখানে নেই।"

'কিন্তু আমার ধারণায় অ্যালিস্ ছিল ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে। সে কখনো বিয়ে করেনি, কপালের ভাঁজ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ধরল টাইপিস্টের কাজ, আর রেখেছিল একটা বেড়াল যা "উইনি-উইনি" করে ডাকলেই চলে আসত। ভালো মেয়েদের ওপর আমার অগাধ আস্থা। বিশ্বাস করি না তারা যাকে সত্যি ভালবাসে তাকে টাকার জন্যই কেবল ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।'

হাওয়া-কলের মানুষ থামল।

মহিলা যাত্রী তার নিচুগলা সামান্য কাঁপিয়ে বলল, "আমার মনে হয় এটি চমৎ—'

'ও মিস্ গারল্যাণ্ড!' জজ মেনেফী হাত উঁচু করে মাঝখানে বলে উঠলেন, 'দয়া করে—কোনো মন্তব্য নয়! অন্য প্রতিযোগীদের পক্ষে সেটা ন্যায্য হবে

না। মিঃ-ইয়ে—আপনি পরের গল্পটা বলবেন?' জজ আহ্বান জানালেন সেই ছোকরাকে যার দালালির ব্যবসা।

কাঁচুমাচুভাবে হাত কচ্‌লে যুবক বলতে শুরু করল, 'রোমান্সটার ব্যাপারে আমার ভাষ্য হবে এই রকম: পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ওরা কোনোরকম ঝগড়া করেনি। মিঃ রেডরুথ মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে দুনিয়ার পথে নেমে পড়ল ভাগ্যের সন্ধ্যানে। সে জানত তার প্রেমিকা তার প্রতি একনিষ্ঠই থাকবে। অমন বিশ্বস্ত অনুরাগভরা হৃদয়ের ওপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ফেলবে, তা সে ভাবতেই ঘৃণাবোধ করত। আমার ধারণায় মিঃ রেডরুথ ওয়াইওমিঙের রকি-পাহাড়ে চ'লে গিয়েছিল সোনার সন্ধানে। একদিন ওর কাজের সময়েই একদল জলদস্যু সেখানে নেমে পড়ে, আর তাকে বন্দী করে। আর—'

'এই, এই! ওটা কী হল?' চেঁচিয়ে উঠেছে সেই যাত্রী যে তেমন-কেউ নয়—'একদল জলদস্যু নামল রকি পাহাড়ে? বলবেন কি কেমন করে তারা জাহাজে এল—'

'নামল ট্রেন থেকে,' মৃদুকণ্ঠে জবাব, একেবারে অপ্রস্তুত তা কিন্তু নয়—'ওরা ওকে গুহার মধ্যে বন্দী করে রাখে কয়েক মাস, তারপর ওকে শত-শত মাইল দূরে আলাস্কার জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে এক সুন্দরী ইণ্ডিয়ান মেয়ে তার প্রেমে পড়ে, কিন্তু তবু সে অ্যালিসেরই চির-অনুরক্ত থাকে। আরো এক বছর জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে সে বেরিয়ে পড়ে হীরা নিয়ে—'

'কোন্ হীরা?'—গুরুত্বহীন যাত্রী এবার প্রায় খাড়া হয়ে বলে।

'যেগুলো সেই জিনসাজের মুচি তাকে পেরুর মন্দিরে দেখিয়েছিল,' অন্যজন একটু অস্পষ্টভাবেই বলে—'যখন সে ঘরে ফিরে এল, অ্যালিসের মা তাকে কাঁদতে-কাঁদতে নিয়ে গেল উইলোগাছের নিচে একটা সবুজ ঢিবির কাছে। ওর মা বললে, "তুমি চলে যাবার পর ওর তো বুক ভেঙেই গেল।" মিঃ রেডরুথ শোকার্ত হয়ে অ্যালিসের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, "আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—চেস্টার ম্যাকিনটশের কী হল?" বুড়ি জবাব দিলে, "যখন সে বুঝেছিল যে ওর হৃদয় পড়ে আছে তোমার কাছেই, সে দিনের পর দিন আক্ষেপ করে কাটাল, শেষমেষ গ্র্যাণ্ড র‍্যাপিড্‌স্-এ একটা আসবাবের দোকান শুরু করে দিল। তারপর এই সেদিন আমরা খবর পেলাম, সাউথ বেণ্ড ইণ্ডিয়ানার কাছে একটা ক্ষিপ্ত মুজ্ হরিণ তাকে গুঁতিয়ে মেরে দিয়েছে। ও সেখানে গিয়েছিল সভ্য জগতের দৃশ্য ভুলে দূরে থাকতে।" এই সব শুনে মিঃ রেডরুথও মানুষের মুখ আর দেখবে না প্রতিজ্ঞা করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়—যেমন আমরা পরে দেখলাম।'

দালাল-ব্যবসায়ী ছোকরা গল্প শেষ করল এই বলে—'আমার কাহিনীতে হয়তো সাহিত্যিক গুণ নেই, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি সেই যুবতি আগাগোড়াই বিশ্বস্তা ছিল। সত্যিকারের প্রেম ছাড়া কোনো সম্পদের দিকেই তার

ঝোঁক ছিল না। আমি নারীদের এমনই তারিফ করি আর বিশ্বাস করি যে অন্য কিছু ভাবতেই পারি না।'

মহিলাযাত্রীর গদীয়ান হয়ে বসা কোণটির দিকে আড়চোখে চেয়ে গল্পকার থামল।

এবার জজ মেনেফী অনুরোধ করলেন বিলডাড রোজকে---আপেলের বিচারের প্রতিযোগিতায় তার কাহিনীর ভাষ্যটা শোনা যাক। গাড়ি-চালকের রচনা হল সংক্ষিপ্ত।

বলল, 'আমি কোনো লোবো-নেকড়ে নই যারা সব সময় মেয়েদেরই দোষ দেয় জীবনের নানা দুঃখকষ্টের জন্য। কল্পিত গল্পটার ব্যাপারে, জজ সাহেব, আমার তথ্যগুলো হবে এই রকম। রেডরুথকে যা অসুস্থ করে তুলেছিল তা স্রেফ আলসেমি। ও যদি মাথা তুলত, আর এই পার্সিভাল ডি-লেসিটিকে গুলি করে মারত তাহলেই হত সবদিক থেকে মঙ্গল—পার্সিভালই চেষ্টা করেছিল তাকে বাইরের পথে বেচাল করতে আর অ্যালিসকে আঙুর লতায় দুলিয়ে ওর চোখে ঠুলি পরাতে। যে মেয়েমানুষকে তোমার চাই, তার জন্য পরিশ্রমও করতে হবে নিশ্চয়ই?

'রেডরুথ শুধু তার স্টেট্সনটা মাথায় চাপিয়ে বলল, "যখনই আবার আমায় দরকার পড়বে, ডেকে পাঠিও।" ব্যস্ তারপর হেঁটে চলে গেল। সে হয়তো এটাকে বলত তার অহঙ্কার, কিন্তু এর "নিষ্কম্মাশাস্ত্রীয়" নাম কুড়েমি। কোনো মহিলাই চায় না পুরুষের পেছনে ছুটতে। মেয়েটি বলে, 'যদি চায় নিজে থেকেই ফিরে আসুক।' আর আমি হলপ করে বলতে পারি টাকার ঝুড়িওয়ালা ছোক্রাকে সে দুলকি-চালেই চলে যেতে বলেছিল; তারপর সে সময় কাটায় জানলার বাইরে চেয়ে, কবে সেই খালি-পকেট আর খরখরে গোঁপওলা লোকটা ফিরে আসবে।

'আমার ধারণা রেডরুথ প্রায় ন'বছর সবুর করেছিল এই আশা করে যে মেয়েটি কোনো নিগ্রো ছোকরাকে চিঠি দিয়ে পাঠাবে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে। কিন্তু তা সে করেনি। রেডরুথ ভাবল "না, এ খেলায় কাজ হবে না। ঠিক আছে আমিও কাজ করব না।" তারপর সে ঢোকে সন্নিসীর পেশায়, দাড়ি রাখতে শুরু করে। হ্যাঁ কুড়েমি আর দাড়ি, দুটোই চমৎকার জুটি। একসঙ্গেই চলে দুটো। কখনো কোনো লম্বা চুলদাড়ির লোককে শুনেছেন বিশাল সোনার খনি বাগাতে? না। মার্লবরোর ডিউককে দেখুন, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলের এই অলস মালিককে দেখুন। তারা কিছু পেয়েছে কি?

'এখন, অ্যালিস তো আর বিয়েই করেনি, তা ঘোড়া বাজি রেখে বলতে পারি। রেডরুথ যদি আর-কাউকে বিয়ে করে বসত, তাহলে সেও তেমনই করত। কিন্তু রেডরুথ আর ফিরেই এল না। ওর কাছে এই যে সব জিনিস, যাকে বলে গভীর অনুরাগের স্মৃতি, হয়তো একগাছি চুল, কিংবা জামার সেফটিপিন যা রেডরুথ ভেঙে ফেলেছিল, সবই যত্নের সঙ্গে রাখা। এসব ধরনের জিনিস যেন স্বামীর মতোই কোনো-কোনো মেয়ের চোখে। আমি বলব সে নিঃসঙ্গই থেকে গেল। বুড়ো রেডরুথের নাপিত বর্জন আর ফর্সা জামার ওপর বিরাগের জন্য আমি কোনো মহিলাকে দুষতে পারি না।'

এর পরে বলবার পালা এল 'তেমন-কেউ-নয়' সেই যাত্রীর। আমাদের কাছে সে নামহীন, প্যারাডাইস থেকে সানসিটি—এই তার ভ্রমণের পথ।

কিন্তু বিচারকের ডাক পেয়ে সে যখন এল, আগুনের আলো খুব একটা স্তিমিত না হলেও, তাকেই আপনারা দেখবেন।

মরচে-বাদামি পোশাকে, রোগাটে গড়নের লোকটা দু'বাহুতে পা দুখানা জড়িয়ে বসে আছে ব্যাঙের মতন, চিবুকটা হাঁটুর ওপর রাখা। নরম, শনের দড়ির রঙ চুল, টিকলো নাক, ঠোঁটজোড়া ছাগ-দেবতার মতো—তামাক দাগানো কোণদুটো ওপর দিকে কোঁচকানো। মাছের মতো চোখ, ঘোড়ার নালের টাইপিন গাঁথা লাল নেকটাই। প্রথম দিকের খস্‌খসে চাটনি-চাটা উচ্চারণগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একেকটা শব্দের মধ্যে।

'এতক্ষণ অবধি প্রত্যেকেই ভুল বলেছেন। কী! কমলা-ফুলের সুগন্ধ ছাড়া আবার রোমান্স হয় নাকি! হা হা! আমার বাজি রইল ওই প্রজাপতি-মার্কা টাই আর ট্রাউজারের পকেটে ঋণপত্রের চেক-নিয়ে ঘোরা ছোকরাটার ওপরেই।

'ফটকের সামনে ওদের ছাড়াছাড়ি হবার ব্যাপারটা থেকেই ধরব? ঠিক আছে! রেডরুথ রাগের মাথায় বলল, "তুমি কখনো আমায় ভালবাসোনি, না হলে যে-লোক তোমাকে আইস্‌ক্রিম কিনে দেয় তার সঙ্গে কথা বলতে না।" মেয়েটি বললে, "আমি ওকে ঘেন্না করি, দারুণ অপছন্দ করি ওর সাজসজ্জার গাড়ি; আমাকে যে সুন্দর ক্রীম-বন্‌বন্ মিঠাই সত্যিকারের লেস্‌বাঁধা উপহার বাক্সে করে পাঠায়, সেগুলো দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমাকে যখন সে কিনারায়-আঙুরপাতা নক্‌শা-করা নিরেট মোহর উপহার পাঠায়, ফিরোজা আর মুক্তোর কাজ-করা লকেটে—আমার তখন মনে হয় তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিই। তার সঙ্গে পালাব! আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি।" রেডরুথ বলে, "ফিরে যাও আরামের কোণটাতে। আমি কি ইস্ট্ অরোরাতে লেখাপড়া করে চুক্তি করেছিলাম? যদি চাও তো ঐশ্বরিক প্রেম নিয়ে থাক। আমার কোনো ছাপ্পড়-ফোঁড় ঐশ্বর্য নেই। তোমার বন্ধুটিকে আরো কিছুদিন ঘেন্না কর গিয়ে। আমার জন্য থাকবে এ্যাভিন্যু বি-র সেই নিকারসন মেয়েটি, আর চিউয়িং গাম, আর ট্রলিবাসে ঘোরা।"

'সে রাতেই এল জন ক্রিসাস্। নিজের মুক্তো-পিনটা ভাল করে এঁটে বললে, "সে কী! কাঁদছ যে!" ছোট অ্যালিস ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, "তুমি আমার প্রেমিককে তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।" জন বলে একটা হেনরি-ক্লে চুরুট ধরিয়ে—"তা হলে আমাকেই বিয়ে কর না কেন?" ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েটা চেঁচায়, "কী বলছ! তোমায় বিয়ে করব! কক্ষনো নয়।" বলে, "এই ঝামেলা অন্তত কেটে যাক, আমিও কিছু কেনাকাটা করতে পারি কিনা দেখি, আর তুমি লাইসেন্সের ব্যাপারটা দেখ। পাশের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে, যদি জেলার পুরোহিতকে ফোন করতে চাও।"

কাহিনীকার থামল তার বিশ্বনিন্দুক চাটনি-চাটার শব্দ প্রয়োগ করে।

ফের বলল সে, 'ওরা কি বিয়ে করেছিল? হাঁস কি বাদলা-পোকা খাবে না? এবার দাঁড়াচ্ছি বুড়োখোকা রেডরুথের তরফে। ওখানেই আবার আপনারা সবাই ভুল করেছেন,—আমার তত্ত্ব অনুসারে। সে সন্ন্যাসী হয়ে গেল কিসের দুঃখে? কেউ বললেন, আলসেমি; কেউ বললেন অনুশোচনা; আবার কেউ বললেন মদ্যপান। আমি বলি মেয়েমানুষই এ কাজ করেছে। বুড়োটার বয়েস কত এখন?'—বিলডাড রোজের দিকে ফিরে বক্তা প্রশ্ন করে।

'তা, বলব পঁয়ষট্টি!'

'বেশ কথা। সে তার সন্ন্যাসীর আস্তানা এখানে চালু রেখেছে কুড়ি বছর। দেখুন, ফটকের সামনে সে যখন টুপি খুলেছিল তার বয়েস ছিল পঁচিশ। তার মানে বাকি কুড়ি বছরের হিসেব দিতে হয় তাকে, নয়তো কাঠগড়ায় তুলতে হয়। কোথায় কাটিয়েছিল সে ওই দশ যোগ-পাঁচ-আর-পাঁচ বছর? আমার যা ধারণা তা বলছি। দুই-বিয়ের দায়ে ধরা পড়েছিল। ধরুন, সেন্ট জো-তে ছিল সেই মোটা সোনালি-চুলো মেয়েটা, আর স্কিলেট রিজে তামাক-বাদামি চুলের মেয়েটা, আর 'ক'-উপত্যকায় সোনার দাঁত-ওয়ালিটা। রেডরুথের মামলা জট পাকিয়ে যায়, ওকে তারা ঠেলে দেয় রাস্তায়। সাজা মিটে যাবার পর সে বলে, "ঘাগরার ক্রিনোলাইন ছাড়া যে কোনো লাইনই আমার পক্ষে সই। সন্ন্যাসীর ব্যবসাতে ভিড়ের চাপ নেই, আর চাকরির জন্য তাদের কাছে স্টেনোগ্রাফাররাও কখনো আবেদন করে না। হাসিখুশি সন্ন্যাসীর জীবনই ভাল আমার পক্ষে। আর কক্ষনো চিরুনিতে লম্বা চুল, আর ছাইদানে চিউয়িং গাম নয়।" আপনারা বলছেন বুড়ো রেডরুথকে ওরা পাগলখানায় নিয়ে গিয়েছিল কারণ সে নিজেকে রাজা সলোমন ভেবেছিল? বাজে কথা! সে সত্যিই ছিল সলোমন। আমার কথা এই পর্যন্তই। জানি কোনো আপেলের পুরস্কার এর জন্য নেই। "সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠাইলাম-পছন্দ না হইলে রচনা ফেরত দিবেন"। পুরস্কার জেতার মতো এলেম এতে নেই।'

'এমন-কেউ-নয়' যাত্রীটি যখন উপসংহার টানল, জজ মেনেফীর কড়া হুকুমে কেউ গল্পের ওপর কোনো টিপ্পনি না কেটে চুপ করে রইল। এবার এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধক নিজের গলা সাফ করে পুরস্কারের শেষ ভাষ্যটি বলতে শুরু করলেন। যদিও যৎসামান্য আয়াস করেই মেঝের ওপর বসেছিলেন, তবু জজ মেনেফীর মর্যাদা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হতে দেখা যায়নি। লক্ষ্য করলেও তা বোঝায় উপায় নেই। ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসা আগুনের আভা তাঁর মুখের ওপর—যেন পুরনো মুদ্রায় খচিত রোমান সম্রাটের প্রতিরূপ, তাঁর সম্মানিত ধূসর কেশের ঘন কুঞ্চনের মধ্যে।

স্থির অথচ অনুরণিত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন—'নারীর হৃদয়! তার পরিমাপ করার আশা কে করতে পারে? পুরুষের আচরণ ও কামনাবাসনা বিচিত্র; মনে হয় সমস্ত নারীর হৃদয় একই ছন্দে স্পন্দিত হয়—ভালবাসার সেই একই প্রাচীন

সুরে। স্ত্রীলোকের কাছে ভালবাসা মানে "ত্যাগ"। সে নামের যোগ্য যদি সে হয়, কোনো সোনাদানা উচ্চপদ তাঁর খাঁটি অনুরাগের চেয়ে বেশি ওজনদার হতে পারে না।

'জেন্ট্‌লমেন অব্ দি—ইয়ে, বলা উচিত বন্ধুগণ! রেডরুথ বনাম প্রেম ও প্রীতি—এই হল বিচারের বিষয়। তবু বলব, বিচারটা আসলে কার? রেডরুথ নয়, কারণ সাজা তার এর মধ্যেই মিলেছে। সেই সব অমর ভক্তি-আবেগও নয় যা দেবদূতদের আনন্দের পোশাকে আমাদের জীবনকে ঢেকে রাখে। তাহলে কার? আজ রাতে এখানে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন জবাব দিতে—বীর-পৌরুষ, না অন্ধকার, কোন্‌টা তাঁর বুকে বাসা বেঁধে আছে? আমাদের বিচার করতে বসেছে নারীজাতি, একজন অতি কমনীয় নারীর রূপ ধরে। তাঁর হাতে ধরা আছে পুরস্কারটি, নিজস্ব মূল্যের বিচারে হয়তো অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু নারীসুলভ বিচারবুদ্ধি ও রুচির এমন এক প্রতিভূর কাছ থেকে, যা পরিতোষিক রূপে পাওয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ উদ্যমের যোগ্য।

'রেডরুথ, আর সেই কমনীয়া নারী, যাকে সে হৃদয় দিয়েছিল—এদের কল্পিত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি সজোর কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাব কিছু অবাঞ্ছিত বক্রোক্তির। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলো এই যে কোনো নারীরই স্বার্থপরতা, অথবা বিশ্বাসহীনতা বা বিলাসের আসক্তি, তাকে ঠেলে দিয়েছিল সংসার থেকে বিবাগী হবার পথে। আমি কখনো মেয়েমানুষকে অতটা অবিবেকী পেশাদারী হিসেবে দেখিনি। কারণটা বের করতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে অন্যত্র—মানুষের হীন প্রবৃত্তি আর নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে।

'সেই স্মরণীয় দিনটাতে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে খুব সম্ভব দুজনের মধ্যে একটা প্রেম ঘটিত ঝগড়াই হয়েছিল। ঈর্ষার জ্বালা সইতে না পেরে যুবক রেডরুথ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল স্বদেশের বিচরণভূমি থেকে। কিন্তু সেটা করার পেছনে কি যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল? এর সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণের চেয়েও উচ্চতর কিছু আছে; আছে নারীর সদাশয়তার মধ্যে চিরকালীন বিপুল আস্থা, যা প্রকাশ পায় প্রলোভনের বিরুদ্ধে দৃঢ়তায়, বাড়িয়ে-ধরা ঐশ্বর্যের সামনেও নিজের একনিষ্ঠতায়।

'আমি মনে-মনে একটা ছবি কল্পনা করি—একগুঁয়ে প্রেমিক সারা পৃথিবীতে পাগলের মতো ঘুরছে। নিজের যাতনা নিজেই ভোগ ক'রে। কল্পনা করি তার ক্রমান্বয় অধোগতির ছবিটা, তারপর অবশেষে তার চূড়ান্ত হতাশা, যখন সে উপলব্ধি করল জীবন তাকে সর্বোত্তম যে উপহারটি দিতে পারত তা সে হারিয়েছে। তখনই তার দুঃখের সংসার থেকে সন্ন্যাস-গ্রহণ আর পরবর্তী মানসিক দুর্যোগের ব্যাপারটা সহজবোধ্য হয়।

'কিন্তু অন্য তরফটাতে আমি কী দেখি? একাকিনী এক মহিলা বছরে পর বছর গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে ম্লান, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু তবু সে বিশ্বস্তা, তবু প্রতীক্ষমানা, তবু একটা দেহমূর্তি দেখবার জন্য, একটা পদশব্দ শোনার জন্য সজাগ—কিন্তু সে-মূর্তি সে-শব্দ আর আসবে না। সে এখন বৃদ্ধা। চুল সাদা, মসৃণ জটে বাঁধা। রোজই দরজার সামনে বসে আকুল নয়নে চেয়ে থাকে ধুলোভরা রাস্তার দিকে। ফটকের সামনেও দাঁড়িয়ে থাকে তার আত্মা, ঠিক যেভাবে সে ওকে ছেড়ে গিয়েছিল—চিরদিন তারই, তবু এই মাটিতে নয়। হ্যাঁ, এ ছবিই আঁকে নারীর প্রতি আমার বিশ্বাস, আমার চিত্তপটে। পৃথিবীতে চিরবিচ্ছিন্না, কিন্তু অপেক্ষমানা! স্বর্গোদ্যানে আবার তাদের দেখা হবে, এই ওর প্রত্যাশা; আর সে পুরুষটি পড়ে আছে নৈরাশ্যের পাঁকে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম সে পাগলাগারদে আছে,' বললে সেই তেমন-কেউ-নয় যাত্রী।

বিচারক মেনেফী অধৈর্য হয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন। লোকগুলো ঝুঁকে বসে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। হাওয়ার প্রচণ্ডতা খানিকটা কমেছিল। এবার তা দমকে-দমকে প্রবল ফুৎকারের মতো আসে। আগুন পুড়ে এক পালা লাল কয়লায় পরিণত হয়েছে, তারই সামান্য আভা আসে কামরার মধ্যে। মহিলা যাত্রীকে তার আরামদায়ক কোণটির মধ্যে দেখায় কিছুটা অবয়বহীন জড়ভরতের মতো। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চকচকে চুল, জড়ানো স্কার্ফের ওপর জেগে রয়েছে শুধু এক চিলতে ফর্সা কপাল।

বিচারক মেনেফী কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন।

ঘোষণা করলেন, 'এবার, মিস্ গারল্যাণ্ড, আমরা আমাদের পালা সমাপ্ত করেছি। এখন আপনার পুরস্কার দিতে হবে সেই ব্যক্তিকে যার বক্তব্য—বিশেষ করে সত্যকার নারীত্বের মূল্যায়নে যার বক্তব্য আপনার নিজস্ব বিচারের সবচেয়ে কাছাকাছি।'

মহিলা যাত্রীর তরফ থেকে কোনো জবাব এল না। বিচারক মেনেফী সনির্বন্ধে ঝুঁকে পড়লেন। সেই 'তেমন-কেউ-নয়' যাত্রীটা নিচু গলায় খস্‌খস্ করে হাসল। মহিলা বড় স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে ঘুমোচ্ছে। বিচারক চেষ্টা করলেন হাত ধরে তাকে জাগাতে। সেটা করতে গিয়ে তার হাত ঠেকল মহিলার কোলে ছোট, ঠাণ্ডা, বর্তুল ও বিকৃতাকার কিছুতে।

'উনি তো আপেলটা খেয়ে ফেলেছেন।'—জজ মেনেফী বিস্মিত কণ্ঠে ঘোষণা করে আপেলের শাঁসখানা উঁচু করে তাদের দেখালেন।

"The Sphinx Apple", এভরিবডি'স্, ১৯০৩

ত্রিভুজ

ঠিক ছ'টার সময় লম্বা-হাতলওয়ালা ইস্ত্রিখানা নামিয়ে রাখে আইকি স্নিগ্‌লফ্রিৎস। আইকি দরজির শিক্ষানবিস। আজকাল কি আর দরজিদের শিক্ষানবিস আছে? সে যা হোক, আইকি কিন্তু একটা দরজি-দোকানের বাষ্পময় দুর্গন্ধে সারাদিন বসে মেহনত করে—কাঁচি চালায়, টাক সেলাই করে, ইস্ত্রি করে, তালি দেয়, কাপড় ভেজায়। কিন্তু একবার কাজ খতম হলে আইকি তার কল্পনার রথ বাঁধে যেন আশমানের কোনো তারার সঙ্গে—যেদিক দুচোখ যায়।

আজ শনিবারের রাত। দোকানের মালিক তার হাতে গুঁজে দিয়েছে বারোটা নোংরা আর নারাজ ডলার। আইকি যত্ন করে হাত মুখ ধোয়, কোট হ্যাট পরে, রঙ্‌চঙে টাই-ওলা কলার আঁটে, তাতে 'ক্যালসিড্‌নি' পিন, তারপর বেরিয়ে পড়ে নিজের আদর্শের সন্ধানে।

আমাদের প্রত্যেকের কাছেই তো সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিজের-নিজের আদর্শের খোঁজ—সেটা প্রেমই হোক, তাসের পিনক্‌ল্‌-খেলাই হোক, নিউবার্গ-ধাঁচের চিংড়িমাছই হোক, অথবা ছাতাপড়া বইয়ের তাকের স্নিগ্ধ নীরবতাই হোক।

দেখুন না আইকিকে—কেমন স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছে ঝকঝকে "এল্‌—" বিজ্ঞাপনগুলোর তলা দিয়ে—যার ফাঁকে ভ্যাপসাগন্ধ বেগার-খাটার কারখানা। বিবর্ণ, ঝুঁকে-পড়া, অকিঞ্চিৎকর, নোংরা চেহারার লোকটা, যার অস্তিত্ব চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে শরীর ও মনের চরম জীর্ণতার মধ্যে, তবু এখন সে-ই শস্তা ছড়ি দুলিয়ে যেরকম সিগ্রেটের অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া গিলছে তাতে আপনার মনে হবে তার ওই শীর্ণ বুকের মধ্যেও সে পুষে রেখেছে সমাজের জীবাণু।

আইকির পা-দুটো তাকে টেনে নিয়ে যায় সেই বিশ্রুত প্রমোদের জায়গায় যাকে সবাই 'কাফে ম্যাগিনি' বলে জানে—বিখ্যাত, কারণ সেটা হল বিলি ম্যাকমাহানের আড্ডাস্থল। ম্যাকমাহান শ্রেষ্ঠ মানব, পরমতম আশ্চর্য মানব—আইকের ধারণায়, অমন মাত্র একজনকেই সৃষ্টি করেছে পৃথিবী।

বিলি ম্যাকমাহান শহরের এই এলাকার নেতা। "চিতাবাঘ" তাঁর কাঁধের ওপর বসে ঘরঘর করে, আর তাঁর হাতে রয়েছে সকলকে বিলোবার মত অমৃত। আইকি যখন ভেতরে প্রবেশ করল, ম্যাকমাহান তাঁর কলরব মুখর সঙ্গীসাথী সেনাপতিদের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে বিজয় আর শৌর্যের গর্বে উজ্জ্বল। মনে হয় কোনো একটা নির্বাচন সবে সমাপ্ত হয়েছে; জেতা হয়েছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আসন; প্রতিরোধহীন ব্যালটের ঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে শহরকে নিজের লাইনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আইকি বারের সামনে লঘু ভঙ্গিতে উঠে বসে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল তার আরাধ্য দেবতার দিকে, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার।

কী জাঁকালো মানুষ ওই বিলি ম্যাকমাহান। বিশাল মসৃণ হাস্যময় মুখমণ্ডল। ধূসর চোখদুটোর নজর বাজপাখির মতো চোখা। হীরার আংটি। তূর্যনাদের মতো কণ্ঠস্বর, রাজসিক হাবভাব, সুপুষ্ট সক্রিয় তাঁর টাকার বাণ্ডিল। বন্ধু আর মিতাদের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান। ওঃ কী রাজার মতো মানুষ একজন! পাশের সঙ্গীসাথীদের কেমন নিষ্প্রভ করে দেন, যদিও তারা নিজেরাই একেকজন গুরুগম্ভীর সুবিশাল জ্যোতিষ্ক—তাদের চেহারায় কেউ-কেটা ভাব, খাটো ওভারকোটের পকেটের গভীরে তাদের হাত থাকে গোঁজা! কিন্তু বিলি!—আইকি স্নিগেলফ্রিৎসের চোখে তাঁর যা ছবি তা ভাষা দিয়ে বর্ণনা করাই দুঃসাধ্য যে!

বিজয়ের আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে কাফে. ম্যাগিনি। সাদাকোট-পরা বার-রক্ষকরা যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বোতল, ছিপি আর গেলাসের ওপর। গোটা কুড়ি হাভানা চুরুটের ধোঁয়া বাতাসে সৃষ্টি করে মেঘকুণ্ডলীর হেঁয়ালি। আশান্বিত আর বিশ্বস্ত যারা তারা বিলি ম্যাকমাহানের সঙ্গে করমর্দন করে। আর তখনই আইকি স্নিগেলফিৎসের ভক্ত হৃদয়ে হঠাৎ জেগে ওঠে একটা চাঞ্চল্যকর বেপরোয়া আবেগ।

যেখানে মহান নেতা ঘোরাফেরা করছেন সামনের সেই ছোট ফাঁকা জায়গাটার দিকে হেঁটে যায় সে, হাত বাড়িয়ে দেয় নিজের।

কোনো দ্বিধা না করেই তার হাতটা চেপে ধরেন বিলি ম্যাকমাহান, হাত ধরে ঝাঁকান আর হাসেন।

আকাশের দেবতারা এই বুঝি তাকে ধ্বংস করে ফেলল—পাগলের মতো ভেবে নিয়ে আইকি নিজের তলোয়ারের খাপ ছুড়ে দিয়ে যেন হামলে পড়ে অলিম্পাসের চূড়ায়!

অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'আমার সঙ্গে একটু মদ্যপান করুন বিলি। আপনি আর আপনার বন্ধুরা মিলে?'

'তাতে আমার একটুও আপত্তি নেই, ওল্ড ম্যান,' বললেন মহান নেতা, 'আনন্দটা চলতে থাকুক এই চাই।'

আইকির বিবেচনাবোধের শেষ শিখাটাও আর থাকে না। বার-রক্ষকের উদ্দেশে হুকুম জানায়—'ওয়াইন!' উদ্যত হাত তার কাঁপছে।

তিনটি বোতলের ছিপি খোলা হল। বারের ওপর সাজিয়ে-রাখা গেলাসের দীর্ঘ সারি বুদ্বুদ-ফেনিল হয়ে উঠল শ্যাম্পেনে। বিলি ম্যাকমাহান নিজের গেলাসটা তুলে নিয়ে উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে মাথা নোয়ালেন আইকির দিকে। সাঙ্গোপাঙ্গ আর চামচারাও নিজেদেরগুলো তুলে নিয়ে ঘর্ঘরে গলায় বলল—'তোমার নামে পান করছি।' আইকি যেন ভাবের ঘোরে পান করে তার অমৃত। সবাই পান করে।

দলামোচা একটা নোটের তাড়ায় আইকি তার পুরা হপ্তার মাইনে তুলে দিল কাউন্টারে।

বারোখানা এক-ডলারের নোট হাত দিয়ে সমান করতে করতে বার-রক্ষক বলল—'ঠিক আছে'। ভিড়টা আবার ছেঁকে ধরে ম্যাকমাহানকে ঘিরে। কেউ একজন বলছিল ম্যাকমাহান তাকে কেমন করে জায়গা করে দিয়েছে এগারো নম্বর রাস্তায়। বারের ওপর খানিকক্ষণ হেলান দিয়ে অবশেষে আইকি বেরিয়ে গেল।

হেস্টার স্ট্রীট ধরে হেঁটে, ক্রিস্টির চড়াই-পথ, তারপর গিয়ে পৌঁছোয় সেই ডেলান্সিতে যেখানে সে থাকে। বাড়িতে মেয়েমানুষ বলতে তার ছিনে-জোঁক মা, আর তিন ইল্লুতে বোন। মাইনেটা কেড়ে নিতে ওর ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর ও সবকিছু স্বীকার করলে তারা চিৎকার করে গালিগালাজ ঝাড়ে এ পাড়ারই চৌকস বাক্যালংকারে।

ওরা যখন তার চুলদাড়ি উপড়ে পেটাচ্ছে তখনো কিন্তু আইকি রয়েছে তার তূরীয় আনন্দে বিভোল হয়ে। মেঘ ছাড়িয়ে উঠেছে তার মাথা, আশমানের তারা যে তার রথ টেনে চলেছে! ও যে কীর্তি আজ করেছে তার কাছে মাইনে গচ্চা যাওয়া কোন্ ছার, মেয়েমানুষদের গর্দভ-চিৎকারও অতি সামান্য বিষয়।

ও আজ বিলি ম্যাকমাহানের সঙ্গে করমর্দন করেছে।

* * *

বিলি ম্যাকমাহানের যে স্ত্রীটি আছেন তার ভিজিটিং কার্ডে খোদাই করা নাম "মিসেস উইলিয়ম ডারাগ্ ম্যাকমাহান"। আর এই কার্ডগুলো নিয়েই মাঝে মাঝে হয় বিরক্তিকর বিপত্তি, কারণ ওগুলো এমনই ক্ষুদ্র যে সব রকম জায়গায় সেগুলো পেশ করা চলে না। বিলি ম্যাকমাহান হলেন রাজনীতির একজন ভাগ্যনিয়ন্তা, ব্যবসার ক্ষেত্রে চারদেয়ালে-ঘেরা তোরণ, যেন কোনো মোগল বাদ্শাহ, যাকে ওঁর নিজের লোকেরাও ভয় করে, ভক্তি করে আর মান্য করে চলে। দিনদিন তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে; দৈনিক পত্রিকাগুলো ডজন-খানেক প্রতিবেদক রেখেছে ওঁর পায়ে-পায়ে, যাতে ওর প্রত্যেকটা জ্ঞানের উক্তি লিপিবদ্ধ থাকে; কার্টুন ছবিতেও তাঁকে সম্মানই করা হয়েছে চেন-বাঁধা চিতাবাঘটিকে টেনে রেখেছেন দেখিয়ে।

কিন্তু অন্তরে অন্তরে একেক সময় বিলির হৃদয় কাতর হয়ে পড়ে। মানুষ জনের একটা বিশেষ জাত থেকে তিনি আলাদা, কিন্তু মোজেজের দূরদর্শী চোখেই দেখেন 'আগামী শপথের' সেই রাজ্য। আইকি স্নিগলফ্রিৎসের মতো তাঁরও কিছু আদর্শ আছে; আর একেকসময় তা পাবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হলে তাঁর নিজস্ব নিরেট সাফল্যগুলোই মুখে যেন বিবর্ণ বিস্বাদ লাগে। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতি উইলিয়ম ডারাগ্ ম্যাকমাহানের মেদপুষ্ট কিন্তু সুন্দর মুখেও ফুটে ওঠে অতৃপ্তির চিহ্ন। তার সিল্ক-পোশাকের সরসরানিও মনে হয় যেন দীর্ঘশ্বাস!

একটা বিখ্যাত অতিথি নিবাসের বিশাল ভোজনকক্ষ যেখানে ফ্যাশান জগতের মনোরম প্রদর্শনী হয়ে থাকে, আজ বহু গণ্যমান্য সাহসী মানুষ জুটেছেন সেখানে।

একটা টেবিলে বসেছেন বিলি ম্যাকমাহান আর তাঁর স্ত্রী। বেশির ভাগ সময় তাঁরা নীরব, তবে যা নানান্ জিনিস তারা উপভোগ করছেন তার মধ্যে বাক্য একটা বাহুল্যমাত্র। মিসেস্ ম্যাকমাহানের হীরাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবার লোক খুব কমই আছে এই কক্ষে। ওদের টেবিলের ওপর ওয়েটার পরিবেশন করে গেল সবচেয়ে মূল্যবান জাতের ওয়াইন। সান্ধ্য কালো পোশাকে, মস্ত মসৃণ মুখমণ্ডলে বিষণ্নতার আভাস নিয়ে বিলিকে যেমন লক্ষনীয় দেখাচ্ছে তেমন আর কোনো মূর্তিকেই দেখতে পারেন না এখানে।

চারটি টেবিল ছাড়িয়ে দূরে একাকী বসে আছেন এক দীর্ঘকায় পাতলা গড়নের মানুষ। বয়েস বছর ত্রিশেক। চিন্তিত বিষণ্ন চোখজোড়া, ভ্যান ডাইকের মতো দাড়ি। হাত দুটো অদ্ভুত রকম সাদা আর রোগা। ডিনারে উনি শুকনো টোস্ট্ সহযোগে মোলায়েম মাংস খাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংক্। আশি মিলিয়নের মালিক। সমাজের অন্তরতর বিশেষ চক্রে উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর একটি পবিত্র আসন।

বিলি ম্যাকমাহান আশেপাশের কারুর সঙ্গেই কথা বলছেন না। কারণ কাউকেই চেনেন না তিনি। ভ্যান ডুইকিংক তাঁর নজর রেখেছেন শুধ্ নিজের প্লেটের দিকে। কারণ তিনি জানেন উপস্থিত প্রত্যেকে বুভুক্ষু হয়ে আছে তাঁর নজর আকর্ষণ করতে। তিনি সম্মতিসূচক মাথা নত করেই একেকজনকে খেতাব বা মর্যাদার আসনে বসিয়ে দিতে পারেন। তাই অতিরিক্ত ব্যাপক একটা অভিজাত সমাজ সৃষ্টি করার ব্যাপারে তিনি অতি সতর্ক।

আর এইবারই বিলি ম্যাকমাহান মনে মনে পরিকল্পনা করলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ, সবচেয়ে স্পর্ধিত কর্মটির কথা, এবং তা হাসিলও করলেন। ইচ্ছে করেই তিনি উঠে সোজা হেঁটে গেলেন কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের টেবিলের সামনে, বাড়িয়ে দিলেন নিজের হাত।

বললেন, 'দেখুন মিঃ ভ্যান ডুইকিংক, আমি শুনেছি আপনি আমার এলাকার দরিদ্র মানুষদের মধ্যে কিছু উন্নয়নের কথা বলছিলেন। আমি হলাম ম্যাকমাহান, বুঝলেন? এবার বলুন, ওটা যদি আপনার নির্দোষ পরিকল্পনা হয় তাহলে আমি সবকিছু করব আপনাকে সাহায্য করতে। আর আমি যা একবার বলি তা মোক্ষম জায়গাটিতে পৌঁছে যায়, তাই না? হ্যাঁ, আমার নিজের তো তাই ধারণা।'

ভ্যান ডুইকিংকের খানিকটা আঁধার-চোখ এবার যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি ঢ্যাঙা দেহটি তুলে উঠে দাঁড়ান, হাত বাড়িয়ে ধরেন বিলির হাত।

গভীর সুরেলা কণ্ঠে বলেন, 'ধন্যবাদ মিঃ ম্যাকমাহান। আমি ওই ধরনেরই কিছু কাজ করার কথা ভাবছিলাম। আপনার সাহায্য পেলে আমি আনন্দিত হব। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বড়ো খুশি হলাম।'

বিলি নিজের আসনে ফিরে আসেন। ওঁর কাঁধ এখনো ঝিনঝিন করছে রাজকীয়

সম্মানের স্পর্শ মর্যাদায়। এবার পঞ্চাশ জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে, ঈর্ষা আর সদ্যোজাত সমীহ নিয়ে। আনন্দে এমনই কম্পমানা শ্রীমতি উইলিয়ম ম্যাকমাহান যে তাঁর হীরাগুলো দর্শকদের চোখে প্রায় পীড়া জাগিয়ে তোলে। আর এও পরিষ্কার হয় যে অনেক টেবিলেই এমন ব্যক্তি আছেন যাদের হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁরা একসময়ে ম্যাকমাহানের পরিচয়ে আনন্দই পেতেন। উনি দেখলেন আশপাশের অনেকেই হাসছেন, মাথা নোয়াচ্ছেন। মাথা-ঘোরানো এক বিশালতা যেন জ্যোতির মতো আবৃত করে ওঁকে। নির্বাচনী অভিযানের সেই ঠাণ্ডা মাথা ওঁকে যেন পরিত্যাগ করেছে।

আঙুল দেখিয়ে ওয়েটারকে হুকুম করেন, 'ওই দলটার জন্য ওয়াইন!.... ওদিকটাতেও দাও। সবুজ গাছের ঝাড়ের পাশে ওই ভদ্রলোককেও দিও ওয়াইন। ওদের বোলো যে এটা আমার হিসেবে। নিকুচি করেছে। আরে সবাইকেই ওয়াইন দাও না!' বিলি বলতে থাকে, 'এ যদি নিয়মের বিরুদ্ধে হয়, তো ঠিক আছে। ভাবছি আমার বন্ধু ভ্যান ডুইকিংক্‌কেও একটা বোতল পাঠানো ঠিক হবে কিনা? না? ঠিক আছে, আজ রাতে না-হয় কাফেতেই চলবে একটানা। চলুক না! সেখানে যারা রাত দুটো অবধি ঢুকবে তাদের জন্য মানা নেই।'

বিলি ম্যাকমাহান সুখী।

তিনি যে কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের কর মর্দন করেছেন!

* * *

পুর শহরতলির মধ্যে। চকচকে ধাতুর সরঞ্জামে মোড়া হাল্‌কা-ধূসর গাড়িখানাকে কেমন যেন আজব দেখায়; ঠেলা-গাড়ি আর বর্জিত টিনের স্তূপের ভেতর দিয়ে চলেছে ধীরে-ধীরে। আজব দেখায় কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংক্‌কেও, তাঁর ওই অভিজাত মুখমণ্ডল, সাদা শীর্ণ হাত দেখলে। অবশ্য উনি সাবধানেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন রাস্তায়-রাস্তায় ছন্নছাড়া, এলোমেলো ছুটে-যাওয়া ছোকরাদের দলের ভেতর দিয়ে। অদ্ভুত লাগে মিস্ কনস্ট্যান্স শুইলারকে দেখতেও, ভ্যান ডুইকিংকের পাশের আসনে যে মহিলা বসে আছেন ম্লান তপস্বিনীর সৌন্দর্য নিয়ে।

মহিলা নিশ্বাস টেনে বললেন, 'কোর্টল্যাণ্ড, মানুষকে যে এমন দুর্গত দারিদ্রের মধ্যেও বেঁচে থাকতে হয়, এ বড় দুঃখের, তাই না? আর তুমি—তুমি যে ওদের কথা ভেবেছ, ওদের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজের সময় আর অর্থব্যয় করছ এ কি কম গৌরবের কথা!'

ভ্যান ডুইকিংক্ তার বিষণ্ন চোখদুটো ওঁর দিকে ফেরালেন।

করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো অতি যৎসামান্যই করতে পারি। সমস্যাটা আরো বড়, গোটা সমাজকে নিয়েই। তবে ব্যক্তিগত চেষ্টাও ফেল্‌নার নয়। দেখ কনস্ট্যান্স! এই রাস্তার ওপর আমি সুপের লঙরখানা বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।

সেখান থেকে ক্ষুধার্ত কাউকেই তাড়িয়ে দেয়া হবে না। আর এই অন্য রাস্তাটার নিচের দিকেই আছে পুরনো সব ইমারত যা আমি ভাঙিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব; আগুন আর ব্যাধির ওই মরণ ফাঁদগুলোর জায়গায় গজিয়ে উঠবে নতুন সব বাড়ি।'

ডেলান্সির দিকে ধীরে ধীরে উৎরাই পথে এগিয়ে চলে হালকা-ধূসর গাড়ি। গাড়ির কাছ থেকে ঝাঁক বেঁধে পালিয়ে যায় অবাক-চোখ, জটপাকানো চুল, খালি-পা, ময়লা-জামাপরা শিশুরা। একটা অদ্ভুত লাল ইটের বাড়ির সামনে দাঁড়ায় গাড়িটা। বাড়িটা পূতিগন্ধময়, বেঁকাটেরা।

গাড়ি থেকে ভ্যান ডুইকিংক্ নেমে পড়েন হেলানো দেয়ালগুলোকে একটু ভালো পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার জন্য। বাড়ির সিঁড়ি ধরে নেমে আসে একটি যুবক—যেন এবাড়ির দুরবস্থা, মালিন্য ও অস্বাচ্ছন্দেরই মূর্ত প্রতীক সে—শীর্ণ বুক, ফ্যাকাশে, স্বাস্থ্যহীন যুবক, সিগারেটে দম দিয়ে চলেছে।

কী একটা আবেগের বশে ভ্যান ডুইকিংক্ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে উষ্ণভাবে হাতে চেপে ধরলেন এমন একটা হাত যা তাঁর কাছে মনে হল জীবন্ত তিরস্কারের মতো।

আন্তরিকভাবেই বললেন, 'আমি আপনাদের লোকজনদের একটু জানতে চাই। আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেই যাচ্ছি। আমরা পরস্পরের বন্ধু হব।'

গাড়িটা যখন সাবধানে গুঁড়ি মেরে চলে গেল, কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের বুকের কাছে যেন অনভ্যস্ত কোনো দীপ্তি। প্রায় এক সুখী মানুষই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

তিনি যে আইকি স্নিগ্‌লফ্রিৎসের সঙ্গে করমর্দন করেছেন!

"The Social Triangle", নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৩

প্রেইরি বনের রাজকুমার

অবশেষে ন'টা বাজল। সারাদিনের একঘেয়ে খাটুনিও শেষ। খনি-মানুষদের হোটেলের আড়াই-তলায় তার নিজের কামরায় উঠে এল লেনা। সেই সূর্য ওঠার সময় থেকে ও বেগার খেটেছে, একজন পূর্ণ বয়স্কা মহিলার যা কাজ তাই করেছে।—মেঝে ঘষেছে, কড়া সাদা পাথরের থালা পেয়ালা মেজেছে, বিছানা গুছিয়েছে, আর ওই হৈ-হল্লার মধ্যেই মেজাজ খারাপ-করা হোটেলের অফুরন্ত কাঠ আর জলের জোগান বহাল রেখেছে।

সারা দিনের খনি-কাজের কলরবও এখন শান্ত—পাথর ফাটানো আর ড্রিলমেশিনে ছেঁদা করা, বড় বড় ক্রেনের ক্যাঁচক্যাচানি, ফোরম্যানদের চিৎকার, ভারি চুনোপাথরের চাঁই নিয়ে লাইন-গাড়ির আগুপিছু চলা—সব এখন ক্ষান্ত। শুধু নিচের হোটেল-অফিসে তিনি-চারজন মজুর বিলম্বিত দাবা খেলা নিয়ে চিৎকার গালাগাল করে চলেছে। স্টু-মাংসের, গরম তেল আর শস্তা কফির ভারি গন্ধ গোটা বাড়ির মধ্যে বিষণ্ণ কুয়াসার মতো ঝুলে আছে।

লেনা একটা পোড়া আধা-মোমবাতি জ্বালিয়ে, এলিয়ে বসে পড়ে ওর কাঠের চেয়ারটায়। ওর বয়েস এগারো, রোগা অভুক্ত চেহারা। পিঠ আর হাত-পাগুলো ওর বেদনাময়, যন্ত্রণাদীর্ণ। কিন্তু মনের ব্যথাই ওর আসল ব্যথা, সেটাই ঝামেলা করে বেশি। ওর ছোট কাঁধটির ওপর শাকের আঁটি হয়ে চাপল এক নতুন বোঝা। ওরা 'গ্রিম'-কেও কেড়ে নিয়েছে। যতো ক্লান্তই সে হোক, রাতে একবার সে গ্রিমের কাছে ফিরতোই, একটু স্বস্তি আর আশা পেতে। প্রতিবারই গ্রিম তার কানে কানে বলত—রাজকুমার বা পরী, কেউ একজন আসবেই তাকে ডাইনির মায়া থেকে উদ্ধার করতে। প্রতিরাতেই সে নতুন সাহস আর শক্তি পেত গ্রিমের কাছ থেকে।

যে কোনো গল্পই সে পড়ুক, তার একটা রূপক সে কিন্তু খুঁজে পেত তার নিজের অবস্থার মধ্যে। কাঠুরের হারানো খুকি, অসুখী রাজহাঁসের মেয়ে, কষ্ট-পাওয়া সতীনের মেয়ে, কিংবা ডাইনির কুটিরে বন্দী ছোট্ট মেয়েটা—এগুলো সবই লেনার কাছে পরিষ্কার ছদ্মবেশ। লেনা খনিমজুর হোটেলের পরিশ্রান্ত রসুইঘরেরই মেয়ে তো! তাই যখন বাড়াবাড়িটা খুব বেশি রকমের হত তখনই উদ্ধার করতে আসত ভাল পরী কিংবা বীর রাজকুমার।

তাই, এখানে এই দৈত্যের প্রাসাদে কোনো দুষ্ট মায়ায় বন্দী ক্রীতদাসী লেনা, গ্রিমের ওপরই ভরসা করে প্রতীক্ষায় থাকত—কল্যাণের শক্তি একদিন জয়ী হবেই। কিন্তু গত রাতে ম্যালোনি-গিন্নি তার কামরায় পেয়ে গেল বইখানা, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেল, আর চড়া গলায় ধমকে গেল চাকরবাকরদের আবার রাতে বই পড়া কী? এই জন্যই তো তারা ভেড়া হারায়, পরের দিন চটপট কাজ করতে পারে না। কিন্তু মাত্র এগারো বছরের একটি মেয়ে, মা-ছাড়া হয়ে বাইরে থাকে, একেবারেই খেলার সময় পায় না, কেমন করে সে গ্রিম বিহনে জীবন কাটাবে? একবার চেষ্টা করেই দেখ না কী কঠিন কাজ এটা!

লেনার দেশ টেক্সাসে। পেডারনালেস্ নদী পেরিয়ে ওই ছোট পাহাড়গুলোর মধ্যে একটা ছোট শহর, যাকে ফ্রেডারিক্সবার্গ বলে, সেইখানে। ফ্রেডারিক্সবার্গে যারা থাকে তারা সবাই জার্মান। সন্ধ্যের সময় তারা রাস্তার ধারে ছোট-ছোট টেবিলে বসে বীয়ার পান করে আর পিনোকল্ তাস বা স্ক্যাট খেলে। ওরা খুব মিতব্যয়ী।

ওদের মধ্যে আবার সবচেয়ে মিতব্যয়ী পিটার হিলডেস্‌মুলার—লেনার বাপ। আর সেইজন্যই লেনাকে পাঠানো হয়েছিল তিরিশ মাইল দূরে এই খনির হোটেলটিতে কাজ করতে। এখানে সে হপ্তায় তিন ডলার পায়, আর পিটার ওর মাইনের টাকা খাটায় তার শক্তপোক্ত দোকানে। পিটারের উচ্চাশা সে তার প্রতিবেশী হুগো হেফেলবাউয়ারের মতোই ধনী হবে। হুগো তিন ফুট লম্বা মিরশাউম পাইপে তামাক খায়, আর ফি হপ্তা ডিনার খায় ওয়াইনে-সেদ্ধ হরিণ মাংস আর হাসেনফেফার। এখন তো লেনা বড় হয়েছে, এখন সেই পারে টাকা জমাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে। কিন্তু যদি পারেন তো কল্পনা করুন—এগারো বছর বয়েসে একটা চমৎকার ছোট রাইন-পল্লীর ঘর থেকে নির্বাসনদণ্ড পেয়ে কোনো দৈত্যের প্রাসাদে গতর খাটানো—যেখানে দৈত্যদের পরিবেশন করতে হলে হাঁটার বদলে উড়ে যেতে হয়। তারা গোগ্রাসে গরুভেড়া খায় হাঁকডাক করে, সাদা পাথরের মেঝেতে পা দাপায়, তাদের ধুমসো জুতোর ধুলো ওকেই ঝাড়পোঁছ করতে হয় দুর্বল যন্ত্রণাভরা আঙুল দিয়ে। আর তার ওপর এখন—এই গ্রিমটাকেও কেড়ে নেওয়া!

লেনা একটা খালি পুরনো তোরঙ্গের ঢাকনা খোলে। ওটার মধ্যে একসময়ে ছিল টিনে-ভরা ভুট্টার ছাতু। একটা কাগজের পৃষ্ঠা আর টুকরো পেন্সিল বের করে ওটা থেকে। ও মাকে চিঠি লিখবে। টমি রায়ান ওর হয়ে সেটা ব্যালিঙ্গারের ডাকঘরে ফেলে দেবে। টমির বয়েস সতের, খনিতেই কাজ করে, রোজ রাতে সে ব্যালিঙ্গারের ওখানে হয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। এখন সে লেনার জানলার নিচে অন্ধকারে সবুর করছে ওর ছুঁড়ে-দেওয়া চিঠিটার জন্য। একমাত্র এই ভাবেই সে ফ্রেডারিক্‌সবার্গে চিঠি পাঠাতে পারে। ম্যালোনি গিন্নি ওর চিঠি-টিঠি লেখা একেবারে পছন্দ করে না।

মোমবাতির টুকরোটা এখন শেষ প্রান্তে এসে জ্বলছে, তাই তাড়াতাড়ি পেন্সিলের শিস্‌ দাঁত দিয়ে চিবিয়ে লিখতে শুরু করে। ও যে চিঠিখানা লিখল তা এই:

"প্রিয়তমা মা! তোমাকে দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করে। গ্রেটেল, ক্লাউস্‌ হাইনরিখ আর ছোট্ট এ্যাডলফ্‌কেও। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আজ মিসেস্‌ ম্যালোনি আমায় চড় মেরেছিল, আমি রাতের খাবার খাইনি। আমি বেশি করে কাঠ বয়ে আনতে পারিনি। হাতে বড় ব্যথা। কাল উনি আমার বইটা কেড়ে নিয়েছেন। আমি বইটা পড়তাম, তাতে কারো কোনো ক্ষতি তো হচ্ছিল না। আমি যতো ভালভাবে পারি কাজ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কাজও তো কত। আমি রাতে শুধু একটু করে পড়তাম। মা মণি, আমি কী করতে যাচ্ছি তা তোমায় বলব। তুমি যদি কালই আমায় ডেকে না পাঠাও বাড়ি ফিরবার জন্য, তা'হলে নদীতে গিয়ে আমার জানা একটা গভীর জায়গায় ডুব দেব। ডুবে মরা শয়তানি কাজ জানি, তবে আমি তোমাকেই দেখতে চেয়েছি, আর কাউকে নয়।

আমি খুব ক্লান্ত, টমিও অপেক্ষা করছে চিঠির জন্য। আমি যদি সত্যি তা করে বসি, তুমি আমায় ক্ষমা কোর। ইতি

তোমার বাধ্য প্রীতিপ্রার্থী কন্যা

লেনা।

চিঠি শেষ হওয়া অবধি বিশ্বস্তভাবে অপেক্ষা করছিল টমি। লেনা চিঠিটা ছুঁড়ে দেবার পর দেখল সে ওটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল খাড়া পাহাড়ি উৎরাই পথে। কাপড় জামা না খুলেই লেনা বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে গুটিগুটি শুয়ে পড়ল মেঝের তোশকটার ওপর।

রাত সাড়ে দশটার সময় বুড়ো ব্যালিঙ্গার মোজা পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে, পাইপ টানছিল। চাঁদের আলোয় সাদা বড় রাস্তাটার দিকে চেয়ে সে এক পায়ের ডগা দিয়ে অন্য পায়ের গোড়ালি চুলকোচ্ছে। ফ্রেডারিক্সবার্গ থেকে ঘোড়াটানা ডাকগাড়ি তো পট্‌পট্‌ করে এসে যাবার সময় হল।

বুড়ো ব্যালিঙ্গার মাত্র কয়েক মিনিট সবুর করতেই শোনা গেল চঞ্চল খুরের আওয়াজ—ফ্রিৎস্ তার কালো ছোট খচ্চরের দল নিয়ে আসছে, পেছনেই ছাদওয়ালা স্প্রিঙের ওয়াগনগাড়ি—চট্‌পট এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। ফ্রিৎসের বড় চশমাজোড়া চাঁদের আলোয় চমকায়, আর জোরালো গলার আওয়াজে সে ব্যালিঙ্গারের পোস্টমাস্টারকে সম্ভাষণ জানায়। ডাক-বাহী লাফিয়ে বেরিয়ে এসে তার খচ্চরদুটোকে বল্‌গা থেকে খুলে নেয়, কারণ বরাবরই সে ব্যালিঙ্গারের আস্তানায় এসেই ওদের ওটের দানা খাওয়ায়।

খচ্চর দুটো যখন মুখে ঝোলানো থলি থেকে দানা খাচ্ছে সেই ফাঁকে বুড়ো ব্যালিঙ্গার ডাকের থলি বের করে এনে ওয়াগনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

ফ্রিৎস্ বার্গম্যানের ভক্তি তিনটে জিনিসের ওপর—সঠিক বললে চারটে—খচ্চর দুটোকে আলাদা দুই জীব বলে ধরতে হবে। ওর জীবনের প্রধান আকর্ষণ আর প্রেরণা হল খচ্চর দুটো। তারপর আসে জার্মানির সম্রাট আর লেনা হিলডেস্‌মুলার।

যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে ফ্রিৎস বললে, 'বলো তো ভায়া, ডাকের থলির মধ্যে কি মিসেস্ হিলডেস্‌মুলারের নামে কোনো চিঠি আছে তার মেয়ে লেনার কাছ থেকে? যে ওই খনিতে কাজ করে? গত ডাকেই একটা চিঠি গিয়েছিল সে কিছুটা অসুস্থ আছে বলে। ওর মা আরো খবর পাবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত।'

বুড়ো ব্যালিঙ্গার বললে,'হ্যাঁ, একটা চিঠি আছে বটে মিসেস্ হেলটার স্কেল্‌টার না ওই রকম কারুর নামে। টমি রায়ান আসার সময় ওটা নিয়ে এসেছিল। তো তার ছোট মেয়ে বুঝি সেখানেই কাজ করে, বলছ তুমি?'

লাগাম তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দেয় ফ্রিৎস, 'হ্যাঁ, ওখানকার হোটেলে। এগারো বছরের মেয়ে, অথচ ছোট ফ্রাঙ্কফুর্টারের মতো। হাড় কেপ্পন ওই পিটার

হিলডেস্‌মুলার! কোন্ দিন মুগুর দিয়ে তার মাথাটি ছেঁচা করে দেব। হয়তো এই চিঠিতে লেনা জানিয়েছে সে এখন ভাল বোধ করছে। তাতে তার মা খুশি হবে। বিদায় হের ব্যালিঙ্গার—বাইরে রাতের ঠাণ্ডায় তোমার পা জমে যাবে।'

'ফের দেখা হবে ফ্রিৎসি! তুমি তো আরামেই সুন্দর ঠাণ্ডা রাতে গাড়ি চালিয়ে যাবে।'

ছোট কালো খচ্চর দুটো অবিচল দুলকি চালে ছোটে রাস্তা ধরে। ফ্রিৎস তবু মাঝে মাঝে মোটা গলায় হাঁকড়ায় তাদের—কখনো মিঠে কখনো আদুরে তার কথাগুলো।

ডাক-বাহকের মনে এইসব খেয়ালই ঘুরপাক খায় যতোক্ষণ-না ব্যালিঙ্গারের আট মাইল দূরে বড়ো ওক-বনের গুঁড়িগুলোর কাছে এসে পড়ে। এইখানে ওর মনের নানা রোমন্থন আকস্মিক পিস্তলের শিখা ও নির্ঘোষে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—সেই সঙ্গে আবার ইণ্ডিয়ানদের গোটা দঙ্গলের ঢঙে হুপ্-হুপ্ চিৎকার।

একদল কদম চালে-ছোটা ঘোড়সওয়ার চারদিক থেকে ডাক গাড়িটাকে ঘিরে ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে। ওদের একজন সামনের চাকার ওপর ঝুঁকে রিভলবার তাক করে চালকের দিকে, তাকে হুকুম দেয় থামতে। অন্যরা ডোন্ডার আব ব্লিটজেনের লাগাম চেপে ধরে।

জোরালো কণ্ঠ উঁচুতে তুলে ফ্রিৎস চেঁচায়— 'এ আবার কী রসিকতা? ওই খচ্চরদের উপর থেকে হাত সরিয়ে নাও! আমরা ইউনাইটেড স্টেটসের ডাক নিয়ে যাচ্ছি!'

'তাড়াতাড়ি করুন ডাক মশাই!' একটা বিষণ্ণ কণ্ঠ অলস ভাবে বলে, 'আপনি কি রাহাজানির পাল্লায় পড়লেও টের পান না নাকি? ঘোড়া পেছিয়ে নিন, নেমে পড়ুন গাড়ি থেকে।'

হন্ডো বিল্-এর বুদ্ধির বহর আর তার ব্যাপক কার্যকলাপের জন্যই বলব, ফ্রেডারিকসবর্গের ডাকগাড়ি আটকানোটা কোনো বড় অভিযান হিসেবে ঘটেনি। সিংহ যেমন কখনো কখনো তার ক্ষমতার উপযুক্ত শিকারের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে তার বেচাল থাবা চাপিয়ে দেয় পথের কোনো অসতর্ক খরগোশের পিঠে, তেমনি হন্ডো বিল আর তার দলবলও আমাদের ফ্রিৎস মশাইয়ের গাড়িটার ওপর খেলাচ্ছলেই ছোঁ মেরে বসেছে।

ওদের কুকর্মের রাতের আসল কাজটা আগেই সারা হয়েছিল। ফ্রিৎস তার ডাকের থলি আর খচ্চরের ব্যাপারটা এসেছে নেহাৎই হালকা একটা আমোদের প্রয়োজনে। ওদের পেশার কঠিন কাজগুলোর পর একটা কৃতার্থতা স্বরূপ। কুড়ি মাইল দক্ষিণে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ট্রেন যার ইঞ্জিন মৃত। যাত্রীরা ভয়ে পাগল, এক্সপ্রেস কামরা আর ডাকের ব্যাগ লুঠ হয়ে গেছে। ওতেই পরিচয় পাওয়া যাবে হন্ডো বিল আর দলবলের গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কী ছিল। যথেষ্ট পরিমাণে নোট

আর রুপার ডলার লুটে নিয়ে ডাকাতরা পশ্চিমদিকের অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলের লম্বা পথ ঘুরে আসছিল। ওদের ইচ্ছে মেক্সিকোতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে যাবে, রিওগ্রান্ডে নদীতে কোনো অগভীর হাঁটা পথ ধরে ওপারে উঠে। ট্রেন থেকে এই লুটের মালই দুর্বৃত্ত বুনোডাকাতগুলোকে অমন খোশমেজাজি গানের পাখি বানিয়ে তুলেছে।

আহত মর্যাদা, আর খানিকটা ব্যাক্তিগত আতঙ্কেও, কম্পমান ফ্রিৎস্ বেরিয়ে এল রাস্তায়। হঠাৎ সরে যাওয়া চশমাটা সে আবার নাকে বসিয়েছে। ডাকাতের দল ঘোড়া থেকে নেমে গান গাইছে, নাচছে, হুপ্‌হাপ্ করছে। তারা দেখাতে চায় যেন ফুর্তিবাজ ফেরারীর জীবনে তারা কতো তৃপ্ত। 'র‍্যাটেলসাপ' রজার্স খচ্চরদের মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু যেন অতিরিক্ত জোরেই নরম মুখ ডোভারের লাগামে হেঁচকা টান মারল। খচ্চরটা ভড়কে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে একটা যন্ত্রণার প্রতিবাদ জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিৎস প্রচন্ড রাগে চিৎকার করে মোটা রজার্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রাণপণে সে ঘুষি মারতে থাকে বিস্মিত লুটেরাটার বুকের ওপর।

'শয়তান কুত্তা জোর দেখাচ্ছ!' চেঁচাতে থাকে ফ্রিৎস, 'ওই খচ্চরটার মুখে ঘা রয়েছে। আমি তোমার মুন্ডু সমেত ঘাড় মটকে দেব- ডাকুর দল!'

'ই- হি- হি- হি!' র‍্যাটেলসাপ চেল্লায় হাসির দমকে, পেছন দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে, 'কেউ এই বাঁধাকপির চাটনিটাকে আমাব ওপর থেকে তোলো হে!'

দলের একজন ফ্রিৎসের কোটের পেছন ধরে টানে, আর বনটা গমগম করে ওঠে র‍্যাটেলসাপের অবিশ্রান্ত বক্তৃতায়।

মিঠে সুরেই চেচাঁয়, 'এই হতভাগা ছোট সসেজটা ডাচ মানুষ হিসেবে অতোটা জঘন্য নয় কিন্তু। ওর জন্তুটির জন্য সঙ্গে সঙ্গেই লেগে পড়েছিল, তাই না? আমি ওর ঘোড়ার মতো লোকেরই কদর করি, ঘোড়া না হলেও খচ্চর। বাপ খেদানো ছোট পনিরের টুকরো আমাকেও ভড়কে দিয়েছিল! হো-হো! বাছা, আর কখনো তোর মুখে খোঁচা দেব না।'

হয়তো কেউ ডাকের থলিতে হাতও লাগাত না, যদি না সাগরেদ বেন মুডির মাথায় কোনো মতলব ঢুকত—তার ধারনায় ওতেও হয়তো লুটের মাল আছে।

হন্ডো বিলকে সম্বোধন করে সে বললে, 'এই যে, ক্যাপ! ওই ডাকের থালিতে হয়তো বেশ কিছু নেবার মতো জিনিস থাকতে পারে, আশ্চর্য নয়। ফ্রেডারিকস্‌বার্গের আশপাশে এই ডাচগুলোকে নিয়ে ঘোড়ার কারবার করে দেখেছি তো! জানি এই ইঁদুরগুলোর কাজের ধরন। মোটা টাকা ওই শহরটাতে যায় ডাকের মারফত। ওই ডাচগুলো একটুকরো কাগজে জড়িয়ে হাজার ডলার অবধি পাঠাবার ঝুঁকি নেয়, তবু ব্যাঙ্ককে দেয় না ও টাকায় হাত লাগাতে।'

মুডির কথা শেষ হবার আগেই ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা হন্ডো বিল ওয়াগনের পেছন থেকে থলিগুলো টেনে নামাতে শুরু করেছে। হন্ডোর গলার আওয়াজ

নরম, কিন্তু কাজে বড় আবেগপরায়ণ। ওর হাতে একটা ছুরি চক্‌চকিয়ে ওঠে, শক্ত ক্যানভাসের মধ্যে সেটা ঢুকতে ওরা শুনতে পায় থলি ছেড়াঁর আওয়াজ। ফেরারীরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চিঠি পার্সেল ছিঁড়ে খুলতে শুরু করে দেয়। আর মাঝে মাঝে নিজেদের শ্রমে ফুর্তি আনতে চিঠির লেখকদের উদ্দেশ্য করে অমায়িক দুর্বাক্য ছাড়ে, কারণ লেখকরা বোধহয় ষড়যন্ত্র করেই বেন মুডির বচন উল্টে দিয়েছে। ফ্রেডারিক্সবার্গের ডাকে একটি ডলারও পাওয়া গেল না।

হন্ডো বিল গম্ভীর গলায় ডাক বাহককে বলল, 'নিজের কাজে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—এতগুলো বাজে পুরনো কাগজ বস্তাবন্দী করেছ। তা, এমন করবার মতলব কি ছিল তোমার? তোমরা ডাচাররা টাকা রাখ কোথায়?'

হন্ডোর ছুরির নিচে ব্যালিঙ্গারের ডাক থলিটা রেশমকীটের থলির মতো খুলে গেল। ওর মধ্যে আছে শুধু এক প্রস্থ চিঠিপত্র। এই থলিটা অবধি পৌছোনো পর্যন্ত ফ্রিৎস্ ভয় আর উত্তেজনায় ঘেমে উঠেছিল। এবার ওর মনে পড়ল লেনার চিঠিখানার কথা। দলের নেতাকে উদ্দেশ করে সে আবেদন জানাল, বিশেষ করে ওই চিঠিটা যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।

উৎকণ্ঠিত ডাক-বাহককে হন্ডো বললে, 'বড় বাধিত হলাম ডাক মশাই। আমার ধারনা ওই চিঠিটাই আমাদেব চাই। ওর মধ্যেই আছে আসল জিনিস, তাই না? এই তো সে চিঠি। একটা বাতি জ্বালাও, স্যাঙাৎরা।'

মিসেস্ হিলডেসমুলারকে লেখা চিঠিখানা হন্ডো পেয়েছে, সেটার খাম খুলে ফেলল। অন্যরা চারদিকে দাঁড়িয়ে দলামোচা চিঠিগুলো জ্বালিয়ে নিতে লাগল, একজন থেকে আরেকজন। হন্ডো একপাতার একখানা চিঠির দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে তারিফের চিহ্ন নেই। সেটা শুধু কোণাচে ঢঙের জার্মান লেখায় ভরা।

'এটা কী জিনিস দিয়ে তুমি আমাদের বেকুব বানালে ডাচি? এটাকে তুমি বলছ মূল্যবান চিঠি? আমরা তোমার বন্ধুর মতো এলাম ডাক বিলিতে সাহায্য করতে, আর তুমি কিনা একটা অতি নিচু ধরনের কৌশল খাটালে আমাদের ওপর!'

হন্ডোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে স্যান্ডি গ্রান্ডি বললে, 'এ তো "চাইনি" লেখা।'

দলের আরেকজন, করিৎকর্মা যুবক, রেশমি রুমাল আর নিকেল পাতে সজ্জিত, ঘোষণা করল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ওটা হল শর্টহ্যান্ড। আমি একবার আদালতে দেখেছি ওরকম লিখতে।'

'আখ্, না, না—ওটা হল জার্মান', বলল ফ্রিৎস, 'এ আর কিছু নয়, একটি ছোট্ট মেয়ে চিঠি লিখেছে তার মাকে। একটা বেচারী ছোট্ট মেয়ে, অসুস্থ, বাড়ি থেকে দূরে খাটুনির কাজ করছে। আখ্! লজ্জার ব্যাপার। ভালো ডাকাত, আপনি ওই চিঠিটা আমায় দেবেন তো দয়া করে?'

'তুমি আমাদের কী মনে কর হে বুড়ো নোন্তা বিস্কুট?' হন্ডো হঠাৎ বিস্ময়কর কঠোর ভাব করে বললে, 'তুমি নিশ্চয় ইঙ্গিত জানাচ্ছ না যে আমাদের ভদ্রলোকদের এতটুকু চিন্তাও নেই মিসি-খুকির স্বাস্থ্য নিয়ে? এবার তুমি জোরে জোরে পড়ে শোনাও ওই আঁকিবুকি লেখা, সিধে আমেরিকার ভাষায়, এখানে সমবেত শিক্ষিত সমাজের সামনে।'

হন্ডো তার ছ'ঘরা পিস্তলের ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্ষুদে জার্মানের মাথার ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়াল। সেও তক্ষুনি পড়তে শুরু করেছে চিঠিটা, সহজ শব্দগুলো ইংরেজিতে তর্জমা করে। ডাকাতের দল একেবারে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

চিঠি পড়া শেষ হতে হন্ডো জিগ্গেস করল, 'বাচ্চাটার বয়েস কত?'

'এগারো', বললে ফ্রিৎস।

'আছে কোথায় এখন?'

'ওই পাথর খনিগুলোতে কাজ করছে। আঃ ঈশ্বর—ছোট্ট লেনা, বলছে কিনা ডুবে মরার কথা। জানি না ও তা করবে কিনা, কিন্তু যদি করেই বসে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ওই পিটার হিলডেসমুলারটাকে আমি বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারব।'

গলার স্বরে সূক্ষ্মশ্লেষের কাঁপুনি তুলে হন্ডো বিল বলে, 'তোমরা ডাচাররা আমাকে বড় হয়রান কর। তোমাদের বাচ্চাদের যখন বালিতে বসে পুতুল খেলার কথা, তখন তাদের মজুরি খাটতে পাঠাও। অদ্ভুত একটা জাত তোমরা হে! তোমাদের পুরনো পচা মাখনের দলকে আমরা কী মনে করি তা দেখাবার জন্য খানিকক্ষণ তোমার ঘড়ি মেরামত করব। এই যে, স্যাঙাৎরা!'

হন্ডো বিল একপাশে তার দলবলের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করে, তারপর তারা ফ্রিৎস্‌কে ধরে টেনে নিয়ে যায় রাস্তা থেকে অন্য একদিকে। ওখানে তারা ওকে একটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে দু' গাছি ল্যাসো দড়ি দিয়ে বাঁধে। ওর ঘোড়াগুলোকে তারা বেঁধে দেয় অন্য একটা গাছের সঙ্গে।

হন্ডো আশ্বস্ত করে বলে, 'তোমাকে আমরা খুব বেশি কষ্ট দিতে চাই না। গাছের সঙ্গে কিছুক্ষণ বাঁধা থাকলে তোমার তেমন ক্ষতি হবে না। এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে, তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি দিনের প্রহর গোনার কাজটা। আর বেশি অধৈর্য হয়ো না।'

লোকগুলো ঘোড়ায় চাপার সময় ফ্রিৎসের কানে এল জিনের ক্যাঁচকোচ প্রবল আওয়াজ। তারপর একটা জোর চিৎকার, ঘোড়ার খুরের শব্দ— ওরা ফ্রেডারিকস্‌বার্গের রাস্তা ধরে যেমন তেমন করে ছুটল পেছন দিকে।

দু'ঘন্টারও ওপর গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে ফ্রিৎস, শক্ত করে বাঁধা, তবে কষ্ট হবার মতো নয়। তারপর তার উত্তেজনাময় অভিযানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপই বোদহয় সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিল তা জানে না, কিন্তু

একটা কর্কশ ঝাঁকুনিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। কয়েকটা হাত তার দড়ির বাঁধন খুলে দিচ্ছে। তাকে পায়ের ওপর খাড়া করা হল, মন এখনো ঘোরের মধ্যে, এলোমেলো ভাবনা, ক্লাকস্ত শরীর। চোখ কচলে দেখল, সে ফের ওই একই ভয়ানক ডাকাত দলের মাঝখানে। ওরা তাকে ঠেলে তুলে দিল তাব গাড়ির আসনে, হাতে তুলে দিল লাগাম জোড়া।

হুগো বিলের কণ্ঠস্বর হুকুমের ঢঙে বলে, 'এবার ছুটে চলে যাও বাড়ির দিকে, ডাচ্। তুমি আমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট করেছ, এবার তোমার ঘাড়ের পেছনটাই দেখতে চাই। ছোটো! দুটো বীয়র! দূর হও!'

হুগো হাত বাড়িয়ে জোর চাবুক কষাল ব্লিৎসেনের ওপর।

ছোট খচ্চরদুটো লাফিয়ে গেল সামনে, আবার চলতে পেরে খুশি। ফ্রিৎস্ নিজেও ওদের খোঁচায়, ভয়ানক অভিযানের পর ওর মাথা ঘুরছে, সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

নির্ঘণ্ট অনুসারে দিনের আলো থাকতেই ওর ফ্রেডারিকস্‌বার্গে পৌঁছোবার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সকাল এগারোটায় শহরেব সদর রাস্তায় ছুটছে ও। পোস্ট অফিসে যাবার পথেই পিটার হিলডেসমুলারের বাড়ির সামনে চলে এল সে। ফটকের সামনে গাড়ি-ঘোড়া দাঁড় করিয়ে সে ডাকল। কিন্তু মিসেস হিলডেসমুলার আগেই তার পথ চেয়ে বসে ছিলেন। গোটা পরিবারটাই ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

ফ্রাউ হিলডেসমুলার মোটা, উচ্ছাসে রাঙা, জিজ্ঞেস করলেন লেনার কাছ থেকে কোনো চিঠি আছে কিনা। তখন ফ্রিৎস গলা উঁচিয়ে শোনাল তার এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। চিঠির বক্তব্য বিষয় সে পড়েছে, ডাকাতরা তাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল। তখন ফ্রাউ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর ছোট্ট লেনা ডুবে মরবে! কেন ওরা বাড়ি থেকে ওকে দূরে পাঠাল? এবার কী করা যাবে? হয়তো এখন তাকে আনতে পাঠালেও দেরিই হয়ে যাবে। পিটারের মিরশাউমখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল পথের ওপরেই, ভেঙে গেল খান্‌খান হয়ে।

বউয়ের ওপর তম্বি করে পিটার—'মেয়েমানুষ! তুমি কেন খুকিটাকে চলে যেতে দিলে? ও যদি আমাদের কাছে আর ফিরে না আসে, তাহলে দোষ তোমারই!'

কিন্তু সবাই জানে দোষটা পিটার হিলডেসমুলারেরই, তাই ওর কথায় কেউ কান দেয় না।

এক মুহূর্ত পর একটা অদ্ভুত সরু গলার আওয়াজ শোনা গেল, ডাকছে 'মামি!' বলে। ফ্রাউ প্রথমে ভেবেছিলেন এ বুঝি লেনারই বিদেহী আত্মা ডাকছে, তারপর তিনি ছুটে গেলেন ফ্রিৎসের ঢাকা গাড়ির পেছন দিকে। প্রবল একটা আনন্দধ্বনি করে তিনি লেনাকে জড়িয়ে ধরলেন, তার ছোট্ট মুখখানার ওপর চুমুর পর চুমু দিতে লাগলেন, আদরের ঠেলায় তাকে প্রায় পিষ্ট করলেন। লেনার চোখদুটো ক্লান্তির গভীর ঘুমে ভারি, তবু সে হাসে, যাকে সে দেখতে চাইছিল তারই বুকে

গা ঘেঁষে থাকে। ওই ডাকের থলিগুলো মধ্যে অদ্ভুত সব কম্বল আর গরম চাদরের গাদার মধ্যে বন্দী হয়ে সে ঘুমিয়েছিল, যতোক্ষণ-না চারদিক থেকে গলার আওয়াজে তার ঘুম ভাঙল।

চশমার পেছনে চোখ ছানাবড়া করে ফ্রিৎস্ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'হে ভগবান!' বলে চেঁচায় সে, 'তুমি কী করে ওয়াগনের মধ্যে ঢুকলে? আমি আজ ডাকাতের হাত খুন হয়ে ফাঁসি যাবার পরও কি শেষে পাগল হয়ে গেলাম?'

ফ্রাউ হিলডেসমুলার বলে উঠলেন, 'আরে, তুমিই তো ওকে আনলে ফ্রিৎস! তোমাকে যে ধন্যবাদ দিয়েই কূল পাই না!'

ফ্রাউ বললেন, 'বলো তো মাম্মি'কে, কেমন করে ফ্রিৎসের ওয়াগনে এলে?'

লেনা বললে, 'আমি তো জানি না। তবে কেমন করে হোটেল থেকে পালিয়েছিলাম, সেটা মনে আছে। রাজকুমার এনেছে আমায়।'

ফ্রিৎস্ চেঁচাল, 'সম্রাটের মুকুটের দোহাই! আমরা সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

লেনা পথের পাশে তার বিছানার পোঁটলার ওপর বসে বলল, 'আমি বরাবরই জানতাম সে আসবে। গত রাতে সে অস্ত্রশস্ত্রওয়ালা 'নাইট্'দের সঙ্গে নিয়ে এসে দৈত্যের প্রাসাদ দখল করল। ওরা থালাবাসন ভাঙল, লাথি মেরে দরজা ফেলে দিল। মিঃ ম্যালোনিকে বৃষ্টিজলের পিপের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে, মিসেস্ ম্যালোনির সারা গায়ে মাথায় ময়দা ঢেলে দিল। হোটেলের কাজের লোকরা জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বাইরের জঙ্গলে ছুটে গিয়েছিল, সে-সময় নাইট্‌রাও চালাতে লাগল বন্দুক। তারা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে আমি উঁকি মেরে দেখি সিঁড়িটা। আর তখনই উঠে আসে রাজকুমার, আমাকে বিছানার চাদর কম্বলে মুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসে। কী লম্বা, শক্তিমান আর সুন্দর রাজকুমার। তার মুখখানা মেঝে-ঘষা বুরুশের মতো খরখরে, কিন্তু নরম পায়ে হাঁটে, দয়ালু মানুষ, আর গায়ে শ্নাপ্‌সের গন্ধ। আমাকে তার ঘোড়ার ওপর তুলে নিল আগে বসিয়ে, নাইটদের দলের সঙ্গেই ছুটে চললাম আমরা। আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল, ওই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়লাম, আর বাড়ি চলে আসার আগে অবধি জাগিইনি।'

'রাবিশ!' চেঁচিয়ে ওঠে ফ্রিৎস্ বার্গম্যান, 'রূপকথার গল্প হচ্ছে! খনি থেকে কেমন করে তুমি আমার গাড়িতে এলে?'

'বা, রাজকুমারই তো নিয়ে এল!' জোর দিয়ে বলে লেনা।

আর আজ অবধি ফ্রেডারিকস্‌বার্গের ভাল মানুষরা কেউ ওর মুখ থেকে অন্য কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পায়নি।

A Chaparral Prince, *নিউইয়র্ক সান্‌ডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন*, ১৯০৩

অচরিতার্থ ভ্রমণ

অ্যালাস্কার "নোম" থেকে আসা মানুষটি— রাস্তার কোণে নিরেট গ্রানিট শিলার মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষজনের ঢলের মাঝখানে, ঠিক তাড়াহুড়োর সময়টায়। উত্তর মেরুদেশের হাওয়া আর রোদ তার চামড়ার রঙ করে দিয়েছে বৈঁচি বাদামি। তার চোখে এখনো রয়েছে হিমরাজ্যের তুষার-নীল আভা।

শেয়ালের মতোই সতর্ক লোকটা, ক্যারিবু বল্‌গাহরিণের মাংসের মতো রুঠো, মেরুজ্যোতির মতো উদার বিস্তৃত। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের প্রচন্ড কলরব যেন ওকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে—উচ্চমার্গে ধাবমান ট্রেনের আওয়াজ, ঝঙ্কার তোলা মোটরগাড়ি, রবারহীন টায়ারের দুম্‌দাম শব্দ, সেই সংগে দ্বৈতনাদে গাড়ি আর ট্রাকড্রাইভারদের ভয়াবহ পারস্পরিক চাপান-উতোর। আর তাই বুঝি নোম থেকে আসা মানুষটা, তার সোনার রেণু এক লক্ষ খুশির ডলারে 'নগদ' করে নেবার পরও, গটহ্যামে এক সপ্তাহ খেয়ে জিভ বিস্বাদ করে, এখন মনেপ্রাণে চাইছে আবার সেই চিলকুটে পা ফেলতে। সেটা হবে এই শব্দদূষিত রাস্তার দেশ আর এই পোড়া দেশের আপেল পিঠে থেকে মুক্তির প্রস্থান।

ষষ্ঠ এ্যাভিন্যু থেকে এই টপকানো, দৌড়ানো, কিচিরমিচির করা, উজ্বল চোখ, ঘরফেরা মানুষদের জোয়ারের মধ্যে 'সীবার ম্যাসনের' মেয়েটাও রয়েছে। নোমের মানুষ তাকাল, প্রথমেই যা দেখল—মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, তার নিজের সৌন্দর্যের ধারণায়; তারপর দেখল, সে হুবহু সমতল বরফের-ওপর চলা, কুকুর স্লেজের মতোই স্থির স্বাচ্ছন্দে পথ চলছে। মানুষটার তৃতীয় অনুভূতি হল একটা তাৎক্ষণিক দৃঢ় ধারণা, মেয়েটিকে সে নিজের জন্য ভীষণভাবে চাইছে। নোমের মানুষরা ওইভাবে চট্ করে মনস্থির করে বসে। তা ছাড়া, সে যখন উত্তরে ফিরে যাচ্ছে অল্প দিনের মধ্যে, তখন তো তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়তেই হবে।

'সীবার ম্যাসনের' বিরাট বিভাগীয় বিপণি থেকে বেরিয়ে প্রায় হাজার জনা মেয়ে ভিড়ে পড়েছে ফুটপাতে, তারা দিক ঠিক রেখে পথ চলাই কঠিন করে তোলে সেই সব পুরুষদের পক্ষে, বিশেষ করে যাদের মেয়ে দেখা চোখের আওতা গত তিন বছর ধরে একেবারেই সীমাবদ্ধ ছিল সিওয়াশ আর চিলকাট জাতের 'স্কু'-দের ওপর, তারা মেরুদেশীয় ইন্ডিয়ান। কিন্তু যে মেয়েটি তার দীর্ঘদিনের পেটিকাবদ্ধ হৃদয়কে সবে জাগিয়ে তুলল, তার প্রতি ঐকান্তিক হয়ে নোমের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল দেহ সৌষ্ঠবের স্রোতে, মেয়েটিকে অনুসরণ করতে লাগল।

২৩-তম রাস্তা ধরে মেয়েটি ফরফর করে নেমে যাচ্ছে, কোনোদিকেই চেয়ে দেখছে না—যেন বাগানের সেই ব্রোঞ্জ ডায়না মূর্তির মতো, কোনো ঢলাঢলি নেই। ওর চমৎকার বাদামি চুল সুন্দর বিনুনি করা, ছিমছাম কোমর আর নিভাঁজ

কালো স্কার্টে দুটি গুণের পরিচয়—রুচি ও বিচক্ষণ ব্যয়। দশ গজ পেছনে থেকে অনুসরণ করছে আবেগাক্রান্ত নোমের মানুষ।

সীবার ম্যাসনের মেয়েটি, মিস্ ক্ল্যারিবেল কল্‌বি, দুর্ভাগ্যক্রমে একদল বিষণ্ণ ফেরীযাত্রীর দলে, যাদের বলা হয় জার্সির কেরানিকূল। সে ফেরীর প্রতীক্ষা-ঘরে ঢোকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে, তারপর অদ্ভুত এক দ্রুত সংক্ষিপ্ত দৌড়ে ধরে ফেলে ফেরী বোটটা। সেটা তক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছিল। নোমের মানুষও তিন লাফে দশগজ পেরিয়ে কোনোক্রমে তার পেছনে-পেছনে উঠে পড়ে ডেকে।

মিস্ কলবি ওপর-কেবিনের বাইরে একটা মোটামুটি নিঃসঙ্গ আসন বেছে নিয়ে বসেছে। রাত ঠান্ডা নয়, মেয়েটার তাই ইচ্ছে যাত্রীদের কৌতুহলী দৃষ্টি আর একঘেয়ে গলার আওয়াজ থেকে দূরে থাকবে। তা ছাড়া সে ভীষণ ক্লান্ত, ঘুমের অভাবে শুধু ঢুলে পড়ছে। গত রাতে সে 'ওয়েস্ট-সাইড পাইকারী মাছ-ব্যবসায়ী সহকারীদের' দু'নম্বর ক্লাব উৎসবে নাচের আসর অলঙ্কৃত করেছিল, তাই তার ঘুমের স্বাভাবিক সময়টুকু কমিয়ে তিন ঘন্টা করতে হয়।

আর দিনের বেলাটা হল অস্বাভাবিক ঝামেলার। খদ্দেররা অনাবশ্যক পেড়াপিড়ি করছিল; ওর বিভাগের ক্রেতা সরাসরি ওকে বকাঝকা করল স্টক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে; ওর সেরা বন্ধু ম্যামি টাট্‌হিল ওর ওপর বিরাগ দেখাল ডকারি ছুকরিটার সঙ্গে আলাদা লাঞ্চে গিয়ে।

একজন স্বাধীন নারী উপার্জনকারীর যে মেজাজটা প্রায়ই আসে সীবার-ম্যাসনের মেয়েটিরও এখন সেই নিরুদ্বেগ শান্ত মেজাজ। এই এক মেজাজ যা প্রেমনিবেদনকারী পুরুষের পক্ষে সবচেয়ে সুলক্ষণের। তাছাড়া তার অনেক আকাঙ্খাও রয়েছে কোনো একটা ঘর বা হৃদয় অবলম্বন করার, নিজের সান্ত্বনা পাবার, আর কোনো সবল বাহুর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে একটু বিশ্রাম, একটু অবসর পাবার। কিন্তু মিস্ ক্ল্যারিবেল কল্‌বির যে আবার প্রচন্ড ঘুমও পেয়ে যাচ্ছে।

ওর পাশে এল একটি বলিষ্ঠ মানুষ। বাদামি হয়ে যাওয়া চামড়া, সেরা পোশাক অবহেলাভরে পরা, টুপি তার হাতেই।

নোমের মানুষ সশ্রদ্ধ ভাবে বলল, 'মাননীয়া, আপনার সঙ্গে কথা বলছি বলে মাফ করবেন আমায়, কিন্তু আমি—আমি—আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, আর—আর—'

'গেল যা!' মন্তব্য করল সীবার ম্যাসনের মেয়ে, অতি আচরিত ঠান্ডা-মগজে চোখ তুলে চেয়ে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে পড়া আপনাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার কি কোনো উপায় নেই? সবরকম চেষ্টা করেছি—রসুন খাওয়া থেকে শুরু করে টুপিতে পিন লাগানো অবধি। নিজের রাস্তা দেখুন, ফ্রেডি।'

'আমি ওধরনের মানুষ নই লেডি—সত্যি বলছি। যা বলছিলাম, আপনাকে রাস্তায় দেখলাম, আর আপনাকে ঠিকমতো জানবার জন্য আমার এমন দারুন

ইচ্ছে হতে লাগল যে আপনার পেছু না নিয়ে পারলাম না। আর ভয় হল যদি এখুনি কথা না বলি তাহলে বোধ হয় এ-জন্মেও এত বড় শহরে আপনার আর দেখা পাব না। সেই জন্যই এমন কাজ করেছি।'

ফেরীবোটের স্তিমিত আলোয় একবার ওর মুখটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল মিস কল্‌বি। না; এর মধ্যে বেইমানি কৃত্রিম হাসিটা নেই, কিংবা লেডি-হন্তাদের সেই নির্লজ্জ ঠাট। উত্তুরে চামড়ার রঙে সততা আর বিনয়ের চিহ্নই ফুটে উঠেছে। ওর মনে হল, লোকটা কী বলতে চায় তা একটু শুনলে মন্দ হত না।

বাহ্যিক ভদ্রতা দেখিয়ে হাত দিয়ে মুখের হাইটা চেপে ও বললে 'আপনি বসতে পারেন। আর—মনে রাখবেন—কোনো অভদ্রতা করলে সঙ্গে সঙ্গে স্টুয়ার্ডকে ডাকব।'

নোমের মানুষ বসল ওর পাশে। দারুন তারিফ করতে লাগল ওর। তারিফের চেয়েও কিছু বেশি।

এতদিন ধরে যা সে বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল হুবহু সেই আদল এই নারীর মুখে। কখনো কি সে তাকে পছন্দ করার মতো অবস্থায় আসবে? ঠিক আছে, সেটাই এবার দেখতে হয়। নিজের চাহিদার ঝুঁকি সামনে রেখে সে তার যথাসাধ্যই করবে, মোটের ওপব।

সে বলল, 'আমার নাম ব্লেডেন—"হেনরী ব্লেডেন"।

"জোনস্‌" তো নয়? আপনি নিশ্চিত?—সকৌতুক পরিহাসে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

উৎকণ্ঠিত গাম্ভীর্য নিয়ে সে বলেই চলে, 'আমি আসছি নোম থেকে। ওখানে কুড়িয়ে কাছিয়ে প্রচুর ধুলোই জড়ো করেছিলাম, আর তা সঙ্গেই নিয়ে এসেছি।'

পরিহাসটা আগের মতই মনোরম লঘু পর্যায়ে রেখে মেয়েটি খিলখিল করে হাসে, 'ও তাই বুঝি! তা হলে আপনি নিশ্চয় "সাদা ডানার" দলে। ভাবছিলাম আপনাকে কোথাও দেখেছি।'

'আপনি তো রাস্তার ওপর আমাকে দেখেননি, যখন আমি আপনাকে দেখি।'

'আমি রাস্তার কারো দিকে চেয়ে দেখি না।'

'বেশ, কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখেছি। আগে কখনো কাউকে দেখিনি যাকে আপনার চেয়ে সুন্দর মনে হয়েছে।'

'বখশিস্‌টা রাখব আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, তা তো রাখবেনই। আমার যা কিছু আছে সবই রাখতে পারেন হয়তো। আমার ধারণা, আমি তেমনই একজন যাকে আপনি রুক্ষ অভদ্র বলবেন, কিন্তু আমি দারুন মিষ্টিও হতে পারি, যদি কাউকে আমার পছন্দ হয়। ওদেশে আমায় অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল, কিন্তু তবু শেষ অবধি জিত হয়েছে আমার। ওখানে থাকতে প্রায় পাঁচ হাজার আউন্স ধুলো আমি সাফ করে নিয়েছি।'

'হে ভগবান!'—সুবিনীত সমবেদনার সুরে মিস্ কলবি বলে ওঠে, 'খুবই নোংরা জায়গা ওটা নিশ্চয়ই, যেখানেই হোক্ তা!'

এবার মিস্ কলবির চোখ বুজে আসে। নোমের মানুষটার গলার আওয়াজে ঐকান্তিকতা আছে বলেই একটু একঘেয়ে শোনায়। তা ছাড়া, এসব কী ভোঁতা কথাবার্তা ধুলো সাফাই, ঝাড়ু নিয়ে! মেয়েটি পিঠ এলিয়ে দেয় দেয়ালের ওপর।

এবার যেন আরো গভীর নিষ্ঠা আর একঘেয়েমির সুরে নোমের মানুষ বলে, 'মিস, আপনার মতো কাউকে দেখে কখনো আমার এত ভাল লাগেনি। আমি জানি আপনি ঠিক এক্ষুনি আমার বিষয়ে অমন করে ভাবতেও পারেন না, তবে আমাকে একটা সুযোগ দিতে আপনার আপত্তি নেই তো? আপনাকে জানার সুযোগ দিয়ে আপনি কি একবারও দেখবেন না আপনি আমায় পছন্দ করতে পারেন কিনা?'

সীবার ম্যাসনের মেয়েটির মাথা আলগোছে ঝুঁকে স্থান নেয় লোকটির কাঁধের ওপর। মিঠে ঘুম তাকে গ্রাস করেছে এবার, সে মহা আনন্দে স্বপ্ন দেখছে 'পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী সহকারীদের' বল নাচের।

নোমের ভদ্রলোক তার বাহুদুটো সামলে রাখে নিজের কাছেই। ঘুম বলে তার কোনো সন্দেহ হয়নি, তবু তার এটুকু বিবেচনা বুদ্ধি আছে যে মেয়েটির এ নড়াচড়া কোনো আত্মসমর্পণের লক্ষণ নয়। ভীষণ রোমাঞ্চ জাগছে অবশ্য তার, স্বর্গসুখের মতো, তবে শেষ অবধি তার কাঁধের ওপর এই মাথা রাখা একটা উৎসাহদায়ক পূর্বাভাস বলেই মনে হল। ওর সাফল্যের এটা প্রথম লক্ষণ হলেও এর সুযোগ নেওয়া চলে না।

একটা ছোট্ট খাদের কণা তার তৃপ্তির সোনাকে অমর্যাদার মানে নামিয়ে দেয়। সে কি তার সম্পদ নিয়ে একটু বেশি খোলাখুলি বলে ফেলেছে? সে তো চায় তার নিজের গুণেই কাম্য মানুষ হতে।

বলে, 'মিস্, আমি এই কথাই বলতে চাইছি যে আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন। ক্লনডাইকের ওর আমায় চেনে—জুনো থেকে সার্কল সিটি, ইউকন নদীর আগা থেকে গোড়া। অনেক রাত আমি বরফে শুয়ে কাটিয়েছি, মানে সেখানে ক্রীতদাসের মতোই খেটেছি তিনটে বছর। আর কেবলই ভেবেছি আমার উপযুক্ত কাউকে কি কখনো পাব যে আমায় পছন্দ করবে? ওই ধুলো সবটাই তো আমি নিজের জন্য চাইনি। ভেবেছিলাম একদিন হয়তো ঠিক মানুষটাকে পেয়ে যাবই, আর আজ তাই পেয়ে গেলাম। টাকা মস্ত জিনিস- হাতে থাকলে, কিন্তু যে তোমার সেরা পছন্দের লোক তার ভালবাসা পাওয়া তো আরো বড় কথা। মিস্, আপনাকে যদি কাউকে বিয়ে করতেই হয়, তার মধ্যে কোন্ গুণটা আপনি চাইবেন বলুন তো?'

'নগদ!'

মিস্ কলবির মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল ছ্যাঁক করে, উচুঁ গলায়। ওতে প্রমাণ হল স্বপ্নের এই মুহূর্তে সে সীবার ম্যাসনের বিশাল বিপণির কাউন্টারের পেছনেই ছিল।

হঠাৎ তার মাথাটা উঠে ঘুরে গেল পাশের দিকে। জেগে উঠে সোজা হয়ে বসল মেয়েটি, চোখদুটো কচলে। নোম থেকে আসা সেই লোকটি চলে গেছে!

মিস্ কলবি বলল, 'এ হে! বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। তারপর সেই সাদা ডানার কী হল কে জানে!'

The Ferry of Unfulfillment, নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন ১৯০৩

মার্টিন বার্নির রূপান্তর

স্যার ওয়াল্টার (স্কটের) নরম পদ্ধতি ধরেই আসুন খতিয়ে দেখি মার্টিন বার্নির ব্যাপারটা।

হারলেম নদীর পশ্চিম পাড়ের ওপর একটা দ্রুত যান-চলাচলের "স্পীডওয়ে" পথ তৈরি করছিল। ছোট কনট্রাকটর ডেনিস্ করিগানের খাদ্য-সরবরাহের বোটখানা পাড়ের সঙ্গে বাঁধা। ক্ষুদে সবুজ দ্বীপের বাইশ জন লোক সেখানে হাড়মাস কালি-করা মজুরি খাটে। ওদের মধ্যে একজন, যে খাদ্য বোটের রসুইখানায় কাজ করে, সে আবার গথ্ জার্মান জাতের লোক। ওদের সকলের ওপর দাঁড়িয়ে নজর রাখে প্রতাপ জাহির-করা করিগান, ক্রীতদাস জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত ওদের ওপর হম্বিতম্বি করে। ওদের মজুরি দেয় এত কম, যে অধিকাংশ কর্মীরই যথাসাধ্য পরিশ্রম করেও খাবারটা আর তামাক ছাড়া কিছু জোটে না; উল্টে ওর কাছেই তারা ধারে। করিগান ওদের সবাইকে খাবার বোটে বসেই খাওয়ায়, খাবারও দেয় ভাল, কারণ তার বদলে কাজটি তো সে পেয়ে যাচ্ছেই।

ওদের সকলের পেছনে মার্টিন বার্নি। ছোটখাটো মানুষ, সবটাই তার পেশী, হাত আর পা। ধূসর লাল বেঁড়ে খোচাঁদাড়ি; কাজের পক্ষে সে খুবই পল্কা, তবে কাজটা বাষ্প-শাবলের ক্ষমতাকেও হার মানিয়ে দিতে পারত।

কঠিন পরিশ্রম। তার ওপর আবার নদীর পাড়ে মশার গুনগুনানি। আঁধার ঘরে কোনো শিশু যেমন একমাত্র সান্ত্বনার জানলাটি দিয়ে নিষ্প্রভ আলোর দিকে চেয়ে থাকে, তেমনি করেই এই মজুররাও চেয়ে থাকে 'এক ঘণ্টার' যে দিনটুকু সূর্য দেখায়, তারই আশায়; সেই সময় যেন একটু স্বাদ ফেরে ওদের মুখে। সূর্যাস্তের ভোজন সমাধা করে তারা নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়ে বসে, তেইশখানা

দুর্গন্ধ নলের জঘন্য ফুৎকার ছেড়ে তারা পাকখাওয়া ঘ্যানঘেনে মশাগুলোকে হটিয়ে দেয় ডাঙার দিকে। এই ভাবে দুশমনের বিরুদ্ধে সবাই মিলে একজোটে লড়ে ওরা ওই এক ঘন্টার ভেতরেই আনন্দের পেয়ালা থেকে যাকিছু ধোঁয়া-ভরা কয়েকটি ফোঁটা গিলে নেয় যেন।

প্রতি হপ্তায় ক্রমে বেশি করে ঋণের মধ্যে ডোবে বার্নি। করিগান বোটের ভেতরেই একটা ছোট ভান্ডার রেখেছে এটা ওটা জিনিসের, সেগুলো যে দামে ও মজুরদের বেচে তাতে ওর লোকসান কিছু হয় না। তামাকের কাউন্টারে একজন বড় খদ্দের হল বার্নি। সকালে কাজে যাবার সময় এক থলে, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর আরেক থলে—এই হিসেবেই ওর বাকির খাতা দিনে দিনে ফেঁপে ওঠে। বার্নি একজন 'জাত' তামাকখোর। তবে এটা সত্যি নয় যে পাইপ মুখে দিয়েই ও খাবার খায়,—ওরকম ওরা বলে বটে! বেঁটে লোকটা কিন্তু অসুখী নয়। যথেষ্ট ভোজন করে, প্রচুর ধূমপানও করে, আর কড়া মালিকটির আদ্যশ্রাদ্ধও করে; অতএব, একজন আইরিশ মানুষ হিসেবে তার তো খুশি থাকারই কথা।

একদিন সকালে অন্য সাথীদের সঙ্গে কাজে যাবার সময় সে পাইন কাঠের কাউন্টারটার সামনে দাঁড়িয়েছে তার দৈনন্দিন তামাক থলির জন্য।

করিগান বলল, 'তোমার জন্য কোনো তামাক নেই। তোমার হিসেব চুকে গেছে, খাতা বন্ধ। তোমার ওপর টাকা খাটানো মানেই লোকসানি। না, তামাক আর নয় বাছা। বাকিতে তামাক নয়। যদি খেটে খেতে চাও, তা কর। কিন্তু তোমার ধোঁয়ার নেশা আকাশে চড়েছে। আমার উপদেশ, তুমি একটা নতুন কাজ খুঁজে নাও।'

'আমার যে আজকের জন্য পাইপের তামাকুই নেই, মিঃ করিগান।' বার্নি ভালো মত বোঝেইনি যে এমন ব্যাপার তার ঘটতে পারে।

করিগান বলল, 'আগে রোজগার কর, তারপর কিনে খাও।'

বার্নি রয়েই গেল। অন্য কোনো কাজ তো সে জানে না। আগে তো ওর ধারণাই ছিল না যে তামাকই ওর মা-বাপ, ওর গুরুদেব আর সঙ্গিনী; ওর বউ ছেলে বলতে এই তামাক।

পরের তিন দিন সে অন্য লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে পাইপ ভরল, তারপর তারাও থলে সরিয়ে নেয়, একে একে সকলেই। ওরা তাকে বলে, রুক্ষ হলেও বন্ধুভাবেই বলে, দেখ, দুনিয়ার যে কোনো বস্তুর মধ্যে তামাকটাই সর্বাগ্রে চলে আসা উচিত আগ্রহী দোস্তের কাছে, সেটা ঠিক, কিন্তু আশু সাময়িক প্রয়োজনের ওপরেও যদি আবার কোনো সাথীর নিজস্ব ভান্ডারে হাত বাড়াতে চাও তা হলে তা হবে বন্ধুত্বের পক্ষে মারাত্মক।

গহ্বরের অন্ধকার তখন গ্রাস করে বার্নির হৃদয়। মৃত পাইপের প্রাণশূন্য বস্তুই তাকে চুষতে হয়, ওই ভাবেই টলে টলে ঠেলা-ভর্তি পাথর আর মাটি টানার

কাজ করতে হয়—এই প্রথম অনুভব করে বাবা আদমের অভিশাপ এবার তারই ওপর ফলছে। অন্য লোকেরা আনন্দের অভাব বুঝলে অন্য জাতের মজা খোঁজে, কিন্তু বার্নির তো জীবনে মাত্র দুটোই সান্ত্বনা। এক তার তামাকের পাইপ, অন্যটা হল পরপারে গিয়ে আর তাকে রাস্তা বানাতে হবে না—এই পরম সুখের আশা।

খাওয়ার সময় হলে ও অন্য লোকদের পথ ছেড়ে দেয় খাবার বোটে আগে যাবার জন্য, তারপর হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে পাগলের মতো খোঁজে ওদের জায়গাগুলো, যেখানে বসে ওরা কাজ করেছিল—যদি এক আধ চিলতে এদিক উদিক ছড়ানো তামাক খুঁজে পাওয়া যায়। একবার সে চুপি চুপি নদীর পাড় ধরে চলেও গিয়েছিল—মরা উইলো পাতা দিয়ে পাইপ ভরতে। তা, সে-ধোঁয়ায় পয়লা টানটা দিয়েই সে থুতু ছোঁড়ে বোটের দিকে, আর তার জানা সবরকম অকথ্য গালাগাল ঝাড়ে করিগানকে লক্ষ্য করে। সে গালাগালের শুরু মাটিতে প্রথম করিগানটির পয়দা হওয়া থেকে একেবারে শেষ করিগানটি অবধি, যে অন্তিম ফরিশ্‌তার তুরীধ্বনি শুনবে একদিন। করিগানের ওপর চরম ঘেন্না ওর শিরা উপশিরা আত্মা অবধি কাঁপিয়ে তোলে। একবার অস্পষ্ট ভাবে খুনের চিন্তাটাও মাথায় এসেছিল। পাঁচ দিন কাটিয়েছে তামাকের স্বাদ ছাড়াই—আর এই লোকই কিনা সারা দিনভর তামাক টানত, আর রাতটাকেও মনে করত বৃথা গেল, কারণ সে সময় জেগে উঠে একটা-দুটো টান দিতে পারেনি তার পাইপে।

একদিন একটি লোক বোটে এসে খবর দিল ব্রংক্‌স্ পার্কে কাজ খালি আছে, সেখানে প্রচুর মজুরের দরকার পার্কের কিছু উন্নতির জন্য। সান্ধ্যভোজনের পর বার্নি তিরিশ গজ হেঁটে চলে গেল নদীর পাড় ধরে, অন্য বোটগুলোর নল থেকে পাগল করা ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তাই এড়াতে। একটা পাথরের ওপর বসল। ভাবছিল ব্রংকসের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়ে যাবে। অন্তত তামাকটা তো কিনতে পারবে সেখানে। যদি খাতাপত্রে দেখা যায় ও করিগানের কাছে ধার রেখেছে? কতোদিন ও কাজ করবে তা নির্ভর করছে ওর থাকার ওপরেই। কিন্তু ওই হৃদয়হীন চৌকিদারটা, যে ওর মুখ থেকে পাইপ কেড়ে নিয়েছে, তার ওপর কোনোরকম শোধ না তুলে যে চলে যেতেও ঘেন্না হয় ওর। কোনো উপায় আছে সে কাজটি করার?

এবড়োখেবড়ো মাটি ডিঙিয়ে আস্তে উঠে এল টোনি—সেই জার্মান গথ লোকটা যে রসুইঘরে কাজ করে। বার্নির কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে সে দাঁত বের করে হাসল। অসুখী বার্নি একেই তো জাতবিরোধী, তার ওপর ভদ্রতার ধার ধারে না, গরগর করে বলল, 'তুমি আবার কী চাও হে—ডাগো?'

টোনির ভেতরেও নালিশ আছে—মাথায় একটা মতলব। সেও করিগান বিদ্বেষী, তাই তৈরিই থাকে অন্যদের মধ্যেও সেরকম কিছু দেখার আশায়।

জিজ্ঞেস করে, 'করিগান লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়? তুমি কি ভাবো সে ভাল লোক?'

বার্নি বলে, 'জাহান্নাম থাক সে! ওর লিভার পচে যাক, বুকের ঠান্ডা লেগেই ওর হাড় মটকে যাক। ওর বাপ পিতামোর কবরে গজাক কুকুর-মোতা গুল্‌ফা গাছ, ওর নাতি পুতিরা জন্মাক চোখশূন্য হয়ে। আর ওর পাইপের ধোঁয়ায় চোখের জল ঝরুক, সেই জলের-ফোঁটা পড়া ঘাস খেয়ে ওর গরুগুলোর দুধে বিষ মাখন হোক্, তাই খাক রুটিতে মাখিয়ে!'

অদ্ভুত এই কল্পজগতের সৌন্দর্য যদিও টোনির মাথায় প্রবেশ করেনি, তবে সে এ থেকে এটুকু বুঝেছে যে ওর বক্তব্য যথেষ্টই করিগান বিরোধী। তাই ষড়যন্ত্রী বন্ধুর ভরসা নিয়ে বার্নির পাশে পাথরের ওপর বসে, আর প্রকাশ করে তার চক্রান্তের নক্‌শা।

নক্‌শার দিক থেকে বড় সহজ একটা মতলব। রোজই রাতের খাওয়ার পর করিগানের অভ্যাস এক ঘন্টা নিজের বাঙ্কে উঠে ঘুমিয়ে নেয়া। এই সময়টিতে রাঁধুনি আর তার সহকারী টোনির কর্তব্য হল সম্রাটের যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় তাই বোট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। রাঁধুনি সর্বদাই এই এক ঘন্টা হেঁটে ঘুরে ঘুরে কাটায়। টোনির মতলবটা এই: করিগান ঘুমিয়ে পড়ার পর সে (টোনি) আর বার্নি বোটের সঙ্গে ডাঙায়-বাঁধা নঙর কাছিটা কেটে দেবে। টোনির একা এ-কাজ করার সাহস নেই। পরে টালমাটাল বোটখানা গিয়ে পড়বে কড়া স্রোতের মধ্যে, আর নিচের কোনো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নির্ঘাত উল্টে যাবে।

'বেশ তো, করেই দেখ না,' বার্নি বললে, 'তোমাকে চাবকেছিল বলে যদি তোমার পিঠে ব্যথা থাকে, এক ছিলতে তামাকের জন্য আমার পেট যেমন কামড়ায়,—কখনোই অতো তাড়াতাড়ি আমরা দড়ি কাটতে পারব না।'

'ঠিক আছে', বলল টোনি, 'বরং দশ মিনিট বেশি সবুর করব, যাতে করিগান যথেষ্ট সময় পায় নাক ডেকে ঘুমোতে।'

পাথরের ওপর বসে ওরা অপেক্ষা করে। বাকি লোকজন রাস্তার একটা মোড়ের ওদিকে চোখের আড়ালে কাজ করছে। সব কিছু ভাল ভাবেই হয়ে যেত—একমাত্র হয়তো করিগান ছাড়া,—যদি না এরপর টোনি তার শয়তানি ষড়যন্ত্রের ওপর একটু কেতামাফিক সাজসজ্জা চড়াতে না যেত। ওর শরীরে নাটুকেপনার রক্ত। মঞ্চের নিয়মানুযায়ী হয়তো কিছু অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক জুড়তে চেয়েছিল তার বদমায়েশি মতলববাজির সঙ্গে—এটা তার সহজাত প্রবৃত্তি। শার্টের বুকের ভেতর থেকে সে একটা লম্বা, কালো, সুন্দর, বিষাক্ত চুরুট বের করে বার্নির হাতে দিল।

'যতোক্ষণ সবুর করছি ততোক্ষণ এটা খেলে চলবে তো?'—টোনির প্রশ্ন। বার্নি খিমচে ধরে ওটার একটা দিক দাঁত দিয়ে কাটে, টেরিয়ার কুকুর যেমন ইঁদুর কামড়ে ধরে। কতোদিনের হারানো সখীর মতো ওটাকে নিজের ঠোঁটে রাখে। ধোঁয়া টেনে বের করার সঙ্গে ও একটা দীর্ঘ গভীর নিশ্বাস ছাড়ে, ধুসর লাল গোঁফের চুল ঈগলের ঠোঁটের মতো কুঁকড়ে আঁকড়ে ধরে চুরুটটাকে। ক্রমে ওর

চোখের সাদা অংশ থেকে লালটা চলে যায়। নদীর ওপারের পাহাড়গুলোর দিকে ওর স্থির দৃষ্টি স্বপ্নালু হয়ে তাকিয়ে থাকে। একের পর এক মিনিট আসে, মিনিট কেটে যায়।

'এবার যাবার সময় হয়ে এল', বললে টোনি, 'ওই হতভাগা করিগান নদীর মধ্যে ভেসে যাক্ জলদি।'

বার্নি যেন স্বপ্ন থেকে চমক ভেঙে জেগে ওঠে ঘোঁত করে। মাথা ফিরিয়ে ও অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে দোসরের দিকে, একটা যন্ত্রণাময় কঠোরতা তার চোখে। ঠোঁট থেকে চুরুটটা একটুখানি তুলে নিয়েছিল, তারপরেই আবার সেটা টেনে নিল মুখে, আদর করে একবার কি দুবার চিবোলো। মুখের কোণ থেকে ভয়ানক দমক ছেড়ে বলে উঠল :

'এটা কী হচ্ছে হলদে কাফের? তুমি কি দুনিয়ার সভ্য জাতগুলোর বিরুদ্ধে কৌশলের জাল ফেলবে? বেআইনি অপরাধের উস্কানি দিচ্ছ? তুমি কি ভেবেছ মার্টিন বার্নিকে তোমার নোংরা কৌশল খাটিয়ে অসভ্য ডাগোর দলে টানবে? তুমি চাও তোমার উপকারী মানুষকে খুন করতে—যে মানুষ তোমাকে খেতে খাটতে দেয়! এই যে লালকুমড়ো খুনী, এই নাও!'

ব্যার্নির ক্রোধের বন্যা এবার দৈহিক আক্রমণের রূপ নিয়েছে। ওর জুতোর ডগা হবু দড়ি-কাটা মানুষকে পাথরের আসন থেকে ছিটকে ফেলে দেয়।

টোনি উঠে দৌড়ে পালায়। তার প্রতিশোধস্পৃহা আবার চাপা পড়ে 'অসমাপ্ত' কর্তব্যের নথিতে। বোট পার হয়েই সে ছুট লাগায় দূরে—আরো দূরে। তার আর থাকতে সাহসই হয় না।

বার্নি বুকটা চিতিয়ে তার প্রাক্তন দোসর-কুচক্রীকে দেখে অদৃশ্য হতে। তারপর সেও বিদায় নেয় ব্রংক্সের দিকে মুখ করে।

ওর যাওয়ার পথে একটা বিশ্রি ক্ষতিকারক রেশ যায় দুর্গন্ধ ধোঁয়ার, যা ওর হৃদয়ে শেষ অবধি শান্তি এনে দিয়েছিল। ওই গন্ধে রাস্তার ধারের পাখিগুলো পালিয়ে যায় গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে।

Transformation of Martin Burney. নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

সংবাদপত্রের ক্ষমতা

সকাল ন'টায় কাগজখানা পড়েছিল গিউসেপির পত্র-পত্রিকার স্ট্যান্ডে, তখনো ছাপাখানার সদ্য ভিজে স্পর্শ তাতে। গিউসেপি তার গোত্র-সুলভ চতুরালির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিল রাস্তার অপর কোণে, নিঃসন্দেহে খদ্দেরদের নিজের সততার ওপর ছেড়ে দিয়েই নজর রাখছিল দূর থেকে।

এই বিশেষ সংবাদপত্রটা,—তার নিজস্ব রীতি ও সজ্জা অনুযায়ী—শিক্ষামূলক,পথপ্রদর্শক, সতর্ককারী, আদর্শরক্ষক আর ঘরোয়া বিষয়ে উপদেশদাতা, তাছাড়া চলার সাথীও বটে।

কাগজটির নানা উৎকর্ষের মধ্যে বেছে নেয়া যায় তিনটি সম্পাদকীয় স্তম্ভ। একটি সহজ, সাধু অথচ জ্ঞানগর্ভ লেখা, ছাত্রদের পিতামাতা ও শিক্ষকদের উদ্দেশে,—শিশুদের দৈহিক শাস্তির প্রবল নিন্দা করে।

আরেকটি এক কুখ্যাত শ্রমিক নেতাকে লক্ষ্য করে তাৎপর্যপূর্ণ সতর্কতা ও অভিযোগ—ওই নেতা তার অনুচরদের এক উস্কানির পর্যায়ে এনে অসংযত ধর্মঘটের পথে পা বাড়াচ্ছে।

তৃতীয়টা এক সোচ্চার দাবি—সর্বব্যাপারে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য ও পালন করতে হবে, যাতে জনসাধারণের রক্ষক ও সেবক হিসেবে তাদের কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ তিরস্কার আর সৎনাগরিকদের কর্তব্যের আহ্বান ছাড়াও ও কাগজের "অন্তরঙ্গ" স্তম্ভে সম্পাদক মশাই এক বিচক্ষণ ব্যবস্থাপত্র অথবা পদ্ধতি জানিয়েছেন এক নির্দিষ্ট যুবকের ক্ষেত্রে—প্রেমিকার অনড় কঠোরতা নিয়ে নালিশ জানিয়েছিল সে, সম্পাদক শেখাচ্ছেন কী কবলে সে তাকে জয় করতে পারবে।

আবার, রূপ-প্রসাধনের পাতাতেও আছে এক অনুসন্ধিৎসু যুবতীর প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ জবাব—সে উপদেশ চায় কী ভাবে সে উজ্জ্বল চোখ, গোলাপি গাল আর সুন্দর চেহারা পেতে পারে।

অন্য আরেকটা বিষয় মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, সংক্ষিপ্ত "ব্যাক্তিগত" কলমে:

"প্রিয় জ্যাক—ক্ষমা কোর। তুমিই ঠিক বলেছিলে। ম্যাডিসন এ্যাভিন্যু আর '—'নং রাস্তার মোড়ে আজ সকাল ৮:৩০এ দেখা কর। দুপুরে আমরা রওনা দেব।

-অনুতপ্তা"

আটটার সময় গিউসেপির স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক যুবক একটা পেনি ফেলে তুলে নেয় ওপরের কাগজটা। খ্যাপাটে চেহারা, চোখে জ্বরাতুর অশান্তির দীপ্তি। বোধহয় রাতে ঘুমোয়নি বলে দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছিল। ন'টার মধ্যে যেতে হবে অফিসে, আর এই অবসরে সেরে নিতে হবে দাড়ি-কামানো, দ্রুত এক পেয়ালা কফি।

সে নাপিতের দোকানে ঢোকে, তারপর তাড়াহুড়ো করে ছোটে রাস্তায়। পরেই না-হয় দুপুরের খাবার ঘন্টায় পড়ে নেবে ভেবে কাগজটা রেখেছিল পকেটে। পরের মোড়টাতে আসতেই খবরের কাগজটা ওর পকেটে থেকে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে

পড়ে গেল ওর নতুন দস্তানা জোড়াও। তিনটে ব্লক চলে যাবার পর ও খেয়াল করল দস্তানা জোড়া হারিয়েছে, তাই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে চলল সেই মোড়ের দিকেই।

কোণটাতে পৌঁছল সাড়ে আটটায়। কাগজ আর দস্তানা সেখানেই পড়ে আছে। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে সে আর গ্রাহ্যই করল না কী খুঁজতে সে এসেছিল—দুটো ছোট হাত ততক্ষণে ও নিজের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরেছে, আর চেয়ে রয়েছে একজোড়া অনুতপ্ত বাদামি চোখের দিকে। ওর হৃদয় আনন্দে আত্মহারা।

মেয়েটি বললে, 'আমার প্রিয় জ্যাক, আমি জানতাম তুমি ঠিক সময়ে এখানে হাজির হবে।'

যুবক মনে মনে বলে, 'এ আবার কী বলতে চাইছে ও! তা ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

পশ্চিম দিক থেকে একটা জোর হাওয়া আসে, হাওয়া ফুটপাত থেকে কাগজটাকে তুলে নিয়ে পাতা খুলে ছুঁড়ে দেয় পাশের গলিতে, কাগজটা পাক খেয়ে গড়িয়ে যায়। ওই গলি ধরে ভিতু ঘোড়া-জোতা এক মাকড়শা-চাকার বগি-গাড়ি চালিয়ে আসছিল সেই ছোকরা, যে "অন্তরঙ্গ" সম্পাদককে চিঠি লিখে ব্যবস্থাপত্র চেয়েছিল তার হা-পিত্যেশ করা প্রেমিকাকে পেতে।

খেলার ছলে ফরফর করে সেই হাওয়া এবার উড়ন্ত খবর-কাগজটাকে সাপ্‌টে দেয় ভিতু ঘোড়াটার মুখে। লম্বা ভোঁ দৌড় মেরে ঘোড়া তার বল্‌গাসাজের লাল রং টেনে নিয়ে গেল একেবারে চার ব্লক অবধি দূরে। তারপর এ ভোজবাজির মধ্যে এল রাস্তার জলের কলের পালা। বগিটা যেন নিয়তির ফেরেই দেশলাই বাক্সের সামিল! আর চালক স্থির হয়ে রইল আস্‌ফালটের ওপর যেখানে সে পড়েছে—একটা বাদামি পাথরের বাড়ির সামনে।

বাড়ির ওরা বেরিয়ে এসে চটপট তাকে টেনে নিল ভিতরে। ওদের মধ্যে এক মহিলা আবার নিজের কোলের ওপর ছোকরার মাথাটাকে বালিশের মতো রাখল। সে কোনো কৌতূহলী চোখের ধার ধারে না। ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ওহ্ ববি, তুমি! সারাক্ষণ তো তোমার কথাই ভাবতাম! তুমি কি সেটা বুঝতে পারোনি? আর, তুমি যদি মর, তা হলে আমাকেও মরতে হবে, আর—'

কিন্তু এখানকার হাওয়ার মধ্যেই আমাদের তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখতে হবে খবরের কাগজটার কী হাল হল।

পুলিসম্যান ও' ব্রাইন ওটাকে গ্রেপ্তার করেছে পথ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক এক চরিত্র হিসেবে। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পাতাগুলোকে মোটা ধীর আঙুলে সোজা করে সে 'শ্যানডন বেলস্‌' কাফের পারিবারিক প্রবেশ পথ থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়াল। একটা শিরোনামা সে অতি কষ্টে বানান করে পড়ল- "সংবাদপত্র জগৎ এগিয়ে আসুন পুলিশের সহায়তায়"।

কিন্তু, হুশ্! হেড বার-রক্ষক ড্যানির গলা শোনা যাচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে—'মাইক, বুড়োদা, তোমার জন্য এক ঢোঁক, এই নাও!'

কাগজের ছড়ানো, বন্ধুত্বময় রচনা স্তম্ভের আড়ালে পুলিশম্যান ও'ব্রাইন চট করে পেয়ে যায় আসল বস্তুটির এক চুমুক। সে চলে যায়, আগের মতো বুক ফুলিয়ে, নতুন তেজে, নিজের কর্তব্য করতে। সম্পাদক মশাই কি গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন না—তার পরিশ্রমের সুফল কতো তাড়াতাড়ি ফলে গেল- আক্ষরিক ও আধ্যাত্মিক অর্থেই?

পুলিশম্যান ও'ব্রাইন কাগজটা ভাঁজ করে একটি আগন্তুক বালকের বগলের নিচে কৌতুক করে ঢুকিয়ে দিল। ছেলেটার নাম জনি, সে কাগজটা নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে। তার বোনের নাম গ্ল্যাডিস। সেই তো কাগজের প্রসাধন সম্পাদককে চিঠি লিখেছিল সৌন্দর্যের হাতে-কলমে উন্নতির পদ্ধতি জানতে চেয়ে। সে কয়েক হপ্তা আগের কথা, তাই এখন জবাবের জন্য প্রত্যাশা করে কাগজ দেখা ছেড়ে দিয়েছে। গ্ল্যাডিস পাংশু চেহারার মেয়ে, নিষ্প্রভ চোখ, মুখে অতৃপ্তির চিহ্ন। এ্যাভিন্যুতে যাবার জন্য পোশাক পরছিল, চুলে বিনুনি করে আসবে। জনি যে কাগজ এনেছে তারই দুটো পাতা সে স্কার্টের নিচে পিন দিয়ে আটকে নিয়েছিল। ও যখন হাঁটতে লাগল, খসখসানি আওয়াজটা হল হুবহু যেন আসল জিনিস।

নিচের তলার ব্রাউন মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়, দাঁড়াল কথা বলতে। ব্রাউন মেয়েটি তখন হিংসেয় ফাটো ফাটো। গ্ল্যাডিস্ নড়াচড়া করতে যে খস্খস্ আওয়াজ হয় তা সম্ভব শুধু ৫-ডলার গজের সিল্কেই। ঈর্ষাবিষ্ট ব্রাউন মেয়েটি কিছু ঝগড়ুটে কথা বলেই নিজের পথ ধরে চলল, ঠোঁট কামড়ে।

গ্ল্যাডিস্ চলল এ্যাভিন্যুর দিকে। ওর চোখ এখন বনবিড়ালের মতো জ্বলছে। গালে উঁকি দিচ্ছে গোলাপি আভা; একটা জয়োল্লাসের চাপা প্রাণবন্ত হাসি ওর মুখটাকেই যেন বদলে দিয়েছে। সে সুন্দরী। আহা! প্রসাধন সম্পাদক যদি এই সময় তাকে দেখতেন! কাগজে ওর প্রশ্নের জবাবে কিছু লিখেছিল, আমার বিশ্বাস,—অতি সাধারণ চেহারাকেও সুন্দর করা যায় অন্যের প্রতি সদয় আচরণের চর্চা করলে।

সেই শ্রমিক নেতা যাকে কাগজে খুব কড়া সম্পাদকীয় ভাষায় সাবধান করা হয়েছিল, সে আমাদের গ্ল্যাডিস আর জনিরই বাবা। গ্ল্যাডিস রেশমি শব্দের প্রসাধনটুকু লুটে নেবার পর কাগজের যে অংশটা পড়ে থাকে তা তুলে নেয় সে। সম্পাদকীয়টা তার নজরে এল না, কিন্তু তার বদলে একটা মজার ধাঁধার কৌশল তাকে আকর্ষণ করল—এ ধাঁধাগুলো বোকা থেকে জ্ঞানী অবধি সবাইকে দারুণ আনন্দ দেয়।

পাতাটার আধখানা ছিঁড়ে নিল শ্রমিক নেতা। একটি টেবিল, পেন্সিল, কাগজ জোগাড় করে নিয়ে একেবারে গঁদের আঠার মতো লেগে রইল ধাঁধা সমস্যায়।

তিন ঘন্টা বাদে, যথাস্থানে তার বৃথা অপেক্ষা করার পর অন্য রক্ষণশীল নেতারা

ফয়সালার পক্ষে ঘোষণা ও প্রস্তাব জানিয়ে দিল, অতএব ধর্মঘট ও তার অবধারিত বিপদও এড়ানো গেল। সংবাদপত্রের পরবর্তী সংস্করণে রঙিন কালি দিয়ে উল্লেখ করা হল শ্রমিক নেতার আসল মতলব ফাঁস করে দেবার ব্যাপারে তাদের অসামান্য সাফল্যের।

সক্রিয় পত্রিকার বাকি পাতাগুলোও যথাযথভাবে প্রমাণ করেছে তার ক্ষমতার দাপট।

জনি স্কুল থেকে ফিরে একটা নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে বসল, আর ওর জামাকাপড়ের ভেতর থেকে হারানো স্তম্ভের পৃষ্ঠাগুলো টেনে বের করল। জামার ভেতরে ওগুলো কৌশল করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, বিশেষ করে যে জায়গাগুলোতে পন্ডিতি পীড়নের ঘা-গুলো পড়ে সেখানটা বাঁচাবার সাধু প্রচেষ্টায়। জনি একটা বেসরকারী স্কুলে পড়তে যেত, আর তার ঝামেলা হত শিক্ষকের সঙ্গে। আগে যেমন বলা হয়েছে, সেদিনকার সকালের সংস্করণে সংবাদপত্রে সুন্দর সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল দৈহিক শাস্তি দানের বিরুদ্ধে, আর নিঃসন্দেহে তার ফল ফলেছে।

এর পরেও সংবাদপত্রের ক্ষমতা নিয়ে কারো সন্দেহ থাকবে কী?

A Newspaper Story, নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

ম্যাডিসন স্কোয়ারে আরব্য রজনী

ম্যাডিসন স্কোয়ারের কাছে কার্লসন চামার্স-এর নিজস্ব স্যুইট। ফিলিপস্ তাঁর কাছে সেদিনের সান্ধ্য ডাক এনে দিল। গতানুগতিক চিঠিপত্রগুলো ছাড়া ওর মধ্যে দুটো রয়েছে বিদেশের ডাকখানার ছাপ মারা লেপাফা।

এই বহিরাগত পার্সেল দুটোর একটাতে একখানি ফোটোগ্রাফ, আর শেষ হতে চায় না এখন এক চিঠি। ফোটো আর চিঠির ওপর অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্ট হয়ে ঝুঁকে থাকেন চামার্স।

অন্য আমদানি লেপাফার মধ্যে ছিল বিষাক্ত হুল। যদিও তিন হাজার মাইল দূর থেকে পাঠানো, তবু ওর কাঁটা ধারালো, আর বিষও সেইরকমই সক্রিয় যখন ওটার খোলসের ওপর ডাকছাপ, আর লিখিয়ের হাতের নাম-ঠিকানা বসে।

চামার্স এই চিঠিটাকে শতখন্ডে ছিঁড়ে ফেললেন, আর দামি কার্পেটটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তারই ওপর আগুপিছু পদচারণা করতে লাগলেন দীর্ঘ পদক্ষেপে। কোনো বন্য জানোয়ার খাঁচায় বন্দী হলে ওরকমই করে আর কোনো খাঁচাবন্দী মানুষও ওই রকমই করে সন্দেহের জঙ্গলে আকীর্ণ হলে।

ক্রমে ক্রমে তাঁর অস্থির মেজাজ সংযত হয়। গালিচাখানা তো আর মন্ত্র মায়ার বস্তু নয়, বড় জোর ষোল ফুট উনি ওতে ভ্রমণ করতে পারেন। তিন হাজার মাইল ওটার ক্ষমতায় কুলোবে না।

ফিলিপ্‌স আবির্ভূত হল। সে কখনো ঢোকে না, সর্বদাই তার আবির্ভাব ঘটে, তৈল-মসৃণ জিন্‌দৈত্যের মতো।

জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এখানেই ডিনার খাবেন স্যর, না কি বাইরে?'

'এখানে', বললেন চামার্স, 'আর আধঘন্টার মধ্যেই।' বিষণ্ন হয়ে শুনলেন শূন্য রাস্তা থেকে জানুয়ারি মাসের প্রচন্ড হাওয়ার শব্দ, যেন এওলিয়ান বীণায় ঝঙ্কার তুলেছে।

অপস্রিয়মান দৈত্যকে ফের ডাকলেন, 'দাঁড়াও! স্কোয়ারের ওপার থেকে ঘরে আসার সময় দেখেছিলাম অনেক লোক সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু একজন লোক একটা কিছুর ওপর উঠে দাড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে। কেন ওই লোকগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে বলো তো? কেন ওরা ওখানে?'

ফিলিপস্ বললে, 'ওরা স্যর, গৃহহীন লোক। বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে একজন ওদের রাতের আশ্রয় চেয়ে ভিক্ষা জানায়। লোকে চারদিক থেকে শুনতে আসে, টাকাপয়সা চাঁদা দেয়। তারপর সে ওই টাকা দিয়ে যতোজন সম্ভব মানুষকে পাঠায় রাতের মতো মাথা গোঁজার আস্তানায়। ওইজন্য সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে, পালা করে একেকজনকে পাঠানো হয়, যে যেমন আসে।'

চামার্স বললেন, 'যতোক্ষণে ডিনার পরিবেশন হবে, ওদের একজনকে ডেকে এনো এখানে। সে আমার সঙ্গে বসে ডিনার খাবে।'

'কো- কো- কাকে?'—এই প্রথম নিজের কাজের আমলে তোত্‌লামি করল ফিলিপ্‌স।

'যে কোনো একজনকে বেছে নিও!' চামার্স বললেন, 'শুধু দেখো সে যেন মোটামুটি সুস্থির বুদ্ধিতে থাকে- আর কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে সেটা তার পক্ষে দোষের হবে না। ব্যস্, এইটুকুই।'

কার্লসন চামার্স খলিফার ভূমিকায় নামবেন সেটা যেন এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আজ রাতে উনি বেশ বুঝতে পারছেন বাঁধাধরা ওষুধে ওর মনের বিষণ্ন ভাব দমন করা যাবে না। একটা উদ্ভট মারাত্মক কিছু, উগ্রগন্ধী আরবীয় কিছু তাঁর চাই—খোশমেজাজ ফিরিয়ে আনতে।

পরের আধঘন্টায় ফিলিপস্ তার সব কর্তব্য সমাধা করল প্রদীপের ক্রীতদাস দৈত্যের মতো। নিচের রেস্তোরাঁর ওয়েটাররা সেরা ডিনারের পদ তুলে এনেছে ওপরে। ডাইনিং টেবিল পাতা হয়েছে দু'জনের মতো করে গোলাপি ঢাকনা লাগানো মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে তা।

আর এবার ফিলিপস্, যেন কোনো কার্ডিনালকে ধরে এনেছে—অথবা কোনো

সিঁধেল চোরকে—এইভাবে ভেতরে ঢোকাল এক কম্পমান অতিথিকে, সিধে ভিখারি-আশ্রয়প্রার্থীদের লাইন থেকে টেনে এনে।

সাধারণভাবে এই লোকগুলোকে দুর্গত বলা হয়; এখানে যদি তুলনা করতেই হয়, এই বিশেষ দুস্থ ব্যক্তি এক 'পোড়-খাওয়া মানুষ, জ্বালায় ভুগে এ-অবস্থা। এখনো বোধহয় তার গতিশীল বপু থেকে কিছুটা পোড়ানির ঝিলিক জাগে। মুখ আর হাতগুলো সদ্য ধৌত—এ অনুষ্ঠানটা ফিলিপসের দাবি রাখতে; সে চায় বলিপ্রাপ্ত রীতিনীতির অন্তত স্মৃতিসৌধটা বজায় থাক। কামরার সাজসজ্জার মধ্যে একটা মূর্তিমান ত্রুটির মতো মোমবাতির আলোয় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অসুস্থ পাংশু মুখ, আইরিশ সেটার কুকুরের লোমের মতো লালচে দাড়ির গোড়া প্রায় চোখ অবধি পৌঁচেছে। ফিলিপ্‌সের চিরুনিতে তার হালকা বাদামি চুল কিছুতেই বাগ মানেনি, অনেক দিন ধরে তা জট খাওয়া,—সদা পরিহিত টুপির কিনারার মাপ অনুযায়ী। তার চোখে নিরাশাভরা সকৌশল দর্পিত দৃষ্টি, যা কেউ অত্যাচারীর হাতে কোণঠাসা একটা কুকুরের চোখেই দেখতে অভ্যস্ত। বিশ্রি কোটটার গলা অবধি বোতাম আঁটা, কিন্তু তবু খানিকটা আশ্বাসের মতো দেখা যায় ওপরে সোয়া-ইঞ্চিটাক কলার। চামার্স যখন চেয়ার ছেড়ে গোল টেবিলের ওপর ঝুঁকলেন, লোকটার আচরণের মধ্যে কিছুমাত্র অপ্রতিভ ভাব দেখা গেল না।

গৃহকর্তা বললেন, 'আপনি কৃতার্থ করলে আমি খুশি হব আপনার সঙ্গে ডিনারে বসতে।'

রাস্তার অতিথি কর্কশ আগ্রাসী কণ্ঠে বললে, 'আমার নাম প্লুমার। আপনি আমার মতো হলে কার সঙ্গে খানা খাচ্ছেন তার নাম জানতে চাইবেন।'

চামার্স তাড়াতাড়ি আগের কথার জের টানেন, 'বলতে যাচ্ছিলাম আমার নাম হল চামার্স, টেবিলে আমার উল্টো দিকেই বসবেন তো?'

উসকোখুশকো চুলের লোকটা হাঁটু মুড়লো, যাতে ফিলিপ্‌স চেয়ারটা ঠেলে দেয় তার পেছনে। আন্দাজ করা যায় আগে তার সমবেতভাবে ডিনারে উপবেশনের অভ্যাস ছিল। ফিলিপ্‌স অ্যানচোভি জলপাই-চাটনি এগিয়ে দেয়।

'বেশ ভাল! নানা পদের খাওয়া হচ্ছে, তাই তো?'—বক্‌বকিয়ে বলে উঠল প্লুমার—'ঠিক আছে আমার বাগ্‌দাদের খোশমেজাজী খলিফা! আমি আপনার বশংবদ শাহাজাদী হয়ে থাকব শেষ পর্যন্ত—দাঁত খুটোনোর কাঠিটা অবধি। তুষারের রাজ্যে পড়ার পর এই প্রথম পেলাম একজন খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় খোশবুর খলিফা। কী সৌভাগ্য! আর আমি কিনা ছিলাম লাইনের তেতাল্লিশ নম্বরে! আমি যখন গোনাই শেষ করে দিয়েছি, তখন আপনার স্বাগত দূতটি এসে আমায় ভোজ খেতে ডাকল। আজ রাতে একটা শয্যা পাবার সম্ভাবনা আমার পক্ষে তো আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবারই মতো সম্ভাবনাময় ছিল কিনা! এখন আমার জীবনের দুর্ভাগ্যের কাহিনীটা আপনি কী ভাবে চান, মিঃ হারুন অল-রশিদ—প্রত্যেক পদের সঙ্গে

একটা করে অধ্যায়, না চুরুট ও কফি সহযোগে পুরো সংস্করণটাই?'

চামার্স একটু হেসে বললেন, 'পরিস্থিতিটা আপনার কাছে নতুন কিছু নয় বলে মনে হচ্ছে!'

'পয়গম্বরের নূরের দিব্যি দিয়ে বলছি—না!' জবাব দিল অতিথি 'যেমন বাগদাদে মশামাছি, তেমনি নিউইয়র্কেও থিক্ থিক্ করছে শস্তা হারুন অল রসিদরা। তা প্রায় বার-কুড়ি মাথার সামনে ভরা ভোজ ঠেকিয়ে আমার কাহিনী শুনতে চেয়েছে লোকে। নিউইয়র্কে এমন কাউকে দেখান তো যিনি কিছুর বদলে কিছু না চান? একই খেলনার ঘুঁটি সাজিয়ে তারা "কৌতূহল" আর "পরোপকার" দুটোই বানিয়ে দেখান। অনেকেই আপনাকে শস্তার দোকানে চপ-স্যুই খাওয়াবে, কেউ কেউ আবার খলিফা সেজে খাঁটি মাংসের দাবনার বাজনা বাজাবে; কিন্তু ওরা প্রত্যেকেই ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে যতোক্ষণ না আপনার পুরো আত্মকথা, মায় পাদটিকা, পরিশিষ্ট, অপ্রকাশিত অংশ—আপনার কাছ থেকে টেনে বের করে নিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি পাতালরেলের ছোট পুরনো বাগদাদ সরাইখানায় খাবার আসতে দেখলেই আমায় কী করতে হবে। পিচের ওপর নিচু হয়ে তিনবার কপাল ঠেকাই, আর তৈরি হই রাত্রিভোজের জন্য কথার সুতো বুনতে৷'

'আমি আপনার কাহিনী শুনতে চাই না,' বললেন চামার্স, 'আমি আপনাকে সিধেসিধি বলছি, একটা আচমকা খেয়ালের বশে কোনো অজানা আগন্তুককে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম আমার সঙ্গে ডিনার করবে বলে। আমি আপনাকে ভরসা দিচ্ছি, আমার কোনো কৌতূহল মেটাতে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না।'

'ওঃ দূর হোক!' অতিথি উৎসাহ ভরে স্যুপের বাটিতে মন দিয়ে ঘোষণা করে, 'আমার এজন্য একটুও মনে করার কিছু নেই। আমি তো রীতিমতো একখানা প্রাচ্য পত্রিকা—লাল মলাটওয়ালা, খলিফা বিদেশে ভ্রমণে গেলে পাতাগুলো কেটে রাখা। সত্যি বলতে আমরা যারা শয্যার লাইনে দাঁড়াই আমাদের এক ধরনের ইউনিয়ন-দর বাঁধাই আছে এসমস্ত কাজের জন্য। কেউ না-কেউ এসে দাঁড়াবেই, আর জানতে চাইবে পৃথিবীতে আমাদের এমন দুর্গতি হল কেমন করে। একটু স্যান্ডুইচ আর এক কাপ কফি পেলে ওদের জানাই মদ্যপানই আমার সর্বনাশ করেছে। ভুট্টা-মাংস, বাঁধাকপি আর এক কাপ কফি পেলে বলি, নির্দয় বাড়িওয়ালা, ছ'মাস হাসপাতালে থাকা, চাকরি খোয়ানোর গল্প। রানের মাংসের কাবাব আর রাত কাটানো শয্যার জন্য সিকি ডলার পেলে শোনাই ফুৎকারে উড়ে-যাওয়া সম্পদ আর ক্রমে অবনতিব ওয়াল স্ট্রীট শেয়ার বাজার সংকটের কথা। এই প্রথম এ ধরনের একটা সৎকারের সামনে পড়লাম। এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো কোনো গল্প আমার কাছে নেই। আমি বলি কি মিঃ চামার্স, এর বদলে আপনাকে একটা সত্যি ঘটনার কথাই শোনাই, যদি আপনি তা শুনতে চান। তৈরি করা গল্পের চেয়েও এটা আপনার বেশি অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।'

এক ঘন্টা বাদে আরবীয় অতিথি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে দিল চেয়ারে। এই ফাঁকে ফিলিপস কফি আর চুরুট আনল, টেবিলখানা সাফ করে দিল।

লোকটা মুখে এক অদ্ভুত হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কখনো শেরার্ড প্লুমারের নাম শুনেছেন কি?'

চামার্স বলেন, 'ও নাম তো মনে পড়ছে। মনে হয় কয়েক বছর আগে চিত্রকর হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন তিনি।'

'পাঁচ বছর', অতিথি বলে, 'তারপর একেবারে ডুবে গেলাম তামার চাকতির মতো। আমিই শেরার্ড প্লুমার! শেষ যে প্রতিকৃতিটি এঁকেছিলাম তা বেচেছি ২০০০ ডলারে। এরপর আর বিনামূল্যে আঁকা ছবির জন্য একজনকেও পাইনি মডেল হিসেবে বসতে।'

'মুশকিলটা কী হয়েছিল?'- চামার্স প্রশ্ন না করে পারলেন না।

প্লুমার গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'মজার ব্যাপার। নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারলাম না। কিছুদিন তো বেশ জলের ওপর হালকা ভেলার মতো ভেসে বেড়ালাম। পয়সাওলা মানুষদের সমাজে ভিড়ে গেছি, দু'হাতে কাজের বরাত পাচ্ছি। খবরের কাগজে লিখছে আমি কেতাদুরস্ত চিত্রকার। তারপর শুরু হল আজগুবি ব্যাপারটা। যখনই কোনো প্রতিকৃতি শেষ করি, লোকজন আসে দেখতে, তারপর তারা পরস্পরের দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে কী সব চাপা গলায় বলাবলি করে।

'তারপর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেলাম ঝামেলাটা কোথায়। প্রতিকৃতির মুখের মধ্যে মূল পাত্রটির লুকোনো চরিত্র ফুটিয়ে তোলার এক বিচিত্র কুশলতা ছিল আমার। কেমন করে সেটা করতাম জানি না—যা দেখতাম তাই তো এঁকে যেতাম—কিন্তু ওটাই যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিত কাজটা। আমার কয়েকজন সীটিং দেবার মানুষ বেশ ভাল রকমই ক্রুদ্ধ হলেন, আমাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে অস্বীকার করলেন। অতি সুন্দরী জনপ্রিয়া এক সামাজিক মহিলার ছবি এঁকেছিলাম। যখন কাজটা শেষ হল তাঁর স্বামী এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি মুখে নিয়ে ছবিটা দেখলেন; পরের সপ্তাহেই করলেন বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা।

'একজন নামজাদা ব্যাঙ্কারের কথা মনে পড়ছে যিনি আমাকে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকতে দিয়েছিলেন। পরে আমার স্টুডিওতে একটা প্রদর্শনীর জন্য ছবিটা রাখি। তাঁর একজন পরিচিত ব্যাক্তি এলেন ছবিখানা দেখতে। ভদ্রলোক বললেন, 'এ কী ব্যাপার। উনি কি সত্যিই ওরকম দেখতে?' তাঁকে বললাম ছবিটাকে তো সবাই বিশ্বস্ত অনুকরণ বলেই মত দিয়েছে। উনি বললেন, 'ওর চোখের মধ্যে অমন একটা ভাব আমি লক্ষ্যই করিনি। মনে হচ্ছে শহরে গিয়ে আমি আমার ব্যাঙ্ক বদল করে ফেলব।' শহরে তো গিয়েছিলেন, তবে তাঁর ব্যাঙ্ক-খাতা লোপাট, মিঃ ব্যাঙ্কারও উধাও।

'তারপর আর ওদের বেশি সময় লাগেনি আমাকে পথে বসাতে। লোকে চায়

না তাদের গোপন নীচতা ছবির মধ্যে ফুটে উঠুক। বাইরে তারা তো হেসে, নিজেদের মুখ বেঁকিয়ে আপনাকে ঠকাতে পারেন। কিন্তু ছবি তো তা পারে না। আর একখানিও ছবির অর্ডার পাই না আমি, তাই আমাকে ও কাজ ছেড়েই দিতে হয়। কিছুদিন এক সংবাদপত্রে শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলাম, তারপর লিথোগ্রাফার, কিন্তু সে সবের মধ্যেও আমার কাজ একই ঝামেলায় ফেলল আমায়। কোনো ফটোগ্রাফ থেকেও যদি ছবি আঁকি, তবু আমার ড্রইং এমন সব চরিত্র লক্ষণ বা ভাব ফুটিয়ে তুলবে যা আপনি ফোটোতে খুঁজে পাবেন না। তবে আমার ধারণা মূল চেহারায় ওগুলো ছিল নিশ্চয়ই। খদ্দেররা জোর চেঁচামেচি করেন, বিশেষ করে মহিলারা, আর কোনো কাজই বেশিদিন হাতে রাখতে পারি না। তাই অবশেষে আমার ক্লান্ত মাথা বুড়ো মদিরার বুকেই রাখতে থাকি একটু সান্ত্বনার আশায়। তারপর কটি দিনের মধ্যেই চলে আসি মাগ্‌না বিছানার লাইনে, আর খাবারের বাজারে বিলি করি মুখে মুখে তৈরি গালগল্প। আমার এই সত্য প্রতিবেদন কি আপনাকে ক্লান্ত করছে, হে খলিফা! আমি অবশ্য শেয়ার বাজারের বিধ্বস্ত অবস্থা ঘুরিয়ে দিতে পারি আপনি চাইলে, কিন্তু তাতে যে চোখের জলের দরকার হবে। এত ভাল খাওয়াদাওয়ার পর সেটা কি সম্ভব হবে আমার?'

'না, না!'- চামার্স আন্তরিকভাবেই বলেন, 'আপনি আমাকে খুবই উৎসুক করে তুলেছেন। আপনার আঁকা সব ছবিতেই কি অপ্রিয় ব্যাপার ফুটে উঠত, নাকি এমন ছবিও কিছু ছিল যাতে আপনার অদ্ভুত তুলির যন্ত্রণা ফুটে ওঠেনি?'

'কিছু ছবি? তা বটে। বিশেষ করে সাধারণ ভাবে শিশুদের আর বেশ কিছু মহিলার, আর যথেষ্ট সংখ্যায় পুরুষদেরও। সব মানুষই তো খারাপ নয়, বুঝলেন। ওরা যতোক্ষণ ভাল ছিল, ছবিও হত ভাল। যেমন বললাম আর কি, ব্যাখ্যা করতে পারি না, কিন্তু এটাই সঠিক তথ্য।'

চামার্সের লেখার টেবিলে পড়ে ছিল সেই ফটোগ্রাফটা যা উনি তার বিদেশের ডাকে পেয়েছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি প্লুমারকে বসিয়ে দিলেন ছবিটা থেকে একটা স্কেচ করতে—প্যাস্টেল রঙের সাহায্যে। এক ঘন্টা বাদে শিল্পী উঠে আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলে বলল, 'কাজ শেষ। এতটা সময় নিলাম বলে মাফ করবেন আমাকে। আসলে কাজটার মধ্যে মন বসে গিয়েছিল। হা খোদা! এখন ক্লান্ত বোধ করছি। গত রাতে কোনো বিছানা পাইনি, বুঝলেন। এখন তাহলে বোধ হয় বিদায় নিতে পারি, ইমানদারদের হুকুমদার।'

চামার্স ওর সঙ্গে দরজা অবধি গেলেন, আর কিছু ডলার নোট গুঁজে দিলেন ওর হাতে।

প্লুমার বললে, 'ও! তা টাকা নেব। সবই তো ভাগ্যের খেল। ধন্যবাদ, চমৎকার ডিনারের জন্যও ধন্যবাদ। আজ রাতে পালঙ্কের গদিতে শোব, আর স্বপ্ন দেখব বাগ্‌দাদের। আশা করি আবার সকালে দেখব না সবটাই মিথ্যে স্বপ্ন ছিল। বিদায়, মহামহিম খলিফা!'

আবার চামার্স অস্থিরভাবে পায়চারি করেন তাঁর গালিচার ওপর। কিন্তু সেই টেবিল যেখানে প্যাস্টেল-স্কেচ করা ছবিটা রয়েছে, সেখান থেকে দূরে কামরার অন্যত্র যতোটা যাওয়া যেতে পারে তার মধ্যেই তাঁর চলাফেরা সীমাবদ্ধ। দু'বার তিনবার তিনি চেষ্টা করেন ওটার কাছে যেতে, কিন্তু পারেন না। মেটে রঙ, সোনালি আর বাদামি তিনি দেখতে পান ঠিকই, কিন্তু ওঁর ভয়ই যেন ওটাকে ঘিরে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছে, যার ফলে উনি দূরেই রয়ে যাচ্ছেন। উনি একটু বসে এবার নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঘন্টা বাজিয়ে ফিলিপ্সকে ডাকেন।

বলেন, 'এই বিল্ডিংয়েই একজন তরুণ শিল্পী রয়েছেন—নাম মিঃ রাইনেম্যান—তুমি জান উনি কোন্ ফ্ল্যাটে থাকেন?'

'একেবারে ওপরের তলায়, সামনের ঘর, স্যর।' বলে ফিলিপ্স।

'একবার গিয়ে তাঁকে অনুরোধ কর যেন উনি কয়েক মিনিটের জন্য এখানে পদধূলি দেন।'

রাইনেম্যান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলেন। চামার্স তাঁকে নিজের পরিচয় দিলেন।

বললেন, 'মিঃ রাইনেম্যান, ওই টেবিলটার ওপর একটা ছোট প্যাস্টেল স্কেচ রয়েছে। আমি খুশি হব যদি আপনি ওটার শিল্পগত মান আর ছবি হিসেবে ওটাকে কী মনে করেন সে সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।'

তরুণ শিল্পী টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্কেচখানা তুলে নেন। চামার্স খানিকটা পেছন ফিরিয়ে চেয়ারের পিঠের ওপর ঝুঁকে থাকেন।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন, 'কী রকম...দেখলেন...জিনিসটা- বলুন তো!'

আর্টিস্ট বলেন, 'ড্রয়িং হিসেবে তো যথেষ্ট প্রশংসা না করে পারছি না। এ তো উঁচু দরের শিল্পীর হাতের কাজ—সাহসী, সূক্ষ্ম আর সত্যনিষ্ঠ। একটু ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছি; এখন ভাল প্যাস্টেলের কাজ তো বেশ কয়েক বছর নজরে পড়েনি।'

'মুখটার কথা বলুন মশাই—বিষয়বস্তু...মূল বিষয়...ওটা সম্পর্কে কী বলেন আপনি?'

'মুখখানা,' রাইনেম্যান বলেন, 'এ মুখ তো ঈশ্বরের আপন দূতের মধ্যে একজনের। জিজ্ঞেস করতে পারি কার—'?

'আমার স্ত্রী!' চেঁচিয়ে ওঠেন চামার্স, একবার পাক খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিস্মিত শিল্পীর ওপর, তাঁর হাত চেপে ধরে পিঠের ওপর কিল মারতে থাকেন, 'নিয়ে যান ভাই ওই স্কেচখানা, আর ওটা থেকে আঁকুন আপনার জীবনের সেরা ছবি। দামের ব্যাপারটা ছেড়ে দিন আমার ওপরেই।'

A Madison Square Arabian Night, নিউইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

আবহাওয়া বিশারদ

'কিওয়া সংরক্ষিত অঞ্চলের' কথা বললে বেশির ভাগ নিউ ইয়র্কবাসীই হয়তো ধরতে পারবে না আপনি আলবানির কোনো নতুন রাজনৈতিক উপদলের কথা বলছেন, না ওয়াশিংটন অপেরার কোনো 'ডায়লগের' কথা বলছেন। কিওয়ার সংরক্ষিত অরণ্যে কিন্তু এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে নিউ ইয়র্কের অস্তিত্বের কথা।

সংরক্ষিত এলাকায় আমাদের একটা দল শিকার ভ্রমণে এসেছে। আমাদের পথপ্রদর্শক বাড কিংসবেরী, দার্শনিক ও বন্ধু—সে এক রাতে শিবিরে বসে এ্যান্টিলোপ হরিণের কাবাব সেঁকছে। দলের আরেকজন, কেতামাফিক শিকারী পোশাক পরা, গোলাপি চুল তরুণ যুবক, হেলে দুলে এল আগুন থেকে সিগারেট জ্বালিয়ে নেবে বলে। অন্যমনা হয়েই বাডকে বললে: 'চমৎকার রাত!'

বাড বললে, 'হ্যাঁ তা বটে। ব্রডওয়ের তারিফ না জুটলে অন্যরাতগুলোও এইরকম চমৎকারই হত।'

এখন ব্যাপার হল, এই যুবকটি সত্যিই নিউইয়র্কের ছেলে, কিন্তু বাকি আমরা সবাই অবাক হলাম বাড সেটা আন্দাজ করল কী করে? তাই, কাবাব যখন তৈরি হয়ে গেল, আমরা তাকে ধরে বসলাম, তার অনুমানের পদ্ধতিটা আমাদের খুলে বলতে হবে। আর বাড যেহেতু গ্রামোফোনের মতোই কিছু এক যন্ত্র, তাই সে নিচের বক্তৃতাটা আমাদের বিশদে শোনাল:

'কেমন করে জানলাম ও নিউইয়র্কের লোক? আরে সে তো ওর প্রথম দুটো শব্দ কানে শুনতেই! দু'বছর আগে আমি নিজেই তো নিউইয়র্কে ছিলাম, তাই র‍্যাঞ্চো ম্যানহাটানের কিছু কানের চিহ্ন, খুরের দাগ তো আমার চেনাই।'

শিকারীদের একজন প্রশ্ন করে, 'নিউ ইয়র্ককে নিশ্চয়ই জংলি নয়নজুলি থেকে বেশ অন্যরকম পেয়েছিলে, তাই না?'

'তা ঠিক বলতে পারি না, তবে কিছু ব্যাপারে তো আলাদা রকমই। সে শহরের প্রধান 'ঘোড়া'-পথ যেটা, যাকে ব্রডওয়ে বলে, সেখানে চলাচল বেশি, কিন্তু দু'পেয়ে জীব যারা, তারা এই চেইন আর আমারিলোতে দাপাদাপি করা জীবগুলোরই ধাঁচের। প্রথমে তো ভিড় দেখে ভিরমি খেলাম, কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে বলি, 'আরে বাড, দ্যাখো। ওরা ঠিক তোমার, বা জিরোনিমো, গ্রোভার ক্লিভ্ল্যান্ড, ওয়াটসন ছোকরাদের মতোই সাদাসিধে মানুষ, তাই জিন কম্বলের নিচে অমন কেঁপে উঠে ঘাবড়ে যেও না।' আর তারপর থেকে শান্ত স্থির বোধ করি- যেন নিজের "জাতেই" ফিরে এসেছি আবার, সেই ভুতের নাচ আর সবুজ ভুট্টার ক্ষেতে "ওঝার" কান্ডের মধ্যে।

'এক বছর ধরে পয়সা জমালাম নিউইয়র্কে এক জবর চক্কোর দেব বলে।

সামার্স নামে একজনকে জানতাম, সে ওখানেই থাকত, কিন্তু তাকে খুঁজে পেলাম না। তাই এই ভুট্টাভোজী শহরের সবরকম মজা লুটতে একাই নেমে পড়লাম।

'কিছুদিন অবধি এমন মশগুল আর একপেশে হয়ে রইলাম ইলেকট্রিক বাতি, গ্রামোফোনের আওয়াজ আর দোতলা রেলরাস্তা নিয়ে, যে ভুলেই গেলাম আমাদের পশ্চিমী রীতির স্বাভাবিক প্রয়োজনের একটা অতি জরুরি বিষয়। বন্ধু বা অপরিচিত, কারুর সঙ্গে আড্ডার কথোপকথন এড়াবার মতো লোকই আমি নই কোনোকালেও। উপনিবেশ এলাকায় গেলেও কোনো অজানা অচেনা মানুষ পেলে, ন' মিনিটের মধ্যে জেনে নেব তার উপার্জন, ধর্ম, কলারের সাইজ, তার বউয়ের মেজাজ প্রকৃতি, তারপর জানব সে কতো খরচ করে কাপড় কিনতে, খোরপোষ দিতে বা তামাক চিবুতে। আলাপ-আলোচনায় কার্পণ্য আমার নেই, সেটা আমার এক প্রতিভা।

'কিন্তু এই নিউইয়র্ক বোধহয় পয়দাই হয়েছিল বাক্যব্যয়ের ব্যাপারে কঞ্জুষির ধারণা নিয়ে। তিন হপ্তা অবধি শহরের কোনো বান্দা একটি শূন্য উচ্চারণও ছুঁড়ে দেয়নি আমায় লক্ষ্য করে, শুধু ওই খানাঘরের ওয়েটারটা ছাড়া—যেখানে আমি খেতাম। কিন্তু যেহেতু তার বাক্যংশগুলোও নেহাতই মেনু-কার্ডের দরদাম থেকে চুরি করা, ওতে সে আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি মেটাতে পারত না। তা হল স্রেফ কেউ আমায় পেছন থেকে থাপ্পড় মেরে বলবে—এই যে মশাই! নিউইয়র্কে পরিচয়ের খোঁজ করা মানে পাতলা রাত্রিবাস পরে উড়নচণ্ড উত্তুরে হাওয়ার মধ্যে পড়া। পানীয়ের বার-এ গিয়ে যদি কোনো মানুষের পাশে দাঁড়াই সে সরে পড়বে আর এমনভাবে আমার দিকে তাকাবে যেন আমার পকেটে গোটা উত্তরমেরুটাই লুকোনো আছে। এরপর ইচ্ছে হয় সময় কাটাতে আবিলিন বা ওয়াকোতেই চলে যাই, ওখানকার শহরের মেয়রও তোমার সঙ্গে বসে পান করবেন; প্রথম নাগরিক যার দেখা পাবে, সে তার আদ্যনাম জানাবে, আর বলবে তোমাকে শহরের লটারি খেলায় অংশ নিতে।

'তা, একদিন আমি যখন বোবা ল্যাম্পপোস্টের চেয়ে বেশি কথা বলে এমন কাউকে হন্যে হয়ে খুঁজছি, তখন এক কফি দোকানের লোক আমায় বলে বসল:

"আজকের দিনটা বেশ সুন্দর!"

'সে ওই দোকানের মালিক গোছেরই কেউ, মনে হয় বেশ কয়েকবার আমাকে সে ওখানে দেখেছে। তারা চেহারাটা মাছের মতো, চোখদুটো জুডাসের, তবু আমি উঠে গিয়ে তার কাঁধের ওপর নিজের বাহু রাখি।

'বলি, "স্যাঙাৎ, সত্যিই বড় সুন্দর দিন। গোটা নিউইয়র্কে তুমিই বোধহয় প্রথম ভদ্রলোক যে লক্ষ্য করেছে মানুষের মুখের ভাষার জটিলতা কোনো বাজে বিষয়ের পেছনে নষ্ট করার জন্য নয়। কিন্তু তুমি কি দ্যাখোনি আজ ভোরবেলাটা বেশ ঠান্ডা ছিল, আর রাতেও বৃষ্টির লক্ষণ আছে মনে হয়, দিনের বেলাটা

দিব্যি আনন্দের। তা বাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো? কাফেখানার ব্যবসা ভালই চলছে নিশ্চয়?"

'কিন্তু আমার অমায়িক হবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও ওই বেয়াড়া লোকটা সোজাই পেছন ফিরিয়ে হেঁটে চলে গেল, ঘাড় সোজা, মুখে কথাটি নেই! এর যে কী মানে তা কি বুঝব। সে রাতে সামার্সের একটা চিঠি পেলাম, ও শহর থেকে বাইরে গিয়েছিল, তার আস্তানার ঠিকানাটা দিয়েছে। আমি ওর বাড়িতে গেলাম, ওর পরিবারের সকলের সঙ্গে আগের দিনের মতো গল্পগাছা করলাম। সামার্সকে বললাম কফিখানার ওই নোংরা শেয়ালটার কথা, জানতে চাইলাম এসবের অর্থ।

'সামার্স বললে, "ও, আসলে সে তোমার সঙ্গে আলাপই করতে চায়নি। ওটা হল নিউইয়র্কের কায়দা। সে তোমাকে নিয়মিত খদ্দের হিসেবে দেখেছে, তাই দু'একটা কথা বলল স্রেফ তোমাকে দেখাতে যে তোমার নিয়ম করে আসা সে কদর করে। ওটার সূত্র ধরে তোমার এগোনোই ঠিক হয়নি। একজন অপরিচিতের সঙ্গে ওইটুকুই আমরা যেতে চাই। আবহাওয়া নিয়েই এক আধটা কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু ওটাকে আমরা পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে সাধারণত দেখি না।"

'"বিলি," বলি আমি, "আবহাওয়া আর তার চুলচেরা বিচার আমার পক্ষে গুরুতর বিষয়। আবহাওয়াতত্ত্ব আমার পক্ষে মর্মান্তিক ব্যাপার। এই ভাবে কোনো লোক আমার সামনে তাপ, আর্দ্রতা, উজ্জ্বল রোদ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, তারপর তাপমানযন্ত্রের ওঠা নামা না দেখেই লেজ গুটিয়ে পালাবে, তা হতে পারে না। আমি আবার যাচ্ছি লোকটার কাছে, একটানা কথোপকথনের আর্ট নিয়ে শিক্ষা দেব তাকে। তুমি বলছ নিউইয়র্কের ভদ্রতাজ্ঞান তাকে দুটো মাত্র কথা আর কোনো জবাব না শুনতে শেখায়। ঠিক আছে, সে এবার খোদ আবহাওয়া অফিস বনে যাবে, আমার সঙ্গে যা শুরু করেছিল তা শেষ করবে। তাছাড়া অন্য অনেক বিষয়েও পড়শির মতো আলাপ-টিপ্পনি কাটবে।"

'সামার্স আবারও সেই কথাই বলে, কিন্তু আমি তখন খানিকটা বিরক্ত, তাই ট্রামগাড়িতে চেপে ফিরে গেলাম সেই কাফিখানায়।

'একই লোক তখনো সেখানে রয়েছে, চেয়ার টেবিলগুলোর মধ্যে বেনো ঘূর্নির মতো ঘুরছে। কয়েকজন লোক বসে পান করছে, পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করছে।

'আমি লোকটাকে একপাশে ডেকে এনে কোণের দিকে ঠেলে নিয়ে গেলাম। কোটের বোতাম ছতোটাই খুলে দিলাম যাতে শার্টের জিচে আমার .৩৮ বোর পিস্তলটা তাকে দেখানো যায়।

'বলি, "স্যাঙাৎ, খানিক আগেই আমি এখানে এসেছিলাম, আর তুমি সুযোগটা নিয়ে আমায় বলেছিলে দিনটা বড় সুন্দর। আমি যখন তোমার আবহাওয়া সংকেতের

উপযুক্ত সমর্থন জানাতে চাইলাম তখন পেছন ফিরিয়ে তুমি চলে গেলে। এখন-” বললাম আমি, “ব্যাঙের প্রাণ, মুখ-বোজা, ঘাড় সোজা, স্পিটজবার্জেনের খালাসি বাবুর্চি আর মুখবন্ধ শামুকের দোআঁশলা—শুরু করো তোমার আবহাওয়া সমাচার, যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই।”

‘লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে, দেখে আমি তো জবাবে হাসছি না, তখন সে যথাযথ গম্ভীর হয়। আমার বন্দুকের বাঁটের দিকে তাকিয়ে বলে, “মানে বলছিলাম দিনটা বেশ সুন্দর ছিল; যদিও একটু গরম ভাব।”

‘আমি বলি, “মুখ-বোজা ফাঁকিবাজ, বিশদ করে বল—বিশেষ তথ্যগুলো শোনাও—ব্যাখ্যা কর—আউটলাইন পূরণ কর। তুমি যখন আমার সঙ্গে শর্টহ্যান্ডে কিছু করবে তার মানে শেষ অবধি দাঁড়াবে ঝড়ের সংকেত।”

‘লোকটা তখন বলে, “গতকাল বৃষ্টির ভাব হয়েছিল, কিন্তু বিকেলের দিকে মেঘ কেটে যায়। শুনেছি চাষীরা রাজ্যের ভেতর এলাকায় দারুণ ভাবে বৃষ্টি কামনা করছে।”

‘বললাম, “এই তো বাবা দুলকি চাল। খুর থেকে নিউইয়র্কের ধূলো ঝেড়ে দাও, এবার একটি সত্যিকারের অমায়িক অশ্বরাজ হও। তুমিই বরফটা ভেঙেছিলে, বুঝেছ, আর এবার আমরা প্রতি মিনিটে পরস্পরের পরিচিত হচ্ছি। মনে হয় আমি তোমার পরিবারের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম?”

“ওরা ভাল আছে, ধন্যবাদ”, বললে সে, “আমাদের- আমাদের একটা নতুন পিয়ানো এসেছে।”

‘বললাম, “এতক্ষণে পথে এসেছ। ওই ঠান্ডা মুখ-বোজা ভাব অবশেষে কেটে যাচ্ছে। ওই পিয়ানোর স্পর্শটা যা দিলে না, তাতেই আমরা প্রায় ভাই-ভাই হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটার নাম কী?” জিজ্ঞেস করি তাকে।

“টমাস্”, বলল সে “এই সবে হাম জ্বর থেকে উঠল।”

‘বললাম, “মনে হচ্ছে আমি যেন কত্তো আগে থেকেই তোমায় জানতাম। এবার শুধু আরেকটা বাকি রইল...তুমি কি এখন সত্যিই এই কাফিখানার কারবারে ভাল করছ?”

‘সে বললে, “খুব ভাল। কিছু টাকাও বাঁচাচ্ছি আমি।”

‘“শুনে খুশি হলাম,” বললাম আমি, “এবার নিজের কাজে যাও, সভ্য মানুষ হও। আবহাওয়ার কথা তুলোই না যদি না তার সূত্রে ব্যক্তিগত কথা বলতে পার। এ বিষয়টা সামাজিকতারই স্বাভাবিক অঙ্গ, নতুন পরিচয়ের সূত্রপাত। এই শহরের মতো জায়গায় তা খুচরো পয়সার মতো বিলোনো হয় দেখে আমার ঘেন্না ধরে যায়।”

‘তাই পরদিন নিজের কম্বল গোটাই, নিউইয়র্ক শহর থেকে বেরিয়ে আসি ঘোড়ার পথ ধরে।’

বাডের কথা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ আমরা আগুনের কাছেই কাটাই, তারপর সবাই চলে যাই বিছানার উদ্দেশে।

আমার বিছানার পাট খুলতে খুলতে শুনি সেই গোলাপি চুল ছোকরা বাডকে কিছু বলছে, তার গলার স্বরে উদ্বিগ্ন ভাব :

'বলছিলাম মিঃ কিংস্‌বেরী, আজকের রাতটার মধ্যে সত্যিই সুন্দর কিছু আছে। চমৎকার হালকা পবন, উজ্জ্বল তারাগুলো, আর পরিষ্কার বাতাস একসঙ্গে মিলে যেন একে আশ্চর্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে।'

বাড বললে, "হ্যাঁ, রাতটা খুবই চমৎকার।"

The Champion of the Weather, নিউইয়র্ক সান্‌ডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

মায়াবী চুম্বন

শস্তার মনোহারি দোকানের কেরানি মাত্র স্যামুয়েল ট্যান্‌সি, তবু তার শীর্ণ বপুর নরম পেশীতেই একাধারে রোমিওর আবেগ, লারার বিষণ্ণতা, বীর দ্যর্তাগ্নাঁর রোমাঞ্চ, আর মেল্‌নোতের মরিয়া প্রেরণা। শুধু দুঃখ হয়, তার অভিব্যক্তির অভাব—যেন জন্ম থেকে চূড়ান্ত ভীরুতা আর সংশয়ের বোঝা ঘাড়ে নেওয়াই তার নিয়তি; ভাগ্য তাকে আড়ষ্ট-জিভ, লজ্জারুণ করে রাখে ওই মসলিন-পরিহিতা পরীদের সামনে, অথচ ওদেরই সে মনে মনে পূজো করে, আর বৃথাই আকুল হয় ওদের উদ্ধার করতে, আলিঙ্গন করতে, সান্ত্বনা দিতে আর বশ মানাতে।

ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা ছোঁয় ছোঁয়, ট্যান্‌সি ওর ক'জন বন্ধুর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলে চলেছে। একদিন-বাদে-একদিন ও মনোহারী দোকানের কাজ থেকে ছাড়া পায় সন্ধ্যা সাতটার পর। সাথীদের মধ্যে থাকলেও কেমন যেন ভিতু আর অস্বচ্ছন্দ ট্যান্‌সি। কল্পনায় তো সে অনেক বীরত্বের কাজ করে, বিশিষ্ট সাহসিকতার কীর্তি দেখায়, কিন্তু বাস্তবে সে এক তেইশ বছর বয়েসের ফ্যাকাশে যুবক, ব্যবহারে অতি বিনয়ী, মুখে কথা ফোটে না।

দশটার ঘণ্টা যখন বাজল, ট্যান্‌সি তাড়াতাড়ি ছড়িখানা নামিয়ে রেখে পাশের শো-কেসে একটা খুচরো পয়সা সজোরে বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল, তার স্কোরের বাবদ সে পাওনা বুঝে নেবে।

দলের একজন বললে, 'এত কীসের তাড়া, ট্যানসি? অন্য কারো সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার আছে বুঝি?'

আর একজন সে কথারই প্রতিধ্বনি তোলে, 'ট্যান্‌সির অন্য কোথাও দেখা

করার ব্যাপার! হুঁ, তা হলেই তো হয়েছে! মা-পীকের হুকুমে দশটার মধ্যেই ওকে ফিরতে হয় যে!'

পাংশুমুখো এক যুবক মুখ থেকে বিশাল একখানা চুরুট নামিয়ে ফোঁড়ন কাটলে, 'আরে না, সে রকম নয়। ট্যান্সির ভয় দেরি করে গেলে আবার মিস্ কেটি ওপরতলা থেকে নেমে দরজা খুলবে, তারপর হলঘরেই ওকে চুমু খেয়ে বসবে।'

এই শেষ পরিহাসের হাল্কা টুকরোটা যেন ট্যান্সির রক্তে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কারণ অভিযোগটা সত্যি— তবে চুমু খাওয়াটা ছাড়া। ওটা তো ওর স্বপ্নের বিষয়; যার জন্য বন্য আশা ওর মনে, কিন্তু বড় সুদূরপরাহত, বড় পবিত্র এক স্বপ্ন, যা নিয়ে লঘুভাবে চিন্তা করা যায় না। বক্তার দিকে একটা শীতল বিদ্রূপের চাউনি দিয়ে (যা ওর নিজের সংশয়ী মনোভাবের পক্ষে মানানসই উপযুক্ত শাস্তি), ট্যান্সি কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পা রাখল।

গত দু'বছর ধরে ও নীরবে ভালবেসেছে মিস্ পীককে, একটা আধ্যাত্মিক দূরত্ব থেকে তাকে পূজো করেছে, যার ফলে তার আকর্ষণ যেন আকাশের তারার মতো রহস্যময় আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মিসেস পীক দেখেশুনে হাত-গোনা ক'জনকে রেখেছেন বোর্ডার হিসেবে, তার মধ্যে ট্যান্সি একজন। অন্য যুবকরা কেটিকে নিয়ে দৌড় ঝাঁপ করে, আঙুলে ঝিঁঝিঁ পোকা নিয়ে ওকে তাড়া করে, আর ওকে "খুশি রাখে" খাতির-শ্রদ্ধাহীন স্বাধীনতা নিয়ে, যেটা অন্তর থেকেই যেন সীসার শীতল পিন্ডের মতো করে তোলে ট্যানসির হৃদয়। ওর আরাধনার চিহ্ন মাত্র ক'টাই—যেমন কাঁপা গলায় "সুপ্রভাত" বলা, খাবার সময় আড়নয়নে তাকে দেখা, আর কখনো সখনো (কী আনন্দ!) রাঙ্গাবদন শিরোঘূর্ণন নিয়ে তার সঙ্গে 'ক্রিবেজ'-তাস খেলা—সেটা কালেভদ্রে কোনো সন্ধ্যায় বসার ঘরে, যখন কোনো আশ্চর্য কারণে কাজ না থাকায় মেয়েটি বাড়িতেই রয়ে যায়। হলঘরে ট্যান্সিকে চুমু দেয়! আহা, বেচারার ভয় করে যে! তবে এ ভয়েও যেন কত গভীর আনন্দ! অবতারদের ভাগ্যেই জোটে এ অনুভূতি।

কিন্তু আজ রাতে সঙ্গীদের এই তামাশা ওকে এমন দংশন করেছে যে ও প্রচন্ড বেগে এগিয়ে যেতে চায় আইন-ভাঙা বিদ্রোহীর মতো; অকুতোভয়, মারমুখো, আদিম পূর্ব-পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে। হার্মাদ সুলভ, দুঃসাহসী, প্রেমিক, কবি ও ছন্নছাড়ার আত্মা তাকে পেয়ে বসে যেন। আকাশে যে তারাগুলোকে দেখছে, তা আর এখন দুষ্প্রাপ্য বলে মনে হয় না, মিস্ পীকের সুনজর পাবার মতো উঁচু তো নিশ্চয়ই নয়, কিংবা তার মনোরম ঠোঁট দুখানার শঙ্কাময় মিষ্টতা! কেমন যেন নাটকীয় আর ব্যথাতুর মনে হয় নিজের ভাগ্যকে, যেন তার চূড়ান্ত সীমার মাপেই ওকে খুঁজতে হবে নিজের সান্ত্বনা। কাছেই একটা পানগৃহ, আর সেটার দিকেই সে ছুটে যায়। হুকুম দেয় অ্যাবসিন্থের—ওর এখনকার মেজাজের পক্ষে

নিঃসন্দেহেই উপযুক্ত পানীয়—লম্পটদের কড়া মদ; পরিত্যক্ত, বৃথা দীর্ঘশ্বাস-ফেলা প্রেমিকের সুরা।

একবার সেটা পান করে, তারপরও আবার, আবার—যতোক্ষণ না জাগতিক বিষয়ে ধ্যান না দেবার সেই অদ্ভুত উচ্চমার্গীয় অনুভূতি তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে। ট্যান্‌সি কখনোই সমজদার-মদখোর নয়; তিন-তিনটে অ্যাবসিন্থে মৌরি চোলাই কয়েক মিনিটে সাবাড় করা দেখলেই বোঝা যায় এ বিদ্যায় তার আনাড়িপনা। অনাস্বাদিত পানীয় দিয়ে সে নেহাৎই নিজের দুঃখ ডোবাতে চাইছে; ইতিহাস আর ঐতিহ্যও ওটাকে নিমজ্জনযোগ্যই বলে।

রাস্তার ফুটপাতের ওপর এসে ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পীকদের বাড়ির উদ্দেশে তুড়ি মেরে উল্টোদিকের পথ ধরে। ভ্রমণ করতে থাকে কলম্বাসের মতো, যেন কোনো মায়ামুগ্ধ রাস্তার জটিল স্রোতে। কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, কারণ বহু বছরের মধ্যে ট্যানসির পা দোকানের বাইরে কোথাও পড়েনি—শুধু দোকান আর বোর্ডিং; এই দুটো বন্দরের মধ্যেই তার যাতায়াত নির্দিষ্ট, বিরুদ্ধ-স্রোত কদাপিও তার গলুইকে বিপথে চালায়নি।

লক্ষ্যহীনভাবে ট্যান্‌সি তার পাদচারণা বিলম্বিত করে। এ অঞ্চলটা তার অপরিচিত বলেই হোক্, কি স্পর্ধা করে ভ্রমণের সাম্প্রতিক নেশাতেই হোক্, অথবা কোনো সবুজ-চোখ পরীর বিভ্রান্তিকর ফিস্‌ফিসানিতে ভুলেই হোক, সে অবশেষে এসে পড়ল একটা ঝাঁপ বন্ধ, ফাঁকা প্রতিধ্বনিময় সদর রাস্তার ওপর—একেবারে অন্ধকার আর জনপ্রাণীহীন। আর হঠাৎই এ রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে (স্পেনীয়দের গড়া এই প্রচিন সান-আন্তোনে শহরের অনেক রাস্তাই এ ধরনের)—মাথা ঠেকেছে এক ওপর-পড়া উঁচু ইটের দেয়ালে। না,—রাস্তা এখনো প্রাণচঞ্চল! ডানদিকে আর বাঁ-দিকে এখনো নিশ্বাস নিচ্ছে সরু সরু প্রস্থান পথ—অপরিসর, নিদ্রালু একেকটা খাড়ি, নুড়ি-পাথরে ঢাকা, আলোহীন। পথের ডান দিকে একটু জায়গা নিয়ে উচুঁতে উঠে গেছে ভুতুড়ে সিঁড়ি, পাঁচটা চুনোপাথরের ধাপ জ্বলজ্বলে। একই উচ্চতার আর একই পাথরের একটা দেয়াল সেগুলোকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

ওই সিড়িরই একটা ধাপে বসে পড়ে ট্যানসি, ভাবতে থাকে তার প্রেমের কথা। আর ভাবে, কেমন করেই বা মেয়েটা কখনো জানবে যে সেই আসলে তার ভালবাসার পাত্রী? তাছাড়া ভাবে, মা-পীকের কথা, মোটা, সতর্কদৃষ্টি, দয়ালু; অপ্রসন্না নন্। ট্যানসি ভাবে, সে আর কেটি তো বৈঠকখানায় বসে ক্রিবেজ খেলবেই একসঙ্গে। কারণ শস্তা হলেও দোকান তো তার মাইনে কাটেনি, যার ফলে, (বিচ্ছিরি ভাবে বলা যায়) সে পীকের বাড়িতে পয়লা নম্বরের স্বাগত বোর্ডার। তারপর ও ভাবে, কেটির বাপ ক্যাপ্টেন পীকের কথা। ওই লোকটাকে সে ভয় পায়, অভক্তিও করে; একটি ভদ্রবেশী লুচ্চা, হাড়-কিপটে, বাড়ির মেয়েদের খাটুনির

ওপর বসে খাচ্ছে; অতি সন্দেহজনক একটি মাছ—আর যা সুখ্যাতি শোনা যায়, মাছটি মোটেই টাট্‌কা তাজা নয়।

রাত ক্রমে ঠান্ডা হচ্ছে, কুয়াশা জমছে। শহরের আসল হৃৎপিন্ড তার সমস্ত কলরব নিয়ে পেছনে পড়ে আছে। উঁচু কুয়াশার বাষ্পে প্রতিবিম্বিত তার সুদূর আলো প্রকাশ পায় কাঁপুনি-তোলা ত্রিকোণ ছটার মধ্যে, অজানা নানা রঙের সন্দেহজনক চমকে, দূরের বিজলি ঝলকের অস্থায়ী ভুতুড়ে তরঙ্গে। এখন যেহেতু অন্ধকারটা চোখ সহ্য হয়ে আসছে, সেই দেয়াল যেখানে রাস্তাটা ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা পাথরের ঢাকনা, যার মাথায় লোহার শড়কির বর্ম সাজানো। তারও ওপাশে দেখা যায় পাহাড় চুড়োর সুক্ষকোণী ত্রিভুজের মতো কিছু, যার এখানে-ওখানে গাঁথা ছোট ছোট আলতো স্পর্শ-করা সামন্তরিক। দৃশ্যটা নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে ট্যান্‌সি অবশেষে বুঝল, যে ওই পাহাড় মতো আদল আসলে 'সান্টা মার্সোডিস্‌' কনভেন্টের। আগের দিনের ওই বিপুল গড়ন সে ভাল করে চেনে নানা দৃশ্যপট থেকে। ওর ধারণাটা আরো দৃঢ় হল যখন সে শুনল গানের মিঠে আওয়াজ। উচ্চ গ্রামে মিষ্টি ক্যারল সঙ্গীত, দূর থেকে,—সুর সমন্বিত, উর্ধমুখী, যেন পবিত্র নান্‌দের সঙ্গীত। সিস্টাররা আবার কতো রাত অবধি গান গায়? ও মনে করতে চেষ্টা করে- ছ'টা, আটটা, না বারোটা অবধি? ট্যানসি চুনোপাথরের দেয়ালে পিঠ রেখে অবাক হয়ে ভাবে। একে একে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। আকাশটা ডানা পতপত-করা সাদা পায়রায় ভরে যায়, ওরা চক্কোর খেয়ে বসে কনভেন্টের পাঁচিলে। পাচিলের সর্বত্র ফুটে ওঠে জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ, পিটপিট করে ওর দিকে তাকায় নিরেট স্থাপত্য থেকে। গর্তভরা রাস্তার একটা খাত থেকে উঠে এল কোনো গোলাপি পরী, খালি পায়ে হাওয়ার মতোই নাচতে লাগল এবড়োখেবড়ো পাথরগুলোর ওপর। এক পাল রিবন-বাঁধা বেড়াল বিশাল এক হাওয়া মিছিল করে পেরিয়ে গেল আকাশ। গানের আওয়াজ ক্রমে চড়া হয়ে ওঠে, অসময়ের জোনাকিগুলো আলো জ্বেলে নেচে যায় সামনে, আর অদ্ভুত ফিস্‌ফিসানির আওয়াজ আসে অন্ধকার থেকে, যার না আছে কোনো মানে, না কোনো কারণ।

বিস্মিত না হয়েই ট্যানসি এই দৃশ্যগুলো নিজের মনে রেখে দেয়। ও একটা নতুন উপলব্ধির স্তরে উঠেছে, যদিও নিজের কাছে মনে হয় ওর মন এখন পরিষ্কার, আর বাস্তবিকপক্ষে শান্তও বটে।

এবার নড়াচড়া, আর কিছু ঘুরে দেখার বাসনা জাগে ওর মধ্যে। ও উঠে ডানদিকের কোপানো কালো গলিটার দিকে ফেরে। কিছুক্ষণ অবধি উঁচু পাঁচিলটাই ছিল ওটার একপাশের সীমারেখা, কিন্তু আরো এগুতে, দু' সারি কালো জানলাওয়ালা বাড়ি, যেন হুমড়ি খেয়ে এল সামনে।

এটা হল শহরের এক এলাকা যা এককালে স্পেনীয়দের খলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনো এখানে তাদের নিষেধের আঙুল তোলা কংক্রীটের বাড়ি আর পোড়া ইটের ঘর,- শতাব্দীর মুখোমুখিও শীতল আর অদম্য হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবিলতার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, আকাশে হেলান-দেয়া তাদের মুর জাতীয় ব্যালকনির জটিল সোনা-রুপোর কারুকার্য। পাথুরে খিলান পথ দিয়ে মৃতদের কবর-ঠান্ডা নিঃশ্বাস কাসি ছোঁড়ে ওদের ওপর; ওদের পায়ের আঘাতে ঝঙ্কার দেয় আংটায় বাঁধা লোহার কড়া, আধখানা অবধি পাথরে গোঁজা। এই সব নগণ্য এ্যাভিন্যুর মধ্যেই এককালে বুক ফুলিয়ে ঘুরত বেপরোয়া 'ডনরা', এখনেই ঘোড়া চালাত, প্রেমের গান শোনাত আর তর্জনগর্জন করত, অথচ ওদিকে রেডইন্ডিয়ানের কুড়োল আর প্রথমাগতদের রাইফেল এর মধ্যেই উঁচু হয়েছে ওদের মহাদেশ-ছাড়া করতে। আর ট্যানসি—এই পুরনো দুনিয়ার ধুলোর মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে মাথা তুলে দেখছে,—অন্ধকার তো, তাই দেখছে ব্যালকনিতে ঝলমল করা আন্দালুসীয় রূপসীদের। ওদের কেউ কেউ হাসছে আর এখনো চালু ভুতুড়ে বাজনা শুনছে; অন্যরা ভয়ে ভয়ে রাতের অন্ধকারে কান পেতে আছে, চেষ্টা করছে স্পেনীয় ঘোড়সওয়ারদের খুরের আওয়াজ শুনতে—যাদের শেষ প্রতিধ্বনি এ পাথরগুলো থেকে একশো বছর আগেই মুছে গেছে। ওই মহিলারা নীরব, কিন্তু ট্যান্সি শুনতে পায় ঘোড়াহীন লাগাম-কাঠির টুংটাং, চালকহীন রেকাব-চাকতির ফর্‌ফর্, আর মাঝে মধ্যে বিদেশী ভাষায় বিড়বিড়িয়ে শাপমন্যি। কিন্তু সে ভয় পায়নি। প্রেতের ছায়াই হোক, আওয়াজের ছায়াই হোক, কিছুই ওকে ভড়কাতে পারে না। ভয়? মোটেই না। মা-পীককে ভয়? আকাঙ্ক্ষিতা মেয়েটির মুখোমুখি হতে ভয়? মাতাল ক্যাপ্টেন পীককে ভয়? না, না। এসব ভূতেও নয়, ওই ভুতুড়ে গান যা ওর পেছু নিয়েছে তাতেও নয়। গান গাওয়া! ওদের দেখিয়ে দেবো এবার! গলা উঁচু করে জোরালো বেসুরো কণ্ঠে তান ধরল:

"আরে, যখন শুনতে পাবে ঘন্টা,
টিং লিং লিং-"

রহস্যময় ভুতপ্রেতদের আগাম নোটিশ দিচ্ছে, যদি শেষ অবধি মুখোমুখি মোকাবিলা হয়, তাহলে:

"জোর গরম হবে আজ রাত,
এই মান্ধাতার শহরেই
হবে লড়াই-"

এই ভুতুড়ে গলিতে পা ফেলে চলতে যে কতোক্ষণ সময় লাগছে, তা ট্যানসির কাছে পরিষ্কার নয়, তবে যথাসময়ে সে বেরিয়ে আসে আরো প্রশস্ত একটা এ্যাভিন্যুয়ে। মোড়টার কয়েক গজ কাছে আসতেই ও একটা জানলা দিয়ে দেখছিল,

ঠিক কোণটিতেই রয়েছে একটা ছোট বাজে-চেহারার রুটি-বিস্কুটের দোকান। এক চাউনিতেই ও হিসেব করে নিয়েছে ওটার যৎসামান্য সরঞ্জাম, শস্তা সোডাকলের মেশিন, তামাক ও মিষ্টির ভাণ্ডার। তারপর দেখল ভেতরে ক্যাপ্টেন পীক একটা চঞ্চল গ্যাসবাতি থেকে চুরুট ধরাচ্ছেন।

ট্যানসি কোণের দিকে এসে মোড় ঘুরতেই ক্যাপ্টেন পীক বেরিয়ে এলেন। একেবারে সামনাসামনি দেখা। উল্লাসে উৎফুল্ল হল ট্যানসি, কারণ সে টের পাচ্ছে এ-সাক্ষাৎকার তাকে বিন্দুমাত্র কাবু করেনি। পীক তো পীক! হুঁ:! হাত তুলে সে সশব্দে তুড়ি বাজাল আঙুলে।

পীকই বরং এখন মনোহারী দোকানের কেরানির উদ্ধত চেহারার সামনে কেমন যেন কেঁচো হয়ে গেছেন। ক্যাপ্টেনের মুখে একটা তীব্র বিস্ময় আর সুস্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সত্যিই এ চেহারা দেখলে মনে পড়ে যায় এই জাতের আর-সব মুখমণ্ডলে অভিব্যক্ত ভাবগুলোর কথা। কামুক পৌত্তলিক দেবতা যাদের খুদে চোখ, ভারি চোয়ালে খোদাই-করা ভাঁজ, আর মুখভাবের মধ্যে জ্বরাতুর বিধর্মী উচ্ছৃংখলতা! দোকানটার ওপাশে নর্দমা-গলিতে একটা দরজা-বন্ধ গাড়ি দেখতে পায় ট্যান্সি। ওর দিকে পেছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন নিশ্চল চালক তার আসনে উপবিষ্ট।

ক্যাপ্টেন পীক সবিস্ময়ে বললেন, 'আরে, এ যে ট্যান্সি! কেমন আছ ট্যান্সি? এ...একটা চুরুট খাবে, ট্যান্সি?'

'আরে, পীক যে!'- নিজের ঔদ্ধত্যে নিজেই মুগ্ধ ট্যান্সি, 'এবার আবার কী শয়তানি শুরু করলেন পীক? পেছনের গলি, বন্ধ গাড়ি! ছিঃ পীক!'

'গাড়িতে কেউ নেই তো।'- নরম সুরে জানালেন ক্যাপ্টেন।

ট্যান্সি মারমুখো সুরে বলতে থাকে, 'ওর মধ্যে না থাকাই ভাগ্যের কথা। আপনার জানা থাকলে খুশি হব, পীক, যে আমি আপনার দলে নই। আপনি একটি নাক-ফোলা বজ্জাত।'

ক্যাপ্টেন সানন্দে বলে উঠলেন, 'আরে, ইঁদুরটা দেখছি শরাব টেনেছে! তবে ওই মাতলামো পর্যন্তই, আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি পথে এসেছে! যাও হে, ট্যানসি, বাড়ি চলে যাও। আর রাস্তায় বড়দের বিরক্ত করার অভ্যেস ছাড়।'

কিন্তু তক্ষুনি একটা সাদা-পোশাক পরা মূর্তি গাড়ির ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ল, আর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—কোটিরই গলার স্বর- বাতাস কেটে ছুটে এল: 'স্যাম! স্যাম!...বাঁচাও আমায় স্যাম!'

ট্যান্সি লাফিয়ে গেল ওর দিকে, কিন্তু মাঝখানে মোটা শরীর নিয়ে পথ রুখে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন পীক! অবাক কান্ড! এককালের সেই নিস্তেজ যুবকটি ডান হাত দিয়ে তাঁকে ঘুষি মারল, আর তিনি উল্টে পড়লেন বস্তার মতো, গালাগাল করতে-করতে। ট্যান্সি ছুটে গেল কেটির কাছে, বিজয়ী নাইটের মতো ওকে

বাহুপাশে টেনে নিল। কেটি মুখ তুলতে সে ওকে চুমু দিলে- বেগ্‌নি ফুল! বিজলি! ক্যারামেল! শ্যাম্পেন! আঃ, এই তো সেই স্বপ্ন যার মায়া থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন নেই!

কেটির পক্ষে যখন সম্ভব হল, সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও স্যাম, আমি জানতাম তুমি আমায় উদ্ধার করতে আসবে। তোমার কী মনে হয়? এই নোংরা জীবগুলো আমায় নিয়ে কী করতে যাচ্ছিল?'

'তোমার ছবি তুলতে চাইছিল,' বলল ট্যানসি, অবাক হল নিজের মন্তব্যের বোকামি বুঝে।

'না, ওরা আমাকে খেতে যাচ্ছিল। আমি ওদের বলাবলি করতে শুনেছি।'

একটু চিন্তা করে ট্যান্‌সি বলল, 'তোমাকে খাবে! তা হতে পারে না, ওদের অতো প্লেটই নেই।

কিন্তু একটা আকস্মিক শব্দে ও ফিরে তাকাল। ওর দিকে হামড়ে পড়ছে ক্যাপ্টেন, আর একটা লম্বা দাড়িওয়ালা, চকমকে জোব্বা আর লাল আঁট-পাজামাপরা বেঁটে বামুন। বেঁটে লোকটা কুড়ি ফুট লাফিয়ে ওকে খিমচে ধরল। ক্যাপ্টেন চিৎকাররতা কেটিকে আঁকড়ে ধরে ছুঁড়ে দিল গাড়ির ভেতরেই, তারপর নিজেও পেছুপেছু ঢুকল, আর পাগলের মতো ছুটল গাড়িখানা। বামন ট্যান্‌সিকে মাথার ওপর তুলে, তাকে নিয়েই ছুটল দোকানের ভেতর। এক হাতে তাকে উঁচুতে ধরে রেখে সে একটা বিশাল সিন্দুকের ডালা খুলল, তার আদ্ধেকটা বোঝাই বরফের টুকরো। ট্যান্‌সিকে ওর ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে সে ডালা বন্ধ করল।

পতনটা নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক হয়েছিল, কারণ ট্যান্‌সি অচৈতন্য হয়ে গেছে। যখন সম্বিত ফিরে এল, তখন ওর প্রথম অনুভূতি পিঠ আব হাত পায়ে প্রবল ঠান্ডা। চোখ খুলে দেখল সে চুনোপাথরের সিঁড়িটার ওপরেই বসে আছে, আর এখনো তাকিয়ে আছে 'সান্টা মার্সেডিস' কনভেন্ট আর সেই দেয়ালের দিকে। ওর প্রথম ভাবনাই হল কেটির সেই অপূর্ব চুম্বনটি। ক্যাপ্টেন পীকের চূড়ান্ত শয়তানি, ঘটনার অস্বাভাবিক রহস্য, ওই অসম্ভব মানবকটির সঙ্গে ওর উদ্ভট লড়াই—এগুলো ওকে ক্রুদ্ধ আর চঞ্চল করছে ঠিকই, কিন্তু 'অবাস্তবের' কোনো ছাপ রাখছে না ওর মনে।

ও সোচ্চারেই গজরায়, 'আমি কাল আবার যাব ওখানে, ওই মোটা কমিক অপেরা বিট্‌লেটার মুন্ডু উড়িয়ে দেব। একেবারে অজানা-অচেনা একটি মানুষকে তুলে নিয়ে ঠান্ডি ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া!'

কিন্তু সর্বাগ্রেই, ওর মাথার মধ্যে থেকে যায় সেই চুম্বন। মনে মনে কল্পনা করে, 'অনেকদিন আগেই সেটা আমার করা উচিত ছিল। ও তো পছন্দই করেছে। চারবার আমায় "স্যাম্" বলে ডেকেছে। ও রাস্তায় তো আবার যাচ্ছি না। বড় বেশি রগড়ারগড়ি। এবার আন্দাজ করি অন্য পথটাই ধরতে হবে। ভাবছি 'ওরা ওকে খেতে যাচ্ছে' বলতে ও কী বুঝিয়েছিল?'

ফের ঘুম পায় ট্যানসির। কিন্তু একটু পরেই ঠিক করে আবার উঠে চলতে শুরু করবে। এবার সে সাহস করে ঢুকে পড়ে বাঁদিকের রাস্তাটায়। কিছু দূর অবধি রাস্তা সমতলে গেছে, তারপরেই ধীরে ধীরে নিচের দিকে, শেষে একটা বিশাল, আলোকহীন, অনুর্বর জায়গা— পুরনো আমলের সামরিক চত্বর। ওর বাঁ-দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে দেখল চত্বরের কিনারা ধরে এক গুচ্ছ বাতি টিপ্‌টিপ্ করে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গেই ও চিনতে পারল এলাকাটা।

সরু সরু খুপরির মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করে আছে এক কালের বিখ্যাত মেক্সিকো রন্ধন-বিদ্যার জাতীয় পরিবেশকরা। কয়েক বছর আগেও শহরের মাঝখানে এই ঐতিহাসিক আলামো চত্বরে ওরা রাতের শিবির বসাত, সে যেন এক কার্নিভাল,—এমন এক নৈশ উৎসব যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। তখন পরিবেশক ছিল শতশত, আর পৃষ্ঠপোষক আসত হাজারে হাজারে। সারারাত ধরে আলামো প্লাজায় মানুষ ভিড় করে থাকত ছলাকলাময়ী সেনোরিটাদের আকর্ষণে, ভুতুড়ে স্পেনীয় চারণগান, আর অদ্ভুত স্বাদু মেক্সিকান খাবারের টানে, সে খাবার পরিবেশন করা হত শতশত প্রতিদ্বন্দ্বী টেবিলে। বহু ভাষাভাষী রাত জাগা পেঁচার মতো সান-আন্তোনে শহর মজা আর তামাশার কেন্দ্রস্থলে মিলিয়ে দিত ভ্রমণকারীদের: র‍্যাঞ্চওয়ালা, পরিবার-দল, ফূর্তিবাজ দেমাকী ভবঘুরে আর দর্শনার্থীদের। বোতলের কাঁক, পিস্তল আর ঝগড়ার আওয়াজ; চোখ, রত্নপাথর, আর ছোরার ঝিলিক; হাসি আর মুদ্রার ঝঙ্কার—এ তো ছিল রাতের নিত্যকার ব্যাপার।

কিন্তু এখন আর তা নয়। সেই ছবির মতো উৎসব এখন দাঁড়িয়েছে আধ ডজন তাঁবু, আগুনের কুণ্ড আর টেবিলে। আর এদেরও আবার ঠেলে দেয়া হয়েছে পুরনো একটা অব্যবহৃত চত্বরের মধ্যে।

অনেক সময় আগে ট্যান্‌সি বেড়াতে বেড়াতে এই রাতের অস্থায়ী দোকানগুলোতে এসেছে, মজাদার "চিলি-কন-কার্নে" খেতে; মেক্সিকোর প্রতিভাজাত ওই খাবারের পদটি সুগন্ধ শবজি সমেত মিহি মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি, সেই সঙ্গে ঝাল "চিলি কলোরেডো"- এ মিশ্রণটির তুলনাহীন স্বাদ, দক্ষিণীদের জিভের কাছে যেন আগুনের মনোরম ছোঁয়া।

এই বিশেষ খাবারটির সুগন্ধ এখন ভেসে আসছে ট্যান্‌সির নাকে, হাওয়ায় ভর করে, আর ওর খিদেটাও চাগিয়ে তুলছে। ও সেই দিকে ফিরতেই দেখতে পেল, মেক্সিকানদের তাঁবুর দিকে ছুটে আসছে একটা গাড়ি, চত্বরের অন্ধকার ফুঁড়ে। লণ্ঠনের অস্থির আলোয় কয়েকটা মূর্তিকে দেখা গেল আগু-পেছু দৌড়োতে। তারপর গাড়িটাকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে খাওয়া হল।

ট্যানসি এগিয়ে গিয়ে একটা রঙচঙে অয়েলক্লথ ঢাকা টেবিলে বসল। যান চলাচল এই সময়টায় নেই বললেই চলে। অন্য একটা টেবিলে বসে কিছু অল্পবয়েসী

ছোকরা হৈ-হৈ করছে। নিরুৎসাহ উদাস মেক্সিকোবাসীরা তাদের পশরা সাজিয়ে বসে আছে। আর সবই কেমন নিঝুম। চত্বরের আশেপাশের অন্ধকার বাড়িগুলোর দেয়ালে জড়ো হয়েছে শহরের নৈশ গুঞ্জন, ঝিমিয়ে পড়ছে একটানা নৈশব্দ্যে, আর তারই মধ্যে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিচ্ছে ঝিমন্ত আগুনের শব্দ আর চামচ-কাঁটার ঝনৎকার। একটা নেশা ধরানো হাওয়া দক্ষিণপূর্ব থেকে। সীসার চাদরের মতো তারাহীন আকাশ ঝুঁকে পড়েছে মাটির ওপর।

এই প্রশান্তির মধ্যেই ট্যান্‌সি হঠাৎ মাথা ঘোরায়, আর উদ্বিগ্ন হয়ে দেখে একদল ভুতুড়ে ঘোড়সওয়ার চত্বরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে আর হামলা করছে একটা পদাতিক সেনাদলের ওপর—তারা আঘাতটা নেবার জন্য তৈরি হয়েই আসছিল। ও দেখল কামান আর ছোট বন্দুকের ভয়ানক শিখা, কিন্তু শুনতে পায় না কোনো শব্দই। ভ্রূক্ষেপহীন খাবারওয়ালারা অবহেলাভরে চলাফেরা করছে, যেন লড়াইটা ওদের চোখেই পড়ছে না। ট্যান্‌সি খানিকটা অবাক হয়ে ভাবছিল ওই বোবা যোদ্ধা সেপাইরা তাহলে কোন জাতির? সেও ওদিকে পিঠ ফিরিয়ে "চিলি" আর কফির অর্ডার দিল মেক্সিকান মহিলাকে—সে পরিবেশন করতে এগিয়ে এল। মহিলাটি বুড়ি, দুশ্চিন্তাপীড়িতা; তরমুজের খোসার মতো মুখে দাগ। গন্‌গনে আগুনের পাশে রাখা একটা পাত্র থেকে কিছু খাবার তুলে নিয়ে সে চলে গেল কাছেই একটা অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে।

একটু বাদেই ট্যান্‌সি শুনল তাঁবুর মধ্যে একটা চেঁচামেচি। সুরেলা স্পেনীয় ভাষায় কেউ কাঁদতে কাঁদতে বুক-ভাঙা স্বরে আবেদন জানাচ্ছে, তার পরেই দুটি মূর্তি ছিটকে বেরিয়ে এল লণ্ঠনের আলোয়। একজন সেই বুড়ি মহিলা; অন্যজন এক জাঁক-জমকের ঝকঝকে পোশাকপরা পুরুষ। মহিলা যেন তাকে আঁকড়ে ধরে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু আকুল হয়ে ভিক্ষা চাইছে। নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরুষটি তাকে পশুর মতো মেরে ফের তাঁবুতে ঢুকিয়ে দিল। সেখানেই সে চোখের আড়ালে পড়ে ফোঁপাতে থাকল। ট্যান্‌সিকে লক্ষ্য করে লোকটা হন্‌হন্ করে চলে এল তার টেবিলের কাছে। ট্যানসি তাকে চিনতে পেরেছে—মেক্সিকান র‍্যামন টরেস, ওর প্রিয় এই দোকানটির মালিক।

টরেস এক সুদর্শন মানুষ, প্রায় কুলীন রক্তের স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত, দেখলে মনে হবে তিরিশ বছর বয়েস, আর বেশ উগ্র হলেও দারুন বিনয়ী তার ব্যবহার। আজ যেন বেশ লক্ষণীয় জাঁকালো ভাবে সেজেছে সে, তার পোশাক বিজয়ী 'মাটাডোরের' মতো বেগুনি মখমলের, যা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে জরির ছুঁচের কাজের তলায়। ওর দেহে এবং হাতে বড় বড় আকারের হীরা জ্বলজ্বল করেছে। একটা চেয়ারের জন্য হাত বাড়ায় সে, টেবিলের উল্টোদিকে জুত করে বসে একটা মনপসন্দ সিগারেট পাকায়।

রেশম-কালো চুলে উষ্ণ ঝিলিক তুলে সে বলে, 'আ-মীস্টার তান্সি, আপনাকে আজ সন্ধ্যায় এখানে পেয়ে আমি খুশি। মীসটার তান্সি, আপনি তো অনেকবারই এসেছেন আমাদের টেবিলে খেতে; আমার মনে হয় আপনি নিরাপদ মানুষ—খু-উব ভাল বন্ধু। একটা ঘোরের মধ্যে চিরদিনের মতো চলে গেলে আপনি কি খুশি হবেন?'

'তার মানে আর কখনো আসব না?' জিজ্ঞেস করে ট্যানসি।

'আরে না, একেবারে চলে যাবার কথা বলছি না- ঘোরের মধ্যে; নেশার মতো- জীবন্মৃত।'

'আমি ওটাকে বলি সম্বিত লোপ।'

টরেস টেবিলের ওপর কনুই রেখে এক মুখ ধোয়াঁ গিলে নেয়, তারপর বলতে থাকে... প্রত্যেকটা শব্দ ধূসর ফুৎকারের সঙ্গে বেরিয়ে আসে:

'আমার বয়েস কতো বলে আপনার মনে হয়, মীস্টার তান্সি?'

'ও- আটাশ, কি তিরিশ।'

মেক্সিকান বলে, 'আজকের দিনটা হল আমার জন্মদিন। আজ আমার বয়েস হল চারশো তিন বছর।'

হৃষ্টকণ্ঠে ট্যান্সি বলে, 'হবেই তো, আমাদের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর আরেকটা প্রমাণ।'

'জলবায়ু নয়। আমি একটা মহা মূল্যবান গোপন রহস্য আপনাকে বলব। শুনুন আমার কথা, মীস্টার তান্সি। আমার যখন তেইশ বছর বয়েস, তখন স্পেন থেকে আসি মেক্সিকোতে। কবে? সেটা ছিল পনেরশো নব্বই সাল, এলাম হেরনান্ডো কর্টেজের 'সোল্ডাডোজের' সঙ্গে। মেক্সিকো থেকে এই দেশে এলাম সতের শো পনেরতে। দেখলাম আপনাদের আলামোর দুরবস্থা। আমার কাছে মনে হয় যেন গতকালের কথা। তিনশো ছিয়ানব্বই বছর আগে শিখেছিলাম 'ঘোরে' চলে যাবার গোপন পদ্ধতি। দেখুন আমার এই পোশাক, দেখুন এই 'ডায়মান্টি'গুলো। আপনি কি মনে করেন পয়সা দিয়ে কিনি এগুলো? 'চিলি-কন-কার্নে'—বেচা পয়সা?

ট্যানসি তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার তো তেমন মনে হয় না।' টরেস উচ্চকণ্ঠে হাসে।

'হায় ভগবান! কিন্তু তাই তো করি। যেটা আপনি এখন খাচ্ছেন তা কিন্তু নয়। আমি অন্য ধরনের একটা বানাই, যেটা খেলে মানুষ সব সময় জীবন্মৃত থাকে। আপনার কী ধারণা? এক হাজার লোককে খাবার জোগান দিই। এই পেসো প্রত্যেকের কাছ থেকে মাসকাবারে পাই। তাহলে দেখুন প্রতি মাসে হাজার পেসো! কী ভোজবাজি! তাহলে চমৎকার জামা পরব না কেন? একটু আগে ওই বুড়িকে দেখলেন না আমাকে আটকাবার চেষ্টা করছিল? ও হল আমার স্ত্রী। যখন ওকে বিয়ে করি তখন সে যুবতী—সতের বছরের, 'বনিটা'। অন্যদের মতো সেও বুড়ি হয়ে গেছে আর- কী বলবেন!—কাঠখোট্টা? আমি সেই রকমই আছি—সারাক্ষণ দিব্যি যুবক।

'আজ রাতে ঠিক করলাম বরের পোশাক পরব, আমার বয়েসের আরেকটি বউ নেব। এই বুড়ি মেয়েমানুষটা আমার মুখ আঁচড়ে দিতে চায়! হা,হা! মীস্টার তান্সি ঠিক ওই ভাবেই চায় ওরা আমেরিকায় ঢুকতে।'

'আর ওই যে স্বাস্থ্যকর খাবারটার কথা বলছিলেন আপনি- ?' বলে ট্যান্সি।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে, শেষ অবধি চিত হয়ে ওটার ওপর শুয়েই পড়ে টরোস, বলে, 'শুনুন তবে—এ "চিলি-কন-কার্নে" বীফ কিংবা মুরগি থেকে বানানো হয় না, বানানো হয় সেনোরিটাদের মাংস দিয়ে—নরম আর কচি। এই হল গুপ্ত তথ্য। প্রতি-ই-ই মাসে ওটা থেকে খেয়ে যেতে হবে, বিশেষ খেয়াল রেখে পূর্ণিমার আগে পর্যন্ত- তাহলে আর কক্ষনো মরবেন না। তাহলে দেখুন বন্ধু তান্সি, আপনাকে কতো বিশ্বাস করি! আজ রাতে এক লেডিকে এনেছি- ভারি-ই-ই সুন্দরী, এমন নরম, নধর আর মিহি! কাল "চিলি" তৈরি হবে। তাছাড়া দেখুন! এক হাজার ডলার দিলাম এই জোয়ান মহিলা বাবদ। পয়সা দিয়ে এক আমেরিকানকে বাগিয়েছি, সেই এনে দিয়েছে—দারুন ঠাঁটবাটের মানুষ- এল্ কাপ্তেন পীক! এ কী হল, সেনর?'

কারণ ট্যান্সি তখন লাফিয়ে উঠে, চেয়ারখানা উল্টে দিয়েছে। কেটির কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তার কানে: 'ওরা আমাকে খেতে যাচ্ছে, স্যাম'। এটাই তাহলে ওর দানবীয় ভাগ্য, যার মধ্যে ওকে সঁপে দিয়েছে ওর অস্বাভাবিক পিতা? চত্বরের দিক থেকে যে গাড়িটাকে আসতে দেখেছিল সেটা ক্যাপ্টেন পীকের গাড়ি। কেটি তাহলে কোথায়? হয়তো এর মধ্যেই—

ও কী করবে ঠিক করতে পারার আগেই একটা উচ্চ আর্তনাদ এল তাঁবু থেকে। বুড়ি মেক্সিকান রমণীটি ছুটে বেরিয়ে এল, হাতে চক্চক্ করছে একটা ছুরি। চিৎকার করে বলল, 'আমি ওকে মুক্ত করে দিয়েছি, আর তোমাকে খুন করতে হচ্ছে না! ওরা তোমায় ফাঁসিতে ঝোলাবে- অকৃতজ্ঞ! মায়াবী জাদুকর!'

টরেস্ একটা হিস্হিস্ শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়ির ওপর।

'র‍্যামনসিটো!' চিৎকার করলে মহিলা, 'তুমি তো একসময় আমাকে ভালবাসতে।'

মেক্সিকানটির হাত একবার ওপরে উঠল, তারপরই নিচে নেমে এল। 'তুই যে বুড়ি হয়ে গিয়েছিস!'- চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, আর মহিলা ভূলুণ্ঠিতা হয়ে নিশ্চল পড়ে রইল।

আবার একটা আর্তনাদ; এবার তাঁবুর পর্দা সপাটে খুলে গেছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে কেটি। ভয়ে ফ্যাকাশে, হাতের কব্জিতে এখনো নিষ্ঠুর দড়ি বাঁধা।

'স্যাম' চিৎকার করে উঠল সে, 'আমায় এবারও বাঁচাও!'

ট্যান্সি টেবিলটা ঘুরে অপূর্ব সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেক্সিকানটার ওপর। ঠিক তখনই ঢং ঢং আওয়াজ শুরু হল- শহরের সব কটা ঘড়ি মধ্যরাত্রি ঘোষণা করছে। ট্যান্সি আঁকড়ে ধরেছিল টরেসকে, আর মুহূর্তের জন্য টের পাচ্ছিল তার

মুঠোর মধ্যে ভেলভেটের খস্‌খসানি, ঝলকানো পাথরগুলোর ঠান্ডা স্পর্শ। পরের মুহূর্তে অলংকৃত সজ্জিত "মানুষটা" তার মুঠোর মধ্যেই আর্তনাদ করে যেন একটা দুমড়ে যাওয়া চামড়া সর্বস্ব, সাদা দাড়িওয়ালা, অতি-অতি প্রাচীন "ম্যমী" বনে গেল। যেন স্যান্ডেলপরা ছেঁড়া পুতুল— চারশো তিন বছরের। মেক্সিকান রমণী তখন পায়ের ওপর ভর দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে এল। হাসতে লাগল, আর বাদামি হাতটা কাঁদুনে ভিয়াগোর দিকে নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'এবার যা। খুঁজে বের কর তোর সেনোরিটাকে। আমি র‍্যামনসিটো, আজ তোর এই হাল করেছি। প্রত্যেক পূর্ণিমার আগে এই জীবনদায়ী "চিলি"খাবি। আমিই তো তোর লগ্ন খারাপ করে দিলাম রে! তোর খাওয়া উচিত ছিল "গতকাল", "আগামীকাল" নয়। বড় দেরি করে ফেললি। যারে মরদ, ভাগ্‌ এবার, আমার পক্ষেও বুড়ো তুই!'

সাদা দাড়ি ছেড়ে দিয়ে ট্যান্‌সি এবার সিদ্ধান্ত করলে, 'এসব হল বয়েস নিয়ে একান্ত পারিবারিক ব্যাপার, আমার এতে কিছু করার নেই।'

একটা টেবিল-ছুরি দিয়ে সে চটপট্‌ কাটতে যায় সুন্দরী বন্দিনীর হাতের দড়ি, আর... এই রাতে সে দ্বিতীয়বাব চুমু দেয় কেটি পীককে। আবার স্বাদ পায় সেই মিষ্টি অবাক করা রোমাঞ্চের, আবার পায় তার অন্তহীন স্বপ্নের চূড়ান্ত উপলব্ধি।

পর মুহূর্তেই ওর ঘাড়ের গভীরে প্রবেশ করল একটা বরফ-ঠান্ডা ধারালো ছোরা। টের পেল ওর রক্ত জমে হিম হচ্ছে ধীরে ধীরে, চিরন্তন স্পেনীয় প্রলাপের কল্‌কলানি আসে কানে; তারপর গোটা চত্বরটাই উঠে ঘুরতে থাকে যতোক্ষণ না উচ্চতম আকাশ আছড়ে পড়ে দিগ্বলয়ে...তারপর ও আর কিছুই জানে না।

আবার যখন ট্যানসি চোখ মেলে চায়, সে বসে আছে সেই একই সিঁড়ির ধাপে, আর তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত কনভেন্টের অন্ধকার ঢিবিটার দিকে। পিঠের ওপর এখনো সেই হিম শীতল ব্যথা। কী করে আবার সে ফিরে এল এখানে? কোনো রকমে আড়ষ্টতা ভেঙে উঠে দাঁড়াল সে, খিল ধরা হাত পা টান করল। পাথরের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে, তার মাথায় ঘোর-পাক খেতে লাগল সেই বাড়াবাড়ি রকমের অভিযানগুলোর কথা; সে রাতে যতোবারই সিঁড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে ততোবারই ওই সব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে। খতিয়ে দেখলে কতগুলো ব্যাপার ওর অবিশ্বাস জাগায়। ও কি সত্যিই ঘুরতে ঘুরতে ক্যাপ্টেন পীক বা কেটি অথবা ওই অতুলনীয় মেক্সিকানের দেখা পেয়েছিল? ও কি সত্যিই ওদের এমন সাধারণ অবস্থার মধ্যে মোকাবিলা করেছিল, আর ওর অতি উত্তেজিত মস্তিষ্কই অসঙ্গতিময় ব্যাপারগুলোকে জুগিয়েছে ওর মনে? সে সব যাই হোক, একটা আকস্মিক উচ্চগ্রামের চিন্তা ওকে গভীর আনন্দ দেয়। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই, জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে কিছু নিয়তির তত্ত্ব আমদানি করে থাকি—তা সে নিজেদের বোকামির ওজর খুঁজতেই হোক, কি বিবেককে

সান্ত্বনা দেবার জন্যই হোক। আমরা এক বুদ্ধিমতী নিয়তিকে খাড়া করি যিনি সংকেত বা নিয়ম রেখে চলেন। ট্যান্সিও সেইরকমই করেছে, আর এখন সে রাতের ঘটনাগুলোর ভেতর দিয়ে পাঠ করছে তার ভাগ্যেব লিখন। প্রতিটি অভিযান যা সে করেছে তা শেষ অবধি পৌছেঁচে চূড়ান্ত অধ্যায়ে—কেটি আর সেই চুম্বন। ওর স্মৃতির মধ্যে তা শুধু বেঁচেই থাকেনি, আরো নেশাবিষ্ট হয়েছে। নিঃসন্দেহে, নিয়তি আজ রাতে তার সামনে একটা আয়না তুলে ধরেছেন, তাকে আহ্বান জানিয়েছেন সেই কাজ সমাপন করতে- যা ওর পছন্দ করা যে কোনো পথেরই শেষ প্রান্তে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, ও নিজের আস্তানায় পথ ধরল।

মিস্ কেটি পীক তার ঘরের একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছে নিভু নিভু আগুনের সামনে। পরনে একটা সূক্ষ্ম কাজ করা হালকা নীল পোশাক, ছিমছাম। ওর ছোট খালি পা' দুটো হাঁসের পালকের কিনারা মোড়া একজোড়া ঘরোয়া চটির মধ্যে ঢোকানো। একটা ছোট বাতির আলোয় সে শেষ রবিবাসরীয় কাগজটির মধ্যে সামাজিক স্তম্ভগুলো দেখছে। ওর সাদা খুদে দাঁতগুলোর ফাঁকে কোনো বিশেষ মজার বস্তু নিয়মিত চর্বিত হচ্ছে, যা বোধহয় শেষ হতে চায় না। মিস্ কেটি অনুষ্ঠান গহনাপত্রের খবর পড়ছে বটে, তবে সতর্ক কান রেখেছে বাইরের আওয়াজের দিকে, আর মাঝে মাঝেই চোখ তুলে চাইছে ম্যান্টেল-ঘড়ির দিকে। বাইরের পিচ বাঁধানো পাশগলিতে কোনো রকম পদশব্দ হলেই ওর মসৃণ গোল চিবুক মুহূর্তের জন্য থামাচ্ছে উত্থান-পতন, আর শ্রবণের কুঞ্চন তার সুন্দর ভ্রূদুটোকে ভঙ্গিল করছে।

অবশেষে ও লোহার গেটের ছিট্‌কিনির আওয়াজ শুনতে পায়। লাফিয়ে উঠে চট্ করে এগিয়ে যায় আয়নার দিকে। ওখানে সামনের চুল আর গলার ওপর কিছু মেয়েলি চটপটে আঙুল চালায়—আগন্তুক অতিথিটিকে মুগ্ধ করতে হবে তো।

দরজার ঘন্টা বাজল। মিস্ কেটি, তাড়াহুড়োর বশে, বাতির শিখাটা উঁচু করার বদলে নামিয়ে দিয়েছে, আর নিঃশব্দে সিঁড়ি ধরে নেমে গেছে হলঘরে। ও চাবিটা ঘোরায়, দরজা খুলে যায়, আর মিঃ ট্যানসি পাশ কাটিয়ে ভেতরে পা ফেলে।

সবিস্ময়ে মিস্ কেটি বলল, 'একি! ব্যাপার দেখ..... আপনি মিঃ ট্যানসি? এখন যে মাঝরাত গড়িয়ে গেছে। আপনার লজ্জা হয় না বুঝি আমাকে এত রাতে জাগাতে.... যাতে দরজা খুলে দি? কী অসভ্য মানুষ আপনি!'

উদ্ভাসিত বদনে ট্যান্‌সি বলে, 'দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

'দেরি তো হবেই জানতাম! মা বড় উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন আপনার জন্য। দশটার পরও যখন ফিরলেন না, হতচ্ছাড়া টম ম্যাক্‌গিলটা বলল আপনি আর কারুর সঙ্গে... বলল আপনি কোনো যুবতি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। আমি

তো ম্যাকগিলকে ঘেন্নাই করি। ঠিক আছে, আমি আর কখনো আপনাকে বকব না মিঃ ট্যান্‌সি, মানে যদি একটু দেরিও- ওহো, বাতির পলতেটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি যে!'

ক্ষীণ আর্তনাদ করে কুমারী কেটি। অন্যমনস্কভাবে বাতির শিখাটা সে বাড়িয়ে দেবার বদলে একেবারেই নিভিয়ে দিয়েছে। এখন গাঢ় অন্ধকার।

ট্যানসি একটা বাজনার মতো মিঠে চাপা হাসি শুনতে পায়। একটা মাতাল 'হেলিওট্রোপ' সুবাসও আসে তার নাকে। আলতো একখানা সন্ধানী হাত তার বাহু স্পর্শ করে।

'কী উজবুকের মতো কান্ড করেছি! আপনি রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন তো স্যাম?'

'অ্যাম-আমার কাছে হয়তো একটা ম্যাচ আছে, মিস্ কে-কেটি।'

কাঠি ঘসবার শব্দ, একটা শিখা, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা আলো দেখায় ভাগ্যের কাপুরুষ দাস, জাগিয়ে তোলে এক আলোকিত দৃশ্য যা এই গঞ্জনাময় ইতিহাসের শেষটুকু দেখাবে... অচুম্বিত, উপহাসের বক্রতা ঠোঁটে নিয়ে এক কুমারী ধীরে বাতির চিমনি ওঠায়, পলতেটাকে জ্বলতে সাহায্য করে, তারপর সবিদ্রূপ রেহাই দেওয়ার ভঙ্গি করে হাত নেড়ে সিঁড়ি দেখায়। আর অসুখী ট্যান্‌সি, একসময়ে যে ছিল ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণীময় রণাঙ্গনের নায়ক—অগৌরবে পা বাড়িয়েছে তার নিশ্চিত, ন্যায্য, নরকদন্ডের দিকে—, সেই সঙ্গে (কল্পনা করা যেতে পারে) মঞ্চপটের পার্শ্ব-পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিয়তির মূর্তি, পাগলের মতো ভুল দড়ি ধরে টানছেন, আর তাঁর স্বাভাবিক যোগ্য ঢঙে সব জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছেন।

The Enchanted Kiss, মেট্রোপলিটান, ১৯০৪

শ্যামরক জোন্‌সের অভিযান

আমার পরম সৌভাগ্য যে নিউইয়র্কের বিখ্যাত গোয়েন্দা শ্যামরক জোনস্‌কে আমার নিজের দলের মধ্যেই গণ্য করতে পারি। শহরের গোয়েন্দা বাহিনীর "ভেতরের লোক"ই বলা হয় জোনস্‌কে। টাইপরাইটারের ব্যবহারে সুদক্ষ সে, আর তার কর্তব্য হল, যখনই কোনো 'খুনের রহস্যের' কিনারা করতে হচ্ছে, তখন তাকে সদর দপ্তরে টেলিফোন ডেস্‌কের সামনে বসতে হবে, আর সেই সব "উন্মাদগুলোর" 'মেসেজ' নিতে হবে, যারা অপরাধটা করেছে বলে টেলিফোনে স্বীকারোক্তি জানাবে।

কিন্তু বিশেষরকম "ঢিলে" কতগুলো দিনে, যখন স্বীকারোক্তি আসে ঢিমে তালে, আর তিন-চারটে নতুন সংবাদপত্র বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন-চার রকম অপরাধীর কাহিনী নিয়ে—সে সব দিনে জোনস্ আমার সঙ্গেই শহর চষে বেড়ায়;

দারুণ আনন্দ আর শিক্ষার মধ্যেই লক্ষ্য করে যাই তার আশ্চর্য নজর আর সিদ্ধান্তে পৌছোবার ক্ষমতা।

সেদিন সদর দপ্তরে এসে দেখি মহান্ গোয়েন্দা চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে তার কড়ে আঙুলে শক্ত করে জড়িয়ে-রাখা একটা সুতোর দিকে।

'গুড মর্নিং, কী ব্যাপার', মাথা না ঘুরিয়েই বলল সে, 'বড় খুশি হলাম লক্ষ্য করে যে অবশেষে তুমি তোমার বাড়িতে বিজলি বাতি বসিয়েছ।'

অবাক হয়ে বলি, 'আমায় দয়া করে বলবে কেমন করে ওটা জানলে? আমি তো নিশ্চিত ও ব্যাপারটা আমি কারুর কাছেই কখনো উল্লেখ করিনি, তা ছাড়া বিজলির তার বসাবার অর্ডারটা ছিল তাড়াহুড়োর, সবে আজ সকালে শেষ হয়েছে।'

প্রসন্ন কণ্ঠে জোন্‌স বলে, 'ওর চেয়ে সহজ আর হয় না কিছু। তুমি ভেতরে আসতেই টের পেলাম যে-চুরুটটা খাচ্ছ তার গন্ধ। দামি চুরুটের গন্ধ আমি জানি, আর এও জানি নিউইয়র্ক শহরে আজকের দিনে তিন জনের বেশি মানুষ নেই যারা চুরুট টানবার আর গ্যাসের বিল মেটাবার হিম্মত রাখে। ওটা ছিল সরল সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আমার একটা নিজস্ব ছোট্ট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।'

'তোমার আঙুলে ওই সুতোটা কেন?' জিজ্ঞেস করি আমি।

জোন্‌স বলে, 'আরে সেইটেই তো সমস্যা। বউ আমার আঙুলে আজ সকালে বেঁধে দিয়েছিল, যাতে মনে করে কিছু জিনিস বাড়িতে পাঠিয়ে দিই।'

বিখ্যাত গোয়েন্দা একটা দেয়াল টেলিফোনের কাছে যায়, রিসিভারে কান রাখে প্রায় দশ মিনিট ধরে।

যখন সে চেয়ারে ফিরে এল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনো স্বীকারোক্তি শুনছিলে নাকি?'

একটু হেসে জোন্‌স বলল, 'হয়ত তাই। সেইরকমই একটা কিছু বলা যায়। তোমাকে আড়ালে একটা কথা বলছি ভাই, আমি নেশার ব্যাপার ছেড়ে দিয়েছি। এত লম্বা সময় নিয়ে পরিমাণটা বাড়াচ্ছি যে মরফিনে আর কোনো কাজই হয় না আমার ওপর। আমাকে আরো জোরালো কিছু নিতে হবে। ওই যে টেলিফোনটা ধরলাম, ওটা ওয়ালডর্ফ হোটেলের একটা কামরার সঙ্গে যোগ করা, সেখানে একজন লেখকের রচনা পাঠ চলছে। এখন এই সুতোটার সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয়।'

পাঁচ মিনিট নীরব চিন্তার পর জোনস্ আমার দিকে হাসিমুখে তাকাল। তারপর মাথাটা নোয়াল।

আমি সবিস্ময়ে বলি, 'আশ্চর্য লোক! এর মধ্যেই?'

আঙুল তুলে সে বলে, 'খুব সহজ ব্যাপার একটা। সুতোর ওই গিঁটটা দেখছ? আমি যাতে ভুলে না যাই তার জন্যেই ওটা। অতএব এটা হল 'বাঁধনটা ভুলো

না' গিঁট। 'ফরগেট-মি-নট্' (আমাকে ভুলো না) ফুল নয় কিন্তু। এক বস্তা ময়দা ঘরে পাঠাতে হবে।'

'চমৎকার!' আমি তারিফের উচ্ছাসটা দমাতে পারি না।

জোন্‌স এবার প্রস্তাব দিল, 'দু'জনে একটু বেড়িয়ে আসব নাকি?'

হাতে মাত্র একখানা গুরুত্বপূর্ণ কেস্ রয়েছে এখন। ১৯৪ বছরের বুড়ো মাক্‌কার্টি মারা গেছেন অতিরিক্ত কলা খেয়ে। প্রমাণগুলো এমন জোরালো ভাবে মাফিয়া-চক্রের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে যে পুলিশ দ্বিতীয় অ্যাভিন্যুর "কাটজেনজ্যামার গ্যাম্ব্রিনাস" ২নং ক্লাবটা ঘিরে ফেলেছে। হত্যাকারীকে পাকড়াও করা এখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজ। সাহায্যের জন্য অবশ্য গোয়েন্দা বিভাগকে এখনো ডাকা হয়নি।

জোনস্ আর আমি বেরিয়ে এসে রাস্তা ধরে সেই মোড়টার কাছে গেলাম যেখান থেকে ট্রাম-বাস কিছু ধরা যায়।

খানিকটা পথ যেতেই আমরা দেখলাম রাইনগেল্‌ডারকে; আমাদের চেনাজানা লোক, সিটি হলে কর্মচারী একজন।

দাঁড়িয়ে পড়ে জোনস্ বলল, 'সুপ্রভাত রাইনগেলডার।'

'বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট হল আজ সকালে।'

সব সময়ই নজর রাখি গোয়েন্দার অসাধারণ সিদ্ধান্ত পদ্ধতির ওপর। দেখি জোন্‌সের চোখ চকিতে গিয়ে পড়ল রাইনগেলডারের শার্টের বুকে লম্বা একটা হলদে ছোপ, আর থুতনির ওপর সামান্য দাগের ওপর। দুটোই নিঃসন্দেহে ডিমের হলদে কুসুম থেকে।

রাইনগেলডার সারা শরীর ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, 'ও, তোমার গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে বুঝি! বেশ, আমি তোমাদের মদ আর চুরুট দেব, এই বাজি রেখে বলছি, প্রাতরাশে কী খেয়েছি তা তুমি বলতেই পারবে না।'

জোন্‌সের জবাব-: 'হয়ে গেছে! সসেজ, রাই-রুটি, আর কফি।'

রাইনগেলডার এটাকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই স্বীকার করল, আর বাজির শর্তও বহাল রাখল। আমরা ফের নিজেদের রাস্তা ধরবার সময় জোন্‌সকে বললাম: 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ওর থুতনি আর শার্টে ডিমের দাগগুলো দেখছিলে।'

'তা তো দেখেছি, আসলে ওখান থেকেই শুরু আমার অনুমান। রাইনগেলডার খুব বাঁচিয়ে খরচ করে, সঞ্চয়ী মানুষ। গতকাল বাজারে ডিমের দর পড়ে গিয়েছিল, আটাশ সেন্টে ডজন। আজকের বাজার দর চলছে বিয়াল্লিশ। রাইনগেলডার গতকাল ডিম খেয়েছিল, আর আজও গিয়েছিল একই জিনিস খেতে। এমন এক ছোট ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বুদ্ধি, এ হল পাঠশালার গণিত-ক্লাশের বিষয়।'

ট্রামে উঠে দেখি সব আসনগুলোই দখল করা—প্রধানত মহিলাদের দ্বারা। জোন্‌স আর আমি পেছনের সিঁড়ি মুখে দাঁড়িয়ে থাকি। গাড়ির প্রায় মাঝামাঝি বসে আছেন এক বুড়ো ভদ্রলোক, খাটো ধূসর দাড়ি, যাকে দেখলেই মনে হয় মার্কামারা সুবেশ নিউইয়র্কবাসী।

পর পর ক'টা মোড় থেকে আরো মহিলা ট্রামে উঠলেন, শিগগিরই তিন-চারজন দাঁড়িয়ে গেল বুড়োর ওপর ঝুঁকে। তারা বেলট্ আঁকড়ে ধরে ওই ভদ্রলোকের দিকে অর্থব্যঞ্জক কড়া নজরে চাইছেন,—লোভনীয় আসনটা তো তিনিই দখল করেছেন। কিন্তু উনি দৃঢ়ভাবে নিজের আসনে বসে রইলেন।

জোনসের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলাম, 'আমরা নিউইয়র্কবাসীরা বোধহয় নিজেদের ভদ্রতাও ভুলে গেছি, বিশেষ করে পাবলিকের মধ্যে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে।'

জোন্স লঘু ভাবে বললে, 'হয়তো তাই। কিন্তু তুমি বাহ্যতই যে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে কথাটা বলছ, উনি পুরনো ভার্জিনিয়ার একজন অতি সজ্জন বীরধর্মী পুরুষ। নিউইয়র্কে কয়েকটা দিন কাটাচ্ছেন ওঁর স্ত্রী আর দুই মেয়েকে নিয়ে। আর আজ রাতে চলে যাবেন দক্ষিণে।'

'তাহলে ওঁকে তুমি চেন?- অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

'এ গাড়িতে ওঠার আগে ওঁকে কখনো দেখিনি', হাসতে হাসতে জানায় গোয়েন্দা।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠি- 'ডাইনির সোনার দাঁতের দিব্যি! শ্রেফ ওঁর চেহারা দেখেই তুমি যদি এমন সব ধারনা করতে পার, তাহলে ব্ল্যাক-আর্ট জাদু ছাড়া আর কিছু করছ না তুমি!'

'পর্যবেক্ষণের অভ্যাস- এছাড়া আর কিছু নয়।' বলল জোনস্, 'বুড়ো ভদ্রলোক যদি আমাদের আগেই ট্রাম থেকে নামেন, তাহলে বোধহয় আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতা দেখাতে পারব তোমায়।

তিনটে ব্লক পেরিয়ে যাবার পর ভদ্রলোক দাঁড়ালেন গাড়ি থেকে নামবেন বলে। জোন্স তাঁকে দরজার কাছেই জিজ্ঞেস করে বসল:

'মাফ করবেন স্যর, আপনিই তো কর্নেল হান্টার ... ভার্জিনিয়া নরফোকের?

'না, সাঃ'- অত্যন্ত বিনয়ী জবাব তাঁর, 'আমার নাম সাঃ এলিসন- মেজর উইনফিল্ড এলিসন, ফেয়ারফ্যাক্স জেলার, ওই একই রাজ্যে অবশ্য। নরফোকের অনেক লোককেই তো জানি সাঃ- গুডরিচ, টলিভার, ক্রাব্‌ট্রিরা, কিন্তু সাঃ, কখনো তো আপনার বন্ধু কর্নেল হান্টারের দেখা পাবার সৌভাগ্য হয়নি। আমি সানন্দে বলছি সাঃ, আপনাদের শহরে এক হপ্তা কাটিয়ে আজ রাতে বউ আর তিন মেয়েকে নিয়ে ভার্জিনিয়া ফিরে যাচ্ছি। দশদিনের মধ্যে নরফোকে পৌঁছে যাব। আপনি যদি আপনার নামটা জানান, আমি খুশি হয়ে কর্নেল হান্টারের খোঁজ করব, তাঁকে বলব যে আপনি তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন।'

জোন্স বলল, 'ধন্যবাদ, তাঁকে বলবেন রেনল্ডস তাঁকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাচ্ছে—যখন আপনি এতটাই দয়া করছেন আমাকে।'

নিউইয়র্কের গোয়েন্দাপ্রবরের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি, একটা ভয়ানক গভীর গ্লানি যেন তার কাটছাঁট চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সামান্যতম বিষয়েও ব্যর্থতা বোধ করলে শ্যামরক জোন্স যেন অতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে, 'আপনি বলছিলেন আপনার "তিনটি" মেয়ে ?'

'হ্যাঁ সাঃ, আমার তিন মেয়ে, তিন মেয়েই ফেয়ারফ্যাক্সের চমৎকার মেয়েদের মতো।'- এই তাঁর জবাব।

এ কথার পর মেজর এলিসন গাড়ি থামান, সিঁড়ি দিয়ে নামতে যান। শ্যামরক জোন্‌স তাঁর বাহু চেপে ধরে।

'এক মিনিট স্যর'- ভিক্ষে জানাবার মতো জোন্‌সের বিনীত কণ্ঠস্বরে আমিই শুধু ধরতে পারি একটা উদ্বেগ- 'আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে একটি যুবতি দত্তক কন্যা, ঠিক বলিনি ?'

নিচের জমি থেকেই উত্তর দিলেন মেজর- "ঠিকই' বলেছেন সাঃ, কিন্তু আমি যতোটুকু বলতে পারি তার চেয়ে বেশি আপনি কেমন করে জানলেন ? আজব কথা !'

গাড়ি যখন চলতে শুরু করে, আমি বলি, 'আমি যে অতোটাও বলতে পারি না।'

জোনসের স্থির পর্যবেক্ষণের প্রশান্তি ফিরে এসেছে আপাত-ব্যর্থতার মধ্যেও জিত হাঁসিল কারতে পেরে। তাই গাড়ি থেকে নামবার পর ও আমায় ডেকে একটা কাফের মধ্যে ঢুকল, কথা দিল তার সাম্প্রতিক আশ্চর্য কাজের পদ্ধতিটা এবার খুলে বলবে।

আমরা যখন আয়েস করে বসেছি, ও বলতে শুরু করল, 'প্রথমেই তো বুঝেছিলাম ও ভদ্রলোক নিউইয়র্কের লোক নন, কারণ ওই মহিলাদের দন্ডায়মানা দেখে কেবলই উশখুশ করছিলেন, লাল হয়ে উঠছিলেন, যদিও দাঁড়িয়ে উঠে আসনটা ওদের দেননি। ওঁর চেহারা দেখে আন্দাজ করেছিলাম উনি পশ্চিমী নন, বরং বলা যায় দক্ষিণ দেশী।

'তারপরে ভাবলাম, অতোই যদি অস্থিরতা ওঁর মনে, তাহলে মেয়েদের জন্য আসন ছেড়ে দিতে পারছেন না কেন ? অস্থিরতা থাকলেও তা ওঁকে বাধ্য করার মতো প্রবল নয়। আমি চট করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি এ বিষয়। লক্ষ্য করলাম ওঁর একটা চোখের এক কিনারায় কোনো জোর আঘাত লেগেছিল, তাই চোখটা লাল আর ফোলা, আর সারা মুখে ছিটফোঁটা গোল দাগ - আকাটা লেড পেন্সিলের পেছন দিকটার মাপের। তা ছাড়াও তার পেটেন্ট চামড়া জুতোর ওপর অনেকগুলো লম্বাটে-গোল কড়া ছাপ একদিক থেকে কাটা।

'এখন, নিউইয়র্ক শহরে মাত্র একটা এলাকাই রয়েছে যেখানে লোকে ওই ধরনের দাগ, আঘাত, খোঁচা পেতে বাধ্য—সেটা হল তেইশ নম্বর রাস্তার ফুটপাত আর ষষ্ঠ এ্যাভিন্যুর দক্ষিণে খানিকটা অংশে। ওঁর পায়ের ওপর ফরাসী জুতোর গোড়ালি দলে যাবার চিহ্ন, আর মুখের ওপর অসংখ্য ছাতার খোঁচা দাগ মহিলা-মহল

থেকে পাওয়া, ওই শপিং এলাকায় নারী বাহিনীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি থেকে। আর ওঁর মুখে যেমন বুদ্ধিমান মানুষের ছাপ, বুঝলাম উনি একান্ত আপনার জনের চাপাচাপি ছাড়া কখনোই ও অঞ্চলে গিয়ে বিপদ মাথায় নিতেন না। তাই যখন ট্রামে চাপলেন, তখনো যে ব্যবহার পেয়েছেন তার জন্য যথেষ্ট রাগ জমে ছিল তাঁর মনে, দক্ষিণী ভব্যতাজ্ঞানের ঐতিহ্য সত্ত্বেও তাই নিজের আসন আঁকড়ে রেখেছেন।'

'এ সবই তো বেশ ভাল বুঝলাম', বলি আমি, 'কিন্তু তুমি তাঁর মেয়েদের কথা বললে কেন—বিশেষ করে দুটো মেয়ের কথা? কেন, ওঁর বউ একাই কি ওঁকে শপিং-এ নিয়ে যেতে পারত না?'

শান্ত ভাবে জোন্‌স বলে, 'মেয়ে তো তাঁর থাকতেই হত সঙ্গে। যদি শুধু ওঁর গিন্নিটিই থাকতেন, ওঁরই কাছাকাছি যাঁর বয়েস, তাহলে না হয় ভুলিয়ে ভালিয়ে গিন্নিকে একাই পাঠাতেন। কাঁচা বয়েসী বউ থাকলে সে একাই চলে যাওয়া পছন্দ করত। অতএব, বুঝতেই পারছ।'

'সেটা না হয় মানলাম', বলি আমি, 'কিন্তু এবার বল দুটো মেয়ে কেন? আর কেমন করেই-বা, ভগবান জানেন, তুমি আন্দাজ করলে ওদের একজন দত্তক-কন্যা, যখন উনি বললেন ওঁর তিন মেয়ে?'

''আন্দাজ'' বোলো না',—গর্বের ভাব দেখিয়ে জোন্‌স বলে, 'অনুমান-সিদ্ধান্তের অভিধানে ও শব্দটি নেই। মেজর এলিসনের কোটের বোতামে একটা কার্নেশন ফুল ছিল, আর জিবেনিয়াম পাতা লাগানো একটা গোলাপ কুঁড়িও ছিল। কোনো মহিলা কখনো একই বোতামের ঘরে কার্নেশন আর গোলাপ-কুঁড়ি একসঙ্গে বসান না। তুমি একবার চোখ বুজে, নিজের কল্পনার যৌক্তিকতাকে এগিয়ে যাবার সুযোগ দাও। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, ফুটফুটে অ্যাডিল কোটের কলারে কার্নেশন গুঁজে দিচ্ছে যাতে বাবা রাস্তায় খোশমেজাজে থাকেন? তারপরেই লাফানো মেয়ে এডিথ মে, নাচতে নাচতে এসে বোনের ঈর্ষা নিয়ে যোগ করে দিল নিজের গোলাপ কুঁড়িটাও?

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি এবার- 'তারপর যখন তিনি বললেন তাঁর তিনটে কন্যা—'

'হ্যাঁ একজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম পেছন দিকে, যে কোনো ফুল যোগ করেনি; জানতাম সেই নিশ্চয় হবে—'

'দত্তক!' আমি বলে বসি, 'তোমায় সব রকম কৃতিত্বই দিচ্ছি। কিন্তু কেমন করে বুঝলে উনি আজ রাতে দক্ষিণে ফিরে যাচ্ছেন?'

মহান্ গোয়েন্দা বললেন, 'ওঁর বুক পকেটে একটা বড় ডিম্বাকার কিছু ফুলে রয়েছিল। ট্রেনে ভাল লীকার পাওয়া যায় না, আর নিউইয়র্ক থেকে ফেয়ারফ্যাক্স জেলা - রাস্তাও বড় চাট্টিখানি নয়।'

বললাম, 'আবার সেলাম জানাব তোমায়। এবার শুধু এইটুকু বল যাতে আমার সন্দেহের শেষ ছায়াটুকুও পরিষ্কার হয়ে যায় - উনি যে ভার্জিনিয়ার লোক তা তুমি বুঝলে কী করে?'

'খুবই অস্পষ্ট, তা মানি', জবাব দিল শ্যামরক জোন্‌স, 'কিন্তু যারা শিক্ষিত পর্যবেক্ষক তারা কখনো গাড়ির মধ্যে পুদিনার গন্ধ টের পেতে ভুল করবে না।'

The Adventures of Shamrock Jolnes. নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

কুড়ি বছর পর

বীটের পুলিসম্যান সগর্ব ভঙ্গিতে এ্যাভিন্যুব ওপর দিয়ে হাঁটছে। এ ভঙ্গিটা একেবারেই অভ্যাসের বশে, লোক দেখানো নয়, কারণ দর্শকও রাস্তায় নেই বললেই হয়, কাকে দেখাবে! সময় সবে রাত দশটা; কিন্তু ঠান্ডা হাওয়ার দমক, সেই সঙ্গে বৃষ্টির আভাস রাস্তাগুলোকে জনশূন্য করেছে।

চলতে চলতে দরজাগুলো ঠেলে দেখা, হাতের ছড়িটা নানা জটিল কায়দায় ঘোরানো, আর মাঝেমধ্যেই ঘুরে ফিরে সতর্ক চাউনি দিয়ে শান্ত সদর রাস্তাটা দেখা——অফিসার কে তার দীর্ঘ চেহারা আর সামান্য ঝুঁকে চলার জন্য শান্তিরক্ষক হিসেবে বেশ ভালই মানিয়ে যায়। কাছের এলাকাটা সাধারণত রাত জাগে অনেকক্ষণ। মাঝেমধ্যেই দেখতে পাবেন কোনো চুরুটের দোকান অথবা সারা-রাত-খোলা লাঞ্চ-খানার বাতিগুলো, কিন্তু বেশির ভাগ দরজাই বড় কারবার বা দোকানের, যেগুলো অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা বিশেষ ব্লকের মাঝামাঝি এসে পুলিসম্যান হঠাৎ তার চলার গতি মন্থর করল। একটা অন্ধকার লোহালক্কড়ের দোকানের দরজায় একটি লোক হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখে নিভে-যাওয়া চুরুট লাগিয়ে। পুলিসম্যান তার কাছে আসতেই সে হড়বড়িয়ে কথা বলে উঠল।

ভরসা দেবার সুরে বলল, 'ঠিক আছে অফিসার, আমি শুধু একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। শুনতে একটু উদ্ভট লাগে, তাই না? তা, আপনি যদি খতিয়ে দেখতে চান ব্যাপারটা সহজ সরল কিনা, তাহলে আমি সব বুঝিয়ে বলব। অতো বছর আগে একটা রেস্তোরাঁ ছিল, যেখানে এখন এই দোকানটা, এখানেই——"বিগ জো ব্রেডির" রেস্তোরাঁ।

পুলিসম্যান বললে, 'পাঁচ বছর আগে অবধি ছিল, তারপর ভেঙে ফেলা হয়।'

দরজার সামনের লোকটা এবার একটা দেশলাই জ্বালিয়ে নিজের চুরুট ধরায়। আলোতে দেখা যায় একটা ফ্যাকাশে চৌকো চেয়াল মুখ, সতেজ চোখ, আর ডান ভুরুর ওপরে একটা ছোট সাদা কাটা দাগ। লোকটার গলাবন্দের পিনে একটা বড় হীরা, খাপছাড়া ভাবে বসানো।

'কুড়ি বছর আগে ঠিক আজকের রাতে', বলে লোকটা, 'এই বিগ-জো-ব্রেডিতে খানা খেতে বসেছিলাম আমার সেরা বন্ধু জিমি ওয়েলসের সঙ্গে, অমন চমৎকার ছেলে দুনিয়াতে আর হয় না। সে আর আমি এই নিউইয়র্কেই মানুষ হই দুটি আপন ভাইয়ের মতো একসঙ্গে। আমার বয়েস ছিল আঠারো, আর জিমির কুড়ি। আমার পশ্চিমে যাবার কথা, কিছু ধনসম্পদ করতে। জিমিকে কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে বের করাই মুশকিল; সে মনে করত পৃথিবীতে এর মতো জায়গা আর নেই। যা হোক, সে রাতে আমরা স্থির করলাম ওই তারিখ থেকে কুড়ি বছর বাদে এখানে আমরা আবার মিলব ঠিক একই দিনে একই সময়ে, তা সে আমাদের অবস্থা যেমনই দাঁড়াক, আর যতো দূরেই থাকি না কেন আমরা এখান থেকে। আমরা হিসেব করলাম কুড়ি বছরে নিশ্চয় আমাদের দুজনেরই ভাগ্য গড়ে উঠবে নিজস্ব পথে, ধনার্জনও হবে, সে যতোটুকুই বা যা কিছুই হোক না কেন।'

পুলিসম্যান বললে, 'শুনতে তো বেশ আগ্রহজনক মনে হচ্ছে। যদিও আমার মনে হচ্ছে দুই সাক্ষাতের মধ্যে সময়টা বড় দীর্ঘ। আপনি চলে যাবার পর বন্ধুর কাছ থেকে কোনো খবরপাত্তা পাননি?'

'তা হ্যাঁ, কিছুদিন অবধি আমরা চিঠিপত্র লেখালিখি করেছিলাম। কিন্তু দু' এক বছর বাদে পরস্পরের সঙ্গে আর যোগাযোগ রইল না। বুঝলেন তো, পশ্চিম দেশ হল এক বিরাট ব্যাপার, আর আমিও মহা ফুর্তিতে এদিক-উদিক ছুটে বেড়াতে থাকলাম। কিন্তু আমি জানি, জিমি যদি বেঁচে থাকে, তাহলে এখানে আমার সঙ্গে মিলবেই, কারণ সে বরাবরই ছিল দুনিয়ার একজন সৎ, অটল সেকেলে মানুষ। সে কখনো ভুলবে না। আমি হাজার মাইল পেরিয়ে এলাম আজ রাতে এই দরজায় দাঁড়াব বলে, এখন তার যোগ্য মূল্য পাব যদি আমার পুরনো সাথীও এসে পড়ে।'

অপেক্ষমান ব্যক্তি একটা চমৎকার-দর্শন ঘড়ি বের করে, ঢাকনায় ছোট ছোট হীরে বসানো।

'দশটা বাজতে তিন মিনিট', জানায় সে, 'কাঁটায় কাটায় দশটার সময় আমরা এই রেস্তোরাঁর সামনে বিদায় নিয়েছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে।'

'পশ্চিমের দিকে গিয়ে বেশ ভালই উন্নতি করেছেন, তাই না?' প্রশ্ন করে পুলিসম্যান।

'তা আর বলতে! আশা করি জিমিও অন্তত কিছুটা ভাল তো করেছেই। অবশ্য একটু ঘেঁতো ধরনের ছিল, তবে মানুষ হিসেবে ভাল। টাকা করতে গিয়ে

আমাকে অনেক মগজ লড়াতে হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। নিউইয়র্কে থাকলে লোকে বাঁধাধরা রাস্তায় চলে। ওদের ওপর ক্ষুরের ধার বজায় রাখতে পারে এক পশ্চিমই।'

পুলিসম্যান বোঁ করে ছড়িটা ঘোরাল, এক পা দু'পা এগিয়ে গেল।

'আমি আমার পথে চলি। আশা করি আপনার বন্ধু ঠিক মতোই এসে পড়বেন। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সময় দিচ্ছেন নাকি তাকে?'

লোকটি বললে, 'না, তা কেমন করে! অন্তত আধ ঘন্টা সময় তো দেবই তাকে। যদি জিমি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, তা হলে এর মধ্যেই এসে পড়বে। বিদায়, অফিসার!'

বীটে যাবার আগে পুলিসম্যান দরজাগুলো ধাক্কাতে ধাক্কাতে বললে, 'শুভরাত্রি স্যার!'

এখন সূক্ষ্ম ঝিরঝিরে ঠান্ডা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, অনির্দিষ্ট দমক থেকে হাওয়া এখন জোরালো এক-তরফা বইছে। দুয়েকজন যা পথযাত্রী ওই এলাকায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা গোমড়া মুখে নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি ছুটছে কোটের কলার তুলে, পকেটে হাত গুঁজে। আর লোহার দোকানের দরজা মুখে সেই লোকটি, যে হাজার মাইল এসেছে তারা যৌবনের বন্ধুর সঙ্গে একটা নিরূপিত সাক্ষাৎকার বজায় রাখতে (যা এখন কিছুটা অনিশ্চিত, প্রায় অসম্ভবই মনে হয়) - চুরুট টানতে আর সবুর করতেই থাকল।

প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করেছিল সে। এমন সময় লম্বা ওভারকোট-পরা এক দীর্ঘকায় ব্যাক্তি, কান অবধি কলার তুলে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রাস্তার ওধার থেকে। সিধেই সে অপেক্ষমান লোকটির কাছে এল। দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল লোকটা, 'তুমি কি বব নাকি?'

'আরে তুমি, জিমি ওয়েলস?' চেঁচিয়ে উঠল দরজার কাছের লোকটা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' আগন্তুক সোল্লাসে তার দুটি হাত নিজের হাতে চেপে বলে উঠল, 'ববই তো, নিয়তির মতো নিশ্চিত। আমি জানতাম যদি বেঁচে থাকো তা হলে এখানেই তোমাকে পাব। বাঃ বাঃ বেশ!- কুড়ি বছর বড় লম্বা সময়। সেই পুরনো রেস্তোরাঁ তো বিদায় নিয়েছে, বব; যেন থাকলেই ভাল হত, আবার তোমাতে আমাতে বসতাম ডিনার খেতে। তা বুড়ো খোকা, পশ্চিম তোমার কেমন দেখভাল করেছে?'

'বেড়ে! যা চেয়েছি সবই পেয়েছি। তুমি অনেক বদলে গেছ জিমি। আমি কখনো ভাবিনি তুমি অমন দু'তিন ইঞ্চি বেড়ে যাবে লম্বায়।'

'ও, কুড়ি পেরুবার পর কিছুটা আরো বেড়েছিলাম।'

'নিউইয়র্কে বেশ ভালই করছ জিমি?'

'মাঝামাঝি। শহরের সরকারী বিভাগে একটা পদ আছে। এসো বব; আমার

জানা একটা জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাই, তারপরে বসে ভাল করে আগের সে সব দিনের গল্পগুলো করা যাবে।'

দু'জন বাহুতে বাহু মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। পশ্চিম থেকে আসা সেই লোকটি সাফল্যের অহঙ্কারে স্ফীত, তার কীর্তিকলাপের ইতিহাসের একটা খসড়া দিতে শুরু করেছে। অন্য জন ওভারকোটের নিচে মাথা গুঁজে উৎসুক হয়ে শুনছে তার কথা।

কোণের দিকে একটা মনোহারী দোকান বিজলি আলোয় ঝকমক করছে। দু'জনে ওই উজ্জ্বল আলোর মধ্যে আসার সঙ্গেসঙ্গেই পরস্পরেব মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

পশ্চিমের আগন্তুকটি হঠাৎ থেমে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

সে পট করে বলে উঠল, 'তুমি জিমি ওয়েলস্ নও হে! কুড়ি বছর লম্বা সময়, কিন্তু এত লম্বা নয় যে একজন মানুষের রোমান খাড়া নাককে একেবারে থ্যাবড়া করে দেবে।'

ঢ্যাঙা লোকটি বললে, 'অবশ্য তা মাঝে মাঝে ভাল মানুষকেও খারাপ করে দেয়। তুমি দশ মিনিট হল গ্রেপ্তার হয়েছে, 'রেশমী' বব! চিকাগো মনে করে তুমি আমাদের দিকেই পা বাড়িয়েছ। তাই "তার" করে জানিয়েছে তোমার সঙ্গে একটু বাতচিত করতে চায় তারা। চুপচাপ যাচ্ছো তো, অ্যাঁ? হ্যাঁ, সেটাই বুদ্ধির কাজ। এবার, আমরা থানায় যাবার আগে এই চিঠিখানা ধর, আমাকে বলা হয়েছিল তোমাকে দিতে। এখানে জানলার কাছেই পড়ে নিতে পার। টহলদার সেপাই ওয়েলসের কাছ থেকে চিঠিটা।'

পশ্চিমের আগন্তুক ছোট কাগজের টুকরোটার ভাঁজ খোলে। পড়তে শুরু করার সময় তার হাত ছিল স্থির, কিন্তু যখন শেষ করল, হাত সামান্য কাঁপছে। খুবই সংক্ষিপ্ত চিরকুটখানা :

"বব,- আমি যথাসময়েই নিরূপিত জায়গায় পৌঁছেছিলাম। তুমি যখন চুরুট ধরাতে দেশলাই জ্বাললে, আমি চিনে ফেললাম চিকাগোর চাহিদার সেই লোকটাকে। কোনো কারণে আমি নিজে কাজটা করতে পারিনি, তাই ঘুরতে ঘুরতে একজন সাদা পোশাকেব পুলিসকেই ধরলাম কাজটা শেষ করতে।

—জিমি ॥"

After Twenty Years, নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে

এ সেই পুরুষ ম্যানেজারটির কাহিনী, যে গল্পের শেষ অবধি টিঁকিয়ে রেখেছিল নিজের পদ।

এটা শুনেছিলাম সালি ম্যাগুনের কাছে,- মুখে মুখে। কথাগুলো অবশ্যই তার, তবে যদি তা সত্য কাহিনীটাকে যথাযথ বিবৃত না করে থাকে তার জন্য সমস্ত দোষ আমারই স্মৃতিশক্তির।

শুরুতেই ম্যানেজারের পুরুষত্বের ওপর যে জোরটুকু দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু মোটেই অহেতুক নয়। কারণ সালির মতে, গোটা মানুষজাতের নারী অংশকে ওই পদবাচ্য করলে, ঠিক উল্টো অর্থই হবে। মহিলা ম্যানেজাররা (তার কথায়) ব্যয় সংকোচ করেন, পয়সা বাঁচান, দরদস্তুর আর কলকৌশল করে বাড়িতে দমননীতি চালান—আর জীবনের মরুপথে সামান্য ঘুঙুর নাচের জন্য কোনো বেহালাবাদককে একটি তামার পয়সা দান করলেও ভ্রূকুটি করে তাকান। তার ফলে পুরুষরা তাদের 'ধন্য' বলে, তারিফ করে, আবার খিড়কির দরজা দিয়ে চুপটি করে বেরিয়েও চলে যায় গিলহুলি ভগ্নিদের তিড়িংবিড়িং নাচ দেখতে।

এখন এই পুরুষ ম্যানেজারটি হল (সালির কথাই উধৃত করছি) 'ব্রুটাস্' বিহনে 'সীজার'। একজন দায়িত্বহীন একনায়ক, এমন এক খেলোয়াড় যে নিজে কখনো বিপদের ঝুঁকি নেয় না। তার কাজ হল নির্দেশ দেওয়া, পাল্টা তেজ দেখানো, আওয়াজ্ তোলা, পরিব্যাপ্ত হওয়া, ঝলকের পালটা আরো ঝলক দেখানো। যদি সম্ভব হয়, তাতে ফায়দা তোলা। বিলের টাকা মেটানো আর ফলাফল নিয়ে চুল পাকানো তো তার ঊর্ধতনদের ব্যাপার। তার কাজ ঝুঁকির পথ দেখানো, আমনে-সামনে চাল বজায় রেখে ধাপ্পাবাজির মাতব্বরি, আর নাগরদোলায় তেল চড়ানো।

আমরা লাঞ্চ খেতে বসেছি, তখনই সালি ম্যাগুন বলল কাহিনীটা। আমি বিশদ জানতে চাইলাম।

সালি বললে, 'আমার পুরনো বন্ধু ডেনভার গ্যালওয়ে যেন ম্যানেজার হয়েই জন্মেছিল। তিন বছর বয়েসে সে নিউইয়র্কে প্রথম দিনের আলো দেখে। তার জন্ম হয়েছিল পিট্সবার্গে, কিন্তু তৃতীয় গ্রীষ্মকালেই তার বাপ-মা পুব দিকে চলে আসে।

'ডেনভার বড় হতেই ম্যানেজারির ব্যবসায় ঢোকে। আট বছর বয়েসে সে এক ডাগো মালিকের হয়ে তার পত্রপত্রিকার স্টল দেখাশোনা করত। তারপর সে বিভিন্ন সময়ে ম্যানেজার হয় স্কেটিং রিঙ্কে, ঘোড়ার চাপরাস-খানায়, নম্বরের সাট্টা খেলায়, রেস্তোরাঁয়, নাচের স্কুলে, হাঁটা প্রতিযোগিতায়, যাত্রা কোম্পানি, কাপড়ের দোকান, ডজনখানেক হোটেল আর গ্রীষ্ম স্বাস্থ্যাবাসে, একটা বীমা

কোম্পানিতে, একজন জেলার নেতার নির্বাচন অভিযানে। সেই অভিযানে যখন 'পূর্ব ভাগ' থেকে জিতলেন কাফলিন, ডেনভারের ভাগ্য উজ্জ্বল হল। এর ফলে ব্রডওয়েয়ের একটা হোটেলের ম্যানেজারের কাজ পেল সে। আর কিছুকাল সেনেটর ও' গ্রেডির নির্বাচন কাজও পরিচালনা করল।

'ডেনভার ছিল আপাদমস্তক নিউইয়র্ক-ওয়ালা। আমার মনে হয় যে সময়টার কথা বলতে যাচ্ছি তার আগে দু'বার মাত্র শহর ছেড়ে বেরিয়েছিল সে। একবার ইয়ংকার্সে খরগোশ শিকার করতে। আরেকবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় যখন সে সবে একটা 'নর্থ-রিভার' ফেরি স্টীমার থেকে নামছে। "পশ্চিম দিকে একটা লম্বা চক্কোরে গিয়েছিলাম সালি, ওল্ড বয়!" বলল সে, 'গ্যাড! আমার তো ধারনাই ছিল না আমাদের দেশটা এত বড়। প্রকান্ড হে! পশ্চিমের ঐশ্বর্যের কথাও কোনোদিন কল্পনা করিনি। যেমন জাঁকজমক, তেমনি গর্বময় আর অন্তহীন। ওর কাছে পূবদিক তো বাক্সে-আঁটা ছোট্ট একটুখানি। ভ্রমণ করে স্বদেশের এই বিপুলতা আর ঐশ্বর্যের ধারনা করা মস্ত এক ব্যাপার।"

'আমি নিজেই অনেকবার ছোটখাটো যাত্রা করেছি ক্যালিফোর্নিয়ায়, দক্ষিণে মেক্সিকো আর উত্তরে আলাস্কার মধ্যে, তাই ডেনভারের সঙ্গে বসে গেলাম ও কী কী দেখেছে তার বৃত্তান্ত শুনতে।

'জিজ্ঞেস করি, "ওখানে গিয়ে ইয়োসেমাইট বাগান তো নিশ্চয়ই দেখেছ?"

'"না, তা বোধহয় না"--বললে ডেনভার, "অন্তত মনে করতে পারছি না। বুঝলে তো, তিন দিন তো মাত্র পেয়েছিলাম, পেন্সিলভানিয়ার আল্টুনার পশ্চিমে আর যেতেই পারলাম না।"

'দু'বছর আগে নিউইয়র্কে এলাম ছোটখাটো একটা টেনেসী অভ্র-খনির নকশা-প্রস্তাব নিয়ে যাতে ওটার চমৎকার পরিবেশ দেখিয়ে কিছু নিয়োগকারীকে বাগানো যায়। একদিন বিকেলে কোনো ছাপাখানা থেকে একগোছা সুন্দর প্রস্তাবপত্র সদ্য ছাপিয়ে নিয়ে বেরুচ্ছি এমন সময় দেখা হয়ে গেল ডেনভারের সঙ্গে মোড়ের মাথায়। ওকে অমন উৎফুল্ল বদন কখনো দেখিনি। সুন্দর টাটকা চেহারা, আনন্দে ভরপুর। করমর্দনের পর ও জিজ্ঞেস করল আমি আজকাল কী করছি। আমিও ওকে দু'এক কথায় বুঝিয়ে দিলাম অভ্রের বাজারে কী কেলেঙ্কারি করতে যাচ্ছি।

'"দূর, দূর! ছাড়ো তো তোমার অভ্র" বললে ডেনভার, "বুড়ো নিউইয়র্কের তামার থলিতে খোঁচা মারার জন্য শেষে স্বচ্ছ অভ্রের চেয়ে ভাল কিছু খুঁজে পেলে না সালি? এবার তুমি আমার সঙ্গে হোটেল ব্রান্সউইকে এসো। ঠিক তোমার মতো মানুষকেই আমি খুঁজছিলাম। ওখানে ঘোর বাদামি রঙ আর কোঁকড়া-চুলের এক চীজ আছে, আমি চাই তুমি তাকে একবারটি দেখ।"

'"তুমি ব্রান্সউইকে উঠেছ নাকি হে?" জিজ্ঞেস করি আমি।

'ডেনভার ফুর্তিভরে জবাব দেয়, "একটি পাইপয়সাও নয়। যে সিণ্ডিকেট হোটেল চালায় তারাই আমায় রেখেছে। আমি হলাম ম্যানেজার।"

'ব্রানস্‌উইক হল ব্রডওয়ের ডাকসাঁইটে হোটেল—পামগাছ, ফুল আর সাজসজ্জায় সাজানো—সবুজ লন আর লন্‌ড্রির মেশামিশি। ইস্ট সাইডের এক সদর রাস্তার ওপর ওটা, কিন্তু এক নিরেট সাবেকি আমলের পান্থশালা, যেখানে স্যানিটেলিসের মেয়র, মিসোরীর গভর্নর সবাই উঠতে পারেন। আট তলা উঁচু বাড়ি, নতুন ডোরাকাটা পর্দা, বিজলিবাতি যেন সবদিক দিনের মতো আলো করে রেখেছে।

'আমরা হোটেলের কাছাকাছি আসতে ডেনভার বললে, "বছরখানেক হল এখানে ম্যানেজার হয়ে আছি। যখন কাজ বুঝে নিই, কাকপক্ষীটি আসত না এখানে থাকতে। কেরানির ডেসকের ওপরের ঘড়িটা সপ্তাহের পর সপ্তাহ অচল পড়ে থাকত চাবির অভাবে। একদিন একটা লোক হার্টফেল করে ফুটপাতে মরে পড়ল, তাকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল সে দু'ব্লক দূরে পৌঁছে গেছে! আমি একটা পরিকল্পনা ঠাউরালাম পশ্চিম ভারতীয় (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) আর দক্ষিণ আমেরিকার খদ্দের ধরব বলে। মালিকদের পেড়াপিড়ি করলাম আরো কয়েক হাজার ডলার খাটাবার জন্য, আর সেই টাকার প্রতিটা পাই লাগালাম বিজলি বাতি, লঙ্কাগুঁড়ো, সোনার পাতি আর রসুনের পেছনে। একদল স্পেনীয় ভাষাভাষী কর্মচারী, আর একটা গীটার ব্যাঞ্জো বাজাবার দলও নিলাম, কথা চাউর হল প্রতি রবিবারে বাড়ির তলার হলঘরে মোরগ লড়াই হবে। ঠিক বাদামি চামড়ার দলটাকে পেলাম না বটে, তবে হাভানা থেকে প্যাটাগোনিয়া অবধি ডন সেনররা জেনে গেলেন ব্রানসউইকের কথা। কিউবা আর মেক্সিকো, আর দু' আমেরিকার দক্ষিণ থেকে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোককে পেলাম—তাদের এত টাকা যে ঝোপঝাড়ের প্রত্যেকটি বুলবুলিকে গোলার ঘায়ে উড়িয়ে দিতে পারে।"

'হোটেলের কাছে পৌঁছুতে ডেনভার আমায় দরজার কাছে থামায়।'

'বলে, "তোমার ডানদিকে একটা বড় চামড়ামোড়া চেয়ারে বসে আছে একটি পিত্তি-রঙা ছোটখাটো মানুষ। তুমি বসে ওকে কয়েক মিনিট লক্ষ্য করে তারপর আমাকে বল তোমার কী মনে হয়।"

'আমি একটা চেয়ার নিয়ে বসি, আর ডেনভার বিরাট গোলাকার কক্ষের এপাশে-ওপাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে। হলকামরাটা 'কোঁকড়া-চুল' কিউবান আর নানা ধরনের 'খয়েরি চুল' দক্ষিণ আমেরিকানে ভরা, আর সিগারেটের ধোঁয়াতে আবহাওয়াটাই আন্তর্জাতিক। হীরা আংটির দ্যুতি আর রসুনে গন্ধ নিঃশ্বাসে ভরা।।

'ডেনভার গ্যালওয়ে সত্যিই চোখের পক্ষে এক স্বস্তি। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, লাল চুল, টাটকা পার্চ মাছের মতো গোলাপি কানের ডগা। আর কী ঠাটবাট! সৌজন্য জানাবার ভঙ্গি দেখলে অবধারিত ভাবে আপনার মনে হবে সেন্ট জেমসের দরবার, চন্সি ওলকট, কেন্টাকির কর্নেলরা আর 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো' অপেরার কথা। সে একটা আঙুল তুললে হোটেলের মোট-বাহক আর বেলবয়দের দেখা যাবে আরশোলার মতো স্কেটিং করে মেঝের ওপর ছুটত, আর ডেস্কের পেছনের

কেরানিটাও ধরবে বংশবদ বিনয়ী মূর্তি।

'ডেনভার ঘুরছে ফিরছে, অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করে দু'একটা স্প্যানিশ শব্দ যা জানত তাই ঝাড়ছে, যেন তৈরি হচ্ছে রাজাভিষেকের জন্য অথবা টেক্সাসের ব্রায়ান মহোৎসবের জন্য।'

'ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটির ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম যেমন ও আমায় বলেছিল। একটি বেঁটেখাটো বিদেশী মানুষ, ডবল ব্রেস্ট ফ্রককোট পরা, চেষ্টা করছে আঙুলের ডগা দিয়ে মেঝে ছুঁতে। ছাগুলে বাদামি রঙ, মেহগিনি কাঠের চিলতের মতো জুলফি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয় আর এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ডেনভারের দিকেই। চোখের মধ্যে বিস্ময় আর তারিফের চিহ্ন, যেমন আমরা বাচ্চা ছেলেদের মুখে দেখি সেরা বেস্ বলের খেলোয়াড়ের খেলা দেখবার সময়।

'ডেনভারের চক্কোর শেষ হলে সে আমায় তার প্রাইভেট দপ্তরে নিয়ে গেল।'

'প্রশ্ন করল, "তোমাকে যে কালো লোকটার ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম, তার সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য ?"

'বললাম, "তোমাকে সে বিরাট কেউকেটা বলে যে নজরে দেখে তাতে তো তোমার প্রাপ্য হওয়া উচিত সেরা হলঘরে ন'খানা কামরা, স্নানঘর, পয়লা অক্টোবর অবধি ভাড়া ফ্রি।"

"তুমি ঠিকই ধরেছ ব্যাপারটা", ডেনভার বললে, "আমি ওঁকে জাদুকরের মুঠির মধ্যে ধরেছি, চক্রান্তকারীর চোখ দিয়েছি। তোমার এই অধমের দেহ থেকে যে জ্যোতি বের হয় তা নর্থ রিভারের কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করেছে ওঁকে। মনে হয় উনি ভাবেন সেনর গ্যালওয়েই সেই একমাত্র মানুষ। ওর কাছেপিঠেও কেউ নর্তন-কুর্দন করতে আসবে না আন্দাজ করি। এবার সালি, তোমায় যদি প্রশ্ন করি, ওই ক্ষুদে মানুষটা আসলে কী, তার জবাব দিতে পারবে ?"

'বললাম, "কেন, কোণের ওই নাপিতখানার নাপিত, আর যদি রাজবংশের কেউ হয় তো 'বুট পালিশ'দের রাজা"।

"কক্ষনো চেহারা দেখে কারুর বিচার করবে না," বললে ডেনভার, "উনি দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রজাতন্ত্রের কলঙ্কিত প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী।"

"বেশ, কিন্তু আমার কাছে তেমন খারাপ লোক মনে হল না।"

'তখন ডেনভার তার চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে নিজের পরিকল্পনাটা শোনায়।

'গুরুত্ব আর লঘুতা, দুটোই মিশিয়ে সে বলে, "সালি, গত কুড়ি বছর ধরে আমি হয়-এটা, নয়-ওটার ম্যানেজার। ওইভাবেই গড়ে উঠেছি আমি— একজনকে ধরে বসাই টাকা খাটাতে, জোড়াতোড়া মেরামত করতে, পুলিশ আর ট্যাক্সের ব্যাপারগুলো দেখতে, আর আমি নিজে চালাই কারবার। জীবনে কখনো নিজের গাঁটের পয়সা কোথাও খাটাইনি। কিন্তু আমি অন্য লোকদের কর্মচারীদের খাটাতে আর অন্যদের ব্যবসা চালিয়ে দিতে পারি। আমার একটা উচ্চাকাঙ্খা ছিল কোনো

বিশাল কিছুতে হাত লাগবার- যা হোটেল, কাঠের কারখানা বা স্থানীয় রাজনীতির চেয়েও অনেক উচ্চমার্গের। আমি চাই উন্নতির পথের একটা কিছুর ম্যানেজার হতে- যেমন ধর, রেলপথ বা হীরার খনির স্বত্ব, অথবা কোনো মোটরগাড়ির কারখানা। তারপর এবার এলেন গ্রীষ্মমণ্ডল দেশের এই ক্ষুদে ভদ্রলোক - ঠিক আমি যা চাই তাই নিয়ে, আমার কোলে ছুঁড়ে দিলেন কাজের ভারটা।"

'"কী কাজ?" জিজ্ঞেস করি, "সে কি জর্জিয়ার 'চারণ কবি' দল পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছে, না কি একটা চুরুটের দোকান খুলবে?"

'কঠোরভাবেই বলে ডেনভার, "উনি কোনো ওদেশী ভোঁদর নন, উনি হলেন জেনারেল রম্পিরো—জেনারেল জোসি আলফনসো সাপোলিও জু-অ্যান রম্পিরো—টেলিগ্রাফ যন্ত্রে তাঁর কার্ড ছাপানো হয়। খাঁটি বস্তু, সালি! আর তিনি চান তাঁর নির্বাচন অভিযান আমি পরিচালনা করি - ডেনভার সি গ্যালওয়েকে তিনি চান রাষ্ট্রপতি-স্রষ্টা হিসেবে। চিন্তা করে দেখ সালি! বুড়ো ডেনভার লাফাতে লাফাতে ক্রান্তি এলাকায় যাবে, এক হাতে পদ্মফুল আর আনারস তুলবে, অন্য হাতে প্রেসিডেন্টদের তৈরি করে বসাবে! এতেও কি আক্কেল মার্ক হ্যানা পাগল হয়ে যাবেন না? আর আমি চাই যে তুমিও চল, সালি। আমার জানা যে-কোনো লোকের চেয়ে তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারবে বেশি। ওই বাদামি লোকটাকে একমাস ধরে হোটেলে আটকে রেখেছি যাতে চক্কোর কাটতে গিয়ে চোদ্দ নম্বর রাস্তার কাছাকাছি না যান, আর সেখানকার ওই উদ্বাস্তু টামালে-খোরগুলোর পাল্লায় না পড়েন। এবার তাঁকে টোপ গিলিয়েছি, এখন জেনারেল জে.এ.এস্.জে রম্পিরোর ম্যানেজার ডি.সি.জি., তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদপার্থী করবে সেই বিরাট প্রজাতন্ত্রের... কী যেন নামটা?"

'ডেনভোর আলমারি থেকে একটা মানচিত্র বই আনে, আমরা দু'জন "আক্রান্ত" দেশটিকে দেখি। পশ্চিম মহাসাগর তীরে সেটা একটা ঘন নীল জায়গা, ডাক টিকেটের মাপের।

'ডেনভার বলে, "জেনারেল যা বলছেন, আর বিশ্বকোষ থেকে যা পেয়েছি, আর অ্যাস্টর লাইব্রেরির দারোয়ানের কথায় যা বুঝেছি, ওদেশের ভোট চালনা করা হবে অতি সহজ কাজ, রাম যেমন শ্যামকে অনায়াসেই স্বেচ্ছাসেবক দলে ঢোকাতে পারে।"

'আমি বলি, "জেনারেল রাম্প্টিরো কেন নিজের দেশে থেকেই নিজের পটচিত্র ম্যানেজ করছেন না?"

'ডেনভার চুরুটগুরো বের করে বলে, "তুমি দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতিটাই বোঝো না। ওটা হল এই রকম। জেনারেল রম্পিরোর দুর্ভাগ্য হয়েছিল একজন জনপ্রিয় নেত্র হবার। ফৌজকে চালিয়ে নিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন দু'জন নাবিককে তাড়া করে... যারা প্লাজাতে চুরিচামারি করেছিল- কিছু ছাইপাঁশ

কি গভর্নমেন্টের কোনো সম্পত্তি। জনতা তাঁকে বীরনায়ক আখ্যা দিল, আর গভর্নমেন্ট হল ঈর্ষায় কাতর। রাষ্ট্রপতি পাবলিক-অট্টালিকা বিভাগের প্রধানকে ডাকলেন। বললেন, একটা চমৎকার পরিচ্ছন্ন পোড়া-ইটের দেয়াল খুঁজে বের কর, আর সিনর রম্‌পিরোকে দাঁড় করাও তার সামনে। তারপর একদল সেপাই নিয়ে যাও, আর তারপর তাকে দেয়ালের গায়েই—। এই রকম কিছু, যেমন ওরা আমাদের দেশে হব্‌সন আর ক্যারি নেশনকে নিয়ে করেছে। অতএব জেনারেলকে পালাতে হল। কিন্তু ওঁর মগজে এটা ছিল যে ওঁর নোটের তাড়াগুলোও আনা দরকার। ওঁর এত টাকা রয়েছে যা দিয়ে যুদ্ধ-জাহাজ কেনা যায়, নামকরণের দিনে জলে ভাসানো হবে।"

"প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা তার কতটা?"

'"এই তোমাকে ওঁর বাজার-দরটা জানিয়ে দিলাম না? ওঁর দেশ দক্ষিণ আমেরিকার গোনাগাথা দেশগুলোর একটা, যেখানে জনসাধারণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জেনারেল এখনই সেখানে যেতে পারবেন না। দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে গুলি খেলে ব্যাথা লাগে। তাঁর একজন নির্বাচনী কাজের ম্যানেজার চাই যে ওখানে গিয়ে সব জোগাড়যন্ত্র করে রাখবে - স্বেচ্ছাসেবকদের লাইনে দাঁড় করাবে, নতুন দু-ডলারের নোটগুলো ছড়াবে, শিশুদের চুমু খাবে আর কলকাঠি রাখবে চালু অবস্থায়। সালি, আমি গর্ব করতে চাই না, কিন্তু তোমার মনে আছে কেমন করে আমি তারের তলা থেকে কাফলিনকে টেনে আনলাম ঊনবিংশ সেনেটসভার নেতা হিসেবে? আমাদের জেলা ছিল সবার আগে। ওই রকম-একটা ক্ষুদে বাঁদর-খাঁচার দেশ ম্যানেজ করতে পারি তা তুমি ধারণা করতে পারছ না? কেন, যত টাকা জেনারেল ঢালতে রাজি, তা দিয়ে আমি দু'পোচ্ আরো ব্ল্যাক জাপান চড়িয়ে ওঁকে জর্জিয়ার গভর্নর পর্যন্ত করে দিতে পারি! সালি, পৃথিবীর সেরা নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ম্যানেজাররা আছেন নিউইয়র্কেই। আমি যেন গুমোর দেখাচ্ছি এমনিভাবেই তুমি সন্দেহ প্রকাশ করছ আমার মুরোদে—যেন এমন একটা ক্ষুদে দেশের রাজনীতির খেলায় হাতই গলাতে পারি না, যার শহরের নামগুলো ছাপা মানচিত্রে চল্লিশ মাইল সমুদ্দুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে!"

'আমি খানিকক্ষণ তর্ক করি ডেনভারের সঙ্গে। আমি তাকে বলি ওই ক্রান্তিমণ্ডলের গোলার্ধে রাজনীতির রকমসকম ঊনবিংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলার রাজনীতি থেকে আলাদা হতে বাধ্য। তাহলে তো আমিও উত্তর ডাকোটা থেকে কংগ্রেসম্যান হয়ে একটা বাতি-ঘর আর উপকূল জরিপের খরচা বের করতে চেষ্টা করতাম। ডেনভারের উচ্চাশা ম্যানেজারির লাইনেই, তাই আমার বক্তৃতায় কোনো কাজ হল না। ডেনভার বললে, "আমি তোমায় যাবার জন্য তৈরি হতে তিনদিন সময় দিচ্ছি, আর কাল জেনারেল রমপিরোর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব, যাতে তাঁর নিজের মুখ থেকেই জানতে পার সমস্ত মতলবটা।"

'পরদিন আমি আমার সেরা স্বাগত সম্মান জানালাম তাকে, বুকার ওয়াশিংটনী

কায়দায়। প্রসিদ্ধ রবার গাছ কতটা কী জানে তা খুঁচিয়ে বের করতে হবে।

'জেনারেল রমপিরোকে বাইরে থেকে যেমন দেখায় ভেতরে কিন্তু অতটা বিষাদ নীরস নয়। যথেষ্টই বিনয়ী, আর এমন নানা শব্দে কথা বলে যে শ্রোতা নিজের ভাষাই গুছিয়ে বলতে গদদ্‌ঘর্ম হয়। ইংরাজিতে বলাই তার লক্ষ্য, আর যখন তার বাক্যবিন্যাসের ধারা আপনার মন অবধি পৌঁছবে ততক্ষণে তা আপনার বোঝার অগম্য থাকবে না। আপনি যদি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত কলেজ অধ্যাপকের রচনা, আর হারানো শার্টের বাবদ চীনা লণ্ড্রিওয়ালার ব্যাখ্যা একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, তাহলে কতকটা ধারণা পাবেন জেনারেলের বক্তব্যের। সে তার রক্তক্ষয়ী দেশের সব অবস্থাই জানাল, আর ডাক্তার এসে পড়ার আগে ওরা সে ব্যাপারে কী করতে চেষ্টা করছে তাও বলল। কিন্তু বেশির ভাগ কথাই বলল ডেনভার সি, গ্যালওয়ে সম্পর্কে।

'বললে, "আঃ সেনর, উনি হলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে 'ফাইন'! অমন 'ম্যাগ্নিফিকো', অমন 'গ-র্-র্যাণ্ড' একটি লোককে কখনো দেখিনি, এমন চট্‌পট অন্যদের দিয়ে কাজ করাতে ওস্তাদ। অন্য লোকদের দিয়ে কাজ করাবেন, আর হুকুম দেবেন, সাজিয়ে দেবেন, যতক্ষণ না আচম্‌কা দেখব কাজ সমাপ্ত। হ্যাঁ সেনর। আমার দেশে তেমন মানুষই নেই যে এত্ত বড়, এত্ত ভাল কথা বলে, এমন শ্রদ্ধা ভরে, জোর যুক্তি দিয়ে কথা বলে। আঃ এই হলেন সেনর গ্যালওয়ে!"

'বলি, "হ্যাঁ যেমন লোকটি আপনি চান তেমনই আমাদের ডেনভার। এখানে সব রকম কারবার সে ম্যানেজ করেছে একমাত্র সেপাই-ডাকাতি ছাড়া, এবার বোধহয় তালিকাটা সম্পূর্ণ করবে।"

"তিন দিন পেরোবার আগেই আমি স্থির করি ডেনভারে নির্বাচনী অভিযানে যোগ দেব। ডেনভার তার হোটেল মালিকের কাছ থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়েছে। এক হপ্তা আমরা জেনারেলের সঙ্গে এক কামরায় রইলাম। তার নানা আওয়াজের মধ্যে থেকে তার দেশ সম্পর্কে সব রকম খোঁজ-খবর পেয়ে গেলাম। যখন যাত্রার জন্য তৈরি হলাম, ডেনভারের পকেটে দিস্তে ধরা চিরকুট, বন্ধুদের কাছে লেখা জেনারেলের চিঠি, আর অনুরক্ত রাজনীতিক যারা নির্বাসিত জনপ্রিয় নায়ককে তুলে ধরবে, তাদের নাম-ধামের তালিকা। এই সব দেনার ব্যাপার ছাড়া আমরা পাওনা গণ্ডা নিয়ে যাচ্ছি নগদ কুড়ি হাজার পাউণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রের নানা কারেন্সিতে। জেনারেল রমপিরোকে দেখাচ্ছে পোড়া কুশপুত্তলির মতো, কিন্তু ব্যাপারটা যখন রাজনীতির বাস্তব বিজ্ঞানে এসে ঠেকেছে তখন তাকে "ব্রের ফক্সই" বলা যায়।

'জেনারেল বললে, "এতে টাকা আছে সামান্য অঙ্কের। আমার নিজের কাছে অবশ্য আরো বেশি আছে - 'মুচো'! আপনাদের প্রচুর টাকা সরবরাহ করা হবে, সেনর গ্যালওয়ে, যতবারই আপনাদের দরকার হবে ততবারই পাঠাব। আমি ইলেক্‌ট্ হবার জন্য দিতে চাইব- পঞ্চাশ, একশো হাজার পেসো, যদি প্রয়োজন হয়।

কেন নয়? সাক্রামেন্টো! যদি প্রেসিডেন্ট হই, এক বছরের মধ্যে এক মিলিয়ন ডলার না বানাতে পারি তো আমার পেছনে লাথি মারবেন! -ভগবানের দিব্যি!"

'ডেনভার এক কিউবান চুরুট-নির্মাতাকে ধরে সাংকেতিক অক্ষরে ইংরেজি ও স্প্যানিশ শব্দের একটা ছোট লিপিমালা তৈরি করাল, তার একটা কপি দিল জেনারেলকে, যাতে আমরা নির্বাচনের বুলেটিন "তার" করে তাকে জানাতে পারি, দরকারমত আরো টাকা চাইতে পারি। তারপর আমরা প্রস্তুত হলাম যাত্রার জন্য। জেনারেল রমপিরো আমাদের সঙ্গে স্টীমার অবধি গেল। জেটিতে দাঁড়িয়ে ডেনভারের কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁদল। বলল, "মহৎ মানুষ। জেনারেল রমপিরো তার আস্থা আর ভরসা অর্পণ করছে আপনার ওপর। সাধুসন্তদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যান, আপনার বন্ধুর কাজটা সুসম্পন্ন করুন— স্বাধীনতার জয় হোক্"।

'ডেনভার বললে, "নিশ্চয়, দেদার অধিকার, শস্তা অপেরা আর পদ্মমধু দেশের অমৃত আর আমাদের ভোট বেঁচে থাক্। চিন্তা করবেন না জেনারেল। কলা যেমন উল্টো হয়ে ফলে তেমনি নির্ঘাত জিতে যাবেন।"

'জেনারেল আবেদন জানান, "আমার ওপর ছবি বানাবেন, যখন প্রয়োজন বুঝবেন, টাকার জন্য আমার ওপর ছবি বানাবেন।"

'চোখ কুঁচকে ডেনভার জিজ্ঞেস করে, "উল্‌কি বানাতে চাইছে নাকি, কী মনে হয় তোমার?"

"নির্বোধ!" বলি আমি, "উনি চান নির্বাচনের খরচের জন্য ওঁর ওপর চেক কাটবে। সেটা উল্কির চেয়েও বিশ্রি হবে- অনেকটা ওর ময়না তদন্তের মতো।"

'আমি আর ডেনভার জাহাজে চড়ে চলে গেলাম পানামা, তারপর যোজকটা হেঁটে আর গাড়িতে পার হয়ে ফের জাহাজে ধরি। জেনারেলের দেশের উপকূলে এসাপিরিটু শহরে পৌঁছে গেলাম।

'এই এক শহর যেখানে নাট্যকার কূটনীতিক জে. হাওয়ার্ড পেইনকে পাঠাতে হয় হাউ-হাউ করার জন্য। কেমন করে কাউকে জায়গাটা পছন্দ করাবেন তা বলছি এবার। এক গাদা ফিলিপিনো কুঁড়ে ঘর আর শ'দুয়েক ইটের ভাঁটা সাজিয়ে দিন একটা কবরখানার মধ্যে চৌকো চৌকো করে। অ্যাস্টর হোটেল আর ভ্যাণ্ডারবিল্‌টোর গ্রীণহাউস থেকে যত রক্ষিত গাছপালা, গাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দিন যেখানেই খালি জায়গা পাবেন। রাস্তায় ছেড়ে দিন বেলভিউয়ের সব রোগীদের, নাপিত সংঘের লোকদের, আর টাস্কেগী স্কুলের বাচ্চাদের। ছায়ার মধ্যেই তাপমান যন্ত্র চড়িয়ে দিন ১২০ ডিগ্রিতে। পেছন দিকে রকি পাহাড়ের একটা অংশ বসান আর বৃষ্টি হতে দিন। জানুয়ারির মাঝেই গোটা 'রক্অ্যাওয়ে' সৈকতের ব্যবসাটা বসিয়ে দিন- তাহলে পাবেন এস্‌পিরিটুর একটা মোটামুটি ভাল নকল।

'এখানকার জলহাওয়ায় ধাতস্ত হতে আমার আর ডেনভারের লেগে যায় হপ্তা খানেক। জেনারেল যে চিঠিগুলো দিয়েছিল তা বিলোতে শুরু করে ডেনভার।

বাকি দলবলকে-খবর দেয় ক্যাপ্টেনের দপ্তরে কিছু একটা ঘটছে। আমরা সদর দপ্তর বসিয়েছি পাশ গলির এক পুরনো ইটের বাড়িতে যেখানে ঘাসগুলো কোমর সমান উঁচু। আর মাত্র চার সপ্তাহ বাদেই নির্বাচন, কিন্তু কোনো উত্তেজনা নেই। প্রেসিডেন্টের পদে দেশীয় প্রার্থীর নাম রোডরিকিস্। ওহায়োর ক্লিভল্যাণ্ড যেমন আর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নয়, ঠিক তেমনি এই শহর এস্‌পিরিটুও আর রাজধানী নয় এ রাজ্যের, কিন্তু এই শহর রাজনীতির কেন্দ্র, যেখানে বিদ্রোহ বিপ্লব পাকানো হয়, আর নেতাদের তালিকা বানানো হয়।

'সপ্তাহের শেষে ডেনভার জানাল, কলকব্জা চালু হয়ে গেছে। "সালি, আমরা যে না লড়েই জিতে যাচ্ছি! জেনারেল রমপিরো তো স্বশরীরে হাজির নেই 'ডন জুয়ানের' মতো, তাই অন্য দলের লোক কাজই করছে না। ওরা পাদ্রির প্রার্থনার সময় উপনিবেশ-প্রতিনিধির মতো একেবারে উদাসীন। এবাব আমরা নির্বাচনের কাজে কিছু গরম ব্যাপার করতে যাচ্ছি, ভোটের সময় ওদের তাজ্জব করে দেব।"

"সেটা কী ভাবে করবে?" জিজ্ঞেস করি আমি।

'ডেনভার অবাক হয়ে বলে, "কেন, বরাবরের মতোই! আমরা প্রতি রাতে আমাদের পক্ষের বক্তাদের ধরে আনব দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা দেবার জন্য, তালবনের নিচে মশাল মিছিল করব, শস্তা মদ, আর অবশ্যই সমস্ত বাজনদার দলকে কিনে ফেলব, আর— যাক, শিশুদের চুমু খাবার ব্যাপারটা তোমার ওপর সালি, -আমি ওদের অনেকগুলোকে দেখে নিয়েছি।"

"এছাড়া আর কী?" বললাম আমি।

"কেন, তুমি তো জান- ওঁচা লোকগুলোকে কড়কড়ে দু'ডলার নোট দিয়ে টেনে আনব, কয়লার কার্ড দেব, মুদির জিনিসপত্রের অর্ডার দেব, আর বটগাছগুলোর তলায় দুটো পিকনিক, দমকলের হলঘরে নাচ- আর সব বাঁধা ধরা ব্যাপার। কিন্তু প্রথম কাজ হল সমুদ্রের তীরে একটা জবরদস্ত চিংড়ি-পোড়ানো উৎসব, যেমনটি মকরক্রান্তির দক্ষিণে কেউ আজ অবধি দেখেনি। শুরু থেকেই সেটা ভেবে রেখেছিলাম। গোটা শহর আর আশপাশের জঙ্গলের বাসিন্দাদের পেট পুরে চিংড়ি গুগলি খাওয়াব। ওটা হল কর্মসূচীর পয়লা জিনিস। তুমি বোধহয় এখনি গিয়ে ওটার বন্দোবস্ত করতে পার, কী বল! আমি একটু খতিয়ে দেখি উপকূল জেলাগুলোতে ভোটের জন্য কী হিসেব করে রেখেছেন জেনারেল।"

'মেক্সিকোতে কিছু স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলাম, তাই ডেনভারের কথামতো বাইরে বেরোই, আর পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে আসি সদর-দপ্তরে।

"এদেশে যদি চিংড়ি গুগলি থাকেও তা কেউ কোনোদিন চোখে দ্যাখেনি," বললাম আমি।

'চোখ আর মুখ বড় করে ডেনভার বলে, 'সে কী আশ্চর্য কথা! চিংড়ি গুগলি নেই? কেমন করে- কে এমন দেশ দেখেছে যেখানে চিংড়ি গুগলি নেই? কী

ধরনের- কেমন করে নির্বাচন কাজ চলবে গুগলি পোড়া না হলে? বলত আমায়? তুমি নিশ্চিত ওখানে কোনো চিংড়ি গুগলি নেই।"

"একখানা গামলাও নেই।"

"তা হলে ঈশ্বরের দোহাই আরেকবার গিয়ে দেখে এস এখানকার লোক কী খায়। যা হোক কোনো খাবার দিয়ে এদের পেট ভরাতে হবে তো।"

'আবার গেলাম। সালিই তো ম্যানেজার। আধঘন্টা বাদে ফিরে আসি। বলি, "ওরা তো খায় ওমলেট, ট্যাপিওকা রুটি, রসুন দেওয়া মাংস, মুরগি-ভাত, জাপাটে, ইউকা, মাছের-ডিম ভাজা।"

'ডেনভার যেন পাগল হয়ে গেছে, বলে "যে লোক ওসব জিনিস খায় তার ভোট চ্যালেঞ্জ করা উচিত। শোনায় যেন চীনা চপ-স্যুই আর সেনেটর হ্যানার মাংস-কিমার খিচুড়ির মতো।"

'কয়েকদিনের মধ্যে অন্য শহরগুলো নির্বাচনী-অভিযান ম্যানেজাররা গুটিগুটি এসে পড়তে লাগল এসপিরিটুতে। আমাদের সদর দপ্তর একটা ব্যস্তসমস্ত জায়গা হয়ে দাঁড়াল। আমাদের এক দোভাষী রয়েছে, বরফ জল রয়েছে, তা ছাড়া পানীয়, চুরুট। ডেনভারও এত ঘন ঘন জেনারেলের টাকা ওড়াতে লাগল যে পরিমাণটা কমে-কমে যা দাঁড়াল তা দিয়ে ওহায়োর কোনো রিপাবলিকান ভোটও কিনতে পারতেন না আপনি।

'তারপর একদিন ডেনভার আরো দশ হাজার চেয়ে জেনারেল রম্‌পিরোকে তার করল, আর পেলও টাকাটা।

'এস্‌পিরিটুতে কিছু সংখ্যায় আমেরিকানও ছিল, তবে তারা সবাই হয় ব্যবসায় নয়তো কোনো ধরনের ঘুষ দিয়ে কাজ বাগাবার চেষ্টায় ব্যস্ত, রাজনীতির ব্যাপারে তারা হাত বাড়ায় না, এবং সেটাই ওদের যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয়। কিন্তু ওরা আমাকে আর ডেনভারকে বেশ তরিবৎ অবস্থায় রাখল, এমন বন্দোবস্ত করে দিল যাতে আমরা ভাল ভাল খাদ্য আর পানীয় পেতে পারি। একজন আমেরিকান ছিল যার নাম হিক্‌স্‌, যে প্রায়ই আসত আর সদর দপ্তরে ঘোরাফেরা করত। হিক্‌সের এই চোদ্দ বছর হল এস্‌পিরিটুতে। লম্বায় ছ'ফুট চার, ওজনে ১৩৫ পাউণ্ড। ওর ব্যবসার লাইন হল কোকো; আর তট-এলাকার জ্বর আর জলবায়ু তার পুরো জীবনটাই প্রায় শেষ করে দিয়েছে। লোকে বলে সে নাকি গত আট বছরে একটিবারও হাসেনি। মুখখানা তিন ফুট লম্বা, কক্ষনো নড়ে না- এক শুধু কুইনিন খাব্যর জন্য যখন মুখ খুলতে হয় তখন ছাড়া। সে এসে আমাদের সদর দপ্তরে বসত, মাছি মারত আর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে কথা বলত।

'একদিন হিক্‌স্‌ বললে, "রাজনীতির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই আমার। কিন্তু এটাই শুধু জানতে চাইছি তোমরা এখানে এসে কী করবার চেষ্টা করছ, গ্যালওয়ে?"

'ডেনভার বললে, "আমরা অবশ্য লোকের সামনে জেনারেল রম্‌পিরোকে উঁচুতে তুলে ধরেছি। আমরা তাঁকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। আমি তাঁর ম্যানেজার।"

'হিক্‌স বললে, "বেশ, তবে তোমার জায়গায় আমি হলে, এব্যাপারে একটু ধীরেসুস্থে এগোতাম। তোমাদের সামনে তো লম্বা সময় পড়ে রয়েছে, বুঝলে না?"

"আমার প্রয়োজনের তুলনায় দেরি তো একেবারেই নেই।" বললে ডেনভার।

'ডেনভার এগিয়ে চলল তার কাজ নিয়ে, সব কিছু মসৃণভাবে ব্যবস্থা করতে হয়। অনুচরদের নিঃশব্দে টাকা গুনে দেয়, তবু তারা বারবারই আসে। শহরের প্রত্যেকের জন্য মাগ্‌না শরাব, প্রতিরাতে ব্যাণ্ডের বাজনা, আর বাজি পোড়ানো। অনেক দালাল জুটেছে যারা দিনরাত ঘুরে ঘুরে ভোট কেনার ব্যবস্থা করে। এস্‌পিবিটুতে এ এক নতুন কায়দার রাজনীতি, সবাই পছন্দ করছে।

'নির্বাচনের তারিক স্থির করা হয়েছিল চৌঠা নভেম্বর। আর আগের রাতে আমি আর ডেনভার সদর দপ্তরে বসে পাইপ টানছি এমন সময় এল হিক্‌স। শরীরের সব সন্ধি খুলে গা এলিয়ে দিল চেয়ারে, খুব ফুর্তির মেজাজ নিয়ে। ডেনভারও খুশ-তবিয়ত আর আত্মস্থ। বললে, "রমপিরো তো লাফিয়ে লাফিয়ে জিতবেন। আমরা দশ হাজার ভোট পেয়ে গদি দখল করছি। এখন শুধু জিন্দাবাদ বলাই বাকি। কালকেই সব জানা যাবে।'

"কাল আমার কী ঘটতে যাচ্ছে?" জিজ্ঞেস করে হিক্‌স।

'ডেনভার জবাব দেয়, "কেন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অবশ্যই।"

"হে!" —কেমন মজার দেখায় হিকসকে— "কেউ কি তোমাদের বলেনি যে তোমরা এখানে আসার এক হপ্তা আগেই সে নির্বাচন হয়ে গেছে? কংগ্রেস সভা তারিখটা বদলে জুলাই সাতাশ করে দিয়েছিল। সতের হাজার ভোটে রোডরিকিস্ নির্বাচিত হয়। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা বুড়ো রম্‌পিরোকে আজ থেকে দু'বছর বাদে পরের মেয়াদের জন্য আকাশে তুলছ। তাই তো অবাক হচ্ছিলাম এত সময় থাকতে এখন থেকেই এত তাড়াহুড়ো করছ কেন!"

'আমার মুখ থেকে পাইপখানা মেঝেতে পড়ে গেল। ডেনভার তার পাইপের গোড়াটাই চিবিয়ে ফেলল। দু'জনেব কারুর মুখে কথা নেই।

'আর তারপরই শুনলাম একটা শব্দ, কেউ যেন আমাদের চালা ঘরের একটা তক্তা ভেঙে নামিয়ে দিল। ওটা হিক্‌সের বিকট হাসির শব্দ, আট বছর পর এই প্রথম।'

ওয়েটার এসে যখন কাপে কালো কফি ঢেলে দিচ্ছে, তখন চুপ করল সালি ম্যাগুন।

বললাম, 'তোমর বন্ধুটি সত্যিই ম্যানেজারের মতো কিছু বটে!'

'এক মিনিট সবুর', বললে সালি, 'আমি তো বলিইনি- এখনো তার কতটুকু

করার ক্ষমতা। এখন সে-সব শুনবে।

'আমরা যখন নিউইর্য়কে ফিরলাম, জেনারেল রমপিরো আমাদের জন্য জেটিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। দারচিনি-রং ভালুকের মতো লম্ফঝম্প করছে, খবর শুনবার জন্য অধৈর্য, কারণ ডেনভার শুধু আমাদের আসার সংবাদটাই 'তার' করে জানিয়েছে, তার চেয়ে এক বর্ণ বেশি নয়।

'চেঁচিয়ে উঠল, "আমি জিতে গেছি? বন্ধু আমার, বল নির্বাচিত হয়েছি? আমার স্বদেশ কি জেনারেল রমপিরোকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দাবি করেছে? শেষের বার তো আমি আমার শেষ ডলারটাও পাঠালাম তোমাকে। আমি নির্বাচিত হব সেটাই 'নেসেসারিও'। আর যে টাকা নেই আমার। সেনর গ্যালওয়ে, বল আমি ভোটে বিজয়ী!"

'ডেনভার আমার দিকে ফেরে। বলে:

"সালি, আমায় একটু বুড়ো রমপির সঙ্গে একা ছেড়ে দাও। সব ধীরে ধীরে ফাঁস করতে হবে ওর কাছে। অন্য চোখ অস্ত্রোপচারটা দেখলে সেটা হবে অসভ্যতা স্যালি, এটাই হল সেই সময়"— বলল সে, —"যখন বুড়ো ডেনভারকে বিনোদনকারী, মিষ্টভাষী ঐন্দ্রজালিকের কেরামতি দিয়ে উসুল করতে হবে সব কিছু— নয়তো সে জীবনে যতো পদক পেয়েছে সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।"

'এর দু'দিন বাদে গেলাম হোটেলের মধ্যে। ডেনভার তার পুরনো জায়গাতেই বসে আছে- দুটো ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়কের মতো, আর ওদের শোনাচ্ছে ফ্লোরিডাতে ওর কমলালেবু-বাগিচায় কী আনন্দেই কাটিয়েছিল ক'টা দিন।'

"জেনারেলের ব্যাপারটা সামলে নিয়েছিলে ঠিক মতো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"শুধু সামলে? এসে দ্যাখোই না একবার।"

'সে আমাকে কাঁধ ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় ডাইনিং কামরার দরজার দিকে। ড্রেস স্যুটপরা একটি বেঁটেখাটো খয়ের-বাদামি মোটা লোককে দেখলাম- মেঝের ওপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে সে। জেনারেল রমপিরোকে ব্রানসউইকের হেড ওয়েটার যদি না বানিয়ে থাকে ডেনভার, তাহলে আমার নামই পাল্টে দেব!'

মিঃ ম্যাগুন তার কাহিনী শেষ করতে আমি প্রশ্ন করলাম, 'মিঃ গ্যালওয়ে কি এখনো ম্যানেজারির কাজে আছে?'

সালি মাথা নাড়ল।

'ডেনভার এক সোনালি হলদে চুলওয়ালা বিধবাকে বিয়ে করেছে যিনি হারলেমের একটা বড় হোটেলের মালিক। একটু কাজকর্ম দেখিয়ে-টেখিয়ে দেয় আর কি!'

On Behalf of the Management, এভরিবডি'স ১৯০৪

ম্যাডিসন স্কোয়ারের চড়ুইপাখিরা

অর্থাভাবে পীড়িত কোনো যুবক যদি নিউইয়র্ক সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তাকে শুধু একটা কাজই করতে হবে- অবশ্য যদি সে আগে থেকেই নিজের বিষয়টা সতর্ক ভাবে অধ্যয়ন করে রাখে। তাকে সিধে চলে যেতে হবে ম্যাডিসন স্কোয়ারে, ওখানকার চড়ুইপাখিগুলো নিয়ে একটা রচনা লিখে তা 'দৈনিক সানের' দপ্তরে বিক্রি করতে হবে পনের ডলারে।

এই জনপ্রিয় বিষয়টি নিয়ে কোনো উপন্যাস বা গল্পের কথা তো আমার মনেই পড়ে না যার তরুণ লেখক গ্রাম থেকে শহরে এসে কলমের জোরে খ্যাতি আর অর্থ উপার্জন না করেছেন - ঠিক এই পদ্ধতি ধরে। অর্থাৎ তার গল্পের নায়ক এই পথ ধরেই শুরু করেছে। কোনো গ্রন্থকার, চমকদার মৌলিক প্লট খুঁজতে গিয়ে যদি তার নায়ককে নিয়ে বিষয়টিই না লেখার কথা ভাবেন, তা হলে সেটা তাজ্জবের কথা হবে— যেমন 'ইউনিয়ন স্কোয়ারের' নীলকণ্ঠ পাখি নিয়ে রচনা "হোরাল্ড" পত্রিকায় বিক্রি হতে পারে। তবে এই শহুরে উপন্যাসগুলোর ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে দেখি বিপুল পরিমাণে রচনা এই চড়ুইপাখি আর সাবেকি গার্ডেন স্কোয়ার নিয়েই; তা ছাড়া 'সান' পত্রিকাও হরদম চেক্ লিখে চলে।

অবশ্য এটা অনায়াসেই বোধগম্য কেন এক স্ফূটনোন্মুখ লেখকের প্রথম শহুরে প্রয়াস এখানে সর্বদাই সাফল্যের মুখ দেখে। একটা অত্যন্ত প্রযত্নকর কাজ যে প্রয়োজনের তাগিদেই শিখে নিয়েছে সে, গর্জায়মান নগরীর লোহা, পাথর আর মার্বেলের মধ্যে সে এই ক্ষুদ্র জায়গাটি পেয়েছে পাখির গান, সবুজ ঘাস আর গাছে ভরা; তার স্বভাবের প্রতিটি কোমল অনুভূতি বেদনা-মধুর লড়াই করে ঘর-মুখো কাতরতার সঙ্গে; পাখিরা কিচির মিচির করে, গাছ ডালপালা ছড়ায়, ভুলে যেতে হয় চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ। যখন সে লেখে তার আত্মা স্থান নেয় কলমে—আর সে পনের ডলারে ওটা 'সান' পত্রিকাকে বেচে।

এই রেওয়াজটার কথা আমি পড়েছিলাম নিউইয়র্কে আসার বহু বছর আগেই। যখন আমার বন্ধুরা তাদের জোরালো যুক্তি দিয়ে আমাকে নিবৃত্তি করার চেষ্টা করেছিল, আমি শুধু প্রশান্ত বদনে হেসেছি। ওরা তো আর সেই চড়ুই পাখির "কলটি" জানে না যা আমি আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি।

যখন নিউইয়র্কে এসে নামলাম, ফেরিঘাট থেকে গাড়ি আমায় সোজা পৌঁছে দিল তেইশ নম্বর রাস্তা ধরে ম্যাডিসন স্কোয়ারে। তখনই আমার কানে বাজছিল ভেতরের পকেটে খচ্মচ্ করছে একটি পনের ডলারের চেক।

মাঝখানে-জোড়া-হীন একটা আবাস বাড়িতে পেলাম থাকার আশ্রয়, তার পরদিনই

ভোরবেলায় আমি ম্যাডিসন স্কোয়ারের একটা বেঞ্চে, সবে যখন চড়ুই পাখিরা জাগতে শুরু করেছে। ওদের সুরেলা কাকলি, বড় বড় গাছের দরাজ বাসন্তী পাতার সমারোহ আর সুঘ্রাণ তাজা ঘাস আমায় গভীর ভাবে মনে পড়িয়ে দিল যে-পুরনো খামারবাড়িটা ছেড়ে এসেছি তার কথা, আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়।

তারপর হঠাৎ একটা মুহূর্তে যেন পেয়ে গেলাম প্রেরণা। এই ফুর্তিবাজ ছোট পাখিগুলোর সাহসভরা তীক্ষ্ম কিচিরমিচির যেন একটা স্বরলিপি গড়ে তুলল কোনো আশ্চর্য, লঘু, খেয়ালি গানের—আশা আনন্দ আর বিশ্বপ্রেমে ভরা। ঠিক আমার মতো ওরাও যেন মাঠ-ঘাট জঙ্গলের সুরেই হৃদয়-বাঁধা প্রাণী; আর আমি যেমন, তেমনি ওরাও যেন দৈবের বশে একে ছন্দোহীন, রসহীন শহরে বন্দী। অথচ তবু কত মনোরম উল্লাসে ওরা এ বন্ধন সহ্য করছে!

তারপর, ভোর সকালের মানুষরা স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে যে যার কাজে যেতে শুরু করে। সব গম্ভীর মানুষ, আড়চোখে চায়, গোমড়া মুখ, —কেবল তাড়া, তাড়া আর তাড়াহুড়ো। আমি কিন্তু পাখির ডাকের ভেতর থেকেই পরিষ্কার গুছিয়ে নিয়েছি আমার বক্তব্য, সেটাকে একটা শিক্ষা, একটা কবিতা, কর্নিভাল নাচ আর ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। তারপর সবটাকেই গদ্যে তর্জমা করে লিখতে শুরু করি।

দু'ঘণ্টা ধরে লেখার প্যাডের ওপর আমার পেন্সিল চলল একটুও বিরাম না নিয়ে। তারপর গেলাম আমার দু'দিনের ভাড়া করা ছোট্ট ঘরখানায়, আর রচনাটিকে দু'ভাঁজ করে গরমাগরম ডাকে পাঠিয়ে দিলাম "সান" পত্রিকার ঠিকানায়।

পরদিন সকালে দিনের আলোর আগেই উঠে পড়লাম, আমার মূলধনের দুটো সেন্ট খরচ করলাম একটা কাগজ কিনতে। "চড়ুই" শব্দটা যদি ওতে থেকেও থাকে, আমি অন্তত খুঁজে পেলাম না।

কাগজখানা ঘরে নিয়ে বিছানার ওপর ছড়িয়ে প্রতিটি স্তম্ভ তন্ন তন্ন করে দেখলাম। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

তিন ঘণ্টা কর একজন ডাকপিওন আমায় লম্বা একখানা লেপাফা দিয়ে গেল, ভেতরে আমার পাণ্ডুলিপি, আর ৩ × ৪ ইঞ্চি শস্তা কাগজের একটা টুকরো—হয়ত ওরকম আপনারা দেখেও থাকবেন- ওপরে বেগুনি কালিতে লেখা- 'সান্-এর ধন্যবাদ সহ'।

স্কোয়ারে গিয়ে আমি একটা বেঞ্চির ওপর বসি। না, সেদিন সকালে আর প্রাতরাশ খাবার প্রয়োজনই বুঝতে পারিনি। হতভাগা চড়ুই পাখির আপদ স্কোয়ারটাকে যেন কুৎসিত করে তুলেছে তাদের বোকার মতো কিচিমিচিতে। সারা জীবনে আমি এমন একবগ্‌গা চেল্লাতে থাকা, অসভ্য, অপচ্ছন্দকর পাখি দেখিনি।

অথচ এই সময় সব রকম ঐতিহ্য অনুযায়ী আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত 'সান' পত্রিকার সম্পদকের দপ্তরে! দীর্ঘ দেহী গম্ভীর, পক্ককেশ সেই ব্যক্তিত্বময় মানুষটি একটা রুপোর ঘন্টি বাজাবেন, আমার হাতে হাত মেলাবেন, আর নিজের গেলাস থেকে কিছু সন্দেহজনক তরলবস্তু মুছে ফেলবেন।

কামরার ভেতরে একজন অধস্তন কর্মচারী ঢুকলে এবার বলবেন, 'ও মিঃ ম্যাক্‌চেস্‌নি, ইনি হলেন মিঃ হেনরি। ইয়ংম্যান যিনি ম্যাডিস্‌ন স্কোয়ারের চড়ুইপাখি নিয়ে ওই অনবদ্য রত্নটি আমাদের পাঠিয়েছিলেন। ওঁকে এখনই একটা টেবিলে বসিয়ে দিতে পারেন। আপনার দক্ষিণা হবে স্যার, সপ্তাহে ৮০ ডলার, শুরুর দিকে।'

নিউইয়র্কের সাহিত্য জগৎ নিয়ে রোমাঞ্চ গড়েছেন যে সব লেখক তারা সবাই এই প্রত্যাশার ছবিই তো আমায় দেখিয়েছেন।

সত্যি এ ঐতিহ্যের মধ্যে মহাগুরুতর ভ্রান্তি কিছু নিশ্চয়ই রয়েছে। দোষটা আমি নিজের ঘাড়ে নিতে পারি না, তাই চালিয়ে দিই চড়ুইগুলোর ওপরেই। আমি তীব্র ক্রোধের সঙ্গেই ওগুলোকে ঘেন্না করতে শুরু করি।

ঠিক এই মুহূর্তে অতিরিক্ত দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি, ডবল টুপি পরে, রাজ্যের মড়কের হাওয়া নিয়ে, গুটিসুটি বসল আমার পাশের আসনে।

ফুসলানোর সুরে বিড়বিড়িয়ে বললে, 'তা হ্যাঁ ভাই উইলি, তোমার সিন্দুক থেকে একটা ডাইম ছুঁড়ে দেবে? আজ সকালে এক কাপ কফি খেতাম।'

'আমার বুকে দম নেই বন্ধু', বললাম আমি, 'বড় জোর তিনটে সেন্ট দিতে পারি।'

'আর তোমাকেও দেখাচ্ছে ভদ্রলোকের মতো, অ্যাঁ? তোমাকে আবার কীসে ডোবাল হে- বোতলের নেশা?'

'নাঃ, পাখি!' তিরিক্ষি হয়ে বলি আমি, 'শহরের ধুলো আওয়াজের মধ্যে খেটে মরছে হয়রান মানুষ তার তাদেব আশা উৎসাহের গান শোনাচ্ছে ওই বাদামি-গলা গায়ক পাখিরা। মাঠ আর বনের ক্ষুদে পালকওয়ালা বার্তাবহরা নীল আকাশ আর ফসলী মাঠের কথা আমাদের শোনাচ্ছে মিষ্টি কিচমিচ করে। হতচ্ছাড়া ট্যারচা চোখো ক্ষুদে বজ্জাতগুলো বক্‌-বকাচ্ছে এক গাদা দম-দেয়া পিয়ানোর মতো, আর পৌরসভার মাতব্বরদের মতো ঘাসের বিচি, পোকা মাকড় গিলে নিজেদের পেট ভরাচ্ছে, যখন একজন মানুষ অভুক্ত অবস্থায় বেঞ্চে বসে আছে। হ্যাঁ স্যার, ওই পাখি! চেয়ে দেখুন ওদের!'

কথা বলতে বলতেই বেঞ্চেব পাশ থেকে তুলে নিয়েছি একটা মরা গাছের ডাল। সেটা সজোরে ছুঁড়ে দিলাম ঘাসের ওপর চড়ুইদের একটা ঘন জমায়েতের ওপর। মহা হৈ চৈ চিৎকার তুলে ওদের ঝাঁকটা উড়ে গেল গাছের দিকে; কিন্তু

দুটো পাখি ঘাসের ওপরেই নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

মুহূর্তের মধ্যে আমার কদাকার বন্ধু বেঞ্চি-সারিগুলো ডিঙিয়ে গিয়ে ডানা-ঝাপটানো শিকার দুটোকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গেই ও-দুটোকে পকেটে পুরল সে। তারপর আমাকে তার নোংরা নখ দিয়ে ইশারা করে ডাকল।

ঘ্যাস্‌ঘেসে গলায় বলল, 'চলে এস দোস্ত। তোমারও খাওয়া হয়ে যাবে।'

দুর্বলভাবে সদ্যপরিচিত নোংরা লোকটার পেছু নিই। পার্ক থেকে বেরিয়ে একটা পাশের গলিতে আমাকে নিয়ে যায় সে। তারপর একটা বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোনো খালি আঙিনায়, ভেতরে খোঁড়াখুড়ির কাজ চলছে। একগাদা পুরনো পাথর আর কাঠের লাক্‌ড়ির পেছনে গিয়ে সে থামল। বের করল পাখি দুটো।

বলল, 'আমার কাছে ম্যাচ-বাক্স আছে। তোমার কাছে কোনো কাগজ আছে যাতে আগুনটা ধরানো যায়?'

আমি চড়ুই নিয়ে লেখা গল্পের পাণ্ডুলিপিটাই বের করি। তার হাতে সমর্পণ করি আগুনের উৎসর্গের জন্য। পুরনো তক্তা, টুকরো কাঠ, চিলতে কাঠি—আগুনের সব ইন্ধনই আমাদের ছিল। আমার নোংরা দোস্ত তার ছেঁড়া পোশাকের কোন্ অন্দরমহল থেকে বের করল আধ পাউণ্ড পাঁউরুটি, গোলমরিচ আর নুন।

দশ মিনিটের মধ্যে দু'জনের হাতে একেকখানা চড়ুই, আগুনের শিখার ওপর কাঠি ঘুড়িয়ে পোড়ানো হয়েছে।

আমার শিবির সাথীটি বললে, 'দেখ, যার পেটে খাবার নেই, তার পক্ষে কিছু খারাপ হয়নি জিনিসটা। আমার মনে পড়ছে প্রথম যেবার নিউইয়র্কে এলাম সেবারের কথা—প্রায় পনের বছর আগে। পশ্চিম অঞ্চল থেকে এসেছিলাম কোনো খবরের কাগজে চাকরি খুঁজতে। প্রথম সকালটিতেই এসে ঢুকলাম ম্যাডিসন স্কোয়ারের পার্কে, এই বেঞ্চিগুলোতেই বসে কাটালাম, দেখছিলাম চড়ুইপাখিদের কিচিরমিচির, সুন্দর ঘাস, গাছ আর সবুজ। মনে হচ্ছিল যেন দেশেই ফিরে গিয়েছি আবার। তারপর পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করলাম, আর—'

'জানি', বাগড়া দিয়ে বললাম, 'পরে সেটা সান পত্রিকায় পাঠিয়ে পনের ডলার রোজগার করেছিলে।'

আমার বন্ধু সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'আরে! তুমি তো দেখছি অনেক কিছুই জান। তুমি কোথায় ছিলে? আমি রোদের মধ্যে এই বেঞ্চিটার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর কেউ আমার জামা হাতড়ে মেলে দিল আমার যা কিছু ছিল সবই - পনের ডলার!'

The Sparrows in Madison Square, নিউইয়র্ক সান্‌ডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

জাঁক দেখিয়েই খোয়ালেন

হলঘরের মধ্যেই মিঃ টাওয়ার্স চ্যান্ডলারের শয্যাকক্ষ, সেখানে নিজের সান্ধ্য স্যুটখানা ইস্ত্রি করছেন। একখানা ইস্ত্রি চাপানো আছে ছোট গ্যাসের উনুনটার ওপর, দ্বিতীয়খানা বীরবিক্রমে আগে-পিছে চালানো হচ্ছে স্যুটের শোভনীয় ভাঁজটা তুলতে—কারণ ওটাকেই পরে দেখা যাবে মিঃ চ্যান্ডলারের পেটেন্ট চামড়ার জুতো থেকে নিচু কাট ভেস্ট্ অবধি ঋজু রেখায় প্রলম্বিত। নায়কের প্রসাধনের অতোটা অবধি আমরা আশ্বাসের সঙ্গেই মেনে নিতে পারি। তবে বাকিটা আন্দাজ করবেন তাঁরা যাঁদের ছাপোষা ভদ্র দারিদ্র্য কিছু অগৌরবের কৌশল নিতে বাধ্য করে। এর পরের দৃশ্যে আমরা তাঁকে দেখতে পাব তাঁর আবাসিক আস্তানা থেকে সিঁড়ি ধরে নেমে আসতে—নিখুঁত আর সুষ্ঠু পোশাকে; শান্ত, আত্মস্থ, সুদর্শন - অর্থাৎ চেহারায় অবিকল মার্কামারা নিউইয়র্কের যুবক 'ক্লাব-ধারী'। যেন বেরিয়ে আসছেন একঘেয়েমিতে সামান্য ক্লান্ত হয়ে, নতুন কোনো সান্ধ্য আমোদের উদ্বোধন করতে।

চ্যান্ডলারের বেতন সাকুল্যে আঠারো ডলার হপ্তায়। একজন স্থপতিবিদের দপ্তরে কাজ করেন। বাইশ বছর বয়েস; স্থাপত্যকে সত্যিকারের শিল্প বলে জ্ঞান করেন; আর ঐকান্তিকভাবেই বিশ্বাস করেন—যদিও নিউইয়র্কে বসে সেটা মেনে নিতে সাহস পাবেন না—যে মিলানের বিশাল ক্যাথিড্রালের তুলনায় 'ফ্ল্যাট আয়রন বিল্ডিংটা' নকশার দিক থেকে নেহাৎই তুচ্ছ।

প্রতি হপ্তার মাইনে থেকে চ্যান্ডলার একটি করে ডলার সরিয়ে রাখেন। প্রতি দশ-সপ্তাহের শেষে যে বাড়তি পুঁজি তাঁব হাতে জমে, তাই দিয়ে কেনেন এক 'ভদ্রজনের' সন্ধ্যা—কৃপণ বৃদ্ধ 'কাল'-পিতার শস্তাদরের দোকান থেকে। নিজেকে সাজিয়ে তোলেন মিলিওনেয়ার বা প্রেসিডেন্টের জাঁকালো সাজে। এমন অঞ্চলে চলে যান যেখানে জীবন সেরা আড়ম্বর আর ঔজ্জ্বল্যে ভরা, আর সেখানেই স্বাদ আর বিলাসের সুখে পান-ভোজন করেন। দশ ডলার হাতে থাকলে একজন মানুষ অন্তত এক আধ ঘন্টার জন্য নিখুঁতভাবে ধনী অবসরভোগীর ভূমিকায় নামতে পারে। একবার ভাল বাছাই-করা খানা, সম্মানিত লেবেলের একটি বোতল, মানানসই বখশিস, চুরুট আর ট্যাক্সি ভাড়া, ইত্যাদি সাধারণ খরচার জন্য ওই অঙ্কটাই যথেষ্ট।

প্রত্যেক সত্তরটা একঘেয়ে সন্ধ্যা কুঁড়িয়ে-কাঁড়িয়ে অবশেষে এই একটি আনন্দময় সন্ধ্যা চ্যান্ডলারের পক্ষে নবজীবনের সুখের মতো। সমাজের ফুলের কুঁড়ির কাছে একটা দিনই আত্মপ্রকাশের, পরে সেটাই তার স্মৃতির মধ্যে মধুর হয়ে থেকে যায় চুল সাদা হয়ে যাবার পরও; কিন্তু চ্যান্ডলারের দশ-সপ্তাহান্ত আনে একই তীব্র আনন্দ, একই উত্তেজনার হর্ষ, ঠিক প্রথম দিনটার মতোই তাজা। পামগাছের নিচে খাদ্য রসিকদের সঙ্গে বসে নেপথ্য সঙ্গীতে মগ্ন হয়ে থাকা, ভূ-স্বর্গের নিয়মিত

আগন্তুকদের দেখার আর তাদের দ্রষ্টব্য হবার এই সুযোগের সঙ্গে কি তুলনা চলতে পারে একটি মেয়ের পয়লা দিনের সামাজিক নৃত্য আর হাতাকাটা রেশমী জামার?

সান্ধ্য পোশাকের বাহার দেখিয়ে ব্রডওয়েয়ের পথে চলেছেন চ্যান্ডলার। কারণ আজ সন্ধ্যায় তিনি যেমন দর্শনীয়, তেমনি আবার দর্শকও। এর পরের উনসত্তরটি সন্ধ্যা তাঁকে আহার করতে হবে পুরু জামা কিংবা মোটা উলের স্যুট পরে কোনো বাঁধা-দরের হোটেলে, ব্যস্ত সমস্ত লাঞ্চ ঘরে, আর বসতে হবে হলঘরের শয্যাকক্ষে স্যান্ডুইচ আর বীয়র নিয়ে। তা করতে তাঁর আপত্তি নেই, কারণ উনি যে চমকানো ঝলকানো বিশাল শহরের প্রকৃত সন্তান! পাদপ্রদীপের সামনে তাঁর একটি সন্ধ্যা অনেক অন্ধকার সন্ধ্যার ক্ষতিপূরণ করবে।

চ্যান্ডলার মন্থর পদেই হাঁটেন যতোক্ষণ না চল্লিশ নম্বর রাস্তাটা এসে বিরাট ঝলমলে প্রিমরোজ-শোভিত এ্যাভিন্যুর মোড়ে ঠেকে, কারণ সন্ধ্যা এখনো গাঢ় হয়নি, আর যখন কেউ ফুলবাবুদের দুনিয়ায় আসে সত্তর দিনের মধ্যে একটি দিন - তখন সে চাইবেই আনন্দটাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে। দীপ্ত নজর ওর দিকেই ঝোঁকে - ঈর্ষাতুর, কৌতুহলী, তারিফ-ভরা; তাতে ওস্কানি আর প্রলোভন; কারণ ওঁর পরিচ্ছদ আর মেজাজ ওঁকে এই সান্ত্বনা ও আনন্দের প্রহরের প্রকৃত ভক্ত বলেই ঘোষণা করছে।

একটা বিশেষ কোণে এসে উনি থমকে দাঁড়ান, চিন্তা করেন ফিরে যাবেন নাকি ওই জাঁকজমকের ফ্যাশান দুরস্ত রেস্তোরাঁর দিকে- .যেখানে উনি এই বিশেষ বিলাসিতার সন্ধ্যায় সাধারণত নৈশাহার করেন? ঠিক তক্ষুনি একটি মেয়ে মোড় থেকে লঘু পায়ে ছুটে বেরিয়ে এল, জমা একপ্রস্থ বরফের ওপর পিছলে গিয়ে সিধে টুপ্ করে পড়ল ফুটপাতের ওপর।

তৎক্ষনাৎ সাগ্রহ সৌজন্য দেখিয়ে চ্যান্ডলার তাকে টেনে দাঁড় করালেন পায়ের ওপর। মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়িটার দেয়ালের কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাল ওঁকে।

মেয়েটি বললে,'বোধহয় গোড়ালি মচকে গেছে, পড়বার সময় দুমড়ে গিয়েছিল কিনা!'

'খুব ব্যথা হচ্ছে কি আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন চ্যান্ডলার।

'শরীরের ভার পা'টার ওপর ছেড়ে দিলে ব্যথা হচ্ছে। মনে হয় দু'এক মিনিটের মধ্যে হেঁটে চলতে পারব।'

যুবক প্রস্তাব করলেন, 'আর কোনো সাহায্য যদি করতে পারি- বলুন তো একটা ট্যাক্সি ডাকি, নয়তো—'

'ধন্যবাদ', মৃদুকণ্ঠে অথচ সাগ্রহে মেয়েটি জানাল, 'আমার ধারনা আপনাকে আর. কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না আমার জন্য। একটা বিশ্রি কাজ করে ফেললাম। তা ছাড়া আমার জুতোর হীলটাও হয়েছে একেবারে সাধারণ—মানে, অবশ্য, ওগুলোকে মোটেই দোষ দিতে পারি না।'

চ্যান্ডলার মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলেন, যেন ওঁর আগ্রহ বেশ তাড়াতাড়িই আর্কষণ করছে সে। মার্জিত নজরে দেখলে সুরূপা; চোখে খুশি আর সহৃদয়, দুটো ভাবই। পোশাক তেমন দামি নয়, সিদেসাধা কালো ড্রেস, যা দোকানের মেয়েদের মতো কোনোরকম ইউনিফর্মের ধারনা দেয়। ঘন বাদামি ফিঙে চক্‌চকে চুল খানিকটা কোঁকড়া হয়ে বেরিয়েও পড়েছে শস্তা কালো টুপির ফাঁক দিয়ে, ওতে একমাত্র অলংকার ভেলভেটের ফিতে আর 'বো'। আত্মমর্যাদাসম্পন্না কর্মী মেয়েদের শ্রেষ্ঠ মডেল হিসেবে 'পোজ' দিতে পারত মেয়েটি।

যুবক স্থপতির মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। এই মেয়েটিকে উনি নিজের সঙ্গে খেতে অনুরোধ করবেন। এই একটা উপাদান যা ওঁর চমৎকার অথচ নিঃসঙ্গ কীর্তির পুনরাবৃত্তিতে বরাবরই গর-হাজির। ওঁর মনোরাম বিলাসিতার সংক্ষিপ্ত সময়টা উপভোগ্য হবে যদি এর সঙ্গে একজন নারীর সাহচর্য যোগ করা যায়। মেয়েটি যে মহিলা তাতে ওঁর সন্দেহ নেই—ওর ব্যবহার আর কথাবার্তাতেই সেটার পরিচয়। উনি বেশ বুঝতে পারছেন মহিলার চূড়ান্ত সাধারণ পোশাক সত্ত্বেও তার সঙ্গে ওঁর টেবিলে বসতে আনন্দ হবে।

এই চিন্তাগুলো দ্রুতই তাঁর মনের মধ্যে খেলে যায়, তিনি স্থির করেন মহিলাকে অনুরোধ করবেন। অবশ্য এটা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে ঠিকই, তবে বেতন উপার্জনকারী মেয়েরা অনেক সময়ই এই ধরনের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতার নিয়ম গ্রাহ্য করে না। সাধারণত তারা পুরুষকে সঠিক ভাবেই যাচাই করে নেয়; ওইসব অর্থহীন নিয়মকানুনের চেয়ে তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা রাখে বেশি। ওঁর দশটি ডলারে, বিবেচনা করে খরচ করলে, দু'জনের খাওয়া খুব ভালো ভাবেই চলে যাবে। আর এ ডিনার নিঃসন্দেহে মেয়েটির একঘেয়ে রুটিন বাঁধা জীবনে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার সঞ্চার করবে। সে যদি সোৎসাহে তারিফ জানায় তাহলে ওঁর নিজের কীর্তি আর আনন্দ আরো বেড়েই যাবে।

খোলাখুলি গাম্ভীর্যের সঙ্গে উনি বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি যতোটা ভেবেছেন তার চেয়ে আরো বেশি বিশ্রাম দরকার হবে আপনার পায়ের। এবার আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যে ভাবে ও-কাজটা করতে পারেন এবং একই সময় আমারও একটা উপকার হয়। আমি একেবারে একা-একাই ডিনার করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কোণা থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আপনি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, একটু আয়েশ করে ডিনার খাব দু'জনে, কিছু সুন্দর আলোচনাও হবে। আর ততক্ষণে আপনার সেরে ওঠা গোড়ালি আপনাকে খুব চমৎকারভাবে বাড়িতে পৌঁছে দেবে, আমি নিশ্চিত।'

চ্যান্ডলারের নিখাদ মনোজ্ঞ চেহারার দিকে চট্‌ করে নজর বুলিয়ে নিল মেয়েটি। একবার তার চোখটা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল, তারপরই সে একটা অকপট হাসি দিল।

'কিন্তু আমরা তো কেউ কাউকে জানি না—এটা হয়তো ঠিক হবে না, হবে কী?—দ্বিধাভরে বলল মেয়েটি।

যুবক মনখোলা ভাবে বললেন, 'এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি—অনুমতি দিন—মিঃ টাওয়ার্স চ্যান্ডলার। আমাদের ডিনার আমি যথাসম্ভব উপভোগ্য করতে চেষ্টা করব, তারপর হয় আপনাকে শুভ সন্ধ্যা জানাব, নতুবা নিরাপদে আপনাকে ঘরের দরজা অবধি পৌঁছে দেব—যেটা আপনার অভিরুচি।'

'কিন্তু হা কপাল!' মেয়েটি চ্যান্ডলারের অনবদ্য পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললে—'আমার এই পুরনো পোশাক আর টুপি পরে!'

ফূর্তি ভরে চ্যান্ডলার বললেন, 'ও নিয়ে ভাববেন না। আমি নিশ্চিত ওই পোশাকেই আপনাকে যা মনোরম দেখাবে, অমন আর কাউকে আমরা দেখতে পাব না ডিনার-ঘরের ঝলমলে প্রসাধন কক্ষে।'

'আমার গোড়ালিটা এখনো ব্যথা করছে'—মেনে নিল মেয়েটি, খুঁড়িয়ে একটু হাঁটারও চেষ্টা করল—'মনে হয় আপনার আমন্ত্রণটাই স্বীকার করে নেব মিঃ চ্যান্ডলার। হ্যাঁ আপনি আমাকে—মিস্ ম্যারিয়ান বলে ডাকতে পারেন।'

'আসুন তাহলে মিস্ ম্যারিয়ান',—খুশি গলায় বললেন যুবক স্থপতি, কিন্তু পুরো দস্তুর সম্ভ্রমের সঙ্গে—'বেশি দূর অবধি হাঁটতে হচ্ছে না আপনাকে। পরের ব্লকেই একটা অত্যন্ত ভদ্রস্থানীয় ভাল রেস্তোরাঁ আছে। আপনাকে আমার বাহুর ওপর হেলান দিতে হবে—এইরকম- আর ধীরে হাঁটতে হবে। নিজে নিজে বসে ডিনার খেতে নিঃসঙ্গ লাগে। আমি একটু বোধহয় খুশিই যে আপনি বরফে আছাড় খেয়েছিলেন।'

একটা বাছাই করা টেবিলে ওরা দু'জন যখন বসেছে, আর আশেপাশে ঘুরছে এক পাকাপোক্ত ওয়েটার, চ্যান্ডলার পেতে লাগল সেই প্রকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতা, যা বরাবরই পায় তার নিয়মিত বহিশ্চারণার সুবাদে।

ব্রডওয়ে ধরে আরেকটু গেলে যে রেস্তোরাঁটি আছে সেটার মতো জাঁকালো ভাব বা গুমোর এ-রেস্তোরাঁর নেই। চ্যান্ডলার বরাবর সে রেস্তোরাঁটাই পছন্দ করত। কিন্তু এটাও নেহাৎ কম নয়। প্রত্যেকটি টেবিলই প্রায় ভরা, বিত্তবান্ মানুষরা ভোজনে বসেছেন, একটা ভাল অর্কেস্ট্রা-দল নিচু সুরে বাজাচ্ছে যাতে নির্বিঘ্ন আনন্দে আলাপাদি করা চলে, আর খাদ্য ও পরিবেশন তো একেবারেই সমালোচনার উর্ধে। ওঁর সঙ্গিনী, তার শস্তা টুপি আর পোশাক সত্ত্বেও, এমন এক মেজাজের সঙ্গে নিজেকে উঁচু করে রেখেছে, যা তার মুখমণ্ডল আর দেহবল্লরীর স্বাভাবিক রূপের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে কোনো বৈশিষ্ট্য। আর এটাও নিশ্চিত যে সে চ্যান্ডলারের প্রাণবন্ত অথচ আত্ম-সংযত ভাবভঙ্গির দিকেই চেয়ে ছিল, আর তাঁর জ্বলজ্বলে সরল নীল চোখদুটো দেখছিল। ওর আকর্ষণীয় মুখে যে ভাবটি ফুটে ওঠে সেটা নিছক প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু নয় বোধহয়।

আর ঠিক এই সময়টাতেই টাওয়ার্স চ্যান্ডলারকে যেন চেপে ধরল একসঙ্গে —ম্যানহাটানের মস্তিষ্কবিকৃতি, ফালতু ফ্যাশনের ফক্কিকারি, বহ্বাড়ম্বরের বীজানু, গেঁয়ো চালিয়াতির গুমোর। উনি যে এখন ব্রডওয়েতে! চতুর্দিকে তাঁর জাঁকজমক আর স্টাইল, আর অসংখ্য চোখও রয়েছে তাঁকে দেখবার। সেই কমেডি নাটকের মঞ্চে তাঁকে অভিনয় করতে হচ্ছে- ফ্যাশনের প্রজাপতি, আর পয়সাওলা রুচির শ্রমবিমুখ বিনোদনভোগীর একটি-রাতের ভূমিকায়। ভূমিকার উপযুক্ত পোশাক তো রয়েছেই, এখন ওঁর বিবেক দূতরা শত চেষ্টা করলেও তাঁর অভিনয় আটকাতে পারবে না।

অতএব উনি মিস ম্যারিয়ানকে বক্‌বক্ করে শোনাতে লাগলেন ক্লাবের কথা, চা, গলফ, ঘোড়ায় চড়া আর কুকুর-পোষা, পল্লীনৃত্য, বিদেশ ভ্রমণের কথা। লার্চমন্টে একটা প্রমোদতরী অপেক্ষা করছে তারও ইঙ্গিত দিলেন। এই ভাসা ভাসা কথাগুলোয় ভীষণভাবে মোহিত হয়েছে মেয়েটি, তা তিনি দেখতেই পাচ্ছেন, তাই তাঁর চালবাজির ঢঙের মধ্যে আমদানি করলেন বিরাট সম্পদ সম্পর্কে ইতস্তত ব্যঙ্গোক্তি, আর উল্লেখ করলেন কিছু পরিচিত নামের, যেগুলো সর্বহারা শ্রেণী শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করে। আজ তো চ্যান্ডলারের এক সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র দিন, তাই এর থেকেই নিংড়ে বের করে নিতে হচ্ছে সেরা নির্যাসটুকু, অন্তত তাঁর নিজের দৃষ্টিতে। তবুও একেকবার দেখেছেন মেয়েটির খাঁটি সোনা ফুটে উঠেছে এই কুয়াশার আড়াল থেকেও, যা উনি নিজেই অহঙ্কার দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন নিজের সঙ্গে আর সবকিছুর ব্যবধান তৈরি করে।

ম্যারিয়ান বললে, 'আপনি এই ধরনের যে জীবনযাত্রার কথা বলছেন, তা শুনতে এত ফাঁকা আর অর্থহীন মনে হয়! আপনাদের কি পৃথিবীতে অন্য কাজ কিছু করার নেই, যা আপনাকে আরও বেশি আগ্রহান্বিত করে রাখে?'

তিনি সবিস্ময়ে বললেন, 'প্রিয় মিস্ ম্যারিয়ান—কাজ! ভাবুন তো প্রতিদিন ডিনারের জন্য পোশাক পরা, বিকেলের দিকে আধ ডজন দেখা সাক্ষাৎ- প্রতিটি মোড়ে পুলিশম্যান দাঁড়িয়ে আছে আপনার গাড়িতে লাফিয়ে ওঠার আর কাছে-পিঠের থানায় নিয়ে যাবার প্রতীক্ষায়—গাধার গাড়ির চেয়ে বেশি স্পীডের মাত্রা লঙ্ঘন করেছেন কিনা যাচাই করতে! আরে, আমরা নিষ্কর্মারাই তো দেশের সবচেয়ে মেহনতি কর্মী!'

ডিনার শেষ হল, ওয়েটারকে বদান্য বকশিস দেয়া হল, তারপর দু'জন বেরিয়ে সেই মোড়টিতেই এলেন যেখানে ওঁদের প্রথম দেখা হয়। মিস্ ম্যারিয়ান এখন খুব ভালই হাঁটছে, ওর নেংচে চলার ভাবটা আর চোখেই পড়ে না।

সোজাসুজিই বললে সে, 'চমৎকার সময়টুকুর জন্য ধন্যবাদ। এবার আমায় বাড়ির দিকে ছুটতে হয়। ডিনারটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল, মিঃ চ্যান্ডলার!'

উনি ওর সঙ্গে করমর্দন করলেন, আন্তরিক ভাবে হেসে, তাঁর ক্লাব ঘরে

বোধ হয় ব্রীজ খেলবার কথাই কিছু বললেন। এক মুহূর্ত উনি চেয়ে দেখলেন মেয়েটি তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে পূবমুখো। আর তখন নিজেও একটা গাড়ি পেয়ে গেলেন ধীরে-সুস্থে বাড়ি পৌঁছোবার জন্য।

কন্‌কনে ঠান্ডা শয়নকক্ষে চ্যান্ডলার তাঁর সান্ধ্য পোশাক খুলে একদিকে রাখলেন ওটাকে, আগামী উনসত্তর দিনের বিশ্রাম দিতে। এবার সব কথাই মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

মনে মনে বলেন, 'মেয়েটা কিন্তু ছিল হতবাক করে দেবার মতো। হলপ করে বলতে পারি, যদি খেটে খাওয়া মেয়েও হয়, কথাগুলো ঠিকই বলেছিল। হয়তো আমি ওই আবোল তাবোল হৈ চৈ না করে সত্যি কথাটাই ওকে জানাতে পারতাম, তবে আমরা হয়তো—কিন্তু যাক্ ওসব গোল্লায়! আমার পোশাকটার মান তো রাখতেই হত!'

এই ভাবেই ভাবলেন সেই সাহসী পুরুষ, যাঁর জন্ম আর বড় হয়ে ওঠা ম্যানহাটানের আদি বাসিন্দাদের চামড়া-তাঁবুর মধ্যেই।

মেয়েটি তার বিনোদনকারীকে ছেড়ে যাবার পর ক্ষিপ্রপদে শহরের ভেতর দিয়ে ছুটে অবশেষে হাজির হল পূবদিকের দুটি স্কোয়ার বাদে এক সুদর্শন শান্তিমগ্ন ম্যানসন বাড়িতে; সামনেই সেই এ্যাভিন্যু যা কুবের, লক্ষ্মী, ইত্যাদি দেবতাদের সদর রাস্তা। এখানেই চটপট ঢুকে ও ওপরতলার এক কামরায় চলে আসে, সেখানে জাঁকালো ঘরোয়া পোশাক পরা এক মহিলা উদ্বেগভরে বাইরে তাকিয়েছিল জানলার ভেতর দিয়ে।

অন্যজন ঢুকতেই অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলা অবাক কণ্ঠে বললে, 'উঃ যা পাগল একটি তুই! কবে আমাদের এভাবে ভয় দেখানো বন্ধ করবি বল্ তো? দু'ঘন্টা হল তুই ওই পুরনো ধোকড়া পোশাক আর মারির টুপিখানা পরে বেরিয়ে পড়লি। মা তো ভয়ই পেয়ে গেছেন। উনি লুইকে মোটরগাড়িতে পাঠিয়েছেন তোকে খুঁজে বের করতে। তুই একটি বাজে পুষি—কারুর জন্য চিন্তা নেই!'

মহিলা বোতাম টেপে, মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে আসে একটি পরিচারিকা। 'মারি, মাকে বলো তো মিস্ ম্যারিয়ান এসে গেছে!'

'আমাকে বোকো না দিদি। আমি শুধু মাদাম থিওর ওখানে ছুটে গিয়েছিলাম যাতে ওরা পিঙ্কের বদলে মোভ রঙের টুকরো ব্যবহার করে। আমার কস্টিউম আর মারির টুপি। দুটোই আমার পক্ষে জুতসই হল—প্রত্যেকেই ভেবে নিয়েছে আমি দোকানের কর্মচারী মেয়ে। এতে আমার সন্দেহ নেই।'

'ডিনার সারা হয়ে গেছে বাছা; তুই এতক্ষণ বাইরে কাটালি!'

'জানি তো! ফুটপাতে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, গোড়ালিতে মোচড়। হাঁটতে পারছিলাম না, তাই কোনো রকমে লেংচে লেংচে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকি, ওখানেই বসে থাকি যতোক্ষণ না সুস্থ বোধ করি। ওই জন্যই তো এত দেরি হয়ে গেল।'

জানলার কিনারার আসনে বসল দু'বোন, বাইরে তাকিয়ে আলো আর এ্যাভিন্যুতে চলা দ্রুতগামী গাড়িগুলোর স্রোত দেখতে থাকল। ছোটটি আদুরে ভঙ্গিতে মাথা গুঁজল দিদির কোলে।

স্বপ্ন-ভরা গলায় বলতে থাকল, 'আমাদের তো একদিন বিয়ে করতেই হবে, দু'জনকেই। আমাদের এত টাকা যে পাবলিককে অখুশি রাখা আমাদের চলবেই না। তুমি যদি চাও তো বলি কেমন ধরনের মানুষকে আমি সত্যি ভালবাসতে পারতাম। দিদি?'

'বলে যা, বড্ড অস্থির তোর মন!' হেসে বলল বড় বোন।

'আমি ভালবাসতে পারতাম গভীর আর সহৃদয় নীল চোখের এক মানুষ, যে গরিব মেয়েদের সঙ্গে ভদ্র আর শ্রদ্ধাশীল. যে সুদর্শন আর সৎ হলেও প্রেমের ভান করার চেষ্টা করে না। কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারতাম একটাই শর্তে—যদি তার উচ্চাকাঙক্ষা থাকে, আর পৃথিবীতে করার মতো কোনো কাজ থাকে। যত দরিদ্রই সে হোক তাকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি দিতাম আমি, আর কিছু গ্রাহ্যই করতাম না। কিন্তু দিদি আমার! যে সব লোকের সঙ্গে হরদমই দেখা হয় আমাদের—মানে যারা ওই সমাজ আর ক্লাবের মধ্যে কুঁড়ের জীবন যাপন করে—ওরকম একটি মানুষও দেখি না যাকে ভালবাসতে পারি, যদিও-বা তার চোখ নীল হয়, রাস্তায় মিলে যাওয়া গরিব মেয়েকে যদিও বা সে সম্মানও করে, তবু নয়।'

Lost on Dress Parade. নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

ডাইনির পাঁউরুটি

মোড়ের মাথায় ছোট্ট রুটির দোকানটা চালান মিস্ মার্থা মীচাম (সেই দোকান যার তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে দরজা খুললেই টুং করে ঘন্টি বাজে)।

মিস্ মার্থার বয়েস চল্লিশ, ওর ব্যাঙ্ক বইয়ে জমার অঙ্কে দেখা যাবে দু'হাজার ডলার। ওর দুটো নকল দাঁত আছে, আর আছে হৃদয়ভরা সমবেদনা। তা, অনেক লোকই তো বিয়ে করেছে, যাদের বিয়ের সুযোগ ছিল মিস্ মার্থার চেয়ে বহু পরিমাণে ক্ষীণ।

সপ্তাহে দু'তিনবার একজন খদ্দের দোকানে আসেন যাঁর সম্পর্কে তার আগ্রহ জন্মাতে থাকে। মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক, চোখে চশমা, একগুচ্ছ বাদামি দাড়ি সতর্ক ভাবে চোখা করে ছাঁটা।

ইংরেজি বলেন চড়া জার্মান উচ্চারণভঙ্গি দিয়ে। তাঁর পোশাক আশাক জায়গায় জায়গায় জীর্ণ, রিপু করা, না'হলে কোঁচকানো, ঝোলা। কিন্তু তাঁকে দেখতে ছিমছাম, আর ব্যবহারও বড় ভাল।

সব সময়েই কেনেন দু'প্রস্থ বাসি রুটি। তাজা রুটি একপ্রস্থ পাঁচ সেন্ট। বাসিগুলো দুটো করে পাঁচ সেন্টে। বাসি রুটি ছাড়া কখনো কিছু চাইতেনই না।

একবার মার্থা ওঁর আঙুলগুলোতে দেখতে পেল লাল আর বাদামি রঙের ছোপ। তখনই নিশ্চিত বুঝে গেল ভদ্রলোক একজন শিল্পী, আর ভীষণ রকম গরিব। নিঃসন্দেহেই কোনো চিলের ছাতের কোঠায় থাকেন, সেখানে বসে ছবি পেন্টিং করেন আর বাসি রুটি খান। আর বোধহয় কল্পনা করেন মিস্ মার্থার দোকানে কতো ভাল ভাল খাবার জিনিস আছে!

প্রায়ই যখন মিস্ মার্থা তার চপ, হাল্কা রোল, জ্যাম আর চা নিয়ে বসে, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কামনা করে, ওই ভদ্র আচরণের শিল্পীটি যদি চিলে কোঠার হাওয়ায় বসে তাঁর শুকনো রুটির খোসা না খেয়ে বরং ওর এই সুস্বাদু খাবারের ভাগ নিতেন,—আহা! যেমন আপনাদের বলা হয়েছে, মিস্ মার্থার হৃদয় বড়ই সংবেদনশীল।

ভদ্রলোকের পেশা সম্পর্কে নিজের তত্ত্বটা যাচাই করতে মার্তা একদিন তার নিজের কামরা থেকে নিয়ে এল একখানা ছবি, ওটা সে ঘাটতি-দরের বাজার থেকে কিনেছিল। রুটির কাউন্টারের পেছনে যে শেলফ্, তারই ওপর রাখল ছবিটা।

ছবিটা ভেনিসের এক দৃশ্যের। একটা সুন্দর প্রাসাদ (তাই বলা হয়েছে ছবিটাতে) দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনের জমিতে—বরং বলা ভাল সামনের জলে। আর বাকি দৃশ্যে আছে গন্ডোলা ডিঙি (একজন মহিলা জলে হাত রেখেছে), মেঘ, আকাশ আর যথেষ্ট আলো-আঁধারির খেলা। কোনো শিল্পীই ওটা নজর না করে পারে না।

দু'দিন পর খদ্দের ভদ্রলোকটি এলেন।

'দুটো বাসি রুটির লোফ দেবেন।'

যখন মহিলা রুটিটা কাগজে জড়াচ্ছে, উনি বলে উঠলেন, 'এখানে একটা চমৎকার ছবি দেখছি ম্যাডাম।'

নিজের ধূর্তবুদ্ধিতে নিজেই উল্লসিত মিস্ মার্থা। বললে, 'হ্যাঁ? আমি এত পছন্দ করি আর্ট আর'- (না, না, এত তড়িঘড়ি 'আর্টিস্ট' বলা ঠিক হবে না) 'আর পেইন্টিং'—কথা বদলায় সে—'আপনার কী মনে হয়, ছবিটা ভাল?'

খদ্দের বললেন, 'ড্রের ব্যালেস্—ওটা ভাল ড্রইং হয়নি। ওটার পরিপ্রেক্ষিত ঠিক বাস্তব হয়নি। গুট্ মর্নিং ম্যাডাম।'

পাঁউরুটি তুলে নিয়ে, মাথা নুইয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উনি শিল্পী, হতেই হবে। ছবিটা তুলে নিয়ে মিস্ মার্থা কামরায় ফিরে গেল।

চশমার পেছনে কী কোমল আর সদয় ওঁর চোখ দুটো! কী চওড়া কপাল! চোখের এক নজরেই পরিপ্রেক্ষিতটা যাচিয়ে নিলেন, এই যাঁর ক্ষমতা, তিনি বাসি রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করছেন! কিন্তু পরিচিতি পাবার আগে প্রতিভাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়, তাও ঠিক।

শিল্প আর পরিপ্রেক্ষিতের পক্ষে কী কল্যাণই না হতো যদি এমন প্রতিভার পেছনে থাকত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত দু'হাজার ডলার, একটা রুটির দোকান, আর একটি সমব্যথী হৃদয় যা...কিন্তু এসব যে দিবাস্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে, মিস্ মার্থা!

আজকাল প্রায়ই এখানে এলে উনি শো-কেসের ওপর ঝুঁকে খানিকক্ষণ গল্পগাছা করছেন। মিস্ মার্থার উদ্দীপনাময় কথাগুলো যেন ওঁর দারুন ভাল লাগে মনে হয়।

তিনি কিন্তু বাসি পাঁউরুটিই কিনে যাচ্ছেন। কখনো কেক নয়, পাইপিঠে নয়, এমনকি ওর 'স্যালি-লুনও' একখানা নয়।

ওর মনে হয় ওঁকে আগের চেয়ে রোগা আর নিরুৎসাহ দেখাচ্ছে কিছুদিন ধরে। ওঁর ওই সামান্য সওদার মধ্যে কিছু খাবার মতো ভাল জিনিস যোগ করে দিতে ওর মন কাঁদে, কিন্তু সে কাজ করতে ওর সাহস হয় না। ওঁকে চটিয়ে দেবার দুঃসাহস তার নেই। সে তো জানে শিল্পীদের মেজাজ!

মিস্ মার্থা আগের মতো কাউন্টারের পেছনে তার নীল-ফুট্কি সিল্কের কোমরবন্দটা পরতে শুরু করে। পেছনের কামরায় বিহিফলের বিচি আর সোহাগা দিয়ে কী যেন একটা রহস্যময় মিশ্রন তৈরি করে সে উনুনে। অনেক লোক নাকি ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করে ওটা।

একদিন যথারীতি খদ্দের ভদ্রলোক এলেন, নিকেলের মুদ্রাটা শো-কেসের ওপর রাখলেন আর চাইলেন তাঁর বাসি পাঁউরুটি। যখন মিস্ মার্থা সেগুলো বের করতে যাচ্ছে, বাইরে প্রচন্ড হর্নের আওয়াজ, ঝাঁকুনির শব্দ হল, একটা দমকল বিরাট বপু নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

খদ্দের হুড়মুড় করে দরজার কাছে গিয়েছিলেন দেখতে, যেটা খুব স্বাভাবিক। হঠাৎ একটা প্রেরণা পেয়ে মিস্ মার্থাও সুযোগটা নিল।

কাউন্টারের পেছনে একেবারে নিচের তাকে, এক পাউন্ড তাজা মাখন ছিল, যেটা দশ মিনিট আগেই ডেয়রীর লোক রেখে গেছে। দুটো বাসি রুটির মধ্যে রুটি কাটা ছুরি চালিয়ে মিস্ মার্থা বেশ গভীর ফালি করল, তারপর দরাজ হাতে তাতে মাখন ঢুকিয়ে দু' পাশ চেপে রুটিগুলোকে ফের আঁটসাঁট করে দিল।

খদ্দের যখন ফিরে এলেন, মার্থা তখন কাগজের মোড়ক বেঁধে দিচ্ছে ওতে।

যখন উনি অস্বাভাবিক হৃষ্টচিত্তে গল্পসল্প করে বিদায় নিলেন, মিস্ মার্থা নিজের মনেই হাসল, তবে ওর হৃদয়েও যে খানিকটা স্পন্দন জাগেনি তা নয়।

ও কি একটু বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলল? উনি কি রাগ করবেন? কিন্তু

নিশ্চয়ই নয়। খাবার জিনিসে কোনো ভাষা নেই; মাখন কোনো অ-কুমারীসুলভ ঔদ্ধত্যের প্রতীক নয়।

সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ও-বিষয়টা নিয়েই ভেবেছে। সে কল্পনা করে দৃশ্যটা, যখন উনি ওর ছোট্ট প্রতারণার ফন্দীটা ধরে ফেলবেন।

উনি তাঁর তুলি আর প্যালেট নামিয়ে রাখলেন। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সেই ঈজেল যার ওপর ছবিটা, যেটার ওপর রঙ চাপাচ্ছিলেন; আর সেটার পরিপ্রেক্ষিত সমালোচনার উর্ধ্বে।

দুপুরে খাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন—শুকনো রুটি আর জল। তারপর একখন্ড রুটির মধ্যে যখন ছুরি চালাবেন—আঃ!

রাঙা হয়ে উঠল মিস্ মার্থার বদন। উনি কি খেতে গিয়ে ভাববেন সেই হাতটার কথা, যা ওই মাখন রেখেছে ওতে? উনি কি—

সামনের দরজার ঘন্টাটা সশব্দে বেজে ওঠে। কেউ বোধহয় ভেতরে আসছে প্রচুর হট্টগোল তুলে।

মিস্ মার্থা সামনের দিকে ছুটে যায়। দু'জন লোক। একজন পাইপ মুখে একটি যুবক—যাকে ও আগে কোনো দেখেনি। আর অন্যজন 'তার' শিল্পী।

শিল্পীর মুখখানা ভয়ানক লাল, টুপি মাথার পেছন দিকে ঠেলে-দেয়া, চুলগুলো একেবারে উস্কোখুশকো। উনি দু'হাতের মুঠো চেপে হিংস্রভাবে নাড়ছেন মিস্ মার্থার দিকে। মিস্ মার্থার দিকেই!

প্রচন্ড চিৎকার করে বললেন, 'মোটা মাথা!' তারপর জার্মান ভাষায় 'টাউজেনডনফার' বা ওই জাতীয় কিছু।

যুবক সঙ্গীটি তাঁকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

রাগত স্বরে উনি বলেন, 'আমি যাব না, যতোক্ষণ না ওকে শুনিয়ে দিয়ে যাই।'

মিস্ মার্থার কাউন্টারে তিনি জগঝম্প বাজালেন।

'আপনি আমায় নষ্ট করেছেন!'—চশমার পেছন থেকে নীল চোখে আগুন জ্বালিয়ে চেঁচান—'আমি বলছি আপনাকে। আপনি হলেন কুচুটে মাথা-গলানি বুড়ি বেড়াল!'

মিস মার্থা দুর্বলভাবে শেলফে ঝুঁকে পড়ে একটা হাত রাখে তার নীল-ফুটকি সিল্কের খোমরবন্দে। অন্য জনের কলার চেপে ধরে যুবক। বলে- 'এসো, চলে এসো, অনেক বলেছ তুমি।' ক্রুদ্ধ ব্যাক্তিকে সে টেনে বের করে নিয়ে যায় দরজার বাইরে, একেবারে ফুটপাতে। তারপর আবার ফিরে আসে।

বলে, 'ম্যাডাম, আপনাকে সবটুকু বলা উচিত বোধহয়, কেন এই চেঁচামেচি। উনি হলেন ব্লুমবের্গার। উনি স্থাপত্যের নকশাবিদ। আমি ওঁর সঙ্গে এক অফিসেই কাজ করি।

'একটা নতুন নাগরিক ভবনের নক্শা তৈরি করতে উনি তিনমাস ধরে প্রচণ্ড খাটছেন। পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যাপার। কাল উনি রেখায় কালি দেবার কাজ শেষ করেছিলেন। জানেন তো, নক্শাবিদকে সব সময়েই আগে পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করতে হয়। ওটা হয়ে গেলে তখন পেন্সিলের দাগগুলো তুলে দিতে হয় বাসি রুটির চিলতে ঘষে। সেটা রবারের চেয়ে ভাল কাজ দেয়।

'ব্লুমবের্গার তো এখানেই রুটিগুলো কিনতেন। তা, আজ হয়েছে কী- মানে, বুঝলেন তো ম্যাডাম, ওই মাখনটা তো চলবে না—তা, এখন ব্লুমবের্গারের নক্শাটা কোনো কাজেই লাগল না—এক টুকরো-টুকরো করে রেলপথে স্যানডুইচ বেচা ছাড়া।'

মিস্ মার্থা চলে গেল পেছনের কামরায়। নীল ফুটকি সিল্কের কোমরবন্দটা খুলে আগের সেই পুরনো বাদামি সার্জটাই আঁটল। তারপর সেই বিহিফলের বিচি আর সোহাগার মিশ্রণটা ছুঁড়ে দিল জানলার বাইরে ছাইগাদার মধ্যে।

Witches' Loaves, আগস্ট, ১৯০৪

শিবির আগুনের আলোয় নিউইয়র্ক

আমরা নিউইয়র্কের ব্যাপারে কিছু নতুন কথা শিখলাম ক্রীক নেশনে বেড়াতে গিয়ে।

বেরিয়েছিলাম শিকার ভ্রমণে; একটি রাত এক ছোট সোঁতার ধারে শিবির বসিয়েছি। আমাদের দক্ষ পথপ্রদর্শক আর শিকারী বাড কিংসবেরী, তার মুখ থেকেই আমরা শুনলাম ম্যানহাটান আর সেখানকার অদ্ভুত বাসিন্দাদের চরিত্রের ব্যাখ্যানা। একবার সে ওই বিশাল নগরীতে পুরো মাস কাটিয়েছিল, পরেও মাঝে মাঝে গিয়ে হপ্তাখানেক কি হপ্তা-দুয়েক থেকেছে। যা-যা দেখেছে তা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে ও আনন্দই পায়।

আমাদের শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা চামড়ার তাঁবু। রেড-ইন্ডিয়ানদের একটা পরিবার বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে এক রাতের জন্য আস্তানা গেড়েছে। এক অতি বৃদ্ধা ইন্ডিয়ান রমনী তিনটে লাঠির ওপর থেকে ঝোলানো লোহার কড়ায়ের নিচে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছিল।

বাড চলে গেল তাকে সাহায্য করতে, একটু পরেই জ্বলে উঠল বুড়ির উনুন। ও যখন ফিরে এল আমরা ওকে ঠাট্টা করে বীর পুরুষ বলে সম্ভাষণ জানালাম।

বাড বললে, 'ওহো, ওতে আর বলার কী আছে! এটাই তো আমার দস্তুর। যখনই কোনো মহিলাকে দেখি হাঁড়িতে কিছু রান্না করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছে, তখনই তাকে উদ্ধার করতে যাই। একবার ওই একই ব্যাপার করেছিলাম নিউইয়র্ক

শহরের এক উচ্চকোটির বাড়িতে। ফিফ্‌থ এ্যাভিন্যুতে বিশাল বড় সমাজের তাঁবু। এই ইনজান মহিলার জন্যই মনে পড়ে গেল কথাটা। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করি বিনয়ী হয়ে মহিলাদের বিপদ থেকে বাঁচাতে।'

শিবিরের সবাই এবার বিবরণ দাবি করল।

বাড বললে, 'আমি ছিলাম টেক্সাস হাতা জমিতে "খ—ত্রিভুজ" খামারের ম্যানেজার। সে সময় ওটার মালিক ছিলেন নিউইয়র্কের বুড়ো স্টার্লিং। উনি খামারটা বেচতে চাইলেন আর আমাকে ডেকে পাঠালেন নিউইয়র্কে। কিনতে ইচ্ছুক এক সিন্ডিকেটের কাছে খামারটার পুরো বিবরণ দিতে হবে। তাই ফোর্টওয়ার্থে লোক পাঠিয়ে একটা চল্লিশ ডলারের স্যুট বানিয়ে নিলাম, তারপর যাত্রা করলাম ঘোড়া চলা পথে, সেই বিরাট গ্রামের উদ্দেশে।

'তা বেশ, যখন সেখানে পৌঁছলাম বুড়ো স্টার্লিং আর তার দলবল তো ভালভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের বিষয়—আশয়ের ব্যাপার আর আনন্দ এমন ভাবে মিলে গেল যে বোঝাই যায় না ওটা মোচ্ছব না ব্যবসা! ট্রলি—ভ্রমণ, চুরুট, থিয়েটার দেখা সবই চলল, মায় রবার পার্টি।'

'রবার পার্টি?'- উৎসুক হয় একজন শ্রোতা।

'নিশ্চয়', বলল বাড, 'তোমরা কেউ ওই পার্টিতে যাওনি কখনো? হেঁটে বেড়াও আর আকাশ-উঁচু বাড়িগুলোর মাথা অবধি দেখার চেষ্টা কর। তা যাহোক, আমরা খামার তো বেচে দিলাম, আর বুড়ো স্টার্লিং আমায় তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করল, ওখান থেকে রওনা হবার আগের রাতে। সেটা একটা বিরাট কিছু ব্যাপার নয়- শুধু আমি, বুড়ো আর তার গিন্নি আর মেয়ে। তবে পরিবারটার রুচি বড় সুন্দর, আলসেমির ব্যাপার ওখানে নেই। ওদের কাছে আমার পোশাকের যা ছিরি, ফোর্ট ওয়ার্থের ওই কাপড়ের মিস্তিরিকে দেখাবে ঘোড়া-কম্বল ব্যাপারির মতো। তারপর টেবিলে জাঁকজমক করে সাজানো ফুল, আর প্রত্যেকের প্লেটের কাছে যতরকমের কলকব্জার সরঞ্জাম। আপনাদের মনে হবে যেন আগে একটা রেস্তোরাঁয় সিঁধ কেটে খাবার এনে, তবে খেতে বসবেন। কিন্তু ততদিনে নিউইয়র্কে আমার এক হপ্তা কেটে গেছে, তাই ইস্টাইলের ব্যাপার সব বুঝে নিয়েছি। আমি করলাম কী, ওদের সঙ্গে তাল না দিয়ে নজর করে যেতে লাগলাম যন্ত্রপাতিগুলো ওরা কীভাবে ব্যাভার করে। তারপর ওই একই অস্তর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নিজের খাবারের ওপর। একবার ওদের গতিকের সন্ধান বুঝলে ওই উঁচু পাল্লার লোকদের সঙ্গে চলা কিছু কঠিন নয়। আমি তো ভালই চালিয়ে গেলাম। বেশ ঠান্ডা আর প্রসন্ন লাগছিল নিজেকে, তারপর খানিকবাদেই মুখ খুলে কথাবার্তা, আপখুশি মতো। এই খামার নিয়ে, পশ্চিম দেশ নিয়ে সব বেত্তান্ত; ওদের বললাম রেড ইন্ডিয়ানরা কেমন গঙ্গাফড়িঙের ঝোল খায়, সাপ খায়। এমন উৎসুক হয়ে উঠল তারা যে বলার নয়।

'কিন্তু ওই ভোজন উৎসবের আসল আনন্দ ছিল মিস্ স্টার্লিং। এমন ধড়িবাজ মেয়ে, এদিকে তো দু'সেন্ট দামের চিউয়িং-গামের চেয়ে বড় নয়; কিন্তু তার চালচলন এমন যে মনে হবে লোক বলতে সে একাই, আর সেটা বিশ্বাসও হবে। তবু সে মেজাজ দেখায়নি নয় একটুকুও, এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে যেন আমি কোন্ কোটিপতি—যখন এক পাহাড়ি খাদে কুকুরের ফিস্টির কথা বলি; আর শোনে এমন করে যেন কেউ ঘরের খবর দিচ্ছে।

'ক্রমে ক্রমে, গুগলি, জোলো সুপ আর এমন সব পদ খেলাম যা আমার তালিকায় কোনোকালেও ছিল না।- এরপর এক মেথডিস্ট পাদ্রি এলেন এক ধরনের ক্যাম্প্ স্টোভ সরঞ্জাম নিয়ে, পুরো রুপোর, লম্বা লম্বা পায়া, তলায় একটা বাতি।

'মিস্ স্টার্লিং সাপার টেবিলের ওপরেই চড়িয়ে স্টোভ জ্বালাল, কিছু রান্না করতে শুরু করল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম বুড়ো স্টার্লিঙের এত টাকা, অথচ একটা বাবুর্চি রাখতে পারে না! একটু বাদেই মেয়েটি পনিরের স্বাদের কোনো পদ সাজিয়ে দিল যা নাকি খরগোশের মাংস, তাই তো বলল সে, কিন্তু হলপ করে বলছি এক মাইলের মধ্যে কোথাও একটা তুলোর লেজও খুঁজে পাওয়া যেত না।

'প্রোগ্রামের শেষ পদ ছিল লিমোনেড। ছোট ছোট বেঁটে কাঁচের পাত্রে বয়ে আনা হয়েছিল, রাখা হয়েছে আপনার প্লেটের পাশেই। আমার বেশ তেষ্টা পেয়েছিল, তাই নিজেরটা তুলে নিয়ে সোজাই চোঁ করে খেয়ে ফেললাম। ঠিক এই ব্যাপারটাতেই আমাদের ছোট্ট লেডি একটা ভুল করে ফেলেছে। লেবুরসটা তো ঠিকই দিয়েছে, তবে চিনি ঢালতে ভুলে গেছে। তা বড় বড় গৃহিনীরাও অনেক সময় গল্তি করে ফেলেন। আমি ভাবলাম হয়তো মিস্ স্টার্লিং সবে ঘরকন্না আর রান্নার তালিম নিচ্ছে—ওই খরগোশটার কথায় তাই মনে হয়—তাই নিজের মনেই বলি, "ক্ষুদে লেডি, চিনি দাও, চাই না-ই দাও, আমি তোমায় মদত দেব।" তারপর নিজের পাত্রটা আবার তুলে ধরে, লিমোনেডের শেষ ফোঁটা অবধি গিলে ফেলি। তখন বাকিরাও নিজেদের পাত্র তুলে একই ভাবে খেয়ে ফেলল সবটা। এবার মিস্ স্টার্লিংএর দিকে চেয়ে যথার্থ হেসে উঠি, একটা সামান্য তামাশার মতো, যাতে সে ভুলটা করেছে বলে মনে না ব্যথা পায়।

'এরপর যখন আমরা সবাই বসার ঘরে গেলাম, ও আমার সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ আলাপ করল।

'ও বললে, "মিঃ কিংসবেরী, আমার গলতিটা এমন চমৎকারভাবে ভুলিয়ে দিলেন আপনি, সত্যিই অশেষ দয়া। চিনিটা দিতে ভুলে গিয়ে কী বোকার কাজই না করেছিলাম!"

"ও নিয়ে ভাববেন না", বললাম আমি, "কোনো ভাগ্যবান নিশ্চয় একদিন

এমন একজন সুরুচিসম্পন্না ক্ষুদে গৃহিনীকে দড়ির বাঁধনে বাঁধবে, এখান থেকে দূরে নয়।”

‘সজোরে হেসে উঠে মেয়েটি বলল, “যদি আমাকেই বুঝিয়ে থাকেন, মিঃ কিংসবেরী, তা হলে আশা করব তিনি আপনার মতোই আমার হতচ্ছাড়া ঘরকন্নার কাজ উদার চোখে দেখবেন।”

“ও কথা আর উল্লেখই করবেন না,” বললাম আমি, “মহিলাদের খুশি রাখতে সবকিছুই করতে পারি।”

বাডের স্মৃতি চর্বণ বন্ধ হল। এর মধ্যে একজন ওকে জিজ্ঞেস করল নিউইয়র্কবাসীদের সবচেয়ে লক্ষণীয় আর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী বলে তার ধারনা।

বাড জবাব দিলে, ‘নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের সবচেয়ে নজরে পড়ার মতো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল নিউইয়র্ক শহর। ওদের বেশির ভাগেরই মস্তিষ্কে থাকে “নিউইয়র্ক”। ওরা অন্য জায়গারও নাম শুনেছে, যেমন ওয়াকো, প্যারিস্ আর উষ্ণ প্রস্রবণ, আর লন্ডন; কিন্তু তাদের বিশ্বাস নেই ওসবে। ওরা মনে করে ওদের শহরটাই সব কিছু, একেবারে নিখাদ ভেড়ার পশম। এবার, ওদের নিজেদের গ্রামটাকে ওরা যে কেমন ভালবাসে তা বোঝাতে একটা ঘটনা বলব। আমার খামারে কাজ করার আমলেই “খ-ত্রিভুজে” উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল এইরকম একজনের কথা।

‘এই নিউইয়র্কবাসীটি এসেছিল খামারে একটা চাকরি খুঁজতে। বলল সে একজন ভাল ঘোড়সওয়ার, তার ঘোড়ায়-চড়া শেখার স্কুলের গন্ধ নাকি এখনো তার গায়ে লেগে আছে।

‘তা, কিছুদিন অবধি ওরা তাকে র‍্যাঞ্চ রসদ-ঘরের হিসেবপত্র দেখার কাজে লাগাল, কারণ অঙ্কে ভয়ানক তুখোড় ছেলেটা। কিন্তু ও-কাজে ওর ক্লান্তি এঁসে গেল, চাইল এমন কিছু কাজ যাতে দৌড়ঝাঁপ শরীর খাটানো যায়। র‍্যাঞ্চের ছেলেরা ওকে মোটামুটি পছন্দই করত, কিন্তু ও-ই আমাদের অস্থির করে তুলল সারাক্ষণ নিউইয়র্ক-নিউইয়র্ক করে চেঁচিয়ে। রোজ রাতেই আমাদের শোনাত ইস্ট রিভার, জে—পি মর্গান, আর ইডেন মিউজি আর হেনরি গ্রীন আর সেন্ট্রাল পার্কের কথা, যতক্ষণ না আমরা ওর দিকে টিনের থালা আর ঘোড়া দাগাবার লোহাগুলো ছুঁড়ি।

‘একদিন এই ছোকরা একটা লাফানে পনি-ঘোড়ার ওপর চড়ে বসল, আর পনিটাও কেমন যেন পেছন দিকটা একপাশে বাঁকিয়ে দিয়ে, যেমন ঘাস খাচ্ছিল তেমনি খেয়ে চলল, আর এদিকে নিউইয়র্কের ভাইটি কুপোকাত।

‘পড়বি তো পড়, তার মাথা ঠুকে গেল মেস্কিট কাঠের একটা চাঙড়ে, আর কোনো লক্ষণই দেখাল না ওর আবার খাড়া হয়ে ওঠার। আমরা ওকে এনে একটা তাঁবুর মধ্যে শুইয়ে দিলাম, আর ওকে দেখাতে লাগল প্রায় মৃত। তাই

গিডিওন পীজ তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় উঠে দাবড়ে গেল বুড়ো ডক্ স্লিপারের বাড়ি, ডগটাউনে—ওখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে।

'ডাক্তার এসে পড়েন, রোগীকে পরীক্ষাও করেন।

'বলেন, "বয়েজ, তোমরা বোধহয় এখন এর জিনসাজ আর কাপড় জামা নিয়ে লটারি খেলতে পার, কারণ এর মাথা ফেটে চৌচির, যদি আর দশ মিনিটও বাঁচে সেটা হবে একটা স্মরণীয় কেস্—দীর্ঘ পরমায়ুর।"

'অবশ্যই আমরা বেচারি ঘরোয়া মোরগের জিনসাজ নিয়ে জুয়ো খেলিনি—ওটা ছিল ডাক্তারেরই এক রসিকতা। তবে খুব গাম্ভীর্যের অনুভূতি নিয়ে আমরা ওকে ঘিরে দাঁড়ালাম, সবাই ওকে ক্ষমা করলাম আমাদের নিউইয়র্কের কথা বলে-বলে হয়রান করার জন্য।

'কাউকে কক্ষনো দেখিনি মরণের মুহূর্ত অবধি এমন ধীর শান্ত, এই লোকটার মতো। ওর চোখদুটো যেন আকাশের দিকে স্থির, আর কেবলি বিড়বিড় করে নিজের মনে বলে চলেছে মধুর সঙ্গীত, সুন্দর রাস্তা, আর সাদা-পোশাক মূর্তিদের কথা, আর হাসছে এমনভাবে যেন মরতে যাওয়াটাও এক আনন্দ।

'ডক বললেন, "ওতো প্রায় চলেই গেছে এতক্ষণে। যখনই কেউ ভাবতে শুরু করে স্বর্গ দেখতে পাচ্ছে, তার মানে তার হয়ে গেছে!"

'হলপ করে বলছি, যখনই নিউইয়র্কের ছোঁড়াটার কানে গেছে ডাক্তারের কথাগুলো, সঙ্গে-সঙ্গে সে যদি খাড়া হয়ে উঠে বসে না থাকে, তো আমার নাম কেটে দিও।

'একটু যেন হতাশভাবেই বলল সে, "কী বলছ! ওটা বুঝি স্বর্গ? দূর দূর! আমি তো ভেবেছিলাম ব্রডওয়ে। তোমাদের কেউ আমার কাপড়গুলো এনে দাও ভাই! এবার আমি উঠব।"

'হলপ করে বলছি,' গল্প শেষ করে বার্ড, 'চারদিন পরেই সে যদি নিউইয়র্কের টিকিট কেটে ট্রেনে না বসে থাকে তো আমার নাম—'!

New York by Camp Fire Light, *নিউইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪*

কাজের ভিড়ে রোমান্স

শেয়ার দালাল হার্ভে ম্যাক্সওয়েলের দপ্তরে চাকরি করে পিচার, গোপনীয় বিষয়ের কেরানি। তার স্বাভাবিক ভাবলেশহীন মুখখানার মধ্যে আচমকাই একটা বিস্ময় আর মৃদু ঔৎসুক্য ফুটে উঠল যখন তার ওপরওয়ালাকে দেখল সাড়ে-নটার সময় নিজের যুবতি স্টেনোগ্রাফারটিকে নিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কামরায় ঢুকতে। চট্ করে

"গুড মর্নিং পিচার" বলেই ম্যাক্সওয়েল তেড়ে গেলেন তাঁর ডেস্কের দিকে, যেন ওটার ওপর দিয়েই ডিঙিয়ে যাবেন! তারপরেই ঝাঁপ দিয়ে ডুব মারলেন ওর জন্য প্রতীক্ষারত এক গাদা চিঠিপত্র আর টেলিগ্রামের মধ্যে।

যুবতি মহিলাটি আজ এক বছর হল ম্যাক্সওয়েলের স্টেনোগ্রাফার। সে যে সুন্দরী তাতে দ্বিমত নেই, তবে নিশ্চয়ই স্টেনোগ্রাফার-সুলভ নয়। আর্কষণীয় প্রসাধনের ধারই ধারে না, তেমন জাঁকও নেই। কোনো চেন, বা ব্রেস্‌লেট কিংবা লকেট পরে না। চট্ করে যে কারো লাঞ্চের আমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবে তেমন ভাবও দেখায় না। ওর পোশাক ছাই-রঙা, সাধারণ, কিন্তু ওর দেহাবয়বকে তা সুষ্ঠু আর সুবিবেচিতভাবেই শোভনীয় করে রাখে। ছিমছাম কালো পাগড়ি-টুপিতে একটা কাকাতুয়ার সোনা-সবুজ পালক গোঁজা। আজকের এই সকালটিতে তাকে বেশ মৃদু আর সলাজ উজ্জ্বল দেখায়। গালদুটোও খাঁটি পীচ লাল, মুখভাবে আনন্দের সঙ্গে কোনো স্মৃতির ছাপ।

পিচার এখনো খানিকটা কৌতূহলী; দেখল আজ সকালে মহিলার চালচলনে একটু অন্য রকম ভাব। সিধে পাশের ঘরে যেখানে তার টেবিল, যেখানে না গিয়ে একটু ইতস্তত করে রয়েই যায় বাইরের দপ্তরে। একবার ম্যাক্সওয়েলের ডেস্কের পাশ কাটিয়েও যায়, এত কাছাকাছি যে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে ভদ্রলোকের সচেতন হবার কথা।

ডেস্কের ওধারে বসে আছে যে,—সে যেন মানুষ নয়, মেশিন একটা। নিউইয়র্কের ব্যস্তসমস্ত ব্রোকার—ঘর্‌ঘরে চাকা আর প্যাঁচখোলা স্প্রিংয়ের ওপর চলে।

ম্যাক্সওয়েল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'আবার কী ব্যাপার? কিছু আছে?' ওঁর খোলা চিঠিপত্রগুলো ভিড় ডেস্কের ওপর যেন সাদা মঞ্চের মতো সাজানো। চোখা ধূসর দৃষ্টি আধা-অধৈর্য ভাবে মহিলার ওপর ঝলক দেয়—নৈর্ব্যক্তিক আর রুক্ষ।

'কিছু না',—ছোট্ট হাসির জবাব দিয়ে স্টেনোগ্রাফার সরে যায় ওখান থেকে।

'গোপনীয় বিষয়ক' কেরানিকে বলে, 'মিঃ পিচার, কাল কি মিঃ ম্যাক্সওয়েল অন্য কোনো স্টেনোগ্রাফারকে বহাল করার কথা কিছু বলেছিলেন?'

পিচার জবাব দিল, 'তা তো বলেছিলেন। আরেকজনকে আনতে বলেছেন আমায়। কাল বিকেলে স্টেনো-এজেন্সিকে খবর দিয়েছিলাম আজ সকালে কয়েকজন নমুনা পাঠাতে। ন'টা পয়ঁতাল্লিশ হয়ে গেল, কোনো সাজানো টুপি কিংবা এক টুকরো আনারসের-চিউয়িংগামও তো এখন অবধি এসে উদয় হল না।'

যুবতি মহিলা বলল, 'তাহলে আমিই গিয়ে বরাবরের মতো বসি যতক্ষণ না কেউ এসে আমার জায়গাটা দখল করে।' বলেই তৎক্ষণাৎ সে ফিরে গেল নিজের

ডেস্‌কে, কাকাতুয়ার পালকওয়ালা কালো পাগড়ি টুপিটা ঝুলিয়ে দিল ওটার নিত্যদিনেব জায়গায়।

ব্যবসা যখন তুঙ্গে পৌঁছোয় সে-সময় কোনো ব্যস্ত ম্যানহাটানী দালালের চেহারা দেখার সৌভাগ্যে যাঁরা বঞ্চিত তাঁরা নৃতাত্ত্বিক কোনো পেশারই যোগ্য নন। কবি গেয়েছেন "গৌরবময় জীবনের জটলা জর্জরিত প্রহর" নিয়ে। দালাল ব্রোকারের প্রহর শুধু ভিড়াক্রান্তই নয়, তার প্রতিটি মিনিট আর সেকেন্ড আষ্টেপৃষ্টে আপাদমস্তক বাঁধা।

আর আজ হল হার্ভে ম্যাক্সওয়েলের কর্মব্যস্ত দিন। টিকার-মেশিনে ঝটকা মেরে মেরে টেপ বেরিয়ে আসছে কুণ্ডুলি পাকানো খিঁচুনির মতো, ডেস্‌কের টেলিফোনে অবিশ্রাম ঝনৎকার। অফিসের ভেতর দলে দলে মানুষজন আসতে শুরু করেছে, রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ম্যাক্সওয়েলকে ডাকছে, কেউ উল্লাসভরে, কেউ তীক্ষ্ণকণ্ঠে দাঁত খিঁচিয়ে, কেউ উত্তেজনাভরে। বার্তাবাহক ছেলেরা ছুটে আসছে, বেরুচ্ছে মেসেজ আর টেলিগ্রাম নিয়ে। দপ্তরের কেরানিরা দৌড়োদৌড়ি করছে ঝড়ের সময় জাহাজের খালাসিদের মতো। এমনকি পিচারের অমন মুখখানা শিথিল হয়ে তাতেও ফুটে উঠেছে জীবনের কিছু চিহ্ন!

শেয়ার এক্সচেঞ্জের বাড়িতে তো এখন ঘূর্নিঝড়, ভূমি-ধ্বস, তুষার ঝঞ্ঝা, হিমবাহ আর আগ্নেয়গিরি। সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোই এই ব্রোকারের দপ্তরগুলোতে অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো আকারে প্রতিচিত্রিত। ম্যাক্সওয়েল একেবারে দেয়াল অবধি চেয়ার ঠেলে নেন, আর কাজ চালান নাচিয়েদের ঢঙে, যারা পায়ের ডগায় নাচে। মূকাভিনেতার সুশিক্ষিত চট্‌পটে ভঙ্গিতে লাফিয়ে যান টিকার থেকে টেলিফোনে, টেবিল থেকে দরজায়।

এই ক্রমবর্ধমান আর গুরুত্বপূর্ণ চাপাচাপির মধ্যেই ব্রোকার হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন এক উঁচু-করে-বাঁধা সোনালি চুলের উপস্থিতিতে, যার কিনারাটুকু দেখা যাচ্ছে দোদুল্যমান মখমল আর অস্ট্রিচ পালকের নিচে। কৃত্রিম সীল-চামড়ার ঢিলে পোশাক, বড় বাদাম-প্রমাণ পুঁতির মালা একেবারে মেঝে অবধি ঝুলে আছে একটা রুপোর 'হার্ট' সমেত। মনে হচ্ছে একজন আত্মনির্ভরশীলা যুবতি, এই সামগ্রীগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। যাক্ পিচারই ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবার জন্য রয়েছে। পিচার বললে, 'স্টেনোগ্রাফার এজেন্সি থেকে মহিলা এসেছেন চাকরির ব্যাপারটা জানতে!'

ম্যাক্সওয়েল দু'হাত ভর্তি কাগজ আর টেপ নিয়ে আর্ধেকটা ঘুরে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী চাকরি?'

'স্টেনোগ্রাফারের পদের', বললে পিচার, 'কাল তো আমায় বলেছিলেন ওদের খবর দিতে, আর আজ সকালে একজনকে পাঠাতে?'

'পিচার তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে', বললেন ম্যাক্সওয়েল, 'এমন নির্দেশ

তোমায় আমি দিতে যাব কেন বল তো? মিস লেসলি এক বছর ধরে খুব সন্তোষজনক ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যতদিন তিনি এ-পদে বহাল থাকতে চান ততোদিন কাজটা তাঁরই। এখানে কোনো পদ খালি নেই, ম্যাডাম। পিচার! এজেন্সির কাছে ও অর্ডার বাতিল করে দাও, অন্য কাউকেও ভেতরে এনো না।'

'রুপোর হৃদয়' দপ্তর ছেড়ে গেল অফিসের আসবাবপত্রে স্বাধীনভাবে ঠোকর দিতে দিতে, দুলে-দুলে। যাবার সময় তার রাগ দেখতে হয়! পিচার এক সুযোগে হিসেব-রক্ষককে মন্তব্য শুনিয়ে বলল—'বুড়ো' মনে হচ্ছে দিনকার দিন আরো অন্যমনস্ক আর ভুলো হয়ে যাচ্ছেন।

ব্যবসার কাজে তাড়াহুড়ো আর গতি যেন আরো প্রবল আর দ্রুত হয়ে ওঠে। মেঝের ওপরেই ওরা আধডজন স্টক পেষাই করছিল, যার মধ্যে ম্যাক্সওয়েলের খদ্দেরদের নিয়োগের পরিমাণই বেশি। ভাড়ুই পাখির ঝাঁকের মতো সবেগে আসা-যাওয়া করছে কেনা-বেচার অর্ডারগুলো। ওঁর নিজস্ব কতকগুলো হোল্ডিং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে, আর ভদ্রলোক কাজ করে যাচ্ছেন কোনো উচ্চবেগ, জটিল, মজবুত কলের মতো—পুরো টান্ টান্ অবস্থায়. পূর্ণ বেগে, নিখুঁত, কোনো ইতস্তত নেই। ঘড়ির কলের মতোই প্রস্তুত আর তৎপর তাঁর যথাযথ শব্দ, সিদ্ধান্ত আর ব্যবস্থাগ্রহণ। স্টক আর বন্ধক, ঋণ আর বন্ধক, অতিরিক্ত সুবিধা ও জামিন—এই হল আর্থিক জগৎ, এর মধ্যে মানবিক পৃথিবী আর প্রকৃতির সংসারের কোনো স্থান নেই।

দিবা-ভোজনের সময়টা আসতে সামান্য বিরাম হল হৈ—হল্লার।

ম্যাক্সওয়েল তাঁর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে ঠাসা টেলিগ্রাম আর স্মারকপত্র নিয়ে, ডান কানে গোঁজা একটা ফাউন্টেন পেন, কপালের ওপর চুলগুলো নেমে এসেছে উশকোখুশকো সুতোর মতো। তাঁর জানলাটা খোলা, কারণ সর্বজনপ্রিয় দ্বাররক্ষী বসন্ত এসে সামান্য উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর জাগ্রত দস্তাবেজগুলোর ওপর।

আর ওই জানলা দিয়ে বয়ে আসছে কোনো ভ্রাম্যমাণ—হয়তো বা হারিয়ে যাওয়া সুঘ্রাণ—একটা হাল্কা মিষ্টি সুবাস, লিল্যাক ফুলের। মুহূর্তের জন্য অনড় হয়ে যান ব্রোকার। কারণ ও সুবাস তো মিস্ লেস্লির, এটা ওর নিজস্ব, একেবারে তারই।

গন্ধটা যেন ওকেই চাক্ষুষভাবে সামনে আনে, প্রায় ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। আর্থিক জগৎ হঠাৎ যেন এক বিন্দুতে ক্ষুদ্রায়িত। কিন্তু ও তো আছে পাশের কামরাতেই? মাত্র কুড়ি পা দূরে।

ম্যাক্সওয়েল অর্ধ-সোচ্চারে বলেন, 'সত্যি বলছি, কাজটা আমি এখনই করব। এখনই জিজ্ঞেস করব ওকে। অনেক আগেই করিনি কেন তাই তো ভাবছি!'

তাড়াতাড়ি বড় পা ফেলে এগুবার চেষ্টায় উনি প্রায় ছুটেই গেলেন ভেতরের কামরায়। ঝুঁকে পড়লেন স্টেনোগ্রাফারের ডেস্কে।

ও হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে। একটা হাল্কা গোলাপি ছোপ জেগেছে ওর গালে, চোখ দুটো সরল আর সদয়। ম্যাক্সওয়েল একটা কনুই রাখলেন ওর ডেস্কে। এখনো উনি দু'হাতে কাগজ আঁকড়ে রেখেছেন, কানের ওপর কলম গোঁজা।

তড়বড় করে বললেন, "মিস্ লেস্লি। আমার হাতে মাত্র এক মুহূর্ত অবসর আছে। আর এই এক মুহূর্তেই বলতে চাই মনের কথা। তুমি আমার স্ত্রী হবে? তোমার সঙ্গে গতানুতিক প্রেম করার সময় আমি পাইনি, কিন্তু সত্যিই আমি তোমায় ভালবাসি। তাড়াতাড়ি বল, দয়া করে...লোকগুলো যে 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক' বিল্ডিং মুগুর দিয়েই গুঁড়িয়ে দেবে।'

'ও, কিন্তু কীসের কথা বলছ তুমি?' অবাক হয়ে বলল মহিলা। চোখ বড় বড় করে ওঁর দিকে চেয়ে, উঠে দাঁড়াল।

অস্থিরভাবে ম্যাক্সওয়েল বললেন, 'আরে, বুঝতে পারছ না? আমি চাই তুমি আমায় বিয়ে কর। আমি তোমায় ভালবাসি মিস্ লেস্লি। আগেই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, আর এখন একটু ঝামেলা কমল বলে এই এক মিনিটের সুযোগই নিলাম। ওই যে, ওরা আমায় টেলিফোনে ডাকাডাকি করছে। পিচার! ওদের বল এক মিনিট সবুর করতে। কী মিস্ লেসলি, বিয়ে করবে না?'

খুবই একটা আজব ভঙ্গি করল স্টেনোগ্রাফার। প্রথমে মনে হল সে এত অবাক যে অভিভূত; তারপর তার বিস্মিত চোখ দুটো থেকে জল বেরিয়ে আসে; তারপর সে ওই জলের ভেতর দিয়েই রোদের উঁকির মতো হাসে। ওর একখানা বাহু আদর করে ব্রোকারের গলা জড়িয়ে ধরে।

মৃদু স্বরে বলে, 'এবার আমি বুঝেছি। এই মান্ধাতার ব্যবসাটাই তোমার মাথা থেকে কিছু সময়ের জন্য সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছে। আমি প্রথমে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কি মনেই পড়ে না হার্ভে? গত কাল সন্ধ্যা আটটার সময় ওই কোণের লিট্‌ল্ চার্চে আমাদের যে বিয়ে হয়ে গেল!

The Romance of a Busy Broker নিউইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

সামান্য উঁচুতে ওঠার ব্যাপার

একবার শীতের সময় নিউ অর্লিয়ন্সের 'আল্‌কাজার নট্ট কোম্পানি' টাকা তোলার ধাঁধায় ভ্রমণ করে বেড়াল মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার

উপকূল ধরে। অভিযানটা খুবই সার্থক হল। সঙ্গীতপ্রেমী, সহজ প্রভাবিত, স্পেনীয় আমেরিকানরা কোম্পানিকে 'ডলার' আর 'জিন্দাবাদ' দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। ম্যানেজার ফুলে ঢাক, দিলদরিয়া। জলবায়ুটা বাদ না সাধলে তিনি তাঁর উন্নতির প্রতীকটাই বের করে ফেলতেন—মানে তাঁর ওভারকোটটা, পশুলোমের নকশাদার কোমরবন্দওয়ালা দামি জিনিস। তারপর কোম্পানির লোকদের মাইনেপত্রও বাড়িয়ে দেবার জন্য প্রায় তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছেন সেই আবেগ, যাতে অনর্থক আনন্দের আতিশয্যে মুনাফা না কমে যায়।

ভেনিজুয়েলার উপকূলে মাকুটো শহরেই কোম্পানির সাফল্য এল সব চাইতে বেশি। কল্পনা করুন, গোটা কোনি দ্বীপটাকে স্পেনীয়তে 'তর্জমা' করা হয়েছে—তা'হলেই আন্দাজ পাবেন মাকুটোর। ওখানে ফ্যাশনের মরশুম হল নবেম্বর থেকে মার্চ। ছুটির সময় কাটাতে ভিড় করে আসে লা-গিয়ারা, কারাকাস্, ভ্যালেন্সিয়া আর অন্য ভেতরের শহরের বাসিন্দারা। চলে সৈকতস্নান, উৎসব, ষাঁড়ের লড়াই, আর কেলেঙ্কারি। তার ওপর আছে লোকদের গানবাজনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, যার শখ শহরের প্লাজা আর সমুদ্রতীরের ব্যান্ডবাদ্যি দ্বারা মেটানো যায় না।

ভেনিজুয়েলার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আর একনায়ক গাজ্‌মান ব্ল্যাঙ্কো তাঁর সভাসদদের নিয়ে ওই ঋতুটায় বসবাস করেন মাকুটোতে। একচ্ছত্র নায়ক—যিনি নিজেই কারাকাসের গ্র্যান্ড অপেরার বাবদ ব্যাক্তিগত অনুদান দেন বছরে চাল্লিশ হাজার পেসো—হুকুম দিলেন সরকারী মালখানাগুলো পরিষ্কার করে সেখানে একটা অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ বসানো হোক। তাড়াতাড়ি করে মঞ্চ তৈরি হল, দর্শকদের জন্য সাদামাটা কাঠের বেঞ্চি বসানো হল। যোগ করা হল ব্যাক্তিগত বক্স আসন,—প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী আর সরকারের হোমরাচোমরাদের জন্য।

মাকুটোতে কোম্পানি রইল দু'হপ্তা। প্রতি প্রদর্শনীতেই প্রেক্ষাগৃহ প্রায় কানায় কানায় ভর্তি। অবশেষে সঙ্গীত-পাগল মানুষরা খোলা দরজা আর জানলাতেও জায়গা পাবার জন্য লড়েছে। তারপর বাইরেও ভিড় ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর অবধি। এখানকার দর্শকদের অদ্ভুত উজ্জ্বল বিচিত্র রঙের বাহার দেখতে হয়! ওদের মুখের বর্ণ খাঁটি রক্তের স্পেনীয় জলপাই-হলদে থেকে শুরু করে মেস্টিজোদের হলদে-বাদামি ছোপ ডিঙিয়ে একেবারে কয়লা-কালো ক্যারিবীয় আর জামাইকা নিগ্রো অবধি। মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট ইন্ডিয়ানের দল, যাদের মুখ পাথরগড়া পুতুলের মতো, মোটা সুতোর জাঁকালো কম্বল চড়ানো। ইন্ডিয়ানরা এসেছে জামোরা, লস্ এ্যান্ডিজ আর মিরান্ডার পাহাড় রাজ্যগুলো থেকে, উপকূল শহরে তাদের স্বর্ণরেণু বিক্রি করতে।

দেশের ভেতরের এই দুর্গ-পাহাড়ের বাসিন্দাদের ওপর অপেরার যা প্রভাব পড়ল তা মন্ত্রবৎ, দেখার মতো। পাথর-বনে-যাওয়া তূরীয়ানন্দে তাদের দেখায় সাধারণ উত্তেজিত মাকুটোবাসীদের মধ্যে অন্যরকম—তারা নিজেদের উল্লাস প্রকাশ

করে পাগলের মতো জিভ আর হাত নেড়ে। একবারই শুধু এই আদিবাসীদের গম্ভীর আনন্দ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। "ফাউস্ট" নাটকের সঙ্গীত রূপায়নের সময় "রত্নগীতি" অংশটা শুনে অতি বিহ্বল গাজ্‌মান ব্ল্যাঙ্কো মঞ্চের ওপর ছুঁড়ে দিলেন স্বর্ণমুদ্রার একটা থলি। অন্য নামজাদা নাগরিকরাও নেতাকে অনুসরণ করে, সুবিধেমতো খুচরো টাকা সংগ্রহ করে ছুঁড়ে দিল, আর তখন কয়েকজন রূপসী ফ্যাশনদুরস্ত সেনোরাও তাদের অনুকরণে, বিহ্বল হয়ে রত্ন পাথর, একটা-কি-দুটো আংটি ছুঁড়লেন "মার্গেরিট" (বিজ্ঞাপনে এ-চরিত্রের অভিনেত্রী) মাদ্‌মোয়াজেল নিনা জিরোর পায়ের কাছে। তারপর হলঘরের বিভিন্ন অংশ থেকে মাথা তুলল এই অবিচল পাহাড়ি মানুষগুলো। তারা মঞ্চের ওপর ছুঁড়ে দিল ছোট ছোট বাদামি মেটে থলি যা নরমভাবে ঝুপ্ করে পড়ে, কিন্তু ছিটকে ওঠে না। নিঃসন্দেহেই এই তোফা তারই কলাকৃতির তারিফে, কারণ মাদমোয়াজেল জিরোর মুখ আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয় যখন সে এই হরিণচামড়ার থলিগুলো তার প্রসাধন কক্ষে নিয়ে গিয়ে খোলে আর দেখে ওগুলোর মধ্যে খাঁটি সোনার রেণু! তাই যদি হয় তা হলে আসল আনন্দ তো ওরই, কারণ ওর গানের কণ্ঠ প্রকৃত আবেগময়ী শিল্পীর অনুভূতিতে নিখাদ, সরল, শিহরণময়—এ পুরস্কারের যোগ্য সে।

কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তুটা আল্‌কাজার নট্ট কোম্পানির বিজয়ের সাফল্য নিয়ে নয়: ওটা শুধু প্রসঙ্গক্রমে, রং চড়াবার জন্য। একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা মাকুটোতে ঘটে গেছে, একটা সমাধাহীন রহস্য, যা কিছুকালের জন্য আনন্দময় মরশুমের উল্লাস সংযত করে দিয়েছে।

এক সন্ধ্যায় ক্ষণকালীন গোধূলি আর মঞ্চে অবতীর্ণ হবার সময়টুকু মধ্যে, আবেগপরায়ণা "কারমেনের" ভূমিকায় লাস্য—কালো পোশাকে যার নামবার কথা সেই মাদমোয়াজেল নিনা জিরো অদৃশ্য হয়ে গেল ছ'হাজার মাকুটোবাসীর চোখ কানের সামনে থেকে। চিরাচরিত আলোড়ন, তাকে খোঁজার জন্য হুড়োহুড়ি; দূতরা ছুটে গেল তার স্বাভাবিক আস্তানা ছোট ফরাসী পরিচালিত হোটেলে। নট্টকোম্পানির আর সবাই ছুটল এখানে ওখানে—হয়তো কোনো প্রসাধনস্থলে এখনো সময় নিচ্ছে, অথবা সমুদ্র সৈকতে অযথা স্নান বিলম্বিত করছে। কিন্তু সমস্ত সন্ধানই বৃথা হল। মাদমোয়াজেল উধাও।

এক ঘণ্টা কেটে যায় তবু সে আসে না। একনায়ক রাষ্ট্রপতি কোনো 'প্রধানা অপেরা-গায়িকার' খামখেয়ালিতে অভ্যস্ত নন্। তিনি অধৈর্য হন। বক্স থেকে এক রক্ষীকে পাঠিয়ে দেন ম্যানেজারকে বলতে, যে যদি অবিলম্বে পর্দা না ওঠে তা হলে উনি এক্ষুনি গোটা কোম্পানিকে গারদে পুরে দেবেন। এতে অবশ্য তাঁর হৃদয় শূন্য হয়ে যাবে—এই রকম কাজ বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে বলে। মাকুটোর পাখিদের দিয়েও গান করানো যায়।

ম্যানেজার কিছুকালের জন্য মাদ্‌মোয়াজেল জিরোর আশা ছেড়ে দেন। কোরাসের

একজন সদস্যা যার বহুকাল থেকে বাসনা ছিল স্বপ্নের ভূমিকাটিতে অভিনয় করার, সে এই সুযোগটি নিয়ে চটপট "কারমেন" সাজল। আর অপেরাও চলতে থাকল।

পরে যখন হারানো কোকিল আর ফিরেই এল না, ওরা শরণাপন্ন হল সরকারী সাহায্যের। প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই অনুসন্ধানের কাজে লাগালেন পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে, অন্য নাগরিকদেরও। মাদমোয়াজেল জিরোর অন্তর্ধানের একটি সূত্রও পাওয়া গেল না। "আলকাজার" দল শহর থেকে চলে গেল উপকূলের দক্ষিণে বরাবর আরো বায়নার প্রদর্শনীতে হাজির থাকতে।

ফেরার পথে ওদের স্টীমার ফের দাঁড়াল মাকুটোতে, ম্যানেজার উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর করলেন। মহিলার কোনো চিহ্নই আবিষ্কার হয়নি। "আলকাজারের" পক্ষে আর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। অন্তর্হিতা মহিলার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রেখে যাওয়া হল হোটেলের সংরক্ষণে, যদি পরে কখনো আবার এসে হাজির হয়। অপেরা কোম্পানি তাদের ঘরে ফেরার যাত্রা শুরু করল নিউ অর্লিয়ন্সের উদ্দেশে।

•

সমুদ্রপাড়ের শক্ত রাস্তায় ডন সেনর জনি আর্মস্ট্রং-এর দুটো জিন-আঁটা খচ্চর আর চারটে মাল-বওয়া খচ্চর দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কখন চালক লুইজের চাবুকটা 'সাঁই' করে ওঠে। সেটাই হবে সংকেত পাহাড়ের দিকে আরেকটা লম্বা যাত্রা শুরু করার। মালবাহী খচ্চরগুলোর পিঠে বোঝাই নানা ধরনের লোহালক্কড়ের জিনিস আর ছুরি-চামচ-কাঁটা। এ জিনিসগুলো জনি বেচে অন্তর্দেশ এলাকার ইন্ডিয়ানদের কাছে, বিনিময়ে পায় সোনার রেণু যা তারা আন্দিস পাহাড়ের নদীগুলো থেকে ছেঁকে তোলে, আর ওর আসার অপেক্ষায় জমিয়ে রাখে পালকের ফাঁপা নলে আর থলিতে। খুব লাভজনক ব্যবসা, তাই সেনর আর্মস্ট্রং প্রত্যাশা করে ও সেই লোভনীয় কফি বাগানটা শিগগিরই কিনে ফেলতে পারবে।

সরু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আর্মস্ট্রং বকচ্ছপ স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে বুড়ো পেরাল্টোর সঙ্গে,—ধনী দেশীয় সওদাগর যে সবে আধ গ্রোস কামার-বাড়ির দা ওকে বেচেছে চারগুনো দামে। আর সংক্ষিপ্ত ইংরিজি চালায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল ছোটখাটো জার্মান রাকারের সঙ্গে।

পেরাল্টো বলে, 'নিয়ে যাও সেনর, সাধুসন্তদের আশীর্বাদ, যাত্রাকালে।'

পাইপের আড়াল থেকে রাকার গরগর করে বলে, 'বরং কুইনিন ব্যবহার কোর। রোজ রাতে দু'গ্রেন করে, আর বেশি লম্বা সফরে যেও না জনি, আমাদের যে তোমাকে দরকার। ওই মেলভিলটা হুইস্ট্ খেলতে গিয়ে বড় চোট্টামি করে, কিন্তু ও ছাড়া অন্য খেলাও নেই। বিদায়, আর পাহাড়ি খাতগুলোর ধার দিয়ে চলবার সময় বাছা নজর রেখো খচ্চরের কান দুটোর মাঝখানে।'

লুইজের খচ্চরের ঘন্টি বেজে উঠল, সতর্কবাণী শোনার পর মালবাহী 'ট্রেন'

একসার বেঁধে চলতে শুরু করে। আমস্ট্রং হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে নিজের জায়গা নিল মিছিলের একেবারে পুচ্ছাংশে। সরু রাস্তা ধরে উঠে ওরা পাশের দিকে মোড় নেয়, দোতলা কাঠের ইংগল্‌স্‌ হোটেলের সামনে দিয়ে যায়। সেখানে চওড়া চত্বরে গড়াচ্ছে আইভ্‌স্‌, ডসন, রিচার্ডস্‌ আর বাকি ছোকরারা, এক হপ্তা পুরোনো খবরের কাগজ পড়ছে। রেলিঙের ওপর ভিড় করে ওরা চিৎকার করে ওর উদ্দেশে নানা বিদায়বাণী জানায়—বন্ধু ভাবে, জ্ঞান দিয়ে বা বোকার মতো! চত্বরের ওপর দিয়ে যাবার সময় ওরা ধীরে দুলকি চালে গাজমান ব্ল্যাঙ্কোর ব্রঞ্জের মূর্তিটার সামনে দিয়ে যায়। চার দিকে সঙীন-ওয়ালা রাইফেলের বেড়া। সেগুলো বিপ্লবীদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তারপর ওরা বেরিয়ে গেল শহর থেকে—কুঁড়েঘরের সারির ফাঁক দিয়ে, যেখানে গিজগিজ করছে মাকুটোর ল্যাংটা ছেলেপিলেগুলো। ওরা এগিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কলাবাগানের ভিজে ঠান্ডার ভেতর দিয়ে চলে, অবশেষে বেরোয় একটা চক্‌চকে নদীর ধারে, সেখানে স্বল্প-বাসে বাদামি মহিলারা সজোরে পাথরের ওপর কাপড় কাচছে। তারপর মাল-'ট্রেনটা' নদী হেঁটে পেরিয়ে হঠাৎই শুরু করল চড়াইয়ের পথে চলা. উপকূলের যা কিছু সভ্যতা, তাকেই তারা বিদায় জানাল এবার।

কয়েক হপ্তা ধরে লুইজের নির্দেশে আর্মস্ট্রং তার গতানুগতিক পাহাড়ি পথে চলেছে। প্রায় পঁচিশ পাউন্ড ওই দামি ধাতু জমিয়েছে সে এর মধ্যে, যার মানে প্রায় পাঁচ হাজার ডলার মুনাফা। এবার বোঝা-হালকা খচ্চরগুলোর মাথা ফেরানো হল আবার উৎরাই পথেই। যেখানে পাহাড়ের ধারে গভীর কাটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে গুয়ারিকো নদীর মুখ, সেইখানে সারিটাকে দাঁড় করাল লুইজ।

'এখান থেকে আধ-দিনের পথ গেলেই, সেনর, টাকুজামা গ্রামটা', বলল সে, 'ওটা আমরা কখনো দেখিনি। মনে হয় ওখানে অনেক আউন্স সোনা পাওয়া যেতে পারে। একবার গেলে মন্দ হয় না।'

আর্মস্ট্রং সায় দিলে। ওরা আবার ওপর দিকে উঠে চলতে থাকল টাকুজামার দিকে। শুঁড়িপথটা যেমন এবড়োখেবড়ো তেমনি বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়া, গভীর বনের ভেতর দিয়ে গেছে। রাত হতেই অন্ধকার আর অস্পষ্ট। লুইজ আরেকবার দাঁড়ায়। ওদের সামনে একটা কালো গভীর খাদ, যতোদূর নজর যায় পথটা মাঝবরাবর দ্বিখণ্ডিত।

লুইজ খচ্চর থেকে নামে। বলে, 'একটা পুল তো থাকার কথা!' বলেই খাতের পাশে খানিকটা দূর ছুটে যায়। চেচিঁয়ে ওঠে, 'এই তো!' আবার খচ্চরে উঠে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই আর্মস্ট্রং একটা শব্দ শুনতে পায়, যেন একটা বজ্রগম্ভীর ঢাক বাজছে অন্ধকারের মধ্যেই কোথাও। ওটা আসলে পুলের ওপর খচ্চরদের খুর দাপানোর শব্দ। সেতুটা খাম্বার সঙ্গে শক্ত চামড়া বেঁধে তৈরি, খাদের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি টানা। আধ মাইল দূরেই টাকুজামা।

গ্রামটা পাথর আর মাটির কুঁড়ে ঘরের একটা জটলাই বলা চলে, অজানা জঙ্গলের গভীরে সাজানো। ওরা যখন এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের কানে এল একটা শব্দ যা ওই মগ্ন নিঃসঙ্গতার মধ্যে কেমন বেখাপ্পা। একটা লম্বাটে নিচু কাদামাটির কুটিরের কাছাকাছি এসেছে ওরা। সেখান থেকে জেগে উঠছে এক গায়িকা মহিলার সুললিত কণ্ঠস্বর। কথাগুলো ইংরেজি, আবহাওয়াটা আর্মস্ট্রং-এর পরিচিত স্মৃতির, তবে ওর সঙ্গীত-জ্ঞানের কাছেপিঠেও নয়।

ও খচ্চর থেকে নেমে পড়ে, চুপিচুপি এগিয়ে যায় ঘরের এক প্রান্তে একটা সরু জানলার দিকে। সাবধানে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে ওর তিন ফুটের মধ্যেই এক অপূর্ব সুন্দরী, প্রশান্ত-দর্শন মহিলা। চিতাবাঘের ছালের চমৎকার ঢিলেঢালা ঘাগরা পরা। কুটিরের যে সামান্য ফাঁকা জায়গাটুকুর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তা ভরে গেছে আসনপিঁড়ি করে-বসা রেড ইন্ডিয়ানদের মূর্তিতে।

মহিলা তার গান শেষ করে ছোট জানলাটার কাছ ঘেঁষেই বসল,—যেন যেটুকু নির্মল বাতাস পাচ্ছে তাতেই সে ধন্য। ওর গান শেষ হতেই দর্শকদের অনেকে উঠে ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল ছোট ছোট থলি। সেগুলো নরম শব্দে পড়ে। একটা কর্কশ কলরব—নিঃসন্দেহেই কোনো বর্বর ধরনের হর্ষ আর মন্তব্যের অভিব্যক্তি—গম্ভীর-বদন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

চট্ করে কোনো সুযোগ নেবার অভ্যাস আর্মস্ট্রং-এর আছে। গোলমালের সুবিধাটা কাজে লাগিয়ে সে চাপা কিন্তু পরিষ্কার গলায় বলল- 'আপনার মাথা এদিকে ফেরাবেন না, শুধু শুনে যান। আমি একজন আমেরিকান। যদি আপনার সাহায্যের দরকার হয়, বলুন সেটা কী ভাবে করতে পারি। যত সংক্ষেপে পারেন জবাব দিন।'

ওর সাহসের যোগ্য পাত্রীই মহিলাটি। সে যে কথাগুলো ধরতে পেরেছে তা তার ফ্যাকাশে গালে সামান্য লালের উচ্ছ্বাস দেখেই বোঝা গেল। তারপর প্রায় ঠোঁট না নেড়েই সে বলল:

'আমি এই ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দী। সাহায্যের যে কত প্রয়োজন তা ঈশ্বরই জানেন। দু'ঘন্টা বাদে ছোট কুঁড়ে ঘরটার কাছে আসবেন, কুড়ি গজ দূরে পাহাড়ের দিক থেকে। জানলাতে আলো আর একটা লাল পর্দা থাকবে। দরজার সামনে সব সময় একজন রক্ষী থাকে যাকে আপনার সামলাতে হবে। ভগবানের দোহাই, আসতে ভুল করবেন না।'

গল্পটা মনে হচ্ছে রোমাঞ্চকর অভিযান, উদ্ধার আর রহস্য থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। আসলে ব্যাপারটাই এমন নরম-সরম যে বীরত্ব আর ধুমধাড়াক্কার সুর এতে নেই। অথচ তবু এর নাগাল কালের আদি থেকে পরিব্যাপ্ত। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পরিবেশ', অনন্যোপায় হয়েই এই দুর্বল শব্দটা ব্যবহার করতে হয় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নাম-করার-অসাধ্য 'আত্মীয়তা' বোঝাতে, ওই আজব সম্পর্কটার জন্যই

বোধহয় আমাদের আবেগ-প্রকৃতির ওপর প্রভাব খাটায় পাথর, গাছ, নোনা জল আর আকাশের মেঘ। কেন আমরা পর্বতের উচ্চতা দেখে গুরুগম্ভীর আর উন্নত বোধ করি, কেন মাথার উপর ঝোঁকা অরণ্য আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত চিন্তাবিধুর করে, কেন বালুসৈকতে তরঙ্গমালা দেখে চঞ্চল হয়ে উঠি, বাঁদুরে নাচ নাচি? তাহলে কি আদিম জীব বীজ...যাক্ যথেষ্ট হয়েছে! রসায়নবিদরা এ ব্যাপারে তদন্ত করছেন, আর শিগগিরই তারা গোটা জীবনকে সাংকেতিক চিহ্নে তালিকাবদ্ধ করবেন।

অতএব সংক্ষেপে কাহিনীটাকে বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে রাখতে—জন আর্মস্ট্রং গেল কুটির বাড়িতে, ইন্ডিয়ান রক্ষীটাকে গলা টিপে রেখে, মিস্ জিরোকে তুলে নিয়ে এল। মহিলার সঙ্গেই চলে এল তার টাকুজামায় বাধ্যতামূলক কাজের ছ'মাসের উপার্জন—বেশ কয়েক পাউন্ড সোনার রেণুও। নিউ অর্লিয়ন্সের ফরাসী অপেরা হাউস থেকে বিষুব রেখা অবধি—কারাবু জাতের ইন্ডিয়ানরাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সঙ্গীতপ্রেমী জাত। এমার্সনের উপদেশ: "হে অতৃপ্ত মানব, যা তোমার চাই, তা তুলে নাও, তবে দামটা দিও"—এ উপদেশকে উত্তম বলেই তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে অনেকেই মাকুটোতে আলকাজার অপেরা কোম্পানির প্রদর্শনীতে হাজির ছিল। তারা মাদমোয়াজেল জিরোর কায়দা আর ঘরানাকে সন্তোষজনক বিবেচনা করেছে। তারা ওকে চাইছিল, তাই এক সন্ধ্যায় আচম্বিতে বিনা ঝামেলায় তাকে উঠিয়ে নিয়ে পালাল। ওকে যথেষ্ট আদরযত্নেই রেখেছিল, শুধু একটা করে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান তারা ওকে চেপে বের করত। মিঃ আর্মস্ট্রং তাঁকে উদ্ধার করাতে যে বেশ খুশিই হল। এই তো গেল রহস্য আর অভিযানের অংশ। এবার আসুন আদিম জীব-বীজের তত্ত্বটা একটু খতিয়ে দেখি।

জন আর্মস্ট্রং আর মিস্ জিরো তো ঘোড়ার পিঠে চেপে চলল আন্দিজের চূড়োগুলোর মাঝখান দিয়ে, ওদেরই বিশালতা আর উচ্চতার ছায়ায়। প্রকৃতির বিরাট পরিবারে দূরতম স্থানে অপসারিত দুই পরম শক্তিমান আত্মীয় এবার সচেতন হল নিজেদের বন্ধন সম্পর্কে। আদিমতম ভূমি-উত্থানের ওই বিশাল স্তূপগুলোর মাঝে, ওই প্রকাণ্ড নীরবতা আর দীর্ঘায়িত দূরত্বের ময়দানে, মানুষের ক্ষুদ্রতা যেন আরো কাছাকাছি আসে,—যেমন একটি রসায়ন বস্তু আরেকটি তলানির মধ্যে থিতিয়ে পড়ে। ওরা দুজন সম্ভ্রম রেখে চলাফেরা করে—যেন মন্দিরের মধ্যে। ওদের আত্মা উন্নীত হয় রাজসিক উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। একটা মহিমা ও শান্তির রাজ্যে যেন ভ্রমণ করে ওরা।

আর্মস্ট্রং-এর কাছে এ নারীকে মনে হয় প্রায় পবিত্র বস্তুর মতো। এ নারীর আত্মত্যাগের শুভ্র শান্ত মর্যাদা, তার পার্থিব রূপকে নির্মল করেছে; মনে হয় তা যেন প্রকাশ করেছে এক অ-ধরা সৌন্দর্যের জ্যোতির্বলয়। তবু সাহচর্যের প্রথম

ক'ঘন্টাতেই সে আর্মস্ট্রং-এর এমন এক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল যার অর্ধেক মানবীয় ভালবাসা, আর বাকিটুকু কোনো ধরায় অবতীর্ণা দেবীর আরাধনা।

উদ্ধারের পর থেকে এখন অবধি মহিলা হাসেনি। পোশাকের ওপর এখনো রেখেছে চিতাবাঘ-ছালের আংরাখা, কারণ পাহাড়ি হাওয়া ঠান্ডা। তাকে যেন ওই বুনো ভয়ংকর উচ্চতার দেশে কোনো উজ্জ্বল রাজকন্যার মতোই দেখায়। ও রাজ্যের আত্মা যেন ওর আত্মার মধ্যেই অনুরণিত হচ্ছে। ওর চোখজোড়া সর্বদাই ফিরে থাকে বিষণ্ণ পাহাড়ের ঢালের দিকে, নীল গহ্বর আর তুষার ঢাকা চূড়োগুলোর দিকে, যেন ওদেরই সমান মহিমাময় বিষণ্ণতা ওরও। ভ্রমণের পথে একেক সময় ও গেয়ে ওঠে রোমাঞ্চকর 'টে ডিয়ুম' স্তবগান, আর কৃপাভিক্ষার গীত, যাতে ফুটে ওঠে পাহাড়ের প্রকৃত সুর, আর ওদের চলার পথকে করে তোলে গির্জার অলিন্দপথে চলার মতো সুগম্ভীর। উদ্ধারপ্রাপ্তা মহিলাটি কথা বলে কম, যেন চারদিকের প্রকৃতির স্তব্ধতায় অংশ নেয় ওর মেজাজ। আর্মস্ট্রং তাকে এক স্বর্গদূতীর মতো দেখে। অন্য নারীদের যেমন প্রেম জ্ঞাপন করা যায় তা যেন কিছুতেই চেষ্টাও করে চলে না এর সঙ্গে।

তৃতীয় দিনে ওরা নেমে এল প্রায় তরাই ভূমির কাছে, সমতল মালভূমি আর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায়। পাহাড়গুলো ক্রমেই পেছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু যেন মাথা উঁচোনো, তাদের গর্বোন্নত শির এখনো গুমোর দেখায়। এখানে ওরা মানুষের বসতির চিহ্ন পায়। বন পরিষ্কার করে একেক জায়গায় কফি-বাগিচার সাদা বাড়িগুলো। ওরা একটা পথে এসে পড়ে যেখানে পথিক আব মালবাহী খচ্চরদলের দেখা পাওয়া যায়। পাহাড়ের ঢালে গরু চরছে। একটা ছোট গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় ছোট বাচ্চার দল ওদের দেখতে পেয়ে চোখ বড় করে চেঁচিয়ে উঠল।

মিস্ জিরো এবার তার চিতা চামড়ার আংরাখাটা সরিয়ে রেখেছে। এখন ওটাকে একটু বেখাপ্পা লাগে। পাহাড়ে মনে হয়েছিল ওটা মানানসই, স্বাভাবিক। আর আর্মস্ট্রং যদি ভুল করে না থাকে, তবে ওটা সরিয়ে রাখার সঙ্গে সে তার হাবভাবে উঁচু মর্যাদার খানিকটাও যেন সরিয়ে দিয়েছে। তারপর যখন দেশগ্রাম হল আরো জনবহুল, পরিচয় পাওয়া গেল আরামদায়ক জীবনের, তখন আর্মস্ট্রং খুশি হয়েই দেখল আন্দিজ চূড়ার মহিয়সী রাজকন্যা আর যাজিকার রূপ থেকে সে এখন একটা নারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে—পৃথিবীর মেয়ে, তবে আকর্ষণ কিছুমাত্র কমেনি। ওর মর্মর শুভ্র গালে এখন সঞ্চারিত হচ্ছে সামান্য রাঙা আভাস। আংরাখা সরিয়ে দেবার ফলে যে মামুলি পোশাক উদ্ঘাটিত হয়েছে তা-ই ও দৃষ্টি-সচেতন হয়ে সযত্ন স্পর্শে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিচ্ছে। চুলের অবহেলিত বিন্যাস এখন সে মসৃণ করে নেয়। কঠোর পাহাড়চূড়ার শীতার্ত আবহাওয়ায় যা দীর্ঘদিন সুপ্ত থেকে ছিল সেই পার্থিব আগ্রহ ওর দুচোখে ফুটে ওঠে এবার।

হিম দেবত্বের এই বিগলন আর্মস্ট্রং-এর হৃদয়কে করে তোলে দ্রুত চঞ্চল। কোনো উত্তরমেরু অভিযানকারীও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত সবুজ ঘাস আর তরলিত জলের ওপর প্রথম দৃষ্টিপাত করে। ওরা এখন পৃথিবী ও জীবনের নিচের স্তরে, আর হার মানছে তার স্বকীয় সূক্ষ্ম প্রভাবের কাছে। পাহাড়ের কাঠিন্যে থেকে এখন আর ওদের বিরল বাতাসে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে না। ওদের আশেপাশে এখন ফল, শস্য, তৈরি গৃহের নিশ্বাস; ধোঁয়া আর গরম মাটির আরামপ্রদ সুবাস: আর সেই সান্ত্বনা, যা মানুষ রেখেছে নিজের আর 'ভাই' মাটির ধুলোর মাঝখানে, যেখান থেকে তার জন্ম। ওই ভয়ংকর পাহাড়গুলো পেরোতে গিয়ে মিস্ জিরো যেন তাদের পূজ্য গাম্ভীর্যের আত্মায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ কি সেই একই স্ত্রীলোক—এখন যে স্পন্দিত, উষ্ণ, আগ্রহী, সচেতন জীবন আর মায়ায় চঞ্চল, আর আঙুলের ডগাটা অবধি সত্যকারের নারী? এ বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আর্মস্ট্রং টের পায় কিছু ভুল বোঝা ওর ভাবনার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল এই পরিবর্তমান প্রাণীটির সঙ্গে এখানেই থেমে পড়ে, নিচে আর না নামে। এখানেই সেই উচ্চতা আর পরিবেশ যার কাছে ওর প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি সাড়া দেয়। সে ভয় পায় মানুষ অধ্যুষিত স্তরে যেতে। যে কৃত্রিম জীবন-স্তরের দিকে ওরা এগুচ্ছে সেখানে কি মেয়েটির মন আত্মসমর্পণ করে বসবে না?

এবার একটা ছোট মালভূমি থেকে ওরা দেখল সবুজ নিম্নভূমির কিনারায় সমুদ্র ঝলক দিচ্ছে। মিস্ জিরো একটা ছোট দম আটকানো নিশ্বাস ফেলল।

'ওই দেখুন, মিঃ আর্মস্ট্রং, ওই যে সমুদ্র! চমৎকার, তাই না? পাহাড় দেখে দেখে হয়রান হয়ে গিয়েছি'—বিরক্তির ভঙ্গি করে ও নিজের সুন্দর কাঁধটি ঝাঁকাল, 'উঃ ওই বিশ্রি ইন্ডিয়ানগুলো! একবার ভাবুন তো কী কষ্টই পেয়েছি! যদিও জানি একজন আকর্ষণীয়া তারকা হবার উচ্চাশা আমার মিটেছিল, তাহলেও আর সেটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আপনি সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করেছিলেন আমায় বের করে এনে। এবার বলুন তো মিঃ আর্মস্ট্রং, সত্যি বলুন আমাকে কি সত্যিই এমন বিচ্ছিরি ভুতুড়ে দেখাচ্ছে? জানেন তো, কয়েক মাস থেকে আমার কোনো আয়না দেখার সৌভাগ্য হয়নি।'

আর্মস্ট্রং জবাব দিল তার নিজের পরিবর্তিত মেজাজ মাফিক। মেয়েটির জিনসাজের মুখে এক হাত রেখে আরেকটি হাত রাখল ওর হাতে। লুইজ তখন খচ্চর সারির একেবারে আগে, তাই দেখতে পেল না। ওই ভাবে হাত রাখতে কোনো অসম্মতি দেখাল না মেয়েটি, বরং ওর চোখের দিকে অকপটে চেয়ে রইল নিজের চোখ রেখে।

তারপর সূর্য যখন ডুবছে ওরা নেমে এল তটভূমির সমতলে—টিয়েরা কালিয়েন্টার তালগাছ, লেবুগাছের নিচে গাঢ় সবুজ, বেগুনি লাল আর মাটি-হলুদের মধ্যে। মাকুটোর ভেতরে প্রবেশ করল ওরা, দেখল সমুদ্রে ক্ষণকালীন স্নানরত আনন্দমত্ত মানুষের সারি। পাহাড় তখন অনেক অনেক দূরে।

মাদোমোয়াজেল জিরোর চোখদুটোতে এখন যে আনন্দের উদ্ভাস তা সম্ভবই হত না পাহাড়চূড়োগুলোর খবরদারির মধ্যে। এখন অন্য আত্মারা তাকে ডাকছে—কমলাবনের পরীরা, ছল্‌বলে সৈকতফেনার কচি ভুতরা; সঙ্গীত, সুগন্ধ, রঙ আর মানুষের পরোক্ষ উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে দুষ্টু ভুতেরা। হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়ায় ও সশব্দে হেসে ওঠে।

আর্মস্ট্রংকে ডেকে বলে, 'একেবারে হৈ চৈ পড়ে যাবে না একটা? যদিও এক্ষুনি একটা বায়নার কাজ হাতে থাকলে মন্দ হত না ভাবছি। সংবাদপত্রের লোকদের কী মজার একটা পিকনিক হয়ে যেত। "বুনো ইন্ডিয়ানদের দলের হাতে বন্দিনী তাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল আশ্চর্য কণ্ঠসঙ্গীতে।"- খুব দারুন শিরোনামা হতো না একখানা? তবে এখন আর বাজি মাৎ করার কথা নয়—যে সোনার রেণুগুলো তোফা হিসেবে পেয়েছি ওই থলিগুলোতে, তারই দাম তো দু'হাজার ডলার হবে, তাই মনে হয় না?'

আমস্ট্রং ওকে ক্ষুদে 'ওতেল দ্য বুয়েঁ দেস্‌কাঁসারের' দরজায় ছেড়ে দিয়ে গেল, যেখানে ও আগে উঠেছিল। সেনর ভিলাব্লাঙ্কা, ধনী রবার দ্রালাল দুটো-চেয়ারের ওপর তাঁর মোটা শরীর ছড়িয়ে বসেছেন—তাঁর চকলেট রঙা মুখে মাখন গড়ানো হাসি ঝিকমিক করে। ফরাসী খনি ইঞ্জিনীয়র গিলবার্ত তাঁর ঝকঝকে নাক চশমার আড়াল থেকে কটাক্ষ হানেন। নিয়মিত সেনাবাহিনীর কর্নেল মেন্দেজ, সোনালি জরির উর্দিপরা, বোকা হাসি মুখ করে ব্যাতিব্যস্তভাবে শ্যাম্পেন বোতলগুলোর কাঁক্ খোলেন। মার্কুটীয় বীরপনা আর ফ্যাশনের অন্য সব নমুনারা নানা ঢঙে দাঁড়ান, পায়চারি করেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া। মেঝের ওপর পানীয় সুরা গড়াচ্ছে।

মাদমোয়াজেল জিরো অনায়াস মুখ্যভূমিকার ভঙ্গি নিয়ে কামরার মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সাদা লনকাপড়ের একটা পরিপাটি পোশাক আর চেরী-লাল রিবন এসেছে তার ভ্রমণের খোলসের বদলে। লেসের সামান্য উঁকি, একটা-কি-দুটো কুঁচি দেখা যাচ্ছে—সেই সঙ্গে হাতে-বোনা পিঙ্ক্ অন্তর্বাসের সুচিন্তিত যৎসামান্য আভাস। ওর কোলে একটা গীটার। ওর মুখে পুনর্জীবনের আলো যেন। বেদনা ও যাতনার ভেতর দিয়ে পাওয়া স্বর্গীয় শান্তি। বাজনার তালে ও একটা ছোট গান গাইছে:

"যখনি দেখবে গোল বড় চাঁদ
বেলুনের মতো আকাশে,
এ কালোমানিক উঠবে লাফিয়ে—
ওই চালিয়াৎ পোড়া-মুখেই যে চুমু দেবে সে।"

গায়িকার নজর পড়ল আর্মস্টং এর দিকে।

ডাকল, 'এই! জনি! এক ঘণ্টা ধরে রয়েছি তোমার অপেক্ষায়। কোথায় আটকে গিয়েছিলে? এ হে হে! এই পোড়া মানুষগুলো তো দেখছি নড়তেই পারে না। একেবারেই মগজে ঢোকে না কিছু। চলে এস ভেতরে, এই সোনালি তকমাধারী কফি-রঙা বুড়ো ফুর্তিবাজকে দিয়ে সিধে বরফ থেকে একটা বোতল খুলিয়ে দিচ্ছি।'

আর্মস্ট্রং বললে, 'ধন্যবাদ, এক্ষুনি চলবে না বোধহয় এসব। অনেকগুলো জরুরি কাজ আছে করার।'

বেরিয়ে গিয়ে সে রাস্তা ধরে চলে গেল, রাকারকে কনসাল-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মুখেই ধরল।

আর্মস্ট্রং বললে, 'এক প্রস্থ বিলিয়ার্ড হয়ে যাক। সমুদ্রের এই সমতলের স্বাদটা মুখ থেকে ফেরাতে কিছু আমার চাই।'

A Matter of Mean Elevation. নিউইয়র্ক সানডে ওয়র্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

ক্ষণিকের আত্মপ্রকাশ

বোগলের 'চপ' আর পারিবারিক রেস্তোরাঁটা যদি আপনার না জানা থাকে, তবে ক্ষতি আপনারই। কারণ আপনি যদি সেই ভাগ্যবানদের একজন হন যারা মেলা পয়সা খরচ করে খান, তাহলে আপনার হয়তো জানার আগ্রহ থাকবে বাকি অর্ধাংশ কীভাবে খায়। আর আপনি সেই অর্ধাংশেব কেউ হলে, যাদের কাছে ওয়েটারের বিল মুহূর্তের মৌখিক ব্যাপার,—নিশ্চয়ই জানবেন বোগলে কেমন জায়গা, কারণ ওখানে আপনার পয়সা যোল আনা উশুল—অন্তত পরিমাণের দিক থেকে।

বোগলের অবস্থান 'বুর্জোয়া জগতের' সেই সদর রাস্তায়—অষ্টম এ্যাভিন্যুর ব্রাউন-জোনস্-এবং-রবিনসন বুলভারে। কামরায় দু'সারি টেবিল রয়েছে—একেক সারিতে ছটি করে। প্রত্যেক টেবিলে একটা করে নুন মরিচের স্ট্যান্ড, তাতে মিষ্টি বা আচারের শিশি। গোলমরিচের শিশি ঝাঁকালে পাবেন মেঘের মতো স্বাদহীন বিবর্ণ কিছু—আগ্নেয়গিরির ধুলো যেমন। নুনের শিশি থেকে অবশ্য কিছুই আশা করবেন না। কেউ হয়তো ফ্যাকাশে শালগম নিংড়েও কিছু লাল রস বের করতে পারে, কিন্তু বোগলের শিশি থেকে নুন বের করতে গেলে তার সব শক্তি বেকার হয়ে যাবে। আবার প্রত্যেক টেবিলে আছে সেই নকল উপকারী সস্টাও- যা নাকি "ভারতীয় সাধুর প্রণালী অনুযায়ী" তৈরি।

বোগলে নিজে বসে ক্যাশিয়ারের ডেস্কে—শীতল, অর্থগৃধ্নু, ঢিলে, চাপা আগুনের মতো, আপনার পয়সা নেয় সে-ই। এক পালা খড়কে কাঠির পেছনে বসে সে

আপনার বাকি পয়সা গোনে, আপনার বিল সাজিয়ে রাখে, আর ব্যাঙের মতো আপনার দিকে ছুঁড়ে দেয় আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য। তার জলহাওয়া সংক্রান্ত বক্তব্যে সায় দেবার ওপর আবার বেশি কিছু বলতে যাবেন না। আপনি তো বোগ্‌লের দোস্ত-ইয়ার নন; আপনি পরিতৃপ্ত, ক্ষণিকের খদ্দের মাত্র, আর হয়তো দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়া অবধি আপনার ও তার মধ্যে দেখা নাও হতে পারে। অতএব আপনার বাকি খুচরো নিয়ে বিদায় হোন—পছন্দ হলে জাহান্নমেই যান। এই হল বোগ্‌লের আদর আপ্যায়ন।

বোগ্‌লের খদ্দেরদের চাহিদা মেটায় দু'জন ওয়েট্রেস আর একটি 'কণ্ঠস্বর'। একজন পরিবশনকারিনীর নাম এইলিন। সে দীর্ঘকৃতি, সুন্দরী, প্রাণোচ্ছল, লাবণ্যময়ী, লঘু রসিকতায় দড়ো। ওর বাকি নামটুকু ? বোগ্‌লের ওখানে কোনো পদবি মধ্য-নামের দরকার নেই, যেমন প্রয়োজন নেই আঙুল ধোয়া বাটিরও।

অন্য ওয়েট্রেসটির নাম টিল্‌ডি। 'ম্যাটিল্‌ডা থেকে', বলছেন কেন ? ভাল করে শুনুন—টিল্‌ডি- টিল্‌ডি। টিলডি মোটাসোটা, সিদেসাধা চেহারার। ভীষণ উদগ্রীব খুশি করতে, যাতে খুশি করা যায়। শেষ কথাকটি নিজের কাছেই একবার দুবার উচ্চারণ করুন, আর ওই দ্বিত্বটাকে বাড়িয়ে নিয়ে যান অনন্ত।

বোগ্‌লেতে ওই 'কণ্ঠস্বরটা' হল অদৃশ্য। ওটা রান্নাঘর থেকে আসে, খুব একটা মৌলিক ঔজ্জ্বল্য ওতে নেই। ওটা পার্থিব কণ্ঠস্বর—ওয়েট্রেসরা খাবারের জন্য হাঁক দিয়ে যা বলে তারই অযথা পুনরাবৃত্তি করে ওটা নিজেকে তৃপ্ত রাখে।

এইলিন যে সুন্দরী সে-কথাটা আবার বললে হয়রান হয়ে যাবেন নাকি? ও যদি কয়েক শো ডলার দামের পোশাক পরত আর যদি ঈস্টার পরবের প্যারেডে যোগ দিত, আর আপনি যদি ওকে দেখতেন, তা'হলে নির্ঘাত নিজেই সে কথা বলতেন।

বোগ্‌লের খদ্দেররা যেন ওর গোলাম। একসঙ্গে ছ'টা ভরা টেবিলের তদারক সে একাই করতে পারত। যাদের তাড়াহুড়ো আছে তারাও নিজের অধীরতা দমিয়ে রাখত শুধু ওর চকিত চপল চলা আর মনোরম দেহসৌষ্ঠর তাকিয়ে দেখার লোভে। যাদের খাওয়া হয়ে গেছে তারা আরো খেত যাতে ওর হাসি-মুখের আলোয় বেশিক্ষণ কাটাতে পারে। ওখানকার প্রত্যেক পুরুষই—বেশির ভাগই পুরুষ অবশ্য—চেষ্টা করত ওর ওপর নিজেদের ছাপ ফেলতে।

এইলিন এক ডজন লোকের সওয়ালের তুখোড় জবাব একসঙ্গেই দিতে পারত অনায়াসে। প্রত্যেকটা হাসি যা ছুঁড়ে দিত তা ছররা বন্দুকের গুলির মতো বিঁধত প্রত্যেকেরই বুকে। আর এসব করার ফাঁকেই আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে অর্ডার নিত পর্ক-আর-বীন, পট্‌-রোস্ট, হ্যাম-হুইট, সসেজ-হুইট কিংবা যে কোনো পরিমাণে যা কিছু, কড়ায়ে অথবা উনোনে, সরাসরি বা অন্য কিছুর সঙ্গে—সমস্তই। এই

সব ভোজ, ঢলাঢলি আর রসিকতার চাপান-উতোরে বোগ্‌লে প্রায় একটা সালোঁই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে মাদাম রেকামিয়ের স্থান দিয়েছে এইলিন।

মোহময়ী এইলিনের জন্য যদি অস্থায়ী অতিথিদের প্রবেশ ঘটে, তো যারা নিয়মিত খদ্দের তারা তো ওকে পুজোই করে বলতে হয়। স্থায়ী খদ্দেরদের অনেকের মধ্যেই যথেষ্ট রেষারেষি। এইলিন ইচ্ছে করলে প্রতি সন্ধ্যায় বাইরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারত। হপ্তায় অন্তত দু'দিন কেউ না কেউ ওকে থিয়েটারে বা নাচে নিয়ে যায়। একটি মোটা ভদ্রলোক (গোপনে ও আর টিলডি যার নাম দিয়েছিল "মোটা শুয়োর") ওকে একটা টার্কুইস আংটি উপহার দেয়। "গায়ে পড়া" নামে আরেকজন, যে ট্রাম লাইন কোম্পানির মেরামতি ওয়াগন চালায়, সে ওকে একটা পুড্‌ল্ কুকুর উপহার দিতে যাচ্ছিল যখন তার ভাই নবম অ্যাভিন্যুয়ে রাবিশ তোলার বায়না পেল। আরেকজন লোক (যে সব সময় পাঁজরার মাংস আর স্পিনিজ খায়) সে নাকি স্টকের দালাল—ওকে ডেকেছিল তার সঙ্গে "পারসিফাল্" দেখতে যাবার জন্য।

টিলডির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এইলিন বলে, 'তবে জায়গাটা কোথায় তা তো জানি না। কিন্তু একটা ভ্রমণের পোশাকে ছুঁচ চালাবার আগে আমাকে যে বিয়ের আংটি পরতে হয়—ঠিক কথা বলিনি, বল্?'

কিন্তু-, টিল্‌ডি!

বাষ্প আর বক্‌বকানিতে ভরা, বাঁধাকপির গন্ধময় বোগ্‌লেতে যেন একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটল। বোঁচা নাক, খড়ের রং চুল, মেচেতা পড়া চামড়া, মোটাসোটা চেহারার টিল্‌ডির কখনো কোনো প্রণয়ী জোটেনি। সে যখন রেস্তোরাঁর এদিকে-উদিকে ঘোরে, কেউ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে না, একমাত্র খাবারের জন্য জন্তুর খিদে নিয়ে ওর দিকে মাঝে মধ্যে আগুন চোখে তাকানো ছাড়া। কেউ মজা করে কোনো তামাশার কথাও বিনিময় করে না ওর সঙ্গে। সকাল বেলায় কেউ উচ্চকণ্ঠে ওকে সম্ভাষণও জানায় না, যেমন এইলিনের বেলায় করে, তবে ডিম প্রস্তুত হতে দেরি দেখলে দোষ দেয় বেশি রাত অবধি ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে বলে। কেউ একটা টার্কুইস আংটিও দেয়নি ওকে, নিমন্ত্রণ করেনি দূর রহস্যের সেই "পার্সিফালে" যাবার জন্য।

টিল্‌ডি এমনিতে ভাল পরিচারিকা, পুরুষরা ওকে সহ্য করে যায়, এই পর্যন্ত। যারা ওর টেবিলে বসে তারা দুটো একটা কথায় ওর সঙ্গে 'মেনু' নিয়ে কথাবার্তা সেরেই উঁচু গলায়, মিষ্টি করে, কিংবা টক ঝাল মিঠে স্বরে ডাকে সুন্দরী এইলিনকে। তারা চেয়ারে মোচড় খেয়ে টিলডির স্থূলবপু ডিঙিয়ে তাকায়, যেন এইলিনের দেহবল্লরীই তাদের বেকন আর ডিমভাজাকে সরেশ অমৃত করে তুলবে।

তা এইলিন যদি স্তাবকতা আর তারিফগুলো পেতে পারে, টিল্‌ডি না হয় অপ্রার্থিতা, বেগার-খাটিয়ে হয়েই খুশি থাকুক। খাটো গ্রীকের অনুগত বোঁচা নাক।

সে এইলিনের বন্ধু; বরং খুশিই হয় এইলিনকে হৃদয় জয় করতে দেখলে, আর পোড়া আশ্‌কে পিঠে আর লেবু 'ম্যারাঁ' থেকে তাদের মনোযোগ সরাতে পারলে। কিন্তু যতোই মেচেতা থাক্ আর খোড়ো রঙের চুল হোক, আমাদের কুৎসিততম লোকটিও তো স্বপ্ন দেখে একজন রাজপুত্র বা রাজকন্যার, যে অন্যদিকে বেচাল না হয়ে শুধু তার দিকেই ফিরবে।

একদিন সকালে এইলিন কাজে এল সামান্য কালশিটে পড়া চোখ নিয়ে, আর টিল্‌ডি যা সেবাযত্ন করল ওর, তা চোখের ডাক্তারকেও হার মানায়।

এইলিন ব্যাখ্যা দিল, 'ওই গায়ে-পড়া লোকটা। গত রাতে যখন তেইশের রাস্তা-ছ'য়ের অ্যাভিন্যুতে নিজের ঘরে যাচ্ছি; কাত্তিকের ঢঙে এসে, সত্যি বলছি, হঠাৎ অসভ্যতা শুরু করল। আমি সিধে তাকে পথ দেখিয়ে দিতে প্রথমে ঘাপটি মেরে থাকল; কিন্তু পেছু পেছু আসতে লাগল আঠারোর রাস্তার দিকে, তারপর আবার শুরু করল শয়তানি। ছিছি! তবে হ্যাঁ বেশ একটা চড় মেরেছি তার গালের ওপর। তখন আমার চোখে এই ঘুষিটা মারল। খুব বিশ্রি দেখাচ্ছে, না? মিঃ নিকলসন যদি দশটার সময় চা-টোস্ট খেতে এসে দেখেন কী লজ্জার কথা হবে।'

টিল্‌ডি এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে। কোনো লোক তাকে কক্ষনো অনুসরণ করার চেষ্টাও করেনি। চব্বিশ ঘন্টার যে কোনো সময়ই ও বাইরে নিরাপদ। কী সুখই না হয় কোনো পুরুষ তার পেছু নিলে, আর প্রেমের খাতিরে চোখে কালশিটে ফেলে দিলে!

বোগ্‌লের খদ্দেরদের মধ্যে একজন যুবক ছিল সীডার্স নামে, সে এক ধোপাখানার অফিসে কাজ করত। মিঃ সীডার্স পাতলা মানুষ, হালকা রঙের চুল, দেখলে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি তাকে শুকনো ধোলাই করে কলপ মারা হয়েছে। সে এইলিনের নজরে পড়ার প্রত্যাশা করে না, সে আত্মবিশ্বাস তার নেই। সাধারণত টিল্‌ডির টেবিলেই বসে, সেখানে মগ্ন হয়ে থাকে নীরবতা আর সেদ্ধ উইকমাছ নিয়ে।

একদিন ডিনার খেতে আসার আগেই মিঃ সীর্ডাস বীয়ার খেয়ে এসেছিল। রেস্তোরাঁয় তখন মাত্র দু—তিনটি খদ্দের। উইকমাছ খাওয়া শেষ করে মিঃ সীডার্স উঠে টিল্‌ডির কোমর জড়িয়ে ধরল বাহু দিয়ে, সশব্দে বেপরোয়াভাবে চুমু খেল তাকে, তারপর বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ধোপাখানার দিকে তুড়ি মেরে তাড়াতাড়ি চলে গেল প্রমোদ চত্বরে, জুয়ার মেশিনে পয়সা ফেলে খেলতে।

কয়েক মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে রইল টিল্‌ডি। তারপর তার সম্বিত এল, যখন দেখল এইলিন তার লম্বা তর্জনী ওর দিকে নাচাচ্ছে আর বলছে:

'আরে, টিল, দুষ্টু মেয়ে! খুব ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে! জানি প্রথম কাজ তুমি যা করবে—আমারই মানুষদের কাউকে চুরি করা! তোমার ওপর আমায় নজর রাখতে হচ্ছে শ্রীমতি!'

টিল্‌ডির ফিরে আসা বুদ্ধিতে আরেকটা নতুন আলোর উদয় হয়। এক লহমার মধ্যেই সে আশাহীন, মাথা নোয়ানো স্তাবক থেকে ক্ষমতাশালী এইলিনের সমকক্ষা নারী হয়ে গেল যে! ও নিজেই এখন পুরুষকে মুগ্ধকরা মদন‌দেবের শর—একজন স্যাবাইন সুন্দরী, যাকে ভোজসভার এই রোমানদের সামনে লাজুক হয়ে থাকতে হবে। মানুষ তার কোমরকে বেষ্টনসাধ্য আর ঠোঁটকে কামনাযোগ্য মনে করেছে। আকস্মিক প্রেমাবিষ্ট সীডার্স যেন, মনে করা যায়, একদিনের মধ্যেই ধোপায় কাচার কাজ আশ্চর্যভাবে করে দেখিয়েছে ওকে দিয়ে। ওর কুদর্শন চেহারার মলিন বসন একটানে খুলে, ধুয়ে, শুকিয়ে, কলপ দিয়ে পরিপাটি করেছে আর ফিরিয়ে দিয়েছে এক ছুঁচের কাজ করা সূক্ষ্ম বস্ত্র, যা দেবী ভেনাসেরই যোগ্য বসন।

টিল্‌ডির গালের মেচেতার দাগ মিশে থাকে গোলাপ রাঙা আভাসে। ওব চোখে এখন স্বর্গের দেবীদের উঁকি। এমনকি এইলিনকেও কেউ সর্বজনসমক্ষে রেস্তোরাঁর মধ্যে আলিঙ্গন বা চুম্বন করেনি।

টিল্‌ডি মজার গুপ্ত তথ্যটা আর চেপে রাখতে পারল না। যখন কাজ একটু ঢিলে, সে সময় সে বোগ্‌লের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর চোখ জ্বল জ্বল করছে। চেষ্টা করছে যাতে ওর কথাগুলোর মধ্যে অহংকাব না ফুটে ওঠে।

বললে, 'এক ভদ্রলোক আজ আমায় অপমান করেছে। আমায় কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে।'

বোগলে তার ব্যবসার মুখোশটা একটু খুলে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে তো এ সপ্তাহের পর, আসছে সপ্তাহ থেকে তুমি এক ডলার বেশি করে পাবে।'

পরের নিয়মিত ভোজনের সময় টিল্‌ডি খদ্দেরদের সামনে খাবাব পরিবেশন করতে করতে, যারা ওর পবিচিত তাদের প্রত্যেককে নরমসরম গলায় বললে (যেন ওর কৃতিত্ব নিয়ে তেমন বাড়িয়ে বলাব প্রয়োজন নেই):

'আজ এক ভদ্রলোক আমায় অপমান কবেছেন। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আমায় চুমু খেয়েছেন।'

অতিথিরা এ রহস্য উদ্‌ঘাটনকে বিভিন্ন রূপে নিয়েছে—কেউ অবিশ্বাসভরে, কেউ অভিনন্দন জানিয়ে। অন্যরা তো হাসি-তামাশার স্রোত বইয়ে দিয়েছে ওর ওপর—যেমন এতদিন অবধি শুধু এইলিনকে উদ্দেশ্য করেই করা হত। আর টিল্‌ডির বুক যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে, কারণ এতকাল ধূসর প্রান্তরে হেঁটে হেঁটে অবশেষে সে দেখতে পাচ্ছে দিগন্তের পারে সেই রোমাঞ্চের প্রাসাদ স্তম্ভ।

পরের দু'দিন মিঃ সীডার্সের আর দেখা নেই। এই সময়ের মধ্যে টিল্‌ডি নিজেকে প্রণয়যোগ্যা নারী হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে চুলের রিবন কিনেছে, এইলিনের মতো চুলের বাহার করেছে, আর কোমরটাকেও প্রায় দু'ইঞ্চি আঁট করে ফেলেছে। ওর এক রোমহর্ষক অথচ উল্লসিত ভয়, এই বুঝি মিঃ সীডার্স হঠাৎ ভেতরে

এসে ওকে পিস্তল দিয়ে গুলি করল। সে নিশ্চয় ওকে মরীয়ার মতো ভালবাসে; আর আবেগপ্রবণ প্রেমিকরা সব সময়ই অন্ধ ঈর্ষায় ভোগে।

এমনকি এইলিনকে পর্যন্ত কেউ পিস্তল দিয়ে গুলি করেনি। কিন্তু তারপরেই টিল্‌ডি আশা করে সে বরং ওর দিকে গুলি না ছুঁড়ুক, কারণ ও যে বরাবরই এইলিনের ভক্ত—ও চায় না ওর বন্ধু আড়ালে পড়ে যাক।

তৃতীয় দিনে বিকেল চারটের সময় মিঃ সীডার্স এল। তখন টেবিলগুলোতে কোনো খদ্দেরই নেই। রেস্তোরাঁর পেছনের দিকে টিল্‌ডি সর্ষের পাত্রগুলো নতুন করে ভরছিল, আর পাই-পিঠেগুলো টুকরো করছিল এইলিন। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, মিঃ সীর্ডাস্‌ হেঁটে এল সেখানেই।

টিল্‌ডি মুখ তুলে তাকে দেখতে পেয়ে যেন খাবি খেয়ে সর্ষের চামচটা বুকের ওপর চেপে ধরে। ওর চুলে একটা লাল 'বো' বাঁধা, একটা ব্যাজ পরেছে অষ্টম এ্যাভিন্যুর "ভিনাসের"—নীল পুঁতির মালা, রুপোর প্রতীকী হৃদয়-চিহ্ন ঝোলানো।

মিঃ সীডার্সকে অপ্রস্তুত আর লজ্জারুণ দেখায়। একটা হাত পেছনের পকেটে ঢুকিয়ে অন্য হাতটা রাখে টাটকা কুমড়োর পিঠের ওপর।

বলে, 'মিস্‌ টিল্‌ডি! সেদিন সন্ধ্যায় আমি যা করেছিলাম তার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি। সত্যি কথা বলতে সেদিন বড্ড বেশি বীয়র খেয়েছিলাম, না হলে কক্ষনো এরকম করতাম না। মাথা স্থির থাকলে কোনো মহিলার সঙ্গেই অমন করি না। তাই আশা করি, মিস্‌ টিল্‌ডি, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, আর বিশ্বাস করবেন আমি সজ্ঞানে থাকলে, আর মাতাল না হলে একাজ করতাম না।'

এই সুন্দর আবেদনটি জানিয়ে মিঃ সীডার্স পিছিয়ে এসে বেরিয়ে চলে গেল, আশ্বস্ত যে তার মেরামতের কাজটা ভালই হয়েছে।

কিন্তু স্বস্তিজনক পর্দাটার ওপাশে গিয়ে টিল্‌ডি যেন একেবারে ভেঙে পড়ল টেবিলের ওপর, মাখনের টুকরো আর কফি কাপগুলোর মধ্যে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয় উজাড় করে। আবার সেই ধূসর প্রান্তরে ফিরে যাওয়া, যেখানে বোঁচা-নাকী আর শণচুলীরা যায়। চুলের বাঁধন থেকে সে লাল 'বো'-টা খুলে ফেলে, ছুঁড়ে দেয় মেঝের ওপর। সীডার্সকে সে এখন যার পর-নাই ঘৃণা করে; ও তার চুম্বন গ্রহণ করেছিল যেন কোনো আগুয়ান জ্যোতিষী-কথিত রাজপুত্রের কাছ থেকে, যে পরীর রাজ্যের সব ঘড়িগুলো চালু করে দিত আর বালক ভৃত্যদের দৌড় করাতো। কিন্তু সে চুম্বন ছিল মাতলামির, অনুদ্দেশ্য; মিথ্যা সংকেতে রাজসভা বিচলিত হয়নি, ওকে চিরকালই এখন থাকতে হবে 'নিদ্রিতা রাজকন্যা' হয়ে।

তবু, সবকিছু খোয়া যায়নি। এইলিনের বাহু রয়েছে তাকে ঘিরে; টিল্‌ডির লাল হাত মাখনের টুকরোগুলোর ভেতর দিয়েই হাতড়ে পৌঁছোয় তার বন্ধুর উষ্ণ সান্ত্বনার মুঠোয়।

'তুমি অতো অধীর হয়ো না টিল', সবটুকু না বুঝেই বলল এইলিন, 'ওই শালগম-মুখো সীডার্স ছোকরাটি এর যোগ্যই নয়। সে কোনো ভদ্দরলোক নয়, ভদ্দরলোক হলে কখনো ক্ষমা চাইতো?'

A Brief Debut of Tildy, নিউইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

ট্রেন ডাকাতি

দ্রষ্টব্য—যে লোকটা এসব ব্যাপার আমায় শুনিয়েছিল, সে বহু বছর ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় ফেরারি আইনভঙ্গকারী, আর যে পেশার কথা সে অকপটে বর্ণনা করেছে তা এখনো অনুসরণ করেই চলেছে। "কর্মপদ্ধতি" সম্পর্কে তার বক্তব্য নিশ্চয়ই আগ্রহোদ্দীপক। যারা সম্ভাব্য ট্রেনযাত্রী, ভবিষ্যতে "ডাকাতির" মধ্যে পড়লে তাদের কাছে উপদেশগুলো কাজে লাগবে। আর ট্রেন ডাকাতির "মজা"- যার সে আন্দাজ দিয়েছে, সেটা অবশ্য কাউকেও পেশা গ্রহণ করার প্রেরণা দেবে না। আমি প্রায় ওব নিজস্ব ভাষাতেই এ কাহিনী হাজির করলাম।-

ও. হে.

মতামত জানতে চাইলে বেশির ভাগ মানুষই বলবে, ট্রেন রুখে ডাকাতি করাটা কঠিন কাজ। কিন্তু তা নয়, খুবই সহজ কাজ। আমি তো রেলপথে কিছুটা অস্বস্তি, এক্সপ্রেস কোম্পানিদের কিছুটা ঘুমের ব্যঘাত ঘটিয়েছি,—আমার সবচেয়ে ঝামেলা হয়েছে নীতিবর্জিত জোচ্চোরদের হাতে, যাদের জন্য নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করেছি। তেমন সাংঘাতিক বিপদ কিছু নয়, তাই ঝামেলা নিয়ে অতো মাথা ঘামাইনি।

একজন লোক হলে প্রায় একাই ট্রেন লুঠ করার মতো, দু'জন থাকলে কয়েকবার সফল হওয়া গেছে; প্রতারক হলে তিনজনেও চলতে পারে, কিন্তু পাঁচজন সংখ্যার দিক দিয়ে সঠিক। কাজের "সময়-আর-জায়গা" নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর।

১৮৯০ সালে ঘটল প্রথম "ট্রেন আটকে ডাকাতিটা" যার মধ্যে আমি ছিলাম। সেবারই আমার হাতে খড়ি। আমি যেভাবে এর মধ্যে এলাম, হয়তো তার মধ্যেই ব্যাখ্যা মিলবে কেমন করে বেশির ভাগ ট্রেন ডাকাত তাদের পেশা শুরু করে। পশ্চিমী ফেরারিদের ছ'জনের মধ্যে পাঁচজনই স্রেফ কাউবয়, যারা চাকরি খুইয়েছে কিংবা গিয়েছে বিপথে। আর ষষ্ঠজন হল পূব অঞ্চলের গুন্ডা, যে বদ-মানুষের মতো পোশাক পরে আর এমন সব বাজে ধরনের চালাকি দেখায় যাতে বদনাম

হয় অন্য ছোকরাদের। প্রথম পাঁচজন আসে খামারের তারের বেড়া ভেঙে, কিংবা কাজে ফাঁকি দিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে; আর ষষ্ঠ জন মন্দ হৃদয় নিয়ে।

কলোরেডের ১০১-র্যাঞ্চে কাজ করতাম আমি, আর জিম্ এস্.। ফাঁকিবাজদের ধরতে খামার মুনিষরা ঘুরছে। ওরা জমি দখল করে এমন সব পুলিশ-অফিসারকে নির্বাচিত করে যাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। একবার ঘেরাও এড়াতে জিম আর আমি দক্ষিণ দিকে লা-জান্টাতে ঘোড়া চালিয়ে ঢুকে পড়ি। পথে যাকে পাই তাকে নিয়েই এক-আধটু তামাশা করি, তবে কোনো বদমাইশি মতলবে নয়। এর মধ্যে এক চাষী পঞ্চায়েত এল মাথা গলাতে, আমাদের ওপড়াবে বলে। জিম এক ডেপুটি মার্শালকে গুলি করল, আর আমিও যেন তার জবাবে নিজের সমর্থন জানালাম গুলি চালিয়ে। দু'জনে মিলে সদর রাস্তায় আগাগোড়া লড়াই চালাই, সব সময় বুমারদেরই কপাল মন্দ হয়। কিছুক্ষণ পর আমরা মাথা নিচু করে ছুটে গেলাম সেরিসো নদীর ধারে খামারটার দিকে। আমাদের ঘোড়া দুটো ওড়ে না বটে, তবে লাফিয়ে পাখি ধরতে পারে।

এর ক'দিন পর, লা-জান্টা বুমারদের একটা দল এল ওই খামারে, দাবি জানাল আমরা যেন তাদের সঙ্গে ফিরে যাই। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা অস্বীকার করি। আমাদের দখলে ছিল বাড়িটা, অস্বীকার করার মেজাজ দেখাবার আগেই পুরনো পোড়া ইটের বাড়ি ঝাঁঝরা হয়ে গেল সীসের গুলিতে। আঁধার ঘনাবার মুখে আমরা ওদের ওপর চালালাম বুলেটের ঝাঁক। পালিয়ে গেলাম পেছনের দরজা দিয়ে পাহাড়ের দিকে। যাবার আগে আমাদেরও ধোঁয়ায় ডুবিয়ে দিয়েছিল ঠিকই। আমাদের ভেসে চলতে হবে এদিক-উদিক, তাই করলাম, অবশেষে ঘুর পথে পৌঁছলাম ওকলাহোমায়।

তা, সেখানে তো আমাদের পাবার মতো কিছুই ছিল না। বড় দুর্দশায় পড়ে ঠিক করলাম এবার একটু রেলের রাস্তা নিয়েই কারবার করব। জিম আর আমি যোগ দিলাম টম আর আইক মুরের সঙ্গে—ওরা দুই ভাই, যাদের প্রচুর বালি যা তারা ধুলোয় বদলে নিতে চায়। আমি ওদের নাম বলতে পারি, কারণ দু'জনেই মরে গেছে। টমি গুলি খেয়ে মরেছিল আরকান্সাসের একটা ব্যাঙ্ক লুট করতে গিয়ে, আর আইক খুন হয়েছিল আরো বিপজ্জনক এক খেলায়—ক্রীক-নেশানে নাচের আসরে গিয়ে।

সান্টা ফে-তে আমরা একটা জায়গা বেছে নিলাম। পেল্লায় সব গাছে ঘেরা এক গভীর খাতের ওপর ছিল একটা পুল। সমস্ত প্যাসেঞ্জার-ট্রেন ওই পুলের একদিকে খুব কাছাকাছি এসে ট্যাংক থেকে জল নেয়। খুব নিঃঝুম জায়গা, সবচেয়ে কাছের বাড়িটাও পাঁচ মাইল দূরে। যে রাতে ঘটনা ঘটল তার আগের দিন আমরা ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে "দাওয়াই" ঠিক করছিলাম কী ভাবে কাজটা করা যাবে। আমাদের নক্‌শা মোটেই পরিষ্কার নয়, কারণ আমরা কেউই আগে ট্রেন আটকে ডাকাতির কাজ করিনি।

সান্টা ফে এক্সপ্রেস গাড়িটার ট্যাংকে আসার কথা রাত ১১:১৫ মিনিটে। এগারোটার সময় টম আর আমি শুয়ে থাকলাম লাইনের এক পাশে। ট্রেন যখন এল, হেডলাইটের আলো লাইনের অনেকটা দূর অবধি ছড়িয়ে দিয়ে, ইঞ্জিন থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ করে, আমার তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। এর চেয়ে বরং খামারে বিনে মাইনেতে সারা বছর খাটা ভাল। মনে হচ্ছিল এ কারবার থেকে এক্ষুনি সরে পড়াই শ্রেয়। অনেক সাহসী লোকই আমায় বলেছে, প্রথম বার এ কাজে এসে তারাও এইরকমই মনে করত।

ইঞ্জিনটা তখন পুরো থামেওনি, আমি তখন একদিকের পা-দানির ওপর লাফিয়ে উঠি, আর অন্য দিক থেকে ওঠে জিম। আমাদের হাতে বন্দুক দেখেই ইঞ্জিনচালক আর ফায়ারম্যান হাত তুলে দাঁড়াল, কিছু বলতেও হয়নি তাদের। ওরা কাকুতি মিনতি করল যাতে গুলি না চালাই, অন্যথায় আমরা ওদের যা কিছু করতে বলব তা করবে।

হুকুম করলাম, 'মাটিতে নেমে পড়!' দুজনেই লাফিয়ে পড়ল। ওদের ঠেলে নিয়ে চললাম আমাদের আগে আগে ট্রেনের পাশ ধরে। এটা যখন ঘটছে, টম আর আইক ট্রেনের দু'পাশ থেকে ওপরে গুলি ছুঁড়ছে আর হাঁকড়াচ্ছে অ্যাপাচেদের মতো—যাতে যাত্রীরা বগির মধ্যে এক-কাঠ্ঠা হয়ে থাকে। কোনো বান্দা একটা কোচের জানলা থেকে ছোট বাইশ ক্যালিবারের বন্দুক বের করেছিল, সোজাই চালাল শূন্যে লক্ষ্য করে। আমি এগিয়েই চললাম, আর গুলি চালিয়ে লোকটাব মাথার ওপরের কাঁচ ভেঙে দিলাম। ও-দিক থেকে কোনোরকম প্রতিরোধ ওভাবেই খতম করা গেল।

এতক্ষণে আমার সব ভিতু ভাব চলে গেছে। এমন মজার উত্তেজনা এল যেন কোনো নাচ বা কোনো ধরনের খেলায় মেতে উঠেছি। কোচগুলোর মধ্যে সব বাতি নিভে গেছে, আর টম আর আইক ক্রমে গুলিবাজি আর চিৎকার থামাতে, সবই যেন নিঃঝুম হয়ে গেল শ্মশানের মতো। মনে আছে লাইনের ধারে একটা ঝোপে শুনতে পাচ্ছিলাম কোনো ছোট পাখির কিচির মিচির—যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে নালিশ জানাচ্ছে সে।

ফায়ারম্যানকে বললাম লণ্ঠন ধরতে, তারপর এগিয়ে গেলাম এক্সপ্রেস্‌ কোচটার কাছে। চিৎকার করে ডাক-বাহীকে বললাম হয় দরজা খুলতে, নয় গুলিতে ঝাঁঝরা হতে। সে দরজাটা এক পাশে ঠেলে খুলে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। বললাম, 'গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়, বাচ্চা!' আর সেও এক দলা সীসের মতো ধুপ করে পড়ল মাটিতে। গাড়ির মধ্যে সিন্দুক—একটা বড়, আরেকটা ছোট। যা হোক, আমি প্রথমে লক্ষ্য করলাম ডাক-বাহকের অস্ত্র-সরঞ্জাম—একটা মোটা কার্তুজের দোনলা শট্‌গান আর দেরাজের মধ্যে একটা ·৩৮ পিস্তল। শট্‌গান থেকে কার্তুজ বের করে পিস্তলটা পকেটস্থ করলাম, তারপর ডাক-বাহককে ডাকলাম ভেতরে।

ওর নাকের সামনে আমার বন্দুক ধরে ওকে লাগিয়ে দিলাম কাজে। বড় সিন্দুকটা সে খুলতে পারল না, কিন্তু ছোটটা পেরেছে। ওর মধ্যে মাত্র ন'শো ডলার। আমার এত ঝক্কি নেবার পক্ষে ও টাকা তো যৎসামান্য, তাই আমরা ঠিক করলাম যাত্রীদের তল্লাসি করতে হবে। আমাদের বন্দীদের ধরে নিয়ে গেলাম ধূমপান কামরায়, সেখান থেকে ইঞ্জিনীয়রকে ট্রেনের ভেতরে পাঠালাম কোচের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিতে। প্রথমটা থেকে শুরু করে, প্রত্যেক দরজায় একজন করে লোক রাখলাম, আর যাত্রীদের হুকুম করলাম আসন সারির মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়াতে।

বেশির ভাগ লোকই যে কত ভীরু প্রকৃতির, তা যদি জানতে চান তা হলে ট্রেনে ডাকাতি করুন। এজন্য বলছি না যে তারা বাধা দেয় না—কেন সেটা করতে পারে না সেটা আপনাকে পরে বলব—কিন্তু যে ভাবে তারা নিজেদের বুদ্ধিটুকু খোয়ায় তা দেখলে ওদের জন্য যে-কোনো লোকেরই কষ্ট হবে। বড়বড় মোটা ভুঁড়িওয়ালা, চাষী, প্রাক্তন সেপাই, কলার উঁচু বাবু, খেলোয়াড় লোক যারা ক'মিনিট আগেও চেঁচামেচি বারফট্টাইয়ে গাড়িটাকে তোলপাড় করছে, তারা এমন ভীতু ভেড়া হয়ে যায় যে কানগুলো অবধি নড়ে।

রাতের ওই সময়টায় দিনের বেলার কোচে খুব কম যাত্রীই থাকে; তাই বেশ স্বচ্ছন্দেই কামরাগুলো লুটে আমরা যাই স্লিপার কক্ষগুলোতে। পুলম্যান কোম্পানির কন্ডাকটার আমার মুখোমুখি হল একটা দরজায়, ওদিকে জিম ঘুরে আসছে অন্য দরজার দিকে। সে বেশ বিনীতভাবে বলল, ও কামরায় তো আমি যেতে পারি না, কারণ ওটা রেল কোম্পানির সম্পত্তি নয়, তা ছাড়া যাত্রীরাও খুব বিরক্ত হয়েছেন চেঁচামেচি আর গুলির আওয়াজে। মিঃ পুলম্যানের সুনামের ক্ষমতায় অতোখানি ভরসা আর সরকারী মর্যাদা! এমন চমৎকার নমুনা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমি এমন জোরে আমার ছ-ঘরা পিস্তলটা ঠেসে ধরলাম মিঃ কণ্ডাকটারের বুকে, যে পরে দেখলাম ওর ভেস্ট্‌কোটের একটা বোতাম বন্দুকের নলে জমপেশ হয়ে বসে গেছে—গুলি করে সেটা বের করতে হয়। সে একেবারে নরম স্প্রিংওলা ছুরির মতোই চুপসে গেল, নেমে পড়ল কামরার সিঁড়ি ধরে।

স্লিপার কামরার দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। একজন বিপুলকায় বুড়ো লোক হাঁসফাঁস করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার কাঁধে একদিকের কোটের হাতা, ওটার ওপরেই ভেস্ট্‌কোট চড়াতে চেষ্টা করছে। জানি না আমাকে সে কী মনে করেছিল।

বললে, 'ইয়ং ম্যান, ইয়ং ম্যান, একেবারে মাথা ঠান্ডা রাখবে, উত্তেজিত হবে না। সব কিছুর ওপর মাথাটি ঠান্ডা রাখা।'

'পারছি না যে!' বলি আমি, 'উত্তেজনা আমায় গিলে খাচ্ছে'। বলেই একবার হাঁকড়ে উঠে আমি স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে ·৪৫ বোর পিস্তল থেকে গুলি ঝাড়লাম।

বুড়োটা হুড়মুড় করে নিচের বার্থে নেমে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেখান

থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার আসে, একটা খালি পা তাকে টেনে নামিয়ে দেয় রুটির ঝুড়ির ওপর—তাকে সোজা নামিয়ে দেয় মেঝেতে। জিমকে দেখলাম অন্য দরজাটা দিয়ে ঢুকতে। আমি হৈ হৈ করে সবাইকে বললাম একে একে বেরিয়ে এসে সার বেঁধে দাঁড়াতে।

ওরা হাঁচড়েপাঁচড়ে নামার চেষ্টা করছে, কয়েক মিনিট যেন তিন রিং-ওয়ালা সার্কাস দেখলাম। বেটাছেলেদের দেখাচ্ছে গভীর তুষারের মধ্যে একদল ভিতু পোষা খরগোশের মতো। গড়ে প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে জামার এক-চতুর্থাংশ, আর একটি করে জুতো। আসনসারির মাঝে মেঝের ওপরেই বসেছে এক ছোকরা, ভাবখানা যেন খুব কঠিন একটা পাটিগণিতের অঙ্ক কষছে। মুখ গম্ভীর রেখেই চেষ্টা করছে কোনো মহিলা দু-নম্বর জুতো নিজের ন-নম্বর পায়ে গলাতে!

মহিলারা পোশাক পরার পেছনে সময়ক্ষেপ করেনি। ওরা একজন মূর্তিমান জ্যান্ত ডাকাতকে দেখতে উৎসুক—তাই কোনোরকমে শুধু গায়ের ওপর চাদর কম্বল জড়িয়ে বেরিয়ে এল কিচ্‌কিচ্ করে, ছটফটে ভাব করে। বরাবরই ওরা পুরুষদের চেয়ে বেশি কৌতূহল আর সাহস দেখায়।

ওদের সবাইকে লাইনে দাঁড় করালাম আমরা, এখন বেশ চুপচাপ, তারপর আমি শুরু করলাম গোটা দলের তল্লাসি। তেমন কিছুই পেলাম না কারুর কাছে—মানে মূল্যবান্ বলতে কিছু। একজনের চেহারা তো দেখবার মতো! সে হল সেই ধরনের বিরাট বপু, সুগম্ভীর 'তন্দ্রাতুর'দের একজন, যাঁরা বক্তৃতা মঞ্চে বসেন, জ্ঞানীদের মতো যাদের চেহারা। গুঁড়ি মেরে বেরুবার আগে সে কোনোমতে পরে নিয়েছে তার লম্বা লেজ-ঝোলানো ফ্রককোট আর উঁচু সিল্কের টুপিখানা। ওর বাকি বসনটা পাজামা আর গেঞ্জি ছাড়া কিছু নয়। যখন সেই প্রিন্স অ্যালবার্টকে খোঁচালাম, ভেবেছিলাম আর কিছু না হোক কিছু সোনার খনির স্টক কিংবা একগাদা গভর্নমেন্ট-বন্ড টেনে বের করতে পারব, কিন্তু সাকুল্যে যা পেলাম তা এক কচি খোকার চার ইঞ্চি লম্বা বাজনা। ওটা ওখানে কী কারণে, তা বুঝলাম না। সে আমাকে বোকা বানিয়েছে ভেবে আমি রেগে টং হই। তার মুখের ওপর বাজনাটা ঠেসে দিয়ে বলি:

'যদি বরাদ্দ না দিতে পার তো এই বাদ্য বাজাও!'

'আমি বাজাতে পারি না', বলল সে।

'তাহলে চটপট্ শিখে ফেল এক্ষুনি', ওর নাকে আমার বন্দুকের নলের গন্ধ শুঁকিয়ে বললাম।

সে বাজনাটা হাতে নিয়ে বীটের মতো লাল মুখ করে ফুঁ দিতে শুরু করে ওতে। আমার ছেলেবেলায় শোনা একটা মজার সুরের গান বাজিয়ে শোনায়: "গাঁয়ের ফুট্‌ফুটে সে মেয়ে গো! মা বলেছেন, বাবা বলেছেন তাই তো!"

যতক্ষণ আমরা গাড়িতে ছিলাম ততক্ষণই তাকে দিয়ে ওই সুর বাজিয়েছি। মাঝে মাঝে তার সুর কেটে যাচ্ছিল, ঢিলে পড়ে যাচ্ছিল। আমি বন্দুক তাক্ করে তাগাদা দিই—এর পর সেই মেয়ের কি হল? ওর মতলবটা কি মেয়েটাকে পথে বসাবার? তা হলে অবশ্য তাকে ষাট বছর থেকে আবার শুরু করতে হয়! মনে হয় এমন মজার দৃশ্য জীবনে দেখিনি—বুড়ো খোকা সিল্কের টুপি আর পাজামা পরে ওখানে দাঁড়িয়ে খেলনার ফরাসী যন্ত্র বাজাচ্ছে! সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা খাটো লালচুলো মেয়ে তো হেসেই ফেলল তাকে দেখে। পরের কামরা থেকেও শুনতে পেতেন তার গলা।

এরপর জিম ওদের ধরে রাখল, আর আমি খুঁজতে লাগলাম বার্থগুলো। বিছানাপত্রগুলো ওলটপালট করে, একটা বালিশের খোলের মধ্যে জড়ো করেছি রাজ্যের সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। মাঝে মধ্যে একটা দুটো ছোট ছেলেমানুষি পিস্তল দেখি যা দিয়ে বোধহয় শুধু দাঁতই তোলা যায়—সেগুলোকে ফেলে দিই জানলা দিয়ে। সংগ্রহ যখন শেষ হল, আমি বালিশের খোলটা নামিয়ে রাখলাম গলির মাঝখানে। বেশ কিছু ঘড়ি, ব্রেসলেট, আংটি ছিল, আর পকেট বই, কিছু নকল দাঁত, হুইস্কির চ্যাপটা বোতল, পাউডার বাক্স, চকোলেট কারামেল, আর নানা রঙের আর লম্বাইয়ের পরচুলা। আর ডজনখানেক লেডীজ মোজা যার মধ্যে গয়নাপত্র, ঘড়ি আর টাকার বান্ডিল ঠেসে রাখা আছে। ওই ভাবেই সব ভাল করে বেঁধে তোশকের নিচে রাখা হয়েছিল। আমি বললাম আমরা তো লড়াই করতে আসা রেড ইন্ডিয়ান নই, তাই পরচুলাগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু মহিলাদের কেউই মনে হল জানে না কাদের চুল ওগুলো।

একজন মহিলা—দেখতে বেশ সুন্দরীই—ডোরাদার কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছিল। আমায় একটা চক্‌মকে মোজা তুলতে দেখেছে—যার ডগার দিকটা বেশ ভারি। দেখেই বলে উঠল:

'ওটা আমার, মশাই। আপনি তো মহিলাদের জিনিস লুট করার ব্যাপারে নেই, তাই না?'

এখন, এটা হল আমাদের প্রথম ট্রেন ডাকাতি, আমরা কোনো নীতির নিয়ম স্থির করে নিইনি, তাই বুঝতে পারলাম না কী জবাব দেব। তবু যা-হোক জবাব দিলাম, 'না, সেরকম কোনো বিশেষ কথা নয়। তবে এর মধ্যে যদি আপনার ব্যাক্তিগত সম্পত্তি থাকে আপনি এটা ফেরত নিতে পারেন।'

আগ্রহভবে হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'তা, কিছু তো আছে!'

বললাম, 'ভেতরের জিনিসগুলো একটু দেখে নেব, মাফ করবেন।' মোজার ডগাটা ধরে উলটে দিলাম। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বড় আকারের পুরুষদের সোনার ঘড়ি, দু'শো ডলার দাম হবে, সেই সঙ্গে পুরুষদের মানিব্যাগ একটা, পরে যার মধ্যে পেয়েছিলাম ছ'শো ডলার, একটা ·৩২ ক্যালিবারের রিভলবার।

মেয়েমানুষের ব্যাক্তিগত জিনিস বলতে ওর মধ্যে আছে একটা রুপোর ব্রেসলেট যার দাম হবে ৫০ সেন্ট।

বললাম, 'ম্যাডাম, এই আপনার সম্পত্তি', বলে ব্রেসলেটটা তার হাতে দিলাম, 'এখন বলুন, কেমন করে আশা করতে পারেন আমরা আপনাদের সঙ্গে সিধে পথে চলব, যখন নিজেরাই চেষ্টা করছেন এভাবে আমাদের ধাপ্পা দিতে? এমন ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি!'

যেন সত্যিই কিছু অসৎ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে এমনি ভাবে রাঙা হয়ে উঠল যুবতি মহিলা। সারির ভেতর থেকেই অন্য কোনো মহিলা বলে উঠল, 'কী ইতরামো!' সেটা আমাকে লক্ষ্য করে না যুবতিকে লক্ষ্য করে, তা অবশ্য আর জানতে পারিনি।

আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাইকে হুকুম দিলাম বিছানায় ফিরে যেতে, দরজার কাছ থেকে সবিনয়ে জানালাম শুভ রাত্রি, তারপর বেরিয়ে এলাম। ভোরের আগেই চল্লিশ মাইল ঘোড়ায় চেপে চলে এসেছি। তারপর বসলাম লুটের বখরা করতে। প্রত্যেকে নগদ টাকা পেলাম ১৭৫২.৮৫ ডলার। পাথর গয়নাগুলো চারদিকে ডাঁই করে রাখলাম। যার যা সাধ্য তুলে নিয়ে নিজের নিজের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লুম।

সেটা ছিল আমার প্রথম ট্রেন ডাকাতি। সেটা যেমন সহজভাবে করেছিলাম তেমন অনায়াসেই করলাম পরেরগুলোও। কিন্তু সেবারই ছিল শেষ আর একমাত্র ডাকাতি যেবার যাত্রীদের ব্যাক্তিগত ভাবে ছিনতাই করেছি। কারবারের ওই দিকটা আমার ভাল লাগে না। এরপর থেকে কড়াভাবে শুধু লেগে থেকেছি এক্সপ্রেস গাড়ির পেছনে। পরের আট বছর আমি টাকাও কামিয়েছি প্রচুর।

সবচেয়ে ভাল খেপটা তুলেছিলাম প্রথমটার ঠিক সাত বছর পরে। খবর পেয়েছিলাম একটা ট্রেন আসবে প্রচুর টাকা নিয়ে, কোনো সরকারী ঘাঁটির সেপাইদের মাইনে দিতে। প্রকাশ্য দিবালোকে আমরা ট্রেনটাকে রুখলাম। একটা ছোট স্টেশনের কাছে বালিয়াড়ির পেছনে ওৎ পেতে ছিল আমাদের পাঁচ জন। দশজন সৈন্য ট্রেনে টাকা পাহারা দিচ্ছিল। তবে তারা যেন ছুটি কাটাতে বাড়িতে বেড়াতে আসছে। এইরকমই তাদের ভাবসাব। আমরা তাদের জানলা দিয়ে মাথা বের করে মজা দেখবার অবসারটাও দিইনি। টাকাগুলো হাতাতে আমাদের কোনো অসুবিধেই হয়নি, সমস্তটাই সোনার আকারে। অবশ্য খুব সোরগোল উঠেছিল ডাকাতির সময়টা নিয়ে। গভর্নমেন্টের সম্পত্তি, তাই সরকারই ব্যঙ্গ করে জানতে চাইল তাহলে সেপাইয়ের দল কী কারদানি দেখাতে সঙ্গে গিয়েছিল? একমাত্র ওজর যা দেখানো হল তা এই যে, পুরো দিনের বেলায় ওই শূন্য বালিয়াড়ি এলাকায় কেউ কোনো আক্রমণই প্রত্যাশা করতে পারেনি। এই ওজর সম্পর্কে সরকার কী ভেবেছিল জানি না, তবে এটা যে ভাল অজুহাত সেটা আমি জানি। 'হঠাৎ চমকে দেওয়া'—সেটাই

ট্রেন ডাকাতি কারবারের আসল মর্ম। খবরের কাগজগুলো লোকসান সম্পর্কে নানান্ কাহিনী ছেপেছে, শেষ পর্যন্ত একমত হয়ে স্থির করেছে সেটা ন'হাজার থেকে দশ হাজার ডলারের মধ্যে হবে। গভর্নমেন্ট ঘাস কেটেছে। এবার নিন্ প্রকৃত পরিমাণটা, ছাপার অক্ষরে এই প্রথম—আটচল্লিশ হাজার ডলার। কেউ যদি একটু কষ্ট করে আঙ্কল স্যামের গোপন হিসেবপত্র দেখেন, লাভ ক্ষতির মধ্যে সামান্য লোকসান, তা'হলেই বুঝবেন আমি শেষ সেন্টটি অবধি সঠিক।

ওই সময়ের মধ্যে কী করতে হবে না-হবে, সে ব্যাপারে আমরা ওস্তাদ হয়ে উঠেছি। আমরা সিধে পশ্চিমে কুড়ি মাইল অবধি চ'লে গেলাম, এমন সূত্র রেখে যা ব্রডওয়ের একজন পুলিসও অনুসরণ করতে পারত, তারপরেই আমরা মোচড় দিয়ে পেছন দিকে ফিরে এলাম, আমাদের সমস্ত চিহ্ন চাপা দিয়ে। ট্রেন রোখার পরের রাতে যখন পুলিশ বাহিনী সব দিক ছেয়ে ফেলে তন্ন তন্ন খুঁজছে, জিম আর আমি, এক বন্ধুর বাড়ির তেতলায় বসে নৈশভোজন করছি- সেই শহরেই যেখান থেকে আতঙ্কের খবর প্রথম ছড়ায়। আমাদের বন্ধু আঙুল দিয়ে রাস্তার উল্টো দিকের একটা দপ্তর দেখাল যেখানে ছাপা যন্ত্র থেকে হ্যান্ডবিল ছেপে বেরুচ্ছে, আমাদের ধরতে পারলেই পুরস্কার মিলবে।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছে, যে টাকাগুলো আমরা পাই তা দিয়ে কী করি। একবার খরচ করে ফেলার পর এর দশ ভাগের একভাগের হিসেবও আমি দিতে পারব কিনা সন্দেহ। আইন-ভাঙা ফেরারিকে যথেষ্ট সংখ্যায় বন্ধু পোষণ করতে হয়। একজন অতি সম্মানিত নাগরিক কয়েকজন মাত্র সুহৃৎকে নিয়ে থাকতে পারেন, আর তা থাকেনও, কিন্তু আইন ফাঁকি মেরে পালানো কোনো লোকের 'পাশ বাঁচানো ইয়ার' না হলে চলবে না। ক্রুদ্ধ পুলিশ আর পুরস্কারলোভী অফিসাররা যখন পাগলের মতো তাকে খুঁজে বেড়ায় সূত্র ধ'রে, তখন তো দেশের এখানে ওখানে কিছু জায়গা ছড়িয়ে থাকতেই হবে যেখানে তার নিজের আর ঘোড়াটির আশ্রয় আর খাওয়া জোটে, আর অন্তত দু'চোখ খুলে না রেখে কয়েক ঘন্টা নিদ্রা দিতে পারে। যখন সে মোটা কামায়, তার ইচ্ছা হয় কিছু মুদ্রা এই সব ইয়ারদেরও দিতে, আর সেটা সে উদারভাবেই করে। কখনো কখনো আমি তড়িঘড়ি এই রকম আস্তানার আশ্রয়ে থেকে মেঝের ওপর খেলতে থাকা বাচ্চাগুলোর কোলে মুঠো করে ছুঁড়ে দিয়েছি সোনার ডলার আর নোট,- হিসেবও রাখিনি আমার "চাঁদা" ছিল একশো ডলার কি হাজার ডলার।

পুরোনো অভিজ্ঞ লোকেরা যখন বড় টাকা দাঁও মারে, তারা সাধারণত বহু দূরে কোনো বড় শহরে চলে যায় টাকা খরচ করতে। যাদের হাত এখনো কাঁচা, তারা যত সফল ট্রেন ডাকাতিই করুক, ঘুরে ফিরে ওই লুটের জায়গায় কাছাকাছিই বেশির ভাগ সময় অতিরিক্ত দরাজ হাতে খরচা করে নিজেদের পরিচয় ফাঁস করে ফেলে।

'চুরানব্বুই সালে একটা কারবার সেরে আমরা কুড়ি হাজার ডলার কামিয়েছিলাম। সেবারও আমরা আমাদের পলায়নের প্রিয় নক্‌শাটাই মেনে চলেছি—অর্থাৎ কিছুটা পথ এগিয়ে ফের সেই পথেই ফিরে আসা—তারপর কিছুদিন ঘাপটি মেরে রইলাম ট্রেনের দুর্ভাগ্য স্থলেরই কাছাকাছি। একদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে পড়ি একটা রিপোর্ট, বড় শিরোনামা দিয়ে ঘোষণা করেছে, পুলিস প্রধান আরো আটজন ডেপুটি, আর তিরিশজন সশস্ত্র নাগরিকের দল সঙ্গে নিয়ে সিমারনের এক মেস্কিট-বনে ঘিরে ফেলেছেন ট্রেন-দস্যুদের। এখন শুধু কয়েক ঘন্টার ব্যাপার, তারপরেই তারা হয় মৃত না হয় বন্দী হবে। কাগজটা পড়বার সময় আমি ওয়াশিংটন নগরীর এক অতি মনোরম ব্যাক্তিগত আবাসে বসে প্রাতরাশ করছিলাম, চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হাফ-প্যান্ট পরা এক ছোকরা। টেবিলের উল্টো দিকে বসে জিম তার তুতো আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলছে। উনি এক অবসরপ্রাপ্ত নৌ-অফিসার, যার নাম আপনারা প্রায়ই দেখছেন রাজধানীর 'অনুস্মারক' স্তম্ভে। আমরা ওখানে গিয়ে ভাল কাপড়ের চটকদার পোশাক কিনেছি, নবাবদের মধ্যে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি পরিশ্রমের পর। আমরা নিশ্চয় ওই মেস্কিটের জঙ্গলেই মারা গেছি, কারণ আমি হলপনামায় ঘোষণা করতে পারি আত্মসমর্পণ আমরা করিনি।

এবার আমি বলব, কেন ট্রেন লুট করা সহজ কাজ, তারপর বলব কেন কারুর সে চেষ্টাও করা উচিত নয়।

প্রথমত, আক্রমণকারী দলের হাতেই সব সুযোগ সুবিধা। এটা অবশ্য ধরেই নেয়া হচ্ছে যে ওরা পুরনো ঘাঘু, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আর সাহস তাদের আছে। তারা রয়েছে ট্রেনের বাইরের দিকে, অন্ধকারে সুরক্ষিত; অপরপক্ষে অন্যরা রয়েছে আলোর মধ্যে, একটা ছোট জায়গায় ঘেরাও হয়ে থাকা। তা ছাড়া যে মুহূর্তে তারা জানলা বা দরজা দিয়ে মাথা দেখাবে, তখনই দৃষ্টিগোচর হবে এমন এক লোকের নিশানার সামনে যে অব্যর্থসন্ধানী, গুলি করতে এক মুহূর্ত হাত কাঁপে না যার।

কিন্তু আমার মতে, যে প্রধান শর্তের ফলে ট্রেন ডাকাতিটা সহজ হয়, তা হলো 'আকস্মিক চমক'- যাত্রীদের কল্পনায় বিস্তার করলে। কখনো যদি 'লোকো' ঘাস খাওয়া ঘোড়া দেখে থাকেন তাহলে বুঝবেন যাত্রীরা 'বিভ্রান্ত' হয়ে যায় বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি। ওরকম ঘোড়া পৃথিবীর যতো অদ্ভুত রকম মস্তিষ্ক-বিভ্রান্তিতে ভোগে। মাত্র দু'ফুট চওড়া একটা ছোট্ট সাঁকোর ওপর দিয়েও তাকে ফুসলে পার করাতে পারবেন না। তার চোখে ওটা তখন চওড়া মিসিসিপি। যাত্রীর বেলায়ও সেরকম। সে ভাবে বাইরে একশো লোক চেঁচাচ্ছে, গুলি ছুঁড়ছে, হয়তো আসলে সেখানে আছে মাত্র দু'জন কি তিনজন। আর ·৪৫ বোরের একটা পিস্তলের নলকে দেখায় সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথের মতো। যাত্রী তবু ভাল, যদিও সে কিছু হীন চালাকি খেলতে পারে, যেমন জুতোর মধ্যে নোটের তাড়া লুকিয়ে রাখা,

আর সেটা বের করতে ভুলে যাওয়া, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আপনি ছ'ঘরার নল ঠেকাচ্ছেন তার পাঁজরে; কিন্তু কোনো মারাত্মক অন্যায় তার মধ্যে নেই।

ট্রেনের কর্মচারী-ক্রু'দের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এক পাল ভেড়া নিয়ে যা ঝামেলা পোষাতে হয় তার বেশি ঝামেলা ওদের নিয়ে আমাদের হয়নি। বলছি না যে তারা ভিতু; বরং বলছি তাদের বুদ্ধি আছে। তারা জানে যে যার সামনে তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে তা কোনো ধাপ্পা নয়। অফিসারদের সম্পর্কেও একই কথা। গোপনীয় সংস্থার লোক, মার্শাল পুলিশ, রেলওয়ের গোয়েন্দারা মোজেজের মতো সবিনয়ে তাদের রেজগি তুলে দেয়। একজন নামকরা সাহসী মার্শালকে দেখেছি নিজের বন্দুকটা আসনের নিচে লুকিয়ে রেখেও যখন সব হিসেব নিচ্ছি তখন অন্য জিনিসের সঙ্গে সেটাও বের করে দিয়েছে। সে ভয় পায়নি; সে শুধু এইটেই জানে যে গোটা ব্যাপারটাই এখন আমাদের তাঁবে। তা ছাড়া, অনেক অফিসারেরই পরিবার আছে, তাই মনে করে কোনো ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়; এদিকে যারা ট্রেন লুট করে তাদের কাছে মৃত্যু কোনো শঙ্কার ব্যাপারই নয়। সে একদিন না একদিন মরবে বলে প্রত্যাশা করে, এবং মরেও।

আপনি যদি কোনোদিন ট্রেন ডাকাতির মধ্যে পড়েন'তা'হলে আপনাকে আমার উপদেশ, ভীরুদের সঙ্গেই সার বেঁধে দাঁড়াবেন আর বীরত্বটা বাঁচিয়ে রাখবেন অন্য কোনো উপলক্ষ্যের জন্য যখন ওটাতে সত্যিই আপনার উপকার হবে। আরেকটা কারণ যার জন্য অফিসাররা ট্রেন ডাকাতদের ঝামেলার মধ্যে পা বাড়াতে চায় না, তা' হল আর্থিক। যতোবারই কাড়াকাড়ি হবে, কেউ খুন হবে, অফিসারদের হবে লোকসান। যদি ট্রেন ডাকাতরা নির্বিঘ্নে সরে পড়ে, তাহলে তারা 'অমুক-তমুকের' নামে হলপ করে একটা ওয়ারেন্ট বের করবে ডাকাতির, তারপর কয়েকশো মাইল গিয়ে পলাতকদের পেছু নিয়েছিল বলে ভাউচারে সই করবে হাজার হাজার ডলার দাবি করে। তাই তাদের কাছে এটা সাহসের প্রশ্ন নয়, ভ্রমণ-ভাতার প্রশ্ন।

ট্রেন ডাকাতির খেলায় 'আকস্মিক চমকই' যে সেরা তাস, সে বিবৃতির সমর্থনে আমি একটি উদাহরণ দেব।

'৯২ সালের বছর ভর 'চেরোকি নেশন' এলাকায় ডালটনদের দল পুলিশ-অফিসারদের নাস্তানাবুদ করেছিল বার-বার। সে সব ছিল ওদের সৌভাগ্যের দিন, তাই এমন মরীয়া আর বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল তারা যে আগে থাকতে ঘোষণা করে দিতে শুরু করল কবে কী করতে যাচ্ছে। একবার তারা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল, এক বিশেষ রাতে ইন্ডিয়ান টেরিটরির প্রায়র-ক্রীক স্টেশনে তারা এম-কে-টি এক্সপ্রেস গাড়ির ওপর হামলা করবে।

সে রাতে রেল কোম্পানি মাস্কোগীতে জড়ো করল পনের জন ডেপুটি মার্শাল, তাদের তুলে দিল ট্রেনে। এ ছাড়াও, প্রায়র-ক্রীক স্টেশনে তারা লুকিয়ে রাখল পঞ্চাশজন সশস্ত্র মানুষ।

যখন "কেটি ফ্লায়ার" এসে পৌঁছলো তখন একটি ডালটনীকেও দেখা গেল না সেখানে। পরের স্টেশন ছ'মাইল দূরে—অ্যাডেয়ার। ট্রেন যখন সেখানে পৌঁছল, ঐ ডেপুটিরা মজা করে ব্যাখানা করছে ডালটনের দলের কেউ এসে পড়লে ওরা তাদের কী ব্যবস্থা করবে, এমন সময় হঠাৎ মনে হল কোনো সৈন্যদল গুলি চালাচ্ছে বাইরে। কনডাকটার আর ব্রেকম্যান ছুটতে ছুটতে এল গাড়ির মধ্যে, চিৎকার করে উঠল, 'ট্রেন ডাকাত!'

ডেপুটিদের কয়েকজন দরজার আলো জ্বালিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে, তারা দৌড়তে শুরু করেছে। ওদের কেউ আবার আসনের নিচে উইনচেস্টার রাইফেলগুলো ঢুকিয়ে রেখেছিল। দু'জন শুধু লড়ল, আর মরল দু'জনই।

ডালটনদের স্রেফ দশ মিনিট লেগেছিল ট্রেন দখল করতে, আর এসকর্ট-গার্ডকে চাবকাতে। আরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে তারা এক্সপ্রেস কামরা থেকে লুট করল সাতাশ হাজার ডলার, তারপর পরিষ্কার বেপাত্তা হয়ে গেল।

আমার মত হল এই যে, ওই ডেপুটিরাই প্রায়র-ক্রীকে হলে বেশ শক্ত লড়াই দিতে পারত, কারণ সেখানে ওরা ঝামেলা প্রত্যাশা করছিল, কিন্তু এ্যাডেয়ারে ওরা ভয়ানক চমক খেয়ে গেল, আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ডালটনরা তো তাদের কাজ ভালই বুঝত, তাই প্রত্যাশাও করেছিল এইটাই।

আমার আট বছরের "ফেরারি" হয়ে গা ঢাকা দেবার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সার সিদ্ধান্ত না জানিয়ে যবনিকা টেনে দেওয়া বোধহয় উচিত হবে না। ট্রেন লুট করে আখেরে কিছু লাভ হয় না। অধিকার বা নীতির প্রশ্ন যা বোধহয় আমার চর্চা করাই উচিত নয়- ওটা বাদ দিলে একজন ফেরারির জীবনে ঈর্ষা করার মতো কতটুকুই বা থাকে! কিছু কাল বাদেই টাকার কোনো মূল্য থাকে না তার চোখে। সে রেলপথ আর এক্সপ্রেস ডাক কোম্পানিগুলোকে দেখতে থাকে নিজের ব্যাঙ্কার হিসেবে, আর তার ছ'ঘরা বন্দুক যেন চেক বই, যাতে যত বড় খুশি অঙ্ক লেখা চলে। ডানে বাঁয়ে টাকা ছড়াতে থাকে সে। বেশির ভাগ সময়েই তো দৌড়-ঝাঁপের ওপর, দিন রাত ঘোড়া ছোটা! দুটো ঘটনার মাঝখানে তাকে এমন কষ্টের জীবন কাটাতে হয় যে উঁচু জীবনের স্বাদ হাতে পেলেও তা উপভোগ করতে পারে না। সে জানে সেই সময়টা তার একসময়ে আসবেই, যখন তার প্রাণ আর স্বাধীনতা দুটোই খতম হয়ে যাবে; তার নিশানার অব্যর্থতা, তার ঘোড়ার বেগ আর তার পার্শ্বচর ইয়ারদের নিষ্ঠাই শুধু ঠেকিয়ে রাখে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে।

আইনের রক্ষকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা করে যে তার রাতের ঘুম উড়ে যায় তা কিন্তু নয়। আমার সমস্ত অভিজ্ঞতায় কখনো কোনো অফিসারকে দেখিনি ডাকাতের দলকে আক্রমণ করতে, যদি না অন্তত একজনের বিরুদ্ধে তাদের তিনজন, এই অনুপাতে শক্তি থাকে।

কিন্তু ফেরারি ডাকাতদের মনে একটা চিন্তা সব সময়েই থাকে—আর সেটাই

তাকে জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ করে তোলে, অন্য আর সবকিছুর চাইতেও—সে জানে মার্শাল প্রধানরা কোথা থেকে তাদের ডেপুটি সহচরদের সংগ্রহ করে। সে জানে এইসব আইনের ধ্বজাধারীদের বেশির ভাগই এক সময়ে ছিল আইন ভাঙা ঘোড়া-চোর, গরু-চোর, রাস্তার ডাকাত, তারই মতো ফেরারি। তারপর রাষ্ট্রের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাল্টে দিয়ে, নিজেরা বেইমান হয়ে সাথীদের কয়েদ আর ফাঁসির দিকে ঠেলে দিয়ে পরে ভাল-ভাল পদ আর সুরক্ষা বাগিয়ে নিয়েছে। সে জানে যে একদিন তাকেও—যদি না আগেই গুলি খেয়ে মরে—তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুরা কাজে নামবে, ফাঁদ পাতবে, আর তাকেই আচমকা চমকে দেবে ডাকাতিতে তার নিজের চমক দেখাবার আগেই।

সেই কারণেই একজন ট্রেন ডাকাতকে তার বন্ধু বেছে নিতে হয় দারুন সতর্ক হয়ে, সাবধানী মেয়ে যেমন তার দয়িতকে বেছে নেয়, তার চেয়েও হাজারগুণ সতর্ক হয়ে। সেই কারণেই সে নিজেকে ঠেলে তোলে রাতের কম্বলের তলা থেকে, কান পেতে শোনে দূরের রাস্তায় যে কোনো শব্দ। সেই জন্যই সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরীক্ষিত বন্ধুরও কোনো নিরর্থক মন্তব্য বা অস্বাভাবিক আচরণ কিংবা পাশে শুয়ে-থাকা পরম বন্ধুর ঘুমের ঘোরে অসংলগ্ন প্রলাপ নিয়ে দিনের পর দিন সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবে। আর সেই অন্যতম কারণেই ট্রেন ডাকাতির পেশাটা তেমন সুখদায়ক নয়—যেমন সুখকর নয় আর-দুটো সমান্তরাল পেশাও: রাজনীতি, আর বাজার কব্জা করা।

Holding up a Train, ম্যাক্লিওর'স, ১৯০৪